সুমতী

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য"

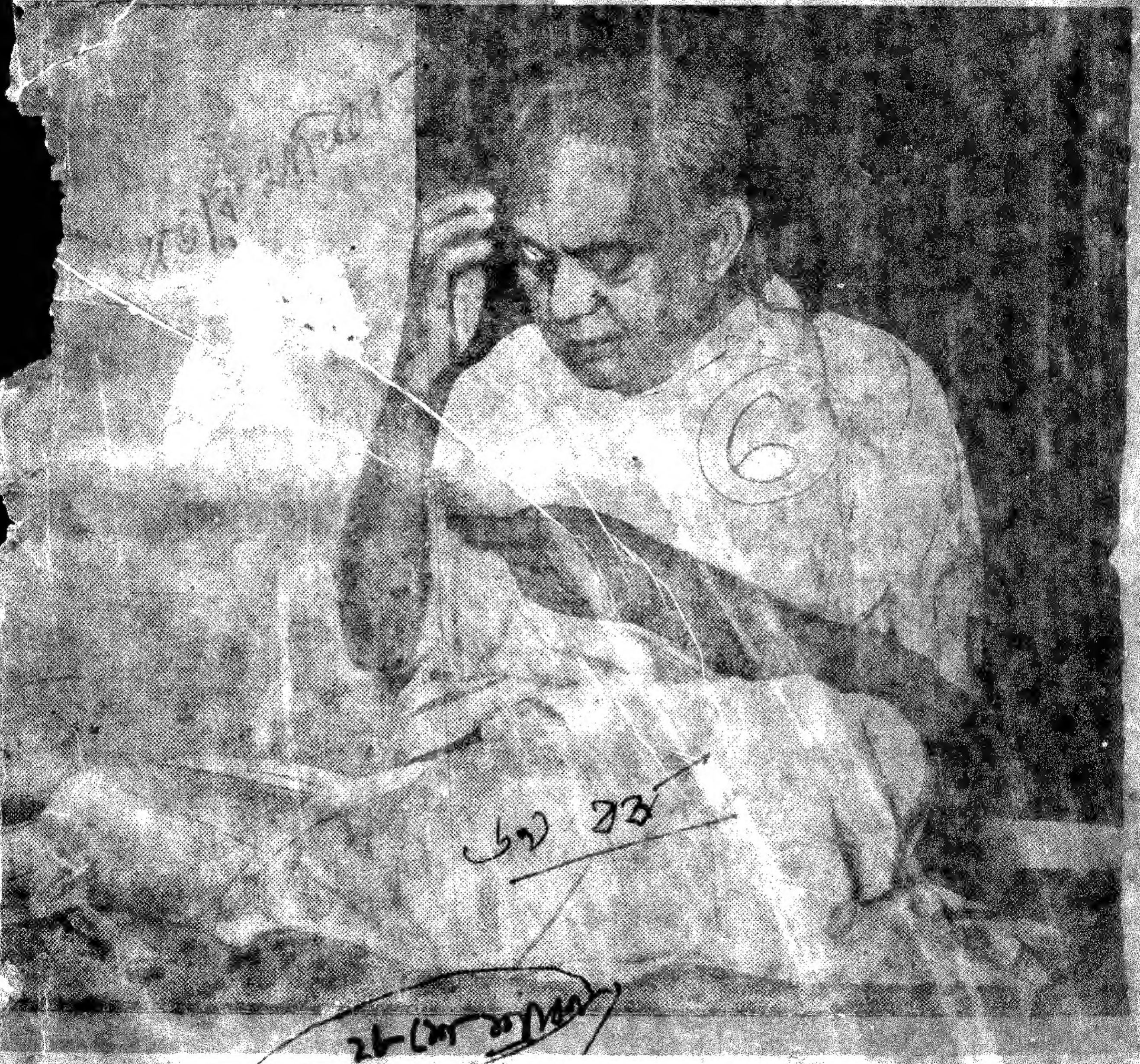

সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 28th May, 1964 . Vol [illegible] No. 1

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

— উপন্যাস —

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য ৩৲ টাকা।

— সাহিত্য —

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম) মূল্য ২৲ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—ধর্মতত্ত্ব (১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য ২৲ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—১॥০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, ২। নীল-দর্পণ, ৩। জামাই বারিক, ৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ৫। নবীন তপস্বিনী, ৬। কমলে কামিনী।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

২য় ভাগে—১। সধবার একাদশী, ২। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৩। লীলাবতী, ৪। কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৫। লীলাবতী, ৬। সুরধুনী কাব্য, ৭। দ্বাদশ কবিতা,

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব্ব উপনিষদ ...
ভক্তি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আবির্ভূত হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থ ... মণিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ... যত্নে পুনর্নির্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালা গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনা ... আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে ... হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি ... স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০ দেব-দেবীর স্তবসমূহ ...

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ
সরোজনাথ ঘোষ অনুদিত
দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর
লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ
দি ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ
মূল্য ১॥০ টাকা।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেশ, কথার সহিত এমন সুরের ... আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্ত্তক, ... অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ... কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী ও বিস্তৃত সমালোচনা ...

মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
…ম্পাদকীয়	…	৩
…ঙ্কাকের মানুষ	…	৪
…রুলকাব্যের আধুনিকতা	সুশীলকুমার গুপ্ত	৫
…চয়ান (কবিতা)	নজরুল ইসলাম	৮
…ও দর্শন	…	৯
…জ্যোতিক	…	১৫
…মেলা	জয়ন্তী সেন	২০
…হিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২১
…ত্ত দেহলী (কা… …চিত্র)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৫
…জরুল ও আব্বাসউদ্দীন	লে… …ল আজীজ আল্‌-আমান	২৯
বর্ষাকালের ঘর (গল্প)	… …াপাধ্যায়	৩৩

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, নির্বাসন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বাঙলার কথাশিল্পী

জলধর গুপ্তের গ্রন্থাবলী

… খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং … খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

… গ্রন্থাবলী

…, মহুয়া, …

মূল্য—… টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, সাধের আসন, … কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য … টাকা

নবরঙ্গ কবির সুন্দরতম সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমা মিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগে—… … … মূল্য— … টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
নজরুল ইসলাম (কবিতা)	বাণী রায়
অনল আয়তী (উপন্যাস)	সুশীল রায়
পঞ্চমী পুরাণ (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	লীলা মজুমদার
রক্তচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
[illegible]	...
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য
রূপজগৎ	...
পাঠক মন	..
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রাজভাষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা-ব্যাকরণ-শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩.৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—[illegible]

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
([illegible])

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—অমর [illegible]
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির [illegible]
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

কথাশিল্পী—[illegible]
অনন্য নিবন্ধ—বিশ্বসাহিত্যপ্রেমিক [illegible]
ক্ল্যাসিকের পরিচয় প্রদান অপরিহার্য।
(২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি :
বারনাবি রাজ, চার্লস ডিকেন্স।) সাহিত্য
জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ [illegible]—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

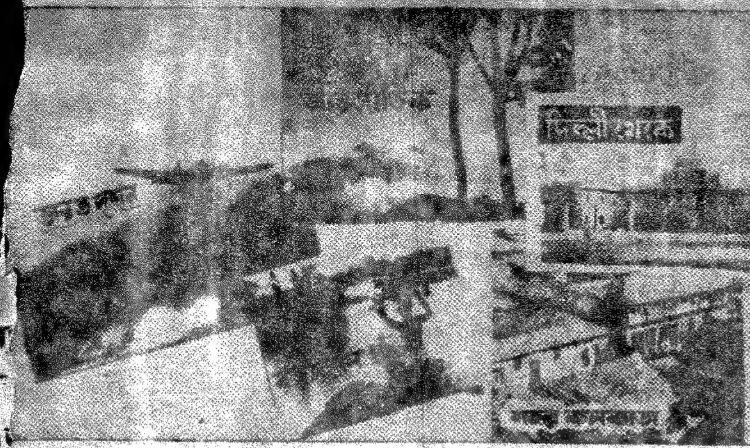

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা - জয়ন্তী সেন

১১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ | 25 Naya Paise

বৃহস্পতিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ | Thursday, 28th May 1964

নজরুল ও জাতীয় দায়িত্ব

মানুষের ব্যথা-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, স্বদেশ-চেতনা, স্বাধীনতা ও বিশ্বমানবতার ভাবের প্রতিমূর্তি কাজী নজরুল ইসলামের মতো মহান কবি সর্বদেশে সর্বকালে জন্মায় না। একান্ত রবীন্দ্র-ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়েও আপন ব্যক্তিত্বে ও স্বকীয়তায় যে গৌরব তিনি অর্জন করেছিলেন, তা সহজ-সুলভ ছিল না। সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী বা দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই দেশ-কালের সীমারেখা অতিক্রম করে তাঁর কাব্য-গীত অনুবাদের মাধ্যমেও দেশান্তরের হৃদয় আজো স্পর্শ করছে। কবি নজরুলও যেন রবীন্দ্রনাথের মতো দেশ-দেশান্তরের চিত্তে ঐক্যানুভূতি ঘটিয়ে বিশ্বহৃদয়ের বন্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। স্বদেশ-চেতনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার জ্বালা, দুর্বোধ্য হৃদয়ের যন্ত্রণায় মানুষ যতদিন ছটফট করবে ততদিন মানুষ নজরুলের কবিতায় ও গানে [illegible] পাবে জীবন-জিজ্ঞাসার সদুত্তর—যার মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব কোনোকালেই বিপন্ন নয়।

[illegible] বাংলার এমন যে, নজরুলের [illegible] সত্তার খবরই যাঁরা একমাত্র [illegible] স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে [illegible] কাব্য-কবিতার প্রয়োগ [illegible] নিষ্প্রয়োজন। কাব্য যদিও তথাকথিত প্রয়োগের বস্তু নয়, কবিতা হচ্ছে চিত্তবিস্তারের অন্যতম দুর্লভ উপায়—তবু একথা আমাদের বলতে হচ্ছে যে, কবি নজরুলের সমগ্র কাব্যভাবনা সম্পর্কে অনেকেই প্রায় নিস্পৃহ। পরাধীন ভারতবাসীর মনে তাঁর কবিতা একদা গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি করলেও, একালেও তার ব্যাপক ব্যঞ্জনার কথা আমরা যেন ভুলে গিয়ে আমাদের অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে না তুলি।

আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি কর্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে—নজরুল সম্পর্কে তাঁদের কর্তব্যের কথা জানিয়ে আমাদের কিছুটা আশ্বস্ত করেছেন। তাঁদের আহ্বানে জাতীয় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দেশবাসী হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সকলের সাড়া দেওয়া আজ উচিত। তাঁরা জানিয়েছেন যে, অন্যান্য বছরের মতো এবারও তাঁরা নজরুলের (৬৫তম) জন্মদিবস উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠান ছাড়াও তাঁরা [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রতিযোগিতা। নজরুলের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে নজরুল একাডেমীর কাজ আগামী জুন মাস থেকে তাঁরা শুরু করতে চান। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্যে যেমন সর্বসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন, তেমনি সরকারী আনুকূল্য একান্ত প্রয়োজন। কেন না একাডেমী কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশের যে দায়িত্ব-ভার নিতে ইচ্ছুক, তাতে ভারতীয় কপিরাইট আইন এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে সরকারী হস্তক্ষেপে নজরুলের যাবতীয় রচনা জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। হিন্দী কবি নিরালার সমগ্র রচনার জাতীয়করণ যদি সম্ভব হয়, তাহলে নজরুলের সমগ্র রচনার জাতীয়করণ সম্ভব হবে না কেন? তাছাড়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ সংস্করণের মতো নজরুলের রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলে দেশবাসী আনন্দিত হবেন।

আশা করি, নজরুল সম্পর্কে আমাদের জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে আমরা আর পরাঙমুখ হবো না, কেননা এতে জাতীয় লজ্জাই বাড়বে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

এই ত' সেদিন পর্যন্তও আমরা সবাই (ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি) ছিলাম একসাথে—একান্নবর্তী। আর আজ, ছিটকে গিয়েছে কে কোথায়—মনের দিক থেকে সরে গিয়েছে অনেক দূরে। সংস্কৃতি আর সংহতি দুটো মেলে নি একসাথে। সম্প্রীতির বদলে জুটেছে প্রবঞ্চনা। এর নাম যদি 'আত্ম-চেতনা' হয়, তবে বলার কিছু নেই। কিন্তু তবুও ভাবি—এই আতঙ্ক সৃষ্টির পরিণতি কোথায়?—এর উত্তর আমরা সন্ধান করি নি বলেই বর্মামুলুক থেকে ভারতীয়দের উচ্ছেদের ব্যবস্থা চলেছে। কোনও ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিবও এই মুহূর্তে শান্তি-প্রীতির ডালি বয়ে নিয়ে সেখানে যেতে ভরসা পাচ্ছেন না। ঠিক এমনই দিনে এই দুরূহ দায়িত্ব নিলেন এমন একজন—যাঁর কথা পররাষ্ট্রনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কখনই মনে আসে নি আমাদের। অথচ যাঁর কর্মক্ষমতা সংশয়াতীত—সকলের কাছে সুবিদিত। নাম—শ্রী আর ডি কাটারী।

অবশেষে নাম শুনে আশ্বস্ত হই। মনে পড়ে নৌবিভাগের ভাইস অ্যাডমিরাল কাটারীর সেই ঋজু-দৃপ্ত চেহারা। আর সেই সাথেই তাঁকে ঘিরে ভিড় করে আসে তাঁর জীবনের অনেক কীর্তির কাহিনী। বয়স তিপ্পান্ন। জন্ম হায়দ্রাবাদে। নাবিক-জীবনের শিক্ষা নিয়েছেন ডাফ্‌রীনে। সেখান থেকে তিনি যোগ দিয়েছেন ভারতীয় নৌবাহিনীতে। পদোন্নতিতে ক্যাপ্টেন হলেন খুব অল্পদিনেই। এবং সেই সঙ্গে প্রধান নৌবিভাগীয় দপ্তরের 'চীফ অফ পার্সোনেল'। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারকে জোরালো করে তুলল। ক্রমশ তিনি 'আই এন ডেস্ট্রয়ার স্কোয়াড্রনে'র 'ক্যাপ্টেন' হ'লেন। 'কমাণ্ডিং অফিসার' হলেন 'রাজপুত আই এন এস'-এর। '৫৪ সালের গোড়ার দিকে শ্রীকাটারী 'ন্যাভাল স্টাফের ডেপুটি চীফ' এবং 'কমোডোর'ও হ'লেন। সে বছরই তিনি পেলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর 'কমাণ্ডার-ইন-চীফে'র দুর্লভ সম্মান। শ্রীকাটারীর আগে আর কোনও ভারতীয়ই সারা ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান কর্ণধারের সম্মানলাভ করেন নি। এরপর ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে তিনি পেয়েছিলেন রীয়ার 'অ্যাডমিরালে'র পদ। সেখানে মাত্র বছর দেড়েক থাকবার পরই ৫৮ সালের [illegible] নৌবিভাগের 'ভাইস-অ্যাডমিরাল' হ'য়েছেন শ্রী আর ডি কাটারী। এর প্রায় বছর চারেক পর থেকেই [illegible] বিভাগ থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত তিনি [illegible] 'চীফ অফ ন্যাভাল স্টাফ'।

অবসর গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত [illegible] অন্ধ্রপ্রদেশ পরিবহন দপ্তরের চেয়ারম্যান হি[illegible] অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময়ে এই বেসামরিক দপ্[illegible] সমস্যাবহুল প্রশাসনিক অধিকর্তার দায়িত্বেও শ্রীকা[illegible] তাঁর কর্মপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কর্মদক্ষতার স্বী[illegible] শুধু স্বদেশবাসী নয়, বিদেশীদের কাছেও অকুণ্ঠভাবে পেয়েছে[illegible] তিনি। গত মহাযুদ্ধের দিনে আটলান্টিক আর ভারত মহা[illegible] সাগরের দুরন্ত বুকে সেদিন এক দুর্দম কাণ্ডারীর ভূমিকা[illegible] এই তরুণ উচ্চাভিলাষী কর্মঠ কর্মচারীটিকে সকলে[illegible] অভিবাদন জানিয়েছিলেন। বরণ করে নিয়েছিলেন দিল্লী[illegible] ফ্ল্যাগশিপ আই এন এস-এর কম্যাণ্ডার হিসেবে। উত্তাল সমুদ্রের বুকে তাঁর অভিজ্ঞতা, সাহস ও দূরদর্শিতার পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ইংরেজ সহকর্মীদের কাছ থেকেও। এমন কি দুর্দান্ত দাম্ভিক লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও এই দৃপ্ত তরুণটিকে উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ না জানিয়ে পারেন নি। সেই তরুণই আজ ৫৩ বছর বয়সের প্রৌঢ়। তরুণের উদ্দামতা আজ প্রৌঢ়ের দূরদর্শিতায় পৌঁছেছে। সেদিনের চাপল্য তাঁর রূপ নিয়েছে স্থৈর্যে। কর্মক্ষেত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে—ক্ষেত্র-বিশেষ

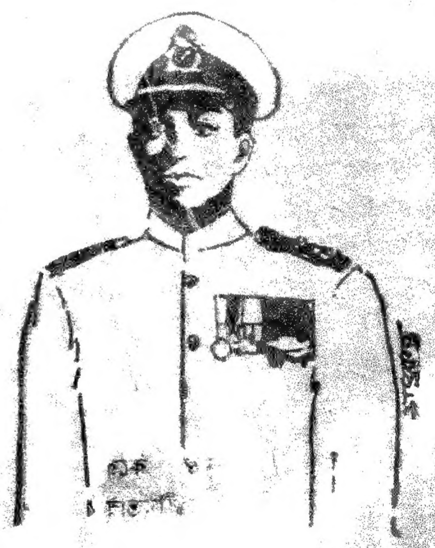

শ্রী আর ডি কাটারী

ঘটেছে গোটা রাজনৈতিক পরিবেশটার। ভাইস এ্যাডমিরাল কাটারী সমুদ্রের কোল থেকে ফিরে এসে আবার যাত্রা শু[illegible] করেছেন অন্য কোথা—পররাষ্ট্রদপ্তরের জটিল কুটিল বুদ্ধির [illegible] আবড়ায়—তাঁর যোগ্যতাকে তিনি [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] তিনি [illegible] [illegible] বর্মার [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] সাফল্য।

নজরুল কাব্যের আধুনিকতা

❁ সুশীল কুমার গুপ্ত ❁

প্রথমে 'আধুনিক' কথাটিকে একটু স্পষ্ট করা যাক। প্রত্যেক যুগেরই আধুনিকতা স্বতন্ত্র। আসল কথা হচ্ছে মানুষের স্থায়িভাবগুলি প্রত্যেক যুগেরই কাব্যসৃষ্টির মুখ্য উপাদান। কিন্তু প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব কতকগুলি সঞ্চারীভাব থাকে। যুগের এই সঞ্চারী ভাবগুলি যখন স্থায়িভাবকে গাঢ় ও উজ্জ্বল করে কাব্যসৃষ্টিতে সমর্থ হয়, তখনই তা আধুনিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতাকে শুধু যুগেরই সামগ্রী হলে হয় না, যুগকে অতিক্রম করে চিরকালের রসলোকে তার উত্তরণ ঘটা চাই। শুধু সাময়িকতার প্রয়োজন মেটানোই বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্থায়িত্ব। তবে যুগের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্যে কবির যে সচেতনতা প্রকাশ পায় তার নব নব স্ফূর্তি দেখবার জন্যে প্রতি যুগের কাব্যরসপিপাসুদের মন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। যুগের কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ বা ভাবকে যান্ত্রিকভাবে কবিতায় স্থান দিলেই তা আধুনিক হয়ে ওঠে না। অপর পক্ষে আপাতভাবে কবিকে যুগের সঙ্গে ... শ্লিষ্ট মনে না হলেও তাঁর কবিতার ... যুগোপযোগী বাণী লুকিয়ে থা...তে পারে। প্রকৃত কথা হচ্ছে আধুনিকতা কবিমানসের যথার্থ লক্ষণ হওয়া দরকার এবং তা কবির সৃষ্টির অঙ্গ হয়ে না দাঁড়ালে নয়। তাই F. R. Leavis তাঁর 'New Bearings in English Poetry (Reprinted 1954) গ্রন্থে লিখেছেন, "All that we can fairly ask of the poet is that he shall show himself to have been fully alive in our time. The evidence will be in the very texture of his poetry", (পৃঃ ২৪)।

যুগভাবের মধ্যে রাজনীতিবিষয়ক ভাবই কবিকে সাধারণের মধ্যে সহজে পরিচিত করে তোলে। কিন্তু এই লোকপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে কবিকে যুগের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখতে চায়। কবির কাব্য তখন যুগের তাগাদা মিটিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়, যুগকে উত্তীর্ণ হবার স্পর্ধা তার থাকে না।

উপরের আলোচনা থেকে এখন স্পষ্ট হবে যে, নজরুল নিঃসন্দেহে আধুনিক কবি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা-নৈরাশ্যের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে তাঁর কাব্য। তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর কাব্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এ যুগের উজ্জ্বল ও অন্তরঙ্গ ভাষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—অতিরিক্ত যুগসচেতনতা তাঁকে যে পরিমাণে সাময়িকতাকে আশ্রয় করে লোকপ্রিয় কবিতা রচনায় উৎসাহ দিয়েছে, সেই পরিমাণে যুগকে অতিক্রম করে যুগোত্তীর্ণ কাব্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে নি।

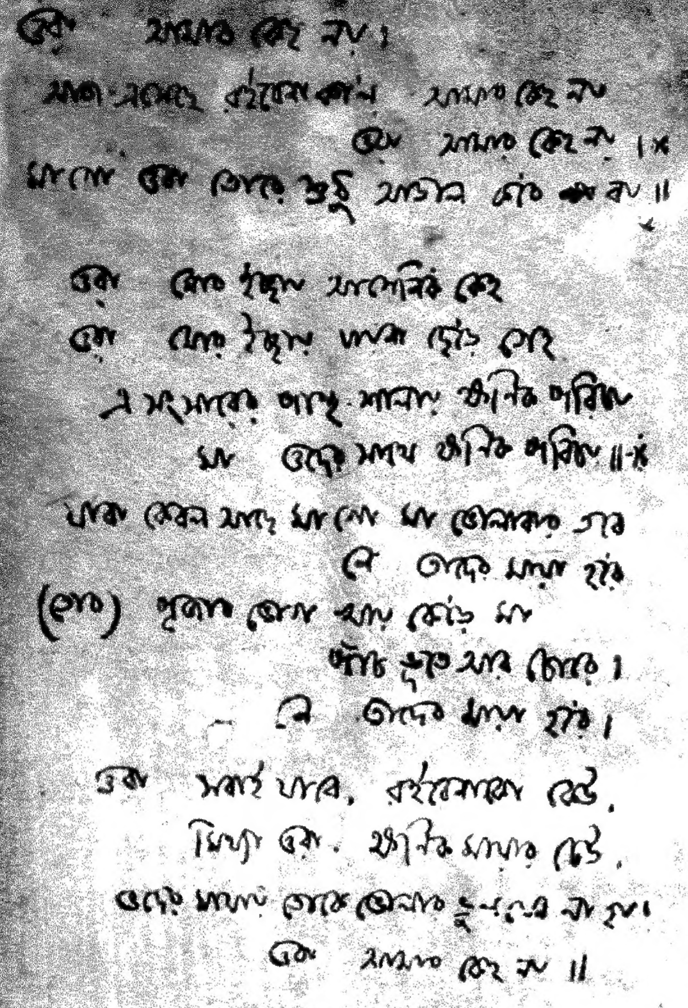

● নজরুলের গানের একটি পাণ্ডুলিপি

যে রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে নিয়ে আধুনিক কবিতার সূত্রপাত, এখনও পর্যন্ত সেই ধারা কমবেশি প্রবাহিত হচ্ছে। মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ 'কল্লোল' ও 'কল্লোলে'র পরবর্তী যুগের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আধুনিক কালের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছে। যে দুটি দিক দিয়ে নজরুল আধুনিক কালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সে দুটি হল রাজনীতিক চেতনা ও [illegible] তাঁর কাব্যের প্রাণিত [illegible] বা প্রেম। এই প্রেমই কখনো রাজনীতিক চেতনায় মানবপ্রেমের রূপ পরিগ্রহ করে সর্বহারা ; অত্যাচারিত ও শোষিত জনসমাজের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে তার মুক্তির জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, আবার কখনো তা নরনারীর হৃদয়সম্পর্কের চিরন্তন রহস্য উদ্‌ঘাটন ও রস আস্বাদনে উন্মুখ। কখনো তিনি প্রবল ও প্রদীপ্ত বিদ্রোহে ঘোষণা করেছেন,—

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব,
আনিব শান্তি শান্ত উদার।
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে,
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে
রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"
(অগ্নিবীণা : বিদ্রোহী)।

কোনো সময় দেহাত্মক প্রেমের নিবিড় কামনায় তাঁকে বলতে শোনা যায়,—

"প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়।
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অনামিকা,
শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।"
(সিন্ধু-হিন্দোল : অ-নামিকা)।

দেশের স্বাধীনতার আকাঙক্ষায় নজরুলের প্রচণ্ড বিদ্রোহ এ দিন জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তাঁর অনেক কবিতাই সেদিন মুক্তিসংগ্রামের হাতিয়ার হ'য়ে উঠেছিল। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তাঁর অনেক কবিতার আবেদন কমে যায় নি। চীনের ভারত আক্রমণের সময় তাঁর বহ্নিদীপ্ত অনেক কবিতাকেই জাতি জড়ত্ব ও শৈথিল্য ঘোচাবার জন্যে স্মরণ করেছে। বস্তুত যতদিন একের উপর অপরের শোষণ, অত্যাচার ও আক্রমণ থাকবে ততদিন নজরুলের অগ্নিক্ষরা, জ্বালাময় ও বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতার আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। আমি অন্যত্র লিখেছিলাম—

"যতদিন না সুস্থ, সুখী ও ধনবৈষম্যহীন বিশ্বসমাজ স্থাপিত হবে ততদিন পর্যন্ত নজরুল-কাব্যের এক অংশ—যেখানে তিনি বিশ্বের বিদ্রোহী, বঞ্চিত, সর্বহারা ও অত্যাচারিত মানবগোষ্ঠীর সপক্ষে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা এক সক্রিয় উদ্দীপনা, প্রেরণা,

সাহস ও বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকবে।"

(নজরুল-চরিতমানস, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভারতী সংস্করণ: কলিকাতা ১৯৬৩: পৃ ৫০০-৫০১)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের কাব্যে এই বিদ্রোহ দেখা গেলেও নজরুলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এর মধ্যে যে আন্তরিকতা ও বাস্তবিকতা উপস্থিত তা তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে দেখা যায় নি।

দেহাত্মক প্রেমের ক্ষেত্রে নজরুল কোন বিশেষ নূতনত্ব দেখাতে পারেন নি। দেহগত প্রেমের বিচিত্র বর্ণরাগ ও লীলায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ হলেও আঙ্গিকের দৈন্যে অনেক ক্ষেত্রেই তা কালোত্তীর্ণ হবার গুণবঞ্চিত। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, নজরুলের প্রেমের মধ্যে যে বিষণ্ণতা, নৈরাশ্য ও কাতরতা ছিল তা কল্লোলযুগের বিশিষ্ট কবি-কুলের মানসিকতায় সহৃদয়তার সঙ্গে স্থান পেয়েছিল। এটা কম গৌরবের কথা নয়।

নজরুলের আধুনিকতা বা যুগ-ধর্মিতা যতটা ভাবের দিক দিয়ে ততটা আঙ্গিকের দিক দিয়ে নয়। আবেগনির্ভর স্বভাবকবি হওয়ার ফলে তাঁর কাব্য নব নব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে পরিপক্বতার অভ্রান্ত লক্ষণ দেখাতে পারে নি। কবি হিসাবে পরিপক্বতা হচ্ছে তাঁর সমগ্র সত্তা, যুগানুযায়ী নতুন আবেগের অভিজ্ঞতাকে যৌবন-সুলভ আবেগের তীব্রতা দিয়ে রূপায়িত করা। টি এস এলিয়টের ভাষায়,—

'Maturing as a poet means maturing as the whole man, experiencing new emotions appropriate to one's age, and with the same intensity as the emotions of youth" (The Poetry of W. B. Yeats, 1940)।

নজরুলের স্বভাবকবির অনেক জায়গার শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতি পায় নি এবং সেই কারণে তাঁর অনেক কবিতাই যুগকে অতিক্রম করতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করেছে। কিন্তু বিদ্রোহ ও দেহাত্মক প্রেমে যেখানে তিনি যুগের হয়েও যুগকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন সেখানে তিনি আধুনিক এবং এখন-কার কালেও আধুনিক। আধুনিক যুগ যদি নজরুলকে বলে,—

"সে বিচিত্র ধূমকেতু,
এসেছিল এই পৃথিবীর
আশ্চর্য পাহাড়, দীপ্ত বন,
রক্তপথের আদিম
যন্ত্রণার আকর্ষণে। জ্বালিয়ে
পুড়িয়ে হিংস্র হিম
বুনেছে ফাল্গুন পোড়া মাঠে,
ভেঙেচুরে ভীরু নীড়
উড়িয়েছে সর্বহারা বিদ্রোহী
পাখিকে প্রতিকূল
বৈশাখী ঝড়ের মুখে,
যৌবনের জ্বলন্ত অক্ষরে
লিখেছে জীবননামা,
ফুটিয়েছে গোলাপ কবরে;—
এ সবই তো জানি আর
জানি তার নাম নজরুল।
সে আজ কোথায়? আছে অন্য
এক রূপে; প্রাণে-প্রাণে
আলোর আকাশ গড়ে,
জন্ম দেয় বিষণ্ণ মাটিতে
যুঁই চাঁপা, চন্দ্রধনু হাতে
ছোঁড়ে জ্যোৎস্নার শায়ক
সাইক্লপস রাত্রির বুকে,
জীবনের সবুজ সম্মানে
ধন্য হয়। কিন্তু কতদিন?
জানি—যতদিন শীতে
ফিনিক্সের স্বপ্ন বুকে যুদ্ধ করে
সূর্যের জাতক।"

তা হলে কারো আপত্তি আছে কি?

: প্রকাশিত হলো ভক্তিরসের প্লাবনাসক্ত গ্রন্থ :

রবীন্দ্রনাথ রায়ের
শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে ৫·০০
কৈবল্যনাথের কথা
শ্রীশ্রীরামঠাকুর সকাশে ২·৫০

প্রলয় সেনের
যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ ২·০০ যুগমাতা সারদামণি ২·০০
যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ২·০০ যুগভগিনী নিবেদিতা ২·০০
তালপাতার বাঁশী ২·০০

সুধাংশুবিকাশ দেবশর্মার
বিদেহী আত্মা ৩·০০ অবিশ্বাস্য ৩·০০

অরুণ সরকারের
দাক্ষিণায়ন ২·৫০ প্রাচীন পল্লীর প্রেমকথা (যন্ত্রস্থ) ২·৫০

সপ্তক	—	অগ্নিদূত	একাঙ্ক নাটক সংকলন	৩·০০
চিরন্তন	—	সুকুমার সেনগুপ্ত	উপন্যাস	২·০০
স্বপ্নশর্বরী	—	গঙ্গাধর দাস	উপন্যাস	২·০০
কৃষ্ণকলি	—	সুকুমার সেনগুপ্ত	কাব্যগ্রন্থ	২·০০

রবীন্দ্রনাথ রায়ের
লগ্ বুক ২·৫০
বিমলেন্দু চক্রবর্তীর
পুনশ্চ ২·০০

সকল প্রকার রচনা প্রকাশের জন্য যোগাযোগ করুন। ॥ লেখক মহল ॥

* প্রতিমা পুস্তক *
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪
শাখা: ১৩, কলেজ রো, কলি-৯

স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, উপহারের যাবতীয় বই ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান।
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
"মানুষ মহীয়ান।"

চারদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান।

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেবি
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা করে
সেই আশাতেই রইলি সবে!

রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখী গান
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।

অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল আগে চল,
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান,
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান।"

নজরুল ইসলাম

নারায়ণগঞ্জ,
২-৭-২১

নজরুলের অপ্রকাশিত একটি কবিতা

(পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

ভারত দর্শন

● আলোচনারত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং সুদানের প্রেসিডেণ্ট ফারুক ইব্রাহিম আবুদ।

রাজধানী ঃ

সুদানের প্রেসিডেণ্ট ফারুক ইব্রাহিম আবুদ পাঁচদিন ভারত সফর করে গেলেন। তিনি চীন সফরের পর ভারতে আসায়, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন বলে প্রথম দিকে কথা উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, প্রেসিডেণ্ট আবুদ চীনের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসেন নি।

সুদানের সাথে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে সুদান বিশ্বাসী। প্রেসিডেণ্ট আবুদ সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছেন যে, সুদান ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি সমর্থন করে যাবে।

• • •

দীর্ঘ সাত মাস পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আশার বাণী উচ্চারণ করেছেন। ভুবনেশ্বরে তিনি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ভাবপ্রবণ এক শ্রেণীর নেতার মনে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারের ভাবনাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। শেখ আবদুল্লা মুক্তি পেয়ে দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলে, তাঁকে নিয়ে এই দলটি মাতামাতি সুরু করলে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি ধামাচাপা পড়েছিল। প্রশ্নটি সাংবাদিক সম্মেলনে পুনরায় উত্থাপিত হলে প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেছেন, "আমার জীবন এত শীঘ্র শেষ হবে না।" প্রধানমন্ত্রীর উক্তিতে সাংবাদিকগণ হর্ষধ্বনি করে উঠেছিলেন। আমরাও এই সংবাদে দেশবাসীর সঙ্গে এক হয়ে আনন্দ প্রকাশ করছি। পরিকল্পনামাফিক ভারতের নব-রূপায়ণের কাজ শেষ হতে এখনও অনেক বাকী। ভারতের অগ্রগতির জয়যাত্রার মাঝপথে বাগড়া দিয়েছে নব-সাম্রাজ্যবাদের আদর্শে বিশ্বাসী নয়াচীন। চীনের সাথে এসে হাত মিলিয়েছে তার চেলা পাকিস্তান। ভারতের দ্রুত অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া, ভারতের সমৃদ্ধির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই এদের এখন প্রধান লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক ভারতকে একবার জব্দ করতে পারলেই জঙ্গীবাদী দুটি দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। এদের আবার কিছু কিছু সমর্থকও দেশের অভ্যন্তরেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। বাইরের শত্রুর হামলা, ভেতরে দেশ-দ্রোহীদের নষ্টামী এবং গঠনমূলক কাজের অগ্রগতির সহজাত আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যায় ভারত এখন অত্যন্ত বিব্রত। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে শ্রীনেহরুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অধিককাল প্রয়োজন হবে। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুস্থ শরীরে অধিক দিন তিনি সে দায়িত্ব পালনে সক্ষম জেনে প্রতিটি মানুষই খুশি হবে।

• • •

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী গণমনের আরও অনেক দ্বিধা ও সংশয়ের নিরসন করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন, 'কাশ্মীর সমস্যা' বলে কোন স্বতন্ত্র সমস্যা নেই—আসল কথাটি হল পাক-ভারত বিরোধ। ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পূর্বে কাশ্মীরে যা' ঘটেছে, সবই আবদুল্লা মেনে নিয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারের আগেই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের দখলে কাশ্মীরের যে-অংশ রয়েছে, সেই অংশ ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানের সাথে চুক্তির ব্যাপারে শেখ আবদুল্লা একমত হতে পারেন নি। তিনি কাশ্মীর বিভাগে সম্মত নন। কি উপায়ে আবদুল্লা কাশ্মীরের দুটি অংশের একীকরণ করবেন তা শ্রীনেহরু বলতে পারেন নি। তবে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সহজ হওয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে শেখ আবদুল্লার সাথে প্রধানমন্ত্রী একমত। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য, সামগ্রিকভাবে দুটি দেশের আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টি ভাবছেন। তিনি বলেছেন, বিষয়টি আরও ভালভাবে বিবেচনা না করে এবং অপর পক্ষের সাড়া কিরূপ হবে তা' না জেনে কিছুই বলা সহজ নয়।

প্রধানমন্ত্রীর উদারতা, তাঁর হৃদয়বত্তা সম্পর্কে কারও মনেই কোন সংশয় নেই। তাঁর মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মূল্য কিন্তু পাকিস্তান কোনদিন দেয় নি। ভারতের সীমান্ত এলাকার জমি পাকিস্তান সুযোগ পেলেই দখল করে বসছে। পূর্বপাকিস্থানে ভারতের

● আয়ুবখান

যে-কটি ছিটমহল পড়েছে, পাকিস্তান কার্যত তা দখল করে বসে আছে। এ সব ঘটনার পর স্বৈরাচারী শাসক আয়ুবখানের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রস্তাবের অনুকূলে কোন সাড়া আসবে বলে আমরা ভরসা করতে পারছি নে। তথাপি আমরা প্রধানমন্ত্রীর এ প্রয়াসকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁর চেষ্টায় আয়ুবের সুমতি হলে, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বেশির ভাগ সমস্যাই মিটে যাবে।

* * *

পশ্চিম বাংলার খাদ্যসঙ্কট যখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, বাজারের চাল উধাও হয়েছে চোরাবাজারের গোপন গলিপথে, তখন দেখা যাচ্ছে সব দোষটা রাজ্যসরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর ভালমানুষ সাজবার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা অবশ্য নতুন নয়। খাদ্য ও উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে এর আগেও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে মধ্যে পারস্পরিক অভিযোগের খেউড় আমরা অনেকবার শুনেছি।

প্রকাশ, শ্রীশরণ সিং পশ্চিম বাংলার খাদ্যনীতির সমালোচনা করে পত্রাঘাত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল, ত্রুটিপূর্ণ বিলি-ব্যবস্থা, অপরিণামদর্শী বিবৃতি, ভুলে ভরা সংখ্যাতত্ত্ব এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থতা পশ্চিম বাংলার খাদ্যসঙ্কটকে দিন দিন তীব্র করে তুলছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর অভিযোগ-গুলোর একটিও মিথ্যা নয়। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর 'বঙ্গ-দর্শনে' বারবার আমরা আলোচনা করেছি। গেল বছর পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে বিবৃতির পরদিন থেকেই বাজারে চালের হাহাকার সুরু হয়েছিল। এবারেও তিনি বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে বিবৃতি দেবার পর থেকেই বাজার গরম হতে সুরু করে। সে সকল কথার এবারে আর

● শ্রীশরণ সিং

পুনরাবৃত্তি করবো না। রাজ্য-সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির সীমা-পরিসীমা সত্যিই নেই। কিন্তু এ নিয়ে দিল্লী-কলকাতার মধ্যে বাগযুদ্ধের সময়ও এটা নয়। এতে মানুষের মনে কৌতুক ও কৌতূহলের সৃষ্টি হতে পারে—তাদের জঠরের জ্বালা মিটবে না।

দিল্লীতে না কি কলকাতা থেকে বাংলার খাদ্যসমস্যা সুরাহার জন্য সাহায্যের কোন আবেদনই যায় নি। আবেদন পেলে দিল্লীর মালিকরা নিশ্চয়ই তা' বিবেচনা করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। ঘরে যাদের চাল বাড়ন্ত তারা বিবেচনার নেওয়ার আশায় ক'দিন বসে থাকবে। ৩০ হাজার টন চালের আবেদন এখনও দিল্লীর খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ আবেদন পশ্চিম বাংলা অনেকদিন আগে পেশ করেছেন। সুতরাং পারস্পরিক দোষারোপ করে কারও কোন লাভ হবে না।

উড়িষ্যা ঃ

তিরুভেল্লি রেলস্টেশনে পুলিশের গুলীতে পূর্ব বাংলার পাঁচজন উদ্বাস্তু নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আটজন।

প্রায় তের শ' উদ্বাস্তুকে তিরু-ভেল্লিতে আনা হয়েছিল ক্ষুদ্রশিল্পে পুনর্বাসনের জন্য। কৃষিজমিতে পুনর্বাসনের কোন আশা নেই দেখে তারা ফিরে আসতে চেষ্টা করেছিল পশ্চিম বাংলায়। পুলিশ তাদের শিবিরে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করলে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পুলিশের সাথে ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ১৪৪ ধারা জারী করে রেল লাইনের ওপর অবস্থান বে-আইনী করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন রেল লাইন ছেড়ে যেতে। এতে কোন ফল না হওয়ায় উদ্বাস্তুদের নেতাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হ'লে তারা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কেউ কেউ আবার বর্শা, লাঠি ও কুড়ুল নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়।

এ ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও

বেদনাদায়ক। এ সংবাদে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত হয়ে পড়েছে হতচকিত, বিমূঢ়। উদ্বাস্তুদের মধ্যে সঞ্চার হয়েছে ভীতির। অসহ্য লাঞ্ছনা ভোগের পর জীবন্মৃত অবস্থায় যারা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছে তাদের ক্ষেত্রে আইনের কচকচিটাই বড় কথা নয়। পুলিশের ওপর হামলার সমর্থন নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। পুলিশ এবং শিবিরের কর্ম-কর্তারা মানবিক দৃষ্টি নিয়ে উদ্বাস্তুদের অবস্থাটা আগে-ভাগে ভেবে দেখলে এ পরিবেশের সৃষ্টি নিশ্চয়ই হতো না। পূর্ব বাংলা ছেড়ে এসে নিদারুণ গরমে দণ্ড-কারণ্যে আরেকদফা দুর্ভোগের পর এদের মানসিক অবস্থার কথাটা বিবেচনা করে আরও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ছিল। তা'দের বোঝানো উচিত ছিল। জমি সংস্কার না করলে কাউকে জমিতে বসানো সম্ভব নয়। সকলকে চাষের জমি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই তাদের ভিখারীর মত 'ডোল' দিয়ে পঙ্গু করে তোলা যুক্তিযুক্ত নয়। একটু দরদ দিয়ে, মমত্ববোধ নিয়ে বোঝালে সুফল পাওয়া অসম্ভব হতো না। এ কাজে প্রয়োজন ধৈর্য ও তিতিক্ষার। হঠ-কারিতা ও নিষ্ঠুরতা দ্বারা কোনদিন কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় নি—হতেও পারে না।

বিহার :

এবার বিহারে বিধান পরিষদে দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। জনসঙ্ঘ মনে করেছিল দেশে যেভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বেড়েছে তার সুযোগে জনসঙ্ঘ সুবিধা করতে পারবে। কিন্তু সেই আশায়ও ছাই পড়েছে। জনসঙ্ঘ একটি আসনও লাভ করতে পারে নি। এবারের নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে এখনো কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল, শত সমালোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রভাব এখনো দুর্বল হয় নি।

স্বতন্ত্র পার্টি চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, পেয়েছে মাত্র একটি। কংগ্রেস ২৮টি আসনের মধ্যে ২১টি পেয়েছে। বিরোধী দলের মধ্যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি একটি আসন পেয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনটি আসন এবং শিক্ষকরা বাকি তিনটি আসন পেয়েছে। শিক্ষকরা এই তিনটি আসন তাদের ছেড়ে দেবার জন্য আবেদন করেছিল। সেই আবেদনে এই তিনটি আসনে প্রার্থী দেয় নি। পি-এস-পির পক্ষ থেকে একটি

● শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়

মাত্র আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল এবং একজন 'বিদ্রোহী' পি-এস-পি স্বতন্ত্র হিসাবে সেই আসন লাভ করেছে।

• • •

বিহার বিধান পরিষদের জন্য পাঁচজন সদস্যকে মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে নাকি রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করলে রাজ্যপাল শ্রীআয়েঙ্গার তাঁদের মনোনীত করতে প্রথমে অসম্মত হয়েছিলেন। পরে তিনি সম্মতি দিয়েছেন।

বিভিন্ন কলা বিষয়ে, সাহিত্য-সাধনায় এবং সমাজসেবায় কীর্তিমান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সদস্য মনোনীত করা হবে, এই ছিল সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায়। বিহারের মনোনয়নের ব্যাপারে এই নীতি অনুসৃত হয় নি বলে শ্রীআয়েঙ্গার নাকি কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে মনোনয়ন দেওয়া হলে রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কি করবেন। এ রকম ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে আপোষে মিটমাট হওয়াই ভাল বলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

• •

তেনুঘাটে প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কে নাকি বিহার ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরা একমত হয়েছেন। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে নিম্ন দামোদরে জলের অভাব দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। বাঁধের জন্য হুগলী ও রূপনারায়ণে নৌ-চলাচলের অসুবিধার প্রশ্নটিও পশ্চিম বাংলার তরফ থেকে তোলা হয়েছিল। বোকারো এবং তার সন্নিহিত এলাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জল সরবরাহের জন্যই এই বাঁধ নির্মাণ। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাওয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছেন।

বাঁধটি নির্মাণ করবেন বিহার সরকার, তবে খরচটা বহন উভয় রাজ্যকেই করতে হবে। বোকারো এলাকা ছাড়া পশ্চিম বাংলার ডুজুদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও এখান থেকে জল পাবে। এই বাঁধের জন্য দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় সেচের জলের ঘাটতি হলে তার ক্ষতিপূরণ করবে কে? অজয় ও সুবর্ণরেখার বাঁধের ব্যাপারটাই বা কি হল। ডঃ রাওকে ধরে এ ব্যাপারে বিহারের আপত্তি অপসারণ পশ্চিম বাংলা সরকার করতে পারলেন কি?

● নয়াদিল্লীতে ২১শে মে ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড এবং ইণ্টারন্যাশনাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইলেকট্রিক করপোরেশন ও বেলজিয়ামের বেল টেলিফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের সচিব শ্রী এন সি জৈন (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) এবং বেল কোম্পানীর পক্ষে জি আর এণ্ডলিঙ্গারকে (ডানদিকে) স্বাক্ষর করতে দেখা যাচ্ছে। সকলের বাঁ দিকে কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন।

মহীশূর :

বাঙ্গালোরের ভারতীয় টেলিফোন কারখানায় টেলিফোনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের উদ্যোগপর্ব চলেছে। এ কাজে প্রধান সহায়ক হচ্ছেন বেলজিয়ামের বেল টেলিফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী।

আশা করা যাচ্ছে, এই বছরের শেষের দিকে কারখানায় ক্রশবার যন্ত্রপাতি সংযোজনার কাজ সুরু হবে। তিন বছরের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকার ক্রশবার ফী বছর উৎপন্ন হতে পারবে। এর বেশির ভাগ থাকবে দেশীয় যন্ত্রাংশ।

ক্রশবার উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মত। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ স্বরূপ পাওয়া যাবে বেলজিয়ামের কাছ থেকে।

২১শে মে নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড এবং ইণ্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড ইলেকট্রিক করপোরেশন ও বেলজিয়াম বেল টেলিফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মধ্যে এ বিষয়ে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের পরই ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ ও কানপুরে স্বয়ংক্রিয় ট্রাঙ্ক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ক্রশবার আমদানীর জন্য বেল টেলিফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কাছে একটি অর্ডারও পেশ করেছেন।

এই চুক্তি সম্পাদনকালে কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীসেন বলেছেন, এই চুক্তি কেবল ভারত ও বেলজিয়ামের পারস্পরিক সহযোগিতার পথই প্রশস্ত করবে এমন নয়, এতে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

গুজরাট :

বিবদমান কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসার সকল চেষ্টা না কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে শ্রী ইউ এন ডেবর, বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী বি খিমজী এবং শ্রীবাবুভাই চিনাই একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন। জীবরাজ মন্ত্রিসভার প্রাক্তন দুজন মন্ত্রী শ্রীরসিক লাল পারিখ এবং শ্রীরাতুভাই আদানীকে তিনজন নেতাই সংগঠনের স্বার্থে বিভেদ পরিহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে শ্রীডেবর শ্রীমোরারজী দেশাই এবং শ্রীবলবন্ত রায়মেহতার সাথে / আলোচনা করেছিলেন।

শ্রীপারিখ আবার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন।

শ্রীপারিখের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড কর্তৃক তিনজন আইনজ্ঞের একটি প্যানেল গঠনের সময়েই না কি মীমাংসার প্রয়াস হয়েছিল।

আইনজ্ঞদের প্যানেলের প্রবীণ

● শ্রীরসিকলাল পারিখ

প্রধান শ্রী জি এস পাঠক তদন্তের শেষের দিকে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার অনুরোধ জানিয়েছিলেন; কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীত্রিভুবনদাস প্যাটেল শ্রীপারিখের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাহারে সম্মত হন নি।

তদন্তের রিপোর্ট শীগগিরই প্রকাশিত হবে। তার পরের লড়াইয়ের জন্য উভয় পক্ষেই এখন থেকে প্রস্তুতি চলছে।

মধ্যপ্রদেশ :

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের যে নির্বাচন হলো তাতে আর একবার প্রমাণ হলো সেখানকার কংগ্রেস সভ্যরা গালভরা কথায় আদর্শবাদ অপেক্ষা সেই পুরাতন 'প্রেম এবং যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নাই' কথায় বেশি বিশ্বাসী। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনে ভোটারদের দলে ভেড়াবার জন্য বে-পরোয়া কার্যকলাপ চলেছিল। এমন কি বিশেষ কোন গ্রুপকে সমর্থন না করলে ভোটারদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে, এমন হুমকীও দেওয়া হয়েছে। সরকারী গাড়ি যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে, সরকারী কর্মচারীদের পর্যন্ত দলীয় কাজে খাটানো হয়েছে। সমাজবিরোধী ব্যক্তিদেরও ভোটার ভাগাবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, জেলা কংগ্রেস অফিস-গুলির সামনে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবর্তে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনের ব্যাপার দেখে মনে হয়েছে, গায়ের জোরের নীতি সেখানে অনুসৃত হয়েছে। যে দল যত জোর খাটাতে এবং অর্থব্যয় করতে পেরেছে, সে দল তত জয়লাভের আশা পোষণ করতে পেরেছে।

মন্ত্রী-বিরোধী দল দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, কারণ তারা সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সুযোগ ব্যবহার করতে পারে নি। মন্ত্রী-বিরোধী দলের এবং নিজেদের শক্তি জাহির করার বেশি পক্ষপাতী। তাই ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করে দুই দলের মধ্যে আপোষের সূত্র স্থাপনের প্রস্তাবও বাতিল করা হয়েছে। দেশলেহ্রার ১২ জন সমর্থক নির্বাচনের দিন হাজিরই হন নি। আবার অনেকে রাতারাতি দল পরিবর্তন করে মন্ত্রী-গ্রুপকে সমর্থন করেছে। মহাকোশল এবং ছত্রিশগড়ের কংগ্রেস ভোটারদের জন্যই বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্রী-বিরোধী দলের এত বিপর্যয় হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই অঞ্চল দুটির কংগ্রেস প্রতিনিধিরা পোষা-কংগ্রেসী নামে পরিচিত। যারা ক্ষমতায় থাকবে তাদের সমর্থন করাই এদের নীতি। ভোট আদায়ের ব্যাপারে অর্থ অপেক্ষাও 'মন্ত্রিত্বে স্থান দেওয়া', সমবায় সমিতিতে যে দুর্নীতি ধরা পড়েছে তা থেকে রেহাই দেওয়া, চাউল ব্যবসায়ের লাইসেন্স দেওয়া ইত্যাদির লোভ দেখান হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই লোভ মহৌষধির কাজ করেছে। মন্ত্রী-বিরোধী দলের মহান্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ দাস এম-পি বলেছেন, তাঁর

● তখৎমল জৈন

লোকেরা প্রাথমিক নির্বাচনে ভাল সমর্থন লাভ করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দারুণ বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রদেশের 'খাদ-চালের রাজা'রা কিছুদিন আগেও তখৎমল-দেশলেহ্রা গ্রুপকে সমর্থন করেছে, কিন্তু হঠাৎ তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মন্ত্রীদলে শ্রীকানাইয়া লাল খাদিওয়ালার কাছে মন্ত্রী-বিরোধী দলের মূলচাঁদ দেশলেহ্রার ৪৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বিস্ময়ের কথা!

এই নির্বাচনের মাধ্যমে একথা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে, মন্ত্রীদল সমগ্র কংগ্রেস সভ্যদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

● ডঃ কাটজু

৪৫ বছরের দেশসেবার কাজে এতবড় দুর্নীতি, এত অন্যায় এবারের নির্বাচনের মত দেখেন নি।

মন্ত্রীদল নিজেদের শক্তি যাচাই করে নেবার পর এখন ১৯৬৫ সালে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, বিধানসভায় আরো আসন লাভ করার আশায়। প্রদেশ কংগ্রেস দখলের পর মন্ত্রীদল মনে করছে তারা প্রায় আট বছরের জন্য নিশ্চিন্ত অবস্থায় পৌঁছেচে। পরাজিত মন্ত্রী-বিরোধী দল শেষ চেষ্টা হিসাবে একটা গণ-দরখাস্ত পেশ করার চেষ্টা করছে। দরখাস্তের বিষয়: মন্ত্রীদল নির্বাচনে সরকারী কর্মচারীদের এবং সরকারী গাড়ি ব্যবহার করেছে। জীবনহানির ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করেছে।

এই নির্বাচনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক হলো মনোনীত নেতার দ্বারা কংগ্রেস পরিচালনার অবসান ঘটানো। ১৯৬২ সালের আগষ্ট থেকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। দুজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মধ্যে ছিলেন মুনিশ্বর দত্ত উপাধ্যায় এবং ভবানীপ্রসাদ ব্যানার্জী। মনোনীত নেতার পরিবর্তে এখন প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচিত নেতার দ্বারা পরিচালিত হবে।

কাশ্মীর:

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিককে কোণঠাসা করার জন্য শেখ আবদুল্লার সাথে বক্সী গোলাম মহম্মদের মিতালীর প্রচেষ্টা না কি ব্যর্থ হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন আদায়ে শেখজীর নীতিগত সংগ্রামের অংশীদার হতেও বক্সী গোলাম মহম্মদ রাজী হয়েছিলেন। সাদিক কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থক, ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং ভারত সরকার, তাঁকে চাপিয়ে দিয়েছেন—এই ধরণের যুক্তি না কি বক্সী গোলাম মহম্মদ তুলেছেন।

প্রকাশ, বক্সীর গোপন দূতিয়ালী শেখ সাহেবের হৃদয় গলাতে

● শ্রী জি এম সাদিক

পারে নি। তিনি বরং রুষ্টই হয়েছেন। জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের দরবারে যিনি নিন্দিত তাঁর সাথে হাত মেলানো সম্ভব নয়। সাদিক কমিউনিস্ট হয়ে থাকলেও সৎ এবং আদর্শনিষ্ঠ। এটাও তাঁর বড় কৃতিত্ব।

বক্সী গোলামের এই আচরণে তাঁর দলের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরেছে। শোনা যাচ্ছে, আইনসভার ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিকাংশ সদস্যই এখন তাঁর ওপর বিরূপ।

ভুটান:

ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লেণ্ডুপ দোরজী বলেছেন, ভুটান এখন শান্ত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দোরজী হত্যার মামলার অপরাধীদের বিচার শেষ হয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার বাহাদুর নামগয়ালের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়েছে। কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল বাচ্চু কুগিয়াল আগেই আত্মহত্যা করেছেন। তিনিই ছিলেন ষড়যন্ত্রের আসল অধিনায়ক। সম্প্রতি কুগিয়ালের দুই পৌত্রের বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ষড়যন্ত্রের গোপন সংবাদ আর যাতে ফাঁস না হতে পারে, তার জন্যই এই দুটি কিশোরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। বাচ্চু কুগিয়ালের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তিব্বতের চীনা কমিউনিস্টদের।

চীনের এই গোপন চক্রান্তের কথাটা ঢাকবার প্রয়াসে চীনা নেতারা কূটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে সরাসরি ভুটানের মহারাজার কাছে দোরজীর হত্যায় সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখে বসেছিলেন। মহারাজা চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের চালে ভুলবার পাত্র নন। তিনি চীনকে কোন আমল দেন নি।

১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী ভুটানের বৈদেশিক কাজ ভারত সরকারের মারফৎ পরিচালিত হয়ে আসছে। কাজেই চৌ-এন-লাইয়ের চিঠি ভারত সরকারের মাধ্যমে যাওয়ার কথা। কিন্তু চীনের আশা অত্যন্ত বড়। হিমালয়ের

● শ্রীলেণ্ডুপ দোরজী

বুকের ওপর খবরদারি করার উগ্র বাসনায় সে দিশেহারা হয়ে ভুটানকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। এখন তার দৃষ্টি সিকিম ও ভুটানের ওপর।

আন্তর্জাতিক

• ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন ওয়াশিংটনে 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন করছেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

ওয়াশিংটন : ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন গত সপ্তাহে এখানে এসে পৌঁচেছেন। ১৯৬২ সালে ভারতের উত্তর সীমান্তে আকস্মিক চীনা আক্রমণের ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত পড়েছিল। ভারতের অনুরোধে তখন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সামরিক উপকরণ ও অর্থ সাহায্য দেন। চীনা আক্রমণের আশু আশংকা না থাকলেও ভবিষ্যৎ চীনা মতিগতি সন্দেহজনক বলে প্রধানমন্ত্রী নেহরু-সহ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে তাই আগে থেকেই বারুদ গরম রাখা দরকার। এ-কারণেই শ্রীচ্যবন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন মার্কিন সামরিক ও অর্থ সাহায্য চাইতে।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর শ্রীভূতলিঙ্গম ও অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীও একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তখন পাওয়া যায় নি। এবার শ্রীচ্যবন পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্ক প্রমুখ মার্কিন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আশা করা অন্যায় হবে না যে, চ্যবন-মিশন সাফল্যমণ্ডিত হবে।

প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের ব্যয় যথেষ্ট বেড়ে গেছে। ১৯৬২ সালে ভারত যেখানে ৯৬ কোটি ডলার খরচ করতো এখন ১৯৬৪ সালের জন্য ১৭২ কোটি ডলারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। শ্রীচ্যবন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তিন স্কোয়াড্রন বা ৩৬ খানা এফ-১০৪ জি সুপারসোনিক স্টার জঙ্গীবিমান চেয়েছেন। এর আনুমানিক দাম হলো ৭৫ কোটি টাকার মতো। শ্রীচ্যবন আগামী পাঁচ বছরের জন্যে মোট ২৭৫ কোটি টাকা সাহায্য চেয়েছেন। তার মধ্যে ৬ কোটি টাকা সাহায্য হিসেবে এবং বছরে এক কোটি টাকা ঋণ হিসেবে। ভারত যাতে নিজের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক উপকরণ নিজেই তৈরি করে নিতে পারে সেজন্যেই ঐ টাকা ব্যয় করা হবে।

শ্রীচ্যবনের আলাপ-আলোচনা প্রায় শেষ হয়েছে বলা চলে এবং

• ডীন রাস্ক

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জবাব পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। মার্কিন প্রতিক্রিয়া যে ভারতের অনুকূলে যাবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সে দেখেছে যে, পাক-চীন আঁতাতের ফলে পাকিস্তানের ওপর যে-আস্থা সে একদিন স্থাপন করেছিল তার অমর্যাদা হয়েছে। ভারতের ওপর প্রসন্ন হবার আর একটি সঙ্গত কারণ হলো—এতদঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সফল হয়েছে। কাজেই এখানে যদি অর্থ ও সামরিক সাহায্য দেওয়া যায়, তবে তা নেহাৎ অপাত্রে ঢালা হবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে যখন ভারত একই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছিল তখন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাগড়া দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে, ভারতকে অস্ত্র সাহায্য করার অর্থ পাকিস্তান আক্রমণে তাকে উস্কানী দেওয়া। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ভারতের মনোভাব, তার জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐকান্তিক ইচ্ছা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সচেতন হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষত

লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ইত্যাদি জায়গায় যে গৃহযুদ্ধ আজো অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তা যাতে অন্যত্র সংক্রামিত হতে না পারে সে-সম্পর্কেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক থাকতে হয়েছে। চীনের অভিসন্ধি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম উদগ্রীব নন। চীনের সম্প্রসারণশীল নীতি যদি জয়যুক্ত হয়, তবে গোটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ হয়ে যাবে। এসব কারণেই ভারতকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পবিত্র নৈতিক কর্তব্য যার রাজনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম।

নিউইয়র্ক: গত মাসে ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থলগ্নীর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সন্ধান নেবার উদ্দেশ্যে একদল বিশিষ্ট মার্কিন ব্যবসায়ী ভারতে এসে এক সপ্তাহ কাটিয়ে গেছেন। এখানকার ব্যবসায়ীমণ্ডলীর নিকট তাঁরা আগামী ২৮শে মে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করবেন।

এই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালকদের সঙ্গে এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যদপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (জুনিয়ার) এবং দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী। তাঁরা ভারত সরকার এবং ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ভারতে পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঐ দলের জনৈক মুখপাত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই আলোচনার ফলে ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যনীতির নানাদিক সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছে।"

ইণ্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট সেণ্টার নামে ভারতের একটি আধা-সরকারী সংস্থার আমন্ত্রণে ঐ মার্কিন ব্যবসায়িগণ ভারত সফরে এসেছিলেন। ভারতে বৈদেশিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়, মুনাফা এর লক্ষ্য নয়।

আমেরিকার "বিজিনেস কাউন্সিল অব ইণ্টারন্যাশনাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং" নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই এই সকল মার্কিন ব্যবসায়ীর ভারত সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই কাউন্সিল যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬টি প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিয়ে গঠিত।

ফ্রান্স :

প্যারিস : যাঁরা ভেবেছিলেন চরমপন্থী গোপন ফরাসী বাহিনীর (OAS) অস্তিত্ব অতীত কাহিনীতে পরিণত

* প্রেসিডেন্ট দ্য গল

হয়েছে, শনিবারের এক অদ্ভুত ঘটনা তাকে অসত্য প্রমাণিত করবে। এখানকার বিখ্যাত ধনী ও বিমান-নির্মাতা মঁ দসোঁর সুন্দরী স্ত্রী শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে অভিজাত পল্লী ওয়েস্ট এণ্ডস্থ তাঁর সুরম্য প্রাসাদ থেকে অপহৃতা হয়েছেন। তিনজন মুখোসধারী লোক নাকি মাদাম দসোঁকে জোর করে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানের পথে পাড়ি জমিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানদপ্তরে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি টেলিফোন মারফৎ জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রাক্তন জেনারেল রাওল সালানকে কারাগার থেকে মুক্তির বিনিময়ে মাদাম দসোঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পুলিশ যদিও অপহরণকারীদের ধরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে—একটি বিষয়ে অন্তত খানিকটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে যে, ও-এ-এস পাণ্ডারাই এ-কাজ করেছে।

ফরাসী সরকার অপহরণকারীদের মাদাম দসোঁর মুক্তিমূল্য দিতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না, তবে এ-ঘটনায় সরকার বেশ একটু বিচলিত হয়েছেন। কারণ মাদাম দসোঁর স্বামীর কাছে ফরাসী সরকার কম ঋণী নন। ন্যাটো, মস্কো পারমাণবিক চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য ও শুল্ক ব্যবস্থা বা কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতিদান ইত্যাদি প্রশ্নে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার বিরোধ চলছে তখন মঁ দসোঁ ফ্রান্সকে বিমানবাহিনীর দিক থেকে প্রভূতভাবে সাহায্য করছেন। মঁ দসোঁর কারখানাই বিখ্যাত পারমাণবিক বোমাবাহী মিরেজ—৪-এর নির্মাতা। তাছাড়া ফরাসী বিমানবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত উচ্চগতিসম্পন্ন জঙ্গীবিমান এবং মিস্টরি বিমানগুলিও তাঁর কারখানায় তৈরি হয়। মঁ দসোঁ একটা নামকরা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও একটা বহুল-প্রচারিত মেয়েদের সাময়িক পত্রিকারও মালিক। সর্বোপরি ফরাসী জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে মঁ দসোঁ প্রেসিডেন্ট দ্য গলের একজন উগ্র সমর্থক। এহেন অবস্থায় দ্য গল সরকার মাদাম দসোঁকে উদ্ধারের জন্যে যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। ওদিকে আলজিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পর ও-এ-এস সম্পর্কে তিনি যে এতদিন নির্লিপ্ত ছিলেন এবার নতুন করে তাদের যথোচিত ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন হবে। এবং অপহৃতা হবার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই অপহরণকারীদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে—একজনকে সন্দেহাতীতরূপে। এরা মাদাম দসোঁকে একটা

পরিত্যক্ত বাসারবাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল। সেখানে সশস্ত্র দুজন সৈন্য হঠাৎ গিয়ে পড়ে অপহৃতা বণিক-বধূকে দেখতে পান এবং প্রহরারত ম্যাথিগ কস্টাকে গ্রেপ্তার করেন। মাদাম দগোঁর মুক্তিপণ হিসেবে যে এক কোটি ফ্রাঁ দাবী করা হয়েছিল তা দেওয়া তো হয়-ই নি, উপরন্তু অপহরণ-কারীদের মাথার ওপর বিচারের দণ্ড উদ্যত হয়েছে।

লাওস ঃ

গত ১৭ই মে থেকে লাওসে আবার আগুন জ্বলে উঠেছে। বামপন্থী পাথেট লাও বাহিনী দক্ষিণপন্থী নিরপেক্ষতা-বাদীর মিলিত বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ জার্স সমতল থেকে হটিয়ে দিয়েছে। কং লে'র নতুন ঘাঁটি খান কোঙের অবস্থাও নাকি সঙ্গীন। ১৯৬২ সালে লাওসের নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করে যে-জেনেভা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল নতুন পাথেট লাও কার্য-কলাপের ফলে তা আজ গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন। পাথেট লাও দলের নতুন আক্রমণের মূল কারণ হলো দুটি। প্রথমত গত ১৯শে এপ্রিল এখানে যে দক্ষিণপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার ফলে নিরপেক্ষতাবাদীদের এবং বিশেষত প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। বামপন্থীরা মনে করে যে, নিরপেক্ষতাবাদীরা এখন দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। দ্বিতীয়ত এর পরে দক্ষিণপন্থী-নিরপেক্ষতাবাদীদের সেনাবাহিনীর মিলনের ফলে বামপন্থীরা আরো চটে যায়। যদিও এ-মিলন জেনেভা চুক্তি বিরোধী নয়, তবু বামপন্থীরা আশঙ্কা করে যে, তাদের শায়েস্তা করার জন্যই দু' দলের একীকরণ হয়েছে। পাথেট লাও দলের রোষের আর একটা কারণ হলো গত বছর সংঘর্ষের ফলে প্রশাসনিক রাজধানী থেকে যে তাদের সরে আসতে হয়েছে সেখানে ফিরে যাবার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয় নি।

সাংবাদিক বৈঠকে প্রিন্স সুভান্না ফুমা

বামপন্থীদের ব্যাপক আক্রমণের ফলে উদ্ভূত গুরুতর অবস্থার কথা জানিয়ে প্রিন্স সুভান্না ফুমা জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ১৪টি দেশকে পরিস্থিতি পরামর্শের আহ্বান জানিয়েছেন। বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া তাতে সম্মতি জানিয়েছে। তবে ফ্রান্স নতুন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব জানিয়েছে। কিন্তু আমেরিকা তাতে সম্মত হতে পারে নি, যদিও সোভিয়েট রাশিয়া ফরাসী প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ড তার প্রতিনিধির 'প্রতি দুর্ব্যবহারের' প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্য পদ ত্যাগ করে সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। তার চেয়েও বেশি জটিল হয়েছে আমেরিকা জার্স সমতলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে জেট পর্যবেক্ষণ বিমান পাঠিয়ে। শোনা যাচ্ছে, ভারত মহাসাগর থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে যে প্রশান্ত মহাসাগরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাও লাওসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ইতিমধ্যে বামপন্থী দলের নেতা প্রিন্স সুভানো ভঙ শান্তি আলোচনার জন্য দুটি সর্ত রেখেছেন। (১) ১৯শে এপ্রিলের অভ্যুত্থানে নেতাদের শাস্তি দিতে হবে এবং (২) পাথেট লাও দলকে ভিয়েনতিয়েনে ফিরে যেতে দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্ত মেনে নেবার ক্ষীণ আশা থাকলেও প্রথম সর্ত প্রিন্স সুভান্না ফুমা মেনে নেবেন এ-আশা করা যায় না। অপর পক্ষে নতুন চতুর্দশ রাষ্ট্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হলে লাওসের সঙ্কট আরো ঘনীভূত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

বৃটিশ গিয়ানা ঃ

জর্জটাউন ঃ বর্ণবৈষম্য এখানে এক উৎকট রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ

করেছে। উন্মত্ত নিগ্রো জনতা রাজধানী জর্জটাউনের বিভিন্ন ভারতীয়দের দোকান-পাট, মিউনিসিপ্যাল বাজার লুঠ করে এক অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। রাস্তার যেখানে যেখানে ভারতীয়দের তারা পেয়েছে, সেখানেই তাদের বেদম প্রহার করে এক বিশৃঙ্খলার রাজত্ব কায়েম করেছে। পুলিশের গুলীচালনার ফলে এক নিগ্রোদম্পতি ও একজন ভারতীয় নিহত হয়েছেন। গত তিন মাসে এ-নিয়ে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৩ জন। দেশের শতাধিক বাণিজ্যস্থান ও বিশ্ববিদ্যালয় হাঙ্গামার দরুণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে বৃটিশ গভর্নর লুইট অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, এ-সুযোগে বৃটিশ সরকারের কাছে তিনি সৈন্য সাহায্য চাইলে বৃটিশ সরকার তা পাঠাতে একটুও দেরী করেন নি।

বৃটিশ গিয়ানায় এ-ধরণের হাঙ্গামা অবিশ্যি নতুন নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৩ সালে বিশিষ্ট সমাজবাদী নেতা ডাঃ ছেদি জগানের নেতৃত্বে পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি (পি-পি-পি) ক্ষমতা দখল করলে বৃটিশ সরকার তা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ একে পি-পি-পি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী, তার ওপর তারা আবার পূর্ণ স্বাধীনতা, অবিশ্যি কমনওয়েলথের ভেতরেই, দাবী করে বসেছিল। কিন্তু সুচতুর বৃটিশ সরকার নানা টালবাহানা করে বৃটিশ গিয়ানাকে স্বাধীনতা দেওয়া মুলতুবী রাখেন। তার কার্যসিদ্ধির জন্যে বৃটেন ভারতবর্ষের বেলায় যা করেছিল বৃটিশ গিয়ানাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটায় নি।

পর পর তিনটি নির্বাচনের অনুষ্ঠান করেও যখন দেখা গেল যে, পি-পি-পি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তখন 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি প্রয়োগের জন্যে বৃটেন এগিয়ে এলো। যে মিঃ ফরবেশ বার্নহাম ১৯৫৩ সালে জগান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তাঁকে ভাঙিয়ে নিয়ে নতুন দল গঠন করা হলো—পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস (পি-এন-সি) যা বর্তমানে দেশের প্রধান বিরোধী দল। মিঃ বার্নহাম একদিন ডাঃ জগানের মতো দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত জগান-বিরোধিতার স্বার্থে তা জলাঞ্জলি দিয়েছেন। ক্ষমতা দখলের জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি না করেও যখন কোনো নির্বাচনেই তাঁর দল প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে

• শ্রী ছেদি জগান

তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করলো পি-এন-সি। ইতিমধ্যে অবিশ্যি আরো একটা রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হলো—প্রতিক্রিয়াশীল ইউনাইটেড ফোর্স-এর কথা বলছি। এরা যখুনি সুযোগ পেয়েছে তখুনি জগান সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করেছে। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জগান সরকারের বাজেট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এরা প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করে। সে-প্রতিরোধ এমন আকার ধারণ করে যে, শহরে-শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠপাট এমন কি খুন জখম পর্যন্ত হয়েছিল। অর্থাৎ সারা দেশে যেন গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে গিয়েছিল তখন। এরপরে গত বছরের এপ্রিল মাসে যখন জগান সরকার শ্রমিক সম্পর্ক বিল আনেন তখনো আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। ধর্মঘট ও মারামারি এত ব্যাপক হয়েছিল যে, জগান সরকারকে সত্যি প্রমাদ গুণতে হয়েছিল। কারণ শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামই নয়, ডাঃ জগানের পি-পি-পি সরকারের বিরুদ্ধে পি-এন-সি এ-অভিযোগও এনেছিলো যে ও-দল বা সরকার ভারতীয় ঘেঁষা এবং নিগ্রোদের স্বার্থ-বিরোধী। অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো, বর্তমান আইনসভায় পি-পি-পির মোট ১১ জন ভারতীয় সদস্য ও ৭ জন নিগ্রো সদস্য রয়েছেন, আর অপর পক্ষে পি-এন-সি'র ৭ জন নিগ্রো ও মাত্র ১ জন ভারতীয় সদস্য আছেন। কাজেই পি-পি-পি'র বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আসল কথা, পি-এন-সি বা অন্য বিরোধীদের পি-পি-পি'র বিরুদ্ধে খাড়া করে বৃটেন যেটা লাভ করেছে সেটা হলো বৃটিশ গিয়ানার স্বাধীনতা পিছিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। কারণ তাঁরা বৃটিশ গিয়ানাকে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারটুকু মাত্র দিয়ে বলছেন যে, দেশে অরাজক অবস্থা চলছে, এক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে দেশে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনেও বৃটেনের পরোক্ষ হাত আছে—এ-ধারণাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ব্রেজিল:

সারা ব্রেজিল জুড়ে সংস্কারের সাড়া পড়ে গেছে। প্রাক্তন বামপন্থী রাষ্ট্রপতি মিঃ জোয়াও গুলার্টের পতনের পেছনেও— এই অতি দ্রুত সংস্কার

প্রবর্তনের চেষ্টা একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ব্রেজিলের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ব্রেজিল কংগ্রেসের চেম্বার অফ্ ডেপুটির সভাপতি রেনিয়েরি ম্যাজিলিও নতুন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবার পর থেকে সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। কিন্তু মিঃ গুলার্ট ও মিঃ ম্যাজিলির সংস্কারের ধারণা ও পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

গত জানুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেজিলের রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে যখন মিঃ রবার্ট ডি অলিভেইরা কেম্পোস সরে আসেন, তখন তিনি একথা পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট গুলার্টের অর্থ-নৈতিক দায়িত্বহীনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পদত্যাগ করলেন। এর ঠিক দশ সপ্তাহ পরে, যখন সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী মার্শাল হামবার্টো ক্যাসটেলো ব্র্যাঙ্কো গুলার্টের পতন ঘটালেন, তখন মিঃ কেম্পোস পরি-কল্পনামন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে হয়তো মিঃ কেম্পোস এবার অর্থনৈতিক ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেবেন। কিন্তু গত কয়েকদিন আগে তিনি ব্রেজিলের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের যে-পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, তা কিন্তু আসলে তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতারই পরিচয় দিচ্ছে।

মিঃ কেম্পোসের ধারণা, ব্রেজিলে যখন জিনিষপত্রের দাম গড়ে বছরে ১০০% বেড়ে যাচ্ছে এবং ১৯৬৪ সালের ঘাটতি ৬৬০ লক্ষ পাউণ্ড হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তখন ব্রেজিলের পক্ষে, জনগণের কাছে অপেক্ষাকৃত অপ্রিয় হলেও, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ব্রেজিলের আইন পরিষদ (কংগ্রেস) যখন সৈন্যদের বেতন প্রায় ২০০% বাড়িয়ে বৃদ্ধ সৈনিক ক্যাসটেলো ব্র্যাঙ্কোর প্ররোচনায় একটি আইন পাস করিয়ে নিলো, তখন তা মিঃ কেম্পোসের সামনে একটা 'বিরাট চ্যালেঞ্জ' হিসাবেই উপস্থিত হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তবু তাঁর পূর্বোক্ত ধারণাতেই অটল ছিলেন। তিনি উঁচু করভার প্রবর্তনের পক্ষে এবং ক্রমে ক্রমে গম ও তৈল-শিল্পে সরকারী সাহায্য কমিয়ে ফেলার পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, আরো বেশি সংখ্যক নাগরিকদের কাজ দেবার জন্য সারা দেশব্যাপী বাসগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় তাদের নিয়োগ করা হবে।

এর চেয়েও যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ভূমি-সংস্কার পরিকল্পনা।

• মাও সে-তুং

প্রেসিডেণ্ট ক্যাসটেলো ব্র্যাঙ্কোর মতে এইটিই যে কোনো সংস্কার পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই পরিকল্পনা অনুসারে সরকার কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বড়ো বড়ো জমির মালিকানার ওপর নতুন নতুন কর বসানোর কথা এবং যে সমস্ত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারী রাস্তা, জলসেচ এবং যোগাযোগের অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে বেড়ে গেছে, তাদের ওপর নতুন কর বসানোর কথা ভাবছেন। মিঃ ব্র্যাঙ্কোর ধার[ণা] আগামী ১৯৬৬ সালের আগেই এ[ই] সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হবে।

সোভিয়েট রাশিয়া :

দ্বাদশ শতাব্দীর মঙ্গোলীয় দস্যু চে[ঙ্গিস] খানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সোভিয়ে[ট] সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া' বলে[ছে] যে, 'চেঙ্গিস খানের ন্যায় মাও-সে-[তুং] সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে বুঁদ হ[য়ে] আছেন।' সোভিয়েট সংবাদপত্র আরো জানাচ্ছে যে, মাও তাঁর এক[টি] রচনায় চেঙ্গিস খানের জোর প্রশ[ংসা] করেছেন।

'ইজভেস্তিয়া' আরো জানাচ্[ছে] যে, চীনে বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে খু[নী] দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খানের অষ্টশত[তম] বার্ষিকী প্রতিপালিত হয়েছে। সেখা[নে] যে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের উন্মাত্ত[তা] বিরাজমান তাতে, উগ্র জাতীয়তাবা[দী] বীরদের এবং সামন্তবাদী যুগে[র] প্রশংসায় মাও-এর অনুমোদনে বিস্ময়ে[র] কিছুই নেই।

চীন-সোভিয়েট সাম্প্রতিক সম্পর্কে[র] আলোকে চেঙ্গিস খানকে 'জাগে[য়ে] ওঠাবার' এই প্রচেষ্টা গভীর অর্থ[] বহ। চেঙ্গিস ও তার উত্তরাধিকারী[] দের একদা বিজিত সোভিয়েট ভূমি[র] বিরাট অংশের ওপর মাও ইতিমধ্যেই তাঁর দাবী পেশ করেছেন।

মধ্য মঙ্গোলিয়ার ইজেন হুরোতে চীনা কমিউনিস্টরা একটি চেঙ্গিস স্মৃতি-ভবন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর দু[টি] প্রদর্শনীকক্ষও আছে। প্রদর্শনীকক্[ষে] চেঙ্গিস খান রাশিয়া এবং এশিয়া-ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে যে[] পথে তার রক্তাক্ত লুণ্ঠন ও ধ্বংসা-ভিযান চালিয়েছিল তার বিস্তারিত মানচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

চীনের ঐতিহাসিকরা এই মঙ্গোল সর্দারের সম্পর্কে 'যুগে যুগে চেঙ্গিস খান' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করেছেন।

গ্রন্থ মেলা

বাংলা কবিতা : শান্তি লাহিড়ী। প্রকাশক : সাধন গঙ্গোপাধ্যায়। ১নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১। মূল্য—চার টাকা।

প্রতিটি সংকলনেরই একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য বর্তমান। ঐতিহ্যানুপ্রসূত বলেই তার একটি স্বাতন্ত্র্য ও স্থায়ী থেকে যায় সাহিত্যের ইতিহাসে। কবি শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত "বাংলা কবিতা" সেই ঐতিহ্যেরই প্রতিধ্বনি। বাংলা কবিতার গতি, প্রকৃতি ও তার কল্লোলিত স্রোতোধারা আজ কোন্ পথে প্রবাহিত, সে স্রোতোধারা কি শুধুই উষর না শ্যামলতায় সজীব, সেদিকেই লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যে যে পরিবর্তনপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যাকে পঞ্চম দশকের বাংলা কবিতা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, তারই স্বয়ংসম্পূর্ণ সমৃদ্ধ প্রকাশ বাংলা কবিতার চতুর্থ পর্যায়/পঞ্চম অলিন্দ।

পঞ্চম দশকের বিশেষ করে চিহ্নিত কবি, যাঁদের কাব্য-ভাবনা ও কবি-চরিত্রের সাথে বাংলা দেশের কবিতা-পাঠক মোটামুটি ভাবে পরিচিত, কারণ তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই বহু আলোচিত। তাছাড়া বহু পত্রিকায় বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই নিয়মিত তাঁদের রচনা প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁদের চিনে নিতে বিলম্ব কিংবা অনুরূপ কোনো সংশয় হয় না। সেই অর্থে বহু আলোচিত কবিদের একাধিক কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের মনস্তুষ্টির অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত অনালোচিত কবিদের একাধিক কবিতা সংযোজিত হ'লে তাঁদের কবি-চরিত্রের পরিচয়ে কাব্য-পাঠক উপকৃত হোত অনেক কারণেই। কারণ অপেক্ষাকৃত অনালোচিত কবি-দের কবিতা সংকলন সংযোজিত করে সম্পাদক তাঁদের কবিকর্মের স্বীকৃতি ও তাঁদের ভাগ্যবান বলে মনে করার সুযোগ দিয়েছেন। যা হোক, রবীন্দ্র-দৃশ্যপট অন্তর্হিত বাংলা কবিতার আবেদনও যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দীপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসায়, সমাজ-সচেতনতায় ও আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্দীপিত তারই একত্রিত সমন্বয়ে সার্থক "বাংলা কবিতা"। আলোচ্য সংকলনের মধ্যে সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনের একটি সমগ্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকের একাধিক কবিতা সংযোজিত না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের নির্বাচিত একটি কবিতার মধ্য দিয়েও তাঁদের কবি-চরিত্র চিনে নিতে দ্বিধা হয় না। সম্পাদকের সৎ প্রচেষ্টা ও কবি-হৃদয়ই সংকলনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপদান করেছে।

জয়ন্তী সেন

রবীন্দ্রনাথ—অসীম রাহা সম্পাদিত। জে এন ঘোষ এণ্ড সন্‌স্। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা।

বাংলা দেশে ইদানীং যত্রতত্র সংকলনগ্রন্থের প্রাচুর্য দেখা গেলেও—এই কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। কেন না, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত যে কোনো সংকলনগ্রন্থ পাঠককে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কিত একটা নতুন জগতে এনে উপস্থিত করতে পারে। এর সাহায্যে পাঠকের মননের অবশ্যম্ভাবী উত্তরণ ঘটে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতার সংকলন কাজটি অধিকতর দুরূহ। কবিরা যে আলোকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন সেই আলো পাঠকদের চোখে প্রতিভাত করে তোলা সংকলকেরই দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা আজো জানার সুযোগ পান নি—তাঁদের জানানো এবং যাঁরা জানার জন্যে কিছুটা এগিয়েছেন—তাঁদের সঠিক পথ দেখানোর একমাত্র উপায় কবিদেরই নির্ধারিত পথ। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিদের কাব্য পাঠ করলে সেই পথ নির্ণীত ও নির্মিত হতে পারে।

অসীম রাহা সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' পাঠ করে সেই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়তর হোল। চল্লিশজন কবির মোট চল্লিশটি কবিতার সংকলন। সবচেয়ে বড়ো কথা, সংকলিত কবিতাগুলি পূর্বেকার সংকলনগুলি থেকে চয়ন করে দায় সারা হয় নি। এদিক থেকে সংকলক যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা অনন্যসাধারণ বলা চলে। পাঠ-পরিক্রমার জন্য কবিতাগুলি যেভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে তা অভিনব প্রণালীর ইংগিতবাহী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন, অজিত দত্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোজিৎ বসু, দিনেশ দাস, কামিনী রায়, অক্ষয় বড়ালের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

'বলাকা'র বিয়াল্লিশের কবিতায় 'তুমি'-সর্বনামের আড়ালে রেখে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মৃত্যুদূতের' মতন,—বলেছেন 'দস্যু',—সেই একই নিঃশ্বাসে আবার তাকেই বলেছেন 'হে বন্ধু অজানা'। অর্থাৎ তাঁর আধ্যাত্মিক দুর্ভাবনাটা সাময়িক। আধ্যাত্মিক শুভগতির নিশ্চয়তাই তাঁর ব্যক্তি-স্বভাবের বিশেষত্ব। তিনি যেন বেদান্তের ধ্রুব বিশ্বাস—কাব্যরসে সরস। আমার সেই বিশ্বাসই ভালো লাগে—তাই, সুলি-প্রুধোমের লেখাতে ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবরণের ঘাম-ছোটানো ঐ কয়েক ছত্র মনে এলেই সঙ্গে-সঙ্গে 'বলাকা'র তেতাল্লিশের কবিতার কয়েক ছত্র আমি আজও আউড়ে যাই—

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে
দুঃখ সুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা।

এবং—

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রইবে থলি-থালি
কোথা বা সংসার।
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া
মন তাহাদের ঘূর্ণা পাকের হাওয়া,
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার।

সুলি-প্রুধোমের বিষাদ-যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনিও ছিলেন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক। তাঁর 'La Justice'-এর আয়তন সুদীর্ঘ; দুটি প্রধান পর্যায়ের বিভাগ অবলম্বন করে 'প্রোলোগ', 'এপিলোগ' এবং পর পর এগারোটি 'ভিজিল' সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য এগিয়েছে,—এবং এই থেকেই এ-কাব্যের গঠনগত বিশেষত্বের কতকটা ধারণা হয়; আর, 'সন্ধানী' এবং 'একটি কণ্ঠস্বর'—এই দুটি প্রতীক-চরিত্রের চলিত-ভাষার সংলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের তির্যক এবং অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ কয়েকটি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও ব্যক্ত হয়েছে। 'La Justice'-এ তাঁর বিশ্বব্যাপী ন্যায়াদর্শের সন্ধান। 'Le Bonheur'-তে আবার 'ফস্টাস' আর 'স্টেলা' চরিত্রের সুখ-সন্ধানের কাহিনী রেখে গেছেন তিনি। আনাতোল ফ্রাঁসের বন্ধু ছিলেন তিনি। আনাতোল ফ্রাঁসও তাঁর অকৃত্রিম বিষাদ, সারল্য, মননবর্মিতা আর রোমান্টিক-দার্শনিক বিশেষত্বের কথা লিখে গেছেন। হয়তো তাঁর সে-বিষাদ প্রগাঢ় কোনোরকম প্রত্যয়ের অভাবের জন্যেই। হয়তো বা গভীর নিষ্ঠার অভাবেই তা বদ্ধমূল। যুক্তিতে-আবেগে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ছিল তাঁর গভীর বোধে। তাছাড়া, শারীরিক অসুস্থতাও সে-বিষাদের আর-এক কারণ। শেষ বয়সে আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগতে হয়েছে তাঁকে। সুকেশিনী কাউন্টেস দিয়ান দে বোসাকের (Countess Diane de Beausacq) সঙ্গে দর্শন আর চারুকলা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ভালো লাগতো তাঁর।

মিস্ত্রাল যেমন ১৮৮৬তে প্রকাণ্ড দুই খণ্ডে প্রাচীন ও সমকালীন প্রভেন্সাল ভাষার এক শব্দবারিধি প্রকাশ করে গেছেন, সুলি-প্রুধোম তেমনি ফ্রান্সের সঙ্গে প্রুশিয়ার যুদ্ধের পরে তাঁর 'নানা কথা' (Impressions) লিখে তাঁর আদর্শবাদী মনের কথা জানিয়ে গেছেন। চারুকলা এবং ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর আলোচনা আছে। কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার নাম 'Le Testament poetique'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্যে'র মতন ১৮৯৫-এ 'আমি কী জানি?' ('Que-sais-je?') নামে তাঁর বিজ্ঞান-সম্পর্কিত চিন্তাও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আর্থার ও-শগনেসির (Arthur O' Shaughnessy) একটি ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমি বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে তাঁর এক কাব্যোক্তি দেখেছিলুম। তাতে কবির এই উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছিল যে, অন্ধকার মহাশূন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেখছেন অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতি। ধান-কলাই-মুগ-মুশুর ঝাড়াই-বাছাইয়ের সময়ে যেমন এইসব ফসলের দানা ছড়িয়ে যায় বাতাসে, তেমনি আকাশে নক্ষত্রের আসা-যাওয়া চলছেই। তাদেরই মধ্যে কোনো-এক ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন—'ওহে, হাজার বছর পরে, এইরকম এক রাত্রে আবার তোমাকে এখানেই ফিরতে হবে, মনে রেখো।' সে-আদেশ লঙ্ঘন করবে কে? ইতিমধ্যে অনেক মানুষের মৃত্যু হবে। অনেকে থাকবে না। অনেকেই চলে যাবে। তবু বিজ্ঞান-ব্রতী প্রতিনিধি কেউ তো জেগে থাকবেন। প্রত্যেকটি মানুষও যদি মরে যায়, তবু বিজ্ঞানের জগৎ এই অকাট্য নিয়মের জগৎ হিসেবেই বেঁচে থাকবে। ও-শগনেসির অনুবাদে দেখেছিলুম—

'And should all men have perished there in turn
Truth in their place would watch that Star's return.'

এ-অনুবাদের নাম 'নিয়োগ'—'The Appointment'.

সুলি-প্রুধোমের কেবল এই গাম্ভীর্য,—এই বিজ্ঞানে প্রত্যয় ইত্যাদি লক্ষণগুলির জন্যেই কি তাঁকে মনে পড়ে?

তিনি প্রেমের কবিতাও লিখে গেছেন,—আবার ছেষট্টি বছর বয়সে—মৃত্যুর বছর-দুয়েক আগে লেখা—জীবনে এবং সাহিত্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর শেষ আলোচনাও প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর বিষাদই আমার মনে জেগে আছে। তাঁর বিষাদের জন্যেই তাঁকে বোধ হয় বেশি মনে পড়ে।

মিস্ত্রাল তাঁর সমকালীন,—বদ্‌লেয়রও তাই। কিন্তু ১৯০৭-এ স্যুলি-প্রুধোমের মৃত্যুর পরেও মিস্ত্রাল বেঁচে-ছিলেন প্রায় আরো সাত বছর। বদ্‌লেয়র জন্মেছিলেন ১৮২১-এ, মারা গেছেন ১৮৬৭তে। বদ্‌লেয়রের পাশে রেখে দেখলে মিস্ত্রালের কাব্য বিষাদহীন,—নিঃসন্দেহে তা ছড়া-গান-রূপকথার পংক্তিতেই স্থাপনীয়। স্যুলি-প্রুধোম রোমান্টিক মেজাজের মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু দর্শনে-ধ্যানে-বিষাদে তিনি যে অন্য-প্রকৃতির কবি-মনের অধিকারী, তাতে সন্দেহ নেই। এঁরা দুজনেই নোবেল-পুরস্কার পেয়েছেন। স্যুলি-প্রুধোম পান ১৯০১-এ,—মিস্ত্রাল ১৯০৪-এ। কে জানে,—বেঁচে থাকলে বদ্‌লেয়রই বোধ হয় আগে পেতেন।

কিন্তু পুরস্কার দিয়েই কি সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করা যায়? পুরস্কার তো একরকম জনমত-জ্ঞাপনের ব্যবস্থা। নোবেল-পুরস্কারও কি এই ধরনের ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কূটনীতিরহিত অন্য কিছু?

থাক্—সে-সব প্রশ্ন উহ্য থাক। কূটনীতি-দুর্নীতি-রাজনীতি আমার লক্ষ্য নয়, আলোচ্যও নয়। স্যুলি-প্রুধোমের বিজ্ঞান-বিশ্বাসী, সার্ব-ভৌম ন্যায়াদর্শবাদী, সুখ-সন্ধানী, চিন্তাশীল মনের বিষাদবোধই আমার বার বার মনে পড়ে। সেই বিষাদের সূত্র ধরেই বদ্‌লেয়রের তথাকথিত শুভনাস্তিবাদ বা সিনিসিজ্‌মের কুখ্যাতি মনে আসে। ফরাসী কাব্যে যে ব্যাপক প্রতীক-অনুশীলনের তিনি ছিলেন প্রবর্তক, তাঁর সেই প্রতীকচর্চার দিকটি মনে পড়ে। তাঁর সমসাময়িক শিল্পী এবং কবিদের মধ্যে ছিলেন থিওফিল গোতিয়ের (১৮১১-৭২)। বদ্‌লেয়র তাঁর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু শব্দ, ছন্দ, প্রতীক ইত্যাদির দক্ষতা তাঁর যতোই থাক, বদ্‌লেয়র যে গভীর দুঃখবাদী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। স্যুলি-প্রুধোম ঠিক সে-রকম নন। তিনি ভগবানের কথা বলেছেন। দেশে দেশে, যুগে যুগে অনেক কবিই অবিশ্যি ভগবানের কথা বলেছেন। সেইসব বৃত্তান্তের মূল সত্যটাই আমার মনে দেখা দিচ্ছে। আমি সেই কথাই ভাবছি।

ভগবান আছেন কি নেই,—থাকলে তিনি মানুষের মতন মনুষ্যরীতিতে বিশ্বকে অনুভব করেন কী না-করেন, ভেবে সে-সব কথার কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ভাবুকের মনও সীমানার মধ্যে বাঁধা। শারীরিক সংস্কারগুলো মস্তো বাধা। চোখ দিয়ে, কান দিয়ে,—অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎকে নিত্যই পাচ্ছি, তার বেড়া ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য নেই। অথচ যাকে আমরা কথায় কথায় 'বিশ্ববোধ' বলে থাকি, সে তো কোন ইন্দ্রিয়সীমিত বোধ নয়। মানুষের যে-কটা ইন্দ্রিয় আছে, সেই কটাই কি যথেষ্ট?

বদ্‌লেয়র কোনো 'বিশ্ববোধে'র ধার ধারতেন না। মানুষের শারীরিক বশ্যতাই তিনি সর্বান্তঃকরণে অনুভব করে গেছেন।

সীমাটাই অনিবার্যভাবে প্রকট। তবু নিজেদের যতোই আমরা সীমা-সচেতনভাবে পাচ্ছি, ততোই অসীমের আবেশ বোধ করছি। এ এক আশ্চর্য বিপরীতের সমাবেশ। ইন্দ্রিয়ের সীমাতে যাকে বেষ্টিত দেখছি, বোধের প্রত্যক্ষ-তায় সে-ই অসীম হয়ে জাগছে।

এই অসীমতা-অনুরাগ বদ্‌লেয়রের নয়; এ আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা। আজ এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আমি দেখলুম কোটি কোটি যুগ-যুগান্তের অতল, অকূল পারাবার। তাকে স্মরণে অনুভব করতে চেয়েছিলুম। তাকে স্রোত বলে ধারণা করেছিলুম,—কিন্তু কোথায় তার আদি, কোথায়ই বা তার অন্ত? বর্তমান ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার মধ্যেই অতীতকে পাচ্ছি, ভবিষ্যৎকেও অনুমান করছি। স্মৃতির পাশেই আছে জাগৃতি, জাগরণের সঙ্গেই আছে অনুমিতি। জীবিত শরীর এবং শরীরবর্তী মনই আমাদের সর্বস্ব। আমাদের দেহ-মনই স্মৃতিবলে অতীতের ধারণা করে, কল্পনাবলে সে-ই আবার ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলে।

এই মুহূর্তে জগৎ-বোধের যে চেউটাকে আমি ছুঁয়ে আছি, যে রূপ-জগৎ-ধ্বনিজগৎ-স্পর্শজগৎ আমার সন্নিহিত,—একমাত্র তাকেই কতকটা অব্যবহিত-ভাবে চিনি, অসংকোচে তাকেই প্রত্যক্ষ বলে মানি। একমাত্র বর্তমান ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ কোনো কালানুভূতি নেই। অতীত স্মৃতিমাত্র,—এই অর্থে কাল্পনিক; ভবিষ্যৎও কাল্পনিক,—কিন্তু 'কাল্পনিক' মানে অলীক নয়। যা প্রত্যক্ষ নয়, এই অর্থে 'কাল্পনিক' কথাটা মনে এলো।

মনটা চতুর্দিকের বস্তুজগতের চাহিদা মানছে বটে, তবু কেমন যেন সরে আছে।

সেদিন ট্রেনে উঠলুম। চলেছি,—যেতে যেতে ভাবছি কাজ আছে, কাজের আর অন্ত নেই। কাজের ডাকে সাড়া দিতে-দিতেই সেদিন কখন যে তাড়ার সকাল গিয়ে দুপুর এসেছিল।

একটু বেশি বেলায় যাঁদের কাজে গেলে চলে, তখন সেই সব কুঠিওলা যাচ্ছিলেন গাড়িতে। আমি পড়ছিলুম রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বৃক্ষবিহার' প্রবন্ধটি। ইতিমধ্যে কোন ইষ্টিশান ছেড়ে গাড়িটা যে চলতে শুরু করেছে, তা বলতে পারি না, হঠাৎ কানে এলো গান—'তারা তোমায় চিনতে পারে যারা তোমার চিন্তা করে।'

বই থেকে চোখ তুলে তাকালুম গাড়ির কামরার এপাশে-ওপাশে

ভেবেছিলুম ভিখিরি বুঝি। কিন্তু না, ভিখিরি নয়। দুটি ভদ্রলোক। তাঁরা পাশাপাশি বসেছেন, —গান গাইছেন বিভোর হয়ে। সাধারণ আপিস-যাত্রীর মতন খুবই সাধারণ চেহারা তাঁদের—পান খেয়েছেন, দাড়ি কামানো হয় নি; শার্টের বুক-পকেটে এক-এক গোছা কাগজ; রুপোর বোতাম লাগানো শার্টের গলার বোতামটা খুলে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি আমার ঠিক সামনেই বসেছিলেন। তাঁর পাশের লোকটির মুখটা লম্বা ধরনের। গালে লম্বা খাঁজ পড়েছে। চেহারার মধ্যে বিশেষ ভাবুকতার কোনো লক্ষণ নেই, বরং একটু বৈষয়িকতার ছোপই যেন বেশি দেখা যায়। তবু তাঁর সেই গানের অনুভূতিটাও অকৃত্রিম।

তাই মনে হালো, আমাদের সমস্ত মনটাকে সম্পূর্ণভাবে যদি দেখতে পেতুম তাহলে সেটা আকাশের মতো বিচিত্র মনে হোতো। কতো যে আলোর বিন্দু, কতো যে শূন্যের শূন্যতা। কতো শহরের ধোঁয়া, গ্রামের মুক্তি।

মনকে প্রসারিতভাবে দেখবার অবকাশ নেই আজকাল। নির্দিষ্ট বৈষয়িক লক্ষ্যে তাকে কেবলই বেঁধে রেখে চলতে হচ্ছে। কিন্তু সেও বিদ্রোহ করে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আলিপুরের মাঠের মধ্যেই তার সমস্ত কীর্তি-অকীর্তি রেখে যাক—অশ্বাধিকারী সেই লক্ষ্যেই স্থিতলক্ষ্য। কিন্তু ঘোড়াটার মধ্যে কখনো যদি প্রবল কোনো স্বাতন্ত্র্য জেগে ওঠে, তাহলে তখন আর নিস্তার নেই। ঘোড়ার মালিক তাঁর নিজের ব্যবসাতে লোকসান সইবেন কেন? তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। হয় মেরে ফেলবেন, নয় ছেড়ে দেবেন।

বিষয়-বুদ্ধির জোয়ালে ঘাড় বেঁধে আমরা মানুষ-ঘোড়ারাও এই সংসার-আলিপুরে নিত্য ঘোড়দৌড় দেখাচ্ছি। সেদিন দেখলুম তারই মধ্যে একটু বিরতির স্বাধীনতা।

সেটা খুবই স্বাভাবিক। আজকাল অস্বাভাবিকে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলেই স্বাভাবিক-কে অপ্রত্যাশিত মনে হয়। তাই গানের ঐ আন্তরিক ঢেউটা সেদিন বড়ো বিচিত্র মনে হয়েছিল। ভারি ভালো লেগেছিল। কলকাতার ভিড়ে পৌঁছে, পথে হাঁটতে-হাঁটতে তখনো আমার মন দুলতে লাগলো—বার বার বললুম, 'যারা তোমার চিন্তা করে তারা তোমায় চিনতে পারে।'

সেও কবির কথা। কবিদের এই গভীর বিষাদের নানা ধ্বনি, নানা রূপ।

তব, আজ এই মুহূর্তে যা ভাবছি, কাল তা থাকবে না। জীবনে অনেক শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তের দৃশ্যপট পার হয়ে এলুম, কিন্তু স্থায়ী কোনো বিশ্বাস পেয়েছি কি?—জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো মত, কোনো ধারণা, কোনো মীমাংসা?

চারদিকেই অস্থায়ীর মেলা! কতোদিন দেখেছি ভোরের চাঁদ পাণ্ডুর হ'য়ে আকাশের সূর্যকিরণে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। গাছের মাথায় নতুন সকালের আলো পড়লো বুঝি। কলতলায় জলের পাত্র নিয়ে একে একে কতো লোক এলো, জল নিয়ে কতো লোক ফিরে গেল। ক্রমশ বেলা বেড়েছে, ছবি বদলে গেছে, মর্জিরও বদল হয়েছে। তেমনি একইভাবে জীবনের পট সরে যাচ্ছে। চলচ্চিত্র আমাদের বোধ। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?'

যতোক্ষণ জেগে আছি, ততোক্ষণ প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সঙ্গে অনুমানের জ্ঞানের বা logical অনুমিতির ঘনিষ্ঠ সমাবেশ জাগিয়ে রাখছি। সেই সমাবেশ থেকেই ঘটছে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বইয়ে দেখেছি বৌদ্ধেরা তারই নাম দিয়েছেন 'প্রজ্ঞপ্তিসৎ'। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, ইন্দ্রিয়চেতনা আর সম্বন্ধবোধ, এই দুইয়ে মিলে আমাদের জাগৃতি। সেই জাগৃতির পারাবারে ভাসতে-ভাসতে অশেষ থেকে অশেষের দিকে চলেছি।

এক ধরনের মন আছে, যাতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দিকেই ঝোঁক বেশি দেখা যায়; আবার অনুমানের লোকও আছে বৈ কি। বিশেষ গাছ, বিশেষ নদী, বিশেষ পাহাড় দেখতে-দেখতে সামান্যের ধারণা জন্মায়। সে-ধারণাটা বস্তুবোধ নয়,—বস্তুতত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বের রূপ নেই। তত্ত্বের অরূপ-লোকে কবিরা বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। আমার তো তাই মনে হয়। মুনি-ঋষিরা যেখানে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন, সে সব মননময় অতি-চিন্তান্বিত লেখা কি আমার ভালো লেগেছিল? ভিক্তর হ্যুগো মোটেই সে রকম নন। দুজন শিল্পীর ধ্যানে যতোই মিল থাক্,—প্রকাশে এঁরা আলাদা মানুষ প্রত্যেকেই।

জগৎটা যে অশেষ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, সে তো সকলেই তত্ত্বরূপে জানে; কিন্তু রূপময় সত্য হিসেবে

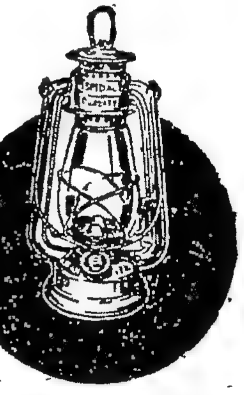
কিমান
লণ্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৭৬,৩ও চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৩৮০

জন তা উপলব্ধি করেছে? রাত্রে কাশভরা তারার মেলা দেখতে-খতে মন মগ্ন হয়ে যায়। মাদ্রাজে কদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বসেছিলুম। কথা কি কোনদিন ভুলবো? সমুদ্র পরূপ শব্দময়, রূপময়, বিস্তারময় ত্যক্ষ এক সত্য। 'অশেষ বারিধি' ললেই কি তার সবটা বোঝানো ায়?

মিস্ত্রালের মধ্যে সেই রূপচেতনার্যতি দেখেছি,—সুলি-প্রুধোমের মধ্যে পের চেয়ে চিন্তাই যেন বেশি মনে হয়েছে। শুনেছি ভিক্তর হুগোর ঙ্গে তাঁর মনোধর্মের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন কেউ কেউ। আর বদ্‌লেয়রকে মনে হয়েছে অন্ধকার আর্তনাদ। হ্যা, আর্থার সাইমনসের বেশ কয়েকটি অনুবাদে আমার সেই কথাই মনে হয়েছে। পাপ, ভয়, যৌন-বিকারের সেই অন্ধকার-জগতে আমি কোনো ভগবানের নাম শুনি নি। শুনেছি ভারি নিঃসঙ্গ ছিলেন বদ্‌লেয়র। সাইমনস লিখেছেন যে, বদ্‌লেয়র ছিলেন—'an ascetic of passion, a hermit of the brothel'!

অ্যালেন টেটের সেই প্রসিদ্ধ অনুবাদ—'A Carrion' মনে পড়ে। পথে যেতে যেতে কবে চোখে পড়েছিল দুর্গন্ধময়, নগ্ন, প্রশান্ত শব। ফুল যেমন সমস্ত বর্ণ-সৌরভের ঐশ্বর্য নিয়ে ফুটে ওঠে, বদ্‌লেয়রের চোখে সেই পচা মাংসের স্তূপও তেমনি সূর্যের নিচে সেদিন নিরাবরণ পেটটা মুক্ত রেখে প্রবল অকুণ্ঠতার সঙ্গে রাস্তায় ফুটে উঠেছে! খিক্ খিক্ করেছে পোকা, ভ্যান্ ভ্যান্ করেছে মাছি। পাহাড়ের আড়ালে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল লুব্ধ এক কুক্কুরী। আহা, বদ্‌লেয়রও শঙ্করাচার্য নাকি? বাংলায় এ-ভাবনাও কেউ কেউ ভেবেছেন।

সে যাই হোক্, বদ্‌লেয়রের অন্ধকার এই বীভৎসতার সঙ্গে বিদ্যমান। তবু তিনিও ফুলের কসল দেখেছেন। বার-বার তাঁর কবিতায় ফুলের উল্লেখ দেখেছি। সত্যেন দত্ত তাঁর 'হার্মনি দু সোয়া'র অনুবাদ করে-ছিলেন—'সন্ধ্যার সুর'। তাতেও ফুলের কথা ছিল। বেহালার কথা ছিল। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল'-এ বদ্‌লেয়রের কাব্যক্ষেত্রের ফুলগুলিই যেন বেছে বেছে তোলা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু মশায় বদ্‌লেয়রের নেশায় বিভোর হয়েছিলেন মাত্র কিছুকাল আগে। সেও কি ফুলের নেশায়? না, বদ্‌লেয়র শুধু ফুল নন, প্রেম নন, স্বপ্ন নন। তিনি

● শ্রীবিষ্ণু দে

তাঁর যুগের সহজ সহযাত্রী ছিলেন না। তিনিও বিষণ্ণ কবি। বিষণ্ণ এবং বলিষ্ঠ! বিকৃতও।

ঝোঁকের বাড়াবাড়ি বা নেশার অতিতাড়না থেকে সরে দাঁড়িয়ে, বদ্‌লেয়রের কথা ভাবতে গেলে জীবনের তীব্র অন্ধকারের কটু-মধুর অনিবার্য নিরানন্দের জ্বালা জ্বলতে থাকে। তাঁর নিঃসঙ্গতা যেন কাঁটা হয়ে বেঁধে। তাঁর জীবনের বিষাদ বড়োই তীক্ষ্ণ, ভয়াবহ, ঈশ্বরহীন। বিষ্ণুবাবু একটি অনুবাদে সেই বিষাদের স্বাদটি দিয়েছেন—

বৃথাই তোমার হাত ক্ষীণ বক্ষে
আমার বিচরে;
তোমার অনিষ্ট করে হে প্রেয়সী!
নারীর দন্তর
নখরের ঘায়ে দুষ্ট, কখনো
এ অশুচি অন্তরে
হৃদয় আমার আর খুঁজো না,
সে আহার্য জন্তুর।
আমার হৃদয় ভগ্ন প্রাসাদ,
সে শিবার নিবাস,
ছেঁড়ে খোঁড়ে চেরে কাড়ে—ভূরি-
ভোজে ছিন্ন সে আশয়।
—সৌরভ কী ছায় নগ্ন তোমার
ও বক্ষের বাতাস।
সুন্দরী! মনের রুদ্র গণ্ডী তুমি,
তোমারই তো জয়!
উৎসবের মতো দীপ্র অগ্নিময়
তোমার নয়নে
পশুর উচ্ছিষ্ট টুকরো শেষ হোক
তোমারই দহনে!

বদ্‌লেয়র-কে আমার শঙ্করাচার্য মনে হয় না তবু। তাঁকে এই সব কারণেই কেমন যেন আধা-তন্ত্রসিদ্ধ, চিরনিঃসঙ্গ তীক্ষ্ণ এক কবিচেতনা বলে মনে হয়। মোহিতলাল 'তন্ত্র' আর, 'তান্ত্রিকতা'র কথা বলতে খুবই ভালোবাসতেন। হয়তো, বদ্‌লেয়র সম্বন্ধেও তিনি এই সব শব্দ ব্যবহার করতে চাইতেন। কিন্তু একথা ঠিকই যে, বদ্‌লেয়র মানুকে মাতাল হবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন। বিষ্ণুবাবুর অনুবাদ ব্যবহার করেই আবার তাঁর নিজের কথা বলা যাক—

'সব সময়ে মাতাল হতে হবে!
ওতেই সব: ঐ একমাত্র বিবেচ্য।
যদি বোধ করতে না চাও
মহাকালের ভয়ানক ভার,
যাতে তোমার ঘাড় ভেঙে যায়
আর তুমি বেঁকে পড়ো মাটির
দিকে, তবে তোমাকে মাতাল হতে
হবে অবিরাম।

'কিন্তু কিসে?' মদে, কবিতায়, সৎকার্যে, তোমার যা রুচি। কিন্তু মাতাল হও!'-----　(ক্রমশঃ)

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী-চিত্র

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দুরন্ত দেহলী

॥ পনেরো ॥

গজানন সেন শহরের সব চেয়ে সমৃদ্ধশালী লোক। কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন একমাত্র সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি ছাড়া তার কোনোটারই অভাব নেই। আজকাল একটা নতুন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। সেটা হ'ল তার সখের সাহিত্যপ্রীতি। তার এই সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব করার আগ্রহ দেখে দিল্লী শহরের চ্যাংড়া ছোকরার দল, রাতারাতি ভুঁইফোড় সাহিত্য-সংঘ খুলে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য তাকে নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে। বলা বাহুল্য, শামিয়ানা, চা, আর্টিস্টদের কনভেন্স সব খরচাই গজাননের। সাহিত্যের এত বড় নতুন পেট্রনটির খবর নৃপেনের কানে আসতে দেরি হয় নি। এই সব লোক নিয়েই তার কারবার। সে ঠিক করেছে তার পত্রিকার উদ্বোধন ব্যাপারে এ মক্কেলকে হাতছাড়া করা চলবে না। শহরের গণ্যমান্য সাহিত্যিক-দের ডাকা হবে। প্রেস রিপোর্টারদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত থাকবে।

বহুক্ষণ নিরিবিলি আলাপ-আলোচনার পর কেতকী চট্টরাজ নৃপেনকে বলল, 'কেন মশাই আবার বক্তৃতার হাঙ্গামা রাখছেন? কেন আবার কাজ বাড়াচ্ছেন?'

লিটারারী সেক্রেটারী চট্টরাজের নতুন চাকরী হয়েছে। সুপুরুষ। দু-পাঁচখানা বাংলা বই পড়েছে। ভুঁইফোড় সাহিত্য-সংঘ থেকে যত নিমন্ত্রণ আসে সেগুলোর তদারক করাই তার কাজ। একটা সুন্দর ডেট-ক্যালেণ্ডারে ঢেরা কেটে তার দিনটা কেটে যায়। বহুদিন বেকার ছিল। কাপড়ের গুদোমে চাকরীর উমেদারী করতে এসেছিল। চেহারা ও বাংলা বলার কায়দায় গজাননের নজরে পড়ে যায়। বেশ মাইডিয়ার টাইপের লোক।

ডানদিকের চোখটায় টিপ দিয়ে নৃপেনকে সে আবার অনুনয়ের সুরে বলল, 'কেন মশাই আবার বক্তৃতার হাঙ্গামা রাখছেন? উদ্বোধন তো আজকাল কাঁচি দিয়ে ফিতে কেটেই চলে যাচ্ছে।'

নৃপেন বলল, 'বুঝবো না কেন? কাঁচির মূল্য জানি না? কাঁচির আজকাল স্টেটাস বেড়েছে। পকেটমারের হাত থেকে উদ্ধার হয়ে সে সাহিত্যিক আর সম্পাদকের হাতে স্থান পেয়েছে। 'কাটো পেস্ট করো'—এই হলো আধুনিক জার্নালিজম-এর মটো। ওর স্থান আরও উঁচু হয়েছে, ইন-অগারেশনের হিড়িকের কল্যাণে। কোথাও কোথাও সোনার কাঁচি দিয়েও ফিতে কেটে ইনঅগারেশন হয়।'

কেতকী বলল, 'আমার কথাটা ঠিক তা নয়, বুঝতে পারছেন, গরীব বেচারার চাকরীটা নিয়ে টানাটানি পড়বে। সেই বঙ্কিমবাবুর আমলের দু-পাঁচখানা বাংলা বই পড়ে দেখেছিলাম। বাংলা সাহিত্যের সাথে তারপর থেকে কোনো সম্বন্ধই নেই। আপনি আবার বলছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ওপর তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে। বুঝতে পারছেন এ বক্তৃতাটা লেখার ভার আমার ওপরই এসে পড়বে। গরীব মানুষ দু-বেলা দুটো খেয়ে কোনোমতে বেঁচে আছি। কেন মশাই আমার এ হাঙ্গামা করতে যাচ্ছেন?'

নৃপেন বলল, 'তা কি করে হয়? এত টাকা খরচ করতে রাজী হয়েছেন। বর্তমান সাহিত্যের এত বড় একটা নাম করা পেট্রন। কত রিপোর্টার আসছে। কত ফটোগ্রাফার আসছে সেদিন জানেন? তাঁরা কি লিখবে? কি রিপোর্ট দেবে? জানেন আপনি কাগজে কাগজে এই সভার পুরো রিপোর্ট বেরুবে? ছবি বেরুবে? গজাননের এই উদার সাহিত্যপ্রীতির ওপর এডিটোরিয়াল বেরুবে। কোনো ভয় নেই। আপনারও নয়। তাঁরও নয়। বক্তৃতাটা আমি নিজেই লিখে দেবার ভার নিচ্ছি। আপনি শুধু দেখবেন সভায় উনি যেন অসুস্থ না হয়ে পড়েন। তাহলে আবার ফটোগ্রাফারগুলো ডিসএ্যাপয়েন্টেড হয়ে পড়বে।'

এর ভেতর তিনটি ক্ষীণকায় যুবক এসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে ঘরে ঢুকলো। প্রথম ছোকরাটি মিহিকণ্ঠে নৃপেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আজ্ঞে আপনি বোধহয় কেতকী চট্টরাজ? সাহিত্যপ্রেমী গজানন সেনের লিটারারী সেক্রেটারী?'

জোরের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে নৃপেন বলে উঠলো, 'না না না মশাই। এই ইনিই কেতকী চট্টরাজ।'

তিনটি ছোকরাই আবার নাটকীয় কায়দায় অভিবাদন করে বলল, 'তাই নাকি? আজ্ঞে আমরা ভেবেছিলাম ইনিই বোধহয় সাহিত্যপ্রেমী গজানন সেন। কি সুপুরুষ!'

চশমা-আঁটা লম্বা ছোকরাটি বলল, 'তিনিও যা আপনিও তাই। ঐ একই কথা। মানে হ'ল আমরা একটা নাটক খাড়া করব ঠিক করেছি। এই দেশের দরিদ্র জনতার ব্যথা,'—বলেই হাতমুখ খিঁচিয়ে ছোকরা অঙ্গভঙ্গী করে বলতে লাগলো, 'দেশের লোকদের মনের কষ্ট এ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমরা ঠিক করেছি একটা নাটকের সংঘ খুলব। নাটকের ভিতরই আমরা চালাব নতুনের পথে অভিযান—' বলেই সে মাসল্ ফুলিয়ে হাত ছুড়ে অভিযানের নমুনা দেখিয়ে দিল।

কেতকী অবাক হয়ে বলল, 'তাতে আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি? আমি তো নিজে কখনও কোন নাটকে পার্ট করি নি।'

মিহিস্বরে ছোকরাটি বলল, 'আপনিই সব কিছু করতে পারেন। আপনার উপরই এই সংঘটির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ভর করছে।'

তৃতীয় যুবকটি ধুতির কোঁচা উড়িয়ে বলল, 'শুধু সংঘটির নয়। আপনার ওপর নির্ভর করছে দেশের শত শত দরিদ্র নরনারীর সমস্ত ভবিষ্যৎ, এ যে দেশের ডাক। না বললে তো চলবে না ভাই।'

নৃপেন দেখল তিনটির ভিতর এইটির অভিনয়ই সর্বোত্তম। একেবারে ন্যাচারাল।

কেতকী বলল, 'গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথাটি বলে ফেলুন। একটা কাগজের এডিটর এখানে বসে রয়েছেন দেখছেন না?'

'পত্রিকার এডিটর? তাই নাকি।' হেঁই হেঁই করে তিনটি ছোকরাই নৃপেনের পায়ের ওপর চিপ চিপ করে উপুড় হয়ে পড়ল।

কেতকী আবার বলল, 'আমাকে কি করতে হবে তাড়াতাড়ি বলে দিন।'

তিনজনেই বিনয়ের সাথে ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'আমরা ঠিক করেছি আমাদের সংঘটির নাম রাখবো 'গজানন প্রগতি নাট্য সংঘ'। আমাদের সভায় আমরা একেবারে

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সরল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

ইউনানিমাস রিজলিউশন পাশ করেছি। এটাতে যেন গজাননবাবু কোন আপত্তি না করেন। দয়া করে সেইটুকুই আপনি দেখবেন।'

কেতকী বলল, 'শুধু নামটা ধার চাই। বক্তৃতা দিতে হবে না তো?

—'বক্তৃতা তিনি ইচ্ছা করলেই দিতে পাবেন। সেটা তাঁর ইচ্ছা।'

—'না না মশাই তিনি বড় ক্লান্ত। বক্তৃতা দেবার জন্য লোকের বন্দোবস্ত করুন।'

গজানন গড়গড়ায় লক্ষ্ণৌ-এর সুগন্ধি তামাক টানছিল। একসাথে এতগুলো খোশামুদে পার্শ্বচর গলে পড়ল।

—'তোমরা একেবারে ইউনানিমাস রিজলিউশন করে ফেলেছো বলছো, যে আমার নামেই নাট্য সংঘটি দাঁড় করাবে। বেশ তাই যদি হয়, তাহলে এই শহরের সব চেয়ে ভালো ভালো এক্টর, আর্ট ডিরেক্টর জড়ো করো। নতুন নতুন সিন তৈরি করাও। টাকার কোনো ভয় পেও না। সে ভার আমার।'

চশমা-আঁটা লম্বা ছোকরাটি অন্য দুটোর দিকে চোখ টিপে দিল। দ্বিতীয় ছোকরাটি বলল, 'আজ্ঞে এই ইনিই হলেন শহরের সব চেয়ে বড় এ্যামেচার থিয়েটারের ডিরেক্টর পুলক আদিত্য।'

পুলক আদিত্য বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল, 'আজ্ঞে ভালো আর্টিস্টের জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা রয়েছি কি করতে স্যার?'

তৃতীয় ছোকরাটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে স্যার, ইনিই হলেন শহরের দুর্গা চক্কোত্তি। এঁকে বিট্ করতে পারে এমন আর্টিস্ট এখনও দিল্লী শহরে জন্মায় নি। একেবারে শিশির ভাদুড়ীর দ্বিতীয় সংস্করণ।'

দ্বিতীয় ছোকরাটি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। দুর্গা চক্কোত্তি তার মনোভাব বুঝতে পেরেছে। তার পরিচয়টুকুও দেওয়া দরকার। দুর্গা হাত নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে ইনি মান্না হাজরা। সিন আঁকতে সমস্ত দিল্লী কেন উত্তর ভারতে এর জুড়ি নেই। আমাদের গজানন প্রগতি নাট্য সঙ্ঘের ইনি একটা এ্যাসেট।'

ঘাড় নাড়িয়ে মান্না হাজরা বিনয়ের হাসিতে দন্ত বিকশিত করে। হেঁ হেঁ হেঁ কি যে বলো? কি যে বলো? তবে হ্যাঁ স্যার, চাই শুধু ক্যানভাস তুলি আর রঙ। ব্যস তারপর শুধু বলে দিন প্লেটা. কি হবে—হিস্টরিকাল, সোশ্যাল, ওপেন এয়ার, ট্রাজেডি, কমেডি, হরর, সাইকলজিক্যাল যা বলেন।'

গজাননের সবচেয়ে বড় গুণ যে, সে কাউকে শুধু তার মৃদু হাসিতেই আপ্যায়িত করে ছেড়ে দেয় না। স্থানীয় কচুরি মিঠাই-মণ্ডার সমিতিরও সে একজন পার্মানেন্ট পেট্রন। তাদের ওখানেও প্রতিমাসে তার বেশ মোটা বকমের চেক্ যায়।

ডিরেক্টর চশমা-আঁটা লম্বা ছোকরা পুলক আদিত্য এ্যামেচার এক্টর হিরো, কোঁচা আলুলায়িত দুর্গা চক্কোত্তি ও আর্ট ডিরেক্টর মান্না হাজরা প্রাণপণে সামনে সাজানো প্লেটগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটা প্লেট সাফ করতে তাদের মুহূর্তটুকু সময় লাগে। গজাননের সম্মানে তারা প্লেটে আক্রমণের স্পীড স্লো করে দিল ক্ষুধাক্রান্ত নববধূর মতন। এমন সময়ে কেতকী এসে খবর দিল 'ভুলি নাই' সাহিত্য সঙ্ঘের সদস্যরা দেখা করতে চায়।'

পুলক আদিত্য, দুর্গা চক্কোত্তি, মান্না হাজরা তাড়াতাড়ি লম্বা হাতে প্লেটগুলো সাফ করে করজোড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—'আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা আজই কাগজে 'ইনসারশন' দিয়ে দিচ্ছি।'

গজানন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কাগজে দিচ্ছ। তারা কি ছাপবে এ খবর?'

পুলক আদিত্য হাত নেড়ে বলল, 'ছাপবে না মানে। টাকা দিয়ে ছাপাবো। ইঞ্চি মেপে টাকা নেবে। ছাপবো না বললেই হ'ল। শুনুন তাহলে—'শহরে সাংস্কৃতিক জীবনের পুনর্জীবন লাভ। গজানন প্রগতি নাট্য সঙ্ঘের জন্ম।' ঠিক আছে তো স্যার?'

এ্যামেচার এক্টর হিরো কোঁচা আলুলায়িত দুর্গা চক্কোত্তি হাত নেড়ে নেড়ে বলল, 'আপনি এ বিষয়ে কি বলেন স্যার? সব ঠিক আছে তো? আজ থেকে সাত দিনের ভিতর 'ইনগুরেশন'। আর তিন সপ্তাহের ভিতর প্লে।'

আর্ট ডিরেক্টর মান্না হাজরা দন্ত বিকশিত করে বলল, 'আজ্ঞে যে রকম বলেন স্যার, হিস্টরিকাল, সোশ্যাল। ওপেন এয়ার। সব রেডি। সিনের জন্য এখন চাই শুধু ক্যানভাস, তুলি আর রঙ।'

সুড় সুড় করে হেলেদুলে থিয়েটার-জগতের কক্ষচ্যুত নক্ষত্র তিনটি গজাননের ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সদস্যরা এক এক করে পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করল। এরা একটু পাশ্চাত্য-ঘেঁষা সঙ্ঘ বলেই মনে হ'ল। প্যান্ট সার্ট আর টাই এদের ইউনিফর্ম। একজন আবার কোটও পরেছেন। মাথায় গগনচুম্বী ঝকঝকে টাকটি দেখে মনে হয় 'ভুলি নাই' সঙ্ঘের ইনিই সভাপতি।

গজানন গুড়ুক টানতে টানতে বলল, 'আসুন আসুন। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

গগনচুম্বী ঝকঝকে টাক দুলিয়ে ডেলিগেশনের লীডার বললেন, 'আজ্ঞে আমরা মহারাজা রঞ্জিৎ সিং রোড থেকে আসছি। আমার নাম ভোস, ইনি মিঃ মিটার, আমাদের সেক্রেটারী। ইনি মিঃ মুকার্জিয়া আমাদের ট্রেজারার। আমিই এদের সভাপতি। আমাদের সভার উদ্দেশ্য হলো সমাজ যে সব সাহিত্যিকদের ভুলে যেতে চলেছে শুধু তাদেরই জন্মবার্ষিকী,

মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে তাদের মৃত আত্মাদের জানানো যে, আমরা তাদের ভুলি নি।' 'ভুলি নি'—বলেই ডান হাতটা মুঠো করে এমন একটা হেঁচকা টান মারলেন যে, মনে হ'ল যেন একটা চলন্ত লোককে তিনি পিছনে টেনে আনলেন। 'তাই আমাদের নাম হ'ল 'ভুলি নাই'।

গজানন বলল, 'আপনিই তো এদের সভাপতি। আমাকে আবার কি করতে হবে?'

ভোস বললেন, 'আজ্ঞে আপনাকেই তো সব কিছু করতে হবে। সাহিত্যিকদের স্মরণে আমরা যে মহান যজ্ঞের আয়োজন করতে চলেছি তার অগ্নিরক্ষা করার ভার এই দিল্লী শহরে আর কে নিতে পারে?'

'অগ্নিরক্ষা' কথাটা গজানন ঠিক বুঝতে পারে নি। কেতকীর দিকে তাকালো। কেতকীর অত বিদ্যা নেই। সে বলল, 'বক্তৃতা দিতে হবে না তো? বড় ব্যস্ত আজকাল জানেন তো।'

ভোস বলল, 'না না না বক্তৃতা দেবার জন্য বহুলোক জোগাড় করেছি। তারা সবাই একশো করে চাঁদা দিতে রাজী হয়েছেন। এখন আমাদের চাই একজন চীফ গেস্ট। আগামী ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন। সেইদিনই আমরা এই সঙ্ঘের উদ্বোধন করব।

কেতকী বলল, 'আপনারা কি মনে করেন শরৎচন্দ্রকে এর ভিতরই সবাই ভুলে গেছে?'

—'না না ঠিক তা নয়। ভুলতে বসেছে। ভোলার আগেই গাঁথুনিটা পাকা করে দিলে আর ভুলবে না।'

কিছুদিন থেকে গজানন সাহিত্যচর্চা সুরু করেছে। এত লোকজন দিবাযামিনী এসে তাকে কেন্দ্র করে এত সাহিত্য আলোচনা করে যায় যে, গজাননের বদ্ধ ধারণা হয়েছে যে, শহরের সাহিত্যিকদের ভিতর সেও একজন। সে বলল, 'ঠিক বলেছেন। শরৎচন্দ্রের কথা বলছেন তো? এই আজ সকালেই আমি তার 'বিষবৃক্ষটা' পড়ছিলাম। লিখুক তো আপনার কি না কি নাম—'

কেতকী বলল, 'প্রবোধ সান্যাল, তারাশঙ্কর।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ওদের কথাই বলছি।'

মিটার একটু অবাক হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল। মুকার্জিয়া তাকে ইসারা দিয়ে বাধা দিল।

—'আপনাদের সেদিনের প্ল্যান কি?'

—'বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, স্বরচিত কবিতা পাঠ।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে গজানন বললেন, 'বাস?'

ট্রেজারার মুকার্জিয়া বললেন, 'আজ্ঞে যাঁরা একশো টাকা চাঁদা দিয়েছেন তাঁরা বক্তৃতা দেবেন। পঞ্চাশ টাকায় প্রবন্ধ পাঠ। আর পঁচিশ টাকায় স্বরচিত কবিতা পাঠ।'

গজানন বলল, 'নাচ গান নেই? জলযোগের আয়োজন নেই? আপনাদের এই সব প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা, কবিতা শুনতে কেউ আসবে বলে তো মনে হয় না। শুনুন মশাই, সভায় লোক আসা চাই। দিল্লীতে আপনারা যে সাহিত্যসভা ডাকেন, তাতে আমি দেখেছি লোক হয় পাঁচজন, সাতজন। ও রকম সভায় আমি চীফ গেস্ট হয়ে যেতে চাই না। সভায় অন্তত চেয়ার-টেবিল যেন খালি না থাকে। নাচ গান-জলযোগ যা যা প্রয়োজন কোনটা বাদ দেবেন না।'

কেতকীকে ইসারা দিতেই সে চেক বুকটা নিয়ে এলো। পাঁচশো টাকার একটা চেক কেটে গজানন বলল, 'টাকার জন্য যেন কোন পরোয়া করবেন না, 'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সাথে যখন জড়িত হচ্ছি তখন তার সম্মান মানে আমার ইজ্জৎ। এ যেন একটুও না ক্ষুণ্ণ হয়। হাতে সময়ও বেশি নেই। দেখবেন যেন সব ঠিক মতন হয়ে যায়।'

'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ হাত তুলে অভিবাদন করে উঠে দাঁড়ালো। কেতকী বিভ্রান্তভাবে তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে নিল, 'আজ্ঞে ওনাকে বক্তৃতা দিতে হবে না তো?'

তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠলো, 'না না না, কোনো চিন্তা নেই। নো স্পীচ।'

কেতকী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আজ্ঞে ঠিক বলেছেন। নো স্পীচ। তা ছাড়া ও'র অত সময় কোথায়?'

নৃপেন এতক্ষণ চুপটি করে বসে বসে সমস্ত ব্যাপারখানা হৃদয়ঙ্গম করছিল। সকলে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। কেতকী চোখ টিপে বলল, 'দেখছেন স্যার, কত কাজ?'

নৃপেন বলল, 'তাই তো এতক্ষণ দেখছিলাম। না না মশাই তা হবে না, গজাননের সাথে আপনারও একখানা ছবি পাঠিয়ে দেবেন। আমার কাগজের প্রথম সংখ্যাতেই এই সব কর্মবীরদের আমি ফোর ফ্রন্টে আনতে চাই। আচ্ছা আজ উঠি। আবার দেখা হবে।' নৃপেন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩।০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩।০।
মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৃত্র-সংহার কাব্য
দাম—দুই টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নজরুল ও আব্বাসউদ্দীন

আবদুল আজীজ আল-আমান

নজরুলের সঙ্গে আব্বাসউদ্দীনের সম্পর্ক কেবল মৌখিক হৃদ্য আলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তা' সুগভীর আন্তরিকতায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠানে একে-অপরকে দাওয়াৎ করতেন—যেন একে-অপরের আত্মীয়। অবশ্য নজরুলের আত্মীয় কে নন, কার সাথে তিনি অনাত্মীয়সুলভ ব্যবহার করেছেন—এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন।

আব্বাসউদ্দীনের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে। তিনি এসে কবিকে ধরলেন একটা নাম রাখার জন্যে। কবি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, এর নাম থাক 'মোস্তাফা কামাল'। এই নামকরণের ভিতরেও স্বাধীনতার স্পৃহা সুস্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, "কামাল আতাতুর্কের মত এই ছেলে যেন একদিন আমাদের পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে পারে।"

আব্বাসউদ্দীন কবিকে কাজীদা বলে ডাকতেন। প্রকৃতপক্ষে কবি আব্বাসউদ্দীনের দাদার ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। সময় সময় তিনি তাড়না-ভৎর্সনাও করতেন। আব্বাসউদ্দীন যখন রেকর্ড কোম্পানীতে যোগ দেন তখন কেষ্টবাবু (কানাকেষ্ট) অপরিসীম জনপ্রিয়তার অধিকারী। নব গায়কেরা অনেকেই কেষ্টবাবুর কণ্ঠের নকল করার চেষ্টা করতেন। এই অপচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিলেন আব্বাসউদ্দীন এবং নকলটা একেবারে নিখুঁত হ'য়েছিল। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে বসে কেষ্টবাবুর নকল গাইছিলেন আব্বাসউদ্দীন। উপস্থিত সকলেই এই নকল কানাকেষ্টকে পেয়ে মহাখুশি, এমন সময় কবি বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে। সেখানে বসে বসে তিনি সবটাই শুনেছিলেন, বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভৎর্সনা করলেন আব্বাস-উদ্দীনকে। তিনি বললেন, "নকলনবীসী হ'লে আব্বাসউদ্দীনকে কেউ চিনবে না, বরং সকলের কাছে সে হেয়র পাত্র হ'বে। অরিজিন্যালিটি নষ্ট করা পাপ, দ্বিতীয়বার যেন এই পাপে লিপ্ত হ'তে না দেখি।" বলা বাহুল্য এ কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন আব্বাসউদ্দীন।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করার সুযোগ দিয়ে নজরুল যেমন সংগীত-জগতে প্রসিদ্ধ করে তুলেছিলেন আব্বাসউদ্দীনকে, তেমনি সঙ্গে-সাথে করে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন বাংলার জনগণের সঙ্গে। ২৩-৮-৩৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সংগীত-সংসদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে লিখিত একটি পত্রে নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। চিঠিটির বিশেষ অংশ এই:

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান আজিজুল হাকিমের মারফৎ আপনাদের প্রস্তাব-মত নিম্নলিখিত সর্তে আমরা ছয়জন আর্টিষ্ট নারায়ণগঞ্জ যাইতে রাজী হইয়াছি।

প্রথম সর্ত:—আপনি আমাদিগকে ১২০০৲ টাকা (বার শত টাকা) দিবেন। ঐ টাকায় আমরা নারায়ণগঞ্জে আগামী ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি গান করিব।......

...আমরা নিম্নলিখিত ছয়জন আর্টিষ্ট যাইব:—

১। অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ২। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস ৩। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ৪। আব্বাসউদ্দীন আহমদ ৫। শ্রীরাসবিহারী শীল (সঙ্গতিয়) ৬। কাজী নজরুল ইসলাম।

আপনার পত্র ও সম্মতি পাইলে আপনার লিখিত-মত চুক্তি-পত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব। ইতি—

বিনীত
নজরুল ইসলাম।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সিরাজগঞ্জ যুব-সম্মেলন'। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক এম, সিরাজুল হককে লিখিত একটি পত্রে আব্বাস-উদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথার উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় রাষ্ট্রক্ষেত্রে নজরুল যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, সংগীতক্ষেত্রে সুরের দোলায় আব্বাসউদ্দীনও তেমনি বাংলার হৃদয় লুট করে নিয়েছিলেন, আর সে সময় আদর্শ জন-নেতা হিসেবে প্রসিদ্ধ হ'য়েছিলেন শিরাজী সাহেব। এমন দিনে কবি প্রায়ই গভীর আবেগের সাথে বলতেন, "শিরাজী, আব্বাসউদ্দীন আর আমি—একত্রিত হ'লে বাংলা দেশ জয় করতে পারি।" কথাটি এতটুকুও মিথ্যা নয়। এম্, সিরাজুল হককে লিখিত চিঠিখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আকারেও দীর্ঘ নয়। তাই চিঠির সবটুকুই এখানে তুলে দিলাম:

কলিকাতা
২. নভেম্বর ১৯৩২

"জনাব সম্পাদক সাহেব,

তস্লিম! আপনাদের নেতা আসাদ-উদ্দৌলা শিরাজীর মারফৎ আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাংলাদেশ আমার বিরুদ্ধে, সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস!

'ধূমকেতু'র সারথীরূপে নয়—যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিশান-বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদী অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া ও তা' হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্য পথ ধরে যাত্রা করুন। কোনো বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হ'বে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হ'তে মুক্ত হোক। মুক্ত-প্রাণে, মুক্ত-বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেই দিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জন কয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন, এ জন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারদিকে বিভীষিকা—অনাদর অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে—তবুও পিছপা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন

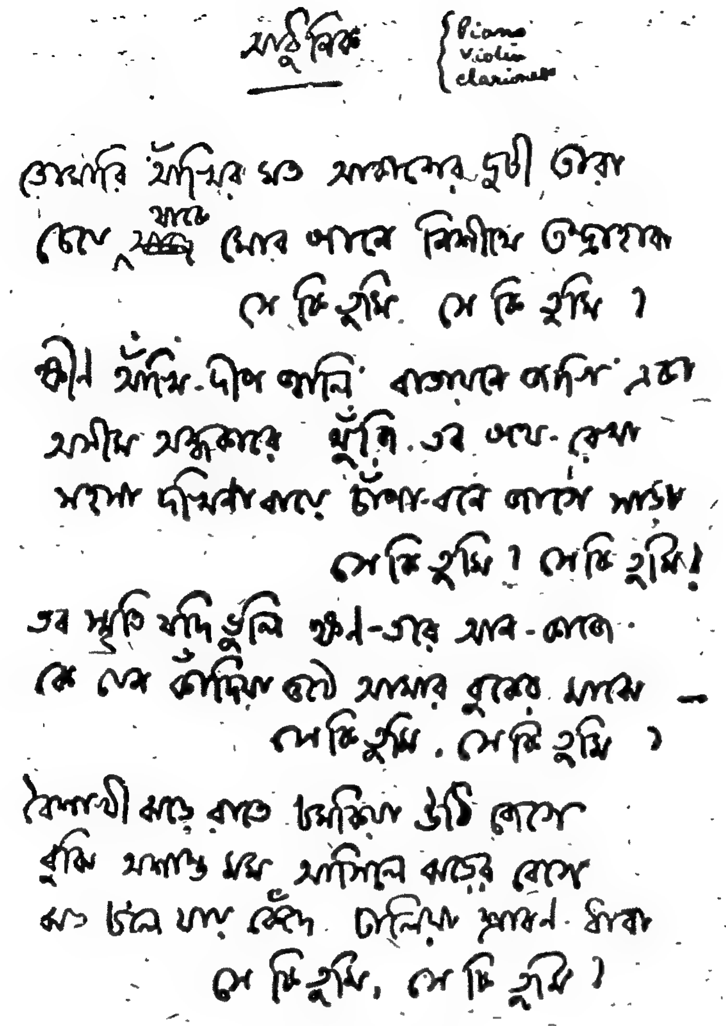

নজরুলের গানের পাণ্ডুলিপি

সমাজ দেবেই। গায়ক আব্বাসউদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাল্লাহ ৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার-ষ্টেশনে পৌঁছাব।"

নজরুল তাঁর জীবনে যতগুলি কন্ফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এই সম্মেলনটি ছিল নিঃসন্দেহে অন্যতম। কবি এবং আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সৈয়দ আসাদ-উদ্দৌলা শিরাজী সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন। ৫ই নভেম্বরের ভোরে তাঁরা পৌঁছুলেন সিরাজগঞ্জ ষ্টেশনে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। অথচ সেই শীতকে উপেক্ষা করে সাত-আট হাজারের এক বিরাট জনতা কবিকে স্বাগত জানাবার জন্যে নীরবে অপেক্ষমাণ। খদ্দরের পাজামা, খদ্দরের শেরোয়ানী, খদ্দরের টুপি আর খদ্দরের উত্তরীয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেহে অপূর্ব সাজ। কবি নামলেন গাড়ি থেকে। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। পুরনারীগণ চন্দন-পুষ্প নিয়ে পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। গাড়ি সামান্য একটু পথ গিয়ে থেমে যায়। চন্দনের ফোঁটা আর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হয় দু'দিক থেকে। এমনি করে সারা শহর ঘুরিয়ে তাঁদের যখন মোক্তার আফজল আলী-খাঁ সাহেবের বাসায় নিয়ে আসা হ'ল তখন দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। দুপুর একটার সময় আব্বাসউদ্দীনের উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। বিশাল জনতা। সারা শহর বুঝি ভেঙে পড়েছে। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। আব্বাসউদ্দীন সুরের যাদু দিয়ে জনতার হৃদয় দুলিয়ে দিলেন আর সেই হৃদয়ে আগুন জ্বালালেন নজরুল। তাঁর বাণীতে সেদিন বুঝি আগুন ঝরেছিল। নিখিল বাংলার তরুণদের ডাক দিলেন, বিপদ বাধা দ'লে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। লক্ষ্য তাঁর বন্ধনমুক্তির, স্বাধীনতার। সেদিন বিশাল জনতার সম্মুখে নজরুল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, আমার মনে হয় সেটি ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ। এই একটি মাত্র অভিভাষণে নজরুলের সমগ্র জীবনাদর্শ বিধৃত হ'য়ে আছে। আজকের দিনেও এই মূল্যবান সুদীর্ঘ অভিভাষণটির সামান্য অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিলাম :

…আমি কবি। বনের পাখীর মত স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই।…আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের—তরুণদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি। যৌবন-সূর্য যেথায় অস্তমিত দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত' লীলাভূমি।…খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশত বেহেশতী চীজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব। ইহাই হউক তরুণের সাধনা। আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামী, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যদ্দর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেনো জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমীর আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠ মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইঁহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট

করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইঁহাদের ক্ষমা করা যায়। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই "গল-মল শাহ্ ফকীর, মগজমে ইট।" ইঁহাদের নীতি "মুর্দা দোজখ মে যায় যা বেহেশ্‌ত মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি সে কাম।" ইঁহাদের ফতুয়াভরা ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া ত' ইঁহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত' সে তরুণ। ...আমাদের পথে মোল্লারা যদি হ'ন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের তুষারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।...এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নীদের উদ্ধার -সাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখী দুধ ছোলা খাইতে শিখিয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে সেও উড়িতে পারে। এই পিঞ্জিরের পাখীর দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীন-বীর্য সন্তানের জন্ম।...পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী—কি কণ্ঠ-সংগীতে, কি যন্ত্র-সংগীতে—তাঁহাদের প্রায় সবলই মুসলমান।...সংগীত-শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়। আজ বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সংগীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমগ্র শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে।...পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিয়াছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়—শ্রেষ্ঠ।"...

নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে গভীর ভাবেই ভালবাসতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ক্লাসিকাল গান না শিখলে কণ্ঠ-শিল্পে ঐশ্বর্যবান হওয়া যায় না। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে যে সুরের বুলবুলি ঘুমিয়ে আছে—ক্লাসিকালের দৌলতে তা' পাখা মেলে দূর নভোলোকের শাশ্বত সৌন্দর্যপথে উড়ে যাবে।" সে জন্যে তিনি H. M. V-র ট্রেনার ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে আব্বাসউদ্দীনের তালিম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া ইত্যাদি কমবেশি সকলেই ওস্তাদ জমির-উদ্দীনের মন্ত্রশিষ্যা।

নজরুলের কিছু কিছু গানে সুর-যোজনা করেছিলেন আব্বাসউদ্দীন। তুরস্ক থেকে কলকাতায় এসেছেন নারী-জাগরণের অগ্রপথিক মাদাম খালিদা এদিব হানুম। কারমাইকেল হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন। কবির ওপর পড়েছে উদ্বোধনী সংগীত রচনার ভার। কবি লিখলেন:

> রূপে গরিমায় আমাদের নারী
> আদর্শ দুনিয়ায়,
> রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রী-তে
> হুর পরী লাজ পায়।
> ...লক্ষ খালেদা আসিবে যদি
> এ নারীরা মুক্তি পায়।

সঙ্গে সঙ্গে সুরযোজনা করে গাইলেন আব্বাসউদ্দীন। অবশ্য পরে এটি রেকর্ড করা হয়েছিল।

এমনি ভাবে বহু সমসাময়িক প্রয়োজনে রচিত গানে সুর দিয়েছিলেন আব্বাসউদ্দীন এবং সেগুলি গেয়ে প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গে বন্যার তাণ্ডবলীলা সুরু হয়েছে। কবি রচনা করলেন 'ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী'। একদল গায়কের সাথে হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরুলেন আব্বাসউদ্দীন। হাজার হাজার টাকা ও গাড়ি গাড়ি বস্ত্র এনে জমা দিলেন ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ডে।

ঢাকায় সুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। চারিদিকে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি। দেশের মানুষ বুঝি শুভবুদ্ধি হারিয়ে পশুতে পরিণত হ'তে চাইছে। ব্যথিত হলেন নজরুল। দাঙ্গার পরি-প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিমের হাতে মিলনের রাখি পরাবার জন্যে কবি লিখলেন দুটি

● গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে (১৯৩৭ সালে) কাজী নজরুল ইসলামকে প্রখ্যাত সুরকার শ্রীকমল দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনারত দেখা যাচ্ছে।

(ফিরোজা বেগমের সৌজন্যে)

গান: 'ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু মুসলমান', 'হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।' মৃণালকান্তি ঘোষ আর আব্বাসউদ্দীনের মিলিত কণ্ঠে গান দু'খানির রেকর্ড করা হল।

পল্লীগীতি এবং ইসলামী সংগীতে আব্বাসউদ্দীন যথেষ্ট নাম করেছিলেন—কিন্তু কোনো স্বদেশীগানে তখনো পর্যন্ত তিনি কণ্ঠ দেন নি। এটি লক্ষ্য করলেন নজরুল। স্বদেশীগান গাওয়ার জন্যে তিনি আব্বাসউদ্দীনকে বললেন। কেবল বলা নয়—দুটি স্বদেশীগানও রচনা করে দিলেন। নজরুলের বহুতর প্রথম শ্রেণীর স্বদেশী গানের মত এ গান দুটির বাণী ছিল অপূর্ব ভাব এবং কথা, কথা এবং ভাব এক অদ্বৈত সম্পর্কে বিজড়িত হয়েছিল। প্রথম গানটির কথা 'ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগে' আর দ্বিতীয় গানটি ছিল 'নম নম নম বাংলা দেশ মম চির মনোহর চির মধুর।'

নজরুল এবং আব্বাসউদ্দীন একে অপরের সাথে বহুতর আবেগময় মুহূর্ত কাটিয়েছেন। একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করারও সুযোগ পেয়েছেন। ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে নজরুলের অন্তরলোকের দিকে দৃষ্টি ফেলে অবাক্ হয়ে গেছেন আব্বাসউদ্দীন, কী মহৎ হৃদয়! কী মহৎ প্রাণ!! কোথাও কোনো গ্লানি নেই, কোথাও কোনো মালিন্য নেই—বিশাল অন্তরপ্রদেশ চির আলোকময়, চির-জ্যোতির্ময়। হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা নিয়ে বহুবার কথা হয়েছে উভয়ের মাঝে, প্রতিবারই কবির চোখ সজল হয়ে উঠেছে, দেশের হ'ল কী—মানুষ কী সব পাগল হয়ে গেল?

নজরুল ছিলেন হিংসা-দ্বেষের অতীত। ও দু'টি জিনিষ কখনো তাঁকে স্পর্শ করে নি। অসূয়া বলে জিনিষটি তিনি জানতেন না। বহুভাবে বহুক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করেছেন আব্বাসউদ্দীন। কবি যে খাতায় সংগীত রচনা করতেন সেটি অধিকাংশ সময় গ্রামোফোন কোম্পানীতে ফেলে রেখে আসতেন। আব্বাসউদ্দীন বহু সময় লক্ষ্য করেছেন বহু সংগীত রচয়িতারা সেই খাতার সদ্যরচিত কোনো কোনো গানের পংক্তিকে সামান্য কিছু অদল-বদল করে তাঁদের গানে সংযুক্ত করছেন। কবিকে এ কথা জানাতেই একটু হেসে অবহেলা করে উত্তর দিয়েছেন, 'কত নেবে—নিক না। কলসী করে জল নিলে কলসী ভাঙতে পারে—সাগর শুকোবে না।'

বেহিসেবী নজরুলের একটি চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন আব্বাসউদ্দীন। কবির ঘরেই বসে আছেন উভয়ে। একজন হকার কাপড়ের মোট কাঁধে করে হেঁকে চলেছে। কবি ডাকলেন তাকে এবং কোনো দরদস্তুর না করে ছেলেদের জন্য কয়েকগজ সিল্কের কাপড় কিনলেন। তিন দিন পর উভয়ে আবার মিলিত হয়ে গল্প করছেন—সেই চীনাম্যান হকারটি কাপড়ের বোঝা কাঁধে করে আবার হাঁকতে হাঁকতে চলেছে। আজও তাকে ডাকা হ'ল এবং কিছু কাপড় কেনা হ'ল। চীনাম্যান যা দাম চাইল তাই দিয়ে দিলেন কবি। আব্বাসউদ্দীন সংসারী এবং হিসেবী মানুষ। তিনি লক্ষ্য করলেন একই কাপড়, মাত্র এই তিন দিনের ব্যবধানে মূল্যের দিক থেকে দেড়গুণ হ'য়েছে। কবিকে কথাটা জানাতেই তিনি বললেন, 'আরে কাপড়ের পাহাড় কাঁধে করে ঘুরছে, গরীব মানুষ—নেবে না দু'টো পয়সা'।

এই-ই নজরুল। বেহিসেবী, উদার, উজ্জ্বল।

অনেক সংগীতের জন্মক্ষণের সাক্ষী আব্বাসউদ্দীন। অতি নিকট থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন কেমনভাবে এক-একটি সংগীত জন্ম নিচ্ছে কবির তুলিতে। একটি উৎকৃষ্ট আধুনিক গানের জন্মেতিহাসের যে কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন তিনি, সেটি উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানবো।

একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে আব্বাসউদ্দীন এবং তৎকালীন অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা গাইয়ের দল বসে খোশ-গল্পে মেতে উঠেছিলেন। এমন সময় কাজী-কবি প্রশ্ন করলেন, 'লটারীতে যদি সবাই লাখখানেক করে টাকা পেয়ে যাও তবে তোমরা তোমাদের প্রিয়াকে কে কী ভাবে সাজাতে চাও' কলরব ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হ'ল। একটু পরেই মতামত বর্ষাতে লাগল অবিরল ধারায়। কেউ বললেন 'আমি এখনই চলে যাব 'ওয়াসেল মোল্লা'স,' কেউ বললেন 'কমলালয় ষ্টোর্সে', কেউ বললেন 'প্রিয়াকে নিয়ে চলে যাব এম বি সরকারে—জড়োয়া গহনার অঙ্গ ঢাকিয়ে দেব,' নানাজনের নানা কথা আর মন্তব্যের শিলাবৃষ্টি থামিয়ে কবি এগিয়ে এলেন। হারমোনিয়াম নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল তাঁর প্রিয়াকে সাজানোর কাজ।

বলা বাহুল্য গগনচারী উদ্দাম কল্পনার সাহায্যেই তিনি বিনাপয়সায় সাজালেন তাঁর অনন্ত প্রিয়াকে। সৃষ্টি হ'ল বাংলার আধুনিক সংগীতের একটি নিত্যকালীন সম্পদ:

মোর প্রিয়া হ'বে এসো রাণী
দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল॥
কণ্ঠে তোমার পরাবো বালিকা
হংস-সারির দোলান মালিকা
বিজলী জরির ফিতায় বাঁধিব
মেঘ-রং এলো চুল॥

জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে
মাখাব তোমার গায়,
রামধনু হ'তে লাল রং ছানি
আলতা পরাব পায়।
আমার গানের সাতসুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব যে প্রিয়া
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে
আমার কবিতার বুলবুল॥

এই দুই মহান শিল্পী আজ নীরব। সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর, বুধবার, সকাল ৭-২০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। নজরুল আজ থেকেও নেই। আর আমরা কোনো দিনই এই দুই মহৎ সংগীত-শিল্পীর কণ্ঠে নতুনতর কিছু শুনতে পাব না। এ ক্ষতি-ক্ষয় অপূরণীয়।

ধনুর্বেদ
(কোদণ্ড-মণ্ডনম্)
মূল্য আট আনা

অহল্যা উপাখ্যান ১৲

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বর্ষাকালের ঘর

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুকুরের পাড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ, আমগাছ, জামগাছ এবং কয়েতবেলের ছায়া বর্ষার জলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করেছে। বর্ষাকাল বলে পুকুরপাড় প্রায় ডুবো ডুবো। এবং কাচের মত জলের রঙ। কিছু রক্তশাপলার ফুল ইতস্তত ফুটে আছে। কিন্তু পেতি শাপলার সাদা ফুল জলের ঘন গভীর থেকে উঠে [illegible] সূর্য দেখছিল। দূরে, দূরে এখন শুধু জল, শুধু সবুজ পাটের জমি এবং ধান খেত। এখন খাল ধরে নৌকা যাচ্ছে, ধানের নৌকা পাটের নৌকা। ওরা বাবুরহাটে যাবে। কাপড়ের নৌকা অথবা গয়নার নৌকা গেল নদী ধরে। এবং সোনালী বালির নদীতে বাদাম তুলে এই অঞ্চলের সকল পুরুষ, রমণীরা যেন উদাস। তখন ছোটকর্তা ছোট কোর্ষার ঘরে ফিরছেন। বর্ষার জলে তিনি পুবপাড়া পশ্চিমপাড়া যাবার পথে বেত ঝোপের ভিতর কিছু দামের নীচে ছোট-বড় চাই পেতে রাখেন সন্ধ্যায়। রাতে কিছু মাছ পড়ে। ভোর হলে এক-কোমর কিংবা বুকজল থেকে সেই সব 'চাই' সংগ্রহ করে ঘরে ফেরেন। তিনি জালপার দিয়ে নৌকা পুকুরের ভিতর ঢুকিয়ে ডাকলেন, ঈসম, ঈসম রে ডুলাটা লৈয়া আয়।

তেঁতুল গাছের অনেকগুলো শেকড় বের হয়ে আছে। বর্ষার জলে মাটি ক্ষয় পেয়ে এমত হয়েছে। শেকড়গুলো চিংড়ীমাছের ঠ্যাঙ-এর মত যেন। তেঁতুল গাছটা যেন হাঁটছে। ছোটকর্তা নৌকার শিকলটা গাছটার ও-পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে তালা মেরে দিলেন। কোর্ষা নৌকা বলে গলুইতে মাছগুলো লাফাতে পারছিল না, চিৎ হয়ে পড়েছিল। ট্যাঙরা মাছের পেটে ডিম। ছোটকর্তা মাছগুলোকে একত্র করছেন। এখন ঈসম আসছে না, ঈসম করছে কি। তিনি ডেকে বললেন, কিরে কৈ গ্যালি।

কিন্তু হাতে ডুলা নিয়ে এল পল্টু। পল্টু বড়কর্তার ছেলে। গায়ের রঙ কাল, বাপের চেহারা পায় নি। মা'র চেহারা সমস্ত অবয়বে। দীর্ঘ পুরুষ বড়কর্তা, এক অতীব সবুজ স্বচ্ছতায় এবং শীতের সময় গৌরবর্ণ। ছোটকর্তা মুখ তুলে পল্টুকে দেখল এবং এমন সব ভাবতে গিয়ে বলল, ঈসম কৈ রে।

পল্টু লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে বলল, ঈসমদা গরুর লাইগ্যা কচড়ী

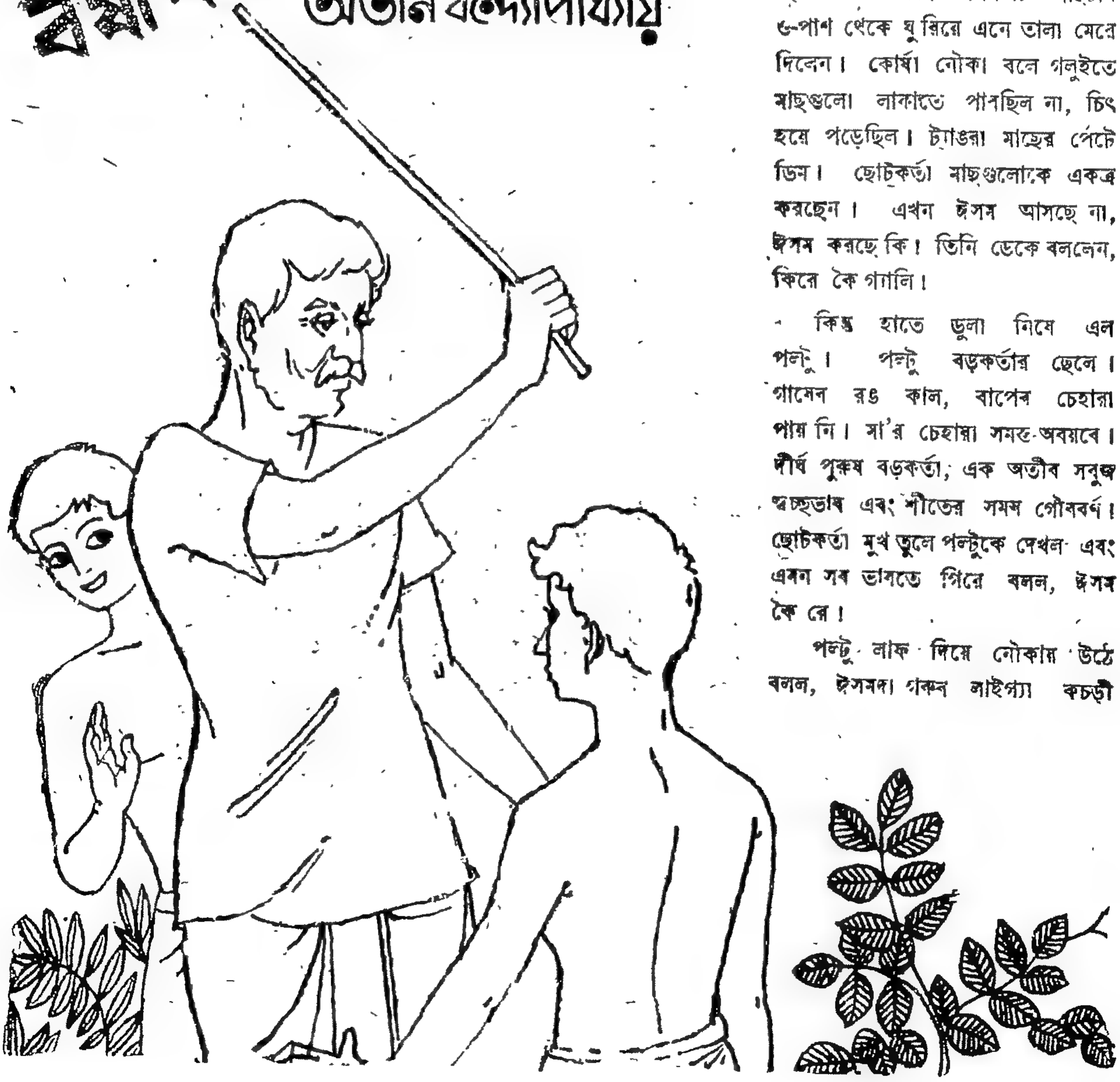

কাটিতে গ্যাছে। সে তারপর পাটাতন তুলে মাছগুলো দেখল। কয়েকটা মাছ মরে গেছে বলে পচা গন্ধ উঠছে। অন্য তাজা মাছগুলো লাফাচ্ছিল। ছোটকর্তা জল সিঁচতে থাকলেন। পল্টু একটা একটা করে সব মাছগুলো তুলছে। জামরুলগাছে ফুল এবং ফল দুই ঝুলছে, গাছে গাছে এখন রোদ—জামের শুকনো বীচি গাছতলায় পচে সোঁদা গন্ধ উঠছে। কাছে কোথাও পিটকিলা গাছের ফল জলে টুপটাপ ঝরছে। ডুলাতে মাছ তোলার সময় এ-সব শব্দও শুনতে পেল পল্টু। তাছাড়া দুটো শোলমাছ পুকুরে পোনা ছেড়েছে। সে মাছ তোলার সময় কাকাকে এ-খবরটাও দিল। শোলের পোনাগুলো সুভাষের বাবা ধরতে এসেছিল, বুড়ো ঠাকরুণ বারণ করাতে ধরতে পারে নি, সে এমত কিছু খবরও দিল। সে বলল; ক.কা, ধরবেন নি পোনাগুলি? অনেকগুলি হৈব—কি লাল। ঈসমদা একটা জালি বানাইছে।

—না, থাকুক। মাছগুলি বড় হৈব।

—জানেন কাকা, জানপার দিয়া দুইবার বাইর হৈয়া যাইতাছিল, আমি আর লাল্টু হৈ হৈ কৈরা আটকাইছি। শৈল, দুইটা কত বড় কাকা! ধরমু শৈলমাছটা রে?

—পারবি ধরতে?

—হ পারমু। দুইটা পয়সা দিবেন ছোটকা। সুভাষের বাবার থাইকা একটা বঁড়শী কিনা আনমু।

পল্টু এ-সময় ডুলা নিয়ে উপরে উঠল। মাটি নরম—বালিমাটি, দুদিন ধরে বৃষ্টি নেই সুতরাং পরিচ্ছন্ন আকাশ, জল বাড়ছে, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল। স্ফটিকস্বচ্ছ জলে গ্রামগুলো দ্বীপ সেজে পাল তুলে দিয়েছে যেন বর্ষার দিনে। পল্টু হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির ভিতর চলে এল। ধনকাকী ডুলা ধরে ঝাঁকি দিলেন এবং এক ঝোল হয়ে যাবে এমত ভেবে তিনি বাঁশতলার ঘাটে বাসন মাজতে বসে দূরে বাবলাগাছের সবুজ পাতার ফাঁকে কেড়ায়া নৌকা দেখে, লগি উঠতে নামতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন—যদি ধনকর্তা আসে, যদি মুড়াপাড়া থেকে সোনা ভাদুরঠাকুর আসেন অথবা যদি কোন আত্মীয়-কুটুম, এইত সময় যাচ্ছে—আত্মীয় আসবে, কুটুম আসবে, ঘরে ঘরে কুটুম ভরে থাকবে এবং এই বর্ষাকালে---আহা সে বাপের বাড়ি যাবে। সোনাকে নিয়ে লাল্টুকে নিয়ে এবারও সে ঘুরে আসবে। ধনকর্তা বাড়ি এলেই এমন একটা প্রস্তাব করবে। ধনবৌ ঘাটে বসে নানা রঙের ছবি এঁকে মশগুল হচ্ছিল। তখন পল্টু বলল, ধনকাকীমা আমারে ইট্টুখানি রেশমী সুতা দিবেন?

—ক্যান রে? কি হৈব?

—শৈলমাছ ধরমু।

—তর ধনকাকায় বকব না!

অথচ পল্টুর শুকনো মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠতেই বলে উঠলেন, যা নেগা। ছোট বাক্সর ডালিতে আছে। দ্যাখবি তর কাকায় য্যান টের না পায়।

—আইচ্ছা। পল্টু চলে গেল। পূবের ঘরে ঢুকে হুইলের সুতা নিয়ে মোটা একটা ছিপে বেঁধে দিল। তারপর লাল্টুকে নিয়ে বোয়াগাছের নীচে কচুর ঝোপের জল থেকে দুটো বড় রাগামাছ ধরে বড় বঁড়শীতে গেঁথে পোনার ঝাঁকের ভিতর টুপ করে ফেলে দিল।

রাগামাছের পিঠের শিরদাঁড়াতে বঁড়শীটা গেঁথে আছে। যেখানে পোনামাছগুলো চড় চড় করছে সেখানেই সে মাছটাকে তুলে ফেলে ফেলে বঁড়শীটাকে নাচাচ্ছে। পোনামাছগুলো তখন ভয়ে ডুবছিল, ভাসছিল। ওরা শোলমাছ দুটোকে দেখতে পাচ্ছে না। আশে-পাশে শালুকলতা এবং ফুল, জলের পাশে দিটকির ঝোপ। সেই ঝোপের ভিতর ঝাঁকটা ঢুকে গেলে বড় শোলমাছটাকে আর ধরা যাবে না। সুতরাং ওরা যতক্ষণ পারল ঝোপটা থেকে ওদের দূরে রাখবার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকল এবং কখনও কখনও ভয় পর্যন্ত দেখাতে ছাড়ল না।

লাল্টু বলল, ঠাকুরভাই, মাছটা খুব চালাকী দ্যাখাইতাছে। ভাবছে, আমরা ধরতে পারমু না। অ রে মাছ, বেশি চালাকী দ্যাখাইয় না।

—অ রে মাছ, তোমারে ধরতে পারলে কুটি কুটি কৈরা খামু।

লাল্টু বলল, আমারে দিবি ঠাকুরভাই? তুইত পারবি না. দ্যা আমি ধরি।

—থাক হৈছে মাতব্বরি দ্যাখাইতে হৈব না।

এবং পল্টু দীর্ঘসময় ধরে পাড়ে পাড়ে হাঁটল। দুবার ওরা মাছ দুটোকে দেখেছে। অথচ তারপর কোথায় যে গেল অথবা পোনার ঝাঁকের সঙ্গে ভাসছে না এবং এখন একটা ঢোঁড়া সাপ পুকুরের মাঝখানে সাঁতার কাটছে। কিছু বর্ষার ফড়িং জলের উপর উড়ে উড়ে শাপলা ফুলের উপর বসল। লাল্টু এইসব দেখে বলল, মাছটা ভয় পাইছে ঠাকুরভাই।

—হ পাইছে। কথা কৈস না। চুপ কর।

ওরা উভয়ে পোনার ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। খুব সন্তর্পণে ওরা হাঁটছে। কোন শব্দ করছে না। পা টিপে টিপে হেঁটে যাচ্ছে।

লাল্টু বলল, দ্যাখবি জানপার দিয়া পোনার ঝাঁকটা বাইর হৈয়া যাইব।

—কথা কৈস না কইতাছি। বলে পল্টু ছিপটা দিয়ে একটা বড় রকমের বাড়ি মারতে উদ্যত হল লাল্টুকে।

লাল্টু সংকুচিত হয়ে দূরে সরে বলল, তর ছিপে মাছ উঠতে বৈয়া রৈছে। তুইত ভোটারে। তর ছিপে মাছ উঠব না, উঠব না।

—দ্যাখা (কালা) তরে দ্যাখাইতাছি। বলে ছিপ ফেলে লাল্টুকে ধরবার জন্য ছুটল। কিন্তু যখন নাগাল পেল না তখন তেঁতুলের গুঁড়িতে বসে

নজরুল ইসলাম

বাণী রায়

হে প্রেমিক, শান্তধারা মত্ত করবার
আগুনের বীণা ছিল হাতেতে তোমার ;
প্রতি রন্ধ্রে জ্বলে শিখা,
জ্বলে দাবানল,
সে অনল, হে বিদ্রোহী, হ'ল কি বিফল ?
আজ মত্ত ধরাবুকে শান্তির পিপাসা,
আর তো আগুন নয়, দাও ভালবাসা।

কামনার কালধূপে আরতিমশাল
হাতে হাতে জ্বেলে গেলে কোন একদিন ;
কিশোরীর চিত্ততলে বাজে যেই বীণ,
—আগুনে গড়া তো নয়, প্রেমে সুরক্ষিণ।

হে প্রেমের দক্ষশিল্পী, বালুচর পারে
শোন বাজে ক্ষুব্ধ ধ্বনি ভীত কপোতীর ;
সাথী খুঁজে পাখা ফেলে
খোঁজে নীলাকাশ,
ডানা মেলে চখাচখী কাঁদে বারমাস।

পাও নি যাকেই কবি, বেসেছ কি ভাল ?
বাগিচায় তাই ওঠে বিরহের সুর,
'কোথায় আমার সাথী প্রেমের বাউল,
যার গানে একদিন গায় বুলবুল।'
আজ তুমি আছ কাছে—তবু কত দূর !
যৌবনের কবি আজ গানেও সুদূর।

পুকুরঘাটে বেলেমাছের অনুসন্ধান করতে থাকল। আর লাল্টু এই অবসরে পুকুরের অন্য পাড় ঘুরে, ছিপে শোলমাছটা ধরার ইচ্ছাতে ছিপ জল থেকে তুলতেই দেখল একটা শোলমাছ রাগামাছটা গিলে বঁড়শীতে আটকে গেছে। সে চীৎকার করে ডাকল, ঠাকুরভাই রে কত বড় মাছ। দৌড়াইয়া আয়। আমি একলা তুলতে পারতাছি না।

ভ্যাটা অথবা দ্যাম্দা এই কটূক্তি পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, কিন্তু যথার্থই যখন লাল্টু ছিপটা টেনে তুলতে পারছে না—বার বার মাছটা যখন জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন পল্টু বসে থাকতে পারল না। সে দৌড়ে গেল এবং দুজনে টেনে টেনে মাছটাকে এক সময় উপরে তুলে মাছটার দু-পাশে দুজন বসে হাঁপাতে থাকল।

—কত বড় মাছটা রে ঠাকুরভাই। লাল্টু মাছটার পেটে হাত বুলাতে থাকল। এতক্ষণ বুকের ভিতর যে অস্থিরতা কাজ করছিল—সব ধীরে ধীরে মুছে গেল।

পুকুরপাড়টা জলের উপর কচ্ছপের পিঠের মত জেগে আছে। পাশে অর্জুনগাছ, সেখানেও জল। চুকৈর গাছটা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। আর একটু বর্ষা হলে, একটু বন্যা হলে গাছটা ডুবে যাবে। এবং পল্টু তখন বঁড়শীটা মাছের মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর মাছটার ঘাড়টাকে দুহাতে চেপে ধরে কচ্ছপের পিঠের মত ভাসমান জমিটুকু ধরে হেঁটে যেতে থাকল।

লাল্টু পিছনে আসছিল। ওর হাতে ছিপ, সুতা গুটানো। সে বলল, আমি শৈলমাছটারে ধরছি না রে ঠাকুরভাই ?

—তুই ধরলি কি কৈরা ? বঁড়শীটা পাইতা রাখলাম আমি আর মাছটা ধরলি তুই। তুই না টানলে আমি টানতাম। মাছটাত আর উড়াল দিত না।

লাল্টু এই কথা শুনে খুব বিরক্ত। —দ্যাখ ঠাকুরভাই, মিছা কথা কৈস না। তুইত আমারে মারণের লাইগ্যা বঁড়শী ফালাইয়া ছুটলি।

—হ হ থাম। তাইন মাছ ধরছেন।

—ভ্যাটা মিছা কথা কৈবি না।

—দ্যাখ দ্যাম্দা, ষাড়, কাকারে কৈয়া তরে যদি আজকা মাইর না খাওয়াইছি তবে কৈলাম কি।

তখনই মাছটা দুহাতের ফাঁকে প্রচণ্ড রকমভাবে নড়ে উঠল। দু-ধারেই জল। একদিকে পুকুরের গভীর গর্ত, অন্যদিকে পাটের জমি এবং জল। কিছু জলো ঘাস, শাপলা ফুল, দাম। এই ঘন দামে জলের ভিতর মাছটা লাফ দিয়ে পড়ে গেল। পল্টু কেমন বিচলিত হয়ে লাল্টুর দিকে তাকাতেই দেখল সে ছিপ ফেলে জলের উপর লাফ দিয়ে পড়েছে এবং দামের ভিতর ডুবে ডুবে মাছটাকে খুঁজছে।

পল্টুর ভয়ানক কষ্ট হতে থাকল মাছটার জন্য। আফশোস। সেও নেমে গেল জলে। দুজন ডুবে ডুবে দাম এবং জলে ঘাসের আড়ালে আড়ালে মাছটাকে খুঁজতে থাকল। ওরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেল না। চোখ লাল হল। শীত করছে। ওরা তবু জলে হাঁটরাতে থাকল। বাড়িতে সুভাষের বাবা খবর দিচ্ছে তখন, দ্যাখেন গিয়া কর্তা আপনেগ লাল্টু পল্টু ক্যামন ডুবাইতাছে পাট খেতের পচা জলে।

ছোটকর্তা এসে পাড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এই তোমাগ মাছ ধরন। মরণের অসুখ কানে বানতাছ। বলে, তিনি সরু একটা বেত দিয়ে ভয়ানক-ভাবে মারধোর করলেন। ওরা যতবার বলতে গেল, মাছটা ছুইট্টা গ্যাছ ছোটকা—ততবার মিথ্যা কথার দায়ে আরও বেশি করে বেত্রাঘাতে নিমজ্জিত হল।

সুশীল রায়

অনল আয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অন্তিম স্ফুলিঙ্গ

কিছুদিন আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে কত ঘটনাই ঘটে গিয়েছে হুগলী-নদীর দুই পারে—সে খবর আমাদের রাখা হয় নি।

মাহেশের কিনার থেকে অন্তর্ধান করার পর রাধারাণীর জীবনে কি ঘটেছে সে খবরও আমরা রাখতে পারি নি। বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম আমরা, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে—শতাব্দীর ওপারে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনে এ সময়টা দীর্ঘ মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু একটি জাতির জীবনে এ সময় সামান্যই। মাত্র কয়েকটি বছর বাস করবার জন্যে আমরা আবির্ভূত হই কোনো জাতির মধ্যে ; অল্পদিনের মধ্যেই বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয় আমাদের। কিন্তু জাতির বিদায় নেই। ঐ নদীর স্রোতের মতই সে জীবিত থাকে। কখনো ফুলে ওঠে জোয়ারে, কখনো স্তিমিত হয়ে যায় ভাটায়।

বছর-দুই বাদে আমরা ফিরে এসেছি পুরাতন পরিবেশে। ফিরে এসে দেখছি, কোনো দিকেই কোনো পরিবর্তন নেই। দু বছর আগেও এই শহর-কলকাতা যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে।

রামমোহন-গৃহে অধিবেশন বসছে আত্মীয়সভার। কিন্তু সভার সদস্য-সংখ্যা একটু বুঝি কমেছে। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসে মিলিত হতেন তাঁদের অনেকেই আজ অনুপস্থিত। ব্যক্তিত্ব এক জিনিষ, আর অভিমত অন্য।

কিন্তু লোকবল কমলেই মনোবল কমবে কেন। বরঞ্চ, এতে মনের শক্তি বেড়ে যাওয়ারই কথা। যখন সহায় ও সম্বলের ওপর ভরসা রাখা যায় না, তখন নিজের ওপরই পূর্ণ ভরসা রাখা ছাড়া গতি কি।

সেই ভরসায় ভর করেছেন রামমোহন। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা বর্জন করেছেন রামমোহনকে। কোনো রূপ পরিবর্তন বা কোনো সংস্কার পছন্দ করেন না যাঁরা, তাঁরা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন রামমোহনের। এই বিরোধিতার সম্মুখে তিনি দ্বিগুণ বলিষ্ঠ মনে দণ্ডায়মান।

পুরাতন পরিবেশে ফিরে এসে এই পরিবর্তনটুকু আপাতত আমাদের চোখে পড়ছে। চোখে পড়ছে, বেদান্তের কলম সরিয়ে রেখে সতীদাহের কলম নিয়ে তিনি নিজের অভিমত প্রকাশে রত হয়েছেন। তাঁর মাতার কাছে তিনি যে শপথ করেছেন, সে শপথ পালনের জন্যে এইবার বুঝি প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন তিনি।

অন্নদাপ্রসাদ বসেছিলেন চুপ করে, এতক্ষণে বললেন, নিরুপম ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্কমোহন ভট্টাচার্য ও ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এঁদের হয়তো আপনি চিনবেন না—চতুষ্পাঠী আছে এঁদের। আমার কাছে গিয়েছিলেন পরশু।

রামমোহন বললেন, তাঁরা আসুন-না, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আরাম পাব না হয়তো, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য জানা যাবে।

—বক্তব্য আর কি ? আপনি গর্হিত অন্যায় কাজ করছেন, তাঁদের বিশ্বাস এই রকম।

একটু হেসে রামমোহন বললেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের চেয়ে বড় পণ্ডিত নিশ্চয় তাঁরা নন। বিদ্যালংকারমশায়ও তো আমার মতে বিস্তর ত্রুটি করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিচার তো হয়ে গিয়েছে। এঁরা কি বলতে চান ?

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, এঁরা প্রবর্তক। সামাজিকপ্রথার কোনো পরিবর্তন এঁরা মানতে রাজি না।

রামমোহন পুনরায় হাসলেন, বললেন, পরিবর্তন হলে সমাজ বুঝি অধঃপাতে যাবে ? অসহায় নারীদের পুড়িয়ে মারলেই সমাজের মঙ্গল, এ ভুল কবে তাঁদের ভাঙবে অন্নদাবাবু ?

এর কি উত্তর দেবেন অন্নদাপ্রসাদ ? রামমোহনকে তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ়-প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ। তিনি যেন ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠছেন, ক্রমশ

বলিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। তাঁর মনের প্রতিজ্ঞার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে।

রামমোহনও বসেছিলেন, পরিপূর্ণ দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শাস্ত্রের নামে ব্যভিচার বন্ধ করতেই হবে অন্নদাবাবু।

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে নতুন সংবাদপত্রের—সমাচারদর্পণ। সম্পাদক, জন ক্লার্ক মার্শম্যান—জোশুয়া'স্ সান্ বলে। যে বালকটির পরিচয় দিয়েছিলেন কেরী সাহেব অনেকদিন আগে রামরাম বসুর কাছে, সেই বালক এখন যুবক হয়ে এই কাজের ভার নিয়েছে।

নানা সমাচার প্রকাশিত হচ্ছে সমাচারদর্পণে। সুখের সমাচার অনেক আছে, সেই সঙ্গে দুঃখের সমাচারও ছাপা হচ্ছে এতে—নদীর দুকূলে সহমরণের বার্তা।

ঐসব বার্তা পাঠ করেন রামমোহন, অমনি বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মন। ক্রমেই, তিনি লক্ষ্য করছেন, এই ধরণের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ইদানীং আরো যেন বেড়ে উঠেছে এই বীভৎসতা।

যতই বেড়ে উঠছে এই ঘটনার সংখ্যা, ততই বুঝি বল বৃদ্ধি হচ্ছে তাঁর। তাঁর যেন মনে হচ্ছে, প্রদীপ নেভবার আগে এ যেন বেশি করে জলে ওঠা।

গঙ্গার ওপার থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমাচারদর্পণ, আর গঙ্গার এপারে চোরবাগান থেকে গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করছেন বাঙ্গাল গেজেটি। তাঁর পুস্তক-ব্যবসায়ও চলেছে সমানে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্তসংবাদ বাছাই করতে-করতে গঙ্গাকিশোর তাঁর বন্ধু ও সহযোগী হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, বলছেন, মশা আর মাছির উৎপাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে হে, হরচন্দ্র। এ সম্বন্ধে একটু লেখা আবশ্যক। নালা-নর্দমায় জল জমে পচে উঠছে, এগুলি বন্ধ করা তো সম্ভব নয়, সাফ করার জন্যে অন্তত উদ্যোগী হতে হয় সকলকে।

হরচন্দ্র ছাপাখানার টাইপ সাজাচ্ছিলেন, বললেন, বন্ধ করা সম্ভব নয়-ই বা কেন। মারাঠা-খাল বন্ধ করে তার ওপরে চওড়া রাস্তা হয়ে গেল, আর এই সামান্য নালা বন্ধ হবে না?

—হয় তো হোক। লটারি-কমিটিকে তাহলে পরামর্শ দিয়ে কয়েক ছত্র লিখে দেওয়া যাক এই সংখ্যায়?

গঙ্গাকিশোর বুঝি অবশেষে সেই কাজেই মনোনিবেশ করলেন।

সমাচারদর্পণে ও বাঙ্গাল গেজেটিতে যুগপৎ সংবাদাদি পরিবেশিত হচ্ছে।

কিন্তু এ সংবাদ বুঝি সব সংবাদ নয়। চলমান গেজেটিরা ভোরে গঙ্গাস্নান সমাপন করে গৃহে-গৃহে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে যথানিয়মে। কিন্তু সে অন্যরকমের সংবাদ—দান ধ্যান বৃত্ত পাইনের সংবাদ। এ শহরে বদান্য ব্যক্তি কে, কে তার পুত্রের অন্নপ্রাশনে কত ব্যয় করেছে, কে তার পিতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণবিদায় করেছে কি ভাবে—তারই দীর্ঘ বিবরণ বিতরণ করতে-করতে গঙ্গা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন সিমুলিয়ার দিগম্বর ভট্টাচার্য।

হাতে তামার কোশাকুশি ও পিতলের ছোট ঘণ্টা। গঙ্গামৃত্তিকায় ললাট চর্চিত, পরিধানে সিক্ত পট্টবস্ত্র।

পোস্তার নিত্যানন্দ পালের বৈঠকখানায় ঢুকে বিনা ভূমিকায় তিনি বললেন, দানে-ধ্যানে তোমার জুড়ি পাওয়া ভার হে নিতাই। কিন্তু তোমার সে গৌরব বুঝি যায়। জোড়বাগানের যোগেন্দ্র বসাক আর জোড়াসাঁকোর কৃপানাথ শিকদার কী দানটাই করল পরশু—গোব্রাহ্মণে তাদের কী অচলা ভক্তি। পিতার শ্রাদ্ধ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটি করে পালঙ্ক, একজোড়া করে গরদের থান, পঞ্চাশটি করে মোহর।

নিতাই পাল স্তব্ধ হয়ে বসে শুনল বৃত্তান্ত। দানের বৃত্তান্তের যেন শেষ নেই, দিগম্বর বলে যেতেই লাগল।

একটু দম নিয়ে গলার স্বর একটু নামিয়ে সে বলল, আর ইয়ে, আহিরিটোলার অনুকূল পোদ্দার, আগে যেমন ছিল দানে মুক্তহস্ত, এখন তেমনি হয়েছে কঞ্জুস। ছি ছি।

টুংটুং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে বলল, তার পুত্র মারা গেল, পুত্রবধূ হল সতী। এত বড় শুভ-উৎসবে ব্রাহ্মণের যা পাওনা তা দিতে কত গড়িমসি। শেষ পর্যন্ত দিল অবশ্য।

আর কে-কে দানে খ্যাতিমান হয়ে উঠছে, আর কে-কে হয়ে উঠছে কৃপণের অধম, উঁচু আর নীচুগলায় তাদের নাম ও বংশপরিচয় দিয়ে বিদায় নিল দিগম্বর। যাবার সময় বলল, ওঁ, কল্যাণমস্তু, শতং জীব, শতায়ু ভব।

আশীর্বাদ করে পোস্তার রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে চলল দিগম্বর।

জোড়াসাঁকোর অনাদিনাথ পোদ্দারের গদিতে দাঁড়িয়ে ঐ একই বৃত্তান্ত দাখিল করল, তারপর দর্জিপাড়ার ইন্দুভূষণ মল্লিকের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দুভূষণকে বলল ঐ— একই কথা—প্রাতর্ভ্রমণ করে ইন্দুভূষণ তখন ফিরছিল।

গৃহে গৃহে সংবাদ বিতরণ করে দিগম্বর যখন প্রাতঃস্নান সেরে নিজগৃহে ফিরল রোদ তখন তেতে উঠেছে।

অচিরেই এই সংবাদ ছড়িয়ে যায় চারদিকে। এক মুখ থেকে অন্য কানে, সেখান থেকে অন্যত্র।

যাদের খ্যাতি এর দ্বারা বিপন্ন হয়ে ওঠে তারা নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে নিত্যানন্দ পাল হিসাব তলব করে। কোনখানে কবে ত্রুটি হয়েছে ব্রাহ্মণবিদায়ে খোঁজ করে তার। বলে, আপনাদের জন্যে মানমর্যাদা কিছু রাখা যাবে না, খাজাঞ্চিবাবু। সাশ্রয় করতে হয়তো অন্য কোনো বিষয়ে করুন, ব্রাহ্মণবিদায়ে সাশ্রয় করা—এর চেয়ে মহাপাতক আর নেই, খাজাঞ্চিবাবু।

খাজাঞ্চিবাবু মেনে নেন এই সতর্কবাণী। নীরবে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝি কবুল করেন তাঁর ত্রুটি এবং ভবিষ্যতে এ-রকম বেহিসাব আর হবে না ব'লে যেন প্রতিশ্রুতিই নেন।

মুখে-মুখে যে-সংবাদ রটে, লিখিত সংবাদের চেয়ে তার গুরুত্ব একটু বেশি বলেই মনে করে সকলে। এইজন্যে দিগম্বর ভট্টাচার্যদের তুষ্ট রাখার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না।

খ্যাতি বা অখ্যাতি নিয়ে যারা বিব্রত, তারা সহজেই ঐসব সংবাদে বিচলিত হয়, কিন্তু সুনাম-দুর্নাম গ্রাহ্য করে না যারা, তারা দিগম্বরদের করুণা করে এবং সম্ভবত ঘৃণাও করে। মানুষের দুর্বলতাই যাদের জীবনের মূলধন, প্রকৃতপক্ষে তারা যে-কত অসহায় এবং কতটা দুর্বল তার পরিমাপ করতে বসে সময় নষ্ট করা বৃথা।

প্রত্যহ প্রাতের নিয়ম অনুসারে প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর গোলোক দাস নাপিত সংবাদপত্র নিয়ে এসে রামমোহনের পাশে বসল। নিজের মনে বৈষয়িক কাজ করে চলেছেন তিনি, আর গোলোক দাস সংবাদ পড়ে শোনাচ্ছে। তিনি সব সংবাদ শুনছেন কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মাঝে-মাঝেই তিনি একটু মাথা তুলে তাকাচ্ছেন গোলোক দাসের দিকে।

চা এল। চা পান করতে-করতে তিনি শুনতে লাগলেন সংবাদের পর সংবাদ।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাতেই, এই-যে, হেয়ার সাহেব?

—গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং। রামমোহন তাঁকে প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, কাম ইন প্লিজ। বসুন।

রামমোহন তাঁর পাশে বসে বললেন, এ বেইন অব টেরর ইজ গোয়িং অন হিয়ার ইন দিস কানট্রি।

কি ব্যাপার জানতে চাইলেন ডেভিড হেয়ার। একে-একে সব বলে যেতে লাগলেন রামমোহন। গোলোক দাস এতক্ষণ তাঁকে যেসব সংবাদ পড়ে শোনাল তারই সারাংশ বলতে লাগলেন তিনি।

একটু থেমে বললেন, দি কানট্রি নিড্স এ স্ট্রং গবর্নর-জেনারেল।

তাঁর মনের উদ্বেগ, অশান্তি ও প্রতিজ্ঞার বিষয় নিয়ে হেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন রামমোহন, বললেন, দেশের লোক শত্রু হয়েছে আমার। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না আমি তাদের শত্রু নই। আমাকে সংহার করে তাদের কোনো লাভ হবে না। হুগলীর জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ওকেলি সাহেবের রিপোর্ট পড়েছেন নিশ্চয়?

হেয়ার তাঁর সটাক মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, পড়েছেন।

কলকাতার এবং তার আশপাশের অঞ্চলের বাসিন্দারা সবরকম নৈতিক স্খলনের ও নানারকম অনাচারের সম্রাট হয়ে উঠেছে; কলকাতা হচ্ছে কালীক্ষেত্র, এই কালী যেন হয়ে উঠেছেন যত-সব মদ্যপের, ডাকাতের ও চোর-বাটপাড়ের ঈশ্বরী; কলকাতায় কালীসাধকের সংখ্যাই বেশি—এই রকম সাধকেরা সতীদাহকে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে না, মনে করে একটা আমোদ-প্রমোদের উৎসব বলে। এই জন্যেই এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুতহারে।

হুগলীর জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এই রিপোর্টের সঙ্গে রামমোহন একমত তো বটেনই, হেয়ারও ঐ মত পোষণ করেন জানালেন।

রামমোহন বললেন, এত যে বেড়ে উঠেছে তারা তার অন্য কারণও অবশ্য আছে। বছর-পাঁচেক আগেও এসব ব্যাপারে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে নি। তখন লোকে জানত, গবর্নমেণ্ট এ প্রথার ঘোর বিরোধী। এইজন্যে ভয়ে-ভয়ে কাজ সারত। কিন্তু এখন পুলিশ হস্তক্ষেপ করছে—কাজটা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী হচ্ছে কি না দেখার জন্যে গবর্নমেণ্টের নির্দেশ জারী হয়েছে। এই নির্দেশের ফলেই লোকে ধরে নিয়েছে, এতে সরকারী অনুমোদন আছে। তাদের ভয় ভেঙে গিয়েছে। পুলিশকে এখন শুধু বুঝিয়ে দিলেই হল যে, হ্যাঁ, শাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম পালন ক'রেই এই অনুষ্ঠান তারা করছে।

হেয়ার বললেন, Yes, they are burning a score or even two score women with one quite unimportant man. I recently read of a pyre kept alight for three days, while relays of widows were fetched from a distance.

হেয়ারের কথা শুনতে-শুনতে দুই চোখ বুঝি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল

রামমোহনের, দাঁতের ওপর দাঁত বুঝি চেপে বসে গেল। বললেন, আমাকে খুন করতে চায়, তা ওরা পারে অনায়াসে। সামান্য একটা মানুষের চিতার অতগুলি নারী বিসর্জন যারা দিতে পারে, তাদের অসাধ্য কিছু নেই। একটা চুল্লি জ্বালিয়ে রেখে জীবন্ত-জীবন্ত মেয়েদের দূর-দূরান্তর থেকে টেনে নিয়ে এসে যারা নিক্ষেপ করতে পারে ঐ অগ্নিকুণ্ডে, তারা না-পারে কি?

একটু থেমে বললেন, আমি খুন হতে রাজি আছি।

এঁরা কথা বলছেন, এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন অন্নদাপ্রসাদ ও দ্বারকানাথ।

—আসুন। আসুন। অভ্যর্থনা করলেন রামমোহন, জিজ্ঞাসা করলেন, আরও কার পায়ের শব্দ যেন পাচ্ছি, আর কেউ এসেছেন নাকি?

অন্নদাপ্রসাদ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখান থেকেই বললেন, হ্যাঁ, এসেছেন ওঁরা—ভট্টাচার্য-মশায়রা।

উঠে পড়লেন রামমোহন, দরজার কাছে এসে বললেন, এই যে আসুন, আসুন।

অনেকে এসেছেন—মৃগাঙ্কমোহন, ত্রৈলোক্যনাথ, নিরুপম, আর এসেছেন দিগম্বর।

প্রশস্ত ফরাসের ওপর ভট্টাচার্য-মহাশয়েরা বসলেন একধারে, অন্য ধারে রামমোহন এবং তাঁর আত্মীয়ত্রয়।

রামমোহন হেসে বললেন, আপনারা আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনাদের ক্রোধের হেতু জানার আমার আকাঙ্ক্ষা।

অন্যান্য ভট্টাচার্যদের মুখের দিকে চেয়ে ত্রৈলোক্যনাথ একটু বিচলিত হয়ে বললেন, আপনি হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করছেন।

—উঁহুঁ। মাথা নাড়লেন রামমোহন, বললেন; একে বিরোধিতা বলছেন কেন, এ হচ্ছে সংস্কারপ্রচেষ্টা। আপনারা বিজ্ঞ, আপনারা মান্য—ধর্ম হচ্ছে জীবের সেবা, জীবের সংহার নয়।

সংহার? বলে কি এই ম্লেচ্ছটা? রামমোহনের কথা শুনে চমকিত হয়ে উঠলেন ওঁরা, গায়ের থেকে নামাবলী ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বললেন, হারীতের স্মৃতির অনুসারে এই সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করা হচ্ছে।

—তদনুসারে কি হচ্ছে ভট্টাচার্য-মশায়? সে বচনের যে অর্থ আপনারা করেছেন তার দ্বারাও বলা হয়েছে—স্বেচ্ছায় অলঙ্কৃতার নারীরা আরোহণ করতে পারে। কিন্তু কার্যত, অগ্রে বিধবাকে পতির দেহের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন করা হয়, তার ওপর কাঠ দেওয়া হয়, তারপর অগ্নিসংযোগের কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দ্বারা চাপিয়া রাখা হয়। কোন্ হারীত-বচনে এরূপ নির্দেশ আছে অনুগ্রহ করে বলুন।

ত্রৈলোক্যনাথ বললেন, বন্ধনাদির নির্দেশ শাস্ত্রপ্রাপ্ত নয় বটে, কিন্তু এইরূপই পরম্পরায় হয়ে আসছে। এই জন্যেই এরূপ করা হয়।

রামমোহন হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না, বললেন, আপনার এ যুক্তি বড় হাস্যকর। স্ত্রীবধ, মনুষ্যবধ, চৌর্যাদি কর্ম যদি কোনো এক বিশেষ অঞ্চলে, কোনো বর্বর জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহলে ঐসব কর্মকে আমরা কি সৎকর্মরূপে গ্রহণ করব?

ত্রৈলোক্যনাথ এর উত্তর দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে দিগম্বর ভট্টাচার্য বলে উঠলেন, এরূপ সহমরণে বা অনুমরণে পাপই হোক কিংবা যাই হোক, আমরা এ ব্যবহার নিবারণ করতে দিতে সম্মত নই। এর কারণ এই যে, এ প্রথা বন্ধ হলে এরূপ আশঙ্কা আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী যদি সহগমন না ক'রে বিধবা অবস্থায় থাকে তাহলে তার ব্যভিচার হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সহমরণ করলে এ আশঙ্কা থাকে না, জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হয়ে থাকেন এবং পতিও জেনে যেতে পারেন যে তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী-ঘটিত কোনো কলঙ্কের চিন্তা নাই।

(ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

পঞ্চমী পুরাণ

লীলা মজুমদার

(ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)

॥ চার ॥

সেদিন মেসোমশাই আটটা বাজতেই বাড়ি ফিরলেন। মুখখানি দেখলাম অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর এবং ক্লান্ত। ফিরে উঠেই আমাদের দু'জনকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে বললেন—'তোমাদের একটি বিষয়ে সাবধান করে দিতে ডেকেছি। বাড়িতে এখন তোমাদের মাসিমা নেই, আমিও বাইরে বাইরে থাকি, কোনো বাইরের লোক ঢুকতে দেবে না, আর নিজেরাও কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে মিশবে না, কথা বলবে না। এর যেন ব্যতিক্রম না হয় কোনোমতে। এখন যেতে পারো।'

পঞ্চমীদিদি এমনিতেই সারাক্ষণ ভয়ে আধমরা হয়ে থাকে. মেসোমশাইয়ের কথা শুনে তো হাত-পা পেটে সেঁধিয়েছে। ঘরে ফিরেই আমাকে বলল, 'এ আমি জানতাম।'

'কী আবার জানতে?'

'এমনি হবে জানতাম। বেড়াজালে মাছ ধরা দেখেছ কখনো? জাল যখন বড় থাকে মাছরা দিব্যি খেলে বেড়ায়, বিপদের কথা টেরও পায় না। ক্রমে জালের মুখ ছোট হয়ে আসে আর মাছরাও বুঝতে পারে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু তখন আর পালাবার উপায় থাকে না। শেষে একদিন—'

কথা বন্ধ করে পঞ্চমীদিদি দেখি ইসারা করে জানলা দিয়ে কাকে যেন সরে যেতে বলছে। আমি উঠে জানলার কাছে যেতেই পর্দা টেনে দিয়ে কর্কশস্বরে সে বললে—'কি? কি দেখছ?'

'ও লোকটা কে, যাকে তুমি সরে যেতে বললে?'

তেড়িয়া হয়ে উঠল পঞ্চমীদিদি। 'কাকে আবার সরে যেতে বলব? তুমি কি পাগল হলে নাকি, টুনি?'

আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। স্পষ্ট দেখলাম আধাবয়সী রোগা ডিগডিগে একটা লোক আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে গ্যাস লাইটের তলা থেকে সরে গেল। ফিরে কঠিন গলায় বললাম, 'তোমাকে আমি বুঝে উঠি নে। এমনিতেই ভয়ে নাড়ী ছাড়বার জোগাড়, তার ওপর মেসোমশাই এত করে সাবধান করে দিলেন, আর পাঁচ মিনিট না যেতেই অমনি বাইরের অচেনা লোককে ইসারা করছ। কে ও লোকটা?'

পঞ্চমীদিদিও অমনি মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল,—'মেরে ফেলবে, ফেল। তাড়াবে তাড়াও। তাই বলে ভদ্রলোকের ঘরের বিধবার নামে ও কথা বল না।'

আমি তবু বললাম—'নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা যায় না। বল ও কে, নইলে এই চললাম মেসোমশায়ের কাছে।'

একলাফে পঞ্চমীদিদি আমার পা দু'টোকে জড়িয়ে ধরল—'না, না, না, বলছি, সব বলছি, মেসোমশায়ের কাছে যেও না।'

ঠিক এমনি সময় কোনো শব্দ না করে লছমি এসে ঘরে ঢুকে বলল—'দিদিরা আজ খাবেন-না-না-কি? সাহেবের বাসন তুলে দিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব?'

ব্যস, কথাটা তখনকার মতো চাপা পড়ে গেল। খাবার পর মাথাধরার অছিলা করে পঞ্চমীদিদি চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আমি একবার জানলার কাছে গিয়ে দেখি সকালের সেই দেখতে ভালো লোকটি আবার সিগারেট হাতে ও-ফুটপাথে পাইচারি করছে। নিজের বিছানার ওপর বসে গম্ভীর গলায় বললাম—'পঞ্চমীদিদি, ওরকম কর না, তাহলে তুমিও বাঁচবে না, আমাকে বাঁচতে দেবে না। ও-ফুটপাথে আবার পাহারা বসেছে দেখছি। সে লোকটি কে, যাকে তুমি সরে যেতে বললে?'

আস্তে আস্তে মুখ থেকে চাদর নামিয়ে পঞ্চমীদিদি বললে, 'আমার বারুইপুরের দেওর।'

চমকে উঠলাম। বারুইপুরের দেওর? সে আবার কে? কি চায় সে? মুখে বললাম—'বাজে কথা ব'ল না, পঞ্চমীদিদি, তুমি নিজের মুখেই বলেছ অনেক সম্পত্তির মালিক সে, মস্তবড় কোঠাবাড়ি আছে তোমার শ্বশুরের, রাণীর হালে রাখতে চায় তোমাকে। এ লোকটা তো একটা—একটা পাড়াগাঁর মুদির মতো দেখতে।'

পঞ্চমীদিদি বললে—'পাড়াগাঁর লোকরা সাজ-পোষাকের অত জানে কি? তোমাকেও তো শুনেছি ডালার ভেতর থেকে যখন বের করা হয়েছিল, পরণে একটা ট্যানাও ছিল না।'

এর কোনো উত্তর হয় না। একটু হেসে বললাম, 'জন্মেও ছিলাম ঐ বেশেই। কিন্তু ঠাট্টা নয়, কে তোমাকে বলেছে যে লোকটা সত্যি তোমার দেওর? তুমি চেনো তাকে?'

হাঁড়িমুখে পঞ্চমীদিদি বললে, 'মুখ চেনা না হতে পারে, কিন্তু তার ঠিকুজি দেখেছি। আর শুধু তার কেন আমার শ্বশুরমশায়ের ঠিকুজিও দেখেছি।'

পঞ্চমীদিদির মুখে সম্পর্কগুলো অদ্ভুত শোনাল। বললাম, 'হ্যাঁ! ঠিকুজি না আরো কিছু? সব জাল, এ কথা তোমাকে বলে রাখলাম। খবরদার বাড়ি থেকে বেরুবে না; এখনো কি তোমার শিক্ষা হয় নি?'

সটাং উঠে বসল পঞ্চমীদিদি। 'বাড়িতেই না আমাকে বড় নিরাপদে রেখেছ! আজ চিলছাদের সিঁড়িতে টন্ সুতো বাঁধা, কাল ছাদ থেকে মাথার ওপর টালি খসে পড়ছে, তার পরদিন ঘরে কেউটে সাপ ফণা ধরছে। বারুইপুরে নিজের স্বামীর

ভিটেয় এর চাইতে শতগুণে নিরাপদে থাকব।'

শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল : অচেনা লোকটার সঙ্গে সরাসরি বারুইপুর রওনা দেওয়া ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে, পঞ্চমীদিদি ঘোলাটে চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলে যেতে লাগল, একরকম জমিদারই বলতে গেলে আমরা ওখানকার; বিরাশী বিঘে ধানজমি; চারটে বড় বড় পুকুর, তাতে মাছ কিলবিল করছে; বাঁশঝাড়, নারকেল গাছ অগুণতি; কাঁঠাল কাঠের হাতে কোঁদা আসবাবে আর সিন্দুক-বোঝাই এই ভারি ভারি খাগড়াই কাঁসার বাসনে বাড়ি একেবারে ঠাসা। অন্দরে সান-বাঁধানো পুকুরপাড়ে শ্বেতপাথরের মন্দিরে জনার্দন আছেন, রোজ তাঁকে ভোগ দিতে হয়, তাই কে বেঁধে দেয় তার ঠিক নেই। ঠাকুরপোর সত্যিই কাপড়ের দোকান আছে, তার হাতে সময় থাকে না, বিশ্বাসী লোকও পাওয়া যায় না, যার হাতে অত রুপোর বাসন, সোনার গয়না ছেড়ে দেওয়া যায়। ওখানে না যাওয়াটাই আমার অন্যায় হবে। একটা মেয়েমানুষ নেই বাড়িতে, দেওরের ছেলেটাও দোকানে বসে, তার ওপর বড় নন্দ কবে গত হয়েছেন, তাঁর অনাথা নাতনীটাও এসেছে, ছ্যাকা-পোড়া খেয়ে শরীর থাকছে না তার।'

শেষটা যখন থামল পঞ্চমীদিদি, তার ঘোলা চোখ চকচক্ করছে। আমিও গা-ঝাড়া দিয়ে যেন কোন রূপকথার দেশ থেকে নেমে এলাম।

'এ সব কি সত্যি তুমি বিশ্বাস কর পঞ্চমীদিদি? আমার মুখের কথায় যদি কাজ না হয় তো গুরুজনদের বলতে হবে।'

পঞ্চমীদিদি সত্যি সত্যি খিলখিল করে হেসে উঠল।

'গুরুজন? গুরুজন মানে মেসোমশাই নিশ্চয়? বেশ তো বল না গিয়ে তাঁকে। আমিও কি চুপ করে থাকব ভেবেছ নাকি? এক্ষুণি টেনে এনে বুড়োদাদুর গুণধর পুত্রের টহল দেওয়া বার করে দেব না!'

এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে আর কি বলব। পঞ্চমীদিদি বলে যেতে লাগল—'কি, অত অবাক হচ্ছ কেন? ও ফুটপাথের ঐ কার্তিকটি বুড়োদাদুর ছেলে তা কি তুমি জানো নি?' তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলল, 'ও হো, তাই তো, তুমি যে তাকে চোখেও দেখ নি, তুমি যখন ইস্কুল-কলেজে, সেই সময়ে এখানে ওর যাওয়া-আসা—'

রেগে বললাম, 'কেন? আমার সামনে দিয়ে আসতে কোনো বাধা আছে নাকি?'

'বিলক্ষণ আছে। মেসোমশাই জানতে পারলে আর ওর পিঠের চামড়া আস্ত রাখবেন না। এমনিতেই বেশ নজর পড়েছে তোমার চাঁদমুখের ওপর, বাপকে দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করিয়েছিল মনে নেই! কম শয়তান ভেবেছ নাকি? অবিশ্যি বিয়ের সম্বন্ধটা ওর বাপের কেরামতিও হতে পারে। অন্তত মেসোমশাইয়ের তো সেই রকম বিশ্বাস।' দম নেবার জন্যে থামল পঞ্চমীদিদি।

দাঁড়িয়েছিলাম, পায়ে কেমন জোর পাচ্ছিলাম না। বসে জিজ্ঞাসা করলাম—'আমার মতো একটা ছালায়-খুঁজে-পাওয়া মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োদাদুর লাভ?'

দুলে-দুলে হাসতে লাগল পঞ্চমীদিদি। 'মেসোমশাইয়ের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামিয়ে তাঁকে একটু খুশি করা, এই লাভ। বুড়োদাদুর সর্বস্ব মেসোমশায়ের কাছে বাঁধা দেওয়া, তার ওপরেও এত ধার নিয়েছেন মেসোমশায়ের কাছ থেকে যে, সারাজীবন ধরেও তা শুধতে পারবেন না। বাকি ছিল ঐ চার কাঠা অকেজো-জমি, তাও মেসোমশাই আমাদের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। মজা কারে বলে।'

পঞ্চমীদিদির কথা অবিশ্বাস করতে আমার একবারও মনে হল না। মেসোমশায়ের কাছ থেকেই হয়তো ও শোনা, নিদেন মাসি ওকে বলেছে। আমাকে একটু ছোট করতে পারলে মাসি আর কিছু চায় না। অথচ বুড়োদাদু মাসির নিজের মায়ের নিকট সম্পর্কের ভাই হন। ছোটবেলাকার অযৌক্তিক অসহ্য দুঃখে যখন আমার বুক ফেটে যেত, বুড়োদাদু মুখের মধ্যে চকোলেট পুরে দিতেন। তখন তাঁদের অবস্থা খুব ভালো, [illegible] খোলা মোটরে চেপে এসে আমাদের সবাইকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মেজমাসিকে খুব ভালবাসতেন, পকেটে করে সর্বদা তাঁর

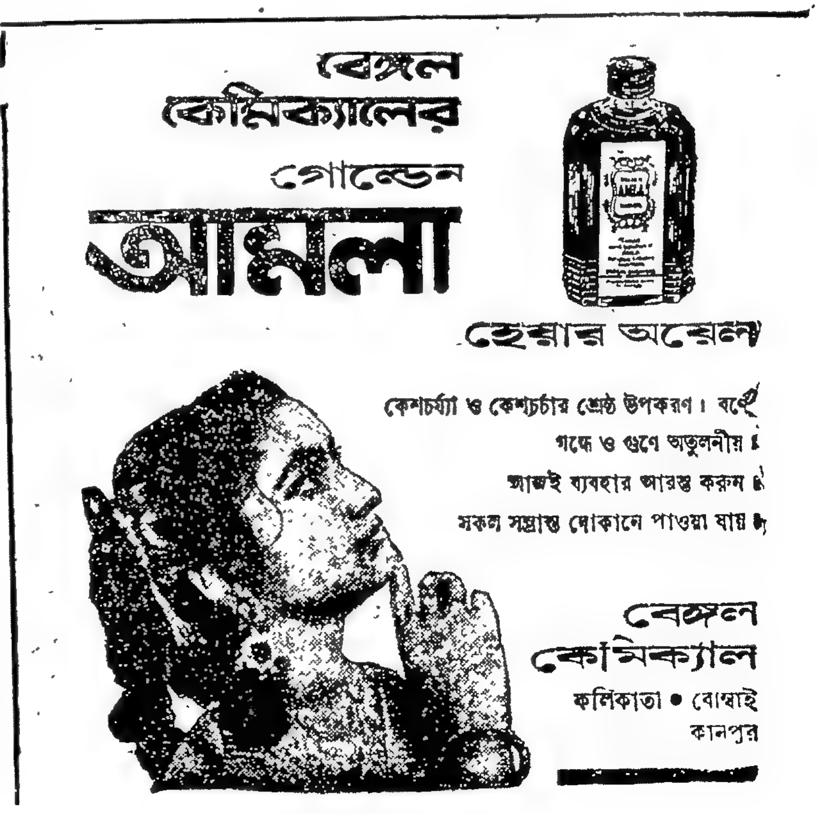

ছেলেমেয়ে, সাগর আর সোনালির জন্যে নানারকম ছোট্ট ছোট্ট মজার খেলনা আনতেন আমিও সমান ভাগ পেতাম। তখন আমার চার বছর বয়স ছিল, অথচ সব কথা স্পষ্ট মনে আছে, শুধু মেজমাসির মরার কথাটা মনে করতে পারি না। হয়তো বড় দুঃখের স্মৃতি বলেই ইচ্ছে করে মন থেকে ঠেলে দূর করে দিয়েছিলাম।

কবে যে মেসোমশাই মেজমাসির চেয়ে দশ বছরের ছোট এই মাসিকে বিয়ে করলেন তাও ভুলে গেছি। হয়তো আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাঝখানে এক বছরও যায় নি। মাতৃহারা নাতনী অন্য সংসারে হাতে পড়লে পাছে কষ্ট পায় এই মনে করেই বোধ করি দিদিমা নিজে উদ্যোগী হয়ে ছোট মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। ফল হয়েছিল উল্টো, এসেই মাসি তার পাঁচ বছরের বোনপো-বোনঝিকে এমনি বিষনজরে দেখতে সুরু করে দিল যে দিদিমা তাদের সরিয়ে নিজের কাছে কয়েক বছর রেখে একটু বড় করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিলেন। এবার তারাও সেখানে বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে, আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।

বড় কষ্টে আমার ছোটবেলাটা কেটেছে, বুড়ি ঝির বিছানায় তার গলা জড়িয়ে শুতাম। সে মলে পর থেকে আমি একা। তবে একা খুব বেশি লাগত না, তার কারণ প্রায় প্রত্যেকদিন বুড়োদাদু এসে দেখে যেতেন। এই সেদিন অবধিও এসেছেন। তারপর ব্যবসা নষ্ট হওয়াতে নিজের ধান্দায় কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান বলে গত তিন-চার বছর বড় একটা দেখা পাই না। অনেকদিন পরে কাল এসেছিলেন, এসেই আবার চলে গেলেন। হঠাৎ পঞ্চমীদিদি ডাকল—'টুনি, ঘুমিয়েছ?'

'না কেন?'

'বুড়োদাদুর এক কানাকড়িও নেই, উলুবেড়ের পাঁচশো বিঘাও মেসোমশায়ের হয়ে গেছে, এটা জানতে?'

'না।'

'এখন ছেলেকে চর লাগিয়েছেন কি মতলবে কে জানে। তুমি খুব সাবধানে থেকো।'

'আর তুমি?'

'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে।'

হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। শেষরাত্রে এমনি ঘুমিয়ে পড়লাম যে সকালে সাতটার আগে ঘুম ভাঙল না। পঞ্চমীদিদি উঠে গেছে, নিচে তার গলার আওয়াজ পেলাম। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি ও ফুটপাথটি ফাঁকা, চারিদিকে অজস্র পোড়া সিগারেট ছড়ানো।

সত্যিই কি ও বুড়োদাদুর ছেলে? মাসি আর মেসোমশাই অষ্টপ্রহর তার নিন্দে করেন, বুড়োদাদু তার নামও করেন না। কি যেন একবার শুনেছিলাম বুড়োদাদুর স্ত্রী ছেলে কোলে নিয়ে কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আর বুড়োদাদুর সঙ্গে দেখা হয় নি, ছেলেটাও নাকি অন্য লোকের কাছে মানুষ হচ্ছিল, তবে ষোল বছর বয়স হতে নিজে ইচ্ছে করে বাপের কাছে চলে এসেছিল। বুড়োদাদু তার কথা কখনো বলতেন না, আর আমি অন্তত ছেলেকে কখনো এ বাড়িতে আসতে দেখি নি।

চা খেতে যখন নিচে নামলাম পঞ্চমীদিদির অন্য চেহারা দেখলাম, হঠাৎ যেন তার মনে বড় ফুর্তি এসেছে। দেখেই তো আমার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। এত কষ্ট পেয়েছে সারাজীবন, তবু মন ওঠে নি, না জানি আরো কি নতন দুঃখে ঝাঁপ দেবার তালে আছে। দেখলাম এই ভোরেই তেল মেখে স্নান করে পাতা কেটে চুল আঁচড়েছে, একটা ফর্সা কাপড়ও পরেছে, গায়ে পূজোর সময়ে বুড়োদাদুর দেওয়া তসরের জামা উঠেছে। ফস্ করে বললাম, 'যাক, বুড়োদাদুর জামাটা তবু গায়ে উঠেছে দেখছি। শুনলে তিনি—'

বাধা দিয়ে পঞ্চমীদিদি বললে—'দাদুর সঙ্গে মেশা বারণ, অন্য লোকের কাছে দাদুর কথা বলা বারণ। দাদুর এ বাড়িতে আসা বারণ।'

আমি হাঁ করে পঞ্চমীদিদির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, সে চামচ দিয়ে চায়ের চিনি ঘুঁটতে ঘুঁটতে মুখ চিপে হাসতে লাগল। তারপর একবার আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে হাতের বাসি রুটিতে জ্যাম মাখাতে লাগল। পাঁউরুটি সে খায় না, এতকাল বাদেও কিছু কিছু মানামানি রয়ে গেছে তার।

আমি কোনো কথা না বলে চায়ের পেয়ালা তুললাম। পঞ্চমীদিদি বললে—'উঃ ফু! কাল মেসোমশায়ের সে কি রাগ! আমি থাকতে সব কথা বুড়োদাদুর কানে গেল কেন? সত্যি তোমার যদি কেউ অনিষ্ট করতে চায় তো আমি আছি ব্যবস্থা করবার। ওঃ! আমার ব্যবস্থা করে তো উনি উল্টে নিচ্ছেন! তবে বুড়োদাদুর কথাটা মন্দ বলেন নি, ভালো চাও তো তুমিও সাবধান হও সময় থাকতে। ও কি, উঠলে যে?'

আমি চেয়ার ঠেলে বললাম—প্রথমে মিসেস্ সোম গাঁইয়ের কাছে যাব, দরকার আছে। তারপর আজ কলেজে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড আনতে হবে। দুপুরে বাড়িতে খাব না, মেয়েরা আমাদের ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া আছে।'

পঞ্চমীদিদি কোনো আপত্তি করল না, বরং যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। আমি ওকে বললাম—'দেখ পঞ্চমীদিদি, মাথায় যদি কোনো পাগলামি ঢুকে থাকে তো ঝেড়ে ফেল।'

কপালে চোখ তুলে সে বললে—'কি পাগলামি?'

'এই যেমন ধর দেওরের বাড়ি যাওয়া।'

'ইচ্ছে হলে তো অনেক আগেই যেতে পারতাম।'

'সে ইচ্ছে যখন আগেও হয় নি, এখনো যেন না হয়। না পঞ্চমীদিদি, ঠাট্টা করছি না। আমার ফিরতে আড়াইটে-তিনটে হবে। সাবধানে থেকো।'

আসলে বুড়োদাদু ছাড়া কারো কথা আমি ভাবতে পাচ্ছিলাম না, নইলে পঞ্চমীদিদিকে ঘরে আটকে রাখার আরো ভালো বন্দোবস্ত করে যেতাম। অন্তত দরোয়ানকে বলে যেতে পারতাম যেন খিড়কিতে তালা দিয়ে রাখে। অবিশ্যি মেসোমশাই তখনো কাজে বেরোন নি, কাজেই তখন হুকুম দেবার মালিক তো আর আমি নই। স্নান করে জিনিস, ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, পঞ্চমীদিদি ছিল রান্নাঘরে, একবার দেখাও করে গেলাম না।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ছয় ॥

'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার'—

ভোর থেকেই এই দু'টি লাইন বেজে চলেছে মনের ভেতর। হয়তো এমন করে সূর্যোদয় বহুদিন দেখা হয় নি কিরণের। এই যে একটু একটু করে দূরের পাহাড় রাঙিয়ে ওঠা, তারপর কৃষ্ণচূড়ার ঊর্ধ্বাঞ্জলির সঙ্গে সেই রঙের মিতালি—সেই রঙের ডাকে পাখিদের দলে দলে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়া, সেই বাতাস—যা এইমাত্র যেন দক্ষিণ সমুদ্র থেকে নবজাতকের নির্মলতায় বেরিয়ে এল—সব মিলে সকালটিকে যেন আবির্ভাবের মতো মনে হল। যেন কালকের রাত একটি শুক্তির মতো অপেক্ষা করছিল, কখন স্বাতী-নক্ষত্রের একটি বিন্দু ঝরে পড়ল তাতে—ভোরবেলায় আকাশের রঙিন ঢাকনাটি খুলে গেল আর পৃথিবীর মাটিতে দুর্লভ মুক্তোর মতো ফুটে উঠল দিনটি।

রোমান্টিক?

কলকাতায় থাকলে হাসি পেত। ঘুম ভাঙত রাস্তার দুঃসহ ট্রামের আওয়াজে, কলতলায় মেসের ঝির বাসন মাজার ঝঙ্কারে, কাকের ডাকে, শোনা যেত ঠাকুর-চাকরের বকাবকি, শোনা যেত 'চা আন শীগ্‌গির, গরম কচুরি আন্‌বি নিচের দোকান থেকে, জিলিপি ভাজছে কি না দেখিস্।' জানলা দিয়ে খানিক রোদ পড়ত গায়ে, জ্বালা করে উঠত চোখ-মুখ, বিরক্ত হয়ে উঠে বসতে হত। যদিও তেতলার একটি সিঙ্গল্-সীটেড্ রুমে তার ডেরা ডেণ্ডা, তবু সারা বাড়ির কোলাহল—পথের হট্টগোল, সব মিলে মনে হত—আর একটা অসহ্য দিন্ সুরু হল, ঘাম, গরম, অবসাদ আর বিরক্তির দিন।

তখন চোখে পড়ত নিজের অগোছালো ঘরটা। টেবিলে-বই-কাগজ-পত্রের জঙ্গল, মেঝেতে বই, বিছানায় বই, দেওয়ালে বই। গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে করতে হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। এমন কি, শিল্পী এক বন্ধুর উপহার-দেওয়া কুল্ ভ্যালির সেই আশ্চর্য ল্যাণ্ডস্কেপটা দেওয়ালে কাত হয়ে ঝুলছে ক'দিন ধরে—সেটা পর্যন্ত সোজা করে দিতে ইচ্ছে করে না। তারপর সেই শ্যাওলা-পড়া স্যাঁৎসেঁতে বাথরুম, তোবড়ানো টিনের মগ, টুথব্রা', রুটি-চা, কিছুক্ষণ খবরের কাগজ, দু-চার লাইন লিখতে বসা, দরকার থাকলে শার্টটা গায়ে টেনে বেরিয়ে পড়া, বন্ধু-বান্ধব কেউ এসে গেলে চাকর ডেকে চা-কচুরি-জিলিপির ফরমাস, ঘণ্টা দুতিন আড্ডা, পরচর্চা, সাহিত্যের বকবকানি, টিনের কৌটো ছাপিয়ে বিড়ি-সিগারেটের ছাই আর টুকরো, সভা-সমিতির জন্যে আগন্তুক, অটোগ্রাফের খাতা হাতে ভীরুপায়ে একটি স্কুলের ছেলের প্রবেশ, কোনো পাব্লিশার, কোনো সমবয়েসী সহকারী সম্পাদক।

—সব সাহিত্যিকের গাড়ি-বাড়ি হচ্ছে, আপনি সারাজীবন মেসেই কাটাবেন কিরণবাবু?

—রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন আপনাদের? 'জীবনে জীবন যোগ করা, নহিলে কৃত্রিম পণ্যে—'

—থামুন মশাই, চালাকি করবেন

না। টাকা (নেহাৎ কম পান না। কী করেন ।। দিয়ে?

—জমাই। বড়োবাজারে একটা পাঁচতলা বা কিনে ব্যবসা আরম্ভ করব।

—আর ।হিত্য? তার কী হবে?

—তাকে বলব সরে পড়ো। ক' পার্সেণ্ট লোক সাহিত্য পড়ে মশাই? কিন্তু চাল-তেল-কাপড় সেণ্ট পার্সেণ্টেরই দরকার। টাকা জমাচ্ছি সেই বৃহত্তর দেশসেবার জন্যে। কী, খুশি হলেন তো?

—নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের কথাও একটু মনে রাখবেন তা হলে। চালটা একটু সস্তায় ছাড়বেন আর কাঁকরের পরিমাণটাও যদি দয়া করে কিছু কমান—

—কী দুঃখে? সাহিত্যে চোখ বুজে পিটনি গোলা গিলছেন আর পচা তেলের ফুলুরি খাচ্ছেন রসিয়ে রসিয়ে, তা-ও কিনছেন বারো টাকা থেকে বাহান্ন টাকা—যে-কোনো দামে। দোষ হল কেবল চালের বেলায়?

—আপনার নিজের লেখা সম্পর্কেও কি এই সমালোচনা—

—নিশ্চয়। ব্রাদার্স ইন ক্রেদ। দলের লোককে রিট্রে করতে বলেন নাকি?

—ঠাট্টা নয়, সত্যিই একটা গাড়ি করুন এইবার।

—বললুম তো চেষ্টা করছি বড়োবাজারে। জয়পুরে গণেশেরও অর্ডার দিয়েছি। ধৈর্য ধরে আর দিন কয়েক অপেক্ষা করুন। আর আপাতত একটা সিগারেট খাওয়ান—আমারগুলো সব ফুরিয়ে গেছে।

এ-ই কলকাতার সকাল। তিক্ত, বিস্বাদ। ঘুম থেকে উঠে মনে হয়, আগের দিনের ক্লান্তি এখনো কাটে নি, মস্তিষ্কের কোষে কোষে মুঠো মুঠো অন্ধকারের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে। সেই ক্লান্তি থেকে সব বিরক্তিকর বলে বোধ হতে থাকে, আসে ধারালো কথা, তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত—দেখা দেয় নিজের ওপর অশ্রদ্ধা, মানুষের ওপর অবিশ্বাস। আজকের পাহাড়ে এই রং-লাগানো সকাল যেখানে দেড়শো বছর আগেকার কোনো ফরাসী লেখকের পাণ্ডুলিপির মতো—যেখানে চির-তরুণ অরণ্য, ছোট নদীটির ধারে ধারে নানা রঙের ফুল—তার মাঝখানে একটি সোনালি চুলের মেয়ে চুপ করে বসে দূরের হাওয়ায় কোনো রাখালের গান শুনছে।

সে পাণ্ডুলিপি কয়েক পাতা পড়বার পর আর ধৈর্য থাকে না। তার মন্থর ভাষা, তার স্বপ্নের কুহক—তার প্রেম-বাসনার সরলীকৃত আবেগ। হাসি পায়। এখন জীবন সরীসৃপ। রূপ অ্যানাটমি। মানুষের দু'টো মাত্র ভাগ—এক ভাগে চিন্তার জটপাকানো কয়েকটা দুর্বোধ্য যন্ত্র—আর এক ভাগে কতগুলো পিণ্ডাকার সমষ্টি—তাদের হাত নেই, পা নেই, নাক-চোখ-মুখ কিছুই নেই; শুধু অক্টোপাশের শরীরের মতো সেই পৃথিবীজোড়া মাংসের তালে অসংখ্য ভ্যাকুয়াম ছিদ্র, আর সেই ছিদ্রময় কোটি কোটি ইন্দ্রিয়গুলো রাতদিন শুধু শুষেই নিতে চাইছে। আর কিছু নয়।

টাকা, বাড়ি, গাড়ি।

কারো কারো হয়তো হয়, কিন্তু কীভাবে হয় কিরণ তা জানে না। দাদার একটা চোখ আগেই খারাপ ছিল, গ্লোকুমা হয়ে আর একটাও গেছে—অর্থাৎ এখন প্রায় পুরোপুরি অন্ধ। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আর মাস-কয়েকের মাইনে দিয়ে জোর করে বিদায় করেছে চাকরি থেকে। অথচ দাদার অনেকগুলি ছেলেপুলে। তার ওপর প্রতিমা—

প্রতিমা আছে একটা প্রাইভেট অ্যাসাইলামে। বাড়িতে রাখা যায় না—জামা-কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। খাবারের থালা দিলে ছুড়ে ফেলে দেয়—'ওতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।' তার চাইতে চোখের বাইরেই থাক। সেখানে একটু যত্ন-আত্তি হয়, কিন্তু তার জন্যে মাসে দুশো টাকা করে খরচ পাঠাতে হয়।

স্কুলের চাকরি আর করা যায় না, টিউশনও না। খ্যাতির বিড়ম্বনা। সাহিত্যই জীবিকা। নাম কিছু হয়েছে, কারণ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার প্রত্যাশা যৎসামান্য, ঔদার্য অসীম। কিন্তু ঠিক জনপ্রিয় বললে যা বোঝায়—তার উপন্যাস তা নয়, এক সপ্তাহে তার কোনো বইয়ের 'তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত' হয় না। তাই খ্যাতি যতটা, আয় তত বেশি নয়। অথচ মনের মতো কিছু আজ-পর্যন্ত লিখে উঠতে পারল না, বলতে পারল না, 'আমার বিচার রইল ভবিষ্যতের কাছে।'

বাড়ি-গাড়ি।

হলে হয়তো ভালোই হয়, কে জানে। কিন্তু দাদার সংসার চালাতে হয়। দুশো করে টাকা পাঠাতে হয় প্রতিমার জন্যে।

এ-ও বাঙালী পাঠক-পাঠিকার গুণে। যাদের দাবি নামমাত্র, প্রীতি অপরিসীম।

তবু কলকাতার সঙ্গে এই টাকার সম্পর্ক। স্বার্থের, জীবিকার। সূর্যোদয় দূরে থাক, আকাশের দিকেই কি চোখ পড়ে কখনো? যখন পড়ে—হয়তো কোনো ঘোলাটে সন্ধ্যায়, কোনো রৌদ্রজ্বলা দুপুরে—তখন মনে হয় অক্টোপাশের শুঁড়ের সেই সব ভ্যাকুয়ামের মতো অসংখ্য রক্তমুখ ছিদ্র—সেই ছিদ্রে কোটি কোটি ইন্দ্রিয়ের জিহ্বাগুলো লকলক করছে।

সকালের রং মিশে গিয়ে রোদ উঠেছিল, হাওয়া লেগে সামনের লনে কাল রাতের ক'টি বেলফুল ঝরে পড়ছিল বৃন্ত থেকে, তখন শম্ভু এল। এল চা নিয়ে।

—কী জলখাবার দেব বাবু?

কিরণ সোজা হয়ে উঠে বসল ইজিচেয়ারটায়।

—জলখাবারের দরকার নেই। চায়ের নেমতন্ন আছে এ বেলায়।

হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল

এতক্ষণে। কী আশ্চর্য, প্রায় রাতটা। এই দু'ঘণ্টা ধরে সে চেয়ারটায় এই-ভাবে বসে আছে, ফিরে গেছে কতগুলো বিরক্তিকর কটুস্বাদ চিন্তার ভেতরে, আর তার অন্যমনস্ক চোখের আড়ালে অন্ধকারের শুক্তি খোলা মুক্তোর মতো দিনটি কত যে আলো, রঙ আর পাখির খেলা খেলে গেছে তা সে দেখতেও পায় নি।

'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার—'

রোমাণ্টিক ? অ্যানাক্রনিজম ? তাই হোক। দেড়শো বছর আগেকার পুরোনো ফরাসী উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপিই আজ সে খুলে ধরুক চোখের সামনে। চির-তরুণ অরণ্যে আরো নীল ছায়া নেমে আসুক, ছোট নদীটির জলে বাজতে থাকুক নুড়ির নূপুর, আর একরাশ বুনো ফুলের মাঝখানে বসে সোনালি চুলের মেয়েটি কান পেতে শুনুক দূরের বন্ধু রাখালের গান—'ল্য শাঁতেঁ দ্যু ব্যার্জার।'

পথে বেরিয়েই তিক্ত কলকাতা মুছে গিয়েছিল। তারপর কৃষ্ণচূড়ার ছিটে লাগল চোখে, আমের মুকুলের গন্ধ এল, বুলবুলির শিসে আর হরিয়ালের ডাকে দু'কান ভরে রইল। 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা'—গানটা অদ্ভুতভাবে পেয়ে বসেছে, কিছুতেই মন থেকে যেতে চাইছে না। কিরণের মনে হল, আজ সকালে কলম নিয়ে বসলে খুব মিষ্টি একটা গল্প সে লিখতে পারত।

এই তো ডাক্তার এ কে রায়চৌধুরী। বি-এস-সি, এম-বি, বি-এস্।

বর্ণনায় কোনো ভুল নেই। সামনে ঢেউতোলা প্রাচীর। কম্পাউণ্ডে দুটো ইউক্যালিপটাস্ আর ক'টি জাপানী ঝাউ। আর—

—আর, কিরণ চকিতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। গেটের বাইরে প্রথমেই যে গলা বের করল, সে আর কেউ নয়—স্বয়ং ডগলাস। বেশ উদার গলায় বললে, ঘৌ:।

কিরণ হেসে ফেলল: এ অভ্যর্থনা মন্দ নয়। আমার ডায়েরীখানা চুরি করলে তুমিই, আর পাল্টা আমাকেই এখন চোর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে!

কিন্তু এরই মধ্যেই বাসব বেরিয়ে পড়েছে। আর বেরিয়েই তার গগন-ভেদী ঘোষণা: এসে গেছেন—এসে গেছেন।

এতক্ষণ বাইরের ঘরে সবাই অপেক্ষাই করছিলেন কিরণের জন্যে। চায়ের টেবিল সাজানো, কেটলিতে কল্যাণী জল চাপিয়েছেন সাড়ে ছ'টায়। শর্মিলা হেসে বলেছিলেন, মিথ্যেই ব্যস্ত হচ্ছ দিদি, কলকাতার লোকের ঘুম ভাঙেই আটটায়।

—লেখক মানুষ আটটায় উঠবেন কি রে? লেখেন কখন তা হলে?

—ওঁরা নিশাচর। না—না, খারাপ অর্থে বলি নি। মানে, একটু বেশি রাতেই ওঁরা কল্পনার জগতে চরে বেড়ান।

—চরে বেড়ান মানে?—কল্যাণী ভ্রূভঙ্গি করেছিলেন: মানুষ চরে নাকি?

শর্মিলা বলেছিলেন, সর্বনাশ, আমাদের মতো বেরসিকের দেখছি কথা বলাই মুস্কিল। সায়েন্স পড়িয়ে এমন দশা হয়েছে যে—

আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই কল্যাণী লক্ষ্য করেছিলেন ভাঁড়ার-ঘরে বাসব এবং কেকার গতিবিধি সন্দেহজনক। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এই—খবরদার, আমি সব দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। জেলীর শিশিতে যে হাত দেবে, তার জিভ আমি কেটে ফেলব।

ডাক্তার রায়চৌধুরী এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সাতটা নাগাদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ঠিক বলে এসেছ তো তোমরা? নাকি লেখক মানুষ ভুলেই গেলেন?

বাসব বললে, ভুলবেন কেন? আমি তো কতবার বলে এসেছি।

—তুমি থামো।

—কাকিমাও তো বলেছেন।

—তবু আমার একবার যাওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক, একজন নামজাদা লেখক—

অতঃপর ডগলাসের অভ্যর্থনা, বাসবের চিৎকার, কেকা-লেখার ছুটে যাওয়া, তাদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার নিজেই। কল্যাণী উঁকি দিলেন দরজার পাশ দিয়ে। শুধু শর্মিলা উঠলেন না, অকারণ সংকোচে নিজের চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

বাইরে ডাক্তারের গলা শোনা যেতে লাগল: আসুন—আসুন—নমস্কার। আমিই অবনী রায়চৌধুরী। আসুন ভেতরে—আমরা অপেক্ষা করে আছি আপনার জন্যে।

সেইসঙ্গে কানে এল বাসবের শাসন: এই ডগলাস, চুপ। অসভ্যতা করতে নেই।

কল্যাণী সরে দাঁড়ালেন দরজার পাশে, শর্মিলা উঠে দাঁড়ালেন এবার। ডাক্তার তাঁর অতিথিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—ইনি আমার স্ত্রী, আর এরা—

শর্মিলার সঙ্গে দৃষ্টি মিলল কিরণের। হাত দুটি কপালে জড়ো করেই মৃদু হাসল কিরণ: এঁদের সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়ে গেছে।

বাসব বললে, দেখুন—দেখুন, ডগলাস আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে।

ভাব করতে চাইছিল নিঃসন্দেহ, কিরণের জুতোটা শুঁকছিল একমনে। কল্যাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই বাসু, হতভাগা কুকুরটাকে বের করে দে তো ঘর থেকে।

কিরণ হেসে বললে, থাক—থাক ওরই জন্যে তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

ঘরশুদ্ধ সবাই হেসে উঠলেন ডাক্তার বললেন, নিন—বসুন। উই আর অলরেডি লেট ফর টী।

সবাই বসলেন। কিরণ কুণ্ঠিত ভাবে বললে, আমিই বোধহয় আপনাদের দেরী করিয়ে দিলুম?

—কিছু না, কিছু না। গ্যাদার ই আর টু আর্লি। আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে সকলেই একটু আগে উঠে জানেন তো? কাজেই দিন আমাদের সুরু হয় তাড়াতাড়ি, আর রাত সাড়ে ন'টা বাজতেই মিড নাইট।

কল্যাণী খাবারের ডিস এগিয়ে দিচ্ছিলেন, সাহায্য করছিলেন শর্মিলা। কিরণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

—একি কাণ্ড বলুন তো! চায়ের সঙ্গে এত খাবার! কে খাবে?

—এত খাবার কোথায় মশাই? —বিরাট একখানা কেক কেটে কিরণের প্লেটে রাখলেন ডাক্তার: ফ্রম দি মেডিক্যাল পয়েণ্ট অফ ভিউ, মানুষের সারাদিনের যা খাদ্য, তার ওয়ান থার্ড খাওয়া উচিত ব্রেকফাস্টের সময়। তারপর সারাটা দিন মনের আনন্দে কাজ করুন। ইয়োরোপে এই নীতিই ওরা মেনে চলে। তা ছাড়া আপনি তো ইয়ং ম্যান—এই তো খাওয়ার বয়েস আপনাদের।

—ইয়ং ম্যান? বয়েস প্রায় চল্লিশ হল।

—চল্লিশ?—ডাক্তার রায়চৌধুরী হেসে উঠলেন, ইউ হ্যাভ জাস্ট বিগ্যান ইয়োর লাইফ।

—ওটা বিলিতী মতে। আমাদের দেশে নয়।

—ওরা কিছু সুপারম্যান নয়। স্বাস্থ্যনীতি মেনে চললে সব দেশের নিয়মই এক। নিন—সুরু করুন।

চায়ের সঙ্গে গল্প। কী করে সরকারী চাকরি ছেড়ে ডাক্তার এখানে প্র্যাকটিস সুরু করলেন, তার ইতিহাস। জায়গাটি ওঁর ভালো লাগে। 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড্স ইগনোবল্ স্ট্রাইফ।' 'লেখকদের এই রকম কোনো পীসফুল জায়গাতেই থাকা উচিত।' 'সত্যিকারের ভারতবর্ষকে দেখতে চান? এখানকার সাধারণ মানুষদের ভেতর দিয়ে দেখুন। আপনার আর্টিফিশ্যাল শহরে নয়,—পলিটিকাল কচকচির ভেতরেও নয়।' 'আপনি কলকাতায় কী করেন—লেখা ছাড়া? কে কে আছেন?'

নিজের প্রসঙ্গটা সাধ্যমতো এড়িয়ে যেতে চাইছিল কিরণ, তবু কল্যাণীই জোর করে আবার কথাটা টেনে আনলেন।

—একা একা কষ্ট হবে না আপনার? স্ত্রীকে আনলেন না কেন?

একটু চুপ করে থেকে কিরণ জবাব দিলে, তিনি অসুস্থ।

—অসুস্থ?—ডাক্তারের মন স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে উঠল: কী হয়েছে? কী অসুখ?

টেবিলের ওধার থেকে শর্মিলার দু'টি গভীর চোখ যে তারই মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। সেদিকে না তাকিয়ে কিরণ তা অনুভব করতে পারছিল। কেকের একটা টুকরো নাড়াচাড়া করতে করতে আলতো-ভাবে জবাব দিলে, মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট।

—সে কি!—দু-তিনটে সরুমোটা স্বর এক সঙ্গে কানে এল, কিন্তু কোনটা যে কার কিরণ তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না।

আরো স্বচ্ছ, আরো সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বললে, পাগল হয়ে গেছে।

চায়ের টেবিল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু পরে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন ডাক্তার রায়চৌধুরী। অপরাধীর মতো বললেন, হাউ আন্‌ফরচুনেট! ট্রিটমেণ্ট—

—আর কিছু করবার নেই।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের ভেতরে অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো শোষক ছিদ্রে ভরা সেই আকাশ; সেই ক্লান্ত, সেই অবসাদভরা সকাল, সেই ধোঁয়াটে সন্ধ্যা, শরীরে, মনে, জীবনচিন্তায় সেই কটুস্বাদ! এই চায়ের টেবিল, এই সুখী মানুষগুলি—এদের যেন হঠাৎ সব মিলে একরাশ সাজানো পুতুল বলে বোধ হল।

ডাক্তার রায়চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

—সত্যি, জীবনে সুখী হওয়ার দাবি নিয়ে মানুষ আসে নি। নইলে আমার ছোট ভাই অমিতাভ অমন করে একটা অ্যাক্সিডেণ্টের মধ্য দিয়ে কেনই বা চলে যাবে আর কেনই বা মিলার মতো মেয়ে—

রায়চৌধুরীর স্বর ভারি হয়ে এল। কল্যাণী নড়ে উঠলেন।

—আঃ, কী করছ। ভদ্রলোককে চা খেতে ডেকে এনে—

—ঠিক, ঠিক, ভাবী অন্যায় হয়ে গেছে।—ডাক্তার নিজেকে সামলে নিলেন, বললেন, নিন, খান—খান। অন্য গল্প চলুক।

কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছিল, অন্য গল্প আর ভালো করে জমল না। কিরণের উপন্যাস সম্পর্কে কল্যাণীর মনে কিছু প্রশ্ন ছিল, ডাক্তারের দু-একটা কবিতা শোনাবার কথা ছিল, লেখার গান গাইবার ব্যবস্থা ছিল, কিছুই হল না। সকলেরই একটা কথা মনে হল, আজ থাক, আর একদিন হবে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে কিরণ যখন উঠতে যাচ্ছিল, কোত্থেকে এক অটোগ্রাফের খাতা হাতে বাসবের আবির্ভাব।

—না—না, খালি সই করলে হবে না, কিছু লিখে দিন কিরণবাবু।

রায়চৌধুরী ধমকে উঠলেন: কিরণবাবু কী! কাকা বলতে পারিস না?

কথাটা আর কেউ লক্ষ্য করলেন না, কিন্তু চমকে উঠলেন একজন। চকিতে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তাঁর। লোকটি শর্মিলা।

(ক্রমশঃ)

রাজধানী :

বুধবার ছিল হরতাল পালনের দিন। আগের সব হরতালের তুলনায় এবারের হরতাল কতটা সফল হয়েছে এ নিয়ে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থেকে সুরু করে পান-বিড়ির দোকানদার পর্যন্ত বিতর্কের ঝড় তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাংবাদিকদের বলেছেন, হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের হরতাল কিছুই হয় নি। হাওড়া ও শিয়ালদহের লাইনগুলোতে ট্রেন পুরোপুরি চলেছে। ১২০টি ষ্টেট বাস এবং ৩৩টি ট্রাম চলাচল করেছে। এ ছাড়া ট্যাক্সি, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি—সব কিছুই চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই যানবাহন চলা সত্ত্বেও শহরের জীবনযাত্রা কি স্বাভাবিক ছিল? অফিসগুলোতে তো শতকরা ২০ জনের অধিক মানুষ আসে নি। ট্রেন চলেছে সত্যি। তাতে যাত্রী ছিল কজন?

এবারের হরতালের রূপটাই আলাদা। এর সঙ্গে আগের হরতালের তুলনা চলতে পারে না। পশ্চিম বাংলার এইটি না কি অষ্টাদশ হরতাল। এর আগের সতেরটি হরতালের ইতিহাসে বেসুরে তালি বাজাবার নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হরতাল আহ্বান করতেন রাজ্যের বামপন্থী দলগুলো এবং তাদের অনুগামী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলো মিলিতভাবে। কংগ্রেস থাকতেন মৌন। সরকারের পক্ষ থেকে হরতালের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালনার এবং হরতালকে ব্যর্থ করবার ব্যাপক প্রস্তুতিও হতো না।

এবারে হরতালের আহ্বায়ক কমিউনিস্ট পার্টি, আর-এস-পি এবং তাদের খুচরা পাঁচটি বামপন্থী নামধেয় সংস্থা। কমিউনিস্ট পার্টির দুর্গতির সাথে সাথে খুচরা দলগুলো পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছেন না। পি-এস-পি হরতালের অংশীদার হতে পারেন নি। শ্রীঅশোক মেহতাকে হারিয়ে তাঁরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক 'সংখ্যালঘু বাঁচাও' আন্দোলন চালিয়ে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। হরতালের সামিল হওয়ার চেষ্টা তাঁরা করেন নি।

● হরতালের দিনে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশী আতঙ্ক

হরতাল ডাকা হয় জাতীয় জীবনের ব্যাপকতর স্বার্থে যখন ঘটে বিঘ্ন। এবারের হরতালের আহ্বায়কগণ সেই ব্যাপকতর স্বার্থের সাথে একটা লেজুড় জুড়ে দিয়েছিলেন। জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার শ্রমিক ধর্মঘট সাধারণ মানুষ একবাক্যে সমর্থন করতে পারেন নি। এই বিরোধে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের পক্ষপাতমূলক নীতির গন্ধ না কি পেয়েছেন। তাই এই ধর্মঘটটিকেও সর্বাত্মক ধর্মঘটের অন্যতম কারণ করা হয়েছে। হরতালের সাথে জয়াকে টেনে আনার যৌক্তিকতা অনেকেই তাই স্বীকার করতে পারেন নি।

মানুষ যখন হরতাল সম্পর্কে কিছুটা দোদুল্যমান চিত্ত, ঠিক সেই সময়টিতে প্রকাশিত হল সরকারের সদম্ভ উক্তি—হরতালের মোকাবিলা করা হবে, গুলীচালনা করা হবে প্রয়োজনবোধে। গণদেবতা খুবই ধৈর্যশীল, সহনশীলতায় অপরাজেয়, কিন্তু ক্ষমতার দম্ভের বাড়াবাড়ি দেখলে ক্ষেপে ওঠে। সরকারী ঘোষণার পরই আলোচনা সুরু হ'ল, পরিসংখ্যানের তথ্যে চালের অঢেল ব্যবস্থার কথা থাকা সত্ত্বেও যে-সরকার লুকানো ধান-চাল বের করে মানুষের অভাব মেটাতে পারেন না, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে যে-সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার পক্ষেই পুঁজিপতিদের স্বার্থে এমন ধারা উক্তি সম্ভব।

হরতালকে তাই সাধারণ মানুষও চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। পুলিশের তোড়জোড় ব্যাপকভাবেই করা হয়েছিল। মঙ্গলবার বিভিন্ন বামপন্থী দলের ৮০ জনকে এবং সমাজবিরোধী হিসেবে এক হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ট্রাম, বাস, ট্রেন এবং কিছু কিছু ট্যাক্সি, রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়িও চলেছে, পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে অনেকের চোখের জলও নামিয়েছে কিন্তু হরতাল ব্যর্থ হয় নি। মহানগরীর, শহরতলীর এবং বিভিন্ন জেলার শহরগুলোর কর্মচঞ্চল জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার জনশূন্য রাজপথে ছেলের দল হকি খেলেছে।

● হরতালের দিনে হাওড়া ব্রীজ

যাদের চাল বাড়ন্ত, মাছ যারা চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তিন টাকা কিলোগ্রামে তেল কেনবার পয়সা যার ট্যাঁকে নেই, হরতালের দিনে মুখ্যমন্ত্রী কাটা পোনা ও মাগুর মাছের ঝোল সহযোগে তৃপ্তিতে অন্ন মুখে তুলেছেন শুনে তারা খুশি মনে সরকারের সকল আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। ক'খানা ট্রাম চলেছে, সরকারী দপ্তরে, কলকারখানায় ক'জন মোসাহেব জমায়েত হয়েছিলেন অথবা জীবিকা হারাবার ভয়ে ক'জন কাজে যোগ দিয়েছিলেন সেগুলো বড় কথা নয়। আসল কথা, হরতালে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ধর্মঘটকে ভেঙে দেবার জন্য সরকারের পুলিশের দৃঢ়তা দেখে স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে চোরাবাজারী ও মুনাফা-শিকারী ও গুণ্ডাদমনের বেলায় পুলিশের এই কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় কেন পাওয়া যায় না। জাগ্রত গণমনের মুকুরে এই জাতীয় চিত্রের প্রতিফলন শুভ নয়। বামপন্থীদের প্রতি সাধারণ মানুষ বাম হলেও সরকারকে তারা দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করতে পারছেন না। কাজেই এ দিনের হরতালকে অন্যান্য হরতালের সাথে তুলনা করে না দেখাই ভাল। বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করে বচন-বিলাস ও সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা লোক ভোলানো চিরদিন সম্ভব নয়।

* * *

হরতাল হল শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী মানুষের নীরব প্রতিবাদ জ্ঞাপনের স্বীকৃত হাতিয়ার। গণতন্ত্রের বাতি নিভিয়ে অন্ধকারের অচলায়তনে তাকে নিক্ষেপের যেখানে উদ্যোগ চলছে, সেখানে হরতালের সাফল্য বা অসাফল্যের পরিমাপের যে-ধারা অবলম্বিত হয়েছে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কলকাতার পৌরপিতারা ১৫ই মে কাগজ চাপা দিয়ে টেবিলে বাজনা বাজিয়ে, সরোষ চীৎকার ও লাফালাফি —দাপাদাপি করে যেভাবে দপ করে কক্ষের বাতি নিভিয়েছিলেন তাতে গণতন্ত্র-বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের মনে আশঙ্কা দেখা না দিয়ে পারে না। এই অন্ধকারের মধ্যে আরেক দল বারান্দা থেকে আসা স্তিমিত আলোকে খুশিমাফিক প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন। পৌরপিতাদের হাতে গণতন্ত্রের এই লাঞ্ছনার পর তার অপমৃত্যু ঘটা বিচিত্র নয়।

২৪ পরগণা :

বাঁধ ভেঙে জোয়ারের জল প্রবেশ করেছে সুন্দরবনের ১৯ হাজার বিঘা জমিতে। কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমা থানার হাজার বিঘা জমি প্লাবিত হয়েছে লোনা জলে। এবং এ ছাড়া কোন কোন বাঁধ উপচে এবং যোগার মধ্য দিয়ে লোনা জল ঢুকেছে চার হাজার বিঘা পরিমিত জমিতে। লোনা জলে ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ মরে যাচ্ছে। ফাটল ধরিয়েছে কয়েকজন কৃষকের ঘরের দেওয়ালে। মাঠের ফসল যাচ্ছে শুকিয়ে। পানীয় জলের অভাবে রোগ বিস্তারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গরমের সময়টায় সুন্দরবনের বাঁধ ভাঙার নজীর নেই। এবারের অকাল বর্ষণের সাথে ঘূর্ণিবাত্যায় তাড়িত হয়ে জোয়ারের জল পেয়েছিল প্রচণ্ড গতিবেগ। জমিদারী আমলের সংস্কারহীন জীর্ণ বাঁধের পক্ষে সে গতিবেগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। জমিদারী প্রথা সরকার তুলে দিয়েছেন। বাঁধগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন সরকারের। মেরামতের অভাবে বাঁধগুলোর উচ্চতাও হ্রাস পেয়েছে। সদাশয় সরকার বাহাদুর বাঁধগুলোর যথাসময়ে মেরামতের ব্যবস্থা করলে সুন্দরবনের চাষীদের আজ এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

মেদিনীপুর :

হলদিয়ার প্রস্তাবিত বন্দরের নক্সার চূড়ান্ত রূপ দিন-দশেকের মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। নতুন নক্সা অনুযায়ী হলদিয়া বন্দর দিয়ে কয়লা, খনিজ লোহা, তেল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য মাল যাতায়াত করবে এক কোটি বিশ লক্ষ টন। তেলের জেটি নির্মাণের টেণ্ডার এখন গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ অপরাপর ইঞ্জিনীয়ারিং কাজের টেণ্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা

হলদিয়ার কাজের অগ্রগতিতে খুশি হয়ে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধে হলদিয়ার জন্য দিতে সম্মত হয়েছেন।

সমস্যার ভারে পীড়িত পশ্চিম বাংলায় হলদিয়া নিয়ে এসেছে একটা আশার বাণী। রপ্তানী বাণিজ্যের বোঝা বহনের ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথেই হলদিয়াতে তেল শোধনাগার, ইস্পাত-কারখানা, সার উৎপাদনের কারখানা এবং আনুষঙ্গিক উপজাত দ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রয়েছে। এগুলো বাস্তবে রূপ নিলে হলদিয়া বাংলার বুকে বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুলে দেবে—হলদিয়া হবে দ্বিতীয় দুর্গাপুর। শুধু পশ্চিম বাংলা কেন ভারতের আর্থিক কাঠামোতেও নতুন শক্তি এখান থেকে সঞ্চারিত হবে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অগ্রগতিতে যাঁরা বীতশ্রদ্ধ—বাংলার দুঃখে যাঁরা প্রচ্ছন্ন আনন্দ উপভোগ করেন, এই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক অফিসার দিল্লী দরবারের কিছুটা কৃপাভাজন।

দুর্গাপুরের শিল্পনগরী গড়ে তুলতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত শ্রদ্ধেয় নেতা এবং শক্তিমান পুরুষকেও এই দলটি কম ক? দেন নি। হলদিয়ার বিপুল সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেবার প্রয়াসে এই চক্রটিই না কি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অপর কোন সুযোগ না পেয়ে পশ্চিম বাংলা সরকারের ওপর কাজের গাফিলতির অপবাদ চাপিয়ে বাজিমাৎ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীহুমায়ুন কবিরের কর্ম-তৎপরতায় এবারের মত কাঁড়া কেটে গিয়েছে। তিনি সরেজমিনে তদন্ত করে পশ্চিম বাংলা সরকারের কাজের কোন ত্রুটি পান নি।

বাঘের থাবা অঙ্গে পড়লে যা সহজে শুকোতে চায় না। কাজেই রাজ্য সরকারকে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা—দিল্লীর ঘাঁটি সামলাবার একটু শক্তপোক্ত ব্যবস্থা করা উচিত হবে। রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা দিল্লী দরবারে আগের মত প্রভাব না কি বিস্তার করতে পারছেন না। রাজ্য অর্থমন্ত্রী সম্পর্কে এমনি ধরণের কানাঘুষা সম্প্রতি উঠেছিল।

মুর্শিদাবাদ ঃ

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় ২২৫টি গভীর নলকূপ খননের প্রস্তাব আছে। জেলা কৃষিদপ্তর নাকি নলকূপ খননের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খোঁজাখুঁজির কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলেই প্রস্তাবিত সময়সীমার মধ্যে নলকূপগুলো বসানো সম্ভব হবে। তা' না হলে ব্যাপারটা প্রচার-মাহাত্ম্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের খাদ্য-সমস্যা মেটাতে প্রয়োজন জমিতে নিয়মিত জলসেচ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বড় রকমের জলসেচের সুবিধা যেখানে নেই সেখানে গভীর নলকূপ নিশ্চয়ই অভাব পূরণ করতে পারে। সেচের সুবিধা পেলেই নিবিড় চাষ সম্ভব।

* * *

বহরমপুর জেলা বোর্ডের কর্মচারী শ্রীসামাউন কিবাসকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, সামাউন কিবাস গোরাবাজারের একটি চায়ের দোকানে বসে পাকিস্তানে সংবাদ পাচার করতেন। পুলিশ তাঁর অনুসন্ধানে ছিল, খবর পেয়ে ছুটি নিয়ে মাস দুই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ি ঃ

ভারতীয় চা-কর সমিতির ৪৯তম বার্ষিক উৎসব সেদিন সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ।

সমিতির সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আর্থিক অনটনের জন্য চা-শিল্পের সঙ্কটের কথা তুলে ধরেছিলেন। চা-শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থের সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য-ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাবও তিনি করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি উত্তর বাংলার উন্নয়ন ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজ্যের দক্ষিণ ও অন্যান্য ভাগে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে অগ্রগতি সূচিত হলেও উত্তর বাংলার জনজীবন এদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। হিমালয়ের সন্নিহিত এলাকায় কয়লা, চূণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোরও

● চা-কর সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ

প্রয়োজনমত অনুসন্ধানের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা হয় নি।

পূর্বভারতের চা-শিল্পের সমস্যা ও উত্তর বাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে শ্রীঘোষের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সরকারী অবহেলার অভিযোগ নতুন নয়। রাজ্য সরকার এই এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কোন কাজে হাত দেন নি। যাতায়াত ব্যবস্থারও সুরাহা করে উঠতে পারেন নি। পরিবহন সহজ ও সুগম না হলে কোন শিল্পেই আশানুরূপ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। উত্তর বাংলার চা-বাগানগুলোর কাছে এটিও একটি বিরাট সমস্যা। চা আমাদের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান পণ্য। উত্তর বাংলার চা-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত।

কোচবিহার:

সর্বস্ব ফেলে আসার পরও হিন্দুদের ওপর সীমান্ত এলাকায় পাক-দুর্বৃত্তদের নির্মম অত্যাচার, যুবতী হিন্দু মেয়েদের ওপর পাশবিক আক্রমণ, জোর-জবরদস্তি, শেষের সম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেবার মর্মন্তুদ কাহিনী প্রতিনিয়তই দিনহাটার উদ্বাস্তুদের কাছে শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তানের লালমণির হাট ও মোগলহাট হয়েছে পাক আনসার বাহিনীর ও পাক-পুলিশের লুঠতরাজের প্রধান কেন্দ্র। গত ১৩ই মে ময়মনসিংহের অলোয়া গ্রামের চাষী শ্রীবুদ্দুরাম দাস তাঁর বোবা যুবতী কন্যাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে এসেছেন দিনহাটা আশ্রয়শালায়। আনসার বাহিনীর লোকেরা দলবদ্ধভাবে মেয়েটির ওপর অত্যাচার চালিয়েছে মোগলহাট গ্রামে। বুদ্দু দাসের কাছ থেকে আদায় করেছে ৫৫৲ টাকা। নতুন জামা, জুতা ও কাপড় পরে পর্যন্ত মোগলহাট দিয়ে আসাও নিরাপদ নয়। পাক-পুলিশের নজরে পড়লেই সে সব ছেড়ে আসতে হচ্ছে।

এ সব ঘটনায় দিনহাটা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা ভারত সরকার না করতে পারলে বিষময় প্রতিক্রিয়া যে-কোন মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।

● পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দার্জিলিংয়ের স্কুলের কিশোর কিশোরীদের নৃত্যগীতের রেশ নিরালা পাহাড়ের বুকে আনন্দের স্পন্দন জাগায়।

কোচবিহারে মাছ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। বাজারে মাছের আমদানী হ্রাস পাওয়াতে দামও গিয়েছে অত্যন্ত বেড়ে। চারটাকা কিলোগ্রামের কম দিনহাটার বাজারে মাছ পাওয়া খুবই কঠিন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন রুই মাছের দাম উঠেছিল দশটাকা কিলোগ্রামে, ডিমের জোড়া বিক্রী হ'চ্ছে ৪০ নয়া পয়সা করে। আলু ৮৫ নয়া পয়সা, বেগুন ৫০ নয়া পয়সা এবং পটলের মূল্য পাঁচ সিকে।

প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোচবিহারে কোন শিল্প গড়ে তোলার প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় নি। কৃষিই এখানকার মানুষের প্রধান উপজীব্য। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং উদ্বাস্তুর চাপ মিলে সাধারণ মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

দার্জিলিং:

দার্জিলিং ছিল বাংলার লাট বাহাদুর, তাঁদের পারিষদ দল এবং বিত্তবানদের গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের শহর। তাঁদের চিত্তবিনোদনে সাহায্য করে এখানকার নেপালী, লেপচা ভুটিয়া, সিকিমী প্রভৃতি উপজাতিরা ক'টা মাস দু'পয়সা কামিয়ে নিত। এ ছাড়া পর্বত-শীর্ষের মানুষগুলোর জীবনের সন্ধান বড় একটা অন্যের চোখে পড়তো না। এই উপেক্ষাই পাহাড়ের কোলের সরল অথচ কঠিন প্রকৃতির মানুষগুলোর মনে বিরাগের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল সমতলের মানুষের প্রতি। এক সময় বাংলার বাইরে যাবার দাবীও তাদের একাংশ তুলতে কসুর করেন নি।

সেই মলিনতা কেটে গিয়েছে—নতুন আশার আলোতে এখন দার্জিলিং উদ্ভাসিত। পল্লীতে পল্লীতে পড়ে গিয়েছে কর্ম-চাঞ্চল্যের অভূতপূর্ব সাড়া। সুতি, পশম, চামড়া প্রভৃতি কুটিরশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে পাহাড়ের কোলের উপেক্ষিত জীবনে নেমে এসেছে আত্মনির্ভরতা। এর পেছনে রাজ্য সরকারের উদ্যমও রয়েছে যথেষ্ট।

সরকার দার্জিলিং জেলায় ধানের পরিবর্তে ফলের চাষ বৃদ্ধির পরিকল্পনাও নিচ্ছেন। এখানকার কমলা লেবুর খ্যাতি রয়েছে। আপেল, বেদানা, আঙ্গুরাদি ফলের চাষ এখানে ভাল হতে পারে বলে সরকারী বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। ধান দার্জিলিং এলাকায় ভাল হয় না। পরিকল্পনা মাফিক ফল ও আলুর চাষ বাড়াতে পারলে দার্জিলিং পশ্চিম বাংলার আর্থিক জীবনের অনেকখানি মোড় ফেরাতে সক্ষম হবে।

কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের কথাগুলি

সেই বিশাল বনস্পতি আর নেই। ছায়া তার জ্বলে গেছে, মায়া তার মিলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে তার ছত্রধারী নীলাকাশ। আর দিনে দিনে দূরে স'রে গেছে ভাগীরথী—যা ছিল তার পাদদেশের নায়িকা এবং কালে কালে পিছিয়ে গেছে গ্রাম—যা ছিল তার উত্তরদেশের বৈতালিক। ধাপে ধাপে তলিয়ে গেছে দক্ষিণের বন, পূবের চারণভূমি এবং ঈশান কোণের সেই চির-বসন্তের মেলা। আর সেই পূজারী মহেন্দ্রের আত্মা-প্রতিম যে-অগ্নিবর্ণ শিমূল—উত্তর-পশ্চিম থেকে তারও মহাপ্রস্থান ঘটেছে অনেককাল আগেই। কিন্তু এককালে সবই ছিল। প্রকৃতি তখন আপন খেয়ালের রাণী হলেও, তার প্রাত্যহিক পদসঞ্চারে তেমন কোনো তালভঙ্গের লক্ষণ ছিল না। তার প্রতিপদক্ষেপেই একটি সুর ছিল, ছন্দ ছিল এবং বহু বর্ণের অতীন্দ্রিয়তা ছিল তার প্রতিদিনের আত্মপ্রকাশে। কখনো গানে, কখনো নাচে এবং কখনো সংযত অথচ প্রতুল কলহাস্যে তার বিবিধ চিত্রের সংস্থাপন ঘটতো এপারে-ওপারে, বনে বনে—সবুজ সংরাগে, হাটে মাঠে—প্রাণের মেলায় এবং ঘাটে ঘাটে—কাঁখের কলসে অথবা সন্ধ্যার শ্রোণী অবনত অকৃত্রিম আবেদনে। তখন সেই বিশাল বনস্পতি ছিল এতদঞ্চলের এক গম্ভীর শরণ। তার ছায়াতল ছিল স্নিগ্ধ, মদির এবং বিস্তৃত। মেঠো পথে চলতে চলতে সে-ছায়ার উদার দাক্ষিণ্যে ধন্য হতো পথিক। তার ডালে ডালে পাখিদের অবাধ স্বাধীনতায় কোনো নির্বেদ ছিল না। নৌকোর নোঙর তুলে, মাঝে মাঝে সেখানে মাঝিরাও আসতো দল বেঁধে। তারা সেই ছায়াতলের তৃণশয্যায় শরীর পেতে এবং শীতল হাওয়ার কোলে তাদের সমস্ত ক্লান্তিকে শুইয়ে দিয়ে গান গাইতো, গল্প বলতো এবং হয়তো ঘুমিয়েও পড়তো কখনো বা।

● কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের একটি দৃ

আর সেই বংশীবাদক রাখাল—যে ছিল সেকালের সাধারণ মানুষের কাছে কলিকালের কৃষ্ণ, তারও সারা দিনের একমাত্র নিকেতন ছিল সেই বনস্পতির ছায়াতল। সে ছিল তৎকালীন আহিরীটোলার রাখাল। গরুর পাল নিয়ে সে প্রত্যহই আসতো এদিকে। ভাগীরথীর কূলে কূলে এবং আশপাশের বিক্ষিপ্ত তৃণাঞ্চলে গরু ছেড়ে দিয়ে, সেই ছায়াতলে বসেই সে বাঁশি বাজাতো

শ্রীপদাতিক

আপন মনে। তার বাঁশির সুরে সুরেই স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতো গরুর পাল। সুরের রেশ সে-অঞ্চলের যতোদূর পর্যন্ত ভেসে যেতো, ঠিক ততোদূর পর্যন্তই তারা চরে বেড়াতো। এমন দূরে তারা যেতো না—যেখান থেকে তাদের প্রিয় রাখালের বাঁশি শোনা অসম্ভব। দিনান্তে সময় হলেই তারা আবার বাঁশির ডাকেই ফিরে আসতো রাখালের কাছে। ... ব্যাপারটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের। এই আশ্চর্য দৃশ্য বেশ কিছুদিন ধ'রে প্রত্যক্ষ করার পর, সাধারণ লোকের মনে ধারণা জন্মে: রাখালের মধ্যে অলৌকিক শক্তি কিছু নিশ্চয়ই আছে। তাই নির্বোধ পশুরাও তার সঙ্কেত বুঝতে পারে। সুতরাং সাধারণ মানুষের এই ধারণাসূত্রে কলিকালের কৃষ্ণ বলেই সে জনশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠা পায় দিনে দিনে। দিনে দিনে তার ভক্তও জুটে যায় অনেক। ভক্তরা সেই বনস্পতির ছায়াতলে এসেই রাখালকে ঘিরে ব'সে থাকে। তার বাঁশি শোনে। কিন্তু নির্বোধ বা নিরীহ রাখালের কাছে এ-ব্যাপারটা খুব দুর্বোধ্য মনে হয়। সে কিছুই বুঝতে পারে না। তাছাড়া তার চারপাশ ঘিরে এত লোকের প্রাত্যহিক উপস্থিতিও সে সহ্য করতে পারে না। এ যেন এক বিশ্রী উপদ্রব। সম্ভবত এই উপদ্রব এড়ানোর জন্যেই দিন-কয়েক পর সে স'রে যায় অন্য অঞ্চলে। কিন্তু রাখালের পক্ষে এভাবে সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে থাকা সহজ হলেও, তৎকালীন ভূ-স্বামী চৌধুরীকে এড়ানো ততো সহজ নয়। ভূ-স্বামী চৌধুরী লোকমুখে রাখালের মাহাত্ম্যের কথা শুনেই সাড়ম্বরে সেই রাখালকে টেনে নিয়ে আসেন তাঁর গৃহে। তারপর

শ্যামরায়-মন্দির স্ব পাশেই মন্দির-প্রতিম একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে সেখানেই তিনি রাখালকে সযত্নে স্থান দেন। তাঁর ধারণা : সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারলেই রাখালবেশী এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ একদিন উদ্‌ঘাটন করবেন ভক্তবৃন্দের কাছে।

কিন্তু রাখাল ? তার কাছে এ যেন এক অভাবনীয় বিপদ, যেমন দুঃসহ, তেমনই মর্মান্তিক। মন তার গরুর পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায় মাঠে মাঠে, গাছতলায় ব'সে বাঁশি বাজাতে চায় স্বাধীনভাবে। সুতরাং সে জমিদার-গৃহের এই কঠিন বন্দীদশা মেনে নেবে কেন ? একদিন গভীর রাত্রে সে জমিদার-গৃহ ছেড়ে গোপনে পালিয়ে যায়।

পরদিন সকালেই রাখালের এই আকস্মিক অন্তর্ধান লক্ষ্য ক'রে জমিদার লোকজনের সাহায্যে তার খোঁজ-খবর সুরু করেন। কিন্তু বিস্তর খুঁজেও রাখালকে যখন আর কিছুতেই পাওয়া গেল না, তখন এক প্রতিমা-শিল্পীকে রাখালের এক কল্পিত মূর্তি গড়ার জন্য নির্দেশ দেন জমিদার। শিল্পী পুরস্কারের বিনিময়ে সে-নির্দেশ পালন করেন। তাঁর নিপুণ হাতে অচিরেই জন্মলাভ করে রাখালের সেই মূর্তি—জমিদার কর্তৃক যার প্রতিষ্ঠা ঘটে শ্যামরায়-মন্দিরের পার্শ্ববর্তী সেই গৃহে—যেখানে রাখাল স্বয়ং বসবাস ক'রে গেছে দিন-কয়েক।

শোনা যায় : রাখালের এই মৃত্তিকা-নির্মিত মূর্তি চৌধুরীদের গৃহে নাকি সেদিন পর্যন্তও ছিল, যেদিন তাঁদের সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে। অনেকের মতে : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারের পর সে-মূর্তিটি নাকি স্থানান্তরিত হয়েছিল বড়িশায়। কিন্তু বড়িশার প্রাচীন অধিবাসীদের কাছ থেকে এ-সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

সেই যে বিশাল বনস্পতি—ছায়ায় যার বাঁশি বাজাত্তে কলিকালের কৃষ্ণ, অধিষ্ঠান তার কোথায় ছিল ? উল্লেখিত কিংবদন্তীর যাঁরা এ-কালের সূত্রধার, কথায়-কথায় তাঁরাই ব'লে থাকেন : সেই বনস্পতি ছিল বর্তমান কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটেরই কোনো এক অংশে। সেখান থেকে অনতি-দূরেই ছিল একটি শিমূল গাছ—যা পূজারী মহেন্দ্রের নিষ্পাপ আত্মার রূপান্তর বলেই প্রচলিত ছিল সেকালের সাধারণ মানুষের কাছে।

ওলন্দাজ বণিকদের 'Bank-Zall' বা জলকর আদায়ের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার কালে, বর্তমান কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের তৎকালীন সেই বনস্পতির জীবনান্ত ঘটে একাধিক বজ্রপাতের ফলে। অবশ্য তা সত্ত্বেও সে নিষ্পত্র অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়েছিল বেশ কিছুকাল। তারপর জন-কয়েক কাঠুরিয়া কর্তৃক সে-অঞ্চল থেকে সেই মৃত বনস্পতির অপসারণ ঘটে আলানীর উদ্দেশ্যে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে সময়। যুগের পর যুগান্তরের পরিবর্তন আসে ঘনিয়ে। এ-দেশের কারবার গুটিয়ে স্বদেশের পথে যাত্রা করে ওলন্দাজ বণিকের দল। তারপর আসে ইংরেজ পরিচালিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কালীক্ষেত্র, সুতানুটী এবং গোবিন্দপুরের বিভিন্ন অংশে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে তারা। সম্ভবত ঠিক এই সময়েই একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী—ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যাঁর কোনো যোগা-যোগ ছিল না, তিনিই এক বৃহদায়তন বসতবাটী নির্মাণ করেন সেই অংশে—যে-অংশ থেকে অপসারণ ঘটে সেই বিখ্যাত বনস্পতির। এই ইংরেজ ব্যবসায়ীর নাম রিচার্ড কোর্ট—যিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক সেনাপতি হলওয়েলের সঙ্গে বন্দী হন।

তারপর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করে সমগ্র বাংলায়, তখন তাদেরই মন্ত্রণা-সভার গোপন অধিবেশনের জন্য একটি গৃহের অভাব অনুভূত হয়। তাই কোম্পানী তখন উক্ত উদ্দেশ্যেই মিঃ রিচার্ড কোর্টের বসতবাটী ক্রয় করে। তারপর থেকে মন্ত্রণাসভার সঙ্গে এ-দেশীয়দের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রের কার্যক্রমও চলতে থাকে উক্ত গৃহেই। শোনা যায় : সে-গৃহ এভাবেই পরে 'কাউন্সিল হাউস' নাম ধারণ ক'রে ইতিহাস-বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এ-গৃহেই কোনো এক মন্ত্রণাসভার অধিবেশনে তৎকালীন কাউন্সিল সদস্য মিঃ ষ্টেনলেক ব্যাটসনের সঙ্গে প্রচণ্ড হাতাহাতি হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের। ব্যাটসনের বজ্রমুষ্টির আঘাতে সাংঘাতিক আহত হন হেস্টিংস। সুতরাং তিনি রাগে এবং অপমানে ব্যাটসনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজদরবারে লিখে পাঠান :

"Mr. Batson making some unbecoming reflections on the Governor, I replied thereto, and I appeal to the Board whether in any indecent or provoking terms, upon which Mr. Batson gave me the lie and struck me in the presence of the Board. I leave them to take such notice as they may think proper of the indignity offered to themselves by this steps of Mr. Batson's. For my own part I cannot think of sitting any longer at a Board where I am subject to such insults."

বলা বাহুল্য, হেস্টিংসের এই অভিযোগের ফলেই কাউন্সিল থেকে বহিষ্কৃত হন মিঃ ব্যাটসন। অবশ্য পরে তিনি কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্যের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করায় সদস্যপদ আবার ফিরে পান। কিন্তু সকলের সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন অধিবেশনের আসন গ্রহণ করা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে চাইলেন কাউন্সিল

কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের আর এক দৃশ্য

সভাপতি ফ্র্যান্সিটার্ট। তবে আইনত তা সম্ভব নয় ব'লে ভ্যান্সিটার্ট নিজেই বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন এবং সভাপতি-রূপে তিনি তাঁর বাসভবনে বসেই কাউন্সিলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

মিঃ রিচার্ড কোর্ট নির্মিত গৃহটি বৃহদায়তন হলেও, পরিবেশগত দিক থেকে তা নাকি কাউন্সিল হাউসের উপযুক্ত ছিল না। তাই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মন্ত্রণাসভার এক বিশেষ অধিবেশনে গৃহ-পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা সভার কার্য-বিবরণীতে উল্লেখ আছে :

"The present Council room being from its situation greatly exposed to the heat of the weather and from its vicinity to public office very ill-calculated for conducting the business of the Board with that privacy which is often requisite, it is agreed to build a new Council room at a convenient distance from the offices."

কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যত্র কোনো নতুন 'কাউন্সিল' হাউস' নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি। কেবল গোপন ষড়যন্ত্র বা পরামর্শের জন্য 'Legislative Departments Office' নামে একটি গৃহের পত্তন ঘটে তৎকালীন টাউনহলের পশ্চাদ্ভাগে। 'কাউন্সিল হাউস' বা 'কাউন্সিল চেম্বারের' যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রিচার্ড-নির্মিত গৃহটিই বহাল থাকে। তবে মন্ত্রণাসভার নির্দেশে সে-গৃহের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে।

১৭৭৫—'৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত কাউন্সিল হাউস বা কাউন্সিল চেম্বারেই মানব-দরদী ফ্রান্সিস এবং ধূর্ত হেস্টিংসের মধ্যে আরেকটি অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়। হেস্টিংস ইংরেজ জাতির অনেক উপকার সাধন করলেও, এ-দেশীয় সাধারণের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তাঁরই অনাচার এবং অত্যাচারে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগেই জাগে নিদারুণ হাহাকার। একাধিক দুর্ভিক্ষেরও স্রষ্টা তিনি এবং তিনিই ফাঁসির রজ্জুতে আবদ্ধ ক'রে হত্যা করেন মহারাজ নন্দকুমারকে। তাছাড়া অসৎ উপায়ে তিনি আত্মসাৎ করেন এ-দেশবাসীর অপরিমেয় সম্পত্তি। তাই মন্ত্রণাসভার এক বিশেষ অধি-বেশনে হেস্টিংসের এই কুৎসিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান ফ্রান্সিস। কিন্তু হেস্টিংস ফ্রান্সিসের এই প্রতিবাদ তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তাঁর উদ্দেশে উচ্চারণ করেন নানাবিধ কটূক্তি বা শ্লেষবাক্য। তাই ফ্রান্সিস এবার আর বাক্যব্যয় না ক'রে হেস্টিংসের মুখের ওপর ঘুসি চালান এবং এভাবে বার-কয়েক ঘুসি চালানোর পর, বেশ মর্মান্তিকরূপেই আহত করেন হেস্টিংসকে।

হেস্টিংস এই অপমানের জ্বালায় ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধেও অভিযোগবার্তা প্রেরণ করেন ইংলণ্ডের দরবারে। কিন্তু ফ্রান্সিসের পক্ষে মিঃ মনসন, ক্লেভারিং এবং আরও জন-কয়েক সদস্যের সমর্থন থাকায় হেস্টিংস তেমন সুবিধে করতে পারেন না। বরং ফ্রান্সিস, মনসন, ক্লেভারিং—প্রভৃতির পাল্টা অভিযোগে হেস্টিংস ফিরে যান ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টেই তাঁকে অজস্র অপরাধে অভিযুক্ত করেন মনীষী এডমণ্ড বার্ক। বার্কের কাছে হেস্টিংসের যাবতীয় অপরাধের মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেন ফ্রান্সিস এবং ক্লেভারিং। মনীষী মিল, মেকলে প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দও হেস্টিংসের বিপক্ষে দাঁড়ান। তাই হেস্টিংসকে শেষ পর্যন্ত আদালতের কাঠগড়াতেও হাজির হতে হয়। সেখানে ১৪৫ দিন মামলা চলার পর বার্কের তীক্ষ্ণ যুক্তিই তাঁর শাস্তিবিধান করে যথোপযুক্ত। এই মামলায় হেস্টিংসের ব্যয় হয়েছিল ৭০,০০০ পাউণ্ড।

যাই হোক, উল্লেখিত 'কাউন্সিল

হাউস' বা কাউন্সিল চেম্বারের' অবস্থিতির জন্যেই পরবর্তী কালে যে-নাতিদীর্ঘ অথচ সুশোভিত সরণীর প্রকাশ ঘটে, তা নাম ধারণ করে 'কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট'। এই কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট তখন বিস্তৃত ছিল একালের রাজভবনের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এবং এ-প্রাঙ্গণেই সেদিন অবস্থিত ছিল সেকালের 'কাউন্সিল হাউস'—ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্টের নির্দেশে যার উচ্ছেদ ঘটে সম্ভবত ১৮০০ খৃষ্টাব্দের অন্তিম পর্বে।

এই কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটেই ছিল কর্ণেল কূট নির্মিত ট্রেজারী বিল্ডিং এবং ইষ্টকেলার প্রতিষ্ঠিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার কার্যালয়। কোম্পানীর সুবৃহৎ আস্তাবলেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এখানেই। তাছাড়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত সেকালের সেই বিখ্যাত হাসপাতালটিরও অধিষ্ঠান ছিল কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের প্রান্তিক রেখায়। তখন ইংরেজ সাধারণের নিরাময় লাভের জন্য এই হাসপাতালটিই ছিল একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র। এখানে অজস্র রোগীর সমাগম ঘটতো দৈনিক। দিনে দিনে অনেকেই যেমন আরোগ্য হয়ে উঠতেন, তেমনই ক্ষমাহীন মরণের শীতল অঙ্কেও ঢ'লে পড়তেন অনেকে। এই হাসপাতালেই মৃত্যু ঘটে পলাশীবিজয়ী এডমিরাল ওয়াটসনের। তৎকালীন 'ফোর্ট' জাহাজের বিখ্যাত চিকিৎসক মিঃ আইভস এই হাসপাতাল সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন, বাংলা ভাষায় তার খানিকটা অংশ হলো এই :

---"এই সময়ে কোম্পানীর হাসপাতাল রোগীতে পরিপূর্ণ। ফেব্রুয়ারী হইতে (১৭৫৭) আগষ্ট পর্যন্ত এই সাত মাস সময়ের মধ্যে ১১৫০ জন রোগী হাসপাতাল হইতে রোগমুক্ত হয়। ইহাদের সকলেই ইংরাজ। ক্ষতি, পৈত্তিক-জ্বর, পিত্তশূল—প্রভৃতি রোগেই অনেকে ভুগিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে জ্বর-রোগীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। ৭ই আগষ্ট হইতে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত ৭১৭ জন রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে ১০১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃতের দলের মধ্যে পলাশী-বিজয়ী এডমিরাল ওয়াটসনও ছিলেন।"

বর্তমানে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের আর সেদিন নেই। আজ প্রস্থে তার পরিবর্তন না ঘটলেও দৈর্ঘ্যে সে সঙ্কুচিত। তাছাড়া সেকালের সেই রমণীয় পরিবেশ থেকেও তার নির্বাসন ঘটেছে চিরতরে। আজ উভয় বাহুই তার অজস্র অট্টালিকার পাষাণভারে বিকল। এ-পথেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল অব বেঙ্গল', 'পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল অব বেঙ্গল' এবং 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'। সেই সঙ্গে 'ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স', 'কমার্শিয়াল লাইব্রেরী', 'ডিরেক্টরেট অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ' এবং এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেরও অধিষ্ঠান ঘটেছে এখানে। তাই স্বাভাবিক কারণেই আজ তার আসীমান্ত অজস্র দ্বিপদচারীর বিরাম-হীন পদাঘাতে আকীর্ণ অথবা জর্জরিত।

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—
কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র
সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার
সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র জাগ্রত—সদ্য ফলপ্রদ—জীবের মুক্তিদাতা—অন্য শাস্ত্র নিদ্রিত—তাহার সাধনা নিষ্ফল। শ্মশানে সাধনমগ্ন মহাদেব পঞ্চমুখে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—সাধনা, মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তন্ত্রসমুদ্র মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের শক্তি-বীজনিহিত অমূল্যরত্ন এই বৃহৎ তন্ত্রসার আজীবন কঠোরতম সাধনায়—জীবনান্তকর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঙ্কলন সারাৎসার সমাবেশ করিয়া—

মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন

তন্ত্র-মন্ত্র ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—
অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত যন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এ বিষয়ে মারলো এলিজাবেথীয় যুগের মানুষদের আসল মানসিক ধারাটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন নিজের রচনায়। এ সময়ের লোকেরা সর্বরকমে জীবনকে বীরত্বব্যঞ্জক করে তুলতে পারলেই নিজেদের সার্থক মনে করতো। নিত্য-নতুন দেশ আবিষ্কার হচ্ছে—এর যেন আর শেষ নেই। জ্ঞানেরও কোন নির্দিষ্ট বা পরিমিত সীমা নেই। Marlow, with his tumultuous and bombastic poetry, caught the spirit of the ag: in its exaggerated form. র‍্যালে, ড্রেক, হকিন্‌স প্রভৃতিকে মডেল করে তিনি তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিকে প্রায় 'অতি মানুষ' হিসাবে গড়ে তোলেন।

মারলোর জীবন ছিল ঘটনাবহুল এবং ক্ষণস্থায়ী। একটি পাবলিক ইন্‌-এ কলহের পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মারলোর মৃত্যুকে ঘিরে আছে এক রহস্যের যবনিকা। অনেকের মতে এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। মারলোর হত্যাকারীও তাঁরই মত এলিজাবেথের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান কর্মকর্তা ওয়ালসিংহামের অধীনে কাজ করতেন। যে দুজন লোক এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল যে, আত্মরক্ষার জন্যই হত্যাকারী বাধ্য হয়েছিল মারলোকে হত্যা করতে—তারা দুজনেই ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্র। এদের মধ্যে একজন আবার ছিল স্পাই।

মারলোর হত্যার ব্যাপার থেকে একটা কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়—It was an ag: of tempestuous passion. উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি র‍্যালেকেও জেলে যেতে হয়েছিল মারামারি এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার জন্য। বেন্‌ জনসনও একজন সহ-অভিনেতাকে ডুয়েলে মেরে ফেলেন। এ যুগের লোকেরা যেমন ভয়ঙ্করভাবে জীবনকে গ্রহণ করেন, তেমনি আবার অনেকের জীবনের অবসানও ঘটে ভয়ঙ্করভাবে। রাজদ্রোহিতার অপরাধে র‍্যালের হয় প্রাণদণ্ড—মারলোর জীবনাবসান হয় ট্যাভার্ন-এ কলহ এবং মারামারির ফলে। Elizabethan England was charatterdzed by a strong note of violence.

সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডিতেও সমতা রেখে তৎকালীন জীবনের ভায়োলেন্স

শিলাজি

অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। তবে মারলোর রচনায় যা রাশ-আলগা ভাবে বর্ণিত, সেক্সপীয়ারে তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পস্তরে উন্নীত। তুলনামূলকভাবে ট্যাম্বারলেন এবং ম্যাকবেথ, ওথেলো বা ব্যারাবাস এবং শাইলক, অথবা ফস্টাস এবং প্রস্পেরো চরিত্রের বিশ্লেষণ করে পড়ে দেখলেই একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এ ছাড়া মারলো, র‍্যালে এবং স্কুল অভ নাইটের অন্যান্য সবার বিরুদ্ধেও নাস্তিকতার অভিযোগ (atheism) গড়ে উঠেছিল রাজসরকারের অভ্যন্তরে। ঐ ভাবে অপঘাত মৃত্যু না ঘটলে কিছুদিন বাদেই মারলোকে প্রিভি কাউন্সিলে atheism-এর charges-এর উত্তর দেবার জন্য উপস্থিত হতে হোত এবং ফলে নিশ্চয় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হোত।

এখানে J. Bronowski এবং Bruce Mazlish-এর লেখা 'The West... Intellectual T adition' বইটি ... কিছুটা তুলে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

'So ne authentic atheism d... exist in Elizabethan times. Duri... an age of 'overreaching' even G... might be by-passed by a f... daring spirits. Atheism was... part of the protest and extravagan... of the time, but only a small part.

For this and many oth... reasons—the violence, the vaunti... ambition, the stress on personali... the sense of discovery in t... Sciences, and the zest for explo... tion in the world—we may ... that in Raleigh and the School ... Night, in the new intellectu... setting of England of 1600, ... catch an echo of that Renaissan... which played itself out in North... Italy just a hundred years earlier.

Marlow's closeness to Hari... marks the union of science a... literary life, and Hariot's admi... tion for Raleigh is o' a piece w... the admiration Leonardo felt f... the condoltiere's son, Lodovi... Sforza. Thus, as in Ital... Elizabethan England witnessed t... union of the man of ideas and t... man of action, and permitted ... aristocracy of intellect to rem... in close touch with its aristocra... of wealth and power.'

ক্যাস্টিগলিয়ন্‌ তাঁর 'দি কোর্টিয়া...' বইতে ইতালিয়ান রাজদরবারে সেরা ... লোক বলতে কি বোঝায়, তার সম্পূর্ণ ... করেন। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত ... ১৫২৮ সালে। এর ইংরাজি অনু... করেন স্যার টমাস হবি ১৫৬১-তে।

এ বইয়ের যথেষ্ট প্রভাব দেখা ... এলিজাবেথীয় কোর্ট লাইফে। এর ... পূর্ববর্তী মধ্যযুগে যাজক এবং নাইটদের ... বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা দেওয়া হো... সেই ধারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এলিজা... বেথীয় 'Gentle nan'-কে একই সঙ্গে রচনা... পারদর্শী এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবার শি... দেওয়া হোত। ভদ্রলোক বলতে গে... গ্রীক এবং কয়েকটি আধুনিক ভাষা... শিক্ষিত হতে হোত, গান এবং কবি...

● ওথেলোর ভূমিকায় ষ্টানিস্লভস্কি

…নার ক্ষমতা না থাকলে চলতো না। …ই সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে …দর্শ উদাহরণ হিসাবে স্যার ওয়াল্টার …লের নাম করা যায়।

ইতালিয়ন কোর্টিয়ারের আদর্শের সঙ্গে …রাজের আবার আর একটা নতুন দিক …গ করেছিল—কিভাবে শাসকের কর্তব্য …লন করতে হয়, তাও জেণ্টল্‌ম্যানকে শিখতে হবে। It was thought that the Tudor Gentleman, along with literature and philosophy, should know something of law so that he might serve the Commonwealth in the capacity of a magistrate, an officer, or an administrator.

১৫৩১ সালে স্যার টমাস এলিয়ট 'Book of the … নামে বই প্রকাশ করেন—এই বইতে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে ইংলণ্ডের চিরাচরিত রীতি এবং Tudor Gentleman-এর শিক্ষা (in the capacity of a magistrate, an officer, or an administrator) সম্বন্ধে আলোচনা … হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

'সন্ধ্যাদীপের শিখা'র নায়িকা সুচিত্রা সেন

কবি নজরুল জন্মজয়ন্তী

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৫তম জন্মোৎসব পালনের আয়োজন হচ্ছে। নজরুল বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে অগ্রপথিক। তাঁর কবিতায় বাংলার বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করেছে। তাঁর কণ্ঠে মুক্তিসংগ্রামের গানে বাঙালীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই বিদ্রোহী কবির রচিত গান ও সুর একদিন বাংলাকে মাতিয়ে তুলেছিল। শহরে-গ্রামে কণ্ঠে কণ্ঠে শোনা গেছে নজরুল-সঙ্গীত। এই অনন্য প্রতিভাধর কবির দানে চলচ্চিত্র শিল্পও গৌরবান্বিত। নজরুল রচিত চিত্রনাট্য 'সাপুড়ে' ও 'বিদ্যাপতি' সেকালের দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি। তাঁর রচিত গান চলচ্চিত্রকে সঙ্গীতময় করে তুলতে সাহায্য করেছে। কবি নিজেও একটি ভূমিকায় অভিনয় করে চলচ্চিত্রকে মর্যাদা দান করেছেন। এ কারণে কবি নজরুলের সাথে বাংলার চলচ্চিত্রের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

নজরুলের জীবন ঘটনাবহুল। বাল্যকালে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে, মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে, দেশে ফিরে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং সাম্যবাদের বাণী প্রচারে নজরুলের জীবন বিচিত্র। এই বর্ণরঙিন জীবন চলচ্চিত্রে রূপ পাবার যোগ্য। তাঁর জীবন অবলম্বনে দুই রীলের একটি চিত্র হয়েছে বটে, কিন্তু সে ছবি কবির জীবনের যোগ্য প্রতিরূপ হতে পারে নি। এই বিষয়ে এখনো কিছু করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির পক্ষ থেকে নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ সময়োচিত। আমরা নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির এই উদ্যোগ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

—সুজন।

চিত্র আলোচনা

কিনু গোয়ালার গলি
(কে-জি প্রোডাকসন্স)

'কিনু গোয়ালার গলি' ছবিটির চিত্রনাট্যের অবলম্বন সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষ ঘোষের একই নামের উপন্যাস। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন ও সি গাঙ্গুলী। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি নবাগত হলেও, এই ছবিতে তিনি শিল্প-রুচির পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় নানা প্রশ্ন যদিও উঠতে পারে, তথাপি একটি সুস্থ জীবন-বোধের বিচারে ছবিটি পরিচ্ছন্ন এবং উপভোগ্য। ছবিটিতে বাঙালীর রস-বোধ ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই মহানগরীর অতি নগণ্য এক গলি। নামটাও তার যেমন অতি সাধারণ, এখানে যারা বাস করে তারাও সমাজের অতি সাধারণ মানুষ। বিরাট মহানগরীর সঙ্কীর্ণ এই গলিতে যারা বাস করে তাদের হয়তো কল্পনা আছে, কিন্তু জীবনের বিকাশ নেই। জীবনে নানাদিক থেকে পরাজিত মানুষের দল এখানে বাসা বেঁধেছে। তাদের মধ্যে আছে সাহিত্যিক মণীন্দ্র (কালী ব্যানার্জী) ও স্ত্রী শান্তি (সুমিত্রা দেবী)। মণীন্দ্র সাহিত্যচর্চা নিয়ে পড়ে থাকে, ঘরের ব্যাপারে নির্বিকার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হতে থাকে। দারিদ্র্যে এবং স্বামীর সাহচর্যের অভাবে শান্তির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন সময় ইন্দ্রজিৎ (সৌমিত্র) এসে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। দারিদ্র্য মণীন্দ্রকেও অনেক নীচে টেনে নামায়, সে স্ত্রীকে তাসের জুয়ায় বসিয়ে নিজে সাহিত্যচর্চা করে। শান্তি তার জন্য মণীন্দ্রকে ক্ষমা করে না—আত্মপ্রতারক সাহিত্যিক বলে অভিযুক্ত করে:

ই বাড়ির ওপরে থাকে শিবব্রত- পাহাড়ী সান্যাল), রুগ্না স্ত্রী, ত্রবধূ ও কন্যা নীলাকে ঠাকু) নিয়ে। ওরাও বনেদী থেকে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এই অন্ধ গলিতে। এই নেমে জন্য সমাজের চোখে তাদের অনেক কমে গেছে। তাই ক অবিনাশ কন্যার বয়েসী মন পাবার জন্য অনর্থক চেষ্টা

ই পাড়ার এক নম্বর বাড়ির প্রসন্ন পোদ্দারের নখদর্পণে সব খবর।

নিভাবে চলার পথে একদিন তেও পরিবর্তনের জোয়ার পৌঁছায়। শান্তির অভিযোগ দ্রোহে মণীন্দ্র জীবনের পথ পায়, তারা গলি ছেড়ে বাইরে য় বাঁচার আগ্রহে। নীলা আর পরস্পরকে ভালবেসে নতুন র পথে পা বাড়ায়।

বিটি প্রথম থেকে শান্ত রসের শে অগ্রসর হয়েছে। এবং গুণে দর্শকরা আনন্দ লাভ । ছবির সঙ্গীতাংশও মোটামুটি ভাল লাগে। বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়। অভিনয়াংশে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুমিত্রা দেবী নিখুঁতভাবে চরিত্র প্রকাশ করেছেন। তবে বহির্দৃশ্যে বৃষ্টিতে দৌড়াবার সময় সুমিত্রা দেবীকে সৌমিত্রের পাশে ভাল দেখায় নি। অন্যান্য চরিত্রে শর্মিলা, সৌমিত্র, গীতা দে ও প্রশান্ত-কুমার, জহর রায়, জীবেন বসু, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ যথাযথ অভিনয় করেছেন।

ছবিটির ত্রুটির কথা যদি উল্লেখ করা যায় তবে না বলে উপায় নাই যে কিনু গোয়ালার গলি নামটার সার্থকতা এখানে অনুভব করা যায় না। গলির বদ্ধজীবনের সামগ্রিক পরিচয় ও অসহায় মানুষের জীবন-যন্ত্রণা পরিচালক প্রকাশ করতে পারেন নি।

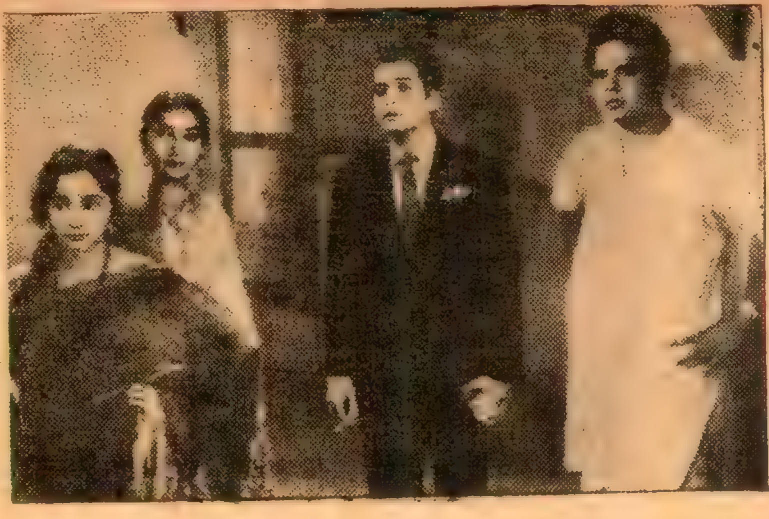

'অগ্নিবন্যা' চিত্রের একটি দৃশ্যে তপতি ঘোষ, কুমকুম, বিশ্বজিৎ ও তরুণকুমার।

হাঙ্গেরীর ছবিতে সমাজ চেতনা

গত সপ্তাহে আমরা দুটি হাঙ্গেরীয় ছবি—'টু-হাফ-টাইমস ইন দি হেল' এবং 'ফিভার' ছবির আলোচনা করেছি। এ সপ্তাহে আমাদের আলোচ্য ছবি 'ডলার ড্যাডি' এবং 'মিলিটারী ব্যাণ্ড'।

ভিক্টর গার্টলার হাঙ্গেরীর একজন শক্তিশালী পরিচালক। 'ফিভার' ছবিতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শক্তি দেখেছি, 'ডলার ড্যাডি'তেও তিনি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা নগ্ন চেহারা প্রকাশ করেছেন প্রচুর হাস্য-রসের মাধ্যমে। অর্থনীতির মত নীরস বিষয় প্রকাশ করতে গার্টলারও চার্লির পথ অনুসরণ করেছেন। চার্লির মত অত সরস না হলেও তাঁর বক্তব্য বিষয়কে তিনি দর্শকদের মনে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

'ডলার ড্যাডি' বৃদ্ধ হফম্যান। বেচারা চিকাগোতে অতি সাধারণ

সত্যমুক্ত ও সি গাঙ্গুলী পরিচালিত 'কিনু গোয়ালার গলি' চিত্রের দুটি চরিত্রে সুমিত্রা দেবী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

মজুরের কাজ করতো। এদিকে দেশে তার আত্মীয়রা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করতো অর্ধেক চিকাগোর সে নাকি মালিক। একদা এ হেন হফম্যান হাঙ্গেরীতে ফিরে এলো শান্তিতে মরবার জন্য, সঙ্গে মাত্র তার দশ ডলার। চতুর এক আইনজীবী যুবক এই দশ ডলারকে বিলিয়ে সমগ্র শহরে তোলপাড় সৃষ্টি করে। ডলারের লোভ দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে, এর টাকা ওকে দিয়ে সাময়িকভাবে শহরের অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন আনে। সমগ্র ঘটনাটা ঘটছে কেবলমাত্র ফাটকাবাজীর ওপর নির্ভর করে। এই ফাটকাবাজীর জোরে হফম্যান মেয়র থেকে রাজার পরামর্শদাতার পদে আরোহণ করে।

তারপরে একদিন ঘটনাটা যখন ধরা পড়লো, তখন শহরের ধনী এবং রাজারও করার কিছুই নেই। কারণ সবাই এই ফাটকাবাজীতে জড়িয়ে পড়েছে, তাহলে সমগ্র শাসক শ্রেণীর মান যাবে। সুতরাং হফম্যান 'ডলার ড্যাডি'রূপে বহালই থাকলেন।

'মিলিটারী ব্যাণ্ড'-এর পরিচালক আন্দ্রে মার্টন। কাহিনীর পটভূমি যদিও ১৮৯৪ সাল, কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগতের সর্বকালে সমর বিভাগের এবং সৈন্যদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতায় সেই অর্ধশতাব্দী-পূর্ব চিন্তা রয়ে গেছে। বিশেষ করে শাসক-দেশের সৈন্যদল যখন উপনিবেশে আসে তখন তারা যে ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়, সেই ক্ষত সমাজজীবন থেকে সহজে মেলায় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমর বিভাগে অধিনায়কের পদগুলি সাধারণত ধনী ও জমিদার শ্রেণীর ছেলেদের জন্য একচেটিয়া। জনসাধারণের প্রতি কোন দায়িত্ববোধ থাকে না বলে একমাত্র নারী-চিন্তায় এরা মসগুল থাকে।

● 'বিজিতা' চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে স্বপর্ণা রায়।

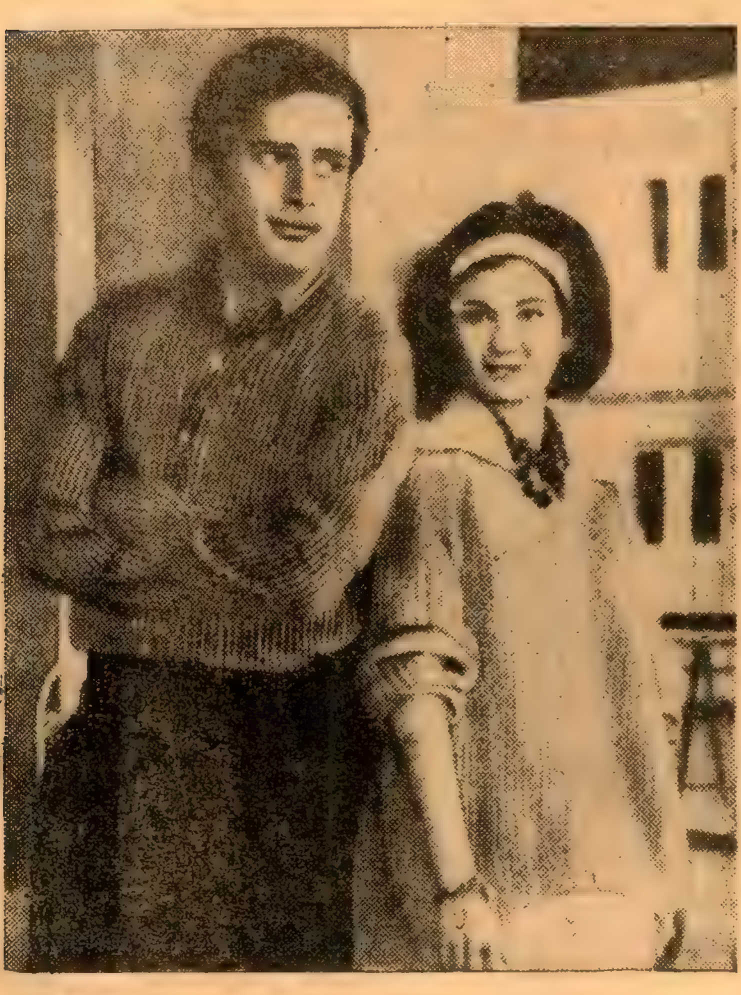

● 'কাশ্মীর কে কলি' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ও শশীকাপুর

'মিলিটারী ব্যাণ্ড'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে একদল অশ্বারোহী সৈন্যদলকে কেন্দ্র করে। তারা এক শহরে ছাউনি ফেলেছিল। তারপরে প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো নারী শিকার। এই নারী শিকারের উদগ্রতায় শহরের এক আদর্শ দম্পতির জীবনে বিপর্যয় নেমে এলো। ডাক্তারের 'ডুয়েল' আহ্বানে ভীত কর্নেল পেছন থেকে তাকে গুলী করে হত্যা করে। আর তার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় কর্নেলের নিরপরাধ ভৃত্য। মিলিটারী ট্রাইবুনাল লোক-দেখানো বিচারপর্ব সমাধা করে স্বশ্রেণীর কর্নেলকে রক্ষা

...ন্য। তারপরে একদিন আবার ...স্মগর্বে শহর ছেড়ে চলে যায়, পেছনে রেখে যায় বিরাট ...তচিহ্ন।

দুটি ছবিতেই পরিচালকরা সমাজ-সচেতন এবং শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ। ...রা নির্মমভাবে ধনিকশ্রেণীর রূপ প্রকাশ করেছেন। ধনিক-শ্রেণী যে অন্তরে কত ফাঁপা, কেবল-মাত্র জবরদস্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—এ কথাটাই ছবি দুটিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ...বার ইউরোপের আর একটি দেশের ...বন ...ার সাথে পরিচিত হলাম।

● রবীন্দ্র ভারতীতে কথক-নৃত্য

'দিনান্তের আলো'-র একটি চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

নাটকের কথা

লিটল থিয়েটার দলের 'ওথেলো'

লিটল থিয়েটার গ্রুপ যখন কোনো নাটক মঞ্চস্থ করেন, তখন স্বভাবতই দর্শকের মধ্যে এই কারণে একটা সাড়া জাগে যে, তাঁরা এবার নতুন কিছু অসাধারণভাবে লাভ করবেন। শেক্সপীয়রের চারশত জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে তাঁরা ইংরেজিতে যে 'ওথেলো' অভিনয় করলেন—তা একদিকে অভিনব এই কারণে যে, অভিনয়-নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁরা শেক্সপীয়রের অমোঘ শব্দরাজিকে ব্যবহারের দ্বারা দর্শকের চোখ—সেই সঙ্গে কান সতর্ক রাখতে বাধ্য করে-ছিলেন।

অবশ্য পাঁচ অঙ্কের নাটকটি মঞ্চে তিন অঙ্কে পরিবেশিত। উপকরণ বাহুল্যও কম। সূক্ষ্মবোধের দ্বারা নাটকের যে পরিবেশ রচনা করা হয়েছে, তা শুধু অতুলনীয়-ই নয়, অভূতপূর্ব ও অসাধারণ।

চরিত্র রূপায়ণেও লক্ষ্য করেছি চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার চিত্তের অবিনশ্বর সাযুজ্য। কালের গতি, স্থানের পরিবর্তন সব কিছুর সঙ্গেই যেন চরিত্রগুলির অখণ্ডনীয় যোগাযোগ বর্তমান। মঞ্চের মধ্যে এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই বাংলা দেশেই নাট্য-রসিকদের সেই অপার সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। 'ওথেলো'র চরিত্রে সার্থক অভিনয় করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। শ্রীউৎপল

◀ মিনার্ভায় 'ওথেলো' নাটকের একটি দৃশ্য।

দত্ত তিলে তিলে ফুটিয়ে তুলেছেন ওথেলোকে। ডীন গ্যাসপারের ইয়াগোর মধ্যে আমরা কুটিল মূর্তিকে যেন স্বচক্ষে দেখেছি। এমিলিয়া চরিত্রের শেষের দিকে মায়া রায় যে অভিনয় করেছেন—তা দীর্ঘকাল মনে রাখার মতো। ডেসডেমোনার চরিত্রে শীলা রায়কে বাঙালী ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয় না। তাঁর অভিনয়ও সুন্দর। ক্যাসিও-র ভূমিকায় প্রবীর ঘোষকে চমৎকার মনে হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনেতৃবৃন্দ সু-অভিনয় করেছেন।

প্রতি অঙ্কের আরম্ভে চায়কভস্কি ও মেনডলসন-কৃত সংগীত থেকে যে সুর ব্যবহার করা হয়েছে—তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য বিশেষ আনন্দদায়ক।

● 'নিশাচর' ছবিতে নবাগতা স্মিতা মজুমদার

সংবাদ-কণা

ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন ছবি বয়কট

ইন্দোনেশিয়ার ষোলটি প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও চিত্র প্রতিষ্ঠান এবং দেশের যুব সম্প্রদায় এক সম্মিলিত সভায় মার্কিন চলচ্চিত্র সম্পূর্ণভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ৯ই মে থেকে এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়েছে। দেশের সকল সিনেমায় মার্কিন ছবি প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে। ভারত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর প্রবেশের প্রতিবাদেই না কি এই সিদ্ধান্ত।

অরুণাভের মূকাভিনয়

গত ১৭ই মে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ মঞ্চে মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদার একক দু-ঘণ্টা-ব্যাপী মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। আধুনিকা, বেকার যুবকের করুণ কাহিনী, দড়ি টানাটানি, ঘুড়ি ওড়ানো এবং লেখক ও মাছি এই পাঁচটি ফিচার পরিবেশনের পর চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সৃষ্টি 'গোল্ড রাশ'-এর একক মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন 'প্রতিভা' প্রতিষ্ঠান।

● মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদার

পাকিস্তানেও মার্কিন ছবি বন্ধের সম্ভাবনা

মার্কিন মোশন পিকচার্স এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন যদি পাকিস্তানে মার্কিন ছবি প্রদর্শনের জন্য যে অর্থ সেখানে জমা হয়েছে তা ব্যবহারের কর্মসূচী গ্রহণ না করে, তবে ৩০শে জুনের পর পাকিস্তানে মার্কিন ছবি প্রদর্শন বন্ধ হতে পারে।

পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন বছরে ২০০ ছবি রপ্তানী করে। কিন্তু অর্জিত সকল অর্থ আমেরিকায় পাঠাতে পারে না। তার একটা অংশ পাকিস্তানেই ব্যয় করার কথা। এই বাবদ এক কোটি টাকা জমা হয়েছে। কিন্তু মার্কিন প্রযোজকরা এযাবৎ মাত্র একটি ছবি পাকিস্তানে নির্মাণ করেছে।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

গত ৩০শে এপ্রিল, বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রী আলো বাগচী, কৃষ্ণা রায় ও সাথী গুপ্তার বিভিন্ন নৃত্যকলা প্রদর্শনে দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেন। অরবিন্দ মিত্র, কেদার নন্দী, অনিল ঘোষ, স্বদেশকুমার প্রভৃতি নৃত্যে সুরযোজনা করেন। রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র (সামাজিক) নাট্যাভিনয় সু-অভিনীত হয়।

পাঠক মন

আমরা মফস্বলবাসী, আপনার পরিচিত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। ইদানীং 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র কয়েকটি 'ফিচার' এবং সামগ্রিকভাবে পত্রিকাটির কিছু উন্নতি লক্ষ্য ক'রে যে আনন্দ পেয়েছি, কয়েকটি কথায় তা প্রকাশ করার জন্যই আপনার কাছে এই নিবেদন।

প্রথমেই আপনার পত্রিকার 'শহর কলকাতা' পর্যায়ের লেখাগুলোর উল্লেখ করতে হয়। গত কয়েকটি সংখ্যায় এই রচনাগুলির অপূর্ব বর্ণ ও স্বাদ যেন মনকে নিয়মিত আকর্ষণ করছে। লেখাগুলির 'হেষ্টিংস,' 'শ্যামপুকুর' এবং এই সপ্তাহে প্রকাশিত 'মহানগরীর বৈঠকখানা' রচনাগুলি পর পর সুন্দর থেকে সুন্দরতর লাগছে। 'মহানগরীর বৈঠকখানা' লেখাটি পড়ে যখন শেষ করলাম, তখন মনে হ'ল নিসর্গ সৌন্দর্যের পটভূমিতে তোলা অজানা ইতিহাসের এক অধ্যায়, একাধিক কাহিনীর এক চলচ্চিত্র দেখা শেষ হ'ল। এই লেখাটির মধ্যে একাধারে পেলাম ইতিহাস, অজানা সত্য কাহিনী, সেদিনের নিসর্গচিত্র আর বর্তমান পরিবেশের কথা এবং সবার উপরে ভাষার কাব্যিক কারুকার্য। একই লেখায় এতগুলো চাহিদা মেটানোর দৃষ্টান্ত বিরল। আমরা সাধারণ পাঠক, ইট-কাঠে-ঘেরা আমাদের চেনা শহর-কলকাতার প্রাক্-জন্মসময়ের এত তথ্য, এত রোমাঞ্চকর উপকাহিনী ছড়িয়ে আছে—কে জানতো? পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল—সাকুলার রোডে ট্রাম নেই, বাস নেই—জনারণ্যের কল-কোলাহল নেই—সুগভীর এক খাল বেয়ে পালতোলা এক নৌকায় যেন চলেছি,—আশে-পাশে বিশাল বনস্পতির ছায়ায়—ডালে ডালে বিহঙ্গের শুরু স্ত কলতান। কয়েকটি জায়গায় এমনি অপূর্ব নিসর্গ বর্ণনা—কবেকার আড়াইশো বছর আগেকার কলকাতার জন্মভূমিকে দুই তটের সর্ষেক্ষেতের হরিদ্রাভ রঙের মায়ায় অপরূপ সৌন্দর্যে চোখের সামনে তুলে ধরেছে। এ ছাড়াও 'রঙ্গমঞ্চ', 'ওদেশে এবং এদেশে' ফিচারটিও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান বহন করছে। আপনাদের বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন সত্যিই আকর্ষণীয়। অন্যান্য 'ফিচার'ও বেশ ভাল হচ্ছে। ছাপা এবং রচনা সাজাবার দিকে একটু নজর দিতে অনুরোধ জানাই।

শ্রীঅধীর ভট্টাচার্য
গ্রাম ও পোঃ—মাজদিয়া (নদীয়া)

প্রথমে পাঠক হিসাবে প্রিয় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সত্যি বলতে কি, এতদিন আমরা যেটা চেয়েছিলাম 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সেটা জোগাচ্ছে অর্থাৎ ভারতের বাইরের ও ভিতরের সার্থক সু-সন্ধান। শহর কলকাতা, বঙ্গদর্শন, ভারত-দর্শন ও আন্তর্জাতিক এর মধ্যে পড়ে। লণ্ডনের চিঠি ও জাপানী সন্দেশ এক আনন্দের স্ফুরণ। 'আজকের মানুষ' এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হয়। অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার দিনে এরকম মানুষকে আমরা চাই—যা দেখে আমরা আমাদের মনোবল ঠিক করতে পারব। এত সস্তায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী' যা দিচ্ছে (একই সঙ্গে সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, কাহিনী, সংবাদ বিচিত্রা, রঙ্গজগৎ, পাঠক মন, খেলাধুলা প্রভৃতি) তা এক কথায় অপূর্ব। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রচ্ছদ চিত্রগুলো মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। সম্প্রতি দেশের পটভূমিকায় এই চিত্রগুলো তোলা হয় (যা অন্য কোন পত্রিকায় পাই না)।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র বিশেষ সংখ্যাগুলি সার্থক সংকলন। এবারের বিশেষ সংখ্যা (রবীন্দ্রসংখ্যা) সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন স্বাদের হয়েছে। এমনটি আর কখনও হয় নি। আমার ত' মনে হয়।

এবার ত্রুটির কথায় আসা যাক্। অবশ্য অনেকে এই কথাগুলো বলেছেন। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র যে লেখাগুলো একপৃষ্ঠায় লেখা হয়, সেগুলো বাড়ান দরকার (পড়ে যেন তৃপ্তি হয় না)। অবশ্য দামের কথা এসে পড়ে। এই পত্রিকার ছাপা ও ছবিগুলো সুস্পষ্ট নয়। এইগুলো আরো উন্নত হওয়া দরকার।

সর্বশেষে বলি, যুগে যুগে ঘোষিত হোক 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র বিজয়বার্তা আর দীর্ঘায়ু হোক এর সাবলীল গতি।

কল্যাণ বৈতালিক
তমলুক

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সর্বতোমুখী সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় আলোচনামূলক যে রূপটি নিয়ে সপ্তাহের শেষে পাঠকমনের উপর প্রতিফলন ঘটায়, তা নিশ্চয়ই একটা অতৃপ্ত অভীপ্সার চরিতার্থতার পথে পদক্ষেপ একথা অনস্বীকার্য। অনাদি-অনন্তকালের আনাগোনায় বিলীয়মান পত্র-পত্রিকার মাঝে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র জন্ম ও পরিবর্ধন দুঃসাহস ও গৌরবমিশ্রিত সন্দেহ নাই।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' আজ তার অন্তর্বহিঃ লোভনীয় রূপটি নিয়ে সমুদ্র-তীরের নারিকেল বৃক্ষের মত নিজের ফলকে উৎপত্তিস্থল ছায়াসুশীতল জনবহুল কলকাতার মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ না রেখে উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা সুদূর এই বিচ্ছিন্ন-জীবন পল্লীবাংলায়ও আজ ভাসিয়ে দিতে পেরেছে তার সুস্বাদু নারিকেল সদৃশ ফলরাশি। কাগজের ছোপড়ার মধ্যে তার অধিষ্ঠান। স্বাদ পেতে হলে একে ভাঙতে হবে বৈকি! ঢিলেমি ছেড়ে বঝতে হবে এর প্রকৃত রূপ। একথা বলার অর্থ—এর প্রচলন সর্বত্র কাম্য। পল্লীবাংলার কথা এর অঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাপুরুষের বাণী প্রতিটি বিভাগে নিয়ে থাকলে ভাল হয়। প্রচ্ছদপট একই রঙের না হয়ে নিত্যনূতন হলে আকর্ষণীয় হবে আশা করি—যদিও এটা বহিরঙ্গ মাত্র, তবু বাহ্যিঃ ও অন্তঃ মিলেই পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা আজকের যুগে অপরিহার্য।

এর একটা বড় গুণ যে অযথা বিজ্ঞাপনে এর পৃষ্ঠা ভরে ওঠে না—যা দেখি অন্য সবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-আলেখ্য ও অনুপ্রেরণামূলক 'আজকের মানুষ' বিভাগটি সত্যই প্রশংসনীয়। এর ছাপা ও ছবিগুলো এখনো সুন্দর নয়—যদিও ব্যবসা মনোবৃত্তির উর্ধ্বে সুলভে এর প্রতিটি সংখ্যা পাওয়া যায়। এর বিশেষ সংখ্যা, যেমন 'নেতাজী সংখ্যা', 'রবীন্দ্র তিরোভাব সংখ্যা', 'সেক্সপীয়র সংখ্যা' বেশ ভাল লেগেছিল।

সবশেষে নববর্ষের প্রথমভাগে এই রকম একটি কল্যাণধর্মী পত্রিকার স্থায়িত্ব তথা নবীনতা ও প্রসারতা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। সাধারণ পাঠক হলেও এই আবেদন অপ্রাসঙ্গিক, অনাদৃত ও নিরর্থক হবে না আশা রাখি।

হরিপদ দাশ
চহরাচক্ (ময়না), মেদিনীপুর।

খেলা ধুলা

ছাই-ভস্মের লড়াই

রামায়ণের রাম যুদ্ধ করেছিলেন সীতার জন্যে, ট্রয়ের যুদ্ধও হেলেনকে নিয়ে, নেপোলিয়ন আর হিটলারের দল রাজ্যের লোভে পড়ে যুদ্ধে মেতে উঠেছিলেন। দেশে দেশে যুদ্ধ গেল থেমে, কিন্তু মানবমনের শক্তি পরীক্ষার নেশা—যুদ্ধের নেশা দূর হল না। খেলা-ধুলা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে লাগল। সৃষ্টি হল অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমসের। দেশে দেশে প্রতিযোগিতার উৎসাহটা সকলের যেন বেড়েই গেল।

এত ত' যুদ্ধের কথা লড়াইয়ের কথা শুনেছেন; কিন্তু শুনেছেন কখনও

ডেক্সটার

সামান্য ছাই-ভস্মের জন্য যুদ্ধের কথা! অবশ্য এই যুদ্ধ গোলাগুলী বা এ্যাটম বম্বের নয়, এর হাতিয়ার হল ব্যাট আর ক্ষেপণাস্ত্র হল বল। বলতে গেলে প্রায় শতবর্ষ আগে মামা-ভাগ্নের এই ব্যাটে-বলে যুদ্ধ সুরু হয়েছে। ক্রিকেটের জনক মামা ইংলণ্ড প্রথমে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। ব্যাটে-বলে হাত দেবার কয়েক বছর পরেই দুরন্ত ভাগ্নে অষ্ট্রেলিয়া পটকে দিল ইংলণ্ডকে। সেই থেকে এই ইঙ্গ-অষ্ট্রেলীয় "এ্যাসেজ" যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এবং উন্মাদনা জন্ম নিয়েছে আর দিনে দিনে মাত্রা বেড়েই চলেছে।

শ্রীঅমিতাভ

শুধুমাত্র ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়াতেই নয়, সারা বিশ্বের ক্রিকেট রসিকদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই এবারের খেলাকে কেন্দ্র করে। অষ্ট্রেলিয়ার দলবল সিম্পসনের সঙ্গে ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। গতবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এসে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে রাবার নিয়ে দেশে ফিরেছে। এ বছর মাইক স্মিথের দলবল ভারতের কাছ থেকে রাবার ছিনিয়ে দেশে ফিরতে পারল না। ইংলণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলী বেশ মুস্কিলে পড়েছেন অধিনায়কত্বের প্রশ্নে। রাজনৈতিক নির্বাচনের রণাঙ্গন থেকে টেস্টের ক্রীড়াঙ্গনে অধিনায়কের গুরু-দায়িত্ব দিয়ে ডেক্সটারকে নামানই হয়ে পড়েছে প্রধান সমস্যা। মাইক স্মিথের সম্ভাবনাও কম নয়।

ইংলণ্ডের ব্যাটিং এবং বোলিং শক্তির কিছু পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। গতবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলায় ইংলণ্ডের বেশ কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান নিরাশ করেছিলেন দর্শকদের। বোলাস, এডরিচ, স্টুয়ার্ট এবং পুলারের মধ্যে কোন্ দুজন যে ইংলণ্ডের ইনিংস উদ্বোধন করবেন তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে ইয়র্কসায়ারের তরুণ ক্রিকেটার বয়কটের টেস্ট দলে স্থান পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। মধ্যের দিকের ব্যাটসম্যানের ভাবনা ইংলণ্ডের তত বেশি নেই। ব্যারিংটন, কাউড্রে এবং ডেক্সটারের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে

এডরিচ

না, এ ছাড়াও আছেন শার্প ক্লোজ এবং ডেক্সটার।

ইংলণ্ডের বোলারদের মধ্যে ট্রুম্যানের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু অন্য বোলারদের 'ওপর নির্বাচকমণ্ডলী নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারছেন না। প্রাইস, জোন্স লার্টার এবং হোয়াইটের মধ্যে আমার মনে হয় ফাস্ট বোলার হিসাবে ইংলণ্ড দলে স্থান পাবার যোগ্যতা একমাত্র প্রাইসেরই আছে। প্রবীণ বোলার

ম্যাকেন্জি এবং উইলসনের মধ্যে একজন হয়ত টেস্ট-দলে স্থান পাবেন। ফ্রেড টিটমাসের ওপর ইংলণ্ড দলের অনেক কিছুই নির্ভর করছে। অল-রাউণ্ডার মর্টিমোর, বারবার, নাইট এবং এ্যালেনের মধ্যে কার ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়বে তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। আগামী ৪ঠা জুন টেণ্ট ব্রিজে যে হচ্ছে প্রথম টেস্ট, এতে কার গলে জয়মাল্য পড়বে সে সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করাই অসম্ভব।

টিটমাস

[illegible] সংকট

হকি লীগ ও বাইটনের দুটি খেলায় নামী দলের দামী খেলোয়াড়দের চরম অখেলোয়াড়ী ব্যবহার কলঙ্কিত করেছে কলকাতা হকির ঐতিহ্যকে, কলুষিত করেছে ময়দানের পবিত্র আঙিনা। কলকাতার ক্রীড়াজগৎ আজ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন. হকি মাঠের অপ্রীতিকর ঘটনা মনে হয় ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। এই সংকটে কর্তৃপক্ষের উচিত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা এবং রোগের উপযুক্ত ওষুধ দেওয়া। কিন্তু কথা হল বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? বি এইচ এ না পারছেন দুই প্রধানের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে. আবার কোন কিছু না করলেও মান থাকে না। উভয়-সংকটে পড়ে তাঁরা ব্যাপারটাকে আরও গোলমেলে করে তুলছেন। ভবিষ্যতে ময়দানে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ক্রীড়ামোদীরা।

সমাচার-দর্পণ

সব দেশের ফুটবল পাগল দর্শকেরাই উগ্র মেজাজের; দলের জয় হল ত' ভাল তা না হলে খেলার মাঠে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে বসেন তাঁরা এবং সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে রেফারীর ওপর। কলকাতার মাঠে ইট আর সোডার বোতলই হল হাতিয়ার. কিন্তু ব্রেজিল, আর্জেণ্টিনায় ইট-বোতলের বদলে চলে গোলাগুলী। পেরুর লিমাতে ইকুয়েডর আর ব্রেজিলের অলিম্পিকের খেলা; একে ত' ইকুয়েডর হারছে তার ওপর কি না দুটো খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে বার করে দেওয়া। দর্শকরাও গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললেন, সকলের রাগ গিয়ে পড়ল আর্জেণ্টিনার রেফারী প্রাদুয়েদের ওপর, এমন কি খেলোয়াড়রাও পর্যন্ত ঘিরে ধরলেন তাঁকে। পুলিশ এসে রক্ষা না করলে, তাঁকে বেশ ভুগতে হত।

* * *

সম্পূর্ণ প্রাণহীন পরিবেশে অগ্রসর হচ্ছে প্রথম ডিভিশন লীগ। ময়দানের প্রধান দলগুলি ফুটবল তারকা-বিহীন অবস্থায় মাঠে অবতীর্ণ হয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। প্রথম খেলায় কোনক্রমে জয়লাভ করে দ্বিতীয় খেলায় মোহন-বাগান হোঁচট খেল ইস্টার্ন রেলের কাছে, সুরুতেই হারাতে হল একটি মূল্যবান পয়েন্ট। ভারতীয় ফুটবল দল তেল-আভিভের পথে যাত্রা করেছে চুণী গোস্বামীর অধিনায়কত্বে এশীয় কাপে অংশ গ্রহণ করার জন্য। এরপর জুনের প্রথম সপ্তাহে অলিম্পিক খেলায় তারা ইরাণের সঙ্গে মিলিত হবে তেহরাণে. ফিরতি খেলা কলকাতায়

জুনের শেষ সপ্তাহে। ইরাণে পরাজিত করতে পারলে ভারত টোকিওতে মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করবে। তবে মনে হয় শক্তিশালী ইরাণ দলকে পরাজিত করা ভারতের খুবই কষ্টসাধ্য হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্স কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই বৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্য্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের গঠন

আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত হউক।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ গ্রাস করিয়াছে তুরানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার রাজগোপালদের রুচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলি ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীমাধব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই পৌঁছে যাক, এ আমার বড় ইচ্ছে"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানী আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—

সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—

প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—

সৌন্দর্য্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজসংস্করণ—

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। মূল্য ৩৲।

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। মূল্য ৩৲

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, প্রশ্নোত্তর, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। মূল্য ৩৲

গত প্রায় ২০ বৎসর এই অদ্ভুত ভক্তিগ্রন্থখানি মহাত্মা শিশিরকুমারের 'অমিয় নিমাই চরিতের' পরই সর্ব্বজনসমাদৃত।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তের কণ্ঠহার পবিত্র তুলসীমালা সদৃশ মহাগ্রন্থ।

মূল্য চার টাকা মাত্র।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্ব্ব-জনপ্রমোদন—অমরকীর্তি

ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী'

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—নবনী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কঙ্কন, স্বর্ণ, পল্লবা, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, [illegible], বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদর্শ, ইত্যাদি, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্বলিত উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৷৷০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোনার কাঠি, মনের মিল, [illegible], পরশ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, লেনের জন্ম, বুড়ি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, ভূমিকা, জাতীয় নাটকের প্লট, নয়াযুগের নাট্য ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, বৌদ্ধ দেশে মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বাবলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরকেশী, সুধা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, কলকাটা, [illegible], পান-সুপারি এই সর্ব্বচিত্ত-বিজয় আনন্দসম্বলিত মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Thursday, 28th May, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-/771, 72, 73

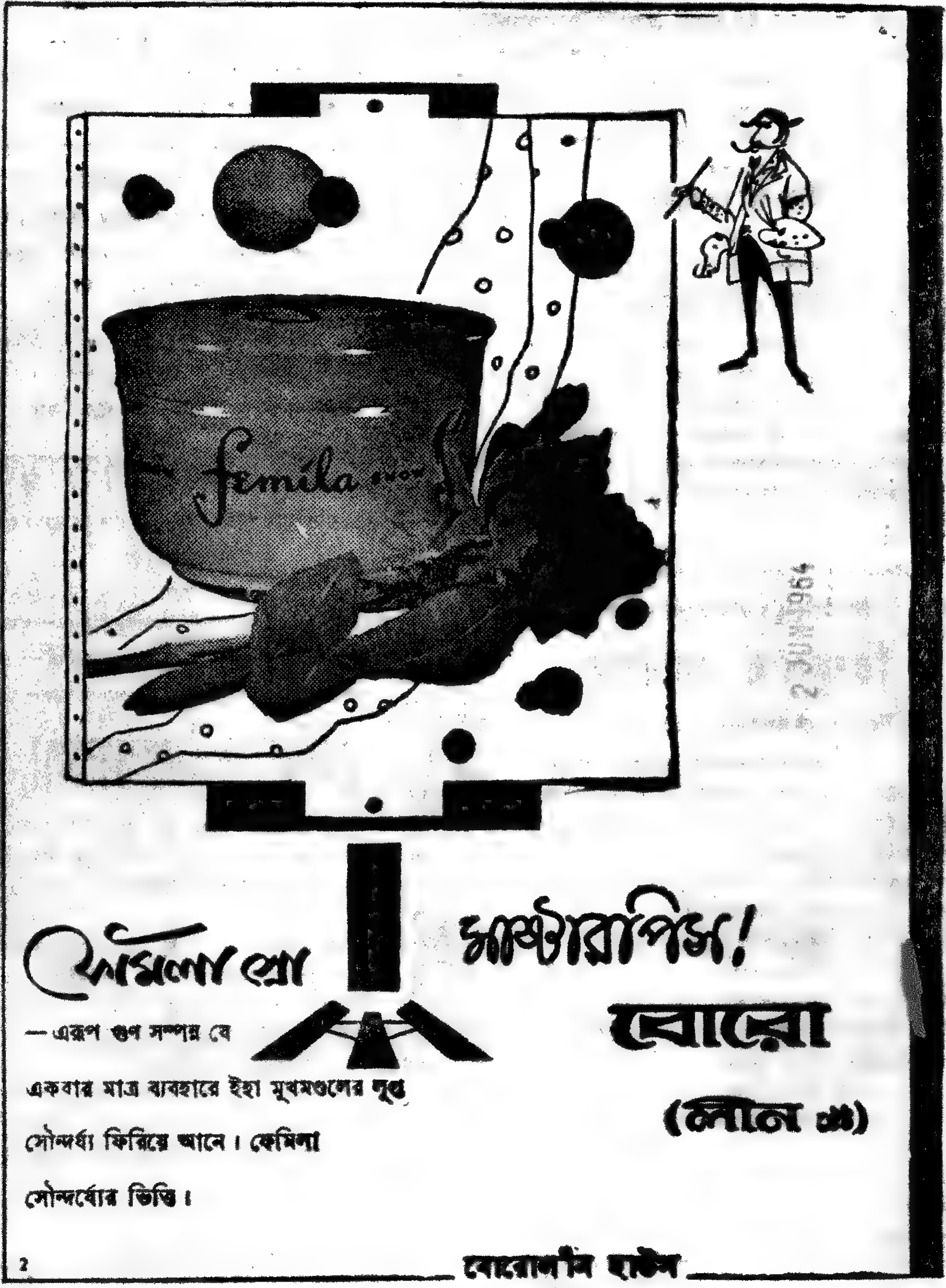

সাপ্তাহিক বসুমতী

…মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের
সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সে'ই মহামৃত্যুঞ্জয়।
…চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।
…আমরা ইহলোক জয় করবো এবং লোকান্তর!

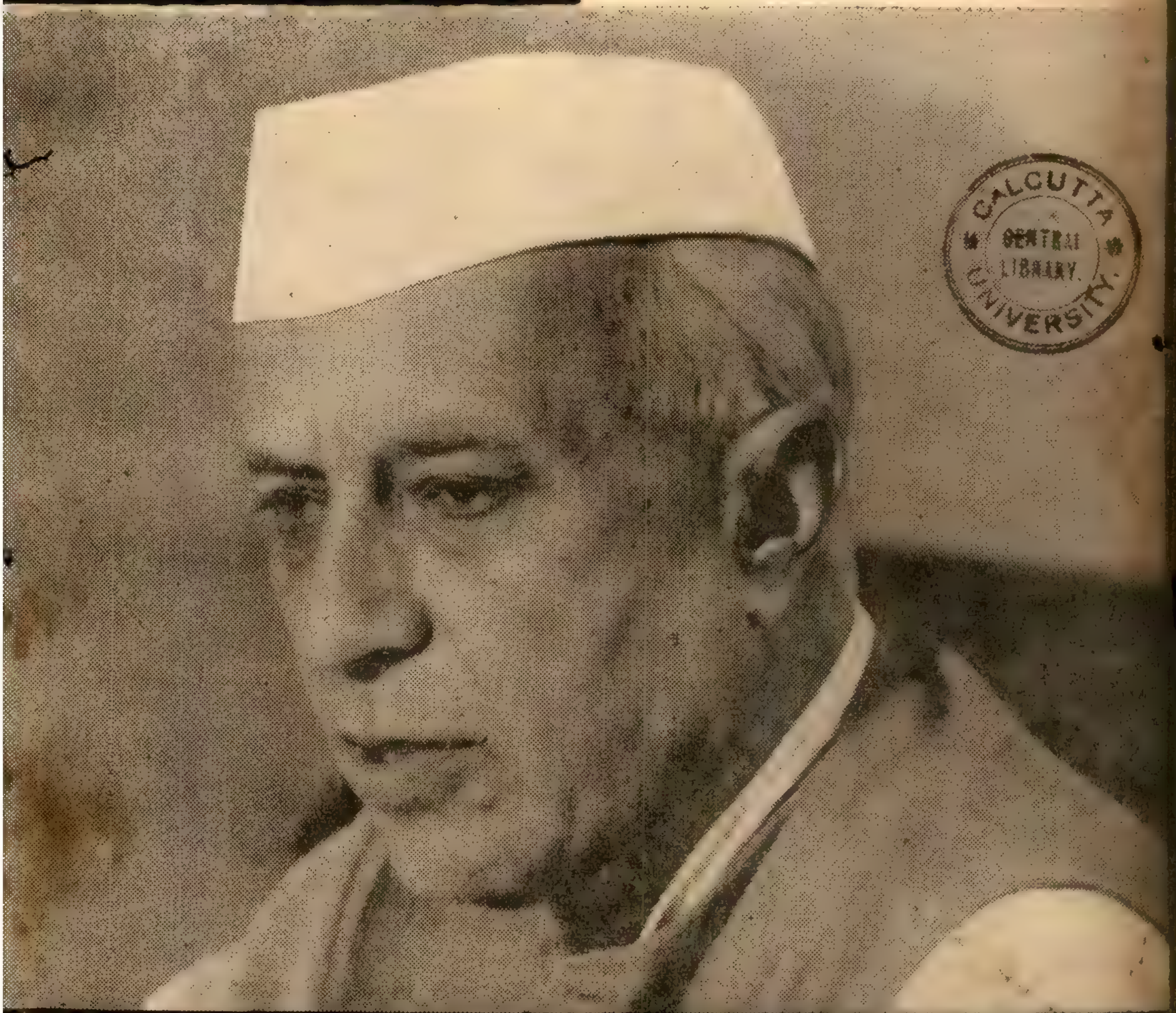

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 4th June, 1964 • Vol. 69, No. 2

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিন সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৬৭
জ্যোতির্ময়-সত্তা (কবিতা)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৬৮
রাঙা গোলাপ মালা (কবিতা)	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৬৮
জীবন-সাধক জওহরলাল (প্রবন্ধ)	গোপাল ভৌমিক	৬৯
তর্পণ (কবিতা)	হরপ্রসাদ মিত্র	৭৪
রক্ত গোলাপ (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	৭৪
শিখা অনির্বাণ (কবিতা)	জয়ন্তী সেন	৭৪
নেহরুর মত ব্যক্তি গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ নহে	চাণক্য	৭৫
অমর রহে	মৈত্রেয়ী দেবী	৭৭
নেহরু অমর রহে	তরুণ মৈত্র	৮১
মৃত্যু, তুমি হেরে গেছ	রজত সেন	৮৪
স্মরণীয় উক্তি	...	৮৭

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, সিনফিন, আনন্দানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য – আড়াই টাকা

বাংলার কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভদ্রের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহধর্মিণী, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি-১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—বাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নবজন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

25 Naya Paise
Thursday, 4th June 1964

অনির্বাণ অগ্নিশিখা

জ্যৈষ্ঠের দুপুর আগুন ছড়াচ্ছে চারদিকে। ঠিক সেই সময় আগুনের মতোই ছড়িয়ে পড়েছে একটি খবর 'নেহরু নেই, আমাদের নেহরু আর নেই।'

নবীন ভারতের রূপকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহরু। অগণিত মানুষের দেওয়া পদকে ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে পণ্ডিতের মতো সম্মানিত খ্যাতির ব্যবহার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিরুপাধি সাধারণ মানুষের নিকটতর, ঘনিষ্ঠতর হলেন শ্রীনেহরু। অসাধারণ নেহরু হলেন সাধারণ মানুষের একান্ত আপন, সব থেকে প্রিয়তম।

পরাধীন ভারতের অপরাজেয় যোদ্ধা, স্বাধীন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা শ্রীনেহরু—যিনি রাষ্ট্রের পতাকাকে বিশ্বের কাছে উঁচুতে তুলে ধরেছেন—সেই পতাকা আজ অর্ধনমিত। ঊর্ধ্ব আকাশে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে বারবার কেঁপে উঠছে রাষ্ট্রীয় শোকে সেই পতাকা। রাস্তায় রাস্তায় ঘর্ঘর বক্ষভেদী গাড়ির গর্জন, তবু শোকাচ্ছন্ন সমস্ত হৃদয়। সে-হৃদয় নেহরুর হাতে-গড়া ভারতের।

জ্যৈষ্ঠের দুপুরের তেজ অনেকটা কমে এসেছে। মানুষের বিষণ্ণ মুখগুলি দেখে—কমে এসেছে প্রবল সূর্যের প্রচণ্ড বিক্রম। আজ আর খেলার মাঠে কিংবা পার্কে নয়, মাতা-পিতার হতবিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ছোট ছোট শিশুরা, ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে রাস্তায়, ফুটপাতে, নিজের নিজের বাড়ির দরজায়—তাদের মুখে নেই সেই হাসি, শুকনো ফুলের মতো মুখ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজছে তাদের চাচা নেহরুকে। নেহরুর কতো সাধের স্বপ্ন ছিল তারা, আর তাদের ছিল নেহরু হবার সাধনা—হায় সেই চাচা নেহরু আজ আর নেই।

একজন গরীব পানওয়ালা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল—'আমাদের নেহরু আর নেই, তাহলে আমাদের কি হবে?' এই প্রশ্ন ত শুধু তার নয়, এ প্রশ্ন অনেকেরই। কোনো এক কারখানার ধর্মঘটের অবসান হয়েছে তেরই জ্যৈষ্ঠ। একজন শ্রমিক কাঁদতে কাঁদতে বললো: 'আজকের এই আনন্দের দিন আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে সব চেয়ে বিষাদের দিন।' শুধু ত বিষাদের দিন নয়, নেহরুর স্বপ্ন সফল করতে নতুন উদ্যমে কাজে লাগারও দিন।

ঠিক এর দু'দিন আগে অর্থাৎ এগারোই জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুলের জন্মদিনেই শুনেছি, শ্রীনেহরুর নিয়মিত মনোযোগ রয়েছে নির্বাক কবির প্রতি। ভারতের তথা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল সত্যি সত্যি এবার নেহরুহীন হলেন।

রাজনীতি এক জটিল বস্তু। তবু ভারতের যে কোনো দলই ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেহরুর নেতৃত্বকে নিজেদের মধ্যে কামনা করেছে। এখানেই তাঁর সবার সেরা শ্রেষ্ঠতা।

আজ যা আছে, কাল হয়তো তা থাকবে না। তবু ভারতের একজন ব্যক্তি যিনি সেখানের সমস্ত মানুষকে এক করেছেন বিশ্বের মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি—মহান মানবতার সেই প্রতিভূ মৃত্যুর নিষ্ঠুর শাসনেও চির অমর। তাঁর চিতার আগুন নিবে গেলেও তাঁর স্মরণে জ্বলবে চিরকাল ভারতের শিল্প মন্দিরে মন্দিরে অনির্বাণ অগ্নিশিখা।

সম্পাদকীয়

কবিতা

জ্যোতিষ্ক-সত্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কালপুরুষের ধনু
নিদাঘের অভিশপ্ত রাত্রিশেষে কোনো
অকস্মাৎ দিল কি টঙ্কার ?
ক্ষীণবৃন্ত নক্ষত্রেরা ঝরে গেল আতঙ্ক-পাণ্ডুর।
বিহ্বল প্রভাত এল শোকাহত আরক্ত নয়ন।

অলীক কল্পনা জানি।
অরণ্যে ও সমুদ্রে পর্বতে
পৃথিবীর হাটে মাঠে ঘাটে
জীবনের স্রোত নিত্য বয়ে যাবে ছেদহীন বেগে,
তবু কোনো মুহূর্তও
কোনখানে হবে না নিথর।
সৃষ্টির প্রবাহ বুঝি চির-উদাসীন।

জন্ম মৃত্যু-ডোর হ'তে খসে গিয়ে তবু,
একটি জ্যোতিষ্ক-সত্তা
মানুষের ইতিহাসে
রেখে দিয়ে গেল না কি
সূর্যাংশের শাশ্বত স্বাক্ষর।

স্বাক্ষর, না অবিনাশী সঙ্কল্পের বীজ।
যেখানে প্রাচীর তোলা
দেশে দেশে মানুষে মানুষে,
শক্তির সংগ্রাম যেথা
লোভে, দম্ভে, হিংসায় নির্মম
শঠতা ও কৌটিল্যের গুল্মাবৃত
কণ্টকিত রক্তাক্ত প্রান্তরে,
সেইখানে অঙ্কুরিত সে-বীজের সত্যমূল প্রীতির পাদপ
দূর করে' সব ভেদাভেদ
অগণন প্রসারিত পত্রপুষ্প পুঞ্জিত শাখায়
একদিন সারা বিশ্ব ছেয়ে
বিছাইবে সুবাসিত ছায়া।

রাঙা গোলাপ মালা

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ফুলের মালার সাজিয়ে ডালা দাঁড়িয়ে ছিলাম
বাহির আঙিনায়
থম-থমে সেই দুপুর বেলায় :
ভাবছি এবার যাই ফিরে যাই, মালার কুসুম
ছড়িয়ে দিয়ে যাই।
সে-ই যদি আজ হারিয়ে গেল,—কোনো সান্ত্বনাই
আনবে নাকো অন্ধকারে আলো-করা অনন্ত বিশ্বাস।
হঠাৎ যেন কিসের আভাস
সরিয়ে দিল গুমোট হাওয়ার তপ্ত হাহাকার,
ঘুচিয়ে দিল সকল বাধা ; সকল বন্ধদ্বার
এক নিমেষে খুলে গেল। ডাক দিল কে—
"এস এস ঘরে।"

বিশ্বচরাচরে
সেই ডাকে আজ লক্ষ কোটি মালার ফুলে ফুলে
হৃদয়-সাগর উথলে-পড়া বিদায়-ব্যথা উঠছে দুলে দুলে।

আমার হাতে ছিল মালা, রাঙা-গোলাপ-মালা,
তোমার প্রিয় প্রতিদিনের আধ-ফোটা ফুল গন্ধমধু ঢালা
তাই দিয়ে যে গেঁথেছিলাম অনেক আশা ক'রে
চোখের জলে ভিজিয়ে মালা বিছিয়ে দিলাম
তোমার বুকের 'পরে।
তোমার মুখে ফুটল হাসি, চিরকালের সেই যে চেনা হাসি,
ফুলের ব্যথা জুড়িয়ে দেওয়া, তাইতো ভালবাসি,
ভালবাসি তোমায় প্রিয়, যেমন বাসে চন্দ্রসূর্যতারা
হারিয়ে গিয়েও নয়কো তোমা-হারা
এই পৃথিবী ; জন্ম জন্মান্তরে
ভাঙলে খেলা সন্ধ্যেবেলা মায়ের আঁচল ধ'রে
ফিরবে তুমি চিরদিনের চেনা আপন ঘরে।

জীবন-সাধক জওহরলাল

গোপাল ভৌমিক

মৃত্যুই জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—এই ধ্রুব সত্য জেনেও আমরা কারও কারও মৃত্যুর কথা কল্পনা করতে পারি না কিংবা কল্পনা করতে ভয় পাই। আমরা নিজেদের দেহাবসানের কথা স্বচ্ছন্দচিত্তে ভাবতে পারলেও এঁদের দেহাবসানের কথা ভাবতে পারি না। যাঁদের মৃত্যুর কথা আমরা সহজ চিত্তে ভাবতে পারি না পৃথিবীতে সেরূপ মানুষের সংখ্যা অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ। ভারতের প্রিয় জননায়ক জওহরলাল ছিলেন এই সীমিত সংখ্যক মানুষদের অন্যতম। তাঁর জীবনাবসান তাই অকল্পিত শোকাবহ ঘটনা—শুধু ভারতের নরনারীদের কাছেই নয়—বিশ্বের সর্বত্র মানুষের মহত্ত্বের যাঁরা পূজারী তাঁদের সকলের কাছে। এখানে জাতিভেদ নেই, ধর্মভেদ নেই, নেই কোন বর্ণবিদ্বেষের অবকাশ। ইদানীং কালে মহাত্মা গান্ধী এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডির আকস্মিক জীবনাবসান জওহরলালের মহান মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। এই জাতীয় মানুষের জীবন যত দীর্ঘায়ত হোক না কেন আমাদের তাতে তৃপ্তি হয় না—আমরা চাই তার অবসান যেন কোনদিন না ঘটে। তার কারণ এরূপ জীবন নিছক ব্যক্তি-মানুষের জীবন নয়—এ জীবন এক-একটি প্রোজ্জ্বল আদর্শ। যত দিন যায় সে আদর্শ তত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে অন্ধকার পথচারী মানুষের কাছে সন্ধানী আলোকরূপে দেখা দেয়। তাই এই জাতীয় মানুষের জীবনাবসান ঘটলে আমরা নিজেদের একটা শ্বাসরোধকারী অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই। জাতির জনক গান্ধীজীর আকস্মিক জীবনাবসানে জওহরলাল বলেছিলেন: "আমাদের জীবন থেকে একটি প্রদীপ নিভে গেছে।" আজ তাঁর গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু উপলক্ষেও সেই একই উক্তি করা চলে।

মানুষের কীর্তির মানদণ্ডে যদি বিচার করা যায়, তাহলে জওহরলালের মৃত্যুকে গৌরবোজ্জ্বল না বলে উপায় নেই। আমরা যাকে পরিণত বয়স বলি সেই বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পিছনে যে জীবন তিনি রেখে গেছেন সে জীবন যেমন বিচিত্র কর্মবহুল তেমনই গৌরবময়। প্রদীপ্ত যৌবনে ভারতের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিশ্ব-মানবতার মুক্তি সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তাঁর সে সংগ্রামের সাফল্যপূর্ণ অবসান হয়েছিল স্বাধীন ভারতের

● শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসবে রফি আহমেদ কিদোয়াই, শেখ আবদুল্লা ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীনেহরু

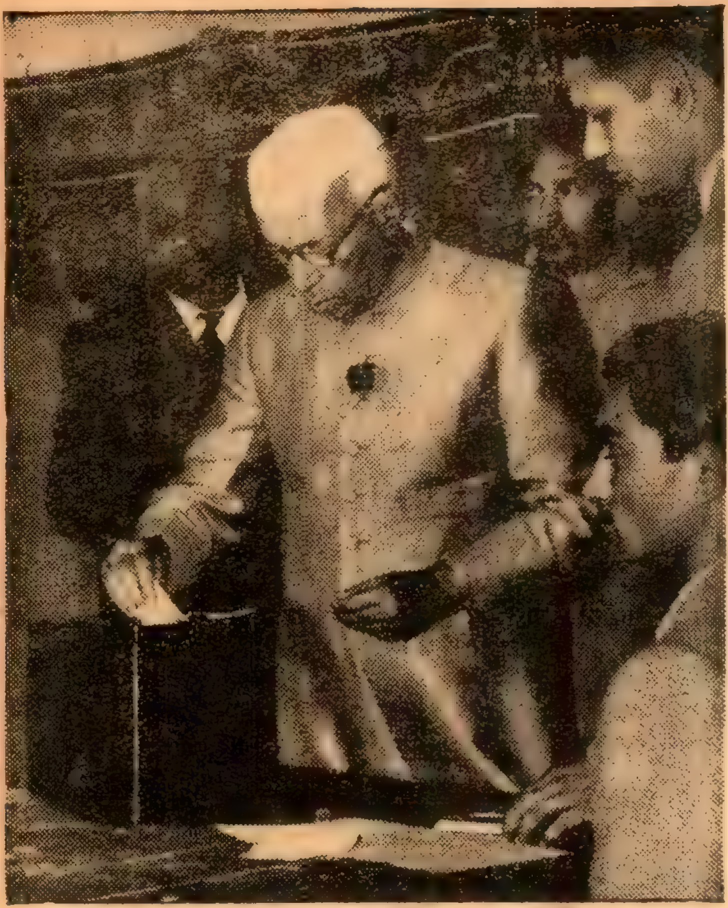

ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনেহরু আপন নির্বাচনকেন্দ্রে ভোট দিয়া গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করে তুলছেন।

আবির্ভাবে। আর সেই স্বাধীন ভারতের অবিসম্বাদী কর্ণধাররূপে জীবনের শেষ সতের বৎসর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর ধ্যানের ভারতকে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে। পরিমাণগত সার্থকতা কতখানি হয়েছে না হয়েছে তার বিচার করবে ভাবীকাল। তবে আমরা চোখের উপর যতটা দেখেছি তাতে এ উপলব্ধি অনায়াসেই হয় যে স্বাধীন ভারতকে তিনি একটা সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন—সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর উত্তরসূরীদের কাজ। একটি মানবজীবনের সীমিত পরিধির মধ্যে জওহরলাল যে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন তার পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে সে কৃতিত্ব পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রনায়কের ভাগ্যেই এক জীবনে জোটে না। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে. পরিণত বয়সে একটি বিরাট কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের অবসান হয়েছে এবং তাঁর এই কৃতিত্বের মধ্যেই তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কই, সে ভাবে তো আমরা চিন্তা করতে পারছি না—পারছি না তাঁর অভাব-বোধকে ঠেলে দূরে ফেলতে। তার কারণ কৃতী পুরুষদের মানদণ্ড দিয়ে আমরা জওহরলালকে বিচার করি না, আমাদের কাছে তাঁর বিচারের মাপকাঠি শুধু তিনি নিজে—সেখানে তিনি অনন্য-সাধারণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর চেয়েও যোগ্যতর কোন ব্যক্তির সন্ধান আমরা হয়তো একদিন পাব—কিন্তু যাঁকে আর কোনদিন ফিরে পাব না তিনি হলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর কাছ থেকে মানুষের প্রত্যাশার অন্ত ছিল না—এ বিশ্বাস মানুষের ছিল যে আরও দীর্ঘজীবন লাভ করলে মানুষের মুক্তির জন্য আরও অনেক কিছু তিনি করতে পারতেন। এই অপূরণীয় ক্ষতি-বোধই তাঁর মৃত্যুকে করে তুলেছে এত শোকাবহ।

জওহরলালের জীবনাবসান একটি ব্যক্তি-মানুষের জীবনাবসান মাত্র নয়—এ যেন জীবন থেকে একটা বিশ্বাস, একটা আস্থা হারিয়ে যাওয়া. এ যেন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে একটা মধুর স্বপ্নের অবসান। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভারতের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার জওহরলাল হয়েছিলেন এটা তাঁর জীবনের একটা ঘটনা মাত্র। কিন্তু তাঁর জীবনের পরিচয় এরই মধ্যে সীমিত ছিল না! তাই পৃথিবীর সাধারণ রাষ্ট্রনীতিবিদদের সঙ্গে এক পংক্তিতে জওহরলালকে বসাতে আমার মন চায় না। তিনি ছিলেন মানবতার পূজারী—স্বপ্নদ্রষ্টা মহামানব। যে পরাধীন দেশে তিনি জন্মেছিলেন তার আহ্বানে ও প্রয়োজনে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের দুঃসাহসী ব্যক্তিত্ব, আত্মত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার গুণে তিনি একদিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গোটা দেশের কর্ণধার। কিন্তু তাঁর চরিত্রে যে সব গুণ ছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দেশকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি আরও অনেক কিছু হতে পারতেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনা অনুকূল হলে তাঁর পক্ষে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক কিংবা একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক হওয়াও বিচিত্র ছিল না। নিজের সংগ্রামী কর্মবহুল জীবনের দুর্লভ অবসরে যে কয়খানি বই তিনি লিখে গেছেন; সে সব বই-এর সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। বুদ্ধিবাদ এবং হৃদয়বাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণে গঠিত জওহরলালের চরিত্র কঠোর বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞের মত ছিল না। যাঁরা কঠোর বাস্তববাদী রাজনীতির ভক্ত তাঁরা তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপী জওহরলালকে শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের সঙ্গে তুলনা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে গালাগালি বলে মনে হলেও একেও জওহরলালের চরিত্রের প্রতি পরোক্ষ সম্মানপ্রদর্শন বলে ধরে নেওয়া চলে। দ্বিধা সংশয়ে দীর্ণ হ্যামলেট বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে যতই ব্যর্থকাম হোন, তাঁর প্রতি কোন পাঠকের প্রীতির অর্ঘ্য প্রসারিত নয়? জওহরলালও তেমনই তাঁর চরিত্রের সর্বপ্রকার দুর্বলতা, সবলতা এবং মহানুভবতা নিয়ে ছিলেন

প্রতিটি মানুষের প্রীতিভাজন। তাঁর কাছে আমি যা চাই তা হয়তো পাই নি—কিন্তু তিনি তাঁর চরিত্রের সহজাত মাধুর্য ও ঔদার্যে আমার সে না-পাওয়ার বেদনা অনুভব করতে দেন নি—আমাকে তাঁর প্রতি বিরূপ হতে দেন নি।

নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ ছিল জওহরলালের জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্যান ও জ্ঞান। এই কল্যাণ সাধনে রাজনীতি ছিল তাঁর কাছে একটা উপায় মাত্র। মহাত্মা গান্ধীর কাছে সে রাজনীতির শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে সে রাজনীতিও তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল অহিংসা-ভিত্তিক। হ্যারো-ইটনে শিক্ষিত জওহরলালের মানসিক গঠনে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি বরাবরই কাজ করে এসেছে এবং তাঁর ফলে তাঁর চরিত্রের আপাত-বিরোধ অনেকের কাছে ঠেকেছে বিস্ময়কর। যৌবনে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা তাঁকে করে তুলেছিল গণতান্ত্রিক ভাবধারার শ্রেষ্ঠ পূজারী। সেই সঙ্গে বিশ্বের নিপীড়িত মানবতায় মুক্তিকল্পে প্রচারিত মার্ক্সীয় মতবাদও তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু মার্ক্সীয় মতবাদের উদ্দেশ্যের সততা মেনে নিলেও রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে সে উদ্দেশ্য সাধন তাঁর মনঃপূত হয় নি। এই সংশয়ে যিনি তাঁকে খাঁটি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তিনি হলেন অহিংসা মন্ত্রের মূর্ত পূজারী মহাত্মা গান্ধী। এই দুই মতের সংমিশ্রণেই জওহরলাল হয়ে উঠেছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অন্যায় বৈষম্য-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে অহিংসার মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সেই বিশ্বাসকেই তিনি ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মাদর্শে পরিণত করেছিলেন। কংগ্রেস যে আজ ভারতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেছে তার মূলে ছিলেন একমাত্র জওহরলাল নেহরু। কংগ্রেসকে কি ভাবে তিনি এই নতুন কর্মাদর্শের প্রতি ধীরে ধীরে টেনে এনেছেন সে এক স্বতন্ত্র কাহিনী।

যাঁরা সাধারণ রাজনীতিজ্ঞ তাঁরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং সেই দলের মতবাদের বাইরে তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা বড় একটা থাকে না। এ ক্ষেত্রে জওহরলাল ছিলেন তাঁর ব্যতিক্রম। অবশ্য নির্বিশেষে কোন বাঁধা-ধরা দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনিও দলের মানুষ ছিলেন—কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সম্পর্ক। তবু মতবাদের বিরোধ যখন দেখা দিয়েছে, তখন বর্ষীয়ান বহু জননায়ক, এমন কি নিজের পিতা মতিলাল নেহরু এবং স্বয়ং গান্ধীজীর সঙ্গেও তিনি লড়াই করতে কুণ্ঠিত হন নি। আর এরূপ বিরোধের ক্ষেত্রে প্রায়ই জয় হয়েছে তাঁর। তার কারণ, তাঁর মনের দরজা ছিল সর্বদা খোলা। বাইরের পৃথিবীর যেখানে যে ভাবধারার উদ্ভব হয়েছে, কল্যাণকর বলে বিবেচনা করলে নিজের রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। এ হিসাবে দেখতে গেলে তাঁকে আমরা এ যুগের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়-বাদী রাষ্ট্রনেতা বলে অভিহিত করতে

১০ই জুন প্রকাশিত হবে—

যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণ ধর ও নিরঞ্জন সেনগুপ্তের

সীমান্তে অন্ধকার ৩·৫০

বিপন্ন বাংলার ইতিহাসে শরণার্থী মানুষের বৃহত্তম ট্র্যাজেডির কারণ, তার প্রতিকার ও ভবিষ্যতের চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন দু'জন খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লেখক। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় যে দ-র আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুনে মানুষের মন উত্তপ্ত। বাঙালীকে ভাবতে হবে তার ভবিষ্যৎ কোথায়—মানা শিবিরে না পূর্ববাংলার ফ্যাসিজমের অবসানে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নতুন সুবৃহৎ উপন্যাস — **পৌষ ফাগুনের পালা** দাম ১৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের — **জয়ন্তী** দাম ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের — **একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে** (২য় সং) ৩·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন উপন্যাস — **কালো হরিণ চোখ** দাম ১০·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর নতুন বই — **অলোক দৃষ্টি** দাম ৩·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের — **দুই পাখি** ৩·৫০

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর — **বিচিত্র বিবেকানন্দ** ২·২৫

শংকর-এর — **চৌরঙ্গী** (১১শ সং) ১০·০০ • **পাত্র পাত্রী** (৩য় সং) ২·৫০

জরাসন্ধের — **মসিরেখা** (৩য় সং) ৯·০০ • **পাড়ি** (৪র্থ সং) ৩·৫০

বিমল মিত্র রচিত — **স্ত্রী** (৩য় সং) ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর — **শ্রেষ্ঠ গল্প** (৩য় সং) ৫·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের — **গরীয়সী গৌরী** (২য় সং) ৪·৫০

শচীন্দ্রনাথ মিত্রের নতুন উপন্যাস — **হলুদ পাতার সবুজ শির** ৫·৫০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের — **পকেটমার** (২য় সং) ৫·০০

নীলকণ্ঠের — **ক্যাপা খুঁজে ফেরে** (২য় সং) ৩·০০

দেবজ্যোতি বর্মণের — **আমেরিকার ডায়েরী** ৭·৫০

বা ক্-সা হি ত্য : ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

● জওহরলাল ও বিধান রায়

পারি। দলের মধ্যে থেকেও জওহরলাল তাই সর্বদা দলের উর্ধ্বে থাকতেন এবং দলের দ্বারা তিনি যতটা প্রভাবিত হতেন, তার চেয়ে বেশি করে দলের উপর প্রভাব পড়ত তাঁর নিজের। গণতান্ত্রিক সমাজবাদে কংগ্রেসের নিঃসংশয় আস্থা-জ্ঞাপন জওহরলালের এই ব্যক্তিগত বিজয়ই সূচিত করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত পন্থ প্রমুখ প্রবীণ কংগ্রেস নায়কদের তিরোধানের পর কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব এসে পড়েছিল একক জওহরলালের হাতে। সাধারণ পর্যায়ের ক্ষমতালোভী রাজনীতিজ্ঞ তিনি যদি হতেন, তাহলে সেই সুযোগে ভারতে তাঁর পক্ষে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মনে-প্রাণে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জওহরলাল সে পথে হাঁটেন নি এবং গণতন্ত্রকেই দেশবাসীদের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে স্থাপন করে গেছেন। গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করে চলে বলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং এ ব্যবস্থায় ভুল-ভ্রান্তির অবকাশও বেশি। তবু খাঁটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর কোন শাসনব্যবস্থা আজও পৃথিবীতে উদ্ভব হয় নি বলে এই ব্যবস্থাই বোধ হয় মানবসমাজের পক্ষে এখনও সর্বোত্তম। গত ১৬ বৎসরের ঘটনাচক্রের আবর্তনে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নেই। এক-মাত্র জওহরলালের একনিষ্ঠ সাধনা এবং উদার মতবাদের ফলে ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর দুইটি বিবদমান শক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় একটি নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠীর প্রবর্তন করে জওহরলাল কি ভাবে বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রয়াস করেছিলেন, সেকথা আজ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর এ সকল প্রয়াস যে সর্বাংশে সার্থক হয় নি তার প্রমাণ হল বান্দুং সম্মেলনের পঞ্চশীলে স্বাক্ষরকারী চীনের অতর্কিত ভারত আক্রমণ। আমার নিজের বিশ্বাস যে, ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ যে-ভাবে জওহরলালের আশা ও স্বপ্ন ভঙ্গ করেছিল, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সেভাবে আর কোন ঘটনা তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। যে মহাচীনকে প্রথম স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, যাকে বিশ্বরাষ্ট্র সভায় স্থান দেবার জন্ম তিনি পূর্বাপর লড়াই করে এসেছেন, সেই চীন সীমান্ত-বিরোধের জন্ম শান্তিকামী ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে—একথা তিনি কোনদিনই ভাবতে পারেন নি। জওহরলালের সে নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের মর্মবেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু কল্পনায় অনুভব করা যেতে পারে।

বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে শালীনতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারে জওহরলাল ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভারতের যুগার্জিত শিষ্টাচারই যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে তার তিক্ততার সম্পর্ক বেড়েছে বই কমে নি। চীনের সঙ্গে তো ভারতের সশস্ত্র সংঘর্ষই হয়ে গেছে। দেশ ও জাতি যখন এইরূপ কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন, তখনও যে জাতীয় নেতা নিজের স্বাভাবিক শালীনতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে নমস্য। পাকিস্তান ও চীন সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত জওহরলাল যে সব বক্তৃতা করেছেন, সেগুলি যদি আমরা ধৈর্য ধরে পড়ি, তাহলে আমরা দেখতে পাব তিনি কি অসাধ্য সাধন করেছেন। পাকিস্তানের ও চীনের শাসককুলের নিন্দা তিনি করেছেন—কিন্তু কোথাও সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোন কটূক্তি নেই। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমান প্রেম ও মমত্ববোধ না থাকলে মনের এরূপ বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি সম্ভব নয়। ভারতের সাধনার ধারায় পরিপুষ্ট জওহরলাল নিছক সাময়িক রাজনীতির দাসত্ব করতেন না বলেই তাঁর পক্ষে মনের এ বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি সম্ভব ছিল। তিনি জানতেন যে, এ সবই মানুষকে আজ হোক, কাল হোক ভুলে যেতে হবে, একদিন না একদিন জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। সেই অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন তিনি দেখতেন বলে সাময়িক ঘটনার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া, গান্ধীজীর জীবনাদর্শে প্রবুদ্ধ জওহরলাল পাপ ও অন্যায়কে মনে-প্রাণে ঘৃণা করলেও পাপী বা অন্যায়কারীকে ঘৃণা করতেন না—বরং প্রেমের মাধ্যমে তাকে পাপ ও অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাই ছিল তাঁর আদর্শ। জওহরলালের দেহাবসানের ফলে আজ গোটা পৃথিবীতে এই আদর্শের ধারক আর কে রইল? যারা সাধারণ রাজনীতিবিদ্ তাঁরা নিজের বা দেশের স্বার্থ অনুসারে নিজেদের কর্মনীতি নির্ধারণ করেন। কিন্তু জওহরলাল তা করতেন না। জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখলেও তিনি জাতিকে কখনও বিশ্ব থেকে বিচ্যুত করে দেখতেন না এবং তার ফলে জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণের সময় বিশ্ব স্বার্থের কথাও তাঁর মনে থাকত।

শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে জওহরলালের এই উদার কর্মনীতি আগামী দিনে ভারতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। তবে তিনি যে চিরন্তন ন্যায়নীতির আদর্শ সম্মুখে রেখে কাজ করতেন, সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে তাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস নয়,

● প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ও রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ

ভীতির কাছে নতি নয়—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তিজীবনে এই মূলমন্ত্র ছিল একই। সর্বদাই যে রাজনীতি ক্ষেত্রে এ মূলমন্ত্রের মর্যাদা তিনি রাখতে পারতেন এমন নয়—তবে রাখার চেষ্টা করতেন। ঘটনাচক্রে কখনও কখনও আপোসের পথেও অবশ্য যেতে হত। তবে সে আপোস তাঁকে করতে হত জেনে শুনে। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটা আত্মসমীক্ষা পড়েছিলাম স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত তাঁর একটি রচনায়। স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ অনেক কঠিন সত্য রূঢ়ভাবে দেশবাসীদের কাছে তুলে ধরেছেন। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তারপর জওহরলাল বলেছেন, আমরা যাঁরা রাজনীতি করি তাঁরাও সময় সময় অনুরূপ কঠিন কথা দেশবাসীদের বলতে চাই—কিন্তু পারি না—তার কারণ সেখানে ভোটের জন্য, আপোস ছাড়া আমাদের পথ নেই। আর সেই সঙ্গে এ স্বীকৃতিও তিনি করেছেন যে, আপোসের পিচ্ছিল পথে একবার পা বাড়ালে তার শেষ যে কোথায় হবে এ কেউ জানে না। কোন সাধারণ রাজনীতিবিদের পক্ষে কি এই ধরণের সচেতন আত্মসমীক্ষা সম্ভব?

জীবন-রসিক জওহরলাল ছিলেন একটা গোটা মানুষ। রাজনীতি তাঁর জীবনের একটা অংশ মাত্র ছিল। প্রাণবন্ত উচ্ছল যে জওহরলালকে কোটি কোটি নরনারী ভালবাসত সে জওহরলাল ছিলেন ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণশীল। তাঁর চোখে ছিল স্বপ্ন, বুকে ছিল আশা, কণ্ঠে ছিল মাভৈঃ বাণী এবং দেহে মনে ছিল অফুরন্ত কর্মক্ষমতা। মানুষের কৃষি-শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ললিতকথা, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে ছিল তাঁর সমান অনুরাগ। পূর্ণ মানবতার সাধনাস্থল ভারতবর্ষেই শুধু এমন গোটা মানুষের আবির্ভাব সম্ভব। আজকের খণ্ডিত মানবতার দিনে তিনি তাই ছিলেন বিস্ময়। বিশ্বের যেখানে তিনি গেছেন সেখানে তিনি বয়ে নিয়ে গেছেন ভারতের প্রেম, মৈত্রী ও জীবহিতের বাণী। অনগ্রসর দেশবাসীদের কাছে তিনি প্রতিনিয়ত শুনিয়েছেন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রগতির কথা। ভারতের শাশ্বত সত্য অক্ষয় রেখে আধুনিক ভারত সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী। জওহরলাল ছিলেন তাঁদের শেষ সার্থক উত্তর-সাধক।

● নৌবাহিনীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীনেহরু

কবিতা

তর্পণ

হরপ্রসাদ মিত্র

না না হাহাকার নয়,
শুধু জনমনের জোয়ারে
স্নান ক'রে ঘরে ফেরা,
শুদ্ধ হওয়া
—এই বারে বারে।

আকাশ অতন্দ্র ব্যাপ্তি,
গোলাপ গভীর কী যে রূপ!
আরো এক কথা আছে—
সে মহামৃত্যুর এই চুপ।

মিছিল কি জানে তাকে?
প্রবৃত্তি মানে কি তাকে?
তাই—
ক্ষুব্ধ পৃথিবীও বলে
এসো শেষ বিশ্রাম নেভাই।

তারপরে অন্ধকারে—
দেখি মহাশূন্যের রাত্রিতে
হীরের গোলাপ হয়ে ছড়ায় সে বাত্রীতে-বাত্রীতে।
মিছিল এগিয়ে যায়,—প্রহর চলেছে অবিরত।
হীরের নির্মাণ হবে নক্ষত্রেরা থাকেই শাশ্বত।

না না হাহাকার নয়,
এ আবার আকাশ-দর্শন।
শুধুই বিষাদ নয়, নয় শুধু শোকাশ্রু-বর্ষণ।

রক্ত গোলাপ

দুর্গাদাস সরকার

কুচিৎ কখনো আসে
একজন
জীবন-নির্বাণে।
মানুষ-গড়ার সেই মহাকারিগর
একদিন
মেশে কোটি কোটি পরমাণুর ভিতর।
তার তবু নেই কোনো—জীবনের ভয়।
যেসব মানুষ আরো রয়ে গেল, পৃথিবীতে
হারাবার মতো তারা নয়।

তবু আজ শোকস্তব্ধ মলিন আকাশে
আমাদের অশ্রুবিন্দু বাষ্প হয়ে ভাসে
রৌদ্রতপ্ত জ্যৈষ্ঠের বাতাসে।

কোথায় আগুন যেন ধিকিধিকি জ্বলে:
—শিল্পের মন্দিরে?
সে-আগুনে লেখা হয় আজ কোন্ নাম?
লেখা থাক তাতে, বন্ধু, তোমার সংগ্রাম।

চিরকাল থাকে না ত চিতার আগুন।
প্রতিদিন আসে না ফাগুন।
এমনি অবাক—
বাগানে ফুটেছে আজ প্রথম গোলাপ।
নেই তার অন্য কোনো নাম।
যদি আমি এই ফুল তোমাকে দিতাম।

শিখা অনির্বাণ

জয়ন্তী সেন

শান্তির সুস্নিগ্ধ দীপ শুভজ্যোতি শিখা অনির্বাণ
পারাবত শ্বেতপক্ষ আন্দোলিত নিখিলের বুকে
পৃথিবী বলেছে জপে নামমন্ত্র, সেই প্রিয় নাম—
পৃথিবীর ধ্যান স্বপ্ন উদ্ভাসিত চির চেনা মুখে।
কখনও বিচ্ছেদ ভয় শোকাহত হৃদয়ের তারে
নিষ্ঠুর রাগিণী আর বাজাবে না নিবিড় প্রত্যয়ে

সোচ্চারে প্রকাশ করে জীবনের নিশ্চিত গৌরব
ফুলের সৌরভ বড় ক্ষুদ্র হতে—প্রেম মধুময়।
শান্তির সুস্নিগ্ধ দীপে অনির্বাণ আলোক স্মরণ—
সে ধারায় শুচিস্নাত বিশ্বলোক জেনেছে, মরণ
স্মরণের কাছে আজও পরাভূত—। সেই স্মৃতিভার
হৃদয়ের বড় কাছে দুলে ওঠে দ্যুতি মণিহার।

অন্তরীক্ষের বুকে দিয়ে অঙ্গকারে থাকো চিনে চিনে
পৃথিবী প্রণাম রাখে পদপ্রান্তে বিদায়ের দিনে।

নেহরুর মত ব্যক্তি গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ নহে * চাণক্য

রাষ্ট্রপতি জহরলালকি জয়। প্রতীক্ষমাণ জনতার মধ্য দিয়া ত্বরিৎপদে চলিয়া যাইবার সময় রাষ্ট্রপতি একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন,জোড়হস্তে নমস্কার জানাইলেন, তাঁহার বিশুষ্ক কঠিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে-হাসি একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল; যাহারা সে হাসি দেখিল তাহারাও তৎক্ষণাৎ হাসিয়া, জয়-ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।

সে-হাসি পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল—রাষ্ট্রপতির মুখাবয়বে আবার সেই বিষণ্ণতা ও কাঠিন্য দেখা দিল। মনে হইল, আবেগবিহ্বল জনতার মধ্যে তিনি যেন সম্পূর্ণ উদাসীন; মনে হইতে লাগিল যেন সে-হাসি ও হাবভাবের পশ্চাতে কোনও বস্তুই নাই। যে জনতার কাছে তিনি প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের প্রীতিলাভের ইহা কৌশল মাত্র। সত্যই কি তাই?

আবার তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখুন। বিরাট শোভাযাত্রা; হাজার হাজার লোক তাঁহার গাড়ি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আনন্দের আতিশয্যে জয়-ধ্বনি করিতেছে। তিনি গাড়িতে বসিবার জায়গায় সোজা হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে দীর্ঘ দেখাইতেছে; এ যেন দেবতা,—জন-সমুদ্রের মধ্যে অবিচল, প্রশান্ত মূর্তি। হঠাৎ আবার সেই হাসি, এ যেন উল্লাসের হাসি। উত্তেজনা প্রশমিত হইতে দেখা গেল, কি কারণে হাসিতেছে তাহা না বুঝিয়াও জনতা আবার হাসিয়া উঠিল। এবার আর তিনি দূরের দেবতার মত নহেন—তিনি মানুষ, তিনি তাঁহার চারিপাশের জনগণের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ হইতে চাহেন—তাহারা ইহাতে আনন্দ পায়—বন্ধু ভাবে—অন্তরের সঙ্গে তাঁহাকে গ্রহণ করে। কিন্তু সে হাসি আবার অন্তর্হিত হয়—মুখের উপর আবার সেই বিবর্ণ কঠিন ভাব জাগিয়া উঠে।

রূপসজ্জাহীন অভিনেতা

ইহা কি স্বাভাবিক অথবা জন-নেতার সুচিন্তিত কৌশল? হয়ত ইহা দুই-ই এবং বহুদিনের অভ্যাসে এখন দ্বিতীয় স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

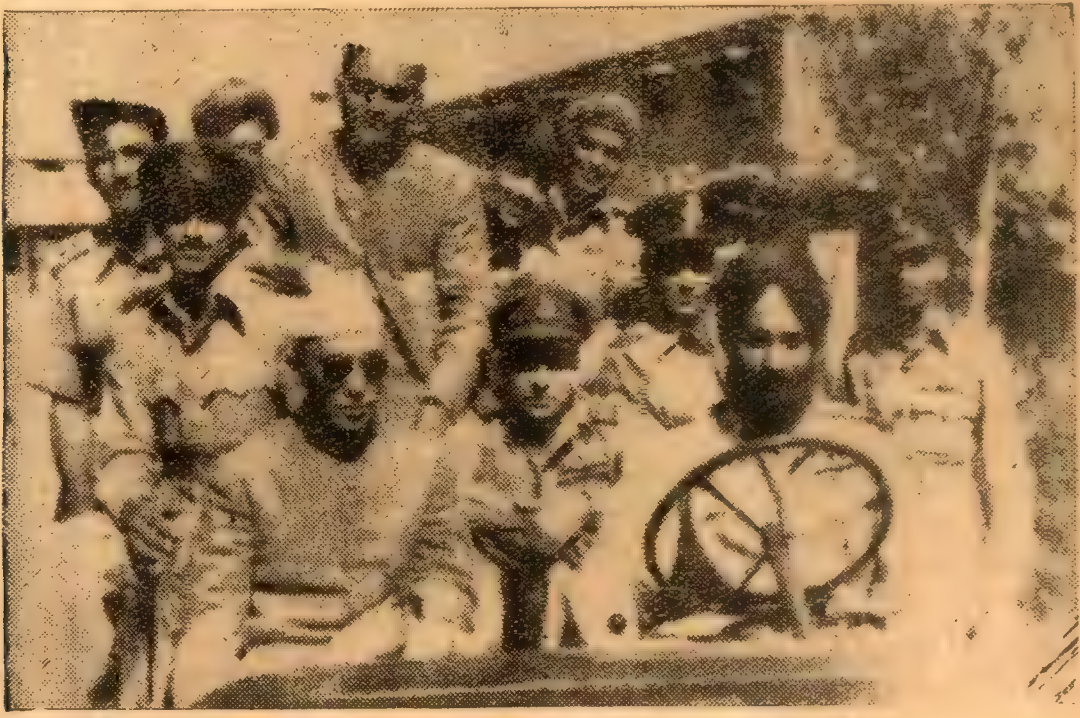

● ১৯৫৬ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট পরিদর্শনকালে প্রধান মন্ত্রী (অবিভক্ত ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) শ্রীনেহরু ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে গৃহীত চিত্র।

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খানের সঙ্গে জওহরলাল নেহরু

যেখানে কোনও আয়াস নাই এমন ভাবভঙ্গিই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী এবং জহরলাল অভিনেতার রূপসজ্জার উপকরণ ব্যবহার না করিয়া সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় করিতে শিখিয়াছেন। আপাত-প্রতীয়মান অসাবধানতা ও ঔদাসীন্যের সহিত জহরলাল একজন কুশলী নটের ন্যায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এ-অভিনয় তাঁহাকে ও দেশকে কোথায় লইয়া যাইবে? তাঁহাই এই আপাত-উদ্দেশ্যবিহীনতার মধ্যে কোন প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি? তাঁহার এই মুখোসের পশ্চাতে কি আছে?—কোন সে কামনা, ক্ষমতালাভের কী সে ইচ্ছা, কোন সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা?

যাহা হউক, এ সকল প্রশ্ন সত্যই কৌতূহলপ্রদ, কারণ জহরলালের এমনি ব্যক্তিত্ব আছে যে, তিনি সর্বদাই মানুষের কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহার গুরুতর তাৎপর্য আছে, কারণ ভারতের বর্তমান এবং সম্ভবত ভবিষ্যৎ কালের সহিত তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ভারতবর্ষের পরম কল্যাণ অথবা চরম অনিষ্ট সাধন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সেই কারণে আমরা এ সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট আছেন; অনেকে মনে করেন, তিনি একজন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অনুগত ভৃত্য মাত্র—অন্যেরা তাঁহাকে দমন করিয়া অথবা সায়েস্তা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তবু দেখা যায় যে, জনসাধারণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর বহু লোকের মধ্যে তিনি অবিচলিত ভাবে ধীরে ধীরে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়াইয়া চলিয়াছেন। কৃষক, মজুর, জমিদার ও পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ও ফিরিওয়ালা, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য, মুসলিম ও শিখ, পার্সি, খৃষ্টান ও ইহুদি—যাহাদের সকলকে লইয়া ভারতীয় জীবনের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য, তিনি সেই সকল সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন, সকলের সঙ্গে আলাপ করেন ঈষৎ বিভিন্ন ভাষায়;—সকল সময়েই সকলকে তাহার নিজের পক্ষে টানিয়া আনার চেষ্টা থাকে।

বিজয়ী সিজারের মত

তাঁহার বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর উৎসাহ ও শক্তিতে তিনি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের সকল স্থানে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন এবং জনসাধারণের নিকট হইতে অভূতপূর্ব অভিনন্দনও লাভ করিয়াছেন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত তিনি বিজয়ী সিজারের মত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার পদচিহ্নে উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাঁহার জীবনের গৌরবময় কাহিনী। তাঁহার পক্ষে ইহা কি মাত্র আনন্দের বিলীয়মান কল্পনা—অথবা ইহা তাঁহার গভীর উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত? অথবা ইহা তাঁহার মধ্যে অজানিত কোনও শক্তির খেলা? ইহা কি তার ক্ষমতালাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—

যাহার বর্ণনা তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে করিয়াছেন,—যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এক জনতা হইতে আর এক জনতার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে এবং তাঁহার কানে কানে চুপিচুপি বলিতেছে—"আমি আমার হাতের মধ্যে এই জন-স্রোতকে টানিয়া রাখিয়াছি এবং আমার ইচ্ছাকে আকাশের গায়ে তারকার অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছি।"

এই খেয়াল যদি রূপান্তরিত হয়? মহৎ ও কল্যাণকর কার্য করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও জহরলালের মত মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ নহে। তিনি বলেন, তিনি গণতন্ত্রবাদী, তিনি সমাজতন্ত্রবাদের অনুরাগীও এবং ইহা তিনি অন্তরের নিষ্ঠার সহিতই বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রত্যেক মনস্তত্ত্ববিদই জানেন যে, মানুষের মন তাহার হৃদয়ের ক্রীতদাস এবং সে যুক্তি মানুষের ইচ্ছা ও অদম্য প্রেরণার বেলাতেও খাটে। একটু বিকৃতি, বিচ্যুতি বা পরিবর্তন করিলেই জহরলাল মন্থরগতি গণতন্ত্রের আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া "ডিক্টেটর" বা সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িতে পারেন। তখনও তিনি সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সেই ভাষা ও ধ্বনি (Slogan) ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু আমরা জানি, কিভাবে সেই ভাষার সাহায্যেই ফ্যাসিজম্ (Fascism) বা জবরদস্তী-তন্ত্র গড়িয়া উঠিয়া সেই ভাষাকেই পরে একদিন অনাবশ্যক বলিয়া পরিহার করিয়াছে।

ফ্যাসিজম-এর ইতরতা তাঁহার নাই

জহরলাল কখনই 'ফ্যাসিষ্ট' নহেন—ইহা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং উহার উপর তাঁহার আস্থাও নাই। তাঁহার আভিজাত্যবোধ এমনি উঁচু সুরে বাঁধা যে, ফ্যাসিজম্-এর অমার্জিত ভাব ও অশিষ্টাচার তাঁহার কাছে অসহ্য। তাঁহার চেহারা, তাঁহার কণ্ঠস্বরও সেই কথাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন—"Private faces in public places are better and nicer than public faces in private places"— নির্জনে দেখা পরিচিত মুখ অপেক্ষা যে-মুখ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না—সে মুখ প্রকাশ্যে আরও বেশি ভাল দেখায়, সুন্দর দেখায়।

ফ্যাসিষ্টের মুখ বাহিরের মুখ—সে মুখ ঘরে বাহিরে কোথাও মনোরম দেখায় না। জহরলালের মুখ, তাঁহার কথাবার্তা একান্তভাবে ঘরোয়া। ইহাতে কোনই ভুল নাই যে, ভিড়ের মধ্যে প্রকাশ্য সভায় আমরা জহরলালের মুখে যে কথা শুনি, তাহা নিতান্ত অন্তরঙ্গেরই কথা—সে কথা প্রত্যেকের কানে গিয়া পৌঁছায় পৃথক ভাবে—অনাড়ম্বর ঘরোয়া কথার ছাঁদে।

সে কথা যে শোনে, যে সেই ভাবপ্রবণ মুখ দেখে, সেই বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—উহার পশ্চাতে কি বস্তু আছে? কি চিন্তাধারা, কোন সে কামনা, কি সে আশ্চর্য ভাবের সংমিশ্রণ, কোন সে নিরুদ্ধ অনুরাগ ও তীব্র আবেগ হইতে উদ্বুদ্ধ তাঁহার এই অন্তর্নিহিত শক্তি ও উৎসাহ, কিসের সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা—যাহা তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করিতে ভরসা পান না।

জীবনে বিশ্রাম নাই

প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিবার সময় নানাবিধ চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসে, কখনও বা তাঁহার উদাসীন দৃষ্টিতে তিনি ধরা পড়িয়া যান, মনে হয় তাঁহার মন তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, অপরিচিত স্থানে। কল্পনার রাজত্বে তিনি বিচরণ করিতেছেন, তিনি তখন নিকটের লোকদের কথা যেন ভুলিয়া যান এবং মানসলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে অস্ফুট আলাপে রত হন।

তিনি কি তখন তাঁহার দুঃসহ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের পথে যে সকল মানুষের সংস্পর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের কথা স্মরণ করেন? তাহাদের জন্য তাঁহার মনে কি বেদনা জাগে? অথবা তিনি তাঁহার স্বপ্নে-গড়া ভবিষ্যতের কথা, সেখানকার আসন্ন ও কল্পিত সংগ্রাম ও জয়লাভের কথা চিন্তা করেন? তাঁহার জানা উচিত, যে পথ তিনি নিজে বাছিয়া লইয়াছেন, তাহার মাঝখানে বিশ্রাম লাভ তাঁহার ভাগ্যে নাই, এবং জয়লাভ করিলেও অধিকতর দায়িত্ব ও কর্মের বোঝা তাঁহাকে বহিতে হইবেই। লরেন্স যেমন আরবদের বলিয়াছিলেন—"There can be no rest house for revolt no devident of joy paid out", অর্থাৎ বিদ্রোহীদের জন্য কোনও বিশ্রামাগার থাকিতে পারে না, আনন্দলাভও তাহাদের জন্য নহে।

আনন্দ হয়ত জহরলালের জন্যও নহে, কিন্তু যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবে আনন্দ অপেক্ষাও মহত্তর বস্তু হয়ত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—জীবনের উদ্দেশ্যের সফলতার মধ্যে।

জহরলাল "ফ্যাসিষ্ট" না জবরদস্ত হইতে পারেন না, তবুও তাহার মধ্যে "ডিক্টেটর" বা সর্বময় প্রভু হইবার সমস্ত উপাদানই আছে—প্রভূত জনপ্রিয়তা, সুনিয়ন্ত্রিত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও উৎসাহ, অহঙ্কার, গঠন করিবার যোগ্যতা, কার্যক্ষমতা, কঠোরতা এবং জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা, এবং দুর্বল ও অযোগ্যের প্রতি অবজ্ঞা। মাঝে মাঝে তাঁহার হঠাৎ ক্রোধান্বিত হইবার কথা সকলেই জানে এবং সে ক্রোধ দমন করিবার পরও তাঁহার কুঞ্চিত ওষ্ঠের দিকে তাকাইলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতেও কষ্ট হয় না। কোনও কাজ সম্পন্ন করাইয়া লইবার জন্য তাঁহার অত্যধিক অতিব্যস্ত প্রভুত্বের ভাব, যাহা তিনি নিজেও অপছন্দ করেন, তাহার সমূলে উৎসাদন করিয়া নূতনের পত্তন—এ সকল গণতন্ত্রের মন্থরগতিকে দীর্ঘদিন সহ্য করিতে পারে না। তিনি তাঁহার বহিরাবরণ রাখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার কাছে তাহাকে নতি স্বীকার করিতেই হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা হিসাবে থাকিতে পারেন, কিন্তু এই বিপ্লবের যুগে প্রাচীন রোমের ডিক্টেটর বা সর্বময় কর্তৃত্বের প্রয়োজন এবং ইহা কি সম্ভব নহে যে, জহরলালও নিজেকে সিজারের মতই মনে করিয়া সর্বময় কর্তৃত্বের দাবী করিবেন?

বিপদ ঐখানেই

জহরলাল ও ভারতবর্ষের বিপদ কিন্তু ঐখানেই। কারণ, সিজারের পন্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হইবে না। এবং যদিও হিতৈষী ও সুদক্ষ স্বৈরশাসকের অধীনে ভারতের কিছুটা উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার বৃদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং জাতির মুক্তির দিন আরও বিলম্বিত হইয়া পড়িবে।

দুই বৎসর ধরিয়া জহরলাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট আছেন এবং যে ভাবেই হউক তিনি নিজেকে সেখানে এমনি অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, অনেকে তাঁহাকে আবার তৃতীয় বারের মত প্রেসিডেণ্ট করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা জহরলাল ও ভারতের প্রতি অধিকতর অবিচার কিছু হইতে পারে না। তৃতীয়বার যদিও কংগ্রেসের স্বার্থ বলি দিয়া আবার তাঁহাকে নির্বাচিত করা হয়, তাহাতে লোকে তাঁহাকে সেই সিজারের মতই ভাবিবে এবং আমরা জহরলালের মধ্যে তাঁহার ভ্রান্ত ভাবধারার প্রশ্রয় দিয়া তাঁহার আত্ম-অহংকার ও গর্বকেই বাড়াইয়া দিব। তাঁহার এই বিশ্বাস হইবে যে, তিনিই একমাত্র এ ভার বহন করিতে পারেন এবং ভারতের সমস্যা সমাধানের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। আমরা যেন মনে রাখি যে, যদিও এই ভার গ্রহণ করিতে বাহ্যত তিনি অনিচ্ছুক, তবুও যেমন করিয়াই হউক, গত সতর বৎসর যাবৎ তিনি কংগ্রেসের প্রধান পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। তিনি যেন ভাবেন না যে, তাঁহাকে ছাড়া কংগ্রেসের এ কাজ চলিবে না এবং অপরেও যেন সেকথা না ভাবে। ভারতবর্ষ কখনই বার বার তিনবার তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট করিতে পারে না।

অতি প্রশংসা তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে

ব্যক্তিগত কারণও এ যুক্তির মূলে আছে। জহরলাল দুঃসাহসিক ও নির্ভীক কথাবার্তা বলা সত্ত্বেও আজ তিনি পরিশ্রান্ত ও বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। যদি আবার তিনি নির্বাচিত হন, তাহা হইলে ক্রমশ তাঁহার আরও অবনতি ঘটিবে। তিনি বিশ্রাম লইতে পারেন না, কারণ একবার বাঘের পিঠে চড়িলে আর মাটিতে নামা যায় না। সে যাহা হউক আমরা অন্তত এটুকু করিতে পারি যে গুরু-দায়িত্বের চাপে যাহাতে তিনি বিপথে না যান, যাহাতে তাঁহার মানসিক অধঃপতন না ঘটে। ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে ভাল কাজ পাইবার প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা নহে। অতি প্রশংসা ও চাটু-বাক্যের দ্বারা আমরা যেন তাঁহাকে এবং তাঁহার কাজকে নষ্ট না করি। যদি তাঁহার কোনও আত্ম-অহঙ্কার থাকে—তবে তাহার পরিণামই ত আপাতত ভয়াবহ—আমাদিগকে ইহার সংকোচ সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা 'সিজার' চাহি না। সর্বময় প্রভু ও জবরদস্ত নেতার প্রয়োজন ভারতবর্ষের নাই। *

* পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, এই প্রবন্ধের লেখক "চাণক্য" ব্যক্তিটি কে? তিনি কি কংগ্রেস বিরোধী কম্যুনিষ্ট?—সমাজতন্ত্রী?—কোনও ট্রেড ইউনিয়নের বিফলমনোরথ নেতা? কুকুট-চক্ষু বিদ্বেষপরায়ণ ঐতিহাসিক? পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর হুবহু চরিত্রচিত্র ইঁহাদের মধ্যে যে-কেহই হয়ত আঁকিতে পারিতেন। যাহা হউক, এই প্রবন্ধের লেখক তাহাদের মধ্যে কেহই নহে।

** এই প্রবন্ধের লেখক জহরলাল নেহরু স্বয়ং—আত্মজীবনের চিত্র নিবন্ধাকারে তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় "চাণক্য" এই ছদ্মনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

*** যিনি ধ্যানরসিক মরমী তিনি যেমন নিজের ব্যক্তিত্বকে এবং সত্তাকে বিশ্লেষণ করিতে পারেন, তেমনি ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র নেহরু দক্ষ শিল্পীর ন্যায় নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিজের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরম শত্রুও যেভাবে লিখিতে সাহস করিবেন না—তিনি নিজে সেইভাবেই নিজের চরিত্রচিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অমর রহে

মৈত্রেয়ী দেবী

আজ এখনো শোকের শূন্যতা আমাদের মন আচ্ছন্ন করে রয়েছে। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা বিভ্রান্ত বোধ করছি। এ সময়ে স্থিরভাবে চিন্তা করা যায় না, ক্ষতির পরিমাপও করা সম্ভব নয়।

কানে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে বহু মানুষের ইচ্ছার একটি বাণীরূপ —জহরলাল নেহরু অমর রহে। অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন মন্দ্রিত সেই স্বর কি বলতে চাইছে? মৃতদেহ বহন করে চলেছে শবযাত্রা। চিতার আগুনে দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাবে সেই আসন্ন বিলুপ্তির সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের দৃপ্ত ঘোষণা—তুমি অমর!

অমরত্বের দুটি দিক বংশ ও কীর্তি। বংশ শুধু দৈহিক, তার মূল্য শুধু প্রাকৃতিক। কিন্তু কীর্তির অমরতার মানবিক ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিচিত্র—ভবিষ্যৎ মানবের জীবনে তার প্রতিষ্ঠা। যে বিপুল জনতার এই জয়ধ্বনি তার মধ্যে বহু মানুষ আছে যারা যে কারণে তাঁকে অমর বলছে তাঁর সেই আদর্শের প্রতি আস্থাবান নয়। তাঁর কীর্তির যে বিশেষ রূপ তাকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তাদের কণ্ঠেও এই ধ্বনি বিপুল আবেগে কম্পিত হচ্ছে তুমি অমর হও। মহৎ মানুষরা তাঁদের চিন্তায় কর্মে ত্যাগে সাধনায় মানুষের যে অমর্ত্যরূপ আমাদের সামনে উপস্থিত করেন, আমরা সাধারণ মানুষরা অনেক সময়ই তা গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের লোভ ক্ষোভ ঈর্ষা দ্বেষ সুযোগ সুবিধার অন্বেষণ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত লাভ-লোকসানের হিসাবের সঙ্গে সেই ভূয়োদর্শী ক্রান্তদর্শী মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গী মেলাতে পারি না। যারা সাময়িক দৃষ্টিতে মানব-জীবন ও ইতিহাসকে দেখতে চায় তারা তাঁদের অনেক কথাই বুঝতে পারি না সেজন্য জ্ঞানী মনীষী সাধুসন্তকে আমরা পূজা করি, ভক্তি করি কিন্তু তাঁদের বাক্যকে ইহলোকের কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে সাহস করি না। সচরাচর পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে রাষ্ট্র-নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে এত বড় দাবী করেন না, তাঁরা হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দিতে চান ও পারেন। হিটলার বিদ্যুৎ-গতিতে অর্ধেক পৃথিবী জার্মান

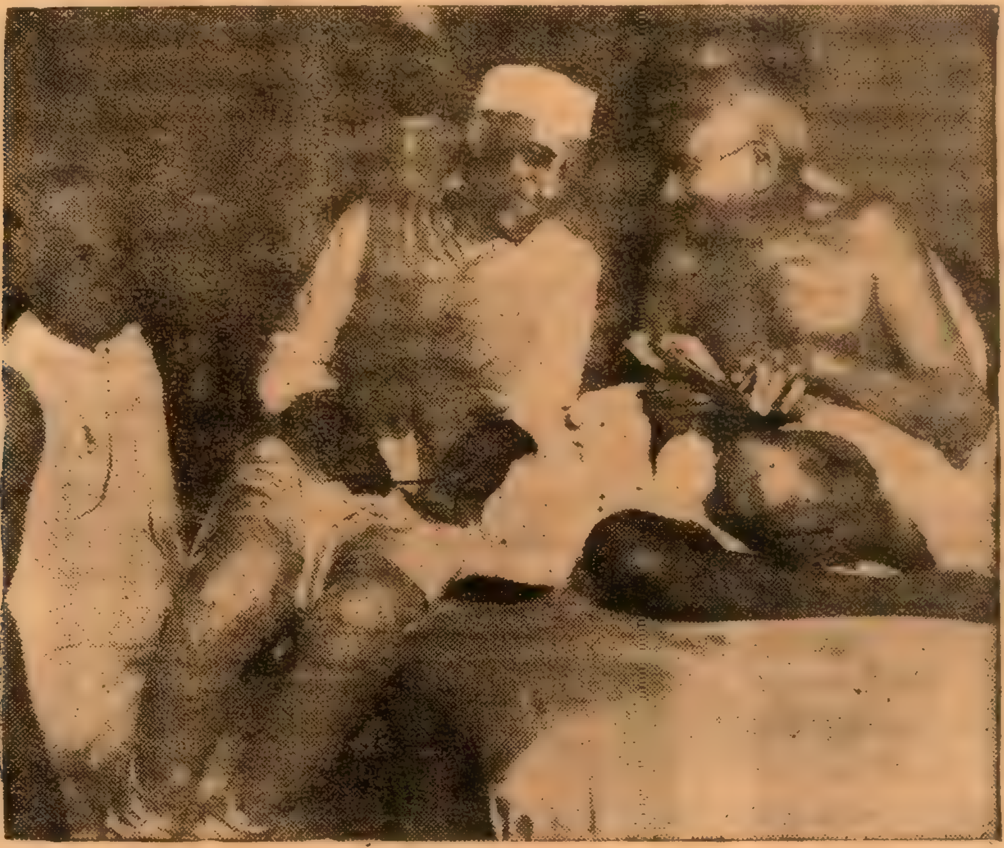

● গান্ধীজী ও নেহরু

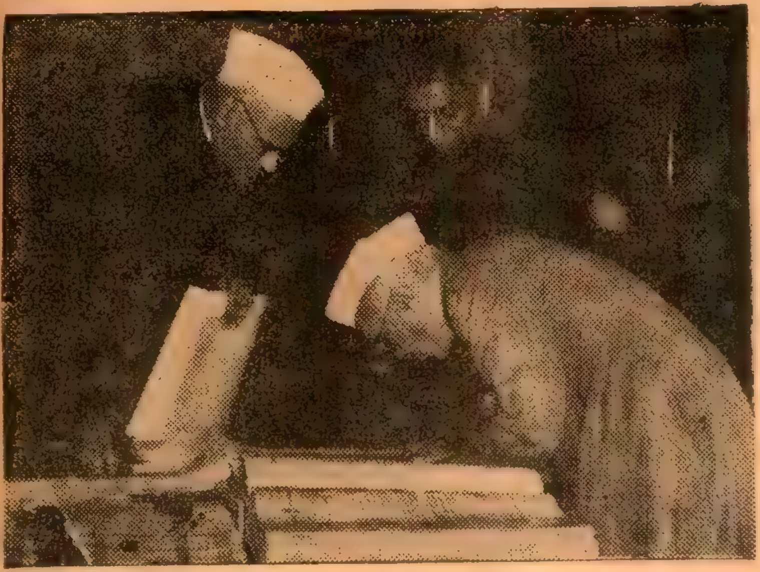

● ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নতুন সংবিধানে স্বাক্ষরদান করছেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু

জাতির পদানত করে দিতে চেয়েছিলেন—রাষ্ট্রনেতারা জনসাধারণকে নানা রকম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন, কখনো বা শত্রুকে উৎসাদন, কখনো বা পরজাতি নিধন, কখনো বা পরস্বাপহরণ—কিন্তু ভারতবর্ষের অদৃষ্টক্রমেই রাজনীতি ক্ষেত্রে এই প্রলোভনের উৎপাত মহাত্মাজী প্রবেশ করতে দেন নি। যে মানব-আদর্শের শুদ্ধতম রূপ তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন আর স্বদেশ চেতনার মধ্যে যে বিশ্ব চেতনা রবীন্দ্রনাথ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ সতের বৎসর ধরে তারই প্রয়োগের জন্য অবিচলিত চেষ্টা করলেন। নানা মতে বিভক্ত জগতে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ যুদ্ধোদ্যত দুই বিবদমান মহাশক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি সহিষ্ণুতার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। যিনি ভিন্ন দেশের প্রতাপান্বিত জাতিদের অনমনীয় বিদ্বেষের মাঝখানে সর্বমানবের সহযোগিতার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নিজের দেশের মানুষের কাছে, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষের কাছে, তাঁর তাই অনেক দাবী ছিল। সহিষ্ণুতার যে পথ, শান্তির যে পথ, সে পথে হাতে হাতে ফললাভের তৃপ্তি নেই। কিন্তু ভারতীয় মানুষের সৌভাগ্য এই যে তাদের সত্য নেতা কখনোই লোভের তাড়নায় বিপথের নির্দেশ দেখান নি, মনুষ্যত্বের যে দুর্গম ক্ষুরধার পথ সেই পথই তাঁদের—এমন কি রাজনীতি ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না, কারণ সত্য এক—তার দ্বিতীয় নেই।

আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি নি গোয়ার জন্য ১৪ বছর অপেক্ষা করার অর্থ কি ছিল, কেন বহু স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে, এ কেনর উত্তর তাঁদের কাছেই আছে যাঁরা অমর। সাময়িক সমাধান তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য নয়। যে অসীম অনন্তবোধে মানুষের পূর্ণতা, সে ক্ষণকালের যোগফল নয়। মানব মহিমার অখণ্ড উপলব্ধি স্বার্থত্যাগের সহিষ্ণুতায়, প্রেমে ও ক্ষমায়, অর্থ-সম্পদ প্রভুত্ব বা জমি এ সবের লাভ-লোকসানের দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। এসব কথা আমরা বার বার শুনেছি, কিন্তু তবু যখন এ কথার সত্যতা আমাদের পথপ্রদর্শক প্রিয় নেতা আমাদের জীবনে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন আমরা বিমুখতা অনুভব করেছি। আমরা বলেছি—বড় বড় কথা রেখে দাও—আমরা আঙুল দেখিয়েছি পশুত্বের দিকে, কদর্যের দিকে, অসুন্দরের দিকে। বলেছি—আমরা হেরে গেলাম, আমাদের ভ্রান্ত নেতা শান্তির বাণী বলছেন, কিন্তু তাতে সব লোকসান হয়ে গেল। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ আজ মৃত্যুর নিষ্কলঙ্ক মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জানে সে শুধু তার মুখের কথা, অন্তরের নয়। মহামানবের জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করে সে স্বীকার করছে নেতার জীবনের যে অংশ মানুষের মহিমাকে পশুত্বের হাত থেকে বীরের মত উদ্ধার করতে চেয়েছিল সেই অমর অংশে তার নিজের প্রতিচ্ছবি সে দেখতে চায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তোমাকে আমরা বার বার নীচে নামাতে চেয়েছি, কিন্তু পারি নি। সেই নিষ্ফলতাই আমাদের গৌরব—তোমার জন্য তুমি প্রিয় নও, তোমার মধ্যে মানবাত্মার যে মহা-প্রকাশ সেই ত আমাদের আত্মীয়—তাই আজ মহাজনতার একত্রীভূত ইচ্ছার উদাত্ত ধ্বনি—নেহরু অমর রহে। তুমি অমর হও—তোমার মধ্যে আমরাও অমর হব।

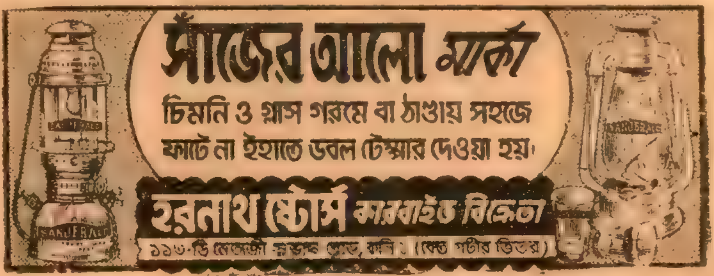

নেহরু অমর রহে

তরুণ মৈত্র

অর্ধ-শতাব্দীর বিশ্বপ্রতীক নেহরু। জীবন ও যৌবনের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। জাতির নায়ক, মহাপথিক তিনি। বিশ্বজনীন সৃষ্টি আর দৃষ্টি নিয়ে গোটা জাতিকে তারুণ্যের অদম্য উৎসাহে নেতৃত্ব দিয়েছেন যিনি, সেই বীর্যবান, শান্তির দূত, পঞ্চশীল-অধিনায়ক, মানবতাবাদী বিশ্বপ্রেমিক জওহরলাল নেহরু আজ আর নাই। সাতাশে মের দ্বিপ্রহরে তাঁর জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়। এ-দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। 'নেহরু নাই', স্তব্ধ বিস্ময়ে অবিশ্বাস্য সংবাদটি উপলব্ধি করতে হয়েছে। বিশ্বাস করতে পারে না কেউ। করতে চায় না। তাই সারা রাত্রি কেটে গেল এমনি স্তব্ধতার মধ্যে। দুর্যোগময় স্তব্ধ রাত্রিশেষে এলো বিষণ্ণ প্রভাত। শোকাচ্ছন্ন চুয়াল্লিশ কোটি ভারতীয়ের সঙ্গে অশ্রু-সজল চক্ষে সমবেদনা জানাতে সমগ্র বিশ্ববাসী যেন কেঁদে উঠলো। বিশ্বজননেতা নেহরুর জন্য দিশিদিশি কাঁদিছে ক্রন্দসী। অন্ধকারের মহাপথিক গোটা বিশ্বকে আলো দেখিয়েছেন,—কিন্তু আর সেই মহা-প্রাণকে দেখতে পাবে না কেউ। এই সান্ত্বনাহীন অনন্ত বেদনায়, সংখ্যাহীন মানুষের কান্নার সাগরে অবিরাম মন্ত্রধ্বনির মধ্যে, সেই বিশেষ মুহূর্তে তিনবার আগ্নেয়াস্ত্রের আর্তনাদে গোটা জন-স্রোত যেন দিল্লীর রাজঘাটে বিষণ্ণ অপরাহ্নে শেষবারের মতো গুমরে কেঁদে ওঠে। শ্রীমান সঞ্জয় এগিয়ে এলো শেষকৃত্যের জন্যে। সুগন্ধি চন্দনকাঠে সজ্জিত চিতায় প্রিয়তম অধিনায়ক, স্বপ্নদ্রষ্টা মহাপুরুষের নরদেহ ভস্মীভূত হয়। ঐতিহাসিক দিল্লী আর পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থ আরও একটা যুগাবসানের সাক্ষী হয়ে রইলো। লক্ষ লক্ষ মানুষের বেদনা-কাতর শোকসমুদ্রে তখন একমাত্র প্রার্থনাধ্বনি : "নেহরু অমর রহে"।

এ-প্রার্থনা কি ব্যর্থ হবে? সত্যি কি নেহরু নেই? 'ওই যারা দিনরাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' তিনি কি তাদের মত সত্য নন? জওহরলাল জাতিকে ভালবেসে-ছিলেন, জাতি তাঁকে ভালবেসেছিল। এটাই হ'ল তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি। ভারতের জনগণের মতো বিশ্ববাসীও শ্রীনেহরুকে বিশ্ব-বরেণ্য নেতা হিসাবে স্বীকার করেছে। শান্তি, যা বিশ্বজনজীবনের একটা বড় আশা ও কামনা, তা যখন রাজনীতির শক্তি ও সন্দেহের দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ ও নেতৃবৃন্দ পরম নেতা বিশ্ব-প্রেমিক নেহরুর সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখে। নেহরুর রাজনৈতিক গুরু মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু মানস-লোকে শ্রীগুরুর আসনটি জুড়ে বসেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। উপনিষদ-উপাসক কবিগুরুর মানবতা-মন্ত্রে দীক্ষিত নেহরু। তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবন, সাহিত্য-জীবন, কর্ম-জীবন, বাস্তব-জীবনের মূলমন্ত্র হ'ল মানবতাবাদ। মানুষের জীবনকে সার্থক করবার আদর্শ জওহরলাল নেহরুর সমস্ত কর্মের গোড়ার কথা। তিনি ভাবনায় শিল্পী, কল্পনায় কবি, কর্মে সৈনিক। বিপ্লবী মনের নেহরুর অন্তরে বাসা বেঁধে ছিল নির্মল প্রেম। তাই পরিকল্পনায়

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে আচার্য শ্রীনেহরুকে চন্দন-তিলকে ভূষিত করে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

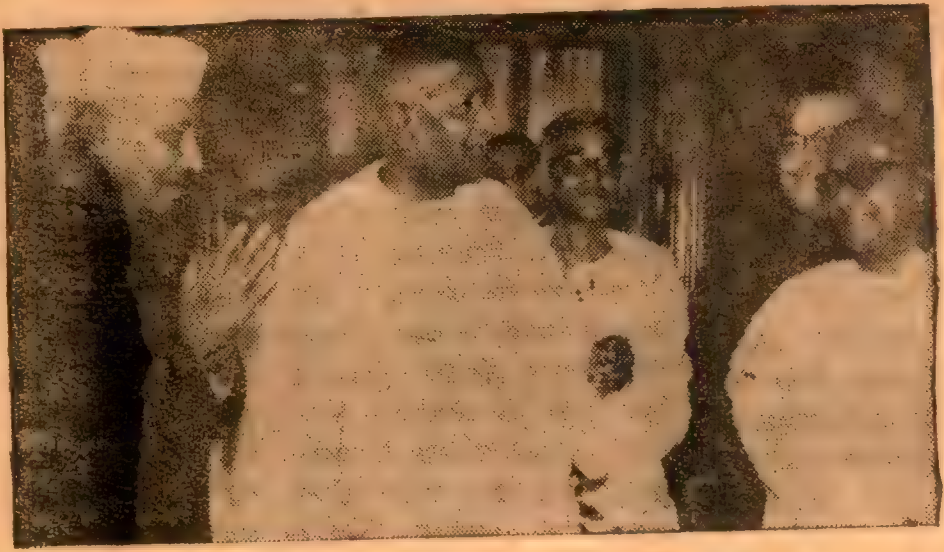

● কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে শ্রীনেহরু ও বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

তিনি অতীতের সঙ্গে পরম্পরাসূত্রের একটি সজীব সংযোগের ফলকেই জীবন বলে মনে করতেন। এ-চিন্তার উৎস রবীন্দ্রনাথ। তাই পাকিস্তান সরকারের বারবার বাড়াবাড়ি নিষ্ঠুরতাকে কঠোরভাবে আঘাত করতে চান নি। উদার সম্প্রীতির সতরঞ্চি বাড়িয়ে দিতে প্রতিবার এগিয়ে এসেছেন। চীনের বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক দুর্ব্যবহারে নেহরু শক্ত হয়েছেন, কিন্তু শত্রুপক্ষকে সুযোগ দিতে আপত্তি করেন নি বৈরীমনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে। দক্ষিণ আফ্রিকার অমানুষিকতায় বিচলিত হয়েছেন মানবতাবাদী নেহরু। তাই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার বদলে হীনতার বিরুদ্ধে এনেছেন প্রতিঘাত। আবার কোরিয়ার রণাঙ্গনে, সাইপ্রাসের অসময়ে, লাওসের অশান্তিতে নেহরু শান্তিসৈনিকের মতো ভারতের নীতি প্রকাশ করেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকরী ব্যবস্থার অংশ গ্রহণ করেছেন। বিশ্বচেতনা-বোধ তাঁর চিন্তায় তীব্র। এ-চেতনার উৎসক্ষেত্র বুঝি শান্তিনিকেতন। সেখানেই তাঁর 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'।

শান্তিনিকেতনে জওহরলাল নেহরু প্রথম যান ১৯১২ সালে। কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করে প্রাণ জুড়ালো। শান্তিনিকেতন তাঁকে সারাজীবন আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সারাজীবন উৎসাহ যুগিয়েছেন। আর একবার ১৯৩৪ সালে স্ত্রী কমলা দেবীকে চিকিৎসা করাতে এনেছেন কলকাতায়। প্রথমে গিয়ে সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন কবিসান্নিধ্যে, শান্তি-নিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তাঁকে নতুন ভাবে কর্মে অনুপ্রাণিত করলো। মানব-দরদী কবির কাছে মন্ত্র গ্রহণ করলেন মানবতার। উদারতার বড় গুণ মানুষের আর কিছু নেই, এই উপলব্ধি লাভ করলেন। স্থির করলেন তাঁর পরম স্নেহের পুত্তলি কন্যা ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে কবিগুরুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কেন না সেখানে 'মৃত্যুকঠোর হস্তের অভাব'। তারপর বারবার আরও এসেছেন শান্তিনিকেতনে ১৯৩৮, ১৯৪২, ১৯৪৫ সালে। প্রায় প্রতি বছরেই সমাবর্তন উৎসবে তিনি শান্তি-নিকেতনে এসেছেন তার ধূলিকণার স্পর্শ নিতে।

এই শান্তিনিকেতনে একদিকে যেমন মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তেমনি সমাজগঠনের প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। কবিগুরুর দৃষ্টিতে যে সুন্দর সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, তারই সংগঠক হয়ে বুঝি শ্রীনেহরু ১৯৩৫ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ঘোষণা করলেন সমাজতন্ত্রের পথ। আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন প্রবীণদল। সম্প্রতি যেমন বিশ্বের কোন কোন কোণ থেকে অভিযোগ শোনা গিয়েছিল, আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল ভারতকে নেহরু কম্যুনিজমের পথে ঠেলে দিচ্ছে বলে। তেমনি সেদিনও কংগ্রেসের ভেতরে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন---নেহরু বুঝি কংগ্রেসকে কম্যুনিজম-এর পথে নিয়ে যেতে চান। সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় সর্দার প্যাটেলের মতো অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে ভাবশিল্পী নেহরুর চোখে দেশগঠনের যে সমাজতান্ত্রিক পথ ধরা পড়েছিল তা পরবর্তীকালে শতদল পদ্মের মতো ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়েছে সমাজসৈনিকের জীবন-অধ্যায়ে। ফৈজপুর কংগ্রেসে রাজ-নৈতিক কর্মসূচীর যে স্রোতধারার পরিবর্তন হয়, তাতে গণসংযোগের

প্রত্যক্ষ পরিচয় দেখা দেয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, গ্রামকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনই হ'ল ভারতের সাধনা। এই দুটি মহৎ প্রাণের প্রতিধ্বনি করলেন নেহরু। ফৈজপুরে ঘোষণা করলেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমাজতন্ত্রের দিকেই এগোতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের জন্য এক-জাতি একপ্রাণ একতার মধ্যে সকল শক্তি সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। আরও পরিষ্কার হ'ল তাঁর এই সমাজতন্ত্র, সংহতশক্তি আর বিশ্বমৈত্রীর বাস্তব অর্থ। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে পরিকল্পনার গুরুদায়িত্ব নিলেন নবীনভারত গঠনে তাতে রক্ষণশীল প্রবীণেরা দেখলেন আগামী দিনের নব্য নাগরিকেরা জানলেন, সমগ্র দেশের দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা বুঝলেন। গোটা দুনিয়া উপলব্ধি করতে পারলো জওহরলাল নেহরু কম্যুনিষ্ট না হয়েও বামপন্থী অভিভাবক। তাঁর এই সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে যার মতে মিল হয় নি তাকে তিনি জোর ক'রে এ নীতি বহন করবার জন্য বাড়াবাড়ি করেন নি বা উপেক্ষা করেন নি। লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুরের সেই নেহরু-নীতি সমাজতন্ত্র দিল্লী, হায়দ্রাবাদ ও কল্যাণী কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে ধীরে ধীরে রূপ নিতে নিতে, আবাদি থেকে ভুবনেশ্বরে পরিণতি লাভ করলো গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে। এ সমাজতন্ত্র নেহরু-স্বপ্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সন্ধানের রূপ। দেশকে যেমন-ভাবে তিনি গড়তে চেয়েছেন, তা তাঁর কবিজীবনের, ভাবজীবনের রূপ-কল্পনা। সেই রূপকল্পনাকে সার্থক করতে হলে খাঁটি জাতীয়তাবোধ যেমন প্রয়োজন, তেমনি সেই মহাপুরুষ মানবতাবাদী নেহরুর আন্তর্জাতিক প্রীতি ও শান্তির নীতিকেও গ্রহণ করতে হবে একই সঙ্গে। এই নেহরু-নীতিতে আজ চুয়াল্লিশ কোটি ভারতবাসী নতুন দৃষ্টিলাভ ক'রেছে। সমগ্র ভারতকে নবীন প্রাণোল্লাসে তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কিন্তু কে এই নীতির বাহক হয়ে প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবেন? গৌতম বুদ্ধের পর এসেছেন মহারাজ অশোক। কিন্তু অশোককে তো গৌতম বুদ্ধ নির্বাচন করে যান নি।

ভারতে তবুও শাশ্বতকাল থেকে এই একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নেহরুকেও প্রশ্ন করা হয়েছে: কে তোমার উত্তরাধিকারী? তিনি গণতন্ত্রের সাধক। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক। তাই তিনি নির্বাচনের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন উত্তরসাধকের উপর। এমনি এক দুর্যোগময় দিনে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুশয্যায় শিষ্য আনন্দ গৌতমকে জিগ্যেস করেছিলেন—কে তোমার উত্তরাধিকারী হবে? গৌতম বলেছিলেন: আমার নীতি।

আজও একই উত্তর এই উত্তরাধিকারী প্রশ্নের সমাধান করবে। ভারতের ইতিহাসে পুনরাবৃত্তির আশ্চর্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আসন্ন। ভরসা আর আশা নিয়ে আমরা অমৃতের অধিকারী নেহরুর যে আদর্শ মৃত্যুহীন, যার মধ্যে ভারতের চিরন্তন আদর্শের মহাসত্য, যার মধ্যে নবভারতের বামপন্থী অভিভাবকের নতুন সমাজতন্ত্র উজ্জ্বল, সেই নীতি-উত্তরাধিকারীর দিকে চেয়ে আছি। তবেই লক্ষ কণ্ঠের প্রার্থনা—'নেহরু অমর রহে' সার্থক হবে।

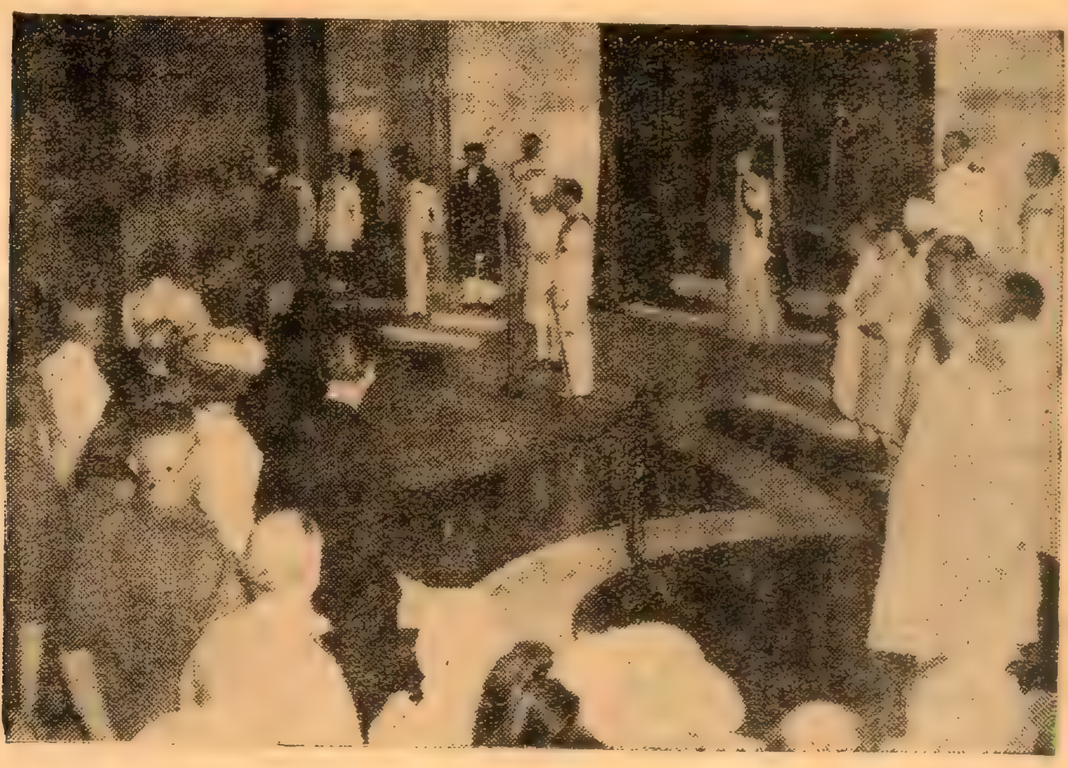

● ১৯৪৫ সালের স্মরণীয় ১৫ই আগষ্ট; লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীরূপে শ্রীনেহরুকে শপথ গ্রহণ করাচ্ছেন

মৃত্যু, তুমি হেরে গেছ

রজত সেন

যদি কখনো অসীম আকাশের নীচে দাঁড়ানো যায়, অথবা যদি হাজির হওয়া যায় সাগরের সামনে—অনন্ত দিগন্ত বা উত্তাল তরঙ্গমালার কাছে নিজেকে কত ছোট মনে হয়। নিজের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি আমরা।

আকাশ নয় বা সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি নয়, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন একেকজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের মধ্যে দিগন্ত সমাহিত হয়—স্তব্ধ হয় সমুদ্রের গর্জন। যাঁরা সাধারণ হয়েও অসাধারণ, মরজগতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। মৃত্যু যাঁদের গ্রাস করতে পারে না, তাঁদের অন্তরে আত্মস্থ হয় মৃত্যু।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদিন শুনিয়েছিলেন, 'যাহার দ্বারা অমৃতত্ব মিলিবে না, তাহা লইয়া কি করিব?' সেই অমৃত সন্ধানের পথে যুগ যুগ ধরে যাত্রা করেছে কত মানুষ। কত শত অস্ত্রের ঝনঝনা মিলিয়ে গেছে শূন্যে, কত কীর্তিস্তম্ভ বিলীন হয়ে গেছে ধুলোয়! কিন্তু তারই মধ্যে মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে আপন ভাস্বে আজও উজ্জ্বল কয়েকটি চরিত্র।

বুঝি তাই অমরত্বের দীপশিখা নিয়ে এই মরজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট। এসেছিলেন সম্রাট অশোক। আত্মচিন্তা নয়, ব্যক্তিগত সুখ চরিতার্থ করবার স্পৃহাও নয়, নিজের জীবন তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন বিশ্বকল্যাণ ব্রতে, মরদেহধারী মানুষকে অমরত্বের সন্ধান তাঁরা দিয়েছিলেন।

গত বৃহস্পতিবারের গোধূলিলগ্ন চিতার আলোয় রেঙে উঠেছিল, ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়েছিল বাতাস। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমরা চিতার আগুনে বিসর্জন দিয়ে এলাম। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সেদিন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখলো ভারতের পশ্চিম দিগন্তে এক বিরাট সূর্যের অগস্ত্যযাত্রা।

না, আজ কোন কথা নয়, কোন আর্তনাদ নয়, আজ শুধু চুপি চুপি একা বসে থাকা, আজ এই অনন্ত অবকাশে আমরা মুহূর্তকালের জন্য আত্মচিন্তা থেকে বিচ্যুত হবো, সমাহিত হবো সেই অমৃতপুত্রের চিন্তায় যিনি আমাদের অমৃতের সন্ধান দিয়ে গেলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। দিল্লীর রাজঘাটে চিতার আগুন নিভে গেছে, সেদিনকার রক্তসন্ধ্যা আজ আবার আপন নীলিমায় উজ্জ্বল, কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তরে সেই অনির্বাণ শিখা জ্বলবে অনন্তকাল ধরে। কেন না মৃত্যু শুধু গ্রাস করে দেহকে আত্মা অমর। আমরা ভারতবাসী, আমরা মানি সেই কথা।

সেই সৌম্য শান্ত মূর্তি, ভারতের চুয়াল্লিশ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের ছবি যাঁর অন্তরে ধ্বনিত, দোলায়িত হতো, আমাদের সেই প্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর আমাদের মধ্যে নেই—একথা যেন এই মুহূর্তে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। বিশ্বাসঘাতক মৃহূর্ত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে পণ্ডিতজীকে, শুধু রেখে গেছে এক নির্বাক হতাশা। রক্তগোলাপ আজ কক্ষচ্যুত, ভারতবাসী আজ বৃন্তচ্যুত। দিল্লীর সেই চেনা রাজপথের দুধারের সারি সারি বাড়ির বাতায়ন আজ উদ্‌গ্রীব নয়নে চেয়ে থাকবে না, অজানা শহীদের স্মৃতিস্তম্ভের পাশ দিয়ে নেহরুজী হেঁটে যাবেন না আর, রক্তগোলাপ হাতে হীরালাল চেয়ে থাকবে শূন্যে আর আমাদের জন্যে রইল শুধু একটি অনন্ত দীর্ঘশ্বাস!

'টু নো নেহরু, ইজ টু নো ইণ্ডিয়া' একথা যে কতখানি সত্য আজ তা ভালভাবে উপলব্ধি হচ্ছে। প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে কখন যে চুপিসারে তিনি হৃদয় দখল করে বসেছিলেন আমরা তা জানতেই পারি নি। আজ তাই নেহরুর স্মৃতি রোমন্থন নয়, এ যেন নিজের স্মৃতি নিজেই রোমন্থন করা—ভারতবাসীর আত্মচিন্তা। প্রতিটি মানুষের চিন্তাই যাঁর চিন্তা মানুষের আত্মশুদ্ধির চিন্তা, শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে সমন্বয় সাধন করবার বাসনাই যাঁর একমাত্র স্বপ্ন, তার থেকে নিজেকে বিচ্যুত করবো কেমন করে? হিটলার, মুসোলিনী, স্তালিন, নেপোলিয়নের যে আঘাত—বিশ্বচেতনার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, আমরা সে পথ পেরিয়ে এসিছি বহুকাল। মানুষের

● শেষ যাত্রার শেষ প্রণাম

● স্বর্গীয় জওহরলাল নেহরুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আর্ল মাউণ্টব্যাটেন প্রধানমন্ত্রী-ভবনে এসেছেন। তাঁর বাঁ-দিকে রয়েছেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

আত্মচিন্তাকে বিশ্বচিন্তায় প্রসারিত করবার জন্য, প্রকৃত মঙ্গলের পথ দেখাবার জন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন পৃথিবীর বুকে। এই শক্‌-থেরাপি কিন্তু আজও পরিপূর্ণতার সন্ধান দিতে পারে নি। অযথাই রক্তে রেঙেছে বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাঙ্গণ, বিফলে গেছে অসংখ্য অসহায় মানুষের প্রাণ। শ', টলষ্টয়, শেক্সপীয়র, আইনষ্টাইন মানুষের চিন্তাধারাকে আরও সূক্ষ্ম পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, মানুষের স্থূল চিন্তাধারাকে পরিত্যাগ করতে সাহায্য করেছেন তাঁরা। ফলে যুদ্ধ থেমেছে বটে, কিন্তু সমস্যা নিয়েছে জটিল পথ।

এই জটিল সমস্যাকে সমাধান করবার চেষ্টাই যুগ যুগ ধরে মনীষিগণ শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞানের মাধ্যমে করে এসেছেন। বিভিন্ন দর্শন ও তত্ত্বের আলোকে মানুষকে তাঁরা পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ইতিহাসে এমন নজির মিলবে বহু।

আজ তাই প্রশ্ন জাগে, মানুষ পরিপূর্ণতার সন্ধান পেল কি? সংঘাতের পথে সমস্যার সমাধান হয়েছে কি, বা সমন্বয়ের মাধ্যমে? বিশ্বচেতনার তটে রাজনীতির ঢেউ সেই একই প্রশ্ন বারবার করেছে। আমেরিকা কিম্বা রাশিয়া সেই শাশ্বত সত্যের সন্ধান পেয়েছে কি? এ প্রশ্ন দুরূহ, উত্তর আপেক্ষিক। আসলে জীবন-যন্ত্রণার রূপ কালে কালে পরিবর্তিত হয়, নতুন রূপ গ্রহণ করে সমস্যা। আর মানুষের এই শাশ্বত যন্ত্রণার প্রতি ইংগিত করেছিলেন অতীতকালে আমাদের মনীষিগণ। আজকের দিনে সেই চিন্তাধারাকে আমি স্মরণ করছি।

ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সংস্কার থেকে মানুষ আজও পরিপূর্ণ মুক্ত হয় নি। বর্ণ-বৈষম্য আজও তিরোহিত হয় নি পৃথিবীর বুক থেকে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান করেছে বটে, কিন্তু মানুষ আজও বিশ্বচেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার কথা ভেবেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীমন দিয়ে। আর সবশেষে ভাবলেন আমাদের জওহরলাল নেহরু।

রাজনীতিবিদ্‌ হিসেবে কিংবা সাহিত্যিক হিসেবে জওহরলাল নেহরুর স্থান কোথায়, সে প্রশ্নের অবতারণা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজন বিশ্ব-সমস্যা সমাধান-চেষ্টায় মনীষিগণের দান।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, জওহরলাল শুধু রাজনীতিবিদ হিসেবেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তাঁর মনে বিভিন্ন চেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। কোনও সত্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাকে বিভিন্ন চেতনার আলোকের সামনে উপস্থিত করাতে হয়। নেহরু ঠিক তাই করেছিলেন। জীবনস্রোতে বিপ্লব ও শান্তির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কেন না স্থিতি ও ধ্বংসের মধ্যেই সত্য নিহিত থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই বিভিন্ন চেতনার পথ ধরে বহু মনীষী এসেছেন, ব্যর্থও হয়েছেন। নেহরু তা চান নি। তিনি বুঝেছিলেন মানব-জীবনের শাশ্বত সত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বিভিন্ন তত্ত্বের আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। নেহরুর এই জীবনচেতনার জন্যই প্রতিটি মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে চিরকাল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে নেহরু ভারতীয় গণতন্ত্রের এক বিরাট শক্তিস্বরূপ। মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছিলেন বলেই ধনতান্ত্রিক সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি যুব আন্দোলনকে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে, উভয়কেই সমর্থন করেছিল। প্রকৃত শান্তির সন্ধানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি এবং সেই শান্তির অমৃতপাত্র তিনি দেখেছিলেন অমৃতলোকে নয়—মানুষের অন্তরের মধ্যেই। পৃথিবীর একমাত্র শান্তির দূত জওহরলাল নেহরু।

সেই নেহরু আজ আমাদের মাঝে নেই। আমাদের ছোট-খাট বিচিত্র জীবনের সুর যাঁর হৃদয়বীণায় ধ্বনিত হয়ে উঠতো, মানুষের মঙ্গলের স্বপ্ন যাঁর দুচোখে ভরে থাকতো, সেই নেহরুর ভস্মাবশেষ আজ যমুনার স্রোতে লীন। কিন্তু মানবাত্মাবাদী, বিশ্বপ্রেমিক বিপ্লবী নেহরুকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, জীবনের প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে তাঁর মুখচ্ছবি আমাদের বুকে এনে দেবে সাহস। সেই স্বপ্নচারী মানুষের স্বপ্ন আমরা প্রতিটি ভারতবাসী সফল করে তুলবো। যে স্বপ্নের আলোয় তিনি চলে গেলেন যমুনার তীর দিয়ে, সেই স্বপ্ন আমরা দেখি, দেখে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। আর সেই স্বপ্নের মধ্যেই আমাদের প্রিয় নেতা নেহরু মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু, তুমি হেরে গেছ!

যাঁকে আমরা এত দেখেছি, আমাদের মধ্যেই যিনি ছিলেন, আমাদের সুখ-দুঃখের আলোছায়ায় যাঁর মুখ ভেসে উঠতো অবিরত, আমাদের দুঃখই দুঃখ ছিল, আমাদের আনন্দই যাঁর আনন্দ—তিনি আজ কোথায়? হে মৃত্যু, তাঁকে নিয়ে তোমার কি লাভ হ'ল?

● 'নেহরু অমর রহে'—জনতার গগনভেদী ধ্বনির মধ্যে দৌহিত্র সঞ্জয় রাজঘাটে দাদুর চিতায় অগ্নিসংযোগ করছে।

স্মরণীয় উদ্ধৃতি

স্বাধীনতার সূচনা থেকেই যে দুটি মূল নীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি তা হচ্ছে জাতীয় ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্ল্যানিং এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা। আমাদের রাষ্ট্রের এই মূল নীতি কোন খেয়াল-খুশি বা আবেগবশে নির্ধারিত হয় নি, এই নীতির ভিত্তি হচ্ছে আমাদের অতীত ইতিহাস ও চিন্তাধারা এবং জাতির মৌল স্বার্থ। এখন ভারতবর্ষের সব চেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করা। এর জন্য একদিকে যেমন চাই সমাজকাঠামোতে দ্রুততম সাংগঠনিক পরিবর্তন, অন্যদিকে তেমনি এই পরিবর্তনের পশ্চাতে বিপুলতম গণ সমর্থন ও জনতার অংশ গ্রহণ। ভারতবর্ষের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি; এবং ভোটাধিকারীর সংখ্যা ২০ কোটি, পৃথিবীর গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জনসংখ্যার আয়তনে ভারতবর্ষই বৃহত্তম। গণতন্ত্রের নীতি ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই অনেক আধুনিকীকরণের কাজে হাত দিয়েছে।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা আমাদের আন্তর্জাতিক নীতির একাংশ মাত্র। শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, উপনিবেশবাদের অবসান, বর্ণবৈষম্যের বিলোপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এগুলিও আমাদের আন্তর্জাতিক নীতির অঙ্গ। কোন একটি বিশেষ সামরিক জোটের গাঁটছড়ায় বাঁধা না থেকে সব দেশের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করাই আমাদের আচরিত নীতি। এই নীতির পিছনে যে বিশ্বাস ক্রিয়াশীল, তা হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বত্র ভালোমন্দ দুয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে, এবং ফলে পৃথিবীর জাতিগুলিকে সাদা-কালোয় ভাগ করে সোজাসুজি নিন্দা বা প্রশংসার ভাগী করা চলে না। একটি সামরিক জোটের বদলে আমরা যদি অন্য একটি জোটে যোগ দিই তাতে প্রধান প্রধান

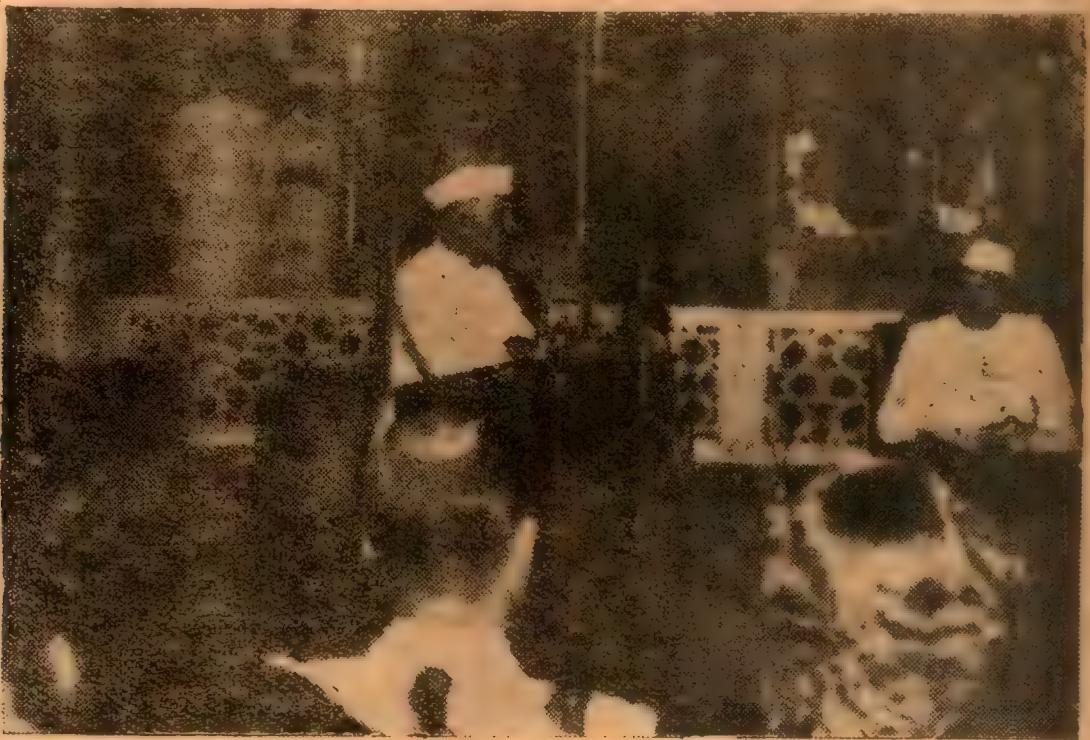

ভাষণরত শ্রীনেহরু

...ট্রি জোটের মধ্যে সঙঘর্ষের সম্ভাবনা ...ভবে বই কমবে না। গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা ...াধীনতারই অংশ, স্থান কাল বিবেচনা ...রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ...শেষ কর্মনীতি নির্ধারণ করবার ...াধীনতা।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ...ান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করে ...ামরা আমাদের প্রতিবেশী দেশ ...ীনে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং ১৯৪৯ ...ালে পিপলস রিপাবলিক প্রতিষ্ঠাকে ...াগত জানিয়েছিলাম; চীন সরকারের ...ঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন ...রতে চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও চীন সরকার আমাদের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করে; ফলে সেখানে সম্পূর্ণ নূতন এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। পিকিংয়ের শত সুকৌশলী প্রচার সত্ত্বেও এ-সত্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, চীনই জঘন্য আক্রমণকারী এবং চীনের এই বারবার আক্রমণ বহু দিন ধরে সুপরিকল্পিত। একথা এখন বিশ্ববাসী উপলব্ধি করছে যে, আক্রমণ-নিরোধ এবং রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের দৃঢ়তা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরপেক্ষতার পক্ষে অপরিহার্য। অদূর অতীতে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, এখন থেকে স্পষ্টই আমাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যও বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং চেষ্টা হবে দেশের মধ্যেই যতদূর সম্ভব সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাচ্ছিল কিন্তু ভারতের উপর চীনা আক্রমণের পর এই সম্পর্কে দ্রুত অবনতি ঘটল। পাকিস্তান রাষ্ট্রনায়কেরা ভারত-চীন সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে ভারতের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য নানাবিধ চাপ দিতে লাগলেন।

ভারতের উপর চীনা আগ্রাসনের মূলে যে কেবল চীনের পক্ষ থেকে সীমা নির্ধারণের তাগিদই কাজ করছে তা বিশ্বাস করা শক্ত। চীন যে কেন বহু বৎসর যাবৎ তার ভৌগোলিক দাবী সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত বা গোপন রেখে পরে দু হাজার মাইল বিস্তৃত দীর্ঘ সীমারেখা বরাবর সুপরিকল্পিত, সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ করে কেনই বা এই সামরিক পটভূমিকায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়া বোঝাপড়ার অন্য কোন পথই গ্রহণ করতে রাজি নয় তা একান্তই দুর্বোধ্য। মনে হয় চীনের রণনীতি ও প্রচার ধারা তার বিশ্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। চীনের ধারণা অনুযায়ী বিশ্বের জাতিপুঞ্জ প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়া এই দুই বিবদমান অতিবিরোধী গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ বিভক্ত হতে বাধ্য এবং এর মধ্যে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার কোন ঠাঁই থাকতে পারে না। চীনের মতে সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্যবাদী ছাড়া কোন জাতি বা দেশ নেই। এবং সাম্যবাদের একমাত্র লক্ষ্য হল এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধকে আরো তীব্র করা এবং গোষ্ঠীনিরপেক্ষতাকে অসম্ভব করে তোলা।

ভারতবর্ষ যেহেতু গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দেশ অতএব তাকে আঘাত করে, আক্রমণ করে গোষ্ঠীভুক্ত হতে বাধ্য করে চীন প্রমাণ করতে চায় যে, বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার নীতি ভ্রান্ত। অতএব দেখা যাচ্ছে চীনের এই আক্রমণ শুধু আমাদের বৈদেশিক নীতির উপর, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা-নীতির উপরই আক্রমণ নয়, আমাদের আচরিত, পরিকল্পিত, ঈপ্সিত নীতিবোধ ও জীবনধারার উপরই আক্রমণ! প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগ থেকে যে শান্তি, ন্যায়, সহনশীলতা, বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আপোষের নীতিতে আমরা দীক্ষিত হয়েছি এবং যে নীতি অনুযায়ী শত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করেছি, সমর শক্তি ও হিংসায় বিশ্বাসী

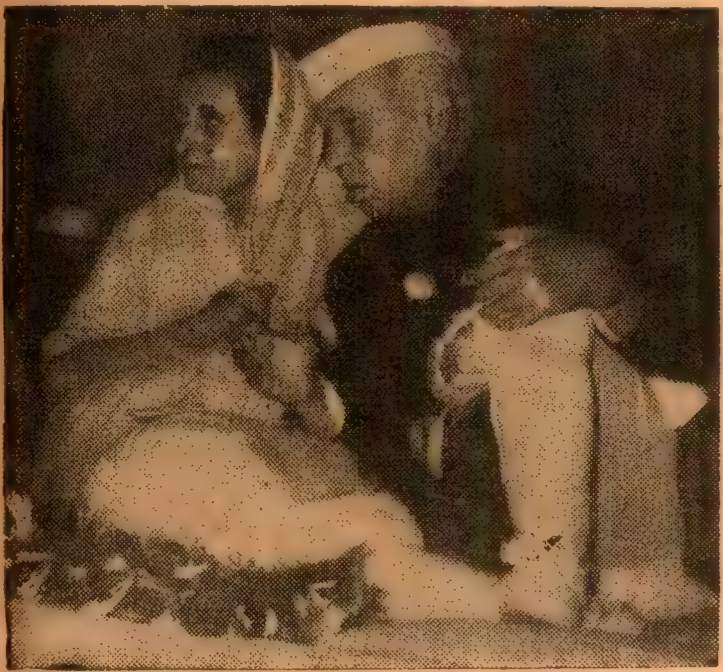

● ভুবনেশ্বরে অসুস্থ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু

● ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এডগার ফরে, মাদাম ফরে ও নেহরু

চীনের ক্ষমতাসীন নেতারা তাকেই পর্যুদস্ত করতে প্রয়াসী। হিমালয়ের উত্তর থেকে আমাদের উপর যে আক্রমণ, এসেছে আমরা অবশ্যই তার মোকাবিলা করব। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে, বন্ধুত্বের মুখোশে এই বিশ্বাসহননে আমাদের মনে ক্ষোভ এবং ঘৃণা উদ্দীপ্ত হয়েছে। এর ফলে সাময়িকভাবে আমাদের মধ্যে ছোটখাটো বিভেদ সব লুপ্ত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে নানা দল আছে, যাদের সংক্ষেপে দক্ষিণ ও বাম এই নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু দক্ষিণ ও বামের পার্থক্য অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে ততটা স্পষ্ট বা তীব্র নয়। সকল মতবাদের ঊর্ধ্বে কোটি কোটি জনসাধারণের আজ সব চেয়ে জরুরী হচ্ছে উন্নততর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার দাবী এবং এর সঙ্গে চীনা আক্রমণের পর আরো একটি দাবী সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে, সেটি হল সর্বশক্তি দিয়ে জাতীয় সংহতি, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার। দক্ষিণ, বাম সকল দল-উপদলকেই জনসাধারণের এই দাবী স্বীকার করে নিজ নিজ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি চীনের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র বিবাদ সত্ত্বেও ভারতের প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পূর্বের মতোই বজায় রেখে চলেছে। ভারতের বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজে তাদের সাহায্য অটুট থাকায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ এবং জোটনিরপেক্ষ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শক্তিসাম্য রক্ষায় সত্যই একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া এখনও মানবসমাজের উপর ব্যাপ্ত। এই প্রেতকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত মানুষের স্বস্তি নেই। ভারতবর্ষের শান্তি-নীতি জয়লাভ করলে তা মানবসভ্যতার ভবিষ্যতেরই জয় বলে পরিগণিত হবে।

(১৯৬৩ সালে এপ্রিল মাসে বিদেশের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় নেহরুজীর এই রচনাটি প্রকাশিত হয়)

* *

"বহু বহু বৎসর আগে ভবিতব্যের সঙ্গে আমাদের যে বোঝাপড়া হয়েছিল আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন এসেছে। আমরা হয়ত আমাদের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারব না, কিন্তু অনেকখানি পরিমাণে আমরা আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। এই মধ্যরাত্রির মুহূর্তে যখন পৃথিবী ঘুমাচ্ছে, ভারতবর্ষ তখন নবজীবন ও স্বাধীনতার নূতন প্রভাতে জেগে উঠবে। কখনও কখনও এমন সময় আসে—ইতিহাসে অবশ্য এমন সময় খুব কমই

ক্রিমান

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৬,৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৩৮০

চাচা নেহরু তাঁর জন্মদিনে পাওয়া একটি মিষ্টির বাক্স উপহার দিচ্ছেন ছোট্ট মেয়ে নীপাকে।

আগে—যখন আমরা পুরাতন হতে নূতন কালে জেগে উঠি, যখন একটা যুগের অবসান ঘটে এবং যখন একটা জাতির দীর্ঘ কালের অবদমিত আত্মা আপনাকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। আজ আমরা যে অনুষ্ঠান করছি, তা একটা পদক্ষেপ মাত্র, বৃহত্তর বিষয় ও কীর্তির পথে নূতন সুযোগের উদ্বোধন মাত্র।"

* * *

"আজ সেই দিন এসেছে—বিধি-নির্দিষ্ট সেই দিন। দীর্ঘ দিনের সুপ্তি ও সংগ্রামের পর ভারত আবার উঠে দাঁড়িয়েছে—জাগ্রত, তেজোদীপ্ত, মুক্ত, স্বাধীন ভারত। অতীত এখন অপেক্ষমাণ। এই ইতিহাস রচিত হবে। আমাদের বহু বিঘোষিত শপথ পূর্ণ করতে এখনো অনেক কাজ বাকি। সন্ধিক্ষণ অতীতে পর্যবসিত হ'ল, আমাদের জন্য নতুন ইতিহাস অপেক্ষমাণ। এই ইতিহাস রচিত হবে আমাদের জীবন ও কর্মের সমাহারে। ভাবীকালের ঐতিহাসিক তা লিপিবদ্ধ করবেন।

"ভারত, সমগ্র এশিয়া ও বিশ্বের পক্ষে এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূবের আকাশে নতুন একটি নক্ষত্রের উদয় হল—স্বাধীনতার নক্ষত্র। নতুন আশার সঞ্চার হল, দীর্ঘকালের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল; এ নক্ষত্র কখনো যেন অস্ত না যায়, এই আশা কোন চক্রান্তে যেন ব্যর্থ না হয়।

"যদিও মেঘ আমাদের চারিদিকে, দেশবাসীর অনেকেই আজ বেদনাহত, কঠিন সমস্যায় আমরা ঘেরাও, তবু এই স্বাধীনতাকে নিয়ে আমরা আনন্দ করব। স্বাধীনতা নিয়ে আসে দায়িত্ববোধ, দায়ভার। স্বাধীন, সুশৃঙ্খল জাতির মত আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে।

"আজ সর্বাগ্রে আমাদের চিন্তা ধাবিত হচ্ছে তাঁর প্রতি, যিনি এই স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক। ভারতের প্রাচীন আত্মাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে যিনি স্বাধীনতার মশাল তুলে ধরে আমাদের চারিদিকের তমসাকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। কখনো কখনো আমরা তাঁর যোগ্য অনুগামী হতে পারি নি, বহুবার তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছি, কিন্তু আত্মবিশ্বাসে আত্মিক শক্তিতে সাহসে ও বিনয়ে গরিমাময় এই প্রবলপ্রাণ ভারত সন্তানের আত্মিক প্রভাব ও বাণী শুধু আমাদেরই নয়, পরবর্তী পুরুষদের হৃদয়েও খোদিত থাকবে। যতই গর্জে আসুক ঝড়ের রাত্রি, স্বাধীনতার এই মশালকে আমরা নিভে যেতে দেব না।

"এর পরই স্মরণ করি স্বাধীনতা সংগ্রামের অজ্ঞাত সেবক ও সৈনিকদের। প্রশংসা বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই তাঁরা ভারতের সেবা করেছেন, মৃত্যুকেও বরণ করেছেন।

"স্মরণ করি আমাদের সেই সব ভাইবোনেদের, যাঁরা রাজনৈতিক সীমানার ওধারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই স্বাধীনতা উৎসবে অংশ নিতে পারলেন না। তাঁরা আমাদেরই আপন জন, ভবিষ্যতে তাই-ই থাকবেন। যাই ঘটুক না কেন তাঁদের সুখ-দুঃখ সমানভাবে আমরা ভাগ করে নেব।

বর্তমান সংখ্যার রচনাবলী লোকান্তরিত প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে নিবেদিত হওয়ায় অধিকাংশ নিয়মিত রচনার প্রকাশ স্থগিত রাখা হোল। পরবর্তী সংখ্যা থেকে উক্ত রচনাসমূহ যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

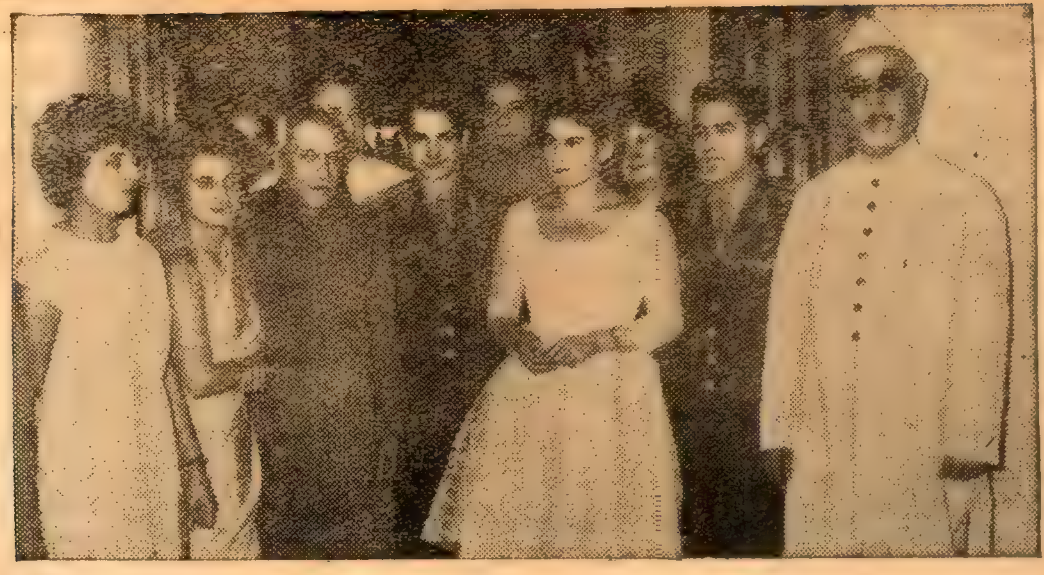

● সোভিয়েট মহাকাশচারীদের সঙ্গে নেহরু

"ভবিষ্যৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কোন্ পথে আমরা যাব, কী হবে আমাদের কাজ? আমরা ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে মুক্ত করে তার সামনে সুযোগ এনে দেব। দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে নির্মূল করব। সমৃদ্ধ প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করব। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করব, যাতে ন্যায় এবং নরনারীর পূর্ণ প্রাণের দাবী রক্ষিত হয়।

(১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের অবিসম্বাদী নেতা জওহরলাল নেহরু এই অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দেন)

* * *

বর্তমান মুহূর্তের সমস্যাই আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় এবং আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এসবের কোন গুরুত্বই নেই এবং এই সমস্ত বাহ্য ঘটনার নিচে হয়তো অনেক বেশি প্রাণবন্ত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। সুতরাং আজকের সমস্যাগুলি বিস্মৃত হয়ে যদি আমরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিপটে ভারত রূপায়িত হবে শক্তিশালী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে, স্বাধীন ইউনিটগুলির স্বেচ্ছা-সংহত একটি ফেডারেশনরূপে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ সেই ভারতবর্ষ সমস্ত বিশ্বজনীন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে।

'পৃথিবীর মধ্যে সামান্য যে কয়েকটি দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম, ভারতবর্ষ তাদের অন্যতম। এই রকম মাত্র আর দুটি দেশই আছে —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। গ্রেট বৃটেনকে এই দলভুক্ত করা যায় যদি তার নিজের সম্পদসামগ্রীর সঙ্গে তার সাম্রাজ্যের সম্পদসামগ্রী সামগ্রিকভাবে ধরা যায়, কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত, বিস্তীর্ণ এবং অসন্তোষপূর্ণ সাম্রাজ্যই আবার তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একমাত্র চীন এবং ভারতই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশের সমকক্ষ হতে পারে। চীন এবং ভারত উভয়েই একটা সুসংবদ্ধ ভৌগোলিক এলাকার অধিকারী। প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি এবং অধিবাসীদের কলাকুশলতা ও কার্যক্ষমতার প্রাচুর্যে তারা উচ্ছলিত। এক দিক দিয়ে ভারতের শিল্পক্ষমতা এবং তার বিকাশের সম্ভাবনা চীনের চেয়েও বেশি। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানীর জন্য তার রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের সংখ্যাও যথেষ্ট প্রচুর। এই চারিটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ এই রকম স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা তার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ নয়। অবশ্য ভবিষ্যতে ইউরোপে বা অন্যত্র হয়তো অনেকগুলি রাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ সংহত বহুজাতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে।

ঘটনা পরিস্থিতির প্রবাহধারা যে গতি নিয়েছে, তাতে বিশ্বের শক্তি কেন্দ্র হিসাবে অতলান্ত মহাসাগরের পরিবর্তে ক্রমশই প্রশান্ত মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। প্রত্যক্ষভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলেও ভারতবর্ষ অনিবার্যভাবেই এই অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। ভারত মহাসাগরের চারিদিকে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য

পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ভারতবর্ষের রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং ভবিষ্যতে এই সব অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতের দুই দিকে ভারত মহাসাগরকে ঘিরে যে সমস্ত দেশ অবস্থিত যেমন—ইরাণ, ইরাক, আফগানিস্তান, সিংহল, বর্মা, মালয়, শ্যাম, জাভা—এরা সকলেই যদি আঞ্চলিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহলে বর্তমানে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটবে। অথবা তা নাহলেও এই সমস্যার বিচার ও পর্যালোচনার পটভূমিকাই সম্পূর্ণ বদলে যাবে। মিষ্টার জি ডি এইচ কোল-এর মত অনুযায়ী ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক কেন্দ্র হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ারই সম্ভাবনা। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ অনিবার্যভাবে বহু জাতির সম্মিলিত শক্তিশালী একটি সংহত রাষ্ট্র হিসাবেই গড়ে উঠবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাষ্ট্রের একদিকে থাকবে চৈনিক-জাপানী-সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে থাকবে মিশর, আরব ও তুরস্কের সম্মিলিত নূতন এক রাষ্ট্র, আর উত্তরে থাকবে সোভিয়েট ইউনিয়ন।

এ-সবই অবশ্য একটা অনুমান বিশেষ এবং ভবিষ্যতের পৃথিবী ঠিক এইভাবে অগ্রসর হবে কি না, তা আজ কেউই বলতে পারে না। আমার নিজস্ব মত ব্যক্ত করতে হলে বলতে হয় যে, মাত্র কয়েকটি বড় বড় বহুজাতিক সংহত রাষ্ট্রে সমগ্র পৃথিবীকে ভাগ বিভাগ করা আমার মনঃপুত নয়। এই কয়েকটা রাষ্ট্রের সকলেই যদি একটা শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু লোকে যদি মূর্খতাবশত বিশ্ব-ঐক্য এবং কোন এক ধরণের বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে এই সব বিরাট বহুজাতিক অঞ্চলগুলি—নিজ স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটগুলির সংহতিতে—এক একটি সুবৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে কার্যকরী হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ আজকের দিনে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি অনিবার্য। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এ-সব দেশ স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়তো পারবে, কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে নয়।

সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখার্জীর সঙ্গে শ্রীনেহরু

এ-সব যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষ যদি তার প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তা সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। কারণ ভারতবর্ষ যে প্রভাব বিস্তার করবে, সে প্রভাব হবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার সপক্ষে এবং আক্রমণপ্রবণতার বিপক্ষে। [১৯৪৫ সালে নেহরু 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এই যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ('ভবিষ্যতে ইউরোপে বা অন্যত্র হয়তো অনেকগুলি রাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ, সংহত বহুজাতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে।') আঞ্চলীয় সংহতি, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, কমন মার্কেট, বান্দুং সম্মেলন, অ্যালায়েন্স ফর প্রোগ্রেস প্রভৃতি আজ নেহরুর দূরদৃষ্টিকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে।]

গ্রন্থ মেলা

জয়ন্ত সেন

বাংলাদেশে সাহিত্যিকের সংখ্যা অনেক বলা যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যসাধকের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীঅশোক সেন যদিও সমালোচক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত তবু তাঁর সেই সমালোচনার মধ্যে রয়েছে মৌলিক গুণাশ্রিত সাহিত্যের ব্যঞ্জনা ও রস। তাই তাঁর সমালোচনা পাঠ করে আমরা শুধু জ্ঞানার্জনই করি না, তা দুর্লভ সৌরভে, অপূর্ব মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে দেয়।

একথা ঠিক, এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই নাট্য সাহিত্যকে অবলম্বন করে সমালোচনা নামক কঠিন বিষয়টি গড়ে উঠেছিল। যদিও সেই সমালোচনা আমাদের দিগ্‌দর্শিকা করে থাকে, তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে জগতে আমরা এখন বাস করছি তাকে যতোখানি জয় করেছি—ততোটাই সে যেন জটিল হয়ে গেছে। নাটকেও রয়েছে সেই জটিল পরিক্রমা—যাকে ঠিক পুরাতন মতবাদ দিয়ে পুরোপুরি যাচাই করা উচিত নয়। তবু একালের সেই নাটকের কথা বিশেষ সাহস করে লেখার মতো যে দুই একজন রয়েছেন, তার মধ্যে শ্রীঅশোক সেন অবিসংবাদিত-রূপে অগ্রণী তাঁর "অভিনয়-শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা"র (প্রকাশক: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।) মতো সার্থক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আর নেই। এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ রচনার পূর্বে শ্রীসেনকে অনেক সাধনার স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় নাটক ও নাট্য বিষয়ক গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন। দেশে ও বিদেশে প্রচুর নাট্যাভিনয় তিনি দর্শন করেছেন। ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের কাছ থেকে নাট্য জগতের সামগ্রিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শ্রীঅশোক সেনের প্রতিভা বাংলাদেশের একটি অনুদ্ঘাটিত দিক যাতে প্রকাশ করতে পারে সেই কারণে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁকে তাঁর নাটকের রিহার্সেলে উপস্থিত রাখার প্রয়োজন বোধ করেছেন। এসব ছাড়া শ্রীসেন ব্রিটিশ ড্রামা লীগ ও লণ্ডন য়ুনির্ভার্সিটিতে অভিনয় ও পরিচালনা করে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই শিক্ষা ও সাধনার ফলেই আমরা লাভ করেছি "অভিনয়-শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা" গ্রন্থ। অভিনয় শিল্প হলেও তার জন্যে শিক্ষার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীসেন জানিয়েছেন আমরা অভিনয় করি কেন? টেকনিকের আবশ্যকতা—অভিনয়ের ব্যাকরণ—স্বাভাবিক অভিনয়—স্বরবিন্যাস—সংলাপের স্বাভাবিকতা—সুকণ্ঠের বিপদ—শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ—কণ্ঠস্বরের মাত্রা বা সময়ের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি যে সব আলোচনা করেছেন তা শুধু সাধারণ অভিনয় শিক্ষার্থীদের কাছেই নয়, যারা জাতশিল্পী বলে গর্ব বোধ করেন তাদেরও জানা উচিত। এর ফলে আমাদের দেশে অভিনয়-শিল্প যথার্থ বিজ্ঞান হয়ে উঠবে। ভালো প্রডিউসারের কি কি গুণাগুণ থাকা দরকার, মুভমেন্ট, স্টেজে পতন প্রভৃতি আরো বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি যা আলোচনা করেছেন, তা বাংলা ভাষায় শ্রীঅশোক সেনই প্রথম আলোচকের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দাবী করতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে বড়কথা এই যে, তাঁর আলোচনায় অভিনয়জিজ্ঞাসু যে কোনো ব্যক্তি ও নট নটীরা অনিবার্য-রূপে উপকৃত হবেন। মাথা, চোখ, নাক, মুখ, গাল, কাঁধ, হাত কবন্ধ পা, হাসি, কান্না প্রভৃতিকে মঞ্চোপযোগী করে তুলতে হলে কী ভাবে অনুশীলন করা দরকার, তা ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীর প্রখ্যাত নট-নটীদের মন্তব্য ও অভিমত তুলে দিয়ে শ্রীসেন আপনার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটে শ্রীহৈমন্তী সেন নাট্যজগতের নতুন দিকে আলোকপাত করেছেন।

শ্রীঅশোক সেন রবীন্দ্রনাথের নাটকের ওপরও যে আশ্চর্য কৃতী সমালোচক তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে তাঁর "রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা" পাঠ করলে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শ্রীঅশোক সেন ছাড়া যে সব সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নাটকের গভীরে বিশেষভাবে প্রবেশ করতে পারেন নি। তাঁদের আলোচনা অনেক সময় একমুখী এবং গ্রন্থগুলিতে প্রায় একই লক্ষ্য—লক্ষ্য করা যায়। শ্রীসেনের রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমার দুটি খণ্ড একই গ্রন্থভুক্ত। প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে: নাট্য সাহিত্য। পৃথিবীতে প্রায় সমগ্র নাটক ও নাট্যকারদের এমন তথ্যবহুল আলোচনা দুর্লভ। সেই আলোচনাকে পটভূমি করে তিনি বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির পরিশোধ, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মালিনী, শেষ রক্ষা, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমারসভা, গৃহ-প্রবেশ, শোধবোধ ও বাঁশরীর সুখ্যাতিমূলক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয়: সাঙ্কেতিকতা, রবীন্দ্রনাট্যে সাঙ্কেতিকতা, শারদোৎসব, পরিত্রাণ, রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, কবির দীক্ষা, চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মধ্যে শ্রীসেন যে মাধুর্য ও প্রসাদগুণ ছড়িয়েছেন, তা যেমন অননুকরণীয় তেমনি প্রত্যেকের শিক্ষণীয়।

সুশীল রায়

অনল আয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেয়ার সাহেব বাংলা তেমন বলতে পারেন না বটে, কিন্তু বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয় না। তিনি এই যুক্তি শুনে হেসে তাকালেন দ্বারকানাথের দিকে। দ্বারকানাথ ও অন্নদাপ্রসাদ খাটো গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপে রত হলেন।

রামমোহন এ যুক্তির কি প্রত্যুত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না, কেবল বললেন, কেবল আশঙ্কা দূর করার জন্যে এইরূপ নৃশংস কাজে উৎসাহ দান করতে চান ? পতি বর্তমান থাকতেও তো এমন আশঙ্কা থাকতে পারে। তার কি উপায় ?

দিগম্বর বললেন, স্ত্রীলোকেরা অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অযোগ্য, সানুরাগা, ধর্মজ্ঞানশূন্য।

এবার উত্তেজিত হয়েছেন রামমোহন, তাঁর কণ্ঠস্বর সহসা উচ্চগ্রামে উঠে এল, বললেন, অত অনায়াসে তাদের অল্পবুদ্ধি বললেন, কিন্তু তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে নিয়েছেন ? বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানশিক্ষা দিয়েও যদি দেখা যায় তারা তা গ্রহণে অক্ষম, তবেই অল্পবুদ্ধি বলা সাজে ; আপনারা তাদের এ সুযোগ দেন না, সহজেই অল্পবুদ্ধি বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। আপনারা জ্ঞানী লোক, আপনাদের জ্ঞান দান করা আমার অর্বাচীনতা। তবুও বলি, কালিদাসের পত্নী, কর্ণাটরাজের পত্নী, লীলাবতী, ভানুমতী প্রভৃতি নারীর কথা আপনারা জানেন—তাঁরা সর্বপ্রকার শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন ব'লে খ্যাত ; যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন, এবং মৈত্রেয়ী তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণে সক্ষম হন। আর, আর-একজনের নাম এই সঙ্গে করি, তিনি সুদূর কালের নারী নন, আমাদেরই কালের এবং আমাদের চাক্ষুষ দেখা—হটী বিদ্যালংকার। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে নারীদের অল্পবুদ্ধি বিবেচনা করে তাদের প্রতি অবিচার করা কি সংগত ? আর, আপনাদের দ্বিতীয় অভিযোগ, তারা অস্থিরান্তঃকরণ। আপনাদের এ কথায় আশ্চর্য হয়েছি। অগ্নির নাম শুনলে যে দেশের পুরুষ মৃতপ্রায় হয়, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা জলচ্চিতায় আরোহণ করে—এ তো আপনারা প্রত্যক্ষ দেখেন, তবুও তাদের অস্থিরান্তঃকরণ বলেন ? আপনারা পারবেন জলন্ত চুল্লিতে ঝাঁপ দিতে ?

একটু থেমে পুনরায় তিনি বললেন, তারা বিশ্বাসের অযোগ্য, তারা বিশ্বাসঘাতক ? এ দোষ পুরুষে অধিক, কি, স্ত্রীতে অধিক ? প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে কত পুরুষ তাদের স্ত্রীকে এবং কত স্ত্রী তাদের স্বামীকে প্রতারণা করছে তার হিসাব রাখেন ? প্রতারিতা স্ত্রীর সংখ্যা অন্তত দশ গুণ এবং পুরুষের এই প্রতারণা-কার্য দোষের মধ্যেও গণ্য নয়। দৈবাৎ কোনো নারী ওরূপ অপরাধ করলে তার কি দশা হয় ? তাদের বলছেন সানুরাগা। কিন্তু এক-একটি পুরুষ দুই তিন দশ কি তদধিক বিবাহ করেন ; কিন্তু স্ত্রীর পতি এক, এবং তিনি মৃত হলে কি ঘটনা ঘটে তাদের অদৃষ্টে ?

আবার একটু থামলেন রামমোহন, বললেন, তাদের আপনারা ধর্মজ্ঞানশূন্যতার অপবাদ দিচ্ছেন। এ হচ্ছে ঘোর অধর্মের কথা। কত দুঃখ যন্ত্রণা তিরস্কার অপমান সহ্য করেও ধর্মভয়েই তারা সব সহ্য করে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থের নিমিত্ত কতগুলি বিবাহ করেন ? বিবাহের পর সব স্ত্রীর সঙ্গে জীবনে আর সাক্ষাৎ করাই সম্ভব হয় না। তবু ধর্মভয়েই তাঁদের সেইসব পত্নী পিতৃগৃহে ভ্রাতৃগৃহে পরাধীন অবস্থায় কত গ্লানি সহ্য করে জীবন যাপন করে ? তবু বলেন, ধর্মভয় তাদের নেই ?

ফরাশ থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালেন রামমোহন। চাপকানে পায়জামায় ও পাগড়িটুপিতে আচ্ছাদিত তাঁর আপাদমস্তক। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, নমস্কার।

ভট্টাচার্য-মহাশয়েরা ফরাশ থেকে নেমে এলেন, প্রতিনমস্কার করলেন তাঁরা।

রামমোহন বললেন, মৌখিক সামান্য আলোচনা হল মাত্র। বিস্তারিতভাবে এই কথোপকথন আমি লিপিবদ্ধ করে মুদ্রিত করে অবিলম্বেই বিতরণ করব। আপনারাও পাবেন।

ভট্টাচার্যরা বিদায় নিচ্ছেন, এমন সময়ে ব্যস্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল গোলোক দাস।

—কি খবর গোলোক?

গোলোক দাস বলল, কাশী মিস্তিরের ঘাটে সতী হচ্ছে। অনেক লোক এসেছে ভিড় ক'রে।

একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রামমোহন তাকালেন তাঁর আত্মীয়ত্রয়ের দিকে, বললেন, গাড়ি জুৎতে বলো, গোলোক দাস।

ভট্টাচার্যেরাও এই সংবাদ শুনলেন। তাঁরা দাঁড়ালেন না। দ্রুতপায়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন।

অন্নদাপ্রসাদ একটু বুঝি ভীত গলাতেই বললেন, কোথায় যাবেন?

—কাশী মিস্তিরের ঘাটে।

ফরাশ থেকে নামতে-নামতে দ্বারকানাথ বললেন, এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে? চারদিকে সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

রামমোহন তার উত্তরে বললেন, আমিও কম ক্ষিপ্ত নই দ্বারকানাথ।

হেয়ার কোনো কথা বললেন না। হয়তো কোনো পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু গাড়ি জুৎতে যখন বলা হয়েই গিয়েছে তখন আর ও মানুষটিকে বাধা দেওয়া যাবে না। শুধু বললেন, লেট্‌স অ্যাকমপ্যানি হিম।

আগে-আগে রওনা হয়ে গেল রামমোহনের ঘোড়াগাড়ি। পিছনে ঝালরদার পালকি চলল তিনটি। গাড়িটা গেল রাস্তা ধরে, পাল্কি চলল খানা-ডোবার পাশ দিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে—এতে পথ অনেক কম হবে, তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে।

ওঁদের পাল্কি যখন ঘাটে এসে পৌঁছল তখন শ্মশানভূমিটায় যেন তিলধারণের স্থান নেই। তাঁরা তিনজন সেই জনতা ভেদ করে অগ্রসর হলেন। মান্য ব্যক্তিদের আগমন দেখে জনতার মধ্যে অনেকে বিস্মিত হয়েছে।

তাঁরা ভিতরে এসে প্রবেশ করে দেখলেন, চিতা সজ্জিত হয়ে আছে, তার পাশে আলুলায়িত-হস্তে বসে আছে রোরুদ্যমানা এক মহিলা, রুক্ষ চুল পড়েছে চোখে-মুখে, পরনের বস্ত্র বিস্ত্রস্ত।

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছেন রামমোহন, কেন সে সংকল্প করেছে মৃত্যুবরণ করার জন্যে, এ কাজের জন্যে কেউ তাকে প্ররোচনা দিয়েছে কি না, বেঁচে থাকায় তার সম্মতি নেই কেন। তাকে যদি আজ রক্ষা করা যায় ঐ চিতা থেকে তবে সে সুখী হবে কি না।

কেঁদে উঠল মহিলাটি, বলল, না না না। বাঁচতে আমি চাই না। আমাকে বাঁচালে আমি মরে যাব।

অদূরে দণ্ডায়মান পুরোহিত বিজ্ঞের মত শির আন্দোলন করলেন। এবং তাঁর পার্শ্বস্থ পুলিশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। পুলিশকে কিছু হয়তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন পুরোহিত।

জনতার মধ্যে উষ্মাসের গুঞ্জন বেজে উঠল, তারা আপত্তি জানিয়ে বলতে লাগল, এই মৌলভীটা কেন এসেছে এখানে।

কে একজন বলল, আসবে না? হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করতে হবে না? ঘরে বসে আবার বেদান্ত পাঠ করা হয়।

অথর্ব বৃদ্ধ এক ব্যক্তি দন্তশূন্য মুখের মাড়ি ঘষে বলে উঠল, উঃ মস্ত বড় বৈদান্তিক।

দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রেখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা জোয়ান ছেলে পাশেই, সে ঐ বৃদ্ধটির দিকে চেয়ে বলল, না দাদু। বৈদান্তিক উনি হবেন কেন, বৈদান্তিক আপনি।

কথাটার তাৎপর্য প্রথমে বুঝতে পারে নি বৃদ্ধটি, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পেরে মুখ বিকৃত করল সে, কি একটা অশ্রাব্য কথা বলে বসল। সে মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ওটা বুঝি একটা দন্তহীন বিভীষিকা।

গরানহাটা বাগবাজার চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে স্নানার্থিনীরা এসেছিল গঙ্গায়। কেউ স্নান সেরে, কেউ-বা স্নানের আগেই এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে ঝাঁক বেঁধে। একটু আগেও তারা খলখল কলকল শব্দে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। কিন্তু ঐ মস্ত-মানুষটিকে এবং আরো তিনজনকে একেবারে চিতার কাছে চলে আসতে দেখে চুপ করে গিয়েছে তারা। চুপ করে যেন চাপ বেঁধে গিয়েছে। কারো চোখের কোণে কালি, কারো নাকে মোতির নোলক, কারো বা নিতম্বে রূপার গোট—কিন্তু সকলেরই মুখ কেমন মাজা-ঘষা পালিশকরা। তাই মনে হয় যেন একটা ফুলের তোড়াই ওরা।

ওই তোড়ার মধ্যের একটি ফুলের দিকে যদি নজর পড়ে গিয়ে থাকে, নজর পড়া-মাত্র যদি বুকের মধ্যে দপ করে উঠে থাকে, তাহলে, হে পাঠক, হে পাঠিকা, আপনাদের অনুরোধ করব সে চোখ ফিরিয়ে আনতে। যদি চোখ ফিরিয়ে আনতে না পারা যায় তাহলে বন্ধ করুন চোখ। রুদ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে শুনুন কি বলছেন রামমোহন রায়।

দৃপ্ত গলায় রামমোহন বলছেন, মেনে নিয়েছি এ চায় সতী হতে। জোর নয়, জবরদস্তিও নয়, স্বেচ্ছায় এ চায় সহমৃতা হতে। তবে, ও-ব্যবস্থা কেন। আগেই স্বামীর পাশে শায়িত করে রজ্জুতে বেঁধে কাঠ চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা কেন। অগ্রে জ্বলিত হোক চিতা, সেই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করুক এ। শাস্ত্রের এই তো বিধান।

থানার দারোগাবাবু উঠে এসে দাঁড়ালেন রামমোহনের পাশে। রামমোহন তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, শাস্ত্রের বিধান এই—অগ্রে চিতা জ্বলিত হবে, তারপর স্বেচ্ছায় আরোহণ করবে ওই চিতায়।

বিধান এই ; কেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। বলল, আমি রাজি আছি। চিতা জ্বালানো হোক তবে আগে।

ফুলের তোড়ার মধ্যে যে ফুলটির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়েছিল আপনাদের, এবার চেয়ে দেখুন—সে কুসুমে যেন কীট, সে ফুলের পাপড়ি ভিজে উঠেছে বুঝি শিশিরে, নাকে তার মোতির নোলক নেই, কিন্তু দুচোখে ফুটে উঠেছে দুটি টলটলে মুক্তো।

সেদিন ফিরে গেলেন রামমোহন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেলাম আমরাও। মেয়েটার মনের জোর দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন তিনি, আমরাও কম স্তম্ভিত হই নি।

সমবেত জনতা বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে, সে বিদ্রূপে কর্ণপাত না ক'রে ফিরে গিয়েছেন তিনি। ঐ জনতার বিশ্বাস, তাদের কাছে হার মেনে যেতে হয়েছে ওই মৌলভীকে।

কিন্তু হার-জিতের প্রশ্ন নয়। আবার কোনো সংবাদ পাওয়া মাত্র গিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন ঘাটে-ঘাটে। পরাজয়ই যদি তবু বলা হয় একে, তাহলে একদিন যাকে পরাস্ত হতে হয়েছে তার কাছে বার বার পরাভূত হয়েছে জনতা। জনতা পরাভূত হয়েছে বটে, কিন্তু ধর্মের ধারক ও বাহক যারা তাদের পরাস্ত করা বড় কঠিন। কত যুগ-যুগান্তর পূর্ব থেকে কত চেষ্টা হয়েছে এই প্রথা-রদের ; কিন্তু অদ্যাবধি তা সম্ভব হল না। মোগল বাদশাহেরা অনেক চেষ্টা করেছেন, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত যাতে না লাগে এইজন্যে অতি সতর্ক-ভাবে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সফল হয় নি তাঁদের সে প্রয়াস। পেশবা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সদ্যবিধবাদের নিবৃত্ত করার জন্যে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিবারণ করা সম্ভব হয় নি তাঁদের দ্বারাও। বৃটিশ সরকারও চেষ্টা করছেন অনেকদিন থেকে, কিন্তু তাঁদেরও এ চেষ্টার মধ্যে তেমন দৃঢ়তা নেই। এ পর্যন্ত যতটা জানা যায় তাতে দেখা যায়—বৃটিশ সরকারের এ-বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হচ্ছে সেই-বছরে, যে-বছরে জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন।—ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ভারতে। ক্যাপটেন টানিন নামে এক শ্বেতাঙ্গ এক সদ্যবিধবা রমণীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে নিরাপদ এলাকায় ; তার এই কার্যের জন্যে একদল জনতা তাকে আক্রমণ ক'রে এক বিরাট দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

রামমোহনের জন্ম-বৎসরে যখন এ-দেশে প্রথম বৃটিশ চেষ্টা আরম্ভ, তখন রামমোহনকে জীবনপণ করেই চেষ্টা করতে হবে সেই বৃটিশ গবর্ন-মেণ্টকে দিয়েই এ-কাজ সম্পাদন করতে পারা যায় কি না। এই জন্যেই তিনি চান একজন স্ট্রং গবর্নর-জেনারেল। দ্বিধা থাকবে না যার মনে, দৃঢ় মনে যে তার সংকল্প ঘোষণা করতে পারবে।

ভট্টাচার্যদের সঙ্গে কথোপকথনের মুদ্রিত বিবরণ প্রচারিত হয়েছে—সহমরণ-বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের সম্বাদ।

দিন গত হচ্ছে ক্রমশ। বছরও কাটল। নানা প্রকারের কাজের মধ্যে নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছেন বটে তিনি, কিন্তু তাঁর প্রধান কাজের কথাটি বিস্মৃত হন নি। সহমরণ-বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কাজ অগ্রসর হয়েছে কতটা তার পরিমাপ করতে তিনি পারেন না। এখনো সংবাদ পাওয়া-মাত্র তিনি যাত্রা করেন গঙ্গার ঘাটে, স্বামীর মৃত্যুতে শোকাকুল নারীদের চরম পন্থা অবলম্বন থেকে তাদের নিবারণ করার জন্যে তাদের সঙ্গে কথা বলেন, পুরোহিতদের সঙ্গে তর্ক হয়। কিন্তু শান্ত সমাহিত অবস্থায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। চতুর্দিকে যেন শত্রুব্যূহ, তার মধ্যে তিনি যেন অসহায় অভিমন্যু। কিন্তু সেই ব্যূহ থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসার পথ তাঁর অজানা নয়।

গঙ্গাকিশোরের বাঙ্গাল গেজেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন সমাচারদর্পণ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সে পত্রিকা মিশনারীদের পত্রিকা ; এবং সে পত্রিকার থেকে রামমোহন সংবাদ অবগত হতে পারেন মাত্র, নিজের অভিমত ব্যক্ত করার জন্যে আবশ্যক বোধ করেছেন আর একটি সংবাদপত্রের। এই জন্যে প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে সম্বাদকৌমুদীর। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে ব্যক্ত করে চলেছেন অভিমত। সাধারণ শ্রেণীর পাঠকদের জন্যেই অবশ্য ঐ পত্রিকা, কিন্তু সেইসঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যও তিনি উপকরণ দান করে চলেছেন এতে। সবই করে চলেছেন বটে, কিন্তু সব উপকরণের মধ্যে থেকে প্রকৃত উপকরণ যা স্পষ্ট রূপে দেখা যায় তা হচ্ছে সহমরণের উচ্ছেদ-সাধনের যুক্তি।

হিন্দু ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্যে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু দুর্নাম তাঁর রটেছে এতই যে, তাঁর এ কাজটিও কেউ সমর্থনের চোখে দেখছে না।

স্কুল পরিদর্শন করে তিনি দ্বিপ্রহরে পথে অপেক্ষমাণ তাঁর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছেন, দেখলেন কাঁধে হাত দিয়ে দুটি যুবক চলেছে রাস্তা দিয়ে, তারা বলছে—

খানাকুলের বামুন একটা করেছে ইস্কুল
জেতের দফা হল রফা, থাকবে
নাকো কুল।

হাসিই পায় ঐ ছড়া শুনে। হাসি পায় নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে না, ঐসব ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে।

কিন্তু ভেবে লাভ নেই কোনো। এদের স্বাজাত্যবোধ যতদিন না জাগবে, নিজেদের কূপমণ্ডুকতা যতদিন না ঘুচবে, ততদিন ওদের কুল রক্ষা করে কে। খানাকুলের কোনো বামুনও পারবে না, গোকুলের কোনো কুলপতিরও সাধ্য নয়।

কয়েকদিন পরেই মানিকতলার বাগানবাড়ি সেজে উঠল আলোকের মালায়। গোলাপী বাতিদানে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সারা গৃহ। প্রতি ঘরের দরজায়-জানলায় নতুন পর্দা বিলম্বিত হল। ঘরে-ঘরে আলোর ফুলঝুরি। অতিথি-অভ্যাগত এসে পৌঁছচ্ছেন একে-একে। ঝালরদার পাল্কি, চেয়ার-পাল্কি, রুপো দিয়ে মোড়া পাল্কির হাঙর-মুখো বাঁট।

কি ব্যাপার? ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কি ঐ মৌলভী সায়েব? এত সায়েব আর এত সায়েবানের ভিড়, এত কালা বিবি আর গোলাপি বিবির আমদানি যে।

সিমুলিয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করে কেউ, কেউ-বা এই পথ দিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায়। ব্যঙ্গ করে বলে—সারা শহর আঁধার করে, বামের ঘরে বাতি। শহরের সব আলো কুড়িয়ে এনে জড়ো করেছে বুঝি এখানে?

মানিকতলার বাগানবাড়িতে আজ উৎসব। বেনিয়ান রামমোহন আর আত্মীয়সভার রামমোহন শহরের কোন আর কাউকেই আমন্ত্রণ করতে ত্রুটি করেন নি। কয়েক দিন আগে খবর এসেছে—আফ্রিকার আবিসিনীয়দের জয় হয়েছে। তাদের সেই বিজয়কে উপলক্ষ করে আজ এখানে এই আনন্দ-সমাগম।

বাজির খেলা চলেছে আকাশে। হুশ-শ শব্দে উধাও আকাশে উড্ডীন হচ্ছে হাউই। রঙবেরঙের আলোর ফুল ফুটে উঠছে শূন্যে।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তলোয়ার বল্লম আর বর্শার খেলা দেখাচ্ছে বাজিকরেরা। সহস্র মোমের আলো তাদের গায়ে পড়ায় মনে হচ্ছে তারা যেন মানব নয়, দানব।

ঘরে-ঘরে বেজে চলেছে বাজনা, নর্তকীদের নূপুর থেকে-থেকে বেজে-বেজে উঠছে তার তালে-তালে। নিকি নর্তকী এসেছে। যত-সব সেরা-সেরা নাচিয়ে এসে থাক এই কলকাতা শহরে, নিকির জুড়ি হতে আজও কেউ পারে নি। এখন বয়স হয়েছে তার একটু, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না, নাচের পা-দুটো এখনো তার কচি। রাঙা সাটিনের পায়জামার উপর সবনম মসলিনের ঘাগরা, একটা পাক খেলেই ছড়িয়ে প'ড়ে প্রায় সারা ঘর ঘিরে ধরে ঐ ঘাগরা। ফৈজ বক্স্-এর আসার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারে নি। জিন্নত বাই এসেছে, সুপনজান এসেছে, হিঙ্গুল এসেছে, আর এসেছে নতুন নর্তকী—রানী-বাই।

ঘরে-ঘরে নাচছে নর্তকীরা। অতিথি-অভ্যাগতেরা পান চিবচ্ছেন আর ঐ নাচ দেখছেন।

দক্ষিণদুয়ারি হল-ঘরে নাচছে রানী-বাই। দিব্য নাচ নাচছে। নিকির নাচ থামা মাত্র সে ঘর থেকেও অনেকে এসে জড়ো হয়েছেন এখানে।

দুজন বিদেশিনী একদৃষ্টে দেখছেন ঐ নাচ। একজন হচ্ছেন শ্রীমতী বেলনস, আর-একজন ফ্যানি পার্কস। দুজনেই স্কেচ এঁকে নেবার জন্যে ব্যস্ত। ঐ ওরিয়েণ্টাল চোখ, ওরিয়েণ্টাল মুখ, আর ওরিয়েণ্টাল ফিগার খুব পছন্দ হয়েছে তাঁদের।

শ্রীমতী বেলনসের অ্যালবাম পূর্ণ হয়ে উঠেছে নানারকম চিত্রে। কিন্তু শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস্ মাত্র কয়েক বছর হল এসেছেন এ দেশে, তাঁর চিত্রের পরিমাণ এখনো তাই কম।

দুজনে বসে-বসে নাচ দেখছেন ও আউটলাইন এঁকে নিচ্ছেন তাঁদের খাতার পাতায়।

অতিথি-অভ্যাগতদের সমাদর করে ঘরে-ঘরে ঘুরছেন গৃহকর্তা। তাঁর সমাদরে সকলেই প্রীত, কিন্তু তার চেয়েও প্রীত এই উৎসবের আয়োজন হয়েছে যেজন্যে, সেই কারণটির কথা ভেবে। কোন্ দূর দেশে অজানা অচেনা মানুষেরা জয়ী হয়েছে, সেই জয়কে মানুষের জয় হিসাবে বরণ করে এই আনন্দোৎসবের আয়োজন।

এ-ঘরে এসে উপস্থিত হলেন রামমোহন কেদারায় বসলেন তিনি। বেলনস পরিচয় দিলেন নিজের, তাঁর নবীন বান্ধবীটির সঙ্গেও পরিচয় করে দিলেন গৃহকর্তার। তাঁর অঙ্কিত চিত্রের অ্যালবামটি তাঁর হাতে দিয়ে অভিমত জানতে চাইলেন। পাতার পর পাতা উল্টে দেখছেন রামমোহন—সম্ভ্রান্ত-মহিলার গঙ্গাস্নান, আলাপরত পল্লীনারী, কালীঘাট থেকে ছিন্নমস্তক ছাগ স্কন্ধে প্রত্যাবর্তন, গঙ্গায় নারীর অর্ঘ্যদান। একে-একে দেখে তিনি তাঁর অভিমত জানালেন, বললেন, ইউ ড্র ভেরি নাইস পিকচার্স, দে আর অ্যাকিওরেট অ্যাণ্ড লাইভলি।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সাত ॥

অনেক দিন আগে আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলুম।

তখন আমার বয়েস দশ কি এগারোর বেশি নয়। যে বয়েসের এক একটা দিন ছেলেবেলার আঁকা ছবির মতো—কাঁচা হাতে টানা মোটা মোটা লাইন, মনের আনন্দে রং বুলিয়ে চলা। তখন নদীর রঙে অনেক বেশি নীল, গাছের পাতায় যত খুশি সবুজ, পাতার আড়ালে ঘন হলুদ রঙে আঁকা বৌ-কথা-কও পাখি, নদীর জলে ভেসে-চলা নৌকোটির পালে একমুঠো নিবিড় লাল।

সেই ছেলেমানুষি ছবির কোনো দাম নেই। তার ড্রয়িং ভুল, পারস্পেক্টিভ ভুল, বড়ো হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়া কাগজের স্তূপের ভেতরে কোথায় তার হারিয়ে যাওয়া। তবু আরো অনেক বড়ো হয়ে যাওয়ার পর সেই হারিয়ে-যাওয়া কাঁচা হাতের ছবিটার দাম বুঝতে পারা যায়। কিন্তু হিসেবী মন তখন আর ভুল ড্রয়িং করতে পারে না, ভুল চোখ নিয়ে দেখতে পারে না—যা খুশি রঙ তুলিতে মাখিয়ে যত খুশি বুলিয়ে দিতে পারে না। তখন মস্ত একটা সাদা হিসেবের খাতা—তাতে রাতদিন যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের ফল নামিয়ে চলেছি।

ছবিরা যে ফাঁকে ফাঁকে আসে না, তা নয়; তারা সাদায় কালোয় আলোয় অন্ধকারে গড়া; আঁকা বাঁকা রেখার একদল সরীসৃপ; তার ড্রয়িংয়ে কোথাও অনাবশ্যক প্রক্ষেপ, কোথাও সঙ্কুচিত কার্পণ্য; মানুষের মুখ রাত্রির দুঃস্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়—প্রকৃতি তখন মানুষেরই মনের পটভূমি হয়ে ওঠে। হিসেবের ফাঁকে ফাঁকে আমিও সে ছবি আঁকি। তুলি দিয়ে নয়—কলমের মুখে, অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে।

কিন্তু সেই অনেক রঙ আর অনেক আনন্দের যে ছবিরা চলে গেল, তারা গেলই; অর্থাৎ চোখের ছবির পালা শেষ। এখন আত্মার ছবি আঁকা—যেখানে আদিম আর সাম্প্রতিক, চেতন আর অচেতন, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, ধ্রুব-বিশ্বাস আর নৈরাজ্যবোধ এক সঙ্গে মিশে হাজারো রেখায় একটা জটিল জাল তৈরি করে রেখেছে।

চোখের আলোয় দেখা মনের শৈশব; আত্মার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষের সাবালকত্ব।

দুঃখ করবার কোনো মানে নেই—এই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় শৈশব আমরা কামনা করতে পারি—তার অনুধ্যানে আমাদের নস্টালজিক পরিতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু আমরা কি কখনো ফিরে যেতে পারি সেখানে? সেই দ্বিতীয় শৈশব কখনো কখনো হয়তো স্থবির বার্ধক্যে ফিরে আসে, কিন্তু তার চাইতে করুণ পরাজয়ের রূপ মানুষের আর নেই।

তবু এক একটা পটভূমি আছে। কখনো কখনো আমরা তার মধ্যে উত্তোলিত হই। তখন নিজেকে নতুন বলে মনে হয়—যেন কোথাও একটা মায়া সরোবর ছিল, কোন এক জ্যোৎস্নাগলা রাত্রিতে তার রুপোলি জলে ডুব দিয়ে আমরা একটা নতুন তীরে এসে দাঁড়াই। তখন দূরের

পাহাড়, ওই নদীটা, ছোট ছোট লাল মাটির ঢিবি, এলোমেলো ঘাস আর সাঁওতালী গ্রামের বুটি আঁকা মাঠের পর মাঠ, বুনো কষায় গন্ধে ভরা হলুদ-লাল কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, সেই হরিয়ালের ঝাঁক, তখন—

তখন সাদা-কালোর ছবিতে যে জটিল রেখার জালে আমার সব শিরাস্নায়ুগুলো জড়িয়ে গেছে, তার মধ্য থেকে একটা স্বপ্নময় মুক্তি। স্বপ্নই। দু দিন পরেই চেতনার ওপর থেকে আলো অন্ধকারের সেই সহস্র বাহু আবার হাত বাড়াবে—কলকাতা আমাকে টানবে, আবার নিজের সেই বিবরের মধ্যে আমি ফিরে যাব। তার আগে পর্যন্ত আমি কিছুক্ষণ এই পাহাড়ের ছায়ায় ডুবে থাকতে পারি, মগ্ন হয়ে যেতে পারি কৃষ্ণচূড়ার অরণ্য-গন্ধে, নিজের কাছে গুঞ্জন তুলতে পারি—'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে—'

অনেক দিন আগে, চোখের আলোয় দেখা বেহিসেবী রঙ আর ভুল ড্রয়িংয়ের সেই শৈশবে, আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলুম।

ইচ্ছে করেই? ঠিক মনে পড়ে না। সেদিন আকাশে রোদ ছিল না—মেঘ এসে থেকে থেকে সূর্যকে আড়াল করছিল। আমাদের স্কুল ছুটি ছিল। আর সেই সকালে আমি রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়েছিলুম।

বাবার মুখে শুনেছি তাঁরা রাজহাঁসের পালকের কলম দিয়ে ছেলেবেলায় লিখতে শিখেছিলেন। রাজহাঁস সরস্বতীর বাহন—তার ডানার কলমে অনেক বিদ্যে লুকোনো থাকে।

এখন আর সে কলম কোথাও নেই। কোনো রাজহাঁস নেই আমাদের গ্রামে। আমি রাজহাঁস দেখি নি।

ঠিক দেখি নি তা বলতে পারব না। আমাদের গ্রামে শরৎ যখন শেষ হয়ে যেত, শীতের হাওয়া লেগে ঝরে যেতে থাকত কাশফুলেরা, আকাশে আর একটুখানিও মেঘ থাকত না, সন্ধ্যের পর থেকে টুপ টুপ করে শিশিরের জল ঝরত, তখন অনেক রাতে—আকাশ জুড়ে আমি পাখির ডাক শুনতুম।

মাকে জিজ্ঞেস করতুম, মা ও কী যায়?

মা বলতেন, হাঁসেরা উড়ে যায়।

—হাঁস উড়তে পারে?

—পারে বই কি। বুনো হাঁসেরা তো দেশে দেশে উড়েই বেড়ায়।

—বুনো হাসেরা কেমন দেখতে?

—অনেক রকম। —এইবার বাবা জবাব দিতেন: সরালি আছে, দীঘলি আছে, কোদালঠোঁটি আছে, লালসর আছে, কালসর আছে, ক্যাটকেটিয়া আছে—চীনে হাঁস আছে, রাজহাঁস আছে—

বুনো হাঁস সম্পর্কে বাবার জ্ঞান দেখে আমি চমকে যেতুম। আরো চমকে যেতুম, ওদের দলে রাজহাঁসেরাও আছে শুনে। আমি রোমাঞ্চিত হয়ে বলতুম, কোথায় যায় ওরা?

বাবা বলতেন, তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে মাইল তিনেক দূরে একটা বড়ো জলা আছে, হাঁসের ঝাঁক সেখানে পড়ে বলে শুনেছি।

—রাজহাঁসও পড়ে?

—পড়ে বইকি। জলে চরে বেড়ায়, কখনো কখনো ডাঙায় উঠে আসে, ধানক্ষেত থেকে কচি কচি ধানের শিষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

আমি আরো রোমাঞ্চিত হয়ে বলতুম, সেখানে রাজহাঁসের পালক পড়ে থাকে, বাবা?

বাবা বলতেন, তা কি দু' একটা আর থাকে না?

—আমি একদিন রাজহাঁসের পালক খুঁজতে যাব।

বাবা হাসতেন।

—কী হবে?

—কলম তৈরি করব। খুব ভালো লেখা হবে সরস্বতীর বরে।

—কিন্তু সে জলা তো অনেক দূর। গ্রাম পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে। সহজে কি যাওয়া যায় সেখানে?

কেন যাওয়া যায় না? কত মানুষ পথ দিয়ে চলে—দূর দূর হাটে চলে যায়, মাঠের ওপারে কত চলন্তি যাত্রীর ছবি একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে। তারা যেতে পারে, আমি পারি না?

হয়তো ভাবনাটা ভাবনাই থেকে যেত; মাঠ-ঘাট-বন পেরিয়ে সেই পালকের সন্ধানে কোনোদিনই আর যাওয়া হত না। কিন্তু একবার শেষ রাতে আমার ঘুম ভাঙল। তখন চারদিক নিঝুম, ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত থমকে গেছে, শুধু টপটপ করে শিশির পড়ছে, এমন সময় হাঁসের কলরোল উঠল, উঠল ডানার আওয়াজ। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম বাইরে।

তখন চারদিকে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা —অথচ কী উজ্জ্বল জ্যোৎস্না মাথার ওপর। সেই জ্যোৎস্নায় আমি হাঁসেদের উড়ে যেতে দেখলুম। মনে হল সেই যে গল্পের বুড়ী চাঁদের রাজ্যে বসে চরকা কাটে, সে মুঠো মুঠো পেঁজা তুলো জ্যোৎস্নার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে—আর সাদা আলোর যে তারাদের দেখা যায় দেখা যায় না তারা একসঙ্গে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে উঠেছে।

ঠিক তখনি আমি জানলুম, পালকের খোঁজে আমায় যেতেই হবে।"

এইখানে কিরণের কলম থামল। একটা সিগারেট ধরানো দরকার।

সেই নীল খাতাটা —যেটা ডগলাস ঘাটপাড়ি করতে চেয়েছিল, তারই পাতার পর পাতা এই কথাগুলো সে সাজিয়ে চলেছে। কেন লিখছে জানে না। ডায়েরী? কিন্তু তার সঙ্গে ছেলেবেলায় হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্কটা

কী? কেন এ-সব মনে এল? আজো কি এই কৃষ্ণচূড়ার দেশে সে নতুন করে আবার রাজহাঁসের পালক খুঁজতে চলেছে? আজো কি আবার সে কাঁচা হাতে ভুল ড্রয়িংয়ে রঙের পর রং ঢেলে ছবি এঁকে যাবে? তারপর সে ছবি যাবে হারিয়ে, সেই রাজহাঁসের পালকও আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না?

একটা উপন্যাস লিখব—নস্টালজিক উপন্যাস? নাম দেব 'কৃষ্ণচূড়া?' কিন্তু আজকের সাদায় কালোয়, জটিল রেখার গোলোকধাঁধার ভেতরে সে উপন্যাস চলবে কি? কেউ পড়বে?

একটি পাঠিকাকে কল্পনা করতে ইচ্ছে করল। কৃষ্ণচূড়ার রঙের সঙ্গে তাঁর বেশবাসের শুভ্রতার কোনো মিল ছিল না, তবু কোথায় যেন মিল ছিল একটা। শর্মিলা। শর্মিলা?

নিজের কাছে লজ্জা পেল কিরণ। এ সেই রোমাণ্টিক আবেগের ফল। কৃষ্ণচূড়ার মোহ। কোনো অর্থ হয় না।

কোনো মোহই থাকে না। পরশু সকালে চায়ের আড্ডাটাই তো কেমন বেসুরো হয়ে গেল। কোথা থেকে উঠে এল প্রতিমার কথা, যা একটা জীবন্ত মৃত্যু হয়ে তাকে প্রতিদিন ঘিরে আছে, যা থেকে থেকে চায় আবার অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করাবার। আর এল সেই ইতিহাস—কিভাবে শর্মিলার জীবনে বৈধব্য নেমে এসেছিল। সেই জটিল সহস্রবাহু রেখাগুলোর হাত থেকে কোথাও তার পরিত্রাণ নেই। স্বপ্নের স্বচ্ছ আবরণটাকে ভেঙে দিয়ে তার থেকে চেতনার সেই নিষ্ঠুর উৎক্ষেপ।

লিখব একটা নতুন, ছোট, মিষ্টি উপন্যাস? কিন্তু কে পড়বে? প্রথম অধ্যায়ের পর আমিই কি আর লিখতে পারব?

—কিরণবাবু আছেন?

মোটা দরাজ গলার ডাক এল বাইরে থেকে।

কিরণ চমকে উঠল। কে ডাকছে তাকে এখানে? কে ডাকতে পারে? ঘোর ভাঙবার আগেই আবার ডাক এল: কিরণবাবু নেই?

এবার সাড়া দিলে শম্ভুই: হাঁ ডাক্তারবাবু, আছেন।

সন্দেহ নেই, ডাক্তার রায়চৌধুরী। পায়ে চটি গলিয়ে, গেঞ্জী গায়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল কিরণ।

—কী সৌভাগ্য। আসুন ডাক্তার রায়চৌধুরী, আসুন।

ডাক্তার রোগী দেখতে বেরিয়েছেন, অথবা রোগী দেখে ফিরছেন। পরণে শার্ট-ট্রাউজার, গলায় স্টেথিসকোপ। বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। কিরণ অন্যমনস্ক ছিল বলেই গাড়ির আওয়াজ শুনতে পায় নি।

—আরে আসব কি মশাই। ডাক্তার বারান্দায় উঠে পড়েছিলেন, বললেন, একটা মহাপাপ করলুম মনে হচ্ছে। লেখক মানুষ, নিশ্চয় সকালবেলা লিখতে বসেছিলেন, আমি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলুম।

—কিছু ভণ্ডুল করেন নি—একটুখানি মিথ্যে কথাই বলতে হল ভদ্রতার খাতিরে: দু-একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করছিলুম। তার জন্যে তাড়া নেই, কাল পরশু লিখলেও চলবে। বসুন—চা খান।

ডাক্তার ধপ করে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

—চা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না মশাই; আপনার ওই শম্ভু মহারাজটিকে আমি চিনি—ও যা চা করবে সে আমার জানা আছে। চা খাব আপনার নিজের বাড়িতে গিয়ে। আমারও বসবার জো নেই—মাইল আটেক দূরে এক ধনী চৌধুরীর বাড়িতে একটা কেস রয়েছে। আমি

কেশবিন্যাসে
আমাদের
ঐতিহ্য

'লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত এই প্রাচীন ভাস্কর্যটি ভারতীয় কেশবিন্যাসের একটি ঐতিহ্যময় সাক্ষ্য। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্য্যের।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারল চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল
সুরভিসম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯।

শুধু খবর নিতে এলুম, কেমন আছেন।

কিরণ হাসল : খুব ভালো আছি।

—খাবার-দাবার ঠিকমতো পাচ্ছেন? এখানে মশাই মাছটা বিশেষ মেলে না, হয় হাটবারে জোগাড় করতে হয়, নইলে এদিক ওদিক থেকে আনাতে হয়। দেখি, কাল কিছু আপনাকে পাঠাতে পারি কি না।

কিরণ বললে, ব্যস্ত হবেন না, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। একটা ডাল-তরকারী গোছের হলেই চলে যায়। তা ছাড়া শম্ভু ডিম আনে, মুরগীও এনেছিল।

—আজকাল যা দাম হয়েছে মশাই। ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : অথচ ক'বছর আগেও কী দিন এখানে ছিল। এক টাকায় এক ঝুড়ি মুরগী নামিয়ে দিয়ে যেত, দুধ ছিল বারো সের। হ্যাঁ, দুধটা ভালো পাচ্ছেন?

—দুধ আমি খাই না।

—খাবেন, খাবেন। জল-টল এরা এখনো একটু কম মেশায়। বেশ করে দুধ খান, কেস্ট মুক্ত মশাই, শরীর ভালো হয়ে যাবে। আর কোনো অসুবিধে হলেই আমাকে জানাবেন।

—জানাব, নিশ্চয় জানাব।

—আর মাঝে মাঝে যাবেন আমাদের ওদিকে। সন্ধ্যের পরেই সাধারণত আমি ফ্রী থাকি—বেশ ভালো করে আড্ডা দেওয়া যাবে। সেদিন তো সাহিত্যচর্চা কিছু হলই না।

—আচ্ছা, যাব দু'-একদিনের মধ্যেই। কিন্তু সত্যিই কি চা খাবেন না এক পেয়ালা?

বলতেই ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন, এই সর্বনাশ, সাড়ে ন'টা বাজল। না: মশাই, আজ আর চা খাওয়া চলল না, এখন আবার আট মাইল পাহাড়ে রাস্তা ঠ্যাঙাতে হবে আমাকে। আচ্ছা নমস্কার— বলে নেমে পড়েই ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আরে, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আজ চারটের পর আপনার সময় হবে?

—কেন বলুন তো?

—বাড়ির সবাই যাবে মহাকালের মন্দিরে বেড়াতে। চমৎকার জায়গাটি মশাই, পাহাড়ের ওপরে, বহু দিনের পুরোনো। এদের খুব বিশ্বাস, মানত করলে নাকি সর্বসিদ্ধিলাভ হয়। যাবেন দেখতে? মিলা বলছিল, গিন্নীও বলছিলেন—আপনি গেলে মনটা ভালো লাগে। যাবেন?

কিরণ চুপ করে রইল।

—কী, কাজ আছে?

—না, কাজ এমন কিছু নেই।

—তা হলে ঘুরে আসুন। ভালো লাগবে আপনার। আর আপনারা লেখক মানুষ—এই সব মন্দির টন্দির নিয়েই তো কী বলে ভারতের সংস্কৃতি —আপনাদের এ সব দেখা উচিত। যাচ্ছেন তা হলে? বেশ একটা পিক-নিকের মতোও হয়ে যাবে। আরে মশাই, চেয়ে এসেছেন কি শুধু বসে থাকবার জন্যে? দশটা জিনিষ ঘুরে দেখবেন —তবে তো?

কিরণ হাসল : ডক্টরস অ্যাড-ভাইস?

ডাক্তারও হাসলেন : হাঁ, ডক্টরস অ্যাডভাইস। আসছেন তা হলে?

একবার দ্বিধা করল কিরণ, তারপর বললে, আসব।

—ও-কে , ও-কে। ঠিক চারটেয় গাড়ি নিয়ে আসব আমরা, রেডি হয়ে থাকবেন, নমস্কার—ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

গাড়িটা স্টার্ট নিলে, এক মুঠো নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে, কৃষ্ণচূড়ার বীথির পাশ দিয়ে, শালবনের আড়ালে হারিয়ে গেল। কিরণ দাঁড়িয়ে রইল। কানে বাজতে লাগল একটি কথা : মিলা বলছিল—

শমিলা।

আর একবার কিরণ ভাবল, আমি একটা উপন্যাস লিখব। নস্টালজিক উপন্যাস ; তার নাম দেব—

(ক্রমশঃ)

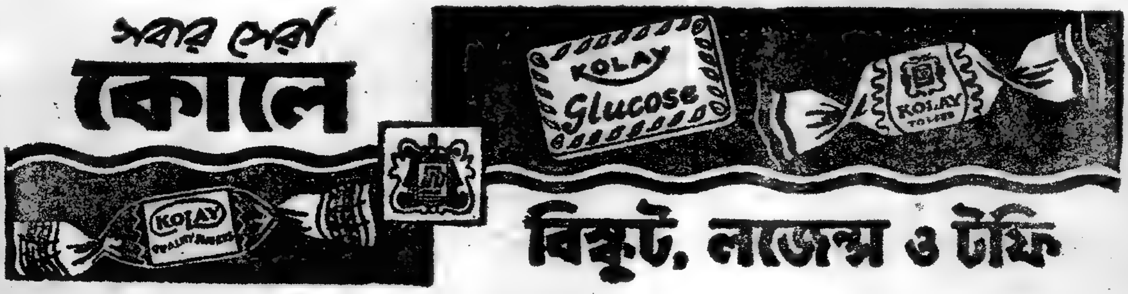

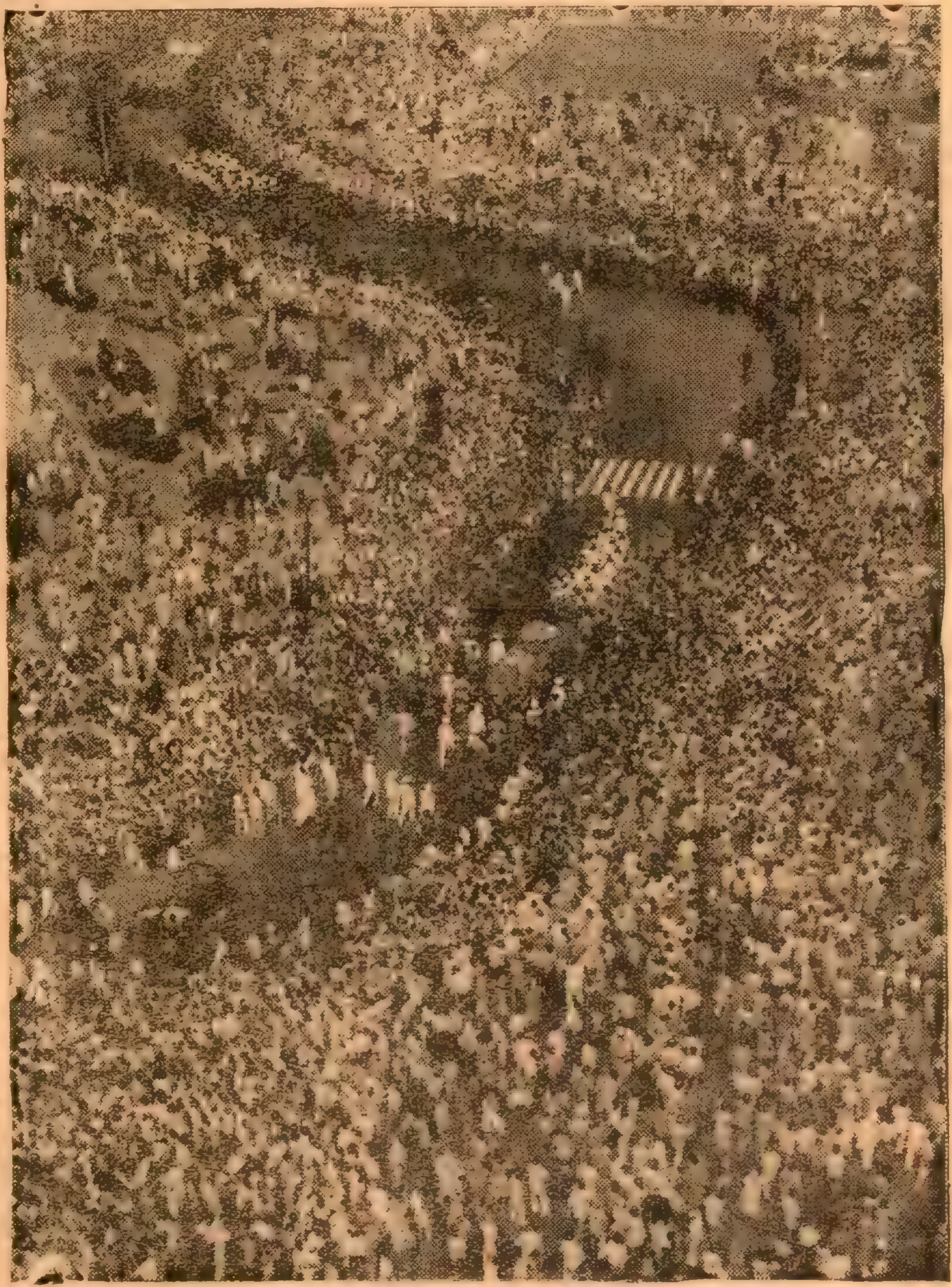

● শ্রীনেহরুর মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা

অবিস্মরণীয়

চরিত্রের দান

"জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী, অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্স-এর সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে তিনি মিথ্যাকে সহায় করেন নি। মিথ্যার উপাচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে-অর্ঘ্যে অসংকোচে স্বাকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূট-কৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড় দান।"

—রবীন্দ্রনাথ

৮ই মার্চ, ১৯৬৩

আমার উত্তরাধিকারী

"কয়েক বছর ধরেই আমি বলে আসছি এবং এখনও বলছি—রাজাজী নন, জওহরলাল হবে আমার উত্তরাধিকারী। সে বলে, সে আমার ভাষা বোঝে না, এবং সে নাকি এমন ভাষায় কথা বলে যা আমার অধিগম্য নয়। হতে পারে তা সত্য,—আবার নাও হতে পারে। কিন্তু দুটি হৃদয়ের মিলনে ভাষা কখনই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমি জানি, আমি যখন থাকব না তখন জওহরলাল আমার ভাষাই বলবে।"

—গান্ধী

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪২

আগামী পৃথিবীর কক্ষপথ

"গান্ধীর উত্তরাধিকারী এবং ভারতের জননায়ক হিসেবে আমরা, বিজ্ঞানপূজারী মানুষেরা, আজ পারমাণবিক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্যে জওহরলাল নেহরুর দিকে তাকিয়ে আছি। ভারতকে ঠাণ্ডা লড়াই এবং শক্তি-শিবির থেকে মুক্ত রেখে এবং দৃঢ়ভাবে শান্তির পথে পরিচালিত করে তিনি এই দায়িত্ব অর্জন করেছেন। ...একাল চরম বিশৃঙ্খলার কাল, নেহরু তাকে সারাই করার জন্যেই বোধ হয় একালে জন্মলাভ করেছেন। ...বিশ্ব আজ তার সঠিক কক্ষপথ থেকে চ্যুত। কিন্তু আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আবার এই পৃথিবী গান্ধী-নেহরুর যুগেই আপন কক্ষপথ ফিরে পাবে।"

—আইনস্টাইন

(নেহরুর ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে)

এশিয়ার লেনিন

"এশিয়ার লেনিনের সমতুল্য একমাত্র আপনি।"

—বার্নার্ড শ'

১২ই নভেম্বর, ১৯৪৮

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

"রাজনীতিক দিক থেকে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেতার মতই দেখেছি, এবং প্রায়ই তোমার পরামর্শও চেয়েছি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

২৮শে মার্চ, ১৯৩৯

বিশ্বপথিক জওহরলাল

বর্তমান বিশ্বের পরম বিস্ময়, মানবতার অতন্দ্র প্রহরী, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজাল থেকে মুক্তিকামী মানুষের আশা ও ভরসার অফুরন্ত উৎস, বিবদমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক শ্রীজওহরলাল নেহরুর কণ্ঠ আজ নীরব। এ জগতের পালা সাঙ্গ করে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অপমান-ভারে অবনত মানবাত্মার উদ্ধারে তাঁর সহায় হস্ত আর প্রসারিত হবে না। বিশ্বধ্বংসী আরেকটি মহাসমরের সম্ভাবনায় ভীত, শঙ্কিত মানুষ শুনতে পাবে না তাঁর অভয়বাণী।

আজ তাঁর বিয়োগব্যথায় ব্যথিত বিশ্বাত্মা। নিরবচ্ছিন্ন কর্মযজ্ঞের এমনি করে হঠাৎ ছেদ টেনে দিয়ে তিনি সরে যাবেন, আটমাস আগেও কেউ তা ভাবতে পারে নি। আকস্মিক আঘাতে আজ তাই বিশ্বের জনমানস বেদনামথি।

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিপদের কি কেটে গেছে। বৃহৎ দু'টি শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের বিপদ এখন আর নেই। প্রলয়ঙ্কর মহাসমরের উদ্বেগও নেই। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ, শক্তির লড়াই, রাজনীতিক তত্ত্বের বিতণ্ডাপ্রসূত বিদ্বেষ থেকে পৃথিবী এখনও মুক্ত নয়। খণ্ড প্রলয়ের তাই বিরতি ঘটে নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকাশে আবার দেখা দিয়েছে দুর্যোগের ঘনঘটা। বারুদের গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। লাওস, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন জুড়ে চলেছে অস্থিরতা।

এক সময়ে এদের বিপদের দিনে প্রধান অবলম্বন ছিল ভারত।

দিগন্দ্রলাল সেন

জওহরলালকে সাচ্চা জহররূপেই পেয়েছিলেন তাঁরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। হিরোসিমা ও নাগাসিকির ধ্বংসের সাথে সাথে অবসান ঘটেছে এশিয়ায় জাপানের নেতৃত্ব। ব্রহ্মদেশ থেকে সুরু করে একে একে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটি থেকে সৈন্য গুটিয়ে নিচ্ছে জাপান। সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ, বৃটিশ ও ফরাসী শক্তি হারানো অধিকার ফিরে পেতে ব্যস্ত। ভারত এগিয়ে চলেছে সার্বভৌম ক্ষমতালাভের পথে। নবজাগরণের শিহরণ সুরু হয়েছে এশিয়ার অবহেলিত জনতার মধ্যে। শ্রীনেহরু তখন দেখা দিয়েছিলেন এশিয়ার অন্তরপুরুষরূপে।

● লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথ ও কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রিগণের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

● ক্রুশ্চেভের সঙ্গে নেহরু

তাঁর নেতৃত্বে ভারত হয়ে ওঠে নতুন এশিয়ার প্রতিভূ। দীর্ঘকাল এই দেশগুলোর পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রীনেহরু ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। আপদকালের সৃষ্টি হতে না হতেই যুক্তের প্রধানমন্ত্রী থেকে সুরু করে দিওনদাদো ম্যাকাপাগল পর্যন্ত তাকাতেন দিল্লীর দিকে। আজ দিল্লীর গৌরব ম্লান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্তমান সঙ্কটের সমাধানে সেখান থেকে কোন আশার কথা শোনা যাবে। বাহুবলকে পরাভূত করার বিস্ময়কর যুক্তির অবতারণা যিনি করতে পারতেন তাঁর অভাবে তাই দেশজোড়া হাহাকার উঠেছে। শোক প্রকাশ করে ম্যাকাপাগল বলেছেন, নেহরুর মৃত্যুতে এশিয়া তার সর্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রনায়ককে হারালো।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস বলেছেন, কালের অন্যতম বিস্ময়কর পুরুষের জীবনের শেষ হল। কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে নেহরু যে-স্থান দখল করেছেন, কোন উত্তরাধিকারী সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

● ● ●

এশিয়ার বর্তমান অশান্তির ইন্ধন যাঁরা জোগাচ্ছেন চীন তাদের একজন। একদিকে চলেছে সাম্রাজ্যবাদের ভেল্কিবাজী কমিউনিজমের প্রসার প্রতিরোধের অজুহাতে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত দু'পক্ষকেই অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছেন তারা, অপর দিকে বিশুদ্ধ সাম্যবাদের নামাবলী পরে পেছন থেকে উস্কানী দিচ্ছে নয়াচীন। এটি শক্তির চাপে পড়ে এশিয়াবাসী যখন ত্রাহি মধুসূদন বলে চীৎকার করে উঠছে তখন দ্য গলের নয়া নিরপেক্ষতাবাদের চালে একেবারে ভরাডুবি হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে।

শক্তির গর্বে গর্বিত চীনের আস্ফালন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ভারতের উপর আক্রমণের পর বিশ্বের দরবারে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল। কলঙ্কের কালিমা মুছে ফেলার জন্য কূটনৈতিক দাবাখেলায় নামতেও সে কসুর কম করে নি। আরব জগৎকে দাবার চালে ফেলতে পারলেই সে এবারের মত কিস্তিমাৎ করতে পারতো। ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আরব ও আফ্রিকার মনোরঞ্জন করা সম্ভব নয়। তাই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে ক্ষুব্ধ মনে সফর-সূচী সংক্ষেপ করে মানে মানে বিদায় নিয়ে ফিরতে হয়েছে।

এই নয়াচীনকে একদিন চলতে হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর

● নেহরু, জনসন ও কেনেডি

কাঁধে ভর দিয়ে। চীনকে মর্যাদার আসনে বসাবার, রাষ্ট্রপুঞ্জে তার স্বীকৃতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন শ্রীনেহরু। বান্দুং সম্মেলনে তাঁর হাত ধরেই চৌ-এন-লাই সম্মানিত স্থান পেয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির ঝগড়ায় স্বীকৃত হয় চীনের দাবী।

এশিয়ার ব্যাপারে চীনের প্রভাবের স্বীকৃতি ভারতই প্রথম দিয়েছে। অথচ সেই ভারতের বুকে বিশ্বাসঘাতকের মত আঘাত হানতে চীন একটুও দ্বিধা করে নি। এখনও তার সৈন্য সদম্ভে হিমালয়ের কোলে ভারতীয় ভূখণ্ডে বিরাজ করছে।

শান্তি, সাম্য ও আপোষ-নিষ্পত্তিতে অবিচল বিশ্বাসী শ্রীনেহরু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার পথের সন্ধানে ছিলেন। তাই তিনি শেখ আবদুল্লাকে পাঠিয়েছিলেন পাকিস্তানে শান্তির দূত হিসেবে। তাঁর শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে চীন সৈন্যঘাঁটি সরিয়ে নিলে তার সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন।

নয়াচীনের প্রতিটি পদক্ষেপে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। লেনিনের একনিষ্ঠ দাবীদার মাও-সে-তুং ও তাঁর অনুগামীদের ঠেকাতে পারে গণতান্ত্রিক ভারত। সে কাজে আর গড়িমসি করলে গণতন্ত্রের সমাধি অচিরেই এশিয়ার বুকে রচিত হবে এই কথাটি শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বুঝেছিল। মারমুখী চীনের মোকাবিলার জন্যই শ্রীওয়াই বি চ্যবন গিয়েছিলেন আমেরিকাতে। শুধু, আমেরিকা কেন, সোভিয়েট রাশিয়াও এই বিপদের ঝুঁকি বুঝতে পেরে আগেভাগেই এগিয়ে এসেছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্ভার নিয়ে।

চৌ-এন-লাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় সব চাইতে বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন শ্রীনেহরু। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রীও মর্মাহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। স্বীকার করেছেন তাঁর এক সময়ের পথদ্রষ্টার পঞ্চশীলের নীতি নতুন করে। বলেছেন, ভারত ও চীনের অবাঞ্ছিত বৈষম্য ক্ষণস্থায়ী।

চীনের দোসর পাকিস্তান। ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের সমৃদ্ধির জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতই জওহরলাল আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতকে বাঁচতে হলে, বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে গেলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন মধুর সম্পর্ক। তা' না করতে পারলে ভারত কোনদিন তার বিশ্বাসের বিজয়কেতন ওড়াতে পারবে না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হৃদ্যতাই দেশের পররাষ্ট্রনীতির বনিয়াদ গড়ে তোলে। এই নীতির অনুসরণে ত্যাগস্বীকারও কম করতে হয় নি। ধর্মান্ধ পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক জিগীর, নয়া জমানা পত্তনের নামে নয়াচীনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার তোড়জোড়—এশিয়ার দণ্ডমুণ্ডের মালিকানালাভের জন্য চীনের রাষ্ট্রনায়কদের প্রস্তুতিপর্ব এবং সর্বোপরি বাইরের চাপে তার সে আশার পরিপূর্ণ রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর এই মহান প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তাই তাঁর পরলোক গমনের সংবাদে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

ঢাকা শহর বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল—স্তব্ধ হয়েছিল তার জীবন-স্পন্দন।

* * *

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতই ধীরে ধীরে স্বাধিকারের পত্তন হতে থাকে আরব ও আফ্রিকার দেশগুলোতে। এদের কাছে জওহরলাল প্রতিভাত হন অন্তরপুরুষরূপে। আরব জাতি এখনও ক্ষুব্ধ। সাম্রাজ্যবাদের বিলীয়মান শক্তি তার আর্থিক সাম্রাজ্য রক্ষার আকুল আগ্রহে [illegible], এডেনে ও সাইপ্রাসের তীর পাশের ভূমধ্য সাগরের জল ঘোলা করে তুলেছে। ভারতের পক্ষ থেকে আরবদের সমর্থনের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এ্যালেক হিউম। বন্ধুত্বের যূপ-কাষ্ঠে ভারত কখনও ন্যায় ও সত্যকে বলি দেয় নি। কূট কৌশলের পথে ফললাভের আশায় আদর্শের বিসর্জন শ্রীনেহরু কোনদিন দেন নি। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদে তাই সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় নি। আরব-বিশ্ব, ঘানা, কংগো, ইথিওপিয়া প্রভৃতি আফ্রিকার দেশগুলোও আজ তাই বেদনাপীড়িত। ঘানার রাষ্ট্রপতি এনক্রুমা শোক-বার্তায় বলেছেন, নেহরুর মৃত্যুতে বিশ্ব একজন নেতা হারালো।

* * *

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অনির্বাণ সংগ্রাম সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাদের একান্ত আপনার, ধনতন্ত্রের তিনি বিরোধী হলেও ধনিক-গোষ্ঠীরও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সহ-অবস্থানের নীতিতে, পঞ্চশীলের মন্ত্রে দীক্ষিত পরমতসহিষ্ণুতায় আস্থাভাজন ভারতের অন্তরাত্মার বাণীর তিনি ছিলেন ধারক ও বাহক। তাই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি বিশ্ব-নেতা। কমনওয়েলথের সর্বজন-মান্য এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য যুদ্ধবর্জিত বিশ্ব গঠনের আবেদন এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ পড়েছিলেন বিমর্ষ হয়ে। প্রতিটি দেশের সংবাদপত্রে তাঁর অভাবজনিত বিশ্বনেতৃত্বে শূন্যতার প্রশ্নও উঠেছে।

বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক, আণবিক অস্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের নেতা লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে পৃথিবীকে ভয়াবহ পরিণতি থেকে শ্রীনেহরু একাধিকবার রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, শ্রীনেহরুর উদ্ভাবিত জোটনিরপেক্ষ নীতিই বারে বারে যুদ্ধ বন্ধ করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি-ধ্বংস থেকে উদ্ধার পেতে-না-পেতেই বেজে উঠেছিল রণদামামা। দম্ভ ও অহঙ্কারের সে কি হুঙ্কার।

একদিকে ডালেসের প্রস্তুতি-পর্ব ও কূট কৌশলের পরিবেষ্টন সৃষ্টি, অপর দিকে অর্থনৈতিক শক্তির পরিচয় নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মম্ভরিতা। দুই শক্তি দাঁড়িয়েছে

● শ্রীমতী জ্যাকলিন কেনেডি, শ্রীনেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

নেহরু ও নেপালের রাজা মহেন্দ্র

এসে মুখোমুখি। আণবিক বোমার বিস্ফোরণে সাগরের জলে ও সাইবেরিয়ার অঞ্চলে থরহরি কম্প লেগেই আছে। ফ্রান্স ও বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী করার দুরভিলাষে রণদামামা বাজিয়ে চলেছে। অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থিক যোগান দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অকাতরে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করণে তাঁর অসম্মতি। স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে দুটি শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে। বিশ্ব রাষ্ট্রসংস্থার উপস্থিতি সত্ত্বেও যৌথ নিরাপত্তার তাগিদ এক পক্ষ বোধ করে গঠন করেছে ন্যাটো, সিয়াটো যুদ্ধ জোট। আপন গোষ্ঠীকে একত্র করে পাল্টা রাশিয়া করেছে ওয়ারশ চুক্তি। প্রলয়ের গুরুগুরু ধ্বনিতে কম্পিত হয়ে উঠেছে মানব হৃদয়। মানবজাতির আত্মবিলুপ্তির এই আশঙ্কার দিনে ভারত তাঁর প্রিয় সন্তান শ্রীনেহরুকে দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে পাঠিয়েছিলেন শান্তিতে আত্মবিস্তারের মহান বাণী। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীও এই বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। বিশ্বজোড়া মানবের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা চিরস্থায়ী হতে পারে না। ভারত বিশ্বাস করে যুগে যুগে এক-একজন পুরুষ এসে ঘন অন্ধকার থেকে হাত ধরে নিয়ে চলে পতিত, ঘৃণিত, অপমানিত মানুষকে আলোকের পথে। শ্রীনেহরু একটি যুগের একক মানুষ। সাধারণ মানুষ হয়েও তিনি অসাধারণ। তাঁর এই মহত্ত্ব বুঝতে হলে ভগবান বুদ্ধের পঞ্চশীল ও দশশীল মূলসূত্র বোঝা যেমন দরকার তেমনি কোরিয়ার রণাঙ্গন, ইন্দোচীন ও আফ্রিকার রণাঙ্গনে ভারতের ভূমিকা ; কোরিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম, কংগো থেকে সুরু করে সাইপ্রাসে বর্তমানে ভারতের গুরুদায়িত্ব পালন বোঝা দরকার। বান্দুং শহরের ত্রিশটি দেশ শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে মিলে যে পঞ্চশীলের প্রবর্তন করেছিল সেখান থেকে বেলগ্রেড সম্মেলন এবং সেদিনের জাকার্তা সম্মেলন পর্যন্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন। বান্দুং সম্মেলনে সৌহার্দ্যের রাখিবন্ধন পরে সুরু হয় এশিয়া-আফ্রিকার গণমনের জয়যাত্রা। বিশ্বের শক্তিধর যাঁরা তাঁরা বান্দুং সম্মেলনের সাফল্যে বিস্ময়াবিষ্টই হয়ে পড়েছিলেন। সুয়েজ সঙ্কটের সময়ও তিনি অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে দিনে তাঁর পরম সহায় ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক জন এফ কেনেডি।

বেলগ্রেড সম্মেলনের সময় বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল। বেলগ্রেডে মিলিত জোটনিরপেক্ষ শক্তিগুলির শান্তির প্রস্তাব বিফল হয় নি। প্রস্তাব নিয়ে শ্রীনেহরু প্রথম রাশিয়া এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করে সাফল্যই অর্জন করেছিলেন। বিবদমান শক্তিগোষ্ঠী আজ একবাক্যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। জাতিতে জাতিতে শঙ্কা, সঙ্কোচ ও ঈর্ষা যখন প্রকট হয়ে ওঠে, তখন তাদের কাছে টেনে এনে মিলনগাথা শোনাবার প্রয়াসেরও প্রয়োজন রয়েছে। শ্রীনেহরুর জোটনিরপেক্ষ নীতি যে-কাজের পক্ষে অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর এই নীতিই বারবার বিশ্বকে রক্ষা করেছে। তাই যমুনাতীরে তাঁর শেষযাত্রার দিনে ভারতের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হিউম, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন, মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্ক, ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী লুই জোকাস, রুশ উপ-প্রধানমন্ত্রী কোজিগিন, শ্রীমতী বন্দরনায়েক প্রমুখ বিশ্বের নেতৃবৃন্দ প্রার্থনা জানিয়েছেন, নেহরু অমর রহে।

চলচ্চিত্র ও নাট্যানুরাগী নেহরু

সুজন

চলচ্চিত্র ও নাট্যানুরাগী নেহরু

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে ভারতের ক্ষতি অপূরণীয়। চলচ্চিত্র শিল্পও একজন পৃষ্ঠপোষক হারালো। চলচ্চিত্র সমিতিগুলি এবং প্রগতিশীল চিত্র-প্রযোজকরা হারালেন একজন অভিভাবক। সঙ্গীত-নাটক আকাডেমি, চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ফিল্ম ইনষ্টিটিউট গঠন, ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, চলচ্চিত্র উৎসব এবং বিদেশের প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠাবার ব্যাপারে নেহরুর উৎসাহ ছিল অসীম। সেই দৃশ্যগুলি এখনো আমাদের চোখের সামনে ভাসছে,—ভারতের অভিনেতা - অভিনেত্রীদের মধ্যে আলাপরত নেহরু, বিদেশী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে হাস্যোৎফুল্ল নেহরু, জর্জিয়ার নর্তকীদের মধ্যে জর্জিয় পোষাকে নেহরু ইত্যাদি। ভারতের চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক বিকাশে নেহরু ছিলেন উৎসাহদাতা।

কয়েক বছর আগে প্রথম পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে 'এ্যাসেস এণ্ড ডায়মণ্ড' ছবিটির ছাড়পত্র দিতে সেন্সার বোর্ড অস্বীকার করে। সিনেক্লাবের সভাপতি এ বিষয়ে নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ছবিটি দেখেন এবং সেন্সার বোর্ডকে উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ছাড়পত্র দেবার কথা পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন। নেহরুর হস্তক্ষেপে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। আমার এক বন্ধু একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। ছবিটি ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্যলাভ না করলেও ছবির বক্তব্য ছিল ভারতীয় সংহতির পক্ষে উৎসাহজনক। ছবিটি বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনায় প্রশংসালাভ করেছিল। ছবিটির ব্যবসায়িক ব্যর্থতার জন্য আমার বন্ধু তখন প্রায় লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত। ছবিটির বক্তব্য এবং ব্যবসায়িক ব্যর্থতা সম্পর্কে নেহরুকে জানিয়ে তাঁকে ছবিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। সেই সঙ্গে ছবির ব্যবসায়িক ব্যর্থতার ফলে প্রযোজকের চরম দুরবস্থার কথাও জানান হয়। নেহরু বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে সম্পূর্ণ ছবিটি দেখেন। তারপরে বৈদেশিক মন্ত্রী-দপ্তর

মেকী সভ্যতার মুখোস ছেঁড়া কাহিনী···।

বসুশ্রী * বীণা * লোটাস * সুরশ্রী
(শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ·······)
আলোছায়া * অজন্তা * নেত্র * জ্যোতি * রূপালী * শ্রীমা ও অন্যত্র

'পথের পাঁচালী'র দুর্গার সঙ্গে শ্রীনেহরু

বিদেশে প্রদর্শনের জন্য ছবির কয়েকটি প্রিণ্ট কিনে নেয়। কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রও প্রিণ্ট ক্রয় করে। নেহরুর সহানুভূতিতে প্রযোজক ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হয়। সত্যজিৎ রায় আজ বিশ্ববিখ্যাত। এই পরিচালকের প্রতি নেহরুর গভীর সহানুভূতি ছিল। সত্যজিৎ রায়ের ছবি তিনি অসীম আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন এবং শ্রীরায় ও খাজা আহমদ আব্বাসের সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

নেহরুকে আমরা বহু সংবাদ-চিত্রে দেখেছি। কিন্তু শিশুদের 'হাম পঞ্ছী এক ডালকে' ছবিতে তাকে একটি চরিত্রে দেখা গেছে। অবশ্য চরিত্রটি তাঁরই অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর।

ভারতীয় নাটক সম্পর্কেও তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা ছিল। এই চিন্তা তিনি 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'য় লিখে গেছেন।

তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালের ১৭ বছর চলচ্চিত্রকর্মীরা বিশেষ করে প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও প্রযোজকরা যখন বিপদে পড়েছেন তখন নেহরুর শরণাপন্ন হয়েছেন। নেহরু ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র ও নাট্য প্রযোজকদের প্রগতিশীল অংশের বন্ধু। ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প ও নাট্যমঞ্চ বাস্তবিকই আজ একজন বন্ধু ও উৎসাহদাতাকে হারিয়েছে।

মহাজাতি সদনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীনেহরু

নেহরুর চিঠি

এলাহাবাদ
এপ্রিল : ১৭, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় বাপুজী,

সুভাষের সঙ্গে আপনার যে-সব পত্র-বিনিময় হয়েছে তার সমুদায় প্রতিলিপি প্যারেলালজী আমায় পাঠাচ্ছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই পরিস্থিতি এখন একটি অচলাবস্থায় পৌঁছেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটবে কেমন করে বুঝতে পারছি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি নিজে দুটি পক্ষের কোনটির সঙ্গেই পুরোপুরি একমত নই। সেজন্যেই আমি চেয়েছিলাম চুপ করে থাকতে। চেয়েছিলাম কাউকে কিছু না-লিখতে এবং না-বলতে। কিন্তু এমন অসহায় ভাবে ভেসে চলাটাও কিছু তো নয়। সমস্যাগুলি জরুরী এবং ফলাফল, ভেবে দেখলে, দুঃখকর।

আপনি যদি খুব বড় রকমের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহলে যে কোনদিনই আমরা এ-অবস্থা অতিক্রম করতে পারব বলে আমার ত মনে হয় না। আপনাকেই নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ঘটনাস্রোতকে নীরবে দেখে যাওয়া ঠিক হবে না। সুভাষের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মন সংবেদনশীল, বন্ধুতাপূর্ণ মনোভাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যদি মনস্থির করে তা করতে পারেন তাহলে এই অচলাবস্থার অবসান আপনি ঘটাতে পারবেন।

রাজকোটের গুরুত্ব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয়, কংগ্রেসের সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে কেন্দ্র করেই আপনার বর্তমান কার্যক্রম স্থির করা উচিত। আমি আশা করি আমার এই কথায় আপনি সায় দেবেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব আপনাকে যে, কিছুকালের জন্য রাজকোটের কাজ মুলতুবী রেখে কংগ্রেসের দিকেই আপনি মনোযোগ দিন। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে আপনার অনুপস্থিতির সম্ভাবনাই উদ্বেগজনক। তার সরল অর্থ হচ্ছে যে, অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে এবং সমগ্র কংগ্রেস টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পূর্বেই এর একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া দরকার। বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সমিতির হাতে দিলে আরও জট পড়া ছাড়া কিছু হবে না। আমি চাই সুভাষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটুক। সরাসরি সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ছাড়াও সাধারণভাবে এই সাক্ষাৎকারের বহু সুফল দেখা দেবেই।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ফলে যে বিলম্ব ঘটেছে তা ভাল নয়। কিন্তু শুধু বিবাদ করবার জন্যেই যদি আমরা মিলিত হই তাহলে সেটা হবে আরও খারাপ। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন দু-এক সপ্তাহ স্থগিত রাখলে (এমনিতে ব্যাপারটা যদিও আমি অপছন্দ করি) যদি আপনার সুবিধে হয় এবং মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সহায়ক হয় তাহলে স্থগিত রাখা চলতে পারে।

আমি এইমাত্র সুভাষের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। সে অনুরোধ করেছে তার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করতে। কিন্তু আমার ত মনে হয় না যে, আমাদের আলাপ-আলোচনায় কোন সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যাবে। কোন পক্ষের মুখপাত্র ত নই আমি, কাজেই মীমাংসার সূত্র আমার হাতে নেই। তবু তাকে 'না' বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দু-এক দিনের মধ্যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব বলে স্থির করেছি। তাকে যে আমি কি বলব সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই আমার মনে। এখনকার মত আমার এই মনে হচ্ছে যে আমি তাকে একটি পরামর্শই দিতে পারি। তা হোল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তাব করার ভারটি সে যেন সম্পূর্ণভাবে আপনার উপর ছেড়ে দেন। সে অবশ্য তার কিছু কিছু মতামত আপনাকে জানাতে পারে। কিন্তু তা পারবে একথা স্পষ্টভাবে জেনে নিয়ে যে, তা গ্রহণ অথবা বর্জনের পূর্ণ অধিকার আপনার থাকবে। আর কার্যক্রম নির্ধারিত হবে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী অনুসারে, যার অন্যতর অর্থ, অতীত কার্যক্রমের সঙ্গে কোন বিচ্ছেদ ঘটান হবে না।

এখন সুভাষ যদি এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তাহলে দায়িত্ব আপনার এবং আপনি তা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। আমি এখনও মনে করি (দিল্লীতেও একথাই ভেবেছিলাম আমি) যে সুভাষকে সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সঙ্গত। তাকে অপসারণের প্রয়াস আমার বরাবরই মনে হয়েছে অতি মাত্রায় ভ্রান্তপথ। আর ওয়ার্কিং কমিটির কথা যদি বলা হয়, তার ভার আপনার। একই রকমের মতাবলম্বীদের নিয়ে এই কমিটি গড়ে তোলার আদর্শটি যদি সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তেমন ভাবে গড়া কমিটি শান্তি অথবা সফলতা কোনোটাই অর্জন করতে পারবেন বলে ত মনে হয় না। অবশ্য মতের ব্যাপারে কোন রকমের ঐক্য নিশ্চয়ই থাকবে। তা নাহলে আমরা ত কাজ করতেই পারব না। ওয়ার্কিং কমিটিতে কয়েকজন ব্যক্তির থাকা বা না-থাকা নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে কোন বড় রকমের পরিবর্তন সম্ভব বলে আমি মনে করি না। অবশ্য কোন ব্যক্তির আন্তরিকতা বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কেউ যদি সন্দিহান হন সেকথা আলাদা। কিন্তু এই

মতৈক্যের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যকে ধরলে চলবে না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন যদি তাঁদের কর্মক্ষেত্র অভিন্ন হয় তা হলেই হল। মোট কথা এই কথাটা আমাদের কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, একমতাবলম্বী একটি ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করলেই সারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে একমতাবলম্বী হয়ে উঠবে না। শেষোক্ত ব্যাপারটি তখনই সম্ভব যখন একমতাবলম্বী শব্দটি আমরা ব্যাপক ও উদার অর্থে গ্রহণ করব।

বিগত কয়েক মাস যাবৎ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে আপনি বিচলিত হয়েছেন এবং দুর্নীতি ইত্যাদির নিন্দা করেছেন। আমার ত মনে হয় মতনির্বিশেষে প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কংগ্রেসকর্মী এ সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। কংগ্রেসের বাইরে নানা রকমের উপাদান কাজ করে চলেছে, এদের উপর আমার বরাবরই নজর আছে এবং আমি স্বীকার করছি যে নানা ঘটনার গতি এবং নতুন নতুন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি উদ্বেগ পোষণ করছি। আমি শুধু সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের কথাই বলছি না। আরও অনেক গভীরতর ও দূরপ্রসারী শক্তি কাজ করে চলেছে। যদি এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস দুর্বল ও বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় তার ফল মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করে যেতেই হবে। ঐক্য অটুট রাখতেই হবে। তাই, আপনাকে আমার এই অনুরোধ যে আপনি মনস্থির করে এই ব্যাপারটি মিটিয়ে দিন, যদিও সমাধানের সে-পন্থায় আমরা সকলেই খুশি হতে নাও পারি। একমাত্র এভাবেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলতে পারি। না হলে আমরা অনড় হয়ে পড়ে থাকব।

নিজের সম্পর্কে একটি কথা। আমার দুর্ভাগ্য আমি বড় বেশি রকমের ব্যক্তিবাদী। আমি লক্ষ্য করছিলাম ইদানীং ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকগুলিতে আমি স্বস্তিবোধ করি নি, সম্ভবত সহকর্মীদেরও বিরক্তিভাজন হয়েছি। কিন্তু কোন পক্ষে সদিচ্ছার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাই আমার মনে হয়েছে এতে থাকা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আরও গুরুতর কিছু কারণ বিদ্যমান থাকায় আমার মনে হয়েছে যে সুভাষ যদি অন্য রকমের কমিটী গড়ে তাতে থাকা আমার পক্ষে আরও শক্ত হবে। আমার এই ধারণা ও অনুভূতি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু এখন যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানকল্পে কমিটিতে আমার উপস্থিতি যদি সহায়ক হয় বলে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে কাজ করতে অসম্মত হতে পারি না। এমনতর সম্ভাবনা সম্পর্কে উৎফুল্ল নই আমি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি তেমন দায়িত্ব দেওয়াই হয় আমায়—তা আমি এড়িয়ে যেতে পারি না।

মহাত্মা গান্ধী
রাজকোট

স্নেহবদ্ধ
জওহরলাল

(উপরিউক্ত চিঠিটি মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত)

১২ এপ্রিল, ১৯৪২
নিউ দিল্লী

প্রিয় মিঃ প্রেসিডেন্ট,

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং যুদ্ধের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনি বিশেষ আগ্রহান্বিত জানি বলেই ভরসা করে আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এবং ভারতবাসীর মধ্যে একটা মীমাংসার ব্যাপারে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য বিফল হয়েছে। এতে আমাদের মতো আপনিও নিশ্চয় দুঃখিত হয়েছেন। আপনি ত জানেন, আমরা অনেক বছর ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে আসছি। কিন্তু আজ এই সঙ্কটকালে আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবল চেয়েছিলুম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটা প্রকৃত জাতীয় প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ আমাদের দেওয়া হোক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এর সঠিক পন্থা হল, আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে তা রক্ষার ভার আমাদের হাতেই দেওয়া। তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণমন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে; যথাসময়ে তা আবার এমনি প্রতিরোধের প্রচণ্ড বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে যে, কোনো আক্রমণকারীই তার সামনে দাঁড়াতে সাহস করবে না।

আমরা যা কিছু দাবী করেছি এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে যা আবশ্যক মনে করেছি তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি বলে শেষ পর্যন্ত মাত্র আমরা দাবী করেছিলাম যে, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়ে আমাদের প্রকৃত জাতীয় গবর্নমেণ্ট গঠন করতে দেওয়া হোক; আমরাই জনসাধারণকে নিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি। দুঃখের বিষয়, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট তা-ও বিবেচনার যোগ্য বা কাম্য মনে করেন নি। আলোচনা আপাতত ফেঁসে গিয়েছে। সবিস্তারে আলাপ-আলোচনার সময় কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আপনার প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই নিশ্চয় সব খবর পেয়েছেন। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, আমাদের নিজ দেশ রক্ষার ব্যাপারে তো বটেই, তাছাড়া পৃথিবীময় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে সহযোগিতা করতে আমরা খুবই ব্যগ্র এবং উৎসুক ছিলাম, এখনও আছি। অথচ আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশ রক্ষার ব্যাপার যেভাবে করতে চাই বা যে প্রণালী অবলম্বন করতে চাই, তা করতে পারি না। আমাদের দেশ রক্ষার জন্যে আমরা সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত, যথাশক্তি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আক্রমণ-

কারীকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে কোনো ক্ষতি, কোনো ত্যাগই বড় বলে গণ্য করতুম না।

বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এ যাবৎ যে নীতি অনুসরণ করে আসছিল তার ফলে আমাদের দেশে শিল্পোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে; তাই আমাদের সম্বল কম। আমরা নিরস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধ করবার প্রচুর সম্ভাব্য বস্তু আমাদের আছে। চীন দেশের মতো আমাদের জনসংখ্যা বিপুল, দেশ বিশাল—এ সমস্তই আমাদের সমর, প্রচেষ্টার সহায়ক হত। মূলধন ও শ্রমিকের সহায়তায় আমাদের উৎপাদন শক্তি খুব বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতা যদি জনগণের হাতে থাকে তবেই এই সঙ্গতি কাজে লাগানো যেতে পারে। যে গবর্নমেণ্ট জনগণ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, তা সর্বসাধারণের সমর্থন পেতে পারে না। অথচ ঐ সমর্থনই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। বিদেশী গবর্নমেণ্টকে লোকে ভাল চক্ষে দেখে না, তার উপর আস্থা রাখে না, সমর্থন করা তো দূরের কথা।

আমরা নানা বিপদাশঙ্কার মধ্যে আছি, বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা আছে এবং তার দরুণ বিভীষিকার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন জাপানী আক্রমণের ফলে চীনে হয়েছে; সুতরাং আমাদের অদূর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য বিফল হওয়াতে অবস্থাটা আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে; জনসাধারণের উপরেও তার প্রতিক্রিয়া ভাল হয় নি। যা হোক, যত দুর্বিপাকই আসুক না কেন, আমরা সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হব এবং বাধা দেব। অবশ্য আমাদের ইচ্ছামতো চলবার যো নেই, ভারতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপও আমরা সমর্থন করতে পারি না; তবু জাপানীদের কিংবা আর কারো আক্রমণের কাছেই আমরা নতি স্বীকার করব না। এতকাল ধরে আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে আসছি, লড়াই করছি পুরোনো আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে; সুতরাং আজ কোনো নতুন আক্রমণকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বরং ধ্বংস হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করব।

যে সকল দেশ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে লড়াই করছে, তাদের প্রতিই আমাদের সহানুভূতি, একথা অনেকবার বলেছি। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হত তাহলে ঐ সহানুভূতি ও সমর্থন অনেক বেশি জোরালো হত এবং কার্যত প্রকাশ পেত।

আপনার বিরাট দেশকে, যে দেশের আপনি সম্মানিত নেতা, সফলতার জন্য শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি। স্বাধীনতাকামী পৃথিবীর বহু দেশ ও জাতি আপনার দিকে নেতৃত্বের জন্য তাকিয়ে আছে। আপনি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট
ওয়াশিংটন — আপনার একান্ত
ইউ, এস, এ — জওহরলাল নেহরু

: প্রকাশিত হলো ভক্তিরসের প্লাবনসিক্ত গ্রন্থ :

রবীন্দ্রনাথ রায়ের
কৈবল্যনাথের কথা
আদর্শ ও উপদেশগুলির
সরল ভাষায় বর্ণনা

শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে ৫·০০
শ্রীশ্রীরামঠাকুর সকাশে ২·৫০

প্রলয় সেনের
যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ ২·০০ — যুগমাতা সারদামণি ২·০০
যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ২·০০ — যুগভগিনী নিবেদিতা ২·০০
তালপাতার বাঁশি ২·০০

বিদেহী আত্মা ৩·০০ — শুধাংশুবিকাশ দেবশর্মা — অবিশ্বাস্য ৩·০০

দাক্ষিণায়ন ২·৫০ — অরুণ সরকার — প্রাচীন পল্লীর প্রেমকথা ২·৫০

অতীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত
আগ্নদূতের সপ্তক ৩·০০
সাতটী বিভিন্ন রস ও আঙ্গিকের মনোরম অভিনেয় সাতটী একাঙ্ক নাটিক।

গদাধর দাসের
স্বপ্নশর্বরী ২·৫০
নবীন লেখকের ইদানিংকালের অভিনব অনন্যসাধারণ যুগসচেতন উপন্যাস।

চিরন্তন	—	সুকুমার সেনগুপ্ত	উপন্যাস	২·০০
সামন্তিনী	—	বিপন্নপালক বসু	উপন্যাস	২·০০
আবাহ সংগীত	—	নীরদ ভট্টাচার্য	উপন্যাস	২·৫০
কৃষ্ণকলি	—	সুকুমার সেনগুপ্ত	কাব্যগ্রন্থ	২·০০
মুক্তির উপায়	—	সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার	ধর্মগ্রন্থ	২·০০

রবীন্দ্রনাথ রায়ের
লগ বুক ২·৫০

বিমলেন্দু চক্রবর্তীর
পুনশ্চ ২·০০ জিজ্ঞাসা ৩·০০

সকল প্রকার রচনা প্রকাশের জন্য যোগাযোগ করুন।
॥ লেখক মহল ॥

* প্রতিমা পুস্তক *
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪

শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলি-৯
স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, উপহারের যাবতীয় বই ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

সমুদ্র-নায়ক নেহরু

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

দিনে দিনে,
দিনে দিনে রূপা-রূপান্তরের প্রদীপ জ্বলবে বার বার
অতীন্দ্রিয়তার আসনে অভিষেক ঘটবে রূপবতী পৃথিবীর ;
চিরন্তনের অনির্বেদ পরিচ্ছেদে
সেদিন চরণ রাখবে ভারতবর্ষেরই নির্বাণী প্রতিমা।
তখন বাউল-বিহঙ্গের অভিরাম পক্ষবিস্তারে
নানা মুদ্রার চিত্রার্পণ ঘটাবে নিশান্তের লাল,
মধ্যাহ্নের দুরন্ত হলুদ এবং গোধূলির বরণীয় ধূসর।
রঙে রঙে শাড়ি বদলাবে আকাশ—
তার আঁচল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাস হবে অফুরন্ত সংগীত,
ক্ষিতিজের অনবসাদের ঝুলনযাত্রায়
আত্মোৎসর্গের গৌরব নিয়ে আসবে এক-একটি ঋতু।
অতএব নিক্রান্তের শব চিতায় তুলে
মানুষ সেদিন নবীন দিগন্তে ললাট পেতে বলবে সুন্দর
সুন্দর, সুন্দর এই ভারতবর্ষ আমার।
কিন্তু সব সুন্দর যাঁর বিমল সত্তায় স্নানার্থী হয়ে
আরও সুন্দর, আরও সম্পূর্ণ হতে পারতো,
যাঁর সানন্দ স্বীকৃতি পেলেই
সার্থক হয়ে উঠতো সমস্ত রমণীয়তার আত্ম-প্রতিষ্ঠা—
সেদিন তিনিই কেবল থাকবেন না।
সেদিনের মানচিত্র তাঁর উত্তরকালের হাতে তুলে দিয়ে
আজ সুদূরের অনস্তিত্বে হারিয়ে গেলেন তিনি।

অরণ্যে পথ কেটে, পাহাড়কে পিছিয়ে দিয়ে,
এবং চড়াই-উৎরাই পথেও সাম্যের জয় ঘোষণা ক'রে
চারদিকের বে-জটিল ধারাকে তিনি ডেকে এনেছেন,
আজ তাদেরই সম্মেলনে প্রণয়ন ঘটেছে সমুদ্রের।
কিন্তু সমস্ত আজ পতিহারা,
অজস্র ঢেউ তার বিপুল দ্বন্দ্বে আবদ্ধ।
কারণ, যিনি তার হাত ধ'রে
তাকে সার্থকতার তীর্থে পৌঁছে দেবেন ব'লে কথা ছিল,
আজ তিনিই হঠাৎ তার পাশ থেকে স'রে গেলেন।

আজ থেকে সেই সমুদ্রের এপারে-ওপারে দাঁড়িয়ে
বৃথাই প্রতীক্ষা করবে শিশুর দল ;
তাদের অতি কাছের খেলার সঙ্গী, অতি প্রাণের প্রিয়বান্ধব
হঠাৎ হাসির উচ্ছ্বাস তুলে
আর কোনোদিন তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না।

সমুদ্রের বিস্তৃত সৈকতের বিক্ষিপ্ত গোলাপগুচ্ছ
প্রত্যুষের পূর্বদিগন্তে চোখ তুলে
আরক্ত অরুণের উদয় দেখেই ভাববে ; তিনি আসছেন।
কিন্তু অরুণ যখন প্রচণ্ড তরণির উত্তরীয় বুকে তুলে
স্বাভাবিক পদসঞ্চারে সে পূর্ব থেকে পশ্চিমের
অন্ধকারে হবে লীন,
তখন ভুল ভাঙবে গোলাপগুচ্ছেরও,
তারা বুঝতে পারবে :
সেই মহান প্রেমিকের পাঁচটি আঙুলে নেচে নেচে,
অথবা তাঁর বিশাল বুকের শরণ নিয়ে
সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে ওঠার সুযোগ আর তারা পাবে না।
কারণ, আজ তিনি ইতিহাস।

অতএব, আজ সেই ইতিহাসই আমাদের একমাত্র সারথী
ইতিহাস তার সপ্তরথাশ্বের সরণী রচনা ক'রে
এগিয়ে যাক।
তার পেছনে পেছনে
ঢেউ তুলে, ঢেউ ভেঙে, সহস্র বাহারের কলাপ তুলে,
সাড়ম্বরে, অথচ সংযত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে সমুদ্র॥

নির্বাণ আলোক ঃ অনির্বাণ শিখা

রজত রায়চৌধুরী

প্রত্যয়ের প্রদীপ্ত মশাল পথিকের ধ্যানমগ্ন চক্ষু 'পরে
অকম্পিত প্রজ্ঞালোকে ধ্বস্ত হয় অন্ধকার রজনীর ঘরে
অর্ধ-শতাব্দীর মিছিলের অগ্রদূত নবীন ভারত সন্ন্যাসী
মৃত্যুঞ্জয় মহিমায় তব দীপ্ত বীর্যগর্ভ বাণী সমুদ্ভাসি
অচঞ্চল হিমাচল হতে দূর দক্ষিণের সমুদ্র সমীরে
কল্লোলে কল্লোলে বাজে লক্ষ কোটি জনতার প্রাণের গভীরে
সমুদ্রের সমুচ্চ শিখরে ওঠা,—ফেলে আসা বিলাস আরাম
অন্বেষণ ভারত আত্মার মাঝে অপরূপ স্বাধীনতা নাম।

সমুদ্র মন্থন রত্ন সম স্তনিত বিশ্বের মর্মকেন্দ্র স্থির।
দানবের ঝঞ্ঝাঘাতে বজ্রকণ্ঠ বার বার মুখর গম্ভীর।
চিত্তের তমসালোক দূর করি ভয় শোক দৈন্য অনুভব
মানুষের অপমানে মৌন থাকা চরম গভীর পরাভব।
শান্তিকামী এ বিশ্বের প্রতি মনে তব নাম আজি যেন লিখা
সুপ্তিমগ্ন আকাশ আলোক। হৃদয়ে হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা।

সেই গোলাপ প্রেমিককে

শান্তনু দাস

অনেকদিন অনেক পথ ক্লান্ত পায়ে এসে
পান্থরা সব স্বপ্ন নিয়ে স্নিগ্ধ ছায়াতলে
রঙ মেখেছে সুর সেধেছে কখন সযতনে
গ্রামীণ মেয়ের রক্তগোলাপ, রঙিন উপহার।

হঠাৎ কালো ঝড়ে মনের অজান্তে কখন,
বিশাল দেহ হুমড়ি খেয়ে নদীর জলে নামে
গুমরে ওঠে শিশু, পিতা এবং পিতামহ,
স্তব্ধ দেহে অবনত, মুক্তো ঝরে পড়ে।

এখন অনেক রাত দূরে আকাশ ভরা তারা,
শূন্য বেদী, বিবর্ণ ফুল দেয় বুঝি পাহারা।

গোলাপ নির্যাসে

প্রদীপ ঘোষ

যদিও বা মৃত্যু হ'ত কোনও জ্যোতিষ্কের
আকাশের অঙ্গুমানে—
অথবা কি কোনও উল্কাপাত।
জানি না বিধাতা এতে কতটা বিধুর,
কি চঞ্চল দিশাহারা প্রায়?
তারার মিছিল এতে কতটা হতাশ
আলোর আগর তাতে কতটুকু ম্লান?

জানি না, জ্যোতিষ্ক কি না আমাদের নেতা
তবু তাঁর তিরোধানে আমরা অধীর।
মুক্তিকামী মানুষের চেতনার তারে
বেজে ওঠে পৃথিবীর শোকার্ত হৃদয়।
আমরা অতন্দ্র আছি তাঁর বেদনায়।

শান্তির সেনানীরা শোন পেতে কান
আমাদের প্রিয় নেতা ডাক দিয়ে যায়।
"জীবনেই শেষ নয় সাধনার শেষ
অর্বুদ জীবন মিলে গোলাপ নির্যাসে
গড়ে তোলো শান্তির শুচি তপোবন।"

সেইখানে শাশ্বত আমাদের নেতা
তাঁর নাম তাপসের বীজমন্ত্র হ'ক।
হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি ভুলে গিয়ে সব
মিশে যাক ছোট-বড় মনের আকাশ।
মৃত্যুতে অমর রহে আমাদের নেতা
হয়ত জীবন তাঁর হ'য়ে গেছে শেষ।
তবু তাঁর স্বপ্ন, সাধ, শেষ নয়, নয়।

● শ্রীনেহরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

● রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় শোকসভায় সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক নেহেরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

মাই লাইফ-টাইম ইজ নট এণ্ডিং সো সুন

—মুরারি ঘোষ

যেদিন নেহরু বলেছিলেন "মাই লাইফ-টাইম ইজ নট এণ্ডিং সো স্থন" —সেদিন আমরা এক ক্লান্তিহীন দুঃসাহসী সেনানায়কের কণ্ঠস্বর শুনেছিলুম। আমাদের একালের জীবনে পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতীয়দের বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের আকাঙক্ষায় যাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল, মনের আড়াল করতে চাই নি, সেদিনের তাঁর সেই উক্তির প্রদীপ্ত আলোকে আমরা উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলুম। হারানোর আশংকা তো ছিলই—তবু ক'মাস ধরে সেই নিদারুণ বেদনাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে মেনে নিতে অনেক দ্বিধা ছিল। নেহরুর অপরিসীম কর্মোদ্যোগ ক্লান্তিহীন মানসিক দৃঢ়তা, আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নির্ভীক পদচারণা আমরা ভারত-ইতিহাসের বর্তমান গতিশীলতার সঙ্গে একাকার করে দেখেছিলুম। নেহরু নিজেও মুক্তি নিতে চান নি। আমরাও চেয়েছিলুম নিঃশঙ্ক যোদ্ধার এই ঐতিহাসিক উক্তি আরো দীর্ঘকাল আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের একান্ত আকাঙক্ষায়—জীবনচারণে, মনের অণুতম ভাবনার প্রতিটি ক্ষণের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকুক। ইতিহাস কখনো মৃত হয় না। মৃত ইতিহাস আমরা চাই নি।

এক সময় এই অক্লান্ত যোদ্ধার উক্তিতেই আমরা এ সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি। "অনেক সময় আমার নিজের জীবনের উপর ইতিহাসের প্রভাব পড়েছে; কখনো বা এমনো ঘটেছে যে, আমার ব্যক্তিগত আওতার মধ্যে আমি এমন কিছু ঘটনা প্রভাবান্বিত করেছি যা পরবর্তীকালে ইতিহাসের বিষয়রূপে গণ্য হয়েছে।" ভারত-ইতিহাসের বর্তমানের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া স্বরাট পুরুষের উক্তিকে আত্মম্ভরিত' বলে মনেই করি না। যেন ইতিহাসের চকিত উজ্জ্বল একটা দিকের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে উঠলো। ভারত-ইতিহাসের চলমানতার সঙ্গে নেহরুর বিচ্ছেদ কোথায়? এমন কি আমাদের বর্তমান বিশ্বপরিচয়েও নেহরু অনুপস্থিত নন।

স্পেনের মুক্তিযুদ্ধের মরণপণ সংগ্রামে, চীনের গৃহযুদ্ধে, কোরিয়ায়, যুনোর দরবারে, আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধে, মিশরের স্বাধীন সংগ্রামে ইতিহাসের বরাভয় নিয়ে ভারতপথিক নেহরু বিশ্বপথিকের ভূমিকায় অগ্রণী সেনানায়ক হয়ে দেখা দিয়েছেন।

অতীতের সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামে সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল ভূমিকায়, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের আকাঙিক্ষত জীবনচারণায় নেহরু কোথায় স্বপ্রকাশ নন? পাঁচসালা যোজনায়, ভূমি-সংস্কারে, শিল্প-বিপ্লবে, সমাজ সংস্কারে, সমাজতন্ত্রের মন্ত্র দীক্ষায়, ভিলাই, রুচকেল্লা, চিত্তরঞ্জন, ভাকরা নাঙ্গালে,—আগামী ভারতবর্ষের প্রাণবন্ত মূর্তি নির্মাণে যাঁর ক্লান্তিহীন নিষ্ঠা, ইতিহাসের গতিশীলতা থেকে তাঁর বিচ্ছেদ কোথায়? একথা এখনো ইতিহাসের চলমানতার

শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত জীবনের একটি দিক বন্যপশুকে আদর করছেন

সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে "মাই লাইফ-টাইম ইজ নট এণ্ডিং সো সুন।"

* * *

Though books and old monuments and past cultural achievements helped to produce some understanding of India, the- did not satisfy me or give me the answer I was looking for. কোন্ ভারতবর্ষকে খুঁজে খুঁজে মরেছেন নেহরু? যে নেহরু তাঁর প্রাণপুরুষকে—জীবনদীপ্তিকে ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন? নিজের একান্ত সত্তাকে, শ্রেণীচেতনাকে—স্বার্থদম্পত্ত সামাজিক অস্তিত্বকে ভুলতে চেয়েছিলেন. "I was not admiret of my own class or ki~d." নিজের সামাজিক শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে গিয়ে নেহরু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন শ্রেণী-বিশেষের কর্মে, ভাবনায় সংগ্রামে সম্পূর্ণ ইতিহাস যেমন ধরা দেবে না, নেহরুকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সন্ধানী মন নিয়ে ভারতবর্ষকে খুঁজতে গিয়ে নেহরু কখনো কখনো নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। নেহরুর অভিজ্ঞতা আর ভারত-ইতিহাসের ঘটনাচক্র যেন আইনস্টাইনের জড় আর শক্তির একক অস্তিত্বের মত উপলব্ধ সত্তা। যে সত্তা নিজেকে প্রকাশ করছে নানান কর্মকাণ্ডে, উদ্যোগ-আয়োজনে, বিরাট রাষ্ট্রীয় যজ্ঞে সেই সত্তাই আবার অপ্রকাশিত শক্তির দুর্জ্ঞেয়তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। খুঁজে পায় না নিজের অস্তিত্ব। এখানেই বিরোধ সেই চিরকালীন। অস্তিত্বকে খুঁজে না পাওয়ার দুর্বার আবেগে রুদ্ধ দুয়ারে দুয়ারে পড়ে ঘা—সেই আঘাতে এক একটা দুয়ার খুলে সচল মানুষের পথ পরিষ্কার হতে থাকে।

নেহরু যখন বলেন: "India with all her infinite charm and variety began to grow upon me more and more, and yet the more I saw of her, the more I realised how very difficult it was for me or for anyone else to grasp the ideas she had embodied. It was not her wide spaces that eluded me or even her divesity, but some depth of soul which I could not fathom, though I had occasional and tantalizing glimpses of it—". —আমাদের সংশয়, বিস্ময় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। নিজেদের দ্বিধায় আমরা নিজেদেরই খুঁজে পাই না। ভারতের জটিল মানসলোক দুর্বোধ্য হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু আসল যজ্ঞশালায় আমাদের প্রাণপুরুষকে অন্যরূপে লাভ করি। জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিশালতায় সুদূরের ধূসর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আয়োজনে তখন সচল ইতিহাসের সাক্ষাৎ স্পর্শ লাভ করি। দীর্ঘদিনের সংগ্রামী নায়কের ক্লান্তিহীন কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে উঠি—

"The aim should be the expension of the productive capacity of the nation in every possible way at the same time absorbing all the labour power of the nation in some activity or other and preventing unemployment. As far as possible there should be freedom to choose one's occupation. An equalization of income will not result from all this, but there will be for more equitable sharing and a progressive tendency towards equalization."

একই অস্তিত্বের দ্বিধাবিভক্ত সত্তার দ্বন্দ্বে আমাদের অগ্রগতি সচল হয়ে উঠেছে। এই সচলতার প্রতিটি পদক্ষেপে পরাধীনতার কলুষ ইতিহাস পেরিয়ে আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রায় নেহরু নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন—নিজেই ইতিহাস হয়েছেন—যে ইতিহাসের মৃত্যু নেই—যে ইতিহাস সগর্বে ঘোষণা করতে পারে "মাই লাইফ-টাইম ইজ নট এণ্ডিং সো সুন।"

কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা ও দৌহিত্রদ্বয় শ্রীমান সঞ্জয় ও রাজীব সহ শ্রীনেহরু

যোদ্ধারও ক্লান্তি আসে। দীর্ঘ যাত্রায় অগ্রগামী সেনানায়ক অপরিসীম ক্লান্তি আর সন্দেহে ভেঙে পড়েন।

"To what purpose was all these long journeying ? To what end these unending processions ? A feeling of tiredness and disillusion would sometimes invade my being, and then I would seek escape from it in cultivating a certain detachment."

রণক্লান্ত সৈনিকের মত তিনি বিশ্রামের লালসায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তখন কি ইতিহাস থেমে থাকে ? ইতিহাস কি থেমেছিল ভুবনেশ্বরের কংগ্রেসে। না '৬২ সালের মার্চ মাসে ? যখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ণ বিশ্রামের হুকুম দিলেন। বাতিল করে দিলেন রণক্লান্ত যোদ্ধার সমস্ত কার্যসূচী। কয়েকদিনের জন্যেই।

যিনি মঞ্চে ওঠেন লাফ দিয়ে, ঝাঁপ দিয়ে পড়েন জনতার মাঝে। চুয়াত্তরে পা দিয়েও যিনি চীৎকার করে বললেন—জনতা মুঝে খিচ রহা হ্যায়। মুঝে জানে দো। জনতা আমায় ডাকছে। যেতে দাও আমায়।

তাঁর এই ক্লান্তি কতখানি স্থায়ী ? উল্লাসের আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে...as there is too much of a volcano within me for real detachment. Unexpectedly all my defences are hurled away and all my detachment goes. ক্লান্তি আর নিঃসঙ্গতা দূরে ফেলে ভেতরের দুরন্ত ঝড় তাঁর সকল হতাশা আর শ্রান্তি লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ইতিহাসের গতিপথ কেই বা স্তব্ধ করে দিতে পারে ? তার অন্তহীন যাত্রাপথে ক্লান্তিহীন সেই সঙ্গীত এখনও আমরা শুনতে থাকবো—"মাই লাইফ-টাইম ইজ নট এণ্ডিং সো সুন।"

নেহরু ভারত-ইতিহাসের সজীব সত্তা, যে ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

“আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ”

১৮৮৯—১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জন্ম।

১৯০৫—হ্যারোয় অধ্যয়নের জন্য মে মাসে বিলাত যাত্রা।

১৯০৭—কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি।

১৯০৯—জার্মানী ও ফ্রান্স পরিভ্রমণ।

১৯১০—রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ বিদ্যায় অনার্স সহ ডিগ্রিলাভ।

১৯১২—ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ; দেশে প্রত্যাবর্তন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসা সুরু এবং কংগ্রেসের বাঁকীপুর অধিবেশনে যোগদান।

১৯১৩—যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যোগদান।

নেহরু পরিবার (বাঁদিক থেকে) : ব্রিজলাল, স্বরূপরাণী, বিজয়লক্ষ্মী, জওহরলাল ও মতিলাল নেহরু।

১৯১৫—সংবাদপত্র দলন সম্পর্কিত একটি নূতন আইনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদের এক জনসভায় প্রথম বক্তৃতা দান।

১৯১৬—ফেব্রুয়ারী মাসে কমলা কাউলকে বিবাহ এবং লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গান্ধীজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৭—হোম রুল আন্দোলনে যোগদান; ১৯শে নভেম্বর কন্যা ইন্দিরার জন্ম।

১৯১৮—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য পদ লাভ।

১৯১৯—পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে সাহায্য দান।

১৯২১—৬ই ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত সফর উপলক্ষে হরতাল পালন সম্পর্কিত ইস্তাহার বিলির অভিযোগে প্রথম কারাদণ্ড।

১৯২২—৩রা মার্চ জেল হইতে মুক্তিলাভ; ১১ই মে বিদেশী কাপড় বর্জন আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে পুনরায় কারাদণ্ড।

১৯২৩—৩১শে জানুয়ারী জেল হইতে মুক্তিলাভ। ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজ্য পরিত্যাগের আদেশ অমান্যের অভিযোগে কারাদণ্ড। ৪ঠা অক্টোবর মুক্তিলাভ; এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি নির্বাচিত এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত।

১৯২৫—এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ; কমলা নেহরু মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত।

১৯২৬—মার্চ মাসে চিকিৎসার জন্য কমলাকে লইয়া সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা; ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও রাশিয়া সফর।

১৯২৭—ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাসেলস-এ যোগদান; স্বদেশে প্রত্যাগমন ও অক্টোবর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান।

১৯২৮—২৯শে নভেম্বর লক্ষ্ণৌ-এ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনাকালে পুলিশের লাঠি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত; বৃটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করার উদ্দেশ্যে ভারত স্বাধীনতা লীগ স্থাপন ও উহার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯২৯—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী অনুমোদন; কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব; নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বৈঠকে সভাপতিত্ব; মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং 'লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার' নামক পুস্তক প্রকাশ।

১৯৩০—লবণ সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য ১৪ই এপ্রিল ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড; ১৭ই অক্টোবর নৈনী সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ; এলাহাবাদে একটি কিষাণ সম্মেলনে যোগদানের অভিযোগে ২৯শে অক্টোবর পুনরায় দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯৩১—২৬শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ; ৬ই ফেব্রুয়ারী পিতা মতিলাল নেহরুর মৃত্যু; এলাহাবাদ পরিত্যাগ না করার আদেশ অমান্যের অভিযোগে ২৬শে ডিসেম্বর দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড।

১৯৩৩—মাতার অসুস্থতার জন্য ৩০শে অক্টোবর জেল হইতে মুক্তিলাভ।

১৯৩৪—জানুয়ারী মাসে বিহারের ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ ও দুর্গতদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা; কলিকাতায় রাষ্ট্র-বিরোধী বক্তৃতা-দানের জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড পীড়িতা পত্নীকে দেখার জন্য ১১ই আগষ্ট মুক্তিলাভ; সরকার-বিরোধী বক্তৃতা

"প্রবল প্রেম সবার মাঝে"

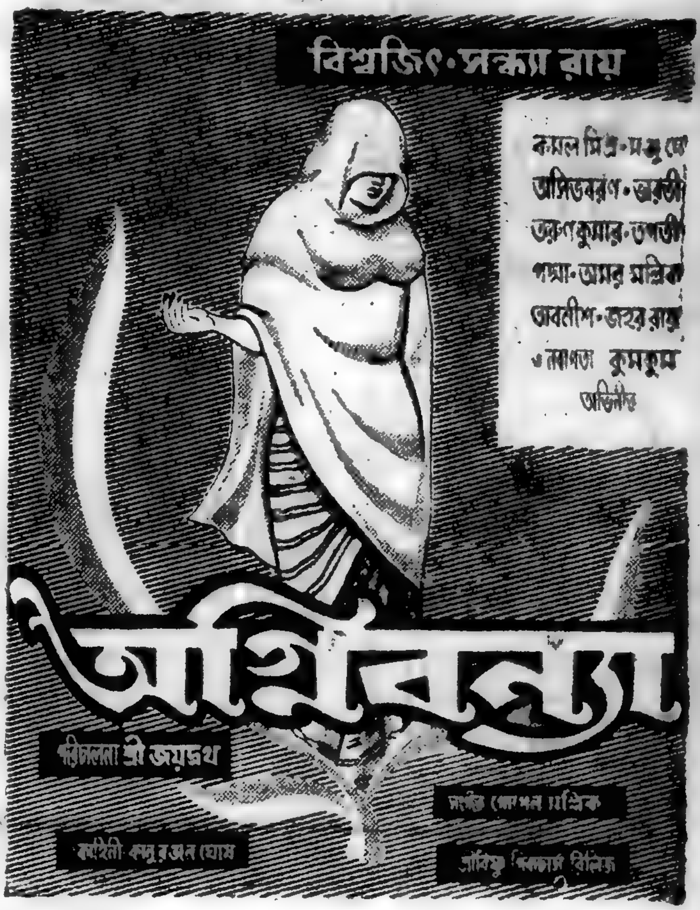

রূপবাণী * ভারতী * অরুণা
পদ্মশ্রী • সুচিত্রা • পারিজাত • নবরূপম • অলকা
লীলা • জয়শ্রী • মীনা • গৌরী • কল্যাণী
শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স রিলিজ

● সুভাষচন্দ্র ও নেহরু

দানের অভিযোগে ১০ দিন পরে পুনরায় গ্রেপ্তার; গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিষ্ট্রী পুস্তক প্রকাশ।

১৯৩৫—আলমোড়া জেলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'আত্মজীবনী' গ্রন্থ সম্পাদনা; কমলা নেহরুকে দেখার জন্য ৪ঠা সেপ্টেম্বর জেল হইতে মুক্তিলাভ ও সকন্যা ইউরোপ যাত্রা।

১৯৩৬—২৮শে ফেব্রুয়ারী পত্নীর মৃত্যু; লণ্ডন ও রোম পরিভ্রমণ; ২৩শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেসের ৪৯তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব; ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী নির্বাচনে যোগদানের সিদ্ধান্ত; নির্বাচন অভিযান উপলক্ষে সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ; ২৬শে ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯৩৮—মাতা স্বরূপরাণীর মৃত্যু; জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর সভাপতিত্ব গ্রহণ এবং গৃহযুদ্ধ চলাকালে স্পেন পরিদর্শন।

১৯৩৯—চীন পরিদর্শন।

১৯৪০—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদানের অভিযোগে ৩১শে অক্টোবর চার বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯৪১—ডিসেম্বর মাসে জেল হইতে মুক্তিলাভ।

১৯৪২—ভারতে চিয়াংকাইশেকের সহিত আলোচনা। ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর সহিত মতামত বিনিময়; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব উত্থাপন; ৮ই আগষ্ট গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া আমেদাবাদ জেলে নীত।

● অতীতের পাতা থেকে—১৯৫৬ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজঘাটে অনুষ্ঠিত বিশেষ সূত্রযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী নেহরু ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

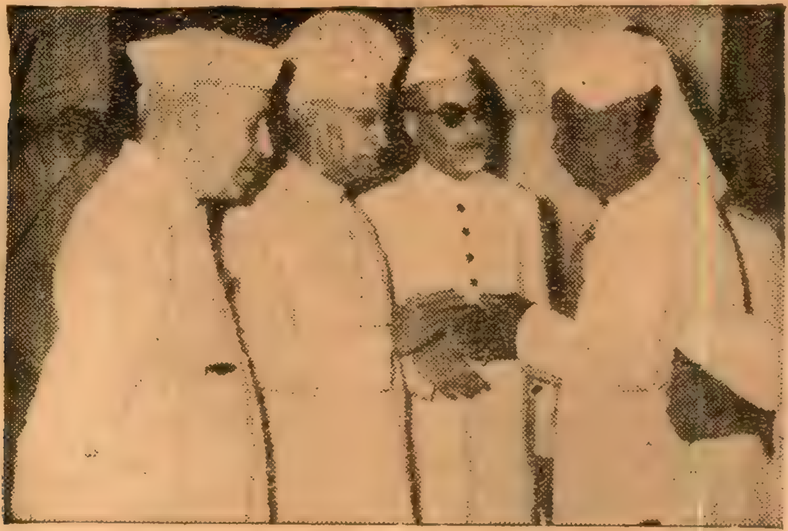

● চৈনিক আক্রমণে নিহত জনৈক সৈনিকের নিকটআত্মীয়ের সঙ্গে আলাপরত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

১৯৪৪—১৩ই এপ্রিল ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থ লেখা সুরু।

১৯৪৫—১৫ই জানুয়ারী জেল হইতে মুক্তিলাভ; ২৫শে জুন সিমলায় বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা; ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের বিচারকালে আইনজীবী হিসাবে তাহাদের পক্ষাবলম্বন।

১৯৪৬—মার্চ মাসে ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থ প্রকাশ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিদর্শন; ৯ই মে চতুর্থবারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত; ভাইসরয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৭ই আগষ্ট তারিখে অন্তর্বর্তী সরকারে উপ-সভাপতির আসন গ্রহণ; অক্টোবর মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ; কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ডিসেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা; ডিসেম্বর মাসে গণ-পরিষদে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা।

১৯৪৭—[illegible] জানুয়ারী দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব; ১৯শে আগষ্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ; ৩১শে আগষ্ট লিয়াকৎ আলী খান ও সর্দার প্যাটেলের সহিত পাঞ্জাবের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ।

১৯৪৮—১৭ই ফেব্রুয়ারী গণপরিষদে ভারতের নূতন গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বর্ণনা; ১২ই এপ্রিল হীরাকুঁদ বাঁধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন; ২রা জুন ওতাকামন্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এশিয়া ও দূর প্রাচ্য সম্পর্কিত তৃতীয় বৈঠকের উদ্বোধন; ২০শে আগষ্ট পারমাণবিক কমিশনের প্রথম বৈঠকে ভাষণ দান; ৪ঠা অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক কমিটীর বৈঠকের উদ্বোধন; ৬ই অক্টোবর গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান; ৩রা নভেম্বর প্যারিসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনের বিশেষ বৈঠকে ভাষণ দান; ১০ই নভেম্বর নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক আবহ সংস্থার আঞ্চলিক অধিবেশনের উদ্বোধন; ২৩শে ডিসেম্বর ভারতীয় ঐতিহাসিক নজীর কমিশনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন।

১৯৪৯—২০শে জানুয়ারী ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ অত্যাচারের নিন্দা করার জন্য ১৯টি জাতির এক সম্মেলনের উদ্বোধন; ১৯শে এপ্রিল লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান; ২৪শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ভারতের সহিত 'লড়াই নয়' ঘোষণায় যোগদানের আহ্বান; ৭ই অক্টোবর সরকারীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাত্রা; ১৯শে অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেস ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দান; ২৪শে অক্টোবর কানাডীয় সংসদে ভাষণ দান; ৬ই নভেম্বর নিগ্রোদের সেবার জন্য মার্কিন স্পিরগান পদক লাভ।

১৯৫০—১২ই জানুয়ারী কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনে ভাষণ দান; ২৮শে জানুয়ারী ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধন; মার্চ মাসে

● ফাইং ক্লাবে গাইডারের স্টিয়ারিং হাতে নেহরু

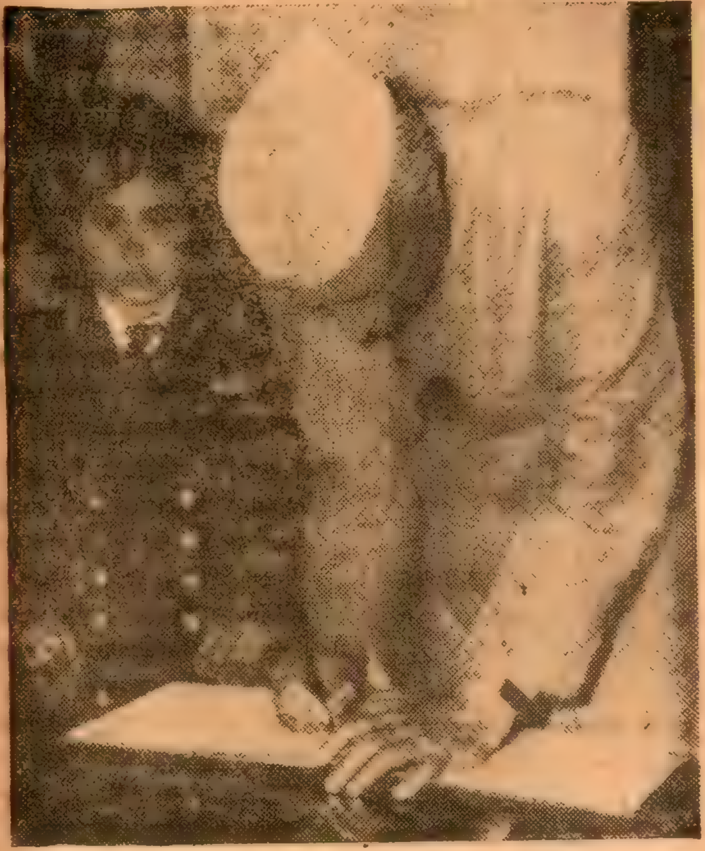

● নেতাজী ভবনে নেহরু

পরিকল্পনা কমিশন গঠন; উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদন; ২৬শে এপ্রিল করাচী গমন; কোরিয়া যুদ্ধের আশু মীমাংসার জন্য ১৪ই জুলাই বিশ্বের তিনটি বৃহৎ শক্তির উদ্দেশ্যে আবেদন; ২০শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে সপ্রু ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯৫১—কায়রো, জেনেভা, লণ্ডন ও প্যারিস পরিভ্রমণ; ১১ই জুন নেপাল পরিদর্শনে যাত্রা; ৯ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত; ৫ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মেলনে ভাষণ দান; ১৬ই ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদের সালার জং যাদুঘরের উদ্বোধন।

১৯৫২—২৫শে ফেব্রুয়ারী ভারত সিরিয়া চুক্তি সম্পাদন; সাঁচীতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫৩—২ই জানুয়ারী বিশ্ব গান্ধী আলোচনা চক্রে যোগদান; ২৮শে মে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগদান; ২৫শে জুলাই পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে করাচী যাত্রা; ১লা আগষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান কর্পোরেশনের উদ্বোধন; ১৩ই অক্টোবর কলম্বো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের উপদেষ্টা কমিটীর বৈঠকের উদ্বোধন।

১৯৫৪—১৫ই জানুয়ারী সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্যার জন কোটলেওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ২৯শে মার্চ ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উদ্বোধন; ২৭শে এপ্রিল হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত সিংহল সফর; ২৫শে জুন চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন লাইকে অভ্যর্থনা এবং তাঁহার সহিত যুক্তভাবে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা; অক্টোবর মাসে চীন সফর; ১৭ই ডিসেম্বর যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটোকে অভ্যর্থনা; ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় পরিদর্শন।

১৯৫৫—৩রা জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হামার সোলাডকে অভ্যর্থনা; জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান; ১৭ই মার্চ কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স নরোদম সিহানুককে অভ্যর্থনা; ২৫শে মার্চ ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ নুকে সম্বর্ধনা; ১৩ই এপ্রিল মিশরের প্রধানমন্ত্রী কর্ণেল নাসেরের সহিত সাক্ষাৎ; ১৫—২৫শে এপ্রিল বান্দুং-এ আফ্রো-এশীয় অধিবেশনে যোগদান; ২রা মে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা; ১২ই মে দিল্লীতে জাতীয় যাদুঘরের

● সৌদী আরবের রাজার সঙ্গে শ্রীনেহরু

বিশ্বের শোক

ভারত সরকার কাল্যে বর্ডার দেওয়া এক বিশেষ গেজেটে জওহর লাল নেহরুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, 'জাতির জনকের মৃত্যুর পর ইহাই দেশের সর্বাধিক ক্ষতি।'

গেজেটে আরও বলা হয়েছে, শ্রীনেহরু ছিলেন সমগ্র মানবজাতির এবং সমগ্র বিশ্ব আজ তাঁর তিরোধানে শোকাকুল।

তাঁকে স্বাধীন ভারতের মুখ্য স্রষ্টারূপে বর্ণনা করে গেজেটে বলা হয়েছে, তিনি শুধু জাতির মুক্তি, ঐক্য ও সংহতির জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও প্রগতির জন্যও আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

বিশ্বশান্তির জন্য শ্রীনেহরুর উদ্যমের উল্লেখ করে গেজেটে বলা হয়েছে, যুদ্ধের অবসান ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য তিনি অক্লান্ত-ভাবে তৎপর ছিলেন।

পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য, মানুষের শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য এবং ক্ষুধা ও ভয় থেকে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীনেহরু সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

শ্রীনেহরু ছিলেন বিশ্বশান্তির অন্তরায় যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক জোটের বিরোধী।

বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী শক্তিকে সংহত করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের জন্য শ্রীনেহরু যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেছিলেন, ভারত সরকার তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত. অর্থনীতির সাহায্যে জাতির বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব তা শ্রীনেহরু তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এ কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে ১৯৩৬ সালে তাঁর উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐ প্রারম্ভিক প্রথার জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হয়। ১৯৬১ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় ও

সেই সঙ্গে সুরু হয় একের পর এক জাতীয় যোজনার রূপায়ণ।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ঐতি-হাসিক সাক্ষাৎকারের পর শ্রীনেহরুর সমগ্র পরিবার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি হোম রুল লীগের এলাহাবাদ শাখার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং ঐ সময়েই কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ঐ সম্পর্ক তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিন্ন হয় নি। ১৯২১ সালে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন এবং তার পর তাঁকে বার বার দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকতে হয়। কিন্তু ঐ সময় তিনি শুধু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাসীবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করেন। স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রীদের তিনি বলিষ্ঠ সমর্থন জানান এবং ঐ গৃহযুদ্ধের সময় তিনি স্পেন পরিদর্শন করেন।

১৯২৯ সালে শ্রীনেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরেই পাঞ্জাবে ইরাবতী নদীর তীরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীনেহরু কোন এক বিষণ্ণ মুহূর্তে তাঁর নিজের জন্য যে স্মৃতি-লিপি রচনা করেছিলেন তা অপেক্ষা সুন্দর ও সর্বগ্রাহী স্মৃতিলিপি কল্পনা করা যায় না। তিনি লিখেছিলেন —কেউ যদি সেদিনও আমার কথা স্মরণ করতে চান, আমার সম্বন্ধে যেন এই কথাই ভাবেন যে, এই মানুষটি তাঁর হৃদয় মন দিয়ে ভারত ও ভারতীয় জনগণকে ভালবেসেছিল। আর তার বিনিময়ে দেশবাসী তাঁকে দিয়েছিল প্রশ্রয় ও প্রচুর ও অফুরন্ত ভালবাসা।

ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব চিরদিন তাঁর মধুর স্মৃতি স্মরণ করবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—বিপদ জেনেও সত্য প্রকাশে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নি। সুবিধা থাকলেও মিথ্যার সঙ্গে তিনি কখন ও আপোষ করেন নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক জওহরলাল নেহরুকে ভারত কখনও ভুলবে না।

● অতীতের পাতা থেকে—১৯৫০ সালের জুন মাসে ইন্দোনেশিয়া যাত্রার পথে ভারতীয় নৌবাহিনীর 'দিল্লী' জাহাজে কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা ও দুই দৌহিত্র সহ শ্রীনেহরু।

ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপন; ১৩—১৮ই মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার সহিত আলোচনা; ৫ই জুন সোভিয়েট রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী ও মিশর ভ্রমণে যাত্রা; ১৫ই জুলাই 'ভারতরত্ন' সম্মান লাভ; ১৯শে জুলাই প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণর সহিত সাক্ষাৎ; ২১শে সেপ্টেম্বর লাওসের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত যুক্ত বিবৃতি দান; ৬ই অক্টোবর বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস কারখানার উদ্বোধন; ১৮ই নভেম্বর ভারত-সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও তদানীন্তন সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভকে অভ্যর্থনা; ২৮শে নভেম্বর সৌদি আরবের রাজা সৌদিকে অভ্যর্থনা; ১০ই ডিসেম্বর নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপন।

১৯৫৬—মার্চ মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জন ডালেস, ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সি পিনো ও সোভিয়েট উপ-প্রধানমন্ত্রী মিঃ মিকোয়ানের সহিত বৈঠক; বোম্বাইয়ে পারমাণবিক রিয়েক্টার সংস্থাপনের জন্য ২৮শে এপ্রিল কানাডার সহিত চুক্তি সম্পাদন; জুন-জুলাই মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান ও পরে আয়ার্ল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, মিশর, সিরিয়া ও লেবানন পরিদর্শন; ১৮—২০শে জুলাই প্রেসিডেণ্ট টিটোর সহিত বৈঠক; অস্থায়িভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ; ২৩শে জুলাই সুয়েজখাল বিরোধের মীমাংসার জন্য শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ; ১৮ই আগষ্ট সৌরাষ্ট্রে এক জীপ দুর্ঘটনায় নিপতিত; ৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার নবম অধিবেশনে ভাষণ দান; মিশরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য নভেম্বর মাসে কলম্বো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান; ২৮শে নভেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রীর সহিত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা; ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ; ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের ভারত সফর কালে তাঁহার সহিত আলোচনা।

১৯৫৭—বুদ্ধদেবের ২৫০০ তম মহানির্বাণ দিবসের অনুষ্ঠানাদির চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার জন্য ১২ই জানুয়ারী দালাইলামা ও পাঞ্চেন লামার সহিত নালন্দা গমন; ১৩ই জানুয়ারী হীরাকুঁদ পরিকল্পনার উদ্বোধন; ২৮শে জানুয়ারী ট্রম্বেতে এশিয়ার প্রথম রিয়েক্টারের উদ্বোধন; ১৭—১৯শে জানুয়ারী সিরিয়ার প্রেসিডেণ্টের সহিত আলোচনা; ২৫শে জানুয়ারী সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল

নেহরু ও অশোক সেন

ক্রুশ্চভকে অভ্যর্থনা ; ৩০শে জানুয়ারী অস্থায়িভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কার্য-ভার গ্রহণ ; ১৭ই এপ্রিল তাঁহার নেতৃত্বে নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ ; জুন মাসে সিরিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনে শুভেচ্ছা সফর ; জুন-জুলাই মাসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান ; জুলাই মাসে হল্যাণ্ড, মিশর ও সুদান পরি-ভ্রমণ ; সেপ্টেম্বর মাসে ভুটান গমন ; অক্টোবর মাসে জাপান সফর ; ২রা ডিসেম্বর কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে ভাষণ দান ;

১৯৫৮—৩-৫ই জানুয়ারী চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলিয়াম সিরোজীর সহিত, ৭-৮ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের সঙ্গে এবং ৮-১০ই জানুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের সহিত আলোচনা ; ১৩ই ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানের রাজা জাহির শাহের সহিত একটি যুক্ত বিবৃতি দান ; ১০ই মার্চ রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সহিত অনুরূপ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান ; ৩রা মে প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ, কিন্তু পরে পার্টি সদস্যদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভুটান পরিদর্শন ; ৮ই অক্টোবর ভারত ১৯৫৮ প্রদর্শনীর উদ্বোধন ; বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশনের এক যুক্ত বৈঠকের উদ্বোধন।

১৯৫৯—ঘানার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এনক্রুমাকে সম্বর্ধনা ; ৫ই জানুয়ারী আন্তর্জাতিক জুরী কংগ্রেসের উদ্বোধন ; ১২-১৫ই জানুয়ারী পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্টের সহিত আলোচনা ; ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাংগালোরের বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ দান ; ৫ই ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সর্দার মোহম্মদ দাউদখানের সঙ্গে আলোচনা ; ২৪শে এপ্রিল দালাইলামার সহিত সাক্ষাৎ ; ১১-১৫ই জুলাই নেপাল পরিদর্শন ; ২১শে জুলাই জব্বলপুরে ট্রাক নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন ; ভারত-পাকিস্তান বিরোধ সম্পর্কে পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সহিত আলোচনা ; সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তান সফর ; ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা।

১৯৬০—এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মিঃ চৌ-এন লাইয়ের সহিত আলোচনাক্রমে সংঘর্ষ পরিহার করিয়া আলাপ-আলোচনার মারফতে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত ; মে মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান এবং প্যারিস, মিশর, তুরস্ক ও লেবানন পরিদর্শন ; ১৯শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সহিত সিন্ধুনদের জল বণ্টন সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন। সেপ্টেম্বর—অক্টোবর মাসে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতারূপে রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ অধিবেশনে যোগদান এবং সোভিয়েট মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির আবশ্যকতা বিষয়ে অভিমত প্রকাশ ; মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের উদ্বোধন ; প্যারিস পরিদর্শন ; দক্ষিণ আফ্রিকার সার্পোভিল ও লক্ষ্ণৌ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ; মিশর, তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া ও পশ্চিম জার্মানী পরিদর্শন ; ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের সহিত আলোচনা ; বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দান।

১৯৬১—১৬ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ে কানাডা-ভারত পারমাণবিক রিয়েক্টারের উদ্বোধন ; ১৮ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং ঐরূপ অবস্থায় কাশ্মীরের সীমানা সম্পর্কে চীনের সহিত পাকিস্তানের আলোচনা চালান অন্যায় ; ৭ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধিবেশনের উদ্বোধন ; ৮-১৩ই ফেব্রুয়ারী ভুটানের মহারাজার সহিত আলোচনা ; সেপ্টেম্বর মাসে বেলগ্রেডে দল-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের

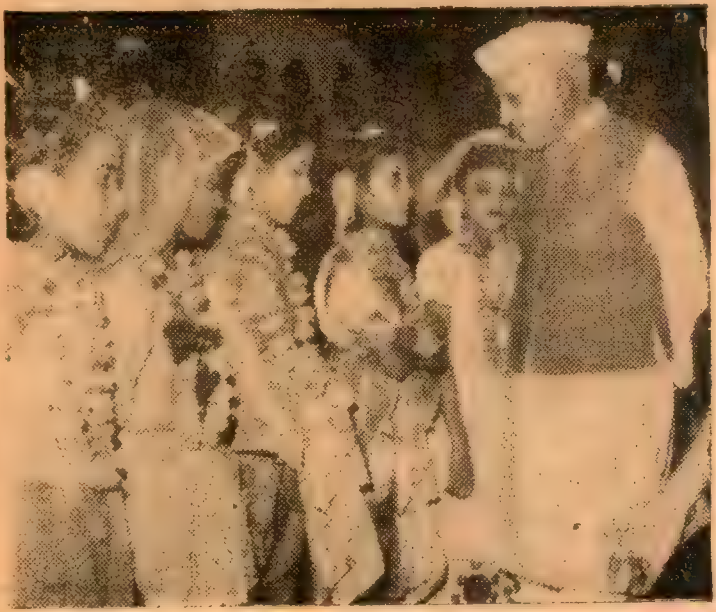

● শিশু রঙমহলের লণ্ডন যাত্রার আগে দিল্লীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শিল্পীদের সঙ্গে চাচা নেহরু। সম্ভবত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এইটিই তাঁর শেষ অংশগ্রহণ।

শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান; ৯ই ডিসেম্বর প্রথম এশীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেসের উদ্বোধন; ৮ই ডিসেম্বর মালয়ের সার্বভৌম শাসকের সহিত সাক্ষাৎ; ১০ই ডিসেম্বর ভাক্রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন; ১৩ই ডিসেম্বর সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভকে স্বাগত জ্ঞাপন।

১৯৬২—১লা জানুয়ারী আসামের নুনমাটি তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন; ৩রা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৯তম অধিবেশনের উদ্বোধন; ১১ই জানুয়ারী ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নুর সহিত সাক্ষাৎ ও কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন; ২৪শে জানুয়ারী ভারতে তৈয়ারী নিশান গাড়ির উদ্বোধন; ১০ই এপ্রিল দেশের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন; ১৮ই এপ্রিল নেপালের রাজা মহেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ; ২-৩রা জুন জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব; সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের শেষে প্যারিস ও কায়রো পরিদর্শন: প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার বৈঠকে ভাষণ দান; ১লা অক্টোবর রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা: চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ২২শে অক্টোবর তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান; নূতন আক্রমণ চলতে থাকলে এবং চীনা সৈন্য ৮ই সেপ্টেম্বরে পূর্বেকার স্থানে ফিরিয়া না গেলে ভারত কোনও আপোষ-আলোচনায় যোগদান করবে না বলে ২৭শে অক্টোবর তারিখে চীনা প্রধানমন্ত্রীকে এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ; চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ করার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের নিকট বাণী প্রেরণ; ২৭শে সেপ্টেম্বর মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আব্দুল রহমানকে স্বাগত জ্ঞাপন; ৩১শে অক্টোবর সাইপ্রাসের প্রেসিডেণ্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে অভ্যর্থনা; ১লা নভেম্বর অস্থায়িভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ: সকল বিরোধের মীমাংসার জন্য ৩০শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখানের সহিত এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান।

১৯৬৩—১০-১৩ জানুয়ারী চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসার জন্য কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মিঃ আলি সাব্রির সংগে আলোচনা; কলম্বো প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ২৩শে জানুয়ারী সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন; ২৬শে জানুয়ারী গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্বোধন; লেবাননের প্রধানমন্ত্রী মিঃ রসিদ কারামে ও কাম্বোডিয়ার প্রিন্স সিংহানুককে অভ্যর্থনা; দেশে নির্মিত প্রথম বিদ্যুচ্চালিত রেল ইঞ্জিন—'লোকমান্যে'র উদ্বোধন; অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক শ্রীনেহরুর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬৫ সনকে সহযোগিতা বৎসর বলিয়া গৃহীত; ভাক্রাবাঁধের উদ্বোধন; নভেম্বর মাসে লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে অভ্যর্থনা এবং আফ্রিকার দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলন আহ্বান; ডিসেম্বর মাসে জর্ডনের রাজা হুসেনের সংগে সাক্ষাৎ।

১৯৬৪—জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার টিকরেপাড়া বাঁধের উদ্বোধন; ঐ মাসে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় অসুস্থতা বোধ; ফেব্রুয়ারী মাসে নয়াদিল্লীতে ব্রহ্মদেশের বিপ্লব পরিষদের সভাপতি জেনারেল নে উইনের ও সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লীকুয়ান ইউ-এর সহিত সাক্ষাৎ; মে মাসে কোশী ও গণ্ডক পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে নেপালের রাজা মহেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ; সুদানের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ফারিক ইব্রাহিম আবুদকে অভ্যর্থনা; ২৩—২৬শে মে দেরাদুনে অবকাশ বিনোদন; ২৭শে মে অপরাহ্ন ২টায় পরলোক গমন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র— ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য্য।
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

1 JUN 1964

সাপ্তাহিক বসুমতী

আমাদের প্রধানমন্ত্রী

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

৬৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 11th June, 1964 • Vol. 69, No. 3

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস্ • কলিকাতা

সূচীপত্র

756
৫৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৩১
আজকের মানুষ	...	১৩২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৩৩
ভারতপথিক জওহর	হর্ষবর্ধন	১৩৭
নেহরু : সাধারণ আমেরিকানের দৃষ্টিতে	সুশীলকুমার গুপ্ত	১৪০
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৪৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৪৬
ঝাণ্ডা উচা রহে	অরুণ সোম	১৪৯
ভারতদর্শন	...	১৫০
আন্তর্জাতিক	...	১৫৩
প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী	মৈত্রেয়	১৫৯

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বালক কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।
মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।
২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।
৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক
প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নবরত্ন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচ[illegible]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিরহ (ছোট গল্প)	মানবেন্দ্র পাল	১৬১
দুরন্ত দেহলী (কাহিনী-বিচিত্রা)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৬৬
পঞ্চমী পুরাণ (রহস্য-গল্প)	লীলা মজুমদার	১৬৮
অনল আয়তী (উপন্যাস)	সুশীল রায়	১৭১
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৫
কেন্দ্র থেকে (কবিতা)	সরিৎ শর্মা	১৭৮
বকুলের প্রার্থনা (কবিতা)	শান্তি লাহিড়ী	১৭৮
বঙ্গদর্শন	...	১৭৯
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৮২
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৮৪
রঙ্গজগৎ	...	১৮৫
সংবাদ বিচিত্রা	সাংবাদিক	১৮৯
পাঠক মন	...	১৯০
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১৯১

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০

৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

25 Naya Paise
Thursday, 11th June 1964

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর

নেহরুর পর কে ?—অবান্তর এই প্রশ্নের আজ অবসান হয়েছে। ৪৪ কোটি মানুষের প্রতিনিধিরূপে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, নিরহঙ্কার ও অজাতশত্রু এই মানুষটিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে শুধু ভারতের সাধারণ মানুষই লাভবান হলেন না, সারা বিশ্ব তাদের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে লাভ করে আশ্বস্ত ও আনন্দিত।

শ্রীনেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্বের পর একটা শূন্যতা বিরাজ করাই স্বাভাবিক। তবু সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করা সম্ভব হয় যদি সেখানে থাকে, অদম্য কর্ম-প্রেরণা, সর্বসাধারণের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং শ্রীনেহরুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা। শ্রীশাস্ত্রীই আপনার বলিষ্ঠ কর্মোদ্যোগে ধ্যানের তপস্যায় ও পৌরুষদীপ্ত তেজস্বিতায় সেই শূন্যস্থান পূরণ করবার যোগ্যতম পাত্র। স্নেহময়ী জননীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে সেই যোগ্যতম পাত্রের প্রতি—"জান চলা যায় তো যায়, মগর দেশ বানা রহে।" প্রাণ যায় তো যাক দেশের যেন উন্নতি হয়। এই আকাঙ্ক্ষা শ্রীশাস্ত্রীর জননীর মুখে উচ্চারিত হলেও ভারতজননীর কোটি কোটি প্রাণের প্রত্যাশা—আজ যিনি—তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করি। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাবতীয় সদানুষ্ঠানে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দান করছি তাঁকে। শ্রীনেহরুর স্মৃতিকে সদা জাগরূক রাখার জন্য ও তাঁর অসমাপ্ত কর্মকে পরিণতি দিতে আমরা ভারত-কর্ণধার লালবাহাদুরের কাছে অনবরত অনুপ্রেরণা লাভ করবো—এই আশায় আজ আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত।

শ্রীনেহরুর স্নেহধন্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাস বরাবর বিরাজমান। শ্রীনেহরু যখন দেশের কর্ণধার, তখনই শ্রীশাস্ত্রী কর্মতৎপরতার গুণে তাঁর আস্থা অর্জন করেছিলেন। প্রতিটি কর্মেই তিনি যেমন শ্রীনেহরুর সমর্থন লাভ করেছিলেন, তেমনি জনগণের কাছ থেকে পেয়েছেন সবল আস্থা। সেই আস্থা যে কতোখানি সত্য, সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীশাস্ত্রীর নির্বাচনেই তা সম্যক রূপে প্রমাণিত হলো। আমাদের কামনা, এই আস্থা বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে ও দেশোন্নয়নে ভবিষ্যতে আরও সত্যরূপে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে। ভারতের বুকে এখন অন্তহীন সমস্যা, তবু প্রধান যে সমস্যা তা হচ্ছে দারিদ্র্য মোচনের সমস্যা। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রূপায়ণের পথেই এই সমস্যা দূরীকৃত হতে পারে। শ্রীনেহরুর আদর্শায়িত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চাই যে আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ অপরাজিত মনোবল, সেই মনোবলের অধিকারী হচ্ছেন লালবাহাদুর। দরিদ্র শিক্ষকের সন্তান আজ কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের ভাগ্যবিধাতা। শুধু ভাগ্যবিধাতাই নন, ভারত সেবক-রূপে তিনি মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ও শ্রীনেহরুর অনুজ, সুহৃদ এবং আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

সম্পাদকীয়

আজকের —— মানুষ

'আদর্শ' কি কখনও প্রাণ পায়—জীবন্ত রূপ? 'ভাব' কি মূর্ত হয় প্রতিমায়? হয়ত হয়। কেন না, তার স্বাক্ষর রেখেছে ইতিহাস। স্বীকৃতি দিয়েছে মহাকাল। এই ব্যঞ্জনাতেই কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে আছে যুগ-যুগান্তরের নানা দীপ্ত চরিত্রের মিছিল। নানা জনের ভাব, আদর্শ ও নিষ্ঠার দৃপ্ত কাহিনী। অনুসন্ধিৎসু মনের ইতিহাসচারণে এমনই ভাবে ধরা পড়েছে এক একটি দিন।

১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর মতিলাল নেহরুর বংশের আদরের দুলালী জওহরলাল-দুহিতা ইন্দিরা প্রথম আলো দেখেছেন বিশ্বের। সেদিন থেকেই তাঁর আদর্শ চিরতরুণ পিতা স্বয়ং ভাবীকালের জন্য গড়ে তুলেছেন তাঁকে। যেন কোনও নিপুণ শিল্পীর অত্যন্ত নিখুঁত যত্নে তৈরি এক ভাব-বিগ্রহ। তিলে তিলে এমনই ভাবেই দিনে দিনে বড় হয়েছেন ইন্দিরা—জওহরলালের বড় আদরের 'ইন্দু'।

আরও একদিন তাঁর জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। তখন রোগাক্রান্ত কমলা নেহরু। জীবনের শেষ লগ্নের পদধ্বনি শুনে শঙ্কিত ব্যাকুল চিত্তে ইন্দিরার হাত ধরে উপনীত হ'য়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। কন্যার জন্য চেয়েছিলেন আশ্রয়-আশ্বাস। তা নইলে জীবনের শেষ মুহূর্ত যেন নিশ্চিন্ত হয় না। কিশোরী ইন্দিরাকে সেদিন বুকে তুলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন-দর্শনের স্নিগ্ধ-বিপুল ছায়ায় সেদিন ইন্দিরা শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায় পিতা জওহরলালের শিক্ষাকেই আরও নিবিড় করে পেলেন। এমনই অনেক মুহূর্তের মালা গেঁথে নিজের জীবনপাত্র পূর্ণ করেছেন ইন্দিরা—'প্রিয়দর্শিনী'। সমাজে, রাজনীতিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও এ অনুসৃত আদর্শের মৃত্যু ঘটে নি।

একজন মহিলা হয়েও সারা ভারতের কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা নির্বিশেষে জনগণের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন। শ্রীনেহরুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের দীক্ষায়, উদ্বুদ্ধ প্রধানদের অন্যতম তিনি। এ আদর্শের মূল সত্যকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন পিতার কাছেই, পিতার সাথে, কিম্বা পিতার প্রতিনিধি হিসেবে, কখনও বা সারা ভারতের জনতার প্রতিনিধি হ'য়ে তিনি সারা বিশ্বের নানা দেশের বহু মানুষের মধ্য থেকে লাভ করেছেন অমূল্য অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন সময়ে প্রমাণ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক পারদর্শিতা। এমন কি, জন-জীবনে আমরা প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে পেয়েছি অনেকটা ইন্দিরার জন্যেই। প্রাণপাত সেবায়, 'স্নেহের শাসনে' তিনি তাঁর পিতার মনে আশার সঞ্চার করেছেন বারবার। রোগে, শোকে, বিপর্যয়ে, পরম আদরে কন্যা এসে পিতার হাত ধরেছে। একমাত্র সন্তানের ব্যথা-বেদনা-আনন্দ-আবদারের মধ্য দিয়েই দেশের কোটি কোটি 'স্নেহার্থী' পুত্র-কন্যার অভাব, আশা বেজে উঠেছে দেশনায়কের মনে। মহানায়কের প্রেমপ্রবাহ তাঁকে কেন্দ্র করেই দেশকালের প্রাকার চূর্ণ করে পৌঁছেচে দিশে দিশে। এলাহাবাদের আনন্দভবন, শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য' পিতা নেহরুর [illegible]

—সর্বোপরি বিশ্বের মানবজীবনের মহাবিদ্যায়তন থেকে যে দুর্লভ জীবনবেদ তিনি পাঠ করেছেন তার আলোকে তিনি অতুলনীয়া।

তবুও তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি জওহরলাল-দুহিতা, বিশ্বমানবতার পথিকৃৎ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মহান উদ্গাতার আপন আদর্শের প্রাণময় মূর্তি। তাই নেহরুর পর কে?—এ প্রশ্নের উত্তরে দেশ-বিদেশের অনেকেই ভেবেছিলেন তাঁর কথা। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির অকস্মাৎ ইঙ্গিতে বিষণ্ণ মেঘ এসে আচ্ছন্ন করেছে ভারতের ভাগ্যাকাশ। শ্রীনেহরু আমাদের সবাইকে অপ্রস্তুত করে চলে গিয়েছেন সকল সীমানার ওপারে। জীবনের চরমতম আঘাতে নিথর পাষাণ প্রতিমার মত অবাক হ'য়ে গিয়েছেন ইন্দিরা। নিরন্তর যে স্নেহমন্দাকিনী তাঁর মনোভূমিকে সিক্ত করত, আজ তা গিয়েছে হারিয়ে। শুকিয়ে গিয়েছে জীবন—কিন্তু বৃন্তচ্যুত কুসুম। সমবেদনায় বিশ্ব মানুষের হৃদয় উৎসারিত স্নেহ-প্রীতির প্রবাহ তাই লেগেছে তাঁর মনের তটে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—শ্রীনেহরুর ভাবশিষ্য—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের বিশ্ব-শান্তিযজ্ঞের উত্তর পুরোধা। তিনি তাঁর ভারত নির্মাণ সাধনায় সাহায্য চেয়েছেন ইন্দিরার। ব্যক্ত করেছেন দেশবাসীর অন্তরের একান্ত অভিলাষটি। আজ তাঁর দায়িত্ব অনেক। তাঁরই আশায়, অপেক্ষায় উৎকর্ণ আছে সবাই। শোক-সন্তাপে আজ আমাদের আরও কাছে এসেছেন ইন্দিরা। উদ্বেলিত জনতার শ্রদ্ধার প্লাবনে নানা দুর্যোগেও শক্ত হাতে হাল ধরেছেন শ্রীনেহরু। বিশ্বাস করি: সেই প্রিয় নেতারই 'আদর্শধন্যা কন্যার বিষাদরুদ্ধদুয়ারও উন্মুক্ত হ'বে দেশবাসীর সমবেদনা শুভেচ্ছার জোয়ারের আঘাতে। আমরা শ্রীনেহরুর উত্তরসাধক। আমাদের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে তাই প্রেরণা দেবেন—' তাঁরই ভাবপ্রতিমা ইন্দিরা—তাঁর দেশ তৈরির আরব্ধ প্রয়াসে [illegible] তিনি।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

বোদ্‌লেয়ারের এই 'মাতাল' হবার আমন্ত্রণ আমার কাছে শিল্পীর পরমার্থ উপলব্ধিরই বিশেষ একরকম উদাহরণ বলে মনে হয়। এ কোনো শুক্‌নো তত্ত্বজ্ঞানের উদাহরণ নয়। জীবনের মূলে এই রকম গভীর পিপাসার তাড়না ভোগ করেন কেউ কেউ। বোদ্‌লেয়ারের লেখাতেও সেই অকৃত্রিম তাড়নারই পরিচয়। সুলি-প্রুধোমের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব তুলনার কথাটা নিতান্তই আনুষঙ্গিক নয়। এঁরা ভিন্ন চেতনার মানুষ, কেউ কারও সঙ্গে মেলেন না। বরং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ ধরে মালার্মের কবিতা পড়তে-পড়তে একদিন তাঁরই একটি লেখার সঙ্গে বোদ্‌লেয়ারের এই মনোভাবের সাদৃশ্য অনুভব করা গিয়েছিল। 'মৃতকল্প বৃদ্ধ যেন বকধর্মে হঠাৎ বিরূপ'—সেই বিরূপতা দেখা দেয় মাঝে মাঝে। মাঝে-মাঝে জগতের লাভ-ক্ষতি-হিসেব-নিকেশের রাজপথ জনপথ হঠাৎ যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। নিয়ম-মাফিক ভদ্রতা, কেতাদুরস্ত সৌজন্য, অবশ্যপালনীয় শ্রেয়-নিষ্ঠা ইত্যাদি সুসংস্কারগুলি সরে দাঁড়ায়। ধ্বংসের অকাট্য আয়োজন চোখে পড়ে দিগ্‌বিদিকে। সে মুমূর্ষুবোধ থেকে উদ্ধার পেতে চাই আমরা।

কিন্তু তুমি-আমি আসবো, যাবো—জ্বলবো, জ্বালাবো। আমাদের উদ্ধার করবে কে? সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে মালার্মের সেই চিন্তার ঢেউ জেগে ওঠে মনের মধ্যে—

মাদকে সে উজ্জীবিত, অচিরাৎ ভোলে
বিভীষিকা—
আরতির ঘৃত, ঘড়ি, রোগশয্যা,
কাসি ও পাঁচন;
সন্ধ্যার শোণিতে স্নাত নগরীর
যত অট্টালিকা
পেরিয়ে, আলোর ভারে থেমে যায়
দিগন্তে নয়ন ॥

সে-উত্তেজনা কখন দরকার? যখন—'অসাড় আমার আত্মা সংসারীর পঙ্কমূল সুখে।' সেই পঙ্ককুণ্ড থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার জন্যেই মাতাল হতে হবে। চাই সঞ্জীবনী। চাই মায়ামুকুর।

নিজেকে দেবতা-রূপে চিনি আমি
সে-মায়ামুকুরে
হোক কলাকৌশলে বা মন্ত্রবলে,
মরে, বেঁচে উঠি,
আকাশকুসুমে গাঁথি জয়মাল্য,
অবারিত দূরে
মাধুর্যের জন্মভূমি যেখানে,
সে-প্রত্ন-তীর্থে ছুটি ॥

কিন্তু 'মাতাল' হলেও কি সত্যিই মুক্তি পাওয়া যায়? সুধীন্দ্রনাথের সেই অনুবাদের শেষ স্তবকটিতে সেই দীর্ঘশ্বাসের যন্ত্রণা বেজেছিল। স্তেফান মালার্মের সেই যন্ত্রণা আমি বোদ্‌লেয়ারের সঙ্গে একপাত্রে পান করবার চেষ্টা করেছি। মনে পড়ছে—

হা, রে তিক্ত অভিমান, সত্যই কি
সম্ভব নিস্তার—
পিশাচলাঞ্ছিত ব'লে, কৈলাসের
অস্তিত্ব না রাখা,
অকূলস্থ অধঃপাতে মাপা মহাশূন্যের
বিস্তার
নিখিল নাস্তিতে ওড়া, মেলে
পুচ্ছবিরহিত পাখা?

এ সব কি শুধু দুঃখবাদ?—শুধুই যন্ত্রণার আকৃতি? এই মদ, আর মাধুর্যের আবাহন,—রোগ-শোক-আধি-ব্যাধির এই কাব্যোচ্ছ্বাস,—এ আমার কখনোই কোনো দুরপনেয় অন্ধকার বলে মনে হয় না। এ কবিদের পরমার্থ-উপলব্ধিরই উদাহরণ। বোদ্‌লেয়ারও সেই পথের পথিক, মালার্মেও সেই পথেরই।

মালার্মের জন্ম হয় প্যারিতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৮৯৮। বোদ্‌লেয়ারের মতন তিনিও এড্‌গার অ্যালান পো-র কিছু অনুবাদ রেখে গেছেন ফরাসী ভাষায়। পোল ভার্লেনের চেয়ে বয়সে বছর-দুয়েকের ছোট ছিলেন তিনি; আর, ভার্লেনের মৃত্যু হয় তিনি লোকান্তরিত হবার দু'বছর আগে,—অর্থাৎ ১৮৯৬এ। ভার্লেন, আর মালার্মে—এই দুই কবিই ফরাসী কাব্যের সে-পর্বে প্রতীক চর্চার বিশেষত্ব দেখিয়ে গেছেন। ভার্লেনের চেয়ে আর্থার র‍্যাঁবো ছিলেন বয়সে বছর-দশেকের ছোটো। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৫৪তে, মারা গেছেন ১৮৯১এ। তিনিও প্রতীক-চর্চায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতীকের প্রসঙ্গটাও এখানে আনুষঙ্গিক। আমি এঁদের পরমার্থ বোধের কথা ভাবছিলুম। সে-কথা ভাবতে গেলেই একালের বাঙালী কবিদের বিষাদ-বিক্ষোভের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথের নিজের কবিতা, যার রচনাকাল ১৮ই মার্চ, ১৯৫৩,—যাতে র‍্যাঁবো-র উল্লেখ ছিল—যাতে তিনি লিখেছিলেন—

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে;
বীর নই,
তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে,
বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের
স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী,
প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক
বিমুখ অতীতে।

যাতে তিনি একথাও বলেছিলেন যে,—আমরা সকলেই ত্রিশঙ্কু-অবস্থার

বিদ্যমান,—'সে-খণ্ড বিশ্বের মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি, নাস্তিরই বিবর্তবাদ।' এই অস্তিবোধেরই আর এক দিকে আমি শুনেছিলুম মালার্মের মাস্তলের গান। সেও সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে। তাঁর 'প্রতিধ্বনি'র সেই 'সমুদ্রসমীর' নামে অনুবাদ-কবিতাটি আমি তাঁর 'সংবর্ত' বইয়ের 'যযাতি'র সঙ্গে মনে মনে কতোবার যে মিলিয়ে দেখেছি। আর, প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে যে, এরই নাম একালের পরমার্থচিন্তা।

আমাদের বোধ-বুদ্ধির সক্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে কি না জানি না। কিন্তু যতো তর্কই জমুক, যতো বিশ্লেষণই চলুক, একথা ঠিকই যে, একালে আমরা ভবিতব্যের এই উপহারই দেশে দেশে নানান সাহিত্যে, নানা ভাষার বিভিন্ন কলা-কৌশলের মধ্য দিয়ে পাচ্ছি। এ আমাদের একালের অদৃষ্ট। এ অদৃষ্ট অনিবার্য এবং ভয়াবহ। এই অদৃষ্টের কথা ভাবতে বসলে মহাভারতের কর্ণের কথা মনে পড়ে।

বনপর্বে কর্ণের কবচকুণ্ডল দানের কথা আছে। পাণ্ডবদের বনবাসের বারো বছর যখন প্রায় উত্তীর্ণ, সেই সময়ে ইন্দ্র কর্ণের শক্তি ক্ষয় করবার জন্যে উদ্যত হন। সূর্য কর্ণকে সাবধান করে দেন। ইন্দ্র যখন ব্রাহ্মণবেশে সদ্যস্নাত কর্ণের কাছে তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তখন কর্ণ প্রথমে তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেন। পরে, সূর্যের পরামর্শ অনুসারে তিনি শত্রুর ধ্বংস সাধনে সমর্থ অন্য অস্ত্রের প্রার্থনা জানান। কর্ণের সে-প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ইন্দ্র কিন্তু কর্ণকে জানিয়ে দেন যে অন্য অস্ত্র থাকতে কিংবা নিজের প্রাণ বিপন্ন না হলে কর্ণ যদি তা প্রয়োগ করেন, তাহলে সে-অস্ত্র তাঁর নিজের ওপরেই পড়বে।

এতৎসত্ত্বেও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে, প্রথমে কর্ণপুত্র বৃষসেন অর্জুনের বাণে নিহত হন। তারপর অর্জুনের আঞ্জলিক বাণে কর্ণের নিজের মাথাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

অদৃষ্টের শাসন লঙ্ঘন করা মানুষের সাধ্য নয়। সেকালের কর্ণও তা পারেন নি, একালের কবিরাও তা পারছেন না।

অথচ উনিশ শতকে আমাদের দেশে সাহিত্যে পরমার্থ-সন্ধানের চেহারা ছিল অন্যরকম। তাতে আশা ছিল, বিশ্বাস ছিল, শুভাস্তিবাদ ছিল। আজকের ব্যাপক দুঃখবাদ আর বিক্ষোভ আমি তারই সঙ্গে সংযুক্ত করেছি। সে কি সংযোগ? এক প্রহরের সঙ্গে অন্য প্রহরের কি সত্যিই কোনো মিল হয়?

সাহিত্য-চিন্তার দিকে মন রেখে, গত শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারা লক্ষ্য করলে রাত্রির অন্ধকার থেকে ক্রমশ যেন মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে এগিয়ে আসবার স্বাদ মনে আসে। রামমোহন থেকেই এই আলোকপথের সূচনা। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র—এই তিন মনীষী দেখা দিয়েছিলেন রামমোহনের মৃত্যুর অল্পকাল পরে। তারপর রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়।

রামমোহন ছিলেন বহুকর্মা ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর যেমন প্রধানত সমাজ আর ভাষার ভাবনা ভেবে গেছেন, রামমোহন তাঁর আগে এসে তেমনি প্রধানত ভেবেছিলেন সমাজের ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'ভারত-পথিক রামমোহন'। কারণ, বাঙালী হয়েও রামমোহন প্রাদেশিক ছিলেন না; তাঁর মন ছিল ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের ঐক্যসন্ধানী—যেমন, কবীর ছিলেন আরো আগের কালে।

মধ্যযুগের আর এক সাধক-কবি রজ্জব-এর কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, যথার্থ ভারতপথিক যাঁরা, তাঁরা জানেন যে, ঐক্যের পথই যথার্থ ভারতের পথ। এই পর্যন্ত এসে, রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলে গেছেন—'যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল, সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন।'

তিনি আরো বলেছেন যে, রামমোহন ছিলেন "চিরকালের মতোই আধুনিক"। কারণ, "তিনি যে-কালকে অধিকার করে আছেন, তার এক সীমা পুরাতন ভারতে; কিন্তু সেই অতীত-কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্যদিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে।"

১৩৪০ সালের পৌষ মাসে রামমোহন-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সভাপতির আসন থেকে তাঁর এই মন্তব্য উচ্চারিত হয়। এই উৎসবে তাঁর প্রিয় কবিতাও শোনা গিয়েছিল—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে। - - -"

কিন্তু, সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে অসাধারণ বাঙালীর তফাৎ আছে। অসাধারণত্ব ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। বিদ্যাসাগরকে রবীন্দ্রনাথ যেখানে অসাধারণ বাঙালী বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে প্রশংসার অভিপ্রায়েই ঐ বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং বক্তব্য বিষয়টি সুপরিস্ফুট করবার জন্যেই লেখক লিখেছিলেন—"সাধারণ লোকের মধ্যে মন নামক যে একটা ব্যা রি আছে বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে। কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। - - - মননক্রিয়া রা যে মন জীবিত, তাহাকে আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। দশ জনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভ ।"

১৩০৫ সালের এই আলোচনার মধ্যেই তিনি লেখেন—"মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ রি, তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। - - - অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া

শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মন:পুত্তলী-যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে এক প্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি; ভক্তি করি না, পূজা করি: চিন্তা করি না, কর্ম করি।”

সাধারণ লোক গতানুগতিক। মননজীবী লোক পারমার্থিক। রাম-মোহন এবং বিদ্যাসাগর উভয়েই এই অর্থে পারমার্থিক লক্ষ্য বরণ করে নিয়েছিলেন। এঁরা প্রধানত: সাহিত্য-কীর্তির জন্য স্মরণীয় না হলেও, উনিশের শতকের আধ্যাত্মিক জাগরণের যে ঘাত-প্রতিঘাত সে-যুগের বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, এঁরা উভয়েই ছিলেন সেই আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরমার্থের উপলব্ধি লগ্ন-সাপেক্ষ। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই তো লগ্ন-সাপেক্ষ। অর্থাৎ শুধু পরিশ্রম আর পরিচর্যা,—মনন আর অধ্যবসায়ই যথেষ্ট নয়। প্রবাহের মধ্যে বিশেষ তরঙ্গের অভ্যুদয়ের জন্যে বিশেষ বাতাস চাই, আকাশ চাই, সুযোগ বা দুর্যোগ চাই। পথে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ যেমন কোনো-কোনো দিন নতুন দৃশ্যের মুখোমুখি হওয়া যায়।

কিন্তু একালের সাধারণ ছন্দটাই অন্যরকম। একালের কপালে নেই সে-সম্ভাবনা। এ অন্য সম্ভাবনার জগৎ।

যাক্ এ দু:খের ছবি যাক্। ভাবতে চেষ্টা করি সুখের দৃশ্য। মনে পড়ে—শিলচর থেকে জীপ ছেড়েছিল সকাল আটটায়। বরাখ নদীতে মার-বোট-এ গাড়ি পার হয়েছিল। সেইসঙ্গে যাত্রীরাও। তারপর আবার রাস্তা। পীচের পথ সকালের বৃষ্টির জলে ভিজে। সামনের দিগন্তে নীল পাহাড়ের দেয়াল। পথের মাঝে ছোটো ছোটো গ্রামের বসতি। বাঙালী, আসামী, সেইসঙ্গে লুসাই, মিজো, নাগা ইত্যাদি জাতির মুখাবয়বের সমাবেশ চোখে পড়েছিল। নৃতত্ত্ববিদ বললেন, এদের মধ্যে অনেক কোল আছে, বিহারীও অনেক আছে, বর্ধমানের বাঙালীও আছে। সব মিশে আছে, মিলে আছে।

এক জায়গায় জীপ থামিয়ে নামতে হয়েছিল সকলকেই। গাছ দেখবেন উদ্ভিদ্‌বিদ্। তিনি বলেছিলেন —‘এই দেখুন এরই নাম আয়াপান, কোথাও বলে বিশল্যকরণী। পাতাগুলো মসৃণ, চিকণ, গাঢ় সবুজ। ডাঁটার রঙ বেগুনী। পাতা উল্টে বেগুনী

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office **: 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

শিরাগুলো দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের।

বললেন: 'বিধানবাবুর খুব প্রিয় ছিল এই গাছ। ইণ্টারন্যাল হেমারেজের প্রতিষেধক।'

আগরতলা বিমানবন্দরেও সেই গাছেরই বেড়া দেখেছিলুম, মনে আছে। মনে পড়লো সেই ছবি। এক ছবির সঙ্গে জীবনের অন্য ছবি এইভাবেই জুড়ে থাকে। অনুষঙ্গ। ঝিম্ ঝিম্ করছে সকালের গ্রাম। তারই মধ্যে দাঁড়কাকের গাঢ় কা-কা ডাকে অনুষঙ্গের সুতোয় টান পড়লো। সায়াপান দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘড়িতে চোখ পড়েছিল উদ্ভিদ্‌বিদের।

হঠাৎ বলে উঠেছিলেন—'চলুন, আর দেরি নয়।'

আবার জীপ ছেড়েছিল। পথে মধুরা নদী। মাটিতে কেয়োলিনের শাদা পলি। নদীতে জল কম। ঢালু খাদে নেমে, সাঁকো পেরিয়ে গিয়েছিল জীপ। আরোহীরা পায়ে হেঁটে পার হয়ে, ওপারে গিয়ে আবার উঠেছিলেন একে একে। আরো ঘণ্টাখানেক এগিয়ে পাহাড়ের উঁচু-নীচু ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে আরো নির্জনতায় পৌঁছোনো গিয়েছিল।

সেখানে বনভূমি আদিম, অকপট, নিরবচ্ছিন্ন। পাহাড়ে মেঘ জমে ছিল, শ্বেতাভ-নীলাভ আস্তরণ। চারদিকে রোদ, গাছ, ঘাসের আচ্ছাদন, মাটির প্রাণ। সময়ের স্রোতের চিহ্ন সেই খাশপুর।

খাশপুর কাছাড়ের রাজধানী ছিল। বাঁয়ে স্নানমণ্ডপ, ডাইনে দশ মিনিট হাঁটতেই আমাদের চোখে পড়েছিল রণচণ্ডীর মন্দির। সেখানে মূর্তি নয়, প্রতিমা নয়,—তলোয়ার ছিল এক সময়ের। বীরত্বের প্রতীক। ছোটো ছোটো ইঁটে গাঁথা, মোগল আমলের পদ্মলতার কাজ। রামমোহনের আমল সেটা। ১৮৩০—৩১-এ সেখানে রাজগৌরবের শেষ রবিরশ্মি।

মনে আছে, হঠাৎ এই অবান্তর দৃশ্য থেকেই রামমোহনের ভারতপথ পরিক্রমার অদৃশ্য ধ্যানটি ক্ষণিকের জন্যে আমার কাছে প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়েছিল।

কোন্ রূপ থেকে কোন্ বোধ যে জেগে ওঠে। পরমার্থ উপলব্ধির রাস্তা কি কেবল তর্কের শুকনো জমির বন্ধুরতার মধ্য দিয়েই? পরমার্থবোধ কি দার্শনিক ব্যাখ্যাই কেবল? বোদ্‌লেয়ার, মালার্মে, সুধীন্দ্রনাথ—এঁরা কেউই সে-পথের যাত্রী ছিলেন না। কবিতায় কি অতিতর্ক চলে? কবিতা কি বাগ্মিতা? সে অন্য আয়োজন, অন্য ভঙ্গি।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে একটি উদাহরণ মনে আসছে। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৪৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'মেঘদূতের' দার্শনিক ব্যাখ্যা নামে এক প্রবন্ধে খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতকের কবি কালিদাসের বেদান্ত-জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। বেদান্তে যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তাতে এই কথাই বক্তব্য যে, আমাদের আত্মা—অর্থাৎ 'প্রত্যগাত্মা' বা 'জীবাত্মা' আর 'ব্রহ্ম' অভিন্ন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবের পুরুষার্থ। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব বা অনন্যত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হইয়াই যেন কালিদাস বেদান্ত-মতের অনুসরণ করিয়া এই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদনে যুক্ত হইয়াছেন এবং সেই রসস্বরূপ আনন্দময় পরমাত্মাতে যদি জীবাত্মা নিজেকে বুঝাইয়া দিতে পারেন তবেই উভয়ের নিরন্তর অন্যোন্য তাদাত্ম্য উপলব্ধ হইতে পারে—এই গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বই, কবি লৌকিক ব্যবহার স্বীকার করিয়া যক্ষ ও যক্ষিণীর বিরহব্যথা ও উভয়ের মিলনবার্তার বর্ণনা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন—আমাদের নিকট এইরূপ ভাব প্রতিভাত হয়।

ব্রহ্মকে জানবার সাধনার 'জ্ঞান'-কেই প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করতে হয়। এই জ্ঞান জাগলেই মায়ার কুয়াশা কেটে যায়। অধ্যাপক বসাকের মতে—কালিদাস মেঘদূত-কাব্যে 'যক্ষিণীরূপিণী' 'পরমাত্মার' সঙ্গে 'যক্ষরূপী জীবাত্মার' ঐকান্তিক মিলনের সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।—এবং সেই একই প্রয়াসে তিনি 'মেঘরূপী জ্ঞানের পথও নিরূপণ' করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন—'বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত 'উত্তর-পথ' জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পথ। সেই পথ দিয়া মোক্ষবিদ্যাধিকারী জীবের জ্ঞানরূপ সহচর বন্ধু বিচরণ করে এবং সেই পথ দিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইয়া, সে অবশেষে হর্ষ-শোকের অতীত পরমাত্মার সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেয়।' এই ধারায় মেঘদূত কাব্যের পরিকল্পনা আর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ সত্যিই অভিনব ব্যাপার। পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবাত্মা যে পরমাত্মা থেকে ব্যবহিত,—অর্থাৎ 'দূরসংস্থ', তাতে সন্দেহ নেই। মেঘদূতে মেঘ যেমন যক্ষ-যক্ষিণীর মধ্যবর্তী দূত,—জ্ঞান তেমনি জীবাত্মার দূত,—পরমাত্মা আছেন ব্রহ্মলোকে,—অলকানগরীতে। জ্ঞানের পথ সরল নয়,—সে পথ দুর্গমের সন্ধানী।—সে এক বক্র পথ। মেঘদূতে মেঘের পথও—'বক্রঃ পন্থা যদাপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাম্।'

এসব দার্শনিক মতামত, তর্ক-বিতর্ক যে-ধরনের চিন্তা, তার সঙ্গে কবিতার সঞ্জীবনীর যোগ নেই। এসব শুকনো কথা, —পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য। এসব জ্ঞানের কথা। আমি এসব কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু পণ্ডিতরা নিশ্চয় ভুল বুঝবেন না আমাকে—এতে মন কাঁপে না, দোলে না, নাচে না। এর চেয়ে আমি ভাবি—

দেহ দুঃখময়, হায়।
সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ
উড়ে যাওয়া বহু দূরে।
জানি মহাকাশের আবেশ,
সিন্ধুর অচেনা ফেনা
আপ্ত বলে বলাকা মাতাল।

স্তেফান মালার্মের এই নাস্তিবাদ, দুঃখবাদ,—প্রাকৃতিক আবেশবাদ আমাকে গভীরভাবে একালের পরমার্থ-অনুভূতির কাছাকাছি এনে দেয়। (ক্রমশঃ)

ভারত পথিক জওহরলাল

হর্ষবর্ধন

জওহরলাল নেহরু তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, তাঁর মরদেহের যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা আকাশ থেকে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়াগের গঙ্গা ও হিমালয়ের পর্বতমালায় ভস্ম দেবার পরেও যা থাকবে, "তার সমস্তটাই বিমানে করে নিয়ে যাও ঊর্ধ্বাকাশে, সেখান থেকে ছড়িয়ে দাও ভারতের চাষীরা যেখানে কাজ করছে, ক্ষেতে-খামারে, সর্বত্র, এক কণিকাও অবশিষ্ট রেখো না। ভারতের মৃত্তিকায় ও ধূলিতে তারা মিশে যাক, আত্মবিলুপ্তির পথে লীন হয়ে যাক ভারত-দেহে।" ভারতের প্রতি ধূলিকণাকে নেহরু গভীর-ভাবে ভালবেসেছেন, তাই মৃত্যুর পর তার মধ্যেই তিনি লীন হয়ে যেতে চেয়েছেন।

নেহরু ভালবেসেছেন ভারতকে, ভারতের সাধারণ মানুষকে। সতেরো বছর ধরে নবীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কোথাও তিনি সফল হয়েছেন, কোথাও বা হন নি। কিন্তু তাঁর সব কীর্তিকে ছাপিয়ে অম্লান হয়ে রয়েছে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে স্বদেশবাসীর প্রতি এই ভালবাসাই তাঁকে আয়াসের জীবন থেকে পরে ধুলোয় নামিয়েছে। নৈনিতালের কৃষকদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে নেহরু সেদিন যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাতেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, এবং ভারতবাসীর দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও কুসংস্কার দূর করতে হবে, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেদিন যে তরুণ ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁর আর ঘরে ফেরা হয় নি। যে যাত্রা সেদিন সুরু হয়েছিল, দীর্ঘ পথের শেষে ২৭শে মে রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে এসে তা থেমেছে।

ভারত কল্যাণ-ব্রতের কঠিন সংকল্প পালন করতে গিয়ে জওহরলাল নেহরুকে নিদারুণ দুঃখকেও বরণ করে নিতে হয়েছে। কংগ্রেসের কর্মী, নেতা ও কর্ণধাররূপে কৃষক, শ্রমিক ও যুব আন্দোলনের সংগঠক ও নেতারূপে নেহরু কঠোর পরিশ্রম করেছেন, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। এর জন্য তিনি কারাবরণ করেছেন, অন্যান্য ক্লেশও স্বীকার করেছেন। দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুখভোগ তাঁর ভাগ্যে বেশিদিন জোটে নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম তাঁকে করতেহয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদের বাধা অতিক্রম করে নতুন ভারতের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। সকল বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নেহরু প্রায় একক সংগ্রাম করেছেন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে, তাঁর সাধের জীবনাদর্শ জোট-নিরপেক্ষতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের শিখাকে অনির্বাণ রাখার জন্য।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেহরু সংগ্রাম করেছেন, সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে একটানা সতেরো বছর সেই ভারতের সর্ববিধ উন্নয়নের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিদেশে ভারতের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কোরিয়া, সুয়েজ, লাওস, কঙ্গো —বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। দেশে উন্নয়ন-যজ্ঞের পুরোহিতরূপে নেহরু কৃষি, শিল্প, সমবায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ এনেছেন। একের পর এক নদী পরিকল্পনা হয়েছে—বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে কারখানার সংখ্যা বেড়েছে, রাস্তা-ঘাট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ; শিক্ষা গ্রাম থেকে গ্রামে প্রসারিত হয়েছে।

নেহরুর সব কাজের মূলে ছিল, জনসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা। স্মৃতিলিপিতে নেহরু নিজের সম্পর্কে বলছেন, "এই একজন মানুষ যিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন ভারত আর ভারতের জনগণকে। ভারতের জনগণও তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাঁরা তাঁকে অফুরন্ত ভালবাসায় অভিষিক্ত করেছেন।" এই ভালবাসার টানেই নেহরু রাত-দিন পরিশ্রম করতেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'ঋতুরাজ বসন্ত' বলে অভিহিত করেছেন সেই চিরযৌবন নেহরু চুয়াত্তর বছর বয়সেও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। নেহরুর মৃত্যুর পর রাজাজী দুঃখ করে বলেছেন, এমন পরিশ্রম না করলে নেহরু আরও অনেক বৎসর বাঁচতে পারতেন। কিন্তু মানুষকে ভালবেসে, ভালবাসার টানে যিনি পথে

বেরিয়েছেন, তাঁর পক্ষে কি হিসাব করে চলা সম্ভব? এঁরা তো বিষয়-হিসেবী সাধারণ মানুষ নন। এঁরাই দেশকে ভালবেসে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চ চুম্বন করেন, আবার এঁরাই চিকিৎসকের নির্দেশ অমান্য করে বয়সের বাধা অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের জন্য কর্মযজ্ঞে—অক্লেশে মৃত্যুবরণ করেন।

নেহরু আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। যুদ্ধের অবসান, শান্তি প্রতিষ্ঠা, মারণাস্ত্র বিলোপ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় নেহরুর অবদান আজ সারা বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। কিন্তু তাই বলে তিনি জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান নায়ক। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। যে জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম সৃষ্টি করে, জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে ভালবাসতে শেখায়, কিন্তু অপর জাতিকে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করে না, অন্যকে ঘৃণা করতে বলে না, সে জাতীয়তাবাদ নেহরুর জাতীয়তাবাদ। আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নেহরু তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

ভারত-সংস্কৃতির মূল সুর নেহরু ধরতে পেরেছেন, তাকে স্বীকার করেছেন। 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্পর্কে আলোচনায় এক স্থানে তিনি বলেছেন, ভারত কখনও অপরকে অস্বীকার করে নি, "ঔদার্যেই তার মহত্ত্ব। সে বিশ্বাস করত সত্যের বহুরূপে। 'সত্য' অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ। সুতরাং একজন মানুষ কি করে বলবে যে, সে 'সত্যকে' পেয়েছে? 'সত্য-সন্ধানী' সত্যের একটি রূপকে পেতে পারেন। অতএব কি করে তিনি বলবেন যে, তাঁর পথ অনুসরণ না করলে 'সত্যকে' পাওয়া যাবে না? তাই ভারত চিরকালই এই সত্য সন্ধান

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে—জাতির তিন কর্ণধার

ও তার নৈতিক মূল্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্যেও এটাই বোধ হয় ভারতীয় সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।" ভারতীয় সংস্কৃতির এই আদর্শ অনুসরণ করেই নেহরু 'পঞ্চশীলে' বিশ্বাসী। ভিন্ন মতাদর্শ ও জীবনধারা নিয়ে নানা জাতি শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করতে পারে, জোরের সঙ্গে নেহরু একথা বলতে পেরেছেন।

নেহরু ভারতকে আধুনিক ভাবধারায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ধর্মীয় অন্ধতার দ্বারা তিনি জাতিকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে নেহরু নবীন ভারত গঠনের চেষ্টা করেছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন। বিদেশ থেকে প্রয়োজন মত সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

নেহরুর হাতে গড়া ভারতের রাষ্ট্রিক আদর্শ কি? নেহরু নিজেই মার্কিন ত্রৈমাসিক পত্র 'ফরেন অ্যাফেয়ার্সের' এপ্রিল, '৬৩ সংখ্যায় 'চেঞ্জিং ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

"স্বাধীনতার সূচনা থেকেই যে দুটি মূল নীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি তা হচ্ছে জাতীয় ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা। আমাদের রাষ্ট্রের এই মূল নীতি কোন খেয়ালখুশি বা আবেগবশে নির্ধারিত হয় নি, এই নীতির ভিত্তি হচ্ছে আমাদের অতীত ইতিহাস ও চিন্তাধারা এবং জাতির মৌল স্বার্থ। এখন ভারতের সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে জন-সাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করা। এর জন্য একদিকে যেমন চাই

● শ্রীনেহরু, শ্রীনন্দ ও শ্রীকৃষ্ণমাচারী

সমাজ কাঠামোতে দ্রুততম সাংগঠনিক পরিবর্তন, তেমনি এই পরিবর্তনের পশ্চাতে বিপুলতম গণসমর্থন ও জনতার অংশ গ্রহণ। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি, এবং ভোটাধিকারীর সংখ্যা ২০ কোটি; পৃথিবীর গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জনসংখ্যার আয়তনে ভারতই বৃহত্তম। গণতন্ত্রের নীতি ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে ভারত ইতিমধ্যেই অনেক আধুনিকীকরণের কাজে হাত দিয়েছে।

গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা আমাদের আন্তর্জাতিক নীতির একাংশ মাত্র। শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, উপনিবেশবাদের অবসান, বর্ণবৈষম্যের বিলোপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এগুলিও আমাদের আন্তর্জাতিক নীতির অঙ্গ। কোন একটি বিশেষ সামরিক জোটের গাঁটছড়ায় বাঁধা না থেকে সব দেশের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব, পোষণ করাই আমাদের আচরিত নীতি।"

নেহরু যে বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, বারে বারে তাতে আঘাত পেয়েছেন। তিক্ততা ও ভ্রাতৃ-বিরোধের অবসানের আশায় দেশ বিভাগ মেনে নেবার পরই পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ, এবং বান্দুং-পঞ্চশীলের অব্যবহিত পরেই তিব্বতের প্রতি চীনের অন্যায় আচরণ থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত চীনের ভারত আক্রমণ নেহরুর বিশ্বাসের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু নেহরু তাঁর আদর্শকে ত্যাগ করেন নি। জাতীয় রাজনীতিতে ব্যথিত চিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর নিজের সহকর্মীরাই অনেকে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করেন না। দেশব্যাপী দাঙ্গা ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্মূল করতে চেয়েছে। ধর্ম, ভাষা ও বর্ণের দ্বন্দ্ব জাতীয় সংহতিকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। তবু সব বাধা অতিক্রম করে দৃঢ়তার সঙ্গে নেহরু তাঁর গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পতাকা উড্ডীন রেখেছেন।

'ভারত সন্ধানে'র লেখক একদিন যে ভারতের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞ ভারতবাসীর মধ্যে তিনি সেই ভারতকে খুঁজে পেয়েছেন। এই ভারতকে জানার জন্য তিনি দেশের সর্বত্র ঘুরেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। লক্ষ মানুষকে দেখে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন, আবার লক্ষ মানুষ তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছে। সাধারণ মানুষকে সুখী করে সমৃদ্ধ ভারত গড়ার যে কাজ নেহরু সুরু করেছেন, তা এখনও শেষ হয় নি, কিন্তু তার পথ পরিষ্কার হয়েছে।

আজকের ভারত নেহরুর সৃষ্টি। ভারতের সংবিধান, ভারতের পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা, অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা, সব কিছুই একটি লোকের চিন্তা ও কর্মের ফল। নেহরু-নেতৃত্বে ভারতে গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত রূপে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভারত, ভারতের প্রকৃতি, ভারতের আপামর জনসাধারণ নেহরুর মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে ছিল। 'শেষ ইচ্ছা'র ছত্রে ছত্রে নেহরুর যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, তা তুলনাহীন। সাধারণ মানুষের কর্মক্ষেত্রে, ক্ষেত-খামারে তার দেহাবশেষকে তিনি বিলীন করতে চেয়েছেন। "হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরমালা, হিমালয়ের গভীর উপত্যকা, এদের আমি চিরদিন ভালবেসেছি। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে এদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, নিম্নের শস্য-শ্যামল ও বিস্তীর্ণ সমতলভূমির কথাও—এখানে আমার জীবন, আমার কর্মসাধনা।"

নেহরুর জীবন ও কর্মসাধনার ভারতকে সমৃদ্ধির লক্ষ্যপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টাই হবে, ভারতপথিক জওহরলাল নেহরুর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

নেহরু : সাধারণ আমেরিকানের দৃষ্টিতে

স্কুশীলকুমার গুপ্ত

আমেরিকাবাসীদের কাছে ভারতবর্ষের সত্যিকার উজ্জ্বল ও গৌরব ইমেজ কে সবচেয়ে বেশি সৃষ্টি করেছেন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলব তিনি জওহরলাল নেহরু। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সাধারণ আমেরিকানেরা রবীন্দ্রনাথ, এমন কি গান্ধীর নাম তেমন বেশি জানে না। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষার চর্চা হয়, যেমন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি, সে সব জায়গায় রবীন্দ্রনাথের নাম অনেকেই জানে। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচয় আছে এমন আমেরিকান বেশি দেখি নি। যে সব মহলে গান্ধী পরিচিত সেখানে অনেক সময়েই তাঁকে লিঙ্কনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গান্ধীর নন ভায়োলেন্সের রীতিকে অনেকেই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

কামরাজের প্ল্যান অনুযায়ী যখন নেহরুর মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন, আমি তখন ওয়াশিংটনে। উঠেছি কার্লাইল হোটেলে। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে লবিতে বসে খবরের কাগজ পড়তে যাব—এমন সময় মিস্টার লিয়ান বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'ভারতবর্ষের কিছু খবর পেয়েছেন?'

মিস্টার লিয়ান সিঙ্গাপুরবাসী। ভারতবর্ষে কিছুদিন ছিলেন। এদেশ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৌতূহল। আমি উত্তর দিলাম, 'না, কেন? কি হয়েছে?'

মিস্টার লিয়ান আমার পাশে বসে পড়ে পকেট থেকে একটা কাগজের ক্লিপিং বের করে বললেন, 'দেখুন, পড়ে দেখুন।'

ক্লিপিংটা 'নিউ ইয়র্ক টাইমসের'। নেহরুর মন্ত্রিসভার পদত্যাগের খবরটা এমনভাবে ছিল যে, তা থেকে পদত্যাগের কারণ বের করা অসাধ্য। আমি ক'বার পড়েও কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। সত্যিই একটু বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, 'কিছু বুঝতে পারছি না তো!'

আমার পাশের সোফায় একজন তরুণ আমেরিকান বসেছিলেন। এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'মাপ করবেন, একটা কথা বলব?'

আমি বললাম, 'কি?'

—'নেহরুর পপুলারিটি কি কমে গেছে?'

—'কখনই নয়, নেহরু ভারতের অবিসংবাদী নেতা।'

—'তবে মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন কেন?'

—'তিনি হয়তো দেশের সংকট অনুযায়ী নতুন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান।'

মিস্টার লিয়ান আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

অফিস অব এডুকেশনে যাওয়ার

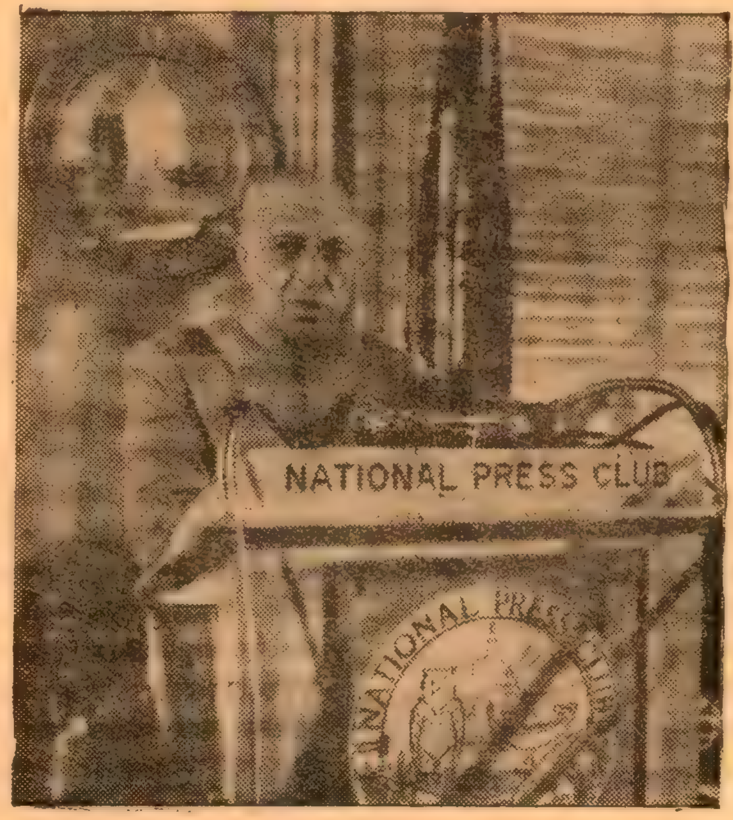

● ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সভায় ভাষণ দানরত শ্রীনেহেরু।

সময় হয়ে গেল বলে আমি উঠে পড়লাম। আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম জন ডিকসন। আবার দেখা হবে।'

দিন চারেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় হোটেলের বেসমেন্টে ডিনার খাচ্ছি এমন সময় দেখি মিস্টার ডিকসন ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমাকে উইশ করলেন। একটু পরে ট্রেতে খাবার নিয়ে আমার টেবিলের কাছে এসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে জয়েন করতে পারি?'

আমি বললাম, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।'

আমার টেবিলে খাবার জিনিসগুলো নামিয়ে ট্রেটা যথাস্থানে রেখে এলেন। চেয়ারে বসে পড়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললেন, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম। এই দেখুন ভারতবর্ষ থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। সঙ্গে 'স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রের একটা ক্লিপিং আছে। এটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

আমি ক্লিপিংটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম। কামরাজের প্ল্যানটি বুঝতে পেরে নেহরুর মন্ত্রিসভার ব্যাপারটি স্পষ্ট হল। ওঁর হাতে ক্লিপিংটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ। আমি সত্যই একটু চিন্তিত ছিলাম। যদিও জানি নেহরুর নেতৃত্বে কোনোমতেই কোন বড় ফাটল ধরতে পারে না।'

—'আমিও তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় আমেরিকানেরাও তাই বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষ আর নেহরু, নেহরু আর ভারতবর্ষ এক। কেনেডি যেমন বাইরে আমেরিকার ইমেজ তৈরি করেছেন, নেহরুর দ্বারাও বিদেশে তেমনি ভারতবর্ষের ইমেজ তৈরি হয়েছে। আমরা আশা করি নেহরুর সবল ও বিজ্ঞ নেতৃত্বে ভারতবর্ষ ক্রমশ উন্নতির পথে যাবে।'

ভীষণ ভালো লাগল মিস্টার ডিকসনের কথা শুনে। আমার তখন যে অনুভূতি হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দূর দেশে বিদেশীর মুখে দেশের কথা শুনলে কি ভালোই না লাগে। দেশ ছেড়ে দূরে না গেলে দেশকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করা যায় না, ভালোবাসা যায় না। দূরে গিয়েই দেশকে বেশি করে অনুভব করেছি, ভালোবেসেছি।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি। সাধারণ একজন আমেরিকান নিজের দেশ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে সে তেমন ওয়াকিবহাল নয়। নিজের দেশের বাইরে রাশিয়া এবং তারপরেই ইংলণ্ড, চীন ও ভারত সম্পর্কে তার কৌতূহল। দেশের মধ্যে অলওয়েভ রেডিও সেট আমি মাত্র কয়েকটি বাড়িতে দেখেছি। নিজের দেশের বিষয়সংক্রান্ত টেলিভিশন দেখতেই সে অভ্যস্ত। তবে যাঁরা বিদেশের খবর রাখেন, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের চেয়েও আমাদের দেশ সম্পর্কে বেশি জানেন।

ওকলাহোমাতে আমি মিস্টার উইলিয়ম পাওয়েল নামে একজন আমেরিকান অধ্যাপকের অতিথি হয়ে ছিলাম। মিস্টার ও মিসেস পাওয়েল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ব্রেকফাস্ট টেবিলে প্রায়ই ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা হত। অনেক আমেরিকানের মতো মিসেস পাওয়েল প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, 'নেহরুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন?' আমি বলতাম, 'ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি যাকে নির্বাচন করবে তিনিই নেতা হবেন।' বেশ অনুভব করতাম এ উত্তরে তাঁর কৌতূহল মিটত না। ভাবতেন—আমি বোধ হয় প্রকৃত উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছি। কখনও মিস্টার পাওয়েল বলতেন, 'নেহরুর বৈদেশিক নীতিকে আমি সমর্থন করি।' ননভায়োলেন্সের আদর্শ খুবই উচ্চ। ওয়াশিংটনে নিগ্রো আন্দোলন নন ভায়োলেন্সের নীতিকে গ্রহণ করে জয়যুক্ত হয়েছে। গান্ধী ও নেহরুকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

মিসেস পাওয়েল কখনো মন্তব্য করতেন, 'আমার নেহরুকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। ভারতবর্ষে গেলে অবশ্যই নেহরুকে দেখব।'

আমি দুজনকেই গান্ধীর 'মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ' ও নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' পড়িয়ে ছিলাম। 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'র একটি আমেরিকান সংস্করণ আছে। ওঁদের বইটি এত ভালো লেগেছিল যে, ওঁরা একটি বই কিনে ওঁদের মেয়েকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। মিসেস পাওয়েল নেহরু ও বিজয়লক্ষ্মীর টেলিভিশন বক্তৃতায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলতেন, 'নেহরু বেশ ভালো ইংরেজী বলেন। লেখেনও ভালো। আচ্ছা, উত্তর ভারতের অনেকের চেহারাই কি নেহরুর মতো?'

মিসেস পাওয়েলের মেয়ে কেটি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, নেহরুর মাথায় ঐ টুপির অর্থ কি? উনি বাটনহোলে গোলাপ ফুল দেন কেন? নেহরুর পোষাক আমার খুব ভালো লাগে।'

একদিন মিসেস পাওয়েল আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টি ক্লাবের ডিনারে নিয়ে গেলেন। শুনলাম ডক্টর ডানকান স্লাইড সহযোগে তাঁর এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলবেন। বক্তৃতা সুরু হলে উদগ্রীব হয়ে আছি কখন ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ আসবে। ডক্টর ডানকান ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে গভর্নমেন্ট পড়ান। আমেরিকান গভর্নমেন্ট তাঁকে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যে বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

● ওয়াশিংটনে সংবাদপত্র প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার পরিবেষ্টিত পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও জওহরলাল নেহরু।

সেই সূত্রে তাঁকে ভারতেও যেতে হয়েছিল। ওকলাহোমা থেকে 'বুকস এ্যাব্রড' বলে যে বিখ্যাত পত্রিকাটি বের হয়, মিসেস ডানকান তার সহকারী সম্পাদিকা। উনিও বিশ্বযাত্রায় স্বামীর সঙ্গী ছিলেন।

ডক্টর ডানকান ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কয়টি ছবি দেখালেন, তাদের মধ্যে ছিল তাজমহল এবং গ্রাম ও শহরের দুঃখময় জীবনযাত্রার দৃশ্য।

বক্তৃতার পরে অনেকে আমায় ঘিরে ধরলেন। কেউ প্রশ্ন করলেন, 'ভারতবর্ষ বৈদেশিক সাহায্যে এতো পরিকল্পনা রূপায়িত করছে, তবুও এখনও সাধারণ মানুষ এত দুঃখী কেন?' কারো জিজ্ঞাসা, 'নেহরুর গোয়া ও কাশ্মীর নীতির অর্থ কি?' কেউ জানতে চাইলেন, 'ভারতবর্ষ ইউ-এন-ও-তে চীনের অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করছে কেন? কৃষ্ণমেনন ক্যাবিনেট ছাড়লেন কেন?'

ডক্টর ডানকান উত্তর দেওয়ার ভার অনেকটা নিজের ওপর তুলে নিলেন। বললেন, 'ভারতবর্ষের মতো জটিল ও বিরাট দেশের সমস্যা চট করে সমাধান হবার নয়। তবে নেহরুর সক্ষম নেতৃত্বে ভারত তার যথেষ্ট বৈষয়িক উন্নতি করেছে এবং করছে। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। নেহরু গোয়া ও কাশ্মীর সম্পর্কে যা করেছেন, যে কোন দেশপ্রেমিক নেতাই তাই করবেন। আমার ধারণা ভারত সত্যিকার শান্তিকামী। নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলতে পারি নেহরু অসামান্য মানুষ এবং প্রকৃত দেশহিতৈষী।'

ফিরে আসার সময়ে মিসেস ডানকাল বললেন, 'নেহরুর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছি।'

ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর উইলিয়মসকে আমার একজন ভারতীয় বন্ধু গান্ধী ও নেহরুর বই পড়িয়েছিলেন। আমাদের সেমিনারে তিনি প্রায়ই গান্ধী ও নেহরুর উল্লেখ করতেন। তিনি বলতেন, 'গান্ধী লিঙ্কনের মতোই মানবপ্রেমিক।'

কেনেডির অপমৃত্যুতে নেহরুর বাণী আমেরিকায় বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়েছিল। আমাকে একজন আমেরিকান বুকসেলার বলেছিলেন, 'এমন আন্তরিকতাপূর্ণ শোকবার্তা আর পড়েছি বলে মনে হয় না। মিসেস কেনেডিকে নেহরু যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন অনেক আমেরিকানকে সে বিষয়ে সশ্রদ্ধ উক্তি করতে শুনেছি।

একটি টেলিভিশন ইণ্টারভিউতে, ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর অব ফরেন স্টুডেন্টস আমাকে বলেছিলেন, 'ডক্টর গুপ্ত, আমরা মনে করি নেহরু এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগরণের অগ্রদূত। আপনার দেশবাসীদের কি মত?'

আমি বলেছিলাম, 'আমরাও তাই মনে করি।'

কেনেডির মৃত্যুর আগে ও পরে আমি দুবার ডালাসে গিয়েছি। শেষবার যাই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন যাওয়ার পথে। সেদিন খুব মেঘলা ছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। টেক্সাস স্কুল বুক ডিপোজিটারির সাততলা বাড়ির সামনে যায় এল কনটিন কিওয়ের ওপরে কেনেডিকে গুলী করা হয়। রাস্তার যে জায়গাটায় গুলী করা হয় তার পাশে দেওয়াল ও থাম দিয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে। সামনে অনেকগুলো ফুলের গাছ। অনেকে এসে ফুলের মালা রেখে যাচ্ছেন। ডিপোজিটারি মুখোমুখি। আমি দূর থেকে ডিপোজিটারি ও জায়গাটার একটা ফটো নিয়ে যেই পিছন ফিরেছি অমনি একজন নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। উনি এতক্ষণ আমাকেই লক্ষ্য করছিলেন। এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ভারতীয়?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

উনি বললেন, 'আমি কদিন আগে ভারতবর্ষ থেকে ফিরেছি। কেনেডির শোকে সমগ্র ভারত মুহ্যমান। কেনেডিকে ভারত যে এত শ্রদ্ধা করে ও এত ভালোবাসে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না।'

আমি বললাম, 'ভারত পৃথিবীর শান্তিকামী প্রতিটি লোককেই ভালোবাসে। কেনেডিকে ভালোবাসার কারণও এই।'

প্রায় আমার কথা কেড়ে নিয়ে উনি বলে উঠলেন, 'এই জন্যে নেহরুকেও আমরা ভালোবাসি। এই দেখুন, ভারত থেকে আমার একটি মূল্যবান সংগ্রহ।' এই বলে তিনি নেহরুর একটা ছোট ফটো বের করে দেখালেন।

সত্যিই আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

যখন নেহরু অসুস্থ আমি তখন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে। উঠেছি সাউথ হিল স্ট্রীটের ক্লার্ক হোটেলে। একদিন সকালবেলা লিফটে নেমে লবিতে ঢুকছি এমন সময়ে একজন বেলবয় আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কি ইণ্ডিয়ান?'

আমাদের বলা হয়েছিল নিজেদের ইণ্ডিয়ান না বলে 'আই অ্যাম ফ্রম ইণ্ডিয়া' বলতে। ইণ্ডিয়ান বলতে এখানে রেড ইণ্ডিয়ানকে বোঝায়। আমি নির্দেশ মতো উত্তর দিলাম।

বেলবয় গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, 'নেহরুর অসুস্থতার খবর পেয়েছিলাম, উনি এখন কেমন আছেন?'

আমি খুবই বিস্মিত হলাম। বললাম, 'এখন একটু ভালো। আচ্ছা আপনি জানলেন কি করে?'

সে বললে, 'কাল দুজন ইণ্ডিয়ান লবিতে বসে নেহরুর বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি তাঁদের কাছ থেকেই নেহরুর অসুস্থতার খবর শুনেছি। আমার এক দাদা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে কয়েক বছর ছিলেন। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের বিষয়ে অনেক কথা জানতে পেরেছি। আমার খুব ইচ্ছে একবার ভারতে যাব।'

আমি বললাম, 'আমিও আশা করব আপনার সঙ্গে একদিন ভারতে দেখা হবে।'

একদিন ফ্লাওয়ার স্ট্রীটে ওয়ার্ল্ড অ্যাফিয়ার্স কাউন্সিলে গিয়েছিলাম। কিছুকাল আগে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মিসেস অ্যানিনেভিলের কাছে শুনলাম রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা সকলেরই খুব ভালো লেগেছিল। এই প্রসঙ্গে নেহরুর লস এঞ্জেলেস পরিভ্রমণের কথা উঠল। মিসেস নেভিল বললেন, 'নেহরুর ব্যক্তিত্ব আমাদের বিশেষ ভালো লেগেছিল।'

আমার এক ভারতীয় বন্ধু সুটকেসের তালার একটা চাবি হারিয়ে যাওয়ায় ডাউন টাউনে ট্র্যাভেল ইকুপমেন্টের একটা দোকানে গিয়েছিলাম। দোকানের মালিক আমাদের ভারতীয় জেনে খাতির করে বসালে। জানতে পারলাম সে ইহুদী, আমেরিকায় সেটেলড করেছে। হঠাৎ সে খুব ব্যস্ত হয়ে একটা ড্রয়ার হাতড়াতে লাগল। শেষে একটা কাগজের তাড়া নিয়ে এল। খুলে দেখলাম নেহরুর হাজারি ও মিশর আক্রমণের সময়কার নানা বক্তৃতার পেপার ক্লিপিং। শেষে প্রশ্ন করলে, 'নেহরু খুব বড় নেতা। কিন্তু প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের দাবির বিষয়ে লড়লেন না কেন?'

শিকাগোতে একদিন ক্যাবে করে ওয়াবেশ এ্যাভিনিউর ওয়াই-এম-সি-এ থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। ক্যাবচালক যখন জানতে পারলে আমি ভারতীয় তখন বললে, 'আমার বড় ছেলে পাহাড়ে যুদ্ধ করা শেখানোর জন্যে এখন নেফায় আছে। প্রায় চিঠিতেই সে নেহরুর কথা লেখে। নেহরু খুব পপুলার লিডার, না?'

মেরিল্যাণ্ডের হেগার্সটাউনে আমি ওয়াশিংটন কাউন্টি বোর্ড অব এডুকেশনের কো-অর্ডিনেটর অব পাবলিক রিলেশন অ্যাণ্ড পাবলিকেশন মিস্টার হার্লেকরের বাসার গেস্ট হয়ে ছিলাম। ভারত সম্পর্কে মিস্টার ও মিসেস হার্লেকরের আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করত। নেহরুর আংশিক প্যারালিসিসের খবরে তাঁরা খুবই দুঃখিত ছিলেন। কাগজে নেহরুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবর বেরুলেই আমাকে দেখাতেন। একদিন আমি কাউন্টি বোর্ড অব এডুকেশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডক্টর ব্রিগের সঙ্গে একটা স্টাফ মিটিং অ্যাটেণ্ড করছি এমন সময় একটা ক্লিপিং আমার হাতে একজন দিয়ে

গেল। দেখলাম মিস্টার হার্লেকর আমার নামে মার্ক করে নেহরুর কতকটা সুস্থতার খবর সমন্বিত একটা ক্লিপিং পাঠিয়েছেন।

এই কাউণ্টির ডক্টর ব্রিশ, মিস্টার বিভানস প্রমুখ কর্মকর্তারা দিল্লীর ক্লোজড সারকিট টেলিভিশন স্টুডিও স্থাপনের জন্যে এদেশে এসেছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁদের খুব ভালো লেগেছিল। মিসেস ব্রিশ আমাকে এক ডিনারে বলেছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখি। কবে আবার ভারতে যাব ভাবি।' ডক্টর ব্রিশ ভারতের অনেক গানের রেকর্ড, বই, পুতুল, শাড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। জওহরলালের সব কটি বইই তাঁর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

একদিন বুনসবরোর লায়স ক্লাবের এক বক্তৃতায় আমেরিকানদের আতিথেয়তার কথা বিশেষ ভাবে বলেছিলাম। বক্তৃতার শেষে আমাকে ধন্যবাদ দিতে উঠে মিস্টার বিভানস বলেছিলেন, 'আপনি আপনার দেশের আতিথেয়তার কথা ভুলে যাবেন না। নেহরু ও আপনার দেশবাসীদের কাছে আমরা যে আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছি তার তুলনা হয় না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নেহরু নিরাময় হোন।'

এখানে জানিয়ে রাখি এই সময়ে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট' প্রভৃতি কাগজে ভারতের সংবাদ বলতে প্রায় কেবল নেহরুর স্বাস্থ্যের সংবাদই থাকত।

আমি আমেরিকার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি। সর্বত্রই ভারত সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তিই নেহরুকে উচ্চ মর্যাদার আসন দেন। ইউরোপে লণ্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফার্ট, জেনেভা ও ইটালীতে এবং মিশরে অবস্থান-

নিউ ইয়র্কে এডলাইস্টিভেনসনের সঙ্গে নেহরু

পরিচয় হয়েছে তাঁদের অনেকেই নেহরুর কথা গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। প্যারিসের লুভার মিউজিয়মে দুটি আমেরিকান ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারা ইউরোপে কিছুকাল থেকে ভারতে আসবে। তাদের একজনের হাতে 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'র একটি কপি দেখেছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বইটি কেমন লাগছে?'

মেয়েটি বলেছিল, 'এত ভাল বই খুব বেশি পড়ি নি। সত্যিই ভারতবর্ষ একটা বিচিত্র দেশ।'

নেহরুর তিরোধানে আজ তাঁর সঙ্গে জড়িত আমার প্রবাসের স্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন করছে।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি সাদা টুপি যা হিমালয়ের শীর্ষে সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করত।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি রক্তগোলাপ যার মধ্যে সমস্ত ভারতের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হত।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি আশ্চর্য সুন্দর নারীর বিষাদকম্পিত মুখ।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ল্যাবরেটরীতে তৈরি অসহায় সাড়ে চার বোতল স্টেরিলাইজড গ্লুকোজ সলিউশন।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে অব্যবহৃত তিনটি অক্সিজেন সিলিনডার।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে তিনটি নিঃসঙ্গ কুকুর।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি টেলিপ্রিণ্টার যে লিখেছে, 'লাইট ইজ আউট।'

ট্র্যাজেডি হচ্ছে রাজঘাটের একটি লালপাথর যার বুকে একটি পরম পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হয়েছে।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি প্রাসাদ যার এক প্রিয়তম বাসিন্দা আর কোনদিন ফিরবে না।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে আটটি তামার পাত্র।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আর্ত নরনারী যারা চিৎকার করে বলেছে, 'নেহরু অমর রহে।'

ট্র্যাজেডি হচ্ছে রূঢ় মৃত্যু যে একটি অমর প্রাণের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত।

গ্রন্থ মেলা

জয়ন্তী সেন

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা—সুধীরচন্দ্র কর। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২। মূল্য : ১০'০০ নঃ পঃ।

শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক সুধীরচন্দ্র কর তাঁর "শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা" গ্রন্থে গভীর নিষ্ঠা ও সংযমের সাথে রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার অনুভূতিটিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন, যে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-সাধনায় "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"-এর স্থান সর্বোচ্চে তারই আলোচনায় সার্থক আলোচ্য পুস্তক।

সর্বমানবের সমান প্রবেশাধিকারে পরিচিত সাধনক্ষেত্রের জগৎ ও আদর্শ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে যে রূপে ধরা দিয়েছে, তার বিস্তৃত ও পরিচ্ছন্ন আলোচনায় সমৃদ্ধ "শান্তিনিকেতনের শিক্ষকগোষ্ঠী" প্রবন্ধটি। যেখানে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে।"

রবীন্দ্র-সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের পুণ্য ছায়ায় রয়েছে বিশ্বাসের অনন্ত সংযোগ। তাই শান্তিনিকেতন প্রথম বিচারে কবি-আত্মার শান্তির আশ্রয় হয়ে বিশ্বমানবাত্মার আশ্রয়ে ভূষিত হয়েছে। তাই শান্তিনিকেতন প্রাচী ও প্রতীচির শিক্ষা ও সাধনার মহামিলনের ক্ষেত্র। এরই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে "দেশিক" ও "বৈদেশিক" দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার অন্তরযোগকে উপলব্ধি করার পক্ষে 'বৈদেশিক' অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাই "শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ"-এর পাশে "শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার" প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হয়ে ধরা দিয়েছে।

নজরুল-চরিতমানস—ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত। ভারতী লাইব্রেরী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২। মূল্য : সাড়ে বারো টাকা।

'নজরুল-চরিতমানস'-এর প্রথম সংস্করণ অতি অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ হওয়ায় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভারতী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এটি নজরুলের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে একমাত্র সুপূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নজরুল-যুগ ও নজরুল-জীবন : দ্বিতীয় ভাগে কবি নজরুল, অনুবাদক নজরুল, শিশুসাহিত্যে নজরুল, নজরুলের উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ, নজরুলের সাংবাদিকতা এবং গীতিকার ও সুরকার নজরুল এবং তৃতীয় ভাগে নজরুলের উত্তরাধিকার, বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নজরুলের অবদান ও নজরুলের উত্তরসাধক অধ্যায়গুলি গ্রথিত। গ্রন্থশেষে নজরুল-গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থটির অমূল্য সম্পদ। বহু নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সহযোগে প্রস্তুত গ্রন্থটি ইতোমধ্যেই নজরুল সম্পর্কে আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গ্রন্থকার গ্রন্থটির বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায়, সুগভীর ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এবং নিপুণ লিখনশৈলীতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের স্মরণীয় সমৃদ্ধি এনেছেন। তাঁর কবি ও সমালোচক সত্তার আশ্চর্য ও সার্থক সমন্বয়ে বর্তমান গ্রন্থটির প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা বিস্ময়কর-ভাবে রসোত্তীর্ণ ও ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। নজরুল বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুপ্তের ৫৬৬ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থটি নজরুলের জীবন ও সৃষ্টির অনুধাবনে একমাত্র অপরিহার্য বলে ভারত ও পাকিস্তানের সর্বত্র উচ্চভাবে অভিনন্দিত।

ধ্রুপদী—সম্পাদক : সুনীল রায়। ১৩বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য—প্রতিসংখ্যা ৫০ নঃ পঃ।

বাংলা দেশে কবিতার মাসিক পত্র। প্রায় কল্পনাতীত ব্যাপার। হয়তো বাংলা দেশ বলেই কল্পনাতীত ব্যাপারও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এমন সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট পত্রিকা যে দেশে নেই—সেই দেশের মানুষের মধ্যে সুন্দরের যে ধারণা রয়েছে, সেই ধারণা সম্পর্কেও আমাদের সন্দেহ জাগে। 'ধ্রুপদী'র বর্তমান সংখ্যাটি (বৈশাখ : ১৩৭১) পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। শেক্সপীয়র এর উপজীব্য। বাংলা দেশের ও বিদেশের কবি-সাহিত্যিকদের চোখে শেক্সপীয়রকে জানতে হলে একমাত্র ধ্রুপদীই পাঠ্য বলে আমাদের মনে হয়েছে। এর প্রচ্ছদেও অসাধারণত্ব। সেখানে শেক্সপীয়রের মূল স্বাক্ষর সংযোজিত রয়েছে। এমন অলংকরণ-গুণে সমৃদ্ধ আর অন্য পত্রিকা শুধু বাংলা দেশেই নয়, অন্যত্রও নেই। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি রয়েছে তা বহুপঠিত। তবু ওর টীকা-টিপ্পনী অত্যন্ত মূল্যবান। জর্জ এডিঙ্গারের প্রবন্ধটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। শুধু শেক্সপীয়রের জীবনী নয়, লেখকের মৌলিক চিন্তার উৎস রয়েছে প্রতিটি পঙক্তিতে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এমন মূল্যবান প্রবন্ধটিকে বড়ই সংক্ষিপ্ত মনে হয়েছে। ৯, ১৭, ১৮, ২৩, ৩৮, ৪৭, ৫০, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৫, ৭৬, ১০০, ১০৯ ও ১৫১ সংখ্যক সনেট অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে সুনীল বসু, সুশীল রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, ফণিভূষণ আচার্য, সন্তোষকুমার অধিকারী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, মঞ্জুলিকা দাশ, সতীন্দ্র ভৌমিক ও দুর্গাদাস সরকার।

সেই ভয়ঙ্কর সংবাদের প্রতিচ্ছায়ায় মহানগরী

দিকে দিকে দারুণ দহন জ্বালা। তবু ক্লান্ত নয় মহানগরী। সে মুখর, প্রখর এবং সাবিক সত্তা তার প্রতিদিনের স্বাভাবিক প্রাণ-চাঞ্চল্যে বিধৃত। সেদিন বুধবার, ২৭শে মে। সেদিনও নিদাঘের নির্মম আত্মপ্রকাশে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম নেই, অপ্রত্যাশিত কোনো সংকেতের বিধূনন নেই তার পক্ষ-বিস্তারে। পূর্বদিনের মতোই তার দুরন্ত আচরণের নগ্ন বিকাশ, ক্ষমাহীন অগ্নি-স্বরণের শর-নিক্ষেপ সুরু হয়েছে সকাল থেকেই। আর মহানগরী—সে'ও তার নিয়মিত কর্মপ্রবাহে প্রয়োজনের বজরা ভাসিয়েছে আগের মতোই। নিদাঘের নির্বাধা সংক্রমণে, মাঝে মাঝে এই মহানগরীর সহজাত গতি-পথে শৈথিল্যের প্রভাব দুর্লঙ্ঘ্য হলেও তেমন কোনো বৈপরিত্যের লক্ষণ নেই তার চরিত্রে। পথে পথে, ঘরে ঘরে, মাঠে-ময়দানে এবং সৌধশিখরে তার চরিত্রের প্রতিফলন প্রতিদিনের মতোই এক এবং অভিন্ন। এমন কি, সকালের কিছু পরেই যখন খবর এলো: ভারতের মহানায়ক—যিনি সারা বিশ্বের শান্তির সেতু-বন্ধ স্বয়ং—তিনি অসুস্থ, তখনও কোনো বিকার বা রূপান্তরের আভাস ফুটলো না তার প্রকৃতিতে। পথে-উপপথে অবিরাম লোকযাত্রা তার তখনও স্বাভাবিক, তখনও মুখর এবং প্রতি-দিনের প্রকৃতিগত নিয়মেই চঞ্চল। কারণ এই মহানগরী জানে: যৌবন যাঁর অপরাজেয়, সংকল্প যাঁর নিষ্কোষিত তরবারি এবং বীর্য যাঁর সূর্যসত্তার পরশে চিরনবীন—মাঝে মাঝে অসুস্থতাও আসে তাঁর শরণ পেতে অথবা তাঁর বীর্যে অব-গাহন ক'রে ধন্য হতে। তিনি প্রেমিক, তাঁর প্রেমের উত্তাপেই পিছিয়ে যায় অন্ধকার। তিনি সাধক, তাঁর মাহাত্ম্যের মৃদু আশ্লেষেই দেয়াল ভাঙে বাধার। তিনি পুরুষোত্তম, তাঁর ছায়া দেখেই মাথা নত করে বন্ধুর পথ এবং তাঁর সহাস্য-মুখ অবলোকনেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সুন্দর, হয়তো বা মৃত্যুও পায় অমৃতের স্বাদ। সুতরাং, তাঁর অসুস্থতার সংবাদে তখন স্বাভাবিক কারণেই তেমন বিচলিত হলো না মহানগরী।

কিন্তু পায়ে পায়ে, উত্তরায়ণের সূর্য যখন মধ্যগগন অতিক্রম ক'রে পশ্চিমে আনত হওয়ার প্রয়াসী- - -ঠিক তখনই সময়ের দ্রুতগতি যানে নগরীর দ্বারদেশে পৌঁছায় আরেকটি খবর: সেই মহান শান্তির দূত অচৈতন্য, অবস্থা তাঁর উদ্বেগজনক।—এ-খবরে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ালো মহানগরী, সে উৎকর্ণ হলো আরও কী যেন শোনার আগ্রহে। আকাশে চোখ তুলে কিছু ভাবতেও চাইলো হয়তো বা, কিন্তু সময় পেলো না। কারণ তার পর মুহূর্তেই সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে উঠলো টেলিপ্রিণ্টার্স: তিনি আর নেই, অন্ধকারের নিরুদ্দেশ পথে অন্তর্হিত সেই অভিযাত্রী আলো, বিশ্ব আজ নেহরুহীন।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদের প্রচণ্ড কল্লোল তুলে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো মহানগরীর ঘোলা নদী। সে বিশ্বাস করতে চাইলো না এ-খবর। সেই যৌবনদৃপ্ত পুরুষের বিরাট জীবনে, হঠাৎ যবনিকা পতনের এই নির্মম বার্তা সত্যাশ্রয়ী নয় বলেই তার তখনও বিশ্বাস। কারণ, মাত্র দু'দিন আগে তিনি নিজেই বলেছেন: My life-time is not ending so soon. সুতরাং, তাঁর সেই বরাভয় কণ্ঠস্বর, সেই উত্তুঙ্গ আত্ম-প্রত্যয়ের বলিষ্ঠ ঘোষণা মহাকালের কুটিল চক্রান্তে অত সহজেই ব্যর্থ হবে—সেই মুহূর্ত তা বিশ্বাস করতে পারলো না মহানগরী।

কিন্তু অবিশ্বাসের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব হলো না তার পক্ষে। সেদিনই, সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যার শিরোনামায় যখন মূর্তিমান হয়ে উঠলো সেই অশুভ সংবাদ; বেতারের যান্ত্রিক কণ্ঠে সেই সত্যতারই প্রমাণ যখন বারবার গুমরে উঠলো বিষণ্ণ ছন্দে, আর রাজভবন এবং সরকারী কার্যালয় থেকে বেসরকারী কার্যালয়ের শিখরদেশে—যখন উক্ত সংবাদেরই নীরব স্বীকৃতিতে অর্ধনমিত হলো রাষ্ট্র-পতাকা, তখন গভীর বিষাদে নীরবে নতশির হলো মহানগরীর সাবিক সত্তা। পথে, ফুটপাথে, ঘাটে ঘাটে চঞ্চল জীবনপ্রবাহের গতিরোধ ক'রে দাঁড়ালো অন্তহীন শোক, শব্দহীন বিলাপ এবং নিকরুণ হতাশা। যেন যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত: কে তাদের পথ দেখাবে?

রাজপথে চক্রযানের গতি হলো শ্লথ, একে একে বন্ধ হলো সারিবন্দী বিপণি, মুখর ব্যস্ততায় গভীর বিরতি ঘটলো হোটেল-রেস্তোরাঁয় এবং প্রতিটি কার্যালয়ে। দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এলো দিন, মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো নতমুখী সন্ধ্যা। আলো জ্বললো এদিকে-ওদিকে প্রাত্যহিক নিয়মেই। কিন্তু সে-আলোয় সেদিন কোনো পথের নিশানা উজ্জ্বল হলো না, কেবল স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠলো মহাশোকের সেই বিষণ্ণ মুখ। সন্ধ্যার আলোয় তার আত্মপ্রকাশ ঘটলো আরও ভয়ঙ্কররূপে। তারপর দেখতে দেখতে, সন্ধ্যার পাশেই শিথিল চালে এগিয়ে এলো রাত্রি। এ-রাত্রি সেই প্রতিদিনের নৃত্য-চঞ্চলা অনন্যা নায়িকা নয়, এ যেন অপরিসীম দুঃখের সেতুবন্ধে দণ্ডায়মানা এক করুণ প্রতিমা—যার শ্রী অবলুপ্ত, শান্তি তিরোহিত এবং আনন্দ যার ভস্মসার যন্ত্রণার প্রচণ্ড দাহে। এ-রাত্রির পাশ ঘেঁষে, পথে পথে দ্বিপদচারীদের পদসঞ্চার

চলছে তখনও, যানবাহনের চাকাও ঘুরছে এদিকে-ওদিকে, কিন্তু সবই যেন নিঃশব্দে। কী-এক অভাবিত গ্রহচক্রে হিম হয়ে এসেছে প্রচণ্ড নিদাঘের মুখর মহানগরী। কেবল তার অজস্র সৌধ-শিখরে বার বার মাথা খুঁড়ে চলেছে অশান্ত হাওয়া, হাহাকারে তার বিবশ হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক সুরের অতন্দ্র পরিবেশ।

আর সেই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—যে-পথ হয়ে দমদম থেকে রাজভবনে আসতেন অধিনেতা, সে-পথের যতিহীন চাঞ্চল্য হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল কোথায়! শূন্য, বড় শূন্য আজ তার দীঘল বুকের প্রশস্ত বিস্তার! প্রিয় অধিনেতার পবিত্র পদচিহ্নে বিভূষিত হয়ে, আর কোনোদিন মহিমান্বিত হওয়ার সুযোগ পাবে না সেই পথ। তাই এই করুণ রাত্রির বিপর্যস্ত অঙ্কেই আজ তা নীরব আর্তনাদে চ'লে পড়ে মূর্ছায়।

তারপর, মহানগরীর অলক্ষ্যেই, ধীরে ধীরে মূক সংগীতের দুঃসহ মীড় তুলে সরে যায় রাত্রি। পায়ে পায়ে মহানগরীর পথে-উপপথে, ফুট-পাথের এপারে-ওপারে, দ্বারে দ্বারে এবং সৌধশিখরে এসে দাঁড়ায় পরবর্তী দিনের ভোর—যার কফিনে আবৃত অবয়ব, অবসাদে আনত মুখ এবং সর্বশূন্যতার বিশাল হতাশায় নির্বাণমুখী যার চোখ। সেদিন বৃহস্পতিবার, ২৮শে মে। প্রতিদিনের মতো সূর্য উঠলো সেদিনও, কিন্তু সমগ্র মুখাবয়ব তার বিষাদে ম্লান। কিরণে তার তেজ আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। নিষ্প্রাণ সূর্যের জ্যোতি-বিচ্ছুরণে সেদিন কেবল যন্ত্রণার নৈবেদ্য। পথ তখনও নীরব, মহানগরী নির্বাক। কেবল বিভিন্ন পথের চৌমাথায় শুভ্র ইঁটের বেদীমূলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রিয় নেতার প্রতিকৃতি—যার সামান্য ঊর্ধ্বেই অস্থির হাওয়ার দেয়ালে নিষ্ফল আক্রোশে আছাড় খাচ্ছে অর্ধনমিত পতাকা।

ক্রমেই ঊর্ধ্বপথে পা বাড়ালো সেদিনের সূর্য এবং সে-মুহূর্তেই কী-এক গভীর জিজ্ঞাসায় দুলে উঠলো মহানগরী সে চোখ পাতলো সংবাদপত্রে, কান পাতলো বেতারের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে। দেখতে দেখতে তার মানসপটে ভেসে উঠলো রাজধানী দিল্লীর শোকাভিভূত চিত্র। বেতারে কান পেতেই সে শুনলো: প্রিয় নেতার মরদেহের পাশে ফুলের মালা হাতে নিয়ে শিশুর মতো কাঁদছেন শেখ আবদুল্লা; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে হায় হায় করছেন ইন্দিরা, বিজয়লক্ষ্মী, রাজীব এবং সঞ্জয়; ভগ্নকণ্ঠে বিলাপ করছেন রাষ্ট্রপতি, শাস্ত্রীজী, নন্দ, চাগলা, জাকির হোসেন—প্রভৃতি অনুরাগিবৃন্দ। আর মার্কিন প্রতিনিধি ডীন রাস্ক, বৃটিশ-প্রতিনিধি মিঃ হিউম ও মিঃ মাউণ্টব্যাটন এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্মানীয় নেতৃবৃন্দ শবাধারের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন নতশিরে, নীরবে, কারণ, তিনি যে কেবল ভারতের নন, সারা বিশ্বের তিনি শুভ্র পারাবতের পরিবাহক।

নেহরু প্রয়াণে

শোক: স্মরণ: শ্রদ্ধা

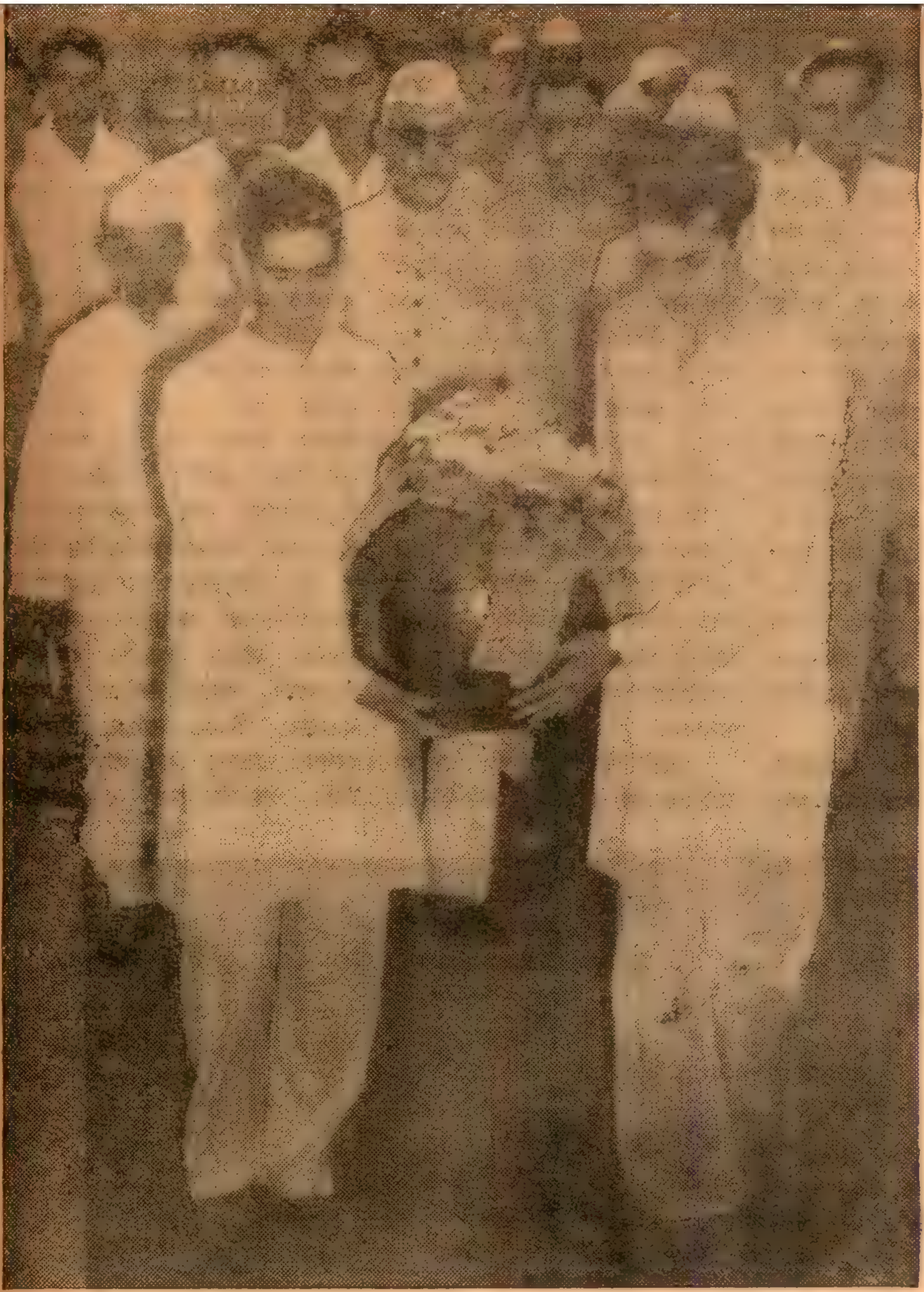

নয়াদিল্লী রেল-ষ্টেশনে মিছিল করে নিয়ে যাবার জন্য রাজীব ও সঞ্জয় জওহরলাল নেহরুর চিতাভস্ম-পূর্ণ একটি পাত্র কামানবাহী শকটে তুলে দিতে নিয়ে চলেছে। নয়াদিল্লী থেকে বিশেষ ট্রেণ-যোগে চিতাভস্ম বিসর্জনের জন্য এলাহাবাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবিতে রাজীব ও সঞ্জয়ের পিছনে উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন, মনোনীত প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী, আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেনকে দেখা যাচ্ছে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে বিশ্বের আকাশে শান্তির পারাবত উড়িয়ে দেবেন কে?

সময় অপেক্ষা করে না। দিন কেটে যায়। প্রয়োজনের তাগিদেই আবার কর্ম্মমুখর হয়ে ওঠে মহানগরী। কিন্তু আগের মতো তেমন নিশ্চিন্ত জীবনায়নে স্বাভাবিক হতে পারলো না সে। কারণ, তার সমগ্র সত্তার গভীরে বার বার নাড়া দিয়ে গেল বিরাট একটা প্রশ্ন: প্রিয় অধিনেতার স্থলাভিষিক্ত যিনি হবেন, তিনি কি আমাদের পথ দেখাতে পারবেন? - - -

প্রিয় অধিনেতাকে স্মরণ করেই শোকসভার আয়োজন চললো দিকে দিকে। শেষে মহানগরীর বিভিন্ন পথের বিপুল জনস্রোত এসে মিলিত হলো ময়দানে—মনুমেণ্টের পাদদেশে। সম্ভবত সেখানেই লোকান্তরিত অধিনেতার দৈববাণী যেন ভেসে এলো: ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি।

আশার সঞ্চারে আন্দোলিত হলো মহানগরীর বিপুল জনতা। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠে এবার ধ্বনিত হলো: মৃত্যুর দ্বারা তিনি আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত। তিনিই মহামৃত্যুঞ্জয়, অতএব পথ দেখাবেন তিনিই। চলো, যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে। আমরা ইহলোক জয় করবো এবং লোকান্তর।

ঝাণ্ডা উঁচা রাখো

সরকারী অফিস। কাজ কম, কথা বেশি। সাড়ে ন'টায় অফিসে এসে একটা প্রশ্ন ঘর থেকে ঘরে, বারান্দা থেকে বারান্দায় ঘুরতে থাকে—কটা বাজল। পাঁচটা বাজার আর কত দেরী? তারই ফাঁকে ফাঁকে নানা আলোচনা। যার অন্তে আলোকিত হয় না কারুরই মন, কোন বিষয়েই।

সেদিনও এমনি অজস্র আলোচনা আর ঘড়ির প্রতি কটাক্ষপাত চলছিল। সেদিন ছিল বুধবার। বিগত বহু বুধবারের মত এক সাধারণ বুধবার।

সহকর্মী প্রশ্ন করলেন, নেহরু-আয়ুব সাক্ষাৎকারের ফল কি হবে?

নানা মত পেশ করা হল। উঠল বিতর্কের ঝড়। এমন সময় ভগ্নদূতের প্রবেশ। নেহরু অসুস্থ, অবস্থা খারাপের দিকে। প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর ক্রোধ ফেটে পড়ল যেন।

বাজে কথা। কাল ফিরেছেন দেরাদুন থেকে। বাজে কথা বলার জায়গা পান নি।

দু-তিনটে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরতে লাগল। আকাশবাণী, পি টি আই, লোকসভা সেক্রেটারিয়েট। কেউ লাইন পেল, কেউ পেল না। যারা পেল তারা মাথা নীচু করল। জ্ঞান নেই, অবস্থা খারাপ।

সহকর্মী বললেন, কাল কাগজে দেখা যাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানেরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

উদ্বেগ, না শোক? প্রথম উচ্চারিত হল সেই অশুভ বাণী। সেই নিদারুণ সম্ভাবনার প্রথম গোচার প্রকাশ। যে অমঙ্গল-আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু অথচ প্রকাশে মন চায় না।

তারপর। কথা নেই। বন্ধ সেই অলস আলোচনা। থেকে থেকে আঙুলের টানে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরে। আকাশবাণী, পি টি আই, লোকসভা সেক্রেটারিয়েট।

খবর এল। ঠিক সেই মুহূর্তে সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচটা কখন বাজবে, ঘড়ি দেখে নি কেউ। স্তব্ধ সময়। মূক সব মুখর মুখগুলো। চোখে চোখে বোবা চাউনি। অবিশ্বাস্য অথচ নিষ্ঠুর সত্য।

বেরিয়ে এসেছিলাম অফিস ঘর থেকে। জরুরী চিঠি, ডাকে সেদিন না দিলেই নয়।

ডাকখানা দূরে নয়। হাঁটছি। হঠাৎ মাথায় পড়ল কয়েক ফোঁটা জল। ধূসর আকাশ। হালকা মেঘের টুকরো এখানে ওখানে। আকাশও খবর পেয়েছে তা'হলে! কাঁদছে। কাঁদছে আকাশ, বাতাস। কাঁদছে দেশ, সারা দেশ। সারা বিশ্ব।

চিঠি ডাকে দিয়ে ফিরছি। তখনই চোখে পড়ল তাকে। মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বসেছিল সে। লাড্ডু, পেড়া, জিলাবী। অফিসের বাবুদের টিফিন। তার পাশে এক পানওলা।

চলে আসছিলাম। থমকে দাঁড়ালাম পানওলার কথা শুনে। পণ্ডিতজী আজ গয়া।

বাজে কথা, বলল মিষ্টিওলা। যো মহী সকতা। তারপর হাঁড়ির তলা থেকে টেনে বের করল সেদিনের হিন্দি খবরের কাগজ।

এখানেই ত লিখেছে। এই ত, এই ত। থেমে থেমে কাঁপা কাঁপা গলায় পড়তে লাগল, নয়ে দিল্লী সাতাইশ সিতম্বর, প্রধান মন্ত্রী জবাহরলাল দেরাদূনসে চারদিন বিশ্রামকে বাদ দিল্লী লোটা।

পানওলা বলল, ও ত কালকের খবর। আজ সকালে শরীর খারাপ হয়। ছুটোর সময় মারা গিয়েছেন।

বকো মাৎ। চীৎকার করে উঠল মিষ্টিওলা।

ঐ দেখ ঝাণ্ডা নামাচ্ছে অফিসের মাথায়। পানওলা আঙুল দেখাল আমাদের অফিসের দিকে।

তাকিয়ে রইলাম মিষ্টিওলার দিকে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হাতের উলটো দিক দিয়ে মুছতে মুছতে বিড়বিড় করছে সে, ঝাণ্ডা উঁচা রাখো ভাই, ঝাণ্ডা উঁচা রাখো।

ঝাণ্ডা উঁচা রাখো। তারই প্রতিধ্বনি শুনলাম সেই কালো বুধবারের কালো রাতে রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে। সেই মহান নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায় হল তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

ঝাণ্ডা উঁচা রাখো। কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং।

—অরুণ ঘোষ

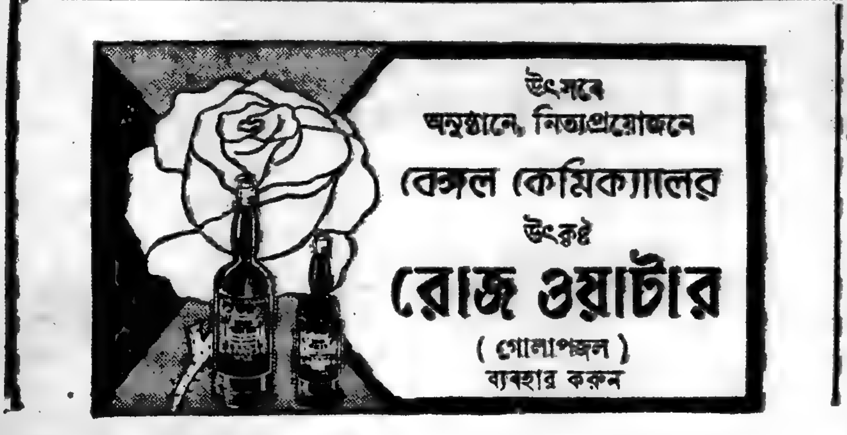

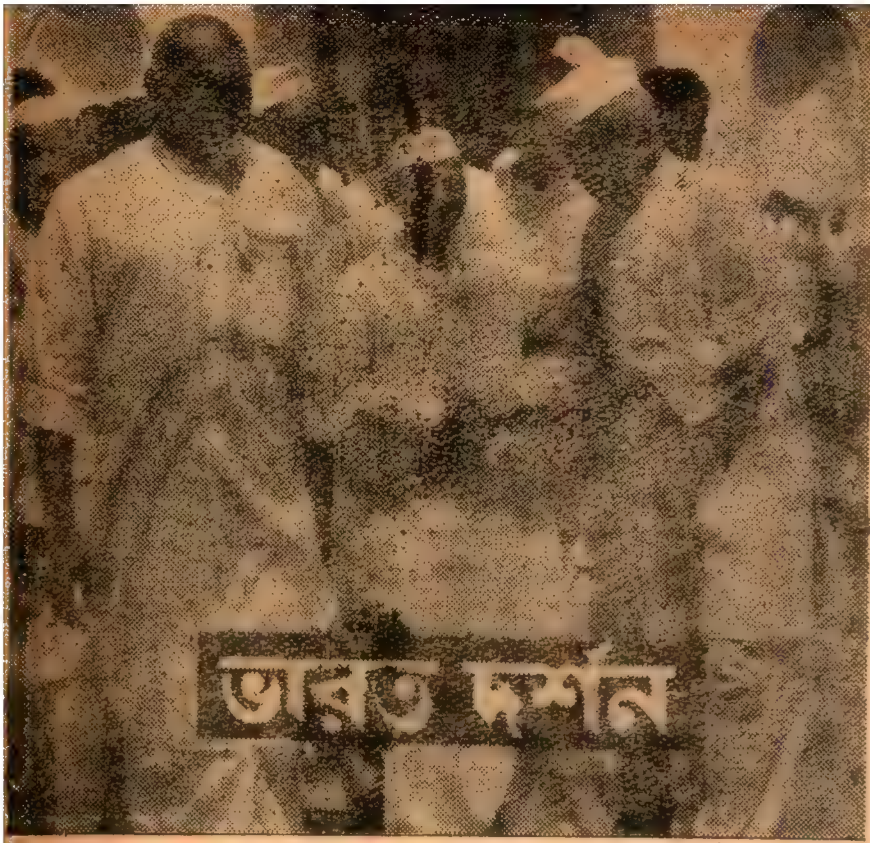

নবনির্বাচিত নেতা শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর অভিনন্দন গ্রহণ

রাজধানী ঃ

নেহরু-উত্তর রাজধানী, নেহরু-উত্তর ভারতের কথা কিছুদিন আগেও আমরা ভাবতে পারি নি। ভাবনার বাইরে যা' ছিল তাই পরিণত হয়েছে কঠিন বাস্তবে। নেহরু নেই—নেই আর সে নেতৃত্ব যাঁর আহ্বানে এগিয়ে আসতো ভারতের প্রতিটি মানুষ সমর্থনের অর্ঘ্য নিয়ে।

বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাবের পর আসে যৌথ দায়িত্ব পালনের, যৌথ নেতৃত্বের দিন। প্রকৃতির নিয়মই তাই। ভিতর ও বাইরের ভারসাম্য রক্ষার অনিবার্য তাগিদেই এ অবস্থা হয়ে পড়ে অপরিহার্য। নেহরু নিজেও এ বিষয়ে সম্যক সচেতন ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, এই প্রশ্নের জবাব তাই তিনি বার বার এড়িয়ে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বিরাট শূন্যতা পূরণ কোন একক ব্যক্তিত্বের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেখানে প্রয়োজন হবে গোষ্ঠীগত নেতৃত্বের। শাস্ত্রী—নাদার—নন্দ—কৃষ্ণমাচারীকে নিয়ে এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টাই তিনি শেষ ক'টা মাস করে গেছেন।

সুখের কথা, নেহরুর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলেছে নেহরু-উত্তর কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সাম্প্রতিক ঘোষণাতেও এই যৌথ নেতৃত্বের কথাই স্বীকৃত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে প্রথম দিকে উপদলীয় ও ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার যেভাবে হুঙ্কার দিয়েছিল তাকে সংযত ও সংহত করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমষ্টিগত নেতৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির কৃতিত্ব সমধিক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা ও কর্মকুশলতার জন্য ভারতের মত বিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের একটা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে। স্বীকৃত হয়েছে নেতা নির্বাচনের বেলায় পার্লামেণ্টারী পার্টিকে চলতে হবে কংগ্রেস হাই-প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করে তিনি একটি নজীর স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মোরারজী ভাইও সমীচীন কাজই করেছেন। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নেতৃত্বের পদে বরণ করে কেবল নেহরু-নীতির প্রতিই আস্থা প্রদর্শন করা হয় নি, এতে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় ঐক্যবোধ, স্বীকার করা হয়েছে গণমানসের ঐকান্তিক বাসনাকে।

শ্রীশাস্ত্রী আজ জাতির নতুন কর্ণধার। নেহরু-নীতির তিনি একনিষ্ঠ সাধক, গণতান্ত্রিক সমাজবাদে তাঁর অটুট বিশ্বাস এবং দারিদ্র্য মোচনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত জেনেই ভারতের ৪৪ কোটি মানুষ তাঁকে একবাক্যে নেতা বলে মেনে নিয়েছে। নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর এবং কংগ্রেস সংসদ দলের কার্যকরী কমিটিতে যে-ভাষণ তিনি দিয়েছেন তাতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের দারিদ্র্য মোচনই তাঁর কার্যকালে প্রধান লক্ষ্য হবে বলে স্বীকারও করেছেন।

এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে শ্রীশাস্ত্রীকে যৌথ দায়িত্ববোধের কথাটা সামনে রেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে হবে। দলগত দাবীর, ব্যক্তির দাম্ভিকতার উর্ধ্বে থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া উচিত হবে উপযুক্ত সহযোগীদের। যোগ্যতা ও আদর্শের বিশ্বাসই হবে সে-ক্ষেত্রে বড় কথা। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে, নেহরুর আদর্শে অবিচল-অচঞ্চল যাঁরা তাঁদের সাথী করতে না পারলে, দল-উপদলের স্বার্থের দাঁড়ি-পাল্লায় যাচাই করে চলতে গেলে যৌথ নেতৃত্বের পথে নিরুপদ্রবে পাড়ি দেওয়া হবে খুবই কষ্টসাধ্য। কারণ যৌথ নেতৃত্বের অর্থই হল কাজে, চিন্তায় ও মননশীলতায় পরম একতা। শ্রীশাস্ত্রী এই যৌথ নেতৃত্ব গঠনে যতটা কৃতকার্য হবেন তার ওপরই নির্ভর করবে তাঁর আগামী দিনের সাফল্য।

বহু বিতর্কিত সংবিধানের ঊনবিংশ সংশোধন বিল লোকসভায় গৃহীত হওয়ায় ভারতের ভূমিসংস্কারের কাজ সহজ ও সুগম হবে। এই বিলটি বাজেট অধিবেশনে সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল রূপে উত্থাপিত হয়েছিল। উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তখন বিলটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। এবারে বিলটি কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের তরফ থেকে এবারেও অবশ্য প্রবল আপত্তি উঠেছিল। ভারতের অগণিত ভূমিহীন চাষীর কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা সংবিধানের ১৪নং ধারার মর্যাদা কতটা হানি হবে এই বিলে তার চুলচেরা বিচারে নেমেছিলেন। এঁদের ক্রুদ্ধ মন্তব্যের সামনে কুশলী, দক্ষ কাণ্ডারীর মত বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে বিলটিকে পরিচালনা করেছেন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। তিনি বলেছেন, ভূমি সংস্কারের পথে সকল বাধা দূর করা, প্রত্যেক চাষীর হাতে সর্বনিম্ন পরিমাণ জমি রেখে অতিরিক্ত দখল করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

খাদ্যে ঘাটতি আমাদের দেশে। উৎপাদন বাড়াতে নিবিড় ও ব্যাপক চাষের গালভরা বিজ্ঞপ্তি সরকার দিয়ে আসছেন। যতদিন ভূমিহীন ও গরীব চাষীর হাতে জমি না আসবে ততদিন চাষের উন্নতি হবে না। এইটিই হল অর্থনীতির আসল কথা। আইন-মন্ত্রী শ্রীসেন অর্থনীতির ছাত্র। তিনি অর্থনীতির মূল ভিত্তির কথা স্মরণ রেখেই চাষীর হাতে অতিরিক্ত জমি তুলে দেবার পথের বিঘ্ন অপসারণের ওপর জোর দিয়েছেন। এ-কাজ ভারত সরকারের বহু আগেই করা উচিত ছিল। দেরীতে হলেও এই উল্লেখ-যোগ্য পদক্ষেপের জন্য সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

লোকসভায় সেদিন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেছেন, মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এ-ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এমনি ধারা ভাল ভাল কথা এবং বাস্তব অবস্থার নিখুঁত বিবরণ আমরা অর্থমন্ত্রীর মুখে আরও শুনেছি। কিন্তু এবারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশের সাথে সাথে প্রতিকারের দাওয়াই বাতলিয়েছেন। তাঁর মতে, কঠোর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও খুচরা বণ্টনের ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ

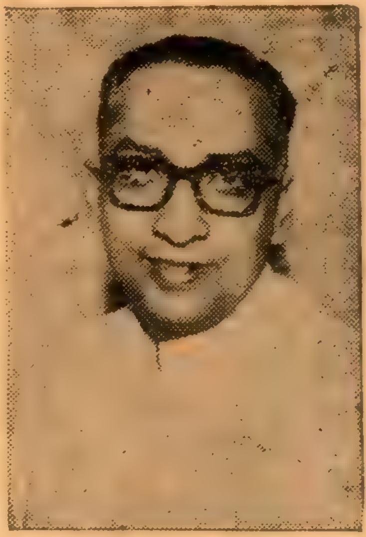

শ্রীঅশোক সেন

করতে পারলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। অশোক মেটা কমিটি খাদ্য-শস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করবার সুপারিশ করেছিলেন বহুদিন আগেই। সরকার এ-বিষয়টি একে-বারে ধামাচাপা দিয়েছিলেন। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হলে অতি মুনাফালোভী জোতদার-আড়তদার-পাইকার ও মিল মালিকদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন। পাইকারী স্তরে খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা তার অন্যতম পথ সন্দেহ নেই। পশ্চিম বাংলা সরকার মিলগুলোকে ধান সরবরাহ করে আংশিকভাবে এই পথে নেমে যে-অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। উপযুক্ত সংগঠন গড়ে না তুলে কাজে নামার জন্যই এ-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সব আঁট-ঘাট বেঁধে নিয়ে পাইকারী ব্যবসায় হাত দিলে সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু তা না করে, পাইকারদের মুনাফা লুটের ছিদ্রপথ বন্ধ না করে পুরোপুরি রেশনিং প্রথার প্রবর্তনে কোন ফলই হবে না। এতে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়বে এবং রেশনের মাল চোরাবাজারের গলিপথে সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে যাবে। পাইকারী স্তরে মূল্য নির্ধারিত হলে এবং খোলা খুচরা বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলে খাদ্য-শস্যের চোরাকারবার আপনা থেকেই হ্রাস পেতে বাধ্য। সরকারকে তখন আর খুচরা বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য মাথা ঘামাতে হবে না।

গুজরাট :

বীরাঙ্গনাদের জহরব্রতের পালা শেষ হয়েছে বহুকাল আগে। শত্রুর পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেকালের রমণীরা জহরব্রত পালন করতেন হাসিমুখে। ভারতীয় নারীর এই আত্মাহুতি আজ ইতিহাসের গৌরবগাথা হয়ে আছে।

ভারত আজ স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান মেয়েদের সম্মানের আসন দিয়েছে। নারী পেয়েছে পুরুষের সমান অধিকার। তা সত্ত্বেও দিনের পর দিন কেন নারীরা মরণকেই বরণ করে নিচ্ছেন, এর মীমাংসার জন্য গুজরাট সরকারের সমাজ-কল্যাণ দপ্তর শ্রীমতী পুষ্পবেন মেহতার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়েছেন।

গুজরাটে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুজন করে রমণী আত্মহত্যা করছেন। আত্মহত্যার সংখ্যাটা সব চাইতে বেশি দেখা যাচ্ছে সৌরাষ্ট্রে। ১৯৬১-৬২ সালে এখানে ৩৩৩ জন রমণী আত্মহত্যা করেছেন। নবনিযুক্ত কমিটি মেয়েদের সামাজিক, আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে

এক বছরের মধ্যে সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করবেন।

বিহার ঃ

প্রচণ্ড গরম বিহারকে কাহিল করে তুলেছে। ১১১ ডিগ্রী তাপের মধ্যে কেউ আর ঘরের বাইরে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সকাল নটার পর থেকেই শহরগুলোর রাজপথ হয়ে পড়ে জনবিরল। ডাক-বিভাগের পিয়নেরা গরম হলকা হাওয়ায় অসুস্থ হয়ে ছুটি নিতে বাধ্য হচ্ছে। চিঠিপত্র বিলি করা এখন একটা সমস্যা হয়ে পড়েছে।

তাপদগ্ধ বিহারের বাজারের তাপমাত্রাও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকারের জোরদার ঘোষণায় কোন ফলই হয় নি। বিহার প্রকৃত প্রস্তাবে চোরাবাজারের লীলা নিকেতনে পরিণত হয়েছে। সরকারী গুদামে টান পড়েছে শুনে তারা আরও উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী নায্যমূল্যের দোকানের মারফত বিতরণযোগ্য ১২ সপ্তাহের চাল ও ৬ সপ্তাহের গম সরকারের গুদামে মজুত আছে। এরপর কেন্দ্রের সাহায্য না পেলে বিহারে একেবারে হাহাকার সুরু হবে। কেন্দ্রের কাছে ২০ হাজার টন চাল ও ৮০ হাজার টন গম চাওয়া হয়েছে। দু মাসের মধ্যে কেন্দ্রের সাহায্য না পেলে অবস্থা না কি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

গমের দাম বেড়েছে শতকরা ৩৪ ভাগ। এক সপ্তাহের মধ্যে সরষের তেলের দাম প্রতি কুইন্টালে বেড়েছে ৬০ টাকা ২৯ নয়া পয়সা। ডালের দাম বেড়ে গত ছ'মাসের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। চিনি, মাছ, মাংস, শাকসব্জীও এখন দুর্মূল্য। বাজার থেকে চিনি উধাও হয়েছে। চোরাবাজারে চিনির অবশ্য অভাব নেই। চিনির জন্য প্রতি কিলোগ্রামে সেখানে দক্ষিণা দিতে হচ্ছে ২ টাকা ২০ নয়া পয়সা।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় স্বীকার করেছেন, বিহারে আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মহারাষ্ট্র ঃ

জওহরলাল নেহরুর তিরোধানের পর তাঁর শূন্য স্থান পূরণের জন্য স্বতন্ত্র পার্টি কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠনের দাবী তুলবেন বলে শোনা যাচ্ছে। দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমিনু মাসানী শ্রীরাজাগোপালাচারীর সাথে

● শ্রীরাজাগোপালাচারী

পরামর্শ করে প্রস্তাবের একটা খসড়া খাড়া করবেন বলে ঠিক হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হবে দলের আগামী জাতীয় সম্মেলনে।

জাতীয় সরকার গঠনের দাবী রাজাজী আগেও তুলেছেন। তবে, এবারের দাবীতে যুক্তি হবে আলাদা। স্বতন্ত্র দলের মতে, নেহরু-উত্তর কংগ্রেসে ছোট ছোট উপদলের সংগ্রাম এবং সেই উপদলীয় স্বার্থে মাঝে মাঝে জোড়া-তালি দেওয়া ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কাজেই জাতীয়তায় বিশ্বাসী বিরাট নেতৃত্বের সন্ধান কংগ্রেসের বাইরেই পাওয়া একমাত্র সম্ভব। সেই বিরাট পুরুষই কংগ্রেসের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতাদের সহযোগিতায় সামান্য উপদলীয় স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারবেন।

স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা আশা করছেন প্রস্তাবটি স্বয়ং রাজাগোপালাচারীই সম্মেলনে পেশ করবেন।

রাজাজীর কথাই আলাদা। তিনি অনেকবার ভোল পাল্টিয়েছেন। কাজেই তাঁর ভেল্কিতে আর যাই হোক, সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ আর ভুলবে না। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে কংগ্রেস যে মহান আদর্শের পরিচয় দিয়েছে তা থেকে শুধু স্বতন্ত্র পার্টি কেন, কংগ্রেস-বিরোধী বাম ও দক্ষিণপন্থী সকল রাজনৈতিক দলকেই নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কংগ্রেস নেতারা তাঁদের এই আদর্শে অটল থাকলে 'সামান্য উপদলীয়' সংঘাত মেটাতে রাজাজীর পরামর্শ প্রয়োজন হবে না।

মাদ্রাজ ঃ

জওহরলালের পরলোকগমনের সংবাদে ভারতের অন্যান্য অংশের মত এই রাজ্যও একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজ্যের জীবনপ্রবাহ। সাম্প্রতিক কালে নেহরুর কঠোর সমালোচক পর্যন্ত সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে কেঁদে ফেলেছিলেন। দ্রাবিড় কাজাগমের ৮৫ বছরের বৃদ্ধ নেতা শ্রীরামস্বামী পারিয়ারকে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনে এই প্রথম না-কি মানুষ এমন আকুল হয়ে কাঁদতে দেখেছেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারেন নি।

কেবল মাদ্রাজ নয়, দক্ষিণ ভারতের অনেকখানি জুড়ে নেহরুর অভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছে। নেহরুর উদার নীতির ছায়াতলে তাঁরা ছিলেন নিরাপদে। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের উগ্র প্রচার আবার সুরু হলে তেমনি নিরাপদ আশ্রয় নতুন নেতার কাছে কতখানি পাবেন সেই ভাবনা তাঁদেরও মনকে কিছু শঙ্কিত করে তুলেছে।

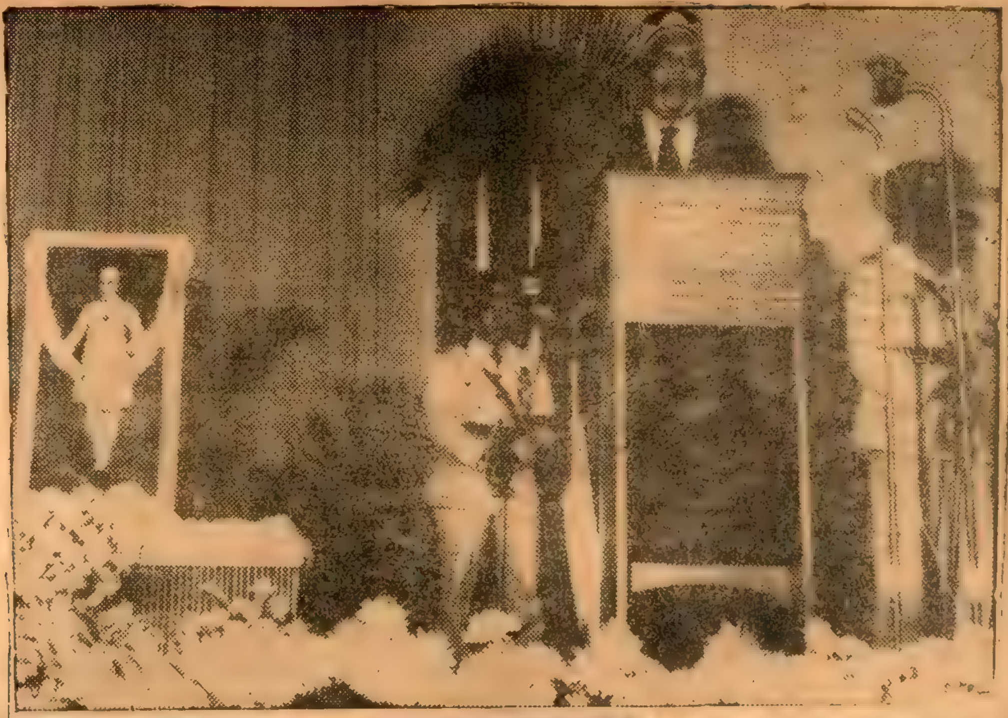

আন্তর্জাতিক

● নেহরু স্মরণে নায়রোবিতে এক বিরাট জনসভায় জোমো কেনিয়াট্টা বক্তৃতা করছেন

নেহরুর প্রতি বিশ্ব প্রশস্তি

জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বে যেরূপ গভীর শোকের ছায়া পড়েছে এবং সর্বত্র যেভাবে গোষ্ঠীমত নির্বিশেষে পরলোকগত রাষ্ট্রনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে, তা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে অতুলনীয়। একমাত্র বোধ হয় জন এফ কেনেডির মৃত্যুর সঙ্গেই এর কিছুটা তুলনা করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, কেনেডির মৃত্যু শহীদের মৃত্যুবরণ ও অত্যন্ত আকস্মিক অতর্কিত ঘটনা বলে সর্বত্র স্বাভাবিকভাবেই বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের প্রধান দুই শক্তির অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বলেও কেনেডির মৃত্যুর গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে শ্রদ্ধার আসন আজ বিশ্ববাসীর কাছ থেকে পেলেন তা তাঁর মহান অবদানের স্বীকৃতি।

যাঁরা তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত নন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকে তাঁর তীক্ষ্ন সমালোচক, এবং অনেকের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ রয়েছে—তবু সবাই স্বীকার করেছেন তাঁর মহৎ গুণের কথা—তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ কূটনৈতিক সৌজন্যের খাতিরে শত্রু-মিত্র সবাই-এর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে হয়, নিয়মমাফিক পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হয়। কিন্তু নেহরুর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে তা নিছক কূটনৈতিক সৌজন্যবিধি নয়, যে ভাষায় যে ভঙ্গীতে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তা অন্তরমথিত—স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থেকে উৎসারিত।

নেহরুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন বিশ্ব-রাজনীতির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী এলেকসি কোসিগিন, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি হুসেন সুফেই, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো, নেপালের মন্ত্রী-পরিষদের সভাপতি ডঃ তুলসী গিরি, যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টাম্বোলেক, ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখ শান্তিঘাটে উপস্থিত হয়েছেন নেহরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে বা অন্য কারণে যাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এসে পৌঁছতে পারেন নি, তাঁরা অনেকে পরে দিল্লীতে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন। টিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি হবিব বরগুইবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গি স্লিমকে নিয়ে ঘুরে গেছেন। আবার অনেকে আসেন নি বলে তাঁদের নিজেদের দেশে এই নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। ক্যানাডা আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা জন

[illegible]ফনবেকার নেহরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ক্যানাডার কোন উচ্চপদস্থ মন্ত্রী উপস্থিত না থাকার জন্য পিয়ার্সন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জানিয়েছেন, মন্ত্রী যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিমান না পাবার জন্য যাওয়া হয় নি। পশ্চিম জার্মানীতেও এরূপ সমালোচনা হয়েছে। এ সব ঘটনা সমগ্র বিশ্বে নেহরুর অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

সব দেশেই বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতারা নেহরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে। বহু রাষ্ট্রে এক বা একাধিক দিন ধরে শোকদিবস পালন করা হয়েছে। আইনসভায় নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বিভিন্ন দলের সদস্যেরা এক সুরে বক্তৃতা করেছেন। বিভিন্ন স্থানে জনসভার অনুষ্ঠান হয়েছে, মিছিল হয়েছে, প্রার্থনা-সভারও আয়োজন হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে আবালবৃদ্ধবনিতা এসে শোক জ্ঞাপন করে গেছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র নেহরুর প্রশংসা করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছে।

প্রধান শক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন নেহরুর মৃত্যুতে অকৃত্রিম বেদনা প্রকাশ করেছে, এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই রাষ্ট্রই নেহরুকে তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু বলে স্বীকার করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন বলেছেন, "নেহরুর মহাপ্রয়াণে তাঁর দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি—যার জন্য তিনি কথায় ও কাজে কতই না দিয়ে গেছেন—আজ কাঙাল হয়ে পড়ল।" 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন'ও একই কথা লিখেছে, "তাঁকে হারিয়ে ভারত এবং বিশ্ব আজ আরও দরিদ্র হল। ... যদি কোন ব্যক্তিত্বকে অপরিহার্য বলে চিহ্নিত করা চলে তবে জওহরলাল নেহরু ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব।" 'সানফ্রানসিসকো ক্রনিকল' লিখেছেন, "ইতিহাসে আর কেউ কোনদিন জওহরলাল নেহরুর মত এত বেশি মানুষের আস্থা, আনুগত্য এবং অধিনায়কত্ব ভোগ করেন নি।" অন্যান্য সব পত্রিকার সুরও একই রূপ। রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি আদলাই স্টিভেনসন, ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ প্রভৃতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ মৃত্যু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সোভিয়েট নেতাকে সঙ্গে করে ভারতীয় দূতাবাসে যান এবং নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ক্রুশ্চেভ বলেন, "সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ আজ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত ; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি, রাজনৈতিক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়োগ করেছিলেন মানবতা, শান্তি ও প্রগতির সুউচ্চ আদর্শে।" "প্রাভদা" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : "ভারতের জনগণের স্বাধীনতার দৃঢ়চেতা নায়ক হিসেবে জওহরলাল নেহরুর নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।... ভারতের বহু-অভিনন্দিত নিরপেক্ষতা ও গোষ্ঠী-বহির্ভূত থাকার নীতি নেহরুরই কীর্তি।" বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর বিবৃতিতে

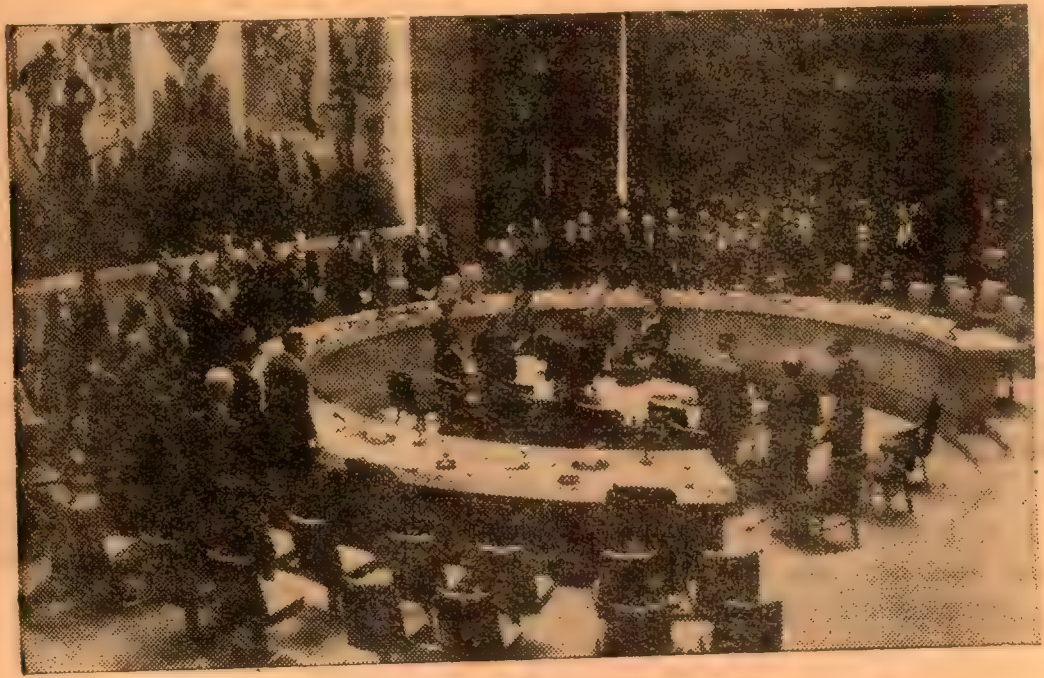

● নেহরুর মৃত্যুতে মুহ্যমান নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণ এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করেন

"মানুষ জওহরলাল নেহরু"র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

বৃটেনে নেহরুর মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘকাল ভারত শাসনের ফলে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবাসীর যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর সে তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি নেহরুর কীর্তি। নবরূপে কমনওয়েলথ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান স্থপতিও নেহরু। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে নেহরু জ্যেষ্ঠতম। তাই বৃটেনের কাছে নেহরুর মৃত্যু এক মস্ত শোকের ঘটনা। রাণী এলিজাবেথ শ্রদ্ধা জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন এবং নেহরুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকার জন্য আর্ল মাউণ্টব্যাটেনকে পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম বলেছেন, "আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বিশ্ব রাজনীতিজ্ঞ এবং সর্বোপরি একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত কমন-ওয়েলথ নেতারূপে আমরা তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি।" বিরোধী শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন বলেছেন, নেহরুর মৃত্যুতে বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হল। শ্রমিক দলের সহকারী নেতা জর্জ ব্রাউন নেহরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার জন্য দিল্লীতে এসেছিলেন। বৃটেনের তিনজন প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী লর্ড এটলি, লর্ড অ্যাভন (এন্থনি ইডেন) ও হ্যারল্ড ম্যাকমিলানও নেহরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় নেহরুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। 'টাইম্‌স্' পত্রিকা মন্তব্য করেছে: "বিশ্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি শুধু জাতীয় নায়কের প্রতিই নয়---জাতীয়তার প্রবল আলো-ড়নের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে যিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সেই মানুষের প্রতিও।" 'গর্ডিয়ান' লিখেছে, "নেহরু স্পষ্টতই আমাদের কালের অন্যতম মহামানব ছিলেন।" এমনিতরো অজস্র প্রশস্তি। তবু কিন্তু বৃটেনে নেহরুর মৃত্যুতে বিরূপ মন্তব্যও শোনা গেছে কোথাও কোথাও। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী 'বিভারব্রুক' গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি মৃত্যুতেও নেহরুর কুৎসা গেয়েছে। কুখ্যাত ভারত-বিরোধী বৃটিশ নায়ক উইনস্টন চার্চিলের কণ্ঠও অনুচ্চারিত। এই সামান্য চিত্তবিকার বাদ দিলে, বৃটেনের সরকারী ও বেসরকারী, সরকার পক্ষীয় ও সরকার বিরোধী, সকল মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন নেহরু।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি দ্য গল ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কাছে প্রদত্ত শোকবাণীতে বলেছেন, "গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি ও শান্তির জন্য মহান রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল নেহরুর মহৎ প্রচেষ্টা ভারত তথা বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।" ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নেহরুজীর চিতাশয্যা পার্শ্বে শোকসন্তপ্ত বিশ্বের নেতৃবৃন্দ: (বাঁ দিক থেকে) ডীন রাস্ক, লেডি পামেলা হিক্স, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং হোসেন সুকেই।

● দ্য গল

দিল্লীতে এসেছিলেন নেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। প্যারিসের দৈনিক পত্রিকা 'এল সরোঁর' লিখেছে, "যদি বলা হয় হিমালয় ভেঙে পড়েছে তাহলে সেটা হয়তো আজ কেবলই কল্পনা-বিলাস নয়।" কমিউনিস্ট দৈনিক 'লু মানিতে' লিখেছে, "নেহরু এমন পৃথিবী চেয়েছিলেন যেখানে যুদ্ধ নেই। সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি এই পথে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।"

কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের সব দেশের কাছে নেহরু ছিলেন বড় ভাই-এর মত। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড সব দেশেই নেহরুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী মিস্টার পিয়ার্সন বলেছেন, "বর্তমান শতাব্দীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে অপর কেহই সমকালীন ইতিহাসে নেহরুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেন নাই।" বিরোধী রক্ষণশীল ...দলের নেতা জন ডিফেনবেকার বলেন, 'নেহরুর মৃত্যু নাই।" অটোয়ার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে নেহরুকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহান পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার

স্তম্ভ" নেহরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেছেন, "এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মৃত্যু হল।" মেলবোর্ন থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'হেরাল্ড' মন্তব্য করেছে: "নেহরুর মৃত্যুতে আধুনিক ভারত গড়ে তোলার একটি অধ্যায়-শেষ হল। তিনি সারা বিশ্বের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।"

গোষ্ঠীনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা নীতির অন্যতম প্রবর্তক নেহরুর মৃত্যুতে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে এদের মধ্যে প্রধান যারা, অর্থাৎ, যুগোশ্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সিংহল নেহরুর মৃত্যুতে তাদের একজন একান্ত নির্ভরশীল ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারাল।

যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটো তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "নেহরুর মৃত্যুতে ভারত, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলি এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার এক মহান সংগ্রামীকে হারাল।" যুগোশ্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।

● মিষ্টার পিয়ার্সন

যুগোশ্লাভ জনসাধারণ নেহরুকে "বড় মানুষ" ('ভেলিকো কোভেক') বলে অভিহিত করেছে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

● টিটো

ভারত নয়, সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে আশার আলো ছিলেন। "মিশরীয় জনগণের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু নেহরু"কে নাসের "একজন মহান চিন্তানায়ক, মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং সর্বোপরি একজন মহান ব্যক্তি"রূপে অভিহিত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কায়রোর সকল সংবাদপত্র নেহরু প্রশস্তিতে ভরা ছিল।

সিংহলে যেভাবে নেহরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় এ-যেন ভারতেরই কোন একটি অংশের শোক। সিংহলবাসীর কাছে নেহরু ছিলেন একান্ত আপন জন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক নিজে ছুটে এসেছেন দিল্লীতে, শোকাভিভূতা ইন্দিরার শোককে পাশে দাঁড়িয়ে ভগিনীর মত ভাগ করে নিয়েছেন। দিল্লীর রামলীলা ময়দানের শোকসভায় শ্রীমতী বন্দরনায়ক নেহরুকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে বর্ণনা করেন। সিংহলের সকল দল, সকল সংবাদপত্র নেহরুর প্রতি সপ্রশংস শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। সিংহলের নদীতে নেহরুর চিতাভস্ম বিসর্জন দেবার কথাও হচ্ছে। সিংহলে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা এখনও অমীমাংসিত, তা সত্ত্বেও সিংহলের এই শ্রদ্ধা নিবেদন অন্তর

প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রি। রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করলেন : আমাদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এই স্বপ্ন ভারতবর্ষের জন্য এবং তা পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল মানুষের জন্যও। শান্তি যেমন অবিভাজ্য, তেমনি স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধও অবিভাজ্য। তেমনি অবিচ্ছেদ্য এই অখণ্ড পৃথিবীর দুর্ভাগ্য। "গত সতেরো বছর ধরে নেহরুর রাষ্ট্রনায়কের জীবনে এ ঘোষণার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। লোকসভায় অধ্যক্ষের আসনের ডানদিকে সরকারী বেঞ্চের প্রথম সারির প্রথম আসনটিতে গত সতেরো বছরে এই ব্যক্তিকেই একমাত্র আসীন হতে দেখেছি। সে আসন, সেই মহান নেতা নেহরুর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে আসন শূন্য হয়ে পড়ে, তা আজ আবার অলঙ্কৃত করেছেন নেহরু-শিষ্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী। শ্রীশাস্ত্রী স্থিরবুদ্ধি ও অচঞ্চল সঙ্কল্পের প্রতীক। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব এই ব্যক্তিটির উপর অর্পিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চুয়াল্লিশ কোটি জনতা অভিনন্দন জানিয়েছে। নেহরুর সাধনার গণতন্ত্র স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছে।

দরিদ্র পরিবারের ছেলে লালবাহাদুর ১৯২১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। নেহরুর সঙ্গে শাস্ত্রীজীর সম্পর্ক সেইদিন থেকে। একজন নেতা অন্যজন কর্মী। একজন গুরু, অপর জন শিষ্য। একজন উদ্দাম আবেগের প্রতিমূর্তি, অপর জন সংযত পদক্ষেপের অধিকারী। একজন এসেছেন উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত শ্রেণীর স্বচ্ছল পরিবার থেকে, অপর জন অতি দরিদ্র মধ্যবিত্তের ঘর থেকে। গুরু তাঁর আসন পেয়েছেন গোড়া থেকেই উচ্চ বেদীতে। শিষ্যকে আসতে হয়েছে জনতার ভিড় থেকে। শাস্ত্রীজী কংগ্রেসে এসেছেন যাকে বলে, একেবারে র‍্যাঙ্ক-এ্যাণ্ড ফাইল থেকে। তিনি প্রথমে হয়েছেন কর্মী, আজ্ঞাবাহক। তারপর নেতা, আজ কর্ণধার। কিন্তু দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ছেদ পড়ে নি অথচ দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে শিক্ষায়, আচারে উভয়ের অমিল আকাশ-পাতাল। শাস্ত্রীজীর শিক্ষা-দীক্ষা খাঁটি স্বদেশী। তাঁর শাস্ত্রী উপাধি কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে পাওয়া। নেহরুর মতো তিনি কোনদিন শিক্ষা-দীক্ষার বিদেশী বা বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। বিদেশ বলতে তিনি মাত্র নেপাল সফর করেছেন। তবুও অনস্বীকার্য যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টি স্বচ্ছ। এ দৃষ্টি লাভ ক'রেছেন তাঁর গুরু নেহরুর কাছ থেকে। শাস্ত্রীজী যেমন ভারতীয় পরিবেশে মানুষ, তেমনি জীবনযাপনে তিনি ঘরোয়া মেজাজের প্রতীক। ঘড়িকে তিনি তাঁর দীর্ঘ রাষ্ট্রজীবনে এখনও শাসন করতে শেখেন নি। 'এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট' নামক জিনিষটি তাঁর কাছে দেখা করবার ক্ষেত্রে বাতুলতার সামিল। প্রকৃত কথা, দেশের মাটির সঙ্গে শাস্ত্রীজীর পরিচয় তাঁর ধ্যান-ধারণার গুরু নেহরুর চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

নেতা নির্বাচিত হবার পর শাস্ত্রীজী পণ্ডিতজীর সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তাঁর দক্ষিণে পুষ্পহস্তে শ্রীকামরাজ নাদারকে দেখা যাচ্ছে।

তিনি ঘরোয়া পরিবেশে যেন বেশি পরিচিতি। তাঁর সঙ্গে যে কোন লোকই যেন দুদণ্ড গল্প-গুজব করতে পারেন, সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারেন। তিনি আলাপে মিষ্টভাষী, বক্তব্যে স্বল্পভাষী, অথচ কর্তব্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞায় অটল। এই খুদে মানুষটিকে নিয়ে অনেকে যেমন ঠাট্টা-তামাসা ক'রে থাকে, তেমনি শ্রীশাস্ত্রী নিজেকেও তাঁর ছোট মাপের চেহারা নিয়ে কম রসিকতা করেন নি। কিন্তু দেহে ছোটখাটো মানুষটি যে কতবড় তার প্রমাণ তাঁর কর্মময় জীবন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছোট দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। ছোট মানুষটি ছোট কাজের দায়িত্ব নিয়েই এসেছিলেন কংগ্রেসে। কিন্তু ছোট ছোট পদক্ষেপে নিজ কর্মতৎপরতায়, ধীশক্তি আর আত্মবিশ্বাসে আজ ভারতের রাষ্ট্রনায়ক। বুঝি ক্ষুদ্রদেহী মানুষেরাই খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার উচ্চতায় অনেককে ছাপিয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসকে যাঁরা প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে খর্বকায় মানুষ নেপোলিয়ান, 'লিট্‌ল শেফ্ৰ-পীয়র', লেনিন, সান ইয়াৎ সেন প্রত্যেকেই পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছেন। প্রত্যেকেই অসীম সাহসের উত্তরাধিকারী। সমসাময়িক কালে পৃথিবীর কোন দীর্ঘদেহী বিপ্লবী তাঁদের নাগাল পায় নি। ক্ষুদ্রদেহী শাস্ত্রীজীর বিরাট আত্মবিশ্বাস আর ধীশক্তি তাঁকে উপযুক্ত আসন দান করেছে। এই মিষ্টভাষী ব্যক্তিটিকে বুঝতে কারোরই তেমন অসুবিধা হয় না। তিনি 'মানুষকে অবিশ্বাস করা পাপ' এই সত্যে মানুষের সাথে কথা বলতেন। তাই বলে, তিনি যে ঝানু ডিপ্লোম্যাট তাতে সন্দেহ নেই। লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রকৃতিতে নরম হলেও, দৃঢ়চেতা। তিনি যে কতখানি কূটনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী তাঁর নেপাল সফরকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। রাজনীতিতে ঝুঁকি নেবার মনোভাব দেখা গেছে কাশ্মীর সমস্যায়, শেখ আবদুল্লার ব্যাপারে। একগুঁয়েমি ভাব প্রকাশ পেয়েছে চীনা আক্রমণ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে শ্রীকৃষ্ণমেননের অপসারণ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে।

আজকের চুয়াল্লিশ কোটি ভারতবাসী এই স্থিরবুদ্ধি ও অচঞ্চল সঙ্কল্পের প্রতীক প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে নেহরু-নীতির স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির আশ্বাস পেতে চায়। নেহরুর অন্যতম রাজনৈতিক কৃতিত্ব ছিল তাঁর পররাষ্ট্রনীতি। এই পররাষ্ট্রনীতি শুধু এই বৃহৎ রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত দেয় নি, এশিয়া ও আফ্রিকায় সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকেও এই পররাষ্ট্রনীতির আদর্শ বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৫১ সালের এই নেহরু-নীতির ভিত্তিতে '৬৪ সালের দুনিয়ায় প্রধান রাষ্ট্রগুলি পর্যন্ত নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজাচ্ছে। নেহরুর মৃত্যুর পর অনেক অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে। আজ যে নেহরু-শিষ্য শাস্ত্রীজী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তথা গোটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাঁকে রুক্ষ কঠিন ভূমিতলে নেমে আসতে হবে। তাঁকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। নইলে শুধু পররাষ্ট্রনীতিই নয়, আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজকাঠামো টলে উঠতে পারে।—মৈত্রেয়

রুদ্রের প্রশান্ত মুখ

লোকসভার কাছে আমি একটি দীর্ঘ প্রস্তাব পেশ করেছি। সভ্যদের বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে এই প্রস্তাব আদৃত হবে ও গৃহীত হবে। আমার এক একবার মনে হয়েছে প্রস্তাবের সঙ্গে একটি ছোট পংক্তি জুড়ে দিয়ে বলি চীন সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ চীন যদি ভারত আক্রমণ না করত তাহলে ভারতের মুখের উপর থেকে হঠাৎ গুণ্ঠন খুলে যেত না। গত তিন সপ্তাহের কিছু আগের থেকে আমি ভারতের সেই রুদ্র অথচ প্রশান্ত মুখখানি দেখতে পাচ্ছি। সে মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সঙ্গে মিশে আছে একটি ধীর শান্ত ভাব, সে মুখে হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে মিশে গেছে চির তারুণ্যের দীপ্তি। এই লোকসভার সদস্যেরা নিশ্চয় এ রকম হাজার হাজার মুখ দেখে থাকবেন—ভারতমাতার শান্ত গম্ভীর মুখের আদল দেখা দিয়েছে তাঁর সন্তানদের মুখে।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের পক্ষে, এই উদ্দীপনা আমরা সকলে যেন ভাগ করে নিয়েছি। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে বলা যায় না, কিন্তু দল ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে আমরা সকলে একযোগে এই যে দেশব্যাপী উদ্দীপনায় সাড়া দিলাম—এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সারা পৃথিবীর এবং বিশেষত চীন সরকারের বুদ্ধিমান লোকেরা যেন এই ঘটনার সম্যক তাৎপর্য তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন। আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পারছি সঙ্কট মুহূর্তে যে দেশে এ রকম উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তাকে দাবিয়ে রাখা কিম্বা জয় করার চেষ্টা সুদূরপরাহত। আমার মনে হয় পশ্চিমের বহু দেশ এবং সম্ভবত এই প্রাচ্যখণ্ডেরও অনেক দেশ এই অবিসম্বাদী সত্য মেনে নিয়েছেন। যে সব ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি নিয়ে এতদিন আমাদের দিন কেটেছে, যা নিয়ে আমরা এতকাল বাড়াবাড়ি করেছি, সে সমস্ত এক নিমেষে কোথায় যেন উবে গেল। আজ আমাদের সকলের মনে এই এক চিন্তা কি করে এই আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, কি করে শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া যায়। দুঃখে দুর্যোগে আমরা যে সবার সঙ্গে হাত মেলাতে পারি, সমস্ত তুচ্ছতা অতিক্রম করতে পারি—আমাদের এই নূতন জাগরণ সারা পৃথিবীতে এক গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। —জওহরলাল নেহরু

● নাসের

আরব জগৎ

আরব জাতির আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক নেহরুর মৃত্যুতে প্রত্যেকটি আরব দেশে শোকের ছায়া পড়েছে। আরব লীগের সেক্রেটারী-জেনারেল আবদেল খালেক হাসুনা এক বিবৃতিতে বলেন, "নেহরুর মৃত্যুতে আরবরা বিশ্বে তাদের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাল।" সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সালা বিতার বলেছেন, "নেহরু বিশ্বের সকল নিপীড়িত মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন।" দামাস্কাসের দৈনিক 'আল বাথ্' বলেছে, 'প্রত্যেক আরবের নিকট নেহরুর মৃত্যু এক ব্যক্তিগত শোক।" অপর একটি আরব দৈনিক 'আল খোরা' বলেছে, নেহরুর মৃত্যুতে "মানবসমাজ শ্রেষ্ঠ অগ্রদূতকে হারাল।" বেইরুটে বিভিন্ন পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে, "বিশ্ব আজ রিক্ত।" আলজিরিয়া ও ইরাকেরও সর্বত্র শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র

ভারতের প্রতিবেশী সিংহল, পাকিস্তান, বার্মা, নেপাল, আফগানিস্থান সর্বত্র নেহরুর মৃত্যুতে সরকার ও জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শোক প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তানে শোক প্রকাশের মাত্রা রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে অনেকের মনে। জন্মের পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নানা কারণে খারাপ হয়েছে। সরকারের প্রধান রূপে নেহরু পাকিস্তান সরকারের তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছেন, এবং প্রায়শই এই সমালোচনা শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করে গেছে। অথচ মৃত্যুর পর সেই নেহরুই পাকিস্তান সরকার, 'সকল রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। এ কিন্তু মায়াকান্না নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান উপলব্ধি করেছে, নেহরু প্রকৃতই পাকিস্তানের বন্ধু ছিলেন। রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ নেহরুকে "মহান ভারতীয় নেতা" রূপে অভিহিত করেছেন। মুসলিম লীগ দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান নেহরুকে "ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক" বলে বর্ণনা করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তান আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে নেহরুকে "ভারত-পাক উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।" কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে ঢাকার বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয়: "ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা নামটি মুছিয়া গেল।"

নেপালের রাজা মহেন্দ্র নেহরুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ামাত্র বিদেশ সফরের বাকি কর্মসূচী বাতিল করে ফিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী ডঃ তুলসী গিরি এসেছিলেন দিল্লীতে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রীহৃষীকেশ শাহের সভাপতিত্বে কাঠমাণ্ডুতে বিরাট সভায় নেহরুর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

আফগানিস্থানের রাজা জাহির শাহ এক বাণীতে বলেছেন, "বিশ্ব-শান্তিতে নেহরুর অবদান ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।" দেশের সর্বত্র শোকদিবস পালন করা হয়।

বার্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লী এসেছিলেন নেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। রেঙ্গুনের প্রভাবশালী দৈনিক 'গার্ডিয়ান' নেহরুকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে উল্লেখ করেছে।

এশিয়া

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের রাজনীতিতে এশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠায় নেহরুর অবদান অনেকখানি। নেহরুর মৃত্যুতে এশিয়া, বিশেষ করে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এশিয়াবাসী গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

জাপানের টেলিভিশন ও রেডিওতে নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়, "আণবিক অস্ত্র বিলোপের জন্য জাপানের আবেদনে বিশ্বের যে সব মহান নেতা প্রথম সাড়া দিয়েছেন, নেহরু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।" শান্তি প্রতিষ্ঠায় আজীবন ব্রতী নেহরুর প্রতি জাপানের সকল স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইকেদা ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান ভারত ও তার নেতা নেহরুর অকৃত্রিম বন্ধু। চীনের ভারত আক্রমণের পর যাঁরা সর্বপ্রথম ভারতের

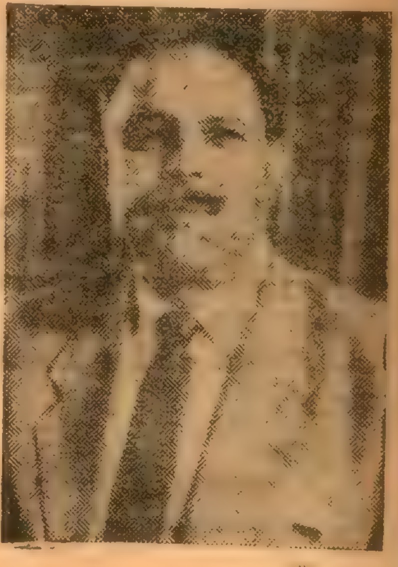

● আয়ুব খান

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, টুঙ্কু আবদুল রহমান তাঁদের অন্যতম। নেহরুর মৃত্যুতে টুঙ্কু বলেছেন, "ভারত গঠন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেহরু যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী, বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী মালয়েশিয়াবাসীর কাছে তা প্রেরণা স্বরূপ হয়ে থাকবে।"

ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ম্যাকাপাগল বলেছেন, "নেহরুর মৃত্যুতে এশিয়ার ইতিহাস থেকে শ্রেষ্ঠ

● টুঙ্কু আবদুল রহমান

রাষ্ট্রনায়ক এবং যুক্তি, বোঝাপড়া ও শান্তির সবচেয়ে বড় সমর্থককে হারাল।"

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নেহরুর সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে প্রদত্ত এক বাণীতে নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

লাওসের প্রিন্স সুভানা ফুমা, কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুক প্রভৃতি তাঁদের বিপদের দিনে নেহরুর সাহায্যের কথা স্মরণ করেছেন—নেহরুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আফ্রিকা

ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের জন্য নেহরু আজীবন সংগ্রাম করে আসছেন। আফ্রিকার সকল জাতি যাতে স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্ব রাজনীতিতে তার যোগ্য স্থান নিতে পারে তার জন্য নেহরু সচেষ্ট ছিলেন। এঙ্গোলায় পর্তুগীজ শাসনের অবসান, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিলোপের ব্যাপারে উৎসাহী সমর্থক নেহরু। তাই তাঁর মৃত্যুতে আফ্রিকার সর্বত্র শোকের ছায়া পড়েছে।

নিয়াসাল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডঃ হেস্টিংস বান্দা বলেছেন, "নেহরুর মৃত্যুতে কেবল ভারত নয়, শান্তিকামী সমগ্র বিশ্ব শোকাভিভূত হবে।"

ট্যাঙ্গানিকা-জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রপতি নিয়েরে নেহরুর মৃত্যুকে সারা বিশ্বের ক্ষতি বলে অভিহিত করেছেন। ডার-এস-সালামের দৈনিক 'ন্যাশনালিস্ট' মন্তব্য করেছে: "বিশ্ব বিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতার পরামর্শ আর পাবে না।"

কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াট্টার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা নেহরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে কেনিয়াট্টা নেহরুকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অভিহিত করেন।

কাম্পালায় অনুষ্ঠিত বিশ সহস্র মানুষের এক সভায় উগাণ্ডার রাষ্ট্রমন্ত্রী হবিঙ্গিরা বলেন, "নেহরু স্বাধীনতার প্রতীক। উগাণ্ডাকে তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন।"

ঘানার রাষ্ট্রপতি এনক্রুমা বলেন, "ভারত তার শ্রেষ্ঠ নেতা এবং বিশ্ব একজন বিরাট রাজনীতিবিদ হারাল।"

ইথিওপিয়া, সুদান, কঙ্গো সর্বত্র নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রেজিল, ইউরোপের নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড—সর্বত্র নেহরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিন্ন সুর

সমগ্র বিশ্ব এভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানালেও, কেউ যে ভিন্ন সুরে কথা বলে নি, তা নয়। চীনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নিকট প্রদত্ত বাণীতে চীনা সরকার ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে নেহরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেও, শোকবাণীটি নিতান্তই শুষ্ক, এতে আন্তরিকতার কোন স্পর্শ নেই। নেহরুর প্রতি

● টিউনিসিয়ার মন্ত্রি স্লিম

প্রশংসাসূচক একটি অক্ষরও নেই। চীনের সংবাদপত্রগুলির কোনটাতেই নেহরুর মৃত্যু সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় নি—ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট করে ছাপা হয়েছে।

আর গা জ্বালা করেছে পর্তুগালের। পর্তুগালের দুটি পত্রিকা 'ডিয়ারিও ডামনহা' ও 'লিসবন আ ভোজ' নেহরুকে 'ভণ্ড' ও "গোয়া আগ্রাসনের প্রধান সংগঠক" বলে বর্ণনা করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও কোন শোকবাণীর খবর পাওয়া যায় নি।

এদের নিন্দাবাদ নেহরুর মহত্বকে ম্লান না করে, আরও উজ্জ্বলই করেছে। বিশ্ব সভ্যসমাজ থেকে এরা আজ বাদ পড়েছে। সমগ্র জগৎ আজ নেহরুর পাশে।

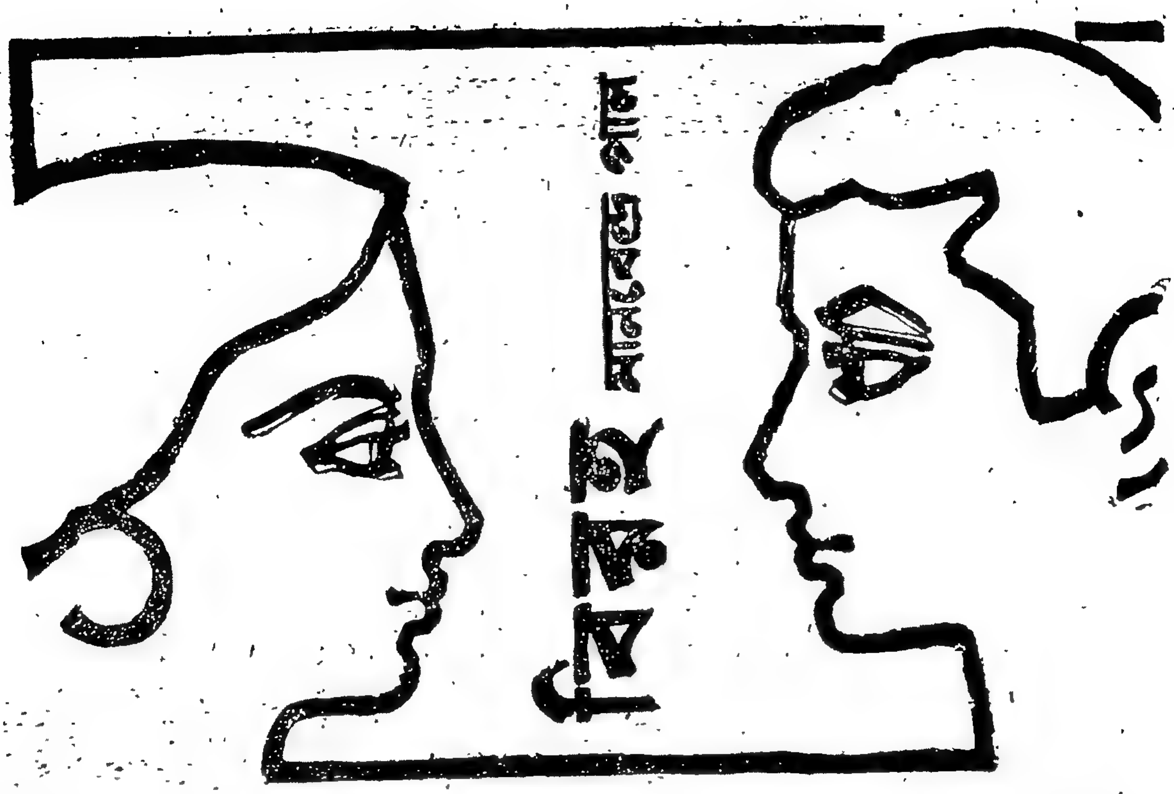

বিকেলে ক্লান্ত শরীরে ভারতী সেলাইয়ের স্কুল থেকে কোয়ার্টারে ফিরল। টুটুন ঠিকই রোজকার মতো জানলায় বসে আছে। মাকে দেখেই হাসতে হাসতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। কোলে নিতে হবে। ভারতী কোলে নিল। একটু আদর করল। জিগ্যেস করল, দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলে তো ?

টুটুন মাথা দুলিয়ে বললে—হুঁ-উ-উ।

ছেলেকে কোলে নিয়েই ভারতী ঘরের ভিতরে ঢুকল। ওদিকে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। উনুনে আঁচ পড়েছে। শাশুড়ি তা হলে রান্নাঘরেই আছেন। অন্য দিনও এই সময় তিনি রান্নাঘরে থাকেন। ভারতী সোজা নিজের ঘরেই ঢোকে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে যায়। শাশুড়ি ততক্ষণে বৌমার জন্যে চা-জলখাবার তৈরি করে রাখেন। কিন্তু ভারতী আজ আর নিজের ঘরে প্রথমে না ঢুকে রান্নাঘরের দিকেই এগিয়ে গেল। দৃঢ় বিশ্বাস আজ একখানা চিঠি আসবেই পাটনা থেকে। কিন্তু এমন আশা তো আজ সপ্তাহকাল ধরে চলেছে। অথচ—

রান্নাঘরের কাছাকাছি গিয়ে কী মনে হল, ভারতী ফিরে এল। শাশুড়িকে জিগ্যেস করতে কেমন যেন ভয় হল। যদি বলেন, না, আসে নি। তার চেয়ে নিজের টেবিলটাই আগে দেখা ভালো। চিঠি এলে উনি ওখানেই রেখে দেবেন। ভারতী দ্রুতপায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

হ্যাঁ, টেবিলের ওপর একটা খাম রয়েছে বটে। তাড়াতাড়ি খামটা তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই চোখের আলো নিভে গেল। নাঃ, এ চিঠি পাটনা থেকে আসে নি।

পাটনা থেকে না আসুক, তবু তারই নামে এসেছে। খামটা খুলে ফেলল। এক নিশ্বাসে পড়ে নিল। ইণ্টারভিউ এসেছে কলকাতার একটা স্কুল থেকে। এতে তার খুব আগ্রহ নেই। স্কুলে কাজ করতে ইচ্ছে করে না। তবু কলকাতা বলেই একটা দরখাস্ত করেছিল। দরখাস্তের যে একটা উত্তর এসেছে এতেই আনন্দ। কিন্তু যে চিঠির জন্যে আজ সে প্রত্যাশা করেছিল সে চিঠি আজও এল না। ভারতী খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে রেখে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালো।

তোমার একটা চিঠি আছে বৌমা। শাশুড়ি ময়দা মাখতে মাখতে বললেন।

পেয়েছি। বলেই ভারতী চলে যাচ্ছিল, শাশুড়ি বললেন, ওটা বোধহয় পাটনা থেকে আসে নি ?

নাঃ, কলকাতা থেকে একটা ইণ্টারভিউ এসেছে।

শাশুড়ি আর বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। মাথা নিচু করে ময়দা মাখতে লাগলেন।

টুটুন এই সময় ভারতীকে জড়িয়ে ধরে বললে, বাবা কবে আসবে মা ?

ভারতী অন্যমনস্কভাবে শুধু বললে, আসবে।

রাত্রে ঘনঘোর করে বৃষ্টি নামল। ঘুম আসে নি ভারতীর। উঠে মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করে দিল। ঘর অন্ধকার। শুধু ওদিকের জানলার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলো মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে ঝলসে উঠছিল।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে আছে। খুব আশা করেছিল চিঠি আজ আসবেই। এ তো শুধু আশা নয়—আশা তো মানুষ প্রতিমুহূর্তেই করে। কিন্তু এক এক সময় মানুষ এক-একটা বিষয়ে এমন সুনিশ্চিত ধারণা করে বসে যার ব্যতিক্রম ঘটলে যেন নিজের ওপরই

বিশ্বাস করে যায়। ভারতীর আজ তেমনি স্থির বিশ্বাস ছিল, চিঠি আসবেই। কিন্তু চিঠি এল না।

না, আর কোনো ভাবনা নয়, শুধু এই যে তার অনুমানের ব্যর্থতা ঘটল এইটে-তেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। অবশ্য এ কথা সে ভালোভাবেই জানে, নতুন জায়গায় নতুন কর্মক্ষেত্রে কত অসুবিধার মধ্যে দিয়েই না আজ তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। হয়তো মাথা গোঁজবার মতো যে জায়গাটুকু অন্যের অনুগ্রহে পেয়েছিল, কে জানে এই পনেরো দিনে সেটুকু আশ্রয় আছে কি না। হয়তো নিশ্চিন্ত হয়ে দুবেলা দুমুঠো খাবার সুবিধেও হচ্ছে না। কিম্বা হয়তো এখানে-ওখানে আপিসের কাজে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। এসব নিয়ে কোনো দিনই সে ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখ করে স্ত্রীর করুণা আকর্ষণ করে চিঠি লিখবে না —চিঠি লেখাতেই তার আলস্য। এ সবই ভারতী জানে। কিন্তু তবু আর একটা দিকও তো আছে। সে কথা ভুলে থাকে কী করে?

এই রাত্রে ভারতীর মনে পড়ল তপতী-বৌদিকে। ধবধবে ফর্সা রঙ, যৌবনদীপ্ত দেহ, কপালে কুমকুমের ফোঁটা, দু-চোখে ঝকঝকে দৃষ্টি।

তখন এরা এসেছে নবদ্বীপে। শাশুড়ি থাকতেন দেশে। নতুন জীবন, নতুন উৎসাহ। কলকাতাতে যখন সেলাইয়ের স্কুলে কাজ শিখছিল তখনই দুজনের আলাপ। একই সঙ্গে দুজনে দুখানা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোল। ফার্স্ট ক্লাস ট্রামের সামনের সীটে পাশাপাশি দুজনে বসে একেবারেই পাকাপাকি কথা হয়ে গেল।

ব্যোমকেশ বললে, তাহলে রাজি?

ভারতী সলজ্জ হাসি হেসে তৎক্ষণাৎ মাথা দোলালো।

কিন্তু জীবিকা?

ভারতী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আজ থেকে তুমি আমায় যা করতে নির্দেশ দেবে, তাই করব। একটা স্কুলে কোথাও দরখাস্ত করে দিই? সেলাইয়ের টিচারের চাহিদা আছে, মাইনেও খারাপ নয়।

ব্যোমকেশ প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, না, চাকরি না।

ভারতী বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল, সে চাকরি করে ব্যোমকেশ বুঝি তা চায় না। তাড়াতাড়ি বললে, বেশ আমি না হয় চাকরি নাই করলাম, তুমি একাই একটা জুটিয়ে নাও।

ব্যোমকেশ হেসে বললে, না, চাকরি আমরা কেউই করব না। দাসত্ব নয়। আমি চাই একটা স্কুল গড়ে তুলতে—সেলাইয়ের স্কুল। যেখানে দুটি মাত্র টিচার থাকবে, তুমি আর আমি।

কিন্তু—

না না এর মধ্যে 'কিন্তু' নেই ভারতী। সেলাইয়ের একটা স্কুল করব এ আমার অনেক দিনের সাধ। বলতে বলতে ব্যোমকেশের দুই চোখ ঝকঝক করে উঠল।

কিন্তু একটা স্কুল করব বললেই স্কুল করা হয়ে ওঠে না—বিশেষত এই কলকাতার মতো জায়গায়। দুজনেই নিঃসম্বল। পুঁজির মধ্যে শুধু দুখানা সার্টিফিকেট আর অনন্ত দুরাশা। অথচ একটা-কিছু কাজ এখনি চাই-ই। নইলে বিয়ের পর্ব মেটে না। অগত্যা ব্যোমকেশকে সাময়িকভাবে কাজ খুঁজতে হল।

ভালো কাজই পেয়েছিল—চৌরঙ্গীর একটা নামকরা টেলারিং শপে। ব্যোমকেশের কাটিং দেখে দোকানের মালিক মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ব্যোমকেশ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারল না। মাত্র কয়েক বছর কাজ করার পর হঠাৎই ছেড়ে দিল। কারও নিষেধই শুনল না। বললে, দাসত্ব করতে করতে অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে, এর পর আর কোনোদিন স্বাধীন কাজের সাহস পাব না।

তখন টুটুন হয়েছে, খরচ বেড়েছে। ঠিক এই সময়েতেই চাকরিটা ছেড়ে দিল। ভারতী একটু ইতস্তত করে বলল, তাহলে এখন কী করবে?

ব্যোমকেশ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, স্কুল করব। স্কুল আমার করতেই হবে। তার নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে—ভারতী টেলারিং স্কুল।

ভারতীর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু—

ভারতী কি বলতে যাচ্ছিল, ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বললে, না 'কিন্তু' নয়। তোমার ঐ 'কিন্তু' 'কিন্তুটা' ছাড়ো। আমার এক পরিচিত লোক নবদ্বীপেই থাকে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করে ফেলেছি আমরা নবদ্বীপেই যাব। বাড়িও ঠিক হয়ে গেছে। অবশ্য পাড়াটা একটু শহরছাড়া। কিন্তু বেশ ভালো বাড়ি। সেখানে থাকা এবং স্কুল দুইই চলবে।

এই নবদ্বীপে এসেই তপতী-বৌদির সঙ্গে পরিচয়। যে বাড়িটায় তারা ভাড়া এসেছিল সেটা তপতী-বৌদিদেরই।

একেবারে গায়ে গায়ে বাড়ি। তপতী-বৌদিদের বাড়িটা দোতলা, আর এটা একতলা। নিজেদের বাসের বাড়িটি বেশ মাজা-ঘষা। জানলায় জানলায় সুন্দর পর্দা, দেওয়ালের গা বেয়ে লতাপাতার বাহার। কিন্তু ভাড়ার জন্যে যে বাড়িখানি তা দেখলে অতিবড় সন্ন্যাসীরও চোখে জল আসে। ভাঙা স্যাঁৎসেঁতে পুরনো বাড়ি। তিনখানি ঘর। ছোট ছোট জানলা। যত-না আলো-বাতাস আসে, তার চেয়ে বেশি ঢোকে মশা। সামনে একটু উঠোন আছে, তাও দীর্ঘদিনের অবহেলায় ঘাসে ভরে গিয়েছে।

এই বাড়িতেই মহানন্দে ব্যোমকেশ সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হল। বাড়ি দেখে ভারতীর চক্ষুস্থির, কিন্তু ব্যোমকেশ তখনই বসে গেল প্ল্যান করতে।

—হ্যাঁ, দেখো, এই দুখানা ঘরই ক্লাসের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।

একটা ঘরে এমব্রয়ডারি শেখানো হবে—শেখাবে তুমি, আর একটা ঘরে শেখানো হবে কাটিং—শেখাবো আমি। হ্যাঁ, একটা বড়ো দেখে সাইনবোর্ড করাতে হবে। কাল থেকেই লেগে পড়ছি।

এই মানুষটি ভারতীর জীবনে পরম বিস্ময়। শক্ত-কঠিন চেহারা, চওড়া চোয়াল, দু-চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। কোনো সংকোচ নেই, কুণ্ঠা নেই, দ্বিধা নেই। একদিকে যেমন চটপটে, হাসিখুশি, দুঃসাহসী তেমনি আর একদিকে দুর্দান্ত জেদি, অবুঝ, বেহিসাবী। নিজে যেটি ভালো মনে করবে আর কারও পরামর্শ নেবে না। তার ভুল-বোঝা তাকে যখন নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে তখনও সে নিজের জিদ ছাড়বে না। কিন্তু সব ছাপিয়ে যে পরিচয়টা ভারতীকে মুগ্ধ করেছে সে তার ভালোবাসা। আশ্চর্য—আশ্চর্য তার ভালোবাসার আবেগ।

এখানে আসার বেশ কিছুদিন পর তপতী-বৌদিই একদিন প্রথম কথা বললেন।—তোমরা নাকি সেলাইয়ের ইস্কুল খুলেছ?

এটা ঠিকই যে, বাতায়নবর্তিনী দ্বিতলাসীনা ঐ ভদ্রমহিলা ঐশ্বর্যে, আভিজাত্যে এমন কি রূপেও ভারতীর চেয়ে শ্রেয়তর, কিন্তু বয়েসে? বোধ হয় সেখানে দুজনেই সমান। তবু যে প্রথম আলাপেই কী করে একজন আর একজনকে নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে 'তুমি' সম্বোধন করতে পারে, ভারতী তা ভেবে পায় নি। প্রথমে ভারতীর মনে হয়েছিল বুঝি বা এ সম্বোধন নিতান্তই সখিত্বের। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভুল ভাঙল। তপতী বললে, ইস্কুল তো জানি লেখাপড়ারই হয়, আজকাল কলকাতায় গানের ইস্কুলও নাকি খুলেছে দু-একটা। কিন্তু সেলাইয়ের আবার ইস্কুল এ তো শুনি নি কখনো।

ভারতী বিনীতভাবে বললে, একদিন আসুন না। তাহলে তো স্বচক্ষে দেখতেই পাবেন। বলে একটু হাসল। কিন্তু সে হাসিতে ভদ্রমহিলার মুখে হাসির চিহ্ন ফুটল না। ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে বললেন, না বাপু, অত সময় কোথা।

ভারতী বললে, কেন সময়ের আবার আপনার অভাব কী? ছেলেপুলে নেই—কেবল একটি মানুষ ঐ দাদাটি। তা ছাড়া সংসারের কোনো কাজই করতে হয় না। ঝি রয়েছে, বাঁধুনি রয়েছে।

তপতী-বৌদি বললেন, তা ঠিকই। তবে মুশকিল, যেখানে সেখানে যাওয়া উনি মোটেই পছন্দ করেন না।

যেখানে সেখানে! ক্রোধে অপমানে ভারতীর মুখটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, যেখানে-সেখানে বলছেন কেন? এতো আপনাদেরই বাড়ি, আর যে মেয়েরা এখানে আসে তারাও আপনাদেরই পাড়ার।

শুধু পাড়ার! ওদের কাকে না চিনি। সবার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর আমি রাখি এই ঘরে বসে। যত সব—

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সরে গেলেন। পিছন দিক থেকে ব্যোমকেশ বাজার করে ঢুকল। একবার ওপরের জানলার দিকে তাকিয়ে বললে, খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছ তো?

ভারতী গম্ভীরভাবে বললে, হুঁ। বলেই থলিটা স্বামীর হাত থেকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। টুটুন কোথায় ছিল, বাপের সাড়া পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল।

* *

ঘুমের ঘোরে টুটুন জড়িয়ে ধরছে ভারতীকে। ভয় পেয়েছে। ঘা মেঘ ডাকার শব্দ। ভারতী টুটুনকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শুল।

আজকের রাতটা বড় অদ্ভুত। চোখে এতটুকু ঘুম নেই—দুশ্চিন্তাও নেই, শুধু মনে পড়া। মনে পড়ছে কত সুখের—কত দুঃখের কথা। কত ভয়—কত সংশয়; তবু শেষ পর্যন্ত স্কুল একটা দাঁড় তো করিয়েছিল মানুষটা। দশ-বারোটি মেয়ে আসছিল। কিন্তু দশ-বারোটি মেয়ে নিয়ে তো আর স্কুল করা যায় না। কতই-বা আয় হবে। প্রথমে ঠিক করেছিল দশ টাকা করে মাইনে নেবে। কিন্তু ভারতীই বাধা দিয়েছিল। মাসে দশ টাকা খরচ করে কতজনই বা শিখতে আসবে। এমনিতেই কেউ আসতে চায় না। তখন ঠিক হল, পাঁচ টাকা করে মাইনে। এটা তবু চলে। কিন্তু মাত্র ষাট টাকায় কী হবে? বাড়িভাড়াই তো তিরিশ টাকা। সুতরাং আরও ছাত্রী চাই। এবার ভারতী আর বসে থাকতে পারল না। নিজেই বেরিয়ে পড়ল। বড় মধুর ভঙ্গিতে বাড়ির মেয়েদের কাছে আবেদন করে—চুপ করে বসে থাকবেন না। আজকের দিনে প্রত্যেককেই স্বাবলম্বী হতে হবে। অন্তত সেলাইটা ভালো করে জেনে রাখুন, ভবিষ্যতে কোনোদিন কাজ দিতে পারে।

ভারতীর এ আবেদন সকলের কাছে—সধবা বিধবা কুমারী যে অবস্থারই হও, চলে এসো।

আরও দুটি-একটি মেয়ে এল।

আবার একদিন তপতী-বৌদির গলা পাওয়া গেল।

—এই যে খুব ব্যস্ত দেখছি।

ছুটির দিন বলে ভারতী ছাত্রী-সংগ্রহে বেরোচ্ছিল, ডাক শুনে ওপর দিকে তাকালো। হ্যাঁ, তপতী-বৌদিই। পর্দাটা আধখানা সরিয়ে জানলা দিয়ে দেখছে। পানের রসে টস টস করছে ঠোঁট দুটো।

খুব ব্যস্ত?

মনে মনে ভারতী চটে গেল। অযাত্রা! প্রকাশ্যে একটু হেসে বললে, হ্যাঁ, একটু দরকারে বেরোচ্ছি।

তোমরা দুটিতে বেশ জাল পেতে বসেছ তো। কটা মাছি পড়ল?

ঠোঁট টিপে হেসে ভারতী বললে, তা অনেকগুলি। তারপর একটু থেমে

ইচ্ছে করেই পুরনো প্রস্তাব তুললে, একদিন আসুন না। আপনাকে দেখলে মাছিগুলো তবু বুঝবে মক্ষিরাণীও তাদের পাশে পাশে আছে।

তপতী-বৌদি আগের মতোই ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে, ওরে বাবা, ওই হাটে-বাজারে গেলে আমি হাঁপিয়ে উঠব।

এ উত্তর ভারতীর জানা ছিল। দম্ভেরও একটা সীমা থাকে। কিন্তু এই দর্পিণীর সে সীমাজ্ঞানটুকুও নেই। তাই আর এক মুহূর্তও কথা বলতে ইচ্ছে করল না। তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা চলি।

তপতী-বৌদি বলে উঠলেন, আরে দাঁড়াও না, যাবেই তো। কর্তাটি বুঝি বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছে?

ভারতী অত্যন্ত সহজভাবে বললে, না। তিনি তো বাড়িতেই রয়েছেন।

আর তুমি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছ। চোখের আড়াল হতে কষ্ট হয় না?

ভারতী মাথা নাড়ল।

ইস। মাথা নাড়লেই হল। আমি যেন কিচ্ছুটি বুঝি না। দেখছি তো রোজ কী ভাব তোমাদের। একটু ছাড়াছাড়ি নেই।

ভারতী হেসে বললে, ছাড়াছাড়ি হলেও সত্যিকার ভালোবাসা কমে না বৌদি। বরঞ্চ বাড়ে।

তপতী-বৌদি বললেন, কী জানি বাপু, আমি হলে তো একদিনও বাঁচতাম না।

আর দাদাটি?

তাঁর কথা আর বোলো না। একবারও যদি মুখে উচ্চারণ করি মায়ের কাছে যাব, তাহলেই যা ছেলে-মানুষি সুরু করবেন তা যদি দেখ। আমার তো সেই হয়েছে জ্বালা—কিছুতেই কি কোথাও নড়তে পারব।

ভারতী ব্যস্ত হয়ে বললে, কিন্তু আমায় এখনই নড়তে হবে বৌদি। বলেই একটু হেসে উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল।

স্কুল ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভাঙন ধরল। প্রথমে দুটি বিধবা মেয়ে আসা বন্ধ করল। তার পর দুটি কুমারী মেয়ে। তারপর আর দুটি।

চঞ্চল হয়ে উঠল ব্যোমকেশ। কী ব্যাপার। ভারতী মাথা নাড়ে। সেও বুঝতে পারছে না। যে ক'জন তখনো আসছিল তাদেরও যেন সেলাই শেখায় মন নেই। কেবল চুপি চুপি কথা। এদের দুজনকে দেখলেই আলোচনা থেমে যায়। তখন ভারতীকে আবার বেরোতে হল। সব মান-অভিমান ভুলে ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি যেতে লাগল। জানতে চাইল, কেন তারা স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে। পাঁচটাকা মাইনে কি খুব বেশি?

সন্তোষজনক উত্তর তো পেলই না, বরঞ্চ এমন ব্যবহার পেতে লাগল যাতে আর এগোতে সাহস হল না। তা বলে নিতান্ত ব্যর্থ হয়েই ফেরে নি। এক বাড়ি থেকে একখানা চিঠি সংগ্রহ করে এনেছিল।

ব্যোমকেশ বললে, কী হল, কিছু জানতে পারলে?

ভারতী গম্ভীরভাবে বললে, হ্যাঁ। এই বলে একটা চিঠি ব্যোমকেশের হাতে দিল।

ছোট্ট বেনামী একটা চিঠি। মেয়ের হাতে লেখা। তাতে বলা হয়েছে, ভারতী টেলারিং-এর শিক্ষক এবং শিক্ষিকা দুজনেই অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে এখানে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেলাইয়ের স্কুল করার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। এ বিষয়ে যদি কেউ প্রমাণ চান তাঁকে দেখাবার মতো প্রমাণের অভাব হবে না। ইতি।

নিবেদিকা

ভারতী টেলারিং-এর জনৈক শিক্ষার্থিনী।

ব্যোমকেশ চমকে উঠলো—শিক্ষার্থিনী।

ভারতী বললে, না। শিক্ষার্থিনী নয়। এ চিঠি কে লিখেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। শুধু একজনের বাড়ি নয়—প্রতি জনের বাড়ি। এক ভাষা—এক বক্তব্য—এক হাতের লেখা। এই বলে একবার দোতলার জানলার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে তাকালো।

ভারতী কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ব্যোমকেশের দুটি হাত চেপে ধরে স্খলিতকণ্ঠে বললে, কিন্তু আর নয়, দোহাই একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখো, এ স্কুল আর চলবে না।

ব্যোমকেশ উত্তর দিতে পারে নি। মুখটা অস্বাভাবিক কঠোর এবং গম্ভীর হয়ে উঠল। সার্টটা কোনো রকমে গলিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বেরিয়ে গেল।

স্কুল উঠিয়ে দিতে হল। উঠিয়ে না দিলে আপনিই ভেঙে পড়ত। চরিত্রের ওপর সন্দেহ। শুধু সন্দেহই নয়, প্রমাণও না কি আছে। প্রমাণ থাক বা না থাক, প্রমাণ আছে যখন বলা হয়েছে তখন তাই যথেষ্ট। হোক না বেনামী চিঠি, তবু তো সেও একজন ভদ্রঘরের শিক্ষার্থিনী। যদি তার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ না-ই থাকবে তাহলে এভাবে এত পরিশ্রম করে চিঠি লেখার কি বা কারণ হতে পারে?

স্কুল উঠে গেল। আবার চলল দরখাস্তের পালা। চাকরিও জুটল। হ্যাঁ, দুজনেরই। তবে দুজনের দু-জায়গায়। ব্যোমকেশকে যেতে হল পাটনায়, আর ভারতীকে আসতে হল সীতাহাটিতে বুক ডেভালেপমেণ্টের আণ্ডারে সেলাইয়ের শিক্ষিকা হয়ে। কোথায় পাটনা আর কোথায় কাটোয়া সাবডিভিসনের অন্তর্গত একটি গ্রাম সীতাহাটি।

নবদ্বীপের আর একটি দিনের কথা মনে পড়ে ভারতীর। চলে আসবার দিন। জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছে। ব্যোমকেশ দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা দেবার জন্যে বাড়িওলার কাছে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে চাবিটা ভারতীর হাতে দিয়ে বললে, কর্তা বোধ হয় বাড়ি নেই, গিন্নিকেই দিয়ে এসো।

ভারতী চাবি নিয়ে ওপরে উঠে গেল। নীচে এক বুড়ি ঝি ছাড়া

আর কারও দেখা মিলল না। ওপরে এসে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াতেই গৃহকর্তার ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কী পেয়েছ কী? বাড়িখানাকে একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে তুলবে না কি! যত রাজ্যের বেড়াল—পাখি—খরগোশ। সব দূর করব বলে দিচ্ছি—সেই সঙ্গে তোমাকেও! আমাকে চেন না তুমি।

তপতী-বৌদির কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর শোনা গেল না। কেবল মনে হল যেন, তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

চাবিটা চুপি চুপি দোরগোড়াতে রেখেই ভারতী পালিয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ, এই সেই সীতাহাটি। কোথায় পাটনা আর কোথায় সীতাহাটি।

কিন্তু এ বিচ্ছেদের জন্যে ভারতী ভাবে না। আজ প্রায় চার মাস হল দেখা নেই। বিবাহিত জীবনের পর দীর্ঘকাল যারা কোনোদিন বিচ্ছেদ কাকে বলে জানতে পারে নি, আজ হঠাৎ তাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো কোন দুর্বাসার অভিশাপ? কিন্তু ভারতী তাতে বিচলিত নয়। আর তো কিছু সে আশা করে না—শুধু একখানি চিঠি। প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে দু'দিন নয়—পনেরো দিন অন্তর একখানা দাও। শুধু একটু কুশলসংবাদ। আর যদি ইচ্ছে হয়, খেয়াল থাকে, সময় পাও, লিখো আর এক ছত্র—'কেমন আছ'। তা হ'লেই হল। তবু যে মনকে বোঝানো দায়, ছাড়াছাড়ি হলেও সত্যিকার ভালোবাসা মরে না। আজও তপতী-বৌদিকে তার ভয় নেই। তার ওপরে এখনো তাদেরই জিত।

চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে কখন। উঠে বসল ভারতী। ভোর হয়েছে।

•

এক সপ্তাহ পর।

বেলা তখন পাঁচটা। কলকাতা থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে ভারতী ফিরছিল। ব্যাণ্ডেল জংশনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। এখানে প্রায় দশ মিনিট স্টপেজ। ছেলেটার জন্যে কিছু কিনবে মনে করে ভারতী প্লাটফর্মে নামল। কেনা শেষ হয়ে গেল, ফিরে আসছে, ওদিকের প্লাটফর্মে ডাউন তুফান এক্সপ্রেস এসে দাঁড়ালো। দূরের গাড়ি দেখলেই মনটা কেমন ছটফট ক'রে ওঠে। ভারতীও দারুণ কৌতূহলে গাড়িগুলো দেখছিল—হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে কে যেন তারই নাম ধরে ডেকে উঠল। চমকে উঠল ভারতী। একটা কম্পার্টমেণ্টের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যোমকেশ রুমাল নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দ্রুত পায়ে ভারতী এগিয়ে গেল লাইনের ধারে। দু' চোখে বিস্ময়—ব্যাকুলতা—আনন্দ। কিন্তু কী কথা বলবে? ঐ তো ডাউন ট্রেনের সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। ব্যোমকেশ হাসছে।---কিন্তু কী রোগা হয়ে গিয়েছে এই ক' মাসে। নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ করেছিল---জানায় নি তো কিছু।

—কোথায় গিয়েছিলে? ব্যোমকেশ ওপার থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

কিন্তু ভারতী চেঁচাতে পারল না। শুধু হাত দিয়ে কলকাতার দিকটা দেখিয়ে দিল।

—ভালো আছ? আবার প্রশ্ন।

ভারতী মাথা দোলালো। কিন্তু, ঐ একই প্রশ্ন এখান থেকে চেঁচিয়ে আর একজনকে করতে পারল না।

—টুটুন আমার কথা বলে?

ভারতীর দু'চোখে জল টলটল করে উঠল। অতি কষ্টে একবার ও মাথা নেড়ে সায় দিল।

এমনি সময় কাটোয়ার ট্রেনের ঘণ্টা বাজল। ব্যোমকেশ চেঁচিয়ে বললে, উঠে পড়ো—উঠে পড়ো।

ভারতী ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে গাড়িতে এসে বসল। একজন এক্স-গুলো প্রশ্ন করল, আর সে একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারল না।

তুফান ছেড়ে দিল। ভারতী খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। ঐ যে রুমাল নাড়ছে। তার কাছেও রুমাল আছে, কিন্তু কিছুতেই অমন করে রুমাল নাড়তে পারল না। তার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছিল, যদি দেখাই হল তা হলে নেমে পরের ট্রেনে গেলেই হত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, না, হয়তো নামবার উপায় ছিল না। চাকরি।

পাশের প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ গা, ও লোকটা তোমার কে হয়?

ভারতী নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

বৃদ্ধা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তবে?

ভারতী শান্ত স্বরে বললে, চেনা।

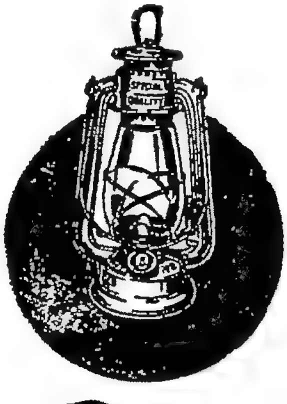

কিষান
লন্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৭৭,৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৫৮০

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী চিত্র

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

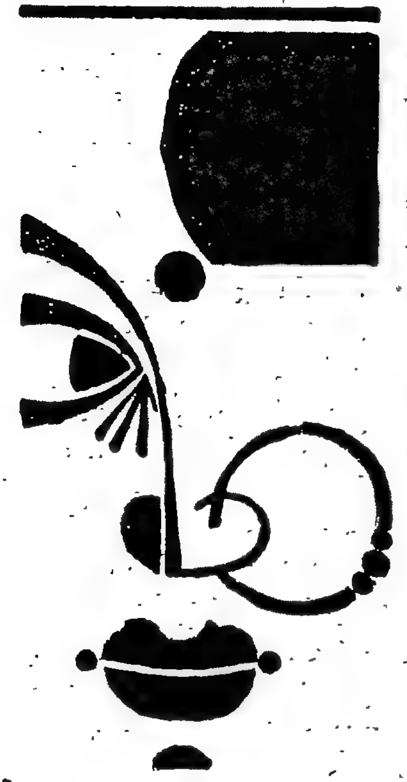

দুরন্ত দেহলী

॥ ষোল ॥

শনিবার আজকাল আবার পুরোদিন অফিস। দিল্লী শহরে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন এই প্রথম। জন্ম-জয়ন্তী আগেও হয়েছে বারকয়েক। মৃত্যুবার্ষিকী কখনও হয় নি। 'ভূমি নাই' সঙ্ঘ বড় বড় পোস্টারে ঘোষণা জানিয়েছে।

সভা আরম্ভের দেরী নেই। গজাননের গাড়িখানা দূর থেকে দেখেই মিটার, ভোস দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বক্তৃতা দেবার জন্ত যারা চাঁদা দিয়েছিলেন, তাঁদের চাঁদাও ফেরত দেওয়াতে তাঁদেরও কেউ সভায় আসেন নি।

মৃকার্জিয়া প্র্যাকটিক্যাল লোক। সে ভোস, মিটারের মতন মাথায় হাত দিয়ে বসার লোক নয়। সে তাড়াতাড়ি একটা প্ল্যান খাড়া করল। সাইকেল নিয়ে জনা পাঁচ-সাত উপস্থিত কর্মিটী মেম্বারদের রাস্তায় পাচার করে দিল।

তটিনী, তমাল, ছকি, বুকি এরা চারজন তার কথা মতন ছুটলো চারদিকে। তটিনী গেল বেঙ্গল টি হোমে।

'টি হোমে' জনাদশেক বঙ্গসন্তান বসে বসে চায়ের কাপের ধোঁয়ায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আঁকছিল। তারা বেশ মজলিস গুলজার করেই বসেছিল। তটিনী গিয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে আপনারা নিশ্চয়ই বাঙালী। এতগুলো বঙ্গ যুবক এত কাছে বেঁচে থাকতে বাংলা সংস্কৃতির এ অপমান কি সহ্য করা চলে? বলুন।'

সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠলো, 'বাংলা সংস্কৃতির অপমান? মানে? কার এত সাহস? বললেই হ'ল? কোথায় চলুন দেখে নি, বলে একটা ছেলে জামার আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ক্ষীণকণ্ঠে অপরজন জিজ্ঞাসা করল: 'কার অপমান বললেন—বাংলা সংস্কৃতির? সংস্কৃতির কোন ডিপার্টমেন্টের মানে নাচের? না গানের? সাহিত্যের? অপমানটা কোন শ্রেণীর, ফিসিকাল? না মরাল? না সাইকলজিকাল, এট অল অপমান কি?'

—'অপমান নয়তো কি? শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকীর সভায় একটা লোকও উপস্থিত নেই।'

তিন-চারটি ছোকরা বলে উঠলো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা খবর পেয়েছি। বক্তৃতাগুলো শেষ হোক। জলযোগ আর নৃত্য-সঙ্গীতানুষ্ঠানে আমরা যোগদান করব। সেটা আমরা সকালেই ভেবে রেখেছিলাম। কার্ডের দরকার নেই তো দাদা?'

তটিনী বলল, 'কার্ড? শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকীর সভায় সবাই ঢুকবে। কে কাকে আটকাবে মশাই?'

একটি যুবক বলল, 'না, ঐ জলযোগ নাচ গান আছে কি না, তাই বলছিলাম; আজকালকার সভা-সমিতি থেকে ঐ জলযোগের পাটটা একেবারে উঠে গেছে কি না তাই বলছিলুম।'

জনাআষ্টেক যুবককে সাহিত্য-সভায় পাঠিয়ে তটিনী ছুটলো বঙ্গীয় ব্রতী সঙ্ঘের দিকে। ব্রতী সঙ্ঘ দিল্লীর বাঙালী যুবকদের ব্যায়ামাগার। সেখানে তখন কেউ ডনবৈঠক, কেউ প্যারালাল বার, কেউ কুস্তি, কেউ বক্সিং প্র্যাকটিস করছিল। এরা নিত্য-নিয়মিতভাবেই এ রকম করে থাকে। এদের মাতব্বর অমল সেন। কৃতী ছাত্র। বক্সিংয়েও নাম করেছে।

তটিনী তাকে গিয়ে বলল, 'আজ্ঞে আপনাদের এই ব্যায়াম আর কতক্ষণ চলবে?'

অমল বলল, 'কেন বলুন তো?'

—'জানেন বোধ হয় আমরা 'ভূমি নাই' সঙ্ঘের তরফ থেকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। মিটিং-এ কোরাম হচ্ছে না। বলছিলাম, যদি জনদশেক মেম্বার কিছুক্ষণের জন্ত পাঠাতে পারতেন আমাদের সভায়। জলযোগেরও আয়োজন হয়েছে।'

অমল অবাকভাবে বলল, 'সাহিত্য-সভায় আবার কোরাম কি মশাই? বলুন ভিড় জমছে না।'

এদের ভিতর সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান যুবক কমলাকান্ত সম্প্রতি শরীরচর্চায় 'মিঃ দিল্লী' হয়েছে। 'মিঃ ইণ্ডিয়া' হবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছে। কমলাকান্ত মুগুরটা ছেড়ে দাঁড়াল। সে বলল, 'জলযোগের লোভে ছোকরা ভাগাতে এসেছেন। বলি সাহিত্য করে কটা লোক রাজত্ব কিনেছে বলতে পারেন? এই সব ছিচকাঁদুনী স্বরচিত কবিতা পাঠ আর পুরোনো ম্যাগাজিনের রচনা নকল করে এই সাহিত্য-সভা করে দেশের কোন্ উন্নতিটা হবে শুনি? এই দেখুন না আপনার নিজের শরীরটার দিকেই তাকিয়ে দেখুন। ইন্কম্যান। ছাতিখানা হবে চল্লিশ ইঞ্চি।' বলেই সে নিজের ছাতিখানা ফুলিয়ে দাঁড়ালো। তটিনী দশহাত পিছিয়ে গেল। 'ধরুন তো এই মুগুরটা। তুলতেও পারবেন না। ঐ সব সাহিত্য ছাড়ুন। ব্যায়াম অভ্যাস করুন। শরীরের যত্ন নিন। দেশটা বাঁচুক। আপনারাও বাঁচুন।'

তটিনী অমলের দিকে উদ্‌গ্রীব নয়নে তাকালো।

চুপি চুপি বলল, 'দাদা সভা যে ডুবলো ওদিকে।'

অমল সেখান থেকে জনাদশেক যুবককে ডাকলো। সে তাদের জামা-কাপড় পরে সাহিত্য-সভায় তাড়াতাড়ি চলে যাবার অনুরোধ জানাল। ল্যাঙোট, গেঞ্জীর ওপর ঝপাঝপ ধুতী পাঞ্জাবী শার্ট প্যান্ট চাপিয়ে তারা সাইকেলে করে সাহিত্য-

সভায় যোগদান করতে ছুটলো। খাবার কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রইলো।

কমলাকান্ত রাগে গর গর করতে করতে আবার মুগুর ভাঁজায় মন দিল। অমল নিজে যায় নি। সে কমলাকান্তকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আহা একটা দিন যেতেই দে না ওদের।'

সমর হন হন করে বাসের দিকে ছুটছিল। অরুণার পরীক্ষা এসে গেছে। অনেকদিনই ফাঁকিতে কাটিয়েছে। এবার হাতে যা দু-পাঁচদিন আছে ভালোভাবে পড়াশুনো না করালে পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হবার ভয় রয়েছে। বোঁ করে সাইকেলে করে তটিনী ঠিক তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। 'এই যে দাদা নমস্কার।'

সমর তটিনীকে ঠিক চিনতে না পেরে হাত তুলে প্রতি নমস্কার করে হকচকিয়ে দাঁড়ালো। নৃপেনের সাথে দু-পাঁচ বাড়ি কনে দেখতে যাবার পর থেকেই রাস্তায় চলতে তার বুকের ভিতর সর্বদাই ঢিপঢিপ করে। কে জানে বাবা কবে কে কোথায় রাস্তায় ধরে কি করে দেয়?

তটিনী বলল, 'কদ্দুর যাচ্ছেন?'

আমতা আমতা করে সমর বলল, 'এই কাছেই। মানে বাড়িতে। কেন বলুন তো?'

—'কি আর বলব? ভরসন্ধ্যে-বেলায় বাড়ি গিয়ে কি করবেন শুনি? চলুন আমার সাথে সাহিত্য-সভায়। 'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সাহিত্য-সভায়। জানেন না আজ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী।'

সমর বলল, 'শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী! সে তো মশাই কবে হয়ে গেছে। ৩১শে ভাদ্র। এখন হল অগ্রহায়ণ।'

তটিনী বলল, 'ঐ তো আমাদের দোষ মশাই। তর্ক করেই বাঙালী জাতটা গেল। আমি বলছি, যখন আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর জন্য সভা ডাকা হয়েছে, তখন আজই তাঁর মৃত্যুদিবস। সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। চলুন চলুন আমার সাথে চলুন।'

বলে এক হাতে সাইকেল অন্য হাতে সমরকে কয়েদীর মতন ধরে সাহিত্য-সভার দিকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

ততক্ষণে হলঘর প্রায় ভরে এসেছে। না ভরে উপায় নেই। সাইকেলে যে সব ছোকরার দল শ্রোতা ধরতে ছুটেছিল দিল্লীর শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবরে তারা তখন হাত পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসে পড়েছে।

প্রধান অতিথি গজানন যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন হলঘরে একেবারে তিল রাখার স্থানটুকু নেই। বক্তৃতা প্রবন্ধের বালাই নেই। জলযোগ। তারপরেই নৃত্য-সঙ্গীতানুষ্ঠান।

গজাননকে সবাই এসে মালার পর মালা পরিয়ে গেল। মৃত্যুদিবসটা যেন তাঁরই! বেচারা শরৎচন্দ্রের একটা ছোট ছবি এক কোণে একটা টিপয়ের ওপর রাখা ছিল। তাড়াতাড়িতে বোধ হয় কোনো স্কুল টেক্সট বই-এর পাতা থেকে খুলে বাঁধানো হয়েছে। সামনে একটা মোমবাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল।

একটি যুবতী এসে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে গান সুরু করলেন। হতভম্ব সমর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না গানটা রবীন্দ্রসঙ্গীত না কীর্তন না আধুনিক! সঙ্গীত সম্বন্ধে সে সাধারণের চেয়ে একটু বেশিই বোঝে। আজ তার সে সাধারণ সঙ্গীত জ্ঞানটুকুতে এ পার্থক্য নিরূপণে কুলোল না।

'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সদস্যরা কলাকেন্দ্রের ছাত্র নৃপেনের মেসের মাধাইকেও ধরে এনেছিল। সে শ্রোতা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অতি কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করে বসেছিল।

যুবতীটি গান শেষ করে নিজে থেকেই আর একটা ধরলো। সভার সবাই ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'প্রোগ্রামে এঁর গান থাকবে না তো তোর গান থাকবে? জানিস মেয়েটি হ'ল 'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সভাপতির শালী। একেবারে আপন শালী। গায়িকার নাম মালিনী মিত্র।'

সমরের ইচ্ছা করছিল হলঘর থেকে দৌড়ে পালায়। কিন্তু উপায় নেই। তটিনীর দল সব গেটে দাঁড়িয়ে। সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

গজাননের কড়া হুকুম।

মালিনীর সঙ্গীতের পর শুরু হ'ল কুমকুম সেনের নৃত্য। নৃত্য সম্বন্ধে সমর দু-পাঁচখানা বই পড়েছিল। ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি, ব্রতচারী, মেকচার্মার, পাহাড়ী এর কোন পর্যায়েই কুমকুমের নৃত্যটিকে ফেলা যায় না। সে মনে করল হবে কোন আধুনিক ষ্টাইল। শাড়িটাকে মাঝে মাঝে নাড়িয়ে কুমকুম হাত দুখানা কাঁপাতে থাকে। তার চোখের চাহনিতে মনে হ'ল মেয়েটা গেল বুঝি পড়ে।

ভবানীর এ সব ভাল লাগছিল না। দূর থেকে সমরকে দেখে সে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে তার কাছে এলো—'এই যে ভাই সমর, কেমন?' বলেই অত্যন্ত আদরের সাথে সমরের কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।—'শুনছি তুমি নাকি আজকাল কি নিয়ে কোথায় হাবুডুবু খাচ্ছো? সব সত্যি নাকি? যাই করো ভায়া, শরীরটার দিকে নজর দিচ্ছ তো?' বলেই এক মোগলাই রদ্দা।

সমরের মনে হ'ল ত্রিভুবন বুঝি এক হয়ে গেল। মিনিটখানেকের জন্য চারিদিক তার কাছে অন্ধকার মনে হল।

সমর বাইরে যাবার চেষ্টা করছিল। ভবানী চোখ টিপ দিয়ে ইসারায় জানাল, দক্ষিণ হাতের ব্যাপার আছে। এই পেট-সর্বস্ব ভবানীটাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

সমর তখন ভাবছে অরুণার কথা। অরুণা নিশ্চয়ই তার ওপর মনে মনে রাগ করছে। তাকে সে দেরীতে ফেরার কি কৈফিয়ৎ দেবে? অরুণা কিছুতেই সাহিত্য-সভার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু পালাবার পথ নেই।

ওদিকে মালাপরিহিত গজানন তখন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। লিখিত ধন্যবাদ ভাষণ। তবুও গজাননের হাত-পা থর থর করে কাঁপছিল। দিল্লীর অগ্রহায়ণ মাসেও কপাল দিয়ে ঘামের গঙ্গা-যমুনা বয়ে যাচ্ছিল। মিনিটখানেকও তিনি উঠে দাঁড়ান নি। এরই ভিতর হঠাৎ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ধন্যবাদ এবং সভাপতির অভিভাষণ ছাড়াই সভা ভঙ্গ হল।

সমর ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে মুক্ত হাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার একটু ভয়ও হ'ল। অরুণাকে গিয়ে সে কি বলবে? ছেলেধরার দল তাকে যে জোর করে সাহিত্য-সভায় নিয়ে ধরে বেঁধে বসিয়ে দিয়েছিল সে কথা 'ভুলি নাই' সঙ্ঘের সদস্য ছাড়া কে বিশ্বাস করবে?

(ক্রমশঃ)

পঞ্চমী পুরাণ

লীলা মজুমদার

(ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)

॥ পাঁচ ॥

বড় বড় পুরোনো বাড়ির নিজস্ব একটা জীবন থাকে, একথা আমার অনেক সময় মনে হয়েছে। যারা এখন ঐ বাড়িতে বাস করে তাদের সঙ্গে সে জীবনটার কোনো যোগ না থাকলেও, হয়তো আগে যারা বাস করেছে তাদের সঙ্গে থাকে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে আমার নতুন করে একথাই মনে হচ্ছিল। একটা পুরোনো বাড়ির নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর বুকের ধুকপুকি শুনতে হলে বাড়িটার বর্তমান জীবনযাত্রায় ছেদ পড়া চাই, অর্থাৎ ঠিক সেই সময় বাড়িতে কেউ থাকবে না, ঘড়ি টিক-টিক করবে না, উনুন জ্বলবে না, পাখা ঘুরবে না, আলো জ্বলবে না, পোষা কোনো জন্তুজানোয়ারও থাকবে না। সেদিন ঠিক এমনি অবস্থার মধ্যেই কলেজ থেকে ফিরলাম।

একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল; পরীক্ষার প্রবেশপত্র, বিদায় সভা, নীলিমা সুলোচনা ইত্যাদির সঙ্গে শেষ একবার প্রাণ ভরে গল্প, তারপর তিনজনে মিলে মোড়ের মাথায় 'শুভ্রা কেবিনে' আইসক্রীম খাওয়া, এইসব নিয়ে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটার আগে বাড়ি পৌঁছই নি। তখন অন্ধকার হতে সুরু করেছে, তার কারণ সে বছর ছাত্র আন্দোলনের ফলে যথাসময়ে আমাদের পরীক্ষা হয় নি, মে মাসে না হয়ে পূজোর ঠিক পরেই তারিখ ঠিক হয়েছিল। এমনিতেই দিন ছোট হয়ে এসেছিল, তার ওপর আকাশে হঠাৎ অসময়ে ঘন কালো মেঘের আবির্ভাব হয়েছিল।

কেবিন থেকে বেরিয়েই নীলিমা সুলোচনা বাস পেয়ে গেল, আমি একা তাড়াতাড়ি হেঁটে বাকি পথটুকু পার হতে পার, পাশের বাড়ির খোলা-বারান্দার তলা থেকে সকালের সেই সুন্দর লোকটি টপ করে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল; কিন্তু চারদিকে লোকজন, সে আমার কি এমন অনিষ্ট করতে পারে? তা ছাড়া সাহস করে যখন তার মুখের দিকে তাকালাম কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল তাকে। ছোট একটা নমস্কার করে সে বলল—'এই সন্ধ্যেবেলা এরকম একা একা বেরুবেন না, সময়টা খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না।'

অকারণে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, জোর করে স্বাভাবিক স্বরে বললাম—'আর দু পা গেলেই তো বাড়ি, এখানে আমার এমন কি বিপদ হতে পারে?'

সে বললে—'বাড়িতে যদি কোনো লোক না থাকে, তা হলে সেখানেও খুব নিরাপদ না-ও হতে পারেন। লছমি দুপুরে খেয়েদেয়েই বেরিয়ে গেছে; পঞ্চমীদিদি গেছে আড়াইটায়; হারু, শঙ্কর, জলধর, মাসী সবাই দল বেঁধে এইমাত্র গেছে, কাহার পাড়ায় আজ সীতাহরণ যাত্রা হচ্ছে।'

অচেনা লোকের মুখে এরকম কথা শুনে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পেল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমার বুড়োদাদুর ছেলে না?'

সে বললে, 'কে বলেছে আপনাকে?'

'পঞ্চমীদিদি বলেছে, কেন তাই ন'ন আপনি?'

'আমি সত্যিই মহিম চৌধুরীর ছেলে।'

তাহলে পঞ্চমীদিদি তো ভুল বলে নি। তার বাকি কথাগুলো মন থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে বললাম—'আমাদের বাড়ির ওপর এমন দিনরাত নজর রাখার মানে কি? আপনার কি কোনো কাজকর্ম নেই?' এই বলে হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। কান্না পাচ্ছিল, বুড়োদাদু কেন এমন করলেন? চিরকাল যিনি সদাশিব তিনি আমাদের পেছনে চর লাগাবেন এ যে আমার বিশ্বাসের বাইরে। তবে কি আমাদের রক্ষা করার জন্যে ওকে পাঠিয়েছেন? চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়ে লোকটি বললে—'আমার নাম আনন্দ। বাবা কি তবে আপনাদের বাড়িতে নেই?'

তবে কি লোকটা আমার কাছ থেকে কোনো কথা বের করবার জন্যে ভণ্ডামি করছে? মনে পড়ল বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা বিষয়ে মেসোমশাই আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তবু অভদ্রতা তো আর করা যায় না, বিশেষ করে বুড়োদাদুর ছেলের সঙ্গে। ও যে বুড়োদাদুরই ছেলে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, চোখে-মুখে বড় বেশি আদল, তাই প্রথম দেখেই চেনা মনে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি যদি বুড়োদাদু নিখোঁজ হয়ে গিয়ে থাকেন?

সে চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বললাম, 'তিনি কাল রাত্রে এসেছিলেন বটে, কিন্তু ভোর না হতেই আমরা কেউ উঠবার আগেই বাক্স বিছানা নিয়ে চলে গেছেন। কেন, তিনি বাড়ি যান নি?'

কথাটা বলতেই প্রাণটা ছক করে উঠল। বুড়ো মানুষদের এক মিনিটের জন্যেও একা থাকা উচিত নয়। আনন্দের ওপর একটু রাগও হল, 'কেন বুড়োমানুষকে এমন একা একা ঘুরে বেড়াতে দেন? তাঁর দেখাশুনো করাটা কি আপনার কর্তব্য নয়? যান, দেখুন কোথায় গেলেন তিনি। আমাকে এরকম ভাবে পথে দাঁড় করাবেন না। আর দয়া করে আমার সঙ্গেও আসবেন না।'

উত্তেজনার চোটে কথাগুলো কি রকম অস্বাভাবিক রকম রূঢ়ভাবে বলে ফেললাম। তার মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে উঠল, তার পরেই ছাইয়ের মতো দেখাতে লাগল। আমি আর অপেক্ষা না করে সোজা বাড়ি চলে গেলাম। খিড়কিতে তালা দেওয়া হত, তার দুটো চাবি, একটা আমার কাছে আর একটা পঞ্চমীদিদির কাছে থাকত। রাতে চাকর-বাকররা বাইরে যাওয়া আসা করতে চাইলে হয় আমাদের বলতে হত, নয়তো বড় ফটকে দরওয়ানের কাছে যেতে হত। চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতর থেকে খিল দিলাম।

রান্নাঘরের পাশে আরেকটি ঢুকবার পথ; সে দরজাও বন্ধ, বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তার চাবিও আমার একটি আছে। খুলে ঢুকলাম, অমনি যেন প্রকাণ্ড খালি বাড়িটা আতঙ্কে দুহাত শূন্যে তুলে হাঁ-হাঁ করে আমার দিকে ছুটে এল। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম, একসঙ্গে দুটো আলো জ্বলে একতলার এদিকটার অন্ধকার ঘুচিয়ে দিল।

বাড়িতে যে সত্যিই কেউ নেই সে আর বলে দিতে হল না। কি যেন একটা অজানা নিদারুণ দুর্ভাবনায় মনটা ভারি হয়ে উঠল। সারা পথ আলো জ্বালতে জ্বালতে দোতলায় নিজেদের ঘরে পৌঁছলাম। পড়ার টেবিলের টানার মধ্যে যত্ন করে পরীক্ষার প্রবেশপত্রটা রাখলাম। এই আমার নিষ্কৃতির চাবিকাঠি; এ বাড়িতে আর আমার একদিনও থাকতে ইচ্ছা করে না; এতকাল কি করে কাটালাম তাই ভাবি।

হাতমুখ ধুয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু সমস্ত জনশূন্য বাড়িখানি থেকে হাজার রকম খুটখাট খসখস শব্দ কানে আসতে লাগল; আরো বেশি কিছুর জন্যে কান পেতে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আর সইতে না পেরে ভাবলাম একবার দরওয়ানকে জিজ্ঞেস করে দেখি মেসোমশাই আজ বাইরে খাবেন কিনা ? রোজ বেরুবার সময় তাকে বলে যান কটার সময় ফিরবেন। নিশ্চয় বাড়িতে খাবেন না, তাই রাঁধাবাড়ার কোনো বালাই নেই ; লছমি জানে পঞ্চমীদিদি আর আমি এ বাড়ির ফালতু বাসিন্দা, খিদে পেলে নিজেরাই যা হয় করে নেব।

সব আলো জ্বালা রইল, দরজা খোলা রইল, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিটুকু পার হয়ে দেখি দরওয়ানের ঘরেও তালা ঝুলছে, বড় ফটক বাইরে থেকে বন্ধ। তবে কি মেসোমশাই রাতেও ফিরবেন না ? হঠাৎ মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গেল, আকাশের কালো মেঘ ততক্ষণে আরো ঘন হয়ে এসেছে, চারদিকটা থমথম করছে। এক দৌড়ে আবার সদর দরজা দিয়ে হলঘরে ফিরে এলাম। নিজের বুকটার ধড়াস ধড়াস শুনতে পাচ্ছিলাম। এমন সময় মনে হল তিনতলা থেকে ভারি পায়ের শব্দ সাবধানে নীচে নেমে আসছে। বার দুই চিৎকার করে ডাকলাম—'কে ? বুড়োদাদু আপনি নাকি ?' কোনো উত্তর নেই, শব্দটা আরো নীচে নেমে আসতে লাগল।

আর অপেক্ষা করলাম না, নীচের সব দরজা খোলাই ছিল, নিমেষের মধ্যে খিড়কির খিল খুলে গলিতে বেরিয়ে বাইরে থেকে তালা টিপে দিলাম। হাত-পা এত কাঁপছিল যে দেয়াল ধরে একটু অপেক্ষা করতে হল। ও ফুটপাথ থেকে আনন্দ তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল—'কি ? কি হল ? কোন বিপদ হয় নি তো ?'

গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না, নীরবে মাথা নাড়লাম। আঃ, মানুষের সঙ্গ কি ভালো, বেঁচে থাকো আনন্দ। আনন্দের মুখের দিকে চেয়ে মনে বল পেলাম; ভাষা ফিরে এল; বললাম, 'কি জানি, খালি বাড়িতে কেমন যেন লাগছিল। দরওয়ানও ফটকে তালা দিয়ে চলে গেছে। তাছাড়া—' এই অবধি বলে আমি থামলাম।

আনন্দ বলল—'তা ছাড়া কি ?'

'কে যেন অন্ধকারে তিনতলা থেকে আস্তে আস্তে নামছিল। ডাকলাম, সাড়া দিল না।'

আনন্দ বলল, 'আমি যাব ? গিয়ে দেখে আসব ?'

বললাম—'না, না, তাহলে মেসোমশাই আমাকে আস্ত রাখবেন না। আপনার ওপর তাঁর ভারি রাগ।'

আনন্দর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। 'তা হলে এখন কোথায় যাবেন ?'

'ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কাছে পঞ্চমীদিদির খবর পাওয়া যেতে পারে। সেখানে তার কাজ ছিল, কে জানে হয়তো সেখানেই বসে আছে।' শেষ পর্যন্ত আনন্দকে সঙ্গে নিয়েই ডাক্তারবাবুর বাড়ি অবধি যেতে হল, দোরগোড়া থেকে তাকে বিদায় করে ভিতরে গেলাম। ভিতরে আলো জ্বলছে, হলঘরের বেঞ্চিতে রুগীরা বসে আছে, আঃ কি সুন্দর, সাধারণ, স্বাভাবিক। আমি পাশের বারান্দা দিয়ে ঘুরে অন্দরে গেলাম। আনন্দ বারবার সাবধান করে দিয়েছিল যেন রাতটা এখানে কাটাই, খালি বাড়িতে যেন না ফিরি। পঞ্চমীদিদি সঙ্গে থাকলেও না।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী কোথায় হরিনাম শুনতে গেছেন। ঝি বলল, পঞ্চমীদিদি তিনটের সময় এসে কি সব ওষুধপত্র নিয়েছিল, তারপর কে একজন বাবু একটা চিরকুট নিয়ে পঞ্চমীদিদির খোঁজে এসেছিল, চিঠিটা পড়েই সে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ওষুধপত্র, চিরকুট সব সেই ইস্তক টেবিলের ওপর পড়ে আছে। ঝি এখন বাড়ি যাচ্ছে।

কাছে গিয়ে দেখি একটা শিশিতে কার্বলিক অ্যাসিড, একটিতে সাপের কামড়ের ওষুধ। চিঠিতে তারিখ ঠিকানা কিছু নেই ; অশিক্ষিত হস্তাক্ষরে মাত্র দুটি লাইন লেখা—শ্রীচরণেষু বৌঠাকুরুণ, যেমন কথা হইয়াছিল সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। আর বিলম্ব করিলে সব পণ্ড হইবে। ইতি শ্রী বি।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার, এ কোন নতুন বিপদে পঞ্চমীদিদি পড়ল কে জানে, নাকি আর যা যা ঘটেছে সবই এই বিপদেরই প্রস্তুতি। পঞ্চমীদিদির এত দিনের আশঙ্কা কি কোনো মহা সর্বনাশে শেষ হল নাকি ?

এখন কি করি ? বুড়ো ডাক্তারবাবুর প্রায় সত্তর বছর বয়স, ঘরভরা রুগী, তাঁকে কিছু বলা যায় না। কিন্তু পঞ্চমীদিদি তার দেরাজের জামা-কাপড়ের নীচে থেকে একদিন একটা রঙচঙে সাবানের বাক্স খুলে, একটা চিঠি বের করে, আমার কাছে তার দেওরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। সে চিঠিতে দেওরের ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য তখন আমি চিঠির দিকে তাকাইও নি। কিন্তু তাহলে যে আবার আমাকে বাড়িতেই ফিরতে হয়।

(ক্রমশঃ)

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩॥০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩॥০।
মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৃত্র-সংহার কাব্য
দাম—দুই টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সুশীল রায়

অনল আয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

খুশি হল বেলনস। রামমোহন কথা বললেন তারপর ফ্যানির সঙ্গে—ফ্যানি পার্ক্‌স্‌ ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে। ফ্যানি তাঁর সংকল্প ঘোষণা করে বললেন, তিনি এদেশে এসেছেন, খুব ভালো লাগছে এই দেশটা—তিনি ভ্রমণকাহিনী লিখবেন, সেজন্যে মেটি-রিয়াল সংগ্রহ করায় এখন ব্যস্ত।

তাঁকে উৎসাহ দিয়ে ওদিকে তাকালেন রামমোহন। বলে উঠলেন, কি খবর, নীলরত্নবাবু, কেমন লাগছে নাচ-গান ? চুঁচুড়ার সব খবর ভালো তো ?

নাচ চলেছিল ঝুমঝুম শব্দে, চমকে উঠল রানী-বাই—হঠাৎ যেন বেসুরে বেজে উঠল ঘুঙুর, ঘুঙুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে না কি ঘাগরা ? নাচতে-নাচতেই সে তাকাতে লাগল ঐ দিকে ? কি নাম বললেন যেন গৃহকর্তা ? —চেনা নাম আর শোনা নাম মনে হচ্ছে যেন, চুঁচুড়ার খবর সব ভালো তো ?

দোপাট্টা দিয়ে মুখটা ঢেকে নিল রানী-বাই। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠেছে। চুঁচুড়ার নীলরত্ন বুঝি উনি ? কত দিন কত বার সে নাম শুনেছে ওঁর, কিন্তু দেখে নি কখনো। আজ তাই সে প্রাক খেযে-খেয়ে নাচছে আর তাকাচ্ছে ঐ মানুষটার মুখের দিকে। ইচ্ছে করছে, সেও জিজ্ঞাসা করে—চুঁচুড়ার খবর সব ভালো তো ?

কিন্তু ইচ্ছে করলেই সব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। মুখের একাংশ ঢাকা আছে, সেই সঙ্গে ভয়ও আছে তাকে-না চিনে ফেলে কেউ। তাই সে ওড়না দিয়ে আড়াল করে নেচে-নেচে পাক খেযে চলেছে মলমলে-ঢাকা ফরাশের উপর।

যে-ওরিয়েণ্টাল চোখ দুটির স্কেচ এঁকে নিচ্ছেন ঐ বিদেশিনী দুই মহিলা, সেই চোখ-দুটি চঞ্চল হযে উঠেছে তার। সারা হল-ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখ লক্ষ্য করছে সে। চুঁচুড়া থেকে আর কেউ আসে নি তো ?

সব নাচ এখনো দেখানো হয় নি রানী-বাইযের। ওপাশের ঘরে সেবা নাচিযে নিকি খুবই বাহবা আদায় করে নিয়েছে। তা নিক। কিন্তু পুরুষদের বাহবা কখনো ফুরিযে যায় না, এ ব্যাপারে তারা ফতুর হয় না কখনো। একটা কিছু চুটকি চঙ দেখাতে পারলেই তওফা তওফা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে এই ঘর।

ঘাগরা ছড়িয়ে পা ভাঁজ করে বসে পড়েছে রানী-বাই। নতুন করে সাজানো হচ্ছে ফরাশ। আরদালি বেয়ারা পেয়াদারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অভ্যাগতেরা উঠে গেলেন একে-একে। খানাপিনা করতে গেলেন তাঁরা। এই অবসরে এখানে নতুন করে আয়োজন হতে লাগল নতুন নৃত্যের।

পা ভাঁজ করে বসেছে রানী-বাই। মাথা নীচু করে বসে সে ভাবছে ঐ গৃহকর্তাটির কথা। বছর-পাঁচের কথা তো হলই, কাশী মিত্তিরের ঘাটে দেখেছিল সে এই মানুষটিকে। তার মাত্র বছর-খানেক আগে সে এসে উঠেছিল রামবাগানে। এ-পথে তখন সে একে-বারে নতুন, নাচে-গানে রপ্ত হয় নি তখনো, তাই সহজেই দু-চোখ সজল হয়ে উঠেছিল তার। কিন্তু এখন আর অত সহজে ভেজে না চোখের পাতা।

কাশী মিত্তিরের ঘাটে সেই মেয়েটি সেদিন খুব বুকের পাটা দেখিয়েছে, কিছুতেই রাজি হল না সে বাঁচতে। না বেঁচে ভালোই হল বুঝি তার। বেঁচে থাকলে তার বরাতে কি ঘটত কে জানে।

তার শিশুকালের কথা মনে পড়ে রানী-বাইয়ের। গরিটির শ্মশানে সে তার বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখেছিল অমনই একটা দৃশ্য। সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে আছে তার আগুনের উপর।

তার বাবা এখন কোথায় ? বেঁচে আছেন তিনি ? তাঁর কথা প্রায়ই তার মনে হয়। আর মা ?

সহজে এখন চোখের পাতা ভেজে না বটে, কিন্তু ঐ কথা ভেবে দুই চোখ সজল হয়ে উঠেছে তার। ওড়না দিয়ে শুষিয়ে নিল সেই জল। হঠাৎ সোজা

হয়ে বসল সে, বুঝি চমকেই উঠল। মুরলী আর নবীন? কত বড় হয়েছে তারা এখন? তারা আবার এসে উপস্থিত হয় নি তো এই আসরে? কেউ যেন চিনতে না পারে তাকে—কেউ না।

নতুন করে পাতা হয়েছে ফরাশ। ফরাশের উপর ঘন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফাগ। তার উপর পাৎলা মলমল দেওয়া হয়েছে বিছিয়ে। ওর উপরে দাঁড়িয়ে নাচবে এখন রানী-বাই।

খানাপিনা সমাপন করে অভ্যাগতেরা আসন নিয়েছেন আবার। এই নাচ দেখার আগ্রহ তাঁদের অপরিসীম। নেচে-নেচে পা দিয়ে ফুল ফোটাবে না কি ঐ বাইজি।

বিদেশিনী মহিলা-দুটির চোখে কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা খাতা বন্ধ করে ঝুঁকে বসে আছেন ঐ নাচ দেখার জন্যে, নর্তকীর পায়ের তুলিতে ছবি আঁকা দেখার জন্যে।

সারেঙ্গী ছড় টানল, করুণ কান্নার শব্দে বেজে উঠল তারযন্ত্রটি। তবলায় বেজে উঠল বোল।

উঠে দাঁড়াল রানী-বাই। করজোড়ে নমস্কার করল সে ঘুরে-ঘুরে সকলকে। গান আজ না, আজ সে গাইতে পারবে না। তার গলা ধরে এসেছে।

চারদিকে দৃষ্টিপাত করল সে, দেখবার চেষ্টা করল—কোথায় সেই ভদ্রলোকটি, সেই নীলরত্ন। ওঁর কথা কতবার সে শুনেছে, কতবার তাকে বলেছে সেই কানাগিন্নি। আজ ওঁকে বড় আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে রানী-বাইয়ের। তার জীবন থেকে কত দূরে চলে গিয়েছে আজ কানাগিন্নি, কোথায় গিয়েছে সে তাও কেউ জানে না।

ফরাশে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সে বলল, কি ফুল ফোটাব? ফরমাশ করুন বাবুসায়েব, বাৎলে দিন বিবিসায়েবা।

—গোলাপ, গোলাপ।—বসরাই-গোলাপ।

রব উঠল চারদিক থেকে। গোঁফ চুমরে শক্ত হয়ে বসলেন সাহেবানেরা।

পাংখাবরদার জোরে-জোরে টানতে লাগল পাখা। সারা ঘর ফুরফুর করে উঠল হাওয়ায়।

রানী-বাই কর জোড় করে বলল, মাফ করবেন। বন্ধ করতে হবে ওই পাংখা। নইলে হাওয়া লেগে উড়ে যাবে এই গোলাপ। আপনাদের একটু তকলিব হবে এতে। কিন্তু একটু কাঁটা না সহ্য করতে পারলে কি গোলাপ মেলে, বাবুসায়েব?

—তায়েফা তায়েফা তায়েফা।

বড় সুন্দর কথা বলেছে তো ওই বাইজি। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে কখনো? কষ্ট করতে রাজি আছে সকলে। তাই, তখনি বন্ধ হয়ে গেল পাখা।

ঘর গুমট। চারদিক স্তব্ধ। সকলের চোখের দৃষ্টি গিয়ে বিঁধছে বুঝি ঐ বাইজির গায়ে পঞ্চশরের মত।

নিপুণ ভঙ্গিতে আরম্ভ হল নৃত্য। সকলের চোখের দৃষ্টি বাইজির অঙ্গ ছেড়ে নেমে এল তার পায়ে। আঙুলে ভর দিয়ে সর্বাঙ্গে তরঙ্গ তুলে অতি ক্ষুদ্র একটা বৃত্তের মধ্যে পাক খাচ্ছে রানী-বাই।

পাক খাচ্ছে, আর, একি আশ্চর্য, মলমলের শুভ্রতা ভেদ করে ফুটে উঠছে এক-একটা পাপড়ি। দেখতে-দেখতে জেগে উঠল পাপড়ির দল। ফুটে উঠল পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ।

করতালি দিয়ে উঠল হল-ঘরের প্রত্যেকে। বাইজির পায়ের আঙুলের কাজে মোহিত হয়ে গিয়েছে সারা হল-ঘর।

নীচে-বিছানো ঘন ফাগ মলমল ভেদ করে জেগে উঠেছে ফুল হয়ে। অদ্ভুত কারুকাজ তো বলতে হবে একে।

নীল গোলাপি সবুজ—নানা রঙের রেশমি রুমালে বাঁধা গুচ্ছ গুচ্ছ মোহর ছুঁড়ে দিতে লাগল অভ্যাগতেরা।

শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে হাটখোলার রামতনু দত্ত বললেন, হার মানাল ফৈজ বক্সকে।

হার মানিয়েছে রানী-বাই। সমস্ত ধৈর্য নিষ্ঠা চেষ্টা সমর্পণ করে বহুদিনের সাধনার পর সে শিখেছে এই পায়ের কাজ। চেষ্টা করতে গিয়ে কতদিন অবশ হয়ে গিয়েছে তার অঙ্গ, কিন্তু মন অবশ হয় নি তার।

রাজকৃষ্ণ বললেন, যা বলেছেন তনুবাবু। বাই বলতে মুসলমান বাইই আমরা বুঝি—নিকি বুঝি, নান্নিজান বুঝি, জিন্নৎ বুঝি, বেগমজান বুঝি, ফৈজ বক্স বুঝি, হিঙ্গুল বুঝি। কিন্তু সকলকে বুঝি হার মানাল এই হিন্দু বাই।

ছুঁড়ে দিলেন না তনুবাবু, স্বয়ং উঠে গিয়ে রুমালে জড়ানো একগুচ্ছ মোহর দিয়ে এলেন রানী-বাইয়ের হাতে।

হাত জোড় করে নমস্কার জানাল বাইজি, বলল, বহুৎ মেহেরবানী।

যেন শুধরে দিতে চাইলেন তার ভাষাটা, তনুবাবু তাই বললেন, মেহেরবানী কেন, বল, খুব অনুগ্রহ আপনার। অবশ্য অনুগ্রহ এটা নয়, এ হচ্ছে পুরস্কার।

তলোয়ারে-বল্লমে বাইরে বাজি-করের খেলা চলেছে সমানে, আর সেইসঙ্গে পুড়ছে বাজি—আকাশেও চলেছে বাজির খেলা।

অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল ঐ নাম, হুগলী-নদীর এপারে-ওপারে। সব বাইজির কীর্তি হরণ করে নিল রানী-বাই।

কীর্তি চুরি হয়তো গেল, কিন্তু পসার চুরি গেল না কারো। এ বাইজির দেমাক আছে, কোনো বাগানবাড়ির ফুর্তির আসরে যোগ দেবার জন্যে বায়না নিতে চায় না এ। গণ্যমান্য-দের আসরে যেতে পারে, কিন্তু লোচ্চাদের আসরে যেতে বড় আপত্তি। কিন্তু খেমটা নাচতে নেমে ঘোমটা দেওয়া এ নয়। লোচ্চারা তার আসরে এলে গা ঢেলে তাদের সঙ্গে লুচ্চোমি

করতে সে রাজি। আর, এই কাজই তো তার এখনকার জীবনের কাজ।

যে যা কাজ নিয়েছে, সেই কাজ করে চলেছে সে। খানাকুলের সেই বামুনটাও করে চলেছেন তাঁর কাজ। একজন জবরদস্ত গভর্নর-জেনারেল না হলে তাঁর বুঝি চলছে না। লর্ড আমহার্স্ট এসেছেন। এঁর দ্বারা কোনো কাজ সিদ্ধ হবে কি না, দেখতে হবে এবার।

কারো যোগ্যতার উপর নিজের চেষ্টাকে বিসর্জন দেওয়া নয়, কোম্পানীর কর্মকর্তারা যদি সহযোগিতা না করে তাহলে সামান্য মানুষের পক্ষে এ-কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

লোককে শত্রু বানিয়েই চলেছে এই মানুষটি। হিন্দুদের বিশ্বাসে ঘা দিয়ে তাদের পরম শত্রু তো হয়েইছে, পাদরিদের সঙ্গেও আবার আরম্ভ করেছে তর্ক। হিন্দুধর্ম নিয়ে আরম্ভ করেছে লড়াই। মানুষটাকে বুঝতে তাই বড় অসুবিধা। নিজে এ হিন্দু না খ্রীষ্টান, মুসলমান না জৈন— কে বলবে।

প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পর গোলোকদাস সংবাদ পড়ে শোনাচ্ছিল সমাচার-দর্পণ থেকে—

কীর্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কলেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক ইঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

কান পেতে ঐ কাহিনী শুনলেন, কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলেন রামমোহন।

কিন্তু এখানে সংবাদের শেষ নয়, নূতন ধরণের আর-একটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করল গোলোকদাস—

গত মহাবারুনী যোগে উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পরদিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারিদিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দনকাষ্ঠ ও ধুনা ও আর আর সুগন্ধি মসলাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামীর শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত স্কন্ধদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

পাঠ সমাপন করল গোলোকদাস। রামমোহন তার দিকে চেয়ে বললেন, এতদ্দেশে নাই, অর্থাৎ বাংলাদেশে নাই, এই বুঝি সমাচারের অভিমত? রীতি পৃথক, কিন্তু নৃশংসতা একই।

গোলোকদাসকে বিদায় দিয়ে সম্বাদকৌমুদী পত্রের জন্যে রামমোহন লিখতে বসলেন। এসব ব্যাপারের বিরুদ্ধে লেখার জন্যে পত্রিকাটি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছে। তাতে বিশেষ আক্ষেপ তাঁর নেই। কিন্তু সম্পাদক ভবানীচরণও যে এর সংস্পর্শ ত্যাগ করে গিয়েছেন, এতেই তাঁর খেদ। যাই হোক, তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে তিনি গোলোকদাসকে ডাকলেন। তার হাতে রচনাটি দিয়ে বললেন, আহিরীটোলায় একবার যাও গোলোক। আনন্দচন্দ্রকে এটা দিয়ে এস।

আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন, সেইজন্যে তাঁর কাছে রচনাটি পাঠিয়ে দিয়ে রামমোহন উঠে বাগানের দিকে গেলেন। রামদাস নাকি কয়েকটি নতুন আমের কলম লাগিয়েছে কয়েকদিন হল। খুরপাই চালিয়ে কাজ করছিল রামদাস, বাবুর পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল।

এদিকে মানিকতলার বাগানে নতুন চারা রোপা হচ্ছে, ওদিকে সারা কলকাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করারও উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। চান্দনী বাজারের পূর্বে ব্যাপারিটোলা থেকে আরম্ভ করে এক রাস্তা বানানো হয়েছে সম্প্রতি, দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিক বউবাজার পর্যন্ত বরাবর এসেছে এই রাস্তা। এতে সোজা চানকের রাস্তার সঙ্গে এর যোগ

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যুক্স

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

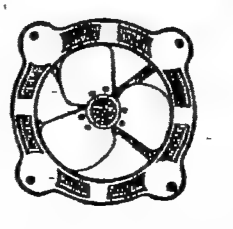

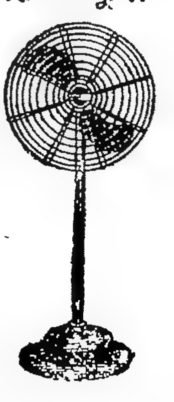

হয়েছে। এই পথ অনেক বাড়ি বাগান ও পুষ্করিণীর উপর দিয়ে গিয়েছে, কোম্পানী বাহাদুর উপযুক্ত খেসারত দিয়েছেন মালিকদের। ধর্মতলা থেকে বউবাজারে যেতে হলে অনেক ঘুরে যেতে হত, এখন লোকের গমনাগমনের অনেক সুবিধা হয়েছে।

কলকাতা জার্নালে সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, খিদিরপুরে জাহাজের ইয়ার্ড অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত এক নতুন রাস্তা হবে, এবং টালির খালের উপরে সাঁকো তৈরি হবে। সাবেক রাস্তা দিয়ে গার্ডেনরিচে যেতে যতটা দূর হয়, এই নতুন রাস্তা তৈরি হলে পথ ক্রোশ-খানেক কম হবে। এতে রাস্তার দু পাশের জমির মূল্য বাড়বে। মল্লিকদের, দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ও বাবু তারানন্দ ঘোষের এতে অনেক উপকার। সুতরাং পথনির্মাণের সব খরচ কোম্পানী একা বহন না ক'রে মল্লিকদের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ আর যে-যে সাহেবের গার্ডেনরিচে বাড়ি তাদের কাছ থেকে কিয়দংশ নেওয়া হোক—কেউ-কেউ সংবাদপত্র মারফত এইরূপ পরামর্শও দিয়েছেন।

নতুন পথ নির্মিত হোক, নালা-নর্দমা বন্ধ করা হোক, পথের ধুলা মারার জন্যে পথে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হোক, খরচের কিয়দংশ লাভবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেওয়া হোক—সবই ভালো। কিন্তু মানুষের মন সাফ করতে না পারলে শুধু শহরের শোভাবর্ধন করেই কি লাভ আছে?

এই দিকে বিশেষ কেউ মনোযোগ দিচ্ছেন না, এ বড় আক্ষেপ। মনোযোগ তো দিচ্ছেনই না, যদি কেউ সামান্য উদ্যোগ করছে তাতে সকলের বাধা-দানের অন্ত নাই। তারা যদি রক্ষণ-শীল, তাহলে সবই সংরক্ষণ করুন তাঁরা। তাহলে নালা-নর্দমা বন্ধের উদ্যোগকে বাধা দেওয়াও তাঁদের কর্তব্য, রক্ষণশীলই যদি তাঁরা তাহলে রক্ষণ করুন ওসব পদার্থও।

লর্ড আমহার্স্ট মানুষটা কেমন তা যাচাই হয় নি। রামমোহন তাঁকে এক পত্র লিখতে বসেছেন, এমন সময়ে নীলরত্ন এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে প্রবেশ করে বিনা ভূমিকাতেই তিনি বললেন, বায়রন মারা গিয়েছেন। হিন্দু কলেজের ছেলেরা শোকসভার আয়োজন করেছে।

রামমোহনের কাছে সংবাদটা নতুন না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, যাবই তো স্থির করেছি। বায়রনের কবিতা তো পড়েছেন—

On with the dance,
let joy be unconfined,

আমাদের দেশের এখন সেই অবস্থা। নেচে চলেছে সকলে, শ্মশানে-শ্মশানে চলেছে ঐ উৎসব। ঐ ঘটনার খবর পেলেই আমার মনে পড়ে ঐ ছত্রটি।

কিন্তু হে পাঠক, আমাদের মনে পড়ে অন্য কথা। মনে পড়ে মুকুন্দ-রামের কথা। মাহেশের কিনারে রূপনারায়ণ তার পত্নীকে হারিয়ে যখন ব্যাকুলভাবে বসে আছে তার পিনিসে, তখন শৌখিন মুকুন্দ এসে তাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে যখন বলল—কত হাজার হাজার ঘটনা ঘটে চলেছে এখানে তার জন্যে ফুর্তি বন্ধ থাকে কেন, চালাও ফুর্তি, তখন আমাদের মনে পড়েছিল ঐ ছত্রটি।

বায়রন গত হয়েছেন। এতে ব্যথিত না হবে কে? এই তো বছর-তিন আগে সামান্য বয়সে মারা গেছে আর-একটি কবিও, যতদিন বেঁচে ছিল সে, কেউ তার নাম করে নি, কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার নাম উচ্চারণ করল সকলে, বলল—কীটস। উপেক্ষা আর অনাদরে ম্রিয়মাণ হয়ে মারা গেল ঐ কবিটি—

Who killed John Keats
"It is I", says the Quarterly
So savage and tartarly.

তাতার-দস্যুর মত নির্দয় আক্রমণ করেই তাকে বুঝি হত্যা করেছে কোয়ার্টারলি নামের ওই পত্রিকাটি।

ঐ কবিটির মৃত্যুর কথা ভুলতে-না-ভুলতেই পর বছর মারা গেল ওদেরই বন্ধু শেলী। ইংরেজি কবিতা যারা পছন্দ করে, তাদের কাছে কীটস আর শেলীর মৃত্যুসংবাদ সামান্য না, সেই অসামান্য সংবাদ বাসি হতে-না হতেই আবার মৃত্যু হল ওদেরই আর-এক জনের। একটি ঝাঁকেরই পাখি ছিল বুঝি ওরা, একটি তীরে তাই পরপর ওরা পতিত হল মৃত্যুর কবলে।

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ওদের অধ্যাপক রিচার্ডসনের সভাপতিত্বে স্মরণসভার আয়োজন করেছে।

ওঁরা সেই স্মরণসভায় যোগদানের জন্য যাত্রা করুন, আসুন, এই অবসরে আমরা অন্য কথা জেনে নিই।

এখানে এই জাহ্নবীর উপকূলে শহর-কলকাতার বক্ষে কবি বায়রনের জন্যে নিবেদিত হোক শোক। মাই নেটিভল্যাণ্ড, গুড নাইট—ব'লে স্বদেশের ও সর্বদেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন বায়রন। কিন্তু কলকাতা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে যশোরের সাগরদাঁড়িতে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে রাজনারায়ণ দত্তের সহ-ধর্মিণী জাহ্নবী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হয়েছে এক শিশু। বায়রন-বিয়োগের বেদনা হয়তো দূর হবে তাকে দিয়ে।

হাতে তালি বাজিয়ে তাকে খেলা দিচ্ছেন জাহ্নবী দেবী, বলছেন, মধু মধু মধু।

অদূরেই মধুস্বরে কল্লোল তুলে বয়ে চলেছে কবতক্ষ-নদী। সেই নদীর কল্লোলে এবং শিশুর কাকলিতে সাগরদাঁড়ির দত্তগৃহ মধুময় হয়ে উঠেছে।

ঐরূপ মধুচ্ছন্দেই বয়ে চলেছে শহর-কলকাতার দীর্ঘ শরীরের কিনার দিয়ে এই হুগলী-নদীও। সুখ আছে এখানে, শোক আছে, দুঃখও আছে, বেদনাও আছে। কিন্তু সে সব নিমজ্জিত করে প্রবল হর্ষের ধ্বনিতে বেজে ওঠে নদীর স্রোত। (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ আট ॥

ডাক্তার গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে বাসব, এ ধারে কিরণ। পেছনের সীটে কল্যাণী, শর্মিলা, দুই মেয়ে। পুরোনো মডেলের বড়ো সাইজের গাড়ি, বসতে কারো অসুবিধে হয় নি। ডগলাসেরও আসবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল, দু-তিনবার লাফিয়েও উঠেছিল গাড়িতে, কিন্তু তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, রেখে আসা হয়েছে চাকরের চার্জে। ডগলাস খুশি হয় নি, শেষ পর্যন্তও করুণভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে সে।

এদিকে আর ম্যাকাডাম রোড নয়—লাল কাঁকরের রাস্তা। সে পথে নুড়ি উঠে আছে, গর্ত রয়েছে, ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে থেকে থেকে। ডাক্তার হাসলেন: একটা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে না কিরণবাবু?

—কিসের?

—এই রাস্তার? ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ব্যাপার—মা-বাপ তো আর নেই। এ রকম পথে বোধ হয় এর আগে—

কিরণ বললে, মেটে রাস্তায় গোরুর গাড়ি চাপবার অভিজ্ঞতা আমার আছে; কিছু ভাববেন না।

—তা হলে সত্যিই ভাববার কিছু নেই। প্রকৃতির শোভাই দেখুন।

শেষ কথাটা ঠাট্টা করে বললেন, কিন্তু কিরণ মগ্ন হয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। দুপাশে—সামনে একটা একটানা পটভূমি, বৈচিত্র্য নেই, তবু নতুনত্ব আছে। একই গাছের পাতা কখনো ঘন সবুজ, কখনো একটুখানি পীতাভ; কোথাও এক ঝাঁক পায়রা—কখনো কয়েকটা খঞ্জন; কখনো সেগুন গাছের নীল নিবিড় ছায়া—কখনো শালের ফুল গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো ঝরে চলেছে। কোথাও কালো কালো পাতার আড়ালে পলাশ ফুটেছে, কোথাও ন্যাড়া শিমুলের ডালে ডালে রক্তকুসুমপুঞ্জ।

ডাক্তার বললেন, জানেন, যখন আমি প্রথম এখানে আসি, তখন এ সময়ে এদিকটাতে অনেক হরিণ পাওয়া যেত।

—এখনো আছে হরিণ?—পেছন থেকে শর্মিলা জানতে চাইলেন।

—আছে কিছু কিছু, তবে দূরের পাহাড়ের দিকে। এদিকটায় লোকজন বেড়ে গেছে অনেক, শিকারও কম হয়েছে, ভয়ে আর আসে না। আমিও তো মেরেছি কয়েকবার।

—বাবা, আমি হরিণের মাংস খাব—কেকার অনুরোধ শোনা গেল।

—থাম্; রাতদিন কেবল খাই খাই।—কল্যাণী ধমক দিলেন।

ডাক্তার বলে চললেন, এদিকে তখন আরো অনেক ঝোপ জঙ্গল ছিল, বিস্তর শিমুল গাছ ছিল, আর এই পথটা ছিল পায়ে হাঁটা রাস্তা। হরিণেরা শিমুলের ফুল খেতে খুব ভালোবাসে, এই সময় দল বেঁধে আসত শিমুল বনে আর আমরা ঝোপের আড়াল থেকে—

বাসব এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিল। এইবার উৎসাহে নড়ে উঠল।

—উঃ, কী থ্রিলিং! বাবা—তোমার বন্দুকটা এবার আমায় দিতে হবে কিন্তু, আমিও শিকার করতে বেরুব। সঙ্গে থাকবে ডগলাস—মাই হান্টিং ডগ।

কল্যাণী বললেন, হুঁ, ওই

তুমি করবে। মায়া দয়া তো আর নেই, ওই লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটাকে সঙ্গে করে যত জীবজন্তু খুন করে বেড়াও।

—খুন কী বলছ মা, শিকার!—বাসব প্রতিবাদ করল: যদি জিম করবেটের বই পড়তে—

—রাখ তোর জিম করবেট। শিকার খুন ছাড়া আর কী।

পারিবারিক আলোচনা, আপোসের ঝগড়া, কিরণ মনটাকে সরিয়ে নিতে চাইল এ-সব থেকে। বাইরে বসন্তের রোদে গাছপালার পুরোনো দৃশ্যপট-টাই নতুন হয়ে উঠছে বার বার; শিমুল-পলাশ-শালের ফুল; কোনো গাছের পাতার রং গাঢ়, কারো রং ঘন সবুজ; ঢেউ খেলানো মাঠ, টিলা, সাঁওতালদের গ্রাম, একটা সাঁকোর তলায় বালি আর নুড়িতে মেশানো সাপের কঙ্কালের মত নদী, মাঠে চরা গোরু-ছাগল, মোটরকে পথ ছেড়ে দেওয়া দু-একখানা মোষের গাড়ি, পসরা নিয়ে চলা মাঝি-মেয়েরা। ভারতবর্ষ। তার দুঃখ, তার অভাব, তার ছোট-খাটো সুখ-শান্তি আনন্দের টুকরো টুকরো।

এই ভারতবর্ষের কথা আমরা উপন্যাসে লিখি না। আমাদের জন্যে কলকাতা। জটিল শহরের জটিল মানচিত্রে ঘুরে বেড়াই। কে পড়ে আমাদের লেখা? আমরাই পড়ি। ভারতবর্ষ পড়ে না।

কী পড়ে ভারতবর্ষ? তুলসীদাস? 'রামচরিত মানস?' ইলেকসনের মিটিংয়ে জমা হয়—স্লোগানে সাড়া দেয়, পোলিং বুথে ভোট দিয়ে আসে; তারপর ঘরে ফিরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সুর করে পড়তে বসে 'ভরত মিলাপ'—দু চোখে তার জল আসে। কবে, এই ভারতবর্ষ নতুন যুগের সাহিত্য পড়তে শিখবে? কবে পড়বে এ-কালের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস?

বাসব কী যেন একটানা বকবক করছে। লেখার গুনগুনানি শোনা যায়: 'ওরে বকুল পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন।' বাকী সবাই চুপ। কিরণের হঠাৎ মনে হল, এতক্ষণ ধরে সব চাইতে কম কথা বলেছেন শর্মিলা, কী যেন ভাবছেন। কী ভাবছেন?

প্রথম দিন তাঁরই সঙ্গে আলাপ—সেদিন খুব সহজ মনে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তারপর থেকে শর্মিলাই যেন সবচেয়ে দূরে সরে গেছেন। যেন এই পরিবারটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার একটুখানি কর্তব্য তাঁর ছিল, সেইটে মিটে যাওয়ার পর তাঁর ছুটি হয়ে গেছে।

শর্মিলা গম্ভীর, শর্মিলা বিষণ্ণ। এই বিষণ্ণতার পটভূমিও কিরণ জানে। কিন্তু প্রথম দিনের সেই উচ্ছ্বসিত হাসিটুকু কি হঠাৎ পাথরের আড়াল সরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল?

গাড়িটা পাহাড়ে উঠছে। ডান দিকে দুধবরণ একটি ঝর্ণার ছোট্ট ধারা, কিছুক্ষণের জন্যে দেখা দিয়েই ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর মিলিয়ে গেল। গাড়ি ওপরে উঠছে—গর্জন করছে এঞ্জিন, তবু যেন ঝর্ণার শব্দটা শোনা যায়—এদিক ওদিক থেকে পাখির ডাক কানে আসে।

বাসব বললে, এই পাহাড়ে বাঘ নেই বাবা?

—আগে ছিল দুটো চারটে লেপার্ড। পাঁচ-সাত বছরের ভেতরে আর শুনি নি। সাঁওতালরাই মেরে খেয়েছে।

কিরণ বললে, খেয়েছে?

—ওরা খায়। বলে, বাঘের মাংস খেলে জোর হয় গায়ে।

কিরণ হাসল: তা জোর ওদের গায়ে হোক। আমাদের খেয়ে বাঘের গায়ে জোর না হলেই হল।

ডাক্তার বললেন, না, বাঘ আর নেই। তা ছাড়া ম্যান ইটার লেপার্ড কৃচিৎ হয়।

বাসব আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বা-রে, জিম করবেটের বইতে লেপার্ডই তো—

কল্যাণী ধমক দিলেন: আবার জিম করবেট।

লেখা বললে, কিন্তু গল্পগুলো খুব ভালো মা। দাদা আমাকে ইংরেজী থেকে পড়ে পড়ে শুনিয়েছে। কী ভীষণ ছিল রুদ্রপ্রয়াগের সেই বাঘটা। সেই লোকটা ঘাস কাটছিল, হঠাৎ—

কল্যাণী বললেন, আর কি গল্প নেই তোদের? যত খুনোখুনি—বাঘ, মানুষ খাওয়া—কী হচ্ছিস তোরা বল দিকি?

এতক্ষণে শর্মিলা হেসে উঠলেন। অনেকক্ষণ পরে যেন নিজের মনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

ডাক্তার গাড়ির ব্রেক কষলেন। বললেন, আচ্ছা, বাঘের গল্প এখন থাক। এইবার মহাকাল দর্শন করো সবাই, আমরা এসে পড়েছি।

পাহাড়ের মাথার ওপর অনেকখানি জুড়ে প্রায় সমতল। দু-তিনশো লোক একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে—প্রায় এমনি একটা উঠোনের মতো জায়গা—মনে হয় পাথর কেটে তৈরি করা। কয়েকটা আঁকাবাঁকা গাছ, তার দুটোতে গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল ফুটেছে, হাওয়ায় তাদের বুনো গন্ধ। ডানদিকে খাড়া জংলা পাহাড়—সেখান থেকে একটা ঝর্ণা নেমে এসে সমতল জায়গাটায় আছড়ে পড়ে আবার বয়ে গেছে নীচের দিকে। ঝর্ণার পাশেই দক্ষিণমুখী ছোট একটি সাদা মন্দির, অনেক দিনের পুরোনো, দু-তিন বছর বোধহয় চুণ পড়ে নি—ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে সবুজ শ্যাওলা আর লাল ইটের রং।

মন্দিরের দরজা নেই। দক্ষিণের আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো পাথরের বেদীর ওপর শিবলিঙ্গ; একটা রুপোর চোখ জ্বলজ্বল করছে তাতে। কিছু শুকনো ফুল আর বেলপাতা। এক ঝাঁক চড়ুই কিছু খুঁটে খাচ্ছিল—ওদের দেখে উড়ে পালালো।

সবাই প্রণাম করল। 'আমি এ-সব

বিশ্বাস করি না—' কথাটা বলতে মন সরল না কিরণের। কী দরকার আছে সব বেসুরো করে দিয়ে? বিকেলের হলুদ আলোয়, হলুদ ফুলের বুনো গন্ধে, নির্জন পাহাড়ের ওপর এই মন্দিরের সামনে অনেকগুলো বিশ্বাসী মনের প্রণামের ভেতরে এক ভারত-ধর্মের সংস্কার। তাকে স্বীকার না করো, অশ্রদ্ধা করতে পারো না। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইল কিরণ।

মন্দিরের ছোট বারান্দায় বসলেন সবাই।

ডাক্তার বললেন, বেশ জায়গাটি—না?

কিরণ বললে, হাঁ, দেবতার থাকবারই উপযুক্ত।

ডাক্তার বললেন, এ দেশের লোকের বিশ্বাস কী, জানেন তো? যতদূর থেকে এই পাহাড়ের চূড়ো দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত মহাকাল সকলকে রক্ষা করেন, কারো কোনো অমঙ্গল হয় না।

—হয় না নাকি?

ডাক্তার হাসলেন: এখন কি আর হয় না? দিনকাল বদলে গেছে, মানুষের পাপে দেবতার মহিমা নষ্ট হয়ে গেছে এখন। তবু লোকের অগাধ বিশ্বাস। শিবরাত্রির দিনে কত দূর-দূর থেকে যে লোক আসে সে যদি দেখেন।

বাসব বললে, কালাপাহাড় তো এই মন্দির ভাঙতে পারে নি—না বাবা?

—হাঁ, সে একটা কাহিনী আছে বটে।—ডাক্তার রায়চৌধুরী গল্প আরম্ভ করলেন। কালাপাহাড় নাকি এই মন্দির ভাঙতে এসেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পাহাড় থেকে এমনভাবে পাথর-বৃষ্টি হতে থাকে যে—

কিছুক্ষণ গল্প চলল। বিকেলের হলদে রোদ আরো কোমল হয়ে এল। ডাক্তার আর কল্যাণী বসে রইলেন মন্দিরের বারান্দায়, লেখা আর কেকা ছুটোছুটি করতে লাগল সামনের জায়গাটায়, আর হঠাৎ বাসব উত্তেজিত হয়ে খবর দিলে, কাকিমা, ওই যে—ওদিকে অনেকগুলো নতুন রকমের প্রজাপতি!

শর্মিলা চুপ করে বসেছিলেন, শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—কোথায় রে?

—ওই তো, ঝর্ণার ওদিকটাতে! অদ্ভুত সব রং। নানা রকম স্পেশিমেন হবে তোমার।

এতক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে শান্ত বিষণ্ণতায় ডুবে ছিলেন শর্মিলা, ছেলে-মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। বললেন, চল্-চল্—দেখি—

ডাক্তার বললেন, যান না কিরণবাবু, দেখে আসুন। লেখক মানুষ, আপনারও কাজে লাগবে।

প্রজাপতি আর কাজে লাগে না, ও এখন ডাক্তার রায়চৌধুরীর মতো কবিদের জন্যেই, একথা মনে এল বটে, কিন্তু বলা গেল না। কিরণ বললে, আপনারা আসবেন না?

—আমরা বুড়োবুড়ি, একটু বসি। আপনি যান।

—আমারও বয়েস প্রায় চল্লিশ হল।

—তবু মশাই আপনি সেদিনের ছেলে। যান—ঘুরে-টুরে আসুন। বেশি দেরী করবেন না—ছেলেমেয়েদের মন এখন টিফিন ক্যারিয়ারের ওপরে পড়ে আছে—ডাক্তার সস্নেহে হাসলেন।

জংলা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল কিরণ। ঝর্ণার ধারে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুল ফুটেছে। বাসব ঠিকই বলেছিল, প্রজাপতির মেলা বসেছে সেখানে।

শর্মিলা যেন অন্যরকম হয়ে গেছেন। উৎসাহে চোখ আলো হয়ে উঠেছে তাঁর।

—দেখেছেন, কত ভ্যারাইটি! পাহাড়ে না এলে এসব পাওয়া যায় না। আগে খেয়াল হয় নি, তা হলে নেট্ নিয়ে আসতুম।

—আপনার বুঝি প্রজাপতি কালেক-শনের হবি আছে?

শর্মিলা বললেন, না, হবি নয়। আমার স্টুডেন্টদের জন্যে কালেক্ট করি। প্রজাপতি—মথ—নানা জাতের ইনসেক্ট। এখানে এলে বাসু হয় আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।—বলতে বলতেই শর্মিলা চকিত হলেন: বাসু!

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

—কী কাকিমা ?

—ঝর্ণার ওপাশে ওই অনন্তমূলীর ঝোপটা দেখতে পাচ্ছিস ? ওর ওপরে ওই বড়ো প্রজাপতিটা ? কী লাভ্‌লি কালার কম্বিনেশন, আর কী জায়ান্ট সাইজ।

—ধরে আনব কাকিমা ?

—না, তুই উড়িয়ে দিবি। আমিই যাচ্ছি ঝর্ণা পেরিয়ে।

—কিন্তু কাকিমা—বাসব প্রতিবাদ করল : ঝর্ণার জলে নুড়িগুলো কিন্তু দারুণ পিছল। দেখছেন না, ওপরে সবুজ শ্যাওলা জমে রয়েছে ? যদি একবার পা পিছলে ধপাস্ করে পড়ে যান, তা হলে—ব্যস!

বাসব হেসে উঠল। আর কাছেই কিরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে করে মুখ রাঙা হয়ে উঠল শর্মিলার।

—হয়েছে, তোমাকে আর ওস্তাদী করতে হবে না।—শর্মিলা পায়ের জুতো খুলে ফেললেন।

—আমিই এনে দিই না ?

শর্মিলা বললেন, থাক বাসু। পাহাড়-জঙ্গলে আমি মেয়েদের নিয়ে এক্সকার্শানে যাই, এসব আমার অভ্যেস আছে। তোকে আর বাহাদুরী করতে হবে না।

পদ্মের মতো একটি পা ঝর্ণার জলে নামল।

কিরণের একবার মনে হয়েছিল, আপনি দাঁড়ান, আমি চেষ্টা করে দেখি—কিন্তু শর্মিলার আত্মপ্রত্যয়ে বা দিতে তার সাহস হল না। সামনে অনন্তমূলীর ঝোপের ওপর প্রকাণ্ড প্রজাপতিটার বিচিত্রবর্ণ ডানা দুটো কাঁপছিল। সেই দিকে চোখ রেখেই এগিয়েছিলেন শর্মিলা, তার ফলে নিজের পা থেকে চোখ তাঁর সরে গেল।

তারপরেই চিৎকার করলেন শর্মিলা।

পা পিছলে গেছে—দাঁড়াতে পারছেন না—এবং ঝর্ণাটা পাথরের ধাপে ধাপে যেভাবে নেমে গেছে, তার মধ্য দিয়ে যদি আছড়ে পড়েন, তা হলে যে কোথায় গিয়ে—

কোনোদিকে না তাকিয়ে কিরণ লাফিয়ে পড়ল, শক্ত করে ধরল শর্মিলাকে, সজোরে ঠেলে দিল এক পাশে। তারপর তারও পায়ের তলায় পাথরগুলো তরল হয়ে গেল—আছড়ে পড়ল সজোরে—যা মুঠোয় ধরতে চাইল তাই পিছলে যেতে লাগল ; তারপর জলে আর পাথরে গড়িয়ে গড়িয়ে আছাড় খেতে খেতে, কয়েকটা তীক্ষ্ণ আকাশফাটা চিৎকার শুনতে শুনতে কিরণের চেতনা অতলান্ত সমুদ্রে ডুবল।

(ক্রমশঃ)

কেন্দ্র থেকে

সরিৎ শর্মা

তবে কি কোথাও নেই যুবকের অমেয় যৌবন—
মৃত্তিকা, আমরা ধ্রুপদী মেঘমল্লারের মৃদঙ্গ প্রণয়ে
বিদ্যুতে হৃদয় বাঁধি, বজ্রের প্রহারে
আরো একবার
দিগন্তের দিকচিহ্নে নটরাজ যৌবনের লীলা
স্বরূপে নিহিত হোক বিশ্বাসের স্বদেশপ্রতিমা।

মৃত্তিকা, অথচ দেখ কার্তিকের মাঠের শিশিরে
প্রতিবিম্ব হয়ে কাঁদি হেমন্তের তির্যক বেলায়—
বিনষ্ট শস্যের কণা খুঁটে ফেরে পউষের প্রৌঢ় প্রহর—
মাঘের চাদর ঘিরে স্থবির কুয়াশা।

তবে কি কোথাও নেই যুবকের অমেয় যৌবন—

ধ্রুবতা কোথাও নেই। মৃত্তিকা, এখন
সকলকে যেতে হবে ; শুধু হৃদয়ের
কোনো এক স্থির কেন্দ্রে রেখে যাবো প্রেমের যৌবন।

বকুলের প্রার্থনা

শান্তি লাহিড়ী

দাঁড়াও পথিক। এই দেখা চিরতরে
চূর্ণ মাটির অনুরাগে মাখামাখি
যাবে তো অনেক দূর গ্রাম বন্দরে
চোখে বসে আছে একটি সবুজ পাখি।
এরপর কত গ্রাম জনপদবধূ
তাদের কাজল চোখের-মায়া কঠিন
আমি নিদাঘের সাহারায় একা ধু-ধু
তুমি বাতায়নে চিকুর মায়াবী দিন।
নূপুরের মত বাঁধা হয়ে পায়ে পায়ে
বাজাই আমার বোবা কান্নার নীল
কণ্ঠ সড়কে একা বকুলের ছায়ে,
বিদেহী আকাশ উড়ে শঙ্খিনী চিল।
জানি নে কখন ডুবে মরতেও—জানি নে।
এখানে ধূসর বিবাগ। দীঘি কাজল।
একা একা আর সন্ধ্যা যাপিতে পারি নে
হৃদয় এখন ভরা আষাঢ়ের ঢল।
দাঁড়াও পথিক, মনে কোন দোষ নিও না
দুটি হাত ভরে হৃদয় বাসনা তুলে দি।
দিও প্রেয়সীর কণ্ঠে দুলায়ে। নিও না
কোন দোষ তুমি—গন্ধ-মায়াবী তুলে দি।

রাজধানী কলকাতায় নেহরু-স্মৃতিতর্পণ সভায় নাগরিকগণ শোকপ্রস্তাব এবং স্বর্গত নেতার আদর্শ অনুসরণের শপথ গ্রহণ করছেন।

রাজধানী:

গেল সপ্তাহে বঙ্গ-দর্শনের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাংলার এক সপ্তাহের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি ইতিবৃত্ত আমরা তুলে ধরতে পারি নি। প্রাণমূলে আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়লে যেমন বিকল হয়ে ওঠে সারা দেহটাই—আঘাতের তীব্র যাতনায় অবলুপ্তি ঘটে অপর সকল কষ্টের চেতনাবোধের, সমাজদেহে তেমনি হঠাৎ কোন প্রবল আঘাত এলে ছোট ছোট বাথা-বেদনার অনুভূতিকে ছাপিয়ে সৃষ্টি হয় একটা বিরাট বিষণ্নতা। মরণশ্যেন অতর্কিতে ছোঁ মেরে ভারতের মুকুটমণি জওহরকে তুলে নিয়েছে, এই সংবাদে বাংলা সারা ভারতের সাথে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। পরম সুহৃদের বিয়োগ-ব্যথার স্তব্ধ মহিমায় আচ্ছন্ন করে তুলেছিল বাংলার জীবন-প্রবাহকে। সেই করুণ ছবিটি তুলে না ধরে আমরা হারানো মাণিকের গৌরব-গাথা পরিবেশন করে গেল সপ্তাহে সান্ত্বনা লাভে প্রয়াসী হয়েছিলাম।

কাল বয়ে চলে নিরবধি। কালের অবিরাম স্রোতোধারায় মানুষ সামান্য বুদ্বুদমাত্র। মানুষের এই ক্ষণকালীন জীবন নিয়েই সৃষ্টি হয় ক্ষণিকের ইতিহাস। আবার এক-একজন এমন মানুষের আবির্ভাব সময়ে সময়ে হয় যাঁদের জীবন উদ্ভাসিত করে সমগ্র জাতির জীবনকে। তাঁদের জীবনের দর্পণে ধরা পড়ে জাতির সাধনার প্রতিরূপটি। তাঁদের নিয়ে গড়ে ওঠে জাতির কালজয়ী ইতিহাস। তাই তাঁদের হারিয়ে সমকালের মানুষ হয় বিমর্ষ, আশাহত। সেই অবস্থায় বিয়োগের বেদনামণ্ডিত উত্তরীয় বুকে ধারণ করে এগিয়ে চলতে হয় মানুষকে। তথাপি, চলার পথের প্রতিদিনের লড়াইতে মনের কোণে এসে ভিড় করে তাঁদেরই কথা। জওহরলালকে হারিয়ে আমাদেরও আজ এমনি দশাই হয়েছে। মনে হচ্ছে, তিনি থাকলে পথের শ্রম কিছুটা লাঘব হত —পথের প্রতিবন্ধকতাকে দলে পিষে এগিয়ে চলা আরও সহজ হতো।

খণ্ডিত পশ্চিম বাংলার তিনি ছিলেন - মুস্কিল-আসান। একবার তাঁর কাছে বিপদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলে ভাবনা কেটে যেতো অনেকখানি। খাত মাফিক অর্থ ব্যয় না করে, কেতাদুরস্ত হিসেব রক্ষা না করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর নব-বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপর রুষ্ট হলে ভারতপথিক দুর্গাপুরের শিল্পায়নে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠতেও তিনি ছিলেন পরম সহায়।

দৈন্যভরা বাংলা আজ অত্যন্ত বিপন্ন। ঘরে তার চাল বাড়ন্ত। মাছ বাজার থেকে উধাও হয়েছে। শিল্পে সে পিছিয়ে পড়েছে দিনের পর দিন। উদ্বাস্তুদের ভিড়ে বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। হলদিয়ার পরিকল্পে আশার একটা ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছিল। কেন্দ্রের প্রশাসন-যন্ত্রের ভেল্কিবাজীতে তাও নিবু নিবু করছে। হলদিয়ায় প্রস্তাবিত স্কুটারের কারখানা নাকি এর মধ্যেই নামঞ্জুর হয়েছে। বাংলা আজ সত্যি অসহায় বোধ করছে জওহরলালকে হারিয়ে।

* * *

বাংলার প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতা হাঁপিয়ে উঠেছে সমস্যার চাপে। পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষের বাস এখানে। রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের সাম্প্রতিক সমীক্ষার পর যে-চিত্র এই শহরের পাওয়া গেছে তা' অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ২২ লক্ষ মানুষ এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পেয়েছে মাত্র ৬ লক্ষ লোক। ৮৫ হাজার ম্যাট্রিক পাশ এখনও বেকার। মোট ৫৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে কাজ পেয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা ২১ লক্ষ।

মাতৃভাষা যাদের বাংলা নয়—কলকাতায় এমন মানুষের সংখ্যা ২০ লক্ষ। কাজেই কলকাতার সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের দায়িত্ব অনস্বীকার্য।

রাজ্য সরকার কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী চাল সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। ন্যায্য দোকানের মারফত দ্বিগুণ পরিমাণ চাল সর-বরাহের আদেশ এখনও কার্যকর হয় নি। ৫৫ লক্ষ লোকের যেখানে বাস সেখানে ২৮ লক্ষের জন্য চালের বরাদ্দ করলে বাকী মানুষকে খোলা বাজার থেকেই চাল নিতে হবে। খোলা বাজারে চাল মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না। ন্যায্যমূল্যের দোকানের চালও চোরাবাজারে চলে যাচ্ছে। চাল দোকানে ঢোকবার আগেই নাকি ক্যাশমেমো

কাটা হয়ে যায় এমন মানুষের নামে তাঁরা চাল গ্রহণ করেন নি। এই ঘটনা সরকারের নজরে এসেছে। প্রতিকারের জন্য ভিজিল্যান্স পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য সরকার। ঘাটতি পূরণ না করে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির রন্ধ্রপথে কুলুপ না এঁটে তদারকী ব্যবস্থায় কোন ফলই হবে না।

ঘাটতি পূরণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার থেকে অতিরিক্ত চার লক্ষ টন চাল চেয়েছেন বলে সেদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এ এম টমাস স্বীকার করেছেন।

মহান নেতার তিরোধানে জাতীয় জীবনে বিরাট শূন্যতা যখন দেখা দেয় তখন মানুষ গ্রহণ করে যৌথ দায়িত্ব। যুগে যুগে তাই ঘটে আসছে। মহাভারতের ইতিহাসই তাই। এই যৌথ নেতৃত্বের কথাটির পুনরুল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার। এই যৌথ দায়িত্ব পালনের প্রধান দায় ন্যস্ত হয়েছে যাঁর ওপর তাঁর হৃদয়বত্তা ও আদর্শনিষ্ঠার সুনাম আছে। ভারতের নতুন নায়ককে আমরা বাংলার প্রতিটি মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভুবনেশ্বরে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর অনুজপ্রতিম শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীকে জওহরলাল তাঁর কাজের অনেকখানি ভারবহনে আহ্বান জানালে শাস্ত্রীজী বলেছিলেন, 'কর্তব্য করতে আমি প্রস্তুত।' ঠিক পাঁচ মাস পরেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনি কাণ্ডারী হয়েছেন। গণতন্ত্রে পরম শ্রদ্ধাশীল বাংলা তাঁর কাছ থেকে অনেকখানি আশাই করে। কলকাতার যে-চিত্র সরকারী পরিসংখ্যানের সমীক্ষায় ফুটে উঠেছে পল্লীবাংলার অবস্থা তার তুলনায় আরও করুণ। ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, দিনমজুরের মুখে আজ দুবেলা অন্ন জুটছে না। দৈন্যের দায়ে পীড়িত বাংলা দৈন্য মোচনের আশার বাণী শাস্ত্রীজীর প্রথম ঘোষণায় শুনে আশ্বস্ত হয়েছে অনেকটা। আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার বাংলার খাদ্য সমস্যা মেটাতে অচিরে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

* * *

গেল সপ্তাহে আমরা বাংলার বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে হারিয়েছি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ছিল তাঁর আদিনিবাস। বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখেই প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। শিশু-ভারতীর সম্পাদনায় তিনি পরবর্তী কালে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিশু ও কিশোরদের মাসিক পত্রিকা কিশোরকের তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক রচনা 'সাধক রাম-প্রসাদ', 'সাধক বিজয়কৃষ্ণ' এবং 'বঙ্গের মহিলা কবি' ও 'ভারত মহিলা' সাহিত্য-রসপিপাসুর হৃদয় এক সময়ে জয় করেছিল। এই বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বর্ধমান :

দুর্গাপুরের গ্যাসের হদিস পাওয়া গেছে। কলকাতায় আসার পথে বালীর কাছাকাছি শতকরা ত্রিশ ভাগ গ্যাস প্রতিদিন গ্যাসবাহী পাইপের ছিদ্রপথ দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিয়ে দীর্ঘদিন দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড এবং কলকাতার ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুর্গাপুর থেকে প্রতিদিন ৫০ লক্ষ কিউবিট ফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী পাচ্ছিলেন তার শতকরা ৩০ ভাগ কম। বিরোধের মীমাংসার জন্য দু-পক্ষের প্রতিনিধিরা অনুসন্ধান কাজে নেমে দেখতে পেলেন দুর্গাপুর ও

নেহরু স্মরণে : মৌন শোকমিছিল

বালীর মিটার পর্যন্ত প্রতিদিন ৫০ লক্ষ কিউবিট ফুট গ্যাসই আসছে। বালীর পর শতকরা ত্রিশ ভাগ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহ করা হচ্ছে এই গ্যাস দুর্গাপুরের পরে পাইপের ছিদ্রপথে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রশাসনযন্ত্রে ছিদ্রের অভাব নেই। কাজেই বহু অর্থব্যয়ে যে পাইপ বসান হয়েছে তাতে ছিদ্র থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এই অপচয়ের খেসারতটা আসবে কোথা থেকে? এর জবাব নিশ্চয়ই কিছু নেই।

* * *

সম্প্রতি আসানসোলে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র-স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। আসানসোল আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিক কমিটির উদ্যোগে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে। এক হাজার দর্শকের উপযোগী একটি প্রেক্ষাগৃহ হবে। সঙ্গে থাকবে একটি গ্রন্থাগার। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আলাদা ঘর থাকবে। মন্দির প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য একটি পার্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও রয়েছে।

২৪ পরগণা:

২৪ পরগণাকে ভাগ করার প্রথম কাজ হবে একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক নিয়োগ করা। শোনা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার শীগগিরই একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক নিয়োগ করছেন। নিয়োগের পর তাঁর ওপর ভার পড়বে বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ এবং ব্যারাকপুর অঞ্চলের। নতুন জেলার নাম হবে বারাসত জেলা। ইতিমধ্যে একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে নিয়োগ করা হয়েছে।

* * *

ব্যারাকপুরের চালকলগুলো ধানের অভাবে এখনও পুরোপুরি চালু হয় নি। ১৭টি চালকলের কাজ প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধ হয়ে আছে।

ক্যানিং থানার নারায়ণপুর গ্রামের তিনজন তাড়ি পান করার পর মারা গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। তাড়ি পানের পরই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসক আসবার আগেই তাদের মৃত্যু ঘটে।

এ ঘটনা নতুন নয়। কিছুদিন আগে হাওড়ায় চোলাই মদ খাওয়ার পর বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

মুর্শিদাবাদ:

ফরাক্কার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাটি কাটা, নতুন নতুন গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হয়েছে। বাঁধের বিলানের কাজ নিয়মমাফিক এগিয়ে চলেছে।

নক্সার কিছুটা রদবদল এবং স্থানের পরিবর্তনের জন্য নাকি খরচ অনেক বেড়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে খরচের মাত্রা ১১০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। ৬৯ কোটি টাকায় এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা ছিল।

বাড়তি খরচটা কিছু হ্রাসের নতুন প্রয়াস চলছে। ভারত সরকার নাকি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সরঞ্জামের কিছুটা আমদানীর জন্য আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। রাশিয়া সম্মত হলে বিদেশী মুদ্রা খরচ কিছুটা কমে আসবে। এই সব মাল আসার কথা ছিল আমেরিকা থেকে।

স্থানের পরিবর্তন এবং সরঞ্জাম আসতে দেরী হলে কাজও ঢিলে তালেই চলবে। ফরাক্কার বাঁধের নির্মাণ-কার্য এই বছরই সুরু হওয়ার কথা ছিল। ১৯৬৫ সালের মে মাসের আগে কাজ সুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই কেউ কেউ মনে করছেন।

ফরাক্কার বাঁধের ওপর কলকাতা বন্দর, কলকাতার শিল্পাঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বছরের পর বছর এই বাঁধ নিয়ে নানা রকম টালবাহানা চলেছে, ফলে কাজ কিছুই হচ্ছে না।

জলপাইগুড়ি:

জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের জীপ গাড়িখানা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে জেলা বোর্ডের সভাপতির বিরুদ্ধে। স্থানীয় সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে 'সভাপতি স্বয়ং নিজের করায়ত্ত করিয়া রাখিয়া তাঁহার ডুয়ার্স অঞ্চলের গ্রামে রাখিয়া এবং গ্রামবাসীদের গাড়িতে চড়াইয়া বিভিন্ন দিকে বেড়াইতে যাইতেন' অথচ জেলা বোর্ডের ইঞ্জীনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারীরা গাড়ির অভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারছেন না। এই অভিযোগের প্রতি আমরা জেলা বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

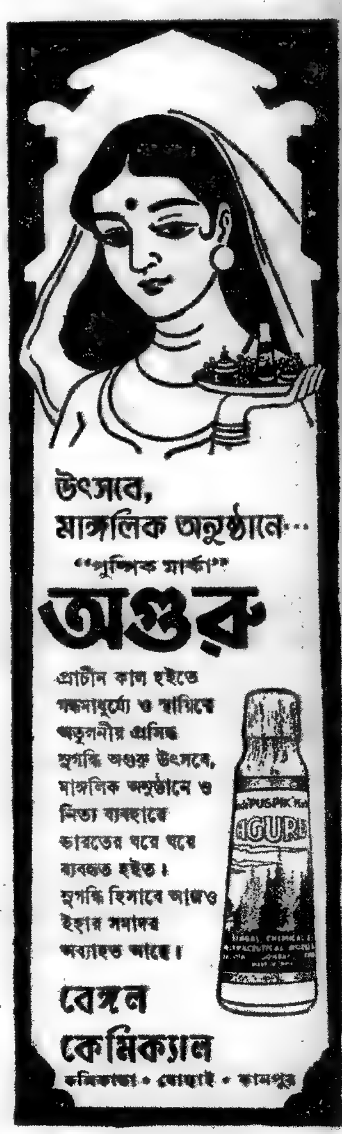

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আদর্শ ভদ্রলোক হতে হলে কি জন্মগত এবং বংশানুক্রমিক কৌলিন্য থাকা দরকার, অথবা চারিত্রিক গুণাগুণ থাকলেই ছোট পরিবারের জন্ম হলেও ভদ্রলোক হতে পারবে—এ নিয়ে সে সময়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এলিয়ট ছিলেন রক্ষণশীল মতাবলম্বী এবং বংশানুক্রমিক কৌলিন্যের উপরই তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর মত ছিল যে, সমাজের সংগঠন হয়েছে hereditary degrees-এর দ্বারা। এই degrees-এর বাঁধন আল্গা করে দিলেই সমাজের structure-ও ভেঙে যাবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই মতবাদকেই সেক্সপীয়ারও তুলে ধরেছেন Troilus and Cressida-তে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ইউলিসিসের 'degree' সম্বন্ধে বক্তৃতায়।

এ সব তর্কবিতর্কের কথা বাদ দিয়ে এই কথাই মনে রাখা দরকার 'উডর জেন্টল্‌ম্যান' হতে হলে বহুগুণের অধিকারী না হলে চলতো না। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, যুদ্ধ, শাসন প্রভৃতি সব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে তবেই ভদ্র বলে খ্যাত হবার অধিকার পাওয়া যেত এমন কি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কৌতূহল পোষণ করতে হোত। স্যার ফ্রান্সিস বেকনের কথাই ভেবে দেখুন না।

একদিকে শিল্পবিদ, অন্যদিকে বিজ্ঞানের চর্চায় সত্যিকার আগ্রহী ছাত্র। মারাও গেলেন তুষারের antiseptic properties আবিষ্কার করতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে। ওয়াল্টার র‍্যালে টাওয়ারে বন্দী অবস্থায় শুধু History of the World-ই রচনা করেন নি, রসায়ন বিষয়েও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন ঐ অবস্থার মধ্যেই। 'Thus, exuberant figures like Raleigh and Marlowe not only wrote poetry and Plays but lived dramatic lives of passion

শিলালি

and—extravagance. In this, the Elizabethan concept of personality was similar to that of

● ফলস্টাফ চরিত্রে রাল্‌ফ্ রিচার্ডসন

Renaissance Italy. Both centred on the idea that life consisted in the development and expression of individual personality. A Leonardo and a Hariot, a Machiavelli and a Sir Walter Raleigh might have inhabited the same court.'

The Western Intellectual tradition—J. Bronowski & Bruce Martish.

তৎকালীন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল, এবং 'করিওলেনাস' পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় কবির সহানুভূতি করিওলেনাসের প্রতি—কারণ নায়ক যাজকসম্প্রদায় এবং সমাজ-শৃঙ্খলা অটুট রাখবার জন্য তৎপর। এ নাটকে মহাকবি প্যাট্রিশিয়েনস এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের প্রতি সহানুভূতিশীল এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রেণীবিষয়ক একটি বিখ্যাত বক্তৃতা আছে হেনরি ফিফ্‌থে (delivered on the night of Agincourt) কোন কোন পণ্ডিতের মতে টমাস মোরের প্লেটিতেও ডিগ্রী সম্বন্ধে বর্ণনাটি সেক্সপীয়ারেরই লেখা।

সেক্সপীয়ারের ধর্মজীবন

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে 'সেন্ট-জর্জেস ডে'তে, যে দিন ৫৩ বছরে পড়লেন, সেই দিনই মহাকবি সেক্সপীয়ার ষ্ট্র্যাটফোর্ডে তাঁর বিরাট অট্টালিকা নিউ প্লেসে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। ষ্ট্র্যাটফোর্ড চার্চের পূর্বাংশে তাঁর দেহ কবরস্থ করা হোল—অনেকে অবশ্য সংশয় পোষণ করেন যে, আসলে এ কবরে মহাকবির দেহাবশেষ আছে কি না। কবর খুঁড়ে যে দেখা যাবে তারও উপায় নেই—কারণ, সেক্সপীয়ারেরই আজ্ঞানুসারে কবরটির উপর এই কবিতাটি লেখা হয়—

Good Friend, for Jesus's sake forbear
To dig the dust enclosed here!
Blest be the man that spares these stones
And curst be he that moves my bones.

মহাকবির মৃত্যুর সত্তর বছর বাদে রেভারেণ্ড রিচার্ড ডেভিস (ইনি ছিলেন গ্লষ্টারশিয়ারের যাজক) ঘোষণা করেন—'Shakespeare died a papist.' এই উক্তিকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। সেক্সপীয়ারের বাবা, মা প্রকাশ্য-ভাবেই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং এই ধর্মের অনুশাসন অনুসারেই নিজেদের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন।

সেক্সপীয়ার-পরিবার ঠিক কি ধরণের ক্যাথলিক ছিলেন? এঁদের তদানীন্তন The English Recusants-এর শ্রেণীতে

ম্যাকবেথের ভূমিকায় জন গিলগাট

ফেলা চলে। Recusant বলতে তাদেরই বোঝায় who refused to attend church-of-England Services। ক্যাথলিক ধর্মমতের জন্য সেক্সপীয়ার এবং তাঁর পরিবারকে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয় নি। এই প্রসঙ্গে Hugh Ross Williamson-এর লেখা 'The Day Shakespeare Died' বইটি থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি :

'Shakespeare had already move than once been in trouble for his Catholicism. He was the cousin of the leading 'Gunpowder Plot' conspirators, Catesby, Tresham, Winter and the Grants. His friend and patron, the Young Earl of Southampton, was an open Catholi

If Shakespeare outwardly 'Conformed' at this period, it would be neither surprising nor evidence against his continuing Catholicism. Yet there is no evidence that he did and what evidance there is points the other way, for he went to live with a Huguenot family who were exempted from the obligation of attending the Anglican Church.

Shakespeare, while in London, so planned his life as to avoid attendance at Anglican Services.'

স্যার জন ফলষ্টাফ

সেক্সপীয়ার যে উদ্দেশ্য নিয়ে চরিত্রটি সৃষ্টি করলেন, তা হয়ে গেল গৌণ—চরিত্রটির বিরাটত্বই সে উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গিয়ে নিজের মহত্ত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো সর্বদেশের এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যচরিত্র হিসাবে। সেক্সপীয়ারের সময়ের ক্যাথলিক—প্রটেষ্টান্ট কলহের বিভীষিকাপূর্ণ ছবিটা আজকের দিনে আমাদের কাছে একেবারে অস্পষ্ট এবং ম্লান হয়ে গেছে।

সুতরাং ক্যাথলিক-বিদ্বেষী স্যার জন ওল্ডক্যাসলকে নিয়ে যে ব্যঙ্গচরিত্র মহাকবি রচনা করেছিলেন এবং তখনকার দিনের লোক তাকে যে ভাবে দেখতো, আজকের দিনের দর্শকের কাছে তার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

এমন কি ফলষ্টাফের নামকরণও হয়েছিল প্রথমটায় ওল্ডক্যাসেল বলেই। পঞ্চম হেনরী যখন যুবরাজ তখন সত্যি-সত্যিই তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্যার জন ওল্ডক্যাসল। চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে তিনি একসময় জায়গায় জায়গায় যুদ্ধ করতেও গিয়েছেন। হেনরী দি ফিফথ যুবরাজ থাকাকালীন এবং রাজা হবার পরও বহুভাবে চেষ্টা করেও ওল্ডক্যাসলকে তাঁর ধর্মবিরোধী মনোভাব থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। ওল্ড-ক্যাসল খৃষ্টীয় অনুষ্ঠান ম্যাস, কনফেসন ইত্যাদিকে নিয়ে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জর করে তুলতেন। এমন কি পোপকে বলতেন এ্যাণ্টিক্রাইষ্ট। শেষকালটায় ওল্ডক্যাসলের প্রকাশ্যভাবে বিচার হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

সেক্সপীয়ারের সময়ে প্রটেষ্টান্ট লেখকেরা ওল্ডক্যাসলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন। প্রচার করা হতে লাগল যে ওল্ডক্যাসল ছিলেন সত্যধর্মের প্রচারক এবং সেইজন্যই ক্যাথলিক মতাবলম্বীদের চক্রান্তে তাঁকে আত্মবলি দিতে হয়েছিল—he was one of the Lollard precursors of the Reformation. (ক্রমশঃ)

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক

মূল্য—সাড়ে চার টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

ছত্রিশ

ভয় ও জয়

১৯৩২ সালের কথা। আর্ট থিয়েটারে অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্রের" নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হবে। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন অপরেশচন্দ্র। শ্যামাকান্তের ভূমিকায় দানীবাবুকে (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) নির্বাচন করেন অপরেশচন্দ্র। কিন্তু "পোষ্যপুত্র" মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে দানীবাবু কয়েকজন সাংবাদিকের ক্রমাগত কলমের খোঁচায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ঐ সময়ে কেউ কেউ 'শ্বেতহস্তী' কেউ বা 'স্থবির' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়ায় দানীবাবু শ্যামাকান্তের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করতে অসম্মত হন।

কাগজওয়ালাদের বড় ভয় করতেন দানীবাবু। তাই অপরেশচন্দ্র দানীবাবুকে শ্যামাকান্তের পার্টটি দিলে দানীবাবু পার্টটি ফেরৎ দিয়ে বলেন, "না মশাই ও পার্ট আমি করতে পারবো না। কাগজওয়ালারা গালাগালি দেবে।"

—না না, গালাগালি দেবে কেন? এ পার্ট ত আপনার বয়েসের উপযুক্ত পার্ট।

—না মশাই, আমাকে রেহাই দিন। "পথের শেষের" দুর্গাশঙ্করের মত পার্ট। সেখানেও বাপ ছেলে। এখানেও বাপ ছেলে।

—চরিত্রটা কতকটা এক রকম হলেও দুর্গাশঙ্করের চরিত্রের মত অত মেলো নয়।

—তা না হোক। ও এক ধরণের পার্ট করে আর গালাগালি খেতে রাজী নই মশাই।

—কেন? সিরাজদ্দৌলার পর মীরকাশিম করেও ত যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন।

স্বর্গত দানীবাবু—'সরলা' নাটকে গদাধরের চরিত্রে

—তা পেয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস ছিল। আমার অভিনয় দেখতে লোকে ছুটে আসতো। তাছাড়া তখন বাপি (নটগুরু গিরিশচন্দ্র) ছিলেন মাথার ওপরে। ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। এখন আমার কি আছে?

—আছে সব আছে নইলে আজও আপনি যখন যুবক প্রবীর সাজেন, তখনও ত যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়।

—না মশাই। কাগজওয়ালাদের আমি বড় ভয় করি। আবার কি বলে বসবে। এ বয়সে আর নিন্দে কুড়োতে রাজী নই।

নানান যুক্তিতর্কেও রাজী করাতে পারেন না অপরেশচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত বলে বসেন—আপনি সরলার গদাধরচন্দ্রের 'ডি ডি চরলে' ভুলে যান। চাণক্যের মত বলুন—"ঐ অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধরে ফেলেছে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে- - -রাখতে পারবো না। তবু যাবার পূর্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশসূর্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবো।"

চাণক্যের উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপ শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন দানীবাবু। তারপর অপরেশচন্দ্রের হাত থেকে শ্যামাকান্তের পার্টটি নিলেন।

বহু কৌশলে শেষ পর্যন্ত দানীবাবুকে দিয়ে যে পার্টটি করান হয়েছিল সেইটাই তাঁর নট-জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তিরূপে আজো চিহ্নিত হয়ে আছে।

একদিন যে কাগজওয়ালাদের ভয়ে তিনি শ্যামাকান্তের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করতে রাজী হন নি, সেই কাগজওয়ালাদেরই অন্যতম 'নাচঘর' পত্রিকা দানীবাবুর অসুস্থতার সময়ে তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—"দানীবাবুর অভাবে পোষ্যপুত্রের অবস্থা হয়েছে বড় কাহিল। মাত্র একজন নাট্যিয়ার অভাবে যে নাটকের চাল হয় এমন ধারা, সে নাটক কেমন নাটক? তবে কি বুঝতে হবে যে, অপরেশবাবুর হাতযশ দানীবাবুর কাছ থেকেই ধার করা? লোকে নাটক দেখতে যেতো, না দেখতে যেতো দানীবাবুকে—ভেল্কি খেলে যাঁর বুড়ো হাড়ে? হা অপরেশচন্দ্র! ধন্য দানীবাবু।"

রঙ্গজগৎ

আড়ম্বরপূর্ণ একটি পুরস্কার অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে

গত ২২শে মে আড়ম্বরের সাথে বি এফ জে এ নামক সংস্থার চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এই উৎসবে বাংলার দুটি সংবাদপত্র গ্রুপের দুটি মালিক একজন সভাপতির আর একজন প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁরা অনেক সারগর্ভ কথাও শুনিয়েছেন। তাঁরা প্রায়ই সামাজিক, রাজনৈতিক বাণী শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের মত এমন গ্ল্যামার শিল্পের ব্যাপারে বলার সুযোগ কোথায়? তাই এই সংস্থা গঠিত হয়েছে। বছরে একদিন চিত্র তারকাদের মধ্যে বসে দু-কথা বলার সুযোগ কম লোভনীয় ব্যাপার নয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সংস্থা এ-দুটি সংবাদপত্র গ্রুপের কুক্ষিগত।

এই সংস্থা যে 'প্রাইজ' দিয়েছেন তা তারকারা গ্রহণ করেছেন। না করে তাঁদের উপায় কি! তবে প্রাইজ-এর ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে সেখানে গুণ অপেক্ষা অন্যকিছু বেশি বিবেচিত হয়েছে। তা না হলে 'মহানগর' বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচিত হয়. অথচ শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার লাভ করেন তপন সিংহ। ছবিটি শ্রেষ্ঠ হলো কেবল কি চিত্রনাট্যের জন্য? ইংরেজী ছবির পুরস্কার আরো হাস্যকর। 'ক্যান ক্যান-এর মত ছবি যাঁদের দ্বারা দশটি শ্রেষ্ঠ ছবির মধ্যে অন্যতম বিবেচিত হয় তাঁদের বিবেচনা সম্পর্কে সুকুমার রায়ের সেই কবিতার কথাই মনে হয়: 'এই দুনিয়ার সকল ভাল, আসল ভাল নকল ভাল, সস্তা ভাল দামীও ভাল…।'

অথচ আশ্চর্যের কথা এরূপ বিচারকদের কেহ কেহ এই পুরস্কার বিতরণের প্রশস্তি লিখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের বিচারের বিরুদ্ধে আর একচোট নিয়েছেন। একেই বলে—মাথা হীনের মাথাব্যথা।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

অগ্নিবন্যা

(হিমালয় পিকচার্স)

শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত দ্বিতীয় চিত্র 'অগ্নিবন্যা'। তাঁর প্রথম ছবি ছিল 'বিষকন্যা'। কানুরঞ্জন ঘোষ লিখিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও সংলাপ রচনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছে পরিচালক। বাংলা ছবির শিল্প-চেতনার কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে কেবল দর্শক মনোরঞ্জনের দিক থেকেই ছবিটির বিচার করলে এরূপ ছবির সার্থকতা অনুভূত হবে। ব্যবসায়িক চিন্তাধারা এরূপ ছবি নির্মাণের প্রেরণা, সেদিক থেকে এ ছবিতে দর্শক মনোরঞ্জনের প্রচুর উপাদান রয়েছে। দর্শকদের খুশি রাখার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালক আঙ্গিক রচনা করেছেন। সাধারণ দর্শকরা ছবিটি উপভোগ করবেন।

ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক সুন্দরী তরুণীর প্রেম ও তার দিদির ত্যাগ ও দুর্ভাগ্যকে কেন্দ্র করে। এই তরুণীর সাথে নায়ক দীপকের (বিশ্বজিৎ) প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল রাস্তার ধারে, সারা গায়ে

● বিজয়া চৌধুরী

চাদর জড়িয়ে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে ছিল। তারপরে এক সুন্দরী তরুণী এলো দীপকের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে। সেই তরুণীর সাথে তার প্রেম যখন পরিণয়ের পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছে, এমন সময় দীপকের ভগ্নিপতি মত পরিবর্তন করে বসলেন, কারণ তাঁর মতে কনের দিদি বাঈজী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জানা গেল দিদি বাঈজী ছিলেন বটে, তবে সেটা ছিল তাঁর ছদ্মবেশ ও আত্মগোপনকালের ঘটনা। সে বিপ্লবী দলভুক্ত ছিল, তাই কাজের জন্য এই ছদ্মবেশ গ্রহণ করে এবং ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করে দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তি লাভ করেছে। তারও জীবনের অসার্থক প্রেমের কাহিনী বড় মর্মান্তিক। নায়ক নায়িকা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করার পর অবশেষে তাদের মিলন ঘটে। ছবিটি ঘটনাবহুল। সুতরাং যাঁরা বহু ঘটনার সমাবেশ পছন্দ করেন তাঁরা খুশি হবেন। ঘটনা বহুলতার দরুণ প্রথম দিক অপেক্ষা শেষের দিকে ছবিটি জমে উঠেছে। তবে যৌক্তিক বিন্যাসে এই ঘটনা বহুলতা অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাস্য হয়ে উঠে না।

নায়ক-নায়িকার চরিত্র দু'টিতে রূপদান করেছে, যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। দিদির চরিত্রে মঞ্জু দে। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে পদ্মা দেবী, কমল মিত্র, জহর রায়, অসিতবরণ, তপতী ঘোষ, প্রভৃতি। একটি প্রাণখোলা যুবকের চরিত্রে তরুণকুমার।

ছবিটির কণ্ঠসঙ্গীতগুলি সুগীত। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক। দীনেন গুপ্তের চিত্র গ্রহণের কাজ পরিচ্ছন্ন। বিশেষ করে বহির্দৃশ্যের কাজ দৃষ্টি-সুখকর।

● মুক্তিপ্রাপ্ত 'কষ্টিপাথর' চিত্রের নায়িকা লিলি চক্রবর্তী

গায়িকা অভিনেত্রী ডোরিস ডে

বিশ্বের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ গায়িকা অভিনেত্রী ডোরিস ডে। ১৯২৪ সালের ৩রা এপ্রিল ওহিওর সিনসিনাটিতে ডোরিস ভন চেপেলফ জন্মগ্রহণ করে। ওর বড় ভাই পল প্রথমে ওকে ডাকতো বাব্বি, তারপরে ডোকো, তারপরে ডোডো। ডোরিসের বাবা ছিলেন সঙ্গীত শিক্ষক। ডোরিসের বাবা চাইতেন মেয়ে হবে বাজিয়ে। মা চাইতেন মেয়ে হবে নাচিয়ে। ডোরিসের যখন এগারো বছর বয়স তখন ওর বাবা-মার বিবাহ বিচ্ছেদ হলো। ডোরিস থাকলো মায়ের সঙ্গে। বাবা-মার বিবাহ বিচ্ছেদ সন্তানদের পক্ষে সব সময় এক ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা। ডোরিসের এখনো সেই বেদনার কথা মনে পড়ে।

ডোরিস নাচ গান শিখতে শুরু করলো। তার মাথায় জিঞ্জার রোজার্সের মত হবার বাসনা। তের বছর বয়সে ডোরিস প্রথম মঞ্চে অবতরণ করলো। চোদ্দবছর বয়সে স্বপ্নের সমাধি ঘটলো। এক মোটর দুর্ঘটনায় তার দুটো পা ভেঙে পিট সমেত বাঁকা হয়ে। বিছানায় পড়ে থাকলো ডোরিস, একা—নিঃসঙ্গ। পনরমাস পরে হুইলচেয়ার ছেড়ে ক্রাচ ধরলো। আবার স্কুলে ফিরে এল। কিন্তু সহপাঠিদের করুণা অসহ্য বোধ হওয়ায় সে স্কুল ছেড়ে চলে এল।

● অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী পরিচালিত অরোরার "রাধাকৃষ্ণ" ছবির একটি দৃশ্যে শীলা পাল ও কেতকী দত্ত

সিনসিনাটিতে গ্রেসরেইন নামের ভদ্রমহিলা ডোরিসকে বিনা পারিশ্রমিকে গান শিখাতে লাগলেন। এ সময় একটি নাইট ক্লাবে ডোরিস গান গাওয়ার কাজ পায়। এখানে ডোরিসের লম্বা পদবীটা কেটে নামের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। সেই থেকে তার নাম হলো ডোরিস ডে। প্রথমে তার মা তাকে ড্রাইভ করে নাইট ক্লাবে নিয়ে যেতো। তারপরে সে সোফারের সঙ্গে একা যেত।

সে সময় বসন্তকালে ডোরিস বুঝতে পারলো তার সন্তান-সম্ভাবনার কথা। বয়স তখন সতের বছর। আল জর্ডান নামে এক তাম্বুরিন-বাদক তার স্বামী। প্রথম সন্তান টেরীর জন্মের পর এক বছরের মধ্যে জর্ডানের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে গেল।

ব্যাণ্ডলীডার লে ব্রাউনের সঙ্গে চুক্তি হবার পর ডোরিসের খ্যাতি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার রেকর্ড সেন্টিমেন্টাল জার্নি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪৬ সালে ডোরিস লে ব্রাউনের দল ছেড়ে রেডিও হিট প্যারেডে যোগ দেয়।

তের সপ্তাহ পরে সেখান থেকেও বিদায় নিতে হয়। এ সময় জর্জ ওয়েডলার নামক স্নায়ু-বাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং তাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসে। সেখানে কোন কাজ না পাওয়ায় অর্থকষ্টে জর্জ ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। সন্তানকে বাঁচাবার চিন্তায় তার বুক কান্নায় ভরে উঠেছে।

সে বছর বেট্টি হাটনের জায়গায় ডোরিস 'রোমান্স অন দি হাই সীজ' ছবিতে অভিনয়ের জন্য মনোনীত হলো। এই অভিনয়ে ডোরিস রাতারাতি চিত্র-তারকা হয়ে গেল। ডোরিসের জীবনের গতি পরিবর্তিত হলো।

১৯৫১ সালে সাতাশতম জন্মদিনে ডোরিস আবার বিয়ে করলো মার্টি মেলচারকে। তার পর থেকে ডোরিস একে একে বহু ছবিতে অভিনয় করে চলেছে। হলিউডের মেয়েরা প্রেসক্লাবে ডোরিসকে সব চেয়ে অসহযোগী শিল্পী ঘোষণা করলেও ডোরিসের খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী।

● প্রোডাকশন্স সিণ্ডিকেটের 'নতুন তীর্থ' ছবিতে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী

নাটকের কথা

হাঙর

গত ৯ই মে হাওড়ায় নবগঠিত সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় কলাপী প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'হাঙর' অভিনয় করেছেন হাওড়া রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন রণজিৎ দত্ত। সৌখীন জগতে নাট্য পরিচালকরূপে রণজিৎবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নাট্যরচনায় তাঁর পারঙ্গমতার কথা সুবিদিত। কলাপীর তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে নাট্যসচেতনতা এবং মঞ্চানুগত্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই সব মিলিয়ে এঁদের প্রথম প্রদর্শনী যে দর্শকবৃন্দের কৌতূহল ও উপভোগকে পরিতৃপ্ত করবে তা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ ও চলচ্চিত্রের সংযোগ সম্পর্কিত এ নাটকের কাহিনীর অভিনবত্ব দর্শকচিত্তে বিশেষভাবেই সাড়া জাগিয়েছে। ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ অবলম্বনে প্রতিটি চরিত্র তাদের জীবনসত্যে প্রতিষ্ঠিত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা ক্রম-পরিণতি লাভ করেছে বিচিত্র রসের অবতারণা করে। কোথাও কোথাও অবশ্য পৌনঃপুনিকতার দোষ থাকলেও তা সোচ্চার নয়। রণজিৎবাবু 'হাঙর' রচনায় যেমন মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর শিল্পকর্ম ও রূপাঙ্গিকের প্রবর্তন এক অনন্য নাট্যসৃষ্টির দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে পরিগণিত হতে পারে।

অভিনয়ে দলগত সুসংবদ্ধতা এ নাট্যকর্মের সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। ব্যক্তিক অভিনয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অবশ্যই করতে পারেন স্বয়ং দীপ্তেনের চরিত্রে। জীবনের হাতে মার খাওয়া বিদগ্ধমানস এই চরিত্রটিকে অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন। এঁর পাশে সাফল্য লাভ করেছেন শেখরনাথ, বিজয় ঘোষ, সুকুমার দত্ত জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও মুকুলজ্যোতি দেবী। কেতকী চরিত্রে সুজাতা ব্যানার্জী আরও

● সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত ও সুশীল ঘোষ পরিচালিত 'সিঁদুরে মেঘ' চিত্রে মাধবী মুখার্জী, শীলা, অনিল চ্যাটার্জী

একটা সাবলীল ঢঙে ভাল হোত। মায়া হালদার এ নাটকের শ্রেষ্ঠ স্ত্রী চরিত্রে প্রায় ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে। কৌতুকাবহ মারোয়াড়ী, মিণ্টু, নদের চাঁদ, গোবরা প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে উপভোগ্য করেছেন দেবীদাস চ্যাটার্জী, সনৎ ঘোষ, অশোক চক্রবর্তী, শ্রীঅমর সুনীল মল্লিক খোকনের ভূমিকায় ভাল, তবে এঁর আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য চরিত্রে দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রতীপকুমার, রমেন সিংহ নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন।

স্টুডিও খবর

দিনান্তের আলো

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত রাজশ্রী পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন 'দিনান্তের আলো' ছবির চিত্রগ্রহণ ২৪শে মে থেকে টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে সুরু হচ্ছে। বহু খ্যাত শৈলেশ দে রচিত একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। সুর সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন—প্রবীণ সুরকার গোপেন মল্লিক। আগামী আঠারই মে টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে পুলক ব্যানার্জী রচিত কয়েকটি গানের রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করবেন—হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী।

ছবিটির চরিত্রচিত্রণে থাকবেন—সাবিত্রী চ্যাটার্জী, কালী ব্যানার্জী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, তরুণকুমার, রবীন মজুমদার, পদ্মা দেবী, পূর্ণিমা দেবী ও দানী দাশগুপ্ত প্রমুখ। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে থাকবেন জনপ্রিয় শিল্পিবৃন্দদের মধ্যে অনেকেই। ছবিটির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে অজয় মিত্র, অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ও সুনীল সরকার।

● ডোরিস ডে

মহাতীর্থ কালীঘাট ছবিতে নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ।

পাঠকের চিঠি : একটি প্রশ্ন

মহাশয়

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকান্তরিত হওয়ায় সারা দেশ শোকে মুহ্যমান। সরকারী আদেশে বারদিনব্যাপী শোক-দিবস পালিত হচ্ছে। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে তাঁর শেষযাত্রার ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জেগেছে। প্রেক্ষাগৃহে মূল ছবি দেখানোর পর যে রাষ্ট্রীয় পতাকা শোভিত জনগণ মন অধিনায়ক জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়—তা শোকদিবসের মধ্যে ঐ ভাবে হওয়া কি উচিত? কেন না, সমস্ত রাষ্ট্রীয় পতাকা যখন অর্ধনমিত তখন প্রেক্ষাগৃহে সেই আদর্শ—জাতীয় মর্যাদা ও সংহতির কারণে পালিত হওয়া উচিত মনে করি। নমস্কারান্তে ইতি।

ইন্দিরা সরকার ও মাধুরী ঘোষ
খিদিরপুর

সংবাদ বিচিত্রা

রাজার কাণ্ড

তার নাম কিং, রাজা। বয়স ন' মাস। এরই মধ্যে সে নাম করেছে কামিনীর প্রতি অদ্ভুত বিরাগ দেখিয়ে। ইংলণ্ডের দশজন অবিবাহিত যুবক তাকে ঘরে আনার জন্য আবেদন জানিয়েছে আর-এস-পি-সি-এর ইনস্পেক্টর আয়ান কিলিয়ামের কাছে।

কুকুরটিকে নিয়ে বিপদে পড়েছে কিলিয়াম। এর আগে চার হাত ঘুরে এসেছে কিং। প্রত্যেক বারই দেখা গিয়েছে প্রভুকে পছন্দ করলেও প্রভুপত্নী বা প্রভু-প্রিয়তমাকে সহ্য করতে পারে নি সে। ফলে কিং চারবার ফেরৎ এসেছে আর-এস-পি-সি-এতে।

সবুজ ডিম

সুইডেনের লোকদের রেওয়াজ হল ইস্টার পরবে চিত্রিত ডিম খাওয়া। দক্ষিণ সুইডেনের ইনগ্রিড জোহান্সন খদ্দেরদের যে ডিম যোগাচ্ছেন তা মানুষের তুলিতে রাঙান নয়, রঙীন হয়েই সৃষ্ট। শ্রীমতী জোহান্সনের সাতটি মুরগী এক নাগাড়ে সবুজ ডিম দিয়ে চলেছে।

সুকমারি রেকর্ড

‘ধেৎ! এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছে না।’ ওহিওর তিন ছেলেমেয়ের মা শ্রীমতী জেরি মক বললেন স্বামীকে।

‘তবে আর কি, প্লেনটা নিয়ে দুনিয়া পাড়ি দিয়ে এস।’ মিঃ মক ঠাট্টা করে বললেন। পদবীগুণে ঠাট্টা করাই তাঁর স্বভাব হয়ত।

কিন্তু শ্রীমতী লাফিয়ে উঠলেন। ফলে একদিন দুনিয়ার কতগুলি বিমান বন্দরে একটি ছোট্ট ‘সেসনা’ বিমানকে নামতে ও উঠতে দেখা গেল। বিমান-চালিকা শ্রীমতী মক।

তিনি ঘরে ফিরে এসেছেন। প্রথম একাকিনী বিমান চালিয়ে বিশ্বপরিদর্শন করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিশেষ পদক পেয়েছেন।

•

ফিনল্যাণ্ডের ডক-কর্মী তৈভো সিলভো একাদিক্রমে না ঘুমাবার বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে। জনৈক ইটালিয়নের রেকর্ড ছিল এগারো দিন ছ' ঘণ্টা। সিলভো সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

সিলভো নিজেকে জাগিয়ে রাখার জন্য এক অভিনব পন্থা নিয়েছিল। ঘুম পেলেই সে জামা খুলে বাইরে তুষারে গিয়ে গড়াগড়ি দিত।

•

ফিনল্যাণ্ডের দুটি কিশোরও বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হয়েছে। তারা বাহাদুরি দেখিয়েছে করমর্দন করে। একনাগাড়ে সাত ঘণ্টা তেতাল্লিশ মিনিট চোদ্দ সেকেণ্ড ধরে তারা পরস্পরের হাত ঝাঁকিয়েছে। ঘরে হাত ঝাঁকানি সুরু হয়েছিল। পাঁচ ঘণ্টা পরে তারা এত গরম অনুভব করছিল যে তারা বাইরে বেরিয়ে আসে।

•

রেকর্ড নয়, প্রতিযোগিতা। সেরা দাড়ি গজাবার জন্য উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুধা অবসানের বিশ্ব আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। বেলফাস্টের কোন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ জানাল, দয়া করে আমাদের দাড়ি গজাতে দিন।

তাদের উদ্দেশ্য জেনে প্রধান শিক্ষক মহাশয় রাজী হলেন। কিন্তু একটি সর্ত। প্রতিযোগিতা শেষ হলেই দাড়ি নির্মূল।

অথ মূষিক কথা

ছোট্ট ইঁদুর। কিন্তু অত বড় জেট বিমানকে কাৎ করে দিল। ঘটনাস্থল লণ্ডনের বিমানবন্দর। বি ও এ সি'র সাত শ' সাত বোয়িং জেট বিমান নিউ-ইয়র্ক পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বিমানটি পরিষ্কার করতে গিয়ে একজনের নজরে পড়ল ছোট্ট ইঁদুর ঘোরাঘুরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটির আকাশে ওড়া বাতিল হয়ে গেল। বিয়াল্লিশ জন যাত্রীকে অন্য বিমানে পাঠান হল।

বিষাক্ত হাইড্রোসায়নিক গ্যাস দিয়ে ভরা হল বিমানটিকে এবং সে অবস্থায় রাখা হল দু'ঘণ্টা। তারপর আরও আট ঘণ্টা লাগল গ্যাস পুরোপুরি বেরিয়ে যেতে।

আর একটি ইঁদুরের বাহাদুরির খবর এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। কুইন্সল্যাণ্ডের হার্টলেজ ক্রীক চিড়িয়াখানায় বিষাক্ত বিরাট তাইপান সাপ নিজের খাঁচায় দুপুরের খাওয়া সেরে ঝিমাচ্ছিল। ক্ষুদে সাদা ইঁদুরটি কখন খাঁচায় ঢুকেছে সে টের পায় নি। চমকে উঠল গলায় ধারাল দাঁতের কামড় পেয়ে। তারপর, মৃত্যু।

শাস্তি

আমেরিকার রচেস্টার শহরে উনিশ বছরের এক তরুণকে বাজারে একটি পোস্টার হাতে ঘুরতে দেখা গেল। পোস্টারে লেখা ‘আমি আর কোনদিন প্রকাশ্যে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করব না।’

কোন এক তরুণীর সঙ্গে তর্ক করার সময় সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি। ফলে নালিশ এবং বিচারক ঐ শাস্তি দিলেন। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে বাজারে ঐ পোস্টার ঘাড়ে ঘুরতে হবে। একদিন, দুদিন নয়, এক মাস।

—সাংবাদিক

পাঠক মন

পাঠকগোষ্ঠীর মতামত উপস্থাপনের জন্য আপনাদের পত্রিকাটিতে 'পাঠকমন' বিভাগটির সূচনা করার জন্য প্রথমে জানাই আপনাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। কারণ বর্তমান সাহিত্য-সমাজে পাঠকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, এ-কথা তর্কাতীত ভাবেই বলা যায়। বর্তমানে এক-একটি পত্রিকা ও তার সম্পাদককে কেন্দ্র ক'রে এক-একটি লেখকগোষ্ঠী বিরাজ করেন—তাঁদের ব্যূহ ভেদ করে নবীন লেখক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যবোদ্ধা পাঠকের প্রবেশ দুঃসাধ্যই বলা চলে। তাই এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাতে লেখকেরা লেখেন নিজের খেয়াল-খুশিতে—পাঠক এখানে নগণ্য, সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। পাঠকের মতামতে এঁদের প্রয়োজন হয় না। এমন কি বাংলাদেশের বর্তমানে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও এমন বিষয়বস্তু পরিবেশিত হ'তে দেখেছি—যা দুর্বোধ্য এবং অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু যেহেতু পাঠকের মতামত বা সমালোচনা উপেক্ষিত, সেইজন্যই মৌন থাকায় বুদ্ধিমানের কাজ। এ-দিক থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রল।

আপনার উন্মুক্তচিত্তে পাঠকসাধারণের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সম্পর্কে মতামত আহ্বান ক'রেছেন এবং সাড়াও পেয়েছেন। সৃষ্টিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ক'রতে হলে যে সুষ্ঠু সমালোচনার প্রয়োজন আছে, এ-কথা আপনারা উপলব্ধি ক'রেছেন। বস্তুতঃ নিজেকে সাজাতে হলে আয়নার প্রয়োজন হয়—পত্র-পত্রিকার পক্ষে পাঠকমন তার আয়না।

বর্তমান বাংলাদেশের অসংখ্য রুগ্ন এবং সূতিকাগৃহেই মুমূর্ষু পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' দৃঢ় পদক্ষেপে তার একবছর উত্তীর্ণ করল—এটা তার চরিত্রের দৃঢ়তার দিক্। সাপ্তাহিক বসুমতী এমন কিছু নিশ্চয় দিচ্ছে, যার জন্যে নিজেকে ক্রমেই সে বিস্তারিত ক'রে দিতে পারছে:

এক:

বর্তমানে অপর কোনো পত্র-পত্রিকা এত বিবিধ ও চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুর আয়োজন করে নি।

দুই:

নবীন লেখকের আত্মপ্রকাশের সুযোগ এখানে বিস্তীর্ণ।

তিন:

এত সুলভ মূল্যে সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযুক্ত পত্রিকা বাংলাদেশে এটি ছাড়া আর নেই বললেই চলে।

চার:

'আজকের মানুষ' পর্যায়ের লেখাগুলি ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান। যে মানুষ একদিন স্বীয় কর্মের দ্বারা (ত্রুটিহীন বা ত্রুটিযুক্ত) দেশে বা বিদেশে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়—কালস্রোতে ভেসে যেতে হয় তাদের একদিন। সমুদ্রের বুকে কয়েকটি বুদ্বুদের মতোই তারা মিলিয়ে যায়; তাদেরই কয়েকটি চিত্র ধ'রে রাখবার এই যে প্রচেষ্টা, তা সত্যই প্রশংসনীয়।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র স্থায়িত্ব ও পাঠক-পাঠিকার ক্রমপ্রসারণের সূচক। এ-ছাড়া পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ হল—শ্রীপদাতিকের 'শহর কলকাতা'। এ এক আশ্চর্য রচনা—যা ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ হয়েও রসাপ্লুত; বিষয়বস্তুটি যার শুষ্ক হয়েও ঝর্ণা ধারার মতোই স্বচ্ছন্দগতি। কঠোর সাধকের মতোই অতীত ক'লকাতার বিস্মৃত ও অজ্ঞাত ইতিহাস রচনায় ধ্যানমগ্ন শ্রীপদাতিক। কালের কবরে কবরায়িত হয়েছে ক'লকাতার যে ইতিহাস—সেই কবর খুঁড়ে খুঁড়ে একের পর এক ইতিহাসের কঙ্কাল আবিষ্কার ক'রে তুলছেন তিনি; এবং আজকের এই কঙ্কালগুলি যা এককালে চঞ্চল ছিল কখনও হাস্যে, কখনও ক্রন্দনে; ভীত, সন্ত্রস্ত, রক্তাক্ত হয়েছে কখনও পর্তুগীজের অত্যাচারে, বৃটিশশাসকের প্রচণ্ড শাসনে; আবার কখনও তাদের ভালোবাসার নিবিড় আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে ধর্মের বলিস্বরূপ কোনো অসহায়া অশ্রুমুখী হিন্দু যুবতী—সেই আদিকালের কবরায়িত ইতিহাস কঙ্কালগুলি শ্রীপদাতিকের লেখনীর যাদুস্পর্শে আবার জীবন্ত-চঞ্চল হয়ে উঠল। সাপ্তাহিক বসুমতীর এ-অবদান যে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ—পরবর্তীকালের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। বাস্তবিক পক্ষে দুঃসাহস হলেও এ-কথা হয়তো বলা চলে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথের পর বিষয়বস্তুর সংগে সংগে ভাষার এমন যাদুস্পর্শ ও ব্যঞ্জনা শ্রীপদাতিকের লেখনীতেই আবার দেখা দিল।

প্রসঙ্গত সংগে সংগে সাপ্তাহিক বসুমতীর কয়েকটি ত্রুটির দিক স্মরণ ক'রতে হয়। এই পত্রিকাতে প্রকাশিত বেশির ভাগ কবিতা ও ছোট গল্প বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের রচনাতুল্য। এগুলতে না আছে ভাষার মাধুর্য, না আছে ভাবের একমুখীনতা, না আছে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও উপস্থাপনার সৌন্দর্য। তাই অন্যান্য দিকের সাথে এই দুটি দিকেও শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চাই। এ ছাড়াও 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরের' ন্যায় পর পর আরও কয়েকটি এরকম সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে পত্রিকাটির মান উন্নত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচূড়া' ভালো লাগছে। মনীশ ঘটক ও দীনেশ দাসের কবিতা এঁদের পূর্বের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সুভাষ মখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের কবিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায় না কি? ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে খ্যাতনামা লেখকবৃন্দের গল্প প্রকাশ করলে তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেওয়া হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সর্বশেষে একথা বলতে হয় যে, বিভিন্ন ত্রুটি সত্বেও পত্রিকাটি বাংলাদেশের অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যেও আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম এবং বাংলা পত্র পত্রিকার ইতিহাসে এর একটি বলিষ্ঠ চিহ্ন থেকে যাবে বলেই বিশ্বাস।

শুভেচ্ছান্তে—
শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য
১১এ।৭, ক্রিষ্টোফার রোড, কলি-১৪

ধনুর্বেদ
(কোদণ্ড-মণ্ডনম্)
মূল্য আট আনা

অহল্যা উপাখ্যান ৷৵

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

খেলা ধুলা

রাজনীতির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়

বিশ্ব-রাজনীতির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। খেলোয়াড় হিসাবে খেলার মাঠে না নেমেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত খেলোয়াড়। তাঁর অমর বাণী "খেলার জন্যই খেলা" আজ ক্রীড়াজগতের আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি একজন সত্যকারের ক্রীড়ামোদী ছিলেন। ১৯৫১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেমসের প্রধান উৎসাহদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীনেহরু। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল খেলার আসরে সময় পেলেই তিনি উপস্থিত হতেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা ভারত, সারা বিশ্বের হল অপূরণীয় ক্ষতি। ক্রীড়াজগতও হারাল একজন বিরাট পৃষ্ঠপোষককে।

তেল আভিভে ভারতীয় ফুটবল দল

স্বাধীনতার পর খেলাধুলায় ভারত অনেক অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফুটবলে ভারত আজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতের মান অনেকটা তাপমানযন্ত্রের পারদের মত ; ফুটবলের মান কখনও উর্ধ্বগামী কখনও বা নিম্নগামী। স্বর্গত ফুটবল কোচ এস এ রহিমের আন্তরিক প্রচেষ্টাই ভারতীয় ফুটবলকে উচ্চে আসন দিয়েছে। এখন রহিম আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর স্থানে ভারতীয় ফুটবল

শ্রীঅমিতাভ

দলকে শিক্ষা দেবার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোচ রাইটের উপর। রহিম যে একজন অভিজ্ঞ কোচ ছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করবেন, তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ তিনি বহুবারই দিয়েছেন। তেল আভিভের এবং ইরানের সঙ্গে অলিম্পিক খেলাগুলির ফলাফল রাইটের যোগ্যতার পরিচয় দেবে।

তেল আভিভে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপের প্রথম খেলায় ভারত গতবারের বিজয়ী কোরিয়া দলকে পরাজিত করে যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে ক্রীড়ামোদী মহলে। এইদিন খেলায় ভারতীয় দলের রক্ষণভাগ এবং আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন ইস্রায়েলের মাঠে। পরের খেলায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইস্রায়েল। ইদানীংকালে ইস্রায়েল ফুটবলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে বহু শক্তিশালী দলকে ঘায়েল করে। ইস্রায়েল দল নিজের দেশের মাটিতে ভারতকে ঘায়েল করল ২—০ গোলের ব্যবধানে। এইদিন ভারতীয় দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের আক্রমণধারায় না ছিল সংহতি না ছিল ক্ষুরধার। ইস্রায়েল দলের আক্রমণভাগের আক্রমণের ঢেউ ঠেকাতে গিয়ে ভারতীয় দলের রক্ষণভাগ যে কয়েকটি ভুল করল পরাজয় এবং দুটি গোলের বিনিময়ে তার খেসারত দিতে হল ভারতকে।

দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবই ভারতীয় দলের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে ৯০ মিনিট খেলতে হয় এবং ভারতে ফুটবল খেলা

● ক্রিকেট খেলার মাঠে নেহরু

এত দীর্ঘ সময় না হওয়ার ফলে বিদেশের মাটিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ একজন অন্যের খেলার সঙ্গে পরিচিত নন। দল গঠনের পর শিক্ষা-শিবিরে মাত্র কয়েকদিনের জন্য তাঁরা একসঙ্গে খেলার সুযোগ পান, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাই দলীয় সংহতি গড়ে ওঠে না। ভবিষ্যতে একটু বেশিদিন শিক্ষা-শিবির চালালে দলের পক্ষে উপকারই হবে। ভারতের ফুটবল খেলাগুলির সময়ও বাড়িয়ে ৯০ মিনিট করা উচিত। খেলোয়াড়দের শারীরিক উৎকর্ষতার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। খেলার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। এইজন্যে প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানকেও কাজে লাগাতে হবে। খেলার নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পাতিয়ালার ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিলে গবেষণা চালান উচিত। পেশাদার ফুটবল মানের সঙ্গে ভারতের মানের কোন তুলনাই করা চলে না, এমন কি অপেশাদার ফুটবল জগতের ব্রেজিল, ইংলণ্ড, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার সমপর্যায়ে আসতে গেলে ভারতকে এখনও বেশ কিছুদিন সাধনা করতে হবে।

সমাচার দর্পণ

বেচারা লিষ্টন, ক্লের হাতে পরাজয়ের সময়টা তার সত্যই খারাপ যাচ্ছে। প্যাটারসনকে হারিয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানশীপের যে দুর্লভ সম্মান তিনি লাভ করলেন, তা বেশিদিন তাঁর ভাগ্যে টিঁকল না। তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা ক্লের হাতে পরাজয়ের পর তাঁর যেটুকু মান-ইজ্জত ছিল, সবই নষ্ট হয়ে গেল। এই পরাজয় লিষ্টনকে উন্মাদ করে দিল। নিজের ক্যাডিলাক গাড়ি নিয়ে বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিষিদ্ধ রাজপথে ঘণ্টায় ৭৬ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন; দুজন পুলিশ অনেক চেষ্টার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তখন গাড়িতে লিষ্টনের সঙ্গে গুলীভরা একটা পিস্তল ছিল এবং সে আগ্নেয়াস্ত্রও আবার বে-আইনী। বিচারে লিষ্টনের ৩০ দিন জেল এবং ৬০০ ডলার

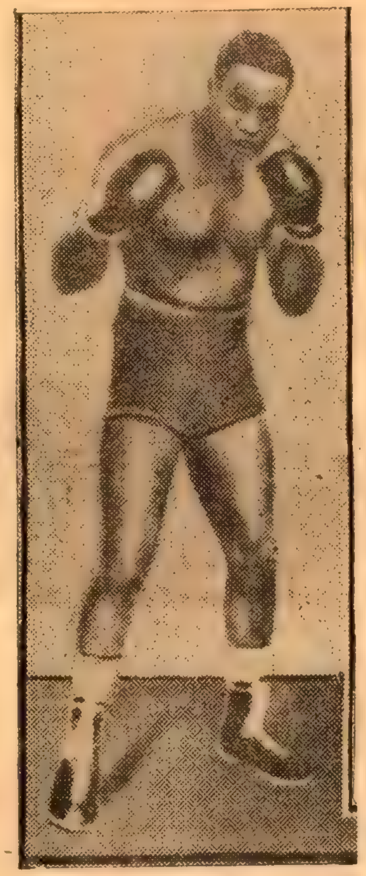

● লিষ্টন

জরিমানা হল। অবশ্য প্রাক্তন জেলঘুঘু লিষ্টনের কাছে জেলটা তেমন কিছুই নয়।

মালয়েশিয়া হকি দল এখন ভারত সফরে ব্যস্ত। কেনিয়া দলের সফরের সময় অপ্রীতিকর কতকগুলি ঘটনা ঘটাতেও ভারতীয় হকি কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয় নি, তাই মালয়েশিয়ার সঙ্গে খেলাতেও আবার প্রায় একই ধরণের কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়। এই ধরণের ঘটনার জন্য ভারতের সম্মান যে ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, সেদিকে কিন্তু কর্তা-ব্যক্তিদের এতটুকু দৃষ্টি নেই। বিদেশী অতিথিরা যদি ভারত সফরে এসে এই ধরণের ব্যবহার পায় তবে ভবিষ্যতে বহু বিদেশী দলই ভারত সফরে আসতে ভয় পাবে। জলন্ধরের চতুর্থ টেষ্টে ভারত উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করল বটে, কিন্তু ঠিক পরের খেলায় চণ্ডীগড়ের পঞ্চম টেষ্টে ভারতের নিম্নমানের খেলা ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করে। মালয়েশিয়া তাই এই টেষ্টে ১—১ গোলে ভারতের সঙ্গে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। যাক, এই খেলার ফলাফলটা বড় কথা নয়; ক্রীড়ামোদীরা এখন অপেক্ষা করছে টোকিওর আসরে ভারতের খেলার জন্য।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর এখন গরম। পেরুর লীমার ফুটবল মাঠের দুর্ঘটনার পর সকলেই সতর্ক হয়ে গিয়েছে। ইংলণ্ড আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় আমেরিকাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল; একেবারে ১০—০ গোলের ব্যবধানে। এরপর বিশ্ব কাপবিজয়ী ব্রেজিল দলের সম্মুখীন হল ইংলণ্ড। বিশ্ব-বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পেলে, ক্যারিনচা, এমারেলডার মত খেলোয়াড় সব ব্রেজিল দলে, বেচারা ইংলণ্ড একেবারে ৪—১ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করে দেশে ফিরল।

প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল খেলায় ব্রেজিল মিলিত হবে পেরুর সঙ্গে রিও-ডি-জেনিরোতে। বিজয়ী দল টোকিও অলিম্পিকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Thursday, 11th June, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73

আমাদের কালের
মৌল সমস্যাবলী
সম্পর্কে
বিশিষ্ট মার্কসবাদী
লেনিনবাদী
এন. এস. ক্রুশ্চফ

**সাম্রাজ্যবাদ—
জনগণের শত্রু, শান্তির শত্রু**

সাম্রাজ্যবাদের দস্যু প্রকৃতির বলিষ্ঠ উদ্ঘাটন—এক পারমাণবিক যুদ্ধের প্রলয়কাণ্ডের দিকে যা বিশ্বকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। গ্রন্থকার সাবলীল বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি না বদলালেও, সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে দেওয়া গেছে। এই মহাশক্তি বিশ্বকে এক পারমাণবিক প্রলয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার সবরকম চেষ্টাকে প্রতিহত করে দেবার ক্ষমতা রাখে। (দাম : ২৫ ন. প.)

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ

কমিউনিজমের গঠনকাণ্ডের মূল সমস্যাবলী, সমাজতন্ত্রের অবস্থান ও সাফল্যগুলির সংহতিসাধন এবং দুই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা। (দাম : ৪০ ন. প.)

**বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও
কমিউনিস্ট আন্দোলন**

বর্তমান যুগের শ্রেণীসংগ্রামের এবং সাম্রাজ্যবাদের চরম পতনের ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ভূমিকার সুগভীর বিশ্লেষণ (পৃথিবীর প্রায় ৯০টি দেশে এই পার্টিগুলি রয়েছে, যার সর্বমোট সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৪২ কোটিরও বেশি)। (দাম : ২৫ ন. প.)

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ-বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ের বিশ্লেষণ, এতে দেখানো হয়েছে যে উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রাম ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কী অপরিসীম সাহায্য ও পথনির্দেশ করে চলেছে। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে কোন্ পথ ধরে এগোতে হবে। (দাম : ২০ ন. প.)

**যুদ্ধ রোধ করা
আমাদের মূল কর্তব্য**

বর্তমান দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতিটি সমগ্র বিশ্বের জনগণের মূল স্বার্থকে কিভাবে পরিপুষ্ট করে তুলছে, তার এক সুগভীর বিশ্লেষণ। (দাম ৪০ ন. প.)

পাঁচটি বই একত্রে ১·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা : ৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি : ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
কালান্তর প্রকাশনী : ৫/১/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

সাপ্তাহিক বসুমতী

"......এ পৃথিবীতে আমার শেষ পরিচয়—কয়েক মুঠো চিতাভস্ম দিলাম আমি উৎসর্গ করে। চিরন্তনী জাহ্নবী তা'ই নিয়ে বয়ে যা'ক মহাসমুদ্রের পথে......"

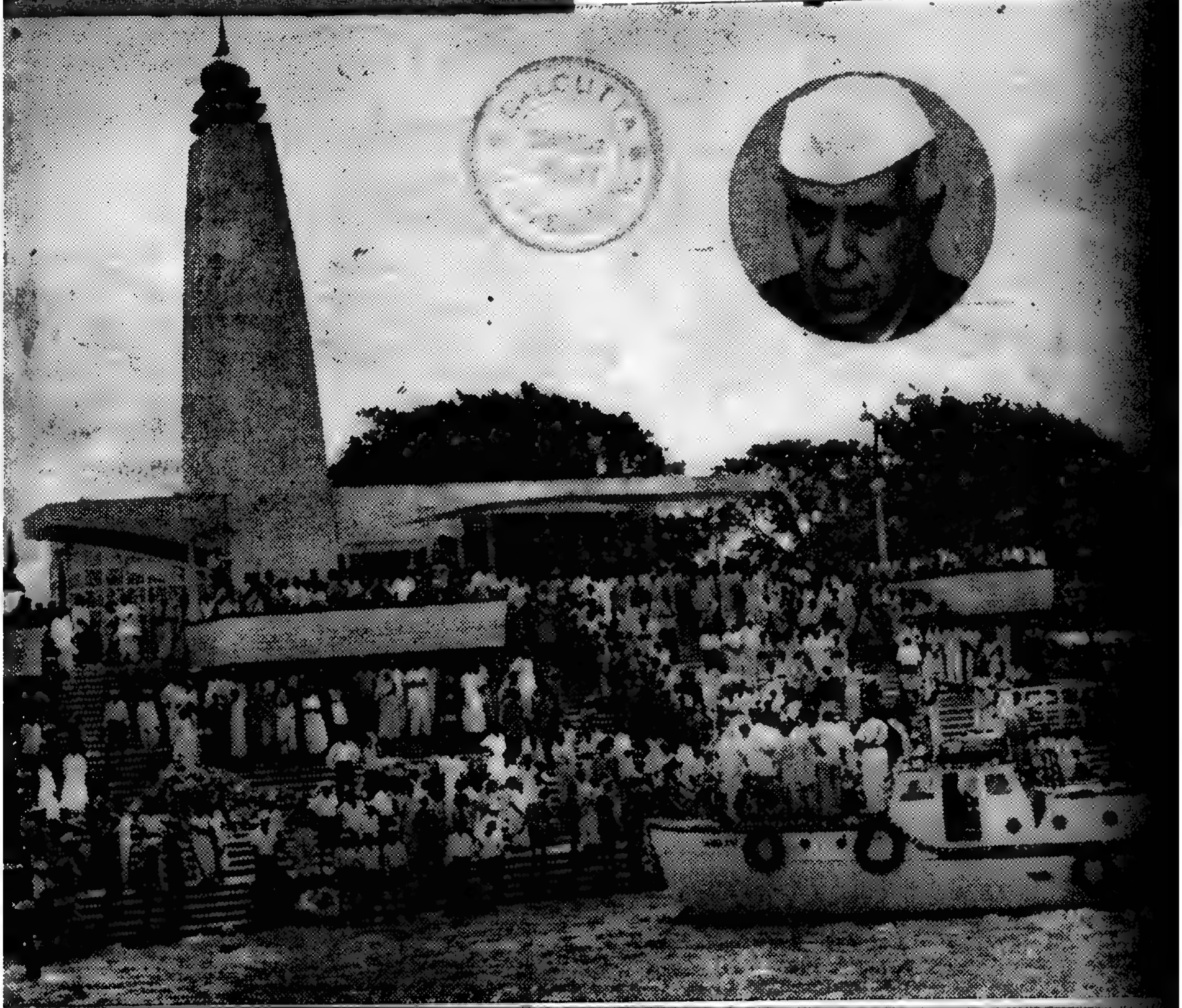

বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 18th June, 1964 • Vol. 69, No. 4

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী

গ্লিসারিন সাবান

হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

756.3
003/3
v.69
no.4

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৯৫
আজকের মানুষ	...	১৯৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৯৭
ভারতদর্শন	...	২০০
আন্তর্জাতিক	...	২০৬
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	২১১
এক বিন্দু নেপথ্য (ছোট গল্প)	বিকাশ বসু	২১৬
অন্য নেহরু অপর এক জনতা	গোত্রহীন	২১৯
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২২১
'আমি চঞ্চল হে'	দেবেশ দাশ	২২৫
দূরন্ত দেহলী (কাহিনী-বিচিত্রা)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২২৯

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব

—তেরখানি নির্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, কয়েক্সে ম্যা মরেক্সে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, শঙ্খমুখী হীরা, রক্তশেকল, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আর্ট ও প্রেম (গল্প)	রথীন্দ্র সরকার	২৩৩
বকুল গন্ধ (কবিতা)	পবিত্র সরকার	২৩৫
হারানো সীতার খোঁজে (কবিতা)	মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৫
অনল আয়তী (উপন্যাস)	সুশীল রায়	২৩৬
বঙ্গদর্শন	...	২৪১
পঞ্চমী পুরাণ (রহস্য-গল্প)	লীলা মজুমদার	২৪৪
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৪৭
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	২৪৯
পাঠক মন	...	২৫০
রঙ্গজগৎ	...	২৫১
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	২৫৫

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্ব্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৷৷০ টাকা

যশস্বী কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

বর্ষাদীপ গল্পাবলী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ | 25 Naya Paise

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আষাঢ় ১৩৭১ | Thursday, 18th June 1964

প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ

জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ব্যক্ত করেছেন। নেহরুর তিরোধানে যে শূন্যতা তা হয়তো পূরণ হবে না—ব্যক্তিগতভাবে সেই বিরাট পুরুষের অনুপস্থিতির শোক কোনদিনও হয়তো দূর হবে না, তবু শাস্ত্রীজী নেহরু-নীতি ও কর্মপদ্ধতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলার এক উজ্জ্বল শপথ দান করেছেন। তাঁর বেতার ভাষণে সেই শপথ আমাদের আশ্বস্ত করেছে।

শ্রীনেহরুর অনুসৃত পথ ধরেই শাস্ত্রীজী অগ্রসর হবেন—দেশকে চালনার প্রয়াস পাবেন সে সম্পর্কে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবু শ্রীনেহরুর পক্ষে যে বিরাট স্বপ্ন ও আদর্শের পথ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল এখনকার অন্য কোন নায়কের পক্ষে সেই লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা খুব সহজ ও সরল হয়ে উঠবে না। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে শ্রীনেহরু যে যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা নিয়ে জাতীয় উন্নতির পথে স্থিরলক্ষ্য ছিলেন, আমাদের নতুন অধিনায়ককে সেই লক্ষ্য-অভিমুখে দুরন্ত সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে নেতৃত্বের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ দিতে হবে।

সংগ্রামী জীবনের অফুরন্ত ঐশ্বর্য নেহরু-নেতৃত্বকে মহত্ত্বে মহীয়ান করে তুলেছিল। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতরাষ্ট্রের সতেরো বছরের জীবনেই এক অনুপম ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে—ভারতের নতুন নায়ক যিনিই হোন না কেন একমাত্র সেই ঐতিহ্যের পথ অনুসরণ করা ছাড়া ভারতরাষ্ট্রের নান্যঃ পন্থা।

এই মহান উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করেই আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রীর শুভ ঘোষণা। এই ঘোষণায় উচ্চারিত আদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনের মৌল সমস্যা ও সঙ্কল্প ঘিরেই ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম: জাতির সকলেরই মিলিত উদ্যম ও শৃংখলা-পরায়ণতা আমাদের জাতীয় শক্তির উৎস। শ্রীনেহরু স্বয়ং সকল বৈপরীত্যের মধ্যে জাতির এক আশ্চর্য ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। এই ঐক্যের শক্তিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশিয়ার একতার বাঁধুনিকে দৃঢ়বদ্ধ করেছে জাতির সম্মিলিত উদ্যম আহ্বান করে ঐক্যবদ্ধ পথে অগ্রসর হবার প্রতিশ্রুতিই শাস্ত্রীজী দিয়েছেন। সেই দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি ঘোষণা করেছেন: ভারত-চীন সংঘর্ষে ভারত কলম্বো প্রস্তাবে অবিচল থাকবে।

দ্বিতীয়: ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথ অনুসৃত হবে। ভারতকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মন্ত্র দীক্ষায় নেহরুই ছিলেন অগ্রগামী পুরুষ। সেই লক্ষ্যের দিকেই দৃষ্টি রেখে ভারতে বিভিন্ন পরিকল্পনার রচনা। নতুন প্রধানমন্ত্রী সেই আদর্শ পথেরই ঘোষণা করেছেন।

তৃতীয়: বিশ্বশান্তির জন্য জোট-নিরপেক্ষতাই হবে ভারতের একমাত্র নীতি এবং যে সব দেশ এখনও সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলমুক্ত হবার জন্যে সংগ্রামে রত ভারতের সহানুভূতি তাদের অভিমুখেই বর্ষিত হবে। এবং এই বিশ্বশান্তির প্রয়োজনেই ভারত ও পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান একান্ত কাম্য।

নেহরুহীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে সচেতন থেকেই ঘরোয়া ও বহির্বিশ্বের সমস্যায় ভারতের লক্ষ্যপথ যে অটুট ও অবিচল থাকবে শাস্ত্রীজীর এই বেতার ভাষণ আমাদের আশ্বস্ত করেছে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবার ক্ষমতাও এক ধরণের কৃতিত্ব। আর এই কৃতিত্বের জোরেই কেউ কেউ সম্মানের আসনও পেয়েছেন আকস্মিকভাবে। শ্রীশাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় শ্রীপাতিলের আগমনে এ কথাই আবার প্রমাণিত হ'ল।

আজ থেকে ৬৪ বছর আগে ১৪ই আগষ্ট শ্রী এস কে পাতিল জন্মগ্রহণ করেছেন বোম্বাই-এর রত্নগিরিতে। বোম্বাই-এর বিখ্যাত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন। এর পর সাংবাদিকতায় ব্যাপৃত হ'য়েছেন। য়ুরোপে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের থেকে নিয়ে এসেছেন সাংবাদিকতায় ডিগ্রী। বহুভাগ্য তাঁর ছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক ধনী প্রতিষ্ঠিত লোকের সাথে মহরম-মহরম ছিল তাঁর। তাই পাতিল যখন বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা—তখন আর যাই হোক, তহবিল ঘাটতির অভিযোগ আসত না কখনই। সেই কারণেই সর্দার প্যাটেলও বোম্বাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান-গুলোর জন্য অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব তাঁর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সে সময়ে পাতিল বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসে এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা। কংগ্রেসের নেতা পরিশেষে '৪৯ সালে বোম্বাই-এর মেয়র। তাছাড়া তরুণ বয়স থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পুরস্কার স্বরূপ ভাগ্যে মিলেছে ৮ বার কারাবাস। কৃতিত্বের দিক থেকে এ সবই অনুপ্রেরণামূলক অনস্বীকার্য। কিন্তু এতেই আত্মম্ভরিতায় পাতিল মশগুল হ'লেন। নিজেকে ভাবলেন সুদক্ষ সাংগঠনিক। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বই লিখলেন কংগ্রেসের সংগঠন সম্পর্কে। নিজেকে প্রচার করলেন সর্দার প্যাটেলের ভাবশিষ্য বলে।

এমনই ভাবে ধীরে ধীরে তিনি দেশের বৃহত্তর পটভূমিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল যতদিন জীবিত ছিলেন শ্রীপাতিল তাঁর বলিষ্ঠ পক্ষপুট থেকে বেরিয়ে এসে তেমনভাবে নিজেকে জাহির করবার সুযোগ পান নি। তবুও লেগে থাকলেন—ইচ্ছে যাচার ওপর আশালতার দৈর্ঘ্য বিস্তারে। অবশেষে পাতিল মন্ত্রী হ'লেন, কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভার পড়ল তাঁর ওপর। এটা '৫৭ সালের কথা। এর দু'বছর পর তিনি হলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী। এ দায়িত্ব পালনে তিনি যোগ্যতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে '৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনায় তাঁকে পদত্যাগ করতে হ'ল। পদত্যাগের পর কেমন যেন বিচলিত বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন শ্রী এস কে পাতিল।

এস কে পাতিল

কামরাজ পরিকল্পনাকে কটাক্ষ করতেও কুণ্ঠিত হ'ন নি। কিন্তু তিনি সুযোগ-সন্ধানী মানুষ। শ্রীনেহরুর লোকান্তরের পর আবহাওয়ার রদবদলের সাথে সাথে সুর পাল্টে ফেলেছেন তিনি। শ্রীশাস্ত্রীর নতুন মন্ত্রিসভায় আবার তাই স্থান করে নিতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হ'য় নি। এই বহু আলোচিত এস কে পাতিল আজ ভারত সরকারের রেল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

'দেহ দুঃখময় হায়'—মালার্মের এই দর্শনের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের উনিশ শতকী রিয়ালিজম্, ন্যাচারালিজম্ সিম্বলিজমের সংযোগ যে কোন্ ধারাবাহিকতায় ব্যক্ত বা নিহিত, আমি এখানে সে ফিরিস্তি দেব না। শুনেছি, ১৮৫০ পর্যন্ত সে-সাহিত্যে রোমাণ্টিক মর্জির প্রাধান্য ছিল। তারপর এসেছে বস্তুবাদ, এসেছে প্রাকৃতবাদ। শুনেছি, তারই পাশাপাশি বস্তু-জগতের সঙ্গে সাহিত্যের নিখুঁত আনুগত্য বজায় রাখবার বদলে কেউ কেউ ফোটাতে চেয়েছেন অভিজ্ঞতার অনতিকথনীয় ঘ্রাণ, ধ্যান, অনুভূতি। সাহিত্যসৃষ্টির মেজাজ এইভাবে বদলে গেছে। যেন বস্তু-নিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পর্বটি পেরিয়ে রোমাণ্টিক মর্জি-ই আবার নতুনভাবে ফিরে এসেছে। অবিশ্যি ভাষায় যা অধরা,—'বোধে যার চিহ্ন থাকে,'—কবিতা তাকেই ধরতে চায়। দেশে দেশে, যুগে যুগে সেটাই রীতি। ফ্রান্সেও তাই ঘটেছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে এইভাবেই সে-দেশের সাহিত্যে প্রতীক-চর্চার রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল। তাই, সে-পর্বের নাম প্রতীক-আন্দোলনের কাল।

তার মানে নিশ্চয় এ নয় যে, প্রতীকের সঙ্গে আগেকার কবিদের কোনো যোগ ছিল না। ছিল, ছিল। পুরোনো কালের আঁচলেও কতো ফুল ছিল। পুরোনো দিনের বুকেও কতো চাপা দীর্ঘশ্বাস ছিল,—স্বপ্ন ছিল, সম্ভাবনা ছিল। ত্রুবাদুর কবিরাও কেউ কেউ ছিলেন ইশারার দিকে বেশি আগ্রহী। সেই সুদূর অতীতের পথে ভিক্তর হুগো এসেছেন, বোদলেয়র এসেছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতার উপকরণ বর্ণনা করতে বসেন নি,—স্বাদ দিতে চেয়েছেন। অনির্বচনীয়কে তাঁরা বচনে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু হুগোর আমলে কবিরা সেদিকে যতোই ঝুঁকে থাকুন, তবু ভাব আর ভাবনার সঙ্গতি বজায় রেখে স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন রচনার দিকেই তখনো সমাজের আগ্রহ ছিল।

ইতিমধ্যে কবিরা গানের দিকে ঝুঁকলেন, সুরে মন হারালেন। অনুভূতির ছায়ালোক নেমে এলো,—জুড়ে বসলো কবিতার আসর। ছায়া আর অন্ধকার। সেইসব অঞ্চল যা সুনির্দিষ্ট নয়, সুচিহ্নিত নয়,—যা ঝাপসা, মেঘলা, অস্পষ্ট—সেইসব লক্ষ্যাতীত লক্ষ্যের দিকে কবিদের মন গেল। তাঁরা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ফিরলেন। সে যেন ফ্রান্সের জাতিগত স্বভাবের বিপরীত মুখে গতি। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? পুরোনো আমলেও কি কিছু কিছু রহস্যবাদ ছিল না? প্রাচীন ফরাসী সাহিত্যেও কি ব্যঞ্জনার মহিমা-বোধ অনুপস্থিত?

স্বদেশের পূর্ব-সংস্কার তো ছিলই, তাছাড়া এই প্রতীক-আন্দোলনের আরো কিছু কিছু কারণ ছিল। বিশ্ব-সাহিত্যের প্রভাবের দিকটাও ধর্তব্য। বিশেষজ্ঞরা তাই এ-পর্বে বিদেশের নানা ঢেউয়ের উল্লেখ করে থাকেন। কার্লাইল আর ইমার্সনের দার্শনিক মতামত,—ইংরেজি সাহিত্যের রোমাণ্টিক কবিদের ভাবের ঢেউ,—শোপেনহাওয়ারের বিষাদ-বোধ,—রুশ উপন্যাসের বিশ্বসৌভ্রাত্র আর জীবন রহস্যের অনুভূতি,—টার্নারের আলো আর কুহেলির স্বপ্ন,—ভাগ্নারের সঙ্গীত—ফরাসী সাহিত্যিকের মনে মনে তখন এইসব হাজার ঢেউয়ের ছোঁয়া লেগেছে।

তাঁরা তারই মধ্যে পথ খুঁজেছেন।

সেই সন্ধানের কথা মনে এলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ রতন'-এর উৎসবক্ষেত্র মনে পড়ে। সেই বিদেশী পথিকদল, আর প্রহরীর দৃশ্য। ভদ্রসেন বলেছিলেন—'এখানে রাজাও দেখি নে রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।'

প্রহরী প্রশ্ন করেছিল—'কিসের রাস্তা?'

মাধব জবাব দেন—'ওই যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?'

প্রহরী বলেছিল—'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সামনে চলে যাও।'

তখন পথিকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছিল। খোলা রাস্তার সেই আজব দেশে এসে ভদ্রসেন স্বদেশের বাঁধা রাস্তা আর বাঁকাচোরা গলির জন্যে মনে মনে বড়োই ব্যাকুল বোধ করেছিলেন।

আমাদের বাঁধা সংস্কার, বাঁধা ইচ্ছে-অনিচ্ছের জগৎও সেই রকম। আমরা অভ্যাসে বাস করতে চাই,—হঠাৎ যদি-বা কোনোদিন কোনো কৌতূহল-বশে কিংবা অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে কিংবা আকস্মিক কোনো তাড়নায় কখনো অন্য পথে গিয়ে পড়ি, তখন অন্য বিবেচনাবর্জিত সেই খেদই দেখা দেয়—যা দেখা দিয়েছিল ভদ্রসেনের মনে।

ভদ্রসেন বলেছিলেন—'আমাদের

গণ্ডিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মুস্কিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব, ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উল্টে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি। এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!'

না, ফরাসী সাহিত্যের এরকম কোনো গোঁড়ামি ছিল না আগের আমলেও। কিন্তু একথা ঠিকই যে, প্রতীক-আন্দোলন সে-দেশে এসেছিল এইরকম খোলা-রাস্তার গভীর সম্ভাবনা নিয়ে। আর, বাস্তবতার ঝোঁক পেছনে ফেলে রেখে, কবিরা সে-দেশে প্রতীক-চর্চার সেই খোলা রাস্তাতেই পা বাড়িয়েছিলেন। সেই পথে পা বাড়িয়েই ভার্লেন লিখেছিলেন—

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা
  প্রবেশ যদি করে
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি মোচড়
  লাগায়ো ভাল মতে
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক
  এনো ভাষান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভালো
  কবিতারে মাঠে মারা হতে।

সত্যেন দত্তের নানা অনুবাদের মধ্যে এ-অনুবাদটি মূল্যবান। এতে বস্তুলোক থেকে মায়ালোকে এগিয়ে যাবার চিরকালের সংকল্পধ্বনিত হয়েছে। একি শুধু ভার্লেন নামে বিশেষ দেশের বিশেষ একজন কবির কথা? একি কেবল ১৮৮৫ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ফরাসী কবিতার প্রতীকী আকাঙ্ক্ষা?

ভার্লেন আর ভালেরির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন সে-কালের নানা দেশের নানা কবি। মন যেন শব্দে সমর্পিত হল। দৃষ্টি যেন সুরে বিলীন হল। যুক্তি আর বর্ণনার সিঁড়ি ছেড়ে,—সাক্ষাৎ সুরে, শব্দে যেন অভিজ্ঞতা সঞ্চারের ঋতু দেখা দিল।

শোনা যায়, ফ্রান্সে ১৮৮০র ঠিক পরের কয়েক বছরের মধ্যেই, 'Symbolisme' নামটা চালু হয়ে যায়। নানা কবির ভিড়ে, জাঁ মোরিয়া নামে এক কবি এই শব্দটি প্রথম

● সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ব্যবহার করেন, আর তখন থেকেই এ-শব্দ সাহিত্যের আসরে চলতে থাকে।

তারপর সময়ের স্রোত আরো এগিয়ে গেছে। র‍্যাবোঁ ঘুরেছেন ভার্লেনের সঙ্গে সঙ্গে। ইংলণ্ডে গেছেন, বেলজিয়মে গেছেন। ভার্লেনের চেয়ে বয়সে দশ বছরের ছোটো হয়েও তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছেন। সেই ঝগড়ায় বেপরোয়া বন্দুকও চলেছে। সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে র‍্যাবোঁ ঘুরেছেন পথে পথে। যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে, ললিতকলায়, নীতিশাস্ত্রে সর্বত্র র‍্যাবোঁ ছিলেন খোলা-রাস্তার পথিক,—তীক্ষ্ণ, তীব্র বিপ্লবী। মালার্মের প্রথম পর্বের মতন সামঞ্জস্য ছিল না তাঁর, ভার্লেনের মতনও নয়। কারণ, মালার্মে আর ভার্লেন দুজনেই প্রতীক-চর্চার সুপ্রতিষ্ঠিত কবি হয়ে বিদায় নিয়েছেন। র‍্যাবোঁ কিন্তু তাঁর সত্তার সমস্ত বিপ্লব ঢেলে দিয়েছিলেন জীবনের খোলা রাস্তায়—অন্তহীন পরিভ্রমণে।

অবশ্য মালার্মেও সামঞ্জস্য আর সুবোধ্যতা থেকে ক্রমেই গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতির দুর্বোধ্যতার দিকে এগিয়েছেন। তাঁর রাস্তাও খোলা-রাস্তা বটে, কিন্তু কেমন যেন নিবিড়তর অন্ধকার সেখানে। শিল্পী হিসেবে, সুন্দরেরই সাধক ছিলেন তিনি। ভাষা যে ভাবের বাহন নয়, সেতু নয়, নির্ভরযোগ্য পথও নয়,—সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না তাঁর। তবু অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন তিনি। ভার্লেনের মতোই কবিতায় বাগ্মিতাকে জায়গা দিতে নারাজ ছিলেন তিনি। তাঁর সেই মনটিই ধরা পড়েছে সুধীন্দ্রনাথের একাধিক অনুবাদে,—যেমন, 'প্রতিধ্বনি'র 'নীলিমা'তে—

নিরপেক্ষ নীলিমার নির্বিকার,
  নির্মল বিদ্রূপ,
মদালস পুষ্প যেন,
  সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায়;
অনর্থক বিড়ম্বনা অভিশপ্ত
  প্রতিভার যূপ
মন্ত্রণার মরুপথে আমি কবি
  ছুটি নিরুপায়।

আবার, মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা। সুদর্শনাকে রাজা বলেছিলেন—'আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগ-যুগান্তরের ধ্যান, লোক-লোকান্তরের আলোক, বহু শরৎ-বসন্তের ফুল-ফল। তুমি বহু পুরাতনের নতুন রূপ।'

সুদর্শনা শুনে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো সুরঙ্গমা নন। তাঁর কৌতূহল মেটে নি। তিনি বলেছিলেন—'কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো

লোহার মতো অন্ধকার---।' সুদর্শনা রাজার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলেন চোখের দেখার জগতে।

রাজা সুরঙ্গমাকে বলেছিলেন সে-কথা।

শুনে, সুরঙ্গমা বলেন—'কৌতূহলের জিনিস তো পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতূহলের অতীত।'

মালার্মের মধ্যে সুদর্শনার কৌতূহল-বৃত্তি ছিল না,—ছিল সুরঙ্গমার গভীর বিশ্বাস। আমি জানি না, এ-উপমা ঠিক হল, কি হল না। বোদলেয়রের মাতাল হবার ইচ্ছের মতন মালার্মের এই কাব্যশিল্পের গহনে অবগাহনও পরমার্থ উপলব্ধিরই উদাহরণ।

সাহিত্যে মাতাল হবার আকাঙ্ক্ষা এবং দেশে দেশে তার অনুকরণ, অনুসরণ—তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কিন্তু সর্বত্র এক জিনিস নয়। কখনো কখনো মনে হয়—তাতে ভদ্রসেনের খেদ নেই বটে, সুরঙ্গমার কৌতূহলে উপেক্ষা, আর পরমে প্রত্যয়ও তাতে অনুপস্থিত। সে এরকম কোনো বাউলের গান নয়, যে গায়—'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে।' সে কোনো বিশ্বাসের ঝঙ্কার নয়, আশার উত্তরাধিকার নয়। কোথাও দেখেছি তাতে ক্লান্তি আছে,—গভীর অবসাদ আছে,—কিন্তু কোনো ঠাকুর্দা'র গান নেই—

'দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে।'

সে মত্ততা অন্ধকার,—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নিজের কবিতা 'উজ্জীবন'-এর মতন যেন বহুকালের বিশ্বাসের বিপরীত কথা। যেন—'নিজিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর', যেন—'আত্মঘাতী পরিহাস।' সে মত্ততার মূলে গভীর, গভীর বিষাদ—'যে পশুবলের কাছে হার মেনে তুমি মৃত্যুঞ্জয়, এ-বারে কি তার উজ্জীবন?'

সে যেন কতকটা সুদর্শনার তিরস্কার সুরঙ্গমার উদ্দেশে—'যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে।' তাতে এ বিশ্বাসের ধ্বনি নেই যে—'মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে।'

সে-অন্ধকার আমার ভালো লাগে না। আমি স্তেফান মালার্মের সেইসব অন্ধকার দুর্বোধ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াতে উৎসাহ পাই না। মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ—সেই 'উৎকণ্ঠা'—

'আর, আমি পরাজিত,
প্রেতভয়ে পাণ্ডু দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা,
ভাবি শয্যা প্রেতের প্রচ্ছদ॥'

সেইসব অন্ধকার প্রহরেই আমি মনে মনে দেশান্তর খুঁজি। চলি অন্য জগতে, অন্য কাহিনীতে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সুস্থ, সাধারণ আলোতে। হোক্ সে হাল্কা আলাপের জগৎ, হোক্ অন্য কিছু—যেমন শ্রীযুক্ত তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিরঙ্গ' মনে পড়ে।

তেরশ একষট্টির পৌষে বেরিয়েছে সে-বই। তাঁর সেই প্রবাস-স্মৃতির রেখা-চিত্রের দুখানি চিত্র এখুনি মনে পড়ছে পাশাপাশি। প্রথমে 'ম্যানহাটান'-এর কথা—মিসেস ফ্লেচারের রবিবাসরীয় দরবারে আসতো অলিভ আর আইভি; চাটুজ্যে মশাইকে তারা ডাকতো 'আংকল চপো'। এই দুই বোনের জন্যে কেনসিংটন হাই ষ্ট্রীটের প্রকাণ্ড এক বাড়ির বেসমেণ্টে প্রকাণ্ড এক 'কোনসেলারে' এক রেস্তোরাঁ খোলা হয়। সেই রেস্তোরাঁর শুভারম্ভ উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন চা-পানের উৎসবে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পিয়ার্সন সাহেব। আর কবি হার্বার্ট পামার সেখানে কবিতা শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

হোক্ সামান্য কথা,—তবু এই হাল্কা ছবিটুকুই আমার পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় চিত্রটি জন-এর। জনের ক্যাবস্টলে পাওয়া যেত ডিমসিদ্ধ, হ্যাম-স্যাণ্ডউইচ, ফিশ-অ্যাণ্ড-চিপ—আর, রোস্ট-করা ডুমো ডুমো আখরোট, রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন রোটেনস্টাইনের নটিং-হিল-গেটের শেফিল্ড-টেরাসের বাড়িতে। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ট্যাক্সির ভাড়া দেবার জন্যে পকেট হাতড়াচ্ছিলেন তিনি। তপনবাবু ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, সেই রাত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যান জনের স্টল দেখাতে।

দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের চেহারা দেখে জন হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যান। তপনবাবুই তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যান। পরে, কেনসিংটন ম্যানশনের নাইট-পোর্টারের হাতে গুরুদেবকে পৌঁছে দিয়ে, তিনি ফিরে এসে জনের স্টলে ঢুকতেই জন বলে—'চ্যাটার্জী, আমার জীবন ধন্য। করুণাময় লর্ড যীশু ক্রাইস্ট দূর থেকে আজ আমাকে দর্শন দিয়েছেন।'

হোক্ এ তুচ্ছ কোনো ক্যাবস্টলের কাহিনী,—হোক্ মতিভ্রম, মোহ। তবু করুণাময় লর্ড যীশু ক্রাইস্টের নামটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দেহ-মনের সৌন্দর্য মিশে গেছে এখানকার এই অন্য জগতে!

হয়তো, মৃত্যুর দিক থেকে এই মুখ ফিরিয়ে থাকার নামই আত্মরক্ষার দুর্মর সংস্কার। আমরা বাঁচতে চাই। আমরা আলো চাই, প্রাণ চাই,—চাই মুক্ত বায়ু,—আমরা আমাদের সংকীর্ণ জগতের সমস্ত খর্বতা, সংকোচ, ক্লেদ আর গ্লানির জয়ধ্বনি শোনবার জন্যে সাহিত্যিকের শরণার্থী হই না,—না, না, না,—আমরা চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

(ক্রমশঃ)

ভারত দর্শন

● শপথ গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের গৃহীত চিত্র

রাজধানী :

মানবতার মূর্তপ্রতীক জওহরলালের শেষ কামনা পূর্ণ করে তাঁর পূত চিতাভস্ম ১২ই জুন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে তাঁরই চির আকাঙ্ক্ষার ধন হিমালয়ের তুষারমৌলি শৃঙ্গ, গহন উপত্যকা, এবং হিমালয়ের পাদদেশের বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ সমতলে যেখানে চাষীর দল প্রাণান্ত পরিশ্রমে সোনা ফলাচ্ছে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের ধূলামাটিতে সে ভস্মরাশি মিশে গিয়ে তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনের মানুষের কাছে এই পবিত্র ধূলিকণা মানবতার প্রতি গভীরতম দরদ, চির বঞ্চিত চাষী ও গরীব মানুষের প্রতি একটি মহাপ্রাণের প্রেম ও অকৃত্রিম ভালবাসার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

নেহরু নেই। তাঁর লোকান্তরের সাথে সাথে প্রতিভাদীপ্ত বিরাট ব্যক্তিত্বের অবসান হয়েছে। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন ব্যক্তিত্ব-সমুজ্জ্বল পথ, তাঁর পরবর্তী পুরুষদের জন্য। নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সেই পথেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। নেহরু-নীতিতে তিনি অবিচল থাকবেন বলে বারবার ঘোষণা করেছেন। দেশের স্বাধীন মর্যাদা রক্ষা করে শান্তির পথে, মীমাংসার মনোভাব নিয়ে তিনি এগিয়ে যাবেন। সমঝোতার পথে কাজ হাঁসিল করার নীতিকে অনুসরণ—যাঁরা দুর্বলতা বলে উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি একটু বক্রোক্তি করতেও ছাড়েন নি। তিনি দুর্বলচেতা নন। ছোট্ট মানুষ হলেও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় তিনি পূর্বেও দিয়েছেন।

মন্ত্রিসভা গঠনকালেও তিনি যেমন পরম সহিষ্ণুতা ও বিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি পরিচয় দিয়েছেন দৃঢ়তা ও সৎসাহসের। নেহরু-মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকে তিনি বাদ দেন নি। এখানে তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয়ই দিয়েছেন। যাঁরা শেষ দিন পর্যন্ত নেহরুর একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন—তাঁর দক্ষিণহস্তরূপে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়েছেন তাঁদের বাইরে রেখে নেহরু-নীতি সততার সাথে অনুসরণ কতদূর সম্ভব হতে পারে এই চিন্তাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সহকর্মীদের বাছাই করে নেবার সময়।

অত্যন্ত সুবিবেচনার সাথেই তিনি দপ্তর বণ্টন করেছেন। নেহরু-নীতির একনিষ্ঠ সাধক তিনি। পররাষ্ট্র দপ্তরের গুরুভার তাই স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শ্রীনন্দ, শ্রীকৃষ্ণমাচারী, শ্রীত্যাগী, শ্রীহুমায়ুন কবীর, শ্রীঅশোক সেন, শ্রীওয়াই বি চ্যবন, শ্রীচাগলা প্রমুখ মন্ত্রীদের দপ্তরের কোন রদবদল করেন নি।

তাঁর মন্ত্রিসভায় নতুন এসেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রী এস কে পাতিল এবং শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি। শ্রীমতী গান্ধীকে তথ্য ও প্রচার দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে। এই দপ্তরটি বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচার কাজে ভারতের ব্যর্থতার কথা আমরা পূর্বে অনেকবার উল্লেখও করেছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে এসে তথ্য ও প্রচার দপ্তর নিশ্চয়ই নতুন প্রেরণা লাভ করবে। শ্রীরেড্ডীকে ইস্পাত ও খনি দপ্তর, শ্রীপাতিলকে রেল দপ্তর, শ্রীশরণ সিংকে শ্রমশিল্প ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং এবং শ্রীসুব্রহ্মণীয়মকে খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে। সকল জল্পনা-কল্পনার

অবসান ঘটিয়ে শ্রীশাস্ত্রী অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করে নতুন ইতিহাসেরই সৃষ্টি করেছেন।

* * *

পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্বাচনের পর শ্রীশাস্ত্রী তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-জনিত দেশের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে এর সমাধানের ব্যবস্থা আগে করা কর্তব্য বলে মন্তব্য করে-ছিলেন। এর প্রতিকারের বাস্তব-পন্থা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী, খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমি-শনের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ ধরণের ভাল কথা, আশ্বাসবাণী নতুন নয়—নেতাদের মুখে আমরা আরও শুনেছি। কাজের বেলায় তার পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই নেতারা দেন নি। শ্রীশাস্ত্রী বিনয়ী ও স্বল্পভাষী, কথা খেলাপের অপবাদ তাঁর নেই। দেশের দারিদ্র্য মোচনের জন্য তাঁর জননীও প্রাণান্ত প্রচেষ্টার নির্দেশই তাঁকে দিয়েছেন। আমরা যতদূর জানি, খাদ্য সমস্যা সমা-ধান, পর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন সত্ত্বেও কৃত্রিম খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টির প্রতিকার এবং অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের কাজেই তিনি এখন অধিক সময় ব্যয় করছেন। পার্লামেণ্টারী পার্টির মূল্য সংক্রান্ত সাবকমিটীর অধিবেশনে এ নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। এর পর আলোচনা হবে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে। পার্লামেণ্টারী পার্টির সাবকমিটী খাদ্য শস্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিষয়ে একমত হয়েছেন। প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে না পারলে কেবল [illegible] পথে সমস্যার সমাধান [illegible] দূরীকরণের [illegible] ছ থেকে [illegible] ও তিনি [illegible] পুনরাবৃত্তি [illegible] বলেছেন, আগামী দেড় বছরের মধ্যে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত না করতে পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন। শাস্ত্রীজীর মন্ত্রিসভা দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সাহসিকতা ও উদ্যমের পরিচয় দেবেন, এই আশাই দেশের সাধারণ মানুষ করে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ

এলাহাবাদের আনন্দ ভবনের আদরের দুলাল ঘরে ফিরে এসে-ছিলেন। দিল্লী থেকে ভস্মাধার এনে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য আনন্দ ভবন তা কোলে ধরে রেখেছিল। তারপরই সুরু হয় যাত্রার শেষ পর্যায়। আটই জুন, সকাল পৌণে ন'টা। মহাপথের মহান যাত্রীর বিদায় সম্বর্ধনায় দুর্গপ্রাকার হতে ধ্বনি ওঠে তোপের, ওপরে বিমান থেকে সুরু হয় পুষ্পবৃষ্টি। বেদনাঘন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—নেহরু অমর রহে, নেহরুজী জিন্দাবাদ।

দুই দৌহিত্র রাজীব ও সঞ্জয় ত্রিবেণীর ঘাটে পুণ্য সলিলে ভস্মাধার উজাড় করে দেয় ভারতের প্রিয় নেতার নরদেহের অস্থি ও চিতাভস্ম। কন্যা ইন্দিরা 'বাপকে' বিদায় দিয়ে ভেঙে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে। তিনিও কাঁদছিলেন। কাঁদছিলেন কৃষ্ণা হাতী সিং ও। সঙ্গমে আর যাঁরা এসে-ছিলেন তাঁরাও অনেকে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন। একদিকে অশ্রুর বন্যা অপরদিকে সামরিক ব্যাণ্ডে সুর বেজে চলেছে "এ্যাবাইড উইথ মি!" এ সুর নেহরুর অতি প্রিয়। গান্ধীজী এ সুরের ছিলেন পরম অনুরাগী।

ত্রিবেণীর এই সঙ্গমেই পিতা মতিলাল নেহরুর চিতাভস্ম দিয়ে-ছিলেন পুত্র জওহর। তারপর এখানেই বিসর্জিত হয়েছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম। জওহরের ভস্মের সাথে তাঁর মাতা স্বরূপরাণীর এবং সহধর্মিণী কমলার চিতাভস্মও বিসর্জিত হয়েছে। গঙ্গার স্রোতধারায় সুরু হয়েছে সেদিন তিনজনের অনন্তযাত্রা। পূর্ণ হয়েছে তাঁর শেষ ইচ্ছা—"এক মুঠো ভস্ম ছড়িয়ে দিও এলাহাবাদের গঙ্গায়। এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা শৈশব থেকেই আমাকে আকর্ষণ করে এসেছে। বয়স বেড়ে যাবার সাথে সাথে সে আকর্ষণ বেড়েছে আরও বেশি করে। ---গঙ্গা ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি।"

* *

লক্ষ্ণৌ শহরে শ্রীঅশোক মেহতার অনুগামী প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীদের দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের পর দলের এক হাজার সদস্য কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর সহ এগারটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে শ্রীমেহতা কংগ্রেসের ভেতরের এবং বাইরের সমাজতন্ত্রী শক্তিকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সুসংহত করবার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভুবনেশ্বরের অধিবেশনে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সমাজতান্ত্রিক কর্মধারা রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁদের

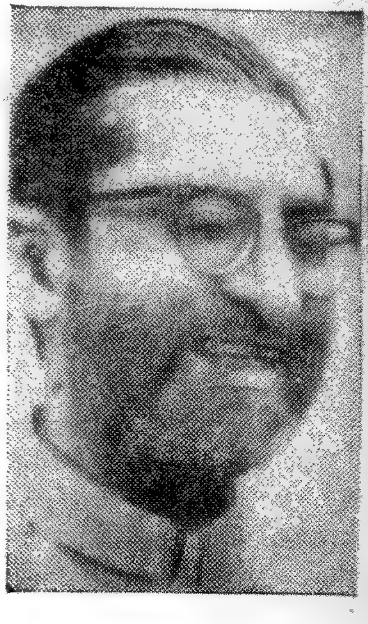

● শ্রীঅশোক মেহতা

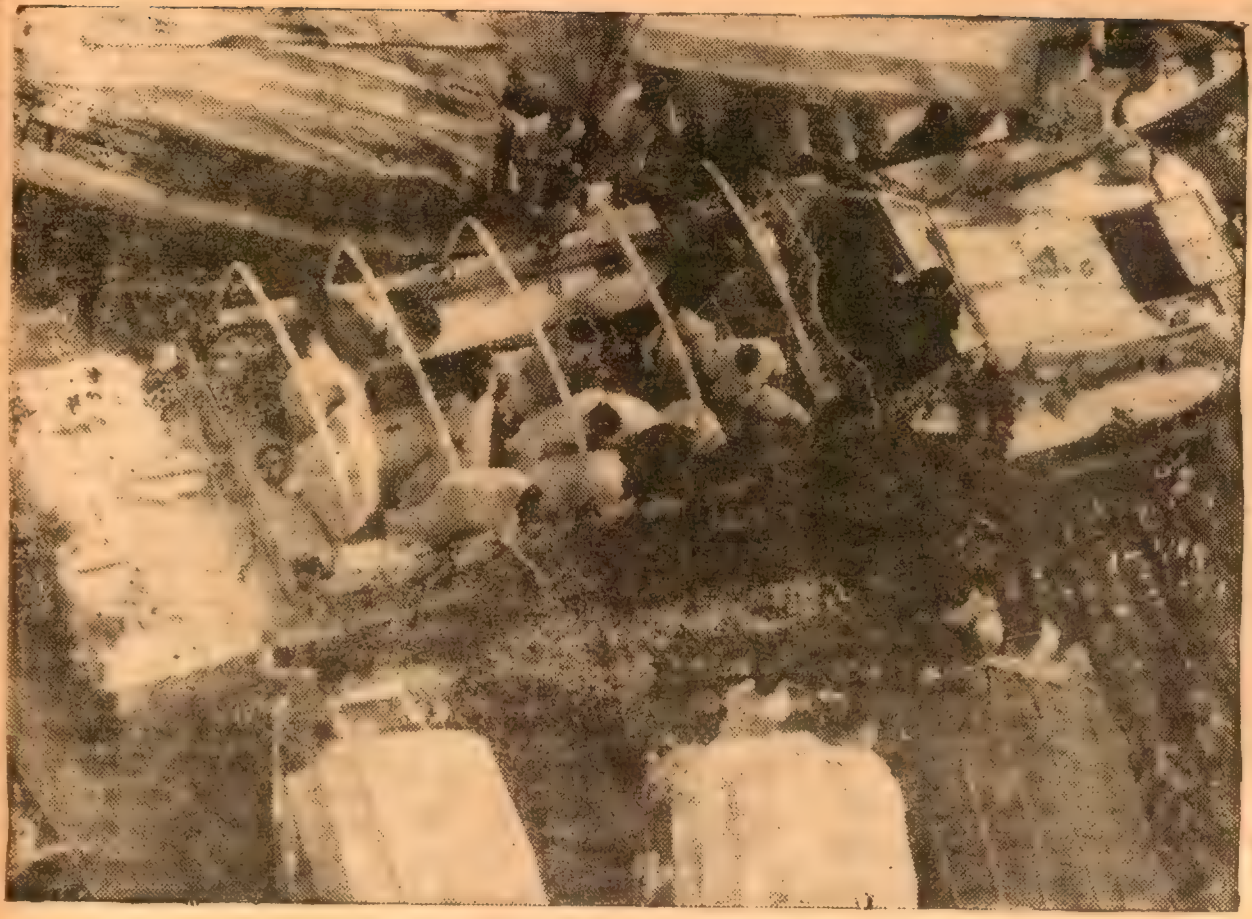

● ত্রিবেণী সঙ্গমে রাজীব ও সঞ্জয়কে স্বর্গত নেহরুর চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে দেখা যাচ্ছে।

কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তেরো মতের বারজনকে নিয়ে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব বেশিদিন রক্ষা করাও কঠিন হয়েই উঠবে। শ্রীমেহতার আহ্বান সময় উপযোগীই হয়েছে।

সম্মেলনের শেষে শ্রীঅশোক মেহতা, শ্রীগুরুপদ স্বামী এম পি, শ্রীগেন্দা সিং এম এল এ প্রমুখ ২৫ জন প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সামনেই কংগ্রেসের সদস্যপদের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। শ্রীনাদার এবং শ্রীগুলজারীলাল নন্দ তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন। মেহতাপন্থীদের আমরাও স্বাগত জানাচ্ছি।

১২ই জুন কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। জীবনের দৈন্যদশা থেকে মুক্তির আশায় দীর্ঘ দিন যাঁরা কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে ছিল—কংগ্রেসকে যারা একমাত্র ভরসার স্থল বলে দ্বিধাহীন চিত্তে বরণ করে নিয়েছিল, আজ তাদের কংগ্রেস সম্পর্কে মনে যে সংশয় জেগেছে, সেই কথাটিই শ্রীনন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন কংগ্রেসকর্মীদের সামনে। শ্রীনন্দ বলেছেন, পুঁজিপতিরা আজ কংগ্রেসে প্রভুত্ব করছেন। বর্তমান কংগ্রেসের এইটিই আসল চিত্র। একজন পুঁজিপতি তাঁকে জানিয়েছেন যে, সংসদের ৪৫ জন সদস্য তাঁর কথায় ওঠেন বসেন। তিনি আরও জানতে পেরেছেন, কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থব্যয় করা হয়েছিল।

শ্রীনন্দ বলেছেন, কংগ্রেস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে জেগেছে বিতৃষ্ণা।

মহারাষ্ট্রঃ

স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন

কথা . বা

বিবেচন

গিয়েছে

কোটি

করপো

করপোরেশন ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত মূলধন বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা করতে পারবে। সরকার যখন যেরূপ সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী করপোরেশন অত্যাবশ্যক পণ্যের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

শিল্পমন্ত্রী শ্রী এস জি বার্ভের নেতৃত্বে গঠিত কমিটীর সুপারিশ অনুসারেই স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন

● শ্রীবার্ভে

প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। করপোরেশনকে প্রথম পর্যায়ে খাদ্যশস্যের ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। পরে অপরাপর অত্যাবশ্যক সামগ্রী এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের ব্যবসাও করপোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বার্ভে কমিটী পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুপারিশ করেছেন। এতে সরকার যেমন একদিকে পণ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাবেন তেমনি অপরদিকে খুচরা বাজারে মাল বিতরণের বিরাট ঝামেলা এবং তার উপযোগী সরকারী সংগঠন গড়ে তোলার ব্যয়ভার থেকে রেহাই পাবেন।

• • •

বোম্বাই থেকে প্রায় দেড় শ' মাইল দূরে রত্নগিরি জেলার মুকুন্দ গ্রামে একটি বিমানে দু'জন বিদেশী নামবার পর উধাও হয়েছেন। এঁদের এই অভিযানের রহস্য ভেদ করে উঠতে এখনও মহারাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী পারে নি। এঁদের খুঁজে বের করার জন্য বেতারে রাজ্যের সর্বত্র সংবাদ পাঠানো হয়েছে। বিমানটি পরীক্ষা করে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ পাওয়া যায় নি। যাত্রীরাও কোনরূপ আঘাত পান নি। কিন্তু বিদেশী যাত্রী দু'জন স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে গেছেন, ইঞ্জিনের গোলযোগের জন্যই তাঁরা নামতে বাধ্য হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়ক জানিয়েছেন, বিমানটি করাচী থেকে বেইরুটের পথে যাত্রা করেছিল ৮ই জুন। বেইরুটের পথে ইরাণের কোন উপকূলে না নেমে বিদেশী রত্ন দুটি রুট পরিবর্তন করে কি করে রত্নগিরিতে এসে উড়ে পড়লেন, কেউ ভেবে পাচ্ছেন না।

• • •

দেশের বিভিন্ন অংশে যখন খাদ্যশস্যের অভাবে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে, মুনাফাশিকারীরা খেয়ালখুশিমত দাম বাড়িয়ে নিজেদের পকেট ভারী করে চলেছে তখন বোম্বাই বন্দরের বারোটি জাহাজ থেকে খাদ্যশস্য সময়মত খালাস করতে না পারার জন্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে মালবাহী বিদেশী জাহাজগুলোর জন্য। পরিবহনের অসুবিধা, গুদামের অভাব, শ্রমিকদের কাজের ঢিলে দেওয়া প্রভৃতি নানা অজুহাত তুলে ধরে কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের অযোগ্যতা ঢাকবার চেষ্টা করছেন।

সময়মত মাল খালাসের অভাবে বিদেশী জাহাজের জন্য অযথা অর্থ ব্যয় এই নতুন নয়। খুব বেশি দিনের কথা নয়, রাঁচীর ভারী শিল্প সংস্থার মালপত্র কলকাতার বন্দরে এমনি জাহাজবন্দী হয়ে পড়ে থাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের হস্তক্ষেপের পর বোম্বাই বন্দরের কর্তাব্যক্তিরা চতুর্থ বার্থটি খাদ্যশস্য খালাসের জন্য খুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কাজটি আগে কেন করা হয় নি, তা জানা যায় নি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বোম্বাই বন্দরের কর্তারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

মধ্যপ্রদেশ :

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে এবং বিষয়টিকে যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দিতে আচার্য বিনোবা ভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে না কি পরামর্শ দিয়েছেন।

ভূদান নেতা তার চিঠিতে নতুন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে চীনের

● আচার্য বিনোবা ভাবে

সাথে মীমাংসার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন, অস্ত্রসজ্জা দেশের আসল শক্তি নয়—আসল শক্তি দেশের মানুষ। বর্তমান অবস্থায় দেশের পক্ষে প্রতিরক্ষার ব্যাপক

ব্যবস্থাপনার জন্য বিপন্ন অবস্থায় করা খুবই কঠিন। দেশের দারিদ্র্য মোচন এবং অশিক্ষা দূর করাই হল এখন প্রধান কাজ। সামরিক বাহিনী গ'ড়ে তোলার কাজে অধিক অর্থ ব্যয় হতে থাকলে দেশের উন্নয়নমূলক কাজ পড়বে পিছিয়ে।

আচার্য ভাবে মনে করেন, ভারতের পক্ষ থেকে মীমাংসার প্রচেষ্টা চলতে থাকলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে চীনের ওপর চারদিক থেকে বিরাট নৈতিক চাপ আসবে। তখন আর চীনের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হবে না—মীমাংসার জন্য অগ্রণী হতে তারা বাধ্য হবে।

আচার্য ভাবের পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই। ভারতের পক্ষ থেকে বরাবরই মীমাংসার চেষ্টা চলে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর বেতার ভাষণে সেরূপ কথাই বলেছেন। আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কোন দিনই কেউ মীমাংসা করতে পারে না। কলম্বো প্রস্তাব ভারত সরকার বহু আগেই মেনে নিয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর মিলিত প্রচেষ্টাকে চীন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই দেখেছে। নৈতিক চাপে নরম হবার পাত্র চীন নয়। কাজেই প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিতে ঢিলে দেওয়া কোন দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি নে। পশুবলকে প্রতিহত করতে উপযুক্ত অস্ত্রের প্রয়োজন।

আসাম ঃ

নেহরুকে হারিয়ে আসামের উপজাতীয় সম্প্রদায় একেবারে মুষড়ে পড়েছে। নেহরু এদের কত আপনার, কত প্রিয়জন ছিলেন খাসিয়া পাহাড় একবার ঘুরে এলেই বোঝা যাবে। সুদূর গ্রামের চাষী থেকে শহরের শ্রমিক পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ আজ শোকবিহ্বল। খাসিয়াদের একজন নেতা আমাদের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "একই কথা, একই দাবী আমরা বারবার তাঁর কাছে নিবেদন করেছি। একদিনও তাঁর মুখে এই পুনরাবৃত্তির জন্য বিরক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে পাই নি। ধৈর্যের সাথে, সহানুভূতির মন নিয়ে চিরদিন তিনি আমাদের কথা শুনেছেন। আমাদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর কাছে যা পেয়েছি অন্যের কাছে তা পাব কি?"

শ্রীমোরারজী দেশাই

নেহরুর পর পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ হবে কি না, এই সন্দেহ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। নেহরু-নীতিই অনুসৃত হবে, এই ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী করবার পর থেকে তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে।

পার্বত্য এলাকার নেতারা শ্রীমোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রীর গদীতে না বসায় সন্তুষ্টই হয়েছেন। তাঁদের দাবী সম্পর্কে শ্রীদেশাই নাকি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। নেতারা মনে করেন, নেহরুর কাছে যে পরিমাণ স্নেহ, ভালবাসা ও মর্যাদা তাঁরা পেয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অতটা না পেলেও তিনি পার্বত্য উপজাতিদের দাবী সম্পর্কে সহানুভূতিশীল নিশ্চয়ই হবেন।

* * *

দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এবং খুচরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মালের অভাব আসামেও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছে। সমালোচকদের মতে, সরকারের ভ্রান্তিপূর্ণ নীতিই মূল্য বৃদ্ধির পথটিকে প্রশস্ত করেছে। রাজ্য সরকার এ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে ধান সংগ্রহের একচেটিয়া এজেন্সি দিলেও চালকল মালিক ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর নিয়ন্ত্রণের তেমন কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সরকার ধানের মূল্য নয় টাকা প্রতিমণ বেঁধে দেবার সাথে সাথেই এরা কাজ হাঁসিল করে নিয়েছে। পরে মণ প্রতি তিনটাকা মূল্য সরকার বাড়ালেও তার সুযোগ আর গরীব চাষী পায় নি। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ আগেই গুছিয়ে নিয়েছে।

আইনকে ফাঁকি দিয়ে চালকলের মালিকরা ধান গুদামজাত করছে দেখে সরকার যে ব্যবস্থা করলেন, তা' আরও হাস্যকর। অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তার অন্যায়কেই নতুন আদেশ জারী করে আইনানুগ করে ফেললেন। নতুন ব্যবস্থায় চালকলের মালিকরা শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী গুদামে তুলে দেবার সর্তে ধান সংগ্রহের লাইসেন্স পাচ্ছে।

ধানের দাম সরকার যা' ধার্য করেছেন তাতে সব রকমের খরচ ধরে চালের দাম হওয়া উচিত প্রতি মণ বাইশ টাকা। কিন্তু ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাল বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ছাব্বিশ টাকা হারে।

রাজ্য সরকারের এই ত্রুটির জন্য আসাম এখন এক শ্রেণীর

মুনাফাবাজদের লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসের একাংশ এবং আই-এন-টি-ইউ-সির নেতারাও সরকারী নীতির সমালোচনা প্রকাশ্যেই করতে বাধ্য হচ্ছেন।

রাজ্য সরকার এখনও এ বিষয়ে নির্বিকার। দাম দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, একথা অবশ্য তাঁরা অস্বীকার করছেন না; কিন্তু প্রতিকারের কোন পন্থার কথা সরকার ভাবছেন, তেমন কোন লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

গুজরাট :

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাচার ও দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন শীঘ্রগিরিই রাজ্য সরকার নিয়োগ করছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমেহদি নওয়াজ জং-এর কাছে ২৮ জন সিনেটর দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ফ্যাকালটির দুজন করে প্রতিনিধিও তাতে স্বাক্ষর করেছেন।

প্রকাশ রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী এল আর দেশাইকে এক চিঠিতে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে অনুরোধ করেছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন মাঝে মাঝে ফাঁস হওয়া, পরীক্ষার ফলাফলে জোড়াতালি দেওয়া, নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তের বছরের ইতিহাসে এই ধরণের অভিযোগ এই প্রথম।

উপাচার্যের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাওয়ার পর তদন্ত কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশনে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার এবং বিশিষ্ট কয়েকজন আইনবিদ।

নাগাভূমি :

ভারত পুরুষ নেহরুর মহাপ্রয়াণে কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় এবং পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে নাগাভূমির জনমন যখন শোকে মুহ্যমান তখনও ফিজোর অনুগামী বিদ্রোহী নাগা দলের মনে কোন পরিবর্তন আসে নি। ২রা জুন তারা আক্রমণ চালিয়েছিল ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর

● মাইকেল স্কট

ওপর। সংঘর্ষে ২০ জন ফিজোপন্থী বিদ্রোহী নিহত হয়েছে। বাকী সবাই বর্মার সীমান্তে চিন-হিলস জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে। এরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমরোপকরণ নিয়ে ফিরে আসবার পথে এই আক্রমণ চালিয়েছিল।

৫ই জুন মণিপুরের তামেংলং মহকুমার আরেকটি জঙ্গলে নাগারা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। সে সংঘর্ষেও বিদ্রোহীদের ২৩ জন নিহত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, নাগা বিদ্রোহীরা সহজে নরম হবার নয়। মাইকেল স্কট সাহেব এবং জয়প্রকাশজীকে আমরা পূর্বেই সাবধান করেছিলাম। নাগাদের পিছন থেকে যারা মদত দিচ্ছে তাদের খপ্পর থেকে সহজে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না। আপোষে শত্রুকে বাগে আনার চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই আপোষ চেষ্টার মধ্যে আদিখ্যেতা থাকলেই মুস্কিল হয়—আস্কারা পেয়ে যায় অপর পক্ষ।

মহীশূর :

থুম্বার উষ্ণ রকেট উৎক্ষেপণ ঘাঁটি থেকে ১১ই জুন দুটি স্টেট রকেট ছাড়া হয়েছে। স্টেট ডিরেক্টার ডঃ এইচ জি এস মূর্তি বলেছেন, এম-সি-এস ১৯ বেতারের কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্যই স্টেট রকেট দুটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। শীগগিরই থুম্বা থেকে আবহাওয়াজ্ঞাপক রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে। তাদের গতিপথ নির্ণীত হবে ঐ র‍্যাডারের সাহায্যেই।

স্টেট রকেট দুটি ১৯,৪০০ ফুট উর্দ্ধে উঠেছিল। আসছে বারমাসে থুম্বা থেকে প্রায় ৪০টি মহাকাশগামী রকেট ছাড়া হবে।

ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ বিক্রম সরাভাই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, থুম্বা রকেট ঘাঁটির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য মঞ্জুর হওয়ায় কানাডা ও বৃটেন সহ কয়েকটি দেশ থুম্বা ঘাঁটির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কমিটি থুম্বায় একটি মহাকাশ গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ করছেন।

আন্তর্জাতিক

• কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান (মাঝখানে), ফিলিপাইনসের বিশেষ রাষ্ট্রদূত গ্যালভেডর পি লোপেজ (ডান দিকে) এবং থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থানাট খোমান (বাঁদিকে) ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসের মধ্যে প্রস্তাবিত শীর্ষ বৈঠক সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

গত সপ্তাহে ক্যালিফোনিয়া প্রাথমিক নির্বাচনে বিরাট সাফল্য রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির চূড়ান্ত মনোনয়ন লাভে ব্যারি মরিস গোল্ডওয়াটারকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচনে গোল্ডওয়াটার তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেলসন রকফেলারকে ৫৯,০০০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। গোল্ডওয়াটার পেয়েছেন ১,০৮৯,১৩৩ ভোট, আর রকফেলার পেয়েছেন ১,০৩০,১৮০ ভোট। ক্যালিফোনিয়ার ফলাফল মার্কিন রাজনীতিক মহলে আরও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এই কারণে যে, ক্যালিফোনিয়া রকফেলারের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত, এবং রকফেলারের পক্ষে এখানে খুব ভাল প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল।

আগামী মাসে সানফ্রান্সিসকোতে রিপাবলিকান পার্টির অধিবেশনে মনোনয়নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। নির্বাচন-বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে, গোল্ডওয়াটারকে রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়ন লাভের জন্য সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৬৫৫টি ভোট পেতে হবে। গোল্ডওয়াটার ইতিমধ্যেই ৬৪৮টি ভোট সম্পর্কে নিশ্চিত

• নেলসন রকফেলার

হয়েছেন। অপর দিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রকফেলার ১৩৯, স্ক্র্যানটন ৮৬, লজ ৪৮ ও নিকসন ১২টির বেশি ভোট আশা করতে পারেন না। সুতরাং গুরুতর কোন বিপর্যয় না ঘটলে গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন লাভ একরূপ নিশ্চিত।

গোল্ডওয়াটারের পক্ষে এভাবে সমর্থন আসার কারণ, রিপাবলিকান দলের সাধারণ কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় এবার নির্বাচনে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সমর্থন করেছেন গোল্ডওয়াটারকে। দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ কর্মীদের এ এক ধরণের বিদ্রোহ।

গোল্ডওয়াটার সম্পর্কে খুব অদ্ভুত সব কথা শোনা যাচ্ছে। চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি গোঁড়া রক্ষণশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কখনও এতটা রক্ষণশীল কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী হন নি। গোল্ডওয়াটারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য

মত হল : (১) রাষ্ট্রসংঘের কোন প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে গোল্ডওয়াটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসংঘ থেকে বের করে আনবেন এবং রাষ্ট্রসংঘকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করাবেন। (সম্প্রতি অবশ্য মত পাল্টে গোল্ডওয়াটার বলেছেন যে, না, একেবারে বাতিল নয়, রাষ্ট্রসংঘের সংশোধনের জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।) (২) সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। (অতি-সম্প্রতি এ-বিষয়েও তিনি বলেছেন, একেবারে স্বীকৃতি অস্বীকারের প্রয়োজন নেই, তবে এই হুমকী দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে হবে।) (৩) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে গোল্ডওয়াটার ডালেসের নীতির সমর্থক। প্রয়োজনমত আণবিক অস্ত্র ব্যবহারও তিনি করতে চান। (৪) দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিস্ট প্রাধান্য বিলোপের জন্য, বিশেষ করে চীনা অংশগ্রহণ বন্ধ করার জন্য তিনি এখনই আণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের পক্ষপাতী। (৫) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগে বিশ্বাসী। (৬) নাগরিক অধিকার বিলে প্রদত্ত নিগ্রোদের অধিকাংশ অধিকারের তিনি বিরোধী।

আজকের দিনে এ রকম মতবাদে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের অন্যতম রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশের আস্থাভাজন হতে পারেন, এটাই আশ্চর্য। লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা যথার্থই মন্তব্য করেছে : "বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অদ্ভুত মতবাদে বিশ্বাসী, জাতীয় রাজনীতির বিষয়ে একেবারে পশ্চাদগামী ও চিন্তাধারার দিক থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ এরূপ একজন লোককে দেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দল সমর্থন করছে, এতে করে বিশ্বের অন্যত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হবে।"

• জয়লাভের আনন্দে গোল্ডওয়াটার

বৃটিশ গায়না :

সাইপ্রাসের মতই গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বৃটিশ গায়না। এবং এখানেও বিভেদকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত ছেদী জগানের সরকার অবিলম্বে বৃটিশ শাসনের অবসান দাবী করছে। কিন্তু বৃটেন এখান থেকে যেতে চায় না। আখের থেকে অনেক পয়সা আসে ইংরেজ মালিকদের।

পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টির নেতা মার্ক্সবাদী মনোভাবাপন্ন ছেদী জগান নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে স্বাধীনতার দাবী আরও জোরদার হয়েছে। তাই এই দাবীকে বানচাল করার জন্য ইংরেজ এখানকার প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাধিয়ে দিয়েছে। শতকরা ৬২ জন পূর্ব ভারতীয়ের বিরুদ্ধে শতকরা ৩৮ জন নিগ্রোকে ইংরেজ দাঙ্গার উস্কানি দিচ্ছে।

একটি আখের ইউনিয়নের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ক'মাস ধরে বৃটিশ গায়নায় পূর্ব ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়ে গেছে, তাতে বহু মানুষ নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যাও অনেক, ঘর-বাড়ি জ্বলেছে, এবং নারী ও শিশু নিগৃহীত হয়েছে।

গত সপ্তাহে ছেদী জগানের মার্কিন স্ত্রী জ্যানেট জগান তাঁর স্বামীর মন্ত্রিসভা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পুলিশ বাহিনীর ওপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই। নিগ্রো-প্রধান পুলিশ বাহিনী ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ও তাঁর নিযুক্ত পুলিশ কমিশনার পিটার আওয়েনের নির্দেশে চলে, এবং পূর্ব ভারতীয়দের ওপর অত্যাচারের সময় চুপ করে থাকে। পুলিশ কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে জ্যানেটের বিবৃতির প্রতিবাদ করলেও, এই অভিযোগ যে অনেকখানি সত্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিগ্রো ও পূর্ব ভারতীয়দের মধ্যে

বিভেদ বজায় রেখে বৃটিশ গায়নার স্বাধীনতা অর্জনকে পিছিয়ে দেয়াই হল ইংরেজদের উদ্দেশ্য, প্রধানমন্ত্রী ছেদী জগান বেশ ভালভাবেই এ কথা বুঝতে পেরেছেন। তাই সংখ্যাগুরু পূর্ব ভারতীয়দের নেতা ছেদী জগান প্রস্তাব করেছেন, সংখ্যালঘু নিগ্রোদের নেতা বার্নহামের সঙ্গে তিনি কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন। কোয়ালিশন সরকার গঠনের দ্বারা তিনি দেশের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাতে পারবেন এবং ইংরেজদের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার দাবীও রাখতে পারবেন।

লাওস ঃ

লাওসের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপক্ষীয় সরকারের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। গত এপ্রিল মাসে দক্ষিণপন্থী সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে, কমিউনিস্ট-

● সুভান্না ফুমা

ঘেঁষা প্যাথেট লাও প্রিন্স সুভান্না ফুমার নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখছে না। প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুভানো ভং স্পষ্টই বলেছেন, নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভান্না ফুমা এখন দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতা কৌপ্রশিথ ও সিহোর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন, সুতরাং সুভান্না ফুমাকে তাঁরা আর প্রধানমন্ত্রী বলে মানেন না, এবং তাঁর সরকারকেও জাতীয় সরকার বলে স্বীকার করেন না।

প্যাথেট লাও বাহিনী নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য জার্স প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু করেছে, এবং লাওসের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ এখন প্যাথেট লাও বাহিনীর দখলে। প্যাথেট লাও বাহিনীর সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনাম, এমন কি চীনের সৈন্যও 'স্বেচ্ছাসেবক'রূপে আছে—এমন অভিযোগ শোনা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লাওসের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষপাতী এবং এই কারণেই এপ্রিলের দক্ষিণপন্থী সামরিক বিদ্রোহকে তারা সমর্থন করে নি। কিন্তু প্যাথেট লাও বাহিনীর অগ্রগতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমত চিন্তিত। পররাষ্ট্র-সচিব ডিন রাস্ক এই ব্যাপারে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু কেউ এতে কর্ণপাত করে নি। হনলুলুতে মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডিন রাস্ক, প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামরা, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ প্রভৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ইতিমধ্যে, প্রিন্স সুভান্না ফুমার সরকারের অনুমতিক্রমে মার্কিন টহলদারী বিমান লাওসের ওপর ওড়া শুরু করেছে। কিন্তু গত ১২ই জুন থেকে এই টহলদারী বিমানের মহড়াও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অবিলম্বে লাওসের তিন পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা না হলে একদিকে প্যাথেট লাও আর অপরদিকে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় নিরপেক্ষতাবাদীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে। অন্যান্য রাষ্ট্রকেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাওসের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে।

লাওস সঙ্কট মীমাংসার জন্য পোল্যাণ্ড প্রস্তাব করেছে, জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম চেয়ারম্যান বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, লাওস সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্য ভারত, পোল্যাণ্ড ও ক্যানাডা এবং লাওসের তিন পক্ষ অবিলম্বে এক সম্মেলনে মিলিত হোক। ফ্রান্স ও চীনের এই প্রস্তাব পছন্দ হয় নি। এরূপ সম্মেলনে চীনের উপস্থিত হবার সুযোগ নেই। আর, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর বিরোধী ও চীনের নতুন সমর্থক ফ্রান্সেরও ইচ্ছা, লাওস সংক্রান্ত সম্মেলনে চীন যোগ দিক। তাই ফ্রান্স ও চীন প্রস্তাব করেছে, জেনেভা সম্মেলনে যোগদানকারী ১৪টি দেশকেই সম্মেলনে ডাকা হোক। ভারত মোটামুটি দুই প্রস্তাবেরই সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও চীনের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। পোল্যাণ্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী ৬ রাষ্ট্রের সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি আছে।

দক্ষিণ কোরিয়া ঃ

গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে ত্রিশ হাজার ছাত্র রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্কের পদত্যাগ দাবী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সিওলের রাজপথে জঙ্গী ছাত্র বিক্ষোভ কোন নতুন ঘটনা নয়। বহুবার ছাত্র-পুলিশে রক্তারক্তি সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু এবারের বিক্ষোভ যেন আরও প্রচণ্ড।

পথের পুলিশকে হটিয়ে সৈন্য বাহিনীর ট্রাক সামনে রেখে ত্রিশ হাজার ছাত্র বিজয়ীর মত ন্যাশনাল এসেম্বলীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীকে কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি পার্ক জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সমগ্র রাষ্ট্রে সামরিক আইন জারী করেছেন, সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ১২০০ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রেখেছেন। তবু পার্কের পক্ষে এই বিক্ষোভ দমন করা সম্ভব হবে না। কারণ ছাত্রদের ধ্বনি ছিল, "আমরা ক্ষুধার্ত। পার্ক সরকার খেতে দিতে পারছে না। পার্ক সরকারের পতন চাই।" এ দাবী কেবল ছাত্রদের নয়, এর পেছনে বৃহত্তর জনসমষ্টির সমর্থন আছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকান পার্টিও ছাত্র বিক্ষোভের পেছনে আছে শোনা যাচ্ছে।

১৯৬১ সালে ক্ষমতা দখলের পর থেকে আজ পর্যন্ত চুং হি পার্ক দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কিছুই করতে পারেন নি। মুদ্রাস্ফীতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে গিয়েও তিনি দেশবাসীর বিরাগের কারণ হয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষ পার্ক সরকারের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

১৯৬০ সালে একদিন ছাত্র বিক্ষোভের ফলেই সিংম্যান রী'র পতন

• চুং হি পার্ক

হয়েছিল। আবার একই ভাবে ছাত্রদের হাতেই চুং হি পার্কের কর্তৃত্বের অবসান হবে কিনা কে জানে!

মালয়েশিয়া ঃ

ফিলিপাইনসের বিশেষ প্রতিনিধি স্যালভেডর পি লোপেজ টোকিওতে আশা প্রকাশ করেছেন, এবার হয়তো ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া বিরোধের নিষ্পত্তি হবে। লোপেজ টোকিওতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এই মন্তব্য করেছেন। ১৫ই জুন টোকিওতে মালয়েশিয়া সম্পর্কে যে শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে সে সম্পর্কে লোপেজ বিশেষ আশাবাদী।

মালয়েশিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রজ্জকের নেতৃত্বে মালয়েশিয়া প্রতিনিধিদল এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ১২ই জুন কুয়ালালামপুর থেকে রওনা হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান পরে যাবেন। ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ম্যাকাপাগলও এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন, মালয়েশিয়া-বোর্নিও থেকে ইন্দোনেশিয়ার

ঐতিহ্যে ও উৎকর্ষে

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে ঃ 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিক্যুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা
স্পেশাল
ফাউণ্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৫০ ও ৭০০ এম এল সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক ঃ সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PROISW-17

সৈন্যদলের অপসারণ। এই বিষয়ে যতক্ষণ না কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ মূল সমস্যার কোন সমাধানই হবে না। জাপান ও ফিলিপাইনস এ-বিষয়ে সোয়েকার্নোকে কতটা রাজি করাতে পারবেন তার ওপরেই শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা:

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ৮ জনকে গত ১২ই জুন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন অধুনা-বেআইনী আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেলসন ম্যাণ্ডেলা, আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ওয়াল্টার সিস্নু, রেমন মাহলবা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ইলিয়াস মোটোসোলেডি, সাংবাদিক গোভেন মিবিকি ও এনড্রু মিলাঙ্গেনি। এঁরা সবাই আফ্রিকীয়। আর দু'জনের মধ্যে একজন হলেন ইউরোপীয়—অধুনা-লুপ্ত 'কংগ্রেস অব্ ডেমোক্রাটসের' নেতা ডেনিস গোল্ডবার্গ, এবং অপরজন ভারতীয়—ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল আহমেদ কাথরাডা। এঁদের সকলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, এঁরা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কারও কারও বিরুদ্ধে কমিউনিজম প্রচারের অভিযোগও আছে।

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য লণ্ডনে ৪৫ জন এম-পি কমন্স সভা থেকে বেরিয়ে মিছিল করে দক্ষিণ আফ্রিকা হাউসের সম্মুখে গিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

ইতিপূর্বে বর্ণবৈষম্য আইনে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৪ জন নেতাকে যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও ব্রেজিল প্রস্তাব গ্রহণের সময় অনুপস্থিত ছিল। সূক্ষ্ম আইনের অজুহাত তুলে এরা এই প্রস্তাবের প্রতি অসমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু আইনের চেয়ে মানবিকতা অনেক বড়, এ কথা এরা ভুললেও ইতিহাস ভুলবে না।

সাইপ্রাস:

সাইপ্রাসের তুর্কী সংখ্যালঘুদের রক্ষার দাবীতে তুরস্ক এখন সক্রিয় কিছু করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। ইস্কেন-দেরানে তুরস্ক সৈন্য সমাবেশ করেছে, উপকূল থেকে দূরে সাইপ্রাস অভিমুখে টহলদারী জাহাজ পাঠিয়েছে, এবং আঙ্কারার জনসভায় সাইপ্রাস সরকারের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতার আয়োজন করেছে। এর ফলে সর্বত্র রীতিমত সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। ম্যাকারিয়স ত্রিশ হাজার গ্রীক হোম-গার্ডকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। রাষ্ট্রসংঘের কর্তারা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ সুরু করেছেন। 'ন্যাটোর' সুপ্রীম কম্যাণ্ডার লিম্যান লেমনিটজার আঙ্কারায় ছুটে গিয়েছেন। এমন কি মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন পর্যন্ত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনুকে সংযত আচরণের জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন। জনসন ইনোনুকে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন আসতেও অনুরোধ করেছেন। ইনোনু "কাজের চাপে" বর্তমানে ওয়াশিংটন যেতে পারবেন না বলে জানালেও, সাইপ্রাসের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সংযত হয়ে চলবেন বলে মনে হচ্ছে।

সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অধিনায়ক ভারতীয় জেনারেল পি এস জ্ঞানী'র ৩ মাসের কার্যকাল এই মাসে শেষ হচ্ছে। জেনারেল জ্ঞানীর শূন্যপদে যোগ দেবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল কে এস থিমায়াকে অনুরোধ করেছেন।

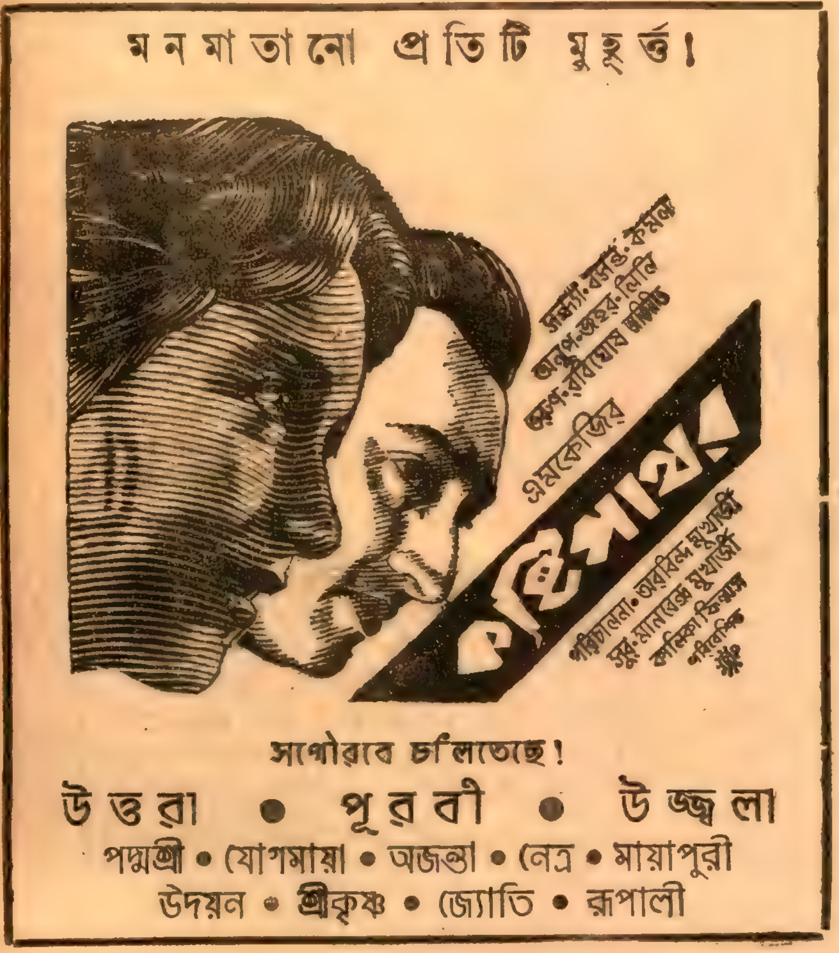

[illegible]

শ্রীপদাতিক

॥ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের বিবিধকালের চিত্র ॥

যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে রূপায়ণ ঘটেছে আধুনিক কলকাতার, দ্বাদশ শতকে তার তৎকালীন স্বরূপের সংস্থাপন ছিল কোন্ পরিবেশে—আজ তা সঠিকভাবে অবহিত হওয়ার কোন উপায় নেই। সেকালের বিক্ষিপ্ত লিপিতে তার কোনো নিখুঁত চিত্রাঙ্কন যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনই একালের যাঁরা নিগূঢ় অনুসন্ধিৎসার বন্ধুর পথে অক্লান্ত পদাতিক—তাঁরাও তার তৎকালীন প্রকৃতির নির্ভেজাল বিবরণ দানে অব্যর্থ নন। তবে স্মৃতি এবং শ্রুতির সংসক্ত লাস্যে, যুগে যুগে প্রচলন ঘটেছে যে-কাহিনী বা কিংবদন্তীর—তারই সূত্র ধ'রে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর জন-কয়েক পুরাতত্ত্ববিদ দ্বাদশ শতকের যে-অস্পষ্ট ছবি আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন—তা থেকেই অনুমান করা যায়: তখন 'কালীক্ষেত্র' নামে এক তান্ত্রিক-বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান কলকাতার মূল ভূমিখণ্ড। একাদশ শতাব্দীর নিবিড় অরণ্যের উপকণ্ঠে যে-বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমির অবস্থান ছিল, দ্বাদশ শতকের কোনো এক তন্ত্রসাধক সেখানেই প্রতিষ্ঠা করে শ্মশানেশ্বরী চামুণ্ডা। তারপর এই চামুণ্ডার ভয়ঙ্কর বিগ্রহকেই কেন্দ্র ক'রে তান্ত্রিক সমাজের যে-সাধনপীঠ গ'ড়ে ওঠে—পরে তা নাম ধারণ করে 'কালীক্ষেত্র।'

দিনে দিনে, সেই সমগ্র কালীক্ষেত্রে এক ভয়ার্ত পরিবেশ রচনা করে তান্ত্রিক সমাজ। একদিকে নিঃসঙ্গ ভাগীরথী, তিনদিকে অরণ্য; আর মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর কালীক্ষেত্র যেন স্বয়ং যমালয়। কোথাও কোনো শব্দ নেই; ভয়াবহ নিস্তব্ধতার বুকে উলঙ্গিনী চামুণ্ডা এক মৌন সর্বনাশ • তার চারপাশ ঘিরে শবাসীন তান্ত্রিকের দল যেন এক-একটা পিশাচ অথবা যমদূত! বিবস্ত্র বিশাল দেহ; শ্মশ্রুলাঞ্ছিত কর্কশ মুখমণ্ডল; রক্তবর্ণ চোখ হিংস্রতায় কুটিল, কুৎসিত এবং পৈশাচিক। তাদেরই 'ওঁ হ্রীং'—মন্ত্রের আকস্মিক ধ্বনিতে মাঝে মাঝে ধ্যান ভাঙে নিস্তব্ধতার, সন্ত্রস্ত শিহরণ জাগে অরণ্যে, প্রান্তরে এবং দোসরহীনা ভাগীরথীর বুকে।

প্রায়ই নরবলির আয়োজন হয় চামুণ্ডার মন্দিরে। বলির জন্য দূর লোকালয় থেকে নরসন্তান সংগ্রহ ক'রে আনে তান্ত্রিকের দল। সম্ভবত তাদের অব্যাহত উপদ্রবের ফলেই লোকালয় স'রে যায় দূর থেকে আরও দূরে। কালীক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী চারণভূমি থেকেও গরুর পাল নিয়ে অনেক দূরে স'রে যায় রাখাল বালকেরা। এমনকি, শ্মশানযাত্রীরাও তাদের শ্মশান নির্বাচন করে অন্যত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও নরবলির যতি পড়ে না চামুণ্ডার মন্দিরে। কারণ তান্ত্রিকেরা কৌশল জানে বিচিত্র। ছদ্মবেশে তারা ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে আরও দূরের লোকালয়ে। তারপর তথাকথিত বশীকরণ মন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কৌশলের বীতংস পেতেই হোক, তারা সহজেই আকর্ষণ করে লোকালয়ের স্বাস্থ্যবান নর-নারীদের। তাদের প্রতি আসক্ত অথবা তন্ত্র-মন্ত্রে বশীভূত এই নর-নারীদের নিয়ে তারা রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে কালীক্ষেত্রে। তারপর যথারীতি তাদের বলিদানের ব্যবস্থাও করে চামুণ্ডার মন্দিরে।

প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ, অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত উক্ত কালীক্ষেত্রের অস্তিত্ব

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

ছিল শোনা যায়। তান্ত্রিক সমাজের প্রতাপও ছিল অক্ষুণ্ণ। তবে নরবলির প্রচলন বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসে তখন। মাঝে-মধ্যে নরবলির আয়োজন অবশ্যই হতো, কিন্তু খুব একটা নির্বিঘ্নে হওয়ার উপায় ছিল না। কারণ জনসাধারণ তখন বিশেষভাবেই সচেতন। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর উদ্বোধন পর্বেই নাকি এমন এক নরবলিকে কেন্দ্র করে সেই বহুশ্রুত ঘটনাটির উৎপত্তি হয়। ঘটনাটি আজ ইতিহাসগ্রাহ্য না হলেও, শ্রুতির গ্রাহ্যে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং খানিকটা মর্মান্তিকও বটে। ঘটনাটি এই :

কালীক্ষেত্রের জনৈক তান্ত্রিক, একদিন পদ্মা নামে এক মধ্যবয়সী নারীর একমাত্র পুত্রকে এনে বলি দেয় চামুণ্ডার মন্দিরে। খবর পেয়ে প্রায় উন্মাদিনীর মতোই কালীক্ষেত্রে ছুটে আসে পদ্মা। তারপর চামুণ্ডার মন্দিরদ্বারে বার বার মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বলতে থাকে :

"মাগো, তুই যদি সত্যিই মা হয়ে থাকিস, আমার সন্তানকে তুই ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে।"

কিন্তু কে ফিরিয়ে দেবে তার সন্তানকে? উলঙ্গিনী চামুণ্ডার নিথর বিগ্রহ নির্বিকার। পদ্মার মর্মভেদী বিলাপের প্রতি-উত্তর স্বরূপ ভেসে আসে একাধিক তান্ত্রিকের বিকট অট্টহাসি। এই মিলিত অট্টহাসির প্রচণ্ড শব্দেই বার-কয়েক শিউরে ওঠে পদ্মা। তারপর সেখানেই সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে হঠাৎ।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফেরে পদ্মার, তখন সে বুঝতে পারে : ভাগীরথী তীরের এক নিভৃত কুঁড়েঘরে কোনো এক তান্ত্রিকের কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। পদ্মা মধ্যবয়সী হলেও, দেহে তার যৌবনের প্রসাদ অবশিষ্ট রয়েছে তখনো। সম্ভবত তাতেই মজেছে সেই তান্ত্রিক। পদ্মা বুঝতে পারে সবই। কিন্তু সব বুঝেও, সেদিন কী ভেবে সেই তান্ত্রিকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে পদ্মা।

তারপর থেকেই পদ্মা একজন সেবাদাসী বা সহচরী রূপে বসবাস করতে থাকে তান্ত্রিকের সঙ্গে। পদ্মার যৌবনখচিত দেহ-বল্লরীর মোহেই দিনে দিনে সেই তান্ত্রিক তার তন্ত্রসাধনা থেকে স'রে আসে দূরে। সুযোগ বুঝেই পদ্মা তাকে আকর্ষণ করার প্রয়াস পায় আরও বেশি। তারপর এভাবেই একদিন তান্ত্রিককে সঙ্গে নিয়ে কালীক্ষেত্র ছেড়ে অনেক দূরের কোনো লোকালয়ে স'রে যায় পদ্মা। সেখানে দিন-কয়েক বসবাস করার পর আরও দূরের এক প্রতাপশালী ভূ-স্বামীর গৃহে এসে তারা উপস্থিত হয়। ভূ-স্বামীর সম্মুখবর্তিনী হয়েই পদ্মা বলে :

তারা শাক্ত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌড়ে যেতে চায়। ভূ-স্বামী অনুগ্রহ ক'রে তাদের গৌড়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।

উক্ত ভূ-স্বামী ছিলেন ধর্মভীরু। সম্ভবত ধর্মের খাতিরেই তিনি তাদের উভয়কে গৌড়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন উপযুক্ত যানবাহনের মাধ্যমে।

প্রায় সপ্তাহ-দুয়েক পর, পদ্মা তার পার্শ্বচর তান্ত্রিককে নিয়ে গৌড়ে আসে ভূ-স্বামীর ব্যবস্থাপনায়। গৌড়ে এসেই তারা উভয়ে উপস্থিত হয় গৌড়-বাদশাহ-এর দরবারে। এতদিন ছল বা চাতুরীর আড়ালে তার যে-প্রকৃত স্বরূপকে গোপন ক'রে রেখেছিল পদ্মা, এবার গৌড়-বাদশাহ-এর দরবারে দাঁড়িয়েই তা সে উদ্‌ঘাটন করে অকস্মাৎ। সজল নেত্রে সে বাদশাহ-সমীপে নালিশ পেশ করে কালীক্ষেত্রের তান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে। সেই নির্দয় তান্ত্রিকের দল দিনের পর দিন কী-ভাবে হত্যা করছে অসহায় নর-নারীদের এবং কী-ভাবে তার একমাত্র পুত্রের রক্তে রঞ্জিত করেছে চামুণ্ডার বেদী—তা সে ভগ্নকণ্ঠে অতি করুণভাবে বর্ণনা করে একে একে।

পদ্মার এই বর্ণনা শুনেই নাকি অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন গৌড়ের বৃদ্ধ বাদশাহ। তিনি তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করেন পদ্মার পার্শ্বচর তান্ত্রিককে। তারপর নরসিংহ নামক একজন সেনানায়কের অধীনে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন কালীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে।

বাদশাহ প্রেরিত সেনাবাহিনী যখন কালীক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়, তখন কী-ভাবে হঠাৎ খবর পায় তান্ত্রিকের দল। তারা জানে :

নরসিংহ হিন্দু হলেও, তাঁর সেনাবাহিনীর প্রত্যেকেই মুসলিম। তাই তারা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কল্প নেয় : মুসলিম সেনাবাহিনীর পদার্পণে তারা কিছুতেই বিনষ্ট হতে দেবে না চামুণ্ডা মাতার শুচিতা।---সুতরাং তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কারণ পান করে প্রচুর। তারপর মন্দির থেকে চামুণ্ডার বিগ্রহকে বের করে তারা এক পানশীর সাহায্যে ভেসে আসে মাঝ গঙ্গায়। সেখানে চামুণ্ডাকেই প্রথম বিসর্জন দিয়ে, একে একে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গাবক্ষেই নিরঞ্জন ঘটায় নিজেদের।

সেনাবাহিনী কালীক্ষেত্রে পৌঁছেই দেখে : সমগ্র কালীক্ষেত্র শূন্য এবং মন্দিরও বিগ্রহহীন। তবু তারা সেখানেই ছাউনি ফেলে। কালীক্ষেত্রে আবার কোনো সংস্কারবাদী তান্ত্রিক দলের আবির্ভাব যাতে না ঘটে—সেজন্য সেনানায়ক নরসিংহ তাঁর সেনাবাহিনীর কিছু অংশকে কালীক্ষেত্রেই রেখে, মাস-কয়েক পর ফিরে যান গৌড়ে।

তারপর কালীক্ষেত্রে অবস্থানকারী সেই সেনানীরাই ক্রমে নিজ নিজ বসতি গড়ে তোলে সেখানে। সম্ভবত তাদের আকর্ষণেই দূর লোকালয়ের কৃষিজীবী মুসলিম সমাজও এসে বসতি স্থাপন করে কালীক্ষেত্রে। মুসলিম ধর্মের সঙ্গে হিন্দু শাক্ত ধর্মের কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও, কালীক্ষেত্রের এই নবাগত মুসলিম সমাজ বিশ্বাস করে :

অন্যমন্ত্র নিশ্চয়ই কোনো ভৌতিক ব্যাপার। সেই চামুণ্ডা বা তান্ত্রিকদের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও, তাদের অশরীরী প্রেতাত্মারা নিশ্চয়ই এখানে আছে—যারা অনায়াসেই ক্ষতি সাধন করতে পারে তাদের। তবে কালী-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যদি বনবনানির অন্তরালে আত্মগোপন করে, তাহলে সেই প্রেতাত্মাদের পক্ষে আর কিছুতেই সেখানে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। তারা পালিয়ে যাবে।

সুতরাং এই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই, সেই নবাগত মুসলিম সমাজ দূর লোকালয়ের আরও স্বধর্মীকে ডেকে এনে বসতি স্থাপন করায় সেখানে। তারপর কিছুসংখ্যক মুসলিম কালী-ক্ষেত্রের এক বিশেষ অংশে নিয়মিত পশুহত্যা করার ব্যবস্থা ক'রে এবং জনসাধারণের কাছে তার মাংস বিক্রি করার মাধ্যমে জীবন ধারণের জন্য গ্রহণ করে এক নতুন জীবিকা। যারা এই জীবিকা গ্রহণ করলো, সাধারণ লোকের কাছে তারা পরিচিত হলো 'কসাই' নামে। তাই কালীক্ষেত্রের সেই বিশেষ অংশেরও নামকরণ হলো 'কসাইখানা'। শোনা যায় : এই কসাইখানাই তার পরবর্তী সংস্করণে নাম ধারণ করে 'কসাইটোলা।'

তারপর কালীক্ষেত্র বা কসাইটোলার বুক বেয়ে দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রান্ত হয় চতুর্দশ শতাব্দী। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কসাইটোলা অঞ্চলেই আবির্ভাব ঘটে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের। তাদের আচরণে কোনো বিরোধ ছিল না। নিবিরোধ সমাজ তাদের আপন বসতির বিন্যাস ঘটায় মুসলিম বাসিন্দাদের পাশাপাশি। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই একটি বুদ্ধ মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা ঘটে কসাইটোলার উত্তর-পূর্ব কোণের ভূ-খণ্ডে। শোনা যায় : সেই মন্দিরে নাকি তথাগত বুদ্ধের বিগ্রহটি ছিল সোনার—যা পরে অপহরণ করেছিল কোনো এক পর্তুগীজ তস্কর।

পঞ্চদশ শতাব্দীরই শেষভাগে হুগলী জেলার আরামবাগ এবং মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চল থেকে উল্লেখিত কালীক্ষেত্রেই এসে বসতি স্থাপন করে কিছুসংখ্যক জেলে—যাদের আরাধ্য দেবতা কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুর। দিনে দিনে এই জেলে সমাজের বংশ বৃদ্ধি ঘটায় একদিকে যেমন বিস্তার লাভ করে তাদের বসতি, তেমনই অন্যদিকে তাদের ধর্মঠাকুরেরও পূজার প্রচলন ঘটে ব্যাপকভাবে। অবশ্য তা সত্ত্বেও, সম্প্রদায়গত দিক থেকে তাদের প্রভাব তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি সে-অঞ্চলে।

জেলে সমাজেরই সমসাময়িক ছিল দক্ষিণ দেশের একদল আদিবাসী। তাদেরও একটি বিক্ষিপ্ত বস্তি গড়ে ওঠে কালীক্ষেত্রের উত্তর ভূ-খণ্ডে এবং ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে তাদের পাশেই এসে বসতি স্থাপন করে কিছু-সংখ্যক পর্তুগীজ। তারপর দেখতে দেখতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ এবং পর্তুগীজ খৃষ্টান মিলে সাধারণ মানুষের একটি বৃহৎ সমাজ গড়ে ওঠে কালী-ক্ষেত্রে। তবে এই মিশ্রিত সমাজের অস্তিত্ব সেখানে কতকাল ছিল—আজ তার সঠিক বিবরণ কো'ও খুঁজে পাবার উপায় নেই।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কালীক্ষেত্র বা কসাইটোলার পরিবেশ-গত চিত্রের বিবরণ কোথাও নেই। ইতিহাস তো দূরের কথা, কাহিনী বা কিংবদন্তীর সূত্রেও সে-চিত্রের কোনো সংকেত পাওয়া দুষ্কর। তবে এই একশ' বৎসরের মধ্যে কালীক্ষেত্র বা কসাইটোলা অঞ্চলে যে বিরাট একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বের ইতিহাস লক্ষ্য ক'রে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বই জব চার্নকের আমল। তখন কালীক্ষেত্র বা কসাইটোলা জঙ্গলাকীর্ণ। এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বস্তি বা বসতির অস্তিত্ব থাকলেও, আগের মতো কোনো শ্রী বা সংগতি নেই কোথাও। কালীক্ষেত্রের সেই বিশেষ অংশে উল্লেখিত কসাইখানা বা কসাইটোলা তখনো রয়েছে এবং তখনো সেখানে গো-মাংসের ব্যবসা চলছে অব্যাহত। কিন্তু প্রতাপ তার পূর্বদিনের তুলনায় অনেক স্তিমিত। এই কসাইখানা বা কসাইটোলার পাশ ঘেঁষেই সে-সংকীর্ণ পথটির বিস্তার ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে—তাও তখন আগাছাকীর্ণ এবং সর্পিল। অথচ সে-পথ বেয়েই উত্তর থেকে দক্ষিণের কালীঘাটে তখনো যাতায়াত করেন হিন্দু তীর্থ-যাত্রীরা। হয়তো সে-কারণেই পথটি তখন তীর্থযাত্রীর পথ বলেই অভিহিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজরা কসাইটোলা অঞ্চল এবং তার পার্শ্ববর্তী সেই পথের সংস্কার সাধন করেন খানিকটা। তারপর সেখানেই একটি গীর্জা নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করেন। কিন্তু কসাইটোলার সম্মিলিত জনসমাজের দৃঢ় প্রতিবাদে সে-পরিকল্পনা তাঁরা বাতিল করতে

বাধ্য হন। অবশ্য তারপরেও তাঁরা গীর্জা নির্মাণ করেন ঠিকই, কিন্তু কসাইটোলায় নয়। গীর্জা নির্মাণ করেন তাঁরা কসাইটোলা থেকে দূরে—তাঁদের তথাকথিত দুর্গের পূর্ব সীমান্তে। এ-সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রী এ কে রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

"The Hindu Kalikshetra of the twelfth century which had an area of two square miles or 1,280 acres only, had developed by subsequent accretion into British Calcutta at the end of 17th century with an area of 1,692 acres of which 216 only were urban and 1,476 sub-urban. The "immemorial pilgrim road" had, in that portion of it which bounded the British settlement come to be designated as the Broad Street, and the proposal of building the first Christian Church on a piece of open ground, situated by the side of that street was met with such opposition from the inhabitants that it had to be abandoned, and the Church was therefore built immediately opposite the east curtain of the fort."

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে খানিকটা সংস্কার সাধিত হলেও তারপর থেকে আবার চরমতম উপেক্ষাই প্রাধান্য লাভ করে কসাইটোলায়। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে, অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দেও কসাইটোলার যে-চিত্র পাওয়া যায়—তা বেশ জঙ্গলাকীর্ণ এবং বিশেষভাবেই সংস্কারবর্জিত। এমন কি, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও কসাইটোলার রাস্তাঘাট সামান্য বৃষ্টিতেই এমন কর্দমাক্ত হতো যে, পায়ে-হাঁটা মানুষ থেকে বিভিন্ন যানবাহনের পক্ষেও সে-সমস্ত রাস্তাঘাট অতিক্রম করা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। তবু এমন অবস্থার মধ্যেও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সেখানেই প্রতিষ্ঠা পায় Mackinnon's school, তারপর দেখতে দেখতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দেই মাথা তুলে দাঁড়ায় দু'তিনটে অট্টালিকা এবং আত্মপ্রকাশ করে দু'একটি সৌখীন দোকানপাট ও হোটেল। এ-সম্বন্ধে "The Good Old Days of John Company" নামক গ্রন্থে W. H. Carey বর্ণনা করেছেন :

"Cossaitollah street, leading from Dharrumtollah into old Calcutta, was named after the 'Kasai' or butchers, dealers in goats' and cows' flesh, who formerly occupied it as their quarter. In 1757 Cossaitollah was a mass of jungle and even as late as 1780, it was almost impassable from mud in rains. In upjohn's map of Calcutta in 1792, only two or three houses are marked in this locality, of which one was that of Charles grant which was situated in grants lane, which takes into him from that circumstance. In 1788 Mr. Mackinnon opened a school in Cossaitollah."

এই কসাইটোলা সম্পর্কে উইলিয়াম ক্যারী, হেনরী কটন, বিচেনডেন, এ কে রায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আরও অনেক পুরাতত্ত্ববিদের অভিমতে কোনো পার্থক্য নেই। প্রায় প্রত্যেকে একই বর্ণনার সংস্থাপন ঘটিয়েছেন তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে। এমন কি, হার্মনিক ট্যাভার্নের সেই শিক্ষিত পাচক প্রথম কসাইটোলাতেই "ট্রেন হোমস ট্যাভার্ন" নামক যে-ইংলিশ-স্টাইলের হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন—সে-সম্বন্ধেও কেউ দ্বিমত নন। উক্ত পাচকের নাম ট্রেন হোম। তিনি উল্লেখিত হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাকালে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বাংলা ভাষাতেই তিনি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তৎকালীন 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি এই :

"ট্রেন হোম কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে জানাইতেছে যে, সে ব্যক্তি কসাইটোলা বাজারে একটি হোটেল খুলিয়াছে। ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সাপার, ব্রেকফাষ্ট ইত্যাদি সকল কিছুই সুন্দররূপে প্রস্তুত করা হয়। সকল রকমের বিস্কুটও এই হোটেলে পাওয়া যায়। হাঁস, মুরগী এবং কবুতর প্রভৃতি নিত্য পাওয়া যায়।"

যাই হোক, দিনে দিনে শিক্ষিত-জনের সমাগম এবং তাঁদের প্রয়োজনেই রুচিসম্মত বসতবাটী, হোটেল, স্কুল, বার, বিপণি প্রভৃতি গ'ড়ে ওঠায় প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সংস্কার সাধন সুরু হয় কসাইটোলার। অবশ্য সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তার মধ্যে রাজকীয় মর্যাদার বিভূষণ ঘটে উনবিংশ শতকে। তখন কসাইটোলা থেকে অনেক দূরে স'রে যায় কসাইটোলা বাজার এবং ভরাট হয়ে ওঠে পূর্ব থেকে পশ্চিম বাহিনী সেই পরিখাও। এদিকে-ওদিকে বাগান এবং সমগ্র অংশে অজস্র শুভ্র অট্টালিকার শ্রীমণ্ডিত সমাহারে এক অনুপম দৃশ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে কসাইটোলায়। তাছাড়া কসাইটোলার সেই সংকীর্ণ পথটিও সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়ে রূপান্তর লাভ করে এক প্রশস্ত এবং সুশোভিত রাজপথে—যা পরে নাম ধারণ করে "বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট"।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক গভর্নরের পদ গ্রহণ করে বাংলাদেশে আসেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হয়ে যে-অভূতপূর্ব যোগ্যতার পরিচয় দেন— সম্ভবত তাতেই মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দেই নিযুক্ত করেন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলের পদে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের তিনিই প্রথম গভর্নর জেনারেল। তিনি ইংরেজ রাজপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, এ-দেশীয় জনসাধারণের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। কুসংস্কার

থেকে মুক্ত ক'রে, এ-দেশের জনসাধারণকে যথাযথভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলার যে-কঠিন ব্রত তিনি গ্রহণ করেন—তুলনা তার সত্যিই বিরল। এই লর্ড বেণ্টিঙ্কই ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। তৎকালীন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন সুরু করেন রাজা রামমোহন—তার সার্থক পরিণতির পথ রচনা করেন লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং। সে-যুগে বেণ্টিঙ্কের মতো এমন একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ভারতবর্ষে না থাকলে, একা রামমোহনের পক্ষে অত শীঘ্র সতীদাহের সেই জঘন্য প্রথা রোধ করা হয়তো সম্ভব হতো না।

এ-দেশীয় জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি লর্ড বেণ্টিঙ্কের অনুরাগ যে সত্যই ছিল অপরিমেয় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ-দেশের মেধাবী ছাত্রদের তিনি ভালোবাসতেন এবং প্রয়োজন বোধে নিজগৃহেই তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিতরণ করতেন নানাবিধ পারিতোষিক। বাং ১২৩৫ সালের ১১ই ফাল্গুন তাঁর নিজগৃহে পারিতোষিক বিতরণের যে-উৎসব হয়, বাংলার ইতিহাসে তা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উৎসবেরই যে-বিবরণ সে-যুগের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে—তা এই :

"গত বুধবারে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোষিক পাইবার নিমিত্ত একত্র হইয়াছিল। ঐ দিবস ছাত্রেরা প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল। দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্থ বড় দালানে সকলেই একত্রিত হইল। সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত বেলি সাহেব ও অন্য দুই ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন। বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী ও তাঁহাদের মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সে সময়ে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করা গেল।-----শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে ইঙ্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুম্বক উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল শ্রীবিনায়ক ঠাকুর, শ্রীতারিণীচরণ মুখুয্যা, শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীরামতনু লাহিড়ী, শ্রীদিগম্বর মিত্র, শ্রীরামগোপাল ঘোষ, শ্রীরাধানাথ শিকদার, শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি।"

● বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের টাওয়ার হাউস

এই শ্রীশ্রীযুত এবং শ্রীশ্রীমতীই লর্ড এবং লেডি উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ভারতবাসীর সেই একান্ত সুহৃদ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক লোকান্তরিত হন অকস্মাৎ।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পর, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কসাইটোলা ষ্ট্রীটের নামকরণ হয় বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের যে-উন্নতি সুরু হয় তা প্রায় চরমে ওঠে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে, অর্থাৎ বর্তমানে সেই সুশোভিত বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের সমাধি লাভ ঘটেছে এক বিপর্যস্ত পরিবেশে। অগণিত প্রাচীন এবং নবীন অট্টালিকার অনিয়ন্ত্রিত সমাবেশ এবং হাজার হাজার শ্রীহীন বিপণির বিশৃঙ্খল অবস্থিতির ফলেই বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট আজ সংকীর্ণ এবং বিপন্ন।

এ-পথেই অবস্থিত শহর কলকাতার উচ্চতম অট্টালিকা 'টাওয়ার হাউস' এবং বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য অজস্র কার্যালয়। তাছাড়া চীনদেশীয়দের অজস্র জুতোর দোকানেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এখানে এবং এখানেই ক্ষিপ্ত কৃষ্ণচূড়ার মতো একাধিক সিনেমাগৃহ বসন্ত ফোটায় অবিরাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবুও কোনো শান্তি বা স্বস্তি নেই বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের পাষাণ-লাঞ্ছিত জীবনে।

কার মত দেখতে হয়েছে বল তো ?

রমেনদার মত।

সনৎ একবার এগিয়ে গেল, দুবার পিছিয়ে এল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর বলল।

নন্-না। একটুও না, ওর মার মত।

কেন, এই ওপর দিকে তোলা নাসিকা, বড় বড় নাসারন্ধ্র। এ বাবা পৈতৃক সম্পত্তি।

সনৎ তুলতুলে ফুলফুলে বাচ্চাটার নাকটা টিপল। বাচ্চাটা ওঁ ওঁ করে উঠল।

আরে চিবুকটা দেখ। ঠিক সেই আবাগীর মত।

সনৎ ওর পিসতুত বোন লতিকে মনে করবার চেষ্টা করল। ঠিক মনে এল না। অনেক দিন ছাড়াছাড়ি। তা ছাড়া বোধহয় মানুষের মুখ সব সময় ঠিক মনে আসে না। হঠাৎ এক সময় না মনে করতে মুখের আদলটা চোখের ওপর ভাসবে।

সনৎ আবার বাচ্চাটার গাল দুটো টিপে দিল। এবার বাচ্চাটা কাঁদল না। হাসল ওর হাসিটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

[illegible] বের করে সনৎ বলল, নাও উই আর পালস। ও কে।

উ-হুঁ-হুঁ। দিস নি। গলায় বাধবে। এখনো খেতে শেখে নি।

বোঝা গেল রমেনদার মা বাচ্চা-টাকে বুকে করে আগলে রেখেছেন।

সনৎ একটু পিছু হটে গেল, বাচ্চাটাকে আর একবার স্টাডি করল। ভুরু নেই, চোখের পাতা দুটো ফুলো ফুলো। গায়ের নীলাভ দাগগুলো এখনো মিলিয়ে যায় নি। দেখলেই চটকাতে ইচ্ছে করে।

সনৎ বাচ্চাটাকে দুহাতে চটকাতে লাগল। নরম শুধু নরম। কী রকম নরম বলা যায় না। এর কোন তুলনা হয় না। হাত পা মাথা, এর সবটুকুই প্রাণ, থলথলে তরল প্রাণ, এর কোন তুলনা হয় না। দুধ আর ঘাম মিলে এক আশ্চর্য গন্ধ। সনৎ বারবার বাচ্চাটাকে চুমু খাচ্ছিল। তাকে আঘ্রাণ করে তার আশ মিটছিল না।

এর কী নাম রেখেছেন ?

এখনো কিছু রাখা হয় নি। তুই একটা নাম দে না।

এর নাম রাখুন থেবড়ি। সনৎ বলল, কেমন থেবড়ে বসে আছে দেখুন।

সনৎ বাচ্চাটার পিঠে একটা মিথ্যে কিল মারল। তারপর বলল, বুড়ি থাপনজুড়ি, চলে এসো তো কোলে।

ও এখনো হাঁটিতে শেখে নি।

এক বিন্দু নেপথ্যে

[illegible] বসু

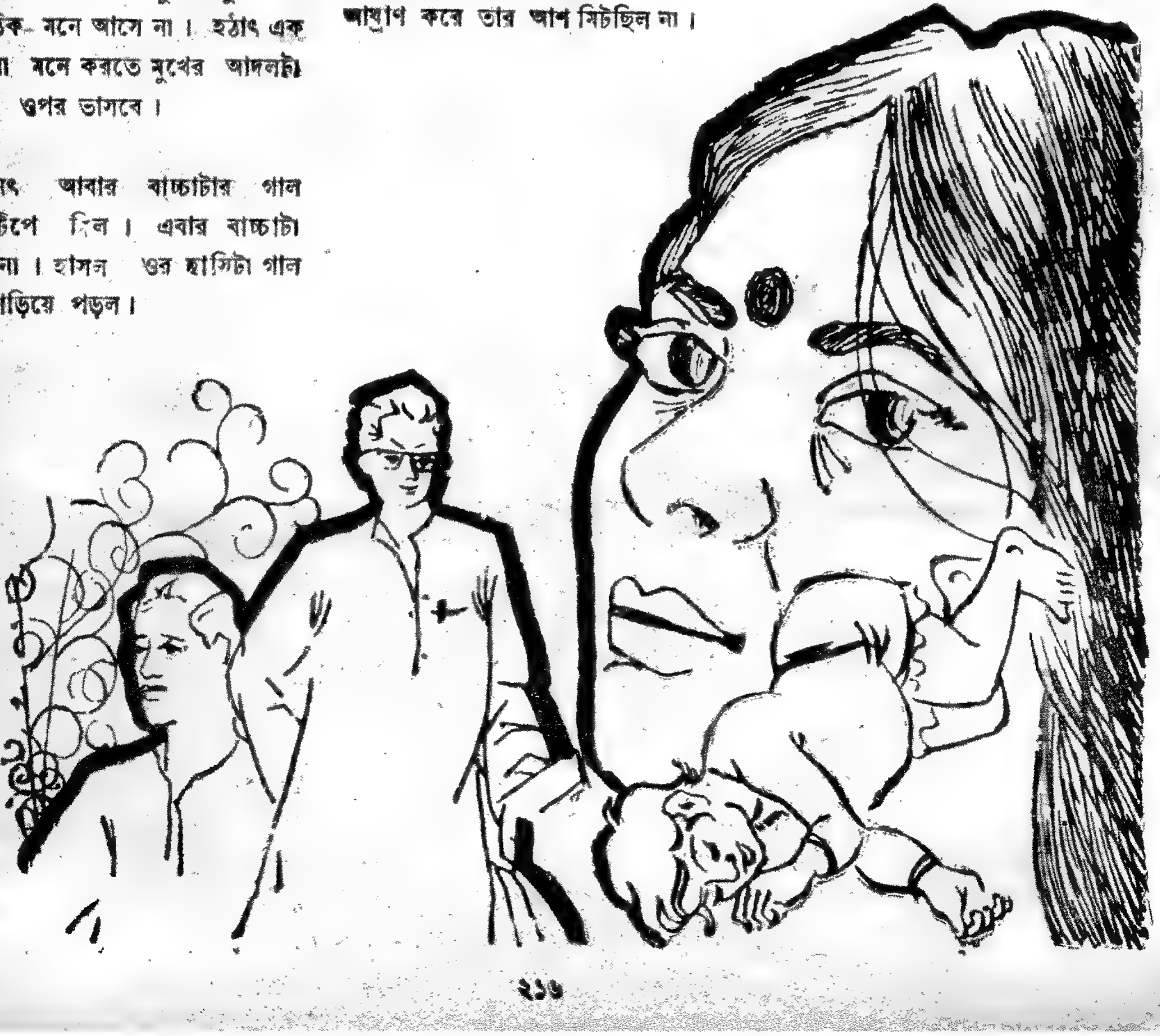

হামা টানে মাত্র। সনতের কথায় কর্ণপাত করল না। তেমনি থাপন জুড়ে বসে রইল। সনৎ নিজেই ওকে কোলে তুলে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল। রমেনদার মা আড় হয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল। সনৎ আবার ওকে মাদুরে বসিয়ে দিল।

মাথায় চুলের আভাস আছে, চুল নেই। সনৎ মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, বুড়ি, তেলকামড়ি, তেলে ভাজা ব-জ-ড়া।

বড় হলে ভালোই দেখতে হবে কী বলিস ?

তা হবে। তবে আপাতত ওর নাম থাক চীনে ম্যান চ্যাং চং। চোখ দুটো কী কুৎকুতে।

ঠিক ওর মার মত। রমেনদার মা বললেন।

আচ্ছা, মাসিমা, লতির ঠিক কী হয়েছিল

রমেনদার মা এক মিনিট স্থির হয়ে রইলেন। অন্যায় প্রশ্ন করা হয়ে গেছে ? না, রমেনদার মা ভেঙে ভেঙে বললেন, আমি তো এখানে ছিলাম না। দেশে ছিলাম। তবে এসব ক্ষেত্রে যা হয়, এ্যানিমিয়া।

ও। সনৎ বলল।

কয়েকটা বোবা মুহূর্ত চলে গেল। কেউ কোন কথা বলল না।

বাচ্চাটাকে কাঁদাবার চেষ্টায় লেগে গেল সনৎ। কাঁদলে বেশ লাগে।

হাসপাতালের ডাক্তার তো রমেনকে এই নেয়, এই নেয়। বলে করেছেন কী।

রমেনদার মা ভেঙে ভেঙে বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগতাড়িত কিন্তু বাষ্পহীন।

সনৎ বাচ্চাটার গালে একটা আলতো চড় মারল।

ওরও খুব দোষ দিই না। ও পুরুষ মানুষ। কিন্তু সে আবাগী নিজে কী করছিল।

সনৎ বাচ্চাটার ডান কানটা মিথ্যে করে কামড়াল।

যখন মারা যায়, এতটুকু রক্ত ছিল না গায়ে। যেন সাদা একখানা কাগজ।

রমেনদা কোথায় মাসিমা ?

বাগানে।

সনৎ ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। চতুর্ভুজ বাংলো বাড়িটার চারদিকেই বারান্দা। বারান্দার মাথায় খোলার চাল। লাল রং বৃষ্টির জল পড়ে সবুজে, জায়গায় জায়গায় পুরোপুরি কালো। দুধ-সাদা দেওয়াল। দেওয়ালের হিসেবে জানলার সংখ্যা বেশি। জানলায় সার্সি। জানলাগুলো বাড়িটাকে অন্য চেহারা দিয়েছে।

পূব দিকের বারান্দা ডিঙোলে রমেনের শোবার ঘর। বাচ্চাটাকে কোলে করে সনৎ এ ঘরে এসে দাঁড়াল।

লতির হাতের একটা ক্রুস কাঠির কাজ আয়নার গায়ে ঝোলানো দেখে সনৎ অবাক হল। এটা লতি বিয়ের আগে করেছিল। তখন তারা সবাই এক সংসারে থাকত তাদের সারেঙ্গাবাদের সাবেক বাড়িতে।

আয়নাটার উল্টো দিকের দেওয়ালে মুখোমুখি বসানো লতির একটা এনলার্জড ফটোগ্রাফ। শিল্পীর ছোঁয়া পড়েছে তাতে। মাথায় কে চওড়া করে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। এ লতি যেন অন্য কেউ, নিজের পিসতুত বোন বলে মনে হচ্ছিল না সনতের। বেশ মোটা সোটা স্বাস্থ্যবতী একজন ভদ্রমহিলা। ট্রামে বা বাসে কোথাও দেখে থাকবে। বিয়ের পর লতি মোটা হয়েছিল, সনৎ শুনেছিল।

বাচ্চাটার সঙ্গে ছবিটাকে একবার মিলিয়ে নিল সনৎ। খুব কী মিল আছে ? রমেনদার মা তাই মনে করেন।

পাশের ঘরটা রমেনদার মার। এ ঘর দিয়েও যাওয়া যায়। ঘরটা পার হয়ে ওদিকের দরজা দিয়ে সনৎ দক্ষিণের বারান্দায় পড়ল।

দক্ষিণের বারান্দা থেকে একফালি সরু করিডর গিয়ে পড়েছে রান্না-বাড়িতে। রান্নাবাড়িটা আলাদা। খোলা দিয়ে ছাওয়া। এ-পাশে ও-পাশে ছড়ানো কয়েকটা অযত্নসম্ভূত পেঁপে গাছ। একটা পেঁপে গাছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি বসেছিল। বাচ্চাটাকে দেখাবার জন্যে সনৎ অনেক কসরৎ করল। পারল না। শেষে হু-উ-স করে উড়িয়ে দিল।

রান্নাবাড়িটা একটু উঁচুতে। করিডরটা ধাপে ধাপে পৌঁচেছে সেখানে। সনৎ সেখানে না গিয়ে ডান দিকের পায়ে-চলা পথে বাগানে গিয়ে পড়ল।

রান্নাবাড়ির গা ঘেঁষে বাগানের সুরুতেই একটি বড় কুয়ো। এত বড় ফাঁদের কুয়ো সনৎ বাংলা দেশে দেখে নি। মনে হয় এক সময় চাষবাস রাঁধাবাড়া সব কাজই এ দিয়ে চলত। এখন সরকার পাহাড়ী নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলাশয় বানিয়ে ছোট শহরটার ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দিচ্ছেন। কুয়োটা তাই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। চৌবাচ্চার গা বেয়ে বাড়তি জল ঝরছে। তলার অনেকখানি ভিজে আছে।

একটা সাঁওতাল মেয়ে ওখানে বসে বাসন মাজছিল ; সনৎকে দেখে হাসল। কেন হাসল, ও জানে না। ওর নাম মুংরি। ও এখানে ঝিয়ের কাজ করে।

সনৎ আর একটু এগোল। একটা মাঝবয়সী শালগাছ, একদা-বড়-বংশের একমাত্র বংশধরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আশে পাশে আর কোন সঙ্গী নেই। চারদিকে সব্জির ক্ষেত। সনৎ সাবধানে সব্জি না মাড়িয়ে বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

লতি লিখেছিল, জায়গাটার নাম রোহিণী। বড় অদ্ভুত নাম, না ? চলো এসো একদিন বেড়াতে বেড়াতে। বেশি দূর তো নয়, মাত্র তিনশ' মাইল। গাছের আঙুর খাওয়াবো। তোমার

রমেনদা নিজের হাতে সব লাগিয়েছেন। আর গাছপালার সখ।

লতির নিজেরও গাছপালার সখ ছিল। তাদের দেশের বাড়িতে তুলসী-মঞ্চের পাশে একটা লংকা গাছে কী লংকা হত। লতির হাতে বসানো। সকলের হাতে ফলে না। লতির ফলন-হাত ভালো ছিল।

বাগানটা ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। পাঁচীলটাও আনুপাতিক ভাবে সিঁড়িভাঙা। এখানকার জমির এই চেহারা। ট্রেনে আসতেও সনৎ লক্ষ্য করেছে।

ঐ ও-কোণটায় একটা মাচান মত করা রয়েছে। একটা লম্বা মানুষ মাচানের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। দূর থেকে সনৎ অনুভবে বুঝল, মানুষটা রমেনদা।

শব্দ তুলে সনৎ রমেনের একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। বাচ্চাটা তার কোলে। রমেন একটা আঙুরের থোলো পরীক্ষা করছিল। ছোট-বড় বেশ কয়েকটা থোলো পড়েছে। কয়েকটায় এখনো ফল আসে নি। ঘাড় না তুলে রমেন বলল, 'রক্ত? ছুঁয়া রাখিয়ে।

কাকে উদ্দেশ্য করে রমেনদা কথাটা বলল। সনৎ শুনেছিল, লতি চলে যাওয়ার পর রমেনদা এই বাগানে নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন। লতির হাতের ছোঁওয়া-লাগা এখানকার মাটি।

রমেনদা আমি। সনৎ বলল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রমেন সনৎকে দেখে অবাক হল। তার মুখে এক চিলতে অপ্রস্তুতির ছায়া, ও তুই। আয় সনৎ কখন এলি?

এগুলো আঙুর গাছ, না? আঙুর হয়?

ওগুলো কেষ্টনগরের জন্য, দেখ না হাত দিয়ে।

দে। ওকে আমার কোলে দে।

বাচ্চাটাকে রমেনের কোলে দিয়ে সনৎ আঙুরের থোলোয় ভয়ে ভয়ে হাত দিয়ে দেখল। নরম তুল-তুলে। নরম ত্বকে ধরে রাখা তরল প্রাণ, এখনি বুঝি গলে পড়ে যাবে।

চা খেয়েছিস? রমেন বলল।

সে হবেখন।

হবেখন না। চল ফেরা যাক। চা খেতে খেতে কলকাতার গল্প করা যাবে।

ওরা পায়ে পায়ে সেই নিঃসঙ্গ শালগাছের তলায় এসে পৌঁছল। এখন পাতা ঝরার বেলা। ওদের পায়ের চাপে মিড় মিড় আওয়াজ উঠল।

কলকাতার খবর কী?

ভালো।

কাগজ টাগজ আর পড়ি না।

কুয়োটার কাছে এসে পড়েছিল ওরা। সনৎ বলল, আচ্ছা রমেনদা, বাগানে এসে তুমি নিজেকে ভুলে থাক। না?

কেন তোর এমন মনে হল?

আমি যখন তোমার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম, তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।

তাই বুঝি।

রমেনের চোখে কুয়াশায় ভেজা নীলাভ মণিদ্যুতি। সে কি লতিকে ভাবছিল। স্মৃতির দাঁড় বেয়ে অনেকখানি দূরে গিয়ে পড়েছিল। না, সে লতির কথা ভাবছিল না।

ওরা রান্নাবাড়ির গা-বেয়ে যাওয়া পায়ে-চলা পথটায় এসে উঠল।

আমার পায়ের শব্দে তুমি 'রক্ত' বলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন? সনৎ বলল।

ও, তাই বল। ওরা রোজ এই সময় রক্ত নিয়ে আসে। আজ বোধহয় দেরি হবে।

রমেনের মুখে এক চিলতে ফিকে হাসি।

ওরা কারা? সনৎ প্রশ্ন করল।

কসাইরা। ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে।

রমেনের চোখে কুয়াশায় ভেজা নীলাভ মণিদ্যুতি। রমেন বুঝি মৃদু হাসল।

রক্ত কী হবে?

জানিস না, আঙুরগাছে লাগে যে রে।

ও। মুখ না তুলে সনৎ বলল।

ওরা আরও একটু এগোল। সনৎ নীচু হয়ে একটা মকাইয়ের শীষ ছিঁড়ে নিল।

লতি থাকতে মাছ-ধোওয়া জল দিত। তাতেও কাজ হয়। রমেন বলল। তার কণ্ঠ প্রায় বাষ্পহীন।

মকাইয়ের শীষটা দাঁতে কাটল সনৎ।

চল্ এসে গেছি। রমেন বলল।

ওরা দক্ষিণের বারান্দায় পা দিল। সনৎ বলল, ওকে এবার আমার কোলে দাও।

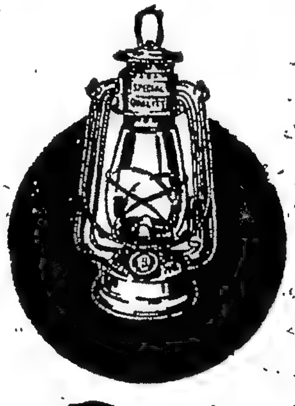
কিমান
দর্শন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,৩এ চিনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৫৮০

অন্য নেহরু অপর এক জনতা

গোত্রহীন

জওহরলালকে অনেকবার দেখেছি এই কলকাতায়, কলকাতার ময়দানে, কলকাতার রাজপথে। কলকাতা বার বার স্বাগত জানিয়েছে তার প্রিয় নেতা জওহরলালকে; হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ কলকাতার রাজপথ ও ময়দানকে উত্তাল করেছে ধ্বনি-তরঙ্গে—নেহরু জিন্দাবাদ। আজ আবার নেহরু এলেন কলকাতায় তাঁর নশ্বর দেহে নয়, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের অঙ্গীভূত ভস্মরাশিতে লীন হয়ে। সেই সদাহাস্য প্রফুল্ল মুখ, সৌম্য শান্ত বলিষ্ঠ পৌরুষ প্রতিভার পরিচয় এবার কলকাতা পায় নি। এবার নেহরু শান্ত নীরব নিস্তব্ধ করুণ। 'অ্যাবাইড উইথ মি'-এর করুণ সুরের এক স্নিগ্ধ ঐকতানে মুগ্ধ এক অনন্যসময় এবার নেহরু। তবু এবারও রাজপথ, ময়দান স্বাগত জানিয়েছে নেহরুর নশ্বর স্মৃতির শেষ কণাকে, সেই ভস্মরাশিকে। লাখে লাখে মানুষ ভিড় করেছে পথে মাঠে ঘাটে তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ বারের মতো দেখার আকাঙ্ক্ষায়। ময়দান জনসমুদ্র হয়েছে। কিন্তু নীরব জমাট সমুদ্র। ঢেউ আছে, বেদনা আছে, কিন্তু শব্দ নেই। গুমোট আকাশের মতই করুণ ব্যথানীল নির্বাক স্তব্ধপ্রহর নিঃশব্দ সময় এখন ময়দান।

অথচ ময়দান একদিন এমন ছিল না। সেদিন জওহরলালের স্পর্শে ময়দান সজীব হতো, প্রাণ চেতনা পেতো। এই শূন্যতা, এই নিঃসাড়তাকে জয় করে যেন ময়দান সেদিন জওহরলালের ভাষাই বলতো, 'Wonderful is the courage that conquers death!' আজ যেন ময়দানের সেই লাখ লাখ মানুষের দেহে কে মরণকাঠি বুলিয়ে দিয়েছে তাই ময়দানের এই শোকস্তব্ধ নীরবতা যেন বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডকে হিমালয়ের তুষারমৌলি নীরবতায় মণ্ডিত করেছিল সেদিন। আলো ঝলসানো সেই বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে যেন মনে হচ্ছিল অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর আমাদের আত্মা যেন কার ব্যথায় ডুকরে কেঁদে উঠছে। 'Light, Light, More light,' কিন্তু ১৯৪৮ সালে সেদিন এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রিয় বাপুজীর মৃত্যুতে প্রিয় নেতা জওহরলাল বলেছিলেন, 'Light is out but that light will show us path' আমরা ময়দানে জওহরলালের ভস্মাধারের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম, আকাশে তাকিয়ে ছিলাম ধ্রুবতারার দিকে। ধ্রুবতারা তোমার বুঝি মৃত্যু নেই?

সত্যি ধ্রুবতারার মৃত্যু নেই। নানাবর্ণের ফুলের সমারোহে শোভিত

প্রকাশিত হয়েছে :

রবীন্দ্র-সুভাষিত ১২·০০

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য উক্তির সংকলন-গ্রন্থ।

রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য।

THE HOUSE OF THE TAGORES 1·50

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

বাংলা দেশের নবজাগরণের পটভূমিকায় ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস।

চৈতন্যোদয় ২·৫০

৺হরিশ্চন্দ্র সান্যাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে।

প্রকাশক : **রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়**

৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক : **জিজ্ঞাসা**

১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৩৩ কলেজ রো কলিকাতা-৯

সেই ভস্মাধার যেন আমাদের তাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ধূপের সৌরভে, ফুলের গন্ধে আমরা জীবনের স্পর্শ পাচ্ছিলাম। যে জীবনকে ভালোবাসতেন জওহরলাল। যে জীবনপ্রীতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন. 'My mind is too full of what I should do in this world and if I see my way clearly here, I am content." ইহলোকের এই জীবন্ত দর্শনই চিরদিন নেহরুকে আকর্ষণ করেছে। তাই জওহরলাল সোচ্চার সমর্থন জানিয়েছেন এই কর্মজীবন-বেদকে, কারণ তিনি জানেন, "A living philosophy must answer the problems of to-day,'

এই ময়দানে আজ যেখানে তিনি সারারাত কাটালেন, সেখানে তিনি কোনদিন এত সময় কাটান নি। কোনদিন এইখানে—এই ময়দানে এত সময় কাটাবেন তা বোধহয় ভাবেনও নি তিনি। তবু ময়দানকে তিনি ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন ময়দানের জনতাকে, এই জনতাকে তিনি যে ভালোবাসতেন জীবন-প্রেমিক জওহরলাল. তাঁর ছোট ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতী -সিংকে এ বিষয়ে বলেছেন: 'If my people choose to think of me then I should like them to say.—"This was a man who with all his mind and heart loved India and the Indian people. And they in turn were indulgent to him and gave him of their love most abundantly and extravagently..'

মানুষের ভালোবাসার পবিত্র শকটে বয়ে চলেছেন নেহরু অন্যলোকে, অমৃত-সন্ধানে। 'আমার চিতাভস্ম পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জন করো, আমার চিতাভস্ম হিমালয়ের পাদদেশে ছড়িয়ে দিও।' জওহরলালের এই অন্তিম ইচ্ছাকে আমরা সত্যিই সফল করতে চলেছি। গঙ্গা, যমুনা, গোমতী সরস্বতীর পুণ্যসলিলে জওহরলাল লীন হয়েছেন। রাজঘাটে প্রয়াগসঙ্গমে গান্ধীঘাটে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর শীতল সলিলে। এই সেই গান্ধীঘাট। ১৯৪৯ সালে জওহরলাল গুরুর চিতাভস্মে এই ঘাটের রূপায়ণ করেছিলেন। ব্যারাকপুর পণ্যতীর্থ হয়েছিল গান্ধীঘাটের অমর স্মৃতিতে। আজ আবার সেখানে মিলন হ'ল গুরু-শিষ্যের বিদেহী আত্মার শান্তির পারাবারে॥

কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল গান্ধীঘাট। এই কুড়ি মাইল সেদিন মিছিল হয়েছিল শোকার্ত মানুষের। রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটে নি তবু বি টি রোডের ধারে মানুষের স্রোতের শেষ ছিল না; জনসমুদ্রের জোয়ার বয়েছিল ডানলপ ব্রীজের কাছে, পাণিহাটীতে। টিটাগড়---অথৈ অথৈ জনসমুদ্র। উত্তাল জনসমুদ্র ফেটে পড়েছিল টিটাগড়ে 'নেহরু অমর রহে' আর শোকের ভাষায় তর্পণের গভীর বেদনায় নিঃশব্দ জনসমুদ্র যেন জমে গিয়েছিল দমদম চিড়িয়ার মোড়ে॥ শেষ দর্শন। দেখা চাই জনপ্রিয় নেতাকে দেখা চাই নেহরুকে। পাণিহাটীর কাছে মায়ের কোলে ছোট ছেলেটি মাকে বলছিল—কই নেহরু কোথায় মা॥ এর আগে যেদিন ব্যারাকপুরে মাতৃ সেবাসদন উদ্বোধন করতে নেহরু এসেছিলেন সেদিন সেই ছেলেটি নেহরুকে দেখেছিল, দেখেছিল সেই প্রফুল্ল মানুষকে। আজ বুঝি সেই ভস্মাধারের মধ্যে তাঁর কোন চিহ্নই দেখতে পায় নি তাই বুঝি এই প্রশ্ন। এই প্রশ্নই যেন আমি সেদিন দেখেছিলাম ব্যারাকপুরের সেই মিছিলে।

শুধু গান্ধীঘাট নয়—ভাগীরথীর ওপারে শ্রীরামপুরও সেদিন জনারণ্যে পরিণত হয়েছিল। বিউগলে শেষ অভিবাদন বেজে উঠল, এবার শেষ। নশ্বর দেহের শেষ কণা এবার মিলতে চলেছে অনন্ত যাত্রায়---। পবিত্র গঙ্গাস্পর্শে। কোথায় লাল গোলাপ। কোথায় সেই ছোট্ট ব্যাটন। সব ফেলে তিনি চলেছেন অনন্তধামে। আনন্দভবন রইল, তিনি এখন অন্য আনন্দলোকে।

সেই ছোট্ট ছেলেটির মতো আমার মনেও যেন একটা প্রশ্ন বেদনায় ছটফট করছিল। কী যেন বলতে চাচ্ছিল মন। নেহরুকে আমার মনও খুঁজছিল, সেই নেহরুকে---যে নেহরু ময়দানে ক্রুশ্চেভের পাশে দাঁড়িয়ে শান্তির পায়রা উড়িয়ে গেছেন। যে নেহরু কবিগুরুর পাশে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনে জীবন খুঁজেছেন---সেই নেহরুকে আমি যেন খুঁজছিলাম॥ না সেই ভস্মাধারে সেই নেহরুকে আমি পাই নি॥ প্রতিমা নিরঞ্জনের বেদনা নিয়ে ঘরে ফিরছিল মানুষ। তখন আকাশে দাবদাহ সুরু হয়েছে। বাতাসে গরম হল্কা। আমি সেই ঘর-ফেরৎ শোকযাত্রী মিছিলের সেই অশ্রুজলে সিক্ত চোখে তাকিয়েছিলাম।

সেই চোখের আয়না মাটি ভস্মাধার নয়, নেহরুকে দেখেছিলাম॥ গঙ্গার পবিত্র জল আমাকে নেহরু দেখাতে পারে নি কিন্তু ওদের—ভারতবর্ষের এই দীনদরিদ্র সাধারণ মানুষের চোখের জলে নেহরুর প্রতিবিম্ব আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর জামার বোতাম ঘরে তখনও হীরালালের দেওয়া লাল গোলাপ, তার সৌন্দর্য আমাকে আকর্ষণ করছিল। সেই লাল গোলাপ যেন জওহরলালের ভাষায়ই বলছিল:

'If we cannot master life we can at least master death: A pleasing thought lessening the feeling of helplessness.'

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ নয় ॥

বিশ্রী কাণ্ডটার জন্যে লজ্জা যেন ডাক্তারেরই বেশি।

—ছি ছি মশাই, বেড়াতে নিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত আপনাকে—

—আপনি কী করবেন। অ্যাক্সিডেন্টের ওপর তো কারুর হাত নেই।

ডাক্তার রায়চৌধুরী চোখ পাকিয়ে বাসুর দিকে তাকালেন : সব এই লক্ষ্মীছাড়াটার জন্যে। প্রজাপতি আর তুমি কোথাও দেখতে পেলে না—সঙ্গে সঙ্গে কাকিমাকে ডেকে নিয়ে গেলে।

বাসু প্রতিবাদ করে বললে, বা রে, আমি কী করব। আমি তো বললুম, কাকিমা আপনি যেতে পারবেন না, পাথরগুলো পেছল, আমি ধরে এনে দিচ্ছি। কাকিমা কথা শুনলেন না। তারপর ঠিক কাকিমার পা পিছলে গেল আর কিরণ কাকা—

—হয়েছে, আর ওস্তাদির দরকার নেই। কিন্তু কিরণ কাকা কেন? শুধু কাকা বলতে কী হয়? যত সব ভালগার হ্যাবিট।

আবার ডাক্তার রায়চৌধুরীর সেই সরল ভদ্রতা। কিন্তু ইজিচেয়ারটার মধ্যে কিরণ একবার নড়ে উঠল, একটুখানি লালের ছাপ পড়ল শর্মিলার গালে। ডাক্তার বলে চললেন, বললুম—চলুন আমার ওখানে, দিন কয়েক রেষ্ট নেবেন, কিন্তু কিছুতেই কথা শুনছেন না।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না ডাক্তার রায়চৌধুরী, আমি ঠিক আছি।

—আপনি কেমন আছেন সে কি ডাক্তারকে শেখাবেন মশাই? সঙ্গে সঙ্গেই তো জ্ঞান হারালেন। ভাগ্যিস ঝোপগুলোতে আটকে গিয়েছিলেন, নীচের বড়ো পাথরটার ওপর আছড়ে পড়লে—ডাক্তার শিউরে উঠলেন : কী যে ঘটতে পারত সে-কথা ভাবাই যায় না।

—ট্র্যাজিডী পর্যন্ত আর গড়াই নি—কিরণ হাসল : প্রহসন পর্যন্ত গিয়েই থমকে গেলুম।

—হাসির কথা নয় মশাই, দেখবেন এসব গায়ের ব্যথা ক'দিনে যায়। বেশি চলাফেরা করবেন না, তা হলে কিন্তু জোর করে এখানকার হেলথ্ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেব।

—ভয় দেখাচ্ছেন?

প্রসন্নমুখে ডাক্তার বললেন, অবাধ্য পেশেন্টকে এক-আধটু ভয় না দেখালে চলে না। অতএব লক্ষ্মী-ছেলের মতো বিশ্রাম করুন। আর আপাতত এদের রেখে গেলুম আপনার কাছে—গোটা দুই রোগী দেখে ঘণ্টা-খানেক বাদে এসে তুলে নিয়ে যাব। বাসু!

—কী বলছ?

—লেখার দিকে নজর রেখো। কাকাকে ডিসটার্ব কোরো না।

—আচ্ছা।

বাংলোর বারাণ্ডায় পাশাপাশি দুজন। কিরণ আর শর্মিলা।

লেখা, বাসব আর শর্মিলাকে নিয়ে ডাক্তার কিরণকে দেখতে এসেছিলেন। এখানে এসে তাঁর মনে পড়েছে, কাছাকাছি গুটি দুই রোগী তাঁরই অপেক্ষায় বসে। আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনজনকে কিরণের কাছে রেখে ঘণ্টাখানেকের জন্যে গাড়ি নিয়ে উধাও হলেন তিনি।

বাসব সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল : জানেন কাকিমা, আমরা যারা স্পোর্টসম্যান, এ-সব আছাড়-টাছাড়ে আমাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। বল নিয়ে ছুটেছি, দারুণ সেণ্টার করব একটা—হঠাৎ বে-আইনীভাবে মারাত্মক চার্জ করল একটা। আছড়ে পড়ে গেলুম—আট-দশ মিনিট সেন্সলেস্, তারপর আবার লাফিয়ে উঠেই—

শর্মিলা বললেন, নিশ্চয়। তোব মতো বীর সংসারে ক'জন আছে।

—ঠাট্টা নয় কাকিমা।—বাসব গম্ভীর হল : সেবার বাবাউনিতে এন-সি-সি ক্যাম্প হয়েছে আমাদের। আমরা সবাই—একটা রোমাঞ্চকর কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক বাধা পড়ল এই সময়। সামনের মাঠটার ভেতরে ঘুরছিল লেখা, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল : দাদা—দাদা—দুটো খরগোস।

—কই, কোথায় রে?

—ওই তো ওদিকে। কী লম্বা লম্বা কান। খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। দাদা, পালালো পালালো—শিগগীর আয়—আর বলতে হল না, এক লাফে বেরিয়ে গেল। তারও পরে দেখা গেল; কলধ্বনি তুলে ছেলে-মেয়ে দুটি চলেছে খরগোসের পেছনে—কৃষ্ণচূড়ার বীথি যেখানে আকাশে মুঠো মুঠো রাঙা ফুলের অঞ্জলি মেলে ধরেছে, মিলিয়ে গেল তারই আড়ালে।

শর্মিলা পেছন থেকে ডাকতে চাইলেন : বাসু—

—আসছি কাকিমা। এক্ষুণি আসব।

তারপর বাংলোর বারান্দায় পাশা-পাশি কেবল দুজন। কিরণ আর শর্মিলা।

মিনিটখানেক চুপচাপ। যন্ত্রণার চমক লাগানো শরীরটাকে ইজিচেয়ারে মেলে দিয়ে কিরণ কৃষ্ণচূড়ার দিকে চেয়ে রইল, আর শর্মিলা মাথা নীচু করে পায়ের সাদা জুতোটাকে লক্ষ্য করে চললেন।

কিন্তু এ-ভাবে চুপ করে থাকার কোন অর্থ নেই। যেন অকারণেই নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকা। শর্মিলা খুব বেশি কথা বলেন না; অহেতুক সংকোচও তাঁর কখনো নেই। কিন্তু কী যে হয়েছে—কিছুতেই কিরণের কাছে তিনি সহজ হতে পারেন না। প্রথম দিন রুত সহজে আলাপ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই কোথা থেকে একটা ছায়া উঠে আসছে তাঁব মনে। কেন এমন হল—কেন এমন হয়?

তারপর পরশু মহাকালের মন্দিরে। সেই ঝর্ণার জলে পা পিছলে অতলে গড়িয়ে পড়বার উপক্রম। হঠাৎ দুটি পুরুষের বাহুর আশ্রয়। সমস্ত ভয় ছাপিয়েও শর্মিলার সাবা শরীর চমকে কেঁপে উঠেছিল একবার। সেই থেকে কিরণের সঙ্গে কথা বলা যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। অথচ ব্যাপার টার ভেতরে অস্বাভাবিকতা কোথাও ছিল না। তাঁর বিপদ থেকে কিরণ তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, সমস্ত স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে যা শোভন আর সঙ্গত। কেন এত অস্বস্তি বোধ করছেন শর্মিলা? না, এসব-দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা উচিত।

শর্মিলা আস্তে আস্তে বললেন, আমার গোঁয়ার্তুমির জন্যেই আপনাব এই দুর্ভোগ। আপনাব কাছে কী বলে যে ক্ষমা চাইব জানি না।

—মিথ্যে ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন?—কিরণ হাসল : দুর্ভোগ আমার অদৃষ্টে ছিল, আপনি উপলক্ষ মাত্র।

—অদৃষ্ট মানেন আপনি?—শর্মিলা আরো সহজ হতে চাইলেন।

—সব সময় নয়। কিন্তু অদৃষ্ট না হলে আপনাদের কুকুব অমন করে আমার খাতা রাহাজানি করত আর আলাপ হত আপনাদেব সঙ্গে?—কিরণ একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে শর্মিলার শান্ত-গম্ভীর মুখ আর কুমারীর মতো শুভ্র-উজ্জ্বল সীমন্তটির দিকে তাকালো : অদৃষ্ট না হলে অমন করে ঝর্ণার ভেতরে কি আপনার পা পিছলে যেত আর আমি ওইভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়তুম?

—তা হলে অদৃষ্ট নয়, দুরদৃষ্ট বলুন।

কিরণ লঘুভাবে বললে, না, ভাগ্য। আর ভাগ্য যদি এ-ভাবে বারে বারে ফিরে আসে, আমি দুঃখিত হবো না।

কৌতুক। শিভালরি দেখানোর সুযোগ। অন্তত কথাটাকে সেই দিক থেকেই নেওয়া যেতে পাবত অনায়াসে—এটুকু রসবোধ শর্মিলার আছে। কিন্তু শর্মিলা যেন নিবে গেলেন। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিভাবে শিউরে উঠেছিল তাঁর—সমস্ত ভয় ছাপিয়েও অনুভব করেছিলেন—যেন কোথা থেকে দুটি বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে অমিতাভ এসে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

শর্মিলার মনে কোথাও যেন মেঘ নামছে, অনুভব করলে কিরণ।

—রাগ করলেন না কি?—মাপ চাইছি তা হলে।

—না—না, রাগ করব কেন?—জোর করে হাসতে চাইলেন শর্মিলা; কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন : গায়ের ব্যথা আজকে কমেছে আপনার?

—অনেকটা। তবে হাঁটতে কষ্ট হয় এখনো।

—বেড়ানো-টেড়ানো সব বন্ধ?

কিরণ মাঠের ওপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি সামনে ছড়িয়ে দিলে—একেবারে দূর পাহাড়ের সীমায় গিয়ে চোখ ঠেকল। মহাকালেব মন্দিবটা ওরই ওপর আছে কোথাও—এতদূর থেকে নজর চলে না।

—তাতে ক্ষতি হয় না। এখানে বসে বসে অনেকখানি পৃথিবী দেখতে পাই। অনেক হাওয়া আসে।

শর্মিলা আবার একটু চুপ করে রইলেন। তারপব জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে চিঠি দিয়েছেন?

কিরণ হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা থমকে গেল ঠোঁটের কোণায়।

শুকনো গলায় বললে, কী হবে লিখে? দাদা-বৌদিকে মাসে মাসে টাকা পাঠালেই চলে। আর আমার স্ত্রীকে চিঠি লেখবার কোনো অর্থ হয় না—সে তো জানেন।

শর্মিলার মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি বিষণ্ণ-করুণ ভাবী হয়ে উঠল চোখের পাতায়। কোমল গলায় শর্মিলা বললেন, কিছুতেই কি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই?

—ডাক্তারেরা তাই বলে।

এত বড়ো লেখক, এত নাম—অথচ কী শূন্যতা নিয়ে লোকটার দিন কাটে! স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই, মনের জন্যে এতটুকুও আশ্রয় নেই কোথাও। যার কাছে সেবা ছিল, মমতা ছিল, ছিল মুক্তি—সে স্ত্রী পাগল। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক। মনে পড়ল, প্রথম দিন ঠাট্টা করে কল্যাণী বলেছিলেন—ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে দেখব, মেয়েদের সম্পর্কে ওঁর এত অশ্রদ্ধা কেন।' হয়তো এখানেই সে জিজ্ঞাসার জবাব আছে। অসুস্থ স্ত্রীর ভাঙা মনের আয়নায় মেয়েদের কতগুলো বিকৃত প্রতিবিম্বই দেখেছে সে—তাই লোকটা কোনো মেয়েকে শ্রদ্ধা করতে শিখল না।

শর্মিলা ঠোঁটদুটোকে শক্ত করে চেপে ধরলেন একসঙ্গে। অথচ, লেখকের কলমেই মানুষ জীবনের সত্যকে দেখে। একটা ভুল সত্যকে এমনভাবে প্রচার করে যাওয়ার কী অধিকার আছে কিরণের? তার আত্মীয়-স্বজন ছাড়া, তার পাগল স্ত্রী ছাড়া বাংলা দেশে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে কি কখনো কিরণের পরিচয় ঘটে নি? অথবা লোভী স্বার্থপর আরো দু-একজনকে যদি দেখেই থাকে—তারাই কি সব?

শর্মিলার ইচ্ছে করল, এই মানুষটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলেন—জীবনের যে আরো অর্থ আছে সেই কথাটা বুঝিয়ে দেন তাকে, শিল্পীকে উদ্ধার করেন এই অপঘাত থেকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, তাঁর কী গরজ? তিনি তো অমিতাভর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমস্ত হিসেব মিটিয়ে দিয়ে একটা শান্ত বৈরাগ্যের মধ্যে তলিয়ে গেছেন। কিরণ বসুর উপন্যাসে মানুষকে কোন চোখ দিয়ে দেখা হয়, এ নিয়ে গবেষণা করে তাঁর কী লাভ?

কিরণ বললে, কী ভাবছেন?

—কিছু না। —শর্মিলা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, সারা দিন বসে থাকেন চুপচাপ—একা একা লাগে না?

—না। নিজেকে নিয়ে একা থাকার অভ্যেস আমার আছে।—কিরণ ইজিচেয়ারের হাতল থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা: কলকাতার ভিড়ের মধ্যেও একা থাকতে পারি।—এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ঠিক একাও নয়, তখন মনের ভেতরে অনেকগুলো মানুষ এসে ভিড় করে।

—উপন্যাসের প্লট।

—ঠিক তাও নয়—কতগুলো ছাড়া ছাড়া চিন্তা, এলোমেলো চরিত্র। কখনো জমাট বেঁধে উপন্যাস হয়ে ওঠে, কখনো বা দল ছাড়া টুকরো টুকরো মেঘের মতো দিকে দিকে মিলিয়ে যায়।

—এখানেও কি সেই মেঘের খেলা?

—বলতে পারব না। আপাতত এই মাঠ আছে, দূরের পাহাড় আছে, কৃষ্ণচূড়া আছে, আর যদি অভয় দেন তো বলি।—কিরণ আর একবার শর্মিলার শান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে চাইল, দেখল, কুমারীর মতো তাঁর উজ্জ্বলশুভ্র-সীমন্ত, তারপর অপেক্ষা করে রইল।

শর্মিলা যেন নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পেলেন। তবু হাসতে চেষ্টা করলেন, বললেন, অভয় দিচ্ছি—বলুন।

—আর এই পটভূমির ভেতরে আপনাকে খুব উজ্জ্বল রং দিয়ে আঁকতে ইচ্ছে করে।

—আমাকে?—চেষ্টা করেও এবার

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ড জুলাই মাসে বাহির হইবে। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য টা. ১২.৫০।

বঙ্কিমরচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪টি)। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য টা. ১২.০০।

রমেশরচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি)। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য টা. ৯.০০।

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বইটি রচনার জন্য সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। মূল্য টা. ১৫.০০।

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদাবলীর বৃহত্তম আকরগ্রন্থ। মূল্য টা. ২৫.০০।

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত এবং শ্রীপূর্ণ রায় কর্তৃক চিত্রিত।

মূল্য টা. ৯.০০।

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সহজ-গ্রাহ্য প্রাঞ্জল পরিবেশন।

মূল্য টা. ৭.০০।

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র-জীবনবেদের সরল ব্যাখ্যা। মূল্য টা. ২.৫০।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

সহজ হতে পারলেন না শর্মিলা, আবার সেই অকারণ লজ্জায় তাঁর চোখ দুটি যেন বুজে আসতে চাইল : আর কি লোক পেলেন না ?

—অন্য কারুর কথা তো ভাবি নি। প্রথমদিন আপনাকে দেখবার পরেই মনে হয়েছে—এখানে আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই মানায় না। ঠিক করেছি, 'মিষ্টি রোমাণ্টিক উপন্যাস লিখব একটা—নাম দেব 'কৃষ্ণচূড়া'। 'কৃষ্ণচূড়া'র মঞ্জরীও দেওয়া যেতে পারে —কী বলেন ?'

কোনো কারণ নেই, তবু একটা অর্থহীন নেশায়, একটা সুখের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে যেতে লাগলেন শর্মিলা। বাতাসে এখন কৃষ্ণচূড়ার কষায় গন্ধ, হরিয়ালের ডাক, মাথার ওপর শরতের আকাশ যেন নিবিড়-নীল চোখের মতো চেয়ে আছে। যেন শর্মিলাকে ঘিরে ঘিরে একটা অপূর্ব সম্মোহন নেমে আসতে লাগল—যেন আলো-বাতাস-আকাশ-গন্ধের একটা সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু তারপরেই তীক্ষ্ণ আঘাত পড়ল একটা। চকিত যন্ত্রণায় শর্মিলা সম্মোহন থেকে জেগে উঠলেন।

সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে কিরণ শুকনো হাসি হাসল : অবশ্য মনে মনে ঠিকই জানি, এ উপন্যাস কোনোদিনই লেখা হবে না। এ রোমাণ্টিক পাগলামিই বা কতক্ষণ থাকবে ? তিন পাতা লেখবার পরেই পাণ্ডুলিপি নিজেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব—কী হল আপনার ?

শর্মিলার মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল। বললেন, না—কিছু হয় নি। আমি দেখছি, বাসু আর লেখা গেল কোন দিকে।

কিরণ কোনো কথা বোঝাবার আগেই বারান্দা থেকে নেমে গেলেন শর্মিলা, লজ্জায়, অপমানে, মাটিতে তাঁর মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। কিসের সুখ—কিসের সম্মোহন ? লেখকেরা নিষ্ঠুর, খেয়ালী, অন্ধ। তাদের মনগড়া জগতে মানুষকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে। কাউকে তারা ভালোবাসে না—সংসারে কারো স্নেহে প্রেমে তাদের প্রয়োজন নেই।

বাসব আর লেখাকে একটু দূরেই পাওয়া গেল। বাসব মাঠে-চরা কার একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়ায় সোয়ার হতে চাইছিল আর লেখা হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছিল তাকে।

তীব্রকণ্ঠে শর্মিলা ডাকলেন : বাসব—লেখা।

গলার আওয়াজটা নতুন ধরণের। ছেলে-মেয়েরা ঠিক এই ধরণের ডাক শোনবার জন্যে তৈরি ছিল না। ছুটে এল তারা।

—কী হয়েছে কাকিমা ?

—কী আক্কেল তোমার বাসু ? আমাকে পরের বাড়িতে একলা বসিয়ে রেখে—

বাসু আশ্চর্য হয়ে গেল। কিরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যে পর্যন্ত এগিয়েছে, অতে পরের বাড়ি কথাটা কানে ঠেকল তার।

—কিন্তু বাবা বলেন, কাকাবাবু—

শর্মিলা ধমকে উঠলেন : থাক, হয়েছে। এখন এসো আমার সঙ্গে।

ঠিক সেই সময় দূরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ডাক্তার রায়চৌধুরী ফিরে আসছেন। এক ঘণ্টার আগে কাজ মিটে গেছে তাঁর।

সেই রাত্রে, শোওয়ার আগে, অমিতাভর ছবিতে ধূপকাঠি জেলে দিলেন শর্মিলা। প্রণাম করলেন গলায় আঁচল জড়িয়ে।

'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাকে। তুমি চলে যাওয়ার পর প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনে তোমাকেই আমার ধ্যানের আসনে বসিয়ে রাখব, পুজো করব প্রত্যেক দিন। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, মাঝে মাঝে যদি ভুলে যাই তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে মনে করিয়ে দিয়ো।'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চোখের জল পড়ল শর্মিলার। তারপর ভোরে ঘুম ভাঙতেই সামনের শেলফ থেকে সরিয়ে দিলেন কিরণ বসুর উপন্যাস, তারা চাপা পড়ল কতগুলো পুরোনো খবরের কাগজের তলায়।

[ক্রমশ:

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

আমি চঞ্চল হে

দেবেশ দাশ

এক একটা গান ছেলেবেলায় মানুষকে একেবারে পেয়ে বসে, এমনভাবে অভিভূত করে যে, অজ্ঞাতে অলক্ষিতে তার জীবনের ধারা বদলিয়ে দেয় বা প্রভাবান্বিত করে। এমনি একটা গান আমার নিরলস ও পরীক্ষাসঙ্কুল ছাত্র-জীবনে সুদীর্ঘ ছায়াপাত করে রেখেছে।

সেই ছায়ার সঙ্গে আজ বিকালে ভীষণ ও বিপজ্জনক "ক্যুলিন" পর্বতের ছায়া মিশে গিয়েছে।

'আমি চঞ্চল হে'। শুধু আমি নই, শুধু আমার মন বা চরণ নয়—ওই বিশাল পর্বতের চূড়ায় যে মেঘ ও কুহেলির খেলা চলেছে ওরাও এমনি চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লুকোচুরি খেলাতে মত্ত হয়ে। কিন্তু আমার মত "সুদূরের পিয়াসী" নয় ওরা। যদি হ'ত তাহলে আমরা এত চঞ্চল হতাম না।

আমরা অর্থাৎ পরস্পরের একরকম অপরিচিত তিনজন ছাত্র আলাউদ্দিন যেমন ভাবে চিতোর গিরিদুর্গ অবরোধ করে গিরিপাদদেশে বসে সতৃষ্ণ নয়নে দুর্গচূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকত তেমনি ভাবেই তাকিয়ে আছি। দু'দিন ধরে অবিরত মেঘ ও বৃষ্টি আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরিহাস করে যাচ্ছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরে, বিস্কুট খণ্ড অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম পার থেকে অতলান্ত সাগর বেয়ে আসতে হয় "স্কাই" দ্বীপে। স্কাই হচ্ছে প্রায় চির অবগুণ্ঠনবতী—মেঘ ও কুহেলিকার গুণ্ঠন ভেদ করে তার শ্যাম সুচারু রূপ দেখতে হ'লে বহু সাধ্যসাধনা ও প্রতীক্ষা করা দরকার। তার পদ্মমুখখানা হচ্ছে এই ক্যুলিন পর্বত। উচ্চ শিরে এই মহীয়সী অবগুণ্ঠনবতী দাঁড়িয়ে আছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আর কোন শৈলসুতার শির ও মহিমা এত উচ্চ নয়। তাই ক্যুলিন যে আরোহণ করতে পারবে গিরি আরোহণের রাজ্যে সে পাবে কুলীনের মর্যাদা। এখানে বলে রাখি যে বহু গিরিসুন্দরী জয় করে আমিও এতদিনে নিকষ কৌলিন্যের দাবী করতে পারি।

দুপুর থেকে আর কোন বৃষ্টিপাত আমাদের আশাকে ধুয়ে দিয়ে যায় নি, সেই আমাদের একমাত্র ভরসা। বন্দোবস্ত ঠিক করে নেওয়া হল, পিঠে থাকবে "রুকস্যাক" অর্থাৎ ক্যানভাসের ঝোলা, তাতে নেব, গোটা দুই টিন খাবার, স্বদেশী সন্দেশ বা বিদেশী বিস্কুটও নয়। অত শুকনো খাবার শুকনো গলার ভেতর চালান দেওয়া কষ্ট-কর, তাই টিনে বন্ধ মিঠে 'বিন' ও 'স্যামন' মাছ নিয়ে নেব, আর থাকবে দড়ি। নিজের নয়—পাহাড়ের গলায় বেঁধে তারপর নিজেদের কোমরে বেঁধে পরস্পরকে সাহায্য করে উপরে ওঠার বন্দোবস্ত করতে হবে। হাতে থাকবে লাঠি—শিক বসানো, আর পায়ে থাকবে বুট জুতো—কাঁটা বসানো।

ভাবতেও অবশ্য কাঁটা লাগবে গায়ে—শিরদাঁড়ায় কাঁটা উত্তেজিত হয়েই আছে পাহাড়ের পিঠের শির-দাঁড়ার বহর দেখে।

বিপদ ত কম নয়, এ যেন ভবসমুদ্রে লীলাখেলা, ইহ ও পর দুই লোকের নীচে অবিশ্রাম সমুদ্র কল্লোল চলছে। তার দুই পারে খোঁটার সঙ্গে বাঁধা দাড়—তার উপর দিয়ে দেহভার সামলাতে সামলাতে যাতায়াত করতে যাচ্ছি।

'বিল' বলল—'রোপ ওয়াকিং (দড়ির উপর পা রেখে শূন্যে হাঁটাহাঁটি) ত তোমাদের দেশের যাদুকরেরা ভালই জানে শুনেছি। তোমার আর ভাবনা কি?

ভাবনা ত সে জন্যই। ওরা ভাবছে যে আমার চরণে যাদু আছে।

কিন্তু ওরাও জানে না যে দেশে থাকতে আমি ভানুমতীর খেল পর্যন্ত দেখি নি। অবশ্য যেভাবে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে প্রথম ভারতীয় হিসাবে এসে দাঁড়িয়েছি ও যেভাবে আমায় দেখতে, আমার সঙ্গে গল্প করতে, আমার হাত দেখার বিদ্যা পরীক্ষা করতে গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে পড়েছে তার চেয়ে বড় ভানুমতীর খেল আর কিই বা হতে পারে?

মুখে বললাম—আমি যদি দড়িতে হাঁটাই জানব তবে দড়ি পাহাড়ে বেঁধে উপরে উঠবার এত আয়োজন কেন?

'জিম' বলল—তবে যাদুকরী

গালিচা উড়িয়ে উপরে উঠে গেলেই হয়।

হেসে ফেললাম। বললাম—জিম, ম্যাজিক কার্পেট যদি কোথাও থাকে তা আছে এই পৃথিবীতেই পাতা। আকাশে তা উড়ে যায় না। ওই পাহাড়ের উপর যদি এক টুকরো শ্যামল জমি দেখতে পাই কাল, সেটাই হবে ইরাণের ম্যাজিক কার্পেট।

বিল মাথা নেড়ে বলল—ঠিক কথা, তার চেয়ে বেশি দামী কার্পেটে আমাদের কাজ নেই।

(২)

ভোর হ'ল। ভোর রাত থেকেই আয়োজন সুরু হয়েছিল, প্রথমে হেঁটে মাইল দুই প্রান্তর পার হয়ে যেতে হবে, সেখানে নদী ও সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে সেখানটি ছেড়ে যেতে হবে—যদিও সেখানে এসে মনে হয় সেই রূপকথার বালকের মত যে সোনার পাহাড়ই যখন এত সুন্দর কাজ কি আর হীরের পাহাড়ের সন্ধানে গিয়ে?

কিন্তু "আগে চল আগে চল ভাই।"

উষার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবার আগেই এই প্রস্তরলাঞ্ছিত পার্বত্য পথটুকু অতিক্রম করে যেতে হবে। আজই শেষদিন ও শেষরাত্রি এই যাদুকর দ্বীপে। কাজেই কুলিন মাথায় মেঘের পাগড়ী চড়িয়ে আজো আমাদের দূরে ঠেলে রাখতে চায় কি না তা দেখবার জন্য আর অপেক্ষা করা চলবে না। পা চালিয়ে চললাম।

দুধারে শ্যামল বন—রাসপ্ বেরীর জঙ্গল। ইচ্ছা হয় হাত বাড়িয়ে গোটা কতক ছিঁড়ে নিয়ে এখানেই খেয়ে নিতে। মনে মনে ওর নাম দিলার রসভরি।

রস কিন্তু আমাদের মনেই ভরা ছিল, তাই ঠিক করে নিলাম যে ওই রা্প বেরীগুলি ফিরবার পথে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে হবে—জ্যাম বানাবার জন্য। রসিক ভাগ্যবিধাতা যে মনে মনে হাসছিলেন তা ত আর জানতাম না।

ক্রমে হাঁটা পথের চিহ্ন মিলিয়ে যেতে লাগল। এখন থেকে সুরু হবে চড়াই—খাড়া চড়াই। শিরদাঁড়া-ভাঙা চড়াই। আমরা চলেছি বিদেশ বিজয়ে। সম্মুখে যে পথ তা হচ্ছে দুর্গম। তা জয় করে নিতে হবেই। পিছনে হটবার পথ নেই, কারণ এ হচ্ছে অগস্ত্যযাত্রার পথ। এ পথে ওঠা যায়, নামা যায় না। পাহাড়ের ম্যাপে চিহ্ন দেওয়া আছে পরিষ্কার-ভাবে, এবং এদিক দিয়ে উঠবার পথে কোন পদচিহ্ন নেই। ঘোরা পথে একটা সহজ রাস্তা আছে কিন্তু আমরা সহজ পথের পক্ষপাতী নই।

ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলাম, সোজা একটানা উপরে চড়াই করা যায় না; তাই নদীর স্রোতের মত আঁকা-বাঁকা চালে চড়তে হবে, হঠাৎ পায়ের নীচে একটা পাথর খুলে গিয়ে চড় চড় শব্দে সজোরে পড়ে যাবে, উপায় নেই পিছু ফিরে দেখার রে ঠিক নীচেই যে সঙ্গী আসছে তার মাথায় বা গায়ে সে পাথর লাগল কি না এবং তাকেই সঙ্গী করে অতলপ্রায় নীচে তলিয়ে গেল কি না, কাজেই আঁকা-বাঁকা স্রোতের মতই উঠতে হবে।

খানিক দূর উঠে দেখি যে এত পাহাড় নয়, এ যেন পাথর-টুকরার একটি অনন্ত স্তূপ। নিজেকে সামলাবার জন্য যে পাথরে হাত দিই সেটাই নড়বড়ে দাঁতের মত ঠাট্টা করে ওঠে। যে পাথরে পা দিই তাই ভূমিকম্প তোলে। আর জাগিয়ে তোলে হৃৎকম্প, হায় যদি আসি কোন মন্ত্রবলে লাট-সাহেব বনে যেতাম তাহলে কোন "এডিকম্প" সাহেব (A. D. C.) নিশ্চয়ই আমার আগে আগে পা ফেলে এই কম্পমান পাথরগুলি পরখ করতে করতে এগিয়ে যেত।

ইতিমধ্যে হৃদয়ের ইঞ্জিনখানা পুরানো ফোর্ড গাড়ির ইঞ্জিনের মত ধ্বকর ধ্বকর করে আওয়াজ করে ঝগড়া করতে সুরু করেছে ভিতরে ভিতরে। ডালভাতের সনাতন শাস্ত্র-সম্মত ভোজনে যে ইঞ্জিন গ'ড়ে উঠে তা বোধহয় এতো চড়াইয়ের উপযুক্ত নয়। ভাবতে ভাবতে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম তাদের খবর।

বিল বলল যে, একটু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ওঠাই ভাল।

জিম বলল—ঠিক কথা—পাহাড় চড়াই ত একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—প্রকৃতির রূপ দেখাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। দেখ, দেখ, সমুদ্রের উপরটা কেমন আলোর ওড়নায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম যে ওদের ইঞ্জিনেও কিছু তৈল দেওয়ার দরকার হয়েছে।

কিন্তু কোথায় বসা যায়? এতো নিরাশ্রয় ত্রিশঙ্কুর নিরেট রাজ্য। পায়ের নীচের যেটুকু আশ্রয় আছে তা দেহভার বহনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, আর তিন-জনে যদি মুখোমুখি হয়ে বসতেই না পারি তাহলে সঙ্গসুখের আনন্দই বা হবে কি করে? আর একটা ঝরণাও ত থাকা দরকার। না হলে টিনগুলির সৎকার করব কি করে? কিন্তু দূরে যেন কোন পাহাড়ী জলবালিকার কলহাস্য শোনা যাচ্ছে। সেদিকে এগিয়ে চললাম খানিকটা নীচে নেমে এসে। পাহাড়ের ছায়ায় পাথরে বসে জলের নীচের নুড়ির উপর পা রেখে ঝরণার গান শুনতে শুনতে খেয়ে সে কি শান্তি আর আনন্দ। তার কাছে কোথায় লাগে স্বর্গসুখ।

(৩)

জিম সখেদে বলে উঠল—আর ভাল লাগে না। পথ ত দেখি কোন দিকেই পাওয়া যায় না।

জিমই এখন হচ্ছে আমাদের তিনজনের বাহিনীর "ভ্যানগার্ড" —পথ দেখাবে আর সামলাবে, ভাগা-ভাগি করে আমরা এই দায়িত্ব নিয়েছি।

বলে উঠলাম—না পাওয়া যাক আমরা বিপথেই উঠব, পথের জন্য ত আমরা বের হই নি।

বিল সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিল,

বলল—ঠিক কথা, পথ হচ্ছে আব সকলের জন্য। আমবা পথিক নই, তাই পথ ছেড়েই আমবা চলব।

অতএব আবম্ভ হল সামনের পাষাণ প্রাচীরের উপর পদচালনের বৃথা প্রয়াস। বাব বাব চেষ্টা করি এখানে ওখানে পা রেখে চাড়া দিযে একটু উঠে আসতে, বার বার অন্য পাথবেব ভরসায় সরে আসতে হয়। তবু হাল ছাড়ি না। এদিকে সূর্য প্রায় মাথাব উপর উঠে এসেছে।

চতুস্পদ হ'তে হ'ল শেষ পর্যন্ত। কারণ খানিক দূর উঠে আর দুখানা পায়ে কুলাচ্ছে না। চার হাত পা দিযে হামাগুড়ি দিযে শিশুর মত পথ খুঁজে উঠতে লাগলাম। তার মধ্যে আবার দুয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট পাহাড়ী ঝোপ পাওয়া গেল, কিন্তু কি কাঁটার বহর তাদের গায়ে। ক্যুলিন পর্বত প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তাব চূড়ায় যে অভিসারে আসবে তাকে আসতে হবে নিজ বীর্যে বিজয়ী হয়ে, কোন সহায়তাই সে পাবে না এই বন্ধুর বন্ধুহীন পর্বতগাত্রে।

বিল করুণভাবে বলল—এতদিন অত্যন্ত একটা অন্যায় করেছি, অত্যন্ত অন্যায়।

বলতে বলতে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

সান্ত্বনার সুরে বললাম—কি আর এমন অন্যায় করেছ যে, এই শীতের দেশে সে কথা মনে করে ঘেমে উঠতে আরম্ভ করলে ?

সখেদে সে বলল—হায়, যাদের দাঁত উঁচু তাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসতাম কিন্তু আজ যদি আমার উঁচু দাঁত থাকত।

ব্যাপারটা দেখলাম জিম ঠিকই বুঝেছে, সে শুধু প্রায় উপুড় হয়ে চড়াই করতে কবতে একটা বিচিত্র মুখভঙ্গি করে উঠল, বুঝতে বাকী রইল না যে পাবলে সে দাঁত দিয়ে পাথব কামড়িয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করত এখন।

আব আমাব দাঁতগুলিব ততক্ষণে পরস্পরকে সজোরে চেপে ধবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন না পালিযে যায় সেজন্য পাহারাওয়ালাব কাজ কবছে।

হঠাৎ দেখতে পেলাম নীচেব দিকেই যেন হড় হড় কবে নেমে যাচ্ছি, কারণটা খুব সহজ। যে প্রকাণ্ড পাথবটিকে দুবাহু দিযে আঁকড়িযে নিজেকে টেনে হেঁচড়িযে উপবে তুলবার চেষ্টায় আছি, সেটি দেখি বিশ্বাসঘাতকতা কবে একটু একটু নীচের দিকে গড়াতে সুরু করেছে। তাড়াতাড়ি সেটি ছেড়ে দিয়ে যেখানে আছি সেখানেই শুয়ে পড়লাম। ব্যস। বড্ড বেঁচে গেছে আজ এই নিরীহ ভারতসন্তানের পৈত্রিক প্রাণটা।

তখন একবার মনে হল ডি এল রায়েব নন্দলালের কথা, বেচারা বড় স্বদেশপ্রাণ। "আমি যদি মরি দেশের হইবে কিবা ?" এইজন্যই সে জীবনে কোনদিন কোন কঠিন কাজ বা ত্যাগস্বীকার করতে পারল না। কিন্তু তারই দেশেব লোক হযে একই তেলে জলে মানুষ হবে যে এসব নিন্দনীয় ভবঘুরে গুণ্ডাজনোচিত কাজ কবতে চায় দেশের সে অত্যন্ত অযোগ্য সন্তান। ওই নিরুকণ নির্বান্ধব ক্যুলিনের পাথর ছড়ানো শরশয্যাই তার উপযুক্ত স্থান।

কিন্তু প্রস্তরশয্যা ত কাউকে স্থান দেয় না। হয় উপবে উঠে যেতে হবে যেমন করে হোক, না হয় এখান থেকে খাড়াই পাহাড়েব গা বেয়ে নামতে চেষ্টা কবে অপঘাত মৃত্যু। কাজেই আবার মনে পড়ল "আমি চঞ্চল হে।" অবশ্য ঐ কথাগুলিতে যে উদার বিশ্ববিসারী চঞ্চলতার আভাস আছে সে চঞ্চলতা নয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা।

ঘড় ঘড় কবে একটা প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে গেল মাথার পাশ দিযে, বুঝলাম আমাদের মত আরো কোন একটি দল আমাদের আগেই রওনা হয়েছে, কিছু সাহস হল। আর কিছু ভযও। কারণ ওই রকম কয়েকটি পাথর পব পর পড়তে সুরু করলেই আমাদের কাউকে সঙ্গে নিযে নেমে যেতে পাবে। পবস্পবকে সাবধান করে দিলাম।

এদিকে মেঘ ঢেকে আসছে চাবদিকে। আমরা নিজেদেরকেই সব সময় দেখতে পাচ্ছি না এমন ঘন মেঘ। ভয় আছে যে তাড়াতাড়ি যদি চূড়ায় চড়া শেষ না করতে পারি তাহলে নীচে নামবার পথ খুঁজে পাব না। সঙ্গে ম্যাপ আছে। কিন্তু চারদিকে চোখে দেখেই ত সে ম্যাপের নির্দেশ ঠিক করে নিতে পারব। ম্যাপের কথা মনে পড়তেই মনে পড়ল পিঠে বাঁধা রুকস্যাকটার কথা। ওটাকে এতক্ষণ ভুলেই ছিলাম—এখন মনে হতে লাগল যে বুড়ো সিন্দাবাদের মত ওটা ঘাড়ে চেপেছে, ওটাকে যদি কোন মতে নামান যেত পিঠ থেকে।

চারিদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসছে। আমরাও দ্বিগুণ চেষ্টায় উপরে উঠবার জন্য হাতড়িযে বেড়াচ্ছি। আজ যেন পাহাড় চড়াইয়ের শেষ নেই। মাথা তুলে মুখ উঁচু কবে যে ভাল করে দেখে নেব যে আবো কতখানি বাকী আছে তারও উপায় নেই। পাহাড়ের গা-টা এতই খাড়াই।

তবু বড় আশা ও চেষ্টা করে হাতদুটির উপর ভব দিযে একবার কোন রকমে মাথাটা পিছনেব দিকে হেলিযে দিলাম। দেখি যে উপরে খাড়ির দেওয়ালের মত সোজা খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল, তার মধ্যে এদিকে-সেদিকে ছড়ানো কিছু পাথব বেবিযে আছে। প্রাচীনকালে দুর্গেব দবজাগুলিতে যেমন ভাবে কাঁটা ফুটান থাকত, ঠিক তেমন ভাবে পাথর ফোটান রয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই কাঁটাতেই দড়ি ফাঁস লাগিয়ে একটি দল নিজেদেরকেও সেই দড়ি দিয়ে বেঁধে পাহাড় চড়ছে। বুঝলাম যে আমাদেরও তাই করা উচিত হবে এখন, পাহাড়ের গায়ে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা মন্ত্রণাসভা বসান গেল।

মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ—

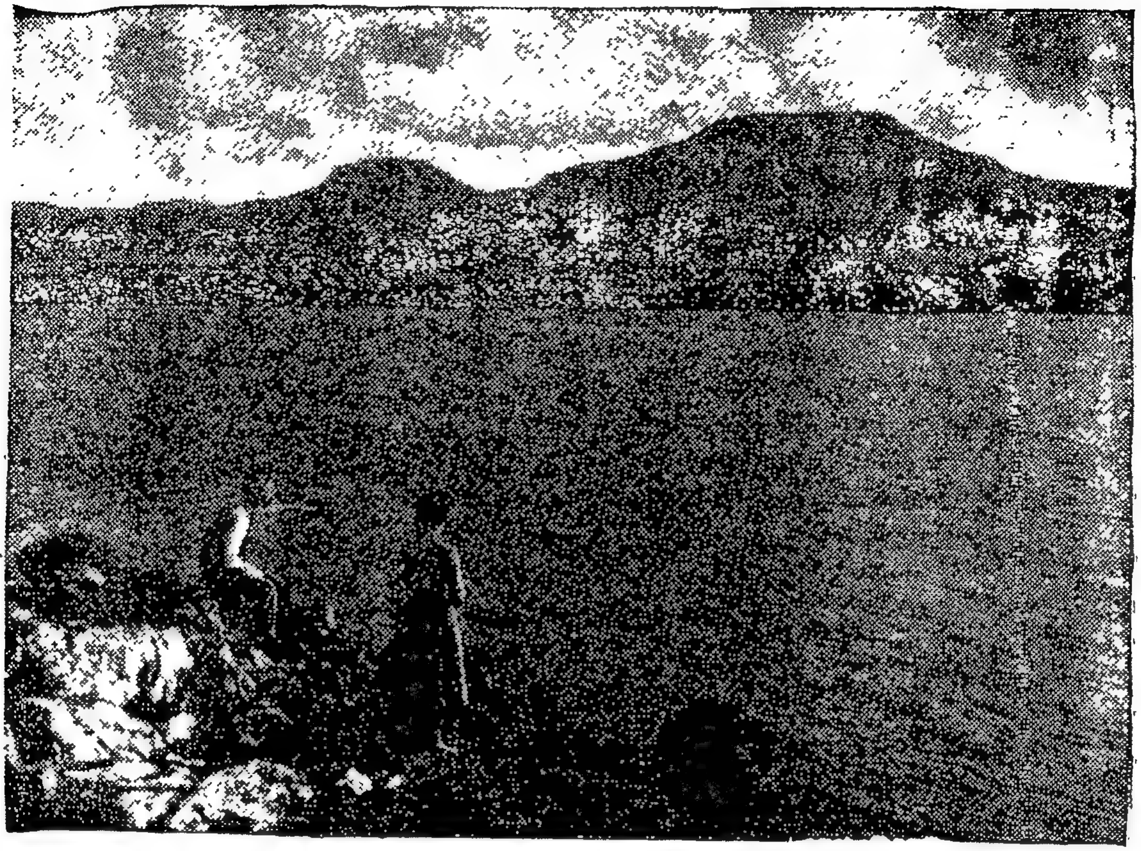

● "স্কাই" দ্বীপের একটি মনোরম দৃশ্য

সংস্কৃত প্রবাদটির অর্থ তাদের বুঝিয়ে দিলাম, কিন্তু কথাটা নিজেদেরই মনে জুৎসই লাগল না। প্রায় ত শেষ করে এনেছি। স্বর্গারোহণ পর্ব। এখন কি নিজেদের হাত-পায়েব অক্ষমতা স্বীকার করে কোমরে দড়ি বাঁধব? আমি বললাম—না, সে হবে না। আমাদের দেশে চৌকিদাররা চোরের কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যায়। সে মূর্তিতে ক্যুলিনের কাছে দূরাশা করার জন্য দণ্ড নিতে যাওয়া চলবে না। আমি রাজি নই, "রোপ ক্লাইম্বিং" করতে।

উপমাটা সকলেরই মনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললাম যে না চোরের মত চূড়ায় চড়া চলবে না। আমরা হাতে পায়ে যুদ্ধ করেই গিরিচূড়া জয় করব, এখনো বেলা আছে। উপরে উঠতে না হয় বিকালই হয়ে গেল। বিশ্রাম না করেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসব। আর অন্ধকার যদি ঘনিয়ে আসে ত, আসুক, তাতে কি ভয় পেয়ে যাব আমরা?

কলম্বাস আমেরিকা প্রথম দেখে এতখানি চমৎকৃত ও আনন্দিত হয়েছিল কি না জানি না। আমাদের তিনটি তরুণ হৃদয় আনন্দে গৌরবে সাফল্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠল, পেরেছি, পেরেছি। তিনদিন প্রতীক্ষার পর প্রথম চেষ্টাতেই আমরা জয়ী হয়েছি, এদিকে বেলা শেষ হয়ে এল বলে। বিজয়ের আনন্দ বসে উপভোগ করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। এখনি সন্ধ্যারাণী তার রক্তিম সরমের উপর তিমিরগুণ্ঠন ছড়িয়ে দিয়ে যাবে।

তা হোক। কিন্তু হে শৈলশিখরের পশ্চিম বাতাস এসো তোমায় নিঃশেষে পান করে নিই। জীবনে এমন কিছু বৃহৎ বা মহৎ কার্য করা হয় নি। কোন কাগজে বা বেতারে প্রচার করবার মত সংবাদ নয় এটা, কিন্তু হে তরুণের দুঃসাহসী দেবতা, তোমার চরণস্পর্শ যেন অন্তরে চিরকাল সুস্পষ্টভাবে বিরাজ করে। তোমারই বিশ্বব্যাপী জয়গানে যেন মন চিরধ্বনিত থাকে। ভালো লাগে, ভালো লাগে এ জীবন—যার মধ্যে সব বাধা ও বিপদ পায়ে পায়ে দলিত করে অকুণ্ঠ অক্ষুণ্ণ সাহসে এমন ভাবে এগিয়ে যেতে চাই। সুদূরের সুদুর্লভের সন্ধানে নিরুদ্দেশের অভিযান বেরিয়ে পড়তে চাই, এই অখণ্ড অব্যয় জীবন, জন্ম হতে জন্মান্তরে যে জীবনের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে চলে যেতে চাইব—এই জীবন যার প্রতীক হচ্ছে এই দুর্গম দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ—এই অচল যার শিখরে আরোহণ করেও আমি চঞ্চল হে।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দুরন্ত দেহলী

॥ সতেরো ॥

ক্লান্তপদে সমর যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেছে। তার মনে হল যেন জানালার ধারে অরুণাই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। রজনীগন্ধার স্তবকে তার কবরী ছিল সুসজ্জিত। বাড়িতে আলোকসজ্জার একটু আতিশয্য দেখে সে নিজেই একটু অবাক হয়ে গেল।

গেট দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতেই লেডী কিং বণ্ড এসে অত্যন্ত আনন্দের সাথে সমরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন। সমর কিছুই বুঝতে পারছিল না। লেডী কিং কণ্ড নিজে হাতে করে রেকাবিতে করে মিষ্টি নিয়ে এলেন। অরুণাকে ডাকলেন। খুশিতে গাম্ভীর্যে মেলানো ভাব নিয়ে অরুণা এসে দাঁড়ালো পাশে।

সমর হাঁ করে বোকার মতন তাকিয়ে রইলো। লাল টকটকে বেনারসীখানায় অলঙ্কার সজ্জিত অরুণাকে অপরূপ সুন্দর মানিয়েছে। সমরের মাথায় যেন কিছু ঢুকছিল না। সে হতবাক হয়ে একবার অরুণার দিকে, একবার লেডী কিং বণ্ডের দিকে তাকাতে লাগলো।

লেডী কিং কণ্ড খিল্ খিল্ করে হেসে ফেললেন। মনে হল যেন আটটা মটকার জল এক সাথে কল্ কল করে গড়িয়ে পড়ল।

সমরের মনের প্রশ্ন তিনি বুঝতে পেরেছেন। 'সন্ধ্যা থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। জানো তো বাবা আজ অরুণাকে তারা দেখতে এসেছিল। ছেলেটি বেশ। অনেকটা তোমার মতন। ভাল ছাত্র ছিল। এখন কলেজের অধ্যাপক। তুমি থাকলে তার সাথে আলাপ করে খুশিই হতে। এইবার একটা শুভদিন শুভক্ষণ ঠিক করতে পারলেই বিয়েটা হয়ে যাবে।'

সমর যেন আকাশ থেকে পড়ল। অরুণা তাকে এ সব ঘটনায় একটুখানি সঙ্কেতও দেয় নি। শুধু বলেছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। পড়াশুনোর প্রশ্ন আছে জমে।

সমরের চোখ অরুণার ওপর পড়ল। অরুণাও তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। অত বড় একটা ছলনা দেবার জন্য দুষ্টুমি ভরা চোখে সমরকে যেন ইঙ্গিতে কি বলার চেষ্টা করল।

লেডী কিং কণ্ড আবদারের সুরে বলল, "এবার কিন্তু সরমাকে দিল্লী আনাতে হবে। যাই বল বাবা, অন্তত দু'পাঁচ দিনের জন্য তাকে দিল্লী আনা চাই। আমার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউই নেই। তোমরাই সব। তোমার বন্ধু কি যেন নাম—"

সমর বলল, 'নৃপেন।'

—'হ্যাঁ ঐ নৃপেনকেও একটা খবর দিয়ে আনিও। কাজের ছেলে সব। আমার বাড়ির এইটেই তো প্রথম ও একমাত্র কাজ।'

সমর জানাল সে নৃপেনকে খবর দেবে।

অরুণা বলল, 'নৃপেনবাবুকে তো তুমিও খবর দিয়ে আনাতে পারো। উপেনের হাতে চিঠি দিয়ে দিলেই হবে। তুমি ওকে বলো বৌদিকে নিয়ে আসতে।' বলেই সে সমরের দিকে জবাবের জন্য তাকায়।

সমর কোন জবাব না দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

অরুণা বলল, 'কথা বলছেন না যে? বৌদিকে আনবেন না?'

সমর আমতা আমতা করে বলল, 'আহা, বিয়েব তারিখ-টারিখ ঠিক হোক তো আগে। তারপর দেখা যাবে। সময় তো আছে অনেক হাতে।'

লেডী কিং কণ্ড বললেন, 'খাও বাবা মিষ্টিটুকু। ফেলে রাখলে কেন? ও অরুণা এক গেলাস জল নিয়ে আয় না।'

মিষ্টিটা যেন সমরের গলা দিয়ে ঢুকছিল না। তার কেবল 'ভুলি নাই' সত্যেশ জটিনীর কথাই মনে হচ্ছিল। ঐ তটিনীই যত নষ্টের গোড়া। জোর করে তাকে সাহিত্য-সভায় নিয়ে যাবার কি দরকারটা ছিল? সাহিত্য-সভায় না গেলে সে নিশ্চয়ই নতুন অধ্যাপক অতিথিটিকে দেখতে পেত। অরুণাই বা কি করবে? তার পক্ষে এ খবরটা দেওয়া একটু দ্বিধাজড়িত ব্যাপারই বটে। সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের পক্ষেই এটা দ্বিধার ব্যাপার। অরুণা সাধারণ মেয়ে। অসাধারণত্ব তার ভিতর কিছুই নেই।

সারাটি রাত কোন্ অজানা একটা অস্বস্তি ভাব,—সমরের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে কৃতী ছাত্র। পরীক্ষার সময়ে তার বিশেষ কোন চিন্তা হত না। পরীক্ষার পর চাকরীর জন্য তার নিশ্চয়ই চিন্তা ছিল।—ঘোর চিন্তা। কিন্তু তখনও এরকম কোন মানসিক অস্বস্তির ভাব তার হয় নি। এ কোন্ নতুন ভূত তার মাথায় চেপে বসেছে। নানাভাবে সে ঘুমোবার চিন্তা করল। বইতে—পড়েছে নদীর স্রোতের কথা চিন্তা করলে ঘুম পায়। সে হরিদ্বারের খরস্রোতা গঙ্গার দৃশ্য স্মরণ করল। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। একখানা বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। বই-এ মনোযোগ দিতে পারলো না।

বনানীকে দেখার পর খানিকটা এরকম ভাব তার মনে হয়েছিল। তার অন্য কারণ ছিল। সে রাতে তার কল্পনায় ভেসে এসেছিল বনানীর মন-মাতানো রূপ। কি সুন্দর তার আঙুলগুলো, যেন কনকচাঁপা ফুল। কি সুন্দর পলাশ ফুলের

মতন তার চোখদুটি। বনানী অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে সরষরক্ত রাগে তাকে কিসের যেন একটা অনুনয় জানিয়েছিল। বনানীর দিকে সে মুহূর্তমাত্র তাকিয়েছিল। সে রাতে সে নিজেকে অপরাধী মনে করেছিল? তার মনে হয়েছিল নৃপেনের সাথে মিলে এ অভিনয় না করলেই বোধহয় হত ভাল।

কিন্তু আজ? আজ তার ঘুম কে কেড়ে নিল? সাহিত্য-সভা থেকে ফিরে সে অরুণার যে রূপ দেখলো—তাতে তার মুগ্ধ হওয়ারই কথা। মুগ্ধ সে হয়েছে। কিন্তু তার মনটা আজ এত চঞ্চল এত উদাস হয়ে উঠলো কেন? হঠাৎ তার মনে হল যেন পৃথিবীটা কিছুই নয়। পড়াশুনো, চাকরী, সাহিত্য সবই মিথ্যা, সবই ছলনা। মনকে সে নিজেই প্রবোধ দিতে চাইল। অরুণা যুবতী। সে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে। না-দেখা অধ্যাপক যুবকের ছবি সে কল্পনা করে নিল। এতো রোজই হচ্ছে। এতে অসাধারণত্ব কিছুই নেই। সব মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারেই রোজ ঘটছে। মেয়ে বড় হচ্ছে। সবাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাত্র খুঁজছেন। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অরুণাও বড় হয়েছে। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাতে সমরের কি?

ওদিকে অরুণার ঘরে সে নাইট বাল্বটা জেলে বালিসটাকে আঁকড়ে ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। ঘুম না পেলে বালিসটায় মাথা না দিয়ে মাথায় বালিসটা দিলে অনেক সময়ে ঘুম পায়। অরুণা বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের ভিতর পায়চারি শুরু করল। তার হৃদয়টা ময়ুরের মতন নাচছিল কি না বাইরে থেকে ঠিক ধরা যাচ্ছিল না। তবে তার মনটা যে খুবই চঞ্চল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। বাগদত্তা সব মেয়েরই ঐ চঞ্চলতাটুকু আসে। নাইট গাউনটা ফেলে সেই গভীর রাতে সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজতে বসল। সামনের একটা চুল কুঞ্চিত করে কপালের উপর ফেলাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যায় যে রজনীগন্ধার গুচ্ছ মাথায় বেঁধেছিল, যেটা ড্রেসিং টেবিলের মাথায় রাখা ছিল, সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল।

প্রায় সারাটা রাত জেগে সমর শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছুটির দিন। কোন তাড়া ছিল না। অলস নিদ্রার বিলাসিতায় ছুটির সকালটা কাটানোই ছিল তার উদ্দেশ্য।

অরুণার ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। অরুণা বলল, 'না ডাকলে বোধ হয় সারাটি দিনই আপনি ঘুমিয়ে কাটাতেন। কতক্ষণ হ'ল এসেছি। দরজা-জানালা খুলে শোবার অভ্যাসটা এখনও আপনার গেল না।'

সমর তাড়াতাড়ি নিজের বেশ সংযত করে উঠে দাঁড়ালো।

সারারাতের অস্বস্তির কোনো উল্লেখই করল না। কিছুই যেন হয় নি এ রকম একটা ভাব নিয়ে বলল, 'অরুণা তোমাদের আশ্রমের সেই গুরুদেবের আশীর্বাদের ফল বেশ তাড়াতাড়িই পেয়ে গেলে বল?'

অরুণা বলল, 'কেন আপনার হিংসা হচ্ছে?'

সমর বলল, 'তা বোধ হয় ততটা হচ্ছে না। সেই ভাগ্যবান অধ্যাপকটিকে কাল দেখতে পেলে খুশিই হতাম। এবার তোমার আর যাই হোক পড়াশুনোর জন্য কারুর আর সাহায্যের দরকার পড়বে না। কি বল?'

অরুণা বলল, 'কে জানে? অধ্যাপকের কিছুই আমি জানি না। যে অধ্যাপককে আমি জানি, তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি।'

কথায় বার্তায় হাসি-পরিহাস থাকলেও সমরের মনের সেই অস্বস্তির ভাবটা যেন সে তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। যে লোকটার আসন্নবিরহে তার মনে এই গভীর বেদনা সে লোকটা সামনেই বসে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস সে অনুভব করছে। তবুও মনে শান্তি নেই। যার জন্য সমরের মনে এ গভীর বেদনা সেই লোকটিকে সম্পূর্ণ শান্ত সুস্থ ও অটল দেখে সমরের মনটা আরও দমে গেল।

অরুণা বলল, 'তামাসা নয়। সত্যি করে বলুন, বৌদিকে নিয়ে আসছেন এবার?'

সমর বলল, 'এবার মানে?'

—'এবার মানে বাড়ির কাজের সময়ে।'

সমর বলল, 'ও বাড়ির কাজের দিনটা স্থিরীকৃত হোক। তখন দেখা যাবে।'

অরুণা বলল, 'উঃ আপনি লোকটা একটা নিষ্ঠুর। পাষাণ।'

সমর অবাকভাবে বলল, 'কেন? কেন বল তো?'

অরুণা বলল, 'দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল। এই আমাদের এই বাড়িতেই কত মাস কেটে গেল। আপনি একটিবারও তাকে দেখতে গেলেন না? আপনার কি একটিবারও তাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?'

সমর বলল, 'ঠিকই বলেছো। চিঠিতে সরমাও সেই সব কথাই লেখে। তোমার কথা লেখার পর থেকে তাঁর একটু একটু যেন ভয়ও হয়েছে। এবার ভাবছি তোমার বিয়ের সময়েই একবার তাকে গিয়ে দেখে আসব। আসতে চাইলে নিয়েও আসতে পারি।'

—'আমার সম্বন্ধে আপনি কি লেখেন?'

—'সে তো একদিন বলেই দিয়েছি। লিখি ছাত্রীটিকে রোজই পড়াতে হয়। মাঝে মাঝে থিয়েটারে, আশ্রমে নিয়ে যেতে হয়। যখন যেমন হুকুম হয় তখনই তেমনটি করতে হয়। তোমার বৌদি এসব ব্যাপারে খুব উদার। কিছু মনে করেন না।'

অরুণা বলল, 'আমি হলে কখনও এরকম স্বাধীনতা দিতাম না। তাছাড়া এত দীর্ঘকাল কখনই চোখের বাইরেও থাকতে দিতাম না। বোধহয় পারতামই না।'

পরিহাসের সুরে সমর বলল, 'তাহলে অধ্যাপক বেচারাকে বেশ কড়া শাসনেই থাকতে হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু বেচারা যদি তোমার কড়া শাসন না মানেন?'

অরুণা বলল, 'আপনি কি যে বলেন? সেই অধ্যাপক সম্বন্ধে আমি কিছুই ভাবি না। ভাবার বোধহয় দরকারও পড়বে না। আমার প্রয়োজন যাকে তাঁর নাম সরমা। এখান থেকে কোথাও যাবার আগে তাঁকে আমার অনেক কথা আছে বলার। দোহাই আপনার, তাঁকে নিশ্চয়ই একটিবার দিল্লী নিয়ে আসুন।'

সমর বলল, 'তাকে বলবে তো এ অকেজো লোকটাকে সাবধানে রেখো। লোকটা নেহাতই অপদার্থ। যে ডাকে তাকেই অর্থের বিনিময়ে পড়াতে যায়।'

—'আপনি কি করে জানলেন আমি তাঁর কাছে শুধু আপনার নিন্দেই করব?'

—আমার সম্বন্ধে এ ছাড়া বলার আর কিছুই থাকতে পারে না যে।'

—'তাহলে নিজের থেকেই আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আপনার কোনো গুণ নেই?'

—আমি তো কখনও নিজের কোনো গুণের গর্ব করি নি। করেছি কি?'

অরুণা অভিমানের সুরে বলল, মেয়েলোক হলে বুঝতেন সেইটাতে তারা কত অপমানিত বোধ করে। আপনি মেয়েদের উপেক্ষার চোখে দেখেন। আপনি তাদের অবহেলা করেন। আমি জানি আপনি সেজন্যই নিজেকে তাদের কাছে সর্বদা যক্ষের ধনের মতন লুকিয়ে রাখেন। তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে চান না?'

সমর বলল, 'আত্মপ্রকাশ করি নি? মানে? যেমন ধরো?'

অরুণা বলল, 'যেমন ধরুন আপনি কখনও আমাকে বলেছেন যে আপনি সাহিত্যিক?'

আকাশ থেকে পড়ে সমর বলল, 'আমি সাহিত্যিক? কে বলল?'

অরুণা বলল, 'আপনার কবিতা আমি পড়েছি। নতুন পত্রিকাতে আপনার ধারাবাহিক উপন্যাস বেরুবে। আপনি ভেবেছেন। এ সব খবর আমি জানি না?'

সমর বলল, 'সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো অরুণা, আমি ও সব খবরের কিছুই জানি না। সবই নেপেনদার ব্যাপার। কবিতা? সে অবশ্য কোনোকালে লিখতাম।'

অরুণা বলল, 'বন্ধ করলেন কেন?'

সমর বলল, 'কবিতা লেখার সখটা আমাদের মতন লোকের পক্ষে একটা বিলাসিতা মাত্র। দিল্লী থেকে সবাই মিলে কবিতার যতগুলো পত্রিকা প্রকাশ করলাম কোনটাই টিঁকলো না। মাঝখান থেকে দেনাটাই বেড়ে গেল। মাইকেল থেকে সুরু করে সুকান্ত পর্যন্ত কবির দিকে তাকালেই দেখবে বাংলা দেশে কবির জায়গা কোথায়, রজনীকান্ত, নজরুলদের দিকে তাকিয়ে দেখো। বুদ্ধদেব, প্রেমেন মিত্র তো কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছেন। সেখানে আমার কবিতা লেখার স্কোপ কোথায়? যাক গিয়ে, কিন্তু তুমি সে সব খবর জানলে কেমন করে? তোমার তো ও সব খবর জানার কথা নয়?'

অরুণা বলল, 'অনেক খবরই তো আমার জানার কথা নয়। কিন্তু কি জানি সব খবর কোত্থেকে কেমন করে আমার কাছে হাওয়ায় উড়ে আসে।'

সমর মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। সে যে অবিবাহিত, বিবাহিত বলে নিজেকে চালাচ্ছে এ সব খবর অরুণা জানতে পারে নি তো? সে বলল, আসল কথাটি কি জানো? আমার কোন খবরই কেউ রাখে না। রাখার প্রয়োজনও পড়ে না। আমার কবিতা লেখার খবরটা সত্যি বলছি, নেপেনদা ছাড়া বোধ হয় এই দিল্লী শহরে কেউই জানে না?

অরুণা বলল, মানে? আপনি বলতে চান সরমাদিও জানেন না?

প্রতিটি কথায় সরমাকে আনা চাই!

সমর বলল, তিনি জেনেই বা কি করবেন বল। তা ছাড়া বোধ হয় বিয়ের পর কোন কবিতাই লিখি নি। লেখার সুযোগও ঘটে নি। আজকালকার মেয়েরা কবিতার দিকে বেশি ঘেঁসেন না। ঘেঁসতে চান না। চুটকি গল্পটাই তারা বেশি পছন্দ করেন। যে কোনো ম্যাগাজিন খুলে গল্পের পৃষ্ঠাগুলো খুলে বসতেই ভালবাসে। সরমার সাথে অবশ্য কখনও সাহিত্য সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নি।

—আজকালকার মেয়েদের কবিতা ভালো লাগে না, আপনি ঠিক জানেন? আমার তো ধারণা আধুনিকাদের সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞানই নেই। সরমাদি সম্বন্ধেও আপনি সত্যিই কোনো খবর রাখেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সমর বল, 'সত্যি কথাটা বলব কি? মেয়েরা—সে আধুনিকাই বল বা প্রাচীনাই বল, প্রাচ্যের বল, পাশ্চাত্যের বল সর্বত্রই শুধু একটি জিনিষ পছন্দ করে—সেটা হল বাসা বাঁধা। মানে নীড় রচনা। সে নীড়টুকু রচনা করতে তারা আধুনিক কবিতা কেন স্নেক চার্মার নাচও শিখতে রাজী থাকে। নীড় রচনার পরে সে শিক্ষাটাকে তারা সিঁকেয় চড়িয়ে রাখেন। নাচ গান কবিতা সবকিছু তখন থাকে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ধামা চাপা। তবে তুমি যখন কবিতা শুনতে ভালবাস তোমাকে নিশ্চয়ই কবিতা শোনাবো। কবিতার খাতা আমার কাছে নেই। অনেক কবিতাই মুখস্থ আছে। কোন ধরণের কবিতা শুনবে? রোমান্টিক? কিন্তু শোনো একটা সর্ত আছে। কবিতার বদলে শোনাতে হবে গান। কে জানে কোথাকার কোন্ অধ্যাপক কোন্ অজানা দেশে বিজয়মালা পরে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আর হয়তো আমাদের দেখাও হবে না। তুমি হবে ঘোর সংসারী। আমি আমার খেয়ালী মন নিয়েই ঘুরে বেড়াবো। চলবে আমার ভবঘুরে যাযাবর জীবন।

বলতে বলতে সমর কোন্ অজানা জগতে চলে যাচ্ছিল।

অরুণা বলল, যাই বলুন, সরমাদিকে এতদিনের জন্য আপনার দূরে রাখা উচিত নয়। তাঁকে কাছে আনলে হয়তো আপনার ভবঘুরে জীবনের একটা হিল্লে হত।

সমর বলল, 'একটা জীবনের হিল্লে অত সহজে হয় না, অরুণা। সেটা আরও ভালো করে জানতে পাবে কিছুদিন পর। আমার মতন অপদার্থ কবির কবিতা শুনে সময় নষ্ট করে লাভ কি? বরং একটা ভালো কবিতা আবৃত্তি করি শুনবে?

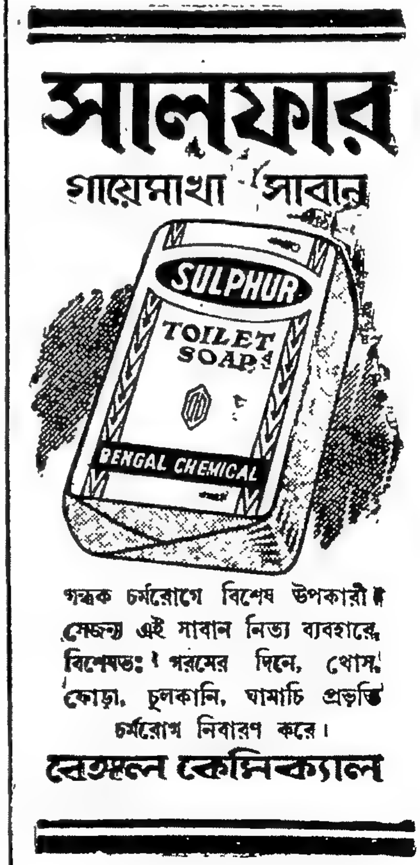

সমরের আবৃত্তি অরুণার ভাল লাগে। সাহস করে কখনও সেটা সে প্রকাশ করে নি। আজ বলল, 'আপনার আবৃত্তি আমার খুবই ভালো লাগে। সেদিনের সেই আবৃত্তি আজও আমার কানে বাজছে।

সমর বললে, 'কোনটা বলতো? তোমাকে কবে আবৃত্তি শোনালাম? উর্বশী ছাড়া তুমি আমার কোনো আবৃত্তি শুনেছো কি?

অরুণা কিছুই বলল না। বহুবার আবৃত্তি শুনেছে দূর থেকে লুকিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমরের মনমাতানো আবৃত্তিতে বিভোর হয়ে কাটিয়েছে।

সমর বলল, এর পরেই কিন্তু হবে তোমার গান। তাইতো? শোনো তাহলে

'রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন।
আগে ওকে বারবার দেখেছি
লাল রঙের শাড়িতে দালিম ফুলের
মতো রাঙা
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলনচাঁপার মতো চিকন গো'র
মুখখানি ঘিরে।
দূরে যাবে তুমি
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে
শুনব তোমার মুখে। সত্য করে বলবে তো?
আমি বললেম 'বলব।' বাইরের আকাশের
দিকে তাকিয়েই শুধোল
'আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে
কিছুই কি নেই বাকি।'
একটুকু রইলেম চুপ করে তারপর বললেন—
রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর
গভীরে।'

অরুণা হাঁ করে সমরের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার মনে হল সমর যেন গুছিয়ে তারই মনের কথাগুলো বলে যাচ্ছে সাজিয়ে।

সমর বলল, এবার তোমার পালা।

অরুণা বলল, 'কোন গানটা শুনবেন?'

—যেটা খুশি।

অরুণা এদিক ওদিক তাকাল। একটা স্বতঃপ্রসূত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে সে গান ধরলো···

'আমার না বলা বাণী·········

অরুণা পুরো গানটা শেষ করতে পারল না। তার গলা ধরে এসেছে। বহু সভা-সমিতিতে সে গান গেয়েছে। কখনও তার এমনটি ঘটে নি। অনেক চেষ্টা করেও সে আর গাইতে পারল না।

সমর কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। অরুণা হঠাৎ উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ কোত্থেকে কি হল সে বুঝতেই পারল না। সমস্ত ঘরখানায় যেন একটা থমথমে ভাব। কতক্ষণ সে এভাবে শুয়ে ছিল সমর ঠিক জানে না। তার হুঁশ এল উপেনের ডাকে।

উপেন বলল, আকাশেতে মেঘ ছাড়া তো কিছুই নেই দাদাবাবু। তোমরা এত হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে কি দেখো? নীচে এসে দেখলাম, দিদিমণি হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে। উপরে এসেও দেখি তুমিও তাই। বহুবার চেষ্টা করেও আমি আকাশে মেঘ ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। কি ভাবছো দাদাবাবু?

সমর উপেনকে দেখে খুশি হল। সমর বলল, হাঁরে উপেন তোর সেই সিনেমায় ঢোকার কি হল? পটলারই বা কি খবর?

অশ্রুসিক্ত নয়নে হাত-পা নেড়ে উপেন জানাল যে, তার যা সামান্য সঞ্চিত অর্থ ছিল, সব সংগ্রহ করে সে স্বামী বিপুলানন্দের আশ্রমে গিয়েছিল। ঠিকানাটা সে অরুণার কাছ থেকে বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছিল। সেখানে গিয়ে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে সে আশ্রম একেবারে ফাঁকা। কাকটি পর্যন্ত সেখানে আর উড়তে দেখা যাচ্ছে না।

সমর বলল, সে কি কথা? স্বামী বিপুলানন্দ কোথায় গেছেন? অন্য আশ্রমে গিয়ে পড়িস নি তো?

উপেন জানাল, সে ঠিক জায়গাতেই গিয়েছিল। ষ্টেশন থেকেই সে জানতে পেরেছিল খবরটা, তবে বিশ্বাস করে নি। এতবড় খবর যে এক নিশ্বাসে বিশ্বাস-না করারই কথা।

সমর বলল, আহা বলেই ফেল না। শুধু শুধু এত দেরী করছিস কেন? বিপুলানন্দ তাঁর আশ্রমে ঢুকতে দিলেন না এই তো? এতদূর থেকে এত খরচা করে গেলি আর দেখাটুকুও হল না, সে কি কথা?

উপেন ধীরে ধীরে নাটকীয় কায়দায়, সাসপেন্স ক্লাইম্যাক্স এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স ট্রিকের সমস্ত চঙ্ শেষ করে যা পেশ করল তার সহজ ও সরল অর্থ হল স্বামী বিপুলানন্দ আপাতত ফেরার। যোগিনী হরণের দায়ে তাঁর ওপর ওয়ারেন্ট ঝুলছে। উপেনের সিনেমা লাইনে ঢোকায় যে এত বাধা আসবে, সে কখনও কল্পনা করে নি। বলেই উপেন হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিল। সমর বলল, 'ট্র্যাজেডিতেই তুই নাম করবি উপেন। যা নীচে। খবরটা তোর দিদিমণিকে দিয়ে আয়।

[ক্রমশঃ]

আর্টও প্রেম

রথীন্দ্র সরকার

শিল্পকলাকে যে ভালোবাসে কোনো পরিশ্রমই তার কাছে কঠিন নয়।

কথাটাকে ধ্রুবসত্য মনে করেই সুরু করা যাক গল্পটা। অবিশ্যি শেষ অবধি দেখা যাবে এ আপ্তবাক্য ধোপে টেঁকে নি। গল্পই প্রমাণ করে দেবে এ-বাক্য অসিদ্ধ। প্রযুক্তির দিক থেকে এ এক নতুন জিনিস হবে, তবে গল্পের কৌশলটা মান্ধাতার আমলের।

ভৈরব ছবি আঁকার ব্যাপারে বোধ হয় জিনিয়াস হয়েই জন্মেছিল। ছ'বছর বয়সে শহরের স্কুলের কলের ছবি আঁকলে সে, ছবির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলে গণ্যমান্য এক নেতাকে। ছবিখানাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে এক ওষুধের দোকানের সামনের জানালায় রাখা হয়েছিল বহু কিছুদিন। তারপর ভৈরবের বয়েস কুড়ি-বাইশ হতেই সে কাঁধে উড়নি চাপিয়ে ট্যাঁকে কিছু পয়সা নিয়ে চ'লে এল শহর কলকাতায়।

অমলা দক্ষিণ ভারতের এক গাঁয়ের মেয়ে। দিনরাত গলা সাধত। ওর গানের চর্চা শুনে আত্মীয় বন্ধুরা বলত—যাও না বাপু, দিল্লী কোলকাতা কোথাও গিয়ে পুরো তালিম নিয়ে গাইয়ে বনে যাও।

ভৈরব আর অমলার দেখা হল কোলকাতায়—কোন এক কলাকেন্দ্রে। সঙ্গীত আর চিত্রকলার রসিকেরা সেখানে আলোচনা করতেন হাজারো রকমের বিষয় নিয়ে। রবিঠাকুর, অবিন ঠাকুর, নন্দলাল, অজন্তা, রবিশঙ্কর, হীরাবাঈ, ফৈয়জ। গান আর ছবি।

ভৈরব আর অমলা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হল। মানে একজন আরেকজনকে ভালোবেসে ফেললে, সোজা বাংলায়। এবং অচিরেই তাদের বিয়ে হল, কারণ (যেমন আগেই বলেছি) 'শিল্পকলাকে যারা ভালোবাসে কোনো শ্রমই তাদের কাছে কঠিন নয়।

সুরু হ'ল অমলা-ভৈরবের সংসারযাত্রা। একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাটে। তানসেন গুরু হরিদাসের কুটিরের মতো নির্জন একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট। ওরা সুখী হয়েছে। আর্ট-কে আর্টও হ'ল, পরস্পরকে কাছাকাছিও পেল। আমিও তাই ধনী যুবকদের উপদেশ দিয়ে থাকি: সর্বস্ব ত্যাগ কর (কিম্বা বেচে দাও নিদেনপক্ষে)। থাকো ফ্ল্যাট বাড়িতে। আর্টের সাধনা করো। অমলার মতো কান্তাকে প্রিয়সখী করে কলাবিদ্যার চর্চা করো।

ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা নিশ্চয় আমাকে সমর্থন করবেন। স্বীকার করবেন যে তাঁরাই একমাত্র সত্যিকারের সুখী। মানুষগুলো কাছাকাছি থাকলেই তো সুখ। লেখাপড়ার টেবিল খাবার টেবিল হয়ে গেল। পর্দার ওপাশ থেকে রান্নাঘরের সুবাস এল বসবার ঘরে। পিয়ানোর পেছন দিকটা কাপড় ঝোলানোর আলনা। জানলার গরাদের ওপর কাপড় শুকুতে দাও, ঘরের জিনিস ঘরেই রইল। সবার ওপরে তুমি আর অমলা রইলে কাছাকাছি। কিন্তু নিজস্ব বাসা-বাড়ির ব্যাপারই আলাদা। সিং দরজা দিয়ে ঢুকলে, ছাতা এক ঘরে, জুতো আরেক ঘরে, সিংহদুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেলে, কাকপক্ষীও জানলে না তুমি এলে কি গেলে।

ভৈরব ভর্তি হয়েছিল আচার্য ভবানীশঙ্করের চিত্রবিদ্যার ক্লাসে। তাঁকে আপনারা সবাই চেনেন। মাইনে বড্ডো চড়া; তবে হ্যাঁ ছাত্রদের খাটান কম, হাল্কা কাজ। ভবানীশঙ্করের খ্যাতিই তো এই চড়া রং আর হাল্কা কাজে। অমলাও গান শিখছে খাঁ-সাহেবের কাছে—চেনেন তো তাকে—বাজখাঁই যার কণ্ঠবিলাস অরসিকদের অতিষ্ঠ করে তোলে।

যতোদিন গাঁটে পয়সাকড়ি ছিল মহা সুখেই কেটে গেল ওদের। এমনিই হয়। থাকগে অযথা রূঢ় মন্তব্য করব না। ওদের আদর্শ ছিল স্পষ্ট, লক্ষ্য স্থির। সুতরাং ভৈরবের পক্ষে দেরি হল না ঠিক চাহিদা মতো ছবি আঁকার কায়দা রপ্ত করতে—টাকমাথা ট্যাকভারী ভারিক্কি লোকের ভিড় জমিয়ে যেগুলো 'কেনার ক্ষমতা' দেখাতে পারে। সঙ্গীতে পারদর্শিনী হয়ে অমলারও খানিকটা নাক উঁচু হল। প্রেক্ষাগৃহের সামনের সারির আসন আর বক্সে দর্শক না থাকলে মাথাধরার দোহাই দিয়ে আড়ালে বসে চিংড়ির কাটলেট খেত, মঞ্চেই আসত না।

কিন্তু ওদের শিল্পিজীবনে যাই ঘটুক, ছোট্ট ফ্ল্যাটের সংসারটুকু সবার সেরা। সারাদিনের বিদ্যাচর্চার শেষে এক জায়গায় বসে দুজনের মহা উৎসাহে আলোচনা, রাতে বেশ করে খাওয়া, সকালে হাল্কা প্রাতরাশ। দুজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আদর্শের মত-বিনিময়, পরস্পরকে প্রেরণা জোগানো। শিল্পচর্চায় প্রেরণা।

কিন্তু অবশেষে একসময় ঢিলে পড়ে গেল আর্টে। যতোটা খরচা সে তুলনায়

আমদানি নেই। আচার্য আর খাঁ সাহেবের দক্ষিণা দেবার পয়সা জোটে না। শিল্পকলায় যাদের নিষ্ঠা আছে, কোনো পরিশ্রমই কঠোর নয় তাদের কাছে। তাই অমলা বললে, সে গানের ছাত্র যোগাড় করে পয়সা রোজগার করবে। যেমন রোজ হাঁড়ি চড়ে তেমনিই চড়বে।

দুদিন। তিনদিন। ছাত্রী যোগাড় করতে বের হয় অমলা রোজই। একদিন বিকেলে খোশমেজাজে বাসায় ফেরে।

—ওগো শুনছ। ছাত্রী ত পেলাম একজন। কী চমৎকার ছাত্রী। রায়বাহাদুর·····কী নাম যেন····· রায়বাহাদুর যশোবন্ত রায়ের মেয়ে, এগারো নম্বর আনোয়ার শা রোডে। আহা—কি বলব তোমাকে, ওদের বাড়ির গেটটা যদি দেখতে! একেবারে তোরণদ্বার। আর ভেতরটা! আহা! মেয়েটির নাম দময়ন্তী। কি ভালো, কি ভালো! রূপে গুণে চমৎকার। তা, হপ্তায় তিনদিন গান শেখাতে হবে, পাঁচটাকা করে দেবে দিন। মন্দ কি আরো দু-একটি ছাত্রী হলে আবার ভর্তি হতে পারব খাঁসায়েবের ক্লাসে।···অমন ভুরু কুঁচকে থেকো না তো, লক্ষ্মীটি।—এসো কিছু খেয়ে নেয়া যাক। ভালো খেতে হবে আজ রাত্তিরে।

—সবই তো বুঝলুম অমলা।—গম্ভীর হয়ে বলে ভৈরব—কিন্তু আমি? আমি কি করব? তুমি কষ্ট করে রোজগার করবে আর আমি গায়ে ফুঁ দিয়ে শিল্প করে দিন কাটাব? আমিও কাগজ বেচে, দেয়ালে রং করে দু-এক টাকা রোজগার করতে পারি।

অমলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলে—ভৈরব, বোকার মতো কোরো না। ছবি আঁকার ক্লাস তুমি ছাড়তে পারবে না কিছুতেই। আমিও তো গান একেবারে ছেড়ে দিয়ে নতুন কাজে লাগি নি। পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শেখাও হয়ে যাচ্ছে। চর্চা রইল আগের মতোই। হপ্তায় পনের টাকায় আমাদের বেশ চলে যাবে। আচার্যের ক্লাস ছেড়ে দেবার কথা তুমি মনেও এনো না।

—ঠিক আছে। তবে তোমার এই গানের ছাত্র পড়ানো আমার ভালো লাগছে না। একে আর্ট বলে না। করছ যখন, করো।

—আর্টকে ভালোবাসলে তার খাতিরে যে কোনো কঠিন কাজই করা যেতে পারে ভৈরব।

—আচার্য আমার আকাশের স্কেচটার তারিফ করছিলেন। পার্ক স্ট্রীটের দোকানের জানালায় স্বচ্ছন্দে রাখা যেতে পারে বললেন। পয়সাওলা কোনো খদ্দের পছন্দ হলে যুৎসই দামে ঝেড়ে দেয়া যাবে।

—নিশ্চয়।

এর পরের হপ্তা। দুজনেরই খুব যেন তাড়া। খুব ভোরে উঠে প্রাতরাশ করে। ভৈরব না কি কোন পার্কে গিয়ে একটা 'ভোরের দৃশ্য' স্কেচ করছে। অমলা ওর খাবার-টাবার তৈরি করে সাতটার মধ্যেই ছেড়ে দেয়। ভৈরব বাসায় ফেরে সন্ধ্যে সাতটায়।

হপ্তার শেষে। অমলা বেশ মিষ্টি একটু গর্বের সঙ্গে তিনখানা পাঁচটাকার নোট ছোট্ট টেবিলটার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ক্লান্ত দেহভার ছেড়ে দিলে বিছানায়।

—দময়ন্তী মাঝে মাঝে বড়ো জ্বালাতন করে। বড়ো ফাঁকি দিচ্ছে। কিছু প্র্যাকটিস্ করবে না। আমারই যতো মেহনত। তবে বাপটি ভারি ভালো। বুড়ো রায়বাহাদুর মাঝে-মাঝে এসে ছাত্রীর পাশে বসেন। বলেন, মা, সা-রে গা-মা কেমন চলছে তোমার? আঃ···ওদের ড্রয়িং রুমটা যদি দেখতে। ইয়া পুরু কার্পেট···।

এবার ভৈরব পকেট থেকে ভোজবাজির মতো বের করে দশটাকা, পাঁচটাকা, দু'টাকা, একটাকার নোট মিলিয়ে আঠারোটি টাকা। অমলার টাকাটার পাশে আলগোছে রেখে দেয় নিজের টাকা।

—আমার সেই জলরঙ ছবিটা বেচে দিলুম খাজাগড়ের রাজার কাছে,—সগর্বে ঘোষণা করলে ভৈরব।

—যাও ঠাট্টা কোরো না। খাজাগড়ের রাজা এত দূরে এসে ছবি কিনলেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! গলায় গাফলার জড়ানো; ইয়া মোটা। খড়কে-কাটির মতো গোঁপ। পার্ক স্ট্রীটের দোকানে আমার আকাশের স্কেচটা দেখে প্রথমে মনে করেছিলেন বৈতরণী নদী। যাহোক তবু কিনলেন, আর অর্ডার দিয়ে গেলেন আরেকটা ছবির।···তোমার গানের ক্লাসের তা-ও কিছু আর্ট আছে!

—উঃ আমার যে কী খুশিই লাগছে। তুমি যে হাল ছেড়ে না দিয়ে আঁকার কাজেই লেগে রয়েছ এ কতো বড়ো কথা বলো দিকি।···শেষ অবধি তোমার জিত হবেই ভৈরব।···তেত্রিশটা টাকা।···কম কথা নয়। আজ রাতে মাংসের হাঁড়ি-কাবাব।···

—রুই মাছের মুড়িঘণ্ট। যোগ করে দিলে ভৈরব।

পরের শনিবার ভৈরব একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। ছোট্ট টেবিলটার ওপর আঠারোটা টাকা রেখে অনেকক্ষণ ধরে হাতের তেল-কালি ধুয়ে ওঠালো, রংই হবে হয়তো।

আধঘণ্টা বাদে এল অমলা। তার ডান হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ, যেমন-তেমন করে বাঁধা।

দেখেই ভৈরব বলে—ও আবার কী? কী হয়েছিল?

অমলা বোঝায়—দময়ন্তীর বড়ো সখ হয়েছিল গান-বাজনার শেষে আমার হাতের তৈরী কাটলেট খাবার। আচ্ছা অদ্ভুত মেয়ে, বেলা পাঁচটার সময় কাটলেট খাবেন। রায়বাহাদুর ছিলেন। ছেলে-মানুষের মতো তিনিও হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলেন, যেন বাড়িতে চাকরবাকর নেই। তারপর হঠাৎ হাতে গরম তেলের ছেঁকা লেগে গেল। তা, এমন আর কী হয়েছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর তো সারাবাড়ি মাথায় করে শেষে কাকে পাঠিয়ে দিলেন ওষুধের দোকানে। মলম আর ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে এল লোকটা যেন কোত্থেকে।···যাক এখন আর তেমন জ্বালা-যন্ত্রণা নেই।

ব্যাণ্ডেজটার ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভৈরব বলে—তুলো বড়ো ময়লা দেখছি। রায়বাহাদুরের বাড়ি···

—ও মলমের জন্য হয়েছে। ভৈরব তোমার দ্বিতীয় ছবিটাও বুঝি বিক্রি হয়ে গেল?—টেবিলের টাকাটা ওর নজরে পড়েছিল।

—বলো কেন! খাজাগড়ের রাজা পার্কের ছবিটা কিনলেন, এখন চাইছেন গঙ্গার দৃশ্য। তোমার হাতটা কখন পুড়েছিল বললে অমলা?

—এই বিকেল পাঁচটা হবে। অতো বড় কড়া উল্টে···মানে, কাটলেটের তেলটা ছিটকে এল কি না হাতের ওপর। রায়বাহাদুরকে যদি দেখতে!

ভৈরব গম্ভীর হয়ে বললে—বোসো তো একটু অমলার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস

বললে—সত্যি করে বলো তো এ দু'হপ্তা তুমি কী করে বেড়িয়েছ ?

অমলা প্রথমে জোর করে ভৈরবের চোখে চোখ রেখেছিল দু'এক মুহূর্ত। এবার ওর চোখ থেকে জল আর মুখ থেকে সত্যি কথাটা বেরিয়ে এল। বললে—গানের ছাত্র কাউকেই জোগাড় করতে পারি নি। তুমি যে ছবি আঁকার ক্লাস ছেড়ে দেবে, এও আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই শেষ অবধি জনমজল কাফেটারিয়াতেই ঢুকে পড়লাম ওদের রসুইঘরে রান্নার কাজে। তা, রায়বাহাদুর আর দময়ন্তীর গল্পটা মন্দ বানাই নি, কী বলো? আজ বিকেলে হঠাৎ ডালের মুগ.লির বিরাট কড়াটা উনোন থেকে হড়কে গিয়েছিল, তাই সামলাতে গিয়ে এই কাণ্ড। রাস্তায় আসতে আসতে কাটলেটের গল্পটা তৈরি করলুম। তুমি রাগ করো নি তো ভৈরব? আমি কাজ না করলে তুমি হয়তো খাজাগড়ের রাজার জন্ত ছবি আঁকার সময়ই পেতে না।

—লোকটা খাজাগড়ের রাজা নয়।—ধীরে ধীরে বলে ভৈরব।

—তা যেখানকারই হোক্। তুমি বড়ো চালাক ভৈরব। কি করে সন্দেহ করলে দময়ন্তীকে। গান শেখবার গল্পটা সত্যি নয়?

—সন্দেহ করি নি আজ বিকেল অবধিও। সন্দেহ হত না যদি না এই ব্যাণ্ডেজের তুলোগুলো চিনতে পারতুম। কাফেটারিয়ার নিচের তলায় গ্যারেজঘর থেকে আমিই তুলো, ব্যাণ্ডেজ আর মলমটা পাঠিয়েছিলাম কিনা ওপরতলায় কোন মেয়ের হাত পুড়েছে শুনে। কাফেটারিয়ার গাড়িগুলো গত দুহপ্তা ধরে আমিই সাফ করে আসছি, ক্লিনারের কাজ।...

—তাহলে তুমি ছবি-টবি কিছুই আঁকো নি?...

—আমার খাজাগড়ের রাজা, আর তোমার রায়বাহাদুর যশোবন্ত, একই আর্ট থেকে এ-দুয়ের সৃষ্টি, তবে সেটা চিত্রকলাও নয়, সঙ্গীতও নয়।

দুজনেই হেসে ফেললে এবার। ভৈরব বললে: শিল্পকলাকে যে ভালোবাসে কোন কষ্টই তার কাছে কষ্ট নয়—

অমলা ওর মুখের ওপর হাতটা চেপে ধরে বলে: না, বলো—'যে ভালোবাসে কোন কষ্টই তার কাছে কষ্ট নয়।

[ও, হেনরী অনুসরণে]

বকুল গন্ধ

পবিত্র সরকার

সহ্য হয় না এত ভীষণ সুগন্ধ এই ফুলের
মমতাহীন ভয়াবহ সুগন্ধ বকুলের,
হাওয়ার শরীর বকুলগন্ধমাখা—
বকুলসমাকীর্ণ ঘরে বিপজ্জনক থাকা।

কেন আনলে বকুলডালা ঘরে, কখন থেকে
বকুল আমি বসে আছি স্নায়ুযুদ্ধ চেকে—
গৃহসঙ্গী বকুল।—মনে নিষ্ঠুরতা পুষে
ক্ষত করবে বকুল-অঙ্কুশে ?

এ কী কঠিন উপদ্রবী শখ।—
ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া বকুল-বিস্ফোরক।
বকুলগন্ধ-দাবানলের মধ্য থেকে ত্রাসে
পালাই, কিন্তু বহিরাকাশ লিপ্ত বকুলবাসে।

হয়তো আমার ঘরই তোমার শত্রু, বকুল ভরে
আমাকে আজ তাড়াতে চাও বাহির চত্বরে।
বাহিরে সুখ কোথা—আমি বকুলভয়ভীত।
পৃথিবীটাই কেমন বকুলব্যাধিসংক্রামিত।

হারানো সীতার খোঁজে

মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হারানো সীতার খোঁজে
মনে মনে পাঠিয়েছি লক্ষ অনুচর
অনেক সন্ধান করে তারা সব এনেছে খবর :

-------দুস্তর সমুদ্রপথ;
একমাত্র সেতু তার অনন্ত আকাশ
ছিন্নপক্ষ জটায়ুর বেদনায় সংক্ষুব্ধ বাতাস।
মাঝে মাঝে সাধ হয়—
সমগ্র চেতনাশক্তি এক করে প্রচণ্ড প্রয়াসে
ঝাঁপ দিয়ে দেখি;
কিন্তু কার কালো মুখ ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যায়।
দ্বিগুণ উৎকর্ণ হয়ে
অস্পষ্ট বর্ণনা তার শুনি বসে অজস্র ভাষায়॥

নিষ্ঠাই সম্বল আজ।
অসংখ্য উপলখণ্ড জড়ো করি তীরে বসে বসে।
তাতেও সংশয় হানে শব্দহীন নির্মম প্রজ্ঞান—
------ না হয় ভাসাবে শিলা
না হয় আশ্চর্য ছন্দে বেঁধে দেবে এপার-ওপার
ফিরে পাবে তাকে;
পাওয়ার প্রযত্ন শেষে
রাখার সম্বল কিছু থাকবে কি তার ?
[illegible] প্রিয়াকে এনে পাঠাবে তো ফিরে বনবাসে ?

সুশীল রায়

অনল আয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মাহেশের স্নানে এখনো যাতায়াত করে যাত্রীরা, এখনো নৌকায়-নৌকায় ভরে যায় ঐ নদী।

কিন্তু রূপনারায়ণ আর আসে নি। জীবনে প্রবল ঘা খেয়ে বুঝি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সে। স্তব্ধ হয়েছে সে, কিন্তু তার জীবনের ধারা স্তব্ধ হয় নি। মাহেশে যায় না বটে, কিন্তু মাহেশই একমাত্র তীর্থ নয়—দমদমার বাগান আছে, সিঁথির বাগান আছে, ইয়ারেরা আছে।

তার স্ত্রী হয়েছে পলাতকা। কত-রকমের আজগুবি কাহিনী রচনা করে একথা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে রূপনারায়ণ। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা বুঝি যায় না। আমিষের গন্ধ ঢেকে রাখা কি সম্ভব? সুতরাং তার সব কাহিনী চাপা পড়ে গিয়ে ফাঁস হয়েছে প্রকৃত ঘটনাই। তার উপর ঢ্যারা পিটে যে কথা প্রচার করা হয়েছিল সেকথা তো চাপা থাকার কথা না।

বেকুব হয়ে গিয়েছে রূপ। তাদের দুঃসময়ে সকলেই বর্জন করেছে তাকে—চুঁচুড়ার সকলে তাকে করেছে একঘরে, কিন্তু দুর্দিনের যারা বন্ধু তারাই প্রকৃত বন্ধু। সকলেই ছেড়ে গিয়েছে তাকে, ছাড়ে নি কেবল নরহরি আর মোতিলাল।

আত্মীয়-সভার সভ্যেরা সেদিন বসে আছেন মানিকতলার গৃহে। নীলরত্নও আছেন উপস্থিত। বেদান্ত নিয়ে, পাদরিদের নিয়ে, এবং ভট্টাচার্যদের আচরণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না, তিনি যথারীতি গিয়েছিলেন সাহেবপল্লীর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে এই আলোচনায় যোগ দিলেন।

একটু পরে নীলরত্নের দিকে চেয়ে রামমোহন বললেন, বেনিয়ান রূপচরণের কথা শুনে এলাম আজ, আপনাদের চুঁচুড়ারই লোক। বাপের বিষয়সম্পত্তি নাকি নষ্ট করছে তাঁর পুত্র?

নীলরত্ন বললেন, হ্যাঁ। ও-পুত্রের কথা আর বলবেন না। সবই প্রায় নষ্ট করেছে, এখনো অবশিষ্ট হয়তো আছে কিঞ্চিৎ। যেভাবে চলেছে তাতে এটুকুও বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না।

—অনেক টাকা করেছিলেন রূপচরণ।

—অনেক বললে সব বলা হয় না—অগাধ। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েছিলেন। একটি মাত্র পুত্র হল উত্তরাধিকারী। কিন্তু সর্বস্ব নষ্ট না করা পর্যন্ত তার হয়তো শান্তি নেই।

দ্বারকানাথ মৃদুহাস্য করলেন, বললেন, গুণধর পুত্রই তা হলে ও নয়, গুণবানও। পিতার ধন পুত্রে নষ্ট করে, এ নিয়ম জেনেছে ও, তাই কিছু রেখে যেতে চায় না। ওর সন্তানাদি কি?

নীলরত্ন বললেন, সন্তানাদি কিছু নেই।

ব'লে তিনি একটু চুপ করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলে যেতে লাগলেন চুঁচুড়ার সেই কেলেঙ্কারির কথা। সবিস্তারে তিনি বর্ণনা করলেন সেই কাহিনী।

বললেন, বাড়ির মেয়েদের মুখে শুনেছি, অমন রূপ নাকি বেশি হয় না। সোনার প্রতিমার মত দেখতে। সেই প্রতিমা সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে গঙ্গায়। ব'লে বেড়ায় বটে ডুবে মরেছে, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করছে না কেউ।

—বিশ্বাস না করার আছে কি? অমন যার স্বামী, সে মেয়ে তো জলে ডুবে মরবেই। দ্বারকানাথ মন্তব্য করলেন।

হেসে উঠলেন নীলরত্ন, বললেন, জলে ডুবলেও তো ভেসে উঠতেই হবে। কিন্তু—

দ্বারকানাথ বলে উঠলেন, জলে ডুবলেই কেবল ভেসে ওঠার কথা না, জলে যদি নাইই ডুবে থাকে তাহলেও তো ভেসে ওঠার কথা—এতদিনে তা হলে কি কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না?

—সন্ধান? একটু চিন্তা করে নীলরত্ন বললেন, সন্ধান কে করবে?

যার স্ত্রী, খোঁজ করবার কথা তার। কিন্তু সে আছে নিজেকে নিয়ে মত্ত হয়ে। ইয়ার নিয়ে ডিয়ার নিয়ে আর বাইজি নিয়ে।

রামমোহন বললেন, আরে বেরাদর, দেশাচার পালন তো করতে হবে। দেশের গতি এখন ঐ দিকে; কোন্ ধনীনন্দন আছে যে কবির লড়াই, হাফ-আখড়াই, মদ্য আর জঘন্য রুচির মেয়েদের নিয়ে মেতে নেই? ঐ সব মানুষরা অনাচার করে-করে তিলে-তিলে ক্ষয় করেন নিজেদের, অকালেই মারা যান, আর অবশেষে কি না তাঁর উপেক্ষিতা স্ত্রীকে সহযাত্রী করার জন্যে চিতাশয্যায় শয়ান দেখতে চান।

গঙ্গার এপারে মানিকতলার গৃহে কথা হচ্ছে যাকে নিয়ে, গঙ্গার অপর পারে সে আছে পরম আরামে বসে। ইয়ারে পিয়ারে মেশামেশি হয়ে বসে গান শুনছে আকা-বাইয়ের।

একটা কবির দল তৈরি করেছে আকা-বাই। দাশরথি রায় নামে বিশ-বাইশ বছরের একটি যুবক ওকে গান বেঁধে দেয়।

আকা-বাই বাইজি নয়, যজ্ঞেশ্বরীর মত সেও এক মেয়ে-কবিয়াল। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে তার তফাত এই যে, নিজের গান নিজেই বাঁধে যজ্ঞেশ্বরী, কিন্তু আকার গান বেঁধে দেয় দাশু নামে ঐ যুবকটি।

দাশরথি বসে আছে পাশে। আকা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সুর করে গেয়ে চলেছে গীত—

গৌরাং-ঠাকুরের ভক্ত চ্যাংড়া
মত অকালকুষ্মাণ্ড ন্যাড়া
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
গৌর বলে আনন্দে মেতে
একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে
বাগ্দীকোটাল ধোপাকলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল
দেখতে নারেন চক্ষুর শূল
কালী নাম শুনলে কানে হস্ত॥

আকা-বাই দুই কান দুই হাতে চাপা দিয়ে গলা চড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে, দুচোখে তার রঙ্গভরা হাসি, গাইতে লাগল—

কি না ভক্তি, কি তপস্বী
জপের মালা সেবাদাসী
ভজন কুঠরী আইবী কাঠের বেড়া
গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে
ছেলে-সুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যাংশে কুলীন বড় ন্যাড়া।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল রূপনারায়ণের বৈঠকে। হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল সকলে। ঐ হাসি শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল আকা-বাই, সে ফিরে গাইল ঐ অংশটা—

গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে
ছেলে-সুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যাংশে কুলীন—

বাঁধনদার দাশু রায়ও যোগ দিল হাসিতে।

মোতিলাল রূপনারায়ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বড় রসবতী বটে এই মেয়েমানুষটি। নাগরও পেয়েছে বড় রসিক।

ব'লে সে চোখ ইশারা করে দেখিয়ে দিল ঐ দাশুকে, বলল, ওর গানের বাঁধনদার হচ্ছে ওর প্রাণের জিম্মাদার।

কথাটা শুনেই চাঙ্গা হয়ে বসল রূপনারায়ণ। আকা-বাইকে সে ঠিক একজন মেয়েমানুষ বলে মনে করছিল না। দেখতেও তেমন চটকদার নয়, বয়সও তেমন তেজী নয়। কিন্তু মোতিলালের কথা শুনেই তার মন গিয়ে আছড়ে পড়ল বুঝি আকা-বাইয়ের বুকের উপর।

আকা তখন নাচের ভঙ্গিতে পাক খেয়ে গান করছে—

চলিলেন- পদ্মিনী স্বামী, যেন
শুকদেব-গোস্বামী
ডাক্‌লে কথা কন্ না কারু সনে
মজিয়ে নিজে মনসিজে
কত কি যে ভাবছে নিজের
মনে।

—বাহবা বাহবা বাহবা। চারদিক থেকে বেজে উঠল তারিফ।

কিন্তু রূপনারায়ণের মন নেই ওতে, তার মন মেতে উঠেছে মনসিজে, মোতিলালের একটা হাত চেপে ধরে সে বলল ওকে চাই।

—কি আছে ওর? কি চাইবে?

—ওই গলা, ওই গান। আর, কিছু যদি না থাকবে তাহলে ঐ ছোঁড়াটা মজেছে কেন?

মোতিলাল বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে বলল, ছোঁড়াটা মজে নি ওতে, ও-ই মজেছে ওই ছোঁড়াতে। কচি নাগর চায় না কোন্ নাগরী? নিজের বয়স যতই বাড়ে, নিজের চাওনা বাড়ে কম-বয়সে।

রূপনারায়ণ তবু বুঝি বোঝে না, বলল, তবু—

বাধা দেবার ইচ্ছেও নেই মোতিলালদের, কিন্তু তাদের মন বুঝি সায় দিতে চায় না এতে, তাই চুপ করে থেকে যেন বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হবে।

দাশুর সঙ্গে কথা বলছে আকা-বাই। বাঁধনদারের কাছে নতুন গানের বায়না ধরেছে বুঝি। রূপনারায়ণ একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওই দিকে। তার সমস্ত চেতনা যেন দুই চোখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়েছে ওই মেয়েমানষটির উপর।

মোতিলাল রূপের হাতে গেলাশ এগিয়ে দিয়ে বলল, চোস্ত বাইয়ের খবর পেয়েছি। আকা-বাই দিয়ে কি হবে, তার চেয়েও পাকা বাই সে। তাকে জোগাড় ক'রে চলো যাই সিঁথিতে।

ঠোঁটের কাছে থেমে গিয়েছে গেলাশ, রূপনারায়ণ বলল, কোথাকার বাই, কাশীর না লখনউর?

মোতিলাল বলল, ওসব না। এ হচ্ছে খাঁটি কলকাতার। নাম রাণী বাই। খুব সরেস চিজ ব'লে শুনেছি। মুখখানা নাকি পদ্মের মত, আর পায়ে ফোটায় গোলাপ।

আর চিন্তা করল না রূপনারায়ণ, আকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মোতিলালের হাত চেপে ধ'রে গদগদ গলায় বলল, আমি তাকে চাই। যত টাকা লাগে।

চাওয়ার আর বিরাম নাই। তার বুকখানা বুঝি আকাঙ্ক্ষার মহাসমুদ্র। কত চাওয়া চেয়েছে সে, অনেক পাওয়াও পেয়েছে। চেয়ে চেয়ে আর পেয়ে-পেয়ে সেই তৃষ্ণার অতলে তলিয়ে আছে। মুখখানা পদ্মের মত, পায়ে ফোটায় গোলাপ— কথাটা কানে লেগে গেল তার। তার মনে পড়ে গেল অন্য আর একজনের কথা। পায়ে পদ্ম ফোটায় যে, কি নাম যেন?—কৈজ বল্প। কৈজের নাচটা এখনো লেগে আছে চোখে, নৌকোর মধ্যে সে রকম আয়োজন করা যায় নি, তাই তার পায়ে ফোটানো পদ্ম দেখতে পায় নি রূপনারায়ণ, কিন্তু মুখখানা দেখেছে, সত্যি একটা গোলাপের মত।

রূপনারায়ণ আবার বলল, যত টাকা লাগে, চাই তাকে।

এই তো চাই। এমন মানুষ না হলে তার মোসায়েব হয়ে লাভ কি। বাইজিতে আর বাগানবাড়িতে গিয়েছে প্রচুর, তার মধ্যে থেকেই নরহরি আর মোতিলাল ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে কম না। এখন পৈত্রিক পুঁজি অবশিষ্ট আছে কতটা সে কথা খাজাঞ্চিবাবুও বলেন নি, সে-কথা জানার কৌতূহলও নেই রূপনারায়ণের।

দশ বছরের বেশিই গত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার পর থেকে। তখন ভালোমত বুঝতে পারা যায় নি, কিন্তু এখন সন্দেহ হয় চাঁপার উপর। সে নিশ্চয়ই জানে সব ঘটনা। নিশ্চয়ই সেই চক্রান্ত করেছে।

কিন্তু চাঁপাকে এখন পাবে কোথায়? সে যে এখন অন্য মানুষ। কপালে রসকলি এঁকে নতুন রসে ডুব দিয়ে আছে সে। সে এখন মস্ত বড় ভক্ত। গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে, হয়তো এবেলা-ওবেলা করছে বিয়ে।

কিন্তু চাঁপার খোঁজে দরকার নেই আমাদের। সে কালনাতেই থাক, কাটোয়াতেই থাক, কিংবা নবদ্বীপেই থাক—তাকে দিয়ে কোনো কাজ নেই আমাদের। দস্তুরি যা সে পেয়েছে, তাতে হেসে খেলে এ-জীবনটা হরিভক্তিতে মেতে থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

আকা-বাই সেদিন গান গাইল আরো কয়েকটা। কিন্তু তার গানে আর কান নেই এদের। এদের কানের মধ্যে তখন বেজে উঠছে নতুন নূপুরের ধ্বনি।

আকার দলকে বিদায় দিয়ে ওরা নতুন মজার জন্যে তৈরি হয়ে বসল বুঝি।

বিরাট এলাকা ঘিরে বাড়িটা। জাঁকে-জমকে রোশনাইতে পুলকিত ছিল এই গৃহ। কিন্তু এখন এখানে সবই প্রায় নীরব। যে সোপানে একদিন রাধারাণীর কোমল পায়ের চিহ্ন পড়েছে, এখন সেখানে নিঃশব্দে বিচরণ করে বেড়ায় নিঃসঙ্গ মার্জার। যে কক্ষে সুউচ্চ পালঙ্কে শয্যা গ্রহণ করত ওই বরতনু, এখন সেখানে একাকী গড়াগড়ি দেয় পরিত্যক্ত উপাধান।

লক্ষ্মী আর সরস্বতী চলে গিয়েছে বিদায় নিয়ে। তারপর একে-একে অন্যান্য দাসীর সঙ্গে চলে গিয়েছে হৃদয়। যে সব দাসীর কাছে দাদাবাবুর চোখের চাউনি খারাপ লাগে না, টিকে আছে তারা। আর আছে ভবসুন্দরী—বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু সে বলে, যে বাড়ির নিমক খেয়েছে সে এতকাল, অত বড় নিমকহারাম হব কি করে, ছেড়ে যাব কি করে সে বাড়ি।

ঘরে ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে চামচিকা। দেয়ালে দেয়ালে ঘু খেয়ে মরছে তারা। তবু তাদের পাখায় অবসাদ নাই।

আরমানি গির্জায় এখনো ঢং ঢং করে বেজে চলেছে সময়ের শব্দ; দূর থেকে ভেসে আসছে ব্যাণ্ডেল গির্জার ঘণ্টাধ্বনি।

বাইরে থেকে রায়বাড়িটির কোনো পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এর ভিতরের চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে বিপুল। কে আছে এই বাড়িতে, যে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে? সারা চুঁচুড়াও বর্জন করেছে এই গৃহটিকে। যে গৃহের বধূ গৃহত্যাগিনী হয় সে গৃহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কে চায় পাতকী হতে? আজ এই রায়বাড়ি তাই পরিত্যক্ত।

বাইরে থেকে কোনো পরিবর্তন হয় নি চুঁচুড়ারও। বাইরেটা ঠিক অবিকল আছে আগের মতই, কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে এর অভ্যন্তরে।

এই তো মাস-কয়েক আগের কথা। ওলন্দাজেরা তাদের এই উপনিবেশটি সমর্পণ করেছে ইংলণ্ডীয়দের হাতে। ওলন্দাজদের দখল থেকে এ গিয়েছে এখন কোম্পানীর হেফাজতে।

এই শহরের বড় সাহেব ছিলেন বোমন। হলাণ্ডের অধিপতি ভার ন্যস্ত করেন বোমন সাহেবের উপর, সেই অধিকারে ইংরেজ পক্ষ থেকে আগত বেইল সাহেব ও সনাইথ সাহেবের হাতে এই শহরটি সমর্পণ করলেন বোমন। কাগজপত্র নিয়ে লেখাপড়া হল নেপথ্যে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে স্থানীয় অধিবাসীদের চোখের সম্মুখে পতাকাদণ্ডের অগ্রভাগ থেকে নেমে এল হলণ্ডীয় নিশান।

আরমানি গির্জার সংলগ্ন সরকারী দালানের সোপান থেকে ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন বেইল সাহেব—এই স্থান এতদিন পর্যন্ত হলণ্ডীয়দের অধিকারে ছিল, কিন্তু এক্ষণ থেকে এ স্থান ইংলণ্ডীয়দের অধিকারভুক্ত হল।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে-দণ্ডে

হলওয়ায় পতাকা উড্ডীন ছিল, সেখানে উড্ডীয়মান হল ইংরেজীয় নিশান। নিশান ওঠা মাত্র সিপাহী তিন বার বন্দুকের দেওড় করল।

একটি বিরাট জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই উৎসব দেখেছে, একটি কথাও তারা বলে নি। কার স্থান, কে কাকে দান করছে—এ চিন্তা নেই তাদের মনে।

এই ভাবেই বুঝি হাতবদল হয় বিষয়সম্পত্তি। হুগলী আর চুঁচুড়া এখন এক হয়ে গেল।

রূপনারায়ণের সম্পত্তিও ঠিক ওইভাবেই হাতবদল হয়ে চলেছে। কিন্তু তার জন্যে এমন-কোনো ঘোষণা পাঠের প্রয়োজন হচ্ছে না, কোনো সিপাহী বন্দুকের দেওড় করছে না। ভাটার সময় যেমন নিঃশব্দে বয়ে যেতে থাকে ঐ স্রোত, অমনি নিঃশব্দ গতিতে ভাটা নেমে আসছে তার ভাণ্ডারে।

উজাড় হয়ে যাক-না এই ভাণ্ডার কি ক্ষতি তাতে? তার জীবনও ক্রমশ চলেছে শূন্যের দিকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে অনেক আগেই; সে কালির দাগ এখন হয়েছে আরো ঘন; শিথিল হয়ে এসেছে মুখের চামড়া।

কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি, শিথিল বুঝি হয় নি কামনা। রূপনারায়ণ অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবছিল, মোতিলালের দিকে চেয়ে বলল, কোথায় তোমার রাণী-বাই?

গঙ্গার অপর পারে, এখান থেকে অনেক দূরে, রাণী-বাইয়ের বারো-বেহারার পালকি চলেছে তখন হুশহাশ শব্দে। ঝালরে ঝলমল করছে পালকি। পথের দুই ধারও উঠেছে বুঝি ঝলমলিয়ে।

গঙ্গা নাইতে চলেছে রাণী-বাই। এর আগে গিয়েছে পায়ে হেঁটে, কিন্তু এখন আর পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। আগে-আগে চলেছে দুজন বরকন্দাজ, রূপো দিয়ে বাঁধানো মোটা মোটা লাঠি তাদের হাতে দিয়ে।

পাল্কির ভিতরে রাণী-বাই আছে, এবং আছে তার দাসী হীরামতি। গুনগুন গুঞ্জনে কথা বলতে বলতে চলেছে তারা। পাল্কির ঝাঁকিতে দুলে উঠছে অঙ্গ।

রামবাগানের গৃহ সে ত্যাগ করেছে কিছুদিন হল। এখন আছে গরানহাটায়। ও-বাড়ির মাসির সঙ্গে পারা দায়—যা চায় না রাণী তা করাবেই ওই মাসি। টাকার খাঁকতি বড় বেশি ওর। বলে, বাগানবাড়িতে মজা করতে যাবি নে তো খাবি কি? শরীরে যৌবন আছে, তাই অত দেমাক। আমাদের দেমাক একদিন ছিল রে।

মুখে খৈ ফোটে ওই মাসির, যা নয় তাই বলে। বলে, সারা অঙ্গে ফুটে আছে ফুল, নেচে-নেচে পা দিয়ে ফোটাচ্ছিস গোলাপ আর গাঁদা। কিন্তু সব পাপড়িই ঝরে যায় রে; ঝরার আগে আখেরের জন্যে কিছু করে রাখতে হয়। বাগানবাড়িতে মজা আছে যেমন, মোহরও আছে তেমনি।

তা থাক্। অনেক মোহর পেয়েছে সে। এতেই তার হবে। ঘরে বসে মজা করে যে যা দিয়ে যাবে তাতেই চলবে তার। পাপড়ি যদি ঝরে যায়, ঝরুক। পরের কথা পরে হবে।

কিন্তু মাসি বড় কুঁদুলে। কার দৌলতে আজ রাণীর এত ডাকহাঁক, সে কথা মনে করতে বলে তাকে। এসেছিল তো একটা গেঁয়ো ছুঁড়ি, কিছুই ছিল না জ্ঞানগম্যি। কে মানুষ করল তাকে? ওস্তাদজিদের ধরে শেখাল সে নাচ, শেখাল গান। শুধু গতর বেচে খেতে হলে ও-গতরের গতি এর মধ্যেই কি হত, ভেবে কি দেখতে হয় না একটু?

কথাগুলো ঠিকই মাসির। এখানকার আদবকায়দা কিছুই জানা তার ছিল না। চাঁপার সেই লোকটি তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল পেরিনের বাগানের কাছের এক মস্ত বাড়িতে। তাকে নিয়ে কত আনন্দ, কত উল্লাস। মাস-কয়েক যেতে-না-যেতেই সেই লোকটি নিয়ে আসতে লাগল তার ইয়ারদের। কত চোখরাঙানি, কত শাসানি তার—ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সাহেবের ঘাট থেকে নৌকোয় তুলে নিয়ে যখন সে তাকে নিয়ে উধাও হল, তখন তার কত প্রতিজ্ঞা কত শপথ—তাকে সে সুখে রাখবে, সুখে রাখবে, সুখে রাখবে। কিন্তু মাস-কয়েকের মধ্যেই নিজের সুখ শেষ হয়ে গেল, তাই বারো-ইয়ার নিয়ে এসে বারোয়ারি সুখের ধান্দায় মত্ত হল সে। প্রথম ক'টা দিন বড় কষ্ট হয়েছিল তার, নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। অবশেষে

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

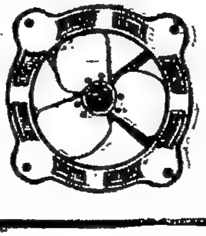

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন ঃ ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

সে ছেড়ে দিল নিজেকে। তাদের হাতে। তার পর যা হয়—খুঁটিনাটি কবে ভাবতে পারছে না সে—একদিন সেখান থেকে তাকে নিয়ে এসে তুলল তারা রামবাগানে।

সে রামবাগান ছেড়ে দিয়েছে এখন সে। এ-পথে এসেছে বলেই নিজের সব সংকল্পই তাকে ত্যাগ করতে হবে কেন। বাগানবাড়িতে বড় ভিড় হয়, ওখানে গিয়ে নিজেকে সে উন্মুক্ত করে দিতে পারবে না। হাসিই পায় তার, গৃহবধূ সে আর নয়, কিন্তু গৃহের কোণে থেকে গর্হিত কাজ করা কি যাবে না? আর মজা করার শখ, সে আসুক না তার কাছে, কিন্তু সে যাবে না কারো কাছে।

নবীন আর মুরলী বড় হয়েছে, তাদের মুখ চেয়েও তো চলতে হবে তাকে। হঠাৎ যদি কখনো দেখা হয়ে যায় তাদের সঙ্গে, তা হলে, নিজের কথা সে ভাবে না; ভাবে ওদেরই কথা। অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে গেলে নিজের পরিচয় চাপা দিয়ে রাখা বুঝি কঠিনই হয়ে পড়বে।

রামবাগানের মাসির কাছে সে রাণী। ঐ মাসির চেষ্টাতেই রাণী আজ রাণী-বাই হয়েছে, এবং তার মনের সব চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা পালন করতে পেরেছে। তার এই দুই পায়ে ফুল ফোটাতে শিখেছে সে—এই কাজটার যদি এতই দাম, তবে তাকে সেটা শিখে নিতেই হবে।

মনে পড়ল সেই ফৈজ বক্সের কথা। পায়ে ফুল ফুটিয়ে তাক লাগিয়েছে দুনিয়াকে। আলতা-ছোপা পা দিয়ে ছবি এঁকেই এত দেমাক, সে-দেমাক ভাঙবে বলে প্রতিজ্ঞা ছিল তার। তার পায়ে আলতা দিয়ে নিতে হয় না, ফরাশে ছিটাতে হয় না গোলাপ-জল। শুক্‌নো ফরাশে সে তার এই পা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে পদ্ম, ফোটাতে পারে গোলাপ। এই পাও এখন বুকে তুলে নেবার মানুষের কোনো অভাব নেই এই শহরে। অনেক মানুষই বুক পেতে দিচ্ছে এই পায়ের কাছে।

এখন গরানহাটায় আছে রাণী-বাই। তার পাল্কি চলেছে পোস্তার রাস্তা ধরে হুশ হুশ শব্দ করতে-করতে। বারো-বেহারায় বয়ে নিয়ে চলেছে এই বরতনু।

টাকশালের ঘাটে এসে পাল্কি নামল। ওড়িয়া বেহারারা কাঁধের গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে বসল পাকুড়-গাছের তলায়। পালকি থেকে নেমে রাণীবাই দাসীর সঙ্গে নেমে গেল ঢালুপথে। জলের কিনারে এসে দাঁড়াল সে।

এ-পাশে ও-পাশে স্নানে নেমেছে অনেক মানুষ। তাই, একটু আব্রু চাই। লম্বা সাটিনের পরদার দুই কিনার ধরে দুই বরকন্দাজ নেমে গেল কোমর-জলে, মাঝখানটা ধরে হীরামতি দাঁড়াল পাড়ে। এরই অন্তরালে অবগাহন-স্নান করছে রাণী। বরকন্দাজ-দুটি হয়তো একটু-আধটু তাকাচ্ছে ভিতরের দিকে; কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি নাই—কি না জানে ওরা গরানহাটার বাড়ির। ওদের কাছে আব্রুর কোনো দরকার হয় না।

স্নান করছে সে, আর তার কানে আসছে ধমকের শব্দ। কে যেন শাসন করছে কাকে, বলছে, ঈশ্বর কথা শোনো। বেয়াড়াপনা ছাড়ো।

নিজের শরীর মাজতে-মাজতে নিজের মনেই হাসতে লাগল রাণী-বাই। কে কার ঈশ্বরকে এমন করে শাসাচ্ছে? কারো প্রার্থনাই শোনে না যে ঈশ্বর, সে কি না শাসন শুনবে। কত অনুনয় করেছে সে কতবার, কিন্তু কখনো সাড়া পায় নি সে ঐ দেবতার কাছ থেকে।

কিন্তু তবু ওদিকের শাসন থামে না। ক্রমাগত ধমক খেতে থাকে ঈশ্বর। কিন্তু তবু কথা সে শোনে না।

—নামো জলে, দিয়ে এসো ডুব।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না নিশ্চয়। অবশেষে অন্য ভাবে শাসন আরম্ভ হল—চলো, ফিরে চলো। না, কিছুতেই না। স্নান কিছুতেই করতে পারবে না। চলে এসো, চলে এসো।

বড়ই কৌতূহল হল রাণী-বাইয়ের। কিন্তু এখন সে যে অবস্থায় আছে, এ ভাবে এই আব্রুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। তাই গা-মাজা সাঙ্গ করে ফিরে ডুব দিয়ে নিল সে। উঠে এসে সারা শরীর মুছল, মাথার চুল পিঠের দিকে ছাড়িয়ে দিয়ে হাতে গামছা ধরে ফটফট করে ঝাড়ল চুলের জল, কাপড় জামা পরে নিয়ে বলল, হীরা।

—কি বলছ গো?

—পরদা সরা।

অনেকটা সময় নিয়েছে সে। কিন্তু পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেও দেখে ঈশ্বরের উপর জুলুম এখনো থামে নি।

ছয়-সাত বছরের একটি ক্ষুদে ছেলেকে শাসন করছেন এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। আগে ইনি জলে নামাবার জন্যে জোর করছিলেন, কিন্তু এখন বলছেন বিপরীত কথা। কিছুতে নাইতে দেবেন না বলে তার হাত ধরে টানছেন। কিন্তু ঐটুকু ছেলে হলে হবে কি, তার গোঁ অসাধারণ। সে কিছুতে নড়তে চায় না।

এগিয়ে গেল রাণী-বাই, বলল, মাপ করবেন। কি হয়েছে?

—নাওয়াতে এনেছিলাম, জলে নামতে চায় না। এখন, জলে নামতে বারণ করেছি, ও নামবেই।

মৃদু হাসল রাণী-বাই, বলল, ছেড়ে দিন-না তবে। নামুক।

ছেড়ে দেওয়া মাত্র ছেলে তরতর করে কোমরজল পর্যন্ত নেমে গেল কৈ-মাছের মত থলবল করতে-করতে, তারপর গুপ গুপ করে ডুব দিতে লাগল। (ক্রমশঃ)

● ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে চিতাভস্মাধারটি সযত্নে মঞ্চে স্থাপন করছেন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

রাজধানী :

অশ্রুনদী ভাগীরথী। দেবতাত্মা হিমালয়ের ধ্যানভঙ্গ করে তাপসশ্রেষ্ঠ ভগীরথের সাধনায় শুভ্র অকলঙ্ক তুষারের শান্ত কোল ছেড়ে যেদিন নেমে এসে পুত্রহারা সগররাজার শোকাশ্রু বক্ষে ধারণ করেছিল, সেদিন থেকেই শোকের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে নিয়ে ভাগীরথী চলেছে শান্তির পারাবার সাগরের অভিমুখে। তার পুণ্য সলিলে প্রতিনিয়ত ধৌত হচ্ছে মাটির মানুষের চিতানল। বিসর্জিত হচ্ছে তার বুকে বিরহকাতর নরনারীর নয়নের জল। কলনাদিনীর কলতানে ধ্বনিত হচ্ছে সেই চিরন্তনী বিয়োগ গাথা। পুত্রহারা জননী স্নেহের দুলালের শেষ চিহ্নটুকু পরম যত্নে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে শোক-সন্তপ্ত চিত্তে। ভাগীরথী বহন করে চলেছে তার সাক্ষ্য।

ভারতমাতার আদরের দুলাল নেহরুর নরদেহের কয়েক মুষ্টি ভস্ম শ্রদ্ধাভরে ব্যারাক-পুর-গান্ধীঘাটে বুধবার পূর্বাহ্নে বিসর্জন দিয়ে পিতৃব্যের প্রতি শেষকৃত্য আমরা উদযাপন করেছি। বেদনাশ্রুসিক্ত সে ভস্মরাশি মিশে গিয়েছে পুণ্যসলিলে। বেদনাঘনচিত্তে ফিরেছে হাজার হাজার নরনারী তাদের প্রিয়নেতাকে শেষবারের মত বিদায় দিয়ে।

আগের দিন ময়দান পরিণত হয়েছিল পুণ্যতীর্থে। ব্রিগেড প্যারাড গ্রাউণ্ডের যে জায়গায় উচ্চ মঞ্চের উপর থেকে সোহাগভরা সম্বোধন আসতো—ভাইও, বহিনো, সেই স্থানটিতে রক্ষা করা হয়েছিল নেহরুর ভস্মাধারটি। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদ উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ নরনারী সেখানে সমবেত হয়ে নিবেদন করেছে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। পরদিন ময়দান থেকে সকালে সুরু হয় শেষ-যাত্রা। ময়দান থেকে ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট পর্যন্ত পথের দু'ধারে শোকমৌন জনতা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। চিতাভস্ম গঙ্গায় ভাসিয়ে কেঁদেছেন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, কেঁদেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অগণিত মানুষের সাথে এক হয়ে।

* * *

গেল দুটি সপ্তাহই কেটেছে শোক-বিহ্বলতার মধ্যে। বিমূঢ় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল বাঙালীর হৃদয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ছিল না অন্যদিকে। সে সুযোগে বাজারের জিনিষের দাম বাড়তে বাড়তে কখন যে নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে কেউ তেমন খেয়াল করে দেখে নি। খোলা বাজারে চাল পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সরষের তেলের অভাবে গৃহিণীদের মেজাজ হয়ে উঠছে তিরিক্ষি। শনিবার থেকেই সরষের তেল কিনতে গিয়ে কর্তারা সরষে ফুল দেখছেন। মিল-মালিকেরা সরষের অত্যধিক দামের দোহাই দিয়ে তেল-কল বন্ধের হুমকি দেবার পরদিনই বাজার থেকে তেল হঠাৎ একেবারে উবে গেছে।

চাল, তেল, মাছের সমস্যা সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। চালের অভাব কিছুটা মিটতো আলু আর তরিতরকারী দিয়ে। আলুর দাম চড়ে এক টাকা হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এর জন্য দায়ী করেছেন ঠাণ্ডাঘরের মালিকদের। সেই সঙ্গে অবশ্য তিনি আলুর উৎপাদন এবারে কতটা কম হয়েছে তার অঙ্কটাও দিতে ভোলেন নি। অঙ্কের হিসেবে এবং ঠাণ্ডাঘরের লড়াইয়ের সংবাদে মানুষের পেট যে ঠাণ্ডা হবার নয়, এ কথা মুখ্যমন্ত্রী আর সকলের চাইতে নিশ্চয়ই বেশি বোঝেন। কাজেই তাঁর কাছে আমাদের নিবেদন সংশয়, দ্বিধা-জড়িত মনোভাব ত্যাগ করে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করুন—মুক্ত করুন সাধারণ মানুষকে অতি মুনাফালোভীর খপ্পর থেকে। তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। খাদ্য দপ্তর দীর্ঘকাল তিনিই পরিচালনা করে এসেছেন। এর অলি-গলির সন্ধান তিনি জানেন। দৃঢ়হস্তে সেই গলিপথ বন্ধ করলেই সমস্যার অনেকখানি চুকে যাবে।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিদায় নেবার পর রাজ্যের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণ করে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা হৃতগৌরব ফিরে পাবে তাঁর পরিচালনাধীনে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘকাল জড়িত থেকে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি পর্যালোচনার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। হাওড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হয়েও মিউনিসিপাল শিক্ষা দপ্তরের পরিচালনা তিনি নিজেই করেছেন। সেই আগ্রহ ও অনুরাগ নিয়ে তিনি এগিয়ে চললে নিশ্চয়ই সুফল পাবেন।

* * *

জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে গেল। বৃষ্টির সন্ধান নেই। ভ্যাপসা গরমে সবাই গলদঘর্ম হচ্ছে। যাঁরা ভাগ্যবান, ফ্যানের হাওয়ায় কিছুটা আরামে কাটাচ্ছেন। বাকী সকলের চিক্কণ দেহের চামড়া গোসাপের চামড়ার মত ঘামাচিতে খস খস করছে। গরমের ক্লান্তি মেটায় আম্রফলের অমৃত-রসে। দেশী আম শেষ হয়ে এলো। বাইরের আম এসে পৌঁচেছে। কিন্তু দাম বড় চড়া। টাকায় চারটের বেশি জাতে কুলীন আম পাওয়া মুস্কিল। চাল যাদের ঘরে বাড়ন্ত তাদের পক্ষে আমের আস্বাদনের সম্ভাবনা কোথায়। তা' ছাড়া, আমও ঠাণ্ডা-ঘরে প্রবেশ করছে কলকাতার মাটিতে পড়বার সাথে সাথেই।

নদীয়া:

পশ্চিম বাংলার অন্যতম ঘাটতি জেলা নদীয়া। তার উপর উদ্বাস্তুর চাপে জেলার খাদ্য-সমস্যা আরও প্রকটাকার ধারণ করেছে বহু দিন আগেই। নদীয়ার গ্রামাঞ্চল, বিশেষ করে, নবদ্বীপ শহরে চালের হাহাকার পড়ে গিয়েছে। বর্ধমানের চাল নবদ্বীপ শহরকে বরাবর বাঁচিয়ে রাখতো। বর্ধমানের চাল আসা বন্ধ হওয়ার পরই বাজারে চাল পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

আশী নয়া পয়সা চালের সর্বনিম্ন দাম দাঁড়িয়েছে। অথচ নবদ্বীপে মজুতদার পাইকারের অভাব নেই। নবদ্বীপ পৌর অঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার। এদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত। ৮০ নয়া পয়সার চাল তাদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। সরকার নবদ্বীপের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের হিসেব-নিকেশ খতিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন বহু পরিবারকেই অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

আমাদের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানের ভদ্রাসন নদীয়ায়। মাছের ব্যাপারীদের কল্যাণে ভদ্রলোকের ঘরে অখাদ্য পচা মাছ ঢুকেছিল। জানি না, তারপর থেকেই মেছোহাটার পাইকার-আড়তদারদের সাহস বেড়েছে কি না। ভেজাল মাছ নবদ্বীপের বাজারে পাঠিয়েছে বলে সংবাদ প্রচার হয়েছে। ইলিশ মাছের পেট কেটে পাওয়া গেছে সযত্নরক্ষিত ছেঁড়া তোয়ালে।

* * *

অসহ্য গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কচি ছেলেমেয়েরা বাইরে একটু ছুটাছুটি করতেও ভয় পাচ্ছে। বড়রা মুনাফাবাজ হাঙ্গরদের হিংস্র দণ্ডাঘাতে যেমন কাহিল হয়ে পড়েছে, ছোটদের মধ্যে তেমনি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে হায়েনার আক্রমণের। নবদ্বীপের ফাঁসীতলা, শ্রীবাস অঙ্গন চড়া, দণ্ডপাণিতলা প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী হয়েছে হায়েনার লক্ষ্যস্থল। সন্ধ্যা-সমাগমের সাথে সাথে এই হায়েনার অভিযান সুরু হয়। কয়েকটি শিশু হায়েনার আক্রমণে আহতও হয়েছে।

● রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন।

দার্জিলিং :

পশ্চিম বাংলার অন্যতম শৈলাবাস কালিম্পং শহরের বিশ হাজার মানুষ ভীষণ জলকষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। মাঝে মাঝে ময়লা জল আসায় নতুন যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে জলের সরবরাহ কমে গিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। শহর থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরের পাহাড়ের দুটি ঝোরা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৭ লক্ষ গ্যালন জল আসতো। পাহাড়ে ঝোরার স্বচ্ছ জল হঠাৎ অপরিচ্ছন্ন কেন হল তার তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে সীমান্তের রাস্তাঘাট নির্মাণ-কার্যের জন্যই ঝোরার আশ-পাশের মাটি মাঝে মাঝে ধ্বসে পড়ে প্রস্রবণের জলকে কর্দমাক্ত করে তুলছে। প্রস্রবণের অপরিচ্ছন্ন জল কখন ঝোরায় নেমে আসছে তার তদারকের ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য দপ্তর থেকে। অপরিচ্ছন্ন জল এলেই ঝোরা থেকে জল তোলা সাময়িক ভাবে বন্ধ করা হচ্ছে। ময়লা থিতিয়ে গেলে আবার কাজ চলছে জল কলটির।

কালিম্পং শহরের জল কলটি পরিচালনা করেন রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তর। ময়লা জল পরিস্রুত করার ব্যবস্থা সরকার অবিলম্বে করতে না পারলে কালিম্পং শহরের জলের কষ্ট আরও তীব্রতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। বর্ষা সমাগমের সাথে সাথেই সে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

* * *

পশ্চিম বাংলার সব চাইতে ঘাটতি এলাকা দার্জিলিং। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম অপর জেলাগুলো থেকে এমনিতেই বেশি থাকে। দ্রব্য-মূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির চাপটাও তাই এখানকার মানুষের উপর পড়েছে অধিক পরিমাণে। সাধারণ মোটা চাল সরকারের বাঁধা মিহি চালের দামেও খুচরা দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না। তেলের কথা না বলাই ভাল। সব সময়ে সব দোকানে মেলেও না। মিললেও সরকারী দামের চাইতে প্রতি কিলোগ্রামে বিশ থেকে ত্রিশ নয়া পয়সা বেশি দিতে হচ্ছে। মাছ দুর্মূল্য। শিলিগুড়ি শহরের বাজারে কাটা রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে সাড়ে সাত টাকা থেকে আট টাকা কিলোগ্রামে।

শিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা পাড়ার অধিবাসীরা আবার নতুন সঙ্কটের মুখোমুখি এসে পড়ছে। সিভক রোড থেকে বরাবর যে রাস্তাটি পাড়ার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে সেই রাস্তার উপর একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মস্থান গড়ে তুলছেন। ধর্মশালা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হলে পল্লীর পিছনের অংশের অধিবাসীদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। বিষয়টির প্রতি আমরা পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যান চলাচলের পথ বন্ধ হলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে চরম দুর্গতি নেমে আসবে।

জলপাইগুড়ি :

জলপাইগুড়ির ম্যালেরিয়া নিবারণী সংস্থার ১১ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর উপর ছাটাইয়ের খড়গ নেমে এসেছে। একমাস পরে এই দুর্দিনের বাজারে ১৪টি পরিবারের বেকারত্বের অভিশপ্ত জীবন সুরু হবে। কর্মীদের অপরাধ তারা নিয়মমাফিক প্রতিদিন যতটি গৃহে যাওয়ার কথা তা' যেতে পারে নি। এ অপরাধ শাস্তি-যোগ্য সন্দেহ নেই। কাজের গাফিলতির প্রশ্রয় নিশ্চয়ই কেউ দেবেন না। কিন্তু চরম শাস্তি বিধানের আগে প্রয়োজন নিরপেক্ষ তদন্তের। শহরাঞ্চলের মাপ-কাঠিতে গ্রামের কাজ বিচার করলে চলবে না। গ্রামের ঘর-বাড়ি দূরে দূরে। সেখানে একদিনে কটা বাড়ি পরিদর্শন সম্ভব তাও বিচার সাপেক্ষ। এসব দিক কর্তাব্যক্তিদের সুবিবেচনার উপরই নির্ভর করে।

অভিযোগ উঠেছে, সহকারী জেলা স্বাস্থ্য-অফিসার মহোদয় এসব দিক আমলে আনেন নি। তিনি নাকি দোর্দণ্ড প্রতাপের মানুষ। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। সারা দেশ যখন নেহরুর আকস্মিক পরলোক গমনের সংবাদে মুহ্যমান সেদিন ২৮শে মে বেলা দুটো পর্যন্ত তিনি নাকি অফিস চালিয়েছেন।

এ কথা সত্যি হলে, অফিসারটিকে কাজের মানুষ বলতেই হবে। আমরা রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এই ভদ্রলোকের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার এবং সরকারী গাড়িগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে।

মালদহ :

মালদহ শহরে জলসঙ্কট অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। জলের অভাবে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জল কে আগে নেবে তা' নিয়ে প্রতিদিনই চলছে শহরের বুকে হাতাহাতি। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে এসে নামতে হচ্ছে মীমাংসকের ভূমিকায়।

পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা নির্বিকার। জলের সরবরাহ এমনিতেই অত্যন্ত কম। তার উপর মাঝে মাঝেই সরবরাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর বালুচরের বিরাট অঞ্চলে জলের কল একটি এবং দুটি নলকূপ। নলকূপ প্রায়ই অকেজো হয়ে পড়ে। এই নলকূপগুলো যথাসময়ে মেরামতের ব্যবস্থা থাকলে অসহ্য গরমে শহরের মানুষকে এত কষ্ট সহ্য করতে হতো না।

* * *

মালদহ আমের দেশ। আম এ জেলার নগদ পয়সা আয়ের অন্যতম ফসল। গোপালভোগ ও ক্ষীরসাপাতি প্রায় শেষ হয়ে এলো। কলকাতার বাজারে এবারে বোম্বাই ও হিমসাগরের মর্যাদা পেয়েছে মালদহের এই দুটি শ্রেণীর আম। কিন্তু 'মালদার ফজলিই' বিখ্যাত—জাতের আম। মালদহবাসীর ঘরে পয়সা আসে ফজলি আমেই। এবারে ফজলির ফলন ভালই হয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই চালানের ব্যবস্থা সুগম করতে না পারলে কোন ফয়দাই হবে না। এ আমের বড় বাজার ছিল পাকিস্তান। দেশ ভাগ হবার বছর তিনেকের মধ্যেই সে বাজার বন্ধ। তারপর থেকে প্রতি বছরই রেলের ওয়াগনের অভাবে মালদহের মানুষ আমের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। পর্যাপ্ত ওয়াগন না পেলে এবারেও ঘটনার পুনরাবৃত্তিই হবে।

পঞ্চমী পুরাণ

লীলা মজুমদার

(ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)

॥ ছয় ॥

বাড়ি ফেরার নামে বুকটা ধুকপুক করতে লাগল। অথচ গৃহহীন আমার ছোটবেলাকার একমাত্র আশ্রয় এই বাড়ি। তখনো মেসোমশাই এ বাড়ির কর্তা ছিলেন, যদিও বাড়িটা ছিল তাঁর শ্বশুরের নামেই। মেজমাসির মৃত্যুর পর তাঁর ছোট বোনকে যখন মেসোমশাই বিয়ে করলেন, বাড়িটা তখন শ্বশুর মেয়ের নামে দানপত্র করে দিয়েছিলেন। তখনো আমি এরই ছাদের নীচে বাস করি, আমার নিজের বাড়ি কোথাও যদি থেকেও থাকে কেউ তার খোঁজ পায় নি। আজ আমি সেই বাড়িতে ফিরতে ভয় পাচ্ছি।

যেমনি ছোটবেলার কথা মনে হওয়া, স্মৃতিতে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। এই তো আমার দুঃখী জীবনের একমাত্র আশ্রয়; মেসোমশাইরা ছাড়া আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই। অমনি আমার মনের ভয় কোথায় দূর হয়ে গেল। নিশ্বাস বন্ধ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সেই চির পরিচিত খিড়কি-দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

তালায় চাবিকাঠিটি লাগাবার আগে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলাম, অন্য ফুটপাথটি খালি খাঁ খাঁ করছে। একবার মনে হল বটে, গ্যাসবাতির নীচে একটা লোক যদি পাইচারি করত তবে মনে কত জোর পেতাম, আবার তখুনি সে দুর্বলতাটুকুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরোলাম। খট্ করে অস্বাভাবিক রকম জোরে শব্দ করে তালার মুখটা খুলে পড়ল, মনে হল শূন্য গলিটার চারপাশ থেকে খট্ শব্দটার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

খিড়কি-দোর খোলাই থাকল, আমি প্যাসেজটুকু পার হয়ে রান্নাঘরের পাশের খোলা দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। দরজা তো খোলা থাকবেই, আমি নিজেই খুলে রেখে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে আলো জ্বালবার জন্য হাত বাড়িয়েছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে আবার হাত নামিয়ে নিলাম। আমি তো আলোও জ্বেলে রেখে গিয়েছিলাম, খালি বাড়িতে তাহলে আলো নেবাল কে? তবে কি মেসোমশাই ফিরে এসেছেন? না কি অভ্যাস মতো হারু খানসামা তার সাহেবের আগমনের আধঘণ্টা আগে এসে হাজির হয়েছে?

এ সব মনকে চোখ ঠারা ছাড়া আর কিছু নয়। হারু এলে রান্নাঘর আর বাসনের ঘরের আলো জ্বলত।

সারা জীবনের চেনা বাড়ি, চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি এর প্রত্যেকটি কোণায় কি আছে। এই অন্ধকারে কোনো কিছুতে ধাক্কা না খেয়েই আমি স্বচ্ছন্দে দোতলায় আমার নিজের ঘরটিতে চলে যেতে পারি, যে ঘরের দরজা বন্ধ করে পঞ্চমীদিদি আর আমি নিরাপদে কত বছর কাটিয়েছি। আলো আমার দরকার নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি পরিচিত অন্ধকার কোণে যেন অদৃশ্য অভাবনীয় শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আলো জ্বালতে আমার ভয় করছিল। অন্ধকারের আবরণে একটা নিরাপত্তা আছে, আলো জ্বাললেই সেটা ঘুচে যাবে, তখন আমি নিতান্ত নগ্ন নিরলম্ব হয়ে ধরা পড়ব।

ধরা পড়ব? কার কাছে ধরা পড়ব? সত্যিই কি পঞ্চমীদিদির পুরোনো রোগটা আমাকে পেয়ে বসেছে? সে যাই হোক, এখন পঞ্চমীদিদিকে বাঁচাতে হবে। আমাদের ঘরে গিয়ে, পঞ্চমীদিদির দেরাজের ঠুনকো তালাটা ভেঙে, কাপড়-চোপড়ের তলা থেকে চিঠিতে লেখা দেওরের ঠিকানা বের করতে হবে।

তারপর? তারপর আনন্দকে সেটা দিতে হবে, বাকি কাজ সে করবে। কথাটা ভেবে নিজেরি আশ্চর্য লাগল, কি করে আমি নিশ্চিত জানলাম যে সে করবে? বুড়োদাদুর ছেলে বলে? তাই মুখটা চেনা চেনা লাগতো? তাই কি ভালো লাগে?

মাঝখানে বড় হলঘর, তার এক ধার দিয়ে চওড়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনের দরজা তখনো খোলা, সামনের বাড়ির দেয়ালে গাঁথা বিজলী বাতির আলোয় একটা চওড়া ফালি সিঁড়ির তলাটা আর আট-দশটা ধাপের ওপর এসে পড়েছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল।

টের পেলাম বাড়িতে আমি একা নই। আমার গায়েও খানিকটা আলো পড়েছে, আমি একদৃষ্টে সিঁড়ির দিকে চেয়ে আছি। দোতলা থেকে কি কেউ নেমে আসছে? না কি সবই আমার কল্পনা, পঞ্চমীদিদির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া? পঞ্চমীদিদির কথা মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কে তাকে ভুলিয়ে

নিয়ে গেল? হয়তো [illegible] বারুই-পুরের বিশাল সম্পত্তির সে আট আনার মালিক। তাকে সরাতে পারলে সেওর সবটাই পায়।

আজ আমার সবকিছু সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আটটা ধাপ উপরে আলোর ফালিতে একটা মানুষের মূর্তি দেখা দিল।

আমার নড়বার চড়বার ক্ষমতা চলে গেল, একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। রোগা লম্বা মিশ-কালো, কপালে একটা কাটার দাগ, খুনেদের চোখ, সরু চকচকে বাঁকা। ঠোঁট নেই, পাৎলা একটা দাগের মতো; ছোট্ট করে চুল কাটা, গলাবন্ধ মেটে রঙের কোট আর আধময়লা ধুতি পরা। কোটের পকেট থেকে একটা রেশমি দড়ির ফাঁস ঝুলে রয়েছে। কত চেনা, কত জানা, পঞ্চমীদিদির মুখে কতবার শোনা।

এক ধাপ এক ধাপ করে সে আমার কাছে আসতে লাগল, রেশমি দড়ির ফাঁস কখন পকেট থেকে হাতে উঠে এল টের পেলাম না। হঠাৎ তিন-তলার ওপর থেকে হুড়মুড় শব্দ আর সে যে কি বিকট স্বরে বুড়োদাদু চিৎকার করে উঠলেন—'ওরে টুনি পালা, পালা, পা'—কেমন যেন থপ করে থেমে গেলেন, কথাটা শেষ হল না।

কোথা থেকে দেহে শক্তি ফিরে এল, প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম—'মেসোমশাই! মেসোমশাই! মেসো-মশাই!' আমারি ঘরের দরজা খুলে মেসোমশাই বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালেন। আঃ, বাঁচা গেল, আর কোন ভয় নেই। কিন্তু কে এ? এই কি আমার মেসোমশাই? মেসো-মশাইয়ের কি এই রকম সাদা পাথরের তৈরি মুখ? আর তবে আশা নেই। বিদ্যুৎ বেগে ফিরে অন্ধকারের নিরাপদের দিকে দৌড় দিলাম, অমনি কোথা থেকে সরু লিকলিকে কোমল মোলায়েম একটা বাঁধুনি আমার গলা

ছেলে যখন। আমার বুক থেকে সমস্ত নিশ্বাস চিপে বের করে দিতে লাগল, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল চোখে সর্ষে ফুল দেখলাম। তারপর একটা বিরাট অন্ধকার আস্তে আস্তে আমাকে আচ্ছন্ন করতে সুরু করল।

তারি মধ্যে, সেই বায়ুশূন্য ব্যথার মধ্যে, সেই কানে তালা ভেদ করে, চোখের সর্ষে ফুলের মধ্য দিয়ে টের পেলাম চারিদিক থেকে কত লোক-জন নিয়ে আনন্দ ছুটে এসেছে।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, আমার গলার বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে, সেই লোক-টাকে আর দেখতে পাচ্ছি না, বুড়ো-দাদুর গলা শুনছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সে যে কি বিকট একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। আনন্দ আমাকে ডাকল—'টুনি, টুনি!' চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, আর কিছু মনে নেই।

আগামী সংখ্যা থেকে বিভা বসুর রহস্য-গল্প **'কুহেলী বিলীন'** ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবে। —সং সাং রং

মনে হল কত যুগ কেটে যাবার পর আবার চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম। বুড়োদাদু আমার মাথার পাশে বেতের গোল চেয়ারে বসে আছেন। আস্তে আস্তে আমার চোখ বেয়ে গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল, বুড়োদাদু আর কিছু না পেরে ধুতির খোঁট দিয়ে চোখ মছিয়ে দিতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর ঠোঁট দু'খানি থরথর করে কাঁপছে। আমার গাটা খালি খালি কেঁপে উঠতে লাগল। ভাঙা কর্কশ গলায় বললাম—'পঞ্চমীদিদি বেঁচে আছে তো?'

অমনি ঝড়ের মতো পঞ্চমীদিদি আমার বুকের ওপর পড়ল—'ওরে আরেকটু হলেই কি সর্বনাশটা করে ফেলেছিলি! আমাকে বাঁচাবার জন্যে ফাঁসের দড়িতে গলা দিয়েছিলি রে, এ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।'

আনন্দ এসে পাশে দাঁড়াল—'ও পঞ্চমীদিদি, অমন করবেন না, ওর শরীর এখনো দুর্বল।'

তাই তো, আমি তো হাতে জোর পাচ্ছি না, গলায় আমার

[illegible] একটা ঠাণ্ডা নরম আঙুল সেই ব্যথার ওপর বুলিয়ে দিল। আঃ, বুকটা আমার জুড়িয়ে গেল, কত বছরের কত দুঃখ গলে জল হয়ে, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রাণটা হাল্কা হয়ে গেল।

কিন্তু—কিন্তু—বুড়োদাদু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'কি টুনি, কি খুঁজছ, কাকে চাও?'

'কি যেন একটা বিকট শব্দ শুনেছিলাম, হুড়মুড় করে কে যেন পড়ল—মেসোমশাই কোথায়?' তারা এমন করে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল যে, আমার বুঝতে বাকি রইল না মেসোমশাই অমন করে পড়ে-ছিলেন। মেসোমশাই আর নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল। সে বছর আমার পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। মাসিকে আর তার ছেলেমেয়েকেও অনেক দিন পরে দেখেছিলাম, যখন আনন্দকে আর আমাকে সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছিলো। তখন সব চুকে বুকে গেছে, সবাই নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাসির সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখে, জীবনে এই প্রথম তার জন্যে কান্না পেয়েছিল। মাসি কিন্তু কাঁদে টাঁদে নি।

কতক কতক শুনেছিলাম বুড়োদাদুর মুখে, কিছু আনন্দ বলেছিল। এইসব ব্যাপারের অনেক দিন আগে [illegible] স্পেকুলেশন করে মেসোমশাই সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, সে কথা কেউ জানত না, মাসিও না। মাসির মন পাবার আশা তিনি বহুকাল হল ছেড়ে দিয়েছিলেন, টাকা রোজগারের দিকেই মন দিয়ে ছিলেন, এখন মরীয়া হয়ে অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আশার আলো দেখলেন।

ওঁদের এটর্নী আপিসে খবর এল আঠারো বছর আগে হাঙ্গামার সময় সেই লুটপাট করা বাড়িতে, মুখ-বাঁধা ছালায় যে বেহুঁস শিশুগুলিকে পাওয়া গেছিল, তার মধ্যে দু-বছর বয়সের যে অভাগী মেয়েটা ছিল, যার দুই ভুরুর মাঝখানে কুচকুচে কালো গোল

একটা তিল আর গলায় ছোট লাল জরুল আছে, তার আত্মীয়-স্বজন তিনকুলে কেউ বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তার দাদা-মশায়ের আমেদাবাদের কাপড়-কলের অনেক সম্পত্তির সে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

সম্পত্তির ট্রাষ্টিরা এতকাল ধরে অনলসভাবে খোঁজ করে, সেই পুরোনো সমাজ-সেবক সঙেঘর কাছ থেকে শিশুগুলির উদ্ধারের খবর পেয়েছেন এতকাল বাদে। সঙেঘর পুরোনো নথিপত্রে শিশুদের ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের খুঁটিনাটি সুদ্ধ বর্ণনাও লেখা আছে।

হাঙ্গামায় আমার সব আত্মীয়-স্বজনরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, শুধু দাদামশাই আমেদাবাদে ছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি খুবই অসুস্থ, মাস দুই পরে মারাও গেলেন, মারা যাবার আগে তাঁর আদরের মেয়ে, জামাই ও নাতনির বিশদ বর্ণনা দিয়ে, তাদের খুঁজে বের করার জন্যে দামিক ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরাই এতকাল পরে খোঁজ পেয়ে, সেবা-সঙেঘর খাতা-পত্র ঘেঁটে আমার হদিস পান আর গার্জিয়ান হিসাবে বুড়োদাদুর নিজের হাতে লেখা মেজ-মাসির নাম-ঠিকানা পান।

এই অবধি বলে বুড়োদাদু এত ভেঙে পড়লেন যে, বাকিটা আনন্দের কাছে শুনতে হল। মেসোমশাই স্থির করলেন যে, আমাকে সারা জীবন প্রতি-পালন করার প্রতিদান স্বরূপে আমার দাদামশায়ের সম্পত্তিটি তিনি হস্তগত করবেন। তদন্তের কথা কাউকে বললেন না। অথচ আমিই যে সেই মেয়ে, আমার ভুরুর মাঝে কালো তিল আর কনুইয়ে জরুল তার প্রমাণ।

আসলে তিনি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, নইলে সব দিক গুছিয়ে এমন প্ল্যান করা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। বুড়োদাদু ব্যাপারটা জানলেন অনেক পরে, যখন সমাজ-সেবক সঙেঘর পুরোনো সেক্রেটারির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। ততদিনে মেসোমশায়ের কথায় বুড়োদাদু তাঁর খুদকুঁড়ো থেকে পঞ্চমীদিদিকে আর আমাকে দু'কাঠা করে জমি দিয়েছেন, আমরা উইল করে বুড়ো-দাদুকে সর্বস্ব দিয়েছি, বুড়োদাদুও কিছু সন্দেহ না করে লেখাপড়া করে তাঁর সর্বস্ব মেসোমশাইকে দিয়েছেন, তাঁর কাছে অনেক দেনা রয়েছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। এবার আমি চোখ বুজলেই মেসোমশাইয়ের সমস্যা ভঞ্জন হয়।

বুড়োদাদু তখন নিজেই আবার বললেন, 'লোক লাগানো হল আপদ সরাবার জন্যে; সে আবার ভুল করে পঞ্চমীর পেছনে লাগল। এদিকে তুমিও পঞ্চমীর কথা বিশ্বাস করলে না। সাবধানও হলে না। আমি যেই না তোমার সম্পত্তি পাওয়ার কথা শুনেছি, তোমাদের উইলের কথা মনে করে কেমন যেন দুর্ভাবনা হল, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। সে রাত্রে উপেন আমাকে যা বলল সে আর নাই বললাম, বিশেষ করে সে যখন আর নেই। তারপর পাছে আমি সব কথা ফাঁস করে দিই, আমার মুখ হাত পা বেঁধে দুদিন তার কাপড় ছাড়ার ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। পরিবার পাছে জানতে পারে তাই তাদের মা'র কাছে পাঠাল। বাকিটা তো তুমি জানই। তোমাকে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আনন্দ পুলিশের লোক দিয়ে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলবার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। তাকে আমি সব কথা জানিয়েছিলাম, আমি নিখোঁজ হওয়াতে তার বড় ভাবনাও হয়েছিল। তুমি যে অত শীগগির বাড়ি ফিরবে, ওরা ভাবে নি; তাই আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। শেষটা যখন উপেন দেখল এত করা সত্ত্বেও সব পণ্ড হয়ে গেল, তখন সে দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সব জ্বালা জুড়ুল।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—'আর পঞ্চমীদিদির দেওর?'

পঞ্চমীদিদি নরুন-পেড়ে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, গলায় শাশুড়ীর মোটা বিছে হার, হাতে এই বড় পান্নার আংটি পরে, নড়েচড়ে বসল।

'কতবার বলি নি তোমাকে—বারুই-পুরে আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো, দেওর নিয়ে যেতে চায়, তার বৌ মরেছে, তা তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।'

'কি করে করি? এদ্দিন নেয় নি কেন?'

'আরে ওর বাপবুড়ো যে বেঁচে ছিল, আমার বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া ছিল, বড় ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে-ছিল, তারপর সব মরে ঝরে সাফ। এখন দেওরের বাড়ি আমি না আগলালে কে আগলাবে বল।'

আস্তে আস্তে আমার জীবনের নক্সার ছবিগুলো যে যার নিজের জায়গায় বসল, আমি একটা আস্ত মানুষ হয়ে গেলাম। মাসি আর ও বাড়িতে আসে নি, বাড়ি বিক্রি করে তার মার কাছে গিয়ে উঠল, সেইখানেই সুকু, মেমি, মালা মানুষ হচ্ছে। লছমি তার কাছেই আছে। সোনার সেই বছর বিয়ে হয়ে গেল; সাগরকে তার দিদিমা বিলেত পাঠাল। সেইখানেই বিয়ে থা' করে সে বসবাস করছে। পঞ্চমীদিদি মনের সুখে তার শ্বশুরের ভিটেয় দেওরের ছেলে আর ননদের নাতনিকে মানুষ করছে। আমাদের মধ্যে খুব যাওয়া-আসা আছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না।

আর আমি? বুড়োদাদুর শেষ বয়সে তাঁর সেবাযত্ন করবার অধিকার পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি, তারপরে বাড়িতে পড়ে এম-এও পাশ করেছি। আনন্দ পুলিশে কাজ করে, তখনো করত। সারা জীবন তারও সেবাযত্ন করতে চাই, তার বেশি আর কিছু চাই না। আমার দাদামশাইয়ের টাকার অর্ধেক অনাথ আশ্রমে দিয়েছি, যাতে আমার মতো অনাথা অভাগী দু-একজন আশ্রয় পায়। হাত জোড় করে প্রার্থনা করি শেষে তারাও আমার মতো সুখী হোক, পৃথিবীর আনন্দরা তাদের খুঁজে পাক।

সমাপ্ত

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রটেষ্ট্যাণ্টদের ওল্ডক্যাসলকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করেই সেক্সপীয়ার ফলষ্টাফের চরিত্র আঁকেন। ফলষ্টাফ Sons of darkness এবং where of Babylon (the Protestant term for the Catholic Church) সম্বন্ধে বহু কুৎসাবর্ষণ করেছেন—সুতরাং ঐতিহাসিক ওল্ড-ক্যাসলের সঙ্গে এ চরিত্রের প্রচুর মিল আছে এবং ঐতিহাসিক ওল্ডক্যাসলই যে ফলষ্টাফ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

প্রথমে চরিত্রটির নামও ছিল ওল্ড-ক্যাসল—শোনা যায় ঐ ব্যক্তির কোন বংশধর রাণীকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করায়, রাণীরই আজ্ঞায় ওল্ডক্যাসলের নাম বদলে রাখা হয় ফলষ্টাফ। এখানেও একটা মজার ব্যাপার আছে—নাম বদলালেন বটে, কিন্তু আরেকজন ঐতিহাসিক Lollard martyr, যাকে 'ষষ্ঠ হেনরী' নাটকে সেক্সপীয়ার বিখ্যাত ভীরু হিসাবে চিত্রিত করেছেন, সেই Fastolfe-এর নামানুসারে ওল্ডক্যাসলের পরিবর্তিত নাম হোল স্যার জন ফলষ্টাফ।

এই নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য এক নাট্যসংস্থার ভেতর। তাঁরা মঞ্চস্থ করলেন স্যার জন্ ওল্ডক্যাসল—এতে Lollard (heretic of 14th Century) Old-castle-কে তুলে ধরা হোল এবং একজন ক্যাথলিক যাজককে সেক্সপীয়ারের ফলষ্টাফের অনুকরণে পেটুক, লম্পট, চোর, জুয়াড়ী এবং অশ্লীল চরিত্র হিসাবে নামিয়ে আনলেন ক্যাথলিক বিরোধী নাট্যকার। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একথা লোকে বিস্মৃত হয়েছে যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কবি ফলষ্টাফের চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং মাহাত্ম্যই আজ চারশো বছর পরেও ফলষ্টাফকে প্রাণরসে ভরপুর করে রেখেছে।

সার টমাস লুসি ও সেক্সপীয়ার পরিবার

ক্যাথলিক বিদ্বেষী গভর্নমেন্ট পিউরিটেন স্যার টমাস লুসিকে ওয়ারউইকশিয়ারে ম্যাজিষ্ট্রেট করে পাঠান ক্যাথলিকদের শায়েস্তা করতে। এ লোকটি ছিলেন ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী, দুর্বলচিত্ত এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। ১৫৭৬ সালে গ্র্যাণ্ড কমিশন একলেসিয়াসটিক্যাল নিযুক্ত হয় ক্যাথলিক বিরুদ্ধ আইনগুলিকে

শিলালি

কার্যকরী করে তুলতে। লুসির দোসর হয়ে এসে জুটলেন হুইটগিফ্ট—ইনি ছিলেন এঙ্গলিক্যান বিশপ অফ উষ্টার, পরে ইনি আর্চবিশপ অফ ক্যাণ্টারবারী হন। এঁর মত ছিল—The pope is Anti-Christ.

লুসির প্ররোচনায় সেক্সপীয়ারের বাবা জন সেক্সপীয়ার এবং তাঁদের পরিবারের উপর বহু অত্যাচার হয়। কিন্তু হাতে-নাতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ লুসি খুঁজে পান নি। তা সত্ত্বেও রাজসরকারের অত্যাচার থেকে সেক্সপীয়ার পরিবার অব্যাহতি পান নি।

টমাস লুসির বাগানে হরিণ চুরির অপরাধে বাধ্য হয়ে মহাকবিকে ষ্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে পালিয়ে আসতে হয়—এটাও যে কল্পিত কাহিনী সেকথাও আজ প্রমাণিত হয়েছে।

এসব বিষয়ে অতি সুন্দর এবং বিস্তৃ[illegible] ভাবে আলোচনা করেছেন Hugh Fos[illegible] Williamson তাঁর 'The Da[illegible] Shakespeare Died' (Lon[illegible] Michael Joseph) বইতে। এখানে [illegible] বই থেকে কিছুটা পাঠকদের অবগতি[illegible] জন্য তুলে দিচ্ছি :

"The absence of evidenc[illegible] against the Shakespeares, however[illegible] as definitely of those 'in any wa[illegible] kin' to the Ardens, did not sav[illegible] them from arrest and questioning[illegible] There seems little doubt that thi[illegible] was the period when Sir Thoma[illegible] Lucy had William Shakespear[illegible] coft whipped and sometime[illegible] imprisoned and at lost made hi[illegible] fly his native country to his gre[illegible] advancement.

The suggestion that th[illegible] punishment was for deer-stealin[illegible] in Sir Thomas Lucy's par[illegible] ha[illegible] been discredited since the discover[illegible] that Lucy had no park to ste[illegible] dear from or to poach in."

উইলিয়াম লণ্ডনে চলে যাবার প[illegible] সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেও তাঁর বা[illegible] ষ্ট্রাটফোর্ডেই থেকে যান। ১৬০১ সা[illegible] তাঁর মৃত্যু হয়—এই বছরেই মহাকবি[illegible] হ্যামলেট রচনা করেন—with its tribut[illegible] to a father who was a man, tak[illegible] him for all in all

We shall not look
upon his like again.

ক্যাথলিকরা মারা যাবার সময়ও তাঁদে[illegible] যাজকদের কাছে শেষ উপদেশ এবং সাহা[illegible] নেবার বা ধর্মযাজকদের কাছ থেকে পাপে[illegible] ক্ষমা চেয়ে নেবার সুযোগ পেতেন না[illegible] কারণ, তাহলেই প্রকাশ হয়ে পড়বে যে[illegible] তাঁরা ক্যাথলিক এবং তার ফলে তা[illegible] প্রকোপ এসে পড়বে তাঁদের বংশধরদে[illegible] উপর। সুতরাং অনেক সময়েই মৃত্যুকালে[illegible] বাধ্য হয়ে এঙ্গলিক্যান যাজকের উপস্থিতি[illegible] তাঁদের সহ্য করতে হোত। এর ফলে[illegible] মৃত্যুপথযাত্রী এবং তাঁর আত্মীয় বন্ধু[illegible] বান্ধবদের মনে হোত যে, মৃত আত্মার[illegible] পরলোকে সদ্গতি হবে না। জন[illegible] সেক্সপীয়ারের মৃত্যুর পর নিশ্চয় এসব কথা[illegible] মহাকবির মনে উদয় হয়েছিল। এই[illegible] প্রসঙ্গে হ্যাম্লেটের বাবার প্রেতাত্মার[illegible] কথাগুলি স্মরণে আসে—

উইলিয়ম সেক্সপীয়ারের 'পঞ্চম হেনরী' নাটকের কিং হেনরীর ভূমিকায় প্রযোজক সার ক্যাসন

Thus was I, sleeping,
by a brother's hand
Of life, of crown of queen,
at once dispatched;
Cut off even in the blossoms
of my Sin,
Unhousel'd, disappointed,
unanel'd,
No reckoning made,
but sent to my account
With all my imperfections
on my head
O, horrible ! O, horrible !
most horrible !

হ্যামলেট প্রার্থনারত ক্লডিয়াসকে হত্যা করতে পারলেন না। কারণ :

He took my father grossly,
With all his crimes broad-blown,
as flush as May
...and am I then revenged
To take him in the purging
of his soul
When he is fit and seasoned
for his passage ?

ওফেলিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় অঙ্গহীন ধর্মাচার লক্ষ্য করে লেয়ারটিস্ ও যাজকের যে কথাবার্তা হয় তা হচ্ছে এই :

Laertes—What ceremony else ?
First priest—Her obsequies
have been as far enlarged
As we have warrantise :
her death was doubtful,
And, but that great command
oversways the order,
She should in ground unsanctified
have lodged
Till the last trumpet :
for charitable prayers,
Shards, flints, and pebbles should be
thrown on her;
Yet here she is allowed her
virgin crants,
Her maiden strewments,
and the bringing home,
of bell and buiral.
Laertes—Must there no more
be done ?
First Priest—No more be done:
We should profane the service
of the dead,
To sing a requiem, and such
rest to her
As to peace-parted souls.
Laertes—Let her in the earth ;
And from her fair and unpolluted
flesh
May violets spring ! I tell thee,
churlish priest,
A ministering angel shall my
sister be,
When thou liest howling.

ওফেলিয়ার শেষকৃত্য সম্পূর্ণ ক্যাথলিক রীতি অনুসারেই হয়েছে। এ-বিষয়ে Hugh Ross Williamson লিখেছেন :

The 'maimed rites' are in accordance with those prescribed by Canon Law (Codex juris canonici, 1240. par. 2, which specifically deals with those whose 'death is doubtful') and a Requiem Mass was forbidden. Buriel in consecrated ground was a general rule, refused. In the Anglican Church there was no prohibition of the burial of a suicide in the churchyard till half a century after Shakespeare's death ; nor did such a thing as a Requiem mass exist in Anglicanism. Canon Dearmer explains 'requiem' as a 'Solemn music', which may stand without comment.

(ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সাইত্রিশ

খ্যাতির বিড়ম্বনা

১৮৮৪ সাল। ষ্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে। 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা করে, গিরিশচন্দ্র শুধু দর্শকের সুখ্যাতিই লাভ করেন নি, সেই সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চেরও মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। যাঁরা থিয়েটারের নাম শুনে নাক সিঁটকাতেন, তাঁরাও 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় দেখে, উত্তরকালে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাই অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন—

'লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল লীলা
নাটাশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার
বাজে শিঙা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসী নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়।'

'চৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ হওয়ার পর গিরিশচন্দ্র একদিকে যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্যলাভের পরম সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি বহু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তাঁর কাছে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আসতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এইসব বৈষ্ণব সাধুদের নিয়ে সময় সময় বড়ই বিব্রতবোধ করতেন। তিনি মদ্যপায়ী, গোঁড়া। কণ্ঠীতিলকধারীরা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে আসবে, বৈষ্ণব-তত্ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবে, আর তিনি যা নন, তেমনতর বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করবে, এটা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করবার মত তাঁর সময়ই বা কোথায়? বৈষ্ণব সাধুদের পাল্লায় পড়ে, ক্রমশই তিনি যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন।

একদিন সকালে গিরিশচন্দ্র তাঁর বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসে পড়াশোনা করছেন এমন সময় এক বৈষ্ণব সাধু এসে ঘরে ঢুকলেন। গিরিশচন্দ্র সসম্মানে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। বৈষ্ণব সাধুটি বললেন:

—আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম। 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা এবং অভিনয় করে, আপনি দেশের প্রভূত উপকার করেছেন।

—তা হবে।

—আপনি পরমভাগবত।

গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব সাধুর কথায় চমকে ওঠেন! বলেন:

—বলছেন কি! আমি ভাগবত?

—হ্যাঁ। তা না হলে কি আর আপনি এমন ভক্তিমূলক নাটক রচনা করতে পারেন?

—না না, ওসব আমি কিছুই নই। খেয়াল খুশিতে নাটক রচনা করেছি। ভক্তি টক্তি আমার মোটেই নেই—

বৈষ্ণব সাধু গিরিশচন্দ্রের কাটা ছেঁড়া জবাবের পরেও বলতে থাকেন:

—আহা! আপনি বিনয়ের আধার। পরম বৈষ্ণব না হলে কি আর এমন নিরহঙ্কার হওয়া যায়?

সাধুর কথায় গিরিশচন্দ্র ক্রমশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কি করে সাধুকে ওঠান যায়, তারই ফিকির খুঁজতে থাকেন। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে, আলমারীটা খোলেন। তারপর মদের বোতল ও গ্লাস বার করে, নিজের জায়গায় ফিরে এসে গ্লাসে মদ ঢালতে থাকেন। বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞাসা করেন:

—আপনি কি অসুস্থ?

—না।

—তবেও ঔষুধ খাচ্ছেন যে?

—ওষুধ নয়। এটা মদ—

গিরিশচন্দ্রের কথায় বৈষ্ণব সাধু চমকে ওঠেন। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। গিরিশচন্দ্র বলেন:

—এ কি! উঠছেন কেন? বসুন—বসুন। ভাগবতের ভগবদ্ভক্তিটা একবার পরীক্ষা করে যান।

বৈষ্ণব সাধু ততক্ষণে উত্তরীয় দিয়ে নাক চেপে ধরেছেন। আর মুখে বলছেন:—রাধে! রাধে!

—এ কি! আপনার ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস এক নিমিষেই উবে গেল!

গিরিশচন্দ্রের শেষ কথাগুলি বৈষ্ণব সাধুর কানে গিয়ে পৌছাল কি না কে জানে! কিন্তু গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করলেন, সাধুটি তখন ঘর ছেড়ে বলতে বলতে চলেছেন:

—ছিঃ ছিঃ! এই লোক গৌরলীলা কীর্তন করছে। রাধে! রাধে!

আর ওদিকে তখন দাওয়াই কাজে লেগেছে দেখে, গিরিশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুরথকুমারী ঘরে ঢোকেন। গিরিশচন্দ্রকে আপন মনে হাসতে দেখে, হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গিরিশচন্দ্র সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন সুরথকুমারীর কাছে। সব শুনে সুরথকুমারী বলেন:

—আচ্ছা, তুমি কি বলতো?

—কি আবার! আমি যা তাই সাধুকে জানিয়ে দিলাম। ভাগবত হতে গেলে, আমাকে যে ভণ্ড হতে হতো!

স্বামীর কথা শুনে, শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে সারা দেহমন। কোন জবাব দিতে পারেন না সুরথকুমারী। শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন, তাঁর দিকে।

● গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পাঠক মন

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন নিত্যপাঠিকা। আপনার সুযোগ্য সম্পাদনায় 'বসুমতীর' উত্তরোত্তর উন্নতিতে আমি খুবই খুশি হয়েছি, এবং কামনা করি, এই উন্নতি অব্যাহত থাকুক। শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের তিনটি বিশেষ সংখ্যা, সব দিক বিচার করলে, বর্তমানকালে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলি থেকে অনেক ভালো ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরিকল্পনা ও রচনার তিনটি সংখ্যাই অভিনব। তিনটি সংখ্যারই কভার স্মরণীয়।

শেক্সপীয়র সংখ্যায় বিশেষ করে ভালো লেগেছে সুশীলকুমার গুপ্তের 'আমার প্রিয়ার চোখ' নামে শেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ সনেটের অনুবাদ। এতো ভালো অনুবাদ আমি পড়ি নি। হরপ্রসাদ মিত্রের রচনাটি ভালো, কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত; রবীন্দ্র সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখা হচ্ছে সুধীরঞ্জন দাসের 'অমৃতময় পুরুষ', সুশীলকুমার গুপ্তের 'রাজস্থান ও রবীন্দ্রনাথ' সংক্ষিপ্ত হলেও অশোক সেনের 'রবীন্দ্র নাট্যের অভিনয়'।

নজরুল সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল কাব্যের আধুনিকতা'। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'ভারতদর্শন', 'শহর কলকাতা' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কৃষ্ণচূড়া' বেশ ভালো লাগছে। 'গ্রন্থমেলা'র উপর আর একটু জোর দিলে ভালো হয়। এখন তো দেশ-বিদেশের প্রভেদ ঘুচে যাচ্ছে। কোন ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনী কি দেওয়া যায় না? বিদেশকে জানার এর চেয়ে বড় উপায় আর কি আছে?

ছাপার উন্নতির দিকে নজর দেওয়া দরকার। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ছাপা খুবই খারাপ হচ্ছে। অনেক সুখপাঠ্য লেখা ছাপার জন্য মার খাচ্ছে—এটা কাগজের পক্ষে সুখদায়ক নয়, লেখকের পক্ষে তো নয়ই। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য পৃষ্ঠার কাগজটাও ভাল দিতে চেষ্টা করুন।

শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
অর্জুনপুর (উত্তরপাড়া) পোঃ হাতিয়ারা
২৪ পরগণা।

* * *

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' নিয়মিত একনিষ্ঠ পাঠক। আপনার পত্রিকার সম্পাদকীয় আমাকে এত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে, যা অবর্ণনীয়। ধরুন—১৪ই মে'র 'বৈদেশিক দাক্ষিণ্য', ২১শে মে'র 'মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, না, ছাত্রবধ্যভূমি' এবং ২৮শে মে'র 'নজরুল ও জাতীয় দারিদ্র' এ যে কঠোর সত্য কথা বলা হয়েছে তাহা যেন চিরন্তনী রূপ ধারণ করে।

তাহা বাদে বঙ্গদর্শন', 'ভারত দর্শন', 'আন্তর্জাতিক' ও 'শহর কলকাতা' কাগজটির উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছে। কাগজে 'আজকের মানুষ' পাঠে সত্যই নাগরিকদের জীবন রশ্মিময় হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া রঙ্গজগৎ, খেলাধুলা, রঙ্গমঞ্চ ওদেশে ও এদেশে, কবিতা, উপন্যাস এবং গল্পগুলিও কাগজটিকে বহুল উৎকর্ষতা দান করেছে। আমার মতে কবিতা একটি কোরে না দিয়ে ২।৩টি আরো বাড়ালে মনে হয় পত্রিকাটির এতটুকু সৌন্দর্য নষ্ট হবে না, বরং তাতে ভালই হবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র প্রামাণিক
গ্রাম-পোঃ: নন্দনপুর
জেলা—হুগলী

শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা,

আপনাদের বহুল প্রচারিত "সাপ্তাহিক বসুমতী"র (9th April, 1964) "পাঠক মন" শিরোনামায় অনাদিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখার প্রায় সমস্ত অংশই ভালো লাগল। কিন্তু এক জায়গায় এসে হোঁচট খেলাম, যেখানে তিনি প্রস্তাব করেছেন, "কবিতার সংখ্যা কমিয়ে প্রতি সংখ্যায় ২।৩টি ভালো কবিতা দিলেই ভাল হয়। আরো ভালো গল্প দিন। অন্তত মাসে দুটো ভাল গল্প পেলে আমরা খুশি হবো---" ইত্যাদি। উদ্ধৃত অংশটি পড়লে সহজেই বোঝা যায় তিনি কবিতার চেয়ে গল্প ভালবাসেন বেশি। তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু তাঁর একথাটাও ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা ছিল যে, অনেকে আবার গল্পের চেয়ে কবিতার প্রতি একটু বেশি অনুরক্ত। আর প্রকাশিত কবিতাগুলো পত্রিকার খুব বেশি জায়গা অধিকার করে না। সুতরাং তিনি যদি "আরো ভাল গল্প" চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "কবিতার সংখ্যা কমিয়ে" দিতে না চাইতেন, তাহলেই তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণতা পেত।

আর একটা কথা এই যে, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কবিতাতে জীবনের সহজ সরল ও ঘনীভূত রূপ যতটা চোখে পড়ে ততটা বোধহয় অন্য কোনো শাখায় (ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি) নয়। এ অবশ্য মতামত তর্কসাপেক্ষ।

পরিশেষে "সাপ্তাহিক বসুমতী"র দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সীমায় রেখেছেন বলে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পত্রিকার মান (Standard) যে প্রশংসনীয় সেকথা বলতে পেয়ে আনন্দিত।

ভজপদ সিংহ রায়,
ছাত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
(স্কুলবাগান) বোলপুর, বীরভূম।

রঙ্গজগৎ

● বিশ্বজিৎ

ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ মেহবুব খান

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে অন্যতম পথিকৃৎ মেহবুব খানের মৃত্যু হয়েছে। সমগ্র দেশ যখন দেশনায়ক জওহরলালের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ এমন সময় মেহবুব খানের মৃত্যু প্রায় অলক্ষ্যেই ঘটে গেছে।

মেহবুব খান বাল্য বয়সে সামান্য মজুরের কাজে চলচ্চিত্র শিল্পে যোগ দিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি পরিচালক ও প্রযোজক হয়ে উঠেছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি অনেকটা সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাস করতেন। তাই কাস্তে-হাতুড়ীকে তিনি মেহবুব প্রোডাকসন্সের প্রতীকচিহ্ন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এককালে তাঁর ছবির সুরুতে বড় করে পর্দায় ভেসে উঠতো কাস্তে-হাতুড়ী। তারপরে দেশের এবং তাঁরও আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাস্তে-হাতুড়ী ছোট হয়ে এলেও তাকে তিনি বর্জন করেন নি। স্টুডিও বয় থেকে তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। মেহবুব প্রথম জীবনে যে প্রগতিশীল ছিলেন তা তাঁর আওরৎ, রোটি প্রভৃতি ছবি দেখলে বোঝা যায়। এই ছবিগুলি এককালে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এরূপ বলিষ্ঠ ভাবধারার ছবি সেকালে হয়েছিল, অথচ আজকের স্বাধীন ভারতে বোম্বাইতে এরূপ ছবি নির্মিত হয় না। তার কারণ, সেদিন মেহবুবের মত চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের ছিল আদর্শ, আজকের নির্মাতারা আদর্শের চেয়েও টিকিটঘরের প্রতি বেশি বিশ্বাসী। আদর্শ এবং টিকিটঘর এই দুই যুগের সেতুবন্ধ ছিলেন মেহবুব খান। আমরা এই চলচ্চিত্র-পথিকৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। —সুজন।

চিত্র আলোচনা

কষ্টি পাথর

এম-কে-জি পিকচার্সের প্রযোজনায় যে কটি ছবি নির্মিত হয়েছে প্রত্যেকটি দর্শক মনোরঞ্জনে সার্থক হয়েছে। তাঁদের নবতম প্রযোজনা 'কষ্টি পাথর' একই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত। উপরন্তু রোমাণ্টিক ছবি নির্মাণে পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জীর হাত আছে। সুতরাং এই ছবিটিও দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে আশা করা যায়। বিশেষ করে হাল্কা রসের ছবি এবং হাল্কা পরিবেশ যাঁরা পছন্দ করেন।

ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক থিয়েটার ও একটি দুঃস্থ পরিবারের মর্মস্পর্শী অবস্থাকে কেন্দ্র করে। পঙ্গু বাবা ও ছোট ভাইকে বাঁচাবার জন্য রমা অভিনেত্রী অর্চনার সাহায্যে রঙ্গম থিয়েটারে কাজ নেয়। রঙ্গম থিয়েটারের তখন শোচনীয় অবস্থা। ওরা তখন ধনী রজত চৌধুরীর সাহায্যলাভের জন্য চেষ্টা করছিল। একদিন রমা ভিড়ের জন্য বাসে উঠতে না পেরে রজত চৌধুরীর গাড়িতে থিয়েটারে আসে। গাড়ির চালক ছিল রমাদের প্রতিবেশী। এতে রটে যায় রমা রজত চৌধুরীর বান্ধবী। সিনেমার কাগজগুলি মাতামাতি সুরু করে দেয়। তাতে বিরক্ত হয়ে রজত চৌধুরী রমাদের বাড়িতে আসে ঘটনার সূত্র আবিষ্কার করতে। অর্চনার পরামর্শে রমা রজত চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্বীকার করে। এই মিথ্যা কথা স্বীকার করার মধ্যে যতই গ্লানি থাকুক এতে তার থিয়েটারের চাকরীটা বহাল থাকবে। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ রমাকে খুশি করে রজত চৌধুরীকে থিয়েটারের সহায়তায় টানবার তালে ছিল। এই টানাটানির মধ্যে এসে রজত চৌধুরী রমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রণয় থেকে পরিণয়ে পৌঁছতে দেরী হয় না। আর থিয়েটার কর্তৃপক্ষও মোটা অর্থ-সাহায্য লাভ করে।

এই কাহিনীর মধ্যে বাংলা দেশের থিয়েটারের আর্থিক সাহায্যলাভের সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বহুকাল থেকে ধনী ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যের উপর থিয়েটারগুলি বেঁচে আছে। এবং এই ধনীদের অর্থসাহায্যের প্রেরণা যতটা না থিয়েটার-প্রীতি তার চেয়ে

শি কোন অভিনেত্রীর প্রতি রাগ। এই সঙ্গে বাংলার নিম্ন-বিত্ত পরিবারগুলির অবস্থাটাও কাশ হয়েছে। রমার মত ভদ্রঘরের য়ে কেবল দু'মুঠো অন্নের জন্য অজ্ঞাত-রিচয় কোন এক ধনীর প্রণয়িনী বলে জে স্বীকার করতে তার বিবেক ও নে বাধে নি। জীবনধারণের না ভদ্র পরিবারগুলি কি এত নীচে মে এসেছে?

পরিচালক শ্রীমুখার্জী নিজেকে মাজসচেতন বলে আশা করি দাবী রেন না। তাই তাঁর ছবিতে পরোক্ত দুর্ঘটনা এমনভাবে প্রকাশ নি যাতে বাস্তব অবস্থার প্রতি পাতের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্লানিকর নসিকতার জন্য মনে জ্বালা ধরিয়ে য়। এই চেতনাবোধের অভাবে রিচালক 'তেলে জলে মেশাবার' তত্ত্বে বিশ্বাসী। রমার বাবার মুখে 'তেলে জলে মেশে না' এই সংলাপ দিয়েও পরিণতিতে পরিচালক দেখিয়ে-ছেন ধনীরা বড় মহৎপ্রাণ; তাই রমার মত অতি সাধারণ পরিচয়হীন, জীবিকার জন্য লজ্জাকর মিথ্যাভাষী মেয়েকেও বিয়ে করে সাগ্রহে। ছবিটিতে অসংলগ্নতা ও অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে প্রচুর। তার মধ্যে উল্লেখ করা চলে, রমার কথা শুনে ভোম্বল মিত্রের রজত চৌধুরীর দেওয়া চেক ফেলে দেওয়ার ঘটনা। যারা রজতের গাড়িটাও চেনে, তারা রজতকেও চেনে, সুতরাং এই রজত সেই রজত নয় এরূপ বিশ্বাস হবার কোন কারণ বোঝা যায় না। তবে দর্শক মনোরঞ্জনী ছবিতে এ-ধরণের অসংলগ্নতা প্রায়ই দেখা যায়; একটু রঙ না মেশালে দর্শকরা না কি খুশি হন না।

এই ছবির মূল কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়, চিত্রনাট্য রচনা করে গেছেন ৺মঞ্জু দাশগুপ্ত। ছবির কণ্ঠ-সঙ্গীত সুগীত, কিন্তু রচনা কাব্য-রসহীন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সন্ধ্যা রায়, লিলি চক্রবর্তী, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, রবি ঘোষ, জহর রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, সাধনা রায়চৌধুরী, বিজন ভট্টাচার্য, সুনন্দা ব্যানার্জী, বীরেশ্বর সেন জয়শ্রী সেন প্রমুখ।

● অর্ধেন্দু পরিচালিত, এম কেজির 'কষ্টিপাথর' চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও অনপকুমার

● সুধীর মুখার্জী পরিচালিত 'নতুন তীর্থ' চিত্রের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুলতা।

বিয়ে-প্রেম-নিঃসঙ্গতা

সোফিয়া লোরেন

আমি তখন সন্তানসম্ভবা। ওরা আমাকে কোর্টে নিয়ে চললো। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ—চরিত্রহীনতার। আমাকে জেলে দেবার ভয় দেখান হলো। জবরদস্তি করে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলো—আমি বিবাহিতা নই।

জীবনে এর চেয়ে কঠিন বাক্য আমি উচ্চারণ করেছি কি না মনে পড়ে না। কার্লোকে যে আমি ভালবাসি সেকথা আমি কোনদিন অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু সেদিন রোমের আদালতে আমাকে একথা অস্বীকার করতে হয়েছিল। সোফিয়া লোরেন ও কার্লো পণ্টি ইতালীতে দুটি চরিত্রহীন মানুষ। কারণ ইতালীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। কার্লোর স্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে।

আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন আমরা একত্রে ইতালীতে ফিরেছি আদালতের সম্মুখীন হতে।

● সোফিয়া লোরেন

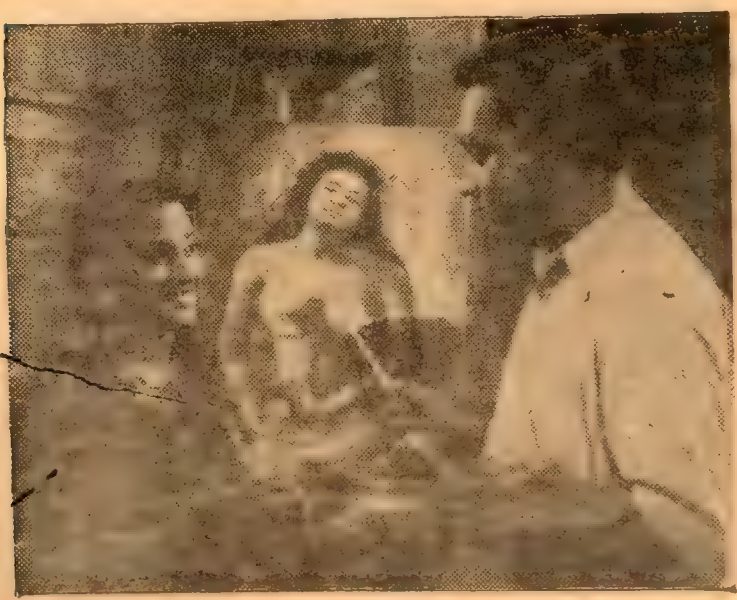

● মুক্তি প্রতিক্ষিত 'মরুতৃষ্ণা' ছবিতে সবিতা বসু ও অসিতবরণ

আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা প্রমাণিত হলে পাঁচবছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। এ অভিযোগ আসলে উপপত্নী রাখার অভিযোগ। আমার বক্তব্য হলো—আমরা যা করেছি, তার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগাযোগ রয়েছে। তার জন্য যত ঝুঁকিই থাক না সে কাজ আমাদের করে যেতে হবে। আমি এবং কার্লো দু'জনে শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতে পারলেই যথেষ্ট মনে করি নি। ঈশ্বরের দৃষ্টির সামনেও আমরা স্বামী-স্ত্রী হতে চেয়েছি। কেন না, আমাদের বিশ্বাস এছাড়া জীবনে শান্তি আসতে পারে না। আজ হোক কাল হোক এই অধিকার আমরা আদায় করবোই।

তাহলে ১৯৫৭ সালে আমরা

বিয়ে করলাম কেন? এদেশে আমাদের বিয়ে আইনসঙ্গত হবে না জেনেও কেন আমরা এমন করলাম। এতে শুধু অশান্তি ডেকে আনবে জেনেও। আমরা তো ইচ্ছা করলেই আমাদের বিরুদ্ধে সকল প্রেমের গুজব অস্বীকার করতে পারতাম।

আজ মনে হয়, আমি যদি সোফিয়া লোরেন না হয়ে সেই সোফিয়া নিকোলনই থাকতাম, তাহলে কেমন হতো? ছবিতে অভিনয় করে আমি যখন খ্যাতি পেলাম, তখন ইউরোপের বহু পত্রিকা আমাকে আত্মজীবনী লেখার জন্য অনুরোধ করলো। আমার ছোটবেলাটা দুঃখে, দারিদ্র্যে, ক্ষুধায় কেটেছে। সে সময় যুদ্ধের হাহাকার সারা দুনিয়ায়। তারপর এক সময় যুদ্ধ শেষ হলো। দুঃখ দারিদ্র্য থেকে বাঁচবার সংগ্রাম সুরু হলো। নতুন করে সংগ্রামের প্রেরণা পেলাম যেন। দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে হলে সংগ্রামী মনের প্রয়োজন আছে বৈকি। আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন আর ব্যর্থপ্রেম সবকিছুর কথা মনে পড়ছে। আমি সেই টেলিগ্রামটির কথা ভুলতে পারবো না। টেলিগ্রামটি এসেছিল আমার বাবার কাছ থেকে। তিনি লিখেছিলেন—তিনি অন্য এক মহিলার প্রেমে পড়েছেন। তারপর আমার বাবা সেই মহিলাকে বিয়ে করেন। এবার সত্যিই আমরা নিঃসঙ্গ হলাম।

আমাকে দেখে ছেলেরা শিস্ দিত। আমার খুব খারাপ লাগতো। মাঝে মাঝে কান্না পেত। এমনি করে কেটেছে আমার প্রথম যৌবন। তখন থেকেই আমার মনে প্রেমের জন্য কেমন যেন হাহাকার অনুভব করতাম। মনে হতো এমন একজন যদি আমার জীবনে আসতো যিনি আমাকে বুঝতে পারতেন। যিনি আমাকে তাঁর নাম ও পদবী দিতেন। তারপর আমার সঙ্গে দেখা হলো কার্লো পণ্টির।

১৯৫০ সালে আমি মিস্ ইতালী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলাম। তখন আমার বয়স পনেরো। আমি হার মানলাম প্রতিযোগিতায়। মন খারাপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন একজন লোক এল আমার কাছে। বললো—মন খারাপ করে কাজ নেই, এই নাও আমার কার্ড। আমার সঙ্গে দেখা করো। এই লোকটি আমাকে আবিষ্কার করলো। বিখ্যাত করলো। ভালবাসা দিল। এর নাম কার্লো পণ্টি।

● ভূপেন রায় পরিচালিত 'নিশাচর' ছবির রূপসজ্জায় সন্তু মিত্র

● 'মহালগ্ন' ছবিতে নবাগত দেবজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ

নাটকের কথা

চোখের বালি

হাওড়ার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা কলাপী 'হাঙর' নাটকটি প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করার পর আগষ্টের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নাট্যরূপদান ও পরিচালনা করবেন রণজিৎ দত্ত। গত ৩১শে মে সন্ধ্যায় এ নাটকের শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরভাবে সম্পাদিত হয়েছে। সভার প্রারম্ভে উপস্থিত সভ্য ও অতিথিবৃন্দ নেহরুজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর সকালে এঁরা পুনরায় 'হাঙর' নাটকটি বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করবেন।

খেলা ধুলা

টেন্টব্রিজে মেঘের খেলা

বাংলা দেশে একটা প্রচলিত ছড়া আছে---আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে ; তবে টেণ্ট ব্রিজের ছেলের দলের এই ছড়া জানা না থাকলেও তারা একটা নতুন ছড়া বেঁধে গাইছিল ---আয় বৃষ্টি ঝেঁপে রান দেব মেপে। এই টেণ্ট ব্রিজ টেষ্ট খেলার বৈশিষ্ট্য একটি প্রবল তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব। ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া ছাড়াও দলে দলে মেঘের খেলা দর্শক খেলোয়াড় ও কর্তৃপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। ইংলণ্ড টসে জিতেছে, খেলা দেখবার জন্যে অগণিত দর্শকে টেণ্ট ব্রিজের ষ্টেডিয়াম উপচে পড়ছে। হঠাৎ কালো মেঘের দল মাঠের মাথায় আসন পেতে বসল। তারাও যেন বিনা টিকিটের দর্শক। যখন তখন ঝুপঝাপ করে মাঠের মাঝে নেমে পড়ছে। খেলোয়াড়েরা তল্পি-তল্পা গুটিয়ে প্যাভেলিয়ানে ছুটে পালাচ্ছে। টেণ্ট ব্রিজ যেন চেরাপুঞ্জিতে পরিণত হল। ইংলণ্ডের পোয়াবারো। প্রায় কেল্লা মেরে এনেছিল, আর একটু সময় থাকলে ...ফিংপটাং হত। এখন খেলার

... ব্যাটিং

... াগত

আস্থার অভাব থাকলেও পরে তিনি বেশ দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে তিনি মূল্যবান ব্যক্তিগত ৪৮ রান করেন। স্যার্প এবং কলিন কাউড্রেও ব্যাটিং নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। স্যার্পের ব্যক্তিগত রান হয় ৩৫ এবং কাউড্রের ৩২। বৃষ্টির জন্য বেশ কিছুক্ষণ সময় নষ্ট হয়।

শ্রীঅমিতাভ

অষ্ট্রেলিয়া দলের দুজন নবাগত বোলার হক এবং স্পিনার ভাইভার্সের বল খুবই কার্যকরী হয়। হক ৬৮ রানে ৩ উইকেট এবং ভাইভার্স ৩৯ রানে ৩ উইকেট সংগ্রহ করেন। ৮ উইকেটে ২১৬ রানের মাথায় ডেক্সটার ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসের সুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ববি সিম্পসন অধিনায়কোচিত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত ৫০ রান দলের পতন রোধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এরপরই উল্লেখযোগ্য হল বার্জের ৩১ এবং ও-নীলের ২৬ রান। ইংলণ্ডের পক্ষে ট্রুম্যান এবং কোল্ডওয়েল ৩টি করে উইকেট সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় ; কিন্তু অধিনায়ক ডেক্সটার ৬৮ রাণ সংগ্রহ করে স্বীয় দলকে প্রভূত সাহায্য করেন। অভিজ্ঞ দুই ব্যাটস্‌ম্যান কাউড্রে ও ব্যারিংটন সংগ্রহ করেন ৩৩ করে রান। এই সময় অষ্ট্রেলিয়ার ...বোলার ম্যাকেঞ্জী সংহার মূর্তি ধারণ করলেন, একাই তিনি ৫৩ রানে ৫টি উইকেট দখল করেন। তারপর ৯ উইকেটে ১৯৩ রানে ইনিংস সমাপ্ত। অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ৪০ রা; সংগ্রহ করার পর খেলাও শেষ হল। অষ্ট্রেলিয়াও প্রায় একটি পরাজয় এড়ান।

ফুটবল সমীক্ষা

গতবারেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম ইরাণকে পরাজিত করা ভারতীয় দলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর হলও তাই, তেল আভিভের মাঠে প্রাক-অলিম্পিক খেলায় ইরাণের কাছে ভারতকে সরাসরি ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে হল। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করব যে, ভারতীয় ফুটবল দল অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করে অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই ব্যর্থ করে ক্রীড়ামোদীদের চমৎকৃত করেছে। ফিরতি খেলা হবে ২১শে জুন কলকাতায়, এই খেলায় ভারত চার বা বেশি গোলের ব্যবধানে ইরাণকে পরাজিত করতে পারলে টোকিও অলিম্পিকে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে। তিন গোলের ব্যবধানে ভারত জয়লাভ করলে মীমাংসার জন্য কোন নিরপেক্ষ দেশের মাঠে আবার একটি খেলা হবে। ভারতীয় দলের পরাজয়ের মূল কারণ সেই একই কথা, দলীয় সংহতির অভাব।

এবার আমাদের কলকাতা ময়দানের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। খেলার মানের কথা বাদ দিয়ে পয়েণ্টের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, এবারের লীগ যথেষ্ট আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান, বি এন আর-এর মত প্রধান দলগুলি এবার পাল্লা দিয়ে পয়েণ্ট নষ্ট করতে সুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃত্যুতে পাঁচদিন ময়দানের খেলাধুলা বন্ধ থাকার পর যে কটি খেলা হয়েছে তাতে মোহনবাগান যোগদান করেছে দুটি খেলায়। মহা-

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটস্‌ম্যান নর্মান ও নীল ট্রুম্যানের একটি বলে হুক মারছেন।

মেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে মোহনবাগান ড্র করে একটি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। পরবর্তী খেলায় মোহনবাগান বাটাকে ২-0 গোলে পরাজিত করেছে। এবার মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ভাগ্যটাই নিতান্ত খারাপ। পর পর দুটি খেলায় তাদের পরাজয়ের আস্বাদ গ্রহণ করতে হল, এরিয়ান্সের কাছে ১-0 গোলে এবং পোর্ট দলের কাছে একেবারে ২-0 গোলে। ইষ্টবেঙ্গলের মিশ্রভাগ্য, পর পর দুটি খেলায় বালী প্রতিভা এবং রাজস্থানকে পরাজিত করে, তৃতীয় খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে একটি পয়েণ্ট নষ্ট করতে হল তাকে। এবার সাধারণ দলগুলির মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন যথেষ্ট উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের কাছ থেকে একটি করে মূল্যবান পয়েণ্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন লীগের গতি দেখে বলা যাচ্ছে না যে লীগের জয়মাল্য কার গলায় পড়বে।

রেকর্ড ভাঙা কীর্তি

অনেকদিন আগেই পোলভল্টে ১৬ ফুটের বাধাও ভাঙল, তারপর এমন কি ১৭ ফুটের বাধাও ভেঙে দিলেন জন পেনেল। কয়েকদিন আগে রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হানসেন ইউ-এস-এ ট্র্যাক ও ফিল্ড ফেডারেশান ডিষ্ট্রীক্ট মিটে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। তরুণ হানসেন পোল হাতে দিলেন এক বিরাট লাফ আর একেবারে ১৭ ফুট ১ ইঞ্চির বাধা অতিক্রম করে ধ্বকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

ইতিপূর্বে জন পেনেল ১৭ ফুট ¾ ইঞ্চি লাফিয়েছেন, কিন্তু স্বীকৃত বিশ্ব রেকর্ড বর্তমানে হল জন পেনেলের ১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি। পোলভল্টারদের কীর্তিকলাপ দেখে মনে হয় আগামী টোকিও অলিম্পিকে তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা পোলভল্টকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত করবে।

আমেরিকার মহিলা এ্যাথলেট ডেবি টমসন প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন বলা চলে। মাত্র ১0'২ সেকেণ্ডে তিনি ১00 গজের দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। এই বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার মারলিন ম্যাথিয়ুস বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। টমসনের রেকর্ড বিশ্ব রেকর্ড বলে স্বীকৃত হবে কি না তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রী

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের
আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে
ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তেল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮
18 JUN 1964

সাপ্তাহিক

বসুমতী

একদিকে কালোবাজারের জন্যে পাচার হচ্ছে হাজার হাজার মণ চাল ও তেল; অন্যদিকে ন্যায্যমূল্যের দোকানে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত হতাশ ক্রেতার দল।

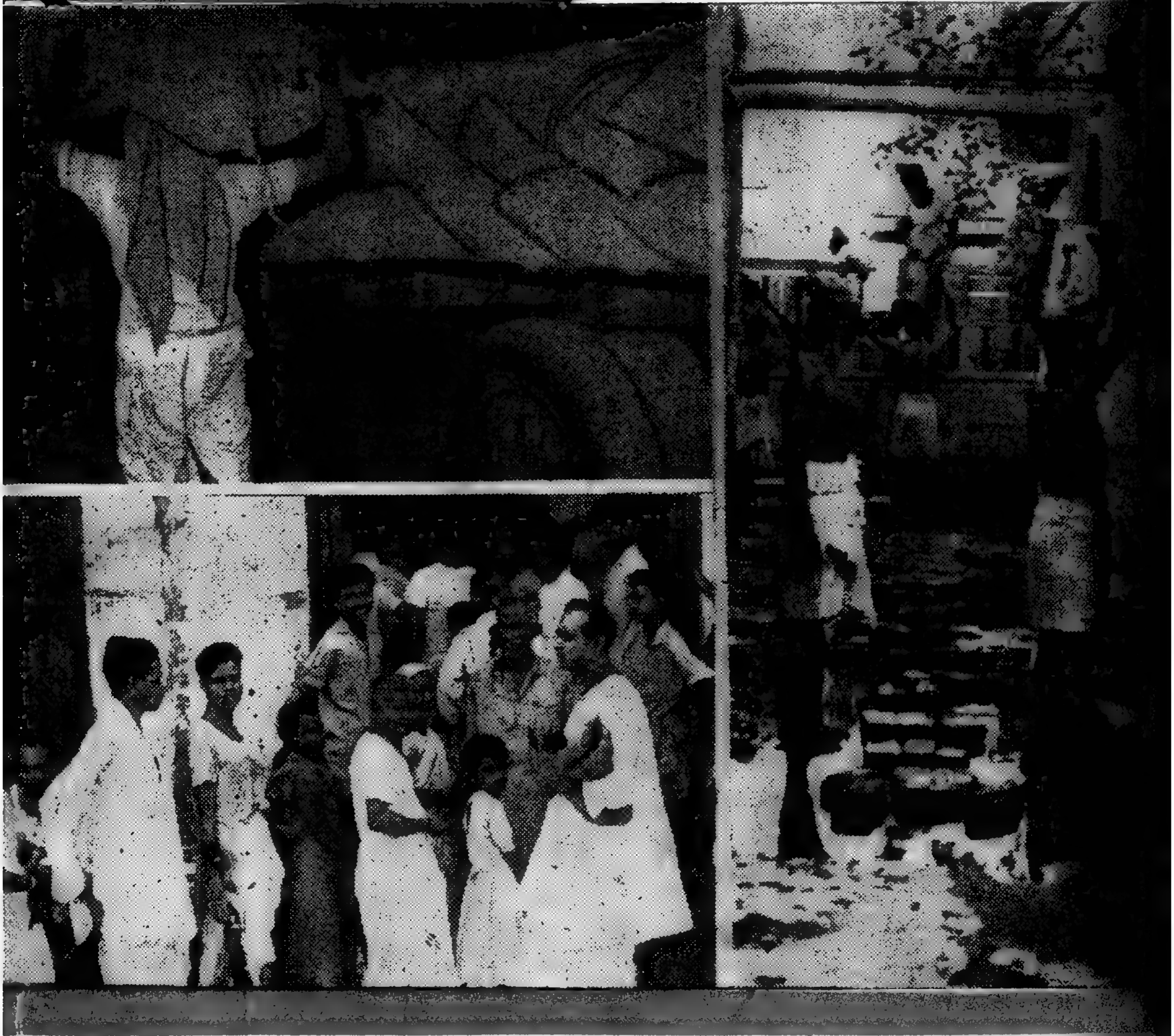

বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 25th June, 1964 • Vol. 69, No. 5

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস • কলিকাতা

সূচীপত্র

V.67 no. 5

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৫৯
আজকের মানুষ	...	২৬০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২৬১
ভারতদর্শন	...	২৬৫
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	২৭১
আন্তর্জাতিক	...	২৭২
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৭
জওহরলাল ঃ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ	পুলিন দাস	২৮১
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	২৮৬
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	২৮৯
অনল আয়তী (উপন্যাস)	সুশীল রায়	২৯৩

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, দিনকিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য— আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভদ্রের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

মধ্যযুগের কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
একটি গোপন কথা	তরুণ মৈত্র	২৯৭
দৃশ্যের কপাট (কবিতা)	বটকৃষ্ণ দাস	২৯৯
পুরীঃ হোটেলে সকাল (কবিতা)	শক্তিব্রত ঘোষ	২৯৯
দুরন্ত দেহলী (কাহিনী-বিচিত্রা)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৩০০
যদি কোনোদিন (গল্প)	মিহির আচার্য	৩০২
পদশব্দে (কবিতা)	সুমিত মিত্র	৩০৫
বঙ্গদর্শন	...	৩০৬
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদি	৩১১
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৩১৩
পাঠক মন	...	৩১৪
রঙ্গজগৎ	...	৩১৫
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৩১৯

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে: ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—নবরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি: বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ ৫ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১১ই আষাঢ় ১৩৭১

25 Paise
Thursday, 25th June 1964

কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিষ্ফলা বছর কিংবা দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হয় নি। বরং উল্টো সুরই তাঁরা গেয়ে এসেছেন। তবু শহর তথা গ্রামের হাজার হাজার অসহায় মূক লোকগুলি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। তাদের কথা বলার মতো তেমন কেউ আজ হয়তো নেই, অথবা বললেই যে একটা সুরাহা হবে সে আশাও সুদূরপরাহত।

কিন্তু এই কলকাতা শহরেই কর্তাব্যক্তিদের চোখের সামনে শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। তাঁদের নাকের ডগায়—আসল বাজার থেকে উধাও হয়ে কালোবাজারেতে দ্বিগুণ-তিনগুণ অধিক মূল্যে বিক্রি হচ্ছে চাল—ডাল—তেল; এমন কি চালের অভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে 'আলু ভোজনের' উপদেশ দান করেছিলেন, আজ তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আকাশ-ছোঁয়া মূল্যে আলুর দম এবার হয়তো 'ভদ্রাসনে ঠাঁই' পেল! এইভাবে সামান্য উপার্জনশীল সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যে সঙ্কট—এর জন্য দায়ী কে?

আমাদের প্রিয় নেতা জওহরলালের পরলোক গমনের আগে ও পরে নেতাদের মুখ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথাটা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সেই মহামূল্য বাণী যতোই অকৃত্রিম হোক না কেন, তা যে শুষ্ক বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়—সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে সমাজ-বিরোধী ফাটকাবাজ, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও কালোবাজারের দুষ্কৃতকারীর দল। সরকার কর্তৃক নিষ্ফলা বছর বা দুর্ভিক্ষ ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও মাছের বাজারে, চালের বাজারে দীর্ঘদিন ধরে যে কৃত্রিম সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে দায়ী সমাজ-বিরোধীরাই। অবশ্য এই সৃষ্ট সঙ্কট দূরীকরণের চেষ্টা সরকার যখনই করতে চেয়েছেন তখনই স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা সরকার পক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি গণতান্ত্রিক রাজ্যে অকল্পনীয় নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। সরকারী আইন এদের বিরুদ্ধে চরম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি বলেই সাধারণ মানুষ আজ দুর্ভিক্ষ কবলিত।

যা হোক, অত্যন্ত বিলম্বে হলেও কলকাতা শিল্পাঞ্চলের ৬০ লক্ষ মানুষের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের টনক নড়েছে। ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ খুব কম হলেও—ঐ ব্যবস্থা দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করতে কিছুটা সাহায্য করবে। কিন্তু সরকারের প্রধান যে কর্তব্য, তা হচ্ছে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখা। সেই ব্যবস্থা যদি বানচাল হয়ে যায়—তাহলে সরকার কৃত্রিম সঙ্কট নিবারণে অপারগ হবেন—তা বলাই বাহুল্য। সরকার অনেকবার সদিচ্ছার কথা ঘোষণা করেছেন—কিন্তু সেই সদিচ্ছার প্রতি জনসাধারণের আস্থা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে বসেছে। এখনো উপায় আছে—সে উপায়ে মজুতদারদের নামমাত্র শায়েস্তা করা নয়, কঠোর হস্তে চরম শাস্তি দিয়ে জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব। তা সম্ভব করতে না পারলে জনসাধারণই একদিন সমুচিত জবাব দেবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে নাকি লোহার ভীম চূর্ণ হয়েছিল। এটা শোনা কথা। তবে অনুরূপ ঘটনাই প্রত্যক্ষ করলাম একালেও। 'দাস কমিশনের' কঠিন পাশে অবশেষে ভেঙে পড়েছেন সর্দার কায়রোঁর মত অনড় অনমনীয় মানুষও। পাঞ্জাবের প্রভাবশালী অধিনায়ক তাঁর জীবনের বহু মন্য সাধনার ফলে পূর্ণ করেছেন তাঁর দেশকে। এগিয়ে নিয়ে গেছেন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে। পাঞ্জাবের ভাঙা ভাগ্যের দিনে শক্ত হাতে রাশ টেনে যিনি বিপর্যয়ের মুখ ফিরিয়েছেন দুর্জয় সাহসে তিনি এই প্রতাপ সিং কায়রোঁই। কিন্তু, এই মুহূর্তের সর্দার কায়রোঁ আর এক যুগ আগের প্রতাপ সিং কায়রোঁতে আজ সত্যি অনেক তফাৎ। সেদিন তিনি একান্ত উচ্চাভিলাষী—যথার্থ সম্ভাবনাময়। আর আজ তিনি পদচ্যুত। ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে ক'রে পতনের শেষ সিঁড়িতে পা দিয়ে ফেলেছেন।

আজ থেকে প্রায় ৬৩ বছর আগে সর্দার প্রতাপ সিং জন্মগ্রহণ করেছেন অমৃতসরের কাইরন গ্রামে। অমৃতসরের বিখ্যাত খালসা কলেজের স্নাতক প্রতাপ সিং পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকায় আরও জ্ঞান, আরও যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। দেশের বাইরের মাটিতে পৌঁছে নিজের সম্ভাবনার শিখাকে আরও উস্কে দিতে। সমান উৎসাহে তাই তিনি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ার সাথেই কাজ করতেন ফোর্ড কোম্পানীর মোটর কারখানায়; রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি শুধু তাঁর বুদ্ধির খোরাক হত তবে এ উৎসাহে ভাঁটা পড়তে হয়ত দেরি হত না। কিন্তু মনের তাগিদে তিনি সে দেশে রাজনীতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিজস্ব করে তুললেন। প্রভাবশালী গদর দলে তিনি হলেন উল্লেখযোগ্য উৎসাহী কর্মী। সেই থেকেই রাজনীতি তাঁর জীবনের ব্রত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাই উচ্চাভিলাষের মঞ্চ। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে '২৯ সালে কায়রোঁ যোগ দিলেন কংগ্রেসে। এরপর '৩৬ সালে এসেছেন আইনসভাতে। এর ৩ বছর পর থেকে তিনি রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন '৪৬ সাল পর্যন্ত। ভারতের স্বাধীনতার বছর থেকেই তিনি পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত। '৫৬ সালের সুরু থেকেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানিত দায়িত্বশীল পদ লাভ করেছিলেন। আবার সেই সঙ্গে সুদৃঢ় যোগ্যতার সাথে তিনি পালন করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বও—'৫০—'৫৯ সাল অবধি।

আজ গল্পের নায়কের মত মনে পড়ে পাঞ্জাবের শান্তি, শৃঙ্খলা, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, আকালী দলের বিক্ষোভ-প্রশমন, পাঞ্জাবী-সুবা আন্দোলন দমন—রাজ্যের পক্ষে এত সব দুরূহ কৃতিত্বের অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ কায়রোঁকে। বিস্মিত চোখে ভেসে ওঠে তাঁর দেশপ্রেমের ছবি। চীনা আক্রমণের সময়ে তাঁরই আহ্বানে জেগে উঠেছিল পাঞ্জাবী সেনানীরা—নির্মম, নির্ভীক। মণ চারেক সোনা, পাঁচ কোটিরও বেশি টাকা, ১০ লক্ষ টাকার কম্বল আর লক্ষাধিক টাকার শীতবস্ত্র সেদিন পাঞ্জাবের এই মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে দিয়েছেন দিল্লীতে। আরও দিয়ে এসেছিলেন দেশ-মাতৃকার সেবায় ২০ লক্ষ ফুলের মত তাজা প্রাণ উপহারের প্রতিশ্রুতি। পাঞ্জাবের প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার পঞ্চায়েতে এক-একটি দেশরক্ষী দল গড়ে তুলেছিলেন। মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ৩১ থেকে ৯ জনে দাঁড় করালেন।

কিন্তু সব কিছুরই বোধ হয় সীমা আছে। আছে সমাপ্তি। তা' নইলে শ্রীকায়রোঁ এত তাড়াতাড়ি বা আত্মসংযম হারাবেন কেন ক্ষমতার দম্ভে? এর থেকে আরও বড় সম্মান ত' তিনি

প্রতাপ সিং কায়রোঁ।

পেতে পারতেন। গণতন্ত্রের মাটিতে স্বজন পোষণ, একনায়কত্ব ইত্যাদি মারাত্মক পথ ধরে আত্মপ্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করবার ম‍্ ভুল চিন্তা, বিপজ্জনক হঠকারিতা কেন করতে গেলেন তিনি। যাবেনই। কেন না, তাঁর দিনও ফুরিয়েছে। শেষ হ'য়ে এসেছে ক্ষমতার উন্মেষশালিনী প্রতিভা। তাঁর বিরুদ্ধে বত্রিশ দফার অভিযোগ উঠেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'দাস কমিশনের' তদন্তে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন দুটো কারণে। আর তারই ফলে মুখ্যমন্ত্রীর আসন খালি করে নেমে আসতে হোল আজ তাঁকে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

খ্রীষ্টের মুখে করুণার কান্তি। কিন্তু তিনিও কি তাঁর জীবনের সর্বকালে, সকল অবস্থায় কারুণ্যে বিগলিত ছিলেন? জীবনের অন্ধকার যেখানে, সেখানে আলো জ্বালবার বীর্য চাই। তিনি সেই বাণীই রেখে গেছেন—'I came not to send peace but a sword'।

সেদিন অন্ধকারের কথা ভাবতে-ভাবতে এই কথাটাই আমার মনে এলো। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রূপ ও রস' বইখানির দুটি উদ্ধৃতি আমার খুবই মনে আছে। ১৩৩৫ সালের মাঘ মাসে তাঁর এ-বইখানি প্রথম ছাপা হয়। 'বীরভাব' প্রবন্ধে তিনি এই খ্রীষ্টবাণী স্মরণ করেছিলেন। তাতেই লিখেছিলেন বুফঁ-র (Buffon) উক্তি—লেখকের স্টাইলই লেখকের সত্তা। আর, 'সমসাময়িক সাহিত্য' নামে সে-বইয়ের আর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'আধুনিক বাংলা যদি যথার্থ রূপদক্ষতা দেখাইয়া থাকে, তবে তাহা চিত্রকলার ক্ষেত্রে।' তিনি তাঁর এই ধারণা ধরেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আলোচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত,—একালের সাহিত্যে সমস্যার প্রাধান্য সম্বন্ধে অনেক কথা উঠেছিল। তিনি ইউরোপের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের তুলনা করে বলেছিলেন যে, ইউরোপের সাহিত্যের বিশেষ একটা শিল্পাদর্শ দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় নি।

আমি তাঁর এই কথাটা হয় ঠিক বুঝি নি, নয়তো এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি। কারণ, আমার মনে হয়েছিল বাংলায় আর কিছু থাক আর না থাক—বিপুল বৈষ্ণব পদাবলী আছে, চমৎকার লোকসাহিত্য আছে, রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে,—বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ আছেন। আমাদের অন্যান্য সম্পদও তুচ্ছ নয়। শরৎচন্দ্র প্রভৃতি আমাদের, এই উপস্থিত শতকের গণ্যমান্য প্রিয় লেখকরাও আমাদের সাগ্রহ স্মৃতিতে চিরবিদ্যমান। তবু কেন বলবো—'আমাদের দেশে সাহিত্যের শিল্পমূর্তি খুব সাধারণভাবে কোনও মাপের বা আদর্শের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়ায় নাই—এখনও তাহার যেন কাদামাটির অবস্থা'?

সে-বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় তাঁর এই মন্তব্যটি ছিল। পড়তে-পড়তে এ-কথা দেখে,—হঠাৎ সেদিন ভারি বিষণ্ণ বোধ হয়েছিল। আমার বার বার মনে পড়েছিল—আমাদের সাহিত্যের নানা আলোর কথা,—অন্ধকারের কথা। নানা শতাব্দীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে-চলা সাহিত্যের ধারায় সাহিত্যের 'স্থায়ী শিল্পরূপ' বলতে কী যে বোঝাতে পারে, তা আমি ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু ভাবনার কলও মেলে নি, তল-ও ছুঁয়ে দেখবার সামর্থ্য ছিল না আমার।

পরে ভেবেছি, নলিনীকান্ত বোধ হয় আমাদের আধুনিক সাহিত্যে,—আমাদের বাংলা গল্পে, উপন্যাসে সমস্যা-প্রাধান্যের দিকটাই বেশি ভেবেছিলেন। হয়তো, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আর শিল্পরূপের রূপায়ণ,—এই দুটি দিকে তিনি আমাদের লেখকদের আগ্রহের এক তুলনামূলক পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন। হয়তো, আমরা আমাদের জাতিগত সাহিত্য-প্রয়াসের ইতিহাসে যতোটা বিষয়-মনোযোগী, ততোটা রূপ-সচেতন নই। কী জানি। তাই কি?

আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, ধরতে পারি নি তাঁর কথা। সাহিত্যে বিষয় আর রূপ একযোগে ব্যক্ত হয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমি জানি, এই কথাই ঠিক কথা। কিন্তু এ-বিচারে বাজার-চলতি অনেক রচনাই বাজে-মাল বলে বর্জিত হবে। সে বর্জনের অনুমোদনই বা কে করবেন,—হুকুমই বা কে দেবেন? কোনো যুগেই একজন দু'জন সমালোচকের তা সাধ্য নয়। মহাকালের হাতেই জগতের সম্মার্জনী তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়।

যদিও সে-প্রবন্ধে সেই সাহিত্যের স্থায়ী শিল্পরূপের ভাবনার সঙ্গে মহাকালের হাতে সম্মার্জনী তুলে দেবার এই ভিন্ন প্রসঙ্গের অকাট্য কোনো যোগ ছিল না, তবু এ-কথা আমার মনে এসেছিল। আমি সেদিন আলোর কথাও ভেবেছিলুম, অন্ধকারের কথাও ভেবেছিলুম। বোদ্‌লেয়র, মালার্মে, র‍্যাবোঁ প্রভৃতির অন্ধকার-দেখা মজির সঙ্গে, পরে অনেকবার—আমি আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কোনো কোনো অঞ্চলের, কোনো কোনো কবির দুঃখবাদ, দেহবাদ, অন্ধকারবাদের তুলনা করবার চেষ্টা করেছি মনে মনে। নলিনীকান্তের কথা সেই সূত্রেই বার বার মনে পড়েছে। 'বাঙালীর কবিত্ব' প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছিলেন —কোল্‌রিজ যাকে বলেছিলেন Masculine poetry আর Feminine poetry—জ্ঞানের কাব্য আর ভক্তির কাব্য, বাংলায় এই দু'রকম কবিত্বের সমান সমৃদ্ধি কোথায়? আমাদের রবীন্দ্রনাথ-কে কবি বিষ্ণু দে এক জায়গায় মনোরম হ্রস্ব বলেছিলেন। মনে পড়ছে সে-উক্তি। সে অন্য প্রসঙ্গে। কিন্তু বিশেষত, এই দিক থেকে দেখলে, রবীন্দ্রনাথকে পরমাশ্চর্য

কোনো গিরিশিখরের স্বাতন্ত্র্য বলতে ইচ্ছে করে। নলিনীকান্ত অর্থগৌরব, তপঃপ্রভাব আর কাঠিন্য—তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, সাধারণভাবে বলা যায়—বাংলার কাব্যে এসব নেই। আমি বঙ্কিম-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবেছিলুম। এঁদের তপস্যার দিকে তাকিয়ে নলিনীবাবুর সে-কথাও আমি মানতে পারি নি।

জীবনের আলো-অন্ধকার দুইই দেখে গেছেন এঁরা। এঁদের সাধনায় সাহিত্যের বিষয়-মাহাত্ম্য আর রূপ-দক্ষতা দুই-ই একযোগে সার্থক হয়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্যে। এঁরা কেউই আমাদের এই শতকের—এই ষাটের দশকের দেশব্যাপী সাহিত্যিক বিষাদের অংশীদার নন। মালার্মে বা বোদ্‌লেয়র বা উনিশ শতকের বিদেশের অন্ধকারবাদীরাই কি আমাদের সমকালের মানুষ? উনিশ শতক শেষ হয়ে গেছে। ফুরিয়ে গেছে। সে আলো নেই, সে অন্ধকারও নেই।

আজ তবু কেন ফিরে ফিরে প্রধানত অতীতের অন্ধকারের সঙ্গেই নিজেদের মিল খোঁজবার চেষ্টা? হয়তো সে আমাদের জাতিগত দুর্বলতা? বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথও এ-দিক থেকে বোধহয় ঠিক বাঙালী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর যেমন ধুতি-চাদরে ঢাকা সাহেব ছিলেন। যেমন রামমোহন।

জীবনের গভীর, নিবিড় অন্ধকার তাঁরাও কি কম দেখেছিলেন? 'মেঘনাদ-বধকাব্য' আর মালার্মে—দুটি নাম ঠিক এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য নয়। তবু, মধুসূদনের জীবনানুভূতির গভীরে সমস্ত কালের মানব-অস্তিত্বের যে বেদনা বেজেছিল, পরিশেষে সেও কি সুগভীর তমসাবোধই নয়? না-কি সে আলোতে উত্তরণ,—বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা?

ফরাসী প্রতীকী কাব্যচর্চার বিষয়ও অন্যবিধ, রূপও স্বতন্ত্র। তাঁদের অন্ধকার মধুসূদনের অন্ধকার-চেতনা নয়। বরং শেক্সপীয়রের সঙ্গে মধুসূদনের মিল ছিল বলে মনে হয়। মনে পড়ে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ, আর নবম সর্গ। প্রথম সর্গে ভগ্নদূতের মুখে পুত্র বীরবাহুর পতন-সংবাদ পেয়ে, রাক্ষসরাজ প্রাসাদের শিখরে উঠেছেন। সেখান থেকে সারা অঞ্চলটাই দেখা যায়। রাজধানী লঙ্কার চতুর্দিকে প্রহরী, প্রাকার,—রক্ষার সতর্ক আয়োজন। তারই মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র চোখে পড়ে। সেখানে বীরবাহুর মৃতদেহ পড়ে আছে। সেই যন্ত্রণায় চীৎকার করে লঙ্কেশ্বর বলেছিলেন—

'পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী
তুমি হে জগৎ-পিতা এ কি রীতি তব?

মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গে মৃত মেঘনাদের সঙ্গে চিতায় উঠেছেন প্রমীলা। সে-দৃশ্যে রাবণ আবার বলেছেন—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে।—
সঁপি রাজ্য-ভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?'

রাবণের গভীর অন্ধকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন মধুসূদন।

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিরঙ্গে'র অনের চোখে দেখা রবীন্দ্রনাথের সেই যীজস্ ক্রাইস্ট মূর্তির কথা ভাবতে ভাবতে, এইসব নানা প্রসঙ্গ দেখা দিল আমার মনে। তারপর,—মনে যখন এইসব ঢেউ চলছিল, সেই সময়েই আমি এক শ্মশানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।

না, গ্রামে নয়,—গ্রামের শ্মশানে নয়। সেদিন বিকেলে গিয়েছিলুম কাশীপুরের শ্মশান-ঘাটে। রামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতিবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের উদ্দেশে আমি আমার প্রণতি জানালুম। ভক্ত মহেন্দ্রনাথের বেদীর সামনে দাঁড়ালুম। পড়লুম ফলকের লিপি—জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ়,—মৃত্যু ১৩৩৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ। বেদীর পেছনে প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে জাহ্নবী। এদিকে শিশিরকুমারের স্মৃতিবেদী—জন্ম ২রা অক্টোবর ১৮৮৯; মৃত্যু ১০ই জুন, ১৯৫৯।

এসব তারিখ পড়ছিলুম শুধু-শুধুই। ইতিহাসের সন-তারিখ নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই আমার। শিশিরবাবু তো আমাদের শতকের। রামকৃষ্ণ উনিশ শতকের। আমাদের দেশে সমস্ত উনিশ শতকটাই যেন আলোর দিকে চলা,—ঐসব বেদী দেখতে দেখতে এই সাধারণ একটা ধারণাই সেদিন আমার মনে ঘুরছিল। ফরাসী প্রতীকী কবিতা-আন্দোলনের কোনো কথাই সেদিন আমার মনে আসে নি। মৃত্যুর সেই মহাসম্মিলনের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে রাবণের হাহাকার শুনেছিলুম যেন। সে হাহাকার সত্যিই হাহাকার। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে হাহাকারের শিল্পরূপ তো আমি রাবণের সেইসব উক্তির মধ্যেই পেয়েছি। নলিনীকান্ত কী বলবেন, জানি না। তাঁর ভাবনাটা আমি ভুলতে পারি নি। আমি অনেক কথাই ভুলে যাই, কিন্তু কোনো কোনো কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। যেমন একদিন দেখেছিলুম মাঠ থেকে একঝাঁক ধুলো-রঙের চড়ুই হঠাৎ একসঙ্গে উড়ে গেল। সে কিছুই নয়। তবু সেও একটা মন্তব্য। মাঠ, পাখি, আলো, চোখ, হাওয়া, কাজ, হেলাফেলা—কী জানি কী কথা,—কার মন্তব্য। সবই একসঙ্গে মিলেছিল। সেই মিলটা আমার মনে আছে।

যাক্, যাক্ ওসব ইশারার খেলা। অনেকক্ষণ প্রতীকচর্চার প্রসঙ্গ নিয়ে কাটিয়েছি বলেই হয়তো এসব অবান্তর ছবি মনে পড়ছে। কাশীপুরের গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আমি সেদিন মধুসূদনের কথা ভাবছিলুম,—সেই আমাদের যশোরের দত্তকুলোদ্ভব যিনি,—যিনি জীবনের বড় বড় উত্থান-পতনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন।

াঁর মধ্যে তপস্যা, অর্থগৌরব, কাঠিন্য, তিনগুণই বিদ্যমান। উনিশ শতকের মনোবল, কর্মবল দুইই ছিল তাঁর। ছিল স্বপ্ন, ছিল আশা। হোমর, বাল্মীকি, মিল্টন, কালিদাস,—জগতের বরেণ্য কোনো মহাকবিকেই বিস্মৃত হন নি তিনি। অন্ধকারকে তিনি তাঁর দুই মহাভুজের সমস্ত পরাক্রম দিয়ে দূরে সরাতে চেয়েছিলেন। ১৮৬৫-তে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন—'I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz Italian, German and French languages which are well worth knowing for their literary wealth'। ইতালীয়, জার্মান, ফরাসী—এইসব বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে নিজের মাতৃভাষায় নিজের সাহিত্যে তিনি আলোর উৎসব সার্থক করতে চেয়েছিলেন। মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই জগতের কাছে আত্মকথা শোনা-বার জন্যে সারা জীবন তিনি শুধু প্রস্তুত হবার চেষ্টা করে গেছেন। কাশীপুরের শ্মশানঘাটে আমি সেদিন তাঁরই কথা ভেবেছিলুম।

একদিকে এই সজাগ সক্রিয় তপস্যা,—অন্যদিকে আর-এক সাহিত্যিক মর্জির কথা মনে এসেছিল। সে আমাদের গত শতকের আলোকতীর্থের স্মৃতি নয়, সে অনেকদিন আগেকার ছবি। প্রাচীন চীন। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতকের কবি ফুসানের কয়েক ছত্র—

রাতের শান্ত শরীরে লাগছে
  শান্ত বাতাস।
উজ্জ্বল চাঁদ জেগে আছে উঁচুতে।
ফিস্ ফিস্ করে কথা বললে কে যেন;
আমি ডাকলুম; কিন্তু সাড়া নেই।
একটা ছায়া কাঁপলো বুঝি।
আমি হাতছানি দিলুম;
  কিন্তু কেউ এলো না।
রাঁধুনী রেখে গেল এক প্লেট
  দানাসিদ্ধ;
মদ রয়েছে, কিন্তু আমার পেয়ালায়
  ঢালিনি এক ফোঁটাও।
দারিদ্র্যের সঙ্গে সন্তোষের সুখই
  ভাগ্যের সেরা দান।
টাকা আর সম্মান হোলো ধ্বংসের
  বরকন্দাজ।
সারা দুনিয়া যদিও সোনাদানার প্রার্থী—
আমার কাছে কোনো দাম নেই
  ওসবের।

● অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-কবিতায় কোনো প্রবল কর্মোদ্য-মের কথা নেই। এ-সন্তোষ আমাদের মধুসূদনের রাবণের মধ্যেও ছিল না, উনিশ শতকের ফরাসী প্রতীকবাদী কবিদের মধ্যেও ছিল না। এ অন্য দেশ, অন্য কাল, অন্য সংবাদ।

জগতের মানব-চৈতন্যে এমনি নানা আলো আর নানা অন্ধকারের বিচিত্রতা ছড়িয়ে আছে। মধুসূদনের প্রবল উদ্যমের সমস্ত ধরদাহের শেষে তাঁর শেষ কয়েক ছত্র স্নিগ্ধ অন্ধকারের স্নিগ্ধতাই সেদিন আমার মন জুড়ে রইল। মনে পড়ল তাঁর সমাধি-লিপির কথাগুলি—'মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত —দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।' মনে পড়লো, শেক্সপীয়রের সমাধি-লিপিরই অনুকরণ ছিল মধুসূদনের সেই শেষ আলো-অন্ধকারের ধ্যানে।

রামকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথ,—শিশিরকুমার—এবং আরো সব মহাজনের সমাধি দেখেছিলুম বলেই সেদিন মধুসূদনের সমাধি-লিপির কথা মনে এসেছিল বোধ হয়। মৃত্যুর কালোর ওপর বিশ্বাসের আলো খুঁজেছিলুম মনে-মনে। 'বিশ্ব-সাহিত্য' কথাটা মনে এসেছিল।

'জগতের সাহিত্য' খুব একটা বড়ো কথা। আমি কতোটুকু বা দেখেছি। আমার চলা-ফেরার সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে এই যেসব আলো-অন্ধকারের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি আমাকে স্পর্শ করেছে, সেইসব স্পর্শের অনুষঙ্গেই সেদিন মনে পড়েছিল যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী হয়ে গেল, অবনীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'ভারতী'তে। তার নাম 'কালোর আলো'। ১৩১৮-র বৈশাখ সংখ্যায় 'ভারতী' দেখছিলুম। তাতে কবীরের কথা তুলে তিনি লিখেছিলেন —'কবীর বলেন 'সবহি মূরতবীচ অমূরত, মূরত কি বলিহারি'—কি ভালো কি কালো সকল মূর্তির মধ্যে অমূর্ত, বলিহারি যাই সকল মূর্তির।'

শিল্পিমনের গভীর কথার ইশারা ছিল কবীরের এই উক্তিতে। অবনীন্দ্র-নাথের মনে বেজেছিল কথাটি। সেদিন তিনি এই কথা স্মরেই ভেবেছিলেন; লিখেছিলেন—'এটাতো প্রতিদিনই দেখিতেছি শিল্পী যেটা সুন্দর বলিয়া গড়িতেছে সাধারণে সেটাকে কুৎসিত বলিয়া বসিয়া আছে। দশজনে একটা চিত্র বলিল ভাল আর পঁচিশ জনে বলিয়া উঠিল মন্দ। বাইরের সৌন্দর্যে শিল্পের প্রতিষ্ঠা এটা যতদিন আমাদের বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন আমরা স্ব স্ব রুচি অনু-সারে শিল্পকে দেখিতে চলিব, ততদিন ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে।

'ভারতী'র সেই প্রবন্ধের ওপর আমার মন স্থির হয়ে রইল। ভাবলুম তাঁর কথা। পড়লুম তাঁর উক্তি—'যখনই আমরা একটা যথার্থ শিল্পের সম্মুখে উপনীত হই, তখনই দেখি যে হালে আর পানি পাই না ; দেখি সেখানে সু-য়ে ক-য়ে বড় প্রভেদ নাই, দুয়েরই সমান আসন সমান আদর।'

তাঁর সত্যদৃষ্টি আর পরিতাপ দুইই ছিল ঐসব কথায়। বাইরে থেকে দেখাটা দেখা-ই নয়। এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন—'ফুল তেল মিল ভয়ো ফুলেল'—একদিকে তেল ছিল, আর একদিকে ছিল ফুল, শিল্পী দুইকে এক করিয়া ফুলেল প্রস্তুত করিল।, বলেছিলেন—'বিছুড় নহিঁ মিলিহো—জোঁ তরুবর ছোড় বন-ধামরী'—'তরুকে ছাড়িয়া বন, বনকে ছাড়িয়া তরু মিলিবে কোথায়?'—'দিবসে রাত্রে, আলোকে আঁধারে কালের যেমন অধিষ্ঠান, শিল্পেরও অধিষ্ঠান তেমনি শোভন এবং অশোভন এই দুই পাদপীঠে।'

কাশীপুর শ্মশানে দাঁড়িয়ে আমি সেইসব কথাই ভাবছিলুম। কালো কুকুরটা তখন পাশের ছাইগাদায় কী যেন চিবুচ্ছিল,—ধোঁয়া উঠছিল আধ-পোড়া একটা বালিশ থেকে,—কাঠের সাঁকোর ওপর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, আমি ওপারের বেলুড়-মঠ দেখতে-দেখতে গঙ্গার ঢেউয়ের শব্দ শুনছিলুম। লোহার গামলাতে বহুকালের বহু চিতার ভস্মাশেষ তুলে নিয়ে গঙ্গার সেই ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ধুয়ে নিচ্ছিল শ্মশানবাসী দুটি সংসারী মানুষ। জিজ্ঞেস করেছিলুম—'কী করছো?' একজন বললে—'সোনা মিলবে, বাবু।'

চিতার ছাই থেকে মৃতের অলঙ্কার খোঁজবার এই অবিশ্বাস্য খেলা দেখতে-দেখতে সংসারের একান্ত আত্মমগ্নতার কথা মনে জেগেছিল। জীবনের চলচ্চিত্রে সু হোক, কু হোক, জগৎ সম্বন্ধে শিল্পীর এই মগ্নতা জাগা দরকার। প্রবৃত্তিও অন্ধকার, লক্ষ্যও গোচর নয়। লোহার গামলাতে চিতার ছাই ধুয়ে সোনা তুলবো?—নাকি প্রাচীন চীনের সেই তৃতীয় শতকের কবির কথা মনে রাখবো—'দারিদ্র্যের সঙ্গে সন্তোষের সুখই ভাগ্যের সেরা দান?'

সাহিত্যের মর্জিও বদলে যায়, রূপেরও বদল হয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত 'শিল্পরূপ' বলতে কী বুঝেছিলেন? কথাটা বার বার মনে পড়ে। সেদিনও মনে পড়লো।

অবনীন্দ্রনাথ ধ্যানের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। সেদিন কাশীপুরের শ্মশানঘাটে নয়, বাড়ি ফিরে তাঁর সেই কথাগুলি আবার দেখলুম। মনের অন্ধকারে কথাগুলি যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগলো—

'যদি সঙ্গীতের ভিতরে অনাহতকে, শিল্পের ভিতর অলিখিতকে, প্রকাশের ভিতর অপ্রকাশিতকে, প্রকটের ভিতর অপ্রকট এবং বিচিত্রতার মধ্যে এক অবিকৃতকে পাইতে চাও তবে—'ক্যা তুম্ সোবত মোহ নীঁদমে'—কেন মোহনিদ্রায় শুইয়া আছ?

'চিত্ত সে শব্দ শুনো'—মন দিয়া একবার শ্রবণ কর।

'সর্বন সে উঠত ধুন রাগনী'—সকল দেহে, সকল গঠনে, সু-য়ে, কু-য়ে, কদর্যে, সৌন্দর্যে কী মধুর রাগিণী উঠিয়াছে, কী রূপের আভাই ফুটিয়া পড়িতেছে।

'বহ রাগ তো লেখা ন জাই—মাত্রা লগে ন কানা'—সেই বর্ণনাতীত বর্ণ তো চোখে দেখা যায় না, সেই অনাহত মাত্রা তো শ্রবণে শ্রুত হয় না।

'ঘুংঘট খোল'—বহির্বাসের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেল—'ধ্যানসে দেখো, ধ্যান দেকে শুনো'—বড় দুঃখে কবীর গাহিতেছেন—

'অনগড়িয়া দেবা কৌন করে তেরী সেবা'—হায়রে গঠনের সেবাই সকলে করে কিন্তু সকল গঠনেই যে অগঠিত বিদ্যমান তাহাকে কয়জন চায়?

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন সু-বর্ণ লাভ করে, তেমনি যেমনই গড়া যাক অগঠিত দেবতাকে নিবেদন করিলে তাঁহার চরণস্পর্শে সেটি একটি অপূর্ব সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত হয়।'

বহির্বাস মোচনের নাম নগ্নতা। সর্বান্তঃকরণে নিষ্ঠার নাম সমর্পণ। বাসনাবর্জিত নগ্নতাই শেষ লক্ষ্য।

কিন্তু, তাই কি? সাহিত্যের সত্য কি অহংকার-সুখে না সুখবর্জনে?

(ক্রমশঃ)

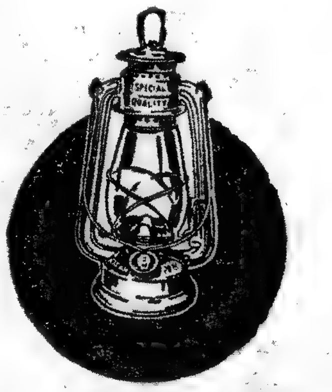

কিষান
লন্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,৩নং চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৩৮০

ভারতদর্শন

রাজধানী :

অসহ্য গরম, জলের কষ্ট, ধাঙড়দের গাফিলতিতে শহরের দুর্গতি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে প্রতি মাসের বাজেটের ঘাটতি, এমনি ধরণের অন্যান্য সমস্যার আলোচনাকে ছাপিয়ে দিল্লীর মানুষের মুখে মুখে এখন চলেছে পাঞ্জাবের কাহিনী। জল্পনা-কল্পনা চলেছে সুচতুর রাজনীতিক, পাঞ্জাবের দোর্দণ্ড প্রতাপ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর নতুন চালবাজীর ফলাফল নিয়ে। দাস কমিশনের রিপোর্টের পর তিনি পদত্যাগ করেছেন। পার্লামেণ্টারী পার্টির এ-বিষয়ে কোন বক্তব্য উত্থাপনের পথ তিনি এই চালে বন্ধ করেছেন। সাথে সাথে পাঞ্জাবে মর্যাদাটাও তাঁর একটু বেড়েছে। দাস কমিশনের রিপোর্টে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এমন ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছেন, যেন অপরাধটা দাস কমিশনই করেছেন। তিনি নিজে নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ। সেই সঙ্গে চেষ্টা চালিয়েছেন নিজের খুঁটিকে আরও শক্তপোক্ত করে তুলতে—পাঞ্জাবের প্রচ্ছন্ন শাসক সেজে নিজের ক্ষমতাকে আরও কায়েম করতে। শাসনযন্ত্র চলবে তাঁরই নির্দেশে—দায়িত্ব কিছু থাকবে না, কিন্তু প্রভুত্বটা বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। দিল্লীর নির্দেশ উপেক্ষা না করলেও পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে নিজের পেটোয়া মানুষকে বসাতে চাইছেন তাঁর পরিত্যক্ত গদীতে।

দিল্লীতে তাঁর অনুগ্রহভাজনদের আনাগোনা গেছে বেড়ে। পার্লামেণ্টারী বোর্ড দু'দিন চুলচেরা আলোচনার পর এই জটিল সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের ওপর। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড শ্রীকায়রোঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, এমন নয়। তাঁরই নেতৃত্বে পাঞ্জাবে সুবা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিবেগ সামলানো এক সময় সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাঁর

● নয়াদিল্লীতে শান্তিঘাটে নেহরুর সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে নেপাল-রাজদম্পতি নেহরুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

বর্তমান চালচলন হাইকমাণ্ডকেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

পাঞ্জাবের এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা এড়াতে সর্দার শরণ সিংকে পাঠানোই কতকটা ঠিকঠাক হয়েছে। কিন্তু তাঁর জায়গায় দিল্লীতে কে আসবেন? এ-প্রশ্নও উঠেছে। তাঁর দপ্তরে না হলেও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর

● সর্দার শরণ সিং

জায়গায় এক শিখ-নেতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাঞ্জাবের পরিকল্পনা-মন্ত্রী সর্দার দরবারা সিং আসতে চাইছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি পাঞ্জাবের রাজনৈতিক চক্রের বাইরে চলে আসতে নারাজ।

স্পীকার সর্দার হুকুম সিং-এর নামও উঠেছে। স্পীকারের সম্মানিত আসন থেকে সরাসরি নেমে এসে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার ঔচিত্যের প্রশ্ন উঠেছে। আশা করা যাচ্ছে, দু-এক দিনের মধ্যেই পাঞ্জাবের নেতা নির্বাচনের খেলা সমাপ্ত হবে। এ-নিয়ে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড অহেতুক বিলম্ব করতে পারেন না। দেরি হলে জটিলতা আরও বাড়বে।

• • •

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কয়েকটি দপ্তরের পুনর্বণ্টন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে গত ১৩ই জুন। শ্রীসত্য-নারায়ণ সিংকে দেওয়া হয়েছে

● শ্রীঅশোককুমার সেন

যোগাযোগ ও পার্লামেণ্টারী বিষয়ক দপ্তর। অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর পেয়েছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কাননুগো। আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের ভার অর্পিত হয়েছে শ্রীঅশোকুকমার সেনের ওপর। ডাঃ রামসুভগ সিং রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। অপর কয়েকজন মন্ত্রীরও দপ্তরের পরিবর্তন হয়েছে। নেহরু-মন্ত্রিসভার ২২ জন উপমন্ত্রীর মধ্যে শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিং এবং শ্রী পি নস্কর ছাড়া সকলেই নতুন মন্ত্রিসভায় রয়েছেন।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠনের চারদিন পরই নতুন করে মন্ত্রিসভার দপ্তর পুনর্বণ্টন করায় দেশবাসীর মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। দু-দিন আগেই খবর বেরিয়েছিল তথ্য ও প্রচার দপ্তর ছেড়ে দিয়ে অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের ভার নিতে শ্রীসত্যনারায়ণ সিং অসম্মত হয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগোও না-কি তাঁর দপ্তর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ-সংবাদের পর মন্ত্রিসভার দপ্তরের আকস্মিক পরিবর্তনে সাধারণ লোক বিস্মিত হয়েছিল। শাস্ত্রীজী চাপে পড়ে কাজটি করতে বাধ্য হয়েছেন, এমনি সন্দেহই দানা বেঁধে উঠেছিল। তিনি নিজেই এ-সন্দেহের নিরসন করেছেন। তিনি বলেছেন, চাপে পড়ে চলতে হলে কাজ চালাবো কি করে?

শ্রীশাস্ত্রী দৃঢ়চেতা মানুষ। চাপে পড়ে তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। আমাদের মনেও একথা আসে নি। নতুন নেতা নির্বাচন পর্ব থেকে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠনের শেষ দিনটির ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের বিষয়টি বিচার করায় সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহের দোলা লেগেছিল। শাস্ত্রীজী সে সন্দেহের নিরসন করে ভালই করেছেন। একথা ঠিকই, দৃঢ়হস্তে হাল না ধরে স্রোতের মুখে তরণী ভাসিয়ে দিলে নিরাপদে পাড়ি জমানো যায় না।

* * *

নেহরুর অবর্তমানে তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের আদর্শ কতটা রক্ষিত হবে, এ-সংশয় যাঁদের মনে জেগেছিল, তাঁরা এতদিনে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়েছেন। শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভার নতুন দপ্তর—সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ গঠনই প্রমাণ করে বর্তমান সরকার নেহরুর আদর্শকে রূপ দিতে কতটা আগ্রহশীল। সমাজ-জীবনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি—সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়েই এই দপ্তরটি খোলা হয়েছে। সমাজ-কল্যাণ মূলক কাজগুলো এতদিন ছিল পাঁচ-পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তার পূর্ণ চিত্র মানুষের সামনে ছিল না। প্রধান প্রধান দপ্তরের লেজুড় হিসেবে থাকায় কাজও সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ সম্পন্ন হতে পারে নি। কর্মচারীদের জীবন-বীমা, কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, সর্বনিম্ন বেতন আইন, উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধান, শিশুকল্যাণ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজ-উন্নয়নের কাজ পরিচালিত করবে সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তর। এ-দপ্তরের ভারও ন্যস্ত হয়েছে সমাজসেবায় অভিজ্ঞ শ্রীঅশোকুকমার সেনের ওপর। পশ্চিম বাংলার সমাজসেবা সংস্থা তাঁরই অবদান। তিনি যোগ্য ব্যক্তি।

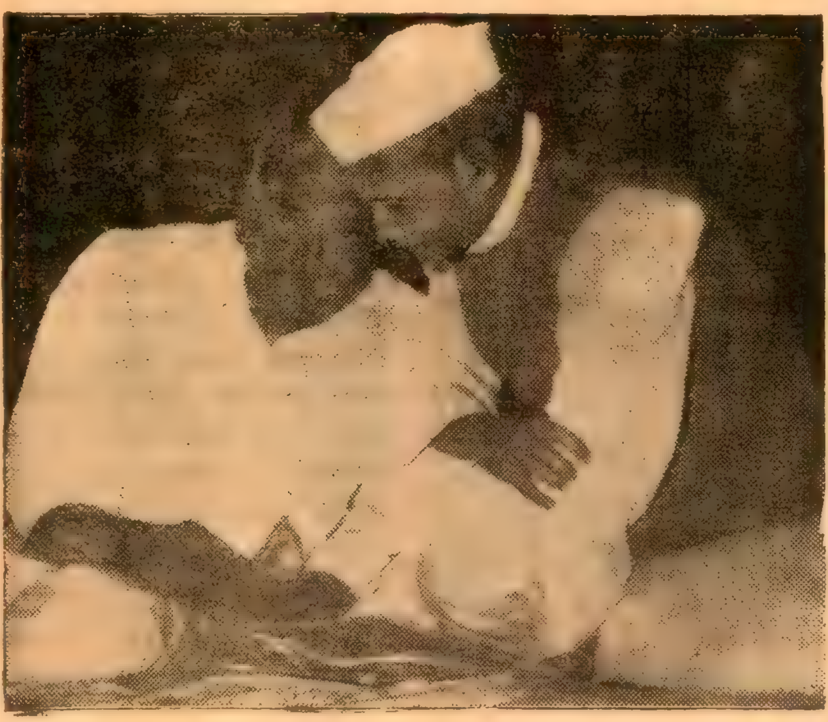

● গভীর আলোচনায় মগ্ন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীকামরাজ নাদার

নতুন মন্ত্রণালয় পরিচালনায় তাঁর দরদী মন এবং বঞ্চিতের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় আরও বেশি করে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই কর্মযজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করবে অনেকখানি কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের ওপর। অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রতিকূল হলে আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে না।

* * *

দিল্লী ভারতের প্রাণকেন্দ্র। ভারতের শিরা-উপশিরায় টান পড়ার সাথে সাথে দিল্লীর বুকও টনটন করে উঠছে। খাদ্যশস্য, জ্বালানী কাঠ, তরিতরকারী, মাছ, মাংস প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য সামগ্রীর মূল্য গেল দু' সপ্তাহের মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। তেলের দাম বেড়েছে সব চাইতে বেশি। সরষের এবং আহারের উপকরণ অন্যান্য তেলের দাম ছিল দু' টাকা কিলোগ্রাম। এখন হয়েছে তিন থেকে চার টাকা।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীও রকেটের গতিবেগে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের জাম্নি গ্রামের জনসভায় বক্তৃতাকালেও খাদ্যের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বলেছেন, ব্যবসায়ীরা খোলাবাজারে মজুত মাল না ছাড়লে, অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে হবে।

২৪শে জুন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা মিলিত হচ্ছেন নয়াদিল্লীতে। সেখানে এই সমস্যা নিয়ে তিনদিন আলোচনা চলবে। খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা আজ পর্যন্ত কম হয় নি। আলোচনার স্তর থেকে নেমে এসে অবিলম্বে সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন না করতে পারলে মানুষের মনে হতাশা আরও বৃদ্ধি পাবে—গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন আরও ধোঁয়াটে হয়েই উঠবে।

* * *

পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে নেপালাধীশ এসেছিলেন। রাণী শ্রীমতী রত্নাও ছিলেন সঙ্গে। শান্তিঘাটের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে রাজদম্পতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন তাঁদের পরম সুহৃদ ভারতের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রতি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সাথেও তাঁরা সাক্ষাৎ করেছেন।

নেহরুর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে রাজা মহেন্দ্র বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে সমবেদনা প্রকাশের জন্যই তিনি দিল্লী এসেছেন। নেহরুকে হারিয়ে কেবল ভারতের যেমন অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তেমনি নেপালেরও ক্ষতি হয়েছে, নেপাল হারিয়েছে এক অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে।

কাশ্মীর ঃ

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলার আসন্ন সফরের সংবাদে এখানে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের ভার নিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশের পর শ্রীচাগলা এই প্রথম কাশ্মীর আসছেন। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানকে নাজেহাল করবার পর থেকে তিনি সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য কেবল সাধারণ মানুষই ব্যগ্র নয়—সরকারের উপরতলার নেতৃবৃন্দ আগ্রহশীল।

● শ্রীচাগলা

● শেখ আবদুল্লা

শ্রীচাগলা আসছেন 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানেজমেণ্ট এসোসিয়েশনের' পঞ্চম এ্যাডভান্স ম্যানেজমেণ্ট প্রোগ্রামের উদ্বোধন করতে। এই আনুষ্ঠানিক কাজের পর তিনি কাশ্মীরের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ শ্রীচাগলার সাথে কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ ভারতভুক্তি সম্পর্কিত আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগও নাকি কাশ্মীর সরকার গ্রহণ করতে উদ্গ্রীব।

কাশ্মীর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদের জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়েছিল। বিলটি এখন সিলেক্ট কমিটীর বিবেচনাধীন। বিধানসভার শারদীয় অধিবেশনের সুরুতেই সিলেক্ট কমিটির বিলটি পেশ করবার কথা। বিলটি বিধানসভায় পুনরায় উত্থাপনের আগে বিশেষজ্ঞের সাথে আইনঘটিত প্রশ্ন আলোচনা করা খুবই স্বাভাবিক।

আইনের বিচার ও বিশ্লেষণেই এ প্রশ্নের মীমাংসা অবিশ্যি হবে না। রাজনীতির তুলাদণ্ডেও যাচাই করার আবশ্যক নিশ্চয়ই হবে। সাদিক সরকার এ নিয়ে দিল্লীর উর্ধ্বতন মহলে আলোচনার পরই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

দিল্লীকেও ভেবে-চিন্তে মতামত দিতে হবে। মত প্রকাশের আগে কাশ্মীরের রাজনৈতিক আবহাওয়ার গতিধারা ও নেতাদের মতিগতির একটা পুরোপুরি সমীক্ষা প্রয়োজন। শ্রীচাগলা কাশ্মীর সফরকালে সরেজমিনে সে কাজটি করে যেতে পারবেন।

শেখ আবদুল্লার মুক্তির পর থেকে কাশ্মীরের রাজনীতির পটপরিবর্তনও দ্রুতগতিতেই চলেছে। হজরতবালের পবিত্র কেশ উদ্ধারের আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত সংগ্রাম কমিটির কার্যকলাপ নিয়ে শেখ আবদুল্লা ও মীর ওয়াইজ মৌলভী ফারুকের তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে সফরকালে শেখ আবদুল্লা পরিষ্কার জানিয়েছেন, হজরতবালের পবিত্র কেশ উদ্ধারের পর সংগ্রাম কমিটিকে জিইয়ে রাখা অর্থহীন। এ কমিটির কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই।

ফারুক সাহেব ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বলেছেন, সংগ্রাম কমিটিকে ভেঙে দেবার অধিকার আবদুল্লার নেই। সংগ্রাম কমিটিও রাজনৈতিক সংগঠন। আবদুল্লাপন্থীরা কমিটি ত্যাগ করলে কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সকে আবার চাঙ্গা করে তোলা হবে।

মৌলভী ফারুক এবং তাঁর অনুগামী মোল্লার দলের দৃষ্টিনিবদ্ধ রয়েছে পশ্চিমে—পাকিস্তানের দিকে। কাশ্মীরকে তারা পাকিস্তানের কোলে তুলে দিতে চাইছে। তাদের এ আচরণ বিসদৃশও নয়। পাকিস্তানের প্রতি তাদের অনুরাগ সর্বজনবিদিত। কিন্তু বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদকে কেন্দ্র করে। জনরব, তিনি নাকি ফারুক-গোষ্ঠীকে পরোক্ষে সমর্থন করে চলেছেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন, দীর্ঘকালের শেখ-বক্সী বিরোধই এর প্রধান কারণ।

সম্প্রতি শ্রীনগরের এক সভায় শেখ আবদুল্লা বলেছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখার ব্যাপারে স্বর্গত জওহরলাল নেহরু মোটেই দায়ী নন। নেহরু এবং ভারতের অপরাপর নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন বক্সী গোলাম মহম্মদ। তাঁর পাক-ভারত মৈত্রী বিধানের

● বক্সী গোলাম মহম্মদ

প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসবার জন্য বক্সী গোলাম মহম্মদ এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন।

হজরতবালের ঘটনাবলীর পর বক্সী-গোষ্ঠী যে-বদনামের ভাগীদার হয়েছেন সে কলঙ্ক ধুয়ে-মুছে ফেলাই বক্সী সাহেবের প্রধান প্রয়াস বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাই তিনি ধর্মে গোঁড়া মানুষদের কাছে নিজেকে জাহির করতে চাইছেন।

এই সব অভিযোগের পেছনে কোন সত্য না থাকলেও দুষ্টচক্র যে কাশ্মীরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সরকারের অসুবিধার পূর্ণ সুযোগ নিতে উঠে-পড়ে চেষ্টা করছে, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। এদের অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য সাদিক-সরকারের পক্ষে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উচিত হবে।

অন্ধ্র :

অন্ধ্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বিজয়ওয়াড়ার একাংশ বৈশ্বানরের তাণ্ডবে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। পাঁচদিন ধরে শহরের বুকে আগুন জ্বলেছে। তার লেলিহান বহ্নিশিখায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে। ভস্মীভূত হয়েছে শহরের দেড় হাজার এবং গ্রামের দু'শ', মোট সতের শ' গৃহ। গৃহ হারিয়েছে পাঁচ হাজার নরনারী। সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকার মত। শহর এখন পুলিশের প্রহরাধীনে। ১৫ হাজার পুলিশের সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও শেষ দিন দুটি গৃহদাহ হতে দেখে মানুষ আরও ভীত হয়ে পড়েছে।

এ অগ্নিকাণ্ড কি করে হল? রহস্য এখনও ভেদ হয় নি। বিবদমান বাম ও দক্ষিণ পথের কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সংঘর্ষ থেকেই এই দাবানলের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর সাথে সকলেই একমত। এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নয়—এ ঘটনা অগ্নিসংযোগের। তিনি আরও বলেছেন, কমিউনিস্টদের উপদলীয় কোন্দলেই বিজয়ওয়াড়ায় আগুন লেগেছে।

বাম ও দক্ষিণ—উভয় দলের কমিউনিস্ট নেতারা অভিযোগ অস্বীকার

● শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

করেছেন। বলেছেন, এতে তাঁদের কোন হাত নেই।

পুলিশ এ পর্যন্ত পঁচাশি জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে চল্লিশ জনের [illegible] কমিউনিস্ট।

তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও রয়েছেন।

বিজয়ওয়াড়া কমিউনিস্টদের পুরানো শক্ত ঘাঁটি। এখান থেকে তাঁরা অতীতে ইতিহাসও রচনা করেছেন। বিশুদ্ধ স্ট্যালিনপন্থী, চীনের চেলাদের সাথে দক্ষিণপন্থীদের তাত্ত্বিক লড়াইটা কিছু-দিন থেকেই চলেছে। প্রচার-পত্রের মাধ্যমে উভয়েই খিস্তি-খেউড় জমিয়ে তুলেছিল। খিস্তি-খেউড়ে কেউ কারো মুখ পোড়াতে না পেরে একদিন হুমকী দেয় ঘর পুড়িয়ে দেবে বলে। তার পরদিনই সুরু হয় আগুনের খেলা। সে আগুনে পুড়েছে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি। গরীব দিনমজুর, শ্রমিকদের এলাকাতেই বাম ও দক্ষিণ উভয় দলেরই আফিস। আগুনের সুরু সেখান থেকেই। আগুনের জন্য যারা দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এ মহড়া বিপজ্জনক। মেহনতী মানুষকে শোষণ ও পেষণের যাঁতাকল থেকে উদ্ধারের একচেটিয়া অধিকারের দাবীদারদের গতিবিধি সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে।

পাঞ্জাব ঃ

সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর জায়গায় নেতা নির্বাচন নিয়ে চণ্ডীগড়ে চলেছে এখন জোর রাজনৈতিক তৎপরতা। সর্দার কায়রোঁ করিৎ-কর্মা পুরুষ। বহু ঝড়ঝাপ্টা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অতীতে। তিনি জানেন, উথালি-পাথালি তরঙ্গাঘাত এড়িয়ে কি করে কূলে তরণী ভেড়াতে হয়। কাজেই সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র তিনি নন।

দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি আলাদা আলাদা ভাবেই আলাপ-আলোচনা চালিয়ে এসেছেন কংগ্রেস সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে। শোনা যাচ্ছে, সর্দার শরণ সিংকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেতা মেনে নেবার আশ্বাস তিনি সেখানে

● শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁর অনুগামী-দের দিয়ে তলে তলে চালাচ্ছেন অবস্থার মোকাবিলার প্রস্তুতি-পর্ব।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীভগবত দয়াল খোলাখুলিভাবে বলে দিয়েছেন, কায়রোঁ তাঁদের অদ্বিতীয় নেতা—তাঁদের মনের মানুষ। দাস কমিশনের রিপোর্টে যাই থাকুক না কেন, কায়রোঁ তাঁদের দার্শনিক, পথ প্রদর্শক এবং 'জেনারেল'। এ হেন ব্যক্তির কথা তাঁদের শুনতেই হবে।

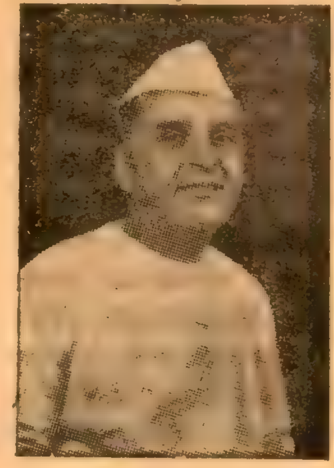

● শ্রীভীমসেন সাচার

শ্রীদয়াল এখানেই ক্ষান্ত হন নি। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের প্রতিও তিনি উচ্চারণ করেছেন সাবধান বাণী। তিনি বলেছেন, "কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকেও আমরা একথা জানাতে চাই যে, তাঁদের আমরা সম্মান করি ; কিন্তু গণতন্ত্রের পথ আমাদের অজানা নয়।"

সর্দার কায়রোঁ এখন কৃষ্ণ-নীতি বেছে নিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় তিনি কৃষ্ণ-নীতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন, যুক্তিযুক্ত মন নিয়ে বিরোধের মীমাংসাই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথ। তবে, যুক্তির পথে মীমাংসা না হলে কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেই হবে। তখন আত্মরক্ষা ও নিজেদের অধিকার বজায়ের চেষ্টা করতে হবে।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় সর্দার কায়রোঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর সাড়ে আট বছরের নেতৃত্বের গুণকীর্তন করে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। জলন্ধরের প্রেম সিং ছাড়া সকলেই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন। প্রেম সিং বলেছেন, দাস কমিশনের রিপোর্টে যাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে তাঁর কাজের প্রশংসার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

নয়াদিল্লীর নেতারাও কায়রোঁকে নিয়ে পড়েছেন বিপদে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড দু'দিন ধরে বিচার বিবেচনার পর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই নিতে পারেন নি। এর ফয়সালার দায়িত্ব তাঁরা অর্পণ করেছেন প্রধান-মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির ওপর। দিল্লীর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত পাঞ্জাবের বিধান মণ্ডলীকে কোন সিদ্ধান্তে না আসতেও বলা হয়েছে।

কায়রোঁর দলবলের মধ্যে এতে চাপা গোঁসা দেখা দিয়েছে। দিল্লীর একতরফা ফতোয়া তারা মেনে নিতে নারাজ।

দেখা যাচ্ছে, সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ প্রধানমন্ত্রীর গদী ছেড়ে দিলেও তাঁর প্রবল প্রতাপ পুরো মাত্রাতেই

বর্তমান রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমে পর্বত প্রমাণ হওয়ার উপক্রম হলেই প্রাক্তন বিচারপতি সুধীররঞ্জন দাসকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল। দাস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত না হলেও, সর্দার কায়রোঁ তা' নিশ্চয়ই দেখেছেন। এবং তাড়াতাড়ি মুখরক্ষার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যপাল হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে কায়রোঁকে অনুরোধ করেছেন।

পদত্যাগপত্র দাখিল করার পর থেকেই কায়রোঁ তাঁর দক্ষিণহস্ত পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহনলালকে

● সর্দার দরবারা সিং

তাঁর উত্তরাধিকারী করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। সর্দার দরবারা সিং এবং শ্রীভীমসেন সাচারের নামও উঠেছিল। দলীয় কোন্দলে পড়ে ভীমসেন বিদায় নিয়েছেন। দরবারা সিং সর্দার কায়রোঁর বিরোধী পক্ষের মনোনীত মানুষ। কাজেই এ দুজন কায়রোঁর কূটনৈতিক কারসাজির সামনে টিকতে পারবেন না।

হাইকমাণ্ড এই জটিল পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যই সর্দার শরণ সিংকে পাঞ্জাবে পাঠাতে চাইছেন। তিনিও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। দলীয় নোংরামির বাইরে থাকতেই ভালবাসেন। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো তাঁকে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের নির্দেশ মাথায় পেতে নিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে হবে। তিনি না গেলে শ্রীমোহনলালকে নেতার আসনে বসিয়ে সকলের ওপর ডাণ্ডা ঘোরাবার পূর্ণ আধিপত্য পাবেন সর্দার কায়রোঁ; তাতে পাঞ্জাবের আবর্জনার আস্তাবল আরও গুলজার হয়েই উঠবে।

গুজরাট:

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি, নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী ইউ এন ঢেবর ধীরে ধীরে রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্থাগুলো থেকে বিদায় নিচ্ছেন। মনে হচ্ছে, তিনি এখানকার ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল রাজনীতির পথটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছেন।

রাজনৈতিক মহলের ধারণাও তাই। তাঁদের মতে শ্রীঢেবর ও গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছে।

তিনি গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন। এছাড়া, গান্ধী স্মারক-নিধির কার্যকরী সমিতি, মহাদেব দেশাই স্মৃতি ভাণ্ডার, গোপাল দাস দেশাই স্মৃতি ভাণ্ডার, গুজরাট দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটি এবং জামনগরের আয়ুর্বেদ সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিয়েছেন।

শ্রীঢেবরের সাথে যাঁরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাঁরা অবশ্য ভিন্ন কথা বলেন। তাঁদের ধারণা, খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগের জন্যই শ্রীঢেবর অপর সকল সংস্থা থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এ মত সৌরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহল সমর্থন করছে না।

প্রকাশ, গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা শ্রীঢেবরের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা না-কি শ্রীঢেবরের প্রতিটি কাজই সন্দেহের চোখে দেখছেন। দিল্লী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনে তিনি যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে গুজরাটের কর্তারা রুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা আশা করেছিলেন শ্রীঢেবর মোরারজী ভাইকে দিল্লীর আসনে বসাতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

শ্রীঢেবর অমায়িক মানুষ। তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শকে কোনদিন ব্যক্তি বা উপদলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বলি দেন নি। গুজরাটের নেতাদের আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। নিজের শহর রাজকোটের গোলমালের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করতে তাই তিনি অসম্মতি জানিয়েছেন।

আসাম:

পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড়ের আশ্রয়-শিবিরগুলো পরিদর্শনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, উদ্বাস্তুদের সকলেই কাজ করতে আগ্রহী।

উদ্বাস্তুরা পরমুখাপেক্ষী, অলস এবং শ্রমবিমুখ, এই অপবাদই আগে আমরা নেতৃস্থানীয় কোন কোন মহলে শুনে আসছি। নিজেদের সকল ব্যর্থতা এমনি করে উদ্বাস্তুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিষ্কৃতির পথ খুঁজেছেন। শ্রীত্যাগীর মুখে নতুন কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। বোঝা গেল, এবার তাঁর নেতৃত্বে উদ্বাস্তুরা খেয়ে-পরে বাঁচবার মত জীবিকার সুযোগ পাবে।

শ্রীত্যাগী আরও জানিয়েছেন, ১৫ হাজার বাস্তুচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব আসাম সরকার নিয়েছেন। আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা হলে অধিক সংখ্যক পরিবারের দায়িত্ব নিতেও তাঁরা গররাজী হবেন না।

খুবই আশার কথা। আর্থিক সঙ্গতি বিধানের কাজটা শ্রীত্যাগীর ওপরই নির্ভর করে। পূর্ব বাংলার মানুষগুলোকে কেবল সুদূর দণ্ডকারণ্যের ঊষর প্রান্তরে না পাঠিয়ে আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার সংলগ্ন এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলে আরও সুফল তিনি পেতেন। ডাঙায় তোলা মাছের মত উদ্বাস্তুদের প্রাণান্ত ছটফটানি তাঁকে দেখতে হতো না। প্রাণ নিয়ে আশ্রয় শিবির ত্যাগের হিড়িকটাও কমে যেতো।

গ্রন্থ মেলা

বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ—ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র। বি সরকার এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। মূল্য : দশ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে অকৃত্রিম স্রষ্টার সংখ্যা নগণ্য না হলেও মহৎ সমালোচকের সংখ্যা প্রায় দুর্লভ। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র প্রখ্যাত কবিদের একজন হিসেবে সর্বজনবিদিত হয়েও সেই দুর্লভ সমালোচকদের একজন। সাহিত্য-গুণাশ্রিত সমালোচনার দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য। বৃহৎ পাঠক-সমাজের মনন এবং কল্পনা উদ্দীপিত করবার সার্থক নেতা হিসেবে বঙ্কিমই ছিলেন আমাদের উনিশ শতকের প্রথম স্মরণীয় লেখক। উপরি-উক্ত "বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ' বাংলা সাহিত্যের সেই অদ্বিতীয় লেখকের গদ্য-পদ্য যাবতীয় রচনার পাঠক-কৃত্য।" অনেক আলোচক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ডক্টর মিত্র, পূর্বালোচকদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেও বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে যে অতুলনীয় আলোকপাত করেছেন, তা অসাধারণ ও অসামান্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠে' রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের আজীবন রচনার সুবিশাল পরিচয়। এই সুবিশাল রচনার পরিচয় দিতে গিয়ে ডক্টর মিত্র উপস্থাপিত করেছেন বঙ্কিমের সমসাময়িক কাল, সে যুগের মননধর্ম, ব্যক্তিবোধ, সমাজবোধ, স্বদেশবোধ এবং অখণ্ড আন্তর্জাতিকতার দিকে আগ্রহ। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিপূর্ণরূপে আবিষ্কার করে ডক্টর মিত্র আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন ব্যক্তি বঙ্কিমের পাশাপাশি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য। এই ধ্রুপদী সাহিত্যের মান নির্ণয়ের জন্য ডক্টর মিত্র পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর স্বীয় কবি-প্রতিভাকে। যেন প্রতিভার দ্বারা আরেক প্রতিভার মহৎ স্বরূপটিকে তিনি অবলোকন করেছেন এবং আমাদের তা সার্থকরূপে করিয়েছেন। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় ভাঙা-গড়া ও ভিন্নধর্মী মতামতের তরঙ্গাঘাতে সমন্বয়বাদী বঙ্কিমের মূর্তিটিকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে অঙ্কন করে

● হরপ্রসাদ মিত্র

দিয়ে ডক্টর মিত্রই আমাদের অজস্র প্রশ্নের এই প্রথম সদুত্তর দান করলেন। এই হিসেবে উপরি-উক্ত গ্রন্থ যেমন অপূর্ব, তেমনি এর ভাষান্তরও প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র সমকালের মানুষকে কি ভাবে জেনেছেন বা জানতে চেয়েছেন, দুর্গেশনন্দিনী যখন প্রথম পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতাদের অবস্থা কি হয়েছিল—তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বঙ্কিম-সাহিত্য উপলব্ধির পক্ষেও তা অনুকূল। আবার কোঁৎ, মিল, লক্, বেন্থাম, হ্যামিল্টন, রীড, হুয়াট, স্পেনসার, কল্লুকভট্ট, রঘুনাথ শিরোমণি, কার্ল মার্ক্স প্রভৃতি দার্শনিকদের সঙ্গে বঙ্কিম-মননের যোগাযোগের ফলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যে দিগদর্শন ঘটিয়েছে—তার আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও রসসম্পৃক্ত, সহজ, সরল ও অনবদ্য। সুবৃহৎ গ্রন্থের অধ্যায়-সূচীও সুপরিকল্পিত। বঙ্কিম-বোধি নির্ণয় স্বরূপ প্রথমেই রয়েছে অপরিহার্য 'আদিকথা'। এরপর 'লঘু প্রবন্ধের গুরু ইঙ্গিত', 'গুরু প্রবন্ধের ১ম পর্ব', 'গুরু প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব', 'পদ্য-লেখক ও কবি', 'কথা সাহিত্যের ধারা' (১ম পর্ব) 'কথা সাহিত্যের ধারাবসান (উপন্যাসের শেষ পর্ব)', 'শেষ কথা' ও 'প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা'। বঙ্কিমচন্দ্রকে সমগ্রভাবে বুঝবার জন্যে এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত ও অভিনন্দিত হবে—, একথা বলা বাহুল্য মনে করি।

শিশু-পরিবেশ— শ্রী সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা : ১২। মূল্য : সাত টাকা।

বাংলা ভাষা যে শুধু রসসাহিত্য সৃষ্টিরই উপযোগী নয়, এ ভাষায় ব্যবহারিক জীবনের সর্বাধিক বিষয় ব্যবহার করা যায়—এর প্রমাণ রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রে ও রবীন্দ্রনাথে। সেই প্রমাণ বর্তমানকালে আরো বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই বলা যায়, বাংলা ভাষার মাধ্যমে জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হবার পথে আগুয়ান। সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শিশু-পরিবেশে' রয়েছে জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

আমাদের দেশে শিশুদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রায় শোচনীয়। কিন্তু পরিবেশের গুণেই গড়ে ওঠে শিশু। তাই পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। সাধারণ শিশু জীবনের কোন কোন অবস্থায় কি কি অভাব পেয়ে থাকে এবং কি কি উপায়ে তার সংশোধন সম্ভব তার সহজবোধ্য আলোচনা করেছেন তিনি। এ থেকে লাভ করা যাবে যেমন সামাজিক শিক্ষা তেমনি মাতাপিতাও হয়ে উঠবে শিশু সম্পর্কে সচেতন। তাই এই ধরণের গ্রন্থ সমাজকল্যাণের জন্যও প্রয়োজনীয়।

—জয়ন্তী সেন

আন্তর্জাতিক

• বিল স্ক্র্যানটন স্ত্রী মেরী ও অন্যান্য দলীয় নেতাদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নেমে পড়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

নাগরিক অধিকার বিল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার ইতিহাসে নাগরিক অধিকার বিল দীর্ঘতম 'ফিলিবাস্টারের' রেকর্ড স্থাপন করেছে। একটানা বক্তৃতার দ্বারা বিল পাশে বাধা সৃষ্টির নাম 'ফিলিবাস্টার'। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরে অন্য কোন আলোচনা না করে সেনেটে অধিকার বিল বিরোধীরা এই বিল পাশে বিলম্ব করার চেষ্টা করেছেন। এঁদের আশা ছিল, বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহে বিল সমর্থকরা সক্ষম হবেন না, এবং ক্রমাগত বক্তৃতা করে তাঁরা বিলকে আটকে দেবেন।

কিন্তু বিলের বিরোধীরা হতাশ হয়েছেন। প্রয়োজনের চেয়েও ৪টি ভোট বেশি পেয়ে ৭১-২৯ ভোটে আলোচনা বন্ধের (closure) প্রস্তাব সেনেটে পাশ হয়েছে। আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব এত বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল যে, সেনেটের ১০০ জন সদস্যের সকলেই ভোটদানের সময় উপস্থিত ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্রাটিক পার্টি সদস্য ক্লেয়ার এংগেল ভয়ংকর রকম অসুস্থ। মস্তিষ্কে দুটি গুরুতর অপারেশনের পর থেকে তিনি চলাফেরা করতে পারেন না, কথাও বলতে পারেন না। এংগেল এ্যাম্বুলেন্সে করে সেনেট ভবনে এসেছেন, 'ইনভ্যালিড চেয়ারে' করে কক্ষে প্রবেশ করেছেন। ভোট-দানের সময় কথা বলতে পারেন নি, কিন্তু হাসিমুখে হাত দিয়ে নিজের চোখ দেখিয়ে দিয়েছেন—"আইজ", অর্থাৎ পক্ষে ভোট। নিগ্রোদের সমানাধিকার দানের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত এই অধিকার বিল পাশের জন্য এংগেলের মত শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের এরূপ মহানুভব আচরণ ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

আলোচনা বন্ধের পক্ষে ডেমোক্রাটিক পার্টির ৪৪ ও রিপাবলিকান পার্টির ২৭ জন সদস্য ভোট দিয়েছেন এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন ডেমোক্রাটিক পার্টির ২৩ ও রিপাবলিকান পার্টির ৬ জন সদস্য। বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন, নিগ্রো সমানাধিকারের ঘোরতর বিরোধী ডেমোক্রাটিক পার্টি রিচার্ড ব্রেভার্ড রাসেল ও রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ব্যারি-গোল্ডওয়াটার ডেমোক্রাটিক রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির উত্থাপিত এবং পরে রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসনের সমর্থিত এই বিলের পক্ষে ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ে রিপাবলিকান পার্টির সদস্যরাই বেশি সমর্থন জানিয়েছেন। সাধারণভাবে চিন্তাধারার দিক থেকে রিপাবলিকান পার্টি ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ে একটু বেশি রক্ষণশীল, কিন্তু নিগ্রোদের অধিকার দানের ক্ষেত্রে বরাবরই দেখা গেছে, রিপাবলিকান পার্টিই বেশি আগ্রহী—এ-ব্যাপারে তারা আব্রাহাম লিঙ্কনের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

আলোচনা বন্ধ করার প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সমর্থনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব সেনেটে সংখ্যালঘু রিপাবলিকান পার্টির দলনেতা এভারেট ডার্কসেনের। কেনেডি-প্রেরিত ও প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অনুমোদিত অধিকার রক্ষা বিলের সমর্থনে যখন দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া যাচ্ছিল না, এবং রাসেলের নেতৃত্বে দক্ষিণের গোঁড়া ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান সদস্যরা 'ফিলিবাস্টারের' সাহায্যে

• 'ইনভ্যালিড চেয়ারে' এংগেল

বিলকে বানচাল করার চেষ্টা করছিল, তখন ডার্কসেন সাহসের সঙ্গে বিলটির সংশোধন করার জন্য এগিয়ে আসেন। বিলের বিরোধী কয়েকজন সদস্যকে দলে টানার জন্য তিনি ৭০টি সংশোধন প্রস্তাব আনেন। সেনেটের সংখ্যাগুরু ডেমোক্রাটিক পার্টির দলনেতা মাইক ম্যানস্‌ফিল্ড, বিলের 'ফ্লোর ম্যানেজার' হুবার্ট হামফ্রে, এটর্নি-জেনারেল রবার্ট কেনেডি ও উভয় দলের কয়েক জন সদস্যকে নিয়ে ডার্কসেন পাঁচটি সম্মেলনে তাঁর সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা সবাই একমত হন। বর্তমানে যে ভাবে বিল পাশ হতে চলেছে, তা বলতে গেলে ডার্কসেনের বিল।

হোটেল-রেস্টুরেণ্টে নিগ্রোদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ, স্কুল-কলেজে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিগ্রোদের সমানাধিকার, কোন প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য অনুসরণ করা হলে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য বন্ধ, চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে নিগ্রোদের অসুবিধা দূরীকরণ, মূল বিলের এই সবই ডার্কসেনের সংশোধিত বিলে আছে। তবে বৈষম্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পূর্বে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণে অনেকখানি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণ বর্ণবৈষম্য না অন্য কিছু, সে-বিষয়েও চাকুরীদাতা ও রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব বেশ কিছুটা মেনে নেয়া হয়েছে।

যাই হোক, ত্রুটিপূর্ণ হলেও এই নাগরিক অধিকার বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। নিগ্রোদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নিঃসন্দেহে এর দ্বারা শক্তিশালী হবে। যেভাবে প্রবল বাধা অতিক্রম করে উভয় দলের নেতৃত্ব নিগ্রোদের অধিকার দানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে ভবিষ্যতে এর আরও প্রসার হবে আশা করা যায়। বিপরীত দিকে নিগ্রোরাও নতুন উৎসাহে আন্দোলন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়ন

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে রিপাবলিকান পার্টি আগামী মাসে সানফ্রান্সিসকোতে জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হবে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে আরিজোনার সেনেট-সদস্য ব্যারি গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন লাভের সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি বলে এখনও মনে হচ্ছে, গোল্ড-ওয়াটারের বিরোধীদের মধ্যে রকফেলার, নিকসন, ক্যাবট লজ বা রোমনির মনোনয়ন লাভের সম্ভাবনা খুবই কম।

* গোল্ডওয়াটার

কিন্তু গোঁড়া রক্ষণশীল গোল্ড-ওয়াটারের অদ্ভুত সব মতবাদের জন্য তাঁর সম্ভাব্য মনোনয়ন নিয়ে দেশে ও বিদেশে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকাগুলিতে যেভাবে গোল্ডওয়াটারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে, অতীতে রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়ন নিয়ে কখনও তা হয় নি। বহু লোকের আশঙ্কা হচ্ছে, গোল্ড-ওয়াটার প্রার্থী হলে রিপাবলিকান পার্টির বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত হবে। গোল্ডওয়াটারের পক্ষে প্রচারকার্য চালাতে গেলে বহু রাজ্যে গভর্নর সেনেট-সদস্য নির্বাচনে রিপাবলিকানরা হেরে যাবেন। এই বিপর্যয় রোধ করার জন্য দলের উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা চেষ্টা করছেন। এঁরা সকলে সম্মিলিত ভাবে "গোল্ডওয়াটারকে থামাও" আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা ভাবছেন।

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে গোল্ড-ওয়াটারকে হারাবার জন্য সর্বসম্মত একজন প্রার্থীর খোঁজ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই উদারনৈতিকরা পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর ৪৬ বৎসর বয়স্ক বিল স্ক্র্যানটনকে বেছেছেন। স্ক্র্যানটন প্রথমে নির্বাচনের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু এখন তিনি মনস্থির করেছেন, এবং স্ত্রী মেরী ও অন্যান্য দলীয় নেতাদের নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে প্রচার অভিযানে নেমে পড়েছেন। অন্যান্য প্রার্থীরা নিজেদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে স্ক্র্যানটনকে একযোগে সমর্থন করবেন, আশা করা যাচ্ছে। হেনরী ক্যাবট লজের সমর্থকরা ইতি-মধ্যেই স্ক্র্যানটনকে তাদের ভোটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রকফেলারও প্রকাশ্যে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত নিকসন ও রোমনিও স্ক্র্যান-টনকে সমর্থন করবেন। যদিও এখন পর্যন্ত গোল্ডওয়াটার জয়ী হবার মত ভোটের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, তবু উদারনৈতিকদের এই চেষ্টার ফলে শেষে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে স্ক্র্যানটন জয়লাভ করলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। অধিকার রক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সেনেটে যে ৬ জন রিপাবলিকান সদস্য ভোট দিয়েছেন, গোল্ডওয়াটার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এতে মধ্য-পন্থীদের ভেতরে গোল্ডওয়াটারের সমর্থন কমে যাবার আশঙ্কা আছে।

স্ক্র্যানটন গোল্ডওয়াটারের রক্ষণশীল মতের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, এক পা উনবিংশ শতাব্দীতে, আর এক পা বিংশ শতাব্দীতে রেখে কেউ চলতে পারে

না। লিঙ্কনের পার্টিকে ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই। পেনসিলভেনিয়ায় স্ক্র্যানটনের সুনাম আছে। আদর্শের দিক থেকে দৃঢ় অথচ সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন, এই গুণের জন্য তিনি জনপ্রিয়। 'ডাইভোর্স' বা 'পরাজয়' কোন কলঙ্কই তাঁর নেই। তাই তাঁর সমর্থকরা তাঁর সম্পর্কে খুবই আশাবাদী।

দক্ষিণ আফ্রিকা :

'রিভোনিয়া' মামলার নেলসন ম্যাণ্ডেলা ও অপর ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় ভারতের প্রতিনিধি পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বলেছেন, হিংসাত্মক কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন এই অজুহাতে আফ্রিকীয়, ভারতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই নেতাদের বিরুদ্ধে এই শাস্তি প্রদান সমর্থন করা যায় না। শ্রীমতী মেনন স্পষ্ট বলেছেন : "দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান অবস্থায় বিরোধীদের পক্ষে হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়া ন্যায়সঙ্গত আচরণ বলে গ্রহণ করতে হবে।"

ঠিক একই কথা বলেছেন, ১৯৬০

• নেলসন ম্যাণ্ডেলা

• লক্ষ্মী মেনন

সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত আলবার্ট লুথুলি। লুথুলি তাঁর বিবৃতিতে ম্যাণ্ডেলাদের কাজকে সমর্থন করে বলেছেন, এঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এঁরা বাধ্য হয়ে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। লুথুলির মতে, "এই কাজের জন্য এই বীরদের কেউ সমালোচনা করতে পারে না।"

বৃটেনে লেবার পার্টি ও লিবারেল পার্টি শাস্তিদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। পার্লামেণ্ট সদস্যরা প্রকাশ্যে বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বনির্দিষ্ট একটি বক্তৃতা করতে গেলে ছাত্ররা গোলমাল করে তার সভা ভেঙে দেয়, এবং শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে বহু কষ্টে পুলিশের সাহায্যে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়।

এদিকে আবার নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রক্ষা করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী নতুন এক পন্থা বের করেছে। ক'দিন পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদ বর্ণবৈষম্যের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রেজিল এই প্রস্তাব সমর্থন করে নি—তারা অনুপস্থিত ছিল। এখন তাদের চেষ্টায় নরওয়ের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য সম্ভাব্য ব্যবস্থার উপযুক্ততা বিচারের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করা হোক—আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত এই কমিটী বিষয়টি বিবেচনা করবে। প্রস্তাবটি এমনিতে ভাল, কিন্তু আসলে এর উদ্দেশ্য মার্চ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবরোধ পিছিয়ে দেয়া। অধিকাংশ আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদে মরোক্কো ও আইভরি কোস্ট এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে। গত ১৮ই জুন নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত ছিল।

বৃটেন :

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটেন এডেনে তার কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভের আশায় কিউবার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করার কথা ভাবছে।

কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি গ্রহণ

• আলেক ডগলাস হিউম

করেছে, বৃটেন তা সমর্থন করে নি। বৃটেন থেকে কিউবার জন্য বহুসংখ্যক লেল্যাণ্ড বাস পাঠাবার সিদ্ধান্তে বিচলিত হয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমকে এই বাস পাঠানো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হিউম সে অনুরোধ মানেন নি। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসন আবার হিউমকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছেন। কিউবার ব্যাপারে বৃটেনের সমর্থন আদায় জনসনের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এডেন নিয়ে বৃটেনও বর্তমানে খুবই বিব্রত। আরব জাতীয়তাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি ও নাসেরের প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে বৃটেনের পক্ষে এডেনে তার কর্তৃত্ব রক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে নাসেরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এডেন রক্ষার জন্য কিছু করা যায় কিনা, হিউম তাই ভাবছেন। তাই 'দেয়া-নেয়ার' নীতি অনুসারে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কিউবা-এডেন সামগ্রিক বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আছে। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এডেনের স্বাধীনতা অর্জন প্রতিরোধ করা কতটা সম্ভব হবে বলা শক্ত।

রুমানিয়া :

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রুমানিয়া আজ সবচেয়ে বেশি সোভিয়েট বিরোধী। চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে রুমানিয়া চীনের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছে। মার্কসবাদের তত্ত্ব বিশ্লেষণে রুমানিয়া চীনের মতকে সমর্থন করে বলে এরূপ করছে, তা কিন্তু নয়। আসল কারণ হল, সোভিয়েট কর্তৃত্বের হাত থেকে রুমানিয়া মুক্ত হতে চায়।

কেবল রুমানিয়া নয়, পূর্ব ইউরোপে এরূপ আরও একাধিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র আছে, যারা সোভিয়েট কর্তৃত্বে ক্ষুব্ধ। বৃটিশ লেবার পার্টির বৈদেশিক

• রুমানিয়ার একটি পাওয়ার স্টেশনে কর্মীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা ঝর্গেউ-দেজ (ফুল হাতে)।

রাজনীতি বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকারের ভাষায়, এদের আচরণ অনেকটা দ্য গলের মত ; দ্য গলও মার্কিন কর্তৃত্বে ক্ষুব্ধ হয়ে মার্কিন বিরোধিতায় নেমেছেন—তাই এদের 'গলপন্থী' বলা যায়। আর রুমানিয়া হল সবচেয়ে বড় 'গলপন্থী'।

নানাভাবে রুমানিয়ার বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে চীনের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্ক স্থাপন, এবং অপরদিকে পশ্চিমী গোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। সম্প্রতি রুমানিয়ার প্রতিনিধিরা জেনেভা এসেছিলেন 'গ্যাট' (GATT) এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবার জন্য। কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্যও চেষ্টা করেছে 'কমেকন' (কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বাণিজ্য সংস্থা) ভুক্ত রুমানিয়া। এছাড়া চরম সোভিয়েট বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে, রুমানিয়ার রাস্তার রুশ নামের পরিবর্তন, আবশ্যিক ভাষা রূপে রুশ ভাষা পাঠ বন্ধ, রুশ বই-এর দোকান বন্ধ প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়ে। মস্কো রেডিও ও বুখারেস্ট রেডিও'র মধ্যে পরস্পর গালাগালও সুরু হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ঝর্গে ঝগিউ-দেজের অভিযোগ, সোভিয়েট ইউনিয়ন রুমানিয়ার শিল্প প্রসার চায় না—তৈলসমৃদ্ধ রুমানিয়াকে চিরকাল তারা কাঁচা মালের দেশ করে রাখতে চায়। ১৯৬০ সালে 'কমেকন' বৈঠকে ঠিক করা হয়েছিল, পূর্ব ইউরোপে চেকোশ্লোভাকিয়া আর পূর্ব জার্মানী শিল্পসমৃদ্ধ হবে, আর বাকি সব কাঁচা মালের দেশ হয়ে থাকবে। কিন্তু ঝর্গে ঝগিউ-দেজ-এ-ব্যবস্থা মানতে রাজি নন। তিনি রুমানিয়াকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ রূপে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। রুমানিয়া ইতিমধ্যেই ভারত থেকে লোহা কিনেছে, এবং পশ্চিমী গোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ ১৫% থেকে ৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও তাই আজ বাধ্য হয়ে রুমানিয়াকে ভারী যন্ত্রপাতি বিক্রি করছে।

পূর্ব জার্মানী :

গত সপ্তাহে মস্কোতে নিকিতা ক্রুশ্চেভ পূর্ব জার্মানীর ওয়াল্টার উলব্রিখ্‌টের সঙ্গে বিশ বৎসরের এক

মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে, কোনরূপ আক্রমণের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানী পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া পশ্চিম বার্লিনকে একটি 'স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা' রূপে এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে যদি জার্মানী সম্পর্কে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করা হত, তা হলে পশ্চিমী গোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সে হৈ-চৈ সুরু হয়ে যেত। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এবার এসব কিছুই হয় নি। বরং সোভিয়েট পক্ষ থেকে বোঝানো হয়েছে, নতুন মৈত্রী চুক্তির ফলে স্থিতাবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, এবং পশ্চিমী গোষ্ঠীও জানিয়েছে, তারা এই চুক্তিতে মোটেই বিচলিত হয় নি। এই ঘটনাকে অনেকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ বলে উল্লেখ করছেন। অবশ্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আনাতলি ডোবরিজিন পররাষ্ট্র সচিব ডিন রাস্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝিয়েছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি—পূর্ব জার্মানীর জনসাধারণের কাছে উলব্রিখটের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এরূপ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল।

ওয়াশিংটন, লণ্ডন ও প্যারিস থেকে এই চুক্তির বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক প্রতিবাদ পাঠানো হলেও, কেউ-ই বিশেষ বিচলিত হয় নি। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার এরহার্ড চুক্তি সম্পাদনের সময় ওয়াশিংটনে ছিলেন। তাঁর কথাবার্তাতেও বিচলিত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। বরং, জার্মানীর ঐক্য সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি এ বৎসরের শেষে মস্কো যাবেন, এ কথাই তিনি ঘোষণা করেছেন।

পশ্চিম জার্মানী ঃ

আগামী মাসে পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মত এতটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন দিক থেকে পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভবত বর্তমান রাষ্ট্রপতি লুবকে পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হবেন। আদেনুর ও এরহার্ডের দল ডেমোক্রাটিক ক্রিশ্চিয়ান পার্টির প্রতিনিধিরূপেই লুবকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয়

* লুবকে

সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করা এককভাবে ডেমোক্রাটিক ক্রিশ্চিয়ান পার্টির পক্ষে সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য আহূত কনভেনশনে মোট প্রতিনিধি বা ভোটদাতার সংখ্যা হবে ১০৪২। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য লুবকেকে এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৫২২টি ভোট পেতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ডেমোক্রাটিক ক্রিশ্চিয়ান পার্টির দখলে থাকে মাত্র ৪৮৮টি ভোট। বাকি ভোটের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির হল ৪৪৩, ফ্রি ডেমোক্র্যাট্‌স ১০৪ ও অন্যান্য প্রাদেশিক দলের ৭। সুতরাং লুবকেকে নির্বাচিত হতে হলে অন্য দলের সমর্থন লাভ করতে হবে।

সোস্যাল ডেমোক্রাটরা কি করবে, এখনও স্থির করে নি। দলের একাংশ লুবকেকে সমর্থন করতে চাইলেও, বৃহত্তর রাজনীতির প্রয়োজনে হয়তো তা করা যাবে না। ফ্রি ডেমোক্রাটরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, তারা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তাদের প্রার্থী, ৪৯ বৎসর বয়স্ক ফেডারেল বিচারপতি এওয়াল্ড বুচার। মাত্র ১০৪টি ভোটের জোরে জয়লাভ করা যাবে না, এ কথা জানা সত্ত্বেও ফ্রি ডেমোক্রাটরা প্রার্থী দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে দলের প্রাধান্য প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। তাছাড়া সোস্যাল ডেমোক্রাটরা ফ্রি ডেমোক্রাট প্রার্থীকে সমর্থন করলে তাদের প্রার্থী নিশ্চিত জয়লাভ করবে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্রাটরা এরহার্ডের ডেমোক্রাটিক ক্রিশ্চিয়ান পার্টিকে হারিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না বলেই পর্যবেক্ষকদের ধারণা। সে ক্ষেত্রে সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতা উইলি ব্যাণ্ড ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কোয়ালিশন করে চ্যান্সেলার হতে পারেন। এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ফ্রি ডেমোক্রাট প্রার্থীকে সমর্থন করে সোস্যাল ডেমোক্রাটরা তাদের সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করতে চায়।

সত্যি সত্যি যদি লবকের সঙ্গে ফ্রি ডেমোক্রাটিক প্রার্থী বুচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তবে এরহার্ড সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করতে হবে। কারণ, এরহার্ড ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার চালাচ্ছেন। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহারের জন্য চেষ্টা চলছে। সর্বসম্মত একজন প্রার্থী নির্বাচনের জন্য প্রধান ৩ দলের সভাপতিরা শীগগিরই মিলিত হচ্ছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাজেনবাবু, ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়ে আপনাকে আর চিন্তিত করতে চাই না। কাজেই গোড়াতেই জানিয়ে রাখি, যদিও চার-পাঁচ দিন হাত-পা ছড়িয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে হয়েছিল, এখন একেবারে যাকে বলে হেল অ্যাণ্ড হার্টি। আবার আপনার মাঠ, নদী, গাছপালা আর পাহাড়ের ছায়ার ভেতরে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কী হয়েছিল? বলবার মতো এমন কিছু নয়। ডাক্তার রায়চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে সেই বিখ্যাত মহাকালে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বেশ জায়গাটি। সেখানে মনের ভুলে কিছু চপলতা করে থাকব হয়তো, তাই আপনাদের মহাকাল একটি ছোটখাটো ধমক দিয়েছিলেন। দেখলুম, নাস্তিককে ঠিকই চিনতে পেরেছেন, কানে ধরে সেটা বুঝিয়েও দিলেন।

কিন্তু থাক ও-সব কথা।

আচ্ছা রাজেনবাবু, প্রকৃতি সম্পর্কে কী ধারণা আপনার? দার্শনিকেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কবিরা বিস্তর কবিতা লিখেছেন, তার জবাবে মানুষ আবার শহরের জয়গান গেয়েছে, প্রকৃতিকে ঠাট্টা করেছে, ধিক্কার দিয়েছে। তবুও ইয়োরোপের মানুষ ছুটির দিনে নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে, পাহাড়ের উপত্যকায় একটি ছোট গ্রামের বাড়ির সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতিকে স্বীকার করি আর না-ই করি, একটা শক্তি তার আছেই, সে আমাদের টানে।

এই টানটা কিসের? মুক্তির, আনন্দের? খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে নীল আকাশে ডানা মেলবার? ক'দিনের জন্যে নিজের সমস্ত বোঝা আর গ্লানি থেকে নিস্তার পেয়ে নবজাতকের মতো নতুন হয়ে ওঠবার? ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াবার? এ কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলবেন, ভিক্তর ইয়ুগো বলবেন, রবীন্দ্রনাথ বলবেন। আমি বিশ্বাস করি না।

তত্ত্বে যেতে চাই না, সোজা কথায় বলতে পারি, ভাইভারশান। মুখ বদলায়, চোখ জুড়োয়, অনেকগুলো মনকে একসঙ্গে দেখি, কিন্তু বুকে তারা পীড়ন করে না। বাতাসে ব্যাকটিরিয়া নিশ্চয় থাকে, কিন্তু তারা সবাই-ই মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে আনে না। একটা পাহাড়ী নদীর ঠাণ্ডা স্রোতে স্নান করবার মতো, কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে ভারি শুচি, ভারি পরিচ্ছন্ন মনে হয়।

কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়। জানেন, মধ্যে মধ্যে আমারও মনে হয়, প্রকৃতির একটা নিঃশব্দ শক্তি আছে—সে ধীরে ধীরে মানুষকে বদলে দিতে পারে। এই জন্যেই কি সাধু-সন্নিসিরা পাহাড়ে পালায়? অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' আমাকে উদাস করত। অনেকদিন পড়ি নি, আজকে কেমন লাগবে জানি না। তবু মন আর চিন্তার যে নৈরাজ্যের ভেতরে এখন কাল কাটে, নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত দীর্ণ-বিচ্ছিন্ন করে যে যন্ত্রণার আনন্দ আস্বাদন করি, প্রকৃতির মধ্যে ফিরে এলে সেগুলোকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তখন পুরোনো

মূল্যবোধগুলোকে স্বীকার করতে ভালো লাগে।

আমি আপনার বাংলোর বারান্দায় বসে এই চিঠিটা লিখছি। এখন বেলা দশটার কাছাকাছি। আকাশে জোরালো রোদ নেই, মেঘ এসে থেকে থেকে সূর্যকে আড়াল করছে। মনে হচ্ছে এক পশলা বৃষ্টি-বাদল দেখা দেবে আজকালের ভেতরে। হাওয়ায় ভিজে ভিজে ভাব একটা। সেই বাতাসে দেখছি সামনে কয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ—ফুলে ফুলে একাকার—তারা সমানে পুষ্পবৃষ্টি করছে। প্রকৃতির মজাটা দেখুন—সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণচূড়ার তলায় একটি মেয়েকে যেন ফুটিয়ে তুলতে চাইছে—ঠিক একটা রোমান্টিক ক্যালেণ্ডারের মতো। মেয়েটি শ্রীমতী, কিন্তু এমন কিছু অসাধারণ রূপসী নয়; তার চাইতে ঢের বেশি সুন্দর মুখ চোখে পড়ে কলকাতায়, অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ যে নেই তা-ও নয়—কিন্তু মন ঠাট্টা করে বলে, কী হবে? অথচ দেখুন, এখানে একটি সুশ্রী সাধারণ বাঙালী মেয়ে কত সহজে আমার মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। এখন আমি তাকে ভালোবাসতে পারি—পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ যে-ভাবে ভালোবাসত; আমি তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারি—চল্লিশ বছর আগেও যে-ভাবে কবিতা লেখা যেত। তারপর একদিন তাকে একটা পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে আপনাকে চিঠি লিখতে পারি—"দয়া করে আমার এই কবিতার বইখানা ছাপুন রাজেনবাবু—কবিতাগুলো আমার স্বপ্ন আর কামনা মিশিয়ে লেখা।"

কিন্তু ভয় নেই, এ-সবই কল্পনা। আমার কোনো প্রেমিকাও জোটে নি, কোনো কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি আপনাকে তাড়া করব না। শুধু বলতে চাইছিলুম, প্রকৃতি মানুষের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়; তার কতগুলো হিপ্‌নটিক্ আকর্ষণ আছে, যে-কোনো বুদ্ধিমান লোককেও কিছুক্ষণের জন্যে সে ভোঁতা করে দিতে পারে—তার পাহাড়ের ছায়ায়, তার কৃষ্ণচূড়ার রঙে, তার হাওয়ায়, তার মহাকাল পাহাড়ে অজস্র প্রজাপতির পাখায় পাখায় মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে।

ভেবেছিলুম, মাসদেড়েক থাকব। এখন মনে হচ্ছে, অতটা দেরি সইবে না। যে-কোনো একদিন ফিরে আসতে পারি আমার চেনা পুরোনো জটিল কলকাতায়, আমার স্বাভাবিকতার ভেতরে।

চিঠিটা বড়ো হয়ে গেল। যদি বেয়ারিং হয়, দয়া করে ফেরৎ পাঠাবেন না। আশা করি, ভালো আছেন।"

লেখা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল কিরণ। সামনে মাঠের বুকে ছড়ানো ছোট ছোট পথগুলোতে আজ মানুষের চলাচল কিছু বেশি। বাঁক কাঁধে করে, ঝাঁকা নিয়ে লোকজন আসছে—তরি-তরকারী, হাঁড়িকুঁড়ি, মুরগী; ধুলো উড়িয়ে মোষের গাড়িও আসছে দু-চারখানা। স্টেশনের কাছে নিশ্চয় আজ হাট বসবে।

হঠাৎ তার হাট দেখতে ইচ্ছে করল। অনেক দিন দেখে নি। আজ বিকেলে একবার যাবে স্টেশনের দিকে।

চলতি হাটুরে লোকজনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ঘোর ঘোর হয়ে এল। আবার সেই দিন-গুলোকে মনে পড়ল; যখন রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়ে সে পথ হারিয়ে-ছিল। তাদের গ্রামেও হাট বসত। সেই মস্ত বটগাছটা—কতদূর থেকেও দেখা যেত সে পাহাড়ের মতো মাথা তুলে রয়েছে। তাকে ঘিরে ঘিরে সারি সারি খড় আর টিনের চালা। গরুর গাড়ি এসেছে দূর দূর থেকে—খড় আর ধুলোর গন্ধ। হাটে পদ্মপাতায় করে চুণো মাছ বিক্রি হয়, ময়রার দোকান থেকে জিলিপি ভাজার গন্ধ ওঠে, চালের পাহাড় দেখা যায়, বেলোয়ারী চুড়ি আর রঙিন কাপড় কেনে মেয়েরা, লক্ষ্মী আর সত্যনারায়ণের পাঁচালী বিক্রি হয়, কোথাও বা ভালুকওলা নাকে দড়ি পরিয়ে ধুমো ভালুকটাকে লাঠির তালে তালে নাচায়।

এখনো কি পাড়াগাঁয়ে তেমনি করে হাট বসে? হয়তো বসে, কিন্তু চালের পাহাড় আর কেউ চোখে দেখতে পায় না।

কিরণ আজকে হাট দেখতে যাবে।

কিন্তু হাট দেখতে যাওয়ার কথাতে মনে হল, তা হলে ডাক্তার রায়চৌধুরীর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হবে। আর নিশ্চয় দেখা হয়ে যাবে কারো সঙ্গে। তখন আর এড়ানো যাবে না, ঢুকতেই হবে ও-বাড়িতে।

আর যে-চিন্তাটাকে এতক্ষণ জোর করে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল, সেইটেই আবার ফিরে এলো মনের কাছে। শর্মিলা।

সেদিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে গিয়েছিলেন। দুজনের নিঃসঙ্গতার ভেতরে কী একটা যেন আবেশের মতো ঘনিয়ে এসেছিল, কোথা থেকে তার যেন সুর কেটে গেল, কী যেন এলোমেলো হয়ে গেল হঠাৎ। কিরণ কিছু বুঝেছে কি? অথবা, কিছুই বুঝতে পারে নি?

কেন রাগ করলেন শর্মিলা?

'এই রোমাণ্টিক মুহূর্তগুলো কতক্ষণই বা থাকবে—একটু পরেই মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়—' এমনি একটা আলোচনা যেন চলছিল। কিন্তু তাতে কেন রাগ করতে যাবেন শর্মিলা? কোথায় তাঁকে বাজল?

একটু আগেই রাজেনবাবুকে যে চিঠিটা লিখছিল, তাতে কৃষ্ণচূড়ার বীথির ছায়ায় একটি কাল্পনিক মেয়েকে আমদানি করেছিল সে। কিন্তু সবটাই কল্পনা? একদিক থেকে তাই—এই নির্জনবাসের মোহ তো একটুকরো স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। যখন চলে যাবে, ট্রেনের চাকায় একটার পর একটা স্টেশনের পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দিনগুলো দূরে-দূরান্তে

চলে যাবে। কোনোদিন হয়তো বড়ো একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর দেখে মনে আসবে ডগলাসের স্মৃতি, পথ-চলতি কয়েকটি স্কুল-কলেজের ছাত্রীর তরল হাসির শব্দ আর ঝলক হাসিকে মনে পড়িয়ে দেবে, কখনো স্বপ্নের ভেতর নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দেবে মুক্তদ্বার মহাকালের মন্দির, অচেনা সেই হলুদ ফুলের বুনো গন্ধ আর ঝর্ণার দু'ধারে প্রজাপতির দল। তাদের ভেতর ঝিকঝিক করবে একটি শ্বেতবিন্দু—শর্মিলা।

ব্যস, এই পর্যন্তই। তাই শর্মিলা থেকেও নেই, রাজেনবাবুকে মিথ্যে কথা সে লেখে নি। আর প্রেম? এক-ধারের জন্যে উন্মনা হল কিরণ। সন্দেহ নেই, এই মেয়েটি তাকে আকর্ষণ করে, কাছে এলে ভালো লাগে, চলে গেলে তার কথা ভাবতে ভালো লাগে। যে প্রকৃতির কথা সে লিখছিল, তার সেই অদৃশ্য শক্তিটাই হয়তো শর্মিলার দিকে তার মনকে টানে—সেই প্রথম দেখা একটা অপরূপ আবির্ভাবের মতো দু'চোখ তার জুড়ে আছে।

আরো একটা কারণ আছে হয়তো। শর্মিলাকে ঘিরে সেই বেদনার শুভ্রতা। সেই অকাল বৈধব্যের ট্র্যাজেডি। শান্ত মুখে করুণ গম্ভীর মগ্নতা, তারই ভেতরে কখনো বিদ্যুতের মতো বুদ্ধিতে জ্বলে ওঠে চোখ, কখনো কৌতুকে ঝকঝক করে ওঠে। তবু মনে হয়, শর্মিলাকে যতটুকু দেখা যায়—তারই থেকে খবর আসে, অনেকখানিই তাঁর দেখা যায় না। সে না-দেখার আড়ালটুকু সরিয়ে দিতে প্রলোভন জাগে, তার একজন ভক্ত-পাঠিকার মনের দরজার বাইরেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে—এইটেই সে কিছুতে সহ্য করতে পারে না।

আচ্ছা, সত্যিই কি সে শর্মিলা সম্পর্কে দুর্বল হতে সুরু করেছে?

ছি—ছি, এ-সবের কোনো মানে হয়? ডাক্তার রায়চৌধুরী নিতুকে মানুষ বলে এমনভাবে আলাপ করে নিয়েছেন, নইলে ক'দিনেরই বা পরিচয়? তাঁদের আতিথেয়তা আর ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে এ-সব কি অন্যায় চিন্তা তার? ভদ্রমহিলা বিদুষী, অধ্যাপিকা, কপালগুণে তার লেখা কিছু কিছু পড়েন—এ-সব চিন্তার আভাস পেলেই বা কী ভাববেন? নাঃ, মনের দিক থেকে কিরণ ভারি নোংরা হয়ে যাচ্ছে।

শম্ভু এল।

—বাবু, চান করবেন না?

—এত তাড়াতাড়ি?

—তাড়াতাড়ি কোথায় এগারোটা বাজল। আমাকে আবার হাটে যেতে হবে।

—হাটে এখন কেন? সে তো বিকেলে।

শম্ভু হাসল: না বাবু, এখানকার হাট দুপুরেই শেষ হয়ে যায়। দূর থেকে লোক আসে কি না, সাঁঝের আগেই তাদের ফিরে যেতে হয়। আপনি চটপট খেয়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দেবেন, নইলে হাটে কিছুই পাওয়া যাবে না।

—আমিও তো হাটে যাব ভেবে-ছিলুম।

—বেশ তো, চলুন আমার সঙ্গে।

—না, এই দুপুরে আর নয়। যাওয়া যাবে আর একদিন।

দুপুরটা কিছু বই পড়ে, কিছু ঘুমিয়ে, ছাড়া-ছাড়া কতকগুলো ভাবনার ভেতরে একরকম ভাবে কেটে গেল। শুধু একটা চিন্তা কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ছে না। সেদিনের পর রায়চৌধুরী রোজই এসেছেন, ছেলেমেয়েরাও এসেছে কয়েক-বার, এমন কি কল্যাণী পর্যন্ত এসেছেন একদিন। কিন্তু শর্মিলা আর আসেন নি।

রাগ করেছেন? কেন?

বিকেলের দিকে মনে হল, মাথাটা কেমন ভার ভার হয়ে উঠেছে। রাত্রে জানলা খোলা ছিল, একটু ঠাণ্ডা লেগে থাকবে খুব সম্ভব। শম্ভু হাট করে ফিরে চা দিয়েছিল, কিরণ তার সঙ্গে একটা অ্যাসপিরিন জাতের বড়ি গিলে ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ—যদি ডাক্তার রায়চৌধুরী এসে পড়েন, যদি তাঁর সঙ্গে—

কিন্তু কেউ-ই এলেন না। ডাক্তার ব্যস্ত মানুষ, নিশ্চয় কোথাও কলে বেরিয়ে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত গায়ে পাঞ্জাবী আর পায়ে কাবলী চটি গলিয়ে কিরণ বেড়াতে বেরুল। চলল নদীর দিকেই।

পশ্চিমের আকাশে মেঘ আছে এখনো, কিন্তু বৃষ্টির ভাবটা আর নেই, মেঘের ওপর সোনালি রোদ জ্বলছে। নদীর জলে সেই মেঘের ছায়া পাথরে পাথরে ভেঙে যাচ্ছে—যেন টুকরো টুকরো কাঁচা সোনা ভেসে চলেছে। মোটা মোটা বালির দানার ওপর আজও খঞ্জন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে কাদাখোঁচা। কিরণ বালির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

এখানে ওখানে হাটফেরত মানুষ নদীর হাঁটুজল পার হয়ে তরল কাচের মতো জলের রংটাকে ঘোলা করে দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছিল, পারে চলার পথ ধরে ধরে মিলিয়ে যাচ্ছিল শালবনের আড়ালে। একজন গেল একটা মাদল বাজাতে বাজাতে, কিরণ তা-ও দেখল। আর তারই পরে দেখল শর্মিলাকে।

বালির ডাঙার ধারেই কতগুলো ঝোপঝাড়। তারই পাশে দাঁড়িয়ে, ঘাড় নীচু করে ঝোপের ভেতরে কী দেখছিলেন শর্মিলা। বিকেলের মেঘ মাখানো রোদে সোনার মূর্তির মতো মনে হল তাঁকে।

শর্মিলা এখানে—একা! কিরণ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর শর্মিলা চোখ তুললেন। তৎক্ষণাৎ সোনার রোদ তাঁর মুখে রাঙা হয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড শুধু রইল নদীর জলের শব্দ, পাখির ডাক, অনেক দূরে চলে-যাওয়া সেই লোকটার মাদলের শব্দ। তারপর কিরণ সহজ হল, কয়েক পা এগিয়ে গেল সামনে।

—নমস্কার।

উত্তরে শর্মিলা দু'হাত জড়ো করলেন কপালে। আঙুলের রঙে মিশে থাকা ছোট একটি আংটি চিকচিক করে উঠল।

কিরণ বললে, বেড়াতে এসেছেন?

শর্মিলা এবার হাসলেন। বললেন, না, ঠিক বেড়াতে নয়। ক্যাকটাসের খোঁজে এসেছিলুম।

—ক্যাক্টাস?

—ওটাও আমার একটা পাগলামি। —শর্মিলা চোখ নামালেন: কিছু কিছু কালেকশন করি। এখানে দু-একটা ভালো স্পেসিমেন রয়েছে, তাই দেখছিলুম।

—কিন্তু একা কেন? আপনার ব্যাটালিয়ন কোথায়? বিশেষ করে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট বাবল?

শর্মিলা আবার হাসলেন: মধ্যে মধ্যে ওদের ছুটি দিয়ে একাই বেরুই।

—একা বেরুনো কি ভালো? প্রজাপতির অভিজ্ঞতা কি ভুলে গেলেন?

শর্মিলা আর একবার রাঙা হলেন: ছি—ছি—

কিরণ বললে, আচ্ছা থাক ও-কথা। আজ তো আর কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই। বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—সাহায্য আজ আর করতে পারবেন না। গাছ দেখছি, কিন্তু দা কিংবা খুরপী নইলে তোলা যাবে না। কাল বাস্তুকে কিংবা একটা চাকরকে সঙ্গে করে আনব।

কিরণ বললে, আমার কাছে একটা পেন-নাইফ আছে। কোনটা তুলতে হবে বলুন তো? ওই চারাটা তো? দেখুন, তুলে দিচ্ছি এক্ষুণি।

—না-না, শিকড় কেটে ফেলবেন। তা ছাড়া বড্ড কাঁটা ওখানে—শর্মিলা প্রতিবাদ করলেন, কিছু করতে হবে না আপনাকে।

—শিকড় কাটব কেন? ঠিক তুলে আনব, দেখুন—কিরণ এগিয়ে গেল।

—আবার বুঝি কষ্ট দেবেন আমাকে? কী ভেবেছেন—বলেই শর্মিলা খপ করে কিরণের হাত চেপে ধরলেন: চলে আসুন বলছি—

কিরণ সরে এল, হাত ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আরো দূরে সরে গেলেন শর্মিলা। কিন্তু সেই ছোঁয়াটুকু যেন পলকের ভেতরে অনেক বেশি অর্থ বয়ে আনল কিরণের কাছে, আর শর্মিলার দুই চোখ লজ্জায়, ভয়ে নিবিড় হয়ে রইল।

সেই পড়ন্ত বিকেলের রোদে যেন কনে-দেখা আলো পড়ল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দুজন। নদীটা বয়ে চলল একটানা, মাদল বাজতে লাগল ওপারের শালবনের ছায়ায়। আর নিজের যে মনটাকে খানিক আগে অসম্ভব রোমাণ্টিক কল্পনায় মোহাচ্ছন্ন বলে ভেবেছিল কিরণ—সেই মুগ্ধ মনটাই এখন তার সবকিছু ছাপিয়ে সত্য হয়ে উঠল।

কিরণ শর্মিলার আরো কাছে এসে দাঁড়ালো।

—আপনি সেদিন রাগ করেছিলেন আমার ওপর।

লজ্জায় নত চোখ দু'টি যেন জোর করে তুলে ধরলেন শর্মিলা।

—করেছিলুম।

—কেন? কী অপরাধ হয়েছিল আমার?

শর্মিলা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সেটা যদি আপনি না বুঝে থাকেন, তবে আর বোঝাবার দরকার নেই।

—আপনাকে বলতে হবে।

শর্মিলা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ঘাড়ের ওপর কয়েকটা ঝুরো চুল উড়তে লাগল হাওয়ায়, জ্বলতে লাগল সোনার হারের সরু রেখাটি। বললেন, আজ নয়। আজকে আমার ভয় করছে। আমি—শর্মিলা একবার থামলেন: আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আর একদিন বলব।

—কিন্তু—কিরণের স্বর গভীর হয়ে উঠল: কিন্তু এমন করে আর একটা দিন তো ফিরে আসবে না। আপনি আবার নিজেকে সকলের আড়ালে লুকিয়ে ফেলবেন।

শর্মিলা মুখ ফেরাতে চাইলেন, পারলেন না। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন, কাল এখানেই দেখা হতে পারে। এই সময়।

—ঠিক আসবেন?

—আসব। কিন্তু আজ আর নয়—আমি যাই—

কাঁটা ঝোপটার পাশ দিয়ে, একটা সরু পথের রেখা ধরে বিকেলের শেষ আলোর ভেতরে শর্মিলা যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেলেন। আর অনেকক্ষণ ধরে, নদীর জলের শব্দ আর পাখির ডাকের সঙ্গে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পেল কিরণ।

রাত্রে ঝিমঝিম করে গানের মতো বৃষ্টি চলল, সকালের রোদ পৃথিবীর ভেজা চোখের জল মুছিয়ে দিলে, কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ঝরল, দূরের পাহাড়ে ক্লান্ত হয়ে মেঘ ঘুমুল, সমস্তটা দিন নেশার ভেতরে কেটে গেল কিরণের।

তারপরে বিকেল। সেই নির্জন নদীর ধার। আজ হাটবার নয়—একান্ত হয়ে পাশাপাশি বসায় কোথাও কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু বিকেল ডুবল, তারা উঠল, রাত হল, কেউ এল না। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় নির্বোধ প্রত্যাশায় কিরণ তবুও ভাবতে লাগল: এখনো আসতে পারে, এখনো সময় যায় নি।

শেষে ভুল ভাঙল তখন, যখন অনেক দূরের একটা পেটা ঘড়িতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসতে লাগল রাত ন'টার আওয়াজ, তখন চমকে তাকিয়ে দেখল দূরে কাছে একটি আলোর রেখা কোথাও নেই, নিতল নিথর হয়ে মৃত্যু-মূর্ছিত রাত নেমে এসেছে।

(ক্রমশঃ)

জওহরলাল : গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

পুলিন দাস

জওহরলাল প্রথম এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২১-এ। গান্ধীর সঙ্গে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হয়ে। জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—এই তিন মহাপুরুষের সেই প্রথম সম্মিলন।

সে ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। গান্ধীর প্রকল্পিত কর্ম-সূচীর সবকিছুকে রবীন্দ্রনাথ সেদিন নির্বিচারে সমর্থন করতে পারেন নি। গান্ধীর কর্মনীতি যে ক্রটিহীন না-ও হতে পারে, তাঁর চিন্তাও যে সর্বত্র অভ্রান্ত নয়, গান্ধীও সমালোচনার উর্ধ্বে নন, একথা সে দিনের সেই উত্তর-ত্রিশের যুবক জওহরলালের মন মানতে রাজী হয় নি। গান্ধীর কর্মনীতির সমালোচনা তাঁর মনঃপূত হয় নি। বরং এতে তিনি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সেদিন। সেদিনের সেই রবীন্দ্র-সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন জওহরলাল তাঁর পরিণত জীবনে এসে। স্মরণ করে লিখেছেন—

"Greatly attracted as I was to Tagore, I still felt a little irritated that he should criticize some aspects of the new movement that Gandhi had started."

সেদিনের সেই বয়স, মন আর মনের স্বভাবকে পেরিয়ে এসে পরবর্তীকালে জওহরলাল রবীন্দ্রনাথের যত ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় যত নিবিড় হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিমাণ ও আকর্ষণ ততই বেড়ে গেছে। শুধু

তাই না, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও জীবনদর্শনের সঙ্গে সহ-মর্মিতাও তিনি ক্রমশ খুঁজে পেয়েছেন। এই পরি-বর্তনের পরিচয়টুকুও জওহরলালই লিখে জানিয়ে গেছেন—

"But the more I have read what Tagore wrote then, the more I have appreciated it and felt in tune with it--- In later years my attraction to Tagore grew. I felt a great deal of Kinship with his thought and with his general outlook on life ... From an intellectual appreciation of his ideas and his outlook on life an emotional bond had grown up between us."

সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের পর জওহরলাল অনেকবার এসেছেন রবীন্দ্র সান্নিধ্যে। নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, উপদেশ চেয়েছেন, কন্যা ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে রেখেছেন শিক্ষার্থিনী-রূপে আত্মজীবনী লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর মতামত প্রার্থনা করে। জাতীয় সঙ্গীত রচনায় অনুরোধ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে, ভারতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Indian civil Liberties union) সভাপতি-পদ গ্রহণ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, অবশেষে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতীর আচার্য-পদ গ্রহণ করে প্রত্যেকটি সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত

থেকে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে গেছেন।

অন্যদিকে যৌবনধর্মের চির-পূজারী রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন 'নবযৌবনের দূত'রূপে। জওহরলালকে নিঃকুণ্ঠায় বসিয়েছেন 'তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে'। আর বসন্ত-উৎসবের দিনে অনুভব করেছেন, 'যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল।' জওহরলালের মধ্যে এই দুর্বার যৌবনশক্তির অবারিত প্রকাশই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। বিশ্ব-ভারতীর অনেক অনুষ্ঠানেই তিনি জওহরলালের উপস্থিতি কামনা করেছেন, পেয়েওছেন তাঁকে। চীনা-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমে আহ্বান জানিয়েছিলেন, হিন্দী-ভবনের উদ্বোধন করিয়েছিলেন জওহরলালকে দিয়ে। জওহরলাল-চরিত্রের অন্য আর একটি দিকও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। সত্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি জওহরলালের গভীর নিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি আর জওহরলাল দেশসেবী রাজনীতিক। দুজনের জগৎ আলাদা। উভয়ের মিল না হওয়ারই কথা। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে একের অন্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ কবি, তবে স্বদেশ, সমাজ ও বিশ্ব—তাঁর কাছের আর দূরের পরিবেশ সম্পর্কে তিনি একান্ত সচেতন কবি। কল্পনার জগতের বাসিন্দা হয়েও অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস আর অযৌক্তিক আবেগ-প্রমত্ততাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নি। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন, চিন্তাশীল মননিষ্ঠ মানুষ তিনি। প্রহরে প্রহরে তিনি পুরোনো দিনকে অনায়াসে পেছনে ফেলে আসতে পেরেছেন, নূতন দিন আর তার নূতন মেজাজকে সহজেই আত্মীকৃত করে তুলতে পেরেছেন। শাস্ত্রের মূঢ় বিধান, অন্ধ আচার-সংস্কার আর বিশ্বাস, যুক্তিহীনতা প্রভৃতি সকল রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম তাঁর। এসবের ঊর্ধ্বচারী উদার মমতাময় বিশ্বরসে ভরপুর আর বিশ্বাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ একটি ধ্যানী-মনকে তিনি সদাজাগ্রত রেখেছিলেন। সে মনের প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টি যেমন পড়েছিল তাঁর স্বদেশ ও স্বকালে, তেমনি আবার তা ছিল অনাগত মহাভবিষ্যতের দিকে অনন্তপ্রসারিত।

আর তাই বোধহয় জওহরলালকে তিনি কাছের মানুষ বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি জওহরলালের স্বক্ষেত্র হলেও রবীন্দ্রনাথ দেখে-ছিলেন রাষ্ট্রিক চাতুরীর হীন প্রণালীতে সুলভ সার্থকতার পথে জওহরলাল পদার্পণ করেন নি। রবীন্দ্রনা আরও দেখেছিলেন "রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের দিনে যখন প্রবঞ্চনা প্রবল হয়ে ওঠে, তার মধ্যেও তিনি বিভ্রান্ত হন নি, সত্যের পতাকাকে সবলে তুলে ধরেছেন—বিপদের ভয়ে তিনি সত্যকে গোপন করেন নি, আরামের পথ বলে অসত্যকে গ্রহণ করেন নি।" রাজ-নীতির সঙ্গে সত্যনীতির বা আদর্শ-বোধের সহজাত বিরোধ আছে, প্রচলিত এই ধারণার স্পষ্ট বিরোধিতা দেখে-ছিলেন তিনি জওহরলালের মধ্যে। রাজনীতির হাটের মাঝখানে থেকেও জওহরলালের এই সত্যনিষ্ঠা রবীন্দ্র-নাথকে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল জওহরলালের প্রতি। ১৯৩৯-এর পর 'কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ' দেখে যেদিন কবিচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল,—কংগ্রেসের কর্তৃত্বে ও পরিচালনাধীনে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সংশয়ান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, সেদিনও তাঁর আস্থা অটুট ছিল জওহরলালের প্রতি। তিনি লিখেছিলেন, "আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।"

রাজনীতিক জওহরলালের অন্তরে যে একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ কবি-সত্তার অস্তিত্ব ছিল একথাও রবীন্দ্র-নাথের অন্তর্দৃষ্টিতে সম্ভবত ধরা পড়েছিল। আবার বিশ্বাস আর সংস্কারের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে জওহরলালও রবীন্দ্র-নাথের মত সংগ্রামী। যুক্তিবাদ আর মননিষ্ঠা উভয়েরই পাথেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর জওহরলাল খুব বেশি আত্মীয়তার যোগ অনুভব করে-ছিলেন সম্ভবত এইখানে এসে, যেখানে তাঁরা দুজনেই কবি। জওহরলালের আত্মজীবনী পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"I feel intensely impressed and proud of your achievement. Through all its details there runs a deep current of humanity which overpasses the tangles of facts and leads us to the person who is greater than his deeds and truer than his surroundings."

মানবতাবোধের এই সুগভীর প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তারও যা অন্তঃপ্রেরণা, জওহরলালের রচনায় তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর তাই দেখে মুগ্ধও হয়েছিলেন।

পদ্মা আর পদ্মাপ্রকৃতি, সেখানকার জনপদ আর মানুষ আর সেই মানুষের সুখদুঃখ রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কতবড় আকর্ষণ ছিল, রবীন্দ্র-রচনার পাঠক-মাত্রেরই তা জানা আছে। অন্যদিকে তাঁর অন্তিমবাসনার কথা লিখতে গিয়ে জওহরলালও অনুরূপভাবে গঙ্গার কথায় এসেছেন। গঙ্গা-যমুনাকে তিনি আশৈশব ভালবেসেছেন। সুন্দরে ভৈরবে মিলেমিশে গঙ্গার নিত্যধারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে অজানা অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের পানে। গঙ্গার সেই পরি-বর্তনশীল চিরপ্রবাহের রূপমুগ্ধ বর্ণনায় জওহরলালের কবিপ্রাণ মুক্তি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

"Smiling and dancing in the morning sunlight and dark and gloo ·y and full of mys'ry as the evening shadows fall : a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon broad bosomed almost as the sea, and something of the sea's power to destroy.'

এ বর্ণনা 'ছিন্নপত্রে'র পদ্মাবর্ণনাকে মনে করিয়ে দেয়। "গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথের নদী-প্রীতির একটি কারণ তাঁর এই মন্তব্যে ধরা পড়েছে। চিরগতিশীল জওহরলালও হয়তো নদীকে ভালবেসে নদীস্রোতের সচলতার ভিতর দিয়ে গতি-প্রেরণাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন।

জওহরলালের জীবন, কর্ম ও চিন্তাকে যে দুজন মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন, তাঁরা হলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। একাধিকবার একথা তিনি স্বীকার করেছেন। জীবনের প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে লিখতে বসে আর একবার তিনি এ-প্রসঙ্গ স্মরণ করে লিখেছেন—

"I also find it rather difficult to write about persons who, in their greatness and magnificence have overshadowed my life as indeed they overshadowed the life of the nation. Such were Gandhi and Tagore.'

এই দুই পুরুষের নিবিড় পরিচয় অজানা ছিল না জওহরলালের কাছে। যথার্থ স্বরূপেই তিনি এঁদের পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন—

"Tagore, the aristocratic artist turned democrat with prolitarian sympathies, represented essentially the caltural tradition of India, the tradition of accepting life in the fullness thereof and going through it with song and dance. Gandhi, more a man of the people, almost the embodiment of the Indian peasant, represented the other ancient tradition of India that of renunciation and asceticism. And yet Tagore was primarily the ·an of thought, Gandhi of concentrated and ceaselle·s activity."

রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীর সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই জওহরলালের সহযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে অনেক বেশি পরিমাণে। গান্ধীকে তিনি গুরুর আসনে বসিয়েছেন। অন্যদিকে গান্ধীও তাঁকে অন্তরঙ্গতরূপে বরণ করে নিয়েছেন।

তবে আত্মজীবনীতে জওহরলাল তাঁর আপন জীবনাদর্শে পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

'It is the Tao, the path to be followed and the way of life that interests me; how to understand life, not to reject it but to accept it, to conform to it and to improve it."

এ তো স্পষ্টভাবে সদর্থে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার কথা। গান্ধীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এখানে এসে বুঝতে ভুল হয় না যে গান্ধীর জীবনাদর্শের এই 'renunciation' বা 'asceticism' -এর অনুগামী তিনি নন। তার পরিবর্তে জীবনকে সমগ্রতায় গ্রহণের যে আদর্শ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনায়, তার প্রতিই জওহরলালের অনুরাগ।

গান্ধীমন অসাম্প্রদায়িক হয়েও শাস্ত্রীয় বিধিবিধান এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনার সমন্বয়-সচেষ্ট। তাঁর শুভবোধ এবং সত্যবোধ মন্দির-মসজিদের দ্বার সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে ঠিকই। তবে তাঁর রাজনীতির প্রীক্ষেত্র মন্দির-মসজিদ বাদ দিয়ে নয়।

"No man can live without religion"-এ হল গান্ধীর বিশ্বাস। তিনি দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করেছেন—"Those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion is." হয়তো তিনি এখানে ধর্মকে একটি বৃহত্তর নীতিবোধের সমার্থ করূপেই দেখেছেন। তবু গান্ধীর ভগবান 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'; যেখানে রবীন্দ্রনাথের দেবতা একান্তভাবেই তাঁর জীবনদেবতা। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ শাস্ত্রীয় অনুশাসনমুক্ত, সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বচারী, উদার, সর্বমানবের জীবনধর্ম এবং এদিক থেকে তা বিশ্বজনীন। গান্ধীচিত্ত যুক্তিনিষ্ঠ হয়েও মূলত বিশ্বাসপ্রবণ। আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও মনন প্রকর্ষে পরিস্রুত হয়ে প্রত্যয়ে পরিণত। গান্ধীর কাছে অস্পৃশ্যতা হল বিহারের ভূমিকম্পের ও প্রাণহানির হেতু, রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী মনের কাছে তা হল নেহাৎই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গান্ধীর বিশ্বাস চরকা এনে দেবে স্বরাজ। আর রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে চরকার "সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে ফেলেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।" কারণ রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতার বিজ্ঞানচর্চার শাসনে যদি কোনো বড়ো নৈতিক সাধনা থাকে

…ল হচ্ছে বাহ্যপ্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানষের মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা, একথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে একপাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না।" রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যে কী পরিমাণ যুক্তিভূয়িষ্ঠ বাস্তব-চেতনা-প্রসূত এবং যথার্থ ও আধুনিক আর তিনি যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামী তা গান্ধীর চরকা-সাধনার উত্তরে রচিত তাঁর এই লেখাটুকু থেকেই বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এই দুই মনীষীর প্রকৃতিগত ও জীবনদৃষ্টির পার্থক্যের কথা খুব পরিষ্কারভাবে জেনেই জওহরলাল লিখেছিলেন—

"No two persons could be so different from one another in their make up or temperaments."

আর একটা কথা জেনেই তিনি উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জীবনের একটা পর্বে যখন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন চলছিল সেই আন্দোলনের দিনে গান্ধীর কর্মযোগের তিনি বিশ্বস্ত অনুচর। রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বানে' তাঁর অন্তর নাড়া খেলেও বাইরে সেদিন তিনি সাড়া দিতে পারেন নি। গান্ধীর সঙ্গে সুতো সেদিন তিনিও কেটেছেন। বিলিতি বস্ত্র বর্জনে তাঁকেও সেদিন সমান তৎপর দেখা গেছে। অতঃপর জীবনের আর একটা পর্বে এসে যখন দেশ-গঠনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন সেদিন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আদর্শের প্রতি আনুগত্য তিনি দেখিয়েছেন সবচেয়ে বেশি, যদিও গান্ধী ছিলেন আমৃত্যু তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি জানতেন যদি কেউ ভারতবর্ষের সাধনা ও সত্যকে সম্পূর্ণ কালোপযোগী রূপ দিতে পেরে থাকেন তাহলে তিনি রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা বিস্মৃত না হয়ে বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য একটি জীবনাদর্শের উদ্গাতাও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বেশি করে আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের আপন আপন সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে দাঁড়াবার জন্য। আর তিনিই সকল দেশের সকল মানুষের মিলনের পথকে প্রশস্ত করে তুলতে পেরেছিলেন সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে জওহরলালের মন সমসূত্রে বাঁধা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

তাই রাষ্ট্রনায়ক জওহরলালের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শেরই অনুসরণ ঘটতে দেখা যায়।

ভারতীয় গণ-পরিষদে জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনে 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে রবীন্দ্র-অভিমতকে সমর্থন জানিয়ে 'জনগণমন'কেই জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন জওহরলাল। গান্ধীর প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও সেদিন জওহরলালের নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে চরকার মৃদু গুঞ্জনে গড়া যে অর্থ-নীতি, তার উপরে ভিত্তি করে ভারতের দারিদ্র্য-মোচন আর বৈষয়িক উন্নতি এ যুগে আর সম্ভবপর নয়। পরিবর্তে প্রয়োজন বিদ্যুৎ-তাড়িত বৃহৎ যন্ত্রশক্তির উপার্জনের। 'বিজ্ঞানকে একপাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না' রবীন্দ্রনাথ-উক্ত এই সত্যকে স্মরণ রেখে জওহরলাল ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার গান্ধী প্রবর্তিত চরকা-প্রতীকও উঠে গিয়েছিল।

ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম আর সেখানকার মানুষের কথা দরদের সঙ্গে ভেবেছিলেন গান্ধী। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও আহ্বান শোনা গিয়েছিল—'ফিরে চল মাটির টানে'—গ্রামীর পানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছিলেন, "প্রাচীন কালের গ্রাম্যতার গণ্ডীর মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই। আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়,—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।" গান্ধী-কথিত চরকার মূলগত সমাধান নয়, রবীন্দ্রনাথ যার ভিতরে সমাধান চেয়েছিলেন, তা হল 'আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্বোধন'। আর এই আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন সমবায় আন্দোলনের উপর। স্বাধীন ভারতেও দেখা গেল কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট আর সমবায় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের রূপায়ণ-প্রয়াস।

স্বাধীন ভারতের যে পররাষ্ট্র-নীতি যা রাষ্ট্রনায়ক জওহরলালের জীবনের সার্থকতার অন্যতম ক্ষেত্র, যেখানে তিনি উদার মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশচেতনার সঙ্গে বিশ্ব চেতনার একটি সমন্বয়ে ব্রতী হয়েছিলেন, বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে আদর্শ যে তিনি বহুলাংশেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৪৪-এ রচিত Discovery of India-তে জওহরলাল লিখেছেন—

"More than any other Indian, he has helped to bring into harmony the ideals of the East and the West, and broadered the bases of Indian nationalism. He has been India's internationalist par excellence, believing and working for international cooperation, taking India's messages to other countries and bringing their messages to his people. And yet with all his internationalism, his feet have

always been planted firmly on India's soil....Tagore was the great humanist of India".

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জওহরলাল রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শেরই অনুবর্তন করে গেছেন। চীনা-ভবনের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করে বলেছিলেন—

"Its one object is to let India, welcome the world to its heart.. let us unite..inspite of our differnces....For differences can never be wiped away, and life would be so much the poor without them. Let all human races keep their own personalities and yet come together, not in a uniformity that is dead, but in a unity that is living." জওহরলালের 'পঞ্চশীলে'র সঙ্গে এই ভাবনার সাদৃশ্য অতি সহজেই চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের মানস-নৈকট্যের প্রসঙ্গে এসে অনুরূপ আরও অনেক মিলের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জওহরলাল লিখছেন—

"Rabindranath Tagore, in line with great succession, was full of the temper and urges of the modern age and yet was rooted in Indian's past, and in his ownself built up a synthesis of the old and the new."

আবার নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়েও তাঁর 'উইলে' তিনি লিখেছেন—

"And though I have discarded much of past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all the shackles that bind and Constrain her and divide her people and suppress vast number off them, and prevent the free development of the body and the spirit, though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completly".

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষের যে মূর্তি কল্পনা করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতায়—এ যেন তারই অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রীতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করে জওহরলাল লিখেছেন—

"I love India, he said, not because I cultivate the iddatry of geography, not because I have had the chance to be born in her soil, but because she has saved through tumultous ages the living words that have issued from the illuminated consciousness of her great sons."

নিজের ভারতপ্রীতি প্রসঙ্গে এরই প্রতিধ্বনি করে তাঁর অন্তিম ইচ্ছাপত্রে লিখেছেন—

"I am proud of great inheritance that has been, and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in that unbroken chain which goes back to the down of history in the immemorial past of India. That chain I would not break, for I masure it and seek inspiration from it."

জওহরলাল মূলত স্বদেশপ্রেমিক রাজনীতিক। তাই জওহরলাল ভেবেছিলেন যে তাঁর এই পরিচয়ই স্থায়ী হোক যে জওহরলাল এমন একজন লোক ছিলেন যিনি দেশকে ভালবেসেছিলেন আর পরিবর্তে দেশের মানষের অজস্র ভালবাসা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ মানবদেবতার পূজারী কবি। তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন তাই এই বসুধাকে আর 'মর্তলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি' তিনি পেয়েছিলেন অমিত ধারায়। তাঁরও বাসনা—

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক।'

রাজনীতির আবর্তে ঘূর্ণায়মান জওহরলাল ছিলেন জীবনশিল্পী। জীবনের পরম সত্য আবিষ্কারে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন এমন দাবী করবার প্রয়োজন নেই। তবে জীবনকে আর জগৎকে যে তিনি বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখে গেছেন সে কথাও তিনি লিখে জানিয়েছেন—

"We can always admire its beauty and through art, exercise a godlike function of creation."

"আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।" অন্তহীন এই বিস্ময়-রসে রবীন্দ্রনাথও দেখেছিলেন এই বিশ্বকে আর মানবজীবনকে।

Oftentimes, one strips
oneself of passion
In order to see the
secret of life;
Oftentimes, one regards
life with passion
In order to see its
manifold results.

গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের মিল-অমিলের প্রসঙ্গে লাওৎসে-র এই বিখ্যাত কবিতা উদ্ধার করে বলা যায় যে গান্ধীর জীবনে এ কবিতার প্রথম অংশের রূপায়ণ আর রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের জীবনে রূপায়িত এর দ্বিতীয়াংশ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। পরমার্থেই তিনি স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্র স্বতন্ত্র; ফসল পৃথক। সে হল এক অতুল শিল্পভুবন। অন্যদিকে তাঁর স্বক্ষেত্রে জওহরলালও স্রষ্টা। সে ফসলও আলাদা। আর তা হল অধিকাংশে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ও কল্পনার অনুপ্রেরণায় গড়ে তোলা এই নবীন ভারতবর্ষ।

শহর কলকাতা ❋ শ্রীপাদাতিক

সেকালের শ্যামরায়তলা থেকে একালের কয়লাঘাট ষ্ট্রীট

এখানে, হ্যাঁ এখানেই ছিল শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির চৌধুরীদের। সে আজ অনেককাল আগের কথা। মন্দিরের অধিষ্ঠান ছিল মর্মর-মণ্ডপের সুউচ্চ রমণীয়তায়। প্রশস্ত উঠোন ছিল সামনে। চারদিকে তার মদির বিন্যাস ছিল বকুল, বেল, আর শিউলির। তৃণবিছানো বীথিকাও ছিল পেছনে—যার বিস্তীর্ণ অঙ্কে শিশুর মতো অঙ্গ দোলাতো ছায়া। কারণ পাশেই ছিল এক ত্রিকালদর্শী মহাবট। শোনা যায়: শ্যামরায়ের অধিষ্ঠান হেতুই মন্দির-পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চল তখন শ্যামরায়তলা নামেই প্রতিষ্ঠালাভ করে সাধারণের কাছে। মন্দির-সংলগ্ন উঠোনেই আসর জমতো বাউল-বৈষ্ণবদের। তাদের কাছে তখন এক উপতীর্থ রূপেই গণ্য ছিল শ্যামরায়তলা। তখন এখান থেকে অনেকদূর পশ্চিমে ছিল ভাগীরথীর বিস্তার। মন্দির-তোরণ থেকে দূর-ভাগীরথীর ঘাট পর্যন্ত বিন্যস্ত ছিল এক দেব-সরণী। অগণিত ভক্তের স্কন্ধবাহী হয়ে, এই সরণী বেয়েই ভাগীরথীর ঘাটে স্নানে যেতেন শ্যামরায়। সঙ্গে থাকতেন প্রধান পুরোহিত। আর থাকতেন কীর্তনীয়ার দল বিগ্রহের পুরোভাগে। তাঁদের গানের সঙ্গে তাল রাখতো সাতটি খোল এবং নয়জোড়া মন্দিরা। ঘাটে পৌঁছেই শ্যামরায়কে এক স্বর্ণ-খচিত জলচৌকিতে স্থাপন করে স্নান করাতেন পুরোহিত। তখন কীর্তন থেমে যেতো এবং সেই সঙ্গে থেমে যেতো খোল-মন্দিরাও। কেবল নিস্তব্ধ পরিবেশে ভাগীরথীর মৃদু কল্লোলের সঙ্গে অনুরণিত হতো পুরোহিতের মন্ত্র।

সম্পূর্ণ সোনার বিগ্রহ শ্যামরায়ের। মন্দিরের অন্দরেও তিনি বিরাজ করতেন এক স্বর্ণখচিত চাঁদোয়ার তলে। মন্দির ছিল সুরক্ষিত। কিন্তু কী-আশ্চর্য, এই সুরক্ষিত মন্দির থেকেও হঠাৎ একদিন অন্তর্হিত হন শ্যামরায়। জমিদার খবর পেয়েই পুরোহিতকে ডেকে বললেন: "এমন সুরক্ষিত মন্দির থেকে বিগ্রহের অপহরণ ঘটলো কী-রূপে?"

পুরোহিত উত্তরে বললেন: "প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের বিগ্রহ। তাঁকে অপহরণ করার ক্ষমতা কারো নেই। সম্ভবত শ্যামরায় নিজেই ত্যাগ করেছেন আপনার মন্দির।"

জমিদার বললেন: "কেন?"

পুরোহিত বললেন: "ঠিক জানি না কেন। তবে মনে হয় তিনি কোন ত্রুটি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন আপনার।"

এ-কথার পর বেশ খানিকক্ষণ নীরব থাকলেন জমিদার। তারপর ধীরে ধীরে আবার বললেন: "কই, জ্ঞাতসারে আমি তো কোনো ত্রুটি বা অপরাধ করি নি।"

পুরোহিত আবার উত্তর দিলেন: "সব ত্রুটিই জ্ঞাতসারে হয় না। আপনার অজ্ঞানেও এমন কিছু ঘটে যেতে পারে—যা দেবতার কাছে ত্রুটি বা অপরাধের সামিল।"

এ-কথার পর জমিদার এবার দৃঢ়স্বরেই বললেন: "বেশ, জ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক, দেবতার সামনে সত্যই যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে আমার, তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো। কিন্তু তার আগে আমি ফিরে পেতে চাই আমার প্রাণের বিগ্রহকে।"

এ-কথা বলেই সেদিন পুরোহিতের সামনে থেকে স'রে গেলেন জমিদার। তারপর বিগ্রহ অনসন্ধানের পর্ব সুরু হলো পরদিন থেকেই। অনুসন্ধানের চর ছড়িয়ে পড়লো উত্তরে দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে। কিন্তু পরিশ্রম হলো বৃথা। মাস-কয়েক অনুসন্ধানের পরেও, কোথাও কোনো হদিশ পাওয়া গেল না বিগ্রহের। শেষে তাই জমিদারের নির্দেশেই মুর্শিদাবাদ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হলো সুদর্শন মিশ্র নামে এক সিদ্ধবাক পুরুষকে। তিনি এসেই কী-সব আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালন করলেন পাঁচদিন। তারপর একদিন একাগ্রচিত্তে গণনা ক'রে বললেন: শ্যামরায় আছেন উত্তরের লোকালয়ে।

অতএব পারিষদবর্গের সঙ্গে উত্তরের লোকালয়ে এসে হানা দিলেন স্বয়ং জমিদার। অনুসন্ধান চললো সে-অঞ্চলের গরীব প্রজাদের ঘরে ঘরে। এভাবে অনুসন্ধান করতে করতেই শেষে শ্যামরায়ের সন্ধান পাওয়া গেল আত্মীয়-পরিজনহীনা এক দরিদ্র সুন্দরীর ঘরে। নাম তার কমলা। জমিদার নতশিরে গ্রহণ করলেন শ্যামরায়কে। তারপর একজন পাইকের দ্বারা কমলাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এলেন তাঁর গৃহে। শ্যাম-রায়কে যথাস্থানে সসম্মানে স্থাপন করার পর, মন্দির-সংলগ্ন উঠোনেই এক বিচার সভা আহ্বান করলেন তিনি। উক্ত বিচার সভায় দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে কমলা বললো: তার গৃহে শ্যামরায়ের এই অভাবনীয় অস্তিত্ব তার জানা ছিল না। শ্যামরায় কী-ভাবে তার মতো এক অনাথিনীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন—তা সম্পূর্ণই তার বোধের বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে কমলাকেই সমর্থন ক'রে সেই পুরোহিতও রায় দিলেন: শ্যামরায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে কমলার পক্ষে কোনোক্রমেই অপহরণ করা সম্ভব নয়। কমলা নিশ্চয়ই একজন

নিষ্ঠাবতী সাধ্বী নারী। তাই শ্যামরায় অনুগ্রহ ক'রে নিজেই তার গৃহে গমন করেছেন। অতএব জমিদার যদি শ্যামরায়কে তাঁর মন্দিরেই ধ'রে রাখতে চান, তাহলে আজ থেকে কমলাকেও মন্দিরের একজন সেবিকারূপে নিযুক্ত করা হোক।

এই পুরোহিত অনেককালের এবং অনেককাল থেকেই তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা ক'রে আসছেন শ্যামরায়ের। তাই পুরোহিতের এই উপদেশ বা নির্দেশবাক্য উপেক্ষা করতে পারলেন না জমিদার। তিনি যথারীতি একজন সেবিকারূপেই নিযুক্ত করলেন কমলাকে।

কিন্তু বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই যখন দেখা গেল: কমলার দেহ-বল্লরীতে এক বিশেষ রূপান্তরের স্পষ্ট প্রতিভাস ধরা পড়েছে, তখন জমিদার বুঝতে পারলেন: শ্যামরায় সেদিন অপহৃতই হয়েছিলেন। অর্থাৎ কমলার গৃহে শ্যামরায়ের সেই আত্মগোপন ঘটেছিল পুরোহিতেরই চক্রান্তে। কিন্তু লোক-লজ্জার আশঙ্কায় কিছুই তিনি প্রকাশ করলেন না। বরং কমলাকে রক্ষা করার জন্য সেই কপট পুরোহিতের সঙ্গেই তার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। তারপর উভয়কেই তিনি সরিয়ে দিলেন উত্তরের সেই লোকালয়ে।

এই গল্প বা কাহিনীর উৎপত্তি ঘটেছিল সেকালের সেই শ্যামরায়তলা থেকেই। কাহিনীটি ইতিহাসগ্রাহ্য না হলেও, এ-কালের দু-একজন অতি প্রবীণ তাকে সত্যাশ্রয়ী বলেই বিশ্বাস করেন। বর্তমান লেখক এ-কাহিনীর সংগ্রাহক মাত্র। অতএব তার সত্যাসত্যের কোনো দায়িত্ব নেই।

ওলন্দাজ বণিকদের Bank-zoll বা Bank-soll প্রতিষ্ঠার কালেও, অর্থাৎ যে-কালে ভাগীরথীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে পূর্বদিকে, তখনও শ্যামরায়তলার অস্তিত্ব ছিল এখানে। কিন্তু ওলন্দাজদের পর যখন সুরু হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল, অর্থাৎ

● কয়লাঘাট ষ্ট্রীটে অবস্থিত রেলওয়ে অফিস গৃহ

১৭১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফাররুকশায়ারের প্রদত্ত ফর্মান অনুসারে, কোম্পানী যখন নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কালীক্ষেত্র বা কলিকাতা, তখন শ্যামরায়তলা থেকে শ্যামরায় বিগ্রহের স্থানান্তর ঘটে সম্ভবত বড়িষায়। আর শ্যামরায়-তলারও সমগ্র অংশে কোম্পানীরই কর্মচারীদের বসবাসের জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায় কয়েকটি গৃহ। তারপর অবশ্য কিছুকালের মধ্যে সেই নবনির্মিত গৃহগুলির বিলোপ সাধন ঘটে। কারণ কোম্পানী তার নিরাপত্তার প্রয়োজনে সেখানেই পরে প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার প্রথম দুর্গ বা ফোর্ট।

উল্লেখিত দুর্গ বা ফোর্ট প্রথম অবস্থায় ছিল অনেক সঙ্কুচিত। কিন্তু ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তার কলেবর বৃদ্ধি পায় প্রয়োজনের তাগিদেই। তারপর ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে দুর্গের গা-ঘেঁষেই প্রতিষ্ঠা পায় কোম্পানীর একাধিক মালখানা বা গুদামঘর। সম্ভবত সেই সময়েই পার্শ্ববর্তী রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথীর যে-ঘাটের অস্তিত্ব ছিল—তা আরও সংস্কার সাধিত হয়ে নাম ধারণ করে কেল্লাঘাট। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উক্ত ঘাট থেকেই রাশি রাশি পাথুরিয়া কয়লার আমদানি রপ্তানি সুরু হওয়ার দরুণ, পরে সেই কেল্লাঘাটের নামান্তর ঘটে কয়লাঘাটে। এই ঘাটের নাম থেকেই দুর্গ-পার্শ্ববর্তী রাস্তাও প্রথমে কেল্লাঘাট ষ্ট্রীট এবং পরে কয়লাঘাট ষ্ট্রীট নামে প্রচলিত হয়। এ-সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ শ্রী এ কে রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"Fort William, still further enlarged by the construction of store houses close to it, occupied the west of the park, from the South-Eastern corner of which issued the road to ghat of the river which was then designated as the Killa-ghat, meaning the ghat of the port, but which has since been corrupted into Koila-ghat on

account of its large traffic in coal in the middle of eighteenth century."

ঐতিহাসিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও কলকাতার প্রথম দুর্গ এবং তৎ-সংলগ্ন গুদামঘর ও কেল্লাঘাট সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন—তার কিয়দংশ এই :

"লালদীঘির উত্তর-পূর্বে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণদিকে কোম্পানী বাহাদুরের আমদানি-রপ্তানির মালগুদাম বা Export and Import warehouse. ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত মালগুদাম নির্মিত হয়। এই মালগুদামের নিকট দিয়া একটি নাতি-প্রশস্ত পথ নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাকে কল্লাঘাট বা ফোর্টঘাট বলিত।'

সিরাজের কলকাতা বিজয়ের সময় নবাববাহিনীর মুহুর্মুহু তোপের আঘাতে বিশেষভাবেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে কোম্পানীর কেল্লা। কিন্তু সিরাজের পতনের পর, ইংরেজকুল যখন পুনরায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে কলকাতায়, তখন আবার তা সংস্কার সাধিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নবীন কলেবরে। তবে কিছুকাল পর যখন নব পরিকল্পনায় আরেক অভিনব দুর্গ নির্মাণের স্থান নির্বাচন হয় গোবিন্দপুরে, তখন স্বাভাবিক কারণেই পরিত্যক্ত হয় সেই পুরোনো কেল্লা। তবে পুরোনো কেল্লার ধ্বংসাবশেষের এক দেয়াল এবং কিছু স্তম্ভের অস্তিত্ব ছিল প্রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত। সম্ভবত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অথবা তার বছর-খানেক পরে উক্ত দেয়াল এবং স্তম্ভসমূহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয় রাস্তার পরিসর বৃদ্ধির প্রয়োজনে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিত্যক্ত কেল্লার একাংশেই প্রতিষ্ঠা পায় জেনারেল পোস্ট অফিস। পরে পোস্ট অফিস অধিকৃত কেল্লার সেই অংশটুকুও তোপের মুখে উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তৎকালীন প্রখ্যাত স্থপতি ওয়াল্টার বি গ্র্যানভিল কর্তৃক সেখানেই পত্তন ঘটানো হয় এক করিন্থিয়ান পদ্ধতির অট্টালিকা—যা জেনারেল পোস্ট অফিসরূপে আজও বিদ্যমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের পূর্বপ্রান্তিক রেখায়। এই পোস্ট অফিস সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে।

কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কার্যালয়। এই কার্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে অনেককাল আগেই এবং তৎকালেই তার নির্মাণকল্পে যা খরচ হয়েছিল—তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। অর্থাৎ একালের হিসেবে পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও অধিক। রোম দেশের বিখ্যাত 'ফার্নিশ প্যালেস'-এর অনুকরণে আত্মপ্রকাশ করে এই কার্যালয়-গৃহ। গৃহের অভ্যন্তরস্থ দুই-শ' কুড়ি ফুট দীর্ঘ এক প্রকোষ্ঠই তখন মুদ্রাযন্ত্রালয়রূপে পরিগণিত ছিল। এ-কালেও এই গৃহের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে নির্মাণশিল্প, স্থাপত্যশিল্প এবং সঙ্গীত ও বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটি অপরূপ মূর্তি। এ-গৃহের প্রতিষ্ঠাকালে ভূ-গর্ভ থেকে এখানেও আবিষ্কৃত হয়েছিল পুরোনো কেল্লার কিছু প্রাচীন উপকরণ।

কয়লাঘাট ষ্ট্রীট নাতিদীর্ঘ। মাত্র নেতাজী সুভাষ রোড থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোড পর্যন্তই তার বিস্তার। পোর্ট কমিশনার্স-কার্যালয়েরও একাংশের অবস্থান ঘটেছে এ-রাস্তায়। আজকাল এ-রাস্তার রূপান্তর ঘটেছে নানাভাবে। এখন সে সম্পূর্ণ একালের। তবু না জানি কেন, এ-পথে পা রাখলে আজও অনুভব করা যায় প্রাচীন আমলের পরিবেশ। এমন কি, রাস্তার উত্তর দিকের গৃহ-সংলগ্ন দু-একটি বৃক্ষের দিকে তাকালে মানসপটে মূর্ত হয়ে ওঠে চৌধুরীদের সেই শ্যামরায়তলাও।

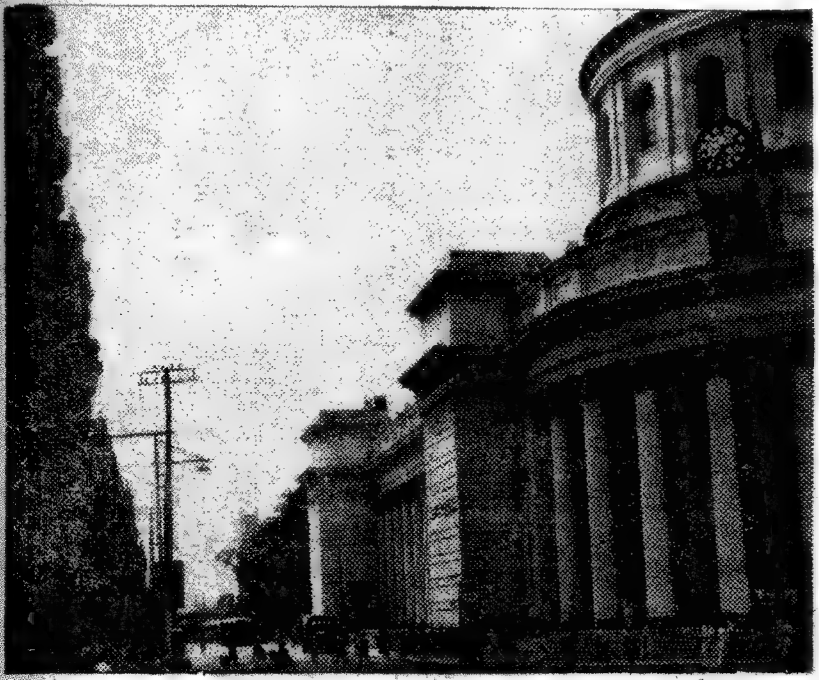

● কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

কান পেতে শুনলো সমরেশ—দেওয়াল ঘড়িটা বাজছে। সারারাতই ওটা বাজে। জেগে থাকার নিরবচ্ছিন্ন একটানা একঘেয়ে সময়ের শামুকের গতিতে চলার একমাত্র নিশানা ঐ শব্দ। এই রাত্রি অন্তহীন নয়, এই নিঃসঙ্গতা হয়তো একদিন ফুরোবে। যত ধীরেই পদক্ষেপ কর না—হে মহাকাল, এগিয়ে তোমাকে যেতে হবেই! রাত এখন কটা, টঙ টঙ করে যতবার শব্দ হোল, ততবার চোখের পাতা থর থর করে কেঁপে উঠল। এগারটা না বারটা। গেলাসে আবার নতুন করে তারপর দুটো লাল বড়ি মেশালো সমরেশ। ঘুমের ওষুধ। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, তবু জোর করে উঠে দরজায় হাত দিলো একবার। মেহগনি পালিশ দেওয়া ভারি কাঠের দরজা—অনেক কাল আগেকার কোন শিল্পীর হাতের নিখুঁত নক্সা আঁকা। দরজাটা বন্ধ ভেতর থেকে। মাধবী আড়াল চায়। মাধবী, তার স্ত্রী। বড় আলোটা জ্বালিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে মুখটা মনে করতে চেষ্টা করল —শ।

কিন্তু কালো অন্ধকারে মনের আয়নাটা লেপে সব কিছু একাকার হয়ে আছে। কিচ্ছু দেখা যায় না, কিচ্ছু বোঝা যায় না।

ঠিক এই কথাটাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হোল কাউকে। পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে করিডরের এক পাশে টেলিফোন টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। কত নম্বর, কি নাম, প্রশ্নটা কি, তাও ভুলে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। জানলা বন্ধ, মনে হয় দমও বন্ধ হয়ে আসছে। জানলাটা খুলে বাইরের দমকা হাওয়া টেনে নিতে নিতে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার ভয় পেয়ে চমকে উঠল ' ওগুলো ঠিক চোখের মত জ্বলছে। কার চোখ। হ্যাঁ—মাধবীর চোখে ঠিক অমনি কি একটা দূরত্বের আভাস প্রায়ই জ্বলে ওঠে। সমরেশ বুঝতে পারে না। যখন তার শরীরে সেই অসহ্য যন্ত্রণা পাক দিয়ে ওঠে, বুকের মধ্যে আটকে থাকা ভারি নিঃশ্বাস পাথরের মত চেপে বসার অনুভূতি নিয়ে সে যখন মাধবীর সঙ্গ চায়, শিয়রের কাছে এক একবার এসে দাঁড়ানো মানুষটার চোখে বুঝি অমনি কঠিন উজ্জ্বল দুর্জ্ঞেয় চাহনি দেখতে পাওয়া যায়।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সমরেশ অনেক কষ্টে সুনন্দর টেলিফোন নম্বর ভাবলো। কালো মোটা ডায়েরীর সূচীপত্র লেখা পৃষ্ঠায় হয়তো এক মিনিটের মধ্যে নম্বরটা খুঁজে বার করে নেওয়া যেতো, কিন্তু মাধবীর হাতে লেখা সেই নাম চোখে দেখতে চায় না। সমরেশ অনেকক্ষণ ভেবে তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে নম্বরটা ডায়াল করতে সুরু করল।

এখুনি ওধারে শব্দ হবে, ঘণ্টা বাজতে সুরু করবে। ঠিক মাথার কাছে টেলিফোন, তবু সুনন্দর সহজে ঘুম ভাঙতে চায় না। কি করে ও অত গভীর ঘুমে ডুবে থাকতে পারে। চোখ দুটোয় যেন পোকা পড়েছে এমনি কর কর করতে থাকে, তবু সমরেশ সমস্ত রাত জেগে নিঃশব্দে এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায় আর ভাবে—মানুষের বিবেক বলে যে একটি পরম শত্রু আছে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায় নিশ্চয়। সুনন্দ তা না হলে কি করে সব ভুলতে পারে।

আজ কেন জানি না টেলিফোন বাজা মাত্র সুনন্দ ঘুম ঘুম গলায় বলল—'হ্যালো।'

'আমি—' সমরেশ ফিস ফিস করে বলল।

'সে কি—আজও ঘুমোও নি। শোবার সময় ওষুধ খেয়েছিলে?'

'চুপ কর—আমার কথা শোন সুনন্দ—' পিট পিট করে চারদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে নিলো সমরেশ—'তুমি ডাক্তার, মানুষের শরীর নিয়ে তোমার কারবার। কিন্তু মানুষের মন যে তিলে তিলে এক অসহ্য নরকের আগুনে পুড়ছে, তাকে তুমি তো বাঁচাতে পারো না। মজা কি জানো, তোমরা কেউ টের পাও না। ঐ নরককেই স্বর্গ বলে ভেবে নাও সকলে। তারপর একদিন যখন ফুরিয়ে যাওয়ার সময় আসে, তখন চিৎকার করে সেই অন্ধ বধির ঈশ্বরকে ডাকো। সে শুনেও

শোনে না, দেখেও দেখে না। হা: হা: হা:।'

'একি পাগলামী হচ্ছে সমরেশ?' ধমকে উঠলো সুনন্দ—'মাধবীকে ডাকো একবার। না, না, মাধবী বোধহয় ঘুমোচ্ছে। ও বেচারীই বা আর কত করবে। তুমি অনিলকে ডাকো, কি ওষুধ দিতে হবে বলে দিচ্ছি। পেটে সেই যন্ত্রণাটা বোধ করছ কি?'

'মাধবী আমাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তুমিও। তোমাদের দুজনেরই এখন ছুটির দরকার। আমি সব বুঝতে পারি সুনন্দ। একটা তৃষ্ণা আর একটা সরোবর—মাঝখানে আমি একজন অবাঞ্ছিত অযাচিত কুৎসিত বাধা। তাই না?'

'তুমি যদি আবার এরকম কর, তাহলে মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। সমরেশ, প্লীজ বি সেন্‌সিবল্। মাধবী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। তুমি তাকে ভালোবাস। নিজের মুখে ভালোবাসার সেই সব গল্প আমাকে শোনাতে—মনে নেই। মাধবীর মত মেয়ে হয় না—আমি যতটুকু ওকে চিনেছি—শি ইজ এ ওয়াণ্ডার। তুমি সাময়িক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তাই এ ধরনের এলো-মেলো চিন্তা তোমার দুর্বল মনকে পেয়ে বসেছে। ফর হেভেন্‌স্ সেক্, তুমি বিশ্বাস কর সমরেশ—তুমি যা ভাবছ তা ভুল। আমি তোমার বন্ধু—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি আমার বন্ধু সুনন্দ—' কথা ফুরোবার আগেই কথা বলে উঠল সমরেশ—'আর মাধবী আমার স্ত্রী। আমরা তিনজন নিজেদের অজান্তে একটা ত্রিভুজ গড়তে সুরু করেছি। দ্যাট ইটারন্যাল ট্রায়াঙ্গল। লেখকরা আমাদের মত নির্বোধ কতকগুলো চরিত্র নিয়ে গল্প ফেঁদে বসে, আর সেই সব ভুল বোঝাবুঝির কাহিনী পড়ার জন্য অপরিণত বয়স্ক পাঠকেরা কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু একটা কথা বলছি সুনন্দ—আমি তোমাদের দুজনকে সাবধান করে দিতে চাই। তিনজন নয়—আমরা মাত্র দুজন বেঁচে থাকব। একজনকে পৃথিবী থেকে সরে যেতেই হবে।'

'যদি বল তাহলে আমি আসছি সমরেশ—এক্ষুণি। তোমার শরীর নিশ্চয় খারাপ হয়েছে। একটা কাজ কর প্লীজ—হজমের জন্য যে নতুন ট্যাবলেটটা দিয়েছি, তার দুটো বড়ি একটু সোডাওয়াটার মিশিয়ে খেয়ে নাও। আর ওডিকোলন মাথায়, কপালে বেশি করে লাগাও। আমি কালকেই তোমার সমস্ত শরীর আবার চেক করাব।'

'আর আমার মন?'

'হ্যাঁ, তাও এখন ডাক্তারী শাস্ত্রের আওতার মধ্যে পড়ে। মনে আছে, সেদিন মাধবীকে ডাক্তার বসাকের কথা বলছিলাম। ভদ্রলোকের সারা পৃথিবী-জোড়া নাম। এত বছর ইউরোপে থেকে তিনি এতকাল বাদে রিটায়ার করে দেশে ফিরেছেন। তোমার কথা হঠাৎ ওঠাতে ডা: বসাক তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে একদিন তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'সাইকিয়াট্রিজম মানেই হোল যত সব বোগাস ব্যাপার—ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। মানুষ যদি সর্বজ্ঞ হতে পারত।' বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল সমরেশ। হঠাৎই রাখলো। হঠাৎ বাইরের জমাট অন্ধকারকে তার একটা স্বচ্ছ আয়না বলে মনে হতে লাগলো। ওখানে তার জেগে থাকা সত্তার স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে। আলোর আশা কোথাও নেই, কালো মেঘের কিনারে রুপালী জরির পাড় কেউ বুনছে না। নিরাশার একটা প্রকাণ্ড সমুদ্রের মধ্যে সে যেন আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, এমনি একটা অনুভূতি বুকে নিয়ে সমরেশ মাধবীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর মনও একবার বুঝে নেওয়া দরকার। একটা শেষ বোঝাপড়া। ওকেও জানানো দরকার মানুষের জীবন উপন্যাসের পাতার মত চমক ধরানো হয় না—হতে পারে না। জীব জগতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী একটা প্রচণ্ড সংঘাত তাদের জীবনে আসন্ন হয়ে পড়েছে। তিনজন এভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট—প্রবাদ মেনে না নিলে জড় পদার্থের মত এ জীবন ধারণই করতে হয়। বন্ধু চলে না।

মাধবী, মাধবী, মাধবী—মনে মনে বারবার নিঃশ্বাসের মতো নামটি নিতে লাগলো সমরেশ দরজার উপর কান পেতে। কিছু শোনা যায় না। এককণা আলো দরজার ফুটোর গায়ে রক্তের মতো লেগে আছে। তার মানে মাধবী এখনও জেগে। অনেকক্ষণ দ্বিধা করে দরজায় টোকা দিলো দুর্বল হাতে। প্রথমে সাড়া নেই। মাধবী হয়তো শিয়রের কাছের জানলা দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে অন্ধকারের দিকে। হয়তো দরজা খুলবে না।

'মাধবী'—চিৎকার করে ডাকতে চাইলো, কিন্তু তার গলা কে যেন টিপে ধরেছে পেছন থেকে। আওয়াজ এলো না।

আমি যেমন ওদের দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু কামনা করছি—ওরাও হয়তো ঠিক সেই ভাবেই আমার কথা চিন্তা করছে। সুনন্দ আমার চাইতে অনেক অ্যাট্রাকটিভ। ওর চেহারা সুন্দর, ওর জীবন-পিপাসা প্রচণ্ড। ও দু:সাহসী সঙ্গ পেলে মাধবীর পক্ষে জীবনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলা অনেক সহজ। অথচ আমার মুখের রেখায় রেখায় সময়ের অকরুণ ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই জীর্ণ, পুরোন আমার পূর্বপুরুষের পরিত্যক্ত বাড়িটার মতো আমিও একটা প্রাণহীন ফসিল হয়ে পড়েছি। সজীব লতার মত মাধবীর জীবন্ত সত্তা আকাশ চাইবে, আলো চাইবে, খোলা হাওয়ার মুক্ত স্পর্শ কামনা করবে।

এসব কথা সমরেশ অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে ভাবলো। ও টের পায় নি মাধবী কখন এসে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় অবশ্য চুলের সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা

ভাসছিলো কিছুক্ষণ থেকে। কি একটা সেণ্ট মাখে মাধবী, বিদেশী ফুলের গন্ধ। বিয়ের আগেও মাখতো। বিয়ের পর শাড়ির আঁচলে, বালিশে বিছানায় এমন কি ঘরের সবখানে গন্ধটা পেয়ে ওর মন কতবার আশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠেছে।

'তুমি ঘুমের ওষুধ খাবে?' মাধবী আস্তে আস্তে বলল। গাছের পাতায় হাওয়ার শব্দের মতো কথাগুলো নিস্তব্ধ ঘরে কেঁপে উঠল।

'মাধবী।' চোখ না ফিরিয়ে সমরেশ বলে উঠল—'ঘুমের ওষুধ কি আমার একলারই খাওয়া দরকার। ওকথা থাক, আজকে কি তিথি জানো?'

'দু-এক দিনের মধ্যেই বোধহয় পূর্ণিমা।' অস্বস্তি ফুটে উঠলো মাধবীর কথায়—'শোবার ঘরের জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এত আলোয় ঘুম আসতে চায় না।'

'সব জানলাই আমার একে একে বন্ধ হয়ে গেছে মাধবী। দেখতে পাচ্ছো না। তবুও তো ঘুম আসে না।'

'ডাঃ. মিত্রকে ফোন করব।'

'সে নিজেই এসে পড়বে এখুনি। আমাদের নিশীথ রাতের এই যে মুখোমুখি জটলা এতে বোধ করি আমরা সকলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। অনেকটা মদের নেশার মত। মদের মধ্যেও তো নতুন স্বাদ মেলে না, তবু সেই একই স্বাদের পুনরাবৃত্তি বার বার করেও আশ মেটে কি?'

মাধবী চুপ করে রইলো। জানলা দিয়ে প্রায় দিনের মত আলো মুখে এসে পড়লেও সে মুখে কোন অনুভূতির ছাপ চোখে পড়ে না। পাথরের একটা মূর্তি যেন।

'সুনন্দ আসে, তুমি দরজা খুলে দাও। বারান্দায় তিনটে চেয়ার পাতাই থাকে। ফ্লাস্কে কোকো ভরে রাখে রামবিলাস কোন প্রশ্ন না করে। তিনটে পেয়ালা, ধোঁয়া ওঠা গরম কোকো। তুমি আমি আর সুনন্দ। আচ্ছা, আমরা কি কোন নতুন কথা বলতে পেরেছি আজ পর্যন্ত। সেই একই সমস্যা, একই সমাধানের আশায় মিথ্যা কথার জাল বোনা। সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার বসাক, অথবা কলকাতার বাইরে চেঞ্জে যাওয়ার পরিকল্পনা। আমেরিকায় কি নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে ইনসমনিয়া সারাতে অব্যর্থ সুনন্দর তাই বোঝাতে চাওয়া। ভালো হয়ে ওঠার আশ্বাস। তারপর তোমাদের ক্লান্ত ঘুম ঘুম চোখে ঘুমোতে যাওয়ার প্রস্তাব। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ বড়িগুলো আমাকে জোর করে

[illegible]য়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর আসর শেষ। এতে কার কি লাভ হয়েছে? একটা কিছু উপসংহারে আমাদের আসতেই হবে—মাধবী।"

"তার মানে?" মাধবীর চোখে ভয়ের আভাস কেঁপে উঠল কি? উত্তর শুনুনি দেওয়া হোল না। অন্ধকারের, গায়ে দুটো লাল চোখ দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। সুনন্দর গাড়ির হেডলাইট। ফটক বন্ধ, কিন্তু রামবিলাস সতর্ক থাকে। হর্নের চাপা শব্দটা পাওয়া মাত্র উঠে খুলে দেয় তালাটা। বন্ধ করার দায় তার নেই, কারণ ডাক্তারবাবুর গাড়ি একবার এলে অনেকক্ষণ থাকে। পুব দিকের অন্ধকার যখন ছাই খাশা-খাশা দেখায় আর আমগাছের মাথার উপরে তারাটা সাদা হয়ে আসে, তখন গাড়িটা বেরোবে। ভোরের দিকে তালা না লাগালেও চলে, সে কথা রামবিলাস জানে বলেই ফটক আস্তে করে ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। এ বাড়ির আর পাঁচটা নিয়ম-ছাড়া ঘটনার মত রামবিলাস এই নৈশ সাক্ষাৎকার কাহিনীও নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে।

শুধু রামবিলাস কেন, সমরেশ সরকারের প্রাইভেট সেক্রেটারী অনিল বিশ্বাস থেকে সুরু করে দারোয়ান, মালী, তিরিশ বছরের পুরোন চাকর অথবা আয়া প্রত্যেকেই বুঝে নিয়েছে অথবা বুঝতে চেষ্টা করেছে এ বাড়িতে ডাঃ সুনন্দ মিত্রের ঠিক কি পরিচয়। কিন্তু আলোচনা কেউ করে নি। রামবিলাসের রাজত্ব যে এলাকায়, সেখানে অন্তত সমরেশ চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখরোচক আলোচনা সে সইবে না।

টেবিলের একপ্রান্তে বিকেলে পরা সেই জ্যোছনা-নীল রঙের সিল্কের শাড়ির আঁচল লুটিয়ে মাধবী বসেছিল। সমরেশ মুখ না ফিরিয়েও একসঙ্গে সুনন্দর পায়ের শব্দ ও মাধবীর মুখের ভাব শুনল ও দেখল। খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধাপগুলো পার হয়ে আসছিল সুনন্দ। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, শব্দ তত জোরালো হয় না। নিজে যখন ওঠা-নামা করে, তখন আগেকার আমলের ঘোরানো সিঁড়ির হলদে হয়ে আসা পাথরগুলো লক্ষ্য করে না সমরেশ। সে হয়তো জানতেও পারত না সবশুদ্ধ কটা সিঁড়ির ধাপ রয়েছে। কিন্তু সুনন্দর পায়ের শব্দ তাকে প্রতিদিন গুণতেই হয়। এক দুই তিন—মনে মনে বলতে সুরু করে সে। তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ পর্যন্ত পৌঁছে তার বুকের মধ্যে সমস্ত রক্ত তোলপাড় হয়ে ওঠে। অথচ মুখের উপর একটা নির্বিকার খোলশ চাপানো ওদের দুজনেরই। কেউ বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না নদীর জলের উপরের অংশটুকু এত শান্ত, এত নিরুদ্বেগ, এত মসৃণ, কিন্তু নীচে অশান্ত ঘূর্ণীর কি অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বাস।

"সুনন্দ।" হঠাৎ বলে ওঠে সমরেশ আত্মবিস্মৃত হয়ে।

"সমরেশ।" কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম এত অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'তুমি কেমন আছ?'

'ভালো—খুব ভালো। অনেকদিন এত ভালো বোধ করি নি। মাধবীকে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার দেওয়া ওষুধ-পথ্য খেতে কোন ত্রুটি হয় নি।'

'তাহলে?' ভুরু কুঁচকে তাকায় সুনন্দ, 'তুমি তখন এত আবোল তাবোল বকছিলে কেন? মাধবী—সমরেশ কি ঘুমের ওষুধ খায় নি?'

মাধবী কথা বলল না। মাথা হেলিয়ে জানালো সমরেশ ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। কথা বলল সমরেশ। দুজনের মাঝখানে খালি চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে সুনন্দর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—"টেলিফোনে আমি প্রলাপ বকি নি বন্ধু। যা বলেছি সবই সত্যি। এখন তোমাদের দুজনের সামনে আবার বলছি—জীবনের এই জটিল জট আমি সহজ করে তুলবই। তুমি, আমি আর মাধবী—আমরা তিনজন কিছুতেই একসঙ্গে পাশাপাশি থাকতে পারব না। ওয়ান অফ আস মাস্ট গো।"

'কোথায়?' ফিস ফিস করে মাধবী বলে উঠল। ওর কালো চোখের চাহনিতে সেই ভয়টা আবার প্রখর ছুরির ফলার মত চক্‌ চক্‌ করে উঠছে।

'টু হেভেন অর হেল—যেখানে নিয়তি টেনে নিয়ে যাবে। ডেথ্—ডেথ্ দি লেভেলার। সবাইকে সে উঁচু-নীচু আসন থেকে টেনে নামিয়ে একেবারে ধুলোর মধ্যে মিলিয়ে দেয়। মরতে কি তুমি ভয় পাও মাধবী? বেঁচে থাকায় তাহলে তোমার বোধহয় খুব সুখ?'

'আঃ সমরেশ—'কড়া ধমক দিয়ে উঠল সুনন্দ—'রিয়েলি তুমি একেবারে আনব্যালেন্সড হয়ে পড়ছ। কি যে বল, তার ঠিক নেই।'

'ঠিক থাকবে কি করে?' সমরেশ দুহাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল—'আমি জানি ইউ আর উইশিং মি ডেথ্। আমার মৃত্যু কামনা করছ তোমরা। হয়তো এমনিতেই বেশি দিন বাঁচব না—না না অসুখের বিষ ঢুকে সমস্ত শরীরকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। কিন্তু সে কটা দিনও ধৈর্য ধরে থাকা অসম্ভব তোমাদের পক্ষে। আমার সমস্ত সম্পত্তি মাধবীর নামে উইলে লিখে দিয়েছি। তাছাড়া জয়েন্ট ইনসিওরেন্স আছে—হাজার কয়েক টাকা অনায়াসে হাতের মুঠোয় আসবে। যে দশ হাজার টাকা তোমাকে ধার দিয়েছিলাম তোমার ডিসপেনসারি খোলার জন্য সে টাকাও ফেরত দেওয়ার আর প্রশ্ন সেদিন থাকবে না। পাল-তোলা নৌকো দুটো তরতর করে উজান বেয়ে জীবননদী বেয়ে চলে যাবে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে। কিন্তু সুনন্দ—একটা কথা জেনে রেখো তোমরা, আমার মনেও সেই একই অনুভূতি। আমিও চাই আমাদের মধ্যে একজন নিঃশেষ হয়ে বাকি দুজনকে সুখী হতে সাহায্য করুক। কিন্তু কে যাবে মাধবী।'

'না, না—সুনন্দ—ওকে আর বলতে দিও না'—মাধবী চিৎকার করে উঠল। মাধবীর মুখ থেকে প্রতিটি রক্তবিন্দু নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরে বাগানে অযত্নে বেড়ে-ওঠা আগাছা, লতাপাতার ঝোপে ঢাকা সাদা মার্বেল পাথরের মূর্তিগুলোর মতই ওকে নিষ্প্রাণ, মৃত দেখাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)।

সুশীল রায়

অনলআয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললেন, আমার ছেলে। যা করতে বলব তার উলটোটা করবে। নাওয়াতেই এনেছিলাম, কিন্তু নাইল না। বারণ করেছি আর ঐ ডুব দিয়ে চলেছে একনাগাড়ে।

রানী-বাই বলল, একটু একগুঁয়ে হওয়া ভালো। কারো কথা না শুনে নিজের মত-অনুসারে চলাই বুঝি ও চায়।

—চায়, ভালো। কিন্তু মান্য করবে না গুরুজনদের? এটাও কি ভালো?

উত্তর দিতে পারল না রানী-বাই, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ছেলেটা উঠে এসেছে উপরে। গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা মুছছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রানী-বাই জিজ্ঞাসা করল, কি নাম তোমার?

ঘাড় কাৎ করে বড়-বড় চোখে চেয়ে সে বলল, ঈশ্বর। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—কোথায় থাকো?

—বড়বাজারে?

—দেশ কোথায়?

ছেলেটি বীর বিক্রমে যেন দাঁড়াল, বলল, বীরসিংহ গ্রামে।

আর কোনো প্রশ্ন করল না রানী-বাই। পাল্কিতে গিয়ে বসল, ঝালরে ঝলমল করতে-করতে পোস্তার পথ ধরে গরানহাটার দিকে চলল পাল্কি।

রানী বলল, ছেলেটিকে দেখলি হীরা?

—দেখলাম। বড় বেয়াড়া, বড় বজ্জাত।

রানী বলল, ভালো ভালো মানুষ তো কত দেখছি হীরা, তুইও তো দেখেছিস কত। দু-একটা বেয়াড়া মানুষ না হলে বুঝি মানায় না আর সংসার। তেজি মানুষ দেখি না যে একটাও।

হীরামতি কোনো উত্তর দিল না এ কথার।

গরানহাটার গলিতে এসে নামল রানী-বাই। ভরদুপুরেও এপাশে-ওপাশে উপরে-নীচে কাঁইকাঁই শব্দে বাজছে হারমোনিয়ম, পুঁ-পুঁ করে উঠছে ফ্লুট।

দো-ফের কবে কাপড় পরা গোটা-কতক মেয়ে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পানওলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। এদের পাল্কি এসে নামতেই ওরা ফিরে তাকাল এদিকে, ফিক-ফিক করে হাসল, মিসি-মাখা দাঁতে ঝিলিক দিয়ে উঠল খুশি, বলল—এসেছেন আমাদের মহারানী।

চাপাগলায় গেয়ে উঠল দোকান-দার—

বিবি-সাহেবের বয়স কত বলবে
বলো কে।
কোমর কষে নবযৌবন বেঁধে
রেখেছে।

খিলখিলিয়ে উঠল মেয়েলোকেরা। তাবিজ-পেড়ে পরনের শাড়ির প্রান্ত তুলে পাড় দিয়ে ঠোঁটের পানের পিকের দাগ মুছে বলল, বাজারে খুব দর ওর। ওর দর যেমন, ওর দেমাকও তেমনি। ঘরের বউ যেন। কারো সঙ্গে বাইরে যাবে না ফুর্তি করতে, ওর ঘরে এসে মজা লোটো প্রাণ ভরে। কত বায়না।

ওপাশে ময়রার দোকানে মাছি ভনভন করছে। রসকরা বাদাম-তক্তি ছানাবড়া সরভাজা ঘিরে ধরেছে মাছিতে।

এর একটু তফাতেই শুঁড়িখানা। ফিরিঙ্গি সদাগরদের নৌকার মাঝিরা ওখানে বসে হল্লা করছে।

মস্ত বাড়ি। উঠোন থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। নীচটা স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার, কিন্তু উপরটা শুকনো খটখটে আর আলোভরা।

দোতলার রেলিঙের ধার দিয়ে পাক খেয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল রানী-বাই।

মোহিনীর ঘর

এখনো যায় নি। কাল সারারাত জ্বালিয়েছে, এখনো দম ফুরায় নি তার। মোহিনী-গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে ও-ঘর থেকে। চাকরানীটা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। মোহিনীর ছাড়া নাই, সাঁড়াশির মত করে দুই হাত দিয়ে তাকে ধরে পড়ে আছে বাবুটি।

রোজ গঙ্গা-নাইতে যায় রানী-বাই। গঙ্গার কিনারে দাঁড়িয়ে সে তাকায় যতদূর দৃষ্টি যায়। ওই দিকেই তো গরিটি, ওই দিকেই চুঁচুড়া। তারা যেখানকার সেখানেই আছে তারা, কিন্তু আজ কত দূরে চলে এসেছে সে নিজে। গা মাজতে-মাজতে এই হিসাব করে সে। ইচ্ছে হয়, সাঁতার কেটে চলে যায় সে ঐ দেশে, চুঁচুড়ায় না —গরিটিতে। হঠাৎ গিয়ে হাজির হয় সে তাদের সেই ফল্গুসগন্ধের আমের ছায়াঘেরা উঠোনে। তাকে দেখে কি চিনতে পারবেন তার মা, চিনতে পারবেন বাবা? তার ভাইয়েরা কি চিনতে পারবে তাকে? আর গাঙ্গুলিবাড়ির সেই পিসিমা, আর, আর, হায়, নেই সে, নেই সেই কদম-মাসি।

কদম-মাসি যেভাবে নিস্তার পেয়ে গিয়েছে এই সংসার থেকে, সেই ভাবে সেও যদি নিস্তার পেত তাহলে হয়তো ভালো হত এর থেকে। প্রত্যহ রাত্রে কত অচেনা মানুষের মুখ থেকে একই স্তুতি শুনতে হচ্ছে তাকে, কত পীড়ন কত পেষণ সহ্য করতে হচ্ছে—তার ঠিক নাই। এই ভাবে কতদিন আর চলবে জীবনটা?

এ-বাড়ির মাসি রোজই সাবধান হতে বলে, বলে—বাইগিরি চলবে কি চিরকাল? হয় হবি মাসি, নয় হবি দাসী—এই তো লিখন রে এ-ললাটে। যতদিন সুদিন আছে, লুটে নে।

[illegible]

না! কোনো মায়া নেই, কোনো মমতাও নেই নিত্যরাতের নতুন অতিথিদের উপর। ওদের কি চিনতে বাকি আছে তার? ওরাও তো প্রত্যেকেই চুঁচুড়ার সেই মানুষটার মতই, স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই, মনে মনে তাই সে চিন্তা করল—রূপনারায়ণ।

আজ আবার ঐ ধমকের শব্দ। ঈশ্বরকে শাসন করছেন তার পিতা। বলছেন, নেয়ে নাও, নেয়ে নাও, নেয়ে নাও।

রানী কাছে গিয়ে বলল; নাইতে চায় না বুঝি?

—না। না-নাওয়াই দরকার আজ। জ্বর হয়েছে ওর।

জ্বর হয়েছে, নিয়ে আসতে চান নি, তবু জোর করে এসেছে ঐ ছেলেটা। তাই তার বাবা ওকে জবরদস্ত করছেন নাইবার জন্যে। যদি এতে সে না নেয়ে ঘরে ফেরে।

—ভীষণ গোঁয়ার, ভীষণ জেদি, ভয়ংকর একরোখা।

ছেলের নামে বুঝি নালিশ জানালেন তার বাবা। মুশকিলে পড়লে কারো কাছ থেকে সামান্য সহানুভূতি পেলে এই রকমই বুঝি বেরিয়ে আসে মনের কথাগুলো। বললেন, এখনই এই, বড় হলে কি যে হবে ভগবান জানেন।

হোক, বড় হোক ও। ওর জেদের পরীক্ষা হোক। সেসব দেখার জন্যে বেঁচে থাকার আশা রাখে না রানী। কিন্তু ঐ যে, সে গিয়েছিল নাচতে মানিকতলায়, সে বাড়ির ঐ লোকটির কিছুটা জেদ সে দেখেছে কালীমিত্তিরের ঘাটে। মারমুখো একটা জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন নির্ভীকভাবে তিনি পরীক্ষা দিলেন তাঁর জেদের। সেদিন ওঁকে চিনতে পারে নি সে, কিন্তু এখন চেনে, নামও জানে এখন। তার ঘরে যে বাবুরা

[illegible]

ঐ মানুষটার নাম করে। সে গাল-মন্দের মধ্যে থেকেই সে একটু-আধটু বুঝতে পারে মানুষটার জেদ।

বলা যায় না, বড় হয়ে এ ছোঁড়া-টাও হবে হয়তো আর-একজন ঐ ধরণেরই মানুষ।

সেদিন ঘরে ফিরে এসে রানী-বাই শুনল তার বায়না এসেছে, মোটা টাকার বায়না।

—কিসের বায়না মাসি?

—সিঁথির বাগানে যেতে হবে নাচতে। মেলা টাকা দেবে। বলে গেল, যত টাকা লাগে।

মৃদু হেসে রানী জিজ্ঞাসা করল, যেতে বলছ নাকি, মাসি?

মাসির নথ এসে পড়েছিল ঠোঁটের উপর, মাথা ঝাঁকি দিয়ে সেটা সরিয়ে বলল, আমি বলার কে। তবে, এটুক বলতে পারি—আমাকে ডাকলে আমি যেতাম।

রানী-বাই হাসতে লাগল, বলল, তবে তুমিই যাও-না, মাসি।

রেগে উঠল মাসি। সর্বাঙ্গ দুলে উঠল রাগে, নিতম্বের গোট নড়ে উঠল, বলল, গেছি রে গেছি। অত ঠাট্টা কেন। কত ডাক-সাইটে বাবুর সঙ্গে নৌকো-বাইচে বাগানবাড়িতে গেছে রে তোদের এই বিন্দি-মাসি। তোরা আর ক'টা বাবু দেখছিস? এখন তো সব ফোতো বাবু। সে-জাঁক সে-জমক তোরা দেখবি কোথা থেকে?

একটু থেমে বিন্দি বলল, সিঁড়ির ধাপে ধাপে মোহর ছড়িয়ে উঠে আসত বাবুরা, সেসব মোহর পেত চাকর-চাকরানীরা। তোরা এখন যা পাচ্ছিস তা ঐ চাকর চাকরানীর দস্তুরি।

চমকেই উঠল যেন একটু রানী-বাই, তবু বলল, সেসব গেল কোথায় মাসি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিন্দি-মাসি বলল, সেসব থাকে না রে।

চৎপাতের ধন উৎপাতে যায়। নইলে তাদের বাড়িউলি-মাসি হব কেন, সেসব থাকলে আজ হতেম মহারানী।

থাকে না না কি সেসব ধন? তবে-যে আখেরের জন্যে ভাবতে বলত তাকে তার রামবাগানের মাসি? যদি না'ই থাকে, তবে অত ঝঞ্ঝাট করে বেড়িয়ে পুঁজি করার চেষ্টা কেন। নিকি নর্তকীকে না কি মাসে হাজার টাকা দিয়ে চাকর রেখেছে কে, আশ্চর্যই লাগে রানীর। একজনের চাকর হয়েই যদি থাকতে হবে তবে ঘরের বউ হবে থাকলেই হয়। ঘরের বা'র হয়ে বাঁধা মাগ হবার অর্থ হয় না। ঐ হাজার টাকা পুঁজি করে রাখতে পারছে না কি নিকি? সে ধনও নিশ্চয়ই খরচ হয়ে যাচ্ছে। উৎপাতে।

সুতরাং আর কি, ভাবতে রাজি নয় রানী। ভবিতব্য আছে ভবিতব্যের মধ্যে। আজকের দিনটাই তার থাক হিসাবের মধ্যে।

রানী বলল, না মাসি, আমি যাব না। দিক না তারা যত টাকা ইচ্ছে, দিক না এই ঘরে এসে।

দাঁতে জোর কমেছে, সাঁচি পান ছেঁচছিল বিন্দি-মাসি। পানের মণ্ড মুখে দিতে দিতে সে বলল, গেছে তারা কাছেই কোথায় ঘুরে আসতে। আবার আসবে বলে গেছে, এলে ঐ কথাই বলব।

হ্যাঁ। বোলো, ঘরে এলে গান শোনাব, নাচ দেখাব সব দেখাব। ?িঙ্ক সিঁথিতে না, দমদমায় না। এই গরানহাটায়।

কিছুক্ষণ পরেই রানী গলা শুনতে পেল নীচে থেকে, মাসি বলছে, না গো না। বললাম যে, ও যাবে না। ও কি তোমাদের নিকির মতন, কি হিঙ্গুলের মতন বাই? ওর দর আলাদা। ঘরে এসো, মোহর ফেলো, মজা কোরো।

উপর থেকে রেলিঙে বুক রেখে ঝুঁকে রানী জিজ্ঞাসা করল, কে মাসি, কে এসেছে?

নীচে থেকে গলা চড়িয়ে মাসি বলল, কে আবার। ঐ চুচড়োর তারা।

—কোথাকার?

—কেন, শুনতে পাস নে না কি কানে? কানে কি হীরের ঝাঁপি পরে আছিস এখনো? চুঁচড়ো, চুঁচড়ো।

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রানী-বাইয়ের। নিজেকে শক্ত ক'রে দাঁড় করিয়ে সে গলার স্বর নরম করে নিল, ঝুঁকে বলল, ওখানে তো হাজার মানুষের বাস। মানুষটার নাম জেনে নাও, মাসি।

মাসিকে জেনে বলার সুযোগ না দিয়ে যারা এসেছে তারাই উপর দিকে চেয়ে বলল, রূপনারায়ণ, রূপনারায়ণ রায়।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানী-বাই। এর পর কি কথা বলবে বুঝতে পারল না। মাথার ভিতরটা বুঝি ঝিমঝিম করে উঠেছে। অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। একপাল কবুতর ছাদের কার্নিশে বসে বকবক করে চলেছে ক্রমাগত, কড়া রোদের গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে যেন একটা উড়ন্ত চিল চিৎকার করে উঠল। বাইরে রাস্তায় ফিরিওলা এই অবেলায় কর্কশ গলায় হাঁক দিল—বেলফুল।

রেলিঙের গা থেকে ছুটে ঘরের মধ্যে গেল রানী-বাই, ব্যস্ত হয়ে ডাকল, হীরা—হীরা—হীরা।

ঘর গোছগাছ করছিল হীরা, চুপসানো বালিশগুলো থাবা দিয়ে দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছিল।

রানী বলল, হীরা, শিগগির নীচে যা। কারা এসেছে তাদের বলে আয়—তাদের বাবু যেন আসেন।

বিরক্তই হল বুঝি হীরা, বলল, কে এমন লাটের বাবু সে? আসতে হয় এমনিই আসবে। তোমাকে সেধে ডাকতে হবে না কি?

—সেধে না রে, সেধে না। নিজের গরজেই লোক পাঠিয়েছে। শুধু ঘরে আসা, যেন আসে।

হীরা রওনা হল। পিছন থেকে রানী-বাই বলল, বলিস দিনের বেলা এলে আমি বিরক্ত হই। দিনে আমি ঘুমোই। রাতের বেলা যদি আসে, আসতে পারে।

হীরা নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

সোজা হয়ে আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না রানী-বাই। সে গিয়ে তার বিছানার উপর পড়ল। হীরার ফাঁপানো বালিশ দিল চুপসে।

কানাগিন্নীর নাচের কথা মনে পড়ছে আজ, বাইজীদের নাম করে-করে পাক খেয়ে খেয়ে নেচেছিলেন কানাগিন্নি। সেসব বাইজী তখন ছিল কত দূরের, কত নীচের। আজ সেই বাইজীর

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স
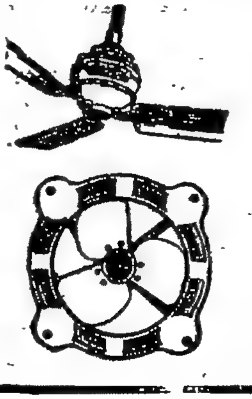
মার্কনী ফ্যান
১৩টি কিস্তি পর্যন্ত
কোন বাড়তি খরচ নেই
মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পো (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

[illegible] একজন সে । আজ তাঁকে খুঁজে পেলে সে অনুনয় করে বলবে—ও গিন্নি গো, ওই নামের সঙ্গে জুড়ে দাও গিন্নি আর-একটা নাম—জুড়ে দাও এই রানী-বাইকে ।

কিন্তু কত দূরে, আর কোন নেপথ্যে চলে গিয়েছে সেই কানাগিন্নি , আর কত নীচে কোন অন্তরালে এসে উপস্থিত হয়েছে সে নিজে ।

হীরা ফিরে এসেছে । ফিরে এসে দেখে রানী-বাইয়ের চোখের জলে ভিজে গিয়েছে বালিশ ।

হীরা বলল, ওরা রাজি গো । কারা গো ওরা ? অনেক কালের চেনা মানুষ বুঝি ? চোখে জল এনে দিল যে এমন ? আর, অমন কেঁদো না গো, কেঁদো না । ওরা রাজি তোমার কথায় । রাতেই আসবে । পরশু ।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হীরা নিজের মনেই বলে উঠল, আদিখ্যেতা ।

কম দিন তো গত হয় নি এর মধ্যে, শুয়ে-শুয়েই হিসাব করল রানী-বাই । বারো বছর । একটা যুগ কেটে গিয়েছে তার জীবনের উপর দিয়ে । চুঁচুড়ার ঐ প্রাসাদের বন্দিশালায় দিন যেন কাটত না । কিন্তু সে-বন্দিশালা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার দিনগুলো কেটে গিয়েছে যেন হু-হু করে ।

এতদিনে তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে নিশ্চয় কিছুটা । আয়নায় নিজেকে দেখে তা পরখ করা কঠিন । রোজকার কণা-কণা পরিবর্তন চোখে পড়ে না । প্রত্যহের সেই কণা-পরিমাণ পরিবর্তন একত্র হয়ে বারো বছরে নিশ্চয় কিছু পার্থক্য ঘটিয়েছে চেহারায় । তা যদি ঘটে থাকে, রক্ষে । সে যেন চিনতে না পারে তাকে । যতদিন সে ছিল ঐ বন্দিশালায় তখন কতটুকুই-বা দেখেছে তাকে । চিনতে পারার কথা না । তবু সাবধান হয়েছে রানী-বাই, রাতের বেলা আসতে বলেছে অতিথিকে, দিনের আলোয় ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না সে ।

রানী-বাই বুঝি রাজরানী হয়ে উঠতে চায় । ঘর-দুয়ার গোছগাছ করার জন্যে হীরাকে হুকুম দিতে লাগল নরম কেদারায় বসে । পিকদানবরদার, পাঙখাবরদার, হুকাবরদারদের তটস্থ রাখল, রুপাবাঁধা সোনাবাঁধা আলবোলা গুড়গুড়ি মেজে রাখালো । সাঁচি পান এনে রাখালো পানদানে—ছোট-এলাচ বড়-এলাচ লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারী কর্পূরে সাজিয়ে রাখালো পানদান । চরসের আর মোহিনী-গাঁজার আয়োজন ঘর থেকে পরিষ্কার করিয়ে, ফিরে আনাল বুদ্ধি ।

ফরমাশ খাটতে-খাটতে হয়রান হয়ে হীরা বলল, কে গো লোকটা, এমন ব্যাপার তার জন্যে কেন ?

যেন আকাশ থেকে পড়ল রানী-বাই, বলল, সে কী রে । এই শহরে আছিস, চিনিস না ঐ মান্য লোকটাকে ? মস্ত বেনিয়ান ছিল ওর বাপ । খুব নামডাক ওর । তাজ্জব করলি হীরা, তাকে চিনিস না তোরা ?

সত্যি, তাজ্জব হয়েছে হীরা । ঠিকা-বাবু আসুক কি বাঁধা-বাবু আসুক কোনো মাগীকে কি কোনো বাইজীকে এমন সাজ সাজ রব করতে শোনে নি সে ।

রানী-বাইয়ের দেমাক দেখে চমকে গেছে রূপনারায়ণের সঙ্গীরা । এমন দেমাক আজ পর্যন্ত দেখে নি তারা কোনো মেয়েমানুষের । বাবু যদি এসেছেন ফূর্তি করতে, বাবুই আসুন তবে ; চেলারা এ ঘরে কেন ? তারা অন্য ঘরে বসুক । নীচতলায় পাশাপাশি ঘরে আছে দশগণ্ডা মেয়ে । সেখানে তারা যাক ।

নরহরিকে ও মোতিলালকে অগত্যা নেমে আসতে হয়েছে নীচে । রানী-বাইয়ের ঘরে একা রূপনারায়ণ ।

হে পাঠক, হে পাঠিকা, পুনরায় আপনাদের সম্বোধন করি—একদিন মাহেশের কিনারে হাতের কলম ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আজ ইচ্ছে হচ্ছে কুড়িয়ে আনি আরো অনেক কলম । দশগুণ দ্রুততায় চকে রাখি ওদের এই মিলনকাহিনীটা ।

দূরপ্রান্তের দেয়ালে দেয়ালগিরিতে জলছে নিষ্প্রভ মোম । ঐ ঈষদালোকের অন্তরালে রূপনারায়ণ চেপে ধরেছে রানীর দু'টি হাত, বার-বার সাধছে তাকে—নাচো, একটু নাচো ।

অটল হয়ে বসে রানী-বাই দেখছে এই মানুষটার মুখ । অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছে, অনেক কাবু হয়ে গিয়েছে লোকটা । একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে ঐ মুখের দিকে ।

—কি দেখছ ?

—দেখছি তোমাকে ।

এর দেমাকের কথা বলছিল না নরহরিরা ? দেমাকই তো বটে । চট করে তুমি বলে বসতে পারল এ ? আশ্চর্য হল রূপনারায়ণ । কিন্তু কিছু বলল না । ঐ সম্বোধনে একটু খুশিই হল যেন । রানী-বাইয়ের মত এমন একটা বাই তার সঙ্গে প্রথম-আলাপেই কথা বলছে এমন অন্তরঙ্গভাবে । রূপনারায়ণ বলল, তুমি বড় সুন্দর ।

হাসল রানী-বাই, বলল, এর আগে আরো সুন্দর ছিলাম ।

—তখন কোথায় ছিলে তুমি ? খোঁজ পাই নি কেন ।

—কেন ? একটা নিশ্বাস ফেলল রানী, বলল, সে-কথা বলব কী ক'রে । খোঁজ বোধ হয় করো নি ।

—কোথায় ছিলে আগে ?

—গঙ্গার ওপারে । ছি, জায়গার নাম জানতে চাইতে নেই । আমরা নষ্ট মেয়ে, আমাদের সব ঠিকানা কি আমরা জানতে দিই কাউকে ?

নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে বসেছে তারা । কথার পর কথা বলে চলেছে । যেন কথা বলতেই আসা এখানে । কত কথা জিজ্ঞাসা করছে রূপনারায়ণ, কত কথা জানতে চাচ্ছে রানী-বাই—তার সংখ্যা নাই ।

(ক্রমশঃ)

একটি গোপন কথা

তরুণ মৈত্র

সম্বৎসরে একবার স্বপ্ন দেখেন রত্নমণিবাবু। যত্নসহকারে সে স্বপ্নসুখ আলতো আলতো ক'রে উপভোগ করেন সারা বছর ধ'রে। সারা বছর এই এক্‌টি মাত্র স্বপ্নসুখে রত্নমণিবাবু আত্মমগ্ন থাকেন। নতুন বছরে আবার নতুন লগ্ন আসবে নতুন ক'রে স্বপ্ন দেখবার, এ আশাটুকু রত্নবাবুর ভগ্ন-হৃদয়ের 'ওয়েসিস'। যদিও ভগ্ন-হৃদয়ের কথা উল্লেখ করলে রত্নমণিবাবু যারপর-নাই বিরক্ত হন। শক্তসমর্থ মানুষটার যে ফুসফুসটা একেবারে ঘুস ঘুস রোগগ্রস্ত মানুষের চাইতেও ভগ্ন সে কথা সাধারণ চিকিৎসক জানতে পারবে না। একথা জানতে হলে রত্নমণিবাবুর স্বপ্নদর্শন তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা চাই। যত্ন নিয়ে মনের এক একটা পরতে রক্ষিত রত্নসম্ভার উদ্ধার করতে যে ধৈর্য আর ঐশ্বর্য দরকার, তার কতটুকু কত জনেরই বা আছে। মূল কথা, রত্নমণিবাবু সারা বছর যত ঝামেলা আর হামলার সঙ্গে লড়াই করুন না কেন, এই বাৎসরিক স্বপ্ন-সুখের কথা তিনি ভুলবেন না। এতে তাঁর সমস্ত মন পড়ে আছে।

এবারও রত্নমণিবাবু স্বপ্ন দেখলেন। সেদিন কলকাতার পথে তাঁকে জোর করে ধরে কলেরার ইনজেকশান দিয়ে দিয়েছিল। তাই সন্ধ্যে হ'তে ব্যথা অনুভব করলেন বাঁ হাতের উপর-তলায়। ঘুম আসতে স্বভাবতই একটু দেরি হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বলা বাহুল্য স্বপ্নসুখে মগ্ন হতেও রত্নমণিবাবুর দেরি হয়েছিল। তবে বছর শেষে এমনি সময়েই যে সাতসমুদ্র-তেরোনদী পেরিয়ে কোন রাংতা-ঢাকা দেশ থেকে স্বপ্ন-টুকু রত্নমণিবাবুর ভগ্নহৃদয়ের কোঠায় প্রবেশ করবে তা তাঁর জানা ছিল। তাই সামান্য ইনজেকশানের ব্যথা বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি স্বপ্ন দেখার। বরং বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতে সাহায্য করেছে। ঘুম না এলেও ঘুমঘুম ভাবখানা নিয়ে এই স্বপ্ন দেখছি, এই স্বপ্ন দেখছি ক'রে কাটিয়ে দেবার পক্ষে ব্যথাটুকু সহযোগী। আসলে কোনটা যে কোন ব্যাপারে উপযোগী, তা নির্ভর করে যে রোগী তার মনের উপর। এখানে রত্নমণিবাবুকে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পর্যায়ে ফেলায় আপত্তি আসতে পারে জেনেই একটা মুখবন্ধ দরকার।

কত শত দেবতা আছে। তেমনি মনের চিকিৎসকরা বলেন তেত্রিশ কোটি দেবতার মতো তেত্রিশ রকম উৎকট বাতিকগ্রস্ত লোক আছে পৃথিবীতে। এই সব বাতিক এক-একটা রোগেরই সামিল। তাই রত্নমণিবাবুর এমন ঘটা করে, ঢাকঢোল বাজিয়ে,

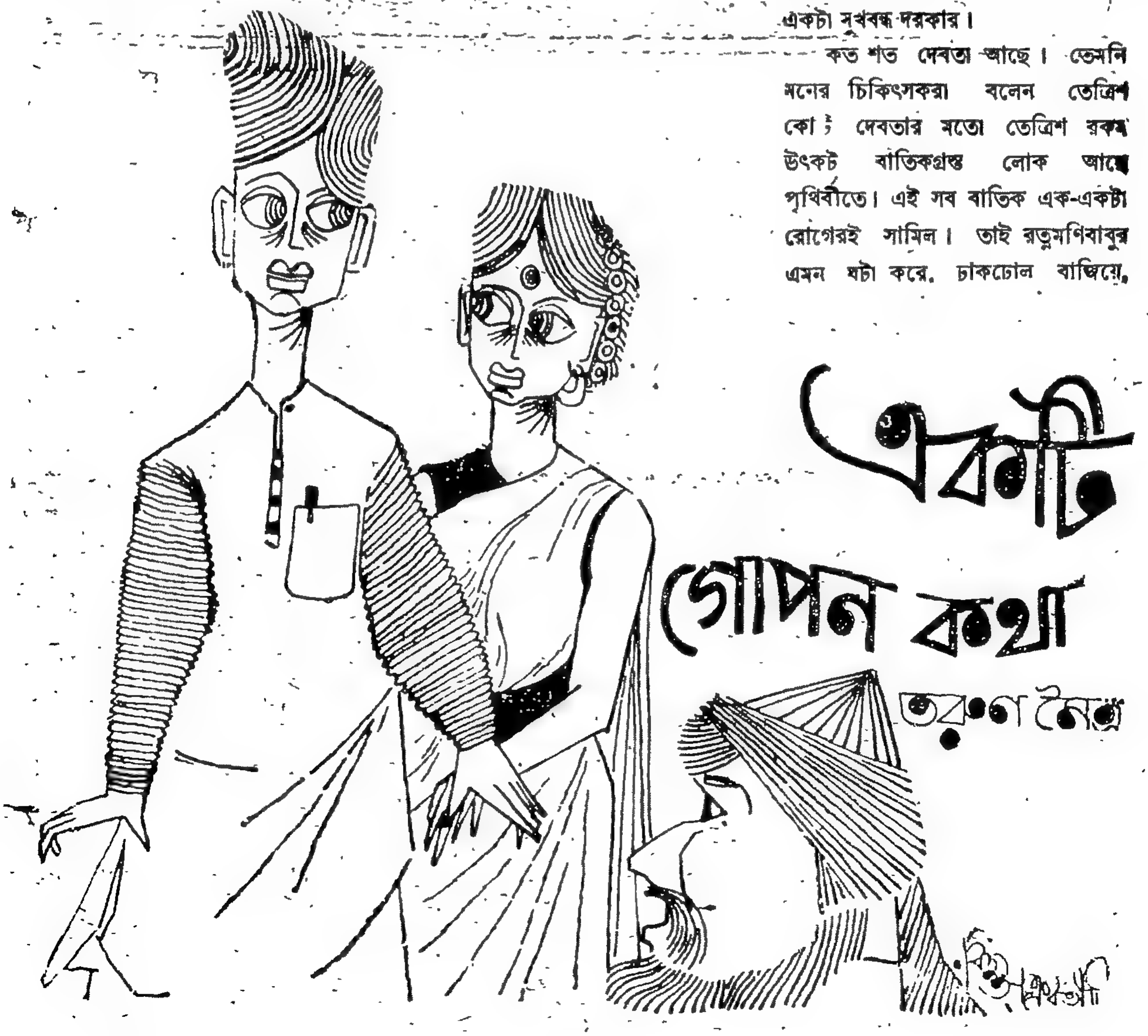

যত্নসহকারে স্বপ্ন দেখা একটা ব্যাধিক বা মনোরোগ ছাড়া কিছু নয়। মন নিয়ে যাঁরা ধৈর্যসহকারে চিকিৎসা করেন, এ কথা তাঁদেরই। এমনি স্বপ্ন দেখায় ক্ষতি যে কতখানি তা বোঝা যায় রোগীর দিন দিন উৎকট উৎকট চিন্তা আর কর্মকাণ্ডে, ইংরেজীতে বলে 'পার-ভারশান'। বাংলায় হয়তো বলা চলে বিকৃত। এই বিকৃত মন নিয়ে অতৃপ্ত বাসনায় কত লোক দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে। হয়তো কল্পনা আর গঞ্জনার মধ্যে কাটাতে কাটাতে হঠাৎ অবচেতন মনের একটা 'স্পার্ক' দেখা দেয়, তারই প্রতিক্রিয়া, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

রত্নমণিবাবু অমনি সারা জীবন শুধু দীর্ঘশ্বাসের বেলুন উড়িয়েই কাটিয়ে এলেন। তাই বুঝি তাঁর অবচেতন মনের অতৃপ্ত বাসনার স্পার্ক দেখা দেয় বছরে একবার। আর সময় পেলো না। ঘুরে ফিরে প্রতি বছরে এই জামাই-ষষ্ঠীতেই, জ্যৈষ্ঠমাসের গুমট গরম রাতেই রত্নমণিবাবু যত্নসহকারে স্বপ্ন দেখেন। জামাইষষ্ঠীর স্বপ্ন। জামাই সাজে সেজেছেন তিনি। ফরাসডাঙ্গা-ধুতি, বাহান্ন ইঞ্চি বহর। শান্তিপুর থেকে কাচানো। নিজের হাতে মালা-গাঁথার মতো দু'আঙুলে খুঁটে খুঁটে কুঁচিয়েছেন। আধ-ইঞ্চি চওড়া কালো পাড়ের কোঁচা ভাঁজে ভাঁজে এসে পড়েছে নিউকাট জুতোর উপর। আলতো আলতো ছোঁয়া দিচ্ছে আয়নার মতো স্বচ্ছ জুতোর বুকটায়। বুকে পরশ পাচ্ছে নিউকাট জুতো শান্তিপুরে কাচানো ফরাসডাঙ্গা-ধুতির আধ-ইঞ্চি চওড়া কালো পাড়ের আলতো ছোঁয়া। রীতিমত স্বপ্ন দেখতে দেখতে রত্নমণিবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ছেন। রোমাঞ্চিত মন নিয়ে স্বপ্নঘোরে রত্নমণিবাবু নতুন ট্রেডমার্ক গেঞ্জিখানা পরে ফেলেন। দুধের মতো সাদা। এরারুটের মতো মোলায়েম। তারপরে গলায়, ঘাড়ের এপাশ ওপাশ সুগন্ধি ট্যালকাম বডি পাউডার ছড়িয়ে দেন। মৃদুমন্দ বাতাসে সে গন্ধ চক্রপাকে নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই রত্নমণিবাবু অষ্টাবক্র মুনির মতো দেহ আন্দোলিত করতে থাকেন। মুখে মাখলেন মাখনের মতো স্নো। ঘসলেন অনেকক্ষণ ধরে দু-তিন পরতে। বেশ পুরু হয়ে স্নোর প্রসাধন যখন রত্নবাবুর মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত তখন মিশ্রিত হ'ল ফেস পাউডার। সোনায় সোহাগা। স্নো-পাউডারে রত্নমণিবাবুর মুখখানা যত্নসহকারে প্রসাধিত হল। বোঝাই দায় হয়ে ওঠে যে, এটা বিবাহযাত্রার বরসাজ, না জামাইষষ্ঠীর জামাইসাজ। গরদ, মটকা এণ্ডি, মুগা কোনদিনই রত্নমণিবাবুর পছন্দ নয়। স্বপ্নঘোরেও রত্নমণিবাবু ওগুলোর দিকে তাকান নি। ফিনফিনে আদ্দির সাদা পাঞ্জাবী গিলে করে আনিয়েছেন রজকিনীর কাছ থেকে। সুন্দরী রজকিনী যেমন সুন্দর ক'রে জামাকাপড় কাচে, তেমনি পাঞ্জাবীর হাতা গিলে করতেও কম নয়। নগদ এক টাকা বকশিস পেয়েছে রজকিনী। সুন্দরীর সুন্দর করে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবীটা আস্তে আস্তে গলিয়ে দেন রত্নমণিবাবু। মাথার উপর দিয়ে গলে আসছে ধীরে ধীরে। মুখটা ঢাকা পড়তেই পাতলা আদ্দির আড়ালে যেন ছায়াছবির মতো ভেসে উঠলো সুন্দরী রজকিনীর মুখখানা। রত্নমণিবাবুর হাত দুটো থেমে যায়। চোখ দুটো পিটপিট ক'রে ওঠে। সুন্দরী হাসছে, সোনা-বাঁধানো দাঁতটা সামনেই বের হয়ে আছে। চোখ দুটো ওর ভারি দুষ্টু। চোখেও সে হাসির ঢেউ।

বকশিস দিবি না বাবু? কেমন যেন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত।

—এই নে। দেবো না সুন্দরী, তুই ভাবলি কি করে? রত্নমণিবাবু যেন যন্ত্রচালিতের মতো সঙ্গে সঙ্গে একটি টাকা ওকে দিয়ে দেন।

—ব্যস। হ'য়ে গেলো। এতো খাটলাম। তুই তো জামাই সেজে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শালীদের মন কেড়ে নিবি, আমার বেলায়?

—কি বলে রে!—রত্নমণিবাবু কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ভয় পেয়ে তাড়া খাওয়ার মতো তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটাও গলিয়ে দেন। বোতাম পরান। হাতের বোতাম আঁটেন।

গিন্নী সেজেগুজে ওঘর থেকে এসেই হেসে কুটি কুটি।—কি, তুমি বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছো নাকি?

বড় আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান রত্নমণিবাবু। একোণ ওকোণ থেকে নিজের প্রসাধন দেখে বেশ খুশি খুশি ভাবে বলেন—বেশ মানিয়েছে না?

—আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না?—মেয়েদের স্বভাবগত ন্যাকামোভরা কথা বেরোয় গিন্নির কণ্ঠে।

—কেন, কেন?—রত্নমণিবাবুর ভাবখানা গলে পড়া।

হঠাৎ গিন্নী এসে সামনে দাঁড়ান।—দেখি।—বলে স্বামীর মুখে কি যেন লক্ষ্য ক'রে আসতেই লাফিয়ে ওঠেন রত্নমণিবাবু।

ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন শেষ। চোখ খুলে দেখেন গিন্নী সজোরে মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। উঠতেই চায়ের পেয়ালা সামনে ঠেলে দুমদাম ক'রে চলে যায় গিন্নী। বাইরে থেকে তার গলা শোনা যায়—চান করে নাও, রোদে ভরে গেল ঘরবাড়ি, এখনও ঘুমুচ্ছো। ন'টা বাজে, অফিসে যেতে হবে না?

অফিসে যেতে হ'ল। যাবার সময় কেন যেন স্বপ্নের কথাটাই ঘুরে ফিরে মনে পড়ায়, রত্নমণিবাবুকে অস্বাভাবিক ক'রে ফেলেছে। নিত্য যাবার সময় কর্তাগিন্নীর দ্বিতীয় রাউণ্ডের ঝগড়া হ'ল না। রত্নমণিবাবু গিন্নীকে সামনে টেনে আনলেন। ঠাণ্ডা গলায় বলেন,—গতবার যাওয়া হয় নি। তোমার মা-বাবা প্রত্যেকবার আশা ক'রে নেমতন্ন করেন। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে এসেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। খোকাকে আর স্কুলে যেতে দিও না। অফিসে সই করেই কেটে পড়বো।

দৃশ্যের কপাট

বটকৃষ্ণ দাস

আর্দ্র জননীর মতো কোথাও শুশ্রূষাপরায়ণ
নদী নেই। চারিদিকে মানুষের ক্লান্ত মুখগুলি
রৌদ্রের পীড়নে ম্লান হৃতবর্ণ পুষ্পের মতোন
গভীর অসুখে জ্বলে। হেমন্তের কী-শূন্য গোধূলি
আকাশের চিত্রপটে। ঘৃণা, অবিশ্বাসে প্রজ্বলিত
নগর বন্দর গ্রাম জনপদ। আদিগন্ত স্থির
মানুষের নষ্টনীড় পরিণামী অন্ধারে আবৃত,—
ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সমাহিত বৃক্ষের শরীর।

আমি দৃশ্যান্তরে যাবো। এই প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘকাল
স্তিমিত আলোয় শান্ত আত্মহননের দৃশ্যাবলী
উদ্ভাসিত। শব্দ নেই। একমাত্র অস্ফুট, ভয়াল
রক্তের ঝর্ঝর ধ্বনি অনর্গল বর্ষণে কেবলি
চতুর্দিকে ঝ'রে পড়ে। কেউ নেই। শূন্য পথঘাট॥
হে রাজন্, খুলে দাও আলোকিত-দৃশ্যের কপাট॥

পুরী : হোটেলে সকাল

শক্তিব্রত ঘোষ

বিতর্কটা এরকম:
এলিয়টও অবশেষে ক্ষীয়মান হন,
এবং নিশ্চিত সত্য রবীন্দ্রনাথের বহুকাব্য
আজ যা সহজে সাব্য
দুদিন বাদেই তার আংশিক অবলুপ্ত হবে।

প্রতিপক্ষ : শাশ্বত কবীন্দ্র ; এই ভবে
যে কোন রচনা লোকোত্তর ;
গৌরাঙ্গের নির্মিত শহর
শ্বাসে দোলে চিরকাল বরণীয় হবে।

নতুন পক্ষের বার্তা : আকাশ ভালো না আজ,
নিষ্ঠুর শাণিত ঢেউ ভেঙে দেওয়া সমুদ্রের কাজ,
রৌদ্রের প্রহরা নিয়ে নীল জলে স্নান করা ঠিক,
মন্দিরে দর্শনে গেলে শাস্ত্রের নিরিখ
পালন করাই বিধি ; জ্যোষ্ঠের সম্মুখে
নির্লজ্জ গর্বের বুকে
ধূমপান শোচনীয়,—নিজেকেই অপমান করা।

একাই এসেছিলাম ; কেন না সমুদ্র
একাকীত্বে খেলে যায় রাখালের খেলা)
হোটেলের চেয়ারে সকাল : বড় ক্ষুদ্র
ক্ষতচিহ্নগুলি নিয়ে পরীতে অবেলা।

গিন্নী বলে—খালি হাতে যেতে পারবো না। মার জন্যে একটা শাড়ি না হলে চলে? তাছাড়া ডলি, আদু, আরতি তোমার কাছে সিনেমা দেখতে চাইবে মনে থাকে যেন।

—সব ব্যবস্থাই হবে। তুমি বরং আমার ধুতিটা আর সাদা সার্টটা কেচে ইস্তিরী ক'রে রেখো।

রত্নমণিবাবু স্বপ্ন-দেখা মন নিয়ে মগ্ন হ'যে অফিসে গেলেন। অফিসে গিয়েই ধর্না দিলেন ক্যাশিয়ারের কাছে। গোটা চল্লিশেক টাকা দাও ভাই। প্রেসটিজ কোশ্চেন। ---বিফল হয়ে অফিসের দারোয়ান রামজীকে বললেন, যত টাকা সুদ চাই দেবো, পঞ্চাশটা টাকা ধার এক্ষুণি দাও। রামজীর কথায় একেবারে রত্নমণিবাবু সঙ্গে সঙ্গে এ্যাবাউট টার্ন। আগের মাসের ধারের টাকা তো দূরের কথা সুদই নাকি বাকী আছে। এমনি করে টিফিন টাইম এসে গেল। দৈনিক এসে যে এক গ্লাস জল খান তাও আজ হয়ে ওঠে নি। নিজের চেয়ারে একবারও বসেছেন কি না মনে করতে পারছেন না। আজ অফিসে অনেকেই আসে নি। নতুন পুরোনো প্রায় সকলেই জামাইষষ্ঠী করতে গেছে। একা একা ফাঁকা পেয়ে রত্নমণিবাবু চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন-দেখা জামাই সাজার কথা ভাবতে লাগলেন। ও'র সেকশানের পিওন মান্না খুব বুদ্ধিমান। বাবুর মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরে গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে বলে, একটা জায়গায় গেলে আপনি টাকা ধার পেতে পারেন।

—কোথায়?

—গেটের সামনে কাবলেদের দেখেছেন তো।

—না, না। ওদের কাছে মরে গেলেও টাকা নেবো না। ভদ্রলোকেরা ওদের হাতে পড়লে আর বাঁচে না! আঁৎকে উঠে রত্নমণিবাবু যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠেন।

খুক খুক ক'রে হেসে নিলো পিওন মান্না। গেটের সামনে কি এমনিই ওরা আসে। এ অফিসের খুব কম বাবুই আছেন যিনি ওদের কাছ থেকে টাকা নেন নি। আমি ওদের ডেরা চিনি। সাড়ে পাঁচটায় আপনাকে নিয়ে যাবো।

সাড়ে পাঁচটায় রত্নমণিবাবু কাবলেদের আড্ডায় গিয়েছিলেন স্বপ্নসুখের কথা ভুলতে পারেন নি বলে। কিন্তু দিতে রাজী হলেও, টাকাটা পাওয়া যাবে পরদিন। রত্নমণিবাবুর স্বপ্ন সার্থক হবে না। তবুও তাঁকে বাসার ফিরতে হ'ল। গিন্নীর সামনে গিয়ে পরাজিত সৈনিকের মতো দাঁড়াতে হ'ল। —এবারও জামাইষষ্ঠীতে যাওয়া হ'ল না।—রত্নমণিবাবু উচ্চারণ করলেন প্রতিটি কথা অতিরিক্ত জোর দিয়ে।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

॥ আঠারো ॥

চোখে পুরু লেন্সের চশমা, পায়ে মোজা বুট, ধুতির নীচে শার্ট পরে বুড়ো বটকেষ্ট কতক্ষণ অরুণাদের গেটে অমনভাবে দাঁড়িয়েছিল কেউ টের পায় নি।

অরুণা জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে বটকেষ্টকে দেখেছিল। সমরে কাছে অফিসের কোনো কাজে এসে থাকবে ভেবে সে আর ওদিকে এগোয় নি। অরুণা কেমন করে জানবে বুড়ো বট এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় গেটের বাইরে ঘুর ঘুর করছে?

অরুণাকে দেখেই বুড়ো বট বিনয়ে বিগলিত হয়ে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছি। বড়ই বিপদগ্রস্ত। অফিস থেকে রিটায়ার করেছি। এ শর্মাকে কোনোদিন কারু কাছে মাথা নীচু করতে হয় নি। কোম্পানীর অফিসে তিরিশ তিরিশটি বছর দাপটের সাথে চাকরী করেছি। কলমটি কোনোদিন টাচ্ করি নি। কিন্তু এখন যে সমস্যাটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার সমাধান একমাত্র আপনিই করতে পারেন।'

আকাশ থেকে পড়ে অরুণা বলল, 'আমি?'

বট বিনয়ে আজানু ঝুঁকে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনিই শুধু আমার সমস্যার সমাধান করতে পারেন।'

অরুণা বলল, 'বেশ তো, আপনার কি সমস্যা আপনি বলুন। আমি চেষ্টা করে দেখব, কি করতে পারি।'

বট আবার আজানু ঝুঁকে বলল, 'একাজ শুধু আপনিই করতে পারবেন। আমি সব শুনেছি। উপেনের কাছে সব জেনেছি। 'আপনিই তো সমরের লোকাল গার্জেন।' আপনার কথায় সমর ওঠে বসে। সে আপনার কথা কখনও ফেলতে পারবে না। সমর আপনাকেই সব চেয়ে বেশি মেনে চলে।'

অরুণা বেশ রাগের ভাণ করে বলল, 'তাই নাকি? সে সব কথা আপনি কি করে জানলেন?'

বট বলল, 'এ সব কথা কি আর চাপা থাকে জননী? সমরের মনের কথা যারা জানে তাদের কাছেই শুনেছি।'

বেশ গম্ভীরভাবে অরুণা বলল, 'যারা জানে তাদের কাছেই শুনেছেন। এই যারা মানে? কার কার কাছে শুনেছেন এ কথা?'

বৃদ্ধ বট দেখল এঁর জেরা কোর্টের উকিলের চেয়েও জোরালো। ঘোড়েল ঘুঘু। সে বলল 'তাদের কথা ছেড়ে দিন। ধরুন আমিই বলছি। আমিই জানি, সমরবাবু আপনার কথা কখনও ফেলতে পারবেন না। করবেন এই উপকারটুকু? চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

অরুণা বলল, 'বেশ, আমি বললেই যদি কাজটা হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই বলে দেখব। এবার আপনি খুলে বলুন ব্যাপারটা কি?'

তৃণাদপি নীচু হয়ে বট নিবেদন করল, 'আজ্ঞে অরুণাদেবী, আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। সমরবাবুর ওপর কোম্পানীর সবাই খুশি। তার চাকরীটাও পাকা হয়ে গেছে। আমার বড়ই বাসনা আমার কন্যা চণ্ডীর সাথে শুভদিনে শুভক্ষণে সমরবাবুর পরিণয় সূত্রটা বেঁধে দিই।'

অরুণা অবাকভাবে বৃদ্ধের দিকে তাকালো।

বট বলল, 'কিছুই বলছেন না যে?'

অরুণা বলল, 'আমি বললেই কি সমরবাবু আপনার মেয়ে চণ্ডীকে বিয়ে করবেন?'

বট বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি একবার এটুকু শুধু বললেই হ'ল। আমি জানি, তিনি কখনও আপনার কথা ফেলতে পারবেন না।'

—'বেশ তো, আমি বলে দেখব। সমরবাবু আপনার মেয়েকে দেখেছেন কখনও?'

বুড়ো বট দন্ত বিকশিত করে বলল 'দেখেছেন বইকি? আপনি দেখতে চাইলেও এক্ষুণি দেখাতে পারি। দেখবেন?'

বলেই বুড়ো ত্রাহি ত্রাহি রবে ডাক দিল, 'চণ্ডী। গেলি কোথায়?'

বারো-তেরো বছরের মেয়ে চণ্ডী। কাছাকাছিই বোধহয় বট তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিল। বটের গুরুগর্জনে পড়ি-কি-মরি-করে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। বেচারা বোধহয় নতুন শাড়ি পরতে সুরু করেছে। শাড়িখানার অধিকাংশই ধূল্যবলুণ্ঠিত। তাকে দেখে অতিকষ্টে হাসি চেপে অরুণা বলল, 'ঠিক আছে। আমি বলে দেখব সমরবাবুকে। তার যদি মেয়ে

পছন্দ হয় তাহলে বাকীটুকু আমরা করে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

বট চণ্ডীকে ইসারা করে চলে যেতে বলল। চণ্ডী একটু দূরে চলে যেতেই বট বলল, 'দেখুন সব কিছু এখন শুধু আপনার ওপর নির্ভর করছে। অনুগ্রহ করে দেখবেন যেন এ শুভ কাজটা সুসম্পন্ন হয়ে যায়। তিরিশটি বছর কোম্পানীর চাকরী করেছি। কোনোদিন কলমটি টাচ্ করি নি। আজ তীরে এসে যেন তরী ডুবে না যায়।'

অরুণা মৃদু হেসে বলল, 'সমরবাবুর সাথে মেয়ের বিয়ে দেবার আগে তার চরিত্র সম্বন্ধে খবর নিয়েছেন? কি রকম ছেলে? কটি বিয়ে করেছেন? এই সব খবর জোগাড় করেছেন তো?'

বট বলল, 'কি যে বলেন? সমরের চরিত্র সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন? আমাদের অফিসের বড়সাহেব কি বলেন জানেন?'

অরুণা বলল, 'কি করে জানব বলুন?'

বট বলল, 'তিনি বলেন, চাঁদের কলঙ্ক থাকতে পারে, বুঝলে হে বট, কিন্তু ঐ যে নতুন ছেলেটি কোম্পানীতে ঢুকেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ সমরের কথাই বলছি, ওর চরিত্তিরে কোন দাগ নেই।'

অরুণা বলল, 'দাগ নেই সে তো ভালো কথা, কিন্তু আপনারা জানেন সমরবাবু বিবাহিত? একটা বৌ বেঁচে থাকতে আপনি তার হাতে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী আছেন?'

বুড়ো বট এক গাল হেসে বলল, 'আমার সাথে পরিহাস করছেন তো অরুণাদেবী? তা আপনি করতে পারেন বইকি। নাতনির বয়স হবে আপনার। সমর সম্বন্ধে আশা করি, কোনো খবরই আমার অজানা নেই।"

অরুণা বলল, 'তাহলে যা ভালো বিবেচনা করেন, করুন। আমি জানি উনি বিবাহিত। ওঁর স্ত্রীর নাম সরমা। তিনি বি-এ পাশ করেছেন।"

—'সমর বলেছে তো? ও ভয়ানক ঠাট্টা-তামাসা করতে ভালবাসে—এমন গম্ভীরভাবে সব কথাবার্তা বলবে যে কারুর সাধ্যটুকু নেই ওকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু সব তামাসা। বুঝলেন, ওর আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি।"

অরুণা বলল, 'না ওঁর বিয়ের কথা উনি নিজে বলেন নি। স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বরং চুপচাপই থাকেন। ওঁর বিয়ের কথা আমরা জেনেছি নৃপেনবাবুর কাছ থেকে। তাছাড়া হাসি-তামাসার কথা নয়। নৃপেনবাবু আমার কাছে বলেন নি। তিনি বাবা-মার কাছে নিজের মুখে ওঁর বিয়ের কথা বলেছেন। বিশ্বাস হ'ল? এরপরও আপনি ওঁর কাছে আপনার মেয়ে দিতে রাজী আছেন?"

এমন সময়ে ওপর থেকে সমর খটখট করতে করতে নেমে এলো। তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। নীচে নেমে বট ও অরুণাকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার বটকেষ্টবাবু? এত সকাল সকাল এ পাড়ায়?"

বট শুধু বত্রিশ থেকে কুড়ি বাদ দিয়ে বারো পাটি দন্ত বিকশিত করে বলল, 'হেঁ হেঁ বেরিয়েছিলাম একটু প্রাতর্ভ্রমণে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছি। আরে এই চণ্ডী, কোথা গেলি আবার?'

বেচারা চণ্ডী আবার সেই পোয়াকেই এসে হাত তুলে সমরকে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার অরুণার করুণা হল। মেয়েটাকে নিয়ে বুড়ো শাটল কর্কের মতন এদিক-ওদিক ছোঁড়াছুড়ি করছে দেখে সে তাকে ড্রইংরুম দেখিয়ে ভিতরে গিয়ে বসতে বলল।

সমরের অফিসের তাড়া ছিল। সে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। অরুণা মৃদু হেসে চোখ পাকিয়ে চুপি চুপি তার গা ঘেঁষে বলল, 'তাড়াতাড়ি আসবেন। কথা আছে। বুড়ো আপনার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। অনেক কিছুই লুকিয়েছিলেন এতদিন। জানতে চাই কে যুধিষ্ঠির? সত্যি বলছি আপনি এত ভাল নাটক করতে পারেন কল্পনাও করি নি। তাড়াতাড়ি আসবেন।"

সমর বলল, 'কেন? যুধিষ্ঠিরও তো শুনেছি মিথ্যেবাদী ছিলেন। তাকে দিয়েও বেদব্যাস মিছে কথা বলিয়েছেন। যাক গিয়ে আসব তাড়াতাড়ি। বুড়োকে আদর-যত্ন করো।'

অরুণা বলল, 'তা করব বইকি? সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন তার খাতিরের ত্রুটি হবে না।' (ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

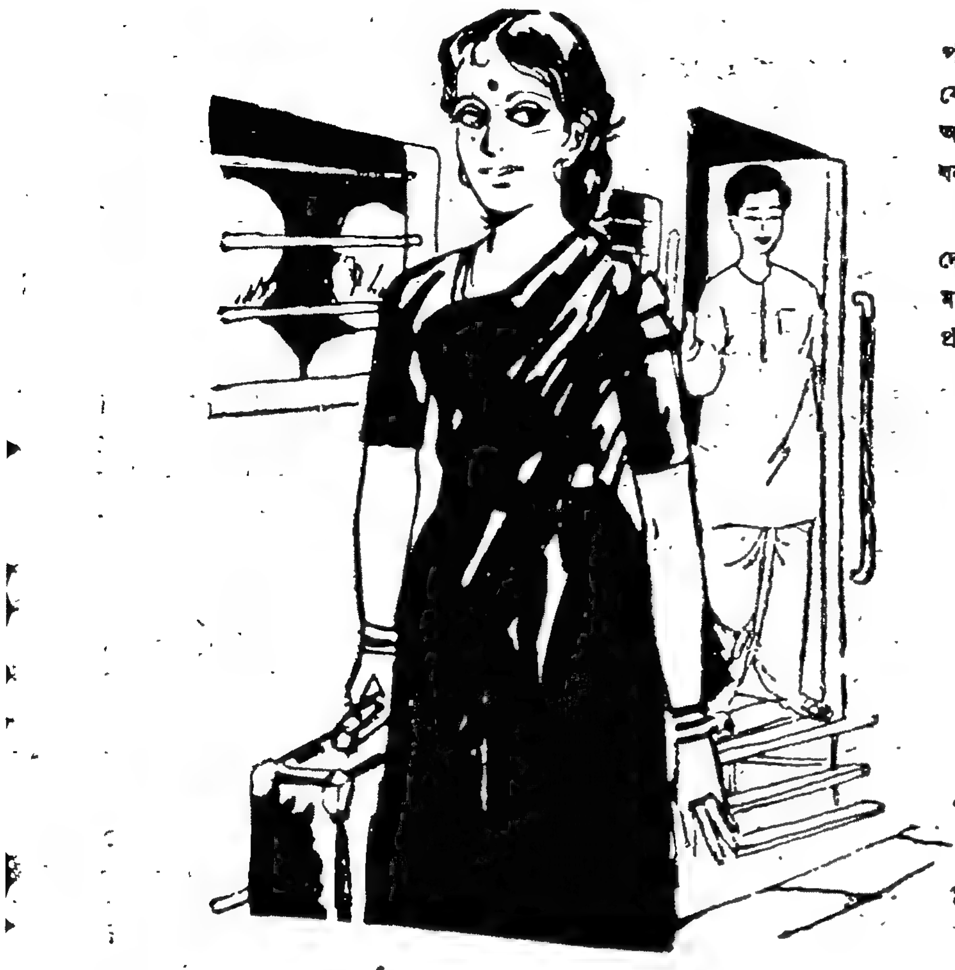

যদি কোনোদিন

মিহির আচার্য

ট্রেনগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা।

ভাবে নি সম্ভব হবে কোনোদিন।

স্টেশনের নাম বর্ধমান। ট্রেন কিছুক্ষণ আগে এসে দাঁড়িয়েছিল। শীর্ষেন্দুর পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। প্রায় ছুটে এসে দরজার হাতল ধরতে হয়েছে। এক হাতে হাতল অন্য হাতে ব্যাগ। কসরত করে দরজা নিজের হাতেই খুলতে হয়েছে। কারণ প্রথম শ্রেণীর কামরা, সেইজন্যেও কিংবা ভেতরে দরদী যাত্রীর অভাবেও হতে পারে। ভেতরে শরীর প্রবেশ করিয়ে অবাক হল শীর্ষেন্দু। গাড়িতে যাত্রী মাত্র একজন। মহিলা। এবং ওধারের বেঞ্চে বসে নিঃশব্দ জানলার বাইরে দৃষ্টি। আশ্চর্য, শীর্ষেন্দুর আবির্ভাবও তার মনোযোগে পড়ে নি।

শীর্ষেন্দু আসন গ্রহণ করল।

ট্রেন শীতের অন্ধকারের নির্মোক ছাড়াতে ছাড়াতে এগিয়ে চলেছে। আর্ত বাতাস হা হা করে জানলা ভেদ করে গায়ে এসে বিঁধছে। না: জানলাটা বন্ধ করল না সে।

শীর্ষেন্দু একটা সিগারেট খাবে কি না ভাবল। অন্যমনস্কে বারবার মহিলার দিকে দৃষ্টি পড়তে লাগল। শাড়িটা ঘোর লাল রঙের। গায়ে নীল রঙের কোট। পেছনে থেকে ওর দেহের ডৌল দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘাঙ্গী, শ্বেতশুভ্র গ্রীবার ওপর এলো-মেলো জড়ানো খোঁপা।

শীর্ষেন্দু বিস্মিত হল। তার উপস্থিতি মহিলার নিস্পৃহতায় বিন্দুমাত্র টোল খায় নি। যেন নিজের আচ্ছাদনে গুটিপোকার মত স্থির।

শীর্ষেন্দু সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে বিলিতি উপন্যাসটি পাঠে মনোনিবেশ করল।

'শুনছেন, দয়া করে জানলাটা বন্ধ করে দেবেন?'

শীর্ষেন্দু চমকে তাকাল মহিলার দিকে।

এবং হঠাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পরস্পর দুজন আত্মীয়ের দেখা হলে যেমন অনুভূতি হত তেমন একটা অতল বিষাদে দু'জনের কেউ কথা বলতে পারল না।

পরস্পরের দর্পণে ওরা সময়কে দেখছিল। দর্পণের রঙ-চটা, ক্ষতের মতো বিন্দু বিন্দু ফাটল এবং বিবর্ণ প্রতিবিম্ব:

'রঞ্জু!'

'শী-র্ষে-ন্দু!'

'বিশ্বাস করো আমার : এরকম কোনো অভিপ্রায় ছিল না। আমি জানতাম না তুমি এই কামরায় একা যাচ্ছ—' শীর্ষেন্দু বলল।

'শীর্ষেন্দু!' রঞ্জু কী বলতে যাচ্ছিল।

শীর্ষেন্দু বলল, 'আমি পরের স্টেশনেই কামরা বদল করব। সত্যি আমি দুঃখিত।'

শীর্ষেন্দু পারলে এখুনি গাড়ি থেকে নেমে যেত।

রঞ্জু হাসল। 'তার কি কোনো দরকার আছে? যখন ঈশ্বর আমাদের এইভাবে দেখা করিয়ে দিয়েছেন—'

শীর্ষেন্দু বলল, 'ঈশ্বর হচ্ছে সেকেলে জমিদারদের মতো, তার হাতে রসিকতার অনেক সময়। তার খেয়ালে তো মানুষের চলতে পারে

না। তাকে প্রতিদিন টিকে-থাকার লড়াই করতে হয়।' একটু থেমে: 'আর সত্যিই তো এটা দেখা নয়। একটা দুর্ঘটনা।'

রঞ্জু বলল, 'হোক না দুর্ঘটনা। ক্ষতি কী।'

'ক্ষতি আছে বৈকি। দেখার একটা অর্থ চাই।'

রঞ্জুর ঠোঁটের কোণে হাসির ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। কিংবা হাসিটা আপনিই মরে গেল।

রঞ্জু চোখ দিয়ে ওকে আঁচড়াতে লাগল।

'তোমার কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। রোগাও হয়েছ।'

শীর্ষেন্দু শরীরতত্ত্বের আলোচনায় আগ্রহ পেল না। আবহাওয়া সমাচারের কথা শুনতেও পছন্দ করত না।

কথা জোগাতে না-পেরে শুধু বলল: 'তুমি কিন্তু আগের মতোই আছ।'

রঞ্জু লুকে নিয়ে বলল, 'মেয়েদের তাড়াতাড়ি বুড়ো হলে চলে না। অন্তত সমাজটা যখন পুরুষশাসিত।'

'তাই হবে।'

'গম্ভীর হবার ভাণ কোরো না। গম্ভীর হলে তোমাকে সমালোচক মনে হয়। বস্তুত জীবনের সমালোচক আমরা কেউ নই। আমরা সকলেই জীবনের অন্তর্ভুক্ত।'

'তত্ত্ব?'

'না। দর্শন।' রঞ্জু বলল, 'যে-ঘটনার জন্যে আমরা দায়ি নই তাকে মনে রেখে---'

'রঞ্জু। আমি স্মৃতিচারণ করতে মোটেই রাজি নই।' শীর্ষেন্দুর গলা রূঢ় শোনাল।

'চুপ করো। স্মৃতির উর্ধ্বে আমরা কেউ নই। না, তুমিও নও, আমিও নই। তোমাকে পালাতে দেবো না। এখন দিন এসেছে—'

'আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব।'

'তার মানে তুমি আমাকে বেশি করে মনে রেখেছ। নিজের কাছ থেকে তো মানুষ পালাতে পারে না। তোমার হাতের আঙটি আমারই স্মৃতি বহন করছে। এই আঙটি আমি তোমাকে উপহার দিয়েছিলাম।'

শীর্ষেন্দু সংক্ষিপ্ত করে বলল, 'ওটা অভ্যেস।'

'অভ্যেস।'

'আঙটিটা অনেককাল থেকে আঙুলে আছে, রয়ে গেছে। এর বেশি কিছু নয়।'

'শীর্ষেন্দু।'

শীর্ষেন্দু বলল, 'সেজন্য কী আমাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে। আমার এই শরীরটাও তো মা-বাবার উপহার। আমি কোনো কৃতজ্ঞতা বোধ করি নে।'

'তোমার মনের স্বভাব আগের মতোই আছে—'

'সেটা আমার নিজস্ব।' শীর্ষেন্দু গর্ববোধ করল।

রঞ্জু কী ভাবল, একটু হাসল। তারপর বলল: 'তুমি বর্তমানে কোথায়?'

শীর্ষেন্দু বলল, 'মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। সাদা বাংলায় ওষুধের দালাল। ঘোরার কাজ। বেশি সময় বর্ধমানেই থাকি।'

'আশ্চর্য।'

'কী?'

'আমি থাকি বোলপুরে। কলেজের চাকরি।'

'তুমি চাকরি করছ।'

'হ্যাঁ।' রঞ্জু থেমে থেমে বলল। 'আমি বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমার বাবা মাসিকে বিয়ে করেছেন। অবশ্য—তুমি বিরক্ত হচ্ছ না আশা করি।'

'না।'

রঞ্জুকে ঈষৎ ক্লান্ত, শুকনো বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। খসখসে গলায় জানাল: 'মিলন জার্মানী থেকে ফেরে নি। সেখানে জার্মান মেয়েকে বিয়ে করেছে—'

শীর্ষেন্দু চমকাল। 'মিলন। কী বলছ। ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে—'

'না।' রঞ্জুর চোখে বোধহয় কয়লার গুঁড়ো পড়ল। রুমাল বের করে

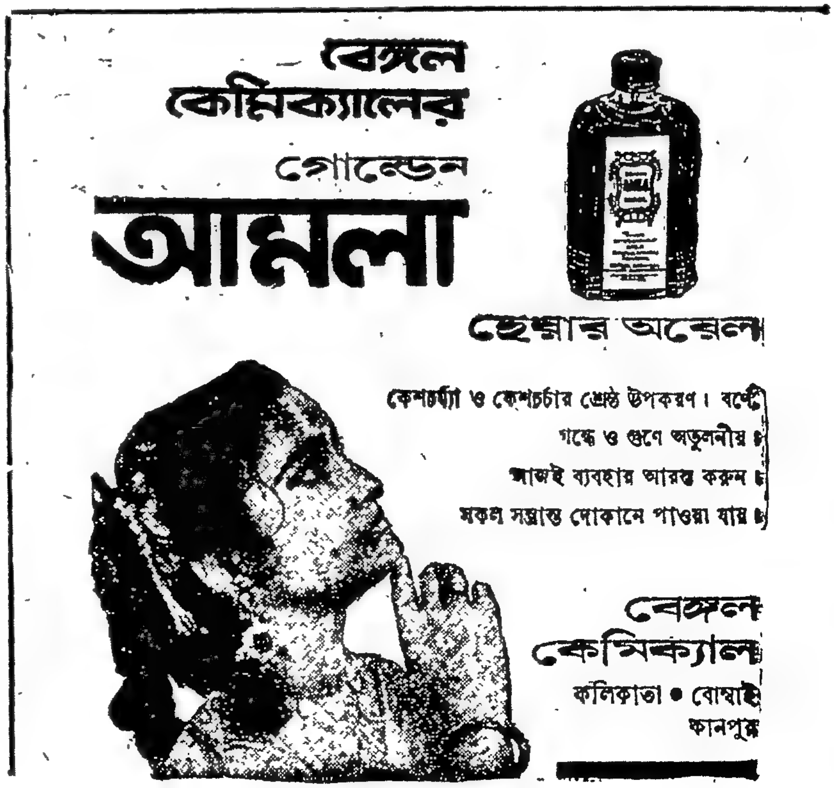

চোখ ঘষল। নাক, ঠোঁটের প্রান্ত। 'মিলন অবশ্য আমার বাবার টাকায় বাইরে গেছে। ওর মা হঠাৎ মারা গেলেন, অশৌচ অবস্থায় ওকে চলে যেতে হল। জানো তো বিদেশ যাওয়ার ভীষণ কড়াকড়ি। আমার বাবাও এই সুযোগ নষ্ট করতে চান নি।'

'কিন্তু, মিলন—'

বাইরে শীত জাঁকিয়ে বসেছে।

রঞ্জু দূর থেকে ভেসে-আসা গলায় বলল, 'মিলন সব জানিয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিল। আমি ওর বিয়েতে মত দিয়েছিলাম।'

'তুমি মত দিয়েছিলে!'

'দেবো না? ও যে আমার সম্মতি চেয়েছিল। এটা আমার পক্ষে কত বড় গৌরব—'

শীর্ষেন্দু বলল, 'গৌরব। প্রতারণার নাম গৌরব।'

রঞ্জু হাত তুলে বলল, 'ওকে তুমি ভুল বুঝছ। যে একদিন আমাকে ভালোবেসেছিল বলেই সে আর দ্বিতীয়বার ভালোবাসতে পারবে না। এর মতো মিথ্যে আর কী আছে। মানুষের মন তো আর সিন্দুকে তোলা থাকে না।'

'কিন্তু তুমি, তুমি কী পেলে?'

'অঙ্ক করার কথা বলছ?' রঞ্জু ক্ষীণ হাসল। 'জীবনে একেকজন যে কীভাবে পায়—'

শীর্ষেন্দু দৃঢ় গলায় বলল: 'এটা উত্তর হল না। তুমি কী পেলে?'

রঞ্জু বলল, 'আমার মুক্তি।'

'নিঃসঙ্গতা কী মুক্তি? একা হতে পারাটাই কী স্বাধীনতা?'

'জানি নে। তারপর, তোমার খবর বলো?'

'আমি একেবারে নিঃসংবাদ।'

'স্ত্রী, ছেলেমেয়ে—?'

শীর্ষেন্দু হো হো করে ফাঁকা প্রান্তরের শূন্য হাসি হাসল।

'তুমি কি আমাকে চিরকালের বোকা ভাবো? মানুষ নিজেকে কিছু সম্মান দিতে চায়। তুমি তো জানো মেয়েদের বিষয়ে আমি কী পাহাড় পরিমাণ ব্যর্থ। পুরুষকে বীরের মূর্তিতে দেখতে না পেলে কোন মেয়ে সহ্য করে।'

রঞ্জু বিমূঢ়ের মতো ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওর ঠোঁট কাঁপছে, শরীরের রক্ত মাছের মতো হিম।

শীর্ষেন্দু অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল।

নীরবতা।

'শীর্ষেন্দু—'

'উঁ?'

'ঠিক আগের মতো তোমার মেজাজ—'

শীর্ষেন্দু হাসল।

রঞ্জু বলল, 'আচ্ছা শীর্ষেন্দু, তুমি মানুষকে ঘৃণা করতে পারো না?'

'ঘৃণা কেন করব?'

'তার অর্থ তুমি মানুষকে ভালোবাসো না।'

'কি করে বুঝলে?'

'——'

শীর্ষেন্দু হাসল ফের।

'বেশ। আমার দিকে চাও।'

'এই তো চাইছি।'

'এখন বলো।'

'কী?'

'কেন ঘৃণা করতে পারলে না আমাকে?'

শীর্ষেন্দু বলল, 'ঘৃণা করলে মানুষ ছোটো হয়।'

রঞ্জু গম্ভীর হল। 'আমাকে আজ এড়াতে পারবে না।'

শীর্ষেন্দু বলল, 'ঘৃণা করতে গেলে আগে আমার দোষ-ত্রুটিগুলিকেই ঘৃণা করতে হয়।'

রঞ্জু বলল, 'তোমার তো কোনো দোষ ছিল না।'

শীর্ষেন্দু বলল, 'ছিল। আমার ইচ্ছার জোর ছিল না। যাকে পেতে হবে তাকে ছিনিয়ে নেবার সাহস আমার ছিল না। আমি একটা-কিছু হতে চেয়েছিলাম, করতে নয়। তাই—'

'শীর্ষে—'

'রঞ্জু, আমাকে বলতে দাও। ভালোবাসার ঐশ্বর্য সকলের ভেতরে থাকে না। আমাদের ইচ্ছাগুলো কাজের হাত-ধরা নয়।'

রঞ্জুর চোখের পুকুরে একটা আলোর মাছ চলকে উঠে মিলিয়ে গেল। 'কেন তোমার দোষ-ত্রুটি নিয়েই আমাকে জয় করে নিলে না? মিলন আমার মনে ডাকাতি করেছিল। অবশ্য বাবার ঠেস ছিল তার পেছনে।'

একটু চিন্তা করে বলল, 'আমি নিজেকে বুঝতে পারি নি, সে-বয়েসটা বোঝারও নয়। জানো তো বাবার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল।'

'আজ এসব কথা থাক রঞ্জু—'

'না। থাকবে কেন।' রঞ্জু নিশ্বাস ফেলল, 'আমার জন্যে একটি নির্দোষ লোক শাস্তি পাবে আমি তা মেনে নেবো কী করে।'

'মেনে নিতেই হয়, রঞ্জু। বেঁচে থাকা মানেই মেনে-নেয়া।'

'তুমি এমন বেশে আমার চোখে পড়লে কেন? আমি যে ভেবেছি তুমি সুখী হয়েছ, ঘর পেয়েছ, শান্তি---'

'রঞ্জু—'

'মিলন আমাকে বাদ দিয়েও শান্তি পেল। তুমি কেন পেলে না?'

শীর্ষেন্দু বলল, 'আমি জানতাম না আবার দেখা হয়ে যাবে।'

রঞ্জু বলল, 'শীর্ষেন্দু, আমাদের এগারো বছর—আর কোনোদিন ফিরে পাব না। সময় হাঙর হয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে আমাদের অস্তিত্ব। এই ব্যর্থতা, গ্লানি—'

'রঞ্জু।'

'যদি পৃথিবীতে কারুর জন্যে বাঁচতে না-শিখলাম তাহলে জীবনের অর্থ কী। আমিও তো দুর্বল মানুষ। আমারো নির্ভরতা চাই, সমবেদনা চাই, প্রীতি চাই—'

'রঞ্জু—'

শীর্ষেন্দু উঠে এসে ওর পাশে বসল।

বাইরে শীতার্ত অন্ধকার। আকাশ, গাছ-গাছালি, সমুহ দৃশ্যপট।

'এতে তোমার কোনো হাত ছিল না—' শীর্ষেন্দু বলল : 'আমি মানুষের অদৃষ্টে বিশ্বাসী।'

রঞ্জু বলল, 'তুমি জানো না আমি কলেজে কাঁটা হয়ে থাকতাম। তোমাকে সবচেয়ে ভয় করতাম কখন তুমি প্রস্তাব করে বসো। অথচ তোমার কোনো দোষ ছিল না। আমার দিক থেকে উৎসাহ পেয়েছিলে বলেই- - -। না না শীর্ষেন্দু আমি তোমার সঙ্গে শঠতা করেছি মিলনকে আমায় গ্রহণ করতে হবে জেনেও। আমার লোভ ছিল, ক্ষুদ্রতা ছিল—'

শীর্ষেন্দু বলল, 'এসব কথা থাক রঞ্জু। তোমাকে আমি বুঝেছিলাম। তোমার ভেতরেই দ্বন্দ্ব ছিল, তুমি নিয়ত রক্তাক্ত হচ্ছিলে। তোমার কষ্ট বুঝেই আমি নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছিলাম। কিন্তু মিলন এমন করবে জানলে—'

'শীর্ষেন্দু—'

'কী ?'

'আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারো না ?'

শীর্ষেন্দু বলল, 'ক্ষমা করলে যে করুণা করতে হয়, রঞ্জু। আমি তা পারি নে।'

রঞ্জু বলল, 'অতীতের একটা ভুলের কি সারাজীবনে সংশোধন করা যায় না ?' বলো—'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি নে রঞ্জু—'

'পারছ পারছ। আমি ভীষণ ক্লান্ত শীর্ষেন্দু। জীবনটা একটা বোঝার মতো—যত দিন যাচ্ছে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছি। আধুনিক ছেলে-মেয়েদের চিনি নে বুঝি নে, তারা আমার কাছে বিদেশী। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়েছিলাম তারা দূরে বহুদূরে চলে গেছে। আমি চেনা কাউকে পাই নে, আমাকেও কেউ চেনে না। শীর্ষেন্দু আমাদের সে দিন সে কী একেবারেই হারিয়ে গেছে, কোথাও কী নেই বাকি ?'

গাড়ি থামল।

আলোকিত স্টেশন।

ওরা কেউ কারুর দিকে তাকাল না। পাশাপাশি বসে। বাইরে জনতা, ব্যস্ত পদশব্দ। হকার-ভেণ্ডারদের আরজি।

আবার গাড়ি ছাড়ল।

শীতের রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল।

'শীর্ষেন্দু—'

'উঁ ?'

'কী ভাবছ ?'

'জানি নে।'

'আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব। আর কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি নে। যদি আবার দেখা হয় লক্ষ্মীটি আজকের মতো কোরো না। একটু ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়ের মতো ব্যবহার কোরো।'

শীর্ষেন্দু নিঃশব্দ।

'অন্তত রাত্রে শুয়ে জানলার বাইরে আকাশ দেখবার সময় যেন মনে করতে পারি এই আকাশের তলায় আর-একজন মানুষ আছে। যে আমার মতোই নিঃসঙ্গ, আমার কালের মানুষ, যাকে আমি দোসর কল্পনা করতে পারি। শীর্ষেন্দু, বড় ফাঁকা লাগে, চারদিকে অচেনা অজানা পরিবেশ। আমি স্রোতে মিশতে পারি নে—'

পরের স্টেশনে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে থামল।

রঞ্জু উঠে দাঁড়াল। ওর দীর্ঘ শরীরটা কৃষ্ণচূড়ার মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমস্ত আকাশকে আচ্ছাদিত করল। রঞ্জুর হাতে স্যুটকেশ। ওর ঠোঁট কাঁপছিল, শাদা আঙুলগুলি যন্ত্রণার মতো বিক্ষোভ তুলছিল। ও হাসল। 'চলি।' দরজা খুলে প্ল্যাটফরমের কুয়াশাচ্ছন্ন আলোয় সে নেমে গেল।

শীর্ষেন্দু জানলায় পাথর হয়ে বসে রইল।

পদশব্দে

সুমিত মিত্র

অন্ধকার বনপথে কারা গেল চলে
নীরব স্বপ্নের মতো
রাত্রির দুয়ারে দুয়ারে।

এখানে ছিলাম আমরা বহুকাল, নিত্যসহচর
নরম লোমেতে ভরা বিলিতি কুকুর,
এবং শীতের দুপুরে
একোয়ারিয়ামে রাখা ধীর স্থির মাছেদের
শীতল শরীর, সবুজ ননেতে
ইতস্তত দেখা যায়
অন্ধকার বেতঝোপের মাঝে
বেঁধে থাকা সময়ের শব।

অতঃপর রাত্রি নামে, হেমন্তের ছাদে
নরম খড়ের মতো জ্যোৎস্নার আভা।
বহুক্ষণ ধরে গমের দানাগুলিকে নিয়ে
টানাটানি করে ইঁদুরেরা। টিনের চালায়
শিশির পড়ার শব্দ ঘুমের ভিতরে। বাতাসে
শ্যাওলার ঘ্রাণ। পুকুরের নিস্পন্দ জলে
সারি সারি নারকেল গাছ ছায়া ফেলে।
রেশম শাড়ির মতো জড়ানো কুয়াশা
পিচ্ছিল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত মাঠে।

অন্ধকার বনপথে কে হে
আমাদের নীরব চোখের পানে সোজাসুজি তাকায়
হৃদয় মাড়িয়ে কে যায়, কে হে
অকরুণ ক্লান্ত পা'য়ে হাঁটে ?

বঙ্গদর্শন

● শুধু বিড়ম্বনা, শুধু ভোগান্তি, শুধু নিষ্ফল চেষ্টা

রাজধানী :

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে সভাপতির আসনে বসিয়ে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করেছেন। আমরাও তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আদর্শনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। অতীত জীবন তাঁর গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় এই সরল গ্রামের মানুষটি মেদিনীপুরে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠা করে অভূতপূর্ব নেতৃত্ব, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কামরাজ পরিকল্পনাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে, কংগ্রেসকে জঞ্জালমুক্ত করার বাসনা নিয়ে যাঁরা মন্ত্রিত্বের দুর্লভ গদী ত্যাগ করেছিলেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করতে তাঁকে বার বার অনুরোধও জানানো হয়েছিল। মানুষের সেবাকে যাঁরা জীবনে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেবাকাজের তাগিদ এলে তাঁরা চুপ করে থাকতে পারেন না। দীর্ঘ এগারো বছর সেচ-মন্ত্রীর পদে তিনি বহাল ছিলেন। সেখানে তিনি কর্মদক্ষতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে তাঁর সহকর্মীরা সেদিন তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দেশসেবার, কংগ্রেসকে গ্লানিমুক্ত করবার পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি আজ পেলেন। এ কথা সত্য, অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসে উপদলীয় সংঘাতটা তেমন প্রকট হয়ে ওঠে নি। অসন্তোষ, রেষারেষি এবং ক্ষমতালিপ্সা পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে নেই, এ কথাও কেউ হলপ করে বলতে পারবেন না। যে কোন কারণেই হোক, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় আসীন নেতাদের সাথে মুখোমুখি সংগ্রামে নামতে পারেন নি। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এর জন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রশংসাও পেয়েছেন। আজ তিনি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অন্যতম অংশীদার। অধিক সময় তাঁকে দিল্লীতেই কাটাতে হচ্ছে। বাংলার সংগঠনের পেছনে আগের মত সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব না-ও হতে পারে।

ত্রিশ বছরের অধিককাল অজয়বাবু কংগ্রেসের সাথে যুক্ত। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অমায়িক স্বভাব এবং সাদাসিধে চালচলনের জন্য তিনি পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সকলেরই প্রিয়। কংগ্রেস সংগঠনের দুর্বলতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলার কংগ্রেস হৃতগৌরব ফিরে পাবে, এই আশাই সাধারণ মানুষ করে।

* * *

১২ই জানুয়ারী কলকাতায় কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন, পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু এসেছে চার লক্ষ। এদের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ ষাট হাজার উদ্বাস্তু বাংলার বাইরে গেছে। তিনি উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের কাজে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রগুলোর কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন, তাতে কেউ বিস্মিত হবেন না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা সত্যি কোন রাজনৈতিক সমস্যা নয়। এ সমস্যা মূলত মানবিক। এ সমস্যা জাতীয় সমস্যা। কাজেই সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক খেলায় নামলে, বাংলার বাইরের শিবির ত্যাগ করতে উদ্বাস্তুদের উস্কানী দেওয়া হলে সর্বনাশই ডেকে আনা হবে। ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিম বাংলার বুকে উদ্বাস্তুদের আর ঠাঁই হতে পারে না। কাজেই শিবির ত্যাগ করে যারা ফিরে আসবে পশ্চিম বাংলার মানুষ যেন তাদের সমর্থন না করেন।

খুবই ভাল কথা। শিবির ত্যাগের প্রশ্রয় দেওয়া কেউ সমর্থন করবে না। কিন্তু যারা পশ্চিম বাংলার মাটিতে পা দেবার পর বিনা দ্বিধায় দণ্ডকারণ্যে চলে গিয়েছিল, তারা কেন ফিরে আসছে? পশ্চিম বাংলায় ফিরে এলে সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে জেনে এই অসহায় মানুষগুলো নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমাতে চাইছে কেন? এ সম্পর্কে শ্রীঘোষ প্রকৃত প্রস্তাবে নীরব। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি জানিয়েছেন, শিবিরগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে এবং তা সংশোধনের চেষ্টাও হচ্ছে। নির্মম অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে যারা পূর্ব বাংলার মাটি আঁকড়ে থাকবার জন্য এতদিন চেষ্টা করেছিল, তারা এ শিবিরের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বরদাস্ত করতে পারে নি এবং এত সহজে রাজনৈতিক শিকারে পরিণত হয়েছে, এ কথাই বা শ্রীঘোষের মত অভিজ্ঞ নেতা কি করে মেনে নিলেন, বোঝা খুব শক্ত নয়।

আসল কথা, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ভবন উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বরাবরই অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শ্রীঘোষ নতুন কথা কিছুই বলেন নি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই উদ্বাস্তুদের রাজনীতির আসরে টেনে আনা সমর্থন করবেন না। এ কাজ মানবতা-বিরোধী—অপরাধযোগ্য। কিন্তু পশ্চিম বাংলার কোন রাজনৈতিক দলই এ অপরাধ থেকে একেবারে মুক্ত, জোর গলায় নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না।

শ্রীঘোষের স্বীকৃতি অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় নবাগত উদ্বাস্তু রয়ে গেছে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার। বেকারের ভারে পশ্চিম বাংলার সমাজ-জীবন প্রায় ভগ্নদশায় এসে পৌঁচেছে। যারা নতন এসেছে তাদের জীবিকার প্রশ্ন আরও সঙ্কটের সৃষ্টি করবে। এই সঙ্কট সমাধানের কোন ইঙ্গিত শ্রীঘোষের মত সর্বভারতীয় নেতার কাছে আমরা আশা করেছিলাম। তিনি এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে নীরব। (মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।) অথচ এই বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। আমরা বারবার এই কথা উল্লেখও করেছি। পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাতে হলে, উদ্বাস্তুদের জীবিকার উপযোগী ছোট, মাঝারী ও বড় শিল্প শহরে, শহরতলীতে এবং গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা' ছাড়া পশ্চিম বাংলায় জমি কতটা আছে, তাও সরেজমিনে সমীক্ষা সাপেক্ষ।

● পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রী জয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকেও শ্রীঘোষ "রাজনৈতিক খেলার পতুল" বলে সমালোচনা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। শ্রীদাশগুপ্ত যে তথ্য পরিবেশন করে পশ্চিম বাংলায় আরও উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভব বলেছেন, সে যুক্তির প্রতিবাদে পাল্টা কোন তথ্য পরিবেশন করা হয় নি।

উদ্বাস্তুদের কলোনীগুলো বৈধকরণের ব্যাপারে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ যেন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার পুরানো দ্বন্দ্বটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কংগ্রেস নেতাদের এই ধরণের বক্তৃতার ফলে, উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকারের টাকা দিয়ে সংস্কার করা জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে বারবার বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীঘোষ বলেছেন, "এমন কি পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের জমি বে-আইনীভাবে দখল করা সত্ত্বেও সরকার সংবিধানের বিরুদ্ধে ঐসব উদ্বাস্তুর জবরদখল কলোনীগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পশ্চিম বাংলার ঐসব জমির মালিকরা

কোর্টের দ্বারে না গিয়েই তা মেনে নিয়েছেন।" একথা অনস্বীকার্য, এ ব্যাপারে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন যাচাই করে দেখবার জন্য কেউ সুপ্রীম কোর্টের আশ্রয় নেয় নি। কিন্তু পুলিশ দিয়ে, ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে নির্যাতন করতে এবং উচ্ছেদের মামলা দফায় দফায় রুজু করে উদ্বাস্তদের নাজেহাল করতে কেউ সেদিন কসুর করেন নি।

সস্তায় কিস্তিমাতের চিরাচরিত প্রথায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত নেতা এগিয়ে চলবেন, দেশবাসী সেই আশা তাঁর কাছে করে না। উদ্বাস্তদের জমি দখলের প্রশ্ন কেন এলো, সে কথাগুলো সবিস্তারে তুলে ধরে তার সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দেবেন, এই আশাই সকলে করে। পিতৃপুরুষের পুণ্যস্মৃতি-জড়িত ভিটে থেকে উদ্বাস্তদের উচ্ছেদের স্থায়ী ব্যবস্থাটা করবার মৌলিক অধিকার দেশের নেতাদের তারা স্বেচ্ছায় কোনদিনই দেয় নি। সারা ভারতের স্বার্থেরই বলি পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুরা। এরা সেখানে থাকতে পারবে না, একথাও দেশ-বিভাগের সময়েই নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বিপদের দিনে ভারতের বুকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। সেদিক থেকে বিচার করলে উদ্বাস্তরা কারো কৃপার পাত্র নয়। অধিকারের দাবী নিয়েই তারা এসেছে। সেই অধিকারের মর্যাদা না দিলে অন্যায়ই করা হবে।

* * *

রাজ্য সরকার কর্মচারীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার জন্য ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ২০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মীরা বছরে ৭৫ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বাবদ পেতে পারবেন। দুর্দিনের বাজারে যা' পাওয়া যাবে তাকেই কর্মচারীরা আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা একেবারে ত্রুটিহীন নয়। কর্মচারীর নিজের, তার স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের চিকিৎসার জন্যই টাকা মঞ্জুর হবে। তাদের ওপর নির্ভরশীল উপার্জন-অক্ষম মা-বাবার চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। বাঙালী পরিবারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছোট ভাই-বোন পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। আশা করি, সরকার এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন।

* * *

কলকাতা শহর ও বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চলের খাদ্য-সঙ্কট দূর করার জন্য রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত কিছুটা তৎপরতার পরিচয়ই

● শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

দিয়েছেন। এই এলাকার ষাট লক্ষ লোককে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে সপ্তাহে এক কে-জি চাল এবং এক কে-জি গম দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আরও জানিয়েছেন, মন্দার ক'টা মাস চালিয়ে যাবার মত মজুত খাদ্যশস্য সরকারের ভাণ্ডারে মজুত আছে। তবে, গম নিতেই হবে—গম না নিলে চাল সরবরাহ করা হবে না। মোটা কাঁকর ভর্তি চালই এতদিন ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে সরবরাহ হ'ত। এখন ভাল চালও পাওয়া যাবে। নতুন ব্যবস্থায় কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের মানুষ কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। থলে হাতে নিয়ে দোকানের পর দোকান ঘুরে একেবারে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ঘরে ফিরে গিন্নীর ঝাঁঝালো কণ্ঠ আগের মত আর শুনতে হবে না। এটা কম কথা নয়। পশ্চিম বাংলায় বর্ষা আসি আসি করছে। উত্তর বাংলায় তার কিছুটা পরিচয় এর মধ্যেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু বর্ষা আসবার বহু আগেই চাল-তেল ও মাছের শোকে প্রায় প্রতিটি ঘরেই শ্রাবণের ধারা চলছিল। চালের কিছুটা সুরাহা হলে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। অন্তত মাসের চাল কেনার বরাদ্দ টাকার সবটাই আর চোরাকার-বারীর পকেটস্থ হবে না।

এর মধ্যেই ব্যবসায়ীমহল না-কি তাদের আঁট-ঘাট বাঁধতে আরম্ভ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে রব উঠেছে এ ব্যবস্থায় কুলোবে না। বাইরের আমদানী না বাড়াতে পারলে বর্ষাসমাগমের পরই সঙ্কট দেখা দেবে বেশি করে।

সরকারকে দৃঢ়তার সাথে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। সরকার তার নীতিতে অবিচল থাকলে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনও পাবেন। কিন্তু প্রশাসন-যন্ত্রের শৈথিল্যে বাংলার চাল বাইরে চলে গেলে, ন্যায্যমূল্যের দোকানের গোপন পথে খাদ্যশস্য পাচার হলে, কাগজে-কলমে ৬০ লক্ষ লোকের নামে যা সরবরাহ হবে তাতে চোরাবাজারের উদরই স্ফীত হবে মাত্র। মুখ্যমন্ত্রী অবিশ্যি ভুয়া রেশন কার্ডের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন। সে আশ্বাস অনুযায়ী কাজ হলে—খাদ্যশস্যের দোকানগুলোর ওপর কড়া নজর রাখতে পারলে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া কষ্ট-সাধ্য হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিভিন্ন

জেলার খাদ্য-পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সাধারণভাবে ধান ও চাল পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর এই তথ্যের সাথে গ্রামের লোকেরা একমত হতে পারবে না। তিনি ভ্রমাত্মক সংবাদই পেয়েছেন। সরকারের বাঁধা দামে চলেছে ধান আটকের অভিযান। সাধারণ মানুষ সে দামে ধান কিনতে পারছে না। আমরা এখানে মুখ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্যই কয়েকটি জেলার ধান ও চালের মূল্য অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব, তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তিনি সরেজমিনে তদন্ত করলে দেখতে পাবেন, তাঁকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করা হয় নি। সরকারের বাঁধা দামে ধান-চাল-তেল ও মাছ পশ্চিম বাংলার কোথাও পাওয়া যায় না।

কলকাতা শহরের বুকে লক্ষ লক্ষ মণ সরষে থাকা সত্ত্বেও খুশিমত চাপ দিয়ে ব্যবসায়ীরা তেলের দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের দাপট দেখে সরকারের প্রশাসন-যন্ত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে। তিন টাকা তেলের দাম বেঁধে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেছিলেন, ব্যবসায়ীরা এই মূল্যে তেল বেচতে সম্মত হয়েছে। দু-দিন পরই দেখা গেল ব্যবসায়ী-চক্রের একাংশের সুর বদলে গেছে। খুচরা ব্যবসায়ীদের মুখে বুলি উঠলো—মিল থেকে যে-দামে তেল দেওয়া হয়, তাতে তিন টাকায় তেল দেওয়া সম্ভব নয়। মিল-মালিকেরা গাইতে আরম্ভ করল সরষের দাম অত্যধিক। তেলের দাম বাড়লো। তিন টাকার তেল পৌনে চার টাকায় উঠলো। রাজ্য সরকার সোয়া তিন টাকা দাম বাঁধবার কথা ঘোষণা করতে-না-করতেই সরষের দাম মণপ্রতি দু' টাকা বেড়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, সোয়া তিন টাকাতেও ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট নয়। তারা না-কি বলে বেড়াচ্ছে তেলের দাম প্রতি কে-জি পাঁচ টাকা করে ছাড়বে। সরকার যে-ভাবে ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীকে তোয়াজ করে চলেছেন, এ নীতির পরিবর্তন না হলে তেলের দাম পাঁচ টাকায় তুলতে তাদের খুব বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। পাইকারের গোলায় চাবিকাঠিতে হাত না দিয়ে খুচরা বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এতো অর্থনীতির গোড়ার কথা। আমাদের সরকারের গোড়াঘাটে হাত দিতেই যত সংশয় ও দ্বিধা। এই সংশয় পরিহার করে বলিষ্ঠ কর্মপন্থা না নিলে বিপদ আরও ঘনিয়ে উঠবে—তখন আর হালে পানি পাওয়া যাবে না।

বর্ধমান :

পশ্চিম বাংলার শস্যভাণ্ডার বর্ধমানকে এমন দুর্গতির মধ্যে পড়তে হবে, কেউ ক'মাস আগেও ভাবতে পারে নি। ঘরে ঘরে চাল বাড়ন্ত। খোলা-বাজারের দুয়ারে ধর্না দিয়ে মানুষ হয়রান হচ্ছে; কিন্তু এককণা চালও মিলছে না।

ধান-চাল আটকের অভিযান অবিশ্যি এখনও চলেছে। অভিযানের কাজটা একেবারে বি-ডি-ও পর্যায়ে নেমে এসেছে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। অসাধু ব্যবসায়ীরা আগে-ভাগেই তাদের কাজটা গুছিয়ে নিয়েছে।

ধান আটক করা হয়েছিল আড়াই লক্ষ মণের কাছাকাছি। সে ধানের অর্ধেকটাও চালকলের দরজা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে নি। প্রশ্ন উঠেছে এ ধান কোথায় গেল? সঠিক জবাব পাওয়ার কোন উপায় নেই।

সরষের তেল উধাও হয়েছে বাজার থেকে। তেল-মাছ ও চালের অভাবের চাপটা তরকারীর বাজার তুলেছে গরম করে।

আউস ধানের সম্ভাবনাও তেমন উজ্জ্বল নয়। অনাবৃষ্টিতে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে উঠেছে। সেচের জল আসছে না দামোদরের খাল বেয়ে। এবারের খারিপ চাষের জন্য দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের জল মাঠে ঢোকে নি। অভাবের দিনে চাষের জমিতে জল না দিয়ে ভরা বর্ষায় জল ছেড়ে দিয়ে মাঠ-ঘাট ভাসিয়ে দেবার ঐতিহ্য করপোরেশনের কর্তা-দের আছে। সেচের দায়িত্ব পশ্চিম বাংলা সরকারের হাতে আসবার পরও সে নিয়মের কোন পরিবর্তন হয় নি। খালগুলো শুকনো—ঠন ঠন করছে তাদের তলাকার মাটি। এদিকে বৈঠকের পর বৈঠক চলেছে পশ্চিম বাংলা সরকার আর দামোদর উপত্যকার মাতব্বরদের মধ্যে। ফয়সালা হয়ে নুন আনতে পান্তা যে কড়-কড়ায় পরিণত হচ্ছে সেদিকে কারো কোন হুঁশ নেই।

বীরভূম :

বীরভূম জেলার এবার ধান বেশি উৎপন্ন হয়েছে ১০ লক্ষ মণ। এ তথ্য সরকারী মহলের। এ ধান গেল কোথায়? এদিকে ধানের অভাবে চালকলগুলো সপ্তাহে চারদিনের বেশি চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, জেলার যারা মজুতদার তাদের শতকরা ৭০ জনের ধান মজুত করার লাইসেন্স নেই। কাজেই ঘরে ঘরে হানা না দিলে কার ঘরে কি পরিমাণ ধান রয়েছে বলা শক্ত। এত মেহনতের কাজ করবে কে? তাছাড়া বিনা লাইসেন্সে যাঁরা ধান জমিয়েছেন, তাঁদের তাগত আলাদা। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবার আশঙ্কা রয়েছে।

চালকলের মালিকরা এদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা ধুয়া তুলেছে, উৎপাদন খরচটা এবারে যে-পরিমাণে বেশি পড়েছে তাতে করে সরকারের বাঁধা মূল্যে ধান দিতে গেলে লোকসান দিতে হবে অনেক। গাঁটের কড়ি লোকসান দিয়ে তাই চালকলে ধান সরবরাহ করতে জোতদার ও মজুতদারেরা নারাজ।

বীরভূমে চাল বিলকুল নেই একথাও সত্যি নয়। চালকলের অসাধু মালিকরা বেশ পয়সা লুটে নিচ্ছে। সরকারী অভিযানের ফলে যারা দুর্বল চাষী, ফাঁকি দেবার ফিকির-

কান্দি করে উঠতে পারে নি, এমন ধরণের জোতদারদের ধান বেরিয়ে আসছে। চালকলেও সে ধান যাচ্ছে। চালকলের মালিকেরা সরকারের লেভির পরিমিত চাল বাদে বাকি চাল কাগজে-কলমে যাই করুক, সাধারণ মানুষের ভোগে তা আসছে না। কাজেই বীর-ভূমের কোন বাজারে ন্যায্যমূল্যে চাল পাওয়া যাচ্ছে না।

চাল যাচ্ছে কোথায় ? সরকার নিশ্চয়ই তার খবর রাখেন। খবর, না পেয়ে থাকলে সরকার বাহাদুর ধুলিয়ান ও খাগড়া ঘাটে পুলিশ মোতায়েন করলেই দেখবেন রাতের ঘন অন্ধকারে আড়াল দিয়ে হাজার হাজার বস্তা চাল বাইরে চলে যাচ্ছে।

মেদিনীপুর :

দীঘা এখন সরগরম। ভ্রমণার্থীর ভিড় বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। দীঘা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ভ্রমণ-বিলাসীদের। সে আমন্ত্রণে জনারণ্য থেকে বেরিয়ে এখানে এসে তারাও যেন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু অতিথিদের সুখ-সুবিধা ও আপ্যায়নের ভার যাদের ওপর ন্যস্ত তারা দীঘার মর্যাদা করেছে ক্ষুণ্ণ। কলকাতার টুরিস্ট ব্যুরো এবং দীঘায় অবস্থানকারী অফিসারদের মধ্যে যোগাযোগটা ঢিলে হওয়ায় কষ্টভোগ করতে হচ্ছে অনেক-কেই। কলকাতার ব্যুরোতে সংবাদ নিয়ে দীঘায় পৌঁছে দেখা যায় ঘর খালি নেই। এ ঘটনা ঘটছে হামেশাই। জলের কষ্ট লেগেই আছে। সরকার বার ইঞ্চি ব্যাসের একটি নলকূপ খননের কাজে সম্প্রতি হাত দিয়েছে। এই নলকূপ হলে জলের কষ্টটা আর অবিশ্যি থাকবে না।

সরকার দীঘায় আরও হোটেল-বোর্ডিং নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। যে-হারে দীঘার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়ে চলেছে তার চাহিদা মেটাতে আরও গৃহনির্মাণ প্রয়োজন হবে।

দীঘার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে পর্তুগীজ আমলের একটি কামান। কামানটি ছিল হুগলী নদীর মোহনায় অবস্থিত খেজুরীর প্রাচীন পোস্ট অফিসের সামনে। সেখান থেকে দীঘায় বনবিভাগের বাংলোর সামনে কামানটি স্থাপন করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ :

বীরভূমের কিছুটা চাল বাকি মুর্শিদাবাদে চলে আসছে। তা' সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ জেলায় কালোবাজার ছাড়া চাল মিলছে না। সরকারের গুদামে চাল নেই। শহরাঞ্চল ও হরিহর পাড়ার ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে সপ্তাহ তিনেক হল চাল দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। বহরমপুরের পাইকাররা বাজারের অনিশ্চিত অবস্থা দেখে চাল মজুত করা এক রকম বন্ধ করে দিয়েছে। বহরমপুরের বাজারে মোটা চালের দাম প্রতি কিলো গ্রাম এখন ৮০ নয়া পয়সা। মাঝারী শ্রেণীর চাল অতি মিহি চালের মর্যাদা পেয়েছে। মিল-মালিকরা প্রতি কুইণ্টালে দু'টাকা করে চালের দাম বেশি নিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে পাইকারের দল। পাইকাররা আবার হিসেব কষে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাড়তি দাম হাঁকছে।

বহরমপুরের বাজারে আমদানী একটু বেশি হলেই মুনাফাবাজ ব্যব-সায়ীর দল তাড়াতাড়ি তা' পাচার করে দিচ্ছে জলঙ্গীর পথে নদীয়া জেলার করিমপুর ও তেহাট্টায়।

জিয়াগঞ্জ বাজারে ধান বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা মণ দরে। ২০ টাকা ধান হলে কোনমতেই ৩৪ টাকার কম চাল বিক্রি হতে পারে না, জিয়াগঞ্জ থেকে আবার চাল ভগবানগোলা ও লাল-গোলায় যাচ্ছে। সেখানে বাজার আরও চড়া।

একমাত্র কান্দি বাজার স্বচ্ছল। চাল অঢেল। তবে, দামটাও কিছু কম। ৭৫ থেকে ৮১ নয়া পয়সা।

সব চাইতে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে নবগ্রাম থানার অধিবাসীরা। এই থানাটি হল মুর্শিদাবাদের ধানের প্রধান কেন্দ্র। গেল কয়েক বছর ধরে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে চাষ ভাল হয় নি। এবারেও মাঠ ধূ ধূ করছে। বৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই। এখানকার অধিকাংশ মানুষ ক্ষেতমজুর, আদিবাসী। কারো ঘরে সঞ্চয় নেই। অনাহারে, অর্ধাহারে এদের দিন কাটছে।

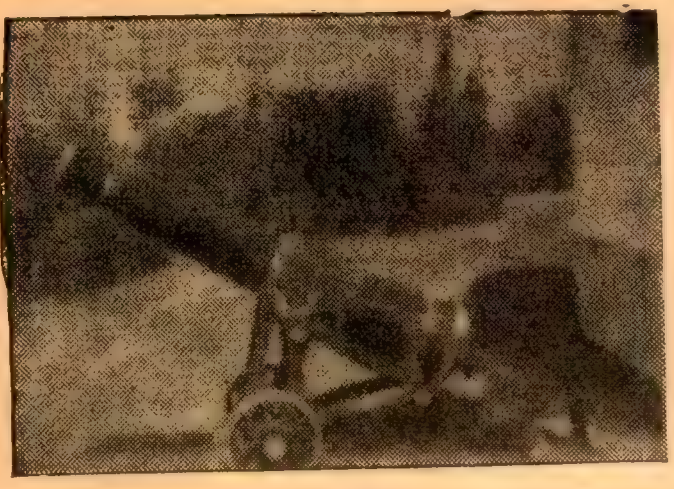

● পর্তুগীজ আমলের এই বড় কামানটি দীঘার নিকটবর্তী খেজুরীতে পাওয়া গেছে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সেক্সপীয়ারের যখন ১৬ বছর বয়স—ক্যাথারিন হ্যামলেট নামে একটি বালিকা এভন্ নদীতে ডুবে মারা যায়, at a spot where the roots of a great willow dammed the current and made a deep pool.—এ নিয়ে ৮ সপ্তাহ ধরে ইনকোয়েষ্ট চলে এবং বিচারে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় যে, মেয়েটির অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। সে সময়ে ষ্ট্র্যাটফোর্ডে এই ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন চলে। মনে হয় সেক্সপীয়ার ক্যাথারিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চাক্ষুষ দেখেছিলেন এবং এরই উপর ভিত্তি করে ওফেলিয়ার শেষকৃত্যের দৃশ্যটি রচনা করেন। জন সেক্সপীয়ারের মৃত্যুর পর funeral attend করবার পর সেক্সপীয়ার ষ্ট্র্যাটফোর্ডে থাকাকালীনই ওফেলিয়াকে কবরে স্থাপনের দৃশ্য এবং ঘোষ্ট সিন রচনা করেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরপর তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন। সে সময় তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক আর্ল অফ সাদাম্পটন টাওয়ারে বন্দিজীবন যাপন করছেন।

আর্ল অফ্ সাদাম্পটন

রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর তিন সপ্তাহের ভেতরেই, ১৬০৩ সালের ১০ই এপ্রিল, রাজা জেমসের আদেশে সাদাম্পটন টাওয়ার থেকে মুক্তি পান। এই উপলক্ষে সেক্সপীয়ার নিম্নোক্ত বিখ্যাত সনেটটি লেখেন :

Not mine own fears, nor the prophetic soul
Of the wide world dreaming on things to come
Can yet the lease of my true love control,
Supposed as forfeit to a confined doom. (etc.)

সেক্সপীয়ার তাঁর বেশির ভাগ সনেট তৃতীয় আর্ল অফ্ সাদাম্পটনকে উদ্দেশ করে রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁকে উৎসর্গ করেছেন Venus and Adonis এবং The Rape of Lucrece। এঁদের

মিতালি

প্রথম আলাপ হয় ১৫৯২ সালে—সেক্সপীয়ারের বয়স তখন ২৮ এবং সাদাম্পটনের ১৮½। এরপর বহু ঝড়ঝাপ্টার ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে হয় আর্লকে। হবর্ণে সাদাম্পটনের প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি

● 'কিং লীয়র' নাটকের নাম ভূমিকায় স্যার লরেন্স অলিভার।

ছিল ১৪৮০ থেকে ১৫৯০ পর্যন্ত ক্যাথলিকদের নিলিত হবার একটি প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র। অবশ্য প্রকাশ্যে সাদাম্পটন এবং সেক্সপীয়ার দু'জনেই ছিলেন কনফরমিস্ট—এছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ দু'জনেরই বাপ-মা উগ্র ক্যাথলিকপন্থী হওয়াতে রাজরোষের ফলে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল এঁদের। খানিকটা শান্তিতে জীবন কাটানোর জন্য Obstinate recusants হয়ে উঠতে পারেন নি সেক্সপীয়ার এবং সাদাম্পটন।

মহাকবির অন্ত সনেটগুলি যে মহিলাকে উদ্দেশ করে লেখা 'The Dark Lady of the Sonnets' নামেই তিনি বিখ্যাত। কিছু সময়ের জন্য সেক্সপীয়ার ও সাদাম্পটনের মধ্যে এই মহিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলে। অক্সফোর্ডের একটি পান্থশালার নাম ছিল Golden Crown Inn—মালিক ছিলেন জন ডেভেনাণ্ট। তাঁরই স্ত্রী ছিলেন এই বিখ্যাত Dark Lady। কবি এবং আর্ল দু'জনেই ১৫৯২ সালের শরৎকালে অক্সফোর্ডে যান এবং মিসেস ডেভেনাণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তবে আর্লের দিকেই তার লেডীর পক্ষপাতিত্বটা বেশি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে সেক্সপীয়ারের দু-একটি সনেটের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

"Two loves I have of comfort and despair
Which like two spirits do suggest me still.
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour'd ill...."
and
"That thou hast her, it is not all my grief,
And yet it may be said I loved her dearly;
That she hath thee is of my wailing chief,
A loss in love that toucheth me more nearly..."
and
"So, now I have confessed that he is thine,
And I myself am mortgaged to thy will,
Thyself I 'll forfeit, so that other mine
Thou wilt restore to be my comfort still..."

'পঞ্চম হেনরী' নাটকের নাম ভূমিকায় পল স্কোফিল্ড

সেক্সপীয়ার কিন্তু এই ডার্ক লেডীর মোহিনী মায়ার প্রভাব থেকে কখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন নি। অক্সফোর্ডে গেলেই তিনি ডাভেনেন্টদের বাড়িতেই থাকতেন। তাদের এক ছেলে উইলিয়ামের তিনি ছিলেন গড্‌ফাদার। অনেকের মতে এই উইলিয়াম ডাভেনেন্ট আসলে সেক্সপীয়ারেরই নিজের সন্তান। ৩২ বছর বয়সের সময় এই উইলিয়াম পোয়েট লরিয়েট হন। ডার্ক লেডী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Hugh Ross Williamson বলেছেন :

'It is unfortunate that the name of Mary Filton (who was fair) has been given currency as 'the Dark Lady' by various popular romances, including plays by Bernard Shaw, Frank Harris and Clemence Dane. There is no reason to suppose that Mary Filton, a Maid of Honour at Court, ever knew Shakespeare and she only appears in the story because in 1890 Thomas Tyler, rejecting the traditional—and, from the historical point of view, inevitable—identification of the beloved friend and patron as Southampton, advanced the claims of the Earl of Pembroke, who had an intrigue with Mary Filton in 1601. The inconsistencies of this identification, though dear to the romantic Nineties, are akin to Baconian cyphers. They involve the rejection of simple and accepted hypotheses in favour of strained interpretations which have no historical background."

আর্ল অফ সাদাম্পটনের সঙ্গে সেক্সপীয়ার একটা আত্মিক অনুরাগের সম্পর্ক অনুভব করতেন। সমকাম বা সমরতির সম্পর্ক এ সম্বন্ধের মধ্যে ছিল না।

"It was the love of a man for a man—Plato's 'Heavenly Love'; passing the love of women—and it was sexually unindulged. It was 'a marrige of true minds', but it was not a gratified lust,"

যে সনেটটি নিয়ে এই ধরণের বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। সেটি ভালভাবে পড়লেই আসল ব্যাপারটা কি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

"A woman's face with Nature's own hand painted
Hast thou, the master-mistress of my passion"
With a physiological fun, he insists,
And for a woman wert thou first created
Till Nature, as she wrought thee, fell a doting,
And by addition me of thee defeated,
By adding one thing to my purpose nothing
But since she prick'd thee out for woman's pleasure;
Mine be thy love, and thy love's use their treasure."

সনেটগুলো থেকেই বোঝা যায় যে সেক্সপীয়ার সাদাম্পটনের কাছ থেকে তাঁর নিবিড় ভালবাসার ঠিকমত প্রতিদান পান নি। সমাজের শ্রেণীবিভাগের মাপকাঠিতে দু'জনের ভেতর যে বিরাট ব্যবধান ছিল, সেটাই বোধ হয় এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেক্সপীয়ারের মৃত্যুর পর আর্ল অফ সাদাম্পটন আরও আটবছর বেঁচেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

আটত্রিশ

প্রস্তুনা ও লাভ

১৯৩১ সাল। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয়ের 'নাট্য নিকেতন' সে সময়ে নাট্যামোদীদের কাছে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এখানে তখন নিয়মিত অভিনয়-শিল্পীর তালিকায় আছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমেন রায়, মণি ঘোষ, নীহারবালা প্রভৃতি।

স্বর্গত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ' নাটকের মহলায় শিল্পীরা তখন ব্যস্ত

একদিন সন্ধ্যায় মহলা সুরু হবে এমন সময় এক বয়স্কা মহিলা ঘোমটা দিয়ে একটি বছর পনেরর মেয়ের হাত ধরে, সোজা প্রবোধবাবুর সামনে এসে হাজির হলেন। মহলার উদ্যোগ-পর্বেই বাধা পড়লো। মনে মনে সকলেই একটু বিরক্ত হলেন। বিশেষ করে দুর্গাবাবু।

প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই?

—আজ্ঞে, আমার এই মেয়েটিকে যদি আপনার থিয়েটারে ভর্তি করে নেন।

মা ঘোমটার আড়াল থেকে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানালেও, মেয়েটি কিন্তু তখন লজ্জায় ভেঙে পড়েছে। মায়ের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাটির দিকে চেয়ে। মায়ের কথায় প্রবোধবাবু আর শিল্পীদের দৃষ্টি তৎক্ষণে নিবদ্ধ হয়েছে মেয়ের দিকে।

মেয়েটি কালো। তার ওপরে মোটা। সুন্দরী ত নয়ই—মোটামুটি সুশ্রী বলতেও যেন সকলের কুণ্ঠা। এরই মাঝে প্রবোধবাবু মেয়েটির মা-কে প্রশ্ন করেন—লেখাপড়া করেছে কিছু?

—আজ্ঞে হাঁ। সামান্য। কি যেন ইস্কুলটায় পড়েছিলি?

মায়ের প্রশ্নে মেয়েটি এবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে ইস্কুলের নাম বলে। সকলের দৃষ্টি পড়ে এবার মুখের দিকে। সত্যিই মুখখানি বড় সুন্দর। সেই সঙ্গে চোখ দুটিও।

প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করেন—অভিনয় করেছে কোথাও?

—আজ্ঞে না। শেফালিকা (পুতুল) একবার নিয়ে গিয়েছিল বড়বাবুর (নাট্যাচার্য শিশিরকুমার) কাছে। কিন্তু তাঁর ওখানে হোল না।

—গান জানে?

—হ্যাঁ। শিখছে।

এরই মাঝে দুর্গাবাবু বলে বসেন—কি হবে ওকে নিয়ে? দেখতে ভাল হলেও বা যা হোক চেষ্টা করা যেত। তার ওপরে যে রকম লাজুক! ওর মুখ দিয়ে কোন কালেই কথা বেরুবে না।

প্রবোধবাবু দুর্গাবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলেন—তা যা বলেছেন।

মেয়ের মা বুঝলেন এখানেও কোন আশা নেই। তাই বার কয়েক সবিনীত অনুরোধ জানালেন যাতে মেয়েটার একটা হিল্লে হয়। কিন্তু কোন উপরোধ-অনুরোধই কাজে এলো না। দুর্গাবাবু বিরক্তভাবেই সাফ জবাব দিলেন। সেই সঙ্গে প্রবোধবাবু ও দুর্গাবাবুকে সমর্থন করলেন। মা মেয়ের হাত ধরে ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন—কিন্তু সহসা নীহারবালা যেন মেয়েটির চোখেমুখে অভিনয়ের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। প্রবোধবাবুকে বলে কয়ে মেয়েটিকে থিয়েটারে ভর্তি করিয়ে নিলেন। মাইনে ঠিক হোল—মাসিক ২৫৲ টাকা। এবং নীহারবালার

● রীতিমত নাটকের একটি দৃশ্যে কঙ্কাবতী ও রাণীবালা

পাঠক মন

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী' নিয়মিত ... পড়ি। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ...-পত্রিকার মেলার মধ্যে 'সাপ্তাহিক ...মতী' এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ...টি বিশিষ্ট আসনে রয়েছে।

সাহিত্য পরিবেশনার সঙ্গে সুষ্ঠু ...ংবাদ পরিবেশনা। 'বঙ্গদর্শন', 'ভারত-...ন', 'আন্তর্জাতিক' এই বিভাগগুলি ...ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সমস্যা-...টিল যুগে জনসাধারণের নিকট ...শ-বিদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ... ...র্থিক অবস্থা সঠিক ও সুস্পষ্ট-...ভাবে তুলে ধরা অসাধারণ পরিচালন-...ক্ষমতার পরিচয় দেয়। এর মধ্যে 'আন্তর্জাতিক' বিভাগটি সত্যিই সুন্দর। ...বর্তমান কোন সংবাদ আলোচনা ...-ও দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ...র পেছনে লুক্কায়িত ঘটনার অবতারণা ...রা হয়। এতে ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে ...পলব্ধি করতে পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত ...বিধে হয়।

...ছাড়া 'লণ্ডনের চিঠি' 'আজকের ...যুগোশ্লাভিয়া' 'আজকের পশ্চিম ...জার্মানী' 'জাপানী সন্দেশ' প্রভৃতি মাঝে ...মাঝে প্রকাশিত এই বিভাগগুলি পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করেছে। ...আমাদের এদেশের সাধারণ ...মানুষদের স্বভাবতই অন্যদেশের মানুষের ...সামাজিক প্রথা, আচার-আচরণ ও কায়দা-কানুন জানতে ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। এই বিভাগগুলি সেই জিজ্ঞাসু মনের অভাবের পরিপূরক।

"বিশাল বিশ্বের আয়োজন,
মন মোর জুড়ে থাকে
অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত
আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—"

এইরূপ কবি-হৃদয়ের নীচে শতত ধুকমান সমস্যা-জর্জরিত উৎসুক সাধারণ পাঠকের নিকট 'বিশ্বের আয়োজন' জানাইবার জন্য 'সাপ্তাহিক বসুমতী' একটি অপরিহার্য পত্রিকা—তা নির্বিচারে ও দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা চলে।

"সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত-সভায় একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—" সাপ্তাহিক বসুমতী এই কথাগুলিরই পরিপূর্ণ রূপায়ণ করেছে নতুন লেখকের গল্প প্রকাশের মাধ্যমে। আমরা—পাঠকসম্প্রদায় এতে অত্যন্ত আনন্দিত। অনেক নতুন লেখকের গল্পের মধ্যে বাস্তব ঘটনা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়। সে জন্য এটা সর্বসাধারণের একটি নিকটতম পত্রিকা।

নতুন বছরে 'পাঠকমন' অধ্যায়টি প্রকাশিত করে পত্রিকাটির মান উন্নয়ন করেছেন। এই অধ্যায়টি সংযোজিত হওয়ায় পত্রিকাটি সাধারণের আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। কিছু দোষ-ত্রুটিও আমার চোখে পড়েছে। ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি আপনারা এক বছরে বা তার বেশি সময়ে সমাপ্ত করেন। ধারাবাহিক উপন্যাসের পাতা কিছু বাড়িয়ে এর সমাপ্তিকাল সঙ্কুচিত করলে ভালো হয়।

'রঙ্গজগৎ' বিভাগটি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এটা অত্যন্ত অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ। এর পাতা আরও দু-একটি বাড়ালে পাঠকমনের ইচ্ছা পূরণ হবে। আর একটি প্রধান দোষ হচ্ছে যে, বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃশ্যগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট।

ছবিই যে পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ তা সকলেই স্বীকার করবেন। সুন্দর ও স্পষ্ট ছাপার জন্য ভাল কাগজ দিতে পারলে খুবই ভাল হয়।

সনৎকুমার নাথ
পোঃ, গ্রাম—সমুদ্রগড়, জেলা—বর্ধমান

...চেষ্টায় 'সতীতীর্থ' নাটকে মেয়েটি একটি ভূমিকার অভিনয় করারও সুযোগ পেল।

কিন্তু গোল বাধলো দুর্গাবাবুকে নিয়ে। তাঁর অমতে মেয়েটিকে এইভাবে থিয়েটারের শিল্পী-গোষ্ঠিভুক্ত করায় তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। শুধু তাই নয়—মেয়েটিকে স্টেজে মহলা দিতে দেওয়াতেও তিনি আপত্তি করলেন। অত্যন্ত খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন দুর্গাবাবু। একবার 'না' বললে, তাঁকে 'হ্যাঁ' করান খুবই কষ্টকর ব্যাপার ছিল। তাই, তাঁর অমতে কেউ কিছু করতে সাহস করতো না। মেয়েটিকে নেওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত যে এমন পরিস্থিতি হবে, তা নীহারবালাও ভাবতে পারেন নি। তাই বাধ্য হয়ে নিজের ...ঘরে বসে, নীহারবালা মেয়েটিকে পৃথকভাবে মহলা দেওয়াতে লাগলেন।

কিন্তু গোল বাধলো—ষ্টেজ রিহার্সালের দিন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ এবং মঞ্চের অপরাপর শিল্পীদের উপস্থিতিতে মেয়েটি ঘাবড়ে গেল। মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হন। সেই সঙ্গে দুর্গাবাবুর চোখেমুখেও বিরক্তি প্রকাশ পায়। শচীন্দ্রনাথ মেয়েটিকে সংলাপ বলানোর চেষ্টা করেন কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে আর বেরোয় না। শচীন্দ্রনাথ রাগের মাথায় চড় মেরে বসেন মেয়েটিকে। ঘুরে পড়ে যায় মেয়েটি। কাঁদতে থাকে। থিয়েটারের অভিনেত্রী হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে মেয়েটি চলে যেতে যায়। কিন্তু নীহারবালা সস্নেহে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটিকে আটকে রাখেন।

'সতীতীর্থ' নাটকের প্রথম অভিনয়ে কিন্তু মেয়েটি সকলকে বিস্মিত করে দিল। প্রতিটি দৃশ্যে অভিনয় করে, দর্শকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করলো মেয়েটি। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ ত অবাক। এই কি সেই মেয়েটি? যে ফুল রিহার্সালে কথা বলতে না পারার জন্যে তাঁর কাছে চড় খেয়েছিল? সাজঘরে গিয়ে মেয়েটিকে অভিনন্দিত করলেন শচীন্দ্রনাথ। পরম-শ্রদ্ধায় পায়ের ধুলো নিল মেয়েটি। আর দুর্গাদাস? যাঁর অমতে মেয়েটিকে নেওয়ার জন্যে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তিনি মেয়েটির জন্যে নিয়ে এলেন রসগোল্লার হাঁড়ি।

উত্তরকালে এই মেয়েটিই—সর্বজন স্নেহধন্যা রাণীবালা রূপে অভিনয়-জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র শিল্পে আশার সঞ্চার

● শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় চলচ্চিত্র-মহল সন্তুষ্ট। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী ও স্টুডিও কর্মীমহলে আশার সঞ্চার হয়েছে। আমরা নবনিযুক্ত মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

পণ্ডিত নেহরু চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ সাধিত হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী নিজেও চলচ্চিত্র বিষয়ে উৎসাহী। এক সময়ে তিনি শিশু-চলচ্চিত্র সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। পিতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতীয় ছবির মানোন্নয়নে তিনি সহায়ক হবেন। চলচ্চিত্র-মহলে বহু অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। স্টুডিওগুলিতে এখনো কাজের স্থায়িত্ব নেই, বহ্নিমান পরিচালকরা কাজ পান না, তারকা প্রথার অভিশাপে চলচ্চিত্র নির্মাণব্যয় আকাশচুম্বী—ছবি নিছক পণ্যমাত্র। চলচ্চিত্রের প্রগতিশীল-মহল আশা করছে শ্রীমতী গান্ধী চলচ্চিত্রকে অভিশাপমুক্ত করবেন। ভারতীয় ছবির মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় ছবির প্রদর্শনের আরো সুব্যবস্থা করবেন। ভারতীয় দূতাবাসগুলি ভারতীয় ছবির প্রচারে সহায়ক হবে। দেশের সর্বাপেক্ষা বড় প্রযোজক সরকার নিজস্ব স্টুডিও গঠন ও পরিচালনায় এগিয়ে আসবেন। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে চলচ্চিত্রকর্মী ও শিল্পীর অনেক আশা।

—সুজন।

ক্যান্‌স চলচ্চিত্র উৎসবে অভিজ্ঞতা

ক্যান্‌স-এর সপ্তদশ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক উৎসবের অন্যতম জুরী মিঃ আলেকজান্দার কারাগানভ সম্প্রতি রাশিয়ার ইজভেস্তিয়া পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মিঃ কারাগানভের অভিজ্ঞতা ক্যান্‌স উৎসবের ওপর প্রযোজক ও চিত্র পরিবেশকদের অশুভ প্রভাব পড়েছে। ফলে এই আন্তর্জাতিক উৎসব এক ধরণের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তার শিল্পবিকাশের দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিঃ কারাগানভ লিখছেন: এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যবিন্দু পরিচালক বা শিল্পী নয়, ব্যবসাদার অর্থাৎ প্রযোজকই উৎসবের নিয়ন্তা। প্রযোজক এবং পরিবেশকরা আগে থেকেই কানাঘুষা করে, নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে স্থির করেন কোন কোন্ ছবি পুরস্কার পাবে। এভাবে পুরস্কার দেওয়ার পেছনে লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক এবং ব্যবসাগত। যেভাবে কোন কোন বাজে ছবির জন্য ঢাক পেটানো হয়েছে এবং যেভাবে কোন কোন ছবির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ছবি প্রদর্শন করতে দেওয়া হয় নি, তার কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে? যে সকল ছবিতে বুর্জোয়া জীবন এবং চিন্তাধারা জোর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে সে সকল ছবিকে যে কোন উপায়ে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য কোন নিয়ম বা চক্ষুলজ্জার পরোয়া করা হয় নি। উৎসবের ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারটা আরো ন্যক্কারজনক। জুরীরা অধিকাংশ সময় আলোচনা করেন নি; একমত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন নি। জুরীদের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির সব চেয়ে বড় প্রমাণ হলো—ফ্রান্সের ছিল সাতজন জুরী, আর চারজন বিভিন্ন দেশের। ফলে দর্শকদের মতামতের সঙ্গে জুরীদের বিচার মেলে নি। প্রধান পুরস্কার

দেওয়ার সময় সাংবাদিক এবং দর্শকরা নীরব ছিল।

জুরীরা যেন একটা ভোটযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তা থেকে লোকে অনুমান করতে পেরেছে সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান ছবি 'ওয়ান পটাটো--টু পটাটো', হাঙ্গেরিয়ান ছবি 'দি লার্ক', ইতালীর মিঃ জের্মি পরিচালিত 'সিডিউসড এণ্ড লেফট' কেন পুরস্কার পায় নি। কেন জনসাধারণের জীবনের সম্পর্ক বর্জিত 'চেরবরো আম্ব্রেলাস' শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।

ক্যান্স উৎসবের জুরীদের অধিকাংশ আন্তর্জাতিক উৎসবের ঐতিহ্য ও মর্যাদার ওপর দারুণ আঘাত দিয়েছেন। আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে তাঁরা ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মিঃ আলেকজান্দার কারাগানভের এই অভিজ্ঞতা ক্যান্স উৎসবকে নিয়ে। কিন্তু এ কেবল ক্যান্স-এর ঘটনা নয়। আমাদের দেশে প্রতি সপ্তাহেই আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করছি। পণ্যচিত্রের দৌরাত্ম্যে এদেশে শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছবি দাঁড়াতে পারে না। চিত্র-সমালোচকরা দল বেঁধে পণ্যচিত্রের প্রশংসায় কোরাস গান করেন। তাঁদের কোরাস গাইতে বাধ্য করা হয়।

'প্রভাতের রঙ' ছবির নায়ক-নায়িকার রূপ-সজ্জায় বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর

স্টুডিও খবর

• পরিচালক মৃণাল সেন ভারত সরকারের প্রামাণিক চিত্রের চিত্রগ্রহণের কাজে সারা দক্ষিণ ভারত ঘুরে এসেছেন। মালাবার, মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র চারটি রাজ্যের ঐতিহাসিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিখ্যাত স্থান ও মন্দিরগুলি থেকে তিনি চিত্রগ্রহণ করেছেন। এইবারের চিত্রগ্রহণের পরে তার প্রামাণিক ছবিটি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক ধারাকে তিনি এই ছবিতে তুলে ধরবেন। তাঁর সঙ্গে কথায় মনে হলো ভারতীয় প্রামাণিক চিত্রের ক্ষেত্রে মৃণাল সেনের এই প্রামাণিক ছবিটি হবে একটি বিশিষ্ট অবদান। এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, এক নতুন চিন্তার প্রেরণায় এই ছবি দর্শকদের অনুপ্রাণিত করবে। অবশ্য যদি কেন্দ্রের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ না করেন।

• পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী দীর্ঘদিন পরে আবার ছবি নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁর 'শেষ তিনদিন' ছবির কাজ অগ্রসর হচ্ছে। নায়িকার চরিত্রে রূপদান করবে সুমিতা সান্যাল।

• মঙ্গল চক্রবর্তী একটি রোমান্টিক ছবি নির্মাণের কাজে নেমেছেন। ছবিটির নাম 'দিনান্তের আলো।'

• কনক মুখার্জী 'মহালগ্ন' ছবির কাজ শেষ করেছেন। এই ছবির কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আর একটি নতুন ছবির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ছবিটির নাম 'মন আর মন্দির'

অনিতা ফিল্ম পরিবেশিত নরেন্দ্র মুরী পরিচালিত 'পূর্ণিমা'-র একটি দৃশ্যে মীনাকুমারী ও সিধু।

বলে জানা গেছে। শোনা যাচ্ছে বোম্বাইয়ের শিল্পী নিয়ে ছবিটিকে আকর্ষণীয় করার তাঁর ইচ্ছা আছে। পরিচালকদের মধ্যে কনক মুখার্জীর কপাল খুব খুলে গেছে। হাল্কা ছবি করার কায়দাটা তিনি বুঝে ফেলেছেন, আর মোটামুটি দর্শকদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা হয়েছে। তবে শিল্পের বিচার যদি করেন তাহলে অনেকে নাক সিঁটকাবেন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, বর্তমান জগতে টাকাই সব। ছবি নির্মাণের পেছনে টাকা রোজগার ছাড়া আর প্রেরণা কিসের? অন্য কোন প্রেরণা ও রস যদি থাকে তার জন্য তো সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন আছেন।

● 'অশ্রু' দিয়ে লেখা'র একটি দৃশ্যে অনিল চ্যাটার্জী ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

• বিমল মিত্রের লেখা 'গুলবাহার'-কে চিত্ররূপ দেবার কথা ভেবেছেন কার্তিক চ্যাটার্জী। তার জন্য তিনি প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

• 'বিবেকানন্দ' জীবনীচিত্রের পরে পরিচালক মধু বসু বন্দেমাতরম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন।

• সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত 'মোমের আলো'র চিত্রগ্রহণের জন্য পরিচালক সলিল দত্ত দলবলে ওয়ালটেয়ার গেছেন। এই ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তম কুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদকণা

বার্লিনে 'মহানগর'

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবিটি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে। এই উপলক্ষে প্রযোজক শ্রীবনশল, নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় বার্লিন গেছেন।

অজিত বসু

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অন্যতম কর্ণধার শ্রীঅজিত বসু ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মেহবুব খানের মৃত্যুতে এই পদ শূন্য হয়েছিল।

তৃতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী দপ্তরের উদ্যোগে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ৮ই জানুয়ারী দিল্লীতে উৎসব উদ্বোধন হবে এবং ২২শে থেকে ২৮শে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

কবি নজরুল জন্মোৎসব

আগামী ২৪শে ও ২৫শে জুন মহাজাতি সদনে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মোৎসব উদযাপিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পিগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে এবং বিশিষ্ট সুধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন।

● 'নিশাচর' ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে মঞ্জু দে

কবি সম্বর্ধনা

গত ১৪ই জুন সন্ধ্যায় সাহিত্যিক কবি শিল্পী নাট্যকার অধ্যাপক ও সুধিবৃন্দের সমাবেশে ৮ পাসপুলে ১৩৭০ সালের সম্মানিত কবি শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

নাটকের কথা

বহুরূপীর নাট্য উৎসব

গত ১২ই থেকে ১৮ই জুন বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়ের নাট্য-উৎসব নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে অভিনীত সাতটি নাটকের মধ্যে দুটি নতুন নাটক। এই দুটি সোফোক্লিসের 'রাজা ঈদিপাস' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'। অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে ছিল 'পুতুল খেলা' 'রক্তকরবী' 'কাঞ্চন-রঙ্গ' 'চার অধ্যায়' 'দশচক্র'। এরূপ আকর্ষণীয় নাট্য-উৎসবের আয়োজন করে বহুরূপী নাট্য রসিকদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

লৌহ প্রাচীর

গত ৭ই জুন প্রতাপ মেমোরিয়ল হলে "শিক্ষার্থী" মঞ্চস্থ করলেন তাঁদের নতুন নাটক 'লৌহ প্রাচীর'। রচনা ও পরিচালনা করেছেন অনিলবরণ দত্ত। "শিক্ষার্থী" কর্তৃক অভিনীত নাটক-গুলির মধ্যে 'লৌহ প্রাচীর' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ নাটক। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ সংলাপ সমৃদ্ধ বাস্তব পটভূমি-কায় লিখিত এই নাটক সমাদৃত হ'বে বলেই আশা করি। দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়।

অভিনয়ে কিরণ লাহিড়ী এবং শিবু গোস্বামী সহজেই দর্শকচিত্ত জয়ে সক্ষম হন। টাইপ চরিত্রে জ্যোতি দে প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেন চিত্ত দাস, রথীন সিকদার, বিলীন দাস, কল্পনা ভট্টাচার্য, তুহিন ব্যানার্জী ও অমিতা খাঁ।

● রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত 'শহর অউর সপনা'-র নায়ক ও নায়িকার রূপ-সজ্জায় দিলীপরাজ ও সুরেখা।

দিল্লীতে নাট্য প্রতিযোগিতা

দিল্লী নাট্য সঙ্ঘের বাৎসরিক নাট্য প্রতিযোগিতা ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে আরম্ভ হয় এবং ১৯৬৪-র মে মাসে শেষ হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ৭টি বাংলা এবং অন্যান্য হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী এবং তেলেগু ভাষার নাটক অভিনীত হয়। দিল্লীর বাঙালী প্রতিষ্ঠান চতুরঙ্গ ৮টি পুরস্কারের মধ্যে ৫টি পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রোডাকশন—চতুরঙ্গের তিনটি নাটক—গেটম্যান, ঝড় এবং নটীর পূজা, শ্রেষ্ঠ পরিচালক চুণী রায়চৌধুরী (গেটম্যান), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—উষা ভার্মা (গেটম্যান), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—বলরাম ঘোষ (গেটম্যান), শ্রেষ্ঠ আলোক সম্পাদনা—(গেটম্যান)।

খেলা ধূলা

টেনিসের নন্দনকানন

সাউথ ওয়েস্ট লণ্ডনের অল ইংলণ্ড টেনিস ক্লাব, সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো ঝকঝকে তকতকে সতেরোটি কোর্ট—যেন ছবি। প্রতি বছরই এই সময় এখানে দেশ-বিদেশের টেনিস খেলোয়াড়দের মেলা বসে যায়। অগণিত ক্রীড়ামোদীর আগমনে ক্লাব-অঙ্গন হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। কারণও আছে, এখানে সুরু হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডেনের। সারা বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের স্বপ্ন উইম্বলডেনের টেনিস কোর্ট, উইম্বলডেনের প্রতিযোগিতা। এখানে না এলে, এখানে না খেললে তাঁদের খেলোয়াড়ী জীবন যেন তৃপ্ত হয় না; অপূর্ণ থেকে যায় অনেক কিছু। আমেরিকার ফরেস্ট হিল প্রতিযোগিতা, অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়ান ওপন টেনিস প্রতিযোগিতা আর ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের এই উইম্বলডেনের কদর-মান-ইজ্জত যেন বেশি। উইম্বলডেনের টেনিস বহন করে চলেছে এক সুমহান ঐতিহ্য আর এর বিরাট ঐতিহ্যের তুলনা মেলাই ভার।

এই বছর উইম্বলডেনের এই টেনিস প্রতিযোগিতা পদার্পণ করল ৭৮ বছরে। এবার এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে উইম্বলডেনের ইতিহাসে। প্রায় ৪৯টি দেশের বহু নামী ও অনামী খেলোয়াড় যোগদানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন, সংখ্যায় তাঁদের প্রায় পাঁচ শত। এর মধ্যে বাছাই করার পর পুরুষ বিভাগে মোট ১২৮ জন এবং মহিলা বিভাগে মোট ৯৬ জনের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে। এই প্রতিযোগিতায় টিকিটের চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে শেষ পর্যন্ত টিকিট বিতরণের জন্য লটারী করতে হয়েছে। যে সমস্ত লোকেদের ভাগ্যে টিকিট ওঠে নি তাদের অগ্রিম দেওয়া ৮৮,০০০ পাউণ্ড ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

উইম্বলডেনের খেলোয়াড় বাছাই তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষদের

শ্রীঅমিতাভ

তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন, দ্বিতীয় স্থান আমেরিকার চাক ম্যাকিনলে, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছেন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা এবং মেক্সিকোর র‍্যাফেল ওসুনা। মহিলা বিভাগে প্রথম স্থানে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ দ্বিতীয় স্থানে ব্রেজিলের মারিয়া বুনো, তৃতীয় স্থানে আমেরিকার বিলি জিন-মফিট।

১৯২৭ সাল থেকে এই বাছাই প্রথা সুরু হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত এই বাছাই তালিকা বহির্ভূত কোন খেলোয়াড় উইম্বলডেন সিঙ্গলস বিজয়ী হন নি। রয় এমার্সনের ভাগ্যই খারাপ—১৯৬২ সালে হলেন ২নং খেলোয়াড়, পরের বার পয়লা নম্বর খেলোয়াড়, কিন্তু বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে পারলেন না। এবারও তিনি পয়লা নম্বর খেলোয়াড়, তবে তাঁর বহুদিনের আশা পূর্ণ হবে কিনা বলা যাচ্ছে না। টেক্সাসের ২৩ বছরের তরুণ খেলোয়াড় চাক ম্যাকিনলে ৪নং স্থানের অধিকারী হয়ে গতবার সিঙ্গলস বিজয়ীর দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। স্পেনের ম্যানয়েল সান্তানা বিরাট আশা নিয়ে এবার উইম্বলডেনে এসেছেন, উইম্বলডেনের ফলাফলের উপর তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ ছাড়া আর আছেন ফ্রেড স্টোলে।

মহিলা বিভাগে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার টেনিস সম্রাজ্ঞী মার্গারেট স্মিথের সম্ভাবনাই বেশি। বাছাই তালিকার উপর্যুপরি তৃতীয়বার প্রথম স্থান পেলেন; গতবার তিনি সিঙ্গলস বিজয়ী হয়েছেন। ব্রেজিলের মারিয়া বুনো ১৯৫৯ এবং ৬০ সালে বিজয়ী হবার পর আবার এবার তাঁর নিজের খেলা ফিরে পেয়েছেন। স্মিথের তিনি একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। ২২শে জুন থেকে সুরু হচ্ছে উইম্বলডেনের খেলা—এখন দেখা যাক খেলার গতি কোন দিকে যায়।

বাচাল বক্সার

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হবার পর ক্যাসিয়াস মার্কুইয়াস ক্লে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে হলেন মহম্মদ আলি ক্লে। একেই তিনি কথাটা বলেন একটু বেশি, কিন্তু এখন দেখছি তাঁর মুখে কথার খই ফুটছে। তাঁকে নিয়ে আবার মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ সম্প্রদায়ের মাতামাতিরও অন্ত নেই। এখন আবার মহম্মদ ক্লে মধ্যপ্রাচ্যে তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন। কায়রোতে নামতেই লোকে তাঁকে বিরাট সম্বর্ধনা জানায়—'ইসলামের জয়' বলে শ্লোগানও তারা দিতে থাকে। ক্লে এখানে বলেছেন যে, প্রাক্তন বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান প্যাটার্সনের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে মিলিত হবে তাঁকে পরাজিত করব এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাব। তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমেরিকার 'ব্ল্যাক মুসলিম' সম্প্রদায়কে ভালভাবে গড়ে

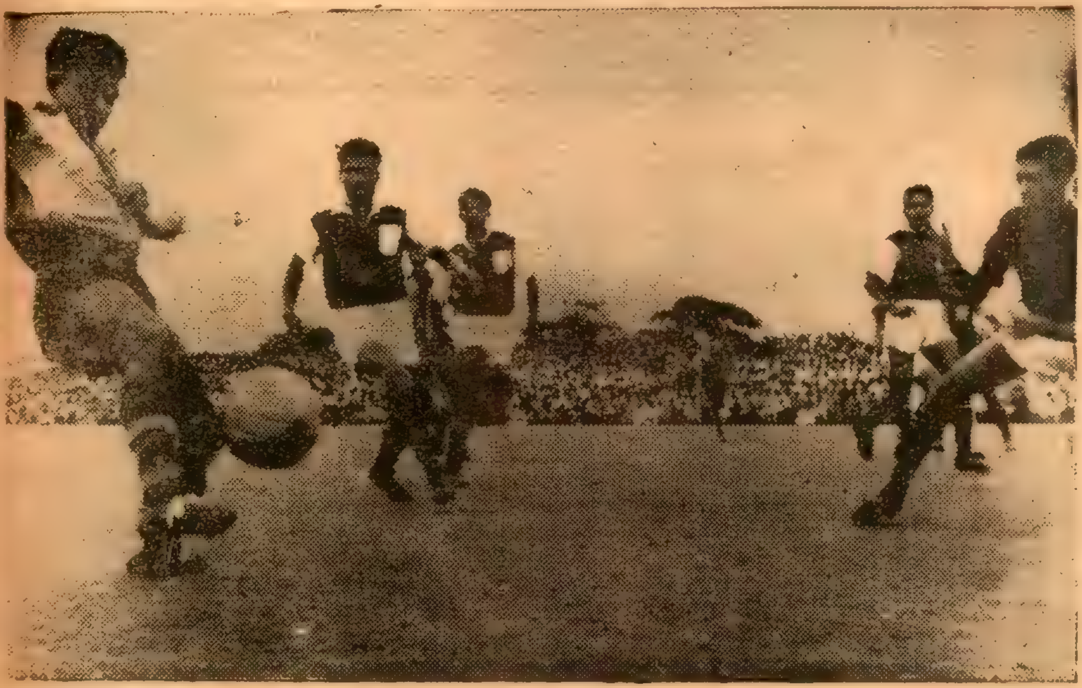

● ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান দলের চ্যারিটি খেলার একটি দৃশ্য

তোলা। তাঁর সম্প্রদায় অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করতে পারে, এমন আশাও তিনি রাখেন। তাঁর কথাবার্তা এবং হাবভাব দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে তাঁর আসল মতলবটা কি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে মুষ্টি-যুদ্ধের রিং থেকে, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নবরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে কি না।

প্রাণহীন ফুটবল লীগ

ময়দান ফুটবলের সেই প্রাণহীন গতি, সেই ড্র আর ড্র, নেই কোন বৈচিত্র্য, কোন উত্তেজনার ছোঁয়াচ। মনে প্রশ্ন জাগে আর কতদিন চলবে কলকাতা প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের এই ছন্দহারা গতি। ইস্টবেঙ্গল মহামেডানের প্রথম চ্যারিটি ম্যাচটিকে মানের দিক থেকে এই মরশুমের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ বলে অভিহিত করা চলে। মহামেডান স্পোর্টিং প্রথমে গোল করেও জয়ী হতে পারে নি। মহম্মদ আলির ফ্রি কিক থেকে বল পেয়ে সালাউদ্দিন গোলরক্ষককে এক রকম ফাঁকি দিয়েই সুন্দর-ভাবে গোলটি করেন। মহামেডানের এই ফলাফল ক্ষণস্থায়ী হয়, ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৌলিক গোলটি পরিশোধ করেন।

পরপর দুটি খেলায় হাওড়া ইউ-নিয়ন আর বালী প্রতিভার সঙ্গে ড্র করে মোহনবাগান লীগের দৌড়ে আরও দুটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করল। ইস্টবেঙ্গলও কম যায় না, জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে কোনক্রমে ড্র করে তারা পরাজয় এড়াতে পেরেছে। লীগে এখন শুধুমাত্র মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেল অপরাজিত আখ্যা বজায় রেখেছে। ইস্টার্ন রেল লীগের দৌড়ে এবার দুই প্রধান মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছে। মোট আটটি খেলায় তারা নষ্ট করেছে ৪ পয়েণ্ট। মোহনবাগান মোট সাতটি খেলায় নষ্ট করেছে ৪ পয়েণ্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের অবস্থাও তথৈবচ। দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের প্রথম সাক্ষাৎকার হবে আগামী ২৭শে জুন, তারপর লীগের ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে।

হকি টেস্ট

কটকে বরবাটী স্টেডিয়ামে ভারত বনাম মালয়েশিয়া সপ্তম ও শেষ টেস্ট খেলায় ভারত ২-০ গোলে জয়ী হয়েছে। মালয়েশিয়া হকি দল ভারতের সঙ্গে মোট সাতটি টেস্ট খেলায় মিলিত হয়েছে। চারটি টেস্টে ভারত জয়লাভ করেছে এবং তিনটি টেস্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ভারত এই খেলাগুলিতে বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়েছিল। ভারতীয় একাদশ এই টেস্টগুলিকে অনুশীলনের পর্যায়ে ফেলেছিল।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রা:) লি:-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

a beautiful woman's constant companions

are not her family and friends,
her near and dear ones,
but her box of beauty aids
which help her to look beautiful
anytime, anyplace — always and forever.
ask her and she'll tell you . . .
her constant companions are

AFGHAN SNOW
BEAUTY AIDS

E. S. PATANWALA, BOMBAY-77. (INDIA)

Tiny Tots... Teen-agers... Grown-ups...
THE WHOLE FAMILY LOVES ELPHINSTONE FABRICS
Because Elphinstone fabrics are designed to suit every age-group, every taste, every need. Hard-wearing, easy-washing, colour-fast....Elphinstone fabrics come to you in a fascinating array of patterns and shades ... for dainty children's frocks, pretty dresses, gorgeous cholis. And to beautify your home ....there's a brilliant spectrum of Elphinstone furnishing fabrics....in attractive designs and eye catching colours. ELPHINSTONE-luxury fabrics at economy prices!
Also manufacturers of the famous fastest selling CHEETA Leather Cloth.
The Elphi... Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.
...ALLARD ESTATE, BOMBAY 1

সাপ্তাহিক

বসুমতী

ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের দায়ে প্রথম অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ দুরপনেয় কলঙ্ক ও নিন্দার গ্লানি মাথায় নিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 2nd July, 1964 • Vol. 69, No. 6

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়
হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

756.3
003/3
V. 69
no. 6

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩২৩
আজকের মানুষ	...	৩২৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৩২৫
ভারতদর্শন	...	৩২৯
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৩৩৬
আন্তর্জাতিক	...	৩৩৭
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪২
সাহিত্য-সাধক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৩৪৭
লণ্ডনের চিঠি	অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪৯
শহর কলকাতা	মুরারি ঘোষ	৩৫১
দুঃখের ঋতু (কবিতা)	পরিমল চক্রবর্তী	৩৫২
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৩৫৩

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ত্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেজে ম্যা মরেজে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিভাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অনল আয়তী (উপন্যাস)	সুশীল রায়	৩৫৭
রাতপাখির কান্না (গল্প)	বিমলকুমার ঘোষ	৩৬১
মা, তুমি (কবিতা)	ভবতোষ শতপথী	৩৬৪
ক্যান্সার (কবিতা)	প্রসূন মিত্র	৩৬৪
বঙ্গদর্শন	...	৩৬৫
দূরন্ত দেহলী (কাহিনী-বিচিত্রা)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৩৭০
ঝাঁটা (রম্য-রচনা)	মিহিরকুমার কাঞ্জিলাল	৩৭২
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৩৭৫
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৩৭৭
পাঠক মন	...	৩৭৮
রঙ্গজগৎ	...	৩৭৯
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৩৮৩

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বইখানি সত্যি সর্বশ্রেষ্ঠই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অনন্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুকদেবানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১।।০ টাকা

অনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

বর্ষাদীপ গল্পাবলী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), বৈশাখিন ও বসন্তে। মূল্য—৩'৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬১ বর্ষ. ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৮ই আষাঢ় ১৩৭১ | Thursday, 2nd July 1964

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী

উনবিংশ শতকে যে সব বরেণ্য ব্যক্তি আমাদের দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠিক এই বছরে তাঁদের জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের কথা ভাবতে গেলে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়া স্বাভাবিক। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তিনি এই বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়ে প্রাণশক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন এই ভূমণ্ডলের অন্যত্র তার তুলনা নেই। বৃষস্কন্ধ, খড়গ-নাসা, ন্যায়াধীশ সেই ব্যক্তিত্বময় পুরুষ আজো আমাদের কর্মপথের স্বপ্ন, জ্ঞান বিস্তারের উজ্জ্বলতম আদর্শ। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিশেষ উদ্দেশ্য যেন নিষ্ফল বাগাড়ম্বরে ও নিষ্প্রাণ উৎসবের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত না হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষ যে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, সেই আদর্শ আমরা কতটা সফল করতে পেরেছি এই জন্মশতবার্ষিকীতেই তাঁর একটা হিসেব-নিকেশ করা প্রয়োজন। পরাধীন ভারতবর্ষে আশুতোষ যা করে গেছেন স্বাধীন ভারতেও আমরা তাঁর বেশি কিছুই করতে পারি নি—আজ তা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। আর একথা রূঢ় হলেও সত্য যে, আশুতোষ আধুনিক শিক্ষার মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যাকে দেখেন নি এবং তিনি বিদ্যালয়কে কখনোই কেরাণীর কারখানা করে গড়ে তুলতে চান নি। সেই কারণে তাঁর কাছ থেকে আমরা লাভ করেছি দেশের যাবতীয় বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক। বর্তমানকালে আমাদের যা কিছু গৌরব, তা ঐ সব জ্ঞানীগুণীদের নিয়েই। একদিন বিশ্বও হয়েছে তাঁদের প্রতিভার গুণে বিস্মিত। আর এখন যে মামুলি শিক্ষা প্রচলিত হচ্ছে তাতে যেন বুদ্ধিবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে নিস্পন্দ।

জাতীয় ক্ষতি সম্পর্কেও স্যার আশুতোষের চিত্ত ছিল সদা সচেতন। তিনি চেয়েছিলেন ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি করতে ; পরীক্ষার্থীদের প্রায় সবাই কৃতকার্য হলেও তাঁর সময় শিক্ষার মান কোনমতেই অবনত হয় নি। এখানেই উদারচেতা আশুতোষের কৃতিত্ব যেমন স্মরণীয় তেমনি তাঁর প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের চির অনুসরণীয়।

পরাধীন দেশে মানুষ সৃষ্টি এবং সত্যিকারের জ্ঞানের আলো জেলে দিয়ে দেশের সার্বিক দৈন্য দূর করতে গিয়ে তেজস্বী আশুতোষ সমসাময়িক সুরেন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জনের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। কেন না তাঁর কাছে মুক্তি সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ার ছিল দেশময় শিক্ষা—যে শিক্ষা পরাধীন মানুষকে স্বাধীনতার পথ দেখাতে পারে। তাই বৃটিশ সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত ছাত্রদের পড়াশুনোর বাধা দূরীকরণের জন্যে এগিয়ে এসেছেন নির্ভীক আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি করেছেন আজীবন সংগ্রাম। জন্মশতবার্ষিকীতে সেই শিক্ষাগুরু, সমাজসংস্কারক এবং সংগ্রামী পুরুষকে জানাই আমাদের প্রাণের প্রণাম।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সম্মান সুলভ নয়। খুব সত্যি কথা। তবুও অনেকের জীবনেই সম্মান আসে আশীর্বাদের মত। কিন্তু আবার এমনও কেউ আছেন যিনি অসাধ্য সাধন করে স্বকীয় দাবী বা অধিকার বলে সম্মান অর্জন করেন। চিরচিহ্ন হ'য়ে থাকেন কাল-দণ্ডীতে। তাঁরা যথার্থই সংখ্যায় যদিও বেশি নয়। তেমনই স্মরণীয়, চিহ্নিত, অপ্রতিরোধ্য আর বিরল ব্যক্তিত্বের প্রতীক শ্রী এস আর দাস। আইনের জগতে এক অদ্বিতীয় উজ্জ্বল পুরুষ। আইনের জগৎ থেকে অবসর গ্রহণের দীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও তিনি সেদিন অব্যর্থ নির্ভীক শক্তিতে শ্রীপ্রতাপ সিং কাইরোঁর মত স্বেচ্ছাচারী, দুর্দান্ত দর্পিত দম্ভকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযানে সাফল্যের চিরস্বীকৃত দৃষ্টান্ত হ'য়ে রইল তাঁর 'দাস কমিশন রিপোর্ট'। সুধীরঞ্জন বরেণ্য হলেন শুধু মাত্র একটি প্রগতিশীল রাজ্যের আসন্ন পরিণতিকে বিপর্যয়ের গ্রাস থেকে উদ্ধার করেই নয়, সেই সাথে ভারতের গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে অমোঘভাবে রক্ষা করেও। স্থিতধী নির্ভীক সংগ্রামী। সৌম্যদর্শন। কর্তব্যে অটল। প্রজ্ঞাগার বিচারমনীষা।

সুধীরঞ্জন তাঁর অবিস্মরণীয় ভ্রাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতই আরেক বিস্ময়। এই শহর কলকাতার বুকেই জনসেবার বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। একদিন এইটে ছিল বিখ্যাত দাস পরিবারের আদি নিবাস। এখানেই প্রথম পৃথিবীর আলোর সাথে সুধীরঞ্জনের নির্বাক পরিচয়—সেদিন ১৮৯৪ সালের ১লা অক্টোবর। তাঁর শিক্ষার্থী জীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনের ছায়াঘন তপোবনে। গুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহসিক্ত সান্নিধ্যে। শান্তিনিকেতনের প্রথম দিককার অন্যতম কৃতী ছাত্র—গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। ১৯১৫ সালে য়ুরোপ গিয়েছিলেন আইনের ডিগ্রী নিতে। তিনি এল-এল-বিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম আর 'বারে' প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

'১৮ সালে দেশে ফিরে যোগ দিলেন কলকাতা বারে। এক বছর কলকাতা আইন কলেজে অধ্যাপনা করলেন। এরপর থেকেই তাঁর ভাগ্যরথ তাঁকে দ্রুততালে নিয়ে চলল সাফল্যের পথে। আরও সম্মান, আরও প্রতিষ্ঠার প্রাসাদ তোরণে। '৪২ সালে শ্রীদাস কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন। সে সময়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম বিচারের রায় উত্তরকালের আইনজীবী-দের অনুধাবনযোগ্য। কলকাতা থেকে সুদূর পাঞ্জাব। '৪৯ সালের মার্চ মাসে সেখানকার প্রধান বিচারপতি হলেন। আইনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ সম্মানের পথ বুঝি উন্মুক্ত হল '৫০ সালের জানুয়ারী থেকে। তিনি হলেন ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি। এর বছর দু'য়েক পরেই এল প্রতীক্ষিত আহ্বান। ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মান। সুনাম ও যোগ্যতার সাথে তিনি সে পদ অলংকৃত করেছিলেন '৫৯ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত।

তারপর অন্য পথ। ভিন্ন পাথেয়। এল বিত্ত থেকে অবসর নিয়ে চিত্তের ডাকে সাড়া দেবার সময়। ভারতের প্রধান বিচারপতি হলেন শান্তিনিকেতনের উপাচার্য। জটিল কর্ম-চঞ্চল জীবনের রাস্তার পাশে এ যেন আনন্দস্নাত স্নিগ্ধ জীবনের কুঞ্জও খুঁজে পাওয়া। সুধীরঞ্জন তাতেই তৃপ্ত। এ দায়িত্বের জন্য তাই কোনও পারিশ্রমিক নিতে কুণ্ঠা হ'ল তাঁর। প্রতিমাসে সম্মান মূল্য নিলেন তাই মাত্র এক টাকা। তাও নিয়মরক্ষার খাতিরে। সুধীরঞ্জনের সাহিত্যিক মন নিজের নতুন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।

এদিকে আরও এক বিস্ময়কর নাম ফিরছিল সকলের মুখে। পাঞ্জাবের প্রতাপশালী মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং দিন দিন দুর্বিনীত স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠছিলেন ক্ষমতার অপপ্রয়োগে। তাঁকে শায়েস্তা করা দরকার। অনেকেই অভিযোগ তুলছেন। অথচ প্রমাণ কই। তাই আবার ডাক পড়ল শ্রী এস আর দাসের। কিছুদিনের জন্য তাঁকে সেই কর্মোদ্যম নিয়ে ফিরে আসতে হ'ল

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

তাঁর পুরনো জীবনে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কায়রোঁ তদন্তের দায়িত্ব দিলেন। প্রসন্ন মনে তিনি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দিলেন—সন্দেহের বশেই শুধু ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা অন্যায়। ব্যক্তির অপরাধ সর্বদাই প্রমাণ-সাপেক্ষ। অন্যথায় তাকে নির্দোষের মর্যাদাই দিতে হ'বে। সেই তদন্তের ৫৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট মাত্র ৬ দিনে স্বহস্তে রচনা করলেন তিনি। ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিধান আলোড়ন আনল সর্বত্র। শেষ হল এক স্বেচ্ছাচারী একনায়কের আগুন নিয়ে খেলা। তাঁর এ কীর্তি হল সর্বকালের আইনের ইতিহাসে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভি-যাত্রায় অনস্বীকার্য সংযোজন। আর কীর্তির চেয়েও মহত্তর হ'য়ে সম্মানিত হলেন কীর্তিমান সুধীরঞ্জন। কেন না জন-প্রিয়তা তাঁর কাম্য নয়। সম্মান তাঁর আকাঙ্ক্ষা নয়। তাঁর পথ সত্য আর সুবিচারের। আর সে পথের দু'পাশে সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পথ চেয়ে থাকে নিস্পৃহ পথিকের।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

মধুসূদনের ইউরোপ যাত্রার তারিখ ৯ই জুন, ১৮৬২। কলকাতা থেকে 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দেবার আগে, ৪ঠা জুন তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক ইংরেজি চিঠিতে লিখে-ছিলেন—বন্ধু, একথা মনেও স্থান দিও না যে, আমি আমার মাতৃভাষার বীণাপাণির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ইতিমধ্যে নতুন ছন্দ সৃষ্টিতে আমার যে অসাধারণ সাফল্য হয়েছে, তা যদি না হোতো, তাহলে আমি আরো কিছুদিনের জন্যে হয় বিদেশ যাত্রা স্থগিত রাখতুম নয়তো যেতুমই না। কিন্তু তাড়াতাড়ি জিৎ হয়ে গেছে আমাদের,—তাই, এখন আরো নবীন কবিদের হাতে যোগ্য চর্চার ভার তুলে দিয়ে আমি দূরে যেতে পারি, আর দূর থেকে এই অনুশীলনে তাঁদের পরামর্শ দিতে আমি বিমুখ হবো না।

সেই বছর জুলাইয়ের শেষে তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছোন। সেখানে গ্রেজইনে ঢোকেন ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। মাস-দশেক পরে, তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা অর্থাভাবে বিপন্ন হয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ২রা মে, ১৮৬৩ ইংলণ্ডেই তাঁর কাছে হাজির হন। আরো দু'এক মাস পরে তাঁরা ফ্রান্সে চলে যান. প্রথমে প্যারিতে, তারপর ভার্সাইয়ে দারিদ্র্যের জ্বালায় ১৮৬৪-র জুন মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে সেখান থেকেই বিদ্যাসাগর মশাইকে পর-পর দু'খানি চিঠি লিখতে বাধ্য হন তিনি। ১৮ই জুন তাঁর তৃতীয় চিঠি লেখা হয়। বিদ্যাসাগর চিঠি পেয়েই, ২রা আগষ্ট মধুসূদনের কাছে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। সেই টাকা পেয়ে, মধুসূদন বিদ্যা-সাগরকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লেখেন। ২৮-এ আগষ্ট বিদ্যাসাগরের পাঠানো সেই টাকাটা তাঁর কাছে পেঁীছোয়; আর ২রা সেপ্টেম্বর মধুসূদন তাঁর চিঠিতে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে লেখেন যে, বিদ্যাসাগর মানুষটির মধ্যে অদ্ভুত এক সমাবেশ—'the man has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother।'

২৬-এ অক্টোবর তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখেন যে, ফরাসী আর ইটালিয়ান ভাষা তো বটেই, তাছাড়া জার্মান ভাষা-শিক্ষাও শুরু করেছেন তিনি। কিন্তু, কবিতার প্রেরণা তাঁর জীবনে তখন বোধ হয় কেটে গেছে; তাঁর নিজের কথায়—'the fit has passed away।'

সেই চিঠির কয়েক মাস পরেই ইটালির ফ্লোরেন্সে দান্তের (১২৬৫-১৩২১) ষষ্ঠ শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ফ্রান্স থেকে মধুসূদন একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেই সঙ্গে ফরাসীতে, এবং ইটালিয়ান ভাষাতেও তাঁর নিজেরই অনুবাদ ছিল।

ইটালির অধীশ্বর ভিক্টর ইমানিউয়েল সেই কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করে যে জবাব দেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, মধুসূদনের সেই কবিতাটি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনাঙ্গুরীয় হয়ে থাকবে —'It will be a ring which will connect the Orient with the Occident।'

পশ্চিমের সাহিত্য-জগতের সঙ্গে মধুসূদন যে আমাদের গভীর সংযোগে যুক্ত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-সংযোগের প্রকৃতি অন্য রকম। সে আমাদের আজকের সন্দেহ-অবিশ্বাস-অন্ধকারের সংযোগ নয়। আজ ১৯৬৪-র ২২-এ জুন। মনে পড়ছে ১৮৭৩-এর ২৬-এ জুন এই কলকাতায় বেনেপুকুরের বাড়িতে মধুসূদনের সাধ্বী স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়। তার ক'দিন পরে ২৯-এ জুন, আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মধুসূদন মারা যান। ব্যারিষ্টার উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, আর ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তীর চেষ্টায়, আলিপুর হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার ডবলিউ জে পামারের আনুকূল্যে মধু-সূদনকে সেই হাসপাতালে ভর্তি করা গিয়েছিল। ২৬-এ জুন ছিল বৃহস্পতিবার। মধুসূদন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পান সেইদিনই। তারপর গভীর রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। সেইদিনই ডাক্তার পামার মধুসূদনকে বলে গেছেন—তাঁর আর মাত্র দু'তিন দিন বাকি। সে-রাত্রে মুমূর্ষু মধুসূদনের মনে জীবনের গভীর অন্ধকারই পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। মনোমোহনকে জিগেস করেছিলেন—'কেমন মনোমোহন, সকল ত' ভদ্রোচিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত' হয় নাই? কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?'

না, বিদ্যাসাগর ছিলেন না। তাঁকে খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। মধুসূদনের অতিরিক্ত খরচের অভ্যাস দেখে,—কয়েকবার নিজে ধার করে মধুসূদনের খরচের টাকা জোগাড় করে দিয়ে বিদ্যাসাগর শেষদিকে মধুসূদন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন, বোধ হয়। হয়তো সে-কথা

মনে পড়েছিল সে-রাত্রে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, মনোমোহনকে তিনি শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' থেকে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। জীবন যে চলন্ত ছায়া, মানুষ যে ক্ষণকালের তুচ্ছ অভিনেতা —এসব কথাই মধুসূদনের শেষ মন্তব্য। তবু তখনো নিজের ছেলেদু'টির ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ছিল তাঁর। মনোমোহন তাদের ভরণ-পোষণের ভার নিয়ে সে রাত্রে তাঁর অন্ধকার দূর করেছিলেন কতকটা। ২৯-এ জুন, রবিবার বেলা দুটোর সময়ে মধুসূদন মারা যান। ৩০-এ জুন, সোমবার বিকেলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

আজ, একশ' বছর পরে, আর এক জুন মাসের শেষে তাঁর সেই অবসানের কথা অন্য কালের মনে এলো।

মধুসূদনের শেষ প্রহরের এ-অন্ধকার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্ধকার। তাঁর কাব্যলোক কিন্তু আলোকিত। তাতে বিচ্ছেদ আছে, বেদনা আছে। মৃত্যুর কথাও আছে, যন্ত্রণার বর্ণনাও আছে। কিন্তু কিছুতেই ভেঙে পড়েন নি তিনি। দুর্বলের ভঙ্গি নেই সেখানে। তিনি উৎসাহী যাত্রী। তিনি গভীর এবং প্রবল। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বে আমি তাঁর তখনকার প্রিয় বাসভূমি ফ্রান্সের নতুন কাব্যলোকের কোনো অন্ধকার খুঁজে পাই নি। ১৮৬৪-৬৫তে তিনি যখন ফ্রান্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—যখন দান্তের ষষ্ঠ-শতবার্ষিক উৎসবে কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন, ভার্সাইয়ে থাকতে-থাকতে নতুন করে চতুর্দশপদী চর্চা শুরু করেছেন যখন, ১৮৬৬তে ইংলণ্ডে অধ্যাপক গোল্ডস্টুকার তাঁকে যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অবৈতনিক অধ্যাপক পদে যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন, ১৮৬৭-র জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে স্ত্রীকে এবং ছেলেমেয়েদের ফ্রান্সে রেখে, মার্সাই থেকে তিনি যখন দেশে ফেরবার জাহাজ ধরেছেন,—ঊনিশ শতকের ষাটের দশকের সেই কয়েক বছরের মধ্যে ফ্রান্সের সমকালীন নতুন কবিতার জগৎ কিন্তু অন্ধকারে, ইশারায়, প্রতীকে, ভঙ্গিতে জর্জর। সুলি-প্রুধোমের বয়স তখন প্রায় তিরিশ বছর, বোদলেয়রের চল্লিশ পেরিয়েছে। মধুসূদন যে-বছর ফ্রান্স ত্যাগ করেন, সেই বছরেই বোদলেয়রের মৃত্যু হয়। ভার্লেন তখন কুড়ি পেরিয়েছেন। র‍্যাবোঁ অবিশ্যি কিশোর। কিন্তু, একথা ঠিকই যে, ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতের সেই সমকালীন ভাব বা ঝোঁক বা মুদ্রাদোষ—কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে নি।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েকটি অঞ্চলেই তাঁর মন মগ্ন ছিল। ত্রয়োদশ শতকের দান্তে (১২৬৫-১৩২১) আর চতুর্দশ শতকের পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪)—ইটালির মহাশক্তিশালী এই দুই কবি তাঁর মন জুড়েছিলেন ; সেই ইটালিরই আরো পরবর্তী কবি টরকাটো ট্যাসোর (১৫৪৪-৯৫) 'অ্যামিনটা' চৈতালী (Pastoral) কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কি না গবেষণার বিষয়, কিন্তু 'জেরুসালেম লিবারেটা' মহাকাব্য তিনি পড়েছিলেন ; গ্রীসের প্রাচীন হোমরকে তিনি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের গুণে নিজের মহাকাব্যে জায়গা দিয়ে গেছেন। তিনি 'বীরাঙ্গনা' লিখেছিলেন ওভিদের পত্রকাব্যের প্রেরণায়। ইংলণ্ডের মিল্টন (১৬০৮-৭৪) ছিলেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয় কবি। তাঁর নিজের শতকের ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন, —স্কটল্যাণ্ডের স্কট, —আয়ার্ল্যাণ্ডের মুর সম্বন্ধে তিনি লিখে গেছেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে ভাল কবি, কিন্তু কেউই সর্বোত্তম কবির দলে গণ্য নন ; বলেছিলেন—ওয়ার্ডস্বার্থকেই তাঁর এঁদের চেয়ে ভালো লাগতো—'I like Wordsworth better।'

মনে পড়ছে, রাজনারায়ণ বসু লিখে গেছেন—'তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্যেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।' গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) যখন মারা যান, মধুসূদনের বয়স তখন সাত-আট বছর। বরং জার্মান সাহিত্যের সমকালীন লেখকদের মধ্যে লেসিং (১৭২৯-৮১) ছিলেন মধুসূদনের আয়ুষ্কালের সমসাময়িক। সাহিত্যের গভীর সত্যার্থী হিসেবে লেসিং-এর খ্যাতি সুপরিচিত। তাঁর হাল্কা কমেডিও ছিল, অন্য ধরনের লেখাও ছিল। তাঁর 'লাওকুন' (Laokoon) প্রসিদ্ধ রচনা। তাতে ভিন্ন ভিন্ন চারু-শিল্পের এলাকা সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম দিকে সে-রচনার উল্লেখ করে গেছেন। মধুসূদন সে-রকম মৃদু-মধুর, তীক্ষ্ণ-গভীর, আলোচনায় নিযুক্ত থাকবার মানুষ ছিলেন না। তিনি যতো নাটক লিখেছেন, তাঁর নিজের জীবন ছিল ততোধিক নাট্যসংঘাতময়। রাজনারায়ণ গ্যেটের সঙ্গে তাঁর মিল দেখেছিলেন বিচিত্র সৃষ্টির সামর্থ্যে—, তাঁর নানামুখী সাহিত্যকর্মে।

শুধু সাহিত্য-চিন্তা আর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যেই নয়, গ্যেটের প্রবল সকর্মক সত্তার সঙ্গে আমাদের উনিশ শতকের বাঙালী মহাপুরুষদের এই মিলের দিকটা মাঝে-মাঝে মনে দেখা দেয়। জার্মানীর কাব্যলোকে তখন শেক্সপীয়র প্রবেশ করেছেন। ক্রিস্টফ মার্টিন উইল্যাণ্ডের (১৭৩৩-১৮১৩) নাম শোনা যায় এদিক থেকে। শোনা যায়, তাঁদেরই সমসাময়িক জোহান গটফ্রিড হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) নাম। উইল্যাণ্ড শেক্সপীয়রের জার্মান-অনুবাদ রেখে গেছেন, আর, হার্ডার রেখে গেছেন শেক্সপীয়রের অকুণ্ঠ প্রশংসা। একুশ বছর বয়সে, স্ট্রাসবুর্গে গ্যেটের সঙ্গে হার্ডারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই স্ট্রাসবুর্গেই গ্যেটে নাকি শেক্সপীয়রের সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন।

কিছুদিন তিনি অ্যালকেমি চর্চাতেও কাটিয়েছেন—সেটা স্ট্রাসবুর্গে পৌঁছবার আগের কয়েক মাসের কথা—লিপজিগ্ থেকে স্ট্রাসবুর্গ পর্বে উপস্থিত হবার আগেকার ঘটনা। একটির পর একটি রমণীর প্রেম এসেছিল তাঁর জীবনে, পর্যায়ক্রমে অপসরণ আর পরিত্যাগের দুর্যোগ সে-সব। গ্যেটে কবিতা লিখেছেন,—শেক্সপীয়রের ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের প্রেরণায় তাঁর প্রথম নাটক লিখেছেন—Gotz von Berlichingen,—নিজেরই ছায়া রেখে গেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস Werther-এ। সমস্ত ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি উইমারে এক সরকারী চাকরি নিয়েছেন। সেই উইমারে ফ্রিডরিখ শিলারের (১৭৫৯-১৮০৫) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। 'ফাউস্ট' লেখার কাজ চলছে তখন।

ক্ষণিক এই মানুষের জীবনে মানবসত্তার সীমা মানতেই হয়—এই অনিবার্য পরিসীমা-চিন্তার বেদনা আছে তাঁর সে-আমলের কবিতায়। আকাশের তারা ধরবার হাত নেই মানুষের। এই যন্ত্রণা নিয়ে গ্যেটে হঠাৎ উইমার ছেড়ে ইটালির পথে পাড়ি দেন। এরিয়ুপিদিসের কাহিনী অবলম্বনে প্রাচীন ফরাসী রীতিতে তাঁর নাটক লেখা হয়—Iphigeine auf Tauris ইটালি থেকে আবার ফিরেছেন উইমারে। ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) তখন জার্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক। এদিকে ফরাসী-বিপ্লব তখন ইউরোপের সর্ব-প্রধান ঘটনা। ১৭৯০-এ 'ফাউস্ট'-এর কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়। কয়েকটি ছোটো ছোটো লেখাতে তিনি ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাবের কথা লিখেছেন এই সময়ে। শিলারের সঙ্গে আগে কতকটা বিরূপতা ছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু শতকের শেষ দশকে দুজনের মধ্যে গভীর সহযোগিতা দেখা দেয়। সেই পর্বে দেখা দিয়েছে গ্যেটের আর এক প্রসিদ্ধ রচনা—উইলহেল্ম্ মিস্টারের শিক্ষানবীশী। আঠারোর শতকের শেষদিকে ইউরোপে ভাবের স্রোতে যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, জার্মানীর গ্যেটে ছিলেন সেই ঢেউয়েরই গভীর উৎক্ষেপ। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে,—জার্মান ভাষায় তাঁর মূল রচনার স্বাদ পেয়েছেন যাঁরা তাঁরাই গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত আস্বাদনের পরিচয় দিতে পারেন।

মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের মহিমা অনুভব করতে গিয়ে গ্যেটের প্রসঙ্গে আমি মাত্র কয়েকটি কথাই এখানে

● মাইকেল মধুসূদন

উল্লেখ করলুম। গ্যেটের সঙ্গে মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনের সাদৃশ্য শুধু এইটুকুই যে, এঁরা নিজের নিজের দেশে-কালে দুজনেই ছিলেন গভীরভাবে জীবন-জিজ্ঞাসু এবং প্রবলভাবে সাহিত্য-সাধক। মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর আচরণ, প্রবৃত্তি আর বিবেকের দ্বন্দ্ব ফুটেছে এঁদের রচনায়। অশান্ত এঁরা। এঁরা চির-চঞ্চল। এঁদের দুঃখের অন্ত ছিল না। এঁদের কৃতিত্বও চিরকালের স্মরণীয়। গ্যেটে জার্মানীর সন্তান, কিন্তু তাঁর চোখ ছিল বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে। মধুসূদন বাংলার সাগরদাঁড়ির সন্তান, তিনিও বিশ্বের বাণীবন্দনা করে গেছেন।

মনে পড়ছে ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপালদাস চৌধুরী-অধ্যাপক' হিসেবে 'মধুসূদন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বর্গত শশাঙ্ক-মোহন সেন। তার আগে যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং নগেন্দ্রনাথ সোম লিখে গেছেন মধুসূদনের জীবন-বৃত্তান্ত আর কবি-ব্যক্তিত্বের নানা কথা। রবীন্দ্র-নাথের অল্প বয়সের রচনা—মেঘনাদ-বধ কাব্যের সমালোচনার তর্ক-বিতর্ক রবীন্দ্রনাথের নিজের মনেও টিঁকে ছিল অনেকদিন। জীবনের পরের পর্বে তিনি মধুসূদন সম্বন্ধে আরো আলোচনা রেখে গেছেন। ব্যক্তি-জীবনের পূর্বপ্রদত্ত কিছু কিছু তথ্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চিহ্ন আছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সাধক চরিতমালা পর্যায়ের তেইশ নম্বর পুস্তিকায়। মোহিতলাল, 'বনফুল', প্রমথ-নাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, ডক্টর রবীন্দ্র-কুমার দাশগুপ্ত ইত্যাদি আমাদের হাল আমলের লেখকরাও মধুসূদন সম্বন্ধে অনুকূল-প্রতিকূল তথ্যময় আস্বাদনমুখী নানা আলোচনাই করেছেন। মধুসূদন সম্বন্ধে আজ প্রায় একশ' বছরের বেশি হোলো, আমাদের সাহিত্য-সমাজে আলোচনার অন্ত নেই। সম্প্রতি একখানি বই বেরিয়েছে—ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্তের লেখা 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী।' শশাঙ্কবাবু সেই ১৯২১-এ যেমন মধুসূদনের অন্তর্জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখে গেছেন—'আমাদের মূল প্রণালী হইবে মধুসূদনের শিল্পকার্যের 'উত্তম-মধ্যম' বলিয়া রায় প্রকাশ নহে, উহাকে সম্যক গ্রহণ,' তিনি যেমন 'judgement' দিতে বসেন নি, চেয়েছিলেন 'interpretation'— অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের এই গবেষণার কাজ তেমনি চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে মধুসূদনের শিল্পিসত্তার সম্যক ধারণায় অভিপ্রায়ী। তাঁকে মধুসূদনের চিঠি-পত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হয়েছে। মোট পাঁচ ভাগে সর্বসমেত একশ' বিয়াল্লিশ খানি চিঠি সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি—

১৮৪১-৪৮ কলকাতায়,—১৮৪৮-৫৬ মাদ্রাজে,—১৮৫৬-৬২ পুনর্বার কলকাতায়,—১৮৬২-৬৭ ইউরোপ-প্রবাসে,—১৮৬৭-৭৩ শেষপর্বে।

মধুসূদন সম্বন্ধে আজ এসব কথা ভাবতে গিয়ে এই কথাই প্রধানত মনে আসছে যে, তিনি তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত অন্ধকার সত্যিই শুদ্ধ করে নিতে পেরেছিলেন তাঁর কবি-চেতনার আলোতে। তিনি 'ইয়ং বেঙ্গলের'ই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভাঙনের বিপ্লবের চেয়ে সৃষ্টির বিপ্লবেই তাঁর মনোযোগ ছিল অব্যাহত। ভাবের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সাহিত্যের স্বাধীনতা—তাঁর জীবনে এসব ধারণার কোনোটাই অন্ধকার-বাচক নয়। সমস্তই আলোর দিকে যাত্রা। মধুসূদনের সম্বন্ধে অনেকদিন আগে,—তাঁর চিঠিপত্র এবং কাব্য-নাটক অবলম্বনে শশাঙ্কবাবু এই কথাটি বলে গেছেন—'ফরাসী বিপ্লবের সমস্ত ভাবাভিঘাতে এবং ভল্‌টেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া রুশো—সেন্টব্রুয়াও—গ্যেটে—বায়রনের যাবতীয় অভিনবতা এবং অতিরিক্ততার আঘাতেও তিনি সচেতন ছিলেন; তবু শিল্পী মধুসূদনের অন্তর্জীবনে এবং কাব্য-আদর্শে ঐ লক্ষণ প্রবল হইতে পারে নাই।' মনে পড়ছে, শশাঙ্কবাবু পর পর তিনটি বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন, লিখেছিলেন—'মধুসূদনের এই অমিশ্র, অমল, অসঙ্গ শিল্পী-চেতনা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর প্রণিধানযোগ্য।'

'অমিশ্র, অমল, অসঙ্গ'—পর্যায়-ক্রমে এই তিনটি বিশেষণের স্মৃতি আজকের ভাষায় অনুবাদ করবার ইচ্ছে হয়েছে মাঝে-মাঝে। শশাঙ্কবাবুর 'অমিশ্র' আর 'অসঙ্গ' শব্দ দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; 'অমল' অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টির চেতনায় সমাজ-সংস্কারের বা অন্য কোনো-কিছু সংস্কারের ইচ্ছে মিশে গিয়ে তাঁর ঐ মূল ইচ্ছের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে নি,—এই ছিল 'অমিশ্র' শব্দটির সংকেত; 'অসঙ্গ' শব্দটির সাহায্যে নানা পারিপার্শ্বিকের সংযোগ সত্ত্বেও মধুসূদন যে তাঁর স্বয়ংপ্রধান স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, শশাঙ্কবাবু এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, আর এই একান্ত সাহিত্য-মনোযোগী স্বাধীনতার ফলেই মধুসূদনের সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল 'অমল' অর্থাৎ মালিন্যহীন—কল্যাণময়।

আমি এইভাবেই বোঝবার চেষ্টা করেছি। ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীর আওয়াজ কে না শুনেছেন? কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে-আওয়াজ স্থায়ী উদ্দীপনা হতে পারে নি। জীবনের অন্ধকার গভীর, গভীর, গভীর। সে দেয়াল সহজে ভাঙে না। সে বাধা সহজে সরে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা মনে পড়ে—'ভুখ দিলে যে, বুক দিলে যে, দুখ দিতে সে ভুললো না—মৃত্যু দিল লেলিয়ে পাছে পাছে।' সেই মৃত্যু-ভাবনায় অদৃষ্ট মানুষেরই। কিন্তু, সাহিত্যে সে-অন্ধকারকে আলোয় রূপান্তরিত করা প্রতিভার কাজ। তাতে প্রবল সক্রিয়তা থাকা চাই। সাত্ত্বিক হোন্ স্রষ্টা, কিন্তু সৃষ্টিকর্ম অনেকটা রাজসিক। চাই অধ্যয়ন, মনন, রচনা। চাই বিশ্বাস, সংকল্প, কর্ম।

ব্যক্তি-জীবনে তাঁর যতোই চাঞ্চল্য ঘটে থাকুক, কবি-চেতনায় মধুসূদন ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ, ভ্রান্তিবিজয়ী, আলোকপন্থী। প্রমথ বিশী মশায়ের 'মাইকেল মধুসূদন' বইখানি ৯৩ পৃষ্ঠা থেকে তাঁর একখানি চিঠির বঙ্গানুবাদের একটু উদ্ধৃতি তুলে দিলুম—

'কালিদাস, ভার্জিল ও টাসোর কথা মনে কর। আমার মনে হয় না, ইংলণ্ডে ইঁহাদের সমকক্ষ কোন কবি আছে। মিল্টন অন্য স্তরের ব্যক্তি। তদ্রচিত শয়তানের মত উচ্চতম কল্পনার ও ভাবনায় তিনি পরিপূর্ণ; কিন্তু ভালবাসার ভাব তাঁহার মধ্যে নাই; মিল্টনের ভাব পাঠকের মনকে উচ্চতম স্তরে উন্নীত করিতে পারে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। ফলে কি হইয়াছে? তাঁহার খ্যাতি অসীম, কিন্তু পাঠক কয়টি? মিল্টনই শয়তান; তিনি আমাদের অপেক্ষা উন্নততর জীব; কিন্তু তাঁহার জন্য আমরা সমবেদনা অনুভব করি না; বিস্ময়ে ও ত্রাসে তাঁহার জলদ-গর্জন কানে প্রবেশ করে; নির্জন বনে সিংহের গভীর গর্জনের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর।'

প্রমথবাবু মধুসূদনের শিল্প-বোধের তিনটি ধাপ দেখিয়েছিলেন তাঁর সেই ১৯৪১-এর বইখানিতে। প্রথম স্তরে মুর, বায়রন, স্কট ছিলেন মধুসূদনের আদর্শ, সেটা তাঁর ইংরেজি কাব্যের যুগ। দ্বিতীয় স্তরে মিল্টনের প্রেরণা। প্রমথবাবু লিখেছিলেন—'ইংরেজী কাব্যের যুগ শেষ হইয়া বাংলা কাব্যের যুগ আরম্ভ হইবার সময়ে তাঁহার আদর্শ মিল্টন, কিংবা সত্য কথা এই যে, মিল্টনীয় প্রয়াস ইংরেজী কাব্যে সম্ভব নয় বলিয়াই তিনি বাংলা কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।' তৃতীয় ধাপে মধুসূদনের প্রেরণা ছিলেন শেক্সপীয়র।

মিল্টনও রাজসিক, শেক্সপীয়রও বহু বিচিত্র জীবন-নিরীক্ষার নিত্য-উৎসাহী শিল্পী। মধুসূদন ফ্রান্সের সুখ-সুবিধা পছন্দ করে অনেকবার অনেক চিঠি লিখে গেছেন। কিন্তু শেক্সপীয়র-মিল্টনের ইংলণ্ডের দিকেই তাঁর ভেতরের চোখ খুলে রেখেছিলেন তিনি,—যেমন গ্রীসের, রোমের হোমার ভার্জিলের দিকে,—যেমন ভারতবর্ষে ব্যাস-বাল্মীকির দিকে,—বাংলার কাশীরাম আর কৃত্তিবাসের দিকেও।

(ক্রমশঃ)

ভারত দর্শন

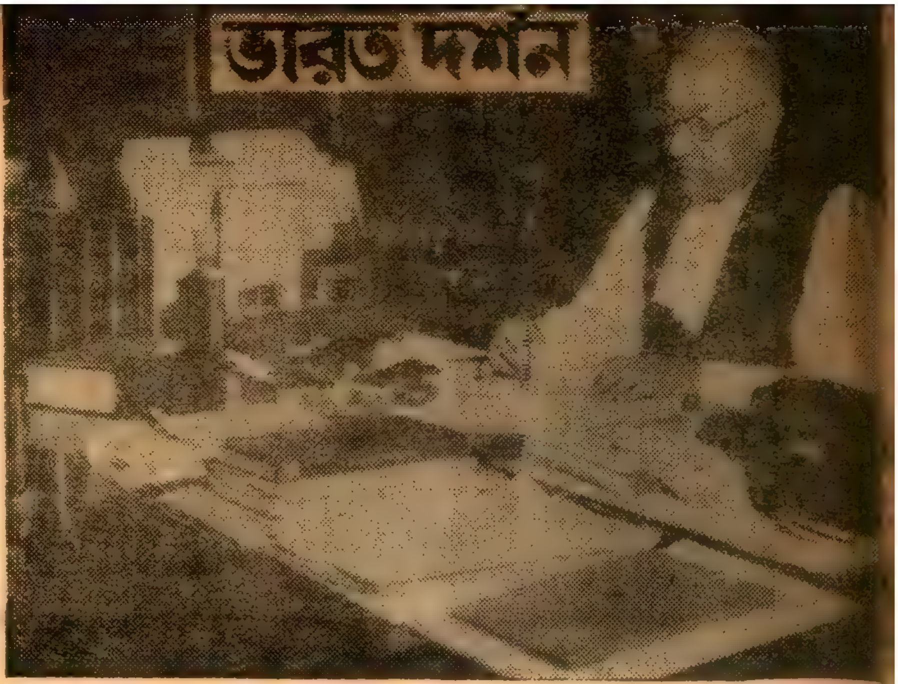

● কর্মবীর শ্রী সুধীরঞ্জন দাস

রাজধানী ঃ

দাস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর জনমনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। একটি রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপ মুখ্যমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর মন্ত্রিত্বের কলঙ্কময় চিত্র উদঘাটন করে, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাস যে রায় দিয়েছেন তা খবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রায়ের পরিণাম ও প্রতিক্রিয়াও হবে অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী। ঋজু চরিত্র, দৃঢ়চেতা ও অসামান্য মননশীল শ্রীদাসের রিপোর্টে বিচার বিভাগের মর্যাদা গিয়েছে অনেক বেড়ে—বিচারের ক্ষেত্রে এনেছে যুগান্তর। একটি রাজ্যের ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আসীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করে রায়-দানে বিদ্যাবত্তা, অপরিমেয় বুদ্ধিমত্তা এবং বিচার-বিশ্লেষণে বলিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি জনচিত্ত জয় করেছেন। আজ তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে সর্বত্র—দিল্লীর দরবার থেকে ভারতের অতি সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। সকলেরই ধারণা, দাস রিপোর্টের পর অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রি-সভা এবং প্রশাসন দপ্তরগুলো একট সাবধান হয়েই চলবে।

পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ সিং কায়েরাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হন তদন্ত কমিশন গঠন করতে। ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাসকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল একক একটি কমিশন। শ্রীকায়রোঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল আটাশটি। কমিশন ৫১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রীকায়রোঁ দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে তাঁর নিজের সুবিধার জন্য, তিন-তিনটি ক্ষেত্রে পত্র ও আত্মীয়স্বজনের সুবিধালাভে মুখ্যমন্ত্রীর প্রভাব ও তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অন্য পাঁচটি ক্ষেত্রে শ্রীকায়রোঁর পুত্র ও আত্মীয়েরা বে-আইনীভাবে সম্পত্তি ও ব্যবসা হস্তগত করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণকালে কাজে লাগানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতাকে। আঠারোটি ক্ষেত্রে অভিযোগ অবিশিা প্রমাণিত হয় নি।

কমিশন মন্তব্য করেছেন, নিজের পুত্র ও আত্মীয়েরা তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা যে কাজে লাগাচ্ছেন, তা কায়রোঁ জানতেন, এরূপ ভাববার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আসল কথা, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও সরকারী কর্ম-চারীদের কার্যকলাপ দেখেও তিনি দেখেন নি, এ কথা স্বীকার করতে হবে। ক্ষমতার এ ধরণের অপব্যবহার, মুখ্যমন্ত্রীর মতো পদস্থ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে সম্পর্ণ অশোভন।

প্রচলিত আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে পুত্র ও আত্মীয়দের সম্পত্তি ও ব্যবসা দখল অথবা তা বিক্রয় ও হস্তান্তরে সাহায্য করার জন্য শ্রীকায়রোঁ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁর সহকর্মী বা অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে তাঁর প্রভাব এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এর জন্য তিনিই দায়ী। চণ্ডীগড়ের নীলম সিনেমা, অমৃতসরের নন্দন সিনেমা, পাঞ্জাব কোল্ড স্টোরেজ এবং রামগড়, ধানী ও মাধার কালাম গ্রামে জমি বিক্রির ব্যাপারে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। কমিশন শ্রীকায়রোঁ ও তাঁর পুত্রের আরও অনেক কাজের তীব্র সমালোচনা করেছেন। শুধু কায়রোঁ নন, তাঁর মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল, পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুরজমল জৈন এবং সহকারী পূর্ত-মন্ত্রী সর্দার নিরঞ্জন তালিব দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও মিউনিসিপ্যালিটীর কর্মচারীর বিরুদ্ধেও কমিশন বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

শ্রীকায়রোঁ ধুরন্ধর রাজনীতিক। বিপদের দিনে রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যায় পর্যদস্ত, দলাদলিদীর্ণ পাঞ্জাবের শাসন পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। সুচতুর, দক্ষ কাণ্ডারীর মত তিনি পাঞ্জাবী সুবার আন্দোলনকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা দিল্লীর মন জয় করেছিল। সে জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ দিল্লীর দরবার প্রথম দিকে কানে তোলে নি।

এ হেন, অবরদস্ত পুরুষের অপরাধ বিচারকের কঠোর, নিরপেক্ষ তুলাদণ্ডে যাচাই করার পর জনসমক্ষে পেশ করে শ্রীদাস অপরিসীম মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরপুরুষদের কাছেও তাঁর এ রায় সুবিচারের নিদর্শন হয়ে থাকবে। এটি তাঁর জীবনের অন্যা ন্য কীর্তিরূপে ঘোষিত হবে। আমরাও মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচার-পতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

• • •

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ পরি-চালনার আহ্বান জানিয়েছেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। সংযুক্ত সদাচার সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনন্দ সকল প্রকার দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করার শপথ গ্রহণ করতে বলেছেন। বৈদেশিক আক্রমণের চাইতেও দুর্নীতি বড় বিপদ বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

শ্রীনন্দের সাথে আমরাও একমত। শত্রুকে রোধ করা সম্ভব; কিন্তু সমাজ-কাঠামোর নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করতে উদ্যত গুপ্ত শত্রুর সাথে লড়াই করা কঠিন।

দুর্নীতির চাপে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে—সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠ থেকেই এর প্রতিকারের দাবীও উঠেছে। কাজেই দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য তাদের কাছে নতুন করে আবেদনের কি সার্থকতা আছে, আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। সরকার আন্তরিকতার সাথে এ কাজে ব্রতী হলে দেশবাসী সকলের অকুণ্ঠ সমর্থনই পাবেন। আসল জায়গায় ঘা না দিয়ে শূন্যে গদা ঘোরালে এবং নীতিশাস্ত্রের বুলি আওড়ালে কোন ফলই হবে না।

• •

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নয়াদিল্লীতে তিনদিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর খাদ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রবর্তন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঠিক হয়েছে, চাল ও গমের সর্বোচ্চ মূল্য অবিলম্বে বেঁধে দেওয়া হবে। এ কাজে হাত দেবার আগে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। অন্ধ্র ও মাদ্রাজে চাল সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের ধান-চাল চলাচলের সকল বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করা হবে। পশ্চিম বাংলার খাদ্যশস্যের মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকবে। পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার থেকে অতিরিক্ত ৮০ হাজার মণ চাল দেবার কথাও না কি হয়েছে। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মোটা দানার শস্য বা ডাল চলাচলের পক্ষে সকল বাধা-নিষেধ তুলে দেওয়া হবে। বর্তমান গম অঞ্চল বহাল থাকবে।

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রবর্তনে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী না কি বলেছেন, সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের ব্যবসার জন্য তিনি এমন একটি পরি-কল্পনা রচনা করেছেন যাতে উৎপাদকরা

● মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে—প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম ও অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী

সন্তুষ্ট হবেন এবং ক্রেতা-সাধারণ ন্যায্য-মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে।

শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের পরিকল্পনা না জানা পর্যন্ত তা' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। তবে, তিনদিন ধরে মন্ত্রীরা শলাপরামর্শ করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার মধ্যে খাদ্যশস্যের ফাটকা-বাজী বন্ধের কোন ইঙ্গিত নেই। চাল ও গমের সর্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা মূল্য বেঁধে দিয়েও সমস্যার সুরাহা পশ্চিম বাংলা সরকার করতে পারেন নি। ন্যায্যমূল্যে সরকারের বাঁধা-দামে চাল খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। যতদিন পর্যন্ত মুনাফা-শিকারীদের চোরাই চালানের, কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টির পথ খোলা থাকবে ততদিন মূল্যমান নির্ধারণ করে কোন লাভ হবে না—মানুষের মুখের আহার নিয়ে চলতে থাকবে অসাধু ব্যবসায়ীদের অবাধ জুয়াখেলা।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশের সঙ্কটকালে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব উপলব্ধির কথা তুলেছেন। তিনি বলেছেন, জনসাধারণের জীবন নিয়ে খেলা সরকার বরদাস্ত করবেন না। অসাধু ব্যবসায়ীদের অপপ্রচার ব্যর্থ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের সরকারী প্রচারযন্ত্র চালাবার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। আগামী দু' মাস চালিয়ে যাবার মত অঢেল খাদ্যশস্য মজুত আছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবসায়ীদের ওপর আস্থা এখনও হারান নি। তা' না হলে, তাদের শুভবুদ্ধি উদ্রেকের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ প্রধানমন্ত্রী করতেন না।

দেশের খাদ্যসঙ্কট অসাধু ব্যবসায়ী, পাইকার-আড়তদার ও মজুতদারদেরই সৃষ্টি। ভারত সরকারও এ কথা অস্বীকার করেন না। মুনাফাখোরদের শায়েস্তা না করে, দিনের পর দিন তাদের প্রতি কঠোর বাক্য উচ্চারণ সত্যি হাস্যকর। ব্যবসায়ীদের আচরণ, তাদের চালচলন ভারত সরকারের অজানা নেই। নীতিবোধের তারা ধার ধারে না। কথা খেলাপ করতে তারা কোনদিনই কসুর করে নি। ভারতের মাটিতে চীনা সৈন্য যেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন ব্যবসায়ী মহল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জরুরী অবস্থা থাকাকালে মূল্যবৃদ্ধি হবে না। জরুরী অবস্থা এখনও বর্তমান। অথচ গেল দু' বছরের মধ্যেই ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে ভারতে সব চাইতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। জরুরী আইন—ভারতরক্ষা আইন বহাল থাকতেও সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের

● শ্রীমিকোয়ান

কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেন নি। সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়েছেন। ক্ষুধার অন্ন মানুষ না পেলে—তার মুখের গ্রাস নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের যথেচ্ছ বিচরণ চলতে থাকলে, কেউ সরকারের মুখপাত্রদের কড়া কড়া কথা শুনে আশস্ত হতে পারে না।

* * *

সোভিয়েট দেশের মুখ্য সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমিকোয়ান নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থের বিষয় আলোচনা করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার পর তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে সোভিয়েট নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি।

প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের সংবাদে প্রকাশ, নিরস্ত্রীকরণের কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় নি। ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনায় সোভিয়েট দেশের সাহায্যের প্রশ্নটি আলোচনাকালে উঠেছিল।

* * *

মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী ব্যয় হ্রাসের আবেদন জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ৭০ কোটি টাকা হ্রাসের ইচ্ছাও প্রকাশ তিনি করেছেন। সাহায্য ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এই ব্যয় এড়ানো কঠিন, কিন্তু তা' বলে উদার হস্তে ব্যয় চলতে পারে না। সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যয়সঙ্কোচে রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য করা উচিত।

অর্থমন্ত্রী অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সরকারী দপ্তরের ব্যয় হ্রাস, বিশেষ করে উদ্বাস্তু, দুঃস্থ ও দুর্গতদের সাহায্যের টাকা কমিয়ে আসল সমস্যার সুরাহা যে হতে পারে না, তা' নিশ্চয়ই তিনি জানেন। সরকারের দপ্তরের অপব্যয়ের অন্ত নেই। সেগুলো বন্ধ করতে পারলে কিছুটা কাজ অবিশ্যি হবে। উদ্বাস্তুদের, বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যের বরাদ্দ অর্থ নানা হাত ঘুরে কতটুকু সত্যি সত্যি যথাস্থানে বিতরণ হয়, তাও অর্থমন্ত্রীর অজানা নিশ্চয়ই নেই। সেই রন্ধ্রপথ শক্ত হাতে বন্ধ না করে কেবল পুনর্বাসন ও সাহায্যের টাকার অঙ্ক কমালে সমাজকল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীকে কেউ দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবে না।

মুদ্রাস্ফীতি উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রে

স্বাভাবিক। তবে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির সে-ঝোঁকটা বিশ্রী মাত্রা ছাড়িয়েই গেছে। সে-ঝোঁক সামলাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যমান স্থির করে তার সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা করা। সে দিকে না গিয়ে কেবল ব্যয় হ্রাসে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ সম্ভব হতে পারে না।

* * *

নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশিলু আও নয়াদিল্লীতে বলেছেন, ভারত সরকার নাগাভূমিতে এবং নাগাভূমির বাইরে বৈরী নাগাদের কার্যকলাপ দমনের অভিযান স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছেন। শ্রীশিলু আও এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে জানিয়েছেন, অভিযান স্থগিত রাখার সাথে সাথে আত্মগোপনকারী বিদ্রোহী নাগারা বৈরিতামূলক কাজ বন্ধ করবে বলে তাঁরা আভাস পেয়েছেন।

বিদ্রোহী নাগারা রণে ভঙ্গ দিয়ে শান্তির পথে আসতে চাইছে, এ সংবাদ খুবই সুখের। ভারতে তারা শান্তিতে, সুখে ও সম্ভ্রমে বসবাস করুক, এটাই সকলের কাম্য। তাদের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আলোচনার পথ মুক্ত করে রাখাতেও কেউ আপত্তি নিশ্চয়ই করবে না। কিন্তু শান্তি কমিশনের পরামর্শে যে-সব সর্তে ভারত সরকার ফিজোর চেলাদের সাথে আলোচনা চালাতে চাইছেন তা অত্যন্ত আপত্তিকর—উদ্ভট। আলোচনা চলাকালে আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যের টহল বন্ধের এবং নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত নাগাদের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগা সরকারের সদস্য হিসেবে গণ্য করার দাবী উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম সর্তটি ভারত সরকার মেনে নেন নি। পাক-ভারত ও ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেওয়া সম্ভবও ছিল না। নাগাভূমি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগা সরকারের সাথে আলোচনার অর্থই সেখানে একটি পাল্টা সরকারের স্বীকৃতিদান। এই আজগুবি সর্তে শান্তি-মিশন নাগাদের সাথে খসড়া চুক্তি করেছেন। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহী ফিজোর আশ্রয়দাতা রেভারেণ্ড মাইকেল স্কটকে নাগারা বিদেশী নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বলে বর্ণনা করেছেন। ভারত সরকার এই সর্ত স্বীকার করে নিয়ে আলোচনায় নামলে আবার বিদেশীদের কূট চক্রান্তের বেড়াজালে আটকা পড়ার পথই প্রশস্ত করবেন। কাশ্মীরেও এমনি করেই বিপদ ডেকে আনা হয়েছিল। নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রী বিদ্রোহীদের সংস্পর্শে এসেছেন জেনে আমরা কতকটা আশ্বস্ত হয়েছি। তাঁর ও শান্তি কমিশনের প্রচেষ্টা সফল হলে নাগাভূমির উদ্বেগজনক অবস্থার অবসান ঘটবে। বিদেশী ধর্মযাজকের কূটনৈতিক চালে নাগাভূমির পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে কথাটা যেন কেউ ভুলে না যান। ভুলের মাশুল যেন দেশবাসীকে দিতে না হয়।

● শ্রীশিলু আও

আসাম:

আসামে পাকিস্তানীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য পাক-ভারত সীমান্তের লোক সরিয়ে নেবার প্রস্তাব অনুযায়ী আসামের সীমান্ত এলাকার প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের তথ্য অনুযায়ী সীমান্ত এলাকা থেকে দশ হাজার পরিবারকে অন্যত্র অপসারণ প্রয়োজন হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে প্রায় এক লক্ষ নরনারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। এদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের জমি ছাড়াও নগদ অর্থ সাহায্যের প্রশ্ন রয়েছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা দিল্লীতে অবস্থান-কালে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

● শ্রীচালিহা

আসামের সীমান্ত অঞ্চল থেকে লোক অপসারণের বিষয়টি নিয়ে পূর্বেও শ্রীনন্দের সাথে আলোচনা হয়েছে। প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করে দেখবেন বলে তিনি আশ্বাসও তখন দিয়েছিলেন।

আমরা আশা করি, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের ভারতভূমিতে গা-ঢাকা দিয়ে প্রবেশের পথ বন্ধ করতে ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে সর্বতোভাবেই সাহায্য করবেন।

মহারাষ্ট্র:

বোম্বাই বন্দরের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। খাদ্যশস্য বোঝাই জাহাজের খেসারত ভারত সরকারকে গুণতে হচ্ছে।

২৫শে মে থেকে ১৯শে জুন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে জাহাজ থেকে খাদ্যশস্য খালাস হয়েছে সাড়ে আট হাজার টন। কথা ছিল প্রতিদিন অন্তত দশ হাজার টন করে মাল খালাস হবে। বর্ষা সুরু হওয়ার পর থেকে কাজে আরও ঢিলে পড়েছে।

বন্দরে জাহাজ জমে যাওয়ায় মার্কিন দেশ থেকে দু' লক্ষ টন খাদ্য নিয়ে আগত এগারটি জাহাজকে বন্দরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব হয় নি—জাহাজগুলো পড়ে আছে মাঝ দরিয়ায়। এই দু' লক্ষ টন খাদ্যশস্যের এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রের জন্যই বরাদ্দ করা ছিল। মহারাষ্ট্রে এবং দেশের অন্যান্য অংশে যখন খাদ্য সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে তখন জাহাজ খালাসের অব্যবস্থায় খাদ্য বোঝাই জাহাজ পড়ে আছে মাঝ দরিয়ায়। এর চাইতে কঠিন পরিহাস আর কি হতে পারে।

শ্রমিক নেতা ও ঠিকাদারদের সাথে আলোচনা করে এর একটা ফয়সালার জন্য খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম এবং শ্রীঅশোক মেহতা এখানে এসে পৌঁচেছেন।

• • •

মহারাষ্ট্রের বুকের ওপর দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে এসেছে। পুণায় খাদ্য নিয়ে দাঙ্গার আশঙ্কা এবং ওয়াসিম, হিংগনঘাট, আমগাঁও ও পুসাদের লুটপাটের ঘটনায় সকলেই চিন্তিতবোধ করবেন।

বিদর্ভের আকোলা অঞ্চলে বুভুক্ষু মানুষ কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে রুটি ছিনিয়ে নিয়েছে। ভাণ্ডারা ও ওয়ার্ধা জেলায় বহু লোক আম ও মহুয়া-আটা খেয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য না থাকার জন্য বাজারে জিনিষপত্রের দাম ভয়ঙ্কর বেড়েছে ও তা সাধারণের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেছে। গ্রামাঞ্চলে যখন ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে তাদের মাল সংগ্রহ করে গরুর গাড়িতে ফিরছিল, তখন নানা জায়গায় তাদের আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লুট হয়েছে। সংবাদপত্রে এ-সব সংবাদ বিশেষ ছাপা হয় নি—যাতে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে না পড়ে তার জন্য এই সব সংবাদ প্রকাশে কড়াকড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে দুর্ভিক্ষ বিদর্ভের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কি সম্ভব হবে?

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও নায়কের নিজের অঞ্চল ইয়োতমলের পুসাদে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানে গম বা চাল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি কুইণ্টাল নিকৃষ্ট গমের সরকার-নির্দিষ্ট দর ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, অথচ তা

● শ্রীবসন্তরাও নায়েক

বর্তমানে ৭৫ থেকে ৭৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভাল গমের সরকারী দর ৭৫ থেকে ৮০ টাকা—কিন্তু তা বর্তমানে প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১১৮ টাকা প্রতি কুইণ্টাল। গম ও চাল অধিকাংশ স্থানেই নেই। ন্যায্যমূল্যের দোকানে যে বিদেশী গম ও মার্কিন চাল পাওয়া যায়, তা খাওয়ার অযোগ্য।

মহারাষ্ট্রের এই খাদ্য সঙ্কটের প্রকৃত কারণ যে কি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সরকার ব্যবসায়ীদের গাল দিচ্ছে, আর ব্যবসায়ীরা দিচ্ছে সরকারকে। ব্যবসায়ীদের মতে, উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করার ক্ষেত্রে বাধাই এই সঙ্কটের জন্য দায়ী। মধ্যপ্রদেশ থেকে গত দু'মাসে কিছুই পাওয়া যায় নি। এ অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও, বর্তমান সঙ্কটের একমাত্র কারণ এই নয়। নাগপুর থেকে প্রতিদিন এক হাজার ব্যাগ চাল বোম্বাই শহর ও গুজরাটের নিকটবর্তী অন্য অঞ্চলে যায়—এখানে দাম অপেক্ষাকৃত বেশি। মধ্যপ্রদেশ থেকেও চোরাপথে প্রচুর চাল মহারাষ্ট্রে আসছে। আসল কারণ, মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য মজুতদার ও মুনাফাকারীরা খাদ্যশস্য লুকিয়ে ফেলেছে।

উত্তর প্রদেশ :

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল থেকে শ্রীঅশোক মেহতার যে সব অনুগামী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের কারও কারও ভাগ্যে মন্ত্রিত্ব জুটবে বলে শোনা যাচ্ছে। উত্তর প্রদেশ বিধানসভার দুজন বিশিষ্ট প্রাক্তন প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীগেন্দা সিং ও শ্রীরামায়ণ রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়ে ইতিমধ্যেই নাকি লক্ষ্ণৌতে আলোচনা সুরু হয়েছে। শ্রীগেন্দা সিং পূর্ণমন্ত্রী ও শ্রীরামায়ণ রায় উপমন্ত্রী হবেন।

প্রাক্তন প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্যরা উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী রাজনীতির ক্ষেত্রেও দু' দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে একদল শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তের দলকে, এবং অপর দল শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠির দলকে সমর্থন করছেন। শ্রীগেন্দা সিং শ্রীগুপ্তের সমর্থক, আর শ্রীরায় শ্রীত্রিপাঠির দলে।

কংগ্রেসে যোগ দেবার পর সেই একই খেলা, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলে অংশ গ্রহণ ও মন্ত্রিত্ব লাভের চেষ্টা। এর ফলে, সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীমেহতা ও তাঁর

অনুগামীরা কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন বলে যে কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে।

কেরল ঃ

কেরলের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাকোকে পরাজিত করে শ্রী কে সি আব্রাহাম কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীআব্রাহামকে সমর্থন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ও বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। সুতরাং শ্রীআব্রাহামের নির্বাচন মন্ত্রিসভা ও সাংগঠনিক দলের যুক্ত শক্তির জয়ের প্রমাণ।

কিন্তু শ্রীচাকো যে ভোট পেয়েছেন তা মোটেই উপেক্ষার নয়। শ্রীআব্রাহাম পেয়েছেন ১১২ ভোট, আর শ্রীচাকো পেয়েছেন ৭০ ভোট। মন্ত্রিসভা, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের পরোক্ষ সমর্থনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রীচাকো যে ৭০টি ভোট পেয়েছেন, তা থেকেই প্রমাণ হয় কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে এখনও শ্রীচাকোর প্রভাব যথেষ্ট আছে। বিশেষ করে কেরলের ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও গ্রামাঞ্চলের ধনীদের বিপুল সমর্থন তিনি পেয়েছেন।

আগামী বৎসর কেরলের সাধারণ নির্বাচন। তাই শ্রীচাকোর এই শক্তি দেখে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ও অন্যান্য মন্ত্রিসভা সমর্থক নেতৃবৃন্দ আবার

শ্রীচাকো

শ্রীচাগলা

শ্রীচাকোর সঙ্গে আপোষ করার কথা ভাবছেন। শ্রীআব্রাহাম সভাপতি নির্বাচিত হবার পরই ঘোষণা করেছেন, সকল পক্ষকে নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিটী গঠন করা হবে।

* * *

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা ত্রিবাঙ্কুরে এসেছেন, শিক্ষার বিষয়টিকে সংবিধানের যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কেরলের সমর্থন আদায় করার জন্য। শ্রীচাগলা শিক্ষামন্ত্রী হবার পর থেকেই এর জন্য চেষ্টা করে আসছেন। এর ফলে সমগ্র দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একই রূপ নীতি অনুসরণ করা যাবে এবং রাজ্যের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কেন্দ্র বেশি করে সাহায্য করতে পারবে।

অধিকাংশ রাজ্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর এই প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছে। কিন্তু কেরল এই ব্যাপারে সমর্থন জানাচ্ছে না, বরং বেশ কিছুটা আপত্তির ভাবই আছে। কেরলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বে-সরকারী ধনিক গোষ্ঠীর, বিশেষ করে ক্যাথলিক চার্চের খুবই প্রাধান্য আছে। সম্ভবত তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করবেন, এই ভয়ে তারা শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার বিষয়ে পরিণত করার বিরোধী, এবং এদের প্রভাবান্বিত কেরল সরকারও তাই এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্করের সঙ্গে শ্রীচাগলা এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে, এই আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতার ভাব কিছুটা কমেছে।

* * *

চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির কেরল রাজ্য কমিটী ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে রাজ্যের ৯টি জেলাতেই মশাল শোভাযাত্রা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হরতাল পালনের কথা আছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংঘকেও এই আন্দোলনে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখযোগ্য, বামপন্থী কমিউ-নিস্টরা এ আন্দোলনে যোগ দেয় নি। তারা পৃথক আন্দোলনের চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে তারা ৬১ জন সদস্যবিশিষ্ট পাল্টা রাজ্য কমিটীও গঠন করেছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি পৌর নির্বাচনে বামপন্থী কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির দুই পক্ষের মধ্যে আপোষের সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

রাজস্থান, মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের মত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলেও, মধ্যপ্রদেশের খাদ্যের অবস্থাও সুবিধাজনক নয়।

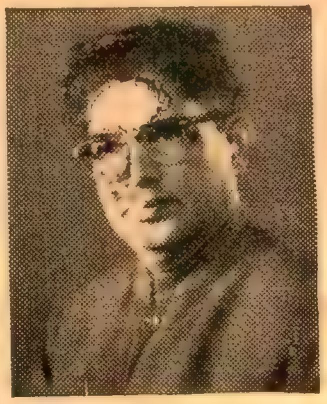

শ্রী শঙ্কর

ধানের দাম এই সপ্তাহে প্রতি কুইণ্টাল ১২ টাকা করে বেড়েছে—প্রতি মণ ধান ২২ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চাল ও অন্যান্য জিনিষের দামও সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে আসছে না। মজুতদাররা নানাভাবে খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়াচ্ছে। সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্যপণ্যের যোগান খুবই অনিয়মিত—প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহও কম। ফলে প্রতি-দিনই হাজার হাজার লোক খালি হাতে দোকান থেকে ফিরে আসছে।

জব্বলপুর বিভাগের কাটনি এবং রেওয়া বিভাগের রেওয়া, সিধি, সাতনা, শাহদল ও পান্না জেলায় ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিয়েছে। বহু আদিবাসী কেবলমাত্র গাছের পাতা খেয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করছে।

মধ্যপ্রদেশে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এরূপ সঙ্কট কেন হল, তা রীতিমত বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এবার উৎপাদন কিছু কম হলেও ঠিক এমন অবস্থা হবার কোন কারণ নেই। সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে দমন করতে না পারলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।

* * *

জব্বলপুর, রাইপুর, ইন্দোর ও গোয়ালিয়রে আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। আগামী মাস থেকে এই সব বিশ্ববিদ্যালয় কাজ আরম্ভ করবে। জব্বলপুরের বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে এবং অন্যান্য তিনটি সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে।

রায়পুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে রবিশঙ্কর শুক্ল বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীশুক্ল মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর মহারাজ শিবাজী রাও সিন্ধিয়ার নামে হবে গোয়ালিয়রের বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলার রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য উপাচার্যদের নাম ঘোষণা করেছেন। ডঃ প্যাটেল, জব্বলপুর, ডঃ বাবুরাম সাকসেনা রায়পুর, ডঃ ভাণ্ডারকর গোয়ালিয়র ও রাজ্যের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী শ্রীকামাথ ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন। শ্রীকামাথ ছাড়া আর সবাই সুপরিচিত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত—এঁদের নিয়োগে শিক্ষানুরাগী মহল সন্তুষ্ট হয়েছে।

নতুন ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজ্যের মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ৭,—বর্তমান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হল—জব্বলপুর, সাগর ও বিক্রম (উজ্জয়িনী)।

মাদ্রাজ ঃ

এখানকার ফরওয়ার্ড ব্লক এখন দ্বিধা বিভক্ত—কর্মীরা হয়ে পড়েছে দিশেহারা। দলের নেতাদের একাংশ চাইছে মিশে যেতে কংগ্রেসের সাথে; আরেক অংশ ঝুঁকে পড়েছে স্বতন্ত্র পার্টির দিকে।

মাদ্রাজের রাজনীতিতে ফরওয়ার্ড ব্লক কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মাদুরাই এবং রামনাদ জেলার থেবর সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা সীমিত প্রভাব ছিল। তাও সম্ভব হয়েছিল স্বর্গত মথুরালিঙ্গম থেবরের ব্যক্তিত্বের জন্য। মথুরালিঙ্গমের মৃত্যুর পরই শ্রীশশিবর্ণ থেবর এবং শ্রীমুখিয়া থেবরের মধ্যে সুরু হয় নেতৃত্বের লড়াই। শ্রীশশিবর্ণ থেবর স্বতন্ত্র এবং ডি-এম-কে দলের অনুরাগী। শ্রীমুখিয়া থেবর কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী।

সম্প্রতি লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে শ্রীশশিবর্ণ থেবরের মনোনীত প্রার্থীকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। দলের মধ্য থেকে বিশ্বাসঘাতকতাই এই পরাজয়ের কারণ বলে তিনি ধরে নিয়েছেন। কংগ্রেসপন্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা মনে করেন—স্বতন্ত্র পার্টির দালালী করাতেই নির্বাচনে বিপর্যয় ঘটেছে।

ডি-এম-কে দলের এক সময়ের অন্যতম নেতা শ্রী ই ভি কে সম্পথের নেতৃত্বে পরিচালিত তামিল ন্যাশনাল পার্টি কংগ্রেসে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করছে। আসছে সপ্তাহেই শ্রীসম্পথ এ নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সাথে আলোচনা সুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে।

পাঞ্জাব ঃ

সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও দাস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে পাঞ্জাব কংগ্রেসে অন্তর্দলীয় রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কায়রোঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবার ফলে কায়রোঁ-বিরোধীরা উৎসাহিত হয়েছেন, এবং স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁদের শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী যিনিই হোন, কায়রোঁর আমলের দুর্নীতি দূর করে সৎ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড ও কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করবেন। কায়রোঁ ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় প্রশাসন ও দলের অভ্যন্তরে যেভাবে সব পাপচক্র গড়ে উঠেছে, তাতে এ কাজ করা খুবই কঠিন। দেখা যাক, নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন পাঞ্জাবে দুর্নীতি-মুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা ও দলাদলিপূর্ণ রাজনীতির সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস নেতৃত্ব কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩া৹ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি বৃহৎ উপন্যাস। মূল্য ৩া৹
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গ্রন্থ মেলা

বিশ্বভারতী পত্রিকা : সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

শুধু সংস্কৃতি চর্চার জন্যই 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার অবদান অসামান্য। এই পত্রিকার কর্ণধারদের নিকট আমাদের ঋণ কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। বিশ্বভারতী পত্রিকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় ব্যাপার এই যে, প্রতি সংখ্যায় নতুন বিষয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরা এবং যে পুরাতন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি এতোকাল পর্যাপ্ত ছিল না, সেই বিষয়ে অভিনব আলোকপাত করা। বর্তমান সংখ্যাটিও (বর্ষ ২০ সংখ্যা ৪—বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২) সেই অতুলনীয় প্রশংসার অধিকারী বলতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি। বলা বাহুল্য এই গর্ববোধের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য, রীতি-নীতি এবং তার সব কিছুই বিশেষভাবে জড়িত। আলোচ্য সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ স্বলিখিত যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন, তার ফটো-স্টাট মুদ্রিত হয়েছে। অপূর্ব অক্ষরমণ্ডিত এই পত্রটি পত্রিকাটিকে শুধু শ্রীবৃদ্ধিই দান করে নি, তার যথাযথ ব্যবহার সম্পাদকীয় সুরুচির স্বচ্ছন্দ পরিচয়ও বহন করে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির আলোচনা স্বল্প-পরিসরে নিবদ্ধ হলেও মূল্যবান। এই সংখ্যায় অমূল্য রচনা হিসেবে যা আমরা বারবার পাঠ করেছি—যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির সেই 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' প্রবন্ধটির জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারের অনবাদ ও পরিভাষা বিভাগ এবং সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি। মানমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে বিগত দিনগুলিতে যে বিস্ময়কর প্রচেষ্টা চলেছিল তাও এই প্রবন্ধ থেকেই একমাত্র জানা যায়। প্রবন্ধটি সাহিত্যগুণাশ্রিত হয়েও রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের একাংশের এবং বাংলাদেশে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পরিভাষা বিস্তারকল্পে সুধীব্যক্তিদের প্রচণ্ডতম প্রচেষ্টার একমাত্র দলিল। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন,' নীলা মজুমদারের 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (সাহিত্যসৃষ্টি), উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের 'প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ' নতুন তথ্য দান করেছে।

জয়ন্তী সেন

সুনীলচন্দ্র সরকার 'এক শতাব্দীর কাব্য' আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'তবু নিজেদের সাহিত্যে কাব্যের বোধ ও রুচির বিস্তার ও নতুন সৃষ্টির সুবিধার জন্য এ কাজ একান্ত আবশ্যক।' বিদেশী কাব্য আলোচনায় কাজটি নিঃসন্দেহে জটিল তবু সম্পূর্ণ সার্থক। পিয়রসন লিখিত ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন অনূদিত 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধটি অনবাদ ও তথ্য সরবরাহের গুণে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। পত্রিকার আলোচনা বিভাগে অংশগ্রহণ করেছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আলোচনায় আদর্শ স্থাপন করেছেন সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। রবীন্দ্রনাথের 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে' গানের স্বরলিপি দান করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। পত্রিকান্তর্গত চিত্রগুলি অমূল্য সম্পদ হিসেবে গৃহীত হবে। সম্পাদককে ধন্যবাদ, এই পত্রিকা আয়তনে বিপুল হলেও এর আর্থিক মূল্য খুব কমই ধার্য করেছেন।

চতুষ্কোণ : সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ১২৩, এস পি মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। দাম : এক টাকা।

বাংলা দেশে পত্র-পত্রিকার, বিশেষত যে সব পত্রিকার আবির্ভাব সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তাদের অপমৃত্যুর ঘটনা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই ঘটনাকে অস্বীকার করে যাঁরা সাহিত্য-সংক্রান্ত কোনো ত্রৈমাসিক পত্রিকাকে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁদের সেই কীর্তি যেমন সোচ্চারে ঘোষণা করার মতই দুর্লভ এক ঘটনা, তেমনি তা ইতিহাসেরও অক্ষয় উপজীব্য বিষয়। 'চতুষ্কোণ' পত্রিকাটি চতুর্থ বর্ষে বৈশাখ '৭১ থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায়—এই ব্যাপার একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করবে। মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হলেও এর আয়তন কমানো হয় নি; বরং আরো নতুন বিষয় পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বৈশাখ সংখ্যায় রয়েছে তিনটি প্রবন্ধ—প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্তের 'বর্ষারম্ভ', সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের 'রবীন্দ্র-অধ্যয়নের নূতন দৃষ্টিকোণে', নৃপেন্দ্র গোস্বামীর 'আর্য গোত্র-সংগঠন'। তিনটি প্রবন্ধেই তত্ত্বের সংগে তথ্যের যেভাবে সংযোগ সাধন করা হয়েছে—তা নতুন চিন্তার খোরাক হিসেবে সাদরে গৃহীত হবে। 'চতুষ্কোণ' ৬/অদ্বৈত মল্লবর্মণের অপ্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'রাঙামাটি' প্রকাশিত হচ্ছে। এর জন্য সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র সেন ও মিহির আচার্যের গল্প দুটিতে বর্তমান জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, সেলিম আমেদ, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুনীল নন্দী, প্রসূন মিত্র ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য প্রসঙ্গ—যথা, 'নতুন বই', 'আলোচনা' প্রভৃতি বিভাগ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয়।

* টোকিওতে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী তিন প্রধান : রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো, রাষ্ট্রপতি ম্যাকাপাগাল ও প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান।

মালয়েশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য ফিলিপাইনসের চেষ্টা আবার ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ম্যাকাপাগাল, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান টোকিওতে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল, শীর্ষ সম্মেলনে কোন লাভ হবে না। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। উত্তর বোর্নিওর বনাঞ্চলে, মালয়েশিয়ার অংশ সারাওয়াক ও সাবায় ইন্দোনেশিয়ার গেরিলাবাহিনী নাশকতা-মূলক কাজে লিপ্ত। তবু ম্যাকাপাগল ও ফিলিপাইনসের বিশেষ প্রতিনিধি লোপেজ, এবং অন্তরাল থেকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইকেদার আন্তরিক চেষ্টার ফলে, অন্ধকারের মধ্যে একবার আলোর ঝলকানি দেখা গিয়েছিল।

টুঙ্কু আবদুল রহমান দাবী করেছিলেন, ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যরা মালয়েশিয়া থেকে সরে না গেলে কোন আলোচনা হবে না। সোয়েকার্নো মীমাংসা আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সারাওয়াক ও সাবা থেকে কিছু গেরিলা সৈন্যের অপসারণে সম্মত হয়েছিলেন। থাইল্যাণ্ডের তদারকীতে "থাইল্যাণ্ড, সোয়েকার্নো ও মালয়ের" জয়ধ্বনি করতে করতে ইন্দোনেশীয় গেরিলা সৈন্যরা সারাওয়াক থেকে বেরিয়ে এসেছিল, মালয়েশিয়ার সৈন্যরা তাদের সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। সবাই আশান্বিত হয়ে উঠেছিল, এবার বোধ হয় মালয়েশিয়া সমস্যার একটা মীমাংসা হবে।

টোকিও শীর্ষ সম্মেলনে ম্যাকাপাগাল প্রস্তাব করলেন, মালয়েশিয়া বিবাদ মীমাংসার জন্য ৪টি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের সালিশী মানা হবে। সোয়েকার্নো সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে রাজি। কিন্তু টুঙ্কু আবদুল রহমানের বক্তব্য, তিনি এই সালিশী মানতে রাজি আছেন. তবে তার পূর্ব সর্ত স্বরূপ ইন্দোনেশিয়াকে মালয়েশিয়ার বুক থেকে সকল গেরিলা সৈন্যকে সরিয়ে নিতে হবে। সোয়েকার্নো এ প্রস্তাবে রাজি নন। সোয়েকার্নোর কথা, মালয়েশিয়ার "সমগ্র রাজনৈতিক সমস্যার" মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া গেরিলা সৈন্য সরাতে পারে না। যদিও ২০শে জুন শীর্ষ সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, ৪ রাষ্ট্রের সালিশীর প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট তিনটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখবেন, তবু টোকিও শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে বলেই সকল পক্ষ ধরে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আর কোন আলোচনা করতে অস্বীকার করেই সোয়েকার্নো টোকিও ত্যাগ করেছেন। জাকার্তায় এসেই তিনি হুঙ্কার ছেড়েছেন, মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করব। টুঙ্কু আবদুল রহমানও স্বীকার করেছেন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মীমাংসার কোন আশা নেই। থাইল্যাণ্ডকে তিনি গেরিলাবাহিনী অপসারণ তদারকের কাজ বন্ধ করতে অনুরোধ করেছেন। ম্যাকাপাগাল অবশ্য এখনও আশা ছাড়েন নি. তবু ভবিষ্যতে কি ভাবে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা হবে, এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কিছু বলতে পারেন নি।

ইন্দোনেশিয়ার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য মালয়েশিয়া নয়, তার আক্রমণের প্রকৃত লক্ষ্য বৃটেন। সোয়েকার্নো মালয়েশিয়া গঠনকে বরাবর বৃটেনের একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিহিত করে এসেছেন। মালয়েশিয়াকে ঘাঁটি করে বৃটেন ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে, এবং সামগ্রিক ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যাবে। ইন্দোনেশিয়া কখনও তা সহ্য করবে না। তাছাড়া সারাওয়াক ও সাবার (কালিমান্তান) মালয়েশিয়াভুক্তিও ইন্দোনেশিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং মালয়েশিয়ার বিলুপ্তিই তার কাম্য। ইন্দোনেশিয়া থেকে সশস্ত্র গেরিলা দল ইতিমধ্যেই মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভেতর থেকে নাশকতা-মূলক কাজ চালাবার চেষ্টাও হচ্ছে। সম্প্রতি একটি বিরাট ট্রেন দুর্ঘটনার ব্যাপারের পেছনে ইন্দোনেশিয়ার

গুপ্তচরদের হাত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে, ইন্দো-নেশিয়ার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী, অন্তত পক্ষে 'স্বেচ্ছাসেবক' সৈন্যদল মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও অবতীর্ণ হবে। সোয়েকার্নো অত্যন্ত খোলাখুলি এ কথা ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী আনাস্তাস মিকোয়ান ইন্দোনেশিয়া সফর করছেন। মিকোয়ান সোয়েকার্নোর মালয়েশিয়া নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে সৃষ্ট মালয়েশিয়ার সংকট অবসানের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনগণের সংগ্রামকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমর্থন করবে বলে মিকোয়ান ঘোষণা করেছেন।

টুঙ্কু আবদুল রহমান মালয়েশিয়ার এই বিপদে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যদি কমনওয়েলথ ও অন্যান্য 'স্বাধীন' রাষ্ট্র এখনই এগিয়ে না আসে, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর একটি 'ভিয়েৎ-নামে'র সৃষ্টি হবে। লণ্ডনে আসন্ন কমনওয়েলথ সম্মেলনে টুঙ্কু আবদুল রহমান নিশ্চয়ই বিষয়টি উত্থাপন করবেন। বৃটেন অবশ্য সর্বশক্তি দিয়ে মালয়েশিয়াকে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছে, এবং সামরিক সাহায্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

মালয়েশিয়া সংকটকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর বিপরীতমুখীন আচরণ লক্ষ্য করার মত। বৃটেন মালয়েশিয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা নিস্পৃহ। বরং কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি ইন্দোনেশিয়ায় এসে সোয়েকার্নোর নীতির প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনও জানিয়ে গিয়েছিলেন। আবার অপর দিকে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সোয়েকার্নোকে পূর্ণ সমর্থন করছে, অথচ বৃটেনের নতুন বন্ধু চীন এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন করতে খুব একটা এগিয়ে আসছে না। চীন কিন্তু আবার ইন্দোনেশিয়ারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাওস, ভিয়েৎনাম নিয়ে ব্যস্ত—বৃটেন সেখানে প্রায় নীরব দর্শক। বৃটেন মালয়েশিয়ার ব্যাপারে বিপন্ন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে এড়িয়ে চলছে। খেলা জমেছে বেশ। তবে মালয়েশিয়াকে উপলক্ষ্য করে একটা বড় রকমের যুদ্ধ না বাধলেই বাঁচা যায়।

লাওস :

কমিউনিস্টপন্থী প্যাথেট লাও বাহিনীর অগ্রগতিতে বিচলিত মার্কিন

* সুভান্না ফুমা

যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ চীন সাগরে পাড়ি করা সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজ 'কিটি হক' থেকে লাওসের ওপরে পর্যবেক্ষক বিমান পাঠানো সুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফুমা ও তাঁর সরকারের সম্মতি ছিল এ ব্যাপারে। কিন্তু গোলমাল বাধল সশস্ত্র মার্কিন বিমান পাঠানো নিয়ে। প্রথম দিকে নিরস্ত্র মার্কিন বিমানই চলাচল করছিল। জার্স প্রান্তর ও অন্যত্র নীচু দিয়ে যাবার সময় বিমান থেকে ফটো তোলা হচ্ছিল এবং প্যাথেট লাও বাহিনীর ঘাঁটি ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা হচ্ছিল। কিন্তু প্যাথেট লাও বাহিনী বিমান-বিধ্বংসী কামানের সাহায্যে দুটি মার্কিন পর্যবেক্ষক বিমানকে ধরাশায়ী করে, এবং এদের পাইলট চার্লস কুসাম্যান ও ডয়েল লিনকে আটক করে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বিমান পাঠানো সুরু করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রিন্স সুভান্না ফুমা মার্কিন বিমান চলাচল বন্ধের দাবী জানান। তিনি বলেন, সশস্ত্র বিমান চালানোর কথা ছিল না। পরে অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিওনার্ড আঙ্গারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর প্রিন্স সুভান্না ফুমা আবার সশস্ত্র মার্কিন বিমান চলার অনুমতি দিয়েছেন।

লাওসের আকাশে সশস্ত্র মার্কিন বিমান চালানোর বিরুদ্ধে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনাম তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রিন্স সুভান্না ফুমা কিন্তু এবার দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কিন বিমান চলার পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্যাথেট লাও বাহিনীর যে-সব ফটো সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে উত্তর ভিয়েৎ-নামের লোকেরা এতে অংশ গ্রহণ করছে। সুতরাং বাইরের লোকের

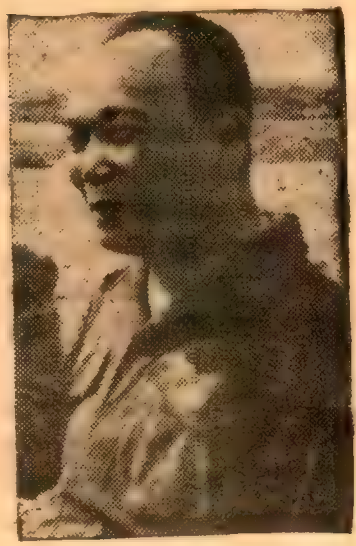

* সোপাভান

আক্রমণ থেকে লাওসকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন তিনি গ্রহণ করবেন।

দক্ষিণপন্থী মন্ত্রী নোসাভান ও নিরপেক্ষতাবাদী সেনানায়ক কং লী

* কং লী
(বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়)

অনেকদিন থেকেই মার্কিন বোমারু বিমান ও মার্কিন সৈন্যদলের সাহায্যের প্রস্তাব করে আসছেন। বর্তমানে মার্কিন সাহায্য নিয়ে প্যাথেট লাওকে পরাজিত করার প্রয়াস সুরু হয়েছে। ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই লাওসের ঘরোয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে।

অবশ্য মার্কিন সাহায্যে ইতিমধ্যেই লাওসে প্যাথেট লাও বাহিনী পিছু হটেছে। জার্স প্রান্তরের পশ্চিম দিকে ফো কুইট পাহাড় নিরপেক্ষতাবাদী সৈন্যদল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কং লী'র নিরপেক্ষাতাবাদী সৈন্যরা এখন প্রকাশ্যেই মার্কিন 'টি-২৮' বোমারু বিমান ব্যবহার করছে। লাওসের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে সহকারী পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম বাণ্ডি বলেছেন, "উত্তর ভিয়েৎনাম সৈন্য প্রেরণ বন্ধ না করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও লাওসে সৈন্য পাঠাতে সুরু করবে।" যেভাবেই হোক, প্যাথেট লাও-এর হাত থেকে অধিকৃত অঞ্চল উদ্ধার করা হবে।

কূটনৈতিক পর্যায়ে, প্যাথেট লাও লাওস সম্পর্কে ছয় রাষ্ট্রের সম্মেলন আহ্বানের জন্য পোল্যাণ্ডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে এই সম্মেলন হবার আশা এখন সুদূরপরাহত। প্রিন্স সুভান্না ফুমা প্রস্তাব করেছেন, লাওসের তিন পক্ষের প্রধানরা কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাজধানী যেমন, দিল্লী, রেঙ্গুন বা জুরিখে মিলিত হয়ে আপোষের চেষ্টা করুন। ভারত সরকার দিল্লীতে এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু প্যাথেট লাও নেতা সুভানো ভং-এর দাবী, লাওসের অভ্যান্তরে লুয়াং প্রবাং অথবা জিয়াং খান্সে এই সম্মেলন করতে হবে। লুয়াং প্রবাং-এ প্রিন্স সুভান্না ফুমা ও প্রিন্স সুভানো ভং-এর মিলিত হবার চেষ্টাও সফল হয় নি।

পোল্যাণ্ড প্রস্তাবিত ছয় রাষ্ট্র সম্মেলন বা সুভান্না ফুমা প্রস্তাবিত তিন পক্ষের সম্মেলন যদি না-ও হয়, জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মত ১৪ রাষ্ট্রের সম্মেলন অন্তত হতে পারে। যেভাবেই হোক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বৃটিশ গায়না :

বৃটিশ গায়নাকে উপলক্ষ্য করে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী রূপ আর একবার নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গণতন্ত্রের পূজারী বৃটেন যে উপনিবেশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও স্বীকার করে না, ইতিহাসে বারে বারে তা প্রমাণিত হয়েছে। বৃটিশ গায়নার ক্ষেত্রে আর একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

উনিশ সপ্তাহ ধরে বৃটিশ গায়নায় আখ শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে এখানকার পূর্ব ভারতীয় ও নিগ্রো সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তাক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। এ পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের ওপর এই দাঙ্গায় মারা গেছে। ইংরেজ শাসকরা প্রকাশ্যে এই দাঙ্গায় উস্কানি দিচ্ছে। সংখ্যালঘু নিগ্রোদের সর্বরকমে প্ররোচনা দিয়ে এবং ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে ইংরেজ প্রভুরা তাদের বিভেদনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রাখতে পারলে ইংরেজ শাসন অব্যাহত থাকবে এবং বৃটিশ গায়নার স্বাধীনতা অর্জনকে পিছিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু বৃটিশ গায়নার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ছেদী জগান ইংরেজ প্রভুদের এই বিভেদের খেলা খেলতে দিতে রাজি নন। তিনি নিগ্রোদের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য এগিয়ে এলেন। জগানের দল পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও নিগ্রোপ্রধান পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে তিনি কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেন। পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা ফরবেশ বার্নহামকে তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। পারস্পরিক বিবাদ সত্ত্বেও পিপলস

* ছেদী জগান

প্রোগ্রেসিভ পার্টি, পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ইউনাইটেড ফোর্স, বৃটিশ গায়নার এই তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যখন আপোষ আলোচনা বেশ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে

চলেছে, ক তখন ইংরেজ সরকার একে ব ্াল করার জন্য এগিয়ে এল। ্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জনগণের ঐক্য স্থাপিত হলেই যে তাদের ি পদ।

বৃটে ের কমনওয়েলথ ও উপনিবেশ ্চিব ডানকান স্যাণ্ডসের অনুমতি নিয়ে গভর্নর স্যার রিচার্ড লুইট জরুরী ক্ষমতা বলে বৃটিশ

• রিচার্ড লুইট

গায়নার শান্তি ও শৃঙখলার পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং ঘোষণা করেন, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ছেদী জগান বা তার মন্ত্রীদের কোন হাত থাকবে না। গ্যারিসন কম্যাণ্ডার কর্নেল রবিন কিং ও পুলিশ কমিশনার পিটার আওয়েনের সাহায্যে নিগ্রোপ্রধান পুলিশ ও ইংরেজ সৈন্যদল নিয়ে রিচার্ড লুইট ভারতীয়দের শায়েস্তা করার কাজে নেমে পড়েছেন। প্রায় ১২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে বৃটিশ গায়নার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ব্রিণ্ডলে বেনও আছেন। গভর্নর রিচার্ড লুইট ভেবেছিলেন, এত কাণ্ডের পর ছেদী জগানের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকা সম্ভব হবে না—তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু ছেদী জগান এই চক্রান্ত বুঝতে পেরে ঘোষণা করেছেন, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও দেশের জনসাধারণের সমর্থন তাঁর সরকারের পক্ষে, সুতরাং তিনি পদত্যাগ করবেন না। ইংরেজ শাসক তাঁকে পদচ্যুত করুন, এই তিনি দেখতে চান। ইতিমধ্যে রিচার্ড লুইট লণ্ডনে গিয়েছেন আলেক ডগলাস হিউম ও ডানকান স্যাণ্ডসের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্য। জোর গুজব, বৃটিশ গায়নার বর্তমান সংবিধান বাতিল করা হবে, এবং ছেদী জগানের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে।

বৃটিশ গায়নায় ইংরেজ শাসকদের আচরণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙেঘ তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙেঘর বিশেষ কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, অবিলম্বে বৃটেনকে বৃটিশ গায়নার স্বাধীনতা লাভের তারিখ ঘোষণা করতে হবে। আরও প্রস্তাব করা হয়েছে, বৃটিশ গায়নার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি শুভেচ্ছা মিশন বৃটিশ গায়নায় প্রেরণ করা হবে। বিশেষ কমিটিতে বৃটেনের প্রতিনিধি সিসিল কিং এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এ ব্যাপারে বৃটেনকে সমর্থন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া। শেষ পর্যন্ত ১৮-৩ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সিংহল :

শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে সিংহলের কোয়ালিশন সরকার বেশ ভালভাবেই কাজ সুরু করেছেন। সলোমন বন্দরনায়কের প্রতিষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি ও ট্রটস্কিপন্থী লঙ্কা সমসমাজ পার্টি দশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্ত সরকার গঠন করেছে, সিংহলে পুঁজিবাদের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করার জন্য।

কিছুদিন থেকেই শ্রীমতী বন্দরনায়ক ও তাঁর দলের আরও কয়েকজন নেতা বলে আসছেন, সিংহলের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করে সমাজতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ করা এককভাবে তাঁদের দলের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য সকল প্রগতিশীল ও বামপন্থী দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চাই। দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে শ্রীমতী বন্দরনায়ক সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত তিনটি দল লঙ্কা সমসমাজ পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি ও মহাজন একসাথ পেরুমেনার সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত লঙ্কা সমসমাজ পার্টির সঙ্গেই একত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। অবশ্য এ দলের মধ্যেও একাংশ এই

• এন এম প্যারেরা

কোয়ালিশনের তীব্র বিরোধিতা করেছে—তাদের মতে, এর দ্বারা সিংহলে ট্রটস্কিবাদের অবসান হল, বিপ্লবের আদর্শ ত্যাগ করে দল সংস্কারবাদের পথে পা বাড়াল। যাই হোক, ডঃ এন এম প্যারেরার নেতৃত্বে

নেতা সমসমাজ পার্টির তিনজন নেতা কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়েছেন। ডঃ প্যারেরা কোয়ালিশন সরকারে অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছেন। অর্থমন্ত্রীরূপে তাঁর প্রথম কাজ হল, তিনি সরকারের সকল দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন, পরবর্তী বৎসরের বাজেট বরাদ্দ স্থির করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। অর্থমন্ত্রীরূপে ডঃ প্যারেরার এই অভূতপূর্ব আচরণে সিংহলের শ্রমজীবী জনসাধারণ ও সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

সাইপ্রাস ঃ

সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তদারকী বাহিনী আরও তিন মাস থাকবে স্থির হয়েছে। আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বাহিনীর মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন করে নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট তাঁর ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর সাফল্যের কথা বলেছেন, ও বর্তমানে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইউ থাণ্ট বলেছেন, সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কী অধিবাসীদের মধ্যে স্থায়ী কোন রাজনৈতিক সমাধান না হলে যে কোন মুহূর্তে আবার বড় রকমের সঙ্ঘর্ষ সুরু হতে পারে। অথচ রাজনৈতিক মীমাংসার কোন আশাই দেখা যাচ্ছে না।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন নিজে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বে তুরস্ক সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করার চেষ্টা করলে, জনসনের অনুরোধে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনু এই অভিযান বন্ধ রাখেন। ইনোনু জনসনের অনুরোধে ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন এই সপ্তাহে, জনসনের সঙ্গে সাইপ্রাস সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এদিকে গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জর্জ পপিনদ্রিউ-ও জনসনের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন রওনা হচ্ছেন। জনসন আশা করছেন, ইসমেট ইনোনু ও জর্জ পপিনদ্রিউ-এর সঙ্গে আলোচনা করে সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি মীমাংসা সূত্র তিনি বের করতে সক্ষম হবেন।

সাইপ্রাসের প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী নেতা 'ইয়োকা' (EOKA) সংস্থার প্রধান জেনারেল জর্জ গ্রিভাস গ্রীস থেকে সাইপ্রাসে এসে পৌঁচেছেন। গ্রিভাস গ্রীক সাইপ্রাসবাসীদের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, ইংরেজরা এতদিন গ্রিভাসের সাইপ্রাস প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করলেও বর্তমানে তারা গ্রিভাসকে সমর্থন করছে। তাদের ধারণা, গ্রিভাস শক্ত মানুষ, তাঁর সাহায্যে প্রকৃত কোন সমাধানের পথ আবিষ্কার করা যাবে।

* পপিনদ্রিউ ও ইনোনু

কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের এক সংবাদে জানা গিয়েছিল, ইংরেজ সরকার সাইপ্রাস বিভাগের প্রস্তাব বিবেচনা করছে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, ইংরেজরা সাইপ্রাস বিভাগের পরিবর্তে গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসভুক্তি অর্থাৎ 'এনোসিস' (enosis) প্রস্তাব সমর্থন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নাকি 'এনোসিসের' পক্ষপাতী। গ্রীস এবং সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীকরা সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজি হবে—বস্তুত দীর্ঘকাল ধরে তারা এই দাবী জানিয়ে আসছে। গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের অন্তর্ভুক্তির এই প্রস্তাবে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুরস্কের। তুরস্ককে সন্তুষ্ট করার জন্য গ্রীস অন্য কোন অঞ্চল তুরস্ককে দান করবে—ইঙ্গ-মার্কিন মীমাংসা প্রস্তাবে নাকি এ কথাও বলা হয়েছে।

বৃটেন ঃ

আগামী ৮ই থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নবপর্যায়ে কমনওয়েলথ গঠনের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু থাকবেন না। নেহরুর অনুপস্থিতি সম্মেলনে বিশেষভাবে অনুভূত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীরা সাগ্রহে চেয়ে আছেন, ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। নেহরুর পর ভারতের নীতির কোন পরিবর্তন হবে কিনা, লালবাহাদুরের সঙ্গে আলোচনা করে বৃটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতারা তা বোঝার চেষ্টা করবেন।

এবার নতুন যাঁরা প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : সিয়েরা লিয়েনের প্রধানমন্ত্রী আলবার্ট মারগাই (আলবার্ট তাঁর পরলোকগত ভ্রাতা মিলটন মারগাই-এর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন), উগাণ্ডার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মিলটন ওবোটে, কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াটা। এ ছাড়া নিয়াসাল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডঃ হেস্টিংস বাণ্ডা এবং ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার যুক্ত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডঃ জুলিয়াস নিয়েরেরও সম্মেলনে যোগ দেবেন—আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের রাষ্ট্রকে কমনওয়েলথে গ্রহণ করার পর।

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ এগারো ॥

এমন নির্বোধও মানুষে হয়!

কেন সে নদীর ধারে গিয়ে অমন করে বসেছিল অত রাত পর্যন্ত? শর্মিলা আসবেন নির্জনে তার সঙ্গে গল্প করবার জন্যে? এবং, অবসর বুঝে এক সময় কিরণ তাঁর একখানা হাত মুঠোর ভেতরে টেনে নিয়ে বলবে, 'আমি এই প্রকৃতির কেউ নই, কেউ হতে চাই নি—তবু এই কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী কখন আমাকে তার স্বপ্নের মধ্যে ডেকে নিয়েছে। সেই স্বপ্নের ওপর এখানকার এই নীল উজ্জ্বল আকাশের মতো জড়িয়ে রয়েছে তোমার শান্ত বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি, আমি তোমাকে কখনো ভুলব না?'

আর শর্মিলা বলবেন—

কল্পনায় নিজের চেহারাটা দেখল কিরণ। গদ-গদ বিগলিত মুখের ভাব, কাঁপন-লাগা গলার স্বর, চোখ দুটো ঘোলাটে—একটা নির্ভেজাল নিখুঁত ইডিয়টের চেহারা। শেক্সপীয়রের কী একটা নাটক থেকে ম্যালভোলিয়ো বলে একটা চরিত্রের কথা মনে এল, হলদে মোজা আর ক্রসড গার্টার পরে প্রচুর পরিমাণ হাসির উপকরণ জুগিয়েছিল লোকটা। আপাতত নিজের সঙ্গে কিরণ তার কোনো পার্থক্য দেখতে পেলো না।

শর্মিলা কী বলতে চেয়েছিলেন?

কী বলতে চেয়েছিলেন তিনিই জানেন। কিন্তু পাহাড়ী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় আর সূর্য ডুবে গিয়ে ধীরে ধীরে তারা জেগে ওঠা দিন-রাত্রির সেই মিথুন-লগ্নে তার পাশাপাশি বসে পঞ্চাশ বছর আগেকার উপন্যাসের একটি অধ্যায় তিনি তৈরি করবেন, এ-কথা কেমন করে সে ভাবতে পারল? বেশ হয়েছে, নিজের ভেতরকার নির্বোধ-টাকে আর একবার পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। বুদ্ধির অহঙ্কার করি, মোহকে ব্যঙ্গ করি, আবেগকে অস্বীকার করি—অথচ দেখা গেল, সমস্তটাই কত ঠুনকো! একটুখানি হাওয়ার ভর সইল না, আড়াল সরে এল, বেরিয়ে এল পুচ্ছধারী সেই চিরন্তন গর্দভের মূর্তি।

কী ভাবছেন তাকে বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা শর্মিলা? এত তরল একজন লেখকের মন? মেয়েদের সম্পর্কে লোভের অন্ত নেই, একটু প্রশ্রয় পেতে-না পেতেই তার আর মাত্রা থাকে না? কিংবা লেখক জাতটাই এ-রকম, তাদের বিশ্বাস করা যায় না?

কিরণ ভুলতে চেষ্টা করল গ্লানিটা। সারাদিন বেরুল না ঘর থেকে। এমন কি বারান্দাতেও নয়। রাজেনবাবুর কাছ থেকে আসবার সময় যে বইটা এনেছিল, সেইটে পড়তে চেষ্টা করল প্রাণপণে। অনেকগুলো পাতা পড়া হল, কিন্তু একটা লাইনের অর্থও ভালো করে মনের কাছে ধরা পড়ল না। সব চিন্তাগুলোই তার এলোমেলো হয়ে গেছে।

শম্ভু এসে জানতে চাইল: কী হল বাবু, বেরোবেন না বেড়াতে?

—না, আজ থাক।

—শরীর খারাপ হয় নি তো?

—না বেশ আছি।

—বসে থাকবার জন্যে কি কেউ চেঞ্জে আসে বাবু?—শঙ্কু গম্ভীর হল: চারদিকে ঘুরবেন, বেড়াবেন, অনেক করে হাওয়া খাবেন, তবে না? সকাল-বিকেলে যত বেড়াবেন, ততই—

এত দুঃখেও কিরণের হাসি এল। বললে, কাল বিকেলে বেরিয়ে একটা পা একটু মচকে গেছে। তাই রেস্ট নিচ্ছি একটুখানি।

—মচকে গেছে? কোন পা? চুণ-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।

এতো আচ্ছা জ্বালা হল।

কিরণ বিব্রত হয়ে বললে, ব্যথা আজকে অনেকটা কম। তা ছাড়া চুণ-হলুদও আমার সয় না। ফোসকা পড়ে যায়।

শঙ্কু হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, তা হলে কী করব বাবু?

কিরণ হেসে ফেলল। বললে, কিছুই করতে হবে না—শুধু এক পেয়ালা চা এনে দে।

দিনটা অদ্ভুতভাবে কাটল। অস্বস্তি, লজ্জা, থেকে থেকে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করা; তবু তার ভেতরে—সমস্ত লজ্জা আর আত্মধিক্কার ছাপিয়ে একটা অস্পষ্ট আশার রেশ বাজতে থাকে—হয়তো আসতেও পারেন শর্মিলা। কাল কোনো কারণে বেরোতে পারেন নি, শরীর খারাপ হওয়াও অসম্ভব নয়—

তাই তো—এ কথাটা তো আগে মনে হয় নি! যদি সত্যিই শর্মিলা অসুস্থ হয়ে থাকেন?

সামনে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ বিকেলের রোদে স্নান করছে—ফুলগুলো জ্বলে উঠেছে ... উঠছে চুণীর মতো। এতদিন পরে কানে এল কোথায় যেন কোকিল ডাকছে। অনেক দূর থেকে শালের মঞ্জরীর গন্ধ এল হাওয়ায়।

যাবে একবার ডাক্তার রায়চৌধুরীর বাড়িতে?

কিন্তু শর্মিলা ইচ্ছে করেই যদি না এসে থাকেন? যদি আগের অনুমানটাই সত্যি হয়? ডাক্তারের ওখান থেকেও দিন-দুই হল কেউ আসে নি। উচিত হবে যাওয়াটা? তার চাইতে—

তার চাইতে আজো আর একবার নদীর ধারে ঘুরে এলে কেমন হয়?

বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল।

এমন তো হতে পারে, কাল আসা সম্ভব হয় নি, আজ নিশ্চয় আসবেন শর্মিলা? প্রতীক্ষা করবেন তার জন্যে? পাগল। তাও কি হয়?

কেন হয় না? জীবনে বিস্ময়ের কোথাও শেষ নেই। প্রকৃতি মানুষকে নতুন ক'রে তোলে। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় অভ্যাস থেকে, বিশ্বাস থেকে, সংস্কার থেকে। হতে পারেন শর্মিলা বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা, ডুবে থাকতে পারেন তাঁর বিষণ্ণ-বৈধব্যের বৈরাগ্যে, কিন্তু এই পাহাড়, এই হাওয়া, বাতাসে এই শালফুলের গন্ধ যদি কিরণের মনে নেশা ধরাতে পারে, শর্মিলাই কি নিজের মগ্নতার গভীরে ডুবে থাকবেন?

প্রথমে একটা খেয়ালী ভাবনার মতো এসেছিল, তারপর একটা অবিশ্বাস্য বিশ্বাসের মতো ধীরে ধীরে কিরণের স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। রক্তে রক্তে বিদ্যুৎ জ্বলতে লাগল। শেষে মনে হল, আজ শর্মিলা আসবেন, সেই ক্যাকটাসগুলোর পাশে অপেক্ষা করবেন তার জন্যে, তারপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলে ধীরে ধীরে ফিরে যাবেন।

ফিরে যাওয়াই ভালো। কাল কিরণের অপেক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আজ শর্মিলার পালা।

কিন্তু তাই কি? পরক্ষণেই মনে হল, নদীর ধারে, মাদলের শব্দে, শর্মিলার রোদে রাঙানো মুখে—সব মিলে যে একটা সোনালি বস্তু সম্পূর্ণ হয়ে উঠছিল—আজই তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। চিরদিনের মতো।

শর্মিলা আসবেন না। কিন্তু শর্মিলা যদি আসেন?

কিরণ আর বসতে পারল না। বিকেল একটু একটু করে পা ফেলছে সন্ধ্যার দিকে, এক-একটি মুহূর্ত যেন স্খলিত হয়ে পড়ছে তার হাত থেকে। আর দেরি করা চলবে না।

শঙ্কু চা এনেছিল। আশ্চর্য হয়ে গেল।

—সে কি বাবু, বেরুচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু।

—বলছিলেন পা মচকে গেছে আপনার?

—এখন ভালো হয়ে গেছে।

—ভালো হয়ে গেল?—শঙ্কু কিরণের মুখের দিকে চেয়ে রইল: এর মধ্যেই?

কিরণ বিব্রত হয়ে বললে, তাই দেখছি। এখানকার জল-হাওয়াই ওগুই আলাদা।

—ওঃ!—শঙ্কু তেমনি চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে রইল। এখানকার জল-বাতাস ভালো তা সে জানে, অনেক চেঞ্জার বাবুরও যাওয়া-আসা আছে, কিন্তু সে জলে-হাওয়ার যে এমন ম্যাজিক ঘটতে পারে, এর আগে সেইটেই তার জানা ছিল না।

তিন চুমুকে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করল কিরণ। রোদ পড়ে আসছে—সরে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে দামী দুর্লভ সময়। সন্ধ্যার ছায়া নামলে ফাঁকা নদীর ধারে একা কিছুতেই বসে থাকবেন না শর্মিলা। কিরণ জুতোটা পরে নিয়ে বেরিয়ে এল—এগিয়ে চলল নদীর দিকে। শঙ্কু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, পা মচকানোর কোনো লক্ষণ কোথাও সে দেখতে পেলো না।

কিরণ ফিরে এল রাত আটটার পর। তখন সামনের আকাশে চাঁদ উঠতে সুরু করেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। সেই আলোয় দূরের পাহাড়টাকে কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দেখালো, আদিগন্ত মাঠটাকে মনে হল মাটির ছোট ছোট ঢিবির করোটি-ছড়ানো

একটা শ্মশান, সামনে কৃষ্ণচূড়ার বীথি আলোয়-ছায়ায় একদল ডাকিনীর মত জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল।

মুখটায় যেন জ্বরের বিস্বাদ, গলা শুকিয়ে পাথরের মতো হয়ে গেছে। পা-দুটো ক্লান্ত আর আড়ষ্ট—যেন যোজন যোজন পথ সে পার হয়ে এসেছে। জামা ছাড়ল না, কাপড় বদলালো না, বাইরের চেয়ারটায় এসে ঝুপ করে বসে পড়ল। লনের ঘাসে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল, কিরণের মনে হল, এমন একটানা ক্লান্তিকর শব্দ জীবনে সে কখনো শোনে নি।

'Nature, the brutal power, which remains hidden and rules the ruin of all'—কে লিখেছিলেন? খুব বিখ্যাত একজন ইতালীয়ান কবি—লেওপার্দি? তাই হবে। কিন্তু এমন আশ্চর্য খাঁটি কথা আর কেউ লেখে নি।

নইলে কিরণ বসুরও এমন অপঘাত ঘটে? অকারণে ভূতে-পাওয়ার মতো একা একটা নদীর ধারে বসে এতক্ষণ ধরে প্যাঁচার ডাক শোনে?

বোকামির জের অনেক দূর পর্যন্ত চলল—আর নয়। এই শেষ।

পালাব এখান থেকে? কালই? কেন পালাব? প্রকৃতির ভয়ে? না—চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। ঠিক একমাস থাকব এখানে। নিশ্চিন্ত অবকাশে সুরু করব একটা নতুন উপন্যাস—যে উপন্যাস জীবনের যন্ত্রণায় জর্জর, মহাকালের জটার মতো জটিল। প্রকৃতির কাছে সেই আমার জবাব।

আমি মুক্তি পেয়েছি।

মুক্তি? কিরণ দাঁতে দাঁতে শক্ত করে চেপে ধরল একবার।

আর, আবার সেই শম্ভু!

—বাবু, খাবেন না?

হঠাৎ একটা হিংস্র বিদ্বেষ বয়ে গেল মাথার ভেতরে, ইচ্ছে করল প্রাণপণে একটা চড় কষিয়ে দেয় লোকটাকে, চিৎকার করে বলে, 'খাব না, আমি খাব না, আমার এক বিন্দুও খিদে নেই।' কিন্তু এতখানি বোকামির পরে এই রকম একটা সস্তা নাটক তৈরি করা? ছি—ছি!

—তুই খাওয়ার ব্যবস্থা কর, আমি আসছি।

বেড়াতে হয় এখানে, নইলে শরীর ভালো থাকে না।

আমিও বেড়াব, খিদে জোগাড় করব—তাজা হয়ে কলকাতায় ফিরে যাব। আমি তো এখানে সঙ্গী চাই নি, বন্ধু চাই নি, কাউকেই চাই নি। আমি শুধু অবকাশ চেয়েছিলুম—নিঃসঙ্গতার নীরন্ধ্র অবকাশ। তাই হোক। সন্ধ্যের একটু পরেই চারদিক যখন কলকাতার মধ্যরাতের মতো ঘুমিয়ে পড়বে—তখন যা খুশি লিখব। আমার ডায়েরী, সময় কাটানো বড়ো বড়ো চিঠি, একটা নতুন উপন্যাসের কয়েক পাতা (ইচ্ছে হলে না-ও লিখতে পারি, এখানে আমি লেখার চাকরি করতে আসি নি) —কিংবা কিছুই লিখব না, আমি লিখব না, জোর করে কেউ আমায় লেখাতে পারে না।

অতএব পরদিন কিরণ বেড়াতে বেরুল।

ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়ার বীথির দিকে নয়, নদীর দিকে নয়, স্টেশনের পথেও নয়। মাঠের ভেতর দিয়ে যে আঁকাবাঁকা পথটা এগিয়ে গেছে, যার শেষে গ্রাম দেখা যায়—যে পথ দিয়ে মাঝি-মেঝেনরা আসা-যাওয়া করে, যেখান দিয়ে হাটের দিনে বোঝাই নিয়ে মোষের গাড়ি আসে। চলতে চলতে কিরণ সাঁওতালী গ্রাম দেখল, দেখল দাওয়ায় বসে বুড়ো সাঁওতাল ডালা বুনছে, চিঁড়ে কুটছে সাঁওতাল মেয়ে; নিকোনো ছবির মতো দাওয়ায় জোয়ান কুকুরগুলো ঝিমুচ্ছে, কাঁড়-বাঁশ হাতে নিয়ে অল্পবয়েসী ছেলেরা পাখি-খরগোসের সন্ধানে বেরিয়েছে।

দারিদ্র্যের চেহারা, অভাবের রূপ চারদিকে। কিরণ জানে, 'দিকু'—অর্থাৎ ভদ্রলোকেরা এদের অনেক দুঃখের কারণ। তবু অনেকখানি বাড়তি প্রাণ আছে এদের, এর মধ্যেই খুশি হয়ে বেঁচে থাকতে জানে। পুরুষানুক্রমে সেই একই ধরণের একঘেয়ে নাচ-গানের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না, তবু ওইটুকুর ভেতরেই, অনেকখানি জীবনের রস ওরা খুঁজে পায়।

করুণাও হয়—ঈর্ষাও হয়। তিক্ত বিরক্ত কবি-লেখকেরা এই জন্যেই আদিম-বর্বর জীবনের স্বপ্ন দেখে।

বেড়িয়ে যখন ফিরল, তখন বেলা এগারোটা। অনেক ঘোরা হয়েছে, ক্লান্ত লাগছিল, শরীরটাও জ্বালা করছিল। কাল রাতে একেবারে ঘুম হয় নি—আজ ভালো করে চান করতে হবে, তারপর খাওয়া-দাওয়ার পরে একটি লম্বা দিবা-নিদ্রা।

মনটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, কিন্তু খবর নিয়ে এল শম্ভু।

—বাবু, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন।

কিরণ চমকে উঠল।

—কখন?

—আপনি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই। একটু বসে রইলেন, তারপর এই চিঠিটা রেখে গেছেন আপনার জন্যে।

ভাঁজ করা একটা ছোট চিরকুট। একবার দ্বিধা করে খুলে ফেলল কিরণ।

'কী মশাই একেবারে ভুলে গেলেন আমাদের? জানেন তো, আমি ডাক্তার মানুষ—হাজার কাজ,

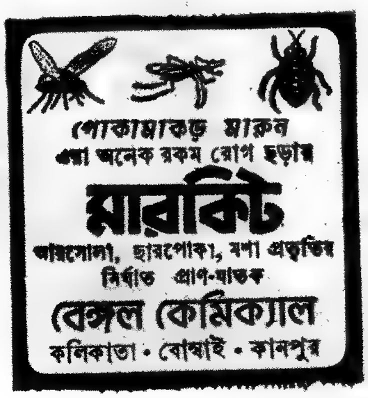

তার ওপর কতগুলো ওষুধপত্র কিনতে হাজারীবাগ যেতে হয়েছিল, এর মধ্যে আর খবর নেওয়া হয় নি। তাই বলে আপনিও আমাদের ত্যাগ করবেন?

আজ সন্ধ্যেয় গরীবের বাড়িতে লুচি খেতে হবে। না করলে চলবে না। গিন্নীর হুকুম। আমি এসে ধরে নিয়ে যাব সন্ধ্যেবেলায়। দয়া করে বাসায় থাকবেন—বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে বেড়াবেন না।'—সইটা করেছেন ইংরেজিতে: ইয়োর্স্ রায়চৌধুরী।

কিরণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শম্ভু বললে, ডাক্তারবাবু, রাতে ওখানে খাওয়ার কথা বলেছেন।

—জানি।

যে-মনটাকে কাল সারাটা রাত, আজকের সমস্ত সকাল ধরে সে গুছিয়ে এনেছিল, সব যেন আবার বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। তার মানে, আবার শর্মিলার সঙ্গে দেখা হবে। কি ভাবে শর্মিলা তাকাবেন তার দিকে, কী বলবেন তিনি? তারপর আবারও কিরণের নেশা ধরবে, আবার সুরু হবে অসুস্থ কল্পনার পালা, আবার—

কিরণ মনে মনে বললে, না, আমি যাব না। আমি কখনোই যাব না।

বিকেলের দিকে একটা ট্রেন আছে। তাতে করে কলকাতায় পালালে কেমন হয়?

কিন্তু কিছুই হল না। সারা দুপুর নিজের অনিশ্চয়তা নিয়ে সে বসে রইল, সামনে কৃষ্ণচূড়ার ফুল ঝরল, হাওয়ায় শালফুলের গন্ধ এল। আমি আর ভুল করব না। যাব না ও বাড়িতে।

তার মানে শর্মিলাকে ভাববার সুযোগ দেব, আমি যত ইমোশন্যাল, তত বেশি সেন্টিমেন্টাল? অসম্ভব। আমিও সহজ হবো। আমিও প্রমাণ করব, নদীর ধারের সেই সন্ধ্যাটি শর্মিলার পক্ষে যেমন একটি লঘু মুহূর্ত মাত্র, আমার কাছেও তার বেশি কিছুই নয়।

আমি যাব।

সন্ধ্যের আগেই গাড়ি নিয়ে এলেন রায়চৌধুরী। সঙ্গে বাসব।

—নিন, চলুন।

কিরণ সহজ হতেই চেষ্টা করল: এত তাড়াতাড়িই রাতের খাওয়াটা খাইয়ে দেবেন?

—তা কেন? আজ সন্ধ্যেটা একদম ফ্রী রেখেছি মশাই। গল্প করব, আড্ডা দেব, লেখার গান শোনাব। তা ছাড়া—

বাসব বললে, মা আরো বিশেষ করে বলেছেন, আজকে বাবার কবিতা—

—শাট্ আপ ইউ ব্র্যাট্!—ডাক্তার চোখ পাকিয়ে ছেলেকে একটা ধমক দিলেন: নিন মশাই, তৈরি হোন।

টেনেই বের করে আনলেন বলতে গেলে। গাড়িতে উঠে কিরণ জিজ্ঞেস করলে, আপনার কবিতার কথা কী বলছিল বাসু?

—কিছু না মশাই, কিছু না।—ডাক্তারের মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, এককালে চাঁদ-ফুলটুল নিয়ে কিছু পদ্য ফলাবার বাতিক ছিল মশাই। এখন সব ফার্মাকোপিয়া আর সার্জারির তলায় চাপা পড়েছে। দু' একটা পুরোনো খাতা বোধ হয় পড়ে আছে বাড়িতে।

—তা হলে তো শুনতেই হবে আপনার কবিতা।

—ও সব আপনার ভালো লাগবে না। ডাক্তারের আবার কবিতা। আমরা বরং এই রকম লিখতে পারি:

হে অদৃশ্য ভাইরাস, তব আনাগোনা,
স্লাইডে না দেখা যায়, কর্ণে কভু
নাহি যায় শোনা।
কখনো বা কোনো কোনো ছাপে
পাই তোমা বাগে
হে অজেয় ভাইরাস প্রভু,
মারিতে পারি নি তোমা তবু।

সগৌরবে চলিতেছে
এ.ভি.এম এর
পূজা কে ফুল
প্রত্যহ ২, ৫-৩০, ৮-৪৫
রক্সি - বসুশ্রী - বীণা - পূর্ণশ্রী
মৃণালিনী (২।।, ৫৫, ৯) আলোছায়া - অশোকা - কমল
চিত্রপুরী - পার্বতী - নবভারত - নিশাত - লক্ষ্মী - বিভা - রজনী
নারায়ণী - কুইন - অন্নপূর্ণা - স্বপ্না - শ্রীরামপুর টকীজ - আরতি
রে টকীজ - গোধূলী - বসন্ত - ক্যাপিটাল
আজ সকাল ১০টায় রক্সিতে অতিরিক্ত শো
AVM PRODUCTIONS

বলতে বলতে ডাক্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন।

কিরণ বললে, আপনি তো দস্তরমতো স্বভাবকবি দেখছি। মুখে মুখে মিলিয়ে ফেললেন।

—যাক, স্বীকার করলেন তা হলে। রস পেল না, নইলে মহাকাব্য গজিয়ে উঠত—অন্তত গিন্নী আর মিলার তাই ধারণা। বাই দি ওয়ে, আজ মিলাকে খুব মিস্ করব আমরা।

কিরণ চমকে উঠল আবার: কেন—কী হয়েছে?

—পরশু সকালে কলেজ থেকে কী জরুরী চিঠি এসেছিল। যদিও কলেজ বন্ধ, তবু মিলা বললে, প্রিন্সিপ্যাল লিখেছেন—ল্যাবরেটরীর কী কতগুলো ইমিডিয়েট পার্চেজ দরকার—আজই বেরুতে হবে। দুপুরের গাড়িতেই চলে গেল রাঁচীতে।

শর্মিলা কেন আসেন নি, তার উত্তর পাওয়া গেল। চুপ করে বসে রইল কিরণ। কোথা থেকে একটা অপমানের ভার তার নেমে গেছে, কিন্তু তার বদলে রেখে গেছে একমুঠো যন্ত্রণা। কোনোমতে একটা খবর পাঠানোও কি অসম্ভব ছিল? বাসবকে দিয়ে—যে-কোনো ছুতোয়?

সন্ধ্যা কাটল লেখার গানে, গল্পে, ডাক্তারের কবিতা শুনে। বাহবা দিতে হল, হাসতে হল, ডাক্তারকে বলতে হল: 'কেন কবিতা লেখা ছাড়লেন, ভারী অন্যায়।' কল্যাণী বললেন, 'আপনিই বলুন কিরণবাবু, আপনি তো লেখক।' কিন্তু সব ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল, মন নিজের বিষণ্ণ নির্জনতায় ডুবে রইল। তার ওপর প্রচুর খাদ্যের অনিচ্ছুক ভোজ—রাত দশটায় আবার ডাক্তারের মোটরে ফিরে আসা।

সমস্ত রাত শুধু একটি অভিমান গুঞ্জন করতে লাগল: একটা খবর পাঠানো কি কিছুতেই সম্ভব ছিল না? কোনোমতেই নয়?

দুটো চিঠি এল পরদিন।

একটা পোস্টকার্ড—দাদার লেখা।

'তুমি দুদিনের জন্যে চেঞ্জে গিয়াছ, বিরক্ত করা উচিত নয়। তবু যদি অবিলম্বে একবার বাড়ি আসিতে পার, বড়ো ভালো হয়। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।'

দ্বিতীয় চিঠি একটি সাদা খামে। ওপরে উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন অক্ষরে তার ঠিকানা।

'মাননীয়েষু,

আমি হঠাৎ চলে এসেছি। দেখা করব কথা দিয়েছিলুম, রাখতে পারি নি—ক্ষমা করবেন।

কলেজের কাজটা জরুরী ছিল না। তার চেয়ে জরুরী ছিল নিজের কাছ থেকে পালানো। আমি যে এত দুর্বল আগে তা ভাবতেও পারি নি।

আপনি লেখক। মানুষের মন নিয়ে আপনার কাজ। হয়তো আমাকে বুঝবেন।

জীবনে কখনো আর দেখা হবে কিনা জানি না। মহাকালের ঝর্ণায় আপনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন আমার জন্যে, সে কথা কোনোদিন ভুলব না। আসবার আগে আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ভারী ইচ্ছে করছিল—হল না, চিঠিতেই প্রণাম নিন। —শর্মিলা রায়চৌধুরী।'

(ক্রমশঃ)

৩রা জুলাই স্মরণীয় শুভমুক্তি!
আর্তের সেবায় উৎসর্গীকৃত মানুষের জীবন্ত চিত্রকাব্য---

মিনার ০ বিজলী ০ ছবিঘর
পদ্মশ্রী - সুচিত্রা - বীণা - নবরূপম - মায়াপুরী - পারিজাত
উদয়ন - গৌরী - বীণা - কল্যাণী ও অন্যত্র

সাহিত্য-সাধক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমাদের দেশের লোকেরা চিরদিনই দাতার যশোগানে ও কৃপণের নিন্দায় মুখর। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিন্তু কৃপণের তেমন নিন্দা নেই, যদিও দাতার প্রশংসা আছে। অনেক বহুশ্রুত পণ্ডিত বা শক্তিশালী লেখকও নিজেদের জ্ঞান ও শক্তির অনুপাতে দেশ বা জাতিকে অতি সামান্যই দান করেন, আবার অনেকে অকৃপণ দানে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে যান। এঁরাই ভূরিদাতা। সাহিত্য-সাধক যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন এইরূপ ভূরিদাতাদের মধ্যে অন্যতম।

যোগেন্দ্রনাথ আমাদের দেশে ঐতিহাসিক ও শিশু-সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্ভবত তাঁর রচিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (দুই খণ্ড) ও সম্পাদিত 'শিশুভারতী' (দশ খণ্ড) তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি। তথাপি বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন, সুতরাং আমরা বলতে পারি, তাঁর প্রতিভা ছিল নানা পথগামিনী।

উনবিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় বাঙালীদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়েও শুধু নিজের চেষ্টা ও সাধনার বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেন—ইংরেজিতে তাঁদেরকে বলে self-made man—যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন এইরূপ একজন self-made man। পূর্ববঙ্গের মনস্বী প্রবন্ধকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তও ছিলেন এইরূপ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ পুরুষ। তবে, যোগেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ঢাকা নগরীর জগন্নাথ কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ছাত্রসংসদে লব্ধকীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি উত্তম আবৃত্তি ও অভিনয় করতে পারতেন এবং বাগ্মীরূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সামাজিক ও মজলিশি-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সকল রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন। 'সাহিত্যের কমল বনে মত্ত হস্তীর প্রবেশ' তাঁর মতে ছিল নিষিদ্ধ।

শিক্ষাবিদেরা বলেন, যে সকল ছেলেমেয়ের উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি (surplus energy) থাকে, খেলাধূলায় তাদেরই আগ্রহ দেখা যায়। শিশু যোগেন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর। তিনি ছিলেন চঞ্চলপ্রকৃতি, কতকটা দুর্দান্তও বটে। বাল্যকাল থেকেই শারীর-চর্চার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। স্বদেশী যুগে, যখন যুবকদের 'ডন কুস্তীর' জন্য নানা আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন তরুণ যোগেন্দ্রনাথ দেহকে সুগঠিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই পরিণত বয়সেও তিনি ছিলেন 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ'।

● যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

যোগেন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। আমরা তাঁকে অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধা করতাম, তিনিও আমাদের অনুজের ন্যায় স্নেহ করতেন। মনে পড়ে একদিন কালীপ্রসন্ন ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঢাকার জগন্নাথ কলেজে একটি সভা হয়। যোগেন্দ্রবাবু ও আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার পৌরোহিত্য করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বর্গত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'কালীপ্রসন্নের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ববঙ্গবাসী তাদের দায়িত্ব পালন করে নি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ ব্যাপারে উদাসীন রয়েছে। প্রতি বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় যারা শীর্ষস্থান অধিকার করে, তাদের কালীপ্রসন্ন স্বর্ণপদক দিলে শোভন হ'ত।'

সেদিন সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যে সকলে প্রসন্ন হন নি। সভার শেষে যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁর বাসায় গেলাম। যোগেনবাবু ছাড়তে চান না, তাই তাঁর বাসায়ও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। বাংলা সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের দানের মূল্য ও পরিমাণ সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিল। সেদিন অকপটে যোগেনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার দানও নিতান্ত উপেক্ষণীয় হবে না।'

এই কথায় তাঁর আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছিলাম। যোগেনবাবু ছিলেন খাঁটি বাঙালী, বাংলা সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। গবেষক যোগেন্দ্রনাথ বাংলার

প্রাচীন সাময়িক পত্রগুলি সযত্নে সংগ্রহ করতেন। কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' ছিল এক কালে কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্র। 'কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র ও বাণী' নামে এই পত্রিকার কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন যোগেনবাবু প্রকাশ করেছিলেন। যোগেনবাবুর প্রতিভায় যে গৃহিণীপনা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বিশেষ সৌভাগ্য ছিল এই যে, সেকালের প্রায় প্রত্যেকটি বড় লোকের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশের মূলে ছিল তাঁর সহধর্মিণীর অনলস সেবা। অনেকদিন পূর্বে দেখেছি, তাঁর গুরুতর অসুখের সময় যোগেনবাবু কিছু বিচলিত হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন—"যদিও জানি 'পাই সুখ, পাই দুঃখ তোমারি সে দান' তথাপি মনে মানে না।" বৃদ্ধ বয়সে জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়ে তিনি তাঁর স্মৃতিকে সযত্নে মনের মধ্যে লালন করতেন, আর অনেক সময়ে আমাদের কাছে তাঁর কথা বলে সান্ত্বনা পেতেন। এই সময়ে পরলোকতত্ত্ব-আলোচনায়ও তাঁর গভীর আগ্রহ দেখেছি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মৃত প্রিয়জনের সঙ্গে জীবিতের আত্মিক সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় না।

আমি প্রায় দেড় বৎসর কাল ক্রিস্টফার রোডে যোগেনবাবুর প্রতিবেশী ছিলাম। এই সময়ে প্রায়ই তাঁর বাসায় গিয়ে সেকালের কথা শুনতাম, কখনও বা যোগেনবাবু তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। মাঝে মাঝে আমার আর এক দাদা (কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়) উপস্থিত থাকতেন।

সাময়িক পত্রের সম্পাদনায়ও যোগেন্দ্রবাবু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছোটদের জন্য 'কৈশোরক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করেন। পরে তিনি 'উদয়াচল' পত্রিকার সম্পাদন করেন।

'বিক্রমপুর' পত্রিকার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থাবলী সংখ্যায় অল্প নয়। নিম্নে তাঁর রচিত, সম্পাদিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হল।

চরিত-কথা

(১) সাধক রামপ্রসাদ (২) সাধক কমলাকান্ত (৩) মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ (৪) বঙ্গের মহিলা কবি (৫) ভারত-মহিলা (৬) মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্য-সাহিত্যের অবদান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা।)

এতদ্ব্যতীত সাধু নাগ মহাশয় সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ মাসিক 'উজ্জীবনে' প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতা সংকলন ও সম্পাদন

(৭) গোবিন্দ-চয়নিকা (স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের কবিতা-সংকলন।)

কিশোর উপন্যাস ও কিশোরদের জন্য জীবনী

(৭) ঝাঁসীর রাণী (৮) বিদ্রোহী বালক (৯) পথে বিপথে (১০) খেলার মাঠে (১১) রূপকথার দেশে (১২) যাদুপুরী (১৩) সুন্দরবনের চিঠি (১৪) বাংলার ডাকাত (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), (১৫) মহিম ডাকাত (১৬) অজানা দেশে (১৭) সাহারার বুকে (১৮) নীলনদের দেশে (১৯) যারা ছিল দিগ্বিজয়ী (২০) মরণ-বিজয়ী বীর (২১) সোভিয়েত দেশ (২২) আরব বেদুইন (২৩) হিমালয়-অভিযান (২৪) বালক কেশব (২৫) মুণ্ডমালার দেশে (২৬) গল্প-সঞ্চয়ন (২৭) অহল্যাবাঈ (২৮) বিদ্যাসাগর।

ইতিহাস

(২৯) বিক্রমপুরের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

সংকলিত পুস্তিকা

(৩০) কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র ও বাণী।

আলোচনা

(৩১) কেশবচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য (৩২) বঙ্গের প্রাচীন কবি (কিশোরদের জন্য।)

ভূতের গল্প ও পরলোকতত্ত্ব

(৩৩) অঘটন যা দেখেছি (৩৪) মরণের পরে (৩৫) ওপারের আলো (৩৬) এপার-ওপার (৩৭) জীবনে-মরণে (৩৮) মৃত্যুনদীর পারে।

উপন্যাস

(৩৯) মাধবী (৪০) জীবন-সঙ্গিনী (৪১) রূপের আগুন (৪২) শান্তিলতা।

নাটক

(৪৩) আনারকলি (৪৪) তসবী (৪৫) যাদুঘর (৪৬) চিড়িয়াখানা (৪৭) ইন্দ্রাণী (৪৮) সম্রাট অসুর বানি পাল।

ভ্রমণ-কাহিনী

(৪৯) বাংলায় ভ্রমণ (ই বি রেলওয়ে প্রকাশিত)।

এতদ্ব্যতীত তিনি 'গান্ধীজীর জীবন-যজ্ঞ' এবং 'সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও অষ্টম এডোয়ার্ড' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দশ খণ্ডে গ্রথিত 'শিশু-ভারতী' (children's Encyclopaedia) তাঁর অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। 'পৃথিবীর ইতিহাস' সিরিজের এই দশখানা বই তাঁকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর সম্পাদিত 'কপাল-কুণ্ডলা'ও বহু তথ্য সমৃদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ নানা সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা', মাসিক পত্র 'শান্তি' এবং পূর্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভায়' তাঁর যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য 'শান্তি' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। কলকাতার সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, অবিলম্বে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

যোগেন্দ্রবাবু শুধু বাংলা সাহিত্যেই অমর হয়ে থাকবেন না, শিশুদের মনেও তাঁর আসন চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। যে সব কচি ছেলেমেয়েরা তাঁর রচনা পাঠ করবে, তারা যদি একদিন বীর্য ও মনুষ্যত্বের প্রেরণা লাভ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তবেই যোগেনবাবুর অনলস সাহিত্য সাধনা সার্থকতায় মণ্ডিত হবে।

লণ্ডনে কারুশিল্প প্রদর্শনী

লণ্ডনে ঘর-গেরস্থালীর কাজে মেয়েদের পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায়। এ দেশে ঝি-চাকরের সুবিধা তো একেবারেই নেই।

খুব বেশি অবস্থাপন্ন যাঁরা তাঁরা হয়তো সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘরের কাজ করে দিয়ে যাবে বা প্রতিদিন দুই-এক ঘণ্টার জন্য ঘর-দোর মোছা, কাপ-প্লেট ডিস ধোয়া, ছোট শিশুকে বা কুকুরছানাকে (এ দেশে বাচ্ছা শিশু আর কুকুরছানা সমান আদর-যত্ন পেয়ে থাকে!) নিয়ে খেলা করা ইত্যাদি কাজ করে দেওয়ার জন্য 'মেড' রেখে থাকেন অথবা 'বেবী-সিটার' বা 'ডগ-প্লেয়ার' রেখে থাকেন।

সাধারণত প্রতি এক ঘণ্টার কাজ করে দেওয়ার জন্য মাশুল দিতে হয় চার থেকে ছয় শিলিং, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ইংরেজ পরিবারের লোকেরা তাই ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ সবটাই নিজের হাতে করে থাকেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই-এক ঘণ্টার জন্যও পয়সার বিনিময়ে কারো সাহায্য নেবার ধার তাঁরা ধারেন না। তার উপর প্রতিটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের ইংরেজ মেয়ে এদেশে চাকুরী করে, কোন মেয়ে বিবাহিতা হোক, অবিবাহিতা হোক, বিধবা হোক, চাকুরী সে করবেই করবে। চাকুরী করে না মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন ইংরেজ মেয়ে দেখাই যায় না।

কোন সদ্য-প্রসূতি বা অন্তর্বত্নী ইংরেজ মহিলার যদি চাকুরী করার বিশেষ অসুবিধা থাকে, তবে সে হয়তো পুরো সময়ের জন্য নয়, আংশিক সময়ের জন্যও চাকুরী করবে, তবু তার চাকুরী করা চাই। চাকুরী করাটা ইংরেজ মহিলার পক্ষে আবশ্যিক কেন? শুধুই কি অর্থনীতিক কারণে? কখনোই তা নয়। অত্যন্ত প্রবল ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ এই বৃটেন। এদেশে কি পুরুষ কি নারী প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নিজের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন। ইংরেজ মহিলারা বিশেষ করে চাকুরী করে থাকে যা'তে তাকে কখনো কোন অবস্থাতেই স্বামীর উপর নির্ভর করে না থাকতে হয়।

এর ভালো দিক খারাপ দিক দুই-ই আছে। খারাপ দিকের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য হ'ল এ দেশে অজস্র বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা। যখন তখন কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে দেয়।

লণ্ডনে ওল্ড বার্লিংটন ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর একাংশ

এইতো সেদিন খুবই সামান্য একটি কারণে স্ত্রী স্বামীকে ডাইভোর্স করে দিল।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই বাইরে কাজ করে। বাড়িতে ফেরার জন্য বাড়ির দরজার চাবি সেই দিন স্ত্রীর সঙ্গে ছিল না, স্বামী চাবি নিয়ে গিয়েছিল। স্বামীর সন্ধ্যা ছয়টায় ফেরার কথা, স্বামী বাড়ি ফিরলো রাত আটটায়। পুরো দুটি ঘণ্টা মহিলাকে চাবির প্রত্যাশায় বাড়ির বাইরে সেদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। স্বামী বাড়ি ফেরার

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরে মহিলা সেই রাত্রিতে রাগে গর গর। পরের দিনই মহিলা আদালতে গিয়ে উপস্থিত, মহিলার অভিযোগ—'আমার স্বামী আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত বেশি মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে ক্লিষ্ট করেছে'—

একমাত্র এই অভিযোগেই মহিলা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলো। এ দেশে এত বেশি সংখ্যায় বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে যার ফলে দেখা যায় কুড়ি-বাইশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণ একজন ইংরেজ মহিলা বা পুরুষ অন্তত বার দুই-তিন বিবাহবিচ্ছেদ করে আবার নতুন করে বিবাহ করে। ঘর-গেরস্থালীর যাবতীয় কাজ করে এবং অফিসের চাকুরী সামলেও এদেশের মেয়েরা যে পরিমাণ সময় ব্যয় করে অঙ্গসজ্জা, দেহের প্রসাধন এবং রূপচর্চায়, তা সত্যিই ভাবতেও পারা যায় না।

এইজন্য এরা অর্থও ব্যয় করে প্রচুর আর দিনের পর দিন প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জায় এদের রুচি আর ফ্যাসানের প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে। সাধারণ একজন ইংরেজ মেয়ে প্রতি পনের দিনে অন্তত একবার করে মাথার চুল ড্রেস করানো, বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে মাথার চুল ছাটানো, চুল রং করানো সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি সচেতন। নাইলন—ব্রাই-নাইলন—টেরিলিন সিল্কের নানা বিচিত্র ধরণের অঙ্গাবরণের প্রতি সপ্তাহের ষ্টাইল ও রুচি অনুযায়ী তাদের ব্যবহার এবং বর্জন এ দেশীয় মেয়েদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

তারপর ঠোঁট, গাল, চোখের পাতা, ভ্রূ রং করা, নানা ধরণের বিচিত্র সব প্রসাধনের জিনিস ব্যবহার, এদেশিনীদের প্রতি দিনের অবশ্য-কর্তব্যেরই সামিল। নিজের হাতে রান্না বান্না, ঘর পরিষ্কার করা, জামা-কাপড় কাচা, ডিস-কাপ-সসার-প্লেট-বোল ধোয়া-মোছা, বাজার করা ইত্যাদি করে এবং সারাদিন ধরে অফিসের কাজ করেও দেহের প্রসাধন অঙ্গসজ্জা আর রূপচর্চা ঠিক ঠিক ভাবে যথা নিয়মে করে যায় ইংরেজ মহিলা।

এ দেশের মেয়েদের প্রতি দিনের ব্যবহারের জিনিষগুলোকে আশ্রয় করে যেন সমস্ত দেশের রুচি, শিল্প-প্রয়াস ও ব্যবসায়ী বৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। মেয়েদের ঠোঁটে গালে ব্যবহার করার নানা প্রসাধন দ্রব্যের প্রদর্শনী, স্কার্ট, জ্যাকেট, স্কার্ফ, স্ল্যাকস্ ইত্যাদি নানাভাবে তৈরি করার ও বছরের বিভিন্ন সময়ে নানারকম রং মিলিয়ে ব্যবহার করার প্রদর্শনী এ দেশে প্রতি সপ্তাহেই হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিচিত্রতর পরিবেশের মধ্যে।

হাতের কাজের নানা জিনিষের প্রদর্শনীও এ দেশে প্রায়ই হয়ে থাকে। লণ্ডনের পুতুল-শিল্প অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি কারুশিল্প। এ দেশে কাগজের ফুল তৈরি, শক্ত কাঠ কুঁদে চেঁছে শিল্পবস্তুর নির্মাণ, টিন, প্লাষ্টিক, এ্যালোমিনিয়ম, পিতল ও কাঁচ দিয়ে নানা বিচিত্র ধরণের কারুশিল্প খুবই উচ্চাঙ্গের আর অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

এদেশের ঘর-গেরস্থালীর কাজে যে সব চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার একটি মনোরম প্রদর্শনী হয়ে গেল কিছুদিন আগে লণ্ডনের ওল্ড বার্লিংটন ষ্ট্রীটে। চশমা, হাতঘড়ি ও ফাউন্টেন পেন রাখবার ছোট চামড়ার খাপ, পয়সা রাখবার জন্য চামড়ার ব্যাগ, মেয়েদের ব্যবহারের জন্য চামড়ার হাণ্ডব্যাগ, চামড়ার পোর্টফোলিও ব্যাগ, চামড়ার এ্যাটাচীকেস, টাইপরাইটার, সেলাইকল, রেডিও সেট ইত্যাদির জন্য চামড়ার ঢাকনি—এমনি চর্মনির্মিত নানান ধরণের কারুশিল্পবস্তুর একটি প্রদর্শনী এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

মেয়েদের প্রসাধনের জন্য ক্রীম-পাউডার-লোশন জাতীয় নানা ধরণের অঙ্গরাগ, নানাবিধ পরিধেয়, ঘর-গেরস্থালীর আসবাব, কুশনকোশন, কাটলারী-ক্রকারী, এমন কি রুটি-কেক-বিস্কুটের পর্যন্ত প্রদর্শনী এদেশে বিস্তর পরিমাণে হয়ে থাকে। সকল দিক থেকে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত করে তোলার জন্য এদেশে এদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চর্মনির্মিত কারুশিল্পবস্তুর প্রদর্শনীও এদের এমনি সব প্রচেষ্টার একটি নিদর্শন। এই কারুশিল্প প্রদর্শনীটিতে চামড়া দিয়ে তৈরি মেয়েদের ব্যবহার্য যে সকল হাণ্ডব্যাগ, সৌখীন ব্যাগ, নানা জাতের বটুয়া দেখানো হয়েছিল তাদের বৈচিত্র্য অসাধারণ।

এদেশের মেয়েরা সারা দিনের মধ্যে কখন কি কি ধরণের হাণ্ডব্যাগ ব্যবহার করেন, অফিসে কাজ করতে যাওয়ার জন্য একধরণের হাণ্ডব্যাগ, বেড়ানোর জন্য, দেশ ভ্রমণের জন্য, সামাজিকভাবে মেলামেশার সময়ে, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হাণ্ডব্যাগ, এ দেশের মেয়েরা কখন কি অবস্থায় ব্যবহার করেন, এইসব বিভিন্ন প্রকার নমুনা এই প্রদর্শনীতে বিশেষ করে দেখানো হয়।

যে মেয়ে খবরের কাগজের রিপোর্টার বা ব্যবসা করে তাকে অনেক টুকরো কাগজ নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, তাই তার ব্যাগ স্বতন্ত্র ধরণের। ঐ ব্যাগের ভেতরে আছে আলাদা একটি খাপ শুধু টুকরো কাগজপত্র রাখবার জন্যে। ব্যাগের ভেতর খুচরো পয়সা রাখবার জন্য একটি আলাদা পকেট, যাতায়াতী টিকিট, দূর দূর জায়গায় যাওয়ার জন্য 'পাস' ও অন্যান্য অত্যন্ত দরকারী কাগজ রাখবার জন্য একটি আলাদা পকেট আর প্রসাধনের নানা জিনিষ রাখবার জন্যও অন্য পকেট রয়েছে। এ ছাড়া টাকার নোট, ব্যাঙ্কের পাস বই, চেক বই, বাড়ির ও গাড়ির চাবি, চশমা, গগলস্ ইত্যাদি রাখবার জন্যও সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ছোট ছোট খাপ রয়েছে। সমস্ত হ্যাণ্ডব্যাগটির ভেতরের অংশ বিচিত্র-ভাবে সাজানো, অথচ বাইরে থেকে দেখতে অত্যন্ত ছিমছাম আর সাদাসিধে।

তারপর বিকেলের চা পার্টিতে উত্তীর্ণ সন্ধ্যার ডিনারের নিমন্ত্রণে রাত্রি-রসালো ককটেল পার্টিতে মেয়েরা যে ধরণের হাণ্ডব্যাগ নিয়ে যান তার রং তার আকার তার কারুকার্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। এই প্রদর্শনীতে সেই ধরণের হাণ্ডব্যাগ অনেক দেখানো হয়। এ যুগের মানুষের মনে ভ্রমণের নেশা অনেক অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে। এখনকার কালে পুরুষদের মত মেয়েরাও কত কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। শুধুমাত্র মোটরে ট্রেনে জাহাজে নয়, আকাশপথে ভ্রমণও এখন কত সহজসাধ্য কত বেশি ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে দূরত্বের ব্যবধান চুকে গেলেও মালপত্র বহন করার সমস্যা কিন্তু এখনো মেটে নি। দূরে কোথাও যেতে হলে অনেক কিছুই সঙ্গে নিতে হয়। নানান্ দেশ-বিদেশে ভ্রমণকারিণী কোন মেয়ে কি ধরণের ব্যাগ ব্যবহার করবে তারও বিচিত্র নিদর্শন পেশ করা হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। অত্যন্ত হাল্কা, দেখতে খুবই সুদৃশ্য মাঝারি আকারের ব্যাগ, যাতে দূরদেশে ভ্রমণের উপযোগী যাবতীয় জিনিষ বয়ে নেওয়া যায়। এই জাতীয় ব্যাগ এত বেশি হাল্কা যে ছোট একটি শিশু পর্যন্ত এই ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ভ্রমণের সময় এই ব্যাগ বোঝার মত মনে হয় না। মনে হয় সঙ্গীর মত।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

শহর কলকাতা

জব চার্নক ও কলকাতা

জব চার্নক প্রথম যখন কলকাতা আসেন সেটা ছিল ১৬৮৬ সাল। বাংলাদেশে তাঁকে আগে আসতে হয়েছিল হুগলীতে। পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র। পর্তুগীজরা ইংরেজদের আগেই বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করে দিয়েছিল। হুগলী হয়ে উঠেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মস্ত কেন্দ্র। পর্তুগীজদের ব্যবসার টানে বাঙালী ব্যাপারী আর মহাজনেরা দলে দলে হুগলীতে চলে এসে বসবাস সুরু করে দিল। তার আগে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। সরস্বতী নদীর তীরে। সরস্বতী নদী শুকিয়ে আসতে থাকে ক্রমশ। জলপথে মালপত্র আদান-প্রদানের মস্ত অসুবিধে দেখা দিল। বাধ্য হয়ে পর্তুগীজরা ভাগীরথীর তীরে হুগলী শহরে নতুন করে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করলো।

সবাই কিন্তু হুগলীতে গিয়ে উঠলো না। কিছু তাঁতি আর কিছু মহাজন সপ্তগ্রাম থেকে হুগলী না গিয়ে গার্ডেনরীচের উত্তরদিকে এখনকার আদি গঙ্গায় আর হুগলী নদীর সংযোগস্থলে এসে থেমে গেল। এখানে তখন পর্তুগীজদের পণ্য বোঝাই জাহাজ এসে নঙ্গর করতো। গার্ডেনরীচ ছিল Halting Station। হুগলীতে আসা-যাওয়ার পথে এখানে একবার জাহাজ থামাবার দরকার হোত। জায়গাটা ছিল বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারী।

তাঁতিঘর ছিল বসাকেরা আর শেঠেরা ছিল মহাজন। কয়েক ঘর শেঠ সঙ্গে করে নিয়ে এল তাঁতিদের। তাঁতিরা বসাল তাঁত। আর শেঠেরা তাদের তৈরি করা কাপড় নিয়ে করতো ব্যবসা। ইতিহাসের ঠিক সেই দিনটি আমাদের হারিয়ে গেছে। এতবড় শহরের পত্তন যারা করলো তাদের আজ আর কোনো সন্মান-ই পাওয়া যায় না। পর্তুগীজদের নঙ্গর করার স্থান দেখে তারা বসতি স্থাপন করলো। বেচাকেনার সামান্য হাটেরও পত্তন হল। শেঠেদের ছিল গোবিন্দজীর মন্দির। সেই থেকে জায়গার নাম চালু হল গোবিন্দপুর। আর একটু উত্তরে পত্তনি হল হাটের। বসাকদের তৈরি সুতোর হাট। এই হাট থেকেই জায়গার নাম হয়েছিল সুতানুটী।

জলপথে হুগলী যাবার মুখে এখানে এসেই থামতে হল জব চার্নককে। হুগলী ছিল সারা বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। পর্তুগীজদের প্রধান কুঠি। পর্তুগীজদের পরেই ওলন্দাজেরা। তাদের কুঠি চুঁচুড়ায়। দেশের যত তাঁতি আর মহাজনদের বসতি হুগলী আর চুঁচুড়ায়। সবশেষে জব চার্নক নিয়ে এলেন ইংরেজদের। বাংলার সুবেদার শাহ সুজাকে বছরে তিন হাজার টাকা খাজনা দেবার চুক্তি হল। কিন্তু ইংরেজদের কুঠি হবে কোথায়? কোথায় চার্নক কোম্পানীর বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করবেন? বিশ্রাম নেবার কারণে সুতানুটীতে চার্নককে জাহাজ থামাতে হয়েছিল।

চার্নক দেখলেন এখানে আস্তে আস্তে মস্ত হাট গড়ে উঠছে। জায়গা হুগলীর কাছেও, আবার নদীর জলও গভীর। জাহাজ চলাচলের বেশ সুবিধে রয়েছে। ঠিক করলেন এখানে এসেই থামা যাক। পরে সুবিধে মতন জায়গা দেখে চলে যাওয়া যাবে। কেন না সুতানুটীর চারদিকে তখন জলা আর জঙ্গলে ভর্তি। আশে-পাশে হিংস্র জন্তুদের বসবাস। একদিকে যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি অস্বাস্থ্যকর। চার্নকের লক্ষ্য ছিল কোনো বাড়বাড়ন্ত জায়গায় গিয়ে স্থায়িভাবে পত্তনি করার। আসলে লোভ ছিল হুগলীর দিকে। পর্তুগীজদের বাণিজ্য তখন পড়তির মুখে। ইংরেজদের কোম্পানী দিনে দিনে বাণিজ্য বাড়িয়ে চলেছে। বাংলাদেশের তাঁত আর মসলিন মস্ত লোভনীয় পণ্য। পর্তুগীজদের হাতছাড়া ব্যবসা চার্নকের চোখে পড়েছিল।

চার্নক ভাবলেন সুতানুটীতে এসেই থামা যাক। সে ছিল ১৬৮৬ সাল। কয়েকটা ঘর তৈরি হল গঙ্গার তীরে। সে ঘর কুঁড়েঘরেরই সামিল। স্থায়িভাবে থাকার তো বাসনা ছিল না। কিন্তু প্রথম দিন থেকে যে ব্যবসা সুরু হল তা প্রায় লুটপাটের সামিল। লুটপাট করে যতদিন চলে চলুক। এখান থেকে নবাবের কাছে খবর পৌছবার নিশ্চয়তা নেই। জলা-জঙ্গল পেরিয়ে খবর যেতে যেতেই চার্নক পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলবেন। বাণিজ্য আর লুট এক সঙ্গেই চলতে

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তকমা

● জব চার্নকের স্বাক্ষর

লাগলো। এখানে যখন বেশ কিছু লাভের মুখ দেখা গেল, চার্নক তখন হুগলীর দিকে হাত বাড়ালেন। হুগলীতেও একটা কুঠি তৈরি হল। এইবারে নবাবের কর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজদের গোলমাল আরম্ভ হল। হুগলীর ফৌজদার শাসিয়ে দিলেন জব চার্নককে। চার্নক আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। কিছু সৈন্য নিয়ে এসে হুগলীর ফৌজদারের কুঠি আক্রমণ করে বসলেন। খবর চলে গেল নবাবের কাছে। বিশাল এক সেনা-বাহিনী তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিলেন, বেগতিক দেখে নদীপথে চার্নক দলবল নিয়ে দক্ষিণ দিকে পাড়ি দিলেন। আবার সেই সুতানুটী। ছেড়ে-আসা কয়েকটা ঘর তখনও পড়েছিল। নবাবের সৈন্য তাড়া করে পিছু পিছু চলে এলো। ব্যবসা তখন মাথায় উঠলো। সুতানুটীতে ফিরে এসে সন্ধির বার্তা পাঠালেন চার্নক। নবাবের সেনাপতি তা আমলই দিলেন না। সুতানুটী থেকে আরো দক্ষিণে পালিয়ে যেতে হল। পথের মধ্যে নবাবের সৈন্য ইংরেজদের ধরে ফেলে। চার্নকের অর্ধেক সৈন্য মারা পড়লো। নবাবের অধীনতা মেনে নিয়ে চার্নক আবার ফিরে যেতে চাইলেন সুতানুটীতে। হুগলীতে থেকে অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে। চার্নকের সেনা-বাহিনীর তখন শোচনীয় অবস্থা। খাবার-দাবার ফুরিয়ে গেছে। নদীর তীরে নামবার উপায় নেই।

এমন সময়ে নবাবের অনুমতি এল। কোম্পানী সুতানুটীতে ফিরে যেতে পারে। চারটে জাহাজ এসে থামলো আবার সুতানুটীর উপকূলে। চার্নকের তখন মোটে ত্রিশজন সৈন্য। আর কিছু লোকজন। সেটা ছিল ১৬৯০ সাল। ২৪শে আগষ্ট। এই নিয়ে তৃতীয়বার সুতানুটীতে আগমন। নদীতীরে নেমে দেখলেন আগেকার ঘর-বাড়ি আর নেই। যা ছিল নবাবের অনুগত লোকেরা সব পুড়িয়ে দিয়েছে। ২৪শে আগষ্ট রাত্রিটা তাদের জাহাজেই কাটাতে হয়েছে। পরদিন থেকেই সুরু হল নতুন করে ঘর-বাড়ি তৈরি করার কাজ। সুতানুটীতে আসার অনুমতি পেয়ে চার্নক খাজনা ঠিক করে নিলেন। তিনটে গ্রামই ইজারা নেওয়া হবে। হুগলীর ফৌজদারের কাছে খাজনা দিতে হবে। সুতানুটী গোবিন্দপুর কলিকাতা। সুতানুটীর দরুণ ৩০৫৲ টাকা, গোবিন্দপুরের ৭০৲ টাকা আর কলিকাতার দরুণ ৩৩৲ টাকা। এইবারে আমরা কিপলিঙকে স্মরণ করি:

Thus the mid-day halt of Charnock—more's the pity Grew a city.

—মুরারি ঘোষ

দুঃখের ঋতু

শ্যামল চক্রবর্তী

আমার দুঃখের ঋতু পৃথিবীর পথে ও প্রান্তরে
হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে অবশেষে এসে
আহত বুকের মধ্যে থেমে যায় অকস্মাৎ, স্থির।
জীবনের সবচেয়ে ধ্রুবসত্য হৃদয়ের ঘরে
বেঁচে থাকে চিরদিন, সব স্বপ্নহননের শেষে;
(যেমন কবিতা বাঁচে কবিদের জীবনে গভীর।)

আমার দুঃখের ঋতু টেনে নেয় উদাস আমাকে
অতীতের রূপলোকে, যেখানে প্রাণের বেদনার
শান্তি আছে, কখনো বা বাসনার স্রোতের উজানে
ভাসি আমি একা একা: প্রকৃতির স্নেহময় ডাকে
সাড়া দেই, হৃদয়ের সুগহন স্বপ্নকামনার
অস্থির মুহূর্তগুলো নিরন্তর টানে পিছু টানে।...

আমার দুঃখের ঋতু অন্তহীন যন্ত্রণার মাঝে
সান্ত্বনার উৎস যেন; বুঝি তাই জননী বসুধা
এমন নিবিড় স্নেহে কাছে টানে বিষণ্ণ আমাকে
বারোমাস; এই আর্ত দেহমনে বাজে, শুধু বাজে
মানবিক পাঞ্চজন্য; নিষ্কলুষ কবিতার ক্ষুধা
মেটে না মেটে না তবু; (স্মৃতিগুলো অহর্নিশ ডাকে।)

আমার দুঃখের ঋতু চেতনার নির্জন প্রান্তরে
কবিতার অপার্থিব স্বপ্নসৌধ গড়ে, ভাঙে, গড়ে...।

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

রামবিলাস তার তন্দ্রার মধ্যেই টের পেল সুনন্দর গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুনন্দ ত্র যোগাড়ে ছেলে, বিদেশী কনস্যুলেট মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সস্তায় প্রায় নতুন আমেরিকান গাড়িটা কিনে নিয়েছে। লেফট্ হ্যাণ্ড ড্রাইভ, বডির রঙ সি গ্রিন অর্থাৎ শ্যাওলা-সবুজ। যখন চলে, বিশেষ কোন শব্দ হয় না। তবে রামবিলাসের কান খুব প্রখর, বাগানে একটি পাতা খসে পড়লেও বোধ হয় ওর সতর্ক ঘুম নিমেষে পাতলা হয়ে আসে। ভোরের তারাটা চন্দনের টিপের মতো ফিকে হয়ে গেছে, একটি-দুটি পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ, আর থেকে থেকে ডেকে ওঠা। ভোর হয়ে এলো। নিশ্চিন্ত হয়ে রামবিলাস আর একবার পাশ ফিরে শুলো।

ভোরের আকাশের ধূসর গায়ে একটু একটু করে রঙের আঁচড় যখন পড়ল সমরেশ তার বিছানার পাশে বেড ল্যাম্পের সুইচ অফ করে নিঃশব্দে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। সমস্ত রাত দরজায় কান পেতে সে শুনেছে, সমস্ত রাত দরজার ফুটোয় চোখ রেখে সে দেখেছে। মাধবী আর সুনন্দ।

মাধবী এতকাল বাদে সুনন্দর চোখের উপর চোখ রেখে বলেছে—'আমি আর পারছি না। এ অবস্থা বেশিদিন চললে পাগল হয়ে যাব। একটা যা হোক কিছু স্থির কর সুনন্দ।'

'আমি কি করতে পারি বল—' সুনন্দর কথায় হতাশার সুর ঝরে পড়ল—'অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।'

'কতদিন ?' মাধবী বলল। মাধবী সত্যিই তাহলে এই দুঃস্বপ্নকে জীবন থেকে মুছে ফেলতে চাইছে।

'যদি জানতাম।' সুনন্দ দুহাতে মুখ ঢাকলো—'কিন্তু এসব কল্পনা করে কি লাভ মাধবী। সমরেশ আমার বন্ধু। কি ভীষণ অন্যায়, যে তুমি সেই সমরেশের স্ত্রী। তুমি যদি আর কেউ হতে।'

'বন্ধুত্বই তাহলে তোমার কাছে সব চাইতে বড়।' মাধবী তার বড় বড় কালো চোখ মেলে তাকালো। সমরেশের মনে হোল কালো সমুদ্রের জলে একটি আশ্চর্য আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'বিশ্বাস কর মাধবী, আমার বিবেক আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। সমরেশকে ভালো করে তুলতে চেষ্টা করছি, ডাক্তার হিসেবে আমাকে কর্তব্য পালন করতেই হবে। কিন্তু আমার মনের সব কথাই তো তুমি জানো।

কি নির্লজ্জ জবানবন্দী। অন্যায় বিচারকের আসনে বসে সমরেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু বিচার করছিলো। একে অন্যের কাছে মনের ভাব গোপন করে রাখছে, এমন কি হয়তো নিজেদের কাছেও। বিবেক, কর্তব্য, কি সব গালভরা নাম। কিন্তু ছোট ছেলেরা স্লেটে যেমন বড় বড় হরফে দাগ কাটে, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওদের মনের কথাগুলো। সমরেশ ওদের জীবনে অনাবশ্যক একটা বোঝা। তার বহন করতে গিয়ে ওরা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এভাবে আর বেশি দিন চলবে না। সে যদি না একজনকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, হয়তো শেষ পর্যন্ত তার জীবনেরই অবসান ঘটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলবে।

হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসল সমরেশ। আজকে—হ্যাঁ, আজকেই এটর্নিকে একটা টেলিফোন করতে হবে। সুনন্দ কাল যাওয়ার আগে জানিয়ে গেছে, আজ সকাল দশটায় ডাঃ বসাকের কাছে নিয়ে যাবে। ওদের দুজনের নিশ্চিত ধারণা শরীরের চাইতেও সমরেশের মন বেশি অসুস্থ। মানুষের মন যেন শরীরের মত কাদা মাটির ছাঁচে ঢালা একটা জড় পদার্থ, যে তার উপর অবাধে ছুরি কাঁচি চালিয়ে ভাঙাচোরা অংশগুলো মেরামত করে নেওয়া চলে।

তা যদি সম্ভব হোত, তাহলে পৃথিবীতে অসুখী বা অশান্ত মন আর থাকতো না। ঐ লাল নীল শিশি থেকে দাগ মেপে ওষুধ খেয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে বুকের জ্বালাগুলো হয়তো দপ করে নিভে যেত—জল দিলে আগুন যেমন নিভে যায়। ওষুধের নামও বেশ নতুন ধরণের হোত। প্রেম, ঈর্ষা, কপটতা, ছলনা, ক্রোধ, ভয়, প্রতিহিংসা—প্রতিটি অনুভূতি দমনের জন্য মানুষ এত সংগ্রাম করতে হোত না নিজের বিরুদ্ধে।

'আমি একটা খাঁচার মধ্যে বন্ধ হয়ে আছি। যতই ডানা ঝাপটে মরি না কেন, দরজা খুলবে না। প্রতিটি মানুষের এই চিরন্তন যন্ত্রণা-বোধের কোন প্রতিকার কেউ খুঁজে পায় নি'—বিড় বিড় করে বকতে লাগলো সমরেশ নিজের মনে। আজকাল এই নতুন এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে। একলা থাকলে মনের ভাবনাগুলো প্রকাশ না করে থাকা যায় না। সত্যিই কি সমরেশ পাগল হয়ে যাবে? সুনন্দ মাধবীরা যা আশঙ্কা করছে, শেষ পর্যন্ত তাই কি ঘটবে?

দেওয়ালে সুইচ দুবার টিপলো সমরেশ। ভয়ে ওর মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে গেছে, শীর্ণ হাতের আঙুলগুলো থর থর করে কাঁপছে। একলা আর বেশিক্ষণ ঐ সব চিন্তা করলে হয়তো মনের ভারসাম্য বজায় থাকবে না কিছুতে।

'আমাকে ডেকেছেন স্যার'—অনিল বিশ্বাস এসে দাঁড়ালো। লম্বা ঋজু শরীর, চোখে মুখে আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ। পায়ের তলায় মাটি যখন সরে যায়, তখন এই ছেলেটিকে নইলে সমরেশ অসহায় বোধ করতে থাকে।

'আপনার কি শরীর খারাপ করছে?' ব্যস্ত হয়ে ওঠে অনিল।

'শরীর তো কদিন ধরেই খারাপ। কাল, পরশু সেই তলপেটের ব্যথাটা খুব বেড়েছিল। তোমার সেই কবিরাজী ওষুধটা এনে দিও তো। যদিও সুনন্দর মতে অ্যালোপ্যাথি ছাড়া অন্য সব ওষুধের গুণ: কিওর ছাড়া আর কি; নয়।'

'আমার এক পিসিমার ঠিক অমনি অসুখ হয়েছিল স্যার। বাড়ির অবস্থা ভাল, কলকাতা শহরের কোন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার আর বাকি ছিল না। কিন্তু রোগটা কি, তা ধরতে না পেরে একদল বললে মানসিক, অন্য দল নাম দিলে অ্যালার্জি। শেষ পর্যন্ত বিজয় মিত্তির সেকেও লেনের কাশী কবরেজ কি এক পাঁচন আর কালো কালো বড়ি দিয়ে গেল। বিশ্বাস করবেন না স্যার, এক মাসের মধ্যে পিসিকে আর চেনা যায় না। এই সেদিন পঁচানব্বই বছর বয়সে বুড়ি সজ্ঞানে জপের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে দিব্যি চোখ বুজল।'

'সুনন্দ বলছে আমার অসুখ বেশির ভাগই মনের। আচ্ছা অনিল—তুমি তো প্রায় দুবছর এখানে কাজে লেগেছো। তোমার কি মনে হয় আমি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছি?'

অনিল চমকে উঠে তারপর জোর করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কখনও না স্যার। ডাক্তারদের কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি নিজে রাতের পর রাত আপনার খাটের পাশে বসে দেখেছি, যখন যন্ত্রণা ওঠে, কি অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হয় আপনাকে। যে অন্ধ, একমাত্র সেই বলবে ওসব কিছু না। আর ইচ্ছে করে যদি কেউ অন্ধ সাজে, তাহলে তাকে বোঝানো তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।'

সমরেশ অনিলের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলো। সুনন্দকে ও দেখতে পারে না, মাধবীকেও ঘৃণা করে, কারণ সমরেশের প্রতি ওর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অকৃত্রিম।

'তবে কেন মাঝে মাঝে আমার সবকিছু গুলিয়ে যায়। একলা হলেই সেই ভয়টা আমার মনের মধ্যে কেন উঁকি মারতে সুরু করে। মনে হয় বন্ধ দরজার ওপারে একটা—একটা মুখ যেন ছায়ার মত আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা না দুটো। অনিল, এসব কি স্বাভাবিক সুস্থ লোকের লক্ষণ? বল তুমি।'

'আপনার শরীর খারাপ বলেই ও ধরণের মানসিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। কাশী কবিরাজের উপর বিশ্বাস নেই আপনাদের নইলে কবে আপনাকে সারিয়ে তুলতাম।'

'কে বললে বিশ্বাস নেই। সেবারে কি একটা কালো বড়ি এনেছিলে, সেটা খাওয়ার পর কদিন বেশ ভালোই ছিলাম। যাকগে, শরীরের কথা উঠলেই মন খারাপ হয়ে যায়। ওকথা থাক। সত্যজিৎবাবুকে টেলিফোনে জানিয়ে দাও—সকালের দিকে একবার আসতে।'

পকেট থেকে ডায়েরী খুলে আজকের তারিখ বার করল অনিল। লাল কালিতে খুদে হরফে অনেক নাম ঠিকানা লেখা। শুধু সমরেশের নয়, তার নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত আরও নানা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সংবাদ টোকা

থাকে এখানে সমরেশ আজকাল চেক-বই সই করা ছাড়া আর কিছুই করে না, করতে পারে না। মুখে সাহস দিলে কি হবে, অনিলের মনে আজকাল আশঙ্কার মেঘ একটু একটু করে জমা হচ্ছে। কি জানি, সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

'সত্যজিৎবাবুকে কাল রাত্রিবেলাই তো সে কথা বলে দিয়েছি স্যার। এই তো সকাল সাড়ে নটায় তিনি সময় দিয়েছেন। তারপর দশটা পনের মিনিটে ডাক্তারবাবু আপনাকে নিতে আসবেন।'

'পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে মনের দিক থেকে পুরোপুরি সুস্থ আছি কিনা, তার পরীক্ষা।'

'একটা কথা স্যার', অনিল মাথা চুলকে ইতস্তত করে বলল, 'সত্যজিৎবাবুকে আবার কেন ডেকেছেন।'

'উইলটা বদলে ফেলব কিনা ভাবছি', সমরেশ অন্যমনস্ক সুরে বলল।

'উইল?' টেনে টেনে উচ্চারণ করল অনিল।

'এত কুসংস্কার কেন তোমার বলতে পার?' আগেকার দিনের মত হঠাৎ জোরে জোরে হেসে উঠল সমরেশ, 'উইল করলেই কি মানুষ মরে যায় নাকি? আমার বোনের ছেলে হিমাদ্রি থাকে জার্মানীতে। ওখানেই সেট্‌ল্ করেছে। হঠাৎ পরশু ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। আমার বোন সবিতার নাম তুমি বোধ হয় শোন নি। বিয়ের দু' তিন বছরের মধ্যে তিন মাসের ঐ ছেলেকে রেখে মারা যায়। যাই হোক, প্রায় দশ বছর বাদে হিমাদ্রি দেশে ফিরছে। ভাবছি যার সঙ্গে নিজের রক্তের সম্পর্ক, তাকে কি কিছু দিয়ে যাওয়া আমার উচিত হবে না?'

'এত তাড়া কেন?' অনিল গম্ভীর হয়ে ওর চশমার কাচ দুটো পরিষ্কার করতে বসল।

'নিজের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই অনিল। যতক্ষণ সুস্থ আছি, তার মধ্যেই একটা কিছু স্থির করে ফেলা দরকার। তুমি যাও, নীচে অপেক্ষা কর। সাড়ে ন'টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।'

বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছিল না, তবু অনিচ্ছুক শরীরকে টেনে হিঁচড়ে কোন গতিকে উঠে দাঁড়ালো সমরেশ। জলে বাথ-সল্টের মিষ্টি সুগন্ধ মিশিয়ে রামবিলাস স্নানের সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছে। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসামাত্র সে ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে ঢুকবে। সকালে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করে বলে ধোঁয়া-ওঠা কফির ব্যবস্থা থাকে। তা' ছাড়া গরম টোস্টের সঙ্গে গলানো মাখন ও জমাট মধু। শ্বেতপাথরের রেকাবীতে কাটা ফলের টুকরোয় গোলাপ জল ছিটিয়ে রাখা হয়। রামবিলাসের কাজে কোনদিন কোন ত্রুটি কেউ ধরতে পারে নি।

সামনেই দেওয়ালজোড়া আয়না। অনেক কালের পুরোন দামী বিলিতি মাল। বাবার বিয়ের আগে ঠাকুর্দা অনেক শখ করে কোন বিদেশী সাহেবের কাছ থেকে এটি কিনে ঘর সাজিয়েছিলেন। এতকালের জিনিষ, কিন্তু এখনও রূপোর মত ঝকঝক করছে। ছায়াটাও পরিষ্কার পড়ে। 'ক্লান্তি, ক্লান্তি, ক্লান্তি। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়া কান্না হাসির ঢেউ পেরিয়ে আর এগিয়ে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই।' সমরেশ তার ক্লান্ত রিক্ত বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই নিজে করুণা করতে সুরু করল।

নীচে গাড়ির হর্ন শুনে বাগানে পায়চারী করতে করতে মাধবী কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো

সত্যজিৎ সামন্ত ব্যস্ত মানুষ, প্রতি কথার সঙ্গে তাঁর চোখ পড়ে ঘড়ির উপরে। কপালে ঘামের চিহ্নও নেই, তবু রুমাল দিয়ে বার বার কপাল মুছতে তিনি ভালোবাসেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিদেশী, মুখে কড়া তামাকের গন্ধ ছড়ানো বর্মী চুরুট। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে আজ কতকাল, তবু দেশীয় সব কিছুতেই সন্দেহ প্রকাশ করার বাতিক তাঁর কাটে নি। এককালে কোনো বিলিতি সলিসিটর অফিসে পার্টনার ছিলেন, কিন্তু খামখেয়ালী মানুষ বলে সে সব ছেড়ে-ছুড়ে এখন বিশেষ কিছু না করার আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে গোড়ার দিকে পৈত্রিক সম্পত্তির পরিমাণ নেহাৎ তুচ্ছ ছিল না। বহুদিন বিপত্নীক বলে সাংসারিক ঝামেলাও তাঁকে বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে না। সমরেশের বাবার সঙ্গে আলাপ ছিলো, সেই সূত্রে দায়িত্ব কিছুটা জোর করেই ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন।

মাধবীর সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া মাত্র ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তোমাকেও যে আজ শুকনো দেখছি। এই বাড়িটাই আসলে আনহেলথি। সমরেশকে কতবার বলেছি সব বিক্রি করে তোমরা কলকাতার বাইরে কোথাও চলে যাও। ভালো পেয়ার

কিনে ক্যাশ টাকাটা ইনভেস্ট করলে, সুদেই তোমাদের যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। কিন্তু সমরেশ তার বাপ ঠাকুর্দার সম্পত্তির মত জেদটাও ইন্‌হেরিট্ করেছে, নিজে যা ভালো বুঝবে তা ছাড়া আর কিছুই করবে না। আজ আবার আমার তলব পড়ল কেন কে জানে। শরীর ভালো আছে তো।'

শুকনো মুখে মাথা নাড়ল মাধবী। ওর শরীর, মনের উপরে দিনের পর দিন যে ঝড়ের উত্তাল ঢেউ বয়ে চলেছে, তার আঘাতে জর্জরিত হয়ে ওঠার চিহ্ন বোঝা যায়। চোখের নীচে গাঢ় কালির নীল আভাস। ঠোঁট দুটি বিবর্ণ রক্তশূন্য।

'তোমাকে দেখলেও মনে হয় অসুখ থেকে উঠেছ। সেই টনিকগুলো কি একেবারেই খাচ্ছ না?'

'আমি ভালই আছি কাকাবাবু', কাঁপা গলায় মাধবী বলল, 'কিন্তু ওঁকে তো ঘুমের ওষুধ খাইয়েও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে মানুষ কতদিন সুস্থ থাকতে পারে?'

'পেটের সেই কলিক ব্যথা আর উঠেছিলো?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সত্যজিৎ সামন্ত যেন চিন্তিত হয়ে উঠলেন। 'আশ্চর্য ডাক্তারেরা আজকাল অসুখ সারাতে এত দেরি করে। আমাদের সময়ে ডাঃ জেন্‌কিন্স, ডাঃ উইলিয়ামস ধন্বন্তরী ছিলেন সকলে। রোগীর দিকে তাকিয়ে একবার নাড়ী, জিভ দেখে কি যে সব লিখে দিতেন ফস্ ফস্ করে—রোগ আর পালাতে পথ পেত না। আজকাল এরা সব বিলেতের ডিগ্রীর বোঝা নিয়ে এসেও বিশেষ কিছু বাহাদুরী দেখাতে পারে না। কি যে তোমাদের বিশ্বাস এই সুনন্দ মিত্রের উপর। সামান্য একটা কলিক পেন কিওর করতে পারছেন না, আজ বছরখানেক হতে চলল।'

'তিনদিন আগে রাত বারটার পর একবার ব্যথা উঠেছিল।' মাধবীর অস্পষ্ট সুরে জড়ানো কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে তাঁর কানে ভেসে এলো—'উঃ, সে কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পারি না।'

উত্তর দেওয়ার আগেই সত্যজিৎ সামন্ত সমরেশকে দেখে চমকে উঠলেন। সাতদিন আগেও এ রকম কঙ্কালসার চেহারা তার ছিলো না। এখন দেখলে মনে হয় মৃত, প্রাণহীন একটা শীর্ণ শরীর বুঝি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

বাগানে দাঁড়িয়ে অন্য কথা আর হোল না। ইশারায় ডেকে নিয়ে সমরেশ অফিস ঘরে মুখোমুখী বসে ড্রয়ার থেকে সামন্তর প্রিয় হাভানা চুরুটের বাক্স বার করতে করতে বলল—'কাকাবাবু, উইলটা আর একবার বদলাতে হবে। অনিল অবশ্য সে কথা তুললেই প্রচণ্ড আপত্তি জানাতে সুরু করে, কিন্তু মানুষের জন্মমৃত্যুর কথা কেউ কি বলতে পারে। ফিলজফি অবশ্য আমার সাবজেক্ট কোনদিন ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক মানুষই শেষ পর্যন্ত একটা বয়সের পরে ফিলজফার না হয়ে পারে না। এখন মনে হয়, কত তুচ্ছতার জালে আমরা নিজেদের জড়িয়ে রাখি।'

'উইলের কথা পরে হবে। কিন্তু মাই বয়, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে।' আর্তনাদ করে উঠলেন সত্যজিৎ সামন্ত। 'আর তোমাদের কথা শুনব না এবারে চিকিৎসা আমার মতে করতে হবে। হ্যারল্ড জেনকিন্সকে কাল সকালেই কল দিয়ে নিয়ে আসব।'

'ডাক্তার আমার অসুখ সারাতে পারবে না কাকাবাবু।' সমরেশ ম্লান হাসল, 'আই নো মাই ফেট। ভাগ্যের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'ফেট, ভাগ্য'—উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন সামন্ত, 'ঐ শব্দটাকে আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যু তো ফাইন্যাল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত লড়াই করে যাবই। হার কিছুতেই মানব না। ইয়ংম্যান এর মধ্যেই এত পেসিমিস্ট হয়ে উঠলে কেন? ভেবে দেখো তোমার তো কোন কিছুর অভাব নেই। বিষয়-সম্পত্তি, যৌবন, সুন্দরী স্ত্রী, সামাজিক প্রতিপত্তি এ সবই অযাচিতভাবে তোমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। সুখী হতে তোমার বাধা কোথায়?'

'বাধা কোথায়?' প্রতিধ্বনির মত উচ্চারণ করল সমরেশ। কি সুন্দর একটা ছবি আঁকছেন সত্যজিৎ সামন্ত। আকাশ নীল, হাওয়া শান্ত, নদীতে আলোর আভাস। ফুটন্ত ডালে দু'টি পাখী যেন নিবিড় অনুরাগে বসন্তের ভাষা একে অন্যকে শোনাচ্ছে। কিন্তু জীবনের ক্যানভাসে ও ছবি আঁকা যায় না। সেখানে ঝড় ওঠে, হাওয়া উত্তাল হয়ে ফোটা ফুলকে ঝরিয়ে দেয়, অন্ধকার রাত্রির কুটিল ছায়া অমলিন আলোকে আড়াল করে দাঁড়ায়। বঞ্চনার তীক্ষ্ণ ছুরি বিশ্বাসের স্নিগ্ধতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। জীবনের নগ্ন-রূপের দিকে তাকিয়ে সমরেশ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি জানেন না কাকাবাবু, আমাকে ওরা স্লো পয়জেন করছে। বাঁচতে আমি আর পারব না।'

'কি বলছ সমরেশ!' কড়া গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন সামন্ত। 'মনের বাতিকগুলোকে তাড়াও দেখি। তোমাকে কে বিষ খাওয়াবে? তাতে কার কি লাভ হবে?'

'যদি এক কথায় জবাব দেওয়া যেত'—আবার যন্ত্রচালিতের মত মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করল সমরেশ।

(ক্রমশঃ)

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সুশীল রায়

অনল আয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রানী-বাই বলল, কেন আসো তোমরা এখানে? এখানে এসে কি আরাম পাও তোমরা? ঘরে বউ নাই?

কথাটা জিজ্ঞাসা করেই সে রূপনারায়ণের মুখের দিকে তাকাল এ-কথার উত্তর শোনার জন্যে; রূপনারায়ণ বলল, না নাই।

—বিয়ে করো নি বুঝি।

—করেছিলাম।

—মরে গেছে বুঝি বউ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রূপনারায়ণ বলল, না। মরে নি, একদিন হঠাৎ—

বাধা দিয়ে রানী-বাই বলল, থাক্, থাক্ ঘরের কথা বলতে নেই সবাইকে। অন্য কথা বলো।

কিন্তু অন্য কথা না, রূপনারায়ণ তার ঘরের কথাই বলতে লাগল, বলল, একদিন হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে সে।

মনের কথা উজাড় করে বলতে চায় বুঝি রূপনারায়ণ। জীবনে অনেক গণিকা অনেক বাইজী দেখেছে সে, তাদের কারো কাছ থেকেই বুঝি এমন সদয় আর সরল আচরণ সে পায় নি, তাই এ-স্বাদ তার কাছে নতুন লাগছে। বিয়ে-করা বউয়ের কাছে মানুষে কেমন ব্যবহার পায়, সে জানে না। হয়তো এই রকমই পায়। সে তাই গদ্‌গদ চোখে চেয়ে আছে রানী-বাইয়ের মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে রানী-বাই জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর খোঁজ করো নি?

—করেছি। পাই নি।

—আবার বিয়ে করলে না কেন?

—বিয়ে? রানী-বাইয়ের কাঁধের উপর হাত দিয়ে রূপনারায়ণ বলল, যার বউ কুলত্যাগ করে সে যে হয় এক-ঘরে। তাকে আর কেউ মেয়ে দেবে কেন?

—ওঃ, এই কথা?

আর-একটা হাত রানী-বাইয়ের কাঁধের উপর তুলে রূপনারায়ণ বলল, এই তো বিয়ে হল আমার তোমার সঙ্গে।

কাঁধ থেকে দুই হাত ধীরে-ধীরে সরিয়ে দিয়ে সরে বসে রানী-বাই বলল, রোজ রাতে বুঝি এমনি বিয়ে হয় তোমাদের?

এ কথার উত্তর দিতে পারল না রূপনারায়ণ। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল নাচো, নাচো একটু। তোমার নাচের কত নাম। একটু দেখাও নাচ।

কিন্তু ওঠে না রানী-বাই। অনড় হয়ে বসে আছে সে। কি যেন ভাবছে বসে-বসে। তার দুর্ভাগ্যের কথাই সে ভাবছে, না, তার সৌভাগ্যের কথা? সমস্ত অতীত এসে আজ যেন ধরা দিয়েছে অর্গলবদ্ধ এই ঘরে। গবি[illegible]ব থেকে হস্তিপুরের যাত্রার কথা, তাদের বিবাহের সেই দীর্ঘ মিছিলের কথা, মাহেশের সেই স্নানযাত্রার কথা, চাঁপার জোগাড় করা সেই বাবুটির কথা।

আবার অনুনয় করল রূপনারায়ণ, বলল, এবার একটু নাচো। দেখি তোমার ঐ পায়ের কাজ। ঐ পায়ে নাকি ফুল ফোটে?

—ফোটে।

—তবে নাচো। ব'লেই চট্ করে রূপনারায়ণ তার হাত ছেড়ে দিয়ে চেপে ধরল পা-দুটো।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানী-বাই। বলল, ছি, তুমি পুরুষমানুষ, তোমরা পুরুষের মত চলবে। মেয়ে-মানুষের পায়ে কি হাত দিতে আছে তোমাদের?

মুখে সে বলল ঐ কথা, কিন্তু মন তার বুঝি ভরে উঠেছে ভয়ঙ্কর জয়ের আনন্দে। হলপ করেছিল সে, সে প্রতিজ্ঞা পালন করল সে। ফৈজ বক্‌সের পা যে তুলে নিতে পারে বুকে, সে যে রানী-বাইয়ের পাও চেপে ধরবে, এ আর বেশি কথা কি। কিন্তু তার মনে হল, এ কথা বেশিই। এই পা-দুটি সে তৈরি করেছে কঠিন চেষ্টা দিয়ে, কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, দিনের পর দিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে। সে পা আজ ধন্য হল।

উঠে দাঁড়াল সে, তার পা-দুটি বুঝি কাঁপছে একটু-একটু।

রূপনারায়ণ ঘাড় তুলে তার দিকে চেয়ে বলল, নাচবে না?

সারাঘর সে সজ্জিত করেছে অপরূপ সাজে, কিন্তু আশ্চর্য, নিজেকে সে সাজায় নি আজ ভালো করে। সাধারণ একটা শাড়িতে অঙ্গ ঢেকে আটপৌরে সাজে আজ সে সজ্জিত। হীরার প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে, আমাকে দেখতে তো আসছে না, আসছে আমার নাচ দেখতে।

সেই নাচ দেখানোর জন্যে তৈরি হল রানী-বাই। কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে এনে কোমরে নিল জড়িয়ে, বলল, শুধু নাচ না, গান গাই আর নাচি?

—বা বা বা, চমৎকার। এই তো চাই।

রানী-বাই হাসল, বলল, সারেঙ্গী নাই, তবলচি নাই—

কথা কেড়ে নিয়ে রূপনারায়ণ বলল, কেবল তুমি আর আমি।

রানীও হাসল, বলল, শুধু নাচ আর শুধু গান।

দরজার ওপারে তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে পিকদানবরদার হুকাবরদার। পাঙ্খাবরদার কোন্ নেপথ্যে ব'সে শুধু পাখার দড়ি টেনে চলেছে জোরে-জোরে।

হীরা বুঝি হার মেনেছে এই আদিখ্যেতার কাছে। বিন্দি-মাসির ঘরে গিয়ে বসে সে মুণ্ডপাত করছে রানী-বাইয়ের।

ঘরের মধ্যে গান ধরেছে রানী-বাই, খাসা গলা তো, গান করছে রানী-বাই—

কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি
অধিষ্ঠান
হেরে মুখ গেল দুখ, দুটো কথার কথা
বলি প্রাণ।

পাক খেয়ে-খেয়ে নাচছে রানী-বাই আর গাইছে—

নাহি চেনো ঘর বাসা, কি দশা
কি দশা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা
পূরাও
রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি কার্যে
না কুলাও।

চমকে তাকাল রূপনারায়ণ ঐ মুখের দিকে। এ যেন শোনা গান, জানা গান। জিজ্ঞাসা করল, এ-গান শিখলে কোথায়?

রূপনারায়ণের পাশে ঘন হয়ে বসে রানী-বাই বলল, যার গান তার কাছ থেকে।

—কার গান?

—যজ্ঞেশ্বরী কবিয়ালনীর।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে রূপনারায়ণের। সেও শুনেছে বটে তারই মুখে ঐ গানটি। কথাগুলো মনেই ছিল না তার, আজ শুনে মনে পড়ল।

রানী জিজ্ঞাসা করল, কিছু খাবে?

ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল রূপনারায়ণ তৃষ্ণার্ত চোখে, রানী বুঝতে পারল বুঝি, বলল, যা খুঁজছ আছে। সব আছে, সব পাবে।

আজ বুঝি নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে রানী-বাই। গেলাশ তার হাতে দিতে-দিতে সে বলল, মাঝে মাঝে এসো।

—আসব বই-কি। যা খাতির পেলাম এখানে, এ কি ভুলবার?

ভুলবার নয়। ঘরের দূরপ্রান্তের দেওয়ালগিরিতে পুড়ে-পুড়ে ক্ষয়ে এসেছিল মোম। সে দিকে লক্ষ্য ছিল না এদের। হঠাৎ দ্বিগুণ আলো ছড়িয়ে জ্বলে উঠেই নিবে গেল বাতি। অমনি দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলে উঠল বুঝি রানীরও বুক।

নিটোল অন্ধকার ঘরে রূপনারায়ণ গদ্‌গদ গলায় বলল, তুমি আমার কে? এত আদর এত যত্ন কেন আমাকে?

রানী-বাই কি উত্তর দিল বোঝা গেল না।

বড় মধু পেয়ে গিয়েছে বুঝি রূপনারায়ণ এখানে। তাই বড় মায়া পড়ে গিয়েছে তার, মমতায় ভরে উঠেছে তার মন। প্রায়ই তাই আসতে হয় এখানে, প্রায়ই চুঁচুড়া থেকে রওনা হয় তার বজরা। টাকশালের ঘাটে নেমে পালকি চেপে চলে আসে এখানে।

নরহরিরা ভাবে অন্তিমকালে হরি-নাম করছে নাকি তাদের এই কাপ্তেন? কত মেয়েমানুষের সঙ্গে কত মেলামেশা হল, কিন্তু এমন লটঘট তো বাধে নি কারো সঙ্গে। শরীরের যা অবস্থা আর বাঁচবেই-বা ক'দিন, এই সময়ে তার যে টান হয়ে গেল একটা নাচনাউলির উপর।

হীরামতিরাও বড় বেআড়া-বেআড়া কথা বলে। কিন্তু সেসব কথা কানে গেলেও রানী তা যেন শুনতে পায় না, এমনি ভাণ করে।

বিন্দি-মাসির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হীরা বলে, ও যে এমন পিরিতখোর মাগী কে জানত বল, মাসি। এ পথে এইচিস কি পিরিত করতে, না, পয়সা করতে? পিরিত চাস তো খসে যা-না এ-তল্লাট থেকে।

গলা নামিয়ে হীরা বলে, আর, পিরিতই যদি চাস তবে ধর-না এক তাজা জোয়ান। অমন মদে-ঝলসানো চালসে ধরা মিন্সেকে ধরে লাভ কি?

কি যে লাভ তা বললে কি হয়, রানী তার নিজের অভিরুচি অনুসারে চলেছে। কেন তার এমন ইচ্ছে হল, সে কথা কেমন করে সে খুলে বলবে—কা'কে।

ঠিক এক নিয়মে চলেছে পরান-হাটার গলি। নানা সাজে সজ্জিত হয়ে দরজায়-দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে সুন্দরীরা। কারো পরনে খাটো বস্নট লাগানো সাটিনের পায়জামা আর আঙ্গিয়া; কারো-বা কলকাদার ঢাকাই শাড়ি; কারো রঙ গালে, কারো ঠোঁটে; কেউ কানবালায় আর হীরা-পান্নার ধুকধুকিতে, কেউ-বা ডায়মন-কাটা চিক ও তাবিজ বাজুতে; কেউ সোনার গোটে, কেউ

রূপার চন্দ্রহারে অঙ্গ সজ্জিত করে মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে মশকরা করে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে সে খবরে কারো যেন কোনো কাজ নেই। তাদের সারা দুনিয়া এসে জড়ো হয়েছে বুঝি এই গরানহাটার গলিতে।

সারা দুনিয়ার কথা থাক্। এই শহর-কলকাতাতেই আরো কত ঘটনা ঘটছে, সেদিকে লক্ষ্য দিতে পারি নি আমরাও। চোখে সুর্মা টেনে দাঁতে মিশি মেখে এখানে ওরা দাঁড়িয়ে থাক, আমাদের দৃষ্টি আমরা টেনে নিয়ে যাই এখন অন্যত্র।

হিন্দুকলেজের ছাত্ররা হিপ্ হিপ্ হুর রে ধ্বনি তুলেছে ধর্মতলার মোড়ে। কি ব্যাপার দেখার জন্যে পথে দাঁড়িয়ে গিয়েছে লোক।

তিনটি ছেলে পথের ধারের যবনের দোকান থেকে রুটি কিনেছে। এই আনন্দে তারা আত্মহারা।

সাহেবের বাড়িতে রুটি আর ডিম ফিরি করে ফিরছিল ফিরিওলা, তাকে ডাকল এদের একজন, প্রকাশ্যে দিনের আলোয় ওর কাছ থেকে কিনল বিস্কুট। সে বিস্কুট মুখে দিয়েই তারা চেঁচিয়ে উঠল—হিপ্ হিপ্ হুর রে।

জেলেপাড়ায় পূজো সেরে ঐ রাস্তা দিয়ে আসছিল শালগ্রাম শিলা হস্তে আত্মানন্দ ভট্টাচার্য। থমকে দাঁড়াল সে, বলল, জাহান্নামে গেল, জাহান্নামে গেল দেশটা, ম্লেচ্ছ হয়ে গেল সব।

নিজের ভাগ্যকেই বুঝি ভর্ৎসনা করতে-করতে এণ্টালির দিকে চলে গেল আত্মানন্দ।

হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আচরণ নিয়ে বড় বিব্রতই হয়ে পড়তে হয়েছে এই শহরকে। এরা ছারখারে দেবে বুঝি দেশটা।

এখানে, এই ধর্মতলার মোড়ে এরা যখন হিপ্ হিপ্ হুর রে ধ্বনি তুলেছে, সেই সময়ে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি তুলে পটলডাঙার রাস্তা দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে একটি ঘোড়া।

মাণিকতলার বাগানবাড়ির ফটক ভেদ করে ঘোড়সওয়ার ভিতরে ঢুকে গেল।

ওই শব্দ শুনে বেরিয়ে এল গোলোকদাস, কি সংবাদ?

সংবাদ নাকি বিশেষ কিছু না। নতুন লাটসাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন রামমোহনকে। সেই বার্তা নিয়ে এসেছে এই 'এডিকং'।

—কে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—গবর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

রামমোহন একটু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হঠাৎ কেন এ-তলব বুঝতে পারলেন না তিনি, কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাঁকে গিয়ে বলুন, আমি এখন পার্থিব কোনো কর্তব্য পালনের দায়িত্ব ত্যাগ করেছি, আমি এখন ধর্মের তত্ত্বালোচনায় ও পরম-সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তাঁর ন্যায় মহিমান্বিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হবার আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই, এজন্য তিনি যেন আমাকে মার্জনা করেন।

অশ্বক্ষুরের আঘাতে ধুলো উড়িয়ে তীব্রবেগে উধাও হল অশ্বারোহী।

গবর্নর-জেনারেলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সে জানাল এই বার্তা।

জিজ্ঞাসা করলেন গবর্নর-জেনারেল, তাঁকে তুমি কি বলেছিলে?

—বলেছিলাম, গবর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তাঁকে আহ্বান করেছেন।

এ কথা শুনে তিনি এডিকংকে বললেন, আবার যাও। গিয়ে বল—তিনি যদি অনুগ্রহ ক'রে এসে একবার দেখা করেন তাহলে মিস্টার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কৃতার্থ হবেন।

পুনরায় অশ্বারোহী এসে উপস্থিত। কি জন্যে তাঁকে এই অনুরোধ কিছুই বুঝতে পারেন নি রামমোহন। কিন্তু এবার বিনীত ভঙ্গিতে পাঠানো তাঁর এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা গেল না। গবর্নর-জেনারেল নয়, মিস্টার বেণ্টিঙ্ক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

লাটপ্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখা করে এলেন বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে। দেখা করে ফিরে আসার পর তাঁকে বিশেষ চিন্তিত দেখাল।

হরিহরানন্দের সঙ্গে কথা বললেন না, গোলোকদাসকে সরে যেতে বললেন, হাতের কাছে টেনে নিলেন তিনি পুঁথি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ব্যাপৃত হলেন রচনাকার্যে।

দীর্ঘ বাইশ বছর মাদ্রাজের গবর্নর ছিলেন বেণ্টিঙ্ক। তারপর সদ্য তিনি গবর্নর-জেনারেল-পদে উন্নীত হয়ে এসেছেন কলকাতায়। এখানে আসার আগেই মন বুঝি প্রস্তুত করেই এসেছেন তিনি।

দীর্ঘদিন তিনি মাদ্রাজে ছিলেন,

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

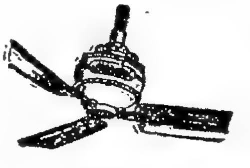

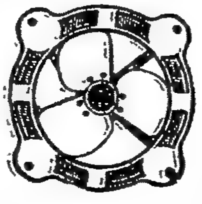

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন: ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

কিন্তু মাদ্রাজের উপকণ্ঠে কখনো যান নি। কিন্তু একদিন তিনি অশ্বারোহণ ক'রে তাঁর সঙ্গী স্লীম্যান-সাহেবের সঙ্গে ভ্রমণ করতে-করতে সমাধিস্তম্ভের ন্যায় প্রস্তরনির্মিত গম্বজ দেখতে পেলেন অগণ্য। লতাগুল্মের আচ্ছাদনে কোনোটি আবৃত, কোনোটি বা অনাবৃত।

এ-জিনিস পূর্বে কখনো দেখেন নি তিনি, তাই স্লীম্যানের কাছে জানতে চাইলেন, কী এসব ?

স্লীম্যান বললেন, এগুলি ? এগুলি হচ্ছে সতী-স্টোন।

এ কথা শুনে একটি কথাও বললেন না বেণ্টিঙ্ক। অশ্বপৃষ্ঠে বসে তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে চললেন। হয়তো মনে-মনে কোনো সংকল্প তাঁর এল, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলেন না তিনি।

স্লীম্যান তাঁকে বললেন পূর্ণ বৃত্তান্ত। শুধু এই অঞ্চলের কথা না, সারা ভারতের কথা। সারা ইণ্ডিয়াতে ছড়িয়ে আছে এই রকম কত সতী-স্টোন, তার কথা। যার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। গভীর অরণ্যের অন্তরালে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে চিতোর এখন অদৃশ্য-প্রায়, এখান থেকে সেই চিতোর অবধি পথের দু'ধারে ছড়িয়ে আছে এইরূপ স্তম্ভ কিংবা প্রস্তর-ফলক। চিতোরের সেই উচ্চ মালভূমিও পরিপূর্ণ এইরূপ প্রস্তর-ফলকে। সেখানে পুরসুন্দরীদের স্নানাগার, একদা সেখানে তাদের কলকণ্ঠ ও কঙ্কনকিঙ্কিণী জল-ধারার সঙ্গে জলতরঙ্গের ধ্বনিতে বেজে উঠত; সে স্নানাগার এখন শুষ্ক ও জলহীন; তারই কিছু ঊর্ধ্বে প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদতুল্য একটি বিশাল স্তম্ভ, নাম তার মহাসতী। এখানে এসে দাঁড়ালে এই নির্জনতাকে নিদারুণ নির্দয় বলে মনে হয়। দূরে দেখা যায় সেই বিরাট রণক্ষেত্র, সবই এখন পরিত্যক্ত ও লোকালয়হীন; কিন্তু সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে তাদের পাখার বিচিত্র বর্ণের রামধনু সৃষ্টি করে উড়ে বেড়ায় 'প্যারট' আর 'পীকক'। নীচে শান্ত সরোবর, তার জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে অগণ্য ধারায়, গড়িয়ে-গড়িয়ে সে ধারা গিয়ে পড়েছে আরও নিম্নভূমির সমতলে। স্বামীর চিতায় আরোহণ করার পূর্বে এই সরোবরে শেষ স্নান সমাপন করত সুন্দরীরা ; প্রাসাদ থেকে সরোবরে আসবার গোপন পথটির চিহ্ন আছে এখনো—ঐ পথ বেয়ে আসত তারা শেষ অবগাহনের জন্য। এই জহরব্রতে আত্মাহুতি দিত যে সব নারী তাদের চিতাভস্ম সংরক্ষণ করা হত ঐ গোপন পথটির অগাধে রচিত ভূগর্ভের ভস্মাধারে।

এ-ঘটনা, স্লীম্যান বুঝি হিসাব করে বললেন, প্রায় পাঁচ শ' বছর আগের—আলাউদ্দিন যখন আক্রমণ করেছিল চিতোর। এরই কাছে হচ্ছে সেই মহিলাটির সমাধি, যাকে বলা যায় ইণ্ডিয়ান হেলেন, কিন্তু যে রূপেই হেলেনের তুল্য, কিন্তু আচরণে নয়—এরই কাছেই সেই পদ্মিনীর প্রাসাদতুল্য সমাধিস্তম্ভ।

তারপর তিনি বললেন, উদয়পুরের কথা। এখানে রানার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে একত্রে কতজন নারী আত্মাহুতি দিয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায় সহজেই, রানার সমাধির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক গণনা করলেই পাওয়া যাবে সে হিসাব। এখানে একস্থানে ষাটটি ক্ষুদ্র ফলক তিনি দেখেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের, বিশেষত বিজয়নগরের, ঘটনার কাছে রাজস্থানের এ-কাহিনী নগণ্য। পর্তুগীজ মিশনারিদের রিপোর্ট সত্য বলে মেনে নিতে মন সায় দেয় না, তাঁরা এরূপ হিসাব দিয়েছেন যে, এই দক্ষিণ-ভারতের এক চিতায় এগারো হাজার নারী আত্মাহুতি দিয়েছে। হয়তো এগজাজারেশন একটু আছে এতে, কিন্তু এ কথা কে না জানে, একটি পুরুষের চিতায় দুই বা তিন হাজার নারীর আত্মাহুতির রীতি দু-তিন শতাব্দী আগেও বিজয়নগরের সাধারণ রীতি ছিল।

বেণ্টিঙ্ক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন ঐ কাহিনী এবং চাক্ষুষ দেখেছেন এই প্রস্তরফলক। শুনেছেন, কোনো মন্তব্য করেন নি।

এর কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতায় এলেন গবর্নর-জেনারেল হয়ে। নিজেকে প্রস্তুত করেই তিনি এসেছিলেন সম্ভবত। কলকাতায় এসে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করে যখন জানতে পারলেন যে, এখানে একটি বাবু আছেন যিনি সতী-বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছেন, অনেক কাজ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন বলে ভরসা হল বেণ্টিঙ্কের, এবং সেইজন্যেই তিনি তাঁর এডিকংকে পাঠিয়েছিলেন বাবু রামমোহন রায়ের কাছে।

বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে এসেছেন রামমোহন। ফিরে এসেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন কাজে। ঐ প্রথাটি প্রকৃতই হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ আচার কি না, জানতে চেয়েছেন বেণ্টিঙ্ক। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার যুক্তি ও প্রমাণ আবশ্যক। এবং কি কারণে এই প্রথা এখানে প্রচলিত তারও হেতু যেন লিখিতভাবে বেণ্টিঙ্কের কাছে পেশ করা হয়—এই তাঁর অনুরোধ।

সেই অনুরোধ-পালনে ব্যাপৃত হয়েছেন রামমোহন।

প্রথমে তিনি উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি বেণ্টিঙ্কের। ইতিপূর্বে লর্ড আমহার্স্টও অনেক প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু না করেই বিদায় নিলেন। তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়ে যখন এলেন এই নতুন গবর্নর-জেনারেল, তখন এঁকেও ঐ আমহার্স্টের মতই একজন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এই কারণেই প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর আহ্বান।

(ক্রমশঃ)

সিঁড়িটা অনেকদূর নীচে নেমে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সিঁড়িটা জল ছুঁতে পেরেছে কি না, সন্দেহ হল তার। কেন না অন্ধকারে সে সিঁড়ির শেষপ্রান্ত দেখতে পাচ্ছিল না। তবে সিঁড়ির দু'পাশে চালু গঙ্গার পাড়ে সে নরম কাদার স্তর দেখতে পাচ্ছিল। জল সরে গিয়েছে, আর গঙ্গাকে এখন এই রাত্রির মতই আশ্চর্য রকম নিরীহ মনে হচ্ছে। দিনের বেলাতেও গঙ্গার এই দিকটা খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা বলে মনে হয়। লোকজন বেশি থাকে না। দলছুট দু-একখানা ব্যাপারী নৌকা মাঝে মাঝে নোঙর ফেলে। আর ইট সুরকি খসে যাওয়া কোম্পানীর আমলের দীর্ঘ সিঁড়িটাতেও স্নানার্থীর ভিড় থাকে না তত।

এখন আকাশে চাঁদ নেই।

তাহলেও অল্প অল্প বাতাসে মাঝগঙ্গায় যে ঢেউগুলো উঠছে, তা ইচ্ছে করলে সে একটা একটা করে গুণে নিতে পারে। ঢেউগুলোর যেন শান্ত ছন্দ রয়েছে।

শহরের রাস্তা ঠিক গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত আসে নি। ভাঙা ঘাটের খানিকটা ব্যবধান রেখে জ্যামিতিক ত্রিভুজের বিষমবাহুর মত বেঁকে গিয়েছে। রাস্তার বাঁকের শেষ আলোটার দাক্ষিণ্য এ-পর্যন্ত এসে পৌঁছুচ্ছে না বলে সে খুশি হল মনে মনে।

গঙ্গার ওপারে দুইদিকেই খানিকটা জায়গা নিয়ে কাশ আর শরবন। উঁচু পাড়। মাঝে মাঝে পাড় ভেঙে পড়ে কাশ আর শরবন সমেত। মাটির গায়ে গর্তের মধ্যে গাঙ-শালিকের ছানা ককিয়ে ওঠে সেই শব্দে। অথচ এখন কি নির্জন মনে হচ্ছে ওই কাশঝোপ। অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে শরবনে। জ্বলছে আর নিভছে। সিগারেট ধরালো সে এবং জ্বলন্ত কাঠিটা পৌঁছুবে না জেনেও সে জলের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাঠিটা শূন্যের উপরেই নিভে গেল এবং মাটিতে পড়ে আগুনের শেষ অস্তিত্বটুকুও মিলিয়ে গেল।

এখন কত রাত্রি সে অনুমান করে নিতে পারে। আর একটু পরেই ওপারের গীর্জা থেকে দুটোর ঘণ্টা বাজবে। কালপুরুষের পাহারায় রাত্রির প্রহর আরও এগিয়ে যাবে। আর যখন ওপারের শরবন থেকে একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ স্বরে ডেকে ডেকে এই নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেবে, তখন মাঝগঙ্গার ঢেউগুলোও কেমন এলো-মেলো হয়ে যাবে। ঢেউগুলোকে তখন আর আলাদা করে দেখা যাবে না। সেই সময় গঙ্গার মাঝখান থেকে বাতাসের ঝাপটা উঠে এসে ওর চোখে মুখে লাগবে। শিরশির করে শীত করবে তার। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপুনি ধরবে।

আশ্চর্য—আজ পাখিটা এখনও ডাকল না। তার মন খারাপ হল পাখিটা ডাকছে না বলে। পাখিটা কেন ডাকল না—সেই সম্পর্কে সে যখন

রাত পাখির কান্না

বিমল কুমার ঘোষ

কতকগুলি সম্ভাব্য কারণ নিজের মনে সাজাবার চেষ্টা করছে—তখন সে মানুষের পায়ের শব্দ পেল।

খুব কাছেই এবং খুব মন্থর চলার শব্দ।

গায়ে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে নিল সে। অশ্বত্থ গাছের যে শিকড়টার উপর বসেছিল—সেই শিকড়ের উপরই আরও গুঁড়ির দিকে সরে গিয়ে বসল।

মানুষই। মেয়েমানুষ।

সিঁড়ির চাতালের উপর এসে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল। বাতাসে কাঁধের আঁচলটা উড়ছে। অন্ধকারে যদিও মুখ দেখা যাচ্ছে না—তবুও তার মনে হল, মেয়েটির চোখে যেন শূন্যদৃষ্টি। বয়সটা খুব বেশি বলে মনে হল না তার।

এত রাত্রে এমন একটি মেয়ের পক্ষে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে দ্বিতীয় কোন অর্থ থাকে না। যে অর্থ সে বোঝে—তা এই রাত্রির মত স্বচ্ছ হলেও—সেটা ভয়ানকভাবে নিষ্ঠুর।

মাঝগঙ্গার ঢেউগুলো তার কাছে ক্রুর হাতছানির মত মনে হল। আর এই নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপ এখন সে নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। যেন একটা স্বাভাবিক এবং পরিচিত দৃশ্য দেখছে এমনি নিরাসক্তভাবে সে চাতালের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। হাতের সিগারেটটা সে অনেকক্ষণ আগেই নিভিয়ে ফেলেছে। মাটিতে ঘষে ঘষে। এই নির্জন রাত্রিতে একটি মেয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে তার দেখা একটা পুরনো নাটকের ভূমিকাভিনয় করতে যাচ্ছে দেখে সে মনে মনে খুশি হচ্ছে কি না, বুঝতে পারল না।

মেয়েটি জলে ডুবে মরবে।

সে নির্ভুল বলে দিতে পারে, এরপরে মেয়েটি খুব ক্লান্ত পায়ে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে জলের কিনারা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে এবং সেখানে গিয়েও ঠিক এমনিভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে জলের দিকে চেয়ে। তারপর এক সময়ে জলে ঝাঁপ দেবে। শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ওর হাত-পা জড়িয়ে যাবে। আর তখন হাবুডুবু খেতে খেতে প্রাণপণে আবার মাটির আশ্রয় পেতে চাইবে। কিন্তু পাবে না। স্রোতে তাকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাবে এবং এক সময় ডুবে যাবে।

বস্তুত প্রত্যক্ষভাবে সে কাউকে জলে ডুবে মরতে দেখে নি। যদিও এসবই তার অনুমান—তবুও এ-অনুমান ভুল নয়।

সে উঠে দাঁড়াল।

মৃত্যুর চেয়েও একটা নিষ্ঠুর কৌতুকে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। কঠিনভাবে চেপে ধরা ঠোঁটের ফাঁকে একটা সাংঘাতিক হাসির আভাস দেখা দিল।

নিঃশব্দ পায়ে সে চাতালের উপর উঠে এল এবং মেয়েটির পিছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির শাড়ির উড়ন্ত আঁচলের স্পর্শ পাচ্ছে সে। আর মেয়েটি যখন যাওয়ার জন্য নীচের সিঁড়িতে পা রাখল, তখন সে সামনের দিকে ঝুঁকে ডাকল—শুনুন।

মেয়েটি ভয়ানকভাবে চমকে উঠল এবং একটা তীক্ষ্ণ এবং ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

সে হাসল। গলা দিয়ে ভাঙা ভাঙা শব্দ করল। বলল—মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছেন না, অথচ মানুষ দেখেই চমকে গেলেন।

মেয়েটি ততক্ষণে সহজ হয়েছে এবং অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখবার চেষ্টা করছে।

সে থেমে থেমে বলল—অথচ মানুষ আপনার কত চেনা। এবার দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে আদেশের ভঙ্গীতে বলল—বসুন না।

মেয়েটি ইতস্তত করল বসতে। এদিক-ওদিক তাকাল এবং শেষ পর্যন্ত ওর সাথে ব্যবধান রেখে বসে পড়ল।

গঙ্গার মাঝখানে এখনও সেই এলোমেলো ঢেউগুলো উঠছে। ওপারের রাতজাগা-পাখিটা শেষ পর্যন্ত ডেকেছিল কি না, সে মনে করতে পারল না। অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল, হয়তো মেয়েটিকে সে কিছু একটা বলবার সুযোগ দিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি কোন কথা বলল না।

সে বলে—মৃত্যুর জন্য এই পরিবেশ এবং প্রস্তুতি নির্ভুলই বলা চলে। কিন্তু আপনার মরা হল না। মানে আমি বাধা দিলাম—

সে আবার একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাতাস এত জোরে বইছিল যে, সিগারেট ধরাতে পারল না।

মেয়েটি বলল—আপনি কেন বাধা দিলেন আমাকে? গলার স্বর কেঁপে গেল ওর। কিংবা কাঁপা গলার স্বরে কান্নার রেশ জড়ানো ছিল কিনা, তা সে বুঝতে পারল না।

—বাধা দিলাম—মানে, টেনে টেনে বলল সে—আমি ঠিক বাধা দিতে চাই নি এভাবে—ব্যাপারটা হল এই যে—এইভাবে কাউকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে দেখলে আমি মোটেই দুঃখ পাই না—

—তা'হলে?

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বাতাসের বেগ কম দেখে সে দেশলাই-এর উপর কাঠি ঘসল এবং সিগারেট ধরিয়ে নিল। সে বলল—আমি বরং চাইছিলাম, এমনি অন্ধকার রাত্রে নির্জন গঙ্গার ঘাটে এসে কেউ জলে ডুবে আত্মহত্যা করুক। এই ধরণের আত্মহত্যার একটা বাঁধা ছক আছে। আমি সেই বাঁধা ছকের সাথে ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনা মেলাতে চাইছিলাম।

—আপনি কি ভেবেছেন—আমার আত্মহত্যার সাথে আপনার ছক মিলে যাবে? মেয়েটি রাগতস্বরে বলল।

—না। মিললেও বোধহয় ক্ষতি নেই—কেন না, আমি একটা আত্মহত্যাই দেখতে চাইছিলাম।

মেয়েটি বলে—এবং সেটা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে। কিন্তু জানেন—

আমি অন্যভাবেও মরতে পারতাম। মৃত্যুর পরে আমার মৃতদেহও নিরুদ্দেশ হোক আমি এইটাই চাই। তা'হলে নিশ্চয়ই আপনার ছকের সাথে মিলত না।

মেয়েটির গলার স্বরে কৌতুক ঝরে পড়ে। মুখে আঁচল চাপা দেওয়া হাসির রেশও শুনল সে। অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে। সিগারেটের সামান্য আগুনে যেটুকু ওর মুখ দেখা গেল—তাতেই বুঝল মেয়েটি হাসছে।

—তার মানে আপনি একটা সাংঘাতিক কারণে আত্মহত্যা করতে চাইছেন।

—মোটেই না—জোর দিয়ে বলল মেয়েটি।—খুবই সাধারণ একটা কারণ এবং আপনি যদি আপনার ছকের সাথে মেলাতে চান তবে বলতেও পারি সে কারণটা।

—বেশ বলুন।

মেয়েটি একটু ভাবল। অন্ধকারের মধ্যেই দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ওপারের দিকে। মাঝগঙ্গার সেই এলোমেলো ঢেউগুলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না সে।

মেয়েটি বলল—আমার নাম স্বাতী। আপনি নায়কের একটা নাম দিন—

সে বলল—বেশ, আমি নাম দিচ্ছি অনিন্দ্য।

—চমৎকার নাম—মেয়েটি বলল—তাই বলে অনিন্দ্য কিন্তু নিন্দাই কুড়োত বেশি। কলেজের প্রফেসরদের তো বটেই, সহপাঠী এবং সহপাঠিনীদের নিন্দাই ছিল ওর প্রাপ্য। একমাত্র বিত্ত এবং চেহারা ছাড়া তার সব কিছুই নিন্দনীয়। আর সবচেয়ে নিন্দার যোগ্য হল—অকারণে মেয়েদের পেছনে হ্যাংলার মত ঘোরা—। কোন মেয়েই ওকে পা[illegible] দয় নি। দিত না। ফলে অনিন্দ্য শু[illegible] হ্যাংলাই নয়, সে লোভীও হয়ে উঠেছিল।

মেয়েটির কথার মাঝখানে [illegible]—মামুলী।

মেয়েটি বলল—এ-পর্যন্ত মামুলী। যেটুকু মামুলী নয়—তা হল এই যে—সকলের নিষেধ সত্ত্বেও আমা। জিদ চাপল, অনিন্দ্যর ক্ষমতা পরখ করে দেখবার জন্য।

—কি দেখলেন?

—দেখলাম অনিন্দ্য ভীতু।

মেয়েটি আবার একটু চুপ করল। গায়ের আঁচল ভালভাবে জড়িয়ে গুছিয়ে বসল।

বলল—তবে অনিন্দ্য একবার মাত্র সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। সে আমাকে বলে দিতে পেরেছিল—আমার মত এমন মেয়ের দায় নেওয়ার সখ তার নেই।

সে হতাশ হল। বলল—আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম। আমার ছকের সাথে মেলে নি। এটা আত্মহত্যার কারণই হতে পারে না।

মেয়েটিও হতাশ হল। বলল—যদিও এটাই ঠিক আত্মহত্যার কারণ নয়, তবুও আপনার ছকটা কেমন জানতে ইচ্ছে করছে।

সে হাতের সিগারেটটা জলের দিকে ছুঁড়ে দিল। সোজা হয়ে বসে গলা ঝেড়ে বলল—আপনার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

অন্ধকারের মধ্যেই সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। না। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

—অনিন্দ্য একেবারেই কাপুরুষ হলে ভাল হত। মানে এই ধরুন যদি, শেষ মুহূর্তে সে বিব্রতভাবে বলতে পারত—আমি তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, তবে জীবনধারণের মত উপার্জন চাই। লেখাপড়া ওখানেই শেষ করে দিত অনিন্দ্য। আপনাকে ঠিক সময় মত ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপার্জনের চেষ্টায় বের হয়ে যেত সে। ধরুন, দণ্ডকারণ্যের এমন এক জায়গায় সে গেল চাকরি নিয়ে—যেখানে হপ্তায় একদিন ডাক যাওয়া আসা করে। এবং সেখান থেকেই সে পুরনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে চিঠিতে। মেয়েটি ভয়ানক ভাবে আগ্রহী হয়ে সরে আসে তার দিকে।

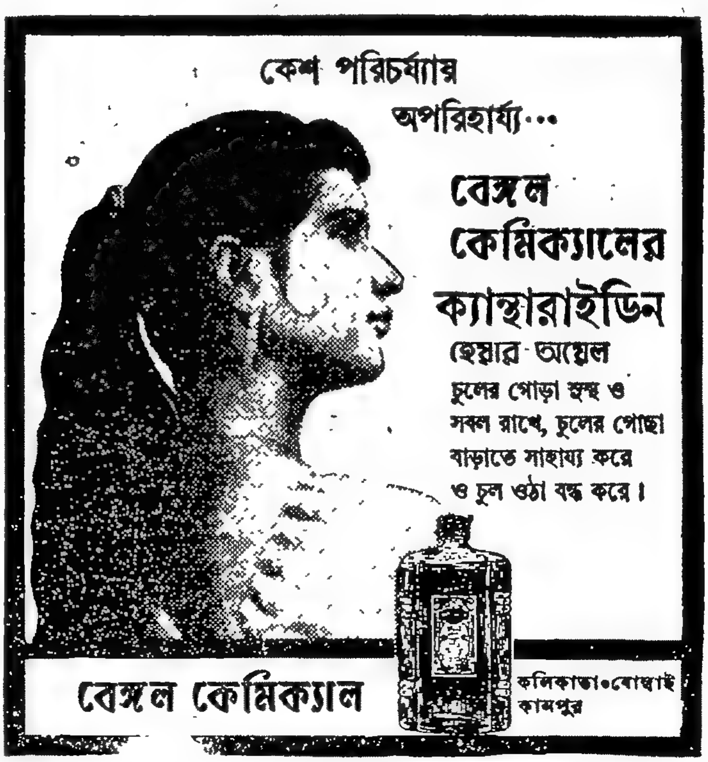

—তারপর ?

—তারপর যথারীতি সে চিঠি আপনি পান না।

—পাই না। আশ্চর্য।

—কেন না আপনি অনিন্দ্যর উপর বিশ্বাস হারালেন।

সে অকস্মাৎ থেমে গেল। মেয়েটির দিকে এবার মুখোমুখী হয়ে বসল সে। —অবশ্য এটা অনিন্দ্য অনুমান করবে। কেন না অনিন্দ্যর সাথে আপনার দেখা হবে না আর। তার আগেই আপনি আত্মহত্যা করবেন। এবং এই গঙ্গাতেই ঝাঁপ দিয়ে।

সে থামল।

অথচ মেয়েটি আরও কিছু শোনার জন্য ওর মুখের দিকে তাকাল। সে দ্বিতীয় দফায় সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল।

মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বলে—আর কিছু নেই ?

—না। অন্তত থাকতে নেই। কেন না মৃত্যুর পরে আর কোন অনুভূতি নেই বলে।

মেয়েটি অবার হতাশ হল।

সে নির্লিপ্তভাবে সিগারেট টেনে চলল। মাঝগঙ্গার ঢেউগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত জোয়ার আসছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছেলেটি বলল—তবে অনিন্দ্যর একটা পরিণতি টানা চলে অবশ্য—কিন্তু তাতে আপনার কোন লাভ নেই। কেন না আপনি আত্মহত্যা করেছেন।

মেয়েটি বলল—জানলেই বা ক্ষতি কি।

—মনে করুন—সে বলল—রোজ গভীর রাত্রে পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ হয়ে যায়—তখন অনিন্দ্য এই গঙ্গার ঘাটে এসে ওর ক্ষুব্ধ গলার স্বর বাতাসের সাথে মিলিয়ে দেয়। সে শপথ ভঙ্গ করে নি—সম্ভবত এই কথাই বলতে চায়।

মেয়েটি এবার একটানা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। তারপর দুই হাঁটুর উপর কনুই রেখে হাতের মধ্যে মুখ চেপে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

সে আর কোন কথা বলছিল না। সিগারেটটা জলের দিকে ছুঁড়ে দেবে কি না ভাবতে লাগল এবং এতই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যে, সিগারেটটা চাতালে ঘষে কখন নিভিয়ে ফেলেছে তা টের পায় নি।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল এবং দু'হাত মাথার উপর তুলে আড়ামোড়া ভেঙে বলল—আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

সে উঠল একটু দেরীতে এবং পাশাপাশি ওরা দাঁড়াল।

সে বলল—করবে জানতাম—কেন না আপনি এখনও মরেন নি।

—কিন্তু অনিন্দ্য বোকা—মেয়েটি অল্প শব্দ করে হাসল—আসলে অনিন্দ্যও মরতে চায়—

—না—সে বলল—অনিন্দ্যও বাঁচতে চায়—বাঁচার ইচ্ছে হয় অনিন্দ্যর, যেমন করে আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

ওপারের শরবনের মধ্যে সেই নাম-না-জানা পাখিটা আজ এতক্ষণে এবং অসময়ে ডেকে উঠল। গীর্জার থেকে শেষ রাত্রির ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে।

মা, তুমি—

ভবতোষ শতপথী

মা, তুমি আমার জন্য, এত স্বপ্ন কেন দেখেছিলে—
কেন ঢেলে দিয়েছিলে, অফুরন্ত প্রাণের নির্যাস।
ক্ষয়-ক্ষতি-বঞ্চনার সব ব্যথা কেন ভুলে গেলে—
মা, আমার মুখ চেয়ে : বুক পেতে নিলে সর্বনাশ।

মা, তুমি মাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রাখো—
অগণিত সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার অধিকার।
মা তুমি মাটির ঘরে : দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকো—
তোমার কুশল স্পর্শে : সুখী হোক : সাজানো সংসার।

অসংখ্য অনার্য শত্রু। গোত্রহীন বর্বর জাতক।
তোমার অজস্র ইচ্ছা, কেন ভাঙে ? কোন দুঃসাহসে।
অক্ষয় কবচ দাও : দাও দেবী, সুতীক্ষ্ণ শায়ক—
রক্তের সামান্য মূল্য দিতে চাই। বলিষ্ঠ বিশ্বাসে।
মা তুমি আমার জন্য : এত স্বপ্ন কেন দেখেছিলে—
যদি না অম্লান চিত্তে—বীরত্বের বীজমন্ত্র দিলে ॥

ক্যান্সার

প্রসূন মিত্র

জীবনের সাধ্য দিয়ে ফাল্গুনের কাঁথা বুনে যাই
স্বর্গের সমাজপতি কী বিধান রেখেছে জানি না,
যে নদী নাব্য নয় তারই পাড়ে গুণ যে টেনেছি,
তিরিশে লিভারে দোষ। পরমায়ু, ফাল্গুনে যাবি না ?
এ হৃদয় দাহ্য তাই প্রমিথিউসের পাত্র হোক,
নিঁঞা কি মল্লারে আর কে মেশাবে আভোগী ? ছিটে
অক্ষয় আয়ুর কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচে পুত্রশোক
অনাথের অট্টহাসি বাপুকুঠি ঘুঘুচরা ভিটে।

বয়সের জপমালা পরকীয়া গাঁটছড়া বাঁধে
কে জানে শান্তির লালসা ? এ বুকে সত্যের বিবমিষা
দ্বিখণ্ডিত সত্তা, আরো করাতের স্পর্শ চেয়ে কাঁদে
(শোন অবিনাশ, ওরা দিতে পারে লুম্বিনীর ভিসা)।

কান্নার চোয়ানো মদে ভিজে যাক ঈস্টারের রুটি
বুদ্ধের দোহাই, আমি উপড়েছি মালিকের খুঁটি।

বঙ্গ দর্শন

● পুলিশের উপস্থিতিতে ন্যায্যমূল্যের দোকানে জনসাধারণকে চাল দেওয়া হচ্ছে

রাজধানী :

জৈ্যষ্ঠের বিদায়ের সাথে সাথে শেষ হয়েছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহন-জ্বালা। আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকেই জলভরা নিকষ কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছেন সূর্যদেব। মেঘ নগরের অভ্র কারাপ্রাচীর ভেদ করে মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মেরে মাটির মানুষের মুখ দেখে নিতে চাইছেন। পেরে উঠছেন না। মেঘকন্যারা এসে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। তারপরই সুরু হয়েছে হাল্কা, মাঝারি অথবা ঘন বর্ষণ।

এবারের বর্ষার রূপটা একটু আলাদা। সমান তালে পা ফেলে যেন চলতে পারছে না। তাই তার ব্যাপকতা, তীব্রতা নেই। প্রথম ক'টা দিন দু'চার পশলা মুষলধারে ঢেলে দেবার পর সুরু হয়েছিল গুরুগম্ভীর গর্জন। গর্জন থেমে গেছে; কিন্তু নবঘন বর্ষা নামে নি সারা বাংলার বুক জুড়ে। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এখনও বর্ষার করুণাঘন রূপের দর্শন পায় নি। উত্তর বঙ্গকে অবশ্যি ভাসিয়ে দিয়েছে। কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় আষাঢ় মাসেই সুরু হয়েছে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি, ঝির-ঝিরে, তির-তিরে শ্রাবণের ধারা। এতেই ধরার মানুষ আনন্দে নেচে উঠেছে। মাঠে নেমেছে চাষীর দল—লাঙলের ফলায় মৃত্তিকার বুক চিরে ফেলে, ছড়িয়ে দিচ্ছে ধানের বীজ, পাটের দানা। মাতলা ও বিদ্যাধরীতে ইলিশ মাছেরও ঝাঁক এসেছিল। জেলেদের হাসি আর ধরে না—সাদা, চকচকে, মোটাসোটা বড় ইলিশ উঠছে জালে। সে ইলিশ সকলের ভোগে আসে নি। বরফের অভাবে, আড়তদারদের কারসাজিতে, জেলেদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টিতে তার বেশির ভাগই পচে, গলে গিয়েছিল।

বর্ষার সমাগমে আশায় বুক বেঁধে যারা মাটিতে সোনা ফলানোর সাধনায় নেমেছে তাদের সাধনালব্ধ ফসলেরও পরিণতি কি হবে বলা শক্ত। হয়তো সুন্দরবনের ইলিশের মতই সে ফসল আড়ৎ থেকে সহজে বেরুবে না—আসবে না সহজ পথে মানুষের ভোগে। এ রাজ্যে তো এই নিয়মই চলে আসছে ক' বছর ধরে। এবারে বর্ষা অবশ্যি নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তার আবির্ভাবের সাথে সাথে দুর্যোগ কলকাতার বুক থেকে কিছুটা কেটে গিয়েছে। মানুষ মাথাপিছু প্রধান খাদ্য ফি সপ্তাহে এক কিলোগ্রাম করে পাচ্ছে রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে। আনুকূল্যেই বলবো, কারণ, এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্চা যাচ্ছে সরকারের ভাণ্ডার থেকে।

রকমারী চাল পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা ও শহরতলীর শিল্প এলাকার ন্যায্যমূল্যের দোকানে। একান্ন নয়া পয়সা থেকে ছিয়াশি নয়া পয়সা মূল্যের পাঁচ রকমের চাল সরবরাহ করছেন রাজ্য সরকার। দোকানে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। শুধু কি তাই? দোকানে মোতায়েন করা হয়েছে কড়া প্রহরা ভুয়ো রেশন কার্ড ধরবার জন্যে—অসাধু দোকানদারদের জব্দ করবার জন্যে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভরসা দিয়েছেন মন্দা বাজারের ভাবনা করতে হবে না—সরকারের গুদামে মন্দা কাটিয়ে ওঠবার মত প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। তাই বলছিলাম, বর্ষা এবারে ভরসার সঞ্চার করেছে।

ভরসার সঞ্চার করলেও, ভীতির বিহ্বলতাটা কেটে গেলেও মানুষের ভয়টা একেবারে কেটে যায় নি। পেটের ধান্দার ঝঞ্ঝাট থেকে পুরোপুরি মুক্তির উপায় এখনও তাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে নি। এক কিলোগ্রামে

মন্ত্রীদের পেট ভরলে ভরতেও পারে; কারণ তারা বর্তমান কলা, ল্যাংড়া আম, আনারসাদি ফলমূল, ডিম, মাংস, ঘি ও দুধে রসনার পরিতৃপ্তির সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয়ই পান। যাদের কাছে এই সব ভোগ্যবস্তু বিলাস মাত্র তাদের প্রধান খাদ্য দুবেলা দুমুঠো ডাল-ভাত। এক কিলোগ্রাম চাল পাবার পর তাদের আবার খোলা বাজারে এখনও হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে চালের সন্ধানে। তবে, চাল কলকাতায় এখন আর দুর্লভ বস্তু নয়। বাঁধা দামের অধিক কড়ি ফেলতে পারলে জানা-শোনা দোকান-বাবুদের কাছ থেকে আর শূন্য থলি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে না।

চাল সহজলভ্য হলেও চতুর ব্যবসায়ীর দল এখনও রণে ভঙ্গ দেয় নি। তারা আছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। সুবিধা পেলেই আবার তারা মেতে উঠবে। সে হুমকী দিতে তারা কসুর করছে না। বলে বেড়াচ্ছে, জোর বর্ষা নামলে শেষরক্ষা হবে না। বাইরের চাল না এলে অবস্থার অবনতি ঘটতে বাধ্য। ব্যবসায়ীদের এ উক্তির পর, ক্ষুধার অন্ন নিয়ে আর জুয়াখেলা চলবে না, এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। ব্যবসায়ীরা শক্তিধর। সরকারের সাথে তাদের শক্তির পরীক্ষা কম হয় নি। সরকারের কথার ধার ও ভার কতটা, সরকারের কথার সাথে কাজের ফারাক কতখানি, তা তাদের আর অজানা নেই। তাই ভারতরক্ষা আইন, অতিমুনাফা নিরোধ আইন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রভৃতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অবাধে তারা মানুষের পকেট কেটে চলেছে। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে গোলদারী ব্যবসায়ী সমিতির চিত্তে এই কারণেই সামান্যতম দ্বিধা বা সংশয় জাগে নি। সরকারের ফাঁকা আওয়াজে ভীত হওয়ার পাত্র তারা নয়। সরকারের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখনও চাল পাচার হচ্ছে রথতলা থেকে, রামকৃষ্ণপুর থেকে। সাধারণ মানুষকে নামতে হচ্ছে এই চোরাই চালান প্রতিরোধের কাজে।

সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না। দু-চারটে তেলকল তেল দিচ্ছে সরকারের বাঁধা দামে—সোয়া তিন টাকা করে। খুচরা দোকানে এক ফোঁটা তেল মিলছে না। তেলের সঙ্কটে নাকি অনেক মন্ত্রী কাবু হয়ে পড়েছেন। তেল মেখে তালেবর হওয়ার কায়দাটা অনেকেই আয়ত্ত করে ফেলে থাকলেও, তেলকল মালিকদের ঠাণ্ডালড়াইয়ের চাপে তারা একেবারে নেতিয়ে পড়ে-ছেন। তেলের অভাবে ওদিকে ঘরের গিন্নীরা রুদ্রমূর্তি ধারণ করছেন। এর পর আর চুপ করেই বা থাকেন কি করে। তাই অনেকের কণ্ঠে খেদোক্তি শোনা যাচ্ছে—এ আর সহ্য করা যায় না। একটা উপায় করতেই হবে। উপায়ের উদ্ভাবনও নাকি হচ্ছে। এর পর তেলের জন্য লাইসেন্সের প্রথা প্রবর্তন করা হবে।

লাইসেন্সের অস্ত্র সরকার আগেও প্রয়োগ করেছেন। কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে সে অস্ত্রকে ব্যবসায়ীরা বারবার বানচাল করে দিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ঠিক না থাকলে—আশে-পাশের জঞ্জাল, গাছ-পালাগুলো ভুলে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্যবস্তুর ওপর মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে না পারলে কোন কাজই হবে না। এ শিক্ষা মহাভারতের। রণগুরু দ্রোণাচার্যের রণনীতিকে উপেক্ষা করা কপটাচার। কাজেই এই আচরণের পরিবর্তন প্রয়োজন। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ব্যব-সায়ীদের লড়াই থামবে না।

কলকাতা শহরে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে চাল সরবরাহের নয়া ব্যবস্থা হলেও মফঃস্বল জেলা-গুলোর হাহাকার একটুও প্রশমিত হয় নি। ধান-চালের দাম কোন জেলাতেই কমে নি। অনেক জায়গায় চাল এখনও দুর্লভ।

* * *

ভেষজ অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, ভেজাল ওষুধের কারবারের সাথে কয়েকজন নামজাদা ডাক্তার ও বাইওকেমিস্ট জড়িত রয়েছেন। বছর দুই আগে পশ্চিম বাংলা থেকে ভেজাল ওষুধ সরবরাহের অভিযোগ তুলেছিলেন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষ। উদ্দেশ্য তাঁদের খুব মহৎ ছিল, এমনও নয়। ওষুধের বাজারে বাংলাকে খর্ব করার চেষ্টাও হয়েছিল। সুখের কথা, বাংলার নামকরা কোন প্রতিষ্ঠানের বদনাম কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায় নি। ভেজাল ওষুধের কারবার তারাই চালাচ্ছে যাদের কোন ড্রাগ লাইসেন্স নেই, এমন কি, তাদের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। এরা একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এদের সাথেই জুটেছেন একদল ডাক্তার ও বাইওকেমিস্ট। এদের মাল চলে বড়বাজারে ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের চোরাবাজারে।

সরকার এই অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরে শাস্তি দিতে পারেন নি। একটি ক্ষেত্রে ভেজাল ও জাল ওষুধ প্রস্তুত-কারককে তার সহযোগীদের সাথে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়েছিল। আসামীদের শাস্তি হয় নি—খালাস পেয়েছে তারা। এ ঘটনার তদন্ত ও প্রসিকিউশনের নাকি কমিশন তীব্র সমালোচনাও করেছেন।

দুর্নীতি দমনে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা সবাই করছে। কোন সমালোচনাই প্রশাসনযন্ত্রের চাকাকে সম্যক গতিশীল করে তুলতে পারে নি। ফলে, দুর্নীতির দাপট বেড়ে চলেছে।

মুর্শিদাবাদঃ

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগপর্ব চলেছে। তাঁর জন্মভূমি কান্দী মহকুমার জেমোতে একটি কমিটীও এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কমিটীর কর্মসূচীকে রূপ দেবার মত অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। উনবিংশ শতকে যাঁদের সাধনায় বাংলা ভাষা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছিল—সাহিত্যের সকল শাখাবাহুকে দৃঢ়, সবল ও সতেজ করে তুলেছিল রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদেরই একজন। সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সেদিন বলেছিলেন, "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে মুক্তবেণীতে পরিণত হয়েছে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনায় একদিকে যেমন রয়েছে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ, অপরদিকে তেমনি রয়েছে তাঁর সুললিত ভাষায় বিচার-বিশ্লেষণ। কঠিন ও গভীর বিষয়বস্তু তিনি সহজ সরল ভাষায় সুন্দর করে পারিপাট্যের সাথে পরিবেশনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রেও এই ঋজু চরিত্র, দৃঢ়চেতা মানুষটির অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত একজন খাঁটি বাঙালী। সেকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার চমকে তাঁর চিত্তবিকার ঘটে নি। প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। নিজের স্বকীয়তা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখেই তিনি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের জাঁক-জমক কখনও তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য কটি কথায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর।"

আমরা আশা করি, সকল সুন্দরের অধিকারী আচার্যদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে তাঁর দেশবাসী সকলেই এগিয়ে আসবেন—মুক্তহস্তে অর্থ দান করবেন।

* * *

রানেরগঞ্জ থানার শিবনগর ঘাটের কাছাকাছি পাকিস্তানীরা হানা দিয়ে দুজন রাখালকে হত্যা করেছে এবং কয়েকজনকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। আহতদের তিনজনের অবস্থা ভাল নয়। হানাদারদের সাথে রাইফেলধারী পাক-পুলিশের একটি দলও ছিল। ফেরার পথে তারা প্রায় এক শ' গরু নিয়ে গেছে। এ ঘটনা ঘটেছে ১৮ই জুন। পাকিস্তানী দুর্বৃত্তদলের সীমান্ত এলাকায় হামলা-বাজী নতুন ঘটনা নয়—হামেশাই চলেছে। কিন্তু এবারের হামলাকে দুর্বৃত্তদলের দুষ্কার্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর পেছনে পাকিস্তান সরকারেরও সমর্থন কিছুটা রয়েছে। তা' না হলে পাক-পুলিশের দলটি

● আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সীমান্ত পেরিয়ে মুর্শিদাবাদের এক মাইল ভেতরে প্রবেশের সাহস পেতো না।

আমাদের সরকার নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মামুলি প্রতি-বাদের ফলও আমাদের অজানা নেই। প্রতিবাদের পরিবর্তে প্রতিকারের ভিন্ন পথ অনুসরণ না করতে পারলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তিই ঘটবে বেশি করে।

কুচবিহার ঃ

চীনের চেলা-চামুণ্ডারা এখানে আস্তানা গেড়ে বসবার উদ্যোগপর্ব চালিয়েছে। বেশ কিছুদিন থেকে তারা চীনের গুণকীর্তন করে চলেছে পথে-ঘাটে। চীনের ভারত আক্রমণের ঘটনাকে একটা সামান্য সীমান্ত বিরোধ হিসেবে প্রমাণের চেষ্টাও চলেছে। সীমান্তের ঘটনাবলীকে কমিউনিস্ট-কর্মীদের কাছে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে চীন নির্দোষ এইটাই প্রমাণিত হয়।

কুচবিহারের আর্থিক দুরবস্থার চিত্র আমরা অনেকবার পরিবেশন করেছি। উদ্বাস্তু সমাগমে আজ কুচবিহারের সমাজজীবন ভারাক্রান্ত। চাষই এখানকার মানুষের একমাত্র সম্বল। দেশীয় রাজ্য কুচবিহার পশ্চিম বাংলায় যোগ দেবার পর এক পা-ও এগোতে পারে নি—সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। এই দারিদ্র্যের কবল থেকে কুচ-বিহারের মানুষকে মুক্ত করতে প্রয়োজন উপযুক্ত শিল্পায়নের। রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। কুচবিহার আজ বিক্ষুব্ধ। এ বিক্ষোভ অন্যায় নয়।

কুচবিহারের তামাক মোটা পয়সা তুলে দিচ্ছে প্রতি বছর পশ্চিম বাংলার কোষাগারে। এই তামাকের নেশায় কুচবিহারকে কোলে টানবার জন্য আসাম ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। কুচবিহারের মানুষের আন্দোলনের চাপে আসামের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নি। কুচবিহারের তামাকে ভাল চুরুট তৈরি হয়। সরকার ইচ্ছে করলেই সেদিকে নজর দিতে পারেন। কুচ-বিহারের দৈন্যদশা ঘোচাবার কাজে গাফিলতি হতে থাকলে অবস্থা আরও জট পাকিয়ে উঠবে। চীনের সাকরেদরা ওৎ পেতেই আছে।

বর্ধমান ঃ

অজয় নদের ভাঙন প্রতিরোধের একটি প্রকল্প নিয়েছেন রাজ্য সরকার। ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অজয়ের ধারে ১৪ মাইল লম্বা বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এই ১৪ মাইলের কাজ শেষ করে অজয়ের নীচের তীরবর্তী এলাকার

আরও মাইল দশেক বেঁধে দেবার কথাও সরকার বিবেচনা করছেন।

প্রতি বছরই অজয় তার তীর ভেঙে প্রবেশ করে চাষের জমিতে—আশে-পাশের ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফসল নষ্ট হয় বিস্তর। বাঁধটি হলে অজয় আর অজেয় থাকবে না। তার প্রবল প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাবে তীরবর্তী গ্রামের মানুষ।

• • •

সরকার বাহাদুর যে কাজে হাত দেন সেটাই তালগোল পাকিয়ে করে সমস্যার সৃষ্টি। সমস্যা সমাধানের চাইতে সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতেই এঁরা সিদ্ধহস্ত।

দুর্গাপুরে কম বেতনের, শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য বাড়ি তৈরি হচ্ছে এমন জায়গায় যেখানে বাজারের কোন সুবিধা নেই, কাছে পিঠে নেই কোন যানবাহন। শ্রমিকদের কাজের জায়গা সেখান থেকে বহু দূরে। বাসে চাপতে হলেও অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। তা' ছাড়া বাসও সরকার বাহাদুরের বাহাদুরীরই অন্যতম নজীর। কখন আসবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। বাড়ি এখন সব কটা হয়ে ওঠে নি। যে-কটা হয়েছে তাতেই এর মধ্যে শ্রমিকরা গিয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। দুর্গাপুরে বাড়ি পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। যারা নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠেছে তাদের এর মধ্যেই নানা অব্যবস্থায় নাভিশ্বাস উঠেছে। জলের অভাব। বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয় নি। কবে আলো আসবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। জল ও আলোর সম্যক ব্যবস্থা না করেই ঘর বিলি করাটা আমাদের প্রশাসনিক শৈথিল্যেরই আরেকটি প্রমাণ।

২৪ পরগণা :

ক্যানিংয়ের বাজারে এর মধ্যে একদিন বড় বড় ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে প্রতি কিলোগ্রাম ছ' থেকে দশ নয়া পয়সায়। এত সস্তায় মাছ পেয়ে সেদিন সকলেই মাছ কিনেছিল দুটো তিনটে করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০ মণ মাছ বিক্রি হয়েছিল।

একালে আনা দরে ইলিশ মাছ কল্পনারও অতীত। কিন্তু কল্পনায় যা' কুলোয় না, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা' বিশ্বাস করা যায় না তাও ঘটে। ক্যানিং শহরের মেছোহাটায় তেমনি অঘটনই ঘটেছিল। আমাদের মৎস্য দপ্তরের বড়কর্তাদের, অতিমুনাফালোভী পাইকার ও আড়তদারদের নোটিশ না দিয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ উঠে এসে ধরা দিয়েছিল গোসাবা ও বাসন্তী অঞ্চলের জেলেদের জালে। পর্যাপ্ত বরফের অভাবে তাদের কলকাতার ঠাণ্ডাঘরে পাঠানো সম্ভব হয় নি। পচে উঠতেই আড়তদারেরা বাজারে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। নিজের চেষ্টায় মাছ ধরে খাওয়া ছাড়া যারা বাজারের মাছ পয়সার টানাটানিতে ঘরে আনবার কথা ভাবতেও পারে না; তারাই সেদিন বাজার সরগরম করে তুলেছিল। অভাগাদের সকলের ভোগে কিন্তু সেদিনের মাছ আসে নি। হাঁক-ডাক কানে যেতেই স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিদর্শক গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আশে-পাশের বাড়ির আনাচে-কানাচে হানা দিয়ে পচা মাছ বের করে এনেছিলেন। তখনও আড়তে পচা মাছ ছিল প্রচুর। খবরে বলা হয়েছে, এক শ' বিশ মণ পচা মাছ পরে নদীর চরে নিয়ে কেরোসিন সহযোগে পোড়াতে হয়েছে।

খবর পেয়ে রাজ্য মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান মোটরচালিত নৌকো পাঠিয়েছেন সুন্দরবন অঞ্চলে মাছ ধরে বরফ চাপা দিয়ে কলকাতার বাজারে এনে ফেলবার ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। তাঁর কেরামতির কথা আজ আর কারো অজানা নেই। ভালমানুষ তিনি। কত দিকই বা সামলাবেন। হাওড়ার বাজারে মাছের ব্যবসা খুলেছেন। বিয়ে-বাড়ির মাছ সরবরাহের ভার নিয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলার খাল-বিলে মাছের চাষের পরিকল্পনা নিয়েছেন। রুই-কাতলা ধরবার জন্য একের পর এক আইনের জালও বুনতে হচ্ছে তাঁকে। কাজের মানুষ তাঁকে বলতেই হবে। তাছাড়া, বলা

● শ্রীফজলুর রহমান

নেই, কওয়া নেই, হুট করে এত ইলিশ মাতলা ও বিদ্যায় এসে পড়বে, ভাবতেও তো তিনি পারেন নি।

বাদলার দিনে ইলিশ মাছ ভাজা খিচুড়ি সহযোগে উপভোগ তিনি নিশ্চয়ই করেন নি। করলে, মাছের ব্যাপারটাকে এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলতেন না। ইলিশ মাছের সাথে বর্ষণমুখর আকাশের সম্পর্কটাও তাঁর অজানা থাকতো না। ঝম ঝম বৃষ্টি ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি পেলে সমুদ্রের লোনা জল ছেড়ে উজান বেয়ে চলে ইলিশের ঝাঁক। আকাশে মেঘের জমাট ছায়া দেখলেই বাংলার জেলেরা ইলিশ-ধরা জাল নিয়ে নৌকো ভাসায় নদীতে। এ নিয়ম চলে আসছে অনাদিকাল থেকে।

ইলিশ মাছ বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হলে অন্য মাছের কদর যায় কমে। বিকোতে হয় তাদের কম দামে। বিদ্যা ও মাতলা মেঘের ঘনঘটার সাথে সাথে মেতে ওঠার আগেই রহমান সাহেব সুন্দরবনের জেলেদের সাহায্যের কথাটা একটু ভাবতে পারলে আজ আর মোটরচালিত নৌকো পাঠিয়ে

কাগজে ফলাও করে বিবৃতি দেবার প্রয়োজন হত না। তাতে জেলেদেরও উদরের চিন্তা যেমন কিছুটা লাঘব হ'ত তেমনি কলকাতার মানুষ প্রাণভরে দুদিন দুটো মাছ খেতে পারতো। তাঁর নৌকো সুন্দরবনে পৌঁছবার আগেই ঠাণ্ডাঘরের মালিকরা কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। ইলিশ মাছ সুন্দরবনের নদী থেকে সরাসরি গিয়ে উঠছে ঠাণ্ডাঘরে। তার রূপোলী দেহ লালচে হয়ে উঠতে ঠাণ্ডাঘর ছেড়ে বাজারেও আসছে। দাম কমে নি—প্রতি কিলোগ্রাম ল্যাজা-মুড়ো সহ তিন টাকায় বিকোচ্ছে। দেহ যাদের এখনও একটু চিকন, শুভ্র তাদের কিনতে গেলে সাড়ে তিন টাকাই দিতে হচ্ছে। এদিকে সরকারের নৌকো সুন্দরবনের নদীবক্ষে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ইলিশ মাছ অদৃশ্য হয়েছে। মৎস্য দপ্তর আর ভুল করতে নারাজ। ঠিক হয়েছে নৌকোগুলো সারাটা বর্ষা এখানে মোতায়েন থাকবে। —টহল দিয়ে বেড়াবে ইলিশের সন্ধানে।

রহমান সাহেবের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে তিনি সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নন। মাছের অভাব পূরণের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের সরকারের কাছে ধর্না দিয়েছেন। সেখানকার পুকুর ইজারা নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারকে পুকুরের মাছ ধরে দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রয়োজনবোধে মাছের খোঁজে তিনি সারা ভারতও চষে বেড়াতে বোধ হয় ত্রুটি করবেন না। এরপর কবির ভাষায় বলতে হয়, বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা মৎস্য সন্ধানে। নদী-মেখলা বাংলার মৎস্যমন্ত্রীকে মাছের জন্য যেতে হচ্ছে উত্তর প্রদেশে। সত্যি অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই ২৪ পরগণাতেই রয়েছে প্রচুর মাছের সম্ভাবনা। যাদবপুর সোনারপুর এবং ভাঙড় থানার বিরাট এলাকা আজ বদ্ধ জলায় পরিণত। সেখানে করপোরেশনের ময়লা জল চালান দিতে পারলে প্রতিদিন কলকাতার বাজারে তিন শ' থেকে চার শ' মণ মাছ আসতে পারে। রহমান সাহেবের দপ্তরের সেদিকে নজর নেই। এদের ব্যাপারই আলাদা। কাজের চাইতে প্রচারের ঢক্কা নিনাদের দিকেই লক্ষ্যটা বেশি। এ ভেল্কিবাজী বেশিদিন চলতে পারে না। সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল।

* * *

একমাত্র ক্যানিং-এর বাজার ভিন্ন অপর কোথাও চাল পাওয়া কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যানিং-এ ৭০ থেকে ৮০ নয়া পয়সার মধ্যে চাল বিক্রি হচ্ছে। বারুইপুর, মগরাহাট, জয়নগর, ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি মণ ১৯ টাকা করে।

সুন্দরবন এলাকার চাল নদী পার হয়ে এপারে এসে সরাসরি চলে আসছে কলকাতা শহরে ও আশে-পাশের শিল্পাঞ্চলে। গুদামজাত হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীদের গোপন গহ্বরে। গ্রামের মেয়েরা দু-এক বস্তা লোক্যাল ট্রেনে যা' আনছে সেগুলো শহরতলীর বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে এই অভাবটা প্রতি বছরই দেখা দেয় জুলাই-আগষ্ট মাসে। তখন চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়ে যায়। এবারে যে মাসের প্রথম দিক থেকেই হাহাকার সুরু হয়ে গেছে। জেলেরা বেকার। মাছের ব্যাপারীদের বেড়াজালে আটকা পড়ে মাছ ধরা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। ঘরে ঘরে অনটন। সাথে সাথে সুরু হয়েছে ডাকাতের দৌরাত্ম্য। বারুইপুর, জয়নগর, মগরাহাট, বাসন্তী, ভাঙর, সন্দেশখালী, গোসাবা প্রভৃতি এলাকার রাহাজানি ও ডাকাতি চলেছে অবাধে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ডাকাতদল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায়, যে কারণেই হোক, ২৪ পরগণার পুলিশবাহিনী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে নি। তাদের এক কথা—বিরাট জেলা, থানাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পুলিশ নেই। প্রশাসনের শিথিলতা থাকলে অপরাধীদের সাহস বাড়ে। ডাকাতদেরও দাপট বেড়ে চলেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কের।

● সস্তা দরে চাল পাওয়ার দাবীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

দুরন্ত দেহলী

॥ উনিশ ॥

কোম্পানীর অফিসে রোজই ফাইল চুরি যাচ্ছে। চোর ধরা যাচ্ছে না। পুলিশ এসেছে। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের সমাগম হয়েছে। দিনরাত তদারক করেও ডিটেকটিভ কর্তারা চুরির কোনো হদিস পাচ্ছে না। দেশের সব টেকনিক্যাল এক্সপার্ট একত্রিত করা হল। কনফারেন্স বসলো। সকাল বিকেল [illegible] সিগার পুড়লো। সিগারেটের নস্য হল। দিস্তের দিস্তে কাগজে নোট গেল। চোর বেশ পাকাপোক্ত বলেই মনে হচ্ছে। ভোজপুরী পেল্লায় পেল্লায় পালোয়ান দারোয়ান লাঠি হাতে গোঁফে তা দিয়ে রাত জেগে পাহারা দিল। চোরের কোনো পাত্তা নেই। তার টিকিটিও নজরে পড়ছে না।

টেকনিক্যাল এক্সপার্টের দল রায় দিল চোর রয়েছে কোম্পানীর অফিসের ভিতরেই, এ কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ করে বাইরে থেকে কে আসতে পারে? কার এত সাহস? কার এত বড় বুকের পাটা?

অফিসের কর্মচারীদের উপর কড়া নজর পড়ল। সার্চ হবে। ছুটির পর বাড়ি যাবার সময়ে সবাইকে সার্চ করা হবে। নতুন পাহারাদার রাখা হল। তাদের তদারক করার জন্য নিযুক্ত হ'ল কেরাণী। এদের সবার মাথার উপর বসলো নতুন অফিসার। কোম্পানী অফিসের ফাইল চুরি। এ তো চাট্টিখানি কথা নয়। জান গেলে জান আসবে। কোম্পানীর মান গেলে দেশের মান থাকবে কোথায়?

প্রেমাসক্ত সমর শাণ্ডিল্য নাম্বার টুর সাথে আমাদের সমরের বহুদিনই দেখা নেই। ফাইল চুরির তদন্তের ফলে কদিন থেকে দুজনের ঘনিষ্ঠতাটুকু বেশ জমে উঠেছে। দুজনের এক সাথে ডিউটি পড়েছে। সমর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছে। আজকাল আর ছেলেটি আগের মতন নিজের প্রণয়ীর গল্প বেশি করে না। সমরের মাঝে মাঝে সেই প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। তার প্রেমিকার ঠোঁট দুটির সাথে সমরের ঠোঁট দুটির নাকি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে।

সমর এ কদিন থেকেই অফিসের ফাইল চুরির সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সকাল সকাল বটকেষ্টকে অরুণার সাথে আলাপ করতে দেখে আবার একটা নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকলো? বুড়োটা আবার কি চায়?

অন্যান্য দিন থেকে আজ তার অফিসে যেতে একটু দেরী হয়ে গেল। সমর শাণ্ডিল্য নাম্বার টু তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

—'এই যে আসুন দাদা। এতক্ষণ আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। আজ একটু দেরী হল যে?'

চশমাটা নাকের ডগায় দিয়ে বৃদ্ধ অবজেকশন স্পেশালিস্ট চাকলাদার-বাবু হিসাব দেখছিলেন। খাতাটা থেকে মুখ তুলে বললেন—'এ আর কি দেরী? কোম্পানীর অফিসে প্রেমে-পড়া ছোকরাদের সাত খুন মাপ। তখনও তোমাদের বৌদির সাথে আমার বিয়ে হয় নি। আশীর্বাদটা শুধু হয়ে গেছে। অফিসে আসার পথে একবারটি তাকে না দেখলে প্রাণটা আমার আই-ঢাই করত। লাঞ্চের আগে কোনদিন অফিসেই আসি নি। আগের দিন এই চাদর-খানা বেঁধে রেখে যেতাম চেয়ারে। পিওন খানিকটা খোঁজাখুঁজি করত বটে। ঐ বাঁধা চাদরেই সব কসুর মাপ হয়ে যেতো।'

বিদেশী সাহেব বলত—'দেখো ওদিক-এদিক কোথাও ঘোরাঘুরি করছে না তো? সীটে যখন চাদর আছে তখন ঐ পান-টান খেতে কোথাও গেছে বোধ হয়।'

দিল্লীতেও কোম্পানী-দপ্তরের বিদেশী সাহেবরা গড়গড় করে বাংলা বলতেন।

ছোট সমর বলল, 'আপনি কি বলতে চান দাদা, আমাদের সমরবাবু প্রেমে পড়েছেন?'

বুড়ো চাকলাদার গোঁফটা নাচিয়ে বলল—'সে আবার খুলে বলতে হবে ভায়া? আমার এই হিসাবের খাতায় সব কিছু ধরা পড়ে। কোম্পানীর ড্রাফটে যখন ভুল দেখি তখন বুঝি ছোকরা ফেঁসেছে। যোগে যখন ভুল দেখি তখন বুঝি ছোকরা মজেছে। এ্যাডভান্সের দরখাস্তখানা যখন খুলি তখন বুঝি ছোকরা ডুবেছে।' সমরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে দেখছো সমর শাণ্ডিল্য নাম্বার টু-কে, একেই জিজ্ঞাসা কর। এর প্রেমসিক্ত দিনগুলোর কথাই জিজ্ঞাসা করে দেখো। ঠিক ধরে ফেলেছিলুম কিনা। বলো না হে শাণ্ডিল্য।'

শাণ্ডিল্যর নীরবতায় বুড়ো

চাকলাদার উৎসাহ পান। তিনি আরও জোরালো গলায় বলেন, 'এই কোম্পানীর দপ্তরের প্রেম অভিনয়ের চার্টখানা আমার নখের ডগায়। বড় সাহেব তখন নতুন জুনিয়র অফিসার হয়ে আসেন। সে ধরো আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা। ড্রাপটে ভুল দেখেই ধরে ফেললাম সাহেবের মনখানা কোথাও বাঁধা পড়ে গেছে। তারপরে কদিনের ছুটির দরখাস্ত। বুঝলাম সাহেব মজেছেন। তারপরই এলো এ্যাডভান্সের দরখাস্তখানা। বুঝলাম সাহেব ডুবেছেন। কদিন যেতে না যেতেই বটকেষ্ট এসে চুপি চুপি খবর দিল, ছোট সাহেবের বিয়ে হে চাকলাদার। একটা প্রেজেণ্টেশনের বন্দোবস্ত করতে হয় যে এখন। —এই শর্মা বসে বসে একে একে সবার প্রেমাভিনয় দেখে এসেছে। তার চোখে ফাঁকিটি দেবার উপায় নেই, বুঝলে হে, ভায়া। এ হল কোম্পানীর অডিট ডিপার্টমেণ্টের চাকলাদার শর্মা।'

শাণ্ডিল্য বলল, 'সমরদার এখন কোন্ স্টেজ চাকলাদার সাহেব?'

চাকলাদার সাহেব চোখটা টিপে বলল, 'দেখাবো হে দেখাবো। এ্যাডভান্সের দরখাস্তখানা এই এলো বলে। সানাই-এর মধুগুঞ্জন কানে এসে বাজতে আর দেরী নেই হে, দেরী নেই।'

বুড়ো চাকলাদারের কথায় সমরের হাসি পায়। কিছু বলে না। সানাই বেজেছে ঠিকই, কিন্তু সে কি করে চাকলাদারকে বোঝাবে যে, বরাসনের জায়গাটা কোথাকার এক অধ্যাপক অধিকার করতে চলেছে?

একবার ভাবলো শাণ্ডিল্যকে সব ঘটনাটা খুলে বলে। মনটা তার বড়ই ভারাক্রান্ত। কাউকে সব কিছু খুলে বলার জন্য মনটা আঁকু-পাঁকু করছে। শাণ্ডিল্যর মুখটাও হাঁড়িপানা দেখে সেই ফ্রণ্টেও কোনো সুবিধে হবে না ভেবে সমর সমস্ত ব্যাপারখানা বেমালুম চেপে যাওয়াই সমীচীন মনে করল।

শাণ্ডিল্য কোথায় যেন গিয়েছিল। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'চাকলাদার সাহেব চোর ধরা পড়েছে। ফাইলের চোর ধরা পড়েছে। উঃ এই কটা দিন কি দম-ফাটানো খাটুনিটাই না গেল।'

চাকলাদার নাকের ডগায় চশমা সরিয়ে বলল, 'বলি, চোরটা ধরলো কে? তার প্রমোশন তো এবার নিশ্চিত। এতে কোন অবজেকশন তোলার পথ নেই।'

সমর বলল, 'কোথায় রেখেছে চোরটাকে। অফিসেই আছে, না বেঁধে নিয়ে গেছে থানায়?'

শাণ্ডিল্য হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'চলুন না, চলুন আমার সাথে। চোর দেখবেন। থানায় এখনও পাঠানো হয় নি। তবে কানুন অনুসারে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দেওয়া হয়েছে। তাদের লোক না এলে চোরের কোনো শাস্তি দেওয়া অসম্ভব। 'সাব জুডিস' হবার ভয় আছে তো। কোম্পানীর ফাইল চুরির ব্যাপারে সমস্ত দেশে একটা আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার টাকা খরচ করে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, ক্লার্ক, স্টেনোগ্রাফার, পাহারাদার রাখা হয়েছে। ডিটেকটিভ অফিসার ছুটোছুটি করেছে কিন্তু কেউ চোরের টিকিটি ধরতে পারে নি। আজ সেই চোর ধরা পড়েছে। কোম্পানী অফিসের সমস্ত কর্মচারী হাতের সব কাজ ফেলে ছুটেছে সেই চোর দেখতে। হ্যাঁ বাবা, বহুদিন বহু সিক্রেট ফাইল চুরি করে বহু টাকা কামিয়েছে। এবার জানতে পারবে কত ধানে কত চাল।

সমর ও শাণ্ডিল্য দুজনেই পড়ি-কি-মরি করে চোর দেখতে ছুটলো। চাকলাদার নিজের কাজে মন দিল। এ সব ব্যাপারে সে নির্লিপ্ত। বহুবার বহু স্পেশাল কমিটির রায় কলমের এক আঁচড়ে সে বানচাল করে দিয়েছে।

সবাই গিয়ে দেখল ডিরেক্টর, ডেপুটী ডিরেক্টর সবাই একটি বিরাটকায় ইঁদুরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। পর পর অপহৃত দুটো ফাইল তার গর্তের মুখ থেকে পাওয়া গেছে।

বড় সাহেব এক্সপার্টদের নিয়ে আবার সভা বসালেন। সিগারেট পুড়লো। স্টেনোগ্রাফারের দল মনোযোগ দিয়ে মাথা নীচু করে নোট নিল। ফাইলের পাহাড় গড়ে উঠলো। অবশেষে টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা রায় দিলেন পঞ্চাশটা বিড়াল এ্যাপয়েণ্ট করতে হবে। সিক্রেট ফাইল চুরি তো যে সে কথা নয়। আর এই পঞ্চাশটা বিড়ালের রোজকার বরাদ্দ হ'ল আড়াই মণ দুধ। সেই আড়াই মণ দুধের হিসাব রাখার জন্য খোলা হ'ল নতুন ডিপার্টমেণ্ট। নিযুক্ত হল ক্লার্ক, পিওন, এ্যাকাউণ্টেণ্ট।

অডিট ডিপার্টমেণ্ট চাকলাদারের হাতে। বুড়ো চাকলাদার যা লিখবেন বড় সাহেব চোখ-কান বুজে তাতে সই মেরে দেন। এর কোন হেরফের নেই।

চাকলাদার সমর ও শাণ্ডিল্যকে ডেকে বলল, 'দেখলে তো হে ভায়া। টেকনিক্যাল এক্সপার্টগুলোর আক্কেলটা। ইঁদুর চোর ধরার জন্য পঞ্চাশটা বিড়াল এ্যাপয়েণ্ট করার পরামর্শ দিয়েছিস, বেশ করেছিস। আবার ডেলি আড়াই মণ দুধ কেনার পরামর্শ দিলি কোন আক্কেলে। অডিট অবজেকশন এখানেও উঠবে না? কোম্পানীর ডকে উঠতে দেরী কোথায়? এ্যাঁ, আড়াই মণ দুধ: দুধ খেয়ে খেয়ে বিড়ালগুলো ধুমসো হয়ে যদি ঘুমিয়েই সময় কাটায় তারা ইঁদুর ধরতে ছুটবে কখন? খালি পেটে না হলে কখনো শিকার চলে? এ শর্মার কাছে ফাঁকির জো নেই। অবজেকশন তুলে তুলে তিরিশটি বছর কোম্পানীকে বাঁচিয়েছি। না হলে কবে এ কোম্পানী ফাঁক হয়ে যেতো। বিড়ালগুলোকে বরং ব্যায়াম শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত কর। খিদেয় পেটে যখন ছুঁচো ডন মারবে বাপরে মারে করে তারা ইঁদুর শিকার করতে ছুটবে।'

সমর শাণ্ডিল্য নাম্বার টু হেসে বলল, 'আচ্ছা দাদা, টেকনিক্যাল এক্সপার্টগুলো। আক্কেল দেখে আপনি তাদের কোন্ দলে ফেলবেন? কেঁসেছে, না মজেছে, না ডুবেছে?'

বুড়ো চাকলাদার তাম্বুলরঞ্জিত দন্ত বিকশিত করে বললেন, 'কোনো দলেই নয়। আজকালকার মেয়েদের অত সহজ সরল হটেনটট মনে করো।। দুধে-পোষা শিকারী বিড়াল নিয়ে যারা বিদ্যার দৌড় দেখায় আধুনিকা নিপুণিকার দল তাদের স্বীকার করে না। তাদের নিয়ে শিকারও খেলে না।'

ঝাঁটা

মিহিরকুমার বণ্ডিলাল

(রম্য-রচনা)

জড়বাচক অক্ষরের বিশেষ্য পদ, ঝাঁটা ব াটা। খুবই পরিচিত (যদিও খব র কাগজে কিংবা সিনেমায় তা নিয়ে কোন প্রচার হয় নি)।

দরজার প র আড়ালে কিংবা খাটের তলায় মশাদের সঙ্গে নীরবে দাঁড়িয়ে কিংবা শুয়ে থাকতে দেখবেন পুরাতন ভৃত্য র মত। প্রতিবাদ তার স্বভাবে নেই। একটি কোণার দাঁড় করিয়ে দিলে তার ঝিমুনি আসে, সেই ঝিমুনি গভীর নিদ্রায় পরিণত হতে থাকে। তারপর হঠাৎ ঝাঁটাটা সড়াৎ করে মাটিতে পড়ে যায়। বাড়ির কেউ এসে আবার তার ঘাড় ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঝাঁটাদের জীবন ঘোড়ার মতই, শুনেছি ঝাঁটাকে দাঁড় করিয়েই রাখতে হয়, শোয়ালে গৃহস্থের অমঙ্গল। জন্মের সুরু থেকে তার চলা সুরু হয়েছে; মরণে শয়ন, নচেৎ নয়।

আপনার রুচিতে বাধতে পারে, হয়ত একটু সংকুচিতও হবেন; কিন্তু আমার দিক থেকে বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি এক ঝাঁটা-প্রেমিক। দেখেছেন তো, পৃথিবীর ইতিহাসে আলেকজান্দারের ঘোড়া, গণেশের ইঁদুর, লক্ষ্মীর প্যাঁচা, চার্চিলের চুরুট, হ্যানচাঁদের হকি-স্টিক, হিটলারের গোঁপ, জহরলালের গোলাপ, গান্ধীর টুপির—একটা না একটা 'টোটান একেন্ট' আছে। কিন্তু ঝাঁটা? ঝাঁটাদের অবদান কি কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে কোথাও কেউ স্বীকৃতি দিয়ে যায় নি। অথচ 'সভ্যতার পিলসুজ' নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা এই ঝাঁটা—তাদের গা দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ে; তারা আলো দেয় কিন্তু আলো পায় না।

ঝাঁটাদের আত্মারা স্বর্গে যাবার আগে আমাকে তাদের কথাই বলার জন্যে বলে গেছে।

কি করে সে বলবে, তার বলার পথ তো আমরাই রুদ্ধ করেছি। গলার মধ্যে একটা কোমর-সরু কাঠকে পুরে দিয়ে কষে দড়ি কিংবা তার দিয়ে গলাটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেওয়া হয় বলে সে কিছু বলতে পারে না। অপারগ সে—কিন্তু খুব শান্ত মস্তিষ্কের লোক। কখনো বিদ্রোহ করে না। সব ঝাঁটার কিন্তু আবার একভাবে ফাঁসি দেওয়া হয় না। খেজুর পাতা, ঝাউপাতার ঝাঁটার সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না। তারা কোমল 'জীব' বলে তাদের সম্বন্ধে আমাদের আচরণটা অন্য-রকম। কিন্তু নারকেল পাতার ঝাঁটার সম্বন্ধে আমাদের আচরণটা একটু নিষ্ঠুর।

ধরুন, বাড়িতে নবাগতা বধূটি, চালচলন বেশ সলজ্জ, ব্যবহার টি মোলায়েম—অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে মুখে হাসিটি বজায় রেখে। ঠিক এমনি এক সলজ্জ মোলায়েম আচরণ আমরা লক্ষ্য করেছি গৃহ-স্বামীর মধ্যিখানে নবাগত ঝাঁটাটির মধ্যে। স্বাধীনা তরুণীটিকে বিবাহের ফাঁস দিয়ে সংসারের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়। আর তেমনি ঝাঁটার শলাগুলোকে বেশ করে বেঁধে তাকে দিয়ে কাজ করানোর মধ্যে সেই স্বাধীন তরুণীটির মৃত্যুর কথাই নিহিত রয়েছে। সংসারে ঝাঁটা এসেছে, কোন উলুধ্বনি, কিংবা শংখধ্বনি হয় নি। একটা গুরুত্বহীন ব্যাপার।

ঝাঁটা হচ্ছে ডানাকাটা পরী (বিশ্বাস করুন বা না করুন)। নারকেলের পাতা দুদিক থেকে চেঁছে ফেলে দিয়ে শলাসুন্দরীকে ঝাঁটা করা হয়েছে। তার মোহিনী রূপকে আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে বৈধব্য রূপ দিতে হয়েছে। অথচ ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয় যে, নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদখানার একটা যেন অতিরিক্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কিন্তু আপনি যদি ঝাঁটার ফাঁক দিয়ে চাঁদটাকে দেখেন—তাহলে।

কিংবা যদি চিন্তা করা যায় যে, নারকেল পাতার জায়গায় অজস্র ঝাঁটার কাঠি কংকালের মতো উঁচিয়ে রয়েছে আর তারি ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যায়—তাহলে? মানসিক অবস্থা সে-সময়ে কার কি রকম দাঁড়ায় তা নিয়ে আলোচনা না করে এইটুকুই শুধু বলতে চাইছি যে, আমাদের সৌন্দর্য-বোধটা খুবই পলকা। একটা পাতলা

দরের মতো মনের ওপরটাতে ছড়িয়ে রয়েছে। সেটাকে সরিয়ে দিলেই দেখা যাবে একটা অতলস্পর্শী শূন্যতা মুখব্যাদন করে রয়েছে।—ভেনাসের রূপ দেখে লোকে পাগল হয়, কিন্তু তার কংকালকে দেখলে আঁৎকে ওঠাই স্বাভাবিক। মোনালিসার হাসি এক বিস্ময়, কিন্তু তার মাংসহীন মুখের কংকালটি দেখে ভয়-বোধ ছাড়া আর সব বোধ লোপ পাবে।

প্রথম যৌবনে ঝ্যাঁটা গায়ে-গতরে ভারী। তাকে দিয়ে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পরিষ্কার করানো যায় না। তখন তাকে দিয়ে হাল্কা কাজ করানো হয়। এই ধরুন, ঘরটা ঝ্যাটানো, রাশি রাশি ধুলো, ময়লা কিংবা জলরাশি সে দু হাতে ঠেলে নিয়ে যায়। তার কাজের সমর্থনে একটি বৈদেশিক বাণীর সাহায্য নিয়ে বলা যায়—**A new broom sweeps clean**—পেছনে একটা কাগজের টুকরোও পড়ে থাকতে পারে না। ---কিন্তু ধীরে ধীরে তার যৌবন যায়। শলার পাতলা ডগাগুলো খসে গিয়ে গিয়ে সে আরো ধারালো হয়ে ওঠে। দীর্ঘাঙ্গী থেকে খর্বাঙ্গী হয়ে আসে। সংসারের ক্রমাগত উৎপীড়ন, ধীরে ধীরে তার মনে ক্রোধ আনে। বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে। তার নখগুলো হয়ে ওঠে ধারালো। একদা তরুণী বধূটির প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা অবস্থার সঙ্গে ঝ্যাঁটার পরিণতির কথাটি তুলনীয়।

বিগত-যৌবনা ঝ্যাঁটা হয়ে ওঠে অস্ত্রবিশেষ। ডাকসাইটে পিসি বা দজ্জাল গিন্নীদের হাতে ওটি এটম-বোমার মত শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়। বাড়ির কিংবা পাড়ার সধবা কি বিধবা গিন্নীদের হাতে ওটি এক আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তাদের রণচণ্ডী রূপ তখন ঝ্যাঁটার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে যায়। সেইসব রণক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধের শ্লোগান হল 'ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেওয়া।'

ঝ্যাটার আক্রমণাত্মক প্রয়োগ মাঝে মাঝে ঘটার ফলে দুই একটি স্বামীকে আহতদের তালিকায় আমরা দেখতে পাই। ঝ্যাঁটার কল্যাণে সেইসব স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা কিংবা নিরীহ স্বামীদের প্রায়ই নিগৃহীত হতে হয়; সেটা কি স্বদেশে কি বিদেশে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে হাতা-খুন্তির মত ঝ্যাঁটাকে গার্হস্থ্য অস্ত্রের মধ্যে ফেলা যায়। বর্ম, শিরস্ত্রাণ, স্টীলহেল-মেট, খাঁকি পোষাক যেমন যুদ্ধের গুরুত্বটা বোঝবার এবং বোঝাবার জন্যে দরকার, তেমনি চুলটাকে আঁট করে বেঁধে, কোমরে শাড়িটা জড়িয়ে ঝ্যাঁটা না ধরলে ঝ্যাঁটার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যা। ঝ্যাঁটা নামক অস্ত্রটির ব্রহ্মতেজ তখন যোদ্ধার শরীরেও প্রবাহিত হতে থাকে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বনবাসকালে সীতাদেবীর হাতে যদি একটা ঝ্যাঁটা থাকত তাহলে তাঁর অত দুর্ভোগ হত না। ভারতবর্ষের ইতিহাসও হয়ত অন্যরকম হতে পারত।

ঝ্যাঁটাকে কোন রাজকীয় সম্মানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তা বোধ হয় টের পেয়েছিলেন। তিনি 'বর্ষ সমালোচন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীগণের পুরস্কারের জন্যে যেমন 'অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' (বর্তমান কালের রাষ্ট্রীয় পদক এবং পদ্মবিভূষণাদি) —সেইরূপ নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীগণের জন্যে 'অর্ডার অব দি ব্রুমস্টিক' সংস্থাপিত করা হউক। তিনি বাছা বাছা বিশেষ বিশেষ গুণবান ডিপুটি এবং সাব-জজদের গলায় এই 'মহারত্ন' ঝ্যাঁটাটিকে ঝুলিয়ে দেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে গিয়েছিলেন।

দেখুন, ধোপার বাহন হল কাপড়। নাপিতের বা ক্ষৌরকারের বাহন ক্ষুর। আর ঝাড়ুদারের ঝাঁটা। দেবতা এবং দেবীরা বাঘ, সিংহ, ইঁদুর, ময়ূর, প্যাঁচা, ষাঁড় ইত্যাদি হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাকেই বাহনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। মানুষ কিন্তু এমন কতকগুলি বাহন নিল যারা প্রাণহীন বস্তু, বিদ্রোহ করবে না। মানুষের পরিত্রাণের জন্যে ভগবান যে দশ অবতার পাঠিয়ে-ছিলেন তাতে মানুষের কার্যসিদ্ধি হয় নি বলে চাষী, ধোপা, তাঁতি, জেলে, কাঠুরে, কামার, কুমোর, নাপিত, মুচি ও ঝাড়ুদারদের নিয়ে নয়া দশ অবতার তৈরি করেছে। আমাদের সমাজের এবং সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের মূলে এই অবতারদের প্রভাব দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। যাঁদের পায়ে জাপানী ঘাসের চটি, চোখে রিমলেস চশমা, কোলের ওপর কোন বিদেশী ডিটেকটিভ উপন্যাস খুলে সবচেয়ে দামী সিগারেটের সঙ্গে কফিতে চুমুক দেন তাঁদের কাছে এদের মূল্য সেতুবন্ধের সময় হনুমানের কাছে কাঠবিড়ালীর মতই তুচ্ছ। তারপর যেদিন গলিটার মোড়ে জমে উঠবে আবর্জনা, বাড়ির মধ্যেটা দুর্গন্ধে

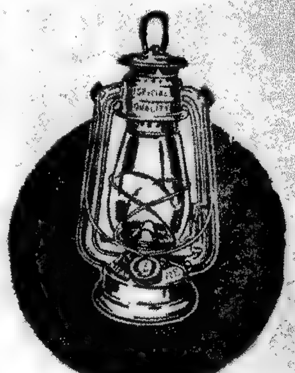
কিষান
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৬,৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

ভরে যাবে সেদিন নাকে সুগন্ধি রুমালটা চেপে গাড়িবারান্দা দিয়ে একবার নোংরা রাস্তাটা দেখে বলবেন, 'ভারী তো কাজ করে, তার জন্যে স্ট্রাইক। হুইপ দেম্।'

অলস দ্বিপ্রহরে একদফা ঘুমিয়ে ওঠার পর তাঁরা পরিচিত কোন সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখতে বসবেন—'ওরা দিনের পর দিন এইভাবে দেশটাকে গোল্লায় দিচ্ছে। দাবী? কিসের দাবী?- - - '

আবার যখন সব কিছু মিটে যাবে, রাস্তাটা পরিষ্কার থাকবে, কোথাও কোন দুর্গন্ধ নেই, শুধু দামী সিগারেটের গন্ধ, ইংরেজী উপন্যাসের পাতা খুলে তন্ময় হয়ে ভাবা চলবে কালকের পার্টিতে সুমনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মাফ করবেন আমাকে, আমি ঝাঁটা-প্রেমিক। ঝাঁটার অবহেলা আমাকে ক্ষুব্ধ করে।

আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন কি আপনার জানলার শিকগুলোও আপনার জীবনের শান্তি এবং নিরাপত্তার একটা মস্ত বড় দিক। ঐগুলোর ওপর ভরসা করে আপনি স্বচ্ছন্দে নববিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সিনেমার কোন রোমান্টিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।

কিংবা তালাটার কথা ধরুন। সে-ও বিশ্বস্তভাবে আপনার আদেশ পালন করছে একা একা দুই কড়াকে দৃঢ়ভাবে বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মজা কি জানেন এসব জিনিষ খুবই তুচ্ছ। এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা ভাবি, 'দুর, এইসব জিনিষ কি আলোচনার বিষয়?'

সত্যি এদের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বুঝতে গেলে আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন আপনার জানলায় শিক নেই, তালা নেই এবং ঝাঁটা নেই।—এই অবস্থায় চোরের পক্ষে আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে আসা স্বাভাবিক এবং জঞ্জালপূর্ণ বাড়ি নিঃসন্দেহে মশা, শেয়াল, মাকড়সা, ছুঁচো ইত্যাদির একটা ভালো আসর হতে পারে।

বাড়ির ধুলো, ময়লা, জঞ্জালদের সার্জেন হল ঝাঁটা। দরজার কোণায়, খাটের তলায় পড়ে থাকলেও সর্বদাই সে তর্জনী তুলে শাসন করছে অবাধ্য ধুলো, ময়লাদের। নর-কে সুন্দর করে নাপিত। সংসারকে সুন্দর করে ঝাঁটা। আর সমাজকে সুন্দর করে ঝাড়ুদার। এদের কেউই কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে কিছুই পড়াশুনো করে নি।—সৌন্দর্য-পিয়াসী মনের একটা স্থুল তুলিকা হল ঝাঁটা।

দেখুন, যুগটা হল প্রতীকধর্মী। প্রগতিশীল সমাজ যেদিন প্রদীপ, কুড়োল, চাকা, সাইকেল, কুঁড়েঘর ইত্যাদির মত ঝাঁটাকেও একটা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করবে সেদিন প্রগতি নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ধুলো কত ধুলো। অতীত ইতিহাস থেকে আজ পর্যন্ত আপনার আশে-পাশে কত ধুলো জমা হয়ে রয়েছে। আপনি হয়ত ধুলোর মধ্যে ডুবে যেতেন, কিন্তু ভাগ্যিস একটা ঝাঁটা ছিল তাই রক্ষে পেলেন। এক সভ্যতা থেকে আর এক সভ্যতা পর্যন্ত ধুলো আপনার পেছনে তাড়া করে আসছে আর আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে ছোট্ট ঝাঁটা। অথচ মানুষের সমাজে নগণ্য এবং ঘৃণ্য। কোন ভাস্কর তার বাটালি-ছেনির ঘায়ে 'ঝগড়াটে মেয়ে হাতে ঝাঁটা' দিয়ে কোন মূর্তি করেন নি। সাহিত্যের দরবারে সে এখনো দরজার আড়ালে রয়ে গেছে। তবুও কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি কবিতায় ঝাঁটার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, 'এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনী মূলে পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম।' জীবন-নাট্যে চিরকালই নেপথ্যে তার ভূমিকা; পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে নি।—কিন্তু এই ঝাঁটাকেই যেদিন মহেনজোদাড়ো, নালন্দার ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হবে তখন তার একটা ঐতিহাসিক মর্যাদা বাড়বে, তার আগে নয়।

ঝাঁটার শেষ জীবনটা বিগত খ্যাতি সিনেমা তারকাদের চেয়েও শোচনীয়। শেষ বয়েসটায় সে—বাড়ির জঞ্জাল ফেলা হয় যেখানটায় কিংবা যেখানটায় বাসন মাজা হয়, তারই ধারে কাছে চব্বিশ ঘণ্টা জল মেখে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঠিগুলো আরো কালো হয়ে আসে। গায়ের থেকে শলা খুলে গিয়ে রোঁয়া-ওঠা বুড়ো পাখিদের মত দেখায়। কাঠিগুলো পচে যায়, মট্‌মট্‌ করে ভাঙতে সুরু করে। তারপর বাড়ির দজ্জাল ঝিটি কিংবা গিন্নীটি তাকে রাস্তায় কিংবা বাড়ির বাইরে কিংবা বাগানের মধ্যে দূর করে ফেলে দেয়। অতীতের পাশুপত অস্ত্র তখন তেজহীন।

কিন্তু তাই বলে ঝাঁটার জীবন ব্যর্থ নয়। তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে সে হয়েছে দধীচি। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তার গা থেকে শলাকা খুলে খুলে বাসা বানায় কাক, পায়রা আর চড়ুইরা। এমনি করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে ঝাঁটা আর ঝাঁটার ভস্ম। তাদের আত্মারা স্বর্গে যেতে পারে নি। তাদের আত্মারা মাটিতে মিশে গেছে।

আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন? পৃথিবীর অন্তর্লোক থেকে ঝাঁটা-দের ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছেন কি?

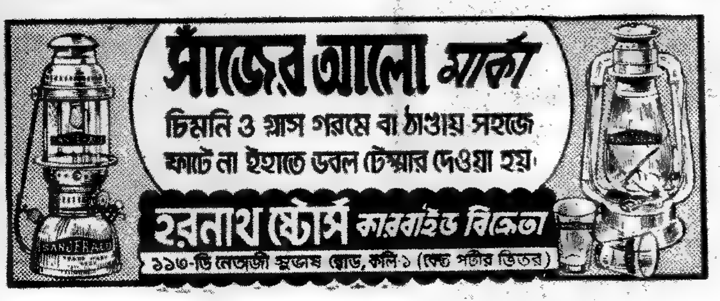

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

সেক্সপীয়ারের পূর্বসূরীরা

এঁদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত টমাস কিড্‌। উদ্দাম আবেগ, উচ্ছ্বাস, বীভৎসতা এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করেই এলিজাবেথীয় নাট্যকারেরা তাঁদের দর্শকদের খুশি করবার চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ে কিড্‌ ছিলেন সবার অগ্রণী। এলিজাবেথীয় 'ট্র্যাজেডী অফ্‌ ব্লাডের' তিনিই প্রবর্তক। টমাস কিডের (১৫৫৮—৯৪) বিখ্যাত নাটক স্প্যানিশ ট্র্যাজেডীর উপর সেনেকার লেখার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। হত্যা, আত্মহত্যা, প্রতিহিংসা, আবেগ, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ কিডের নাটকগুলি এত বেশি মেলোড্রামাটিক যে, তৎকালীন দর্শকদের তুষ্টিসাধনে সাফল্যলাভ করলেও কালের বিচারের মাপকাঠিতে এসব নাটক ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

মার্লোকে বাদ দিয়ে সেক্সপীয়ারের পূর্বসূরীদের ভেতর জন্‌ লিলির নাটকই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোর্ট কমেডির তিনিই প্রবর্তন করেন এবং সেক্সপীয়ারের লেখায় তাঁর প্রভাব ঠিক উপেক্ষা করবার মত নয়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম—ম্যাগ্‌ডালেন কলেজ, অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন এবং মাষ্টার অফ্‌ আর্টস ডিগ্রী পান। Enphues রচনার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এ বইটি অর্থাৎ Enphues, the Anatomy of Wit এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই বইটি থেকেই লিলি যে রচনারীতির প্রবর্তন করেন তার নামকরণ হয়েছে Enphuism (which may be defined as a literary style used by Lyly in his prose works, and adopted into the language of polite society.) ইংরাজী নাটকে লিলিই প্রথম গদ্যের অবতারণা করেন—এর আগে নাটক লেখা হোত পদ্যে এবং অমিত্রাক্ষরছন্দে। গদ্য যেন নাট্যসাহিত্যকে বাস্তবধর্মী করে তুললো—মঞ্চে যা হচ্ছে, তা যেন সত্যি সত্যিই ঘটে মনে হোতে লাগল দর্শকদের। রোমান্টিক কমেডির সার্থক রূপকার হিসাবে সেক্সপীয়ার, বেন জনসন এবং ফ্লেচার সমধিক প্রসিদ্ধ—কিন্তু এ বিষয়ে এঁদের সত্যিকার পূর্বসূরী ছিলেন জন লিলি। তাঁর লেখা আটটি কমেডির ভেতর ছটিই রাণীর সামনে অভিনীত হয়—রাণীর সম্বন্ধে বহু স্তুতি এ নাটকগুলিতে আছে। If Kyd represents the tragedy of blood, Lyly stands for the comedy of manners. By introducing prose

---

মিলামি

---

into his comedies he also opened the way for clever and interesting dialogue. In Lyly the Romantic Spirit found expression in comedies and masques, and thus he became a forerunner of Shakespeare & Ben Jonson.

গ্রীন—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সেক্সপীয়ারের সমসাময়িক এবং পূর্বসূরীদের মধ্যে সব চেয়ে নামকরা ছিলেন গ্রীন, পিল্‌, ন্যাস, লজ্‌ এবং মার্লো। এঁরা সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উদ্দাম চরিত্রের। পর্যাপ্ত পরিমাণ দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতাও এঁদের ছিল এবং জীবনে পর্যায়ক্রমে কখনও প্রাচুর্যের উজ্জ্বলতায় এবং কখনও ভয়াবহ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের ভেতর দিয়ে এঁরা জীবন কাটাতেন। এই দলের গ্রীন ছিলেন যেমন প্রতিভাবান তেমনি অস্থিরমতি ও উচ্ছৃঙ্খল। মার্লোর বিরাট সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার প্রথমটায় গ্রীন মার্লোর প্রতি বিদ্বেষ এবং হিংসায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তারপর অবশ্য উপলব্ধি করেন যে, মার্লো তাঁর থেকে অনেক উঁচুদরের নাট্যকার এবং সেই হিসাবেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। ১৫৫০ থেকে ১৫৬০ সালের ভেতর কোন সময়ে নরউইচে এক বিত্তবান ঘরে গ্রীনের জন্ম হয়। কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। এর আগে কিছুকাল ইটালী এবং স্পেনে কাটিয়ে আসেন—প্রবাসে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবেই তিনি জীবন কাটাতেন। দেশে ফিরে তিনি এক ধনী এবং সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেন। স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি ফুর্তি করে উড়িয়ে দেন। পান্থশালায় চোর-বদমাইসদের সঙ্গেই তিনি বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। এইভাবেই ধাপে ধাপে অধঃপতনের পথে গ্রীন নিজেকে নামিয়ে আনেন—দৈন্য এবং দুর্দশা যেন চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে—সঙ্গীসাথীরা সব ছেড়ে চলে যায়।

মৃত্যুশয্যা থেকে তিনি স্ত্রীকে ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র দেন এবং অনুরোধ জানান তাঁর সমস্ত ঋণ শোধ করে দেবার জন্য। মার্লো, পিল এবং ন্যাসকে লেখেন উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করে, বিগত পাপ, অধর্ম এবং নাস্তিক মনোবৃত্তির জন্য অনুশোচনা করতে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের জন্য। মৃত্যুকালে যে কোনো মানুষের মনে একটা পবিত্রতার ভাব আসে—কিন্তু এ সময়েও গ্রীন মনের তিক্ততা এবং বিদ্বেষের ভাবকে সংযত না রেখে মঞ্চ, অভিনেতা এবং মহাকবি সেক্সপীয়ারের প্রতি বিষোদ্গার করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুকালীন একটি পত্রের কিছুটা অংশ তুলে দিলাম—

'To those gentlemen, his quondam acquaintance that spend their wits in making plays. If woeful experience may move you, gentlemen, to beware, or unheard of wretchedness intreat you will look back with sorrow on your time past, and endeavour with repentance to spend that which is to come, wonder not, for with thee will I first begin, thou famous

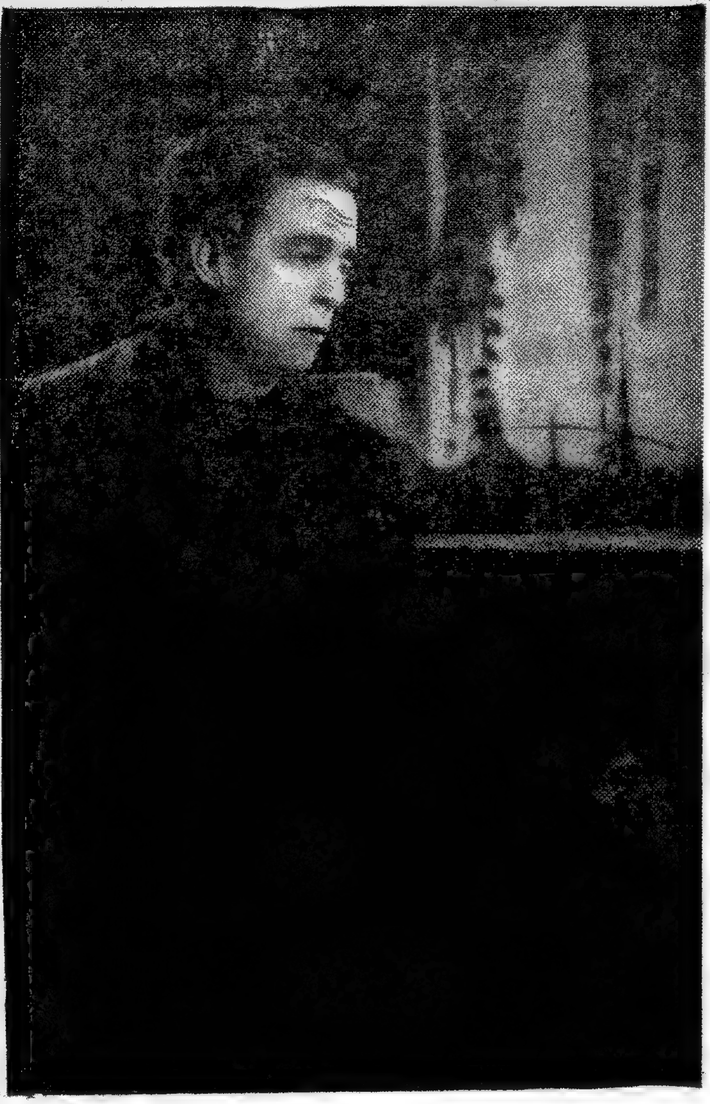

মাইকেল বেন্থল কৃত ঊনবিংশ শতকের সজ্জায় হ্যামলেট নাটকে নামভূমিকায় রবার্ট হেল্পম্যান (১৯৪৮)।

gracer of tragedians (meaning Marlowe) that Greene, who hath said with thee, like the fool in his heart, 'There is no God', should now give glory unto His greatness. With thee I join Funal, that biting Satirist, that lastly with me together writ a comedy (Thomas Lodge). Sweet boy, might I advise thee, be advised and get not many enemies by bitter words.

And thou (Peele) no less deserving than the other two, in some things rarer, in nothing inferior, driven (as myself) to extreme shifts, a little have I say to thee....Base minded men, all three of you, if by my misery ye be not warned; for unto none of you (like me) sought those burs to cleave; those puppets (I mean) that speak from our mouths those antics garnished in our colours, (the actors)....You, trust then not; for there is an upstart crow beautiful with our feathers..supposes he is as well able to bomtast out a blank verse, as the best of you; and being an absolute Johannes Fact:tum, is in his own conceit the only shake-scene (Shakespeare) in a country. Oh, that I might entreat your rare wits to be employed in more profitable courses; and let those imitate your past Excellence, and never move against them with your admired inventions. (Of Greene's 'Groate's Worth of Wit', 'Edinburgh, 1889, p. ?2.)

গ্রীনের উপরি-উক্ত চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সেক্সপীয়ারের পূর্বসূরীর দল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভ করলেও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন—মৃত্যুর কিছু আগে গ্রীনও মারলোর মতই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না এবং সেক্সপীয়ারের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে গ্রীন মারলো প্রভৃতিকে তাঁর সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে যান।

তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্রীন ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। গ্রীনের লেখার ষ্টাইল ছিল স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও কল্পনাপ্রবণ—কিন্তু তাঁর লেখায় গভীরতার ছাপ পাওয়া যায় না। জাতীয়তাবোধের ভাবটাও তাঁর রচনায় বেশ প্রকটভাবেই পাওয়া যায়। আদর্শ নারীচরিত্রও বেশ সুন্দরভাবেই রূপায়িত হয়েছে তাঁর নাটকে।

গ্রীনের বন্ধু পীলও ছিলেন ভদ্র শ্রেণীর। তাঁর জন্ম হয় ১৫৫৭ সালে ডেভনশিয়ারে। লণ্ডনে নাট্যকার বন্ধুবর্গের সঙ্গে পীলও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। গ্রীনের মত তিনি অত লেখেন নি বটে, তবে সবাই একবাক্যে তাঁর কবিপ্রতিভার প্রশংসা করতো। ১৬৬৬ সালে লণ্ডনে যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় তার ফলে পীলের অনেক নাটক নষ্ট হয়ে যায় এবং হারিয়ে যায়।

টমাস ন্যাস (১৫৬৭—১৬০১) এবং টমাস লজও (১৫৫৮?—১৬২৫) এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ন্যাস স্যাটায়ার লিখে নাম কিনেছিলেন এবং অনেকের ধারণা মারলোর সঙ্গে যুগ্মভাবে 'Dido, Queen of Carthage' (১৫৯৪) নাটকটি রচনা করেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ উনচল্লিশ ॥

গদা বিভ্রাট

এক সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রায়ই সম্মিলিত অভিনয়ের (combination play) আয়োজন করা হোত। এই সম্মিলিত অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সে সময়ের মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীচণ্ডী বাঁড়ুয্যে মশাই। একবার পর পর দু'দিনের জন্যে একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেন। প্রথম দিন 'চরিত্রহীন', দ্বিতীয় দিন 'কর্ণার্জুন'। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র, শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কমল মিত্র, শ্রীমতী সরযূবালা প্রভৃতি।

'চরিত্রহীনে' কমল মিত্রের পার্ট ছিল অনঙ্গ ডাক্তার। আর 'কর্ণার্জুনে' দুর্যোধন। কমল মিত্র ইতিপূর্বে 'কর্ণার্জুন' নাটকে কোন ভূমিকাতেই অভিনয় করেন নি। তাই চণ্ডীবাবু যখন তাঁকে 'দুর্যোধন' সাজাতে চান, তখন তিনি প্রথমটায় রাজী হন নি। কিন্তু চণ্ডীবাবুর একান্ত অনুরোধে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়।

সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন ব্যাপারে চণ্ডীবাবু ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। যেহেতু কমল মিত্র কখনও 'কর্ণার্জুন' নাটকে অভিনয় করেন নি, সেই হেতু তাঁকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নামিয়ে এই প্রথম বলে বিজ্ঞাপন দিতে পারলে, অতিরিক্ত আকর্ষণ হতে পারে, এই আশায় কমলবাবুকে দুর্যোধন সাজান।

কমলবাবুর হয়েছে তখন 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা'। চণ্ডীবাবু দুর্যোধন সাজার ব্যাপারে কমলবাবুকে রাজী করানোর সময় মহলার আয়োজন করবেন বলে আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত মহলার কোন আয়োজনই করেন নি। মোটামুটি সংলাপগুলি মুখস্থ করে অভিনয়ের দিন কমলবাবু মঞ্চে উপস্থিত হলেন। ভয়-ভাবনার অন্ত নেই। শুধু সংলাপ আবৃত্তি করলেই ত' হবে না—সেই সঙ্গে কোথায় কি করণীয় সেগুলিও শিল্পীর জানা চাই। যাই হোক, যাঁরা এর আগে একাধিকবার কর্ণার্জুনে অভিনয় করেছেন তাঁদের কাছে সেগুলি জেনে নেবার চেষ্টা করলেন কমলবাবু। তারপর সজ্জাগৃহে গিয়ে সাজসজ্জা করে মঞ্চে অবতরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উইংসের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বুকের ভেতর কে যেন তখন হাতুড়ি পিটছে। ইতিমধ্যে চণ্ডীবাবু কমলবাবুর সামনে এসে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্যে বলে বসলেন,—বাঃ! বেশ মানিয়েছে। ঠিক যেন original দুর্যোধন।

চণ্ডীবাবুর কথায় বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে কমলবাবুর। চণ্ডীবাবুকে বলে বসেন—সরে যান মশাই সামনে থেকে। আমি বলে মরছি বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করে। আর আপনি কিনা এসেছেন এখন original দেখাতে। রিহার্সালের কোন ব্যবস্থা করলেন না। আপনার জন্যে আজ যদি আমি দর্শকদের কাছে হাস্যাস্পদ হই, তাহলে আপনাকেও আমার originality সহ্য করতে হবে। এই বলে রাখলাম।

যাই হোক, কমলবাবুর কথায় চণ্ডীবাবু ত' ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন।

অভিনয় যথাসময়ে আরম্ভ হোল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যে যেখানে দুঃশাসন বস্ত্রহরণে উদ্যত হন এবং ভীম প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তার আগে কে যেন কমলবাবুকে জনান্তিকে বলে বসলো—এখানে দুর্যোধন গদাটা একবার ধরবে মনে রেখো। কিন্তু কোন্ কথার পর গদাটা ধরতে হবে, তা আর তিনি বললেন না।

যাই হোক বস্ত্রহরণের দৃশ্য অভিনয় হতে আরম্ভ হলো। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যত হলেন। ভীম—'নভ বরিষণ ধারা' ইত্যাদি সংলাপ বলে গদা নিয়ে আস্ফালন করে উঠলেন।

কমলবাবু ভাবলেন ভীম যখন গদা নিয়ে আস্ফালন করে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন এই জায়গাতেই বোধহয় দুর্যোধনকেও গদা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। কমলবাবু গদাটি বাগিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবেন, এমন সময় কর্ণবেশী অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁকে বাধা দিলেন।

দৃশ্যটির অভিনয় শেষ হলে কমলবাবু অহীন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—গদা তোলাটা কি এ-জায়গায় নয় দাদা? অহীন্দ্রবাবু জানালেন দুর্যোধনের গদা নিয়ে কোন business-ই নেই ঐ জায়গায়। অহীনবাবুর কাছে সব শুনে গদা নিয়ে আস্ফালন করতে যুক্ত করলেন কমলবাবু এবং খোঁজ করতে লাগলেন চণ্ডীবাবুর—যিনি মহলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন আয়োজনই তার করেন নি। কিন্তু চণ্ডীবাবু তখন থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন।

● 'কারাগার' নাটকে কংসের ভূমিকায় কমল মিত্র ও অপর্ণা দেবী

পাঠক মন

আমি একজন প্রবাসী বাঙালী যুবক। আপনাদের বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিকের নিয়মিত পাঠক। নব-পর্যায়ে সুরু হবার পর থেকে, 'সাপ্তাহিক' আমি আগ্রহ সহকারে পাঠ করে আসছি। বহুদিন থেকেই আপনাদের এ পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু একটা লেখার ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। 'পাঠক মন' প্রকাশ হবার পর আমাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

আপনার পত্রিকার সম্পাদকীয়, আজকের মানুষ, শহর কলকাতা, বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন, আন্তর্জাতিক, খেলাধূলা ও রঙ্গজগতের বিভাগগুলি অতীব আকর্ষণীয়। এই বিভাগগুলি আরও একটু বিস্তৃত হলে খুবই সুখী হব। বিশেষ করে খেলাধূলা ও রঙ্গ-জগৎ এ বিভাগ দুটি একটু বেশি করে বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

শহর কলকাতার মত আমাদের বাংলার পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কিছু অজানা সত্যকে কি প্রকাশ করা যায় না? আমাদের বঙ্গপল্লীর সংস্কৃতির চিহ্ন, বিভিন্ন মেলা, উৎসব, প্রাচীন ও বর্তমান পল্লীবাংলার সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করলে সুখী হব।

'গ্রন্থমেলা' এ বিভাগটির আরও সম্প্রসারণ আশা করি। বিদেশী বইয়ের তালিকা, প্রচ্ছদের ছবি প্রভৃতি দিয়ে এ বিভাগটিকে আরও সম্প্রসারিত করবেন, আশা রাখি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি আপনারা 'লণ্ডনের চিঠি' 'জাপানী সন্দেশ' 'ওয়াশিংটনের চিঠি' 'আজকের যুগোশ্লাভিয়া' প্রভৃতি ফিচারের মাধ্যমে যেভাবে তুলে ধরেছেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। এগুলির নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ করবেন না।

এককথায় বলতে গেলে আমরা 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র মাধ্যমে যেভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের বিভিন্ন খবরাখবর, সমাজ-জীবনের চিত্ররূপ পেয়ে আসছি এরকম আর অন্য কোন পত্রিকাতেই পাই না।

আপনাদের বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-গুলি সত্যিই ভিন্ন জাতের ও [illegible] স্বাদের। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী সম্বন্ধে রবীন্দ্র সংখ্যা, নেতাজী সংখ্যা, সেক্সপীয়র সংখ্যাগুলির তুলনা হয় না। এমনটি আর অন্য কোন সাপ্তাহিকের মাধ্যমে পাই না।

পরিশেষে পত্রিকার কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেই আমার এ পত্র শেষ করছি। পত্রিকার কাগজ, লেটারিং প্রভৃতি একটু উঁচু স্তরের হওয়া প্রয়োজন। বাংলার বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রতিচ্ছবির যে রূপ আপনারা প্রচ্ছদপটে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন, সেটা ভালো কাগজের অভাবে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে না। ছাপাটা ভাল আশা করি।

মলয়রঞ্জন দাস
ফ্যুংশলিং, ভূটান

* * *

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর একজন পাঠক। ১ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই পড়ে যাচ্ছি। অনেক দিন যাবৎই বাসনা করছি—বসুমতী সম্বন্ধে কিছু লিখব। শুভ ২য় বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে 'পাঠকমন'—খোলায় আমার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

বাঙলার মাটিতে সাপ্তাহিক বসুমতীর আবির্ভাব যেমনি গৌরবের—তেমনি বিচিত্র ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে ২য় বর্ষে পদার্পণ এবং জনপ্রিয়তা লাভ করাও তেমনি সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

সাপ্তাহিক বসুমতী আমার কাছে ভাল লাগে, কারণ—এতে বিচিত্র ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে। একদিকে সাহিত্যের ধারা—অন্যদিকে নিরপেক্ষ, নির্ভীকভাবে সংবাদের আলোচনা। বিশেষ করে 'আজকের মানুষ', 'শহর কলকাতা', 'লণ্ডনের চিঠি', 'জাপানী সন্দেশ' প্রভৃতি আকর্ষণীয় নিবন্ধগুলিতে মনের অনেক খোরাক পাওয়া যায়।

উপন্যাসের মধ্যে 'ভঙ্গুর মাটির পাত্রে' খুব একটা ভাল লাগে নি। 'কৃষ্ণচূড়া'—ভাল লাগছে। 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাচ্ছি।

তাছাড়া সাপ্তাহিক বসুমতীর এ কটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যার ফলে সে অন্যান্য পত্রিকা থেকে একটু স্বতন্ত্র। নবীনেরাও প্রবীণের পাশে স্থান পায়—যা অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকার দুর্লভ। একাজে সম্পাদিকা বিশেষ বিচক্ষণ তার পরিচয় দিচ্ছেন। সম্পাদিকার 'গ্রন্থমেলা'—ভালই লাগছে—কিছু নতুন পত্রিকার সমালোচনার সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক মনে করি। তবে সে বিষয়ে তিনিই ভাল জানেন। 'খেলাধূলা'র আসরখানা একটু বর্ধিত করলে আরও ভালো হত।

যা হোক, একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠক হিসাবে উপরি-উক্ত মন্তব্য করলাম। তাছাড়া কয়েকটি দোষ-ত্রুটি খালি চোখেই ধরা পড়ে। যেমন—

(১) প্রচ্ছদের কাগজখানি বিশেষ ভাল নয়। অনেক সময় পত্রিকা হাতে পৌঁছাবার পূর্বেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

(২) ছাপা অনেক সময় সুস্পষ্ট হয় না। যার ফলে অনেক কষ্ট করেও বিশেষ মূল্যবান শব্দ বা লাইনগুলি বুঝে উঠতে পারা যায় না।

(৩) গল্পগুলি অনেক সময় সুখপাঠ্য হয় না। আরও ভাল গল্প হলে এবং গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে সুখী হব।

আমার মনে হয় ২ নং ত্রুটির সমাধান খুব শীঘ্র করা আবশ্যক।

সর্বশেষে একথা অবশ্যই বলব, কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাটি নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বিশেষ সংখ্যা-গুলি আরও আকর্ষণীয় হয়। বর্তমান 'নেহরু-সংখ্যা' চমৎকার হয়েছে।

স্বপন সেনগুপ্ত
আগরতলা, ত্রিপুরা

রঙ্গজগৎ

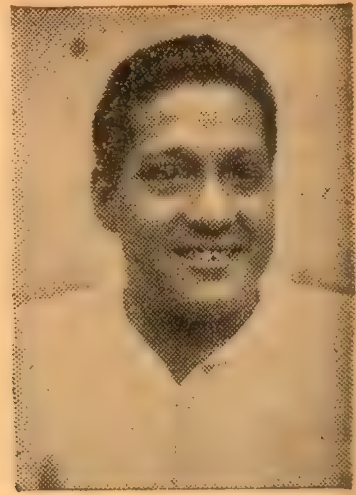

● অজিত বসু
ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার নব নির্বাচিত সভাপতি।

টুইষ্টের পরে শেক

হলিউডের নাচে অবিরাম পরিবর্তন ঘটছে। ওদের নাচ শাস্ত্র মানে না। এক জায়গায় থেমেও থাকে না। এক রীতিতে নাচ তো ওদের কাছে প্রাণশক্তির অভাব। তাই রাম্বা, হুলাহুলায় ওদের মন ভরে নি। এসেছে রক এন রোল, চা-চা, তাও দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে গেল। এলো টুইষ্ট। মানে দোমড়ানো মোচড়ানো। শুধু তালে তালে কোমর নাড়ানো। তা তালকাটা গেলেও আপত্তি নেই। ওতেও ওরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি—হালে নাকি নতুন নাচের চলন হয়েছে—শেক। মানে নাড়ানো—কাঁপানো। এটা নাকি ওদের নাচের জগতে সর্বাধুনিক ফ্যাশন।

শেক শব্দটার সাথে কেবল হ্যাণ্ডশেকে নয়, ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি এবং দুর্বল স্নায়ুর কাঁপুনির সাথে আমাদের পরিচয় আছে—তা ওদের ছেলেমেয়েরা, কাঁপুক, তাতে আমাদের কি! কথাটা বললেই হলো না। হলিউডের ছায়ায় আমাদের বোম্বাই যেভাবে বেড়ে উঠেছে, তাতে রক এন রোল এসেছে, টুইষ্ট এসেছে, আর শেক আসতে কতক্ষণ? হলিউড আর বোম্বাই ছবির কল্যাণে ড্রেন পাইপ আর বিকিনি-পরা ছেলেমেয়েরা যেভাবে রাস্তায় বার হচ্ছে, পার্টিতে ও নাইট ক্লাবে টুইষ্ট নাচছে, তারা শেকও নাচবে। শেকের হিহি করা কাঁপুনি দেখে আপনি আমি যতই লজ্জা পাই, ওদের মাম্মি-ড্যাডিরা বেবিদের এই বেলেল্লাপনা দেখে মোটেই লজ্জা পাবে না। আমাদের এত সুন্দর, বৈচিত্র্যময় ও ছন্দোময় প্রায় তিন শ' বছরের লোকনৃত্য থাকতে চিত্র পরিচালকরা বিদেশী জঞ্জাল আমদানী করেন কেন। দাসমনোভাব-জনিত এই অনুকরণপ্রিয়তা থেকে আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প মুক্ত হোক।

—স্বজন।

চিত্র আলোচনা

'শহর অউর সপ্না'

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কে এ আব্বাসের 'শেহর অউর সপ্না' কলকাতার চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। কে এ আব্বাস লেখক এবং চিত্র পরিচালক হিসাবে এবং তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সুপরিচিত। তাঁরই রচিত মূল কাহিনীর নাম 'ওয়ান থাউজেণ্ড নাইটস অন এ বেড অব স্টোনস'। নগর-জীবনের স্বপ্ন এবং দেশের গৃহহীনদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে চিত্রনাট্য প্রস্তুত হয়েছে। ভোলা এবং রাধা শহরে এসেছিল বলিষ্ঠ জীবন যাপনের স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু সে স্বপ্ন সার্থক করার পথে দেখা গেল কত বাধা। স্বপ্ন আর বাস্তব জীবনের আকাশ-পাতাল ব্যবধানে তারা মনের দিক থেকে পরস্পরকে কাছে পেলেও নীড় বাঁধতে পারলো না। ক্রমে ক্রমে স্বপ্নের রঙিন জগৎ থেকে তারা নেমে এল রুক্ষ বাস্তব জীবনে। ফুটপাথে অবস্থানকারীদের মধ্যে, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তারা পেল অন্তরের স্পর্শ। উপরের তলার মানুষ যেমন সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করে তেমনি তাদের মনও প্রস্তরীভূত—সাধারণের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতির বাইরে। সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে স্নেহশীতল বলিষ্ঠ মন।

হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ছবিরূপে 'শেহর অউর সপ্না' অভিনন্দনযোগ্য। এই ছবি যেমন ভাবধারার দিক থেকে বলিষ্ঠ, তেমনি চিত্রজগতে 'তারকা প্রথা' অমান্যকারী নতুন পথের দিশারীরূপে অভিনন্দনীয়। খাজা আব্বাস এখানে নায়ক-নায়িকারূপে উপস্থিত করেছেন সম্পূর্ণ নতুন দুটি তরুণ-তরুণী—দিলীপরাজ ও সুরেখাকে; এবং তারা সার্থকভাবেই পরিচালকের কল্পনাকে রূপদান করেছেন। সর্দার জাফরি রচিত গান ও জে পি কৌশিক পরিচালিত সঙ্গীত উপভোগ্য।

● কবি নজরুল জন্মোৎসবে বাঙলার সুবিখ্যাত গায়িকা আঙুরবালা গান করছেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট কমল দাশগুপ্ত, সত্য চৌধুরী, গিরীন চক্রবর্তী।

তবে ত্রুটি বিচার করলে অসঙ্গতি ও আতিশয্য চোখে কম পড়বে না। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের মানের দিক থেকেও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যে মানদণ্ডে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার এযাবৎ 'দাদাঠাকুর' থেকে আরো বহু ছবি পেয়ে এসেছে সে ক্ষেত্রে এই সুস্থ কাহিনীর ছবিটিকে একভাবে চিহ্নিত করা কেন? বরঞ্চ পণ্যরূপী চিত্ররাজ্যে একটি সুস্থ মনের পরিচ্ছন্ন ও ব্যতিক্রমমূলক কাহিনী-চিত্র হিসাবে দর্শনীয়।

কবি নজরুল জন্মোৎসব

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৬৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটীর উদ্যোগে গত ২৪শে ও ২৫শে জুন দু-দিনব্যাপী বিশিষ্ট সুধী ব্যক্তি ও শিল্পীরা উপস্থিত হয়ে নির্বাক কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। নজরুলজীবন ও সাহিত্য বিষয়ে সুধী ব্যক্তিদের আলোচনা যেমন শিক্ষাপ্রদ ছিল, তেমনি পুরাতন ও নতুন শিল্পী সমাবেশ এই উৎসবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিগত যুগের ও নতুন যুগের শিল্পীদের কণ্ঠে নজরুল-সঙ্গীত পরিবেশনে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বহু শ্রোতা শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া ও শ্রীমতী আঙুরবালাকে দর্শন এবং তাঁদের কণ্ঠের গান শোনার জন্য দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। বয়সের ভারে তাঁরা ভারাক্রান্ত হলেও আজো তাঁদের কণ্ঠে বাজে সেই বিজয়িনীর সুর! প্রথম দিনে কমলা ঝরিয়া গাইলেন দুটি নজরুল-সঙ্গীত—'পরদেশী বঁধুয়া ঘুম ভাঙালো চুমিয়া' এবং 'এত জল ও কাজল চোখে'। দ্বিতীয় দিনে অসুস্থ শরীর নিয়েও আঙুরবালা প্রথম গাইলেন—'কে গো আমার সাঁঝ গগনে', তারপরে 'পিয়ালা কেন গো আনিলে ভরি'। শ্রোতারা নাছোড়বান্দা তাই তৃতীয় গান গাইতে হলো—'কে গান গেয়ে যায় দূরে'। গিরীন চক্রবর্তী একটি নজরুলগীতি গাওয়ার পরে পল্লীগীতির সুরে স্বরচিত গানে কবির রোগমুক্তি কামনা করে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কবির স্নেহভাজন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় গাইলেন—'কেমনে রাখি বারি চাপিয়া' ও 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে'।

এ যুগের শিল্পীদের মধ্যে পান্নালাল ভট্টাচার্যের মিষ্টি কণ্ঠে 'মোর প্রিয়া হবে এস রাণী' শ্রোতাদের মনে এক অপূর্ব রোমান্টিকতা জাগিয়ে তোলে। ধীরেন মিত্রের—'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' মনকে উদাসীন করে দেয়। দীপালি নাগ গাইলেন তাঁর মধুর কণ্ঠে 'মালতি মালিকা দোলে'। সুপ্রভা

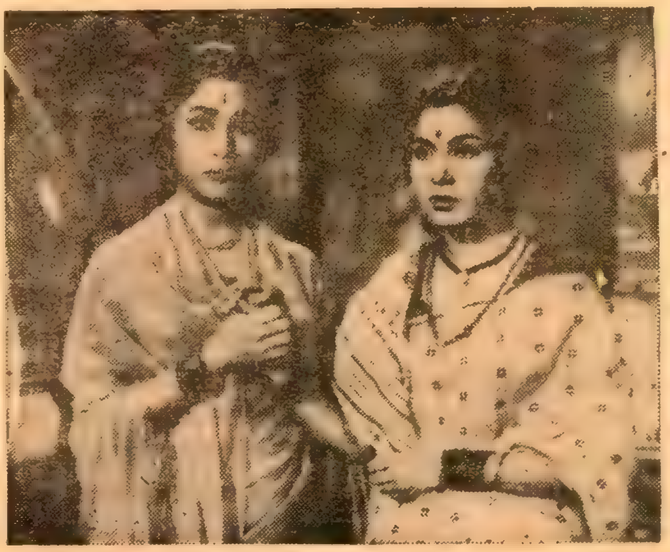

● 'পূজা-কে-ফুল' হিন্দী চিত্রে মালা সিনহা ও নিম্মী

● 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ছবির একটি দৃশ্যে সুমিতা সান্যাল ও বনানী চৌধুরী

সরকার 'সন্ধ্যা মালতি'র সুরে ভরে তুললেন সান্ধ্য আসর। এই সুরের মেলায় সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় একদিকে ভক্তিভাব আর একদিকে বিদ্রোহের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলে গাইলেন 'বলরে জবা বল' এবং 'শিকল পরা ছল'। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রেণু ভৌমিক, অরুণ দত্ত, সত্য চৌধুরী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না কাওয়াল একক গান পরিবেশনে জন্মোৎসবের সঙ্গীত আসরকে সার্থক করে তুললেন।

শ্রীমতী ফিরোজা বেগমের পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে গীত হয়েছে 'জাগো নারী বহ্নিশিখা'। উভয় দিনে তিনি সমবেত সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁর একক স্খলিত কণ্ঠের গীতিবিচিত্রা শ্রোতাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে বিভিন্ন সুরের নজরুল-গীতির সাথে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর-মূর্ছনায় অনুষ্ঠানটি অপূর্ব, উপভোগ্য ও মধুময় হয়ে উঠেছিল।

এককভাবে যন্ত্রসঙ্গীতে কিশোর অভিজিতের গীটার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অনুষ্ঠানের আর একটি উল্লেখযোগ্য সূচী ছিল আবৃত্তি। চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী বনানী চৌধুরীর নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' আবৃত্তি প্রশংসনীয়। সর্বাধিক প্রশংসনীয় আবুল কাসেম রহিমুদ্দিন ও বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম আবৃত্তি 'বিদ্রোহ'। প্রদীপ ঘোষ (মানুষ) এবং শুভ্রা সেন (সব্যসাচী) আবৃত্তি করেছেন। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী পাঠ করেছেন 'আমার সুন্দর'। সমগ্র সঙ্গীত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত। কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগে প্রথম দিন একক কণ্ঠে তিনিও গাইলেন,—'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়', 'কোয়েলিয়া কেন ডাকে' এবং আরো কয়েকটি গান।

সমবেত সঙ্গীতে এবং সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করেছেন অণিমা দাশগুপ্তা, অর্ঘ্য সেন, গীতা পাল, হেনা সেন, বেলা চক্রবর্তী, মায়া মুখার্জী, রতন রায়, মাধুরী রায়, বরুণা রায়, মহম্মদ হানিফ প্রমুখ।

নাটকের কথা

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন

জাতীয় নাট্যকার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্য সংস্থার আহ্বানে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে গত ২০শে জুন প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য আলোচনা করেন। তিনি বলেন —এই সম্মেলন আহ্বানের মূলে যে সত্য আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে, তা হ'ল একদিকে আমাদের অসীম ঐশ্বর্যমণ্ডিত নাট্য ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকার : অপরদিকে

● সুধীর মুখার্জী পরিচালিত 'নতুনতীর্থ' ছবিতে সুলতা চৌধুরী

আজকের পরিবর্তিত যুগ ও সমাজ-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার, ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার দুর্বার তাগিদ।

সম্মেলনের কর্মসূচী প্রসঙ্গে উদ্যোক্তাদের ঘোষণা-পত্রে বলা হয়েছে, নাটকের সামগ্রিক স্বার্থে যে সহযোগিতা ও সুবিধা দানের নীতি গ্রহণ করা উচিৎ ছিল আমাদের জাতীয় সরকার তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আমাদের নাট্যস্রষ্টা, শিল্পী ও কর্মীদের জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজ্যে জাতীয় নাট্যশালার দ্বারোদঘাটন করছেন অথচ তাঁর নিজ রাজ্যে জাতীয় নাট্যশালা আজো অনাথ হয়ে পড়ে রয়েছে। জাতীয় নাট্যশালার পরিচালক গোষ্ঠীতে নাট্যকার ও শিল্পীদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। নাট্যকারের সাহিত্যিক গৌরব আজো অস্বীকৃত। রচনা ও প্রযোজনার উপর বহু প্রকার অগণতান্ত্রিক ও পীড়নমূলক বিধিনিষেধ রয়েছে। সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন এই বিরূপ নীতি ও নিয়মের অবসান ঘটানোর জন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়—সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের ভাব ও চিন্তা, নাট্য প্রযোজনার আবেগ ও চরিত্র; পেশাদার মঞ্চ ও অপেশাদার গোষ্ঠী। এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ নাট্য সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম।

স্টুডিও খবর

প্রভাতের রঙ

অজয় কর পরিচালিত এস এস পিকচার্সের 'প্রভাতের রঙ' ছবিটি আগামী ৩রা জুলাই মুক্তি পাবে। হাসপাতাল ও চিকিৎসকের জীবনের পটভূমিকায় ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর।

সংবাদ বর্ণনা

• সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' মণ্টরীল চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে।

• পাকিস্তানে আমেরিকান ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

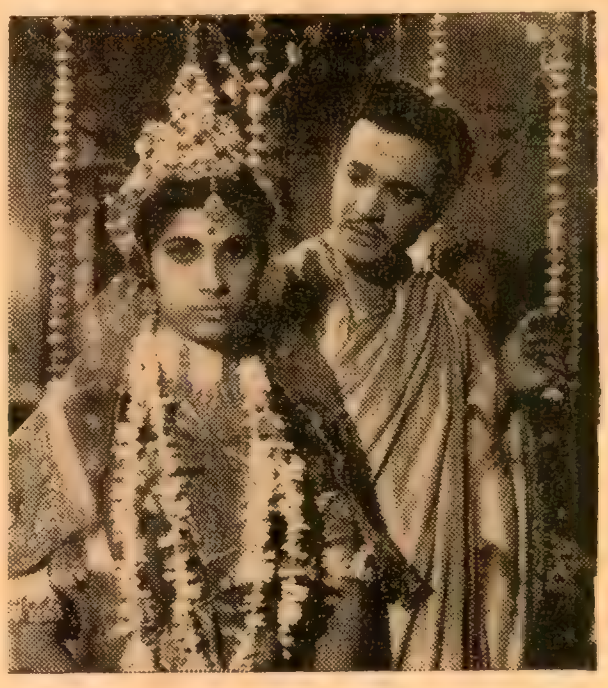

● 'লাল পাথর' চিত্রের একটি দৃশ্যে নবাগতা শ্রাবণী বসু ও উত্তমকুমার

খেলাধুলা

ঘুম তার ভেঙেছে

দেশ-বিদেশের যত ক্রীড়া-সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফার হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল উইম্বলডেনের ৫নং কোর্টের দিকে। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে মুখরিত হ'ল ক্রীড়াঙ্গন। দর্শকরা ব্যাপারটা বোঝবার আগেই সাংবাদিকের দল যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কেউ বলল, ফটোগ্রাফারদের লক্ষ্য এক বৃদ্ধ মহিলা। কেউ মন্তব্য করল, বৃদ্ধা বোধহয় কোন প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান। কেউ বলল, সাউথ আফ্রিকার আবু সেগ্যালের ছবি নিচ্ছে। দর্শকরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত ঘটনার ওপর রং চড়াতে লাগল। ৫নং কোর্টে তখন আবু সেগ্যালের (সাউথ আফ্রিকা) ও ক্লার্ক গ্রেবনারের (ইউ-এস-এ) খেলা সমান তালে চলেছে।

দর্শকরা হেসে লুটিয়ে পড়ল যখন রহস্যটি ফাঁস হয়ে গেল। আবু সেগ্যাল খেলায় জিতলেন। ক্লার্ক গ্রেবনার শেষ পয়েন্টটি হারালেন বলটি বাইরে পাঠিয়ে। খেলোয়াড় দুজন নেটের কাছে ছুটে এলেন করমর্দন করতে। হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'ল, লাইন-বিচারক গ্রেবনারের মারটি আউট ঘোষণা করেন নি। আম্পায়ার ও খেলোয়াড়েরা পেছনে তাকিয়ে দেখলেন লাইন-পরিদর্শক শ্রীমতী ডরোথী ব্রাউন চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। আম্পায়ার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে তিনি একটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে নিজের জিনিষ-পত্র গুছিয়ে গট গট করে এগিয়ে এসে শুধুমাত্র আম্পায়ারের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল ঘুমিয়ে পড়ার জন্য লজ্জা পাবার কিছুই নেই, লজ্জা যদি পেতে হয়, তা খেলোয়াড়দেরই প্রাপ্য, কারণ তাদের প্রাণহীন খেলা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই অশীতিপর বৃদ্ধা ইভা ব্রাউন উইম্বলডেনের সবচেয়ে প্রাচীন লাইন-পরিদর্শক। বিলেতের সব কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর ঘুমন্ত ছবিটি ছাপা হ'ল। ইভা ব্রাউন যেন উইম্বলডেনের প্রতীক। উইম্বলডেন কিন্তু এখন ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলে তাকিয়েছে।

উইম্বলডেনের বাছাই খেলোয়াড়রা একে একে বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্য-বস্তুর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। রয় এমার্সন, চাক ম্যাকিনলে, ম্যানুয়েল সান্তানা, র‍্যাফেল ওসুনা দুর্বল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে পরবর্তী রাউণ্ডে উন্নীত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত উইম্বলডেনের সবচেয়ে বড়

শ্রীঅমিতাভ

বিস্ময় হ'ল ৫নং বাছাই খেলোয়াড় আমেরিকার র‍্যালস্টনের বুচেনের শিকার্ডের হাতে পরাজয়। ভারতের একজন খেলোয়াড় জয়দীপ এখন পর্যন্ত টিকে আছেন। প্রেমজিৎ লাল প্রথম খেলাতেই ম্যানুয়েল সান্তানার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। ভারতের তরুণ খেলোয়াড় মিশ্র জয়দীপের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নিয়েছে।

আবার পরাজয়

অলিম্পিকের অঙ্গনে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রথম আবির্ভাব ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিকে। প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স; নগ্নপদ ভারতীয় খেলোয়াড়রা উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেও সেদিন ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারত ফুটবলে কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে নি। এল ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক, ভারতীয় ফুটবল দলও উপস্থিত হল অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। অলিম্পিকের খেলা শেষ হল, দেখা গেল ভারত আশাতীতভাবে ফুটবলে চতুর্থ স্থান দখল করেছে। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকের পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে ভারত উপনীত হল রোমে। রোমের মাঠে ভারতীয় ফুটবল দলের উচ্চাঙ্গের খেলা বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞকে করেছিল বিস্মিত আর ক্রীড়ামোদীদের করেছিল চমৎকৃত। বিশ্ববিখ্যাত হাঙ্গেরী দলের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও শেষ পর্যন্ত ভারত ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করে। ফ্রান্সের সঙ্গে খেলায় ভারত অগ্রগামী থেকেও শুধু মাত্র গোলরক্ষকের দোষে ভারত বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে পারে নি। শেষ খেলায় ভারত সম্পূর্ণ নিজ দোষে পরাজিত হয়।

১৯৬৪ সালের টৌকিও অলিম্পিক সমুখে। বেশ কিছুদিন আগেই প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত প্রথমে দুর্বল সিংহল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল। পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী লেবানন নাম প্রত্যাহারের পর ভারত ইরাণের সম্মুখীন হল। তেহরানে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় ভারত সরাসরি ৩—০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হল। ফিরতি খেলা কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে শেষ হল। এই খেলার বিরতির বংশীধ্বনি মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে নিভে গেল ভারতীয় ফুটবল দলের টৌকিও যাবার শেষ আশার আলো। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় ফুটবল দল অলিম্পিকের মূল প্রাঙ্গণে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারল না।

প্রাক্-অলিম্পিক ফিরতি খেলায় ভারত শেষ পর্যন্ত ৩—১ গোলে পরাজিত হয়েছে বটে ইরাণের কাছে, কিন্তু তুলনা-মূলকভাবে খেলার মান বিচার করলে বলা যায় যে, ভারত-ইরাণ প্রায় সমান সমান। কলকাতার খেলায় ভারত উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের নজীর রেখেছে, প্রথমার্ধে তাদের আক্রমণধারা যথেষ্ট ক্ষুরধার ছিল, কিন্তু ইরাণের গোলরক্ষক আসলী ছিল দুর্ভেদ্য। শক্ত সমর্থ ইরাণী খেলোয়াড়রা কয়েকটি বিষয়ে ভারতীয়-দের চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বল আদান-

প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল : ভারত ও ইরাণের অধিনায়করা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে করমর্দন করছেন ।

প্রদান ইরাণীদের নিখুঁত এবং দমও তাদের ছিল প্রচুর। ভারতের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী ১৫ মিনিটের সময় দর্শনীয় একটি গোলে ভারতকে অগ্রগামী করে, ইরাণের বেঞ্জহাদী ৪০ মিনিটে প্রথম গোল, দ্বিতীয়ার্ধের ২১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল এবং বারমাকী দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন। খেলার শেষার্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই হয় নি। ইরাণ এবার টোকিওর আসরে কি ফলাফল প্রদর্শন করে দেখা যাক।

বর্ষণসিক্ত লর্ডস টেষ্ট

বর্ষণসিক্ত লর্ডসের দ্বিতীয় টেষ্ট শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পাঁচদিনের খেলায় প্রায় আড়াই দিনই চলেছে বৃষ্টির খেলা। প্রথম দুদিন খেলা একেবারে বন্ধ ছিল। টসে জয়লাভ করে ডেক্সটার তৃতীয় দিন অষ্ট্রেলিয়া দলকে ব্যাট করতে পাঠায়। ডেক্সটারের পরিকল্পনা সফল হয় না, ভিজে পিচে ট্রুম্যান সংহারমূর্তি ধারণ করে পাঁচটি উইকেট দখল করেন; অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংস মাত্র ১৭৬ রানে শেষ হয়। ভাইভার্স ৫৪ রান করে সকলকে অবাক করেন, রেডপাথের ৩০ রান এবং ও-নীলের ২৬ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডও প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে। এডরিচ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে শতরান লাভ করার গৌরব অর্জন করেন, তাঁর ব্যক্তিগত রান ছিল ১২০ এবং তিনি দুটি চিত্তাকর্ষক ওভারবাউণ্ডারী মারেন। অষ্ট্রেলিয়ার কোরলিং বিপক্ষ দলের চারটি উইকেট দখল করেন। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৬৮ রান সংগ্রহ করার পর খেলা শেষ হয়। এই ইনিংসে পিটার বার্জ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। উইকেটের চতুর্দিকে পিটিয়ে খেলে তিনি সংগ্রহ করেন ৫৪ রান। পর পর দুটি টেষ্ট খেলা বর্ষণবিঘ্নিতভাবে শেষ হল। বাকি তিনটি টেষ্টই এবারকার সিরিজের ভাগ্য নির্ধারিত করবে।

কলকাতা ফুটবল

প্রাক-অলিম্পিক খেলা শেষ হবার পর নামী দলের দামী খেলোয়াড়েরা আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে। তাদের আগমনে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল; কিন্তু তাদের খেলা ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করেছে। মোহনবাগানের ড্রয়ের রোগটা কিছুটা সেরেছে মনে হচ্ছে। এরিয়ান ও রাজস্থানের সঙ্গে খেলায় মোহনবাগান পুরো পয়েণ্ট নিয়েই তাঁবুতে ফিরেছে। দলপতি চুণী গোস্বামীর অভাবে মোহনবাগানের আক্রমণভাগকে কেমন যেন ছন্নছাড়া মনে হচ্ছে, রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে আবার দৃঢ়তার অভাব। পর পর দুটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল কোনক্রমে অপরাজিত আখ্যা বজায় রেখেছে। বি এন রেলের ভাগ্য নিতান্তই খারাপ, ভাগ্যদেবীর সামান্য অনুগ্রহ লাভ করলে তারা ইষ্টবেঙ্গলের কাছ থেকে পুরো দুটি পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে পারত। কালীঘাট দল ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় অগ্রগামী থেকেও শেষ সময়ে গোলরক্ষকের সামান্য ভুলের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে। এখন ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের চেয়ে দু'পয়েণ্ট পিছিয়ে আছে। ইষ্টার্ন রেল দল কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। মহামেডান এবার লীগ যুদ্ধের আসর থেকে এখন অনেক পেছনে। ছোট দলগুলির তরুণ খেলোয়াড়দের ক্রীড়াধারা সত্যই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবী রাখে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা

সাপ্তাহিক বসুমতী

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের নাগরিক সম্বর্ধনা

…র্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 9th July, 1964 • Vol. 69, No. 7

বোরোলীন
ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্যে

সূচীপত্র

756·3
·003/3
V.69
no.7

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩৮৭
আজকের মানুষ	...	৩৮৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৩৮৯
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৩৯৩
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৯৫
ভারতদর্শন	...	৩৯৯
উৎকণ্ঠা-কাতর উপত্যকা (কবিতা)	অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৪০৫
রাত্রি শেষ হলে (কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	৪০৫
আন্তর্জাতিক	...	৪০৬
একটি উপন্যাসের খসড়া (গল্প)	ঝর্ণা রায়চৌধুরী	৪১১
শহুর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৪১৪

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, সিরাফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী
মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নবরত্ন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দুই কূল (গল্প)	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৭
অনল আয়তী (উপন্যাস)	সুশীল রায়	৪২২
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৪২৭
বঙ্গদর্শন	...	৪৩১
দুরন্ত দেহলী (কাহিনী-বিচিত্রা)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৪৩৬
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৪৩৮
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৪৪০
পাঠক মন	...	৪৪১
রঙ্গজগৎ	...	৪৪২
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৪৪৭

প্রচ্ছদ পরিচয় : কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হয়। মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় একটি রৌপ্যাধারে কংগ্রেস সভাপতিকে মানপত্র উপহার দিচ্ছেন।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মুল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সপ্তরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৫শে আষাঢ় ১৩৭১ Thursday, 9th July 1964

যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধির পর উদাসীন কর্তৃপক্ষ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে, আমাদের একটা ধারণা হয়েছিল, এবার যাত্রী-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন ও কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী কিছুটা সচেষ্ট হবেন এবং সরকার যখন ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে ঐ দুই কর্তৃপক্ষকে আনুকূল্য দান করেছেন তখন যাত্রীদের 'পড়ি-মরি' অবস্থা দূরীকরণেও প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নির্দেশ জারি করবেন। সরকারের হাতে আর হয়তো সময় নেই, কেন না কলকাতার ঘরে ঘরে উপোসী লোকগুলিকে চাল ও আটা সরবরাহের সুচারু ব্যবস্থা করতে তাঁরা শশব্যস্ত। হাতে যে একটু সময় ছিল, শুধু সেই সময়ে ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির জন্যে সরকার মাত্র কিছুটা সময় ব্যয় করতে পেরেছিলেন।

এদিকে চাল-আটার বাজারে নাজেহাল, তেল-আলুর দোকানে উপর্যুপরি বিপর্যস্ত জনসাধারণ ট্রামে-বাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভাড়া দিয়েও প্রতিদিন যে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করছেন—সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো লক্ষ্য নেই; এমন কি, কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি তারা একেবারেই উদাসীন। উদাসীনতার চিহ্ন বিশেষ কোনো স্থলে নয়, প্রায় সর্বত্রই। অনেক ট্রাম-লাইন শুধু অমার্জিত নয়, যে কোনো সময় গাড়ি লাইনচ্যুত হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, লাইন ভাল থাকে ত' মাথার ওপর বৈদ্যুতিক তার অসহযোগিতা করে, সেও যদি সহযোগিতা করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে Defective car-এর বোর্ড। এ ত' গাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া না, কর্মী মানুষদের রুজি রোজগারের পথটিকে এভাবেই ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত করে তোলা হচ্ছে।

বাঙালীরা নাকি অলসতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু ধরুন, কোনো একটি নিকটবর্তী ট্রাম ডিপো থেকে যদি ডালহৌসীতে পৌঁছতে ঘণ্টাধিক সময় লাগে, তাহলে সাধারণ যাত্রীদের অবস্থা কী হয়। অথবা বেহালার পরিমিতসংখ্যক ট্রামের জন্য মধ্যপথে গাড়ি ধরা যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে, দোষটা কি শুধুমাত্র নিরুপায় যাত্রীর। স্টেটবাসের অবস্থাও তথৈবচ। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো খারাপ। অথচ এই সব ব্যাপারে সরকারও উদাসীন। শুধু পথের মাঝখানে কিংবা পাদানীতে উঠে 'পড়ি-মরি' অবস্থায় জনসাধারণ নগদ বাড়তি পয়সা হাতে নিয়ে ভাবছে এ দুরবস্থার অবসান হবে কবে? যেখানে কোনো কল্যাণময় প্রচেষ্টা নেই অথচ আছে বাগবহুল প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর নির্মম উদাসীনতা সেখানে প্রতিকারের জন্য দুর্ভোগগ্রস্ত জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নেমে আসতে বাধ্য হয়, একথা কারো অজানা নয়!

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আকাশে হরেক তারার মেলা। তবু তারই মধ্যে কোনটা কা চোখ টেনে রাখে বিস্ময়ের আবেশে। এমনই ওদেশের নিউটন, আইনস্টাইন। আমাদের জগদীশ, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ, রমণ, আর রামানুজ। বিজ্ঞান-জগতের এক একটি বিস্ময়। সম্প্রতি এক যুগ্ম তারা মুগ্ধ করেছে আমাদের। লাবণ্যে উজ্জ্বল। প্রতিভায় সমুদ্ভাসিত। হয়েল আর নারলিকার। প্রতীচ্য আর প্রাচ্যের দুই তারা এক হ'য়ে বিশ্বের কৌতূহলী চোখের সামনে জলজল করছে। বুঝলাম আকাশ এক। তাই তারার আলোও অন্ত পেরিয়ে যুগান্তকারী। তবুও গৌরব সে দেশের যে দেশের জল হাওয়া মাটির স্নেহে এক তারা আলোয় আলো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে।

তাই নারলিকারের কথাই আজ বলি। জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার—বিজ্ঞান-জগতের মাত্র ছাব্বিশ বছরের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমাদের দেশ-গৌরব। এ দেশেরই কোলাপুরে তাঁর জন্ম। শিক্ষালাভ করেছেন তাঁর বাবা ভি ভি নারলিকারের কর্মস্থল বারাণসীতে। জয়ন্তবিষ্ণুর প্রথম শিক্ষাগুরু তাঁর পিতা—ভারতের প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদদের অন্যতম—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপক। সেখান থেকে অবসর নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হ'য়ে বাস করছেন রাজস্থানে। মনের পাথেয় জয়ন্ত পেয়েছেন মায়ের কাছে—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী, সংস্কৃত আর ইংরেজী সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগিণী। তাঁর কাছে জয়ন্ত পাঠ নিয়েছেন প্রাচীন প্রাচ্য শাস্ত্রের। 'গীতা' কণ্ঠস্থ করেছেন। প্রাচীন শাস্ত্রের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ক'রে তিনি তাই গণিতের ব্যাখ্যা করেন গীতার শ্লোক উচ্চারণ করে। ছাত্র-জীবনের শুরু থেকেই তিনি যে প্রথম সারির তা বলা বাহুল্য। হাতের কলমের চেয়ে তাঁর মনের কলম আরও দ্রুততর। গণিত তাই তাঁর ছাত্র-জীবনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রই শুধু নয়—চিন্তা-জগতের স্বতঃপ্রণোদিত বিষয়ও। কাগজের চেয়ে জয়ন্ত বেশি অঙ্ক কষেন মনে। অনায়াসেই প্রথম হ'য়ে স্নাতক হ'য়েছেন। এরপর গিয়েছেন সুদূর কেম্ব্রিজে। এখানেই একদিন পড়তেন তাঁর বাবা শ্রীবিষ্ণু বাসুদেব নারলিকার। আর এখন পড়ছেন একমাত্র সহোদর অনন্ত। কেম্ব্রিজের ফিজ উইলিয়ম হাউস থেকে গণিত, পদার্থবিদ্যা আর পরিসংখ্যানবিদ্যার পাঠ নিয়ে গণিতে 'ট্রাইপোস' নেবার পর জয়ন্ত হ'য়েছেন এখানকার গণিত-শিক্ষার ডাইরেক্টর। এ সময়ে তিনি কেম্ব্রিজ থেকে দর্শন-শাস্ত্রেও ডক্টরেট পেয়েছেন। '৬১ সালে ইতালীর বিজ্ঞান-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন কেম্ব্রিজের হ'য়ে। গত বছর কুসংস্কার ও জাতিবৈষম্য বিনাশের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর আহূত সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন জয়ন্তবিষ্ণু।

গত বছর থেকেই ফেলোশিপ নিয়ে আছেন কিংস কলেজে। এর পরই সেই বিখ্যাত উদ্বোধন। য়ুরোপের বিস্ময়কর 'রেনেসাঁ-ম্যান' হয়েল আর ভারতের তরুণ সূর্য জয়ন্ত নারলিকারের আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর গবেষণার নতুন ফলশ্রুতি। মাত্র তিন ছত্রের সূত্র। অথচ আলোড়ন সৃষ্টিতে তা বিশ্বব্যাপ্ত। বৃটেনের রয়্যাল সোসাইটিতে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ বিজ্ঞানীরা অপলক বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে দেখেছেন এঁদের। চমকিত হ'য়েছেন মাত্র ছাব্বিশ বছরের তরুণ নারলিকারের চোখে যুগান্তকারী মনীষার তীক্ষ্ণ গাঢ় দ্যুতি দেখে। নিউটন আইনস্টাইনের সাথে এক নিঃশ্বাসে সেদিন সবাই তাঁদের নাম উচ্চারণ করেছেন আপেক্ষিক তত্ত্বের আলোচনায়। এই থিওরীর এক কপি তাঁর বাবাকেও পাঠিয়েছেন জয়ন্ত। বলেছেন: পৃথিবীতে যে ক'জন এই সূত্র বুঝবেন আমার বাবা তাঁদের অন্যতম। প্রশংসা আর খ্যাতি কিন্তু জয়ন্তর ওই আত্মভোলা আন্তরিক হাসিটুকু কেড়ে নিতে পারে নি। আপেক্ষিক তত্ত্বের থিওরীর মতই বিস্ময়কর জয়ন্ত নিজেই। মদে আসক্তি নেই। ধূমপানে মেজাজ

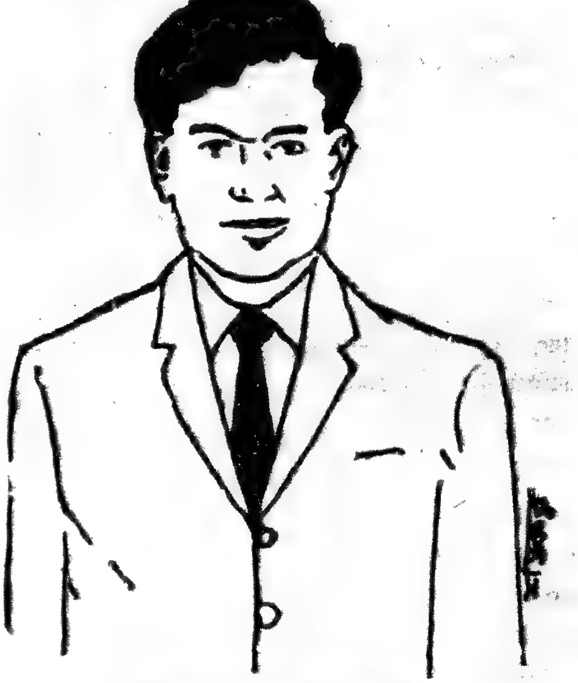

শ্রীজয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার

নেই। উৎসাহ নেই বাইচ খেলায়। শুধু মাঝে মাঝে স্লো, উড-হাউস, কোনানডয়েল কি জ্যাকব পড়ার ঝোঁক। আর তা নইলে —? তা নইলে দিনরাত একমাথা অবিন্যস্ত চুল আর যুগ্মভুরুর নীচে দিগন্তে বিছানো দু'চোখ নিয়ে ওই এক খেলা। —ভাবনার ঘোড়ায় চড়ে হাসতে হাসতে রাশি রাশি কাগজের পাহাড় আর চিন্তার সমুদ্র ডিঙানো। এ খেলাতেই সব ভুলে মগ্ন আছেন তরুণ সাধক। আজ স্বদেশের সবাই তাঁকে প্রাণের আহ্বান জানিয়েছেন বরণমাল্য হাতে। কেম্ব্রিজের দায়িত্ব ফুরোবে '৬৭ সালে। জয়ন্ত বলেছেন—তার পরে ফিরবেন দেশে। সেইদিন, সেইক্ষণ তাই আমরা সাজিয়ে রেখেছি শুভেচ্ছার ফুলে —কবে তিনি দেশে ফিরবেন বিজয়মাল্য নিয়ে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

মধুসূদনের লেখাতে সুখ-দুঃখের ঢেউয়ের চিহ্ন যতো চোখে পড়ে, সত্যের স্বরূপচিন্তা ততো নয়। সুখ-দুঃখের ভাবনা নিয়েই জীবনের পথ ফুরিয়ে যায়। সত্যের স্বরূপ বুঝবে কে? সত্য যে দুর্জ্ঞেয়। সত্য তো অপরূপ।

আমরা অভিজ্ঞতার মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনাতে গিয়ে পৌঁছোই। দিন যায়, রাত্রি যায়। হয়তো মনে মনে বলি—'রাত্রি এসে দাও তুমি দিবসের চোখে,—আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।'

সুখ-দুঃখের বোধ, আর সত্যবোধ, এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী? 'নৈবেদ্যে'র সাতানব্বই নম্বর কবিতা মনে পড়ছে—

নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখ জনমচাগান
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম
ভাঙি তাহা ডুব দিব বিশ্বসিন্ধুনীরে
সহজে বিপুল জল বহি যাবে শিরে।

কিন্তু বিশ্বসিন্ধুর বিপুল জলে ডুবতে পারা কি সহজ কথা? সাধারণ-ভাবে সেটাই কি মানুষের জীবনসত্য?

মানুষ সুখে উচ্ছল হয়, দুঃখে ভেঙে পড়ে। সুখ ক্ষণস্থায়ী। দুঃখই জীবনের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সত্য। সেই সত্য-বোধে প্রবুদ্ধ হয়ে 'নৈবেদ্যে'র একশ' নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
দুখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
এক বিশ্বাসে রহে যেন মন বাঁধিয়া।

অর্থাৎ মানব-জীবনের 'সত্য' বলতে বোঝায় মানুষের অশেষ গতি। মানুষ সুখেও নিঃশেষিত নয়, দুঃখেও নিশ্চিহ্ন হয় না। বিশুদ্ধ কোনো 'সু'-তেও সে আবিষ্ট নয়,—'কু'-তেও সে পরিসমাপ্ত নয়। মানব-জীবন মানে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্বের সিদ্ধান্ত নয়, কোনো তর্কের উপসংহার নয়। রবীন্দ্র-নাথের 'পঞ্চভূতে'র ব্যোম বলেছিলেন—

'তর্ক বল, তত্ত্ব বল, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্র জাতীয় পদার্থ—অমরতা-অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান সার্থকতা। বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতাকে কে সংক্ষেপ করিবে, গতির সারাংশ কে দিতে পারে? ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অনায়াসভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও তবে বোধ হয় তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই—তাহার যতদূর হইবার শেষ হইয়া গেছে। চেষ্টা বল অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাতত দারিদ্র্যের মতো দেখিতে হয় কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি একটা জীবন নির্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রংটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা দুর্বলতাটুকু না রাখিয়া দিলে—তাহাকে একেবারে সাফ করিয়া ছোটো করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচীপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।'

তাই ভাবছিলুম, সুখ ও জীবনের চূড়ান্ত সত্য নয়,—দুঃখও নয়।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে কতো অজস্র লেখার মধ্যে এসব কথা ছড়িয়ে আছে। অনেকে ভেবেছেন, অনেকে লিখেছেন।

শেষ রাত্রে কলকাতার স্তব্ধতার মধ্যে জেগে উঠে, আজ সেই কথাই আর একবার মনে এলো।

এদিকে ভোরের চাঁদ [illegible] মতো লাল হয়ে ম্লান হয়ে গেল। মনে পড়লো শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের লেখা তিরিশের দশকের কবিতায় এই উপমা দেখেছিলুম। শুনলুম মোরগের গম্ভীর ডাক। গায়ে হাওয়া লাগলো,——শেষ রাত্রের প্রকৃতির শান্তি।

মোরগের ডাকে কলকাতায় ভোর হওয়া সত্যিই অসাধারণ ঘটনা। আজ শেষ-রাত্রে তাই বোধ হয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের তুলনা মনে এলো। মন অশান্ত, প্রকৃতি দ্বিধাহীন। 'জীবনের সত্য' কথাটার মানে বোধ হয় আর কিছু নয়,—শুধু চির-অশান্ত এই মনশ্চাঞ্চল্যের স্বীকৃতি, আর সেই সঙ্গে—পরিশেষে গভীর কোনো দ্বিধাহীনতার আশা।

জীবন সম্বন্ধে এসব আশা, অনুমান, ধারণা শুধু আভাসে ধরা দেয়। মনই সুখ-দুঃখের সমুদ্র। সত্যকে পেতে হলে মনেরও গভীরে নামতে হবে। আমাদের জীবনসত্য সেই গভীরেই গ্রাহ্য। সাহিত্য যখন সে-অঞ্চলে পৌঁছোয়, সাহিত্যে তখনই আধ্যাত্মিকতা দেখা দেয়। মধুসূদন দত্ত আমাদের ব্যক্তি-জীবনের সেই গভীর তাড়নাকে

বলে গেছেন 'অদৃষ্ট'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অনন্ত পিপাসা'।

সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা আত্ম-যোগের সাধক। এও রবীন্দ্রনাথের কথা। 'পঞ্চভূতের' সমীর বলেছিলেন—'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ।' বুদ্ধির সঙ্গে প্রতিভার তুলনা উঠেছিল সেই সূত্রেই। সমীরের লেখাতেই দেখা গেছে—'বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়, আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মতো আসে, কাহারও আহ্বানও মানে না, নিষেধও অগ্রাহ্য করে।'

সেই আলোচনার শেষ দিকে ব্যোম বলেছিলেন—'আহরণ করে মন আর সৃজন করে আত্মা।' কথায়-কথায়, সেই আলোচনাতেই সাহিত্যের সাধনার সঙ্গে যোগ-সাধনার সাদৃশ্যের কথা উঠেছিল। ব্যোম বলেছিলেন—

'যোগের সকল তথ্য জানি না, কিন্তু শুনা যায় যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব-রস-দৃশ্য-বর্ণ-ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া পুঞ্জিত করিয়া জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।'

জীবন-সত্য আর সাহিত্যের সত্য, —এই দুটির সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার, তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। মধুসূদনের জীবন-ভাষ্য লিখতে গিয়ে স্বর্গত শশাঙ্ক সেনের মতন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মশাইও মধুসূদনের অদৃষ্টবাদের কথা তুলেছিলেন। মধুসূদনের বিশেষ লক্ষ্যের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

'মধুসূদনের জীবন-ধনুকের দুই কোটি; এক কোটিতে সাহিত্য, অন্য কোটিতে সম্পদ, তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, একসঙ্গে, এক জীবনে, এই দুই কোটিতে তিনি গুণ পরাইবেন; এমন প্রতিজ্ঞা করে অনেকেই; কিন্তু রক্ষা করিতে পারে কয়জনে? মধুসূদনও পারেন নাই।'

মধুসূদনের ইউরোপ-যাত্রার আগেই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির পর্ব শেষ হয়েছিল বলা যেতে পারে। ইউরোপে তিনি ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছিলেন। প্রমথবাবু লিখেছেন—

'এবারে অথের কোটিতে গুণ পরাইবার লগ্ন। তাঁহার দানবীয় শক্তি ধনুখানাকে নত করিয়া ধরিল; বিশাল ধনুক আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং অবশেষে বলের প্রবলতায় সে ধনুক ভাঙ্গিয়া পড়িল—ইহাই মধুসূদনের জীবনের ট্র্যাজেডি।'

সাহিত্যের সত্য যে কী ব্যাপার, তাঁর সে-আলোচনায় এ-বিষয়ে কোনো বিশদ ব্যাখ্যা ছিল না বটে, কিন্তু মধুসূদনের জীবনের এই দুই কোটির কথা বলতে গিয়ে প্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনির মতনই তিনি লিখেছিলেন—

'উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনার পক্ষে মানসিক একটা সংযম আবশ্যক। নৈতিক সংযমের কথা বলিতেছি না। মনোবৃত্তি, দেহবৃত্তি, সাংসারিক প্রবৃত্তি কায়মনোবাক্যে একটি কেন্দ্রে আসিয়া একীভূত হইলে তবেই বড় কাব্য রচনার অনুকূল অবস্থা ঘটে। ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এমন একটি অতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার যে, এমন অষ্টগ্রহের সংযোগ কদাচিৎ ঘটে, এবং ঘটিলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয়জীবন সম্বন্ধেই সত্য।'

এই মানসিক সংযম-অসংযমের কথা থেকেই তিনি গ্যেটের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনার দিকে এগিয়েছিলেন। সাহিত্যের সত্য, আর জীবনের সত্য—এই দুটি প্রসঙ্গে মন গেলেই সে-কথা মনে পড়ে—

'মহাকবি গ্যেটের জীবন দেখা যাক। বৈজ্ঞানিক গ্যেটে ও শিল্পী গ্যেটে; একদিকে তিনি সভাসদ্ ও মন্ত্রী, অন্য দিকে তিনি কবি মহর্ষি; এই দ্বিত্ব তাঁহার কাব্যকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে সৃষ্টির শুভলগ্ন আসিয়াছে, তখন অমর কাব্যের অজস্র বর্ষণ। আবার সেই দ্বিধা; তাঁহার অনেক অসমাপ্ত কাব্যে এই জীবনব্যাপী দ্বিধার চিহ্ন।'

স্রষ্টার সৃষ্টিতে দ্বিধাহীন বিশ্বাসের ভাবটা যে কী, সে-কথা ব্যাখ্যা করতে বসি নি আমি। ব্যাখ্যার দরকার নেই। সূর্যোদয়ের খবর কি ঢাক পিটিয়ে জানাতে হয়? ফুলের খবর কি মৌমাছির অজানা?

মধুসূদনের যেখানে সত্যিকার অনন্যতা, সেখানে তিনিও দ্বিধাহীন। সৃষ্টির কাজ দ্বিধাদোলিত চিত্তের সাধ্য নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, লেখকের প্রেরণার সঙ্গে প্রবল অহংকার থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়,—কিন্তু দ্বিধা নিঃসন্দেহে বাধা।

তাই, গ্যেটের দ্বিধা, মধুসূদনের দ্বিধা—এসব কথা শুনলেই আমার মনে হয়—এ-লক্ষণ তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের বিশেষ লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু তাঁদের লেখক-সত্তার সাক্ষাৎ রচনা-কর্মের মধ্যে বোধ হয়, সত্যিই সে-চিহ্ন ছিল না। সমালোচকরা এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে স্রষ্টা-মনের সম্পর্কটা হয়তো তাড়াতাড়িতে ঠিক নজরের মধ্যে পান নি। মধুসূদন যখন ইউরোপে গেছেন, তখন তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির গভীর প্রেরণা সত্যিই অন্তর্হিত। কিন্তু যখন তিনি মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছেন,

তখন তাঁর প্রেরণার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না।

প্রবল অহংকার যে উগ্র,—এবং সাধারণভাবে তা যে কতকটা অশিষ্টতার চিহ্ন, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি-ব্যাপারে তাও যে মাঝে মাঝে ঘটতে পারে, সেও জানা কথা। যেমন ব্যক্তি-জীবনে, তেমনি জাতিগত জীবনেও কোনো কোনো দেশে, কোনো কোনো পর্বে সে-রকম অহংকার দেখা গেছে।

আজ মনে পড়ছে, স্বর্গত চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা'তে তিনি গত শতাব্দের শেষ দিকের ইংলণ্ডের সেই রকম অবস্থার কথা লিখে গেছেন। অর্থাৎ চারুবাবুর কথায়—'মোটের উপর ইংরেজের তখন একটা খুব হাম-বড়া ভাব। তা হওয়ার কারণও ছিল। তাদের Free Trade (অবাধ বাণিজ্য), তাদের Constitutional monarchy (নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র), তাদের Public school (ইটন, হ্যারো প্রভৃতি), তাদের Varsity (অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিদ্যাপীঠ) জগতের আদর্শ।' সেই ঐশ্বর্যের মধ্যে চারুবাবু রাস্তায় রাস্তায় ইংলণ্ডের কুলি-মজুরের মুখেও এই গান শুনেছিলেন—

We don't want to fight
But by Jingo, if we do
We have got the ships,
We have got the men
We have got the money too.

চারুবাবুর 'পুরানো কথা' প্রথম বেরিয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায়। ১৩৪৩-এ বই হয়ে বেরোয় সে-লেখা। আজ হঠাৎ মধুসূদনের অহংকারের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর সেই বর্ণনায় দেখা উনিশ শতকের শেষ দিকের ইংলণ্ডের কথা মনে এলো।

আজ সে ইংলণ্ডও নেই, বোধ হয়, ইংরেজ জাতির সে-অহংকারও নেই। সে-কালের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান মাত্র সত্তর-পঁচাত্তর বছরের। এরই মধ্যে ইতিহাস যে কতো বদলে গেল। মনে পড়ছে, চারুবাবু লিখে গেছেন—'১৮৯৬ সালে লণ্ডনে আমি মটর গাড়ি দেখি নাই। শুনেছিলাম যে যুবরাজ এড্ওয়ার্ডের একখানা আছে। প্যারিসে অনেকগুলো দেখলাম।'

সাহিত্যের সুখ-দুঃখ, আর জীবনের সত্যবোধের কথা থেকে আজ আমার মন

● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলে এলো এই কালস্রোতের ভাবনায়। সাহিত্যের যে-যে অঞ্চলে এই অনুভূতি নিবিড় হয়ে দেখা দেয়, সে-সব অঞ্চলের কথা ভাবতে গেলেই আমাদের বাংলা-সাহিত্যের ধারায়,—মনে পড়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা।

মধুসূদন আর বিভূতিভূষণ দুজনেই যশোরের সন্তান। দুজনে দুই শতাব্দীর মানুষ। তুলনার কথা এইজন্যেই মনে আসে। এ-ছাড়া তুলনার সত্যিই কোনো কারণ নেই। দুজনের প্রকৃতি এক তো নয়ই, বরং বিপরীত বললে অন্যায় হয় না। মধুসূদনের ওজোগুণ নেই বিভূতিভূষণে, বিভূতিভূষণের মধুরতা নেই মধুসূদনে। মধুসূদন অদৃষ্টের কথা একভাবে বলেছেন, বিভূতিভূষণ অন্য ভাবে। মধুসূদন অহংকারে বিশিষ্ট। বিভূতিভূষণ শান্তরসে অনন্যসাধারণ। না, দুজনের মধ্যে সাদৃশ্যের ভাবনা সত্যিই প্রত্যাশিত নয়।

তবু, কোথায় যেন গভীর একটি মিল থেকে গেছে এঁদের মধ্যে!—এঁদের ভিন্ন কালের ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন মননে। আজ শেষ রাত্রে ভোরের চাঁদ যখন পদ্মমধুর মতো লাল হয়ে ম্লান হয়ে অস্ত গেল, তখন মনে এলো মধুসূদনের একটি চতুর্দশপদী—'ভরসেল্স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান'। তাতে তিনি এই কালস্রোতের কথা লিখে গেছেন।

'কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল?'

প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে নির্ভর ছিল মধুসূদনের। সেই মধুসূদনের কণ্ঠে এ-দার্শনিকতা হঠাৎ কেমন যেন অপ্রত্যাশিত মনে হতে পারে। সময়কে সম্বোধন করে তিনি তাঁর এই চতুর্দশপদীতে বলে গেছেন—

কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবী-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি? তোর হাতে হত!
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সেমত।

মধুসূদন তাঁর সমস্ত অহংকার সত্ত্বেও সময়ের স্রোতে এই নিরন্তর অবসানের ধারা দেখে গেছেন। বিভূতিভূষণ যখন 'পথের পাঁচালী' লিখছিলেন, সেই-সময়ে,—২০-এ নভেম্বর, ১৯২৫ —এক সন্ধ্যায় নিজের লেখক-সত্তাকে সুদূর ভবিষ্যতের পাঠক-সমাজের আসরে বসিয়ে ভেবেছিলেন—

হয়ত পাঁচ শত বছর পরে—যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে—আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাবো। আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জ্বেলে তেল খরচ করে, আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, তবুও দেবো, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি। তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক।'

এতো মধুসূদনের অদৃষ্টবাদ নয়। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অদৃষ্টও নয়। বিভূতিভূষণ ছিলেন এই প্রেরণার মানুষ। তাঁর লেখা বাঁচতেও পারে, না-বাঁচতেও পারে, এ-সংশয়বোধ তিনিও হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু সময়ের অশেষ ধারায় বিশেষ কালের বিশেষ সাহিত্যিক-মনের যে সত্যিই কিছু দেবার আছে, করবার আছে,—তাতে কোনো দ্বিধা ছিল না তাঁর। আর, জীবনানন্দের মতন যদিও মনের গভীরে তিনি কতকটা বিষণ্ণ বোধ করেছেন, তবু তিনি একথাও বলে গেছেন যে—

'এই তো যুগ-যুগের শিক্ষকতা। যুগ-যুগের জনসেবা সে। এক জন্মের suffering সেখানে সার্থক। উত্তরকালের শত শত অনাগত তরুণ মনে যখনই দুঃখ আসবে, তাদের কচি প্রাণে আশা, বল, আনন্দ দেওয়া, জীবনের পথ দেখিয়ে দেওয়া—এক জন্মের জন্য জীবন নয়, দু'দশ বৎসরের সাময়িক উত্তেজনা নয়, যুগ-যুগের জনসেবা। সেদিকে মন রেখে কাজ করতে হবে।'

সুখ-দুঃখ জীবনের সঙ্গী। সুখও তাই, দুঃখও তাই। কিন্তু দুঃখের অন্ধকারে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে দেওয়া যে সাহিত্যিকের কাজ নয়, সে-বিষয়ে তাঁর বিশ্বাসের কথা বিভূতিভূষণ খুবই জোরের সঙ্গে জানিয়ে গেছেন। 'পথের পাঁচালী' রচনার সমকালে তাঁর সেই ২০-এ নভেম্বর ১৯২৫-এর আত্মকথাতেই তিনি বলে গেছেন—

'কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃতে কি করেছেন? বুদ্ধদেব কি করেছেন? স্বয়ং চৈতন্য কি করেছেন? তাঁদের এক জন্মের suffering, ব্যাকুলতা, ধ্যান সব ধন্য হয়েছে—কারণ যুগে যুগে তাঁদের কাহিনী পড়ে লক্ষ লক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন মন আলোর সন্ধান পাচ্ছে। suffering এদিক থেকে মস্ত জিনিস, কেউ যেন সে-কথা না ভোলে। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্যে।'

এই লেখার মাস তিনেক পরে, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, সেই ভাগলপুরে বসেই তিনি লিখেছিলেন—

'হে আনন্দময় যুগে যুগে তোমার মহারহস্যময় জীবনধারা বিজয়বৎ বিমৃত্যু, বিশোক, পথহীন মহাপথ ছেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর, মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত-সহস্র জন্ম-মৃত্যুর মাঝ দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে।'

'নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল, মহাকালের মহাকলরবের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—
অনন্ত নীল ব্যোম-সমুদ্রে এখানে-ওখানে পাটকিল রংয়ের মেঘ দ্বীপের দিকে—'

তাঁর, এই আনন্দ-বন্দনার আঠারো দিন পরে, ২৪-এ ফেব্রুয়ারি তিনি আবার লিখেছিলেন—

'কাল রাত্রে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোদ্দাম অনুভব করলাম—ও রকম অনেক দিন হয় নি। শক্তির, উৎসাহের, কল্পনার, আনন্দের, উদ্দীপনার, সৌন্দর্যের, মাধুর্যের কি বিরাট প্রাণ-মন-মাতানো, পাগল করা, উদ্দাম, বাধা বন্ধহীন গতি-বেগ।—কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো। উদ্দাম উন্মত্ত, বিজর বিমৃত্যু গতির বেগে বার হয়ে পড়ো---'

সাহিত্যিক-মনের এ-প্রেরণাও অদৃষ্টের মতো দুর্নিবার।

অনেকের অনেক নাটকে অদৃষ্ট সর্বনিয়ন্তা মহাকালের ভূমিকা নিয়েছে। গ্রীক নাটকে সেই অদৃষ্টের প্রতাপের খ্যাতি কে না জানেন? সেই উৎস থেকে জগতের অন্যান্য সাহিত্যেও তার বিকিরণ দেখা গেছে। শিলারের Die Braut Von Messina ১৮০৩-এর রচনা। ইডিপাস রেক্স থেকে সে-লেখার উদ্ভব। ১৯৩১-এ ইউজিন ও'নিল লিখেছিলেন 'Mourning Becomes Electra'—ইসকিলাসের কাছে তাঁর ঋণ ছিল। সে সব এক ধরনের অদৃষ্ট-শাসন। বিভূতিভূষণের এই জীবন-গতির ধারণা যেন অন্য এক অদৃষ্টের ধ্যান।

আজ শেষ রাত্রে মধুসূদনের কথা ভাবতে ভাবতে আমি বিভূতিভূষণের সেই ধ্যানে এসে পৌঁছুলুম।

(ক্রমশঃ)

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

"উষাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং
যে অস্যা আচরণেষু, দধ্রিরে সমুদ্রে ণ
শ্রবস্যবঃ ॥"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪৮ সুক্ত ৩ ঋক্।

কোন্ সুদূর পুরাকালে প্রস্কণ্ব ঋষি ঋগ্বেদের এই প্রথম মণ্ডলের যুগান্তকারী শ্লোক রচনা করেছিলেন কে জানে। কে জানে কবে কোন্ কুয়াশাময় অতীতে কোন নির্জন অরণ্যচ্ছায়ায় বসে ঋষিবর শৈব কল্পনা করেছিলেন ধনাভিলাষী বণিকেরা দুস্তর সমুদ্রের বিশাল জলরাশি পার হয়ে দূরদেশে চলেছে বাণিজ্য করতে।

প্রস্কণ্ব ঋষি, ঋষিবর শৈব আজ বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের রচনার ভেতরে আজও স্মরণাতীতকালের সেই হিন্দু বণিকের, বাঙালী বণিকের সার্থক বাণিজ্যের জয়গান দিকে দিকে মখরিত হচ্ছে।

শুধু প্রস্কণ্ব নয়, মহাজ্ঞানী শৈব নয়, মহামুনি বশিষ্ঠদেবও সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন—সামবেদ একথাও বলে। দূর অজানা দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন সেই সুপ্রাচীনকালের সওদাগর তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুও।

সামবেদ সংহিতার পাতায় পাতায় যেন হাজার হাজার বছর আগেকার সুখী, সম্পন্ন আর বাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারতবর্ষের ছবি ফুটে ওঠে :

বিক্রেতা বলছে, হে অদ্রিব, বহুমূল্য পাইলেও এই বস্তু আপনাকে বিক্রয় করিতে পারিব না। অধিক কি সহস্র বা অযুত শুল্কেও বিক্রয় করিতে পারিব না—

ক্রেতা। কেন? হেতু কি? জানিতে পারি কি?

বিক্রেতা। অনেক ক্লেশে উত্তাল সমুদ্র ডিঙিয়ে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলাম। সমুদ্রবক্ষে তরী ভগ্ন হলো। ভেসে ভেসে উঠলাম এক অজানা দ্বীপে। সেই দ্বীপের এক নির্জন গিরিগুহায় পেয়েছি এই অমূল্য মাণিক্য।

অতি আধুনিক কোন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্যারিফের বই নয়। ঋগ্বেদ, সামবেদের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে শুল্কের কথা, শুল্কের বিভিন্ন রেটের কথা, ক্রয়বিক্রয়ের কথা ইত্যাদি বাণিজ্য বিষয়ক আরও নানা কথা।

কোথা থেকে আসে এই সুপ্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, কোথা থেকে আসে দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবাণের সেই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের কথা।

কল্পনা করে গল্প-উপন্যাস হয়তো লেখা যায়। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় হাজার হাজার বছরের পুরানো সেই মহারত্ন সত্যিই যখন সমগ্র বিশ্বচরাচরে আদিম ার অন্ধকা অনড় হয়েছিল, যখন এই ভূমণ্ডলের অনেক দেশের মানুষ পশুবৃত্তির পর্যায় কাটিয়ে মহাগ্র বেদ এতটুকু মিথ্যার বেসাতি নেই। উঠতে পারে নি, যখন মানুষের মনে দু'টি মাত্র কামনা জঠর ও দেহ উগ্র ক্ষুধায় অগ্নিগোলকের মত জ্বলতো; সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালেই বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে, বাণিজ্যে আর সম্পদে উন্নত ছিল এই দেশ। হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর মনীষা, তার ব্যবসা-বাণিজ্য যজ্ঞাগ্নির মত সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছিল। তাই স্বভাবতই ঋগ্বেদে আর সামবেদে এবং আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে আমাদের সুদূরকালের বাণিজ্যপটুতার ইতিবৃত্ত।

বেদ, ঋগ্বেদ, সামবেদ নয়, কবিকঙ্কণচণ্ডীতে এই বাংলার বিখ্যাত সওদাগর ধনপতি আর শ্রীমন্তের তরঙ্গসঙ্কুল ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সিংহল যাত্রার সেই বিচিত্র রোমাঞ্চকর ইতিকথা।

ভারত মহাসাগর অনেক দূ"। অত দূরে নয়। খুব কাছে। কলকাতার খুব কাছে রাণাঘাট। রাণাঘাট থেকে লালগোলা লাইনে যেতে ক্ষুদ্র একটি

স্টেশন বীরনগর। এই বীরনগরের আর এক নাম উলা। লোকে কথায় বলে উলা বা বীরনগর। অতি সুপ্রাচীনকালের সমৃদ্ধ জনপদ বীরনগর। আজও বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি আর রাজামহারাজা জমিদারের ধ্বংসজীর্ণ অনেক প্রাসাদ, নাটশালা, চণ্ডীমণ্ডপের কঙ্কাল বুকসমান উঁচু জঙ্গলের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

প্রায় দুই শত বছর আগে লেখা গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে আছে সেকালের ধনে-জনে উজ্জ্বল (বাঙালীর) বাণিজ্য-কেন্দ্র উলার বিবরণ, আছে আমাদের দেশের মানুষের জীবনসরণী, জননী জাহ্নবীর গতিপথের কথা—

"অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্বধারে
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া
উল্লাসে উলার গতি, বটমূলে ভগবতী
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।।"

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কবির চোখে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাণিজ্যসমৃদ্ধ উলার ছবি ফুটে উঠেছে। গঙ্গা উল্লাসে প্রবাহিত হয়ে চলেছেন সম্পদ পরিপূর্ণ উলার দিকে। সুখকর স্থানেই চলার গতিতে আসে উল্লাস আর চণ্ডিকা?

উলার বটমূলে কোন্ চণ্ডীকে দেখেছিলেন কবি! মূক ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে। কোন্ সুদূর অতীতে ধনপতি সওদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত বাণিজ্যতরীর বহর ভাসিয়েছিলেন গঙ্গার বুকে। কবিকঙ্কণচণ্ডী বলে: শ্রীমন্তের বাণিজ্যতরী গিয়েছিল গোলনপুর, নবদ্বীপ, পাড়পুর, মৃজাপুর, অম্বুয়া (অম্বিকা কালনা), শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, ফুলিয়া হয়ে ত্রিবেণীতে। ত্রিবেণীতে কয়েকদিন বিশ্রাম করে আরও দূর দক্ষিণাপথে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

পিতা ধনপতি সওদাগর সিংহলে কারারুদ্ধ হয়েছেন। ধনপতি বাঙালী সওদাগর। বাণিজ্য করে বিপুল অর্থ, মণিমাণিক্য নিয়ে স্বদেশে আসছিলেন। শালবাহন—সিংহলের রাজা শালবাহনের মনে আশঙ্কার কালো মেঘ দেখা দিল। স্বদেশের এই প্রভূত অর্থ সমুদ্র পারের বিদেশে নিয়ে চলে যাবে! তাকে বন্দী করলেন শালবাহন।

শ্রীমন্তের মনে আলোড়ন চলছে। অজানা দেশ। বিপদসঙ্কুল সমুদ্র-যাত্রা। মনের দুর্যোগই যেন আকাশ থেকে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। জীবনদায়িনী গঙ্গা ফুলে উঠল, কেঁপে উঠল অজগরের মত। শোঁ শোঁ ঝড়ের গর্জনে বড় বড় ঢেউয়ের প্রচণ্ড শব্দে আর মেঘের গুমগুম ডাকে পৃথিবীটা যেন সেই সৃষ্টির অন্ধকার আদিম যুগে ফিরে গেল। চারিদিক অন্ধকার। নীরন্ধ্র অন্ধকার।

শঙ্কাকুল, বিপন্ন আর বিনিদ্র শ্রীমন্তের চোখের সামনে অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ময় মূর্তি ফুটে উঠল।

—কে?

—আমি জগত্তারিণী, দুর্গতি-নাশিনী চণ্ডী—তুমি আমাকে এই উলার বটবৃক্ষের নীচে প্রতিষ্ঠা কর। তোমার বিপদ হবে না।

সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিশিখা ঘন অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল। প্রমাদ গুণলেন শ্রীমন্ত। এই দুর্যোগ ঝড় জল। কেমন করে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবেন। কোথায় পুরোহিত—কোথায় দেবীমূর্তি? কি তিথি—কি ক্ষণ?

মনে পড়ল ঝড় আসার আগে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জ্বল জ্বল করছিল। গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। আজ তাহলে বৈশাখী পূর্ণিমা। উত্তম তিথি।

দেবীমূর্তি নেই। তাতে কি? নোঙরের প্রস্তরখণ্ড তো আছে। গঙ্গাতীরবর্তী অশ্বত্থবৃক্ষমূলে শিলা-রূপী চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। দেবী প্রসন্না হলেন। ঝড়-জল থেকে রক্ষা পেলেন সওদাগর শ্রীমন্ত।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে আছে শ্রীমন্ত প্রতিষ্ঠিত এই চণ্ডীরই কথা—'বটমূলে ভগবতী চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া' - - - - আজও প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে চণ্ডীতলায় মেলা বসে। নারী শিশু বৃদ্ধের কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে নির্জন নিস্তব্ধ সেই সুপ্রাচীনকালের অশ্বত্থ-তলা। তাদের কথায় কথায় হয়তো মা চণ্ডীর প্রতিষ্ঠার কথা উঠে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীপূর্বের সেই ঘোর দুর্যোগময় রাত্রির স্মৃতির ভেতরে ফুটে ওঠে ধর্মপরায়ণ, উদারচেতা সেই বণিকপুত্র শ্রীমন্ত।

হয়তো ভাবছেন কিংবদন্তী। প্রবাদ। এই উপাখ্যানের মূলে সত্য কোথায়? কিংবদন্তী হলেই তা মিথ্যা হয় না। অনেক পুরানো ঘটনা, অনেক পুরানো ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখে কিংবদন্তী।

আজ যেটা ঘটনা, কাল সেটা অতীত হয়ে যায়। অতীতের ভেতরে কালের প্রলেপ পড়ে পড়ে প্রবাদ হয়ে বেঁচে থাকে সত্যটুকু।

একদা বাঙালীর বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র তাম্রলিপ্তের কথা আছে মহাভারতে, আছে পুরাণে। কিন্তু তাম্রলিপ্ত তো আর প্রবাদ নয়! তার পোড়ামাটির মন্দিরে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা আছে অতীত বাঙালীর ঐতিহ্যের ইতিহাস।

আজ বাঙালী বাণিজ্যবিমুখ। তারা কেরাণী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কোন রকমে একটা দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি জুটিয়ে রেস্টুরেন্টে বসে আমেরিকার বণিক রকফেলার মর্গ্যানের আশ্চর্য কীর্তি নিয়ে আলোচনা করে। তারা জানে না কোথায় মহাস্থান, কোথায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কোথায় তাম্রলিপ্ত, কোথায় বরেন্দ্রভূমি। তারা জানে না বরেন্দ্রভূমির গৌড়-নগরীর বাঙালীরা কী অসাধারণ বাণিজ্যপটু ছিলেন—তারা জানে না, তাম্রলিপ্তের বাঙালী বণিক কেমন করে সমুদ্রযানে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে চীন দেশে গিয়েছিলেন।

আজ আমরা বাণিজ্যের দিক থেকে পরাজিত, বিধ্বস্ত। তাই প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন অতীত পূর্বসূরীদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ছবিটিকে স্মরণ করার। বারান্তরে তাম্রলিপ্তের কথা বলবো। (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ বার ॥

রাজেনবাবু চমকে উঠলেন, আরে, আপনি !

—কেন, এত অবাক্ হওয়ার কী হল ?—কিরণ চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল : ফিরে এলুম।

—বললেন, একমাস দেড়মাস থাকবেন, শরীরটা ভালো করে ফিরবেন, কিন্তু পনেরো দিন না যেতেই ?

রাজেনবাবুর টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে নিলে কিরণ : ভালো লাগল না।

—কিন্তু পরশুও তো আপনার চিঠি পেয়েছি। তাতে ফিরে আসার তো কোনো কথা ছিল না।

—মত বদলায়। সেটা পাঁচ মিনিটেই বদলাতে পারে।

রাজেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন কিরণের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সত্যিই চেঞ্জে আপনার কোনো কাজ হয় নি দেখছি। যেন আরো শুকিয়ে গেছেন। চাকরটা কি যত্ন আত্তি করে নি ?

—মিথ্যেই আপনার শঙ্কুর নামে অপবাদ দেবেন না মশাই। সে বেচারা প্রাণপণে যত্ন করেছে, সঙ্গে গিন্নী থাকলেও তার বেশি করতে পারত না। বরঞ্চ, পারেন তো আপনার ওই ভৃত্যটির কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবেন আমি বেশ ছিলুম ওখানে।

—বেশ ছিলেন তো শুকিয়ে গেলেন কেন ?—হঠাৎ রাজেনবাবুর মনে পড়ে গেল : ভালো কথা, কী একটা অ্যাক্সিডেণ্টের কথা যেন লিখে-ছিলেন। কী হয়েছিল মশাই, বলুন তো ?

কিরণ হাসতে চেষ্টা করল : ছেলে-বেলায় পড়েছিলুম—

'ঘোড়ায় চড়িল,
আছাড় খাইল।'

অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়লেই আছাড় খেতে হয়। পাহাড় সম্পর্কেও ওটা লেখা উচিত ছিল। ও ছেড়ে দিন। দু' দিন গায়ের ব্যথা, তারপরেই অল ও-কে।

—এখন ও-কে ?

—একদম।

—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার ভালো লাগছে না।

—কিছু ভাববেন না মশাই, কিছু ভাববেন না। এখনো অনেক বাজে বই আমি লিখব, আপনি সেগুলো প্রকাশ করবেন এবং অনুতাপ করবেন।

—সে অনুতাপ আমি পরমানন্দে করব। কিন্তু আপনি মশাই ডাক্তার দেখান।

—আরে বললুম তো, চমৎকার আছি। গায়ে বোধ হয় কিছু এক্সট্রা ফ্যাট্ হয়েছিল, আপনার সেই খোলা হাওয়ায় মাঠে মাঠে ঘুরে সেটা ঝরিয়ে দিয়ে এসেছি।

একটি অল্পবয়েসী ছোট-খাটো চেহারার মেয়ে দোকানে ঢুকল।

—কাকা, ব্র্যাডলির সেই বইটা আনিয়েছ আমার জন্যে ? সেই অক্সফোর্ড লেকচার্স অন্ পোয়েট্রি ?

—এই যা, ভুলে গেছি—রাজেনবাবু জিভ কাটলেন : আচ্ছা, আজই আনিয়ে রাখব ম্যাকমিলান থেকে।

মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিল, রাজেনবাবু

ডাকলেন : ঐ মিনু—শোন্‌-শোন্‌—। কালকেও কি বাবুর কথা বলছিলি না ? —রাজেনবাবুর স্বরে আত্মপ্রসাদ ফুটে বেরুল : তোর সামনেই বসে রয়েছেন। ইনিই কিরণ বসু। আর এ হল আমার ভাইঝি—মিনু, পুরো নাম মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

মিনু লজ্জিতভাবে কিরণের পায়ের ধুলো নিতে এল।

কিরণ বললে, আরে—আরে—আমি কায়েতের ছেলে—শেষে বামুনের প্রণাম নিয়ে নরকে যাব ?

রাজেনবাবু বললেন, বেশি বকবেন না।

—এই করেই আপনারা হিন্দুধর্মকে ডোবালেন।

রাজেনবাবু হাসলেন : হিন্দুধর্ম হচ্ছে সাবমেরিনের মতো, চিরদিন ডুবছে এবং ভাসছে—দরকার হলে টর্পেডো ছুড়তেও ত্রুটি করছে না। ওর জন্যে মাথা ঘামাবেন না। শুনুন, এই মেয়েটি আপনার খুব ভক্ত—আপনার বই যত পড়ে, ভক্তি করে আপনাকে তার চাইতেও বেশি। কি রে, ব্যাগে অটোগ্রাফের খাতা-টাতা নেই ?

মেয়েটি হাসল : জানতুম না তো ওঁর সঙ্গে দেখা হবে। তা হলে সঙ্গে করে নিয়ে আসতুম।

কিরণ বললে, একে তো আগে দেখি নি।

—এখানে তো থাকে না, রাঁচীতে। ওখানে যে হেভি-মেশিনারীর প্ল্যাণ্ট বসছে, ওর বাবা সেখানে এঞ্জিনীয়ার। ওখানকার কলেজেই পড়ে, ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছে।

রাঁচী ! জোর করে ভুলে থাকার সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে এসে দাঁড়ালেন শর্মিলা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে এই ঘরটা মিলিয়ে গেল, নৈঃশব্দে বিলীন হল সামনের পথ দিয়ে অফুরন্ত ট্র্যাফিকের সমস্ত কলরোল, এই কলকাতা অদৃশ্য হল। একটা বিরাট ফ্রেমের ভেতরে রঙিন ছবির মতো দেখা দিল একটি কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ হাওয়ায় পাপড়ি ঝরছে, হরিয়ালের ডাক উঠছে, লাল মাটির সেই ছোট টিবিটায় বসে নীল খাতার পাতায় কিছু একটা লিখতে চাইছে সে—ডগলাস খাতাটা নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর হঠাৎ উচ্ছলিত খানিকটা কলধ্বনির সঙ্গে—

সেই প্রথম দেখা। সেই অপূর্ব শুভ্রতার মূর্তি। বিকেলের রোদে শাড়ির জরিপাড় জ্বলছে।

একটু চুপ করে থেকে কিরণ বললে, কোন্‌ কলেজে পড়ছ ?

মিনু কলেজের নাম বললে। এখানেই শর্মিলা পড়ান।

—শর্মিলা রায়চৌধুরী আছেন না তোমাদের কলেজে ? প্রফেসার ?

—শর্মিলাদি ? আমাদের তো পড়ান না—সায়েন্স ডিপার্টমেণ্টে আছেন।

রাজেনবাবু বললেন, আপনার চেনা ?

কিরণ ক্লান্তভাবে হাসল : আপনিও চেনেন বোধ হয়। ওখানকার ডাক্তার রায়চৌধুরীর ভ্রাতৃবধূ। এবার গিয়ে পরিচয় হল।

—ওহো, নাউ আই রিমেম্বার !—রাজেনবাবু বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, জানি। সেই যাঁর স্বামী ক্যারিবিতে একটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন ? ভেরি স্যাড্‌ লাইক ন্যাইস মেয়েটির, ভেরি আন্‌ফর্চুনেট্‌।

কিরণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

—আজ চলি, রাজেনবাবু।

—আরে বসুন বসুন, চা-টা আনাই—

—না, আজ আর বসব না। বিকেলের গাড়িতেই একবার দেশে যেতে হবে, জরুরি কাজ আছে। চললুম।

শর্মিলার সম্পর্কে আলোচনা আরো খানিকটা উঠে পড়বার আগেই কিরণ নেমে পড়ল রাস্তায়।

মেসের সেই ঘর। পুরোনো চুনবালির স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। এখানে ওখানে প্লাস্টার খসে-পড়া নীলচে রং-ধরা নীচু ছাত মাথার ওপর। দেওয়ালে তার পূর্বতন অধিবাসী মাঝে মাঝে ছারপোকা মারতেন—কালো রক্তের কতগুলো লম্বা লম্বা রেখা টানা রয়েছে এখানে ওখানে, কোনো-কোনোটার সীমান্তে এখনো ছারপোকার দেহাবশেষ। বন্ধ ঘরেও এ ক'দিনের মধ্যে বেশ ধুলো জমেছে, টেবিলের ওপর পেতলের বড়ো অ্যাশট্রেটার ভেতরে স্তূপাকার বিড়ি-গুলো যাওয়ার আগে আর পরিষ্কার করা হয় নি।

ঘরের জানলাটা খুলে দিল কিরণ, এক ঝলক রোদ এসে পড়ল। বাতাসের ঢেউ এল ঘরে, সোঁদা গন্ধটা মিলিয়ে যেতে লাগল একটু একটু। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার ওপর কনুই রেখে চুপ করে বসে রইল তারপর। সামনের উঁচু গাছের মাথায় লাল রঙের একটা ঘুড়ি আটকে রয়েছে, অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল সেইদিকেই।

কলকাতা। আর ঘর। এখানে ঋতু নেই, প্রকৃতি নেই, আলো-মেঘ-হাওয়া-পাহাড়-পাখির কোনো কূজন নেই ; শুধু সামনের গাছটা মাঝে মাঝে বেশ বদলায়, সেটা কখনো চোখে পড়ে, প্রায়ই পড়ে না।

এখানে বাইরের জীবনের একটি মাত্র রঙ—মধ্যে মধ্যে কালোর ছোপ দেওয়া এক নিরবচ্ছিন্ন ধূসরতা। সেই ধূসরতায় ক্ষুধা, ক্লান্তি, বাঁচবার চেষ্টা, ব্যবসাদারী, কামনা, অবক্ষয়, জোর করে জোড়া লাগানো কতকগুলো স্বপ্ন, কিছু মানুষের অনেক বেশি সুখের বিকার, আর ক্লান্তি। ঘুরে ফিরে ওই একটা জায়গায় পেঁছানো—ক্লান্তি। অন্তত মধ্যবিত্ত মন ওইখানে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

তারই ভেতরে বুদ্ধির দ্বীপ তৈরি করি। চা-কফির পেয়ালায়, কিছু

খাপিত-নিষ্ঠুর বিদেশী বইয়ের পাতায়, কিছু উত্তেজিত তর্কে, কখনো কখনো বেপরোয়া লেখায়। তখন নিজেকেই নানান দিক থেকে দেখা, যেমন করে বিচিত্র বর্ণে রাঙিয়ে রাখা হয় মাইক্রোসকোপের স্লাইড, তেমনিভাবে নিজেকে খুঁজে বেড়ানো। সব গল্পের কেন্দ্রেই আমি—আমিই শিকারী, আমিই শিকার আমারই সেই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে জীবন ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, মানুষের ইতিহাস ঘুরছে। এই ঘরে—এই ধূসরতার পটভূমিতে মাকড়সার মতো এমনিভাবে জাল বুনে চলাই আমার কাজ

কিন্তু এই পনেরোটা দিন—না আরো বেশি? ঠিক হিসেব নেই, এই সময়টুকুর ভেতরে নিজেকে নতুনভাবে দেখতে পাওয়া গেল। আমার বৃত্তে প্রদক্ষিণ নয়—বাইরের অনেকখানি ঝড়ের ঝড় আমাকে ছড়িয়ে দিল, আমাকে ব্যাপ্ত করল; তখন দেখতে পেলম, আমিই সর্বময় নয়—আমাকে হারিয়ে দিতে পারে—তলিয়ে নিতে পারে এমন শক্তিও আছে। কঙ্কচূড়ার বড় থেকে সে তার শাবক সন্ধান করে, দূরের শুভ্র পাহাড় থেকে তার গম্ভীর আহ্বান আসে, অনেক দূরের মাদলের শব্দে সন্ধ্যার নদীর জল যেখানে চলকে-ঝলকে উঠছে সেখান থেকে তার সম্মোহন ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করে না হলে—না হলে—

না হলে শর্মিলা এমন কেউ নন। চেনা-আধচেনার ভেতরে, কলকাতার পথে-ঘাটে ওর চাইতে অনেক সুন্দর মুখ চোখে পড়ে; শর্মিলার চাইতে অনেক বেশি দুর্ভাগ্য বইতে হয় এমন মেয়েরও অভাব নেই; বুদ্ধিতে বিদ্যায় উজ্জ্বল মেয়েদের চোখে পড়ে ট্রামে বাসে, ইউনিভার্সিটির সামনে, বন্ধুর ড্রয়িং-রুমে, আলোচনার বৈঠকে। শর্মিলা অসাধারণ নন।

এ শুধু সেই শক্তি—যা আমাকে বিকেন্দ্রিত করে, ছড়িয়ে দেয়, হারিয়ে দেয়। তাই আজো প্রকৃতির পক্ষে মানুষের রক্ষা হল না।

"La nature il brutto—
poter che, ascoso, a commun
danno impera—'

কিন্তু তাই কি?

ছেলেবেলায় রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়ে সেই যে আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম, সেই আকের ক্ষেত পার হয়ে, একটা গড়খাইয়ের চারদিকে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে—

—কখন এলেন মশাই?

চিন্তাটা কেটে গেল। পাশের ঘরের ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

—এসেছি সকালে। বাক্স-বিছানা রেখেই বেরিয়ে গিয়েছিলুম একটু কাজে।

—ওঃ, এই ক'দিনে কত লোক যে এসে আপনাকে খুঁজে গেল মশাই। সভা-সমিতি, পত্রিকা, পাবলিশার। কোথায় গেছেন, কবে আসবেন—এ-সব কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমাদেরই প্রাণান্ত। কী করে যে আপনারা এগুলো সহ্য করেন তাই ভাবি।

কিরণ হাসল।

ভদ্রলোক বললেন, এবার কিন্তু আমার উপন্যাসটা পড়ে দেখতেই হবে আপনাকে। আমরা নবীন লেখক (কিরণ আড়চোখে ভদ্রলোকের চকচকে টাকটা একবার লক্ষ্য করে দেখল)—আপনাদের মতো প্রতিষ্ঠিতেরা যদি একটু ব্যাক না করেন—দাঁড়াব কোথায়। বেশ নতুন জিনিস আছে মশাই—সি-পির আদিবাসীদের কী বলে—ইয়ে লাইফও বেশ একটু দিয়েছি—লোকে আজকাল ও-সব বেশ রেলিশ করে।

—তা হলে কোনো পত্রিকাতে নিয়ে যান না?

—এ এক আচ্ছা প্যাঁচ মশাই পত্রিকাগুলো বলে, বই-টই ছাপুন, একটু নাম হোক, তখন দেখব আমরা। আর পাবলিশার বলে, আগে কাগজে লেখা ছেপে গুড উইল তৈরী করুন, তবে তো বই বিক্রী হবে। কোথায় যাই বলুন তো?

কিরণ সম্পাদকও নয়, প্রকাশকও নয়। নিরুপায়ভাবে চুপ করে রইল।

—দেখবেন তো পড়ে?

—দেখব।

—যদি ভালো লাগে ছাপবারও কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে, দাদা।

যত নামী লেখকই হোন, এ কাজটা তাঁর পক্ষে কত অসম্ভব তা এই সব সাহিত্য যশঃপ্রার্থীকে কোনোদিন বোঝানো যাবে না, কিরণ বললে, চেষ্টা করে দেখব।

—চেষ্টা আবার কী? আপনি একবার মুখ ফুটে বলে দিলেই হয়।

—না। তা হয় না।—কিরণ উঠে পড়ল: কিছু মনে করবেন না ভবেশবাবু, আমি এবার চান করতে যাব।

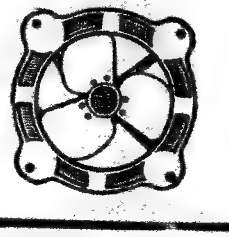
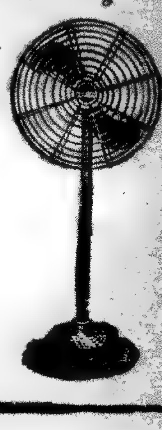

কাল সারাটা রাত ট্রেনে আদৌ ঘুম হয় নি। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে আমাকে আবার বিকেলের গাড়িতে একবার দেশে যেতে হবে।

—উপন্যাসটা সঙ্গে দিয়ে দেব কি? এখানে তো সময় পান না, পথে পড়ে নিতেন?

—এসেই পড়ব।

—আচ্ছা, তাই হবে—ক্ষুণ্ণ আর নন্দিধ হয়ে ভবেনবাবু চলে গেলেন।

গ্রামের বাড়িতে পৌঁছল রাত আটটায়। দাদা বাইরের ঘরের তক্তপোষে বসে প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন।

—কী ব্যাপার দাদা, এত জরুরী তলব কেন? কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?

প্রৌঢ় আশ্চর্য হয়ে দাদার দিকে চাইলেন: কার অসুখ হে হিরণ্ময়? কিছু শুনি নি তো।

দাদা যেন কেমন বিব্রত আর অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। বললেন, না—না, সে-সব কিছু নয়, আমি অন্য ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলুম। তুই কলকাতার বাইরে চেঞ্জে গেছিস, সেও তো তোর চিঠি পেয়ে জানলুম। তার আগে ওটা লেখা হয়ে গিয়েছিল, রি-ডাইরেক্টেড হয়ে—

তীব্র বিরক্তিতে কিরণের সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। কোনো দরকার ছিল না, শুধু খেয়ালের মাথায় একটা চিঠি ছেড়ে দেওয়া হল। কী ব্যাপার?

মা—অনেকদিন দেখি নি—তাই! দাদার চিরদিন একভাবেই কাটল, কোনোদিন সে আর সাবালক হল না।

হিরণ্ময় বললেন, আছে বইকি, কথা কিছু নিশ্চয় আছে। তা পরে হবে সে-সব, তুই ভেতরে যা।

বৌদি রান্নাঘরে। ছেলেমেয়েরা বারান্দায় মাদুর পেতে পড়ছিল। তারাই সমস্বরে ঘোষণা করল: মা, কাকা এসেছে।

বৌদির জবাব এল: আমি আসছি।

কিন্তু বৌদিকে আসবার সুযোগ দিলে না কিরণ। তার আগেই দুম-দুম করে হাজির হল রান্নাঘরে।

—এসবের মানে কী, বৌদি?

—কিসের মানে?

—চিঠিটা দাদার বটে, কিন্তু ইনস্পিরেশন নিশ্চয় তোমার। খামোকা কেন এভাবে আমাকে ডেকে পাঠালে?

—ওঃ, সব দোষ বুঝি এখন আমার ওপর গিয়েই পড়ল?—বৌদির চোখ কৌতুকে জলজল করতে লাগল: ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বুঝি আমিই? আচ্ছা, তাই সই, আমিই চিঠি লিখিয়েছি।

শক্ত হয়ে কিরণ বললে, কেন লেখালে? অকারণে—এইভাবে—মানুষের কাজকর্ম থাকে—

—রেখে দাও তোমার কাজকর্ম! —বৌদি ডালের কড়া নামিয়ে ফেলে বললেন, না হয় বড়ো লেখক হয়েইছ ঠাকুরপো, তাই বলে আমরাও কি তোমায় সভাপতি করে মালা-চন্দন পরিয়ে ডেকে আনব নাকি? বেশ করেছি—ডেকেছি।

—না, এরকম বেশ আর কোরো না।—

কিরণের হাঁড়ি মুখের দিকে তাকিয়ে বৌদি কাছে উঠে এলেন। আস্তে আস্তে বললেন, আগেই রাগারাগি করছ কেন ঠাকুরপো? তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমরা আ সইতে পারছি না। আমরা আবার তোমায় সংসারী করব। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাস
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক,

মূল্য—তিন টাকা

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ! এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রাজধানী ঃ

দিল্লীর উৎকণ্ঠা অনেকটা কেটে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দিল্লীর মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তিনি এখন সুস্থ। দেহের তাপ স্বাভাবিক হয়েছে। অফিসের কাজও তিনি করে চলেছেন। তাঁর চিকিৎসকগণ আরও কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

অসুস্থতার মধ্যে তিনি দু-তিনদিন মাত্র পূর্ণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের মনে কোন দুর্ভাবনা দেখা দেবার কারণ আর নেই। নেহরুর তিরোধানের পর দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে খাটতে হয়েছে। কাজের অত্যধিক চাপে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থতা ক্লান্তিজনিত। তিনি আসন্ন কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন। চিকিৎসকদের পীড়াপীড়িতেই শেষ পর্যন্ত লণ্ডন সফর বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্য তিনি নিজেও দুঃখিত। প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান ছাড়াও প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সাথে লণ্ডনে আলোচনা এবং মিশরে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সাথে সাক্ষাতের কথা ছিল। এ সবই বাতিল হয়ে গেল।

প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করবেন অর্থ-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে রাজনৈতিক দিকের চাইতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোচনাটাই হয়ে থাকে বেশি। সেদিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যোগ্য ব্যক্তিকেই পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী ও শ্রীমতী গান্ধী ভারতের বক্তব্য সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবেন বলে তিনি আশাও প্রকাশ করেছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শপথ গ্রহণ করছেন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২রা জুলাই তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করার পরই বলেছেন, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ সংবাদপত্রে বেরিয়েছে তা সত্য হোক, আর নাই হোক, এ-দপ্তরের পক্ষে নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। অতীতকে কাটিয়ে নতুন দিগন্তের কথা চিন্তা করাই উচিত।

শ্রীমতী গান্ধীকে এই দপ্তরের ভার অর্পণের প্রস্তাবের সময়ই আমরা বলেছিলাম, দপ্তরটিতে নতুন আদর্শ সঞ্চারের প্রয়োজনের কথা। বর্তমান বিশ্বে তথ্য পরিবেশন,—নিজেদের কথা অন্যের কাছে তুলে ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই কাজটি আমরা সুষ্ঠুভাবে করে উঠতে পারি নি। আমাদের শত্রুরা নিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ। পাকিস্তান ও তার নয়া দোস্ত চীনের অপপ্রচারে ভারতের সম্পর্কে আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু রাষ্ট্রের মনেই সৃষ্টি হয়েছিল ভ্রান্ত ধারণা। এই মন্ত্রণালয়ের বড়কর্তাদের কারসাজিতেই 'ভোয়া' চুক্তি নিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছিল তদানীন্তন তথ্য ও বেতার-মন্ত্রীকে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীকেও এ নিয়ে কম ঝামেলা ভোগ করতে হয় নি। কাজেই এ-দপ্তরটির বিরুদ্ধে অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শ্রীমতী গান্ধীর পরিচালনায় দপ্তরটি গলদমুক্ত হবে এবং নবদিগন্তের হাতছানিতে সাড়া দেবে বলেই আমরা আশা করি।

* * *

মানুষকে আর খাদ্যের ধান্দায় ছুটাছুটি করতে হবে না—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবনান্ত শ্রমেরও আর কোন আবশ্যক থাকবে না। ক্ষুধা নিবারণের মহৌষধির সন্ধান পেয়েছেন—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভেষজগুণ-বিশিষ্ট গাছ-গাছড়া ও উদ্যান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীরসিকলাল বৈদ্য। কালীতকন্দ লতার এক টুকরা ছিঁড়ে মুখে দিতে পারলে এক সপ্তাহের খাদ্যের দাবি মিটে—অন্য কোন খাদ্যের আর প্রয়োজন হবে না। এই সুধাহার লতা খেয়ে নাকি আমাদের দেশের সাধুরা পর্বতের গুহায় বসে নির্লিপ্ত জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। গুজরাটের জেষ্ঠুর

শ্রীকৃষ্ণমাচারী

পাহাড়ে এই লতা পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে।

সংবাদটা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেবার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশের বনসম্পদের, গাছ-গাছড়ার গবেষণা কমই হয়েছে। ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা হলে অনেক ভেষজ গুণবিশিষ্ট গাছও লতার আবিষ্কার একদিন হবে। কালীকন্দের ক্ষুধাহরণের ক্ষমতা প্রামাণ্যও হতে পারে। কালীকন্দের ক্ষমতা যতই হোক, তাতে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। মানুষের রসনার তার রুচিরসের পরিচয় দেয় তার খাদ্য। রসনার তৃপ্তির জন্যই প্রয়োজন তেল-ঘি ও মশলা পাতির। রুচি-রস চরিতার্থ করতে খাদ্যকে সাজায় সে নানা রঙে, নানা ঢঙে। পারিপাট্য পরিহার মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কালীয়কন্দ ক্ষুধার মহৌষধি হতে পারে, তা মানুষকে চোর্ব্য-চোষ্য আহারের পর তৃপ্তির ঢেকুর তোলার আনন্দ দিতে পারে না। পেটপুরে পরিতৃপ্তির সাথে আহারের আনন্দ উপভোগের জন্য আমাদের অন্নের সংস্থান, মাছ-মাংস—তরিকারী ও মশলাপাতির সন্ধান করতেই হবে।

এই অন্নের হাহাকার উঠেছে আজ ভারতের প্রায় সব ক'টি রাজ্যে। পশ্চিম বাংলা থেকে সুরু করে পাঞ্জাব পর্যন্ত খাদ্য সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। গেল এক মাসের মধ্যে ঘি ও সরষের তেলের দাম বেড়েছে প্রতি কেজিতে গড়ে এক টাকা থেকে দেড় টাকা। এক বছরে গমের দাম বেড়েছে প্রায় ২৬ ভাগ। ১৯৫২—৫৩ সালের মূল্যের ভিত্তিতে খাদ্য-শস্যের মূল্য বেড়েছে ১৯৬১—৬২ সালে ১২০'১ ভাগ, ১৯৬২—৬৩ সালে ১২৬'১ ভাগ এবং এ বছরের মে পর্যন্ত ১৪৮'৩ ভাগ। মূল্যবৃদ্ধির ঝোঁকটা যখন মাত্রা ছাড়াতে সুরু করে তখন টুঁটি চেপে ধরলে কালোবাজার এমন ফেঁপে উঠতে পারতো না। আমাদের সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল সে দিকে না গিয়ে আমেরিকার বদান্যতা ও পি-এল ৪৮০ দেখিয়ে পাশ কেটে গিয়েছিলেন। কামরাজ পরিকল্পনায় তিনি গদি থেকে ছিটকে পড়ার পর সর্দার শরণ সিং এসে প্রথম খাদ্য সম্পর্কে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন। ব্যবসায়ীরা সংযত না হলে খাদ্যের ব্যবসায়ে সরকারী হস্তক্ষেপের কথাও বলেন। ভুবনেশ্বরের কংগ্রেসে মোটামুটি স্থির হয়, খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা রাজী না হওয়ায় আপাতত তা' স্থগিত রাখা হয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা

● শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম

করেছেন, সরকারী ও সমবায়িক উদ্যোগে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতে স্থাপন করা হবে নতুন দু' হাজার চাল-কল। এই কলে চাল ছাঁটাই হবে দু' কোটি টন। ১৬ই জুলাই এই কলের সন্ধানে একটি দল যাবে পশ্চিম জার্মানী ও ইতালীতে। সেখান থেকে ফিরে জাপানের চালকলও যাচাই করে দেখে আসবে। এই তিনটি দেশেই নাকি এ ধরণের যন্ত্রপাতি ভাল পাওয়া যায়।

প্রথম কিস্তিতে ছটি চাল-কলের মধ্যে তিনটি স্থাপিত হবে মাদ্রাজের তাঞ্জোরে, অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরীতে ও বিহারের শাহাবাদে। তিনটি কলে ঘণ্টায় যথাক্রমে তিন টন, দু টন ও এক টন করে চাল উৎপন্ন হবে। ব্যবসায়ীদের প্রভাব হ্রাসের জন্য নতুন করে আর কাউকে চাল-কলের লাইসেন্স দেওয়া হবে না। বর্তমান কলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবতের সম্ভাবনাও আছে। খাদ্যশস্যের সরকারী ট্রেডিং করপো-রেশন প্রবর্তনের জন্য যথাযথ গঠন প্রণালীও রচিত হচ্ছে।

ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশবাসী এর চাইতে অনেক বেশি আশা করেছিল শ্রীসুব্রহ্মনিয়মের কাছে। তাঁর পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হতে আরও দেড় বছর বাকী। তাঁর পরিকল্পনা পরিপূর্ণ রূপ নিতে লাগবে ছ' বছরের অধিক। দেশের চালু চাল-কল রাষ্ট্রায়ত্ত না করার পক্ষে তাঁর যুক্তিও নিচ্ছিদ্র নয়। চাল-কলের মালিকেরা বিনা লাভে কল চালাচ্ছে না। বিদেশী কল আমদানী করে যে-পরিমাণ চাল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে তার চাইতে ঢের বেশি চাল প্রতি বছর দেশে উৎপন্ন হচ্ছে। চালু কলগুলো হাতে নিয়ে ধীরে-সুস্থে তিনি বিদেশের কলের কথা চিন্তা করতে পারতেন। তাতে আপাতত বিদেশী মুদ্রার খরচটা বেঁচে যেতো এবং সম্ভব হলে দেশেই নয়া কল নির্মাণ করে নিতে পারতেন। ভারতে এখন ভারী শিল্পের যন্ত্র, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি উৎপন্ন হচ্ছে। চাল-কল নির্মাণ এমন কিছু শক্ত কাজও ছিল না।

হিসাব বহির্ভূত মজুত অর্থ মজুত-দারদের শক্তি যতই বৃদ্ধি করুক না কেন, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে মজুতদারদের শায়েস্তা করাও কঠিন কাজ নয় বলেই সাধারণ মানুষের ধারণা। সরকারের আন্তরিকতা থাকলে সতের বছরের শাসনকালে দেশের অনেক রোগেরই নিরাময় করা সম্ভব হতো। মানুষ আগে করে—বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সংস্থান। সেদিনে

আমরা একেবারেই দৃষ্টি দিতে পারি নি। জাপানী প্রথায় চাষের গাল-ভরা কথা আমরা বলে থাকি। সেখান-কার মত আমাদের চাষের উন্নত সরঞ্জাম নেই। প্রতি একরে তারা যে পরিমাণ সার দেয় তার শতাংশের একাংশ সার ভারতের চাষযোগ্য মাটিতে ফেলতে হলে সারের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। জল সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। কোনটাই আমরা করে উঠতে পারি নি। চেষ্টা যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। কেবল চাল-কল চালিয়ে সরকার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। ধানের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত না হলে, ব্যাঙ্কগুলোর রাষ্ট্রীয়-করণ না হলে এবং মূল্যমান নিয়ন্ত্রিত ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে না পারলে ব্যবসায়ীদের চক্রে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে

* * *

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ৪ঠা জুলাই ৬৬ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। তাঁর এই শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের তিনি একনিষ্ঠ সাধক। ভারতের তথা বিশ্বের শ্রমিক আন্দো-লনে তাঁর অবদানের কথা শ্রমিক মাত্রেই চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সাম্প্রতিক হাঙ্গামা দমনে সাহসিকতার ও শাসন পরিচালনার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুর্নীতির কলঙ্ক-কালিমা মুছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনায় তিনি এখন মনোনিবেশ করেছেন। আজ তিনি ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় মন্ত্রী। তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়ে সুস্থ দেহে, দুর্জয় শক্তি নিয়ে শোষণহীন, দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সাফল্য অর্জন করুন, এই আশাই দেশবাসী করে।

● শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

পাঞ্জাব ঃ

পাঞ্জাব আজ অত্যন্ত উল্লসিত। চণ্ডীগড়ের ঘরে ঘরে নেমে এসেছে আনন্দের অফুরন্ত জোয়ার। খবরটা তো প্রথম দিকে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন নি। প্রথম ধাক্কায় অনেকেই বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। সর্দার কায়রোঁর বিরোধী পক্ষ এবং চতুর রাজনীতিকরা পর্যন্ত কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ভাবতেও পারেন নি—কায়রোঁ-বিরোধী কমরেড রামকিষেণ হবেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। সরকারী ভাবে সংবাদ ঘোষণার পরই চলেছে উল্লাসের ঢেউ। দুর্নীতি-পরায়ণতা, জুলুমবাজী ও জবরদস্তির উপর সাধারণ মানুষের এটি একটি বিরাট জয় বলেই সকলে ধরে নিয়েছে। তাই এত আনন্দ, এত উল্লাস। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড পাঞ্জাবের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সর্দার কায়রোঁর অধীনে পাঞ্জাবের নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মনোভাবটাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক, আর্থিক, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক স্তূপীকৃত সমস্যার সমাধানে রামকিষেণকে নির্ভর করতে হবে হাই কমাণ্ডের ওপর।

● শ্রীকামরাজের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীরামকিষেণ

সর্দার কায়রোঁ জবরদস্ত মানুষ, পাঞ্জাবের রাজনীতিতে তিনি অপরিহার্য। এমনি একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। কেন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি অবাধে মন্ত্রীদের দপ্তর বদল করেছেন। গ্রামাঞ্চলে বসিয়েছেন জেলদার। বিক্ষুব্ধ হয়ে তখন যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাও পাঞ্জাব কংগ্রেস বানচাল করে দিয়েছিল। সর্দার কায়রোঁ এক সময় যাঁকে তাঁর

উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর (সর্দার দরবারা সিংয়ের) সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। শেষের দিকে সর্দার কায়রোঁ নাকি মাষ্টার তারা সিংয়ের সাথে হাত মেলাতেও চেষ্টা করেছিলেন। সর্দারজীর দাপটে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড কতকটা অসহায় বোধ করছিলেন।

এই পরিস্থিতি বিচার করেই হাই কমাণ্ডকে নেতা নির্বাচনে নতুন পথে নামতে হয়েছিল। বর্তমান ব্যবস্থায় কেবল সর্দার কায়রোঁ ও তাঁর তাঁবেদার গোষ্ঠীর ক্ষমতা হ্রাসই করা হয় নি, তাঁর উত্তরাধিকারী এসে বহাল-তবিয়তে আসনে বসার পর যাতে পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে না পারে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

রামকিষেণ অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের কাছের লোক। সঙ্কল্পে তিনি দৃঢ়, কঠোর পরিশ্রমী এবং সরল মানুষ। জনতার মানুষও রামকিষেণ। তাই তিনি কমরেড। ভুবনেশ্বরে ঘোষিত কংগ্রেসের আদর্শের একনিষ্ঠ সাধক। হাই কমাণ্ডেরও অত্যন্ত অনুগত। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে বীরের মতই লড়েছিলেন।

কমরেড রামকিষেণ এখন দিল্লীতে। দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার নাম পেশ করবেন কংগ্রেস সভাপতির কাছে। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য বিশ জনের বেশি হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। পাঞ্জাবের নতুন নেতা অক্লান্ত কর্মী, আদর্শনিষ্ঠ কমরেডকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

উত্তর প্রদেশ ঃ

উত্তর প্রদেশেও খাদ্য সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। গমের দাম গিয়েছে বেড়ে। গ্রামাঞ্চলের হাটে বাজারে ভাল গম পাওয়া দুষ্কর। ন্যায্যমূল্যের দোকানে গম প্রায়ই পাওয়া যায় না। এই অবস্থার পর কেন্দ্রীয় খাদ্য-ভাণ্ডার থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ার সংবাদে সাধারণ মানুষে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট আতঙ্কের।

রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য সেদিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে খাদ্যশস্য দিতে কেন্দ্রীয় দপ্তর অস্বীকার করে নি। তবে, একসঙ্গে চাহিদা মেটানো কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। দফায় দফায় গম কেন্দ্রের ভাণ্ডার থেকে আসবে। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সরবরাহের জন্য কলকাতা বন্দর থেকে গম আসছে এক হাজার টন। ১৮

● শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

হাজার টন গম আসবে মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম থেকে। সরকারের হাতে, এ ছাড়া মজুত আছে ৫৫ হাজার টন। কাজেই আতঙ্কের কোন কারণ থাকতে পারে না। হাতে যা' গম আছে তাতে মাস দুই কাটানো যাবে। কেন্দ্রের প্রতিশ্রুত সাহায্য এসে পড়লে, কোন সমস্যাই থাকবে না।

ব্যবসায়ীরা ও মুখ্যমন্ত্রী মূল্যের স্থিতি-স্থাপকতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কেন্দ্রের সাহায্য দেরীতে হলেও পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের দুষ্টচক্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে উত্তর প্রদেশের খাদ্য-সঙ্কট আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ব্যবসায়ীরা ওস্তাদ। বারবার তাঁরা এ কাজটি বিপদের সময় করেছেন।

গুজরাট :

শিক্ষা মানুষ গড়ে।—পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে তার জীবনকে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষ-গড়ার দিকটাই সব চাইতে অবহেলিত। গুজরাটের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে তাই শিক্ষা দেখা দিয়েছে অভিশাপরূপে। মাতার শহরের তালুক পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে এই কথাই নিবেদন করেছে কাঁকসীওয়ালা সম্প্রদায়ের লোকেরা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থানুযায়ী তাদের এলাকায় শিক্ষকগণ কাজ করে চলেছেন। ছেলেরা শিক্ষা গ্রহণের পর সমাজে অযোগ্য হয়ে পড়ছে। আগের মত গতর খাটিয়ে হাতের কাজ করতে চায় না। চাকরীও তাদের জোটে না।

মেয়েদের নিয়ে আরও বেশি সমস্যায় পড়েছে কাঁকসীওয়ালারা। তাদের বিয়ের বর জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কেতাব পড়া মেয়ে ঘরের কাজ ভাল জানে না। কাজেই তাদের নিতে নারাজ ছেলের বাপ।

গুজরাটের কাঁকসীওয়ালাদের মত বিপন্ন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অনেক মাতা-পিতা। এর অপরাধ শিক্ষার নয়, শিক্ষা-ব্যবস্থার। জীব-জগতে মানুষ প্রাধান্য লাভ করেছে তার দুটি হাতের সাহায্যে। হাত কাজে লাগাতে গিয়েই খুলেছে মানুষের বুদ্ধি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বন্ধনমুক্ত দুটি হাতকে দিচ্ছে অকেজো করে। পেশাগত প্রযুক্তি বিদ্যার প্রবর্তন না করে পুঁথিগত বিদ্যার ওপর দিয়েছি আমরা অধিক জোর। এ নিয়ে আলোচনাও ঢের হয়েছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্তন আজও

হয় নি। গুজরাটের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থা দেখে কর্তাব্যক্তিদের জ্ঞানচক্ষু আশা করি, উন্মীলিত হবে।

ত্রিপুরা ঃ

ভারতের প্রাচীনতম দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার প্রথম জনপ্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভার বয়স এখন এক বছর কয়েকদিন মাত্র। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পর সাত বছর ত্রিপুরা ছিল চীফ কমিশনার শাসিত 'গ' শ্রেণীর রাজ্য। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তাকে

● শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ

আনা হয় সরাসরি কেন্দ্রের শাসনাধীনে। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রথম মন্ত্রিসভা। এক বছরের শিশু রাজ্যটি হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির পথে।

ছোট্ট রাজ্য। আয়তন মাত্র ৪১১৬ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে লোকসংখ্যা ১১,৪২,০০৫। তার মধ্যে ৩৬,০০৭০ অর্থাৎ শতকরা ৩১·৬৮ জন লুসাই, মগ, কুকি, চাকমা, খাসিয়া, ভুটিয়া, সাঁওতাল, ত্রিপুরী, ওছাই, ওরাং প্রভৃতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। বাদবাকী প্রায় সবই বাঙালী। প্রতি বর্গমাইলে বসতি ২৭৭ জন করে। পাশেই তার মধ্যযুগীয় প্রথায় পরিচালিত ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান। জঙ্গী নেতা আয়ুব খাঁ'র চেলা-চামুণ্ডাদের উপদ্রব সীমান্তে হামেশাই চলেছে। দলে দলে চলে আসছে উদ্বাস্তু। এ-বছরের জানুয়ারী থেকে ১৫ই জুন অবধি উদ্বাস্তু এসেছে ১৪,৫৯০টি পরিবারের কিঞ্চিদধিক ৬০ হাজারের মত। উদ্বাস্তুর এই প্রবল চাপ সত্ত্বেও ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে।

শিল্পে ত্রিপুরা অনুন্নত। উদ্বাস্তুদের এক শ' পরিবার বিহারে এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' পরিবার এ-পর্যন্ত গিয়েছে দণ্ডকারণ্যে। সবাই দণ্ডকারণ্যে যেতে পারবে এমনও নয়। অনেকে এসেছে সম্পত্তি বিনিময় করে। তা ছাড়া, দণ্ডকারণ্যে না গিয়ে নিজের চেষ্টায় পুনর্বাসনের বাসনা রয়েছে কিছু কিছু পরিবারের মনে। এদের জীবিকার সংস্থান করতে আবশ্যক ত্রিপুরাকে শিল্পে সমৃদ্ধ করে তোলা। ত্রিপুরা সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠার আবেদন পেশ করেছেন কেন্দ্রের দরবারে। গেল এক বছরে ত্রিপুরা সরকার ২১টি ছোট শিল্প কারখানাকে অর্থ সাহায্য করেছে ২ লক্ষ টাকা। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের জন্য কমলপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর লঙ্গাই ব্লকগুলো নিয়ে ত্রিপুরার উত্তরাংশে একটি গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একটি কাগজের কল, একটি সূতা-কল এবং একটি পাট-কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলেছে। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে উদ্বাস্তুদের জীবিকার নতুন পথ খুলে যাবে। যারা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সম্পত্তি বিনিময় করে এসেছে তাদের বীজ, সার ও বলদ দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে।

ফটিকছড়া, কালাছড়া, মনুভ্যালি, বাপলংছড়া ও রামদুর্লভপুরে পাঁচটি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে শ্রমিকদের অবসর বিনোদনের, অবসর সময়ে লেখাপড়া ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

নতুন মন্ত্রিসভা গোড়া থেকেই চেষ্টা করছেন শিক্ষা সম্প্রসারণের। ইতিমধ্যে একটি সঙ্গীত কলেজ খোলা হয়েছে। এ-মাসেই একটি বি-টি কলেজ খোলা হচ্ছে। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে আসছে বছর ছাত্রীদের জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হবে। গণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ত্রিপুরার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। বনজ সম্পদ থেকে তার আয় প্রায় ত্রিশ ভাগ। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের ফলন বৃদ্ধি বন-সম্পদকে বাড়িয়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চেষ্টা চলছে বনাঞ্চলে রবার চাষের প্রবর্তনের। অল্প মূল্যে উন্নত ধরণের ধানের বীজ চাষীদের সরবরাহ করা হয়েছে ৫২,৪৬৮ কিলোগ্রাম।

কিষাণ
লন্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৬,৩ নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৩৮০

আলোচ্য বছরে ১৮ হাজার একর জমিতে জাপানী প্রথায় নিবিড় চাষের প্রবর্তন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিমান ছিল যোগাযোগের একমাত্র বাহন। স্বাধীনতার আগে একটি মাত্র রেলপথ ছিল। দেশ বিভাগের ফলে সেটি গিয়ে পড়েছে পূর্ব-পাকিস্তানে। ত্রিপুরা পেয়েছে নতুন রেলপথ। দৈর্ঘ্যে মাত্র কুড়ি মাইল, হলেও ত্রিপুরার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। খাস ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রেন চলাচল এই প্রথম সুরু হল। আগের রেলপথ ছিল ত্রিপুরার সীমান্তে মহারাজার জমিদারীর ওপর। নতুন রেলপথ কৈলাশহর পর্যন্ত যাবে। ভবিষ্যতে একে টেনে আগরতলা ও স: রুমে নেবার পরিকল্পনা আছে। আগরতলার হাওড়া নদীর ওপর ১২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণের কাজ এখন সমাপ্তির মুখে। উদয়পুরে গোমতী নদীর ওপরে সেতু নির্মাণের কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী মহাভারতের কাল থেকে সুরু হয়েছে তার যাত্রা। নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও চারুকলায় ত্রিপুরার অবদান অপরিসীম। স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা, আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছে। ত্রিপুরার মানুষ পেয়েছে নতুনের আস্বাদ। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ সর্বতোভাবে সাহায্য করছে সরকারকে নতুন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে। সাধারণ মানুষের এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বজায় রেখে মন্ত্রিসভা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে গেলে ত্রিপুরার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

আসাম ঃ

আত্মগোপনকারী নাগাদের সাথে পাদ্রী মাইকেল স্কট ইতিমধ্যে আরেক চক্কর আলোচনা শেষ করেছেন। নাগাদের সামলাতে তাঁকে না কি এবারে বেশ কিছুটা হিমসিম খেতে হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা অথবা ভিন দেশের সাহায্য নিয়ে নাগাদের কোন সুবিধা হবে না এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্নটাই একেবারে উঠতে পারে না, এই সব তথ্য ও তত্ত্ব তিনি শুনিয়ে এসেছেন। তিনি নাগাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের গুরু ও অধিনায়ক ফিজো এদিকের সকল দুয়ারেই ঘা মেরেছিলেন। ঐ অসাধ্য সাধনের বাসনা নিয়েই তিনি বিলাতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কোনপথেই নাগাভূমিকে আর স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা

● ফিজো

নেই। কাজেই আপোষ-আলোচনায় এ প্রশ্ন অবান্তর—এ প্রশ্ন আর কোন কারণেই উঠতে পারে না। তা' ছাড়া ভারতের অঙ্গরাজ্য নাগাভূমির সরকারের অস্তিত্ব ও তার গুরুত্বটা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। স্কট সাহেব আশা করেন তাঁর দৌত্য সফল হয়েছে। আত্মগোপনকারী নাগাদের অবস্থাটা তিনি বোঝাতে পেরেছেন।

ফিজোর আশ্রয়দাতা নাগা-দরদী পাদ্রী সাহেবের শুভবুদ্ধির উদ্রেক শেষ পর্যন্ত হয়েছে জেনে আমরা আশ্বস্ত হলাম। নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত নাগাদের সাথে আলোচনায় বসতে ভারত সরকার সম্মত হলেও কমিশনে আলোচনায় যে-সর্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ভারত সরকার তা' মানতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বের সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রকাশ, ভারত সরকারের মনের কথাটা টেলিফোনযোগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা জানাবার পরেই স্কট সাহেব নাগাদের সমঝাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। আলোচনার জন্য নাগাদের প্রতিনিধি পাঠাবার নির্দেশও নাকি দেওয়া হয়েছে।

উড়িষ্যা ঃ

মহানদীর ওপরে নতুন সড়কের উদ্বোধন করে গেলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি-মন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি। দেড় মাইল দীর্ঘ এই সেতুপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে এক কোটি আশী লক্ষ টাকার অধিক। এই পথ নির্মাণের ফলে কলকাতা, কটক ও মাদ্রাজের মধ্যে যাতায়াত সহজ ও সুগম হবে। বিরূপা নদীর সেতুটিও একই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয়েছে। বাকী চারটি নদী—খর্যোত্রা, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী ও সালান্দীর ওপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও হয়েছে।

খনিজ ও প্রাকৃত সম্পদে সমৃদ্ধ উড়িষ্যা এখনও ভারতের অন্যতম 'অনগ্রসর' রাজ্য। যে-হারে উড়িষ্যার উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলেছে তা' বজায় থাকলে এ রাজ্য অচিরেই ভারতের অন্যান্য উন্নত রাজ্যগুলোর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারবে।

ভ্রম সংশোধন

বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস আমাদের জানিয়েছেন যে, ৪র্থ সংখ্যায় (১৮ই জুন) রেভাঃ মাইকেল স্কটের যে ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে, তা অন্য এক মাইকেল স্কটের—রেভাঃ স্কটের নয়। আমরা এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদিকা

কবিতা

উৎকণ্ঠা-কাতর উপত্যকা

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
(জন্ম ১৯০৪—মৃত্যু ১৯৬৪)

স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন বিধবার মত গেল বর্ষ চলে
যন্ত্রণা আহত।
পুষ্পিত হওয়ার যে অবকাশ ছিল চৈত্রবীথিতলে,
তাও হোলো গত।
সাজানো কথার স্তূপে প্রাত্যাহিক বহ্নির উৎসব
মানবমনের ইতিহাস হোতে সকল গৌরব
আজ পলাতক ;
ঘুমহারা চোখ : তুমি আর বেঁধো না অলক।

দুঃখে শোকে যার ভেঙেছে হৃদয় অশ্রুপাত করি
তার কথা ভেবে,—
তুমি কি কাতর ? ছায়া-বিড়ম্বিত মৌন পথ ধরি
এসো যাই এবে।
এশিয়ার তটে, শৈল অন্তরীপে সমুদ্রবণ্টার
ধ্বনি কি শুনেছ ?—দিক্-নির্দেশিকা নাহি মনুটার
তুমি কি বিহ্বল।
উৎকণ্ঠা-কাতর উপত্যকা : অন্তর বিকল।
যন্ত্রণা-মুহূর্ত চকিত উত্তাপে, রক্তরঙ মাখা
সব ধ্বংসস্তূপ।
বিভগ্ন প্রাচীরে নিদ্রালু প্রহরী, ছিন্ন অঙ্গরাখা,
অদৃষ্ট বিদ্রূপ।
অতীত দিনের সেতু পড়ে ভেঙে—চলে অগ্নিদাহ,
তোমার আমার পথ চলা মাঝে ঘটনাপ্রবাহ,
ছায়ার আড়ালে ;
পাখীর কাকলি, নম্র আলো, তাও তো হারালে।

প্রভাতী আকাশে কাল মেঘগুলো নিরাপদ নয়,
ওরা হানাদার।
গত বরষের ধর্ষিত প্রান্তরে আশার সংশয়
তোমার আমার।
শস্যরিক্ত মাঠ, পদ্মাগরেণুর শুষ্ক প্রাণধারা,
কাঙালের মত নবাগত দিন হের, পথ হারা
যারা আছে থাক্
কান পেতে শোনো হেথা ঘূর্ণী বাতাসের ডাক।

(অপ্রকাশিত)

রাত্রি শেষ হলে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

রাত্রি শেষ হলে দলে দলে
এখনো সমুদ্রগামী পাখীরা উজ্জ্বল কোলাহলে
বড় সমুদ্রের দিকে উড়ে চলে যায়।
চঞ্চল ডানায় কোন দূরত্বের রহস্য জড়ানো
শিশুর হৃদয় জুড়ে রেখে যেত বিস্ময়ের বিচিত্র আকাশ ;
তন্দ্রালীন ভীরু চোখে—ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়
বিচূর্ণ ভোরের দীপ্তি, কুয়াশা মেশানো
খোলা জানালার দিকে টেবিলের উপরে সে
নির্জন আভাস।
ভাইবোন শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে আছে ঘুমের ভিতরে,
মা কখন উঠে গেছে—সংসারের কাজে,
পাশের ঠাকুর-ঘরে—বাবার উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ—
এই সব ছোট ছোট দৃশ্যগুলি স্পষ্ট মনে পড়ে—
বয়স্ক প্রবীণ আজ জীবনের সুদীর্ঘ দুরূহ প্রবাসে ;
সেই সব দৃশ্যান্তরে যেতে যে বারণ।

সেই সব বুনো হাঁস—কবে তারা উড়ে চলে গেছে
সময়ের দীর্ঘ পথ ধরে—
কয়েকটি পালক, ক'টি মগ্ন ছায়া শিশুর স্বপ্নের খেলাঘরে
ফেলে রেখে। জানালার ওদিকের বড় জামগাছে
এখনো বসন্ত ঋতু ফিরে আসে, বৃষ্টির বেহাগে
গভীর নিশীথ রাতে—ব্যাঙেদের ঐকতান জমে,
চাটুজ্জে ভিটের হয়তো আকন্দের হিজলের বনে
হলুদ পাতারা ঝরে টুপটাপ, ঋতুর সংরাগে
বিকেলের মেঘে মেঘে রঙ রোদ রহস্যেরা ক্রমে
বিবর্তিত হতে থাকে। আঁকাবাঁকা ছোট্ট খাল
আমাকে এখনো
উদাত্ত আনন্দ হয়ে ওঠে।
সেখানে যাব না আর বিক্ষত বিপন্ন চরণে।
আমার বাগানে আর অপরাজিতা ফোটে কি না ফোটে
কিছুই জানি না আর—ভোরের পাখীরা সব
কবে চলে গেছে
বড় সমুদ্রের দিকে। বুড়ো বট সমস্ত দেখেছে।

• হেনরি ক্যাবট লজ (টুপি মাথায়) সায়গন ত্যাগের প্রাক্কালে হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনসাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

আইসেনহাওয়ার রিপাবলিকান পার্টির নেতা। তারও পূর্বে ট্রুম্যানের সময়েও এই সমস্যা ছিল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সরকারী নীতি স্থির করার ব্যাপারে কেনেডি ও জনসন উভয়েই রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, এমন কি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূতের পদে একজন রিপাবলিকানকে, অর্থাৎ লজকে নিয়োগ করেছেন। সুতরাং এই বিষয়টা নির্বাচনী অভিযানের বাইরে রাখা উচিত। তবে লজের এই কথা গোল্ডওয়াটার বা লজের সমর্থিত প্রার্থী স্ক্র্যানটন, কেউই সমর্থন করছেন না। তাঁরা দুজনেই চান, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ব্যাপারে কেনেডি-জনসন সরকারের ত্রুটি দেখিয়ে নিজেদের প্রতি সমর্থন আদায় করতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন লাভের অভিযানে হেনরি ক্যাবট লজের যোগদানের ফলে প্রচার অভিযান রীতিমত জমজমাট হয়ে উঠেছে। গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যারি গোল্ডওয়াটার যাতে কিছুতেই মনোনয়ন লাভ করতে না পারেন, সে উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করার জন্য লজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করেছেন। লজ উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন উইলিয়াম স্ক্র্যানটনকে সমর্থন করছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে গোল্ডওয়াটারের অদ্ভুত সব বক্তব্যে দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা হয়েছে এবং রিপাবলিকান পার্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই রকফেলার, নিকসন, রোমানি সবাই তাঁদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে একযোগে স্ক্র্যানটনকে সমর্থন করছেন—যেভাবে হোক গোল্ডওয়াটারকে আটকাতে হবে। এবার তাঁদের সঙ্গে লজও যোগ দিলেন। উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য গতবারের রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ও বিশিষ্ট কূটনীতিক লজের যথেষ্ট প্রভাব আছে দলের মধ্যে। সুতরাং স্ক্র্যানটনের পক্ষে লজের প্রচারে নামা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমস্যাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়রূপে ব্যবহার করার বিরোধী। তাঁর মতে ভিয়েৎনামের ঘটনার সঙ্গে কেবল ডেমোক্রাটিক পার্টিই যুক্ত নয়, রিপাবলিকান পার্টিও সমভাবে যুক্ত। কেনেডি বা জনসনের পূর্বে আইসেনহাওয়ার সরকারও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

লজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আণবিক বোমা নিক্ষেপের জন্য গোল্ডওয়াটারের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। গোল্ডওয়াটার বলেছিলেন, ভিয়েৎনামের বনাঞ্চলে যে-সব কমিউনিস্টপন্থী ভিয়েত কং সৈন্য লুকিয়ে আছে, তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আণবিক বোমা ব্যবহার করা প্রয়োজন। লজ এই প্রস্তাবকে 'সিগারেট ধরানোর জন্য আণবিক বোমা' ব্যবহারের মত বিপজ্জনক ও ছেলেমানুষী বলে বর্ণনা করেছেন।

• নির্বাচনী অভিযানে স্ক্র্যানটন

• গোল্ডওয়াটার

স্ক্যানটন নিজেও গোল্ডওয়াটারের নীতি ও কথাবার্তার সমালোচনা করে বক্তৃতা করছেন। এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার জন্য যে-সব গুণ থাকা প্রয়োজন, গোল্ডওয়াটারের তা নেই। তিনি বলেছেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে যা খুশি তা বললে চলবে না, মনে রাখা দরকার রাষ্ট্রপতির 'প্রত্যেকটি কথা ও কাজ মানবজাতির শান্তি ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবে—ভাল হলে তার ফল ভাল হবে, আর খারাপ কথা ও কাজের ফল খারাপ হবে।'

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

হেনরি ক্যাবট লজের জায়গায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হয়েছেন জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল টেলরকে এই পদের জন্য নির্বাচন করে রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ব্যাপারে তাঁর সরকারের দৃঢ় মনোভাব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যুদ্ধকে প্রসারিত করতে চায় না। তবে এই অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বরকমে চেষ্টা করবে।'

কেবল যে সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধানকে রাষ্ট্রদূত করা হয়েছে, তাই নয়—পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন প্রধান ব্যক্তিকে সহকারী রাষ্ট্রদূতরূপে নিয়োগ করা হয়েছে। সহকারী রাষ্ট্রদূত সাধারণত থাকেন না। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে। পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সচিব ইউ আলেকসিস জনসনকে সহকারী রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই নিয়োগ

● জেনারেল টেলর

দেখে মনে হয়, টেলর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক ব্যাপারের দায়িত্বে থাকবেন আর সাধারণ কূটনৈতিক কাজ দেখাশুনা করবেন আলেকসিস জনসন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে আর একটি ঘটনা থেকে। হেনরি ক্যাবট লজ রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করছেন জানার পর এই পদ গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র সচিব ডিন রাস্ক, প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা, এটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি, পররাষ্ট্র বিষয়ে রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা জর্জ বান্তি প্রভৃতি সকলেই তাঁদের বর্তমান কাজ ত্যাগ করতে রাজী হয়েছিলেন।

জেনারেল টেলর দৃঢ়তার সঙ্গে

● আলেকসিস জনসন

কমিউনিস্টপন্থী ভিয়েৎ কং ও তাদের সমর্থক উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন এবং প্রয়োজনমত লাওসের ব্যাপারেও খোঁজ রাখবেন, মার্কিন সরকার সেই আশা করেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী মহলও টেলরের নিয়োগে উল্লসিত। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন খান টেলরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতিপদে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন লাভের জন্য লজ সায়গন ত্যাগ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি জনসন 'দুঃখের সঙ্গে' লজের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন, এ কথা সত্য হলেও, বেশ কিছুদিন ধরেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সামরিক নীতি সম্পর্কে লজের সঙ্গে মার্কিন সরকারী কর্তাদের মতভেদ চলছিল। হনলুলুতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কিত জরুরী বৈঠকে লজের সঙ্গে রাস্ক, ম্যাকনামারা, টেলর প্রভৃতির গুরুতর মতভেদ হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রদূত পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিরও হয়তো কিছু পরিবর্তন হবে।

জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর কেবল দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নয়, লাওস এবং সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক প্রয়াসকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করবেন।

লাওস :

লাওসের সমস্যা সমাধানের জন্য লাওস সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে কয়েকটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ক্যানাডা, থাইল্যাণ্ড ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। ভিয়েনটিয়েনে এই রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রদূতেরা সম্মেলনে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এক যুক্ত ঘোষণায় এই আবেদন

প্রচার করেছেন। এই রাষ্ট্রগুলির দাবী: (১) অবিলম্বে লাওসে যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্যাথেট লাও, দক্ষিণপন্থী, নিরপেক্ষতা-বাদী, সকল পক্ষকেই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। (২) ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ তারিখের পর প্যাথেট লাও বাহিনী যে-সব নতুন অঞ্চল দখল করেছে, সে-সব তাদের ছেড়ে দিতে হবে। (৩) উত্তর ভিয়েৎনামকে লাওস থেকে তাদের সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক সরিয়ে নিতে হবে। (৪) যুদ্ধবিরতি ও আনুষঙ্গিক কাজ করবার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে চেষ্টা করতে হবে এবং এ বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা দেখা দিলে, কমিশনকে তা জানাতে হবে। তা ছাড়া লাওসের তিন পক্ষের অবিলম্বে এক বৈঠকে মিলিত হবার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি ও প্যাথেট লাও বাহিনীর অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ—পাঁচ রাষ্ট্রের এই হল প্রধান দাবী। ভিয়েনটিয়েন বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন নি। ভারত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি, সুতরাং তার পক্ষে এইরূপ ঘোষণার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, ভারতের মতে, জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে কোন পক্ষ অন্যায় করেছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের—কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিরা ভিয়েনটিয়েন বৈঠকে যোগ দেয় নি। ফ্রান্স ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে।

লাওসের গৃহযুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যদের অংশগ্রহণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি রীতিমত বিচলিত। যুক্ত ঘোষণায় এই ঘটনার জন্য 'লাওসের সামরিক পরিস্থিতি'কে এশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে লাওস সমস্যার রাজ-নৈতিক সমাধানের জন্য পোল্যাণ্ডের চেষ্টায় কিছুটা ফল হয়েছে দেখা যাচ্ছে। পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি জে দুব্জিনস্কি খাং খেতে প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুভানো ভং-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঘোষণা করেছেন, সুভানো ভং ফম্ ফেন্ অথবা জাকার্তায় নিরপেক্ষতাবাদী ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লাওস সমস্যা সমাধানের বিষয় আলোচনা করতে রাজী আছেন। এতদিন পর্যন্ত প্রিন্স সুভানো ভং লাওসের বাইরে কোথাও এইরূপ সম্মেলনের প্রস্তাবে রাজী হন নি—নিরপেক্ষতাবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমার সব অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবার তিনি কেবল বাইরে গিয়ে মিলিত হতেই রাজী হন নি, এই আলোচনায় বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, ক্যানাডা ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষকরূপে উপস্থিত থাকার প্রস্তাবেও সম্মত হয়েছেন।

প্রিন্স সুভানো ভং-এর এই মত পরিবর্তন ও আলোচনা মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রস্তাবে সম্মতিতে শান্তিকামী মাত্রেই আশান্বিত হবেন।

কঙ্গো:

৩০শে জুনের পর কঙ্গোতে আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী থাকবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী ইতিমধ্যেই কঙ্গো ত্যাগ সুরু করেছে।

কিন্তু দীর্ঘদিন কঙ্গোতে শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে চেষ্টা করার পর, আজ যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কঙ্গো ত্যাগ করে যাচ্ছে, তখন কঙ্গোতে কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? না, নতুন করে কঙ্গোর রাজনৈতিক জীবনে সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে?

বেলজিয়ানদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে ময়সে টিশোম্বের চেষ্টায় কাটাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার নিষ্পত্তি হয়তো হয়েছে, কিন্তু কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দমিত হয় নি। নানাস্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন উপজাতি বন্য জন্তুর মত হিংস্র আচরণ, এমন কি মানুষ ভক্ষণ পর্যন্ত করছে। এই অবস্থায় কঙ্গোর ভবিষ্যৎ কি?

১৯৬০ সালের ৩০শে জুন

• সাংবাদিক বৈঠকে টিশোম্বে (মাঝখানে)

কঙ্গোয় বেলজিয়ান শাসনের অবসান ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর চার বৎসর কঙ্গো বেলজিয়ান প্রদত্ত 'ফাণ্ডামেণ্টাল ল' দ্বারা শাসিত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতিপ্রধান নতুন একটি সংবিধান গৃহীত হয়েছে। কঙ্গোর অধিবাসীরা গণভোটের দ্বারা এই সংবিধানের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে। রাষ্ট্রপতি কাসাভুভু যাতে নতুন সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী আদুলা পদত্যাগ করেছেন।

কিন্তু কাসাভুভুর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কঙ্গোর বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। বিদ্রোহীরা 'জাতীয় মুক্তি কমিটি' এই নাম নিয়ে কাজ করছে এবং লুমুম্বার নীল ও সোনালি রং-এর পতাকাকে তাদের পতাকারূপে গ্রহণ করেছে। লুমুম্বাপন্থীরা প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহ পরিচালনা করছে। কুইলু প্রদেশ পুরোপুরি বিদ্রোহীদের দখলে, কিভু ও কাটাঙ্গা প্রদেশেও এদের প্রাধান্য বেশি। কঙ্গো সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মবুটু বিদ্রোহীদের দমনে ব্যর্থ হয়েছেন। মবুটুর সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল ও বিমানবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে, তবু এদের পরাস্ত করা যাচ্ছে না। চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থসাহায্য দেওয়া হচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে।

[illegible]টাঙ্গা প্রদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্[illegible] ময়সে টিশোম্বে একদিন ধিক্কৃত হয়ে বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের দালালরূপে আখ্যাত হয়ে কঙ্গো ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এবার যখন তিনি উত্তর কাটাঙ্গার রাজধানী এলবার্টভিলেতে এসে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাঁর প্রদেশবাসীর কাছ থেকে বীরের মত অভিনন্দন লাভ করেন। অবশ্য ইতিমধ্যে টিশোম্বের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিদর্শন করে তিনি বুঝেছেন, বেলজিয়ান বা অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদীর কথামত চলা উচিত নয়, কাটাঙ্গাকে কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন করা সকল কঙ্গোলীরই স্বার্থবিরোধী এবং আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির একযোগে চলা উচিত।

কঙ্গোর সকল পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য টিশোম্বে বিশেষ উৎসাহী। বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে রাষ্ট্রপতি কাসাভুভুও এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। টিশোম্বের অনুরোধে দক্ষিণ কাসাই-এর নেতা ক্যালনজি'র ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে এবং লুমুম্বার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গিজেঙ্গাকে মুক্তি দিতে কাসাভুভু রাজি হয়েছেন।

আশা করা যাচ্ছে, শীঘ্রই টিশোম্বে ক্যালনজি, গিজেঙ্গা ও কাসাভুভু লিওপোল্ডভিলেতে মিলিত হয়ে কঙ্গোতে শান্তি স্থাপন ও স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করবেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর অপসারণের পর কঙ্গোর প্রয়োজনে অন্যান্য আফ্রিকান রাষ্ট্রকে সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে কাসভুভু আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের চিঠি দিয়েছেন। আগামী ১৭ই জুলাই কায়রোতে আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের যে সম্মেলন হবে, তাতে এই বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

সাইপ্রাস:

সাইপ্রাসের ব্যাপারে তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে একটা মতৈক্য স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন যে চেষ্টা করছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউমের প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। জনসন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনু ও গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপিনড্রিউ-এর মধ্যে সাক্ষাৎ ও সরাসরি আলোচনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাতে রাজি হন নি।

• পাপিনড্রিউ ও ইনোনু

ইসমেট ইনোনু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ওপর রীতিমত চটেছেন। তাঁর ধারণা, তুরস্কের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে এরা সমর্থন করছে না। সাইপ্রাসে গ্রীকদের হাত থেকে সংখ্যালঘু তুর্কীদের রক্ষা করার জন্য তুরস্কের যুদ্ধ করার অধিকার আছে, এই হল ইনোনুর বক্তব্য।

তুরস্ক সাইপ্রাসের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন দাবী করে—বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে তুর্কীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তুরস্কের দাবী, হয় সাইপ্রাসকে বিভক্ত করে গ্রীক-প্রধান অংশ ও তুর্কী-প্রধান অংশকে পৃথক রাজ্যরূপে গঠন করে একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' রাষ্ট্র গঠন করা হোক, অথবা সাইপ্রাসকে ভাগ করে গ্রীক-প্রধান অংশ গ্রীসের সঙ্গে

• ম্যাকারিয়স

ও তুর্কী-প্রধান অংশ তুরস্কের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। 'এনোসিস', বা সংযুক্তিকরণ যদি করতে হয়, তবে তা 'ডবল এনোসিস' হবে—কেবল গ্রীসের সঙ্গে নয়, গ্রীস ও তুরস্ক উভয়র সঙ্গেই হবে।

ইনোনু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতিকে সতর্ক করে বলেছেন, তুরস্কের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে যদি গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসকে যুক্ত করা হয়, তবে তুরস্ক 'লসেন চুক্তি' অস্বীকার করবে। 'লসেন চুক্তি' অনুযায়ী এজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপের ওপর তুরস্ক গ্রীসের অধিকার মেনে নিয়েছিল। তুরস্ক তা হলে এই সব দ্বীপের ওপর আবার দাবী জানাবে।

এদিকে প্রাক্তন 'ইয়োকা' নেতা জেনারেল জর্জ গ্রিভাসের সাইপ্রাস আগমনকে কেন্দ্র করে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সাইপ্রাসবাসী তুর্কীরা গ্রিভাসের আগমনকে ভাল চোখে দেখে নি। গ্রীক ও তুর্কীরা পরস্পর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে, গ্রিভাসের এই শুভেচ্ছাকে ব্যঙ্গ করে তুর্কী নেতারা বলেছেন, এই সহযোগিতা হবে 'প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে।' গ্রিভাসের সাইপ্রাস আগমনের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসের তুর্কী উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ ফজিল কুচুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন।

গ্রিভাস ঘোষণা করেছেন, রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সের নেতৃত্বে তাঁরা সাইপ্রাসের উন্নতির জন্য কাজ করবেন। নিকোসিয়ায় ম্যাকারিয়স ও গ্রিভাসের প্রতিকৃতি নিয়ে উল্লসিত জনতা গ্রিভাসকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। কিন্তু গ্রিভাস ও ম্যাকারিয়স কি এক সঙ্গে চলতে পারবেন? ম্যাকারিয়স স্বাধীন সাইপ্রাসের পক্ষে আর গ্রিভাস গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের একীকরণ চান। ম্যাকারিয়স সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতে চান, আর গ্রিভাস উগ্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষী।

পাকিস্তান :

আগামী নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ কনভেনশন মুসলিম লীগ দলের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং এই নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করবেন এ একরূপ নিশ্চিত। পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী সমগ্র রাষ্ট্রে মাত্র ৮০ হাজার "বেসিক ডেমোক্রাট" রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। এই ৮০ হাজার ভোটদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই নানাভাবে আয়ুবের অনুগ্রহভাজন।

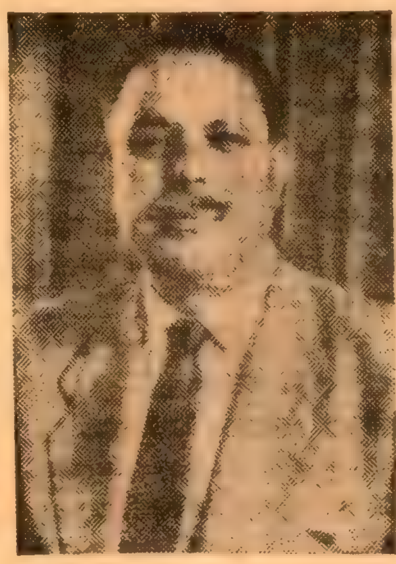

• আয়ুব খাঁ

তবু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলছে। আয়ুবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কোন প্রার্থী দাঁড় করানো যায় কিনা, তার জন্য চেষ্টা চলছে। কায়েদে আজম জিন্নার ভগিনী ফতেমা জিন্নাকে আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রার্থীরূপে দাঁড় করানোর জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করছেন শোনা গিয়েছে। সম্প্রতি আর একটি সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর আজম খাঁ আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবছেন। আজম খাঁ এক সময় আয়ুবের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে আজম খাঁর জনপ্রিয়তা আছে। এক্ষেত্রে আয়ুব বিরোধী সকলের সমর্থন পেলে আজম খাঁ আয়ুবের বিরুদ্ধে ভালরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন বলে অনেকে আশা করছেন।

• • •

লাহোরে খাজা নাজিমুদ্দিনের একটি বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাজিমুদ্দিন যখন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন মার্কিন দূতাবাসের জনৈক পদস্থ কর্মচারী পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মার্কিন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এই জন্য এই মার্কিন কর্মচারীকে তিরস্কার করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে খাজা নাজিমুদ্দিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা কারও নেই।

মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনের এই বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়া দূরের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর প্রতিও খাজা নাজিমুদ্দিনের বিশেষ সহানুভূতি নেই। ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে জেহাদ ঘোষণাতেও খাজা সাহেবের বেশ উৎসাহ আছে। লাহোরে তিনি আরও ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীরের পূর্ণ পাকিস্তানভুক্তি তো চাই-ই, ভারতের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড় ও মানভাদার 'উদ্ধারের' জন্যও তাঁর কাউন্সিল মুসলিম লীগ দল চেষ্টা করবে। অথচ এই নাজিমুদ্দিনই এক্‌ন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা।

একটি উপন্যাসের খসড়া

ঝর্না রায়চৌধুরী

এখানে এই বাগানের নিরিবিলিতে বসে আজই মনে মনে অনেকদিনের ভেবে রাখা উপন্যাসের খসড়াটা ঠিক করে নেবে রমা। চারদিকে আম, সজিনা, পেয়ারা আর শালগাছের ছড়াছড়ি। বাতাসে-কাঁপা পাতার ছায়াগুলো সরে সরে যাচ্ছে চঞ্চল হয়ে। এখানেই এই আলো-ছায়া আর ঝিরিঝিরি হাওয়ার মাঝে গায়ের চাদরটা জড়িয়ে আরাম করে বসল রমা।

না, উপন্যাসের নায়িকাকে নিয়ে তার আর ভাবনা নেই। কারণ উপন্যাসের নায়িকার রূপ নিয়ে সব ভাবনা তার শেষ। ওর বন্ধুরা ওর কথা শুনে মুখ বেঁকিয়ে হাসে। অথচ রমা বুঝতে পারে না। কেন, নায়িকা হতে গেলেই সুন্দর হতে হবে কেন?

সেই আদ্যিকাল থেকে দেখে আসছে যে প্রতিটি লেখকের কল্পনায় সব নায়িকাই সুন্দরী, অনুপমা, তিলোত্তমা, অতুলনীয়া,—কি নয়? যার কোনও তুলনা নেই, সেই হবে নায়িকা। কিন্তু রমা মোটেই তা সইতে পারে না। এখনকার লেখকেরা আবার আরেকটু সরেস। তাদের যে একটুখানি উদার হ'তে এত কুণ্ঠা কিসের তা ও বুঝে উঠতে পারে না। যার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ জড়িয়ে তুমি খুবই সাধারণ একটা গল্প লিখবে, তাকেও কেন অসাধারণ রূপের অধিকারিণী করা? শুধু কি তাই? সাধারণ ক'রে নিয়েও তাকে আবার কোনও ভাবে ঘুরিয়ে একটু অসাধারণ করা চাই। হয় কালো, কিন্তু খুব মিষ্টি কালো অথবা উজ্জ্বল শ্যাম—মাজা মসৃণ চিক্কণ শ্যাম—আর কি না হোক, অন্তত একজোড়া কালো হরিণ চোখ, আর তাও যদি না হোল তবে চিবুকের সুডৌল ডোলটুকু, যা হোক কিছু একটা চাই-ই চাই। হুঃ—পড়লে গা জ্বালা করে। কই—রমার চেনা-জানা, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কম করে ৩০।৩৫ জন কালো মেয়ে আছে। অমন মিষ্টি কালো রং তো কারও চোখে পড়ে নি? আর যারা কালো মেয়েকে হিরোইন করে একটু নতুনত্বের চমক দিতে চেয়েছেন তাদের হাবভাবটাই এমন যেন তারা ঐ একটি কালো মেয়েকেই জানেন যার অমন মাধুর্য আছে যা দুর্লভ। রমা আজকাল কোনও গল্প বা উপন্যাস কিছু পড়বার আগেই দেখে নেয় নায়িকা সুরূপা, না দেখতে নেহাৎ মোটামুটি।

সৌন্দর্যবোধের এই পক্ষপাতিত্ব ও সর্বনাশা রূপটি নিয়ে এত চিন্তা এসেছে সেদিন থেকে, যেদিন তার এক বন্ধু আত্মহত্যা করল। প্রীতি মরল, কিন্তু রমা জানে—একটি মৃত্যুর জন্যে দায়ী এই রূপ। আর রূপের প্রতি তার স্বামীর মোহ। প্রীতির বোন প্রীতির চেয়ে শতগুণ দেখতে ভালো ছিল। আর তাকে ঘিরেই তার স্বামী এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব করল, যে দুঃখের জ্বালায়, যন্ত্রণায়—অপমানে প্রীতি আত্মহত্যা করল। সেদিন থেকে রমার মাথায় এই উপন্যাসের প্লটখানা ঘুরছে। সে লিখবে, সৌন্দর্য-মুগ্ধতা স্বাভাবিক, কিন্তু এই মুগ্ধজাত আকর্ষণ মানুষের মনের কুশ্রীতাকে প্রকাশ করে এবং তার উপন্যাসের নায়িকার রূপ হবে, সাধারণের চেয়েও সাধারণ। আমাদের ঘরের ও পথের এই অতিচেনা মেয়েটির জীবনের উপন্যাস পাঠকমহল কেমনভাবে নেবে—তা ও পরখ করে দেখবে।

কলকাতার ভিড় ছেড়ে তাই রমা এসেছে এখানে। এখানে মানুষ কম। পরিবেশটা ফাঁকা। আর এই

অবসরের প্রহরগুলোয় সে তৈরি করে নেবে তার উপন্যাসের প্লটখানা। অতি সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তা বিবাহ। সন্তানসন্ততি। রূপ ও রূপহীন—দুই মা বে তার গল্পের ভেতর। কিন্তু নায়িকার মাতৃত্বের কাছে রূপ বড় নয়—চেহারার দেমাক তুচ্ছ কিন্তু কেমন-ভাবে এগুলো সে পরিবেশন করবে? চরিত্রগুলোর বিকাশ কোন্ কোন ঘটনার ও বিশ্লেষণের সাহায্যে কেমন করে প্রকাশ করবে—তারই একটা সুস্পষ্ট ধারা ও গড়ে নিতে চায় তার মনের ভেতর—তারপরেই ও লিখতে সুরু করবে।

চিন্তায় বাধা পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে এল বুলি আর ডলি। বুলির ডল পুতুলটা ডলি দিচ্ছে না। ডলি দেবে না। রমা বলল, ডলি, তোমারও তো এ রকম ডল আছে। তুমি বুলিরটা দিয়ে দাও। ডলি ডল পুতুলটা দু'হাতে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরল।

রমা বলল, দেবে না? আচ্ছা, তোমার ডলটা নিয়ে এস।

বুলি এবার কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওরটা ভাঙা।

রমা বুঝল এবার। ডলিকে বলল, তোমারটা ভেঙে গেছে বলে তুমি বুলির ডলটা নিয়েছ। কিন্তু বুলিরটা ভেঙে গেলে বুলি যদি তোমারটা চাইত—তুমি দিতে?

—আমি তো ছোট, ডলি ঠোঁট ফোলালো। ছোটদের তো দিতে হয়।

শুনে রমা হাসল এবার। কথা-গুলো ডলির নয়। কথাগুলো ওদের মা'র। রমা এসে অবধি এইরকম ঝগড়ার মীমাংসা করছে। কিন্তু রমার দিদি উমার তা সব সময় পছন্দ হচ্ছে না। উমা চায় দুজনকে সব সময় এক রকম জামা-কাপড় দিতে, এক রকম খেলনা দিতে। কিন্তু মুশকিল বাধে ঝগড়া লাগলে। উমা ছোট মেয়েকে একটু যেন বেশি স্নেহ করে বলে মনে হয়। বোধ হয় কোলের মেয়ে—তাই।

বুলি আর ডলি। মাথায় প্রায় দুজনেই এক। স্বাস্থ্যও একই রকমের। একই ধরণের জামা পরায় দূর থেকে দুজনকে চিনতে অসুবিধা হবার কথা—কিন্তু তা হয় না। কারণ, বুলি তার মায়ের মত। ডলি তার বাবার মত। বুলির মা কালো। ডলির বাবা গৌর। রমা সেদিন দু'বোনের একটা সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে বললে, ডলি, বুলি তো তোমার বোন। তোমার দিদি। দিদির গায়ে হাত দিতে আছে। তুমি ওর চুলের মুঠি ধরে টেনেছ কেন?

—ও কেন আমার ছবিটা বিশ্রী হয়েছে বলল।

—তাই বলে মারবে কেন? মারলেই কি তোমার ছবিটা সুন্দর হয়ে যাবে?

এমন সময় উমা এল সেখানে। বললে, দেখ রমা, বুলিকে অত প্রশ্রয় দিবি না। মেয়েদের অত আহ্লাদ দেওয়া ভালো নয়।

রমা একটু অবাক হল। বলল, আহ্লাদ আমি দুজনকেই দিই।

উমা বললে, সে কথা হচ্ছে না। বড় হয়ে ছোটকে যদি কেউ হিংসে করতে শেখে তবে সংসারে সে অনেক ঠোকর খায়। ত্যাগ জিনিষটা ছোট-বেলা থেকেই মেয়েদের শেখা উচিত।

উমার এ কথার পর আর কোন জবাব দেয় নি রমা। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। উপন্যাসের খসড়া তৈরি করা যে এত ঝামেলার তা আগে জানত না রমা। বিশেষ করে এই সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বটা তাকে বড় ভাবাচ্ছে। আরও তাকে ভাবিয়ে তুলেছে তার দিদি। ওর মনে এখন একটা সংশয় ঢুকেছে স্নেহের ভেতর উনিশ-বিশ হয় নাকি। মায়ের কাছে তো সব সন্তানই সমান। তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আহ্লাদ তো একই রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে মায়ের মনে? রমা ভাবছে। আজকাল এই কথাটাই ভাবছে।

ভাবনাটা হঠাৎ জটিল হয়ে উঠল। কাছাকাছি কোন একটা ক্লাবে ছোটদের কি একটা সিনেমা দেখাবার কথা। বুলি আর ডলি যাবে তাদের বাবার সঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ জ্বর এসে গেল ডলির। ডলি কান্না সুরু করে দিল। আর ডলির জ্বরের জন্যে বুলির যাওয়া বন্ধ শুনে বুলির চোখ ছল-ছলিয়ে উঠল।

রমা বলল, সিনেমা আবার আসবে। তখন দেখবে। জ্বর গায়ে তো কেউ সিনেমায় যায় না।

বুলি বলল, আমার তো জ্বর হয় নি। আমি যাব না কেন?

—কেমন করে যাবে। ছোট বোনকে ফেলে একলা একলা যেতে ইচ্ছে করবে? রমা বললে। এই দেখো না, ডলির জ্বর হয়েছে দেখে তোমাদের বাবাও যাবেন না। কই, তিনি তো না যেতে পেরে তোমার মতন কাঁদছেন না।

কিন্তু উমা বলল অন্য কথা। উমা বলল, তা হবে কেন? জ্বর হয়েছে ডলির, ডলি যাবে না। তার বদলে তুই যাবি।

—না, আমি যাব না।

—কেন যাবি না!

রমা যায় নি। উত্তরও দেয় নি। ভেবেছে দিদি ঠিকই বলেছে। বুলিই হোক, ডলিই হোক—দুজনেই তার মেয়ে। সেখানে স্নেহের কমতি নেই।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার চিন্তায় পড়ল রমা। ডলির জ্বর ছাড়ার পর ওরা সবাই মিলে দোকানে এসেছিল। ডলির বায়না ছিল খেলনা কেনবার। কিন্তু খেলনার বদলে ডলির পছন্দ হয়ে গেল একটা মণিপুরী পুতুল। সেটা তো কেনা হবেই—কিন্তু বুলির মুখখানা ততক্ষণে করুণ হয়ে এসেছে। চোখ দুটোয় বোধ হয় এবার জল এসে পড়বে। কারণ দোকানী জানিয়েছে এর জোড়া তার কাছে নেই। বুলির মুখের দিকে

তাকিয়ে কি যেন কেন রমার হঠাৎ একটা খেয়াল হল। সে বললে, ডলি, এরকম তো আর নেই। তার চেয়ে বরং আমরা অন্য জিনিষ কিনি। তোমারও হবে, বুলিরও হবে। ডলি নাছোড়বান্দা। সে পুতুল ছাড়বে না। অন্য জিনিষ নেবেও না। দোকানের ভেতর আর কিছু বলা গেল না। বুলিকে অন্য একটা পুতুল কিনে দেওয়া হল। কিন্তু বুলির মুখে হাসি ফুটল না।

উমা বললে, মেয়ের সবটাতে বাড়াবাড়ি। ছোট বোনকেই ভালোটা দিতে হয়—এবার থেকে এই কথাটা শেখো।

আবার চোখে জল এসে পড়ল বুলির। রমা শুধু দেখল। কোন কথা বলল না।

রমা এবার ভেবেছে, আর দেরি করবে না। এবার উপন্যাসটা আরম্ভ করবে। আর ভাবাভাবি নয় একেবারে আজই লেখায় হাত দেবে। স্যুটকেস খুলে নিজের পাততাড়ি থেকে মোটা খাতাখানা আর কলমটা বার করেছে।

হঠাৎ বাচ্চাদের আর দিদির জোর চীৎকার কানে আসে। দৌড়ে বেরোয় ঘর থেকে। ওদিকে যায়। কি হোল আবার?

কি সাংঘাতিক। দুই বোনে দুপুরে মায়ের বিশ্রামের সুযোগে রান্নাঘরে বসে রান্নাবাড়ি খেলবে বলে ভেবেছিল সত্যি সব জিনিষ দিয়ে। স্টোভ নিয়ে আরম্ভ করতে যায় বোধ হয়। সেই স্টোভ উলটিয়ে কেরোসিনে আগুন লেগে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে যায়। আর তাতেই আগুন ধরে গেছে বুলির জামায়। এদিকে শীতকাল বলে গায়েও দু-তিনটে করে জামা। জামার চারদিক জ্বলছে। ডলির অবশ্য কিছুই হয় নি, আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়ে, ভীষণ ভয়েই চীৎকার ক'রছে। উমা চেঁচাচ্ছে আতঙ্কে। এ কি সর্বনাশ হ'ল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। আর এদিকে বুলি সারা বারান্দা দৌড়ুচ্ছে। এর মধ্যে চুলেও আগুন ধরেছে। সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝতে রমার বোধ হয় মিনিট-খানেক সময় লেগেছিল সবশুদ্ধ। তারপরই সে এদিক-ওদিক চেয়ে দৌড়ে গেল ওদিকের বারান্দায়। সেখানে রোদে দেওয়া লেপটা বারান্দায় ঝুলছিল রেলিংয়ে। সেটা নিয়ে এসে বুলিকে চাপা দিয়ে মাটিতে জোর ক'রে শুইয়ে দিল। এর পর আগুন নিভতে বিশেষ সময় লাগল না কিন্তু ততক্ষণে বুলির মুখ আর পিঠটা বেশি রকম পুড়েছে। সামনের বাকী দিকটা একটু কম। যন্ত্রণায় বেচারী খুব চেঁচাচ্ছে। উমা তো হাউমাউ ক'রে কাঁদছে, কি হবে।

সন্ধ্যের পর উমা আর রমা, দু'বোনে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। হাসপাতাল থেকে ফিরছে ওরা। বুলির অবস্থা ভালোই তবে মুখ আর পিঠের দিকের কয়েক জায়গায় চামড়া কিছু কিছু কুঁচকে থাকবে এই পর্যন্ত মাত্র। প্রাণের আশঙ্কা একেবারেই নেই। ডাক্তাররা জোরগলায় ভরসা দিয়েছে। তারপর উমার মুখে হাসি ফুটেছে।

রমা সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললো—দেখ দিদি, ভাগ্যের জোর বলতে হবে যে, মেয়েটার প্রাণটা বেঁচে গেল।

—হাঁ, জোর ব'লে জোর। সর্বনাশ হ'তে হ'তে বেঁচে গিয়েছে।

—আর তাছাড়া দুজনেরই তো এক সঙ্গে পুড়তে পারতো। ওরা তো এক জায়গাতেই ছিল। মাত্র একজনের ওপর দিয়ে বিপদটা গেছে এটাও মন্দের ভালো, ভগবানের আশীর্বাদ বইকি।—রমা বলে।

—আমার কি মনে হচ্ছে জানিস রমা? যদি এটা বুলির না হ'য়ে ডলির হ'ত? বাবা: সেতো আরও সাংঘাতিক। ভাবতেই পারি না। কল্পনাতেই যেন শিউরে ওঠে উমা।

—কেন? ঐ এক ব্যাপারই হোত। প্রাণের আশঙ্কা হয়তো ডলিরও থাকত না যেমন বুলির নেই।— রমা উত্তর দিল।

—একই ব্যাপার হোত? তুই বলছিস কি রমা? ডলির মুখটা দেখতে একেবারে খারাপ হয়ে যেত না? বাব্বা। সে আমি ভাবতেও পারছি না। —বলতে বলতে যেন শিউরে উঠল উমা।

রমা চমকে উঠল ভীষণ। দিদির দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই মনে মনে তার অত সাধের সেই কল্পনার উপন্যাসকে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়তে থাকল।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

● হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের ছন্দসী দৃশ্য

অরণ্যের কাল থেকে অধুনা-কালের হ্যারিংটন ষ্ট্রীট

জন্ম তাঁর দূর-পাশ্চাত্যের দ্বীপ-পুঞ্জে। বংশানুক্রমের সংস্কারেই তিনি নামধারণ করেন হ্যারিংটন। তাঁর তেজস্বিতার উন্মোচন ঘটে শৈশবে; আর কৈশোর থেকেই সুরু হয় তাঁর বিচিত্রমুখী অভীপ্সার মাল্য-বিরচন। সমুদ্রের বেলাভূমিতেই তাঁর আলোক-দর্শন ঘটে প্রথম। সেখানে জন্মলগ্নেই তাঁর শ্রুতিন্দ্রিয়ে সাড়া দিয়েছে সমুদ্রের গান। তারপর দিনে দিনে, সমুদ্রের সঙ্গেই তাঁর নিবিড় হয়ে ওঠে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। সমুদ্র তাঁকে আলিঙ্গন দেয় বার বার, কিন্তু ধরা দেয় না সম্পূর্ণ। অথচ তাকেই ধরবে ব'লে হ্যারিংটনের কিশোর মানসে বাজে ঝঞ্ঝার করতাল। তিনি জানেন: সমুদ্র বিশাল; তার অপার বিস্তৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আদি-অন্তের সাক্ষাৎলাভ অসম্ভব। তাকে জয় করতে হ'লে, শরণ নিতে হবে তার উত্তাল তরঙ্গমালায়। তারপর বিস্ময়ের হাল ধরে এবং কৌতূহলের দাঁড় ঠেলে, ভেসে যেতে হবে দূর থেকে দূরে, আরও দূরে—দিগন্ত যেখানে অবনত-মুখে বিমূঢ়!

সম্ভবত সে-কারণেই যখন তাঁর পায়ের কাছে এগিয়ে আসে যৌবনের প্রথম সোপান, তখন থেকেই তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তোলে সমুদ্রপথে দূর-অভিপ্রয়াণের বাসনা। তিনি স্বদেশেই সমাধা করেন তাঁর শিক্ষা। আইনের ছাত্ররূপে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী তিনি। তাই তাঁর স্বদেশ তাঁকে অভিষিক্ত করতে চাইলো বিশেষ এক যোগ্যতম পদে। কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বিনিময়ে একজন সামান্য কর্মচারীরূপে নিয়োগপত্র গ্রহণ করলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে ভেসেই তিনি আবিষ্কার করার সুযোগ

শ্রীপদাতিক

পেলেন সমুদ্রকে। সমুদ্রের আদি-অন্ত উর্মিমালায় দুলতে দুলতে, তিনি ভারতে এসে পৌঁছলেন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে, তাঁর কার্যক্রম সুরু হয় প্রথমত মাদ্রাজে। তারপর সেখানেই কী-এক যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে, তিনি একজন সাধারণ কর্মচারীর পদ থেকে উক্ত কোম্পানীরই 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর অন্যতম সদস্যপদে উত্তীর্ণ হন। তারপর সেই যোগ্যতম পদে বহাল থেকেই তিনি কলকাতায় আসেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে।

তখন কলকাতার সেই Road to Kalighat সুদীর্ঘ হলেও, সংকীর্ণ। সেই সংকীর্ণ পথের উভয়-পার্শ্ববর্তী বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে অরণ্যের বিলোপ ঘটে নি তখনো। তবে আজ যে-প্রশস্ত পথ চৌরঙ্গী রোড নামে প্রখ্যাত, তৎকালীন Road to Kalighat-এর ঠিক সেই অংশেরই পূর্বপ্রান্তিক ভূমি-খণ্ডে অরণ্যের রূপ ছিল অনেকটা উদ্যান-সদৃশ। তার পরিবেশ ছিল নির্লিপ্ত, নির্জন এবং সে-কারণেই যেন অলিখিত কাব্যের অনুরণন জাগাতো তার প্রত্যহের মর্মরধ্বনি। এ-অংশের এই সার্বিক পরিবেশে মন মজেছিল কোনো এক ধর্ম-যাজকের—যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিলেন এ-দেশীয় ইংরেজ মহলের কুলগুরু। তখনই তিনি কোম্পানীর খরচে এ-অংশে নির্মাণ করেন গীর্জা-প্রতিম যে-বসতবাটী, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমপর্বে হ্যারিংটন সেই বসতবাটীকেই নিজ বসবাসের গৃহরূপে নির্বাচন করেন। এখানে এসেই তিনি এ-দেশের সাহিত্য-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন অবসর সময়ে। অবশ্য এর পশ্চাতে ছিল মনীষী উইলিয়াম জোন্সের পরোক্ষ অনুপ্রেরণা। সম্ভবত তাঁরই নির্ধারিত পথ অনুসরণ ক'রে হ্যারিংটন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অনুবাদ করেন ফার্সী এবং আরবী ভাষায় রচিত শেখ সাদীর কিছু মূল্যবান গ্রন্থ—যা অনুবাদের পর একযোগে এক বৃহৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং নামধারণ করে "The Persian and Arabic works of Sadi."

ঠিক এই সময়ে, সেকালের একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী—যাঁর সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনো সংযোগ ছিল না—তাঁর সঙ্গেই এক জটিল মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। উক্ত ইংরেজ ব্যবসায়ীর স্বপক্ষে ছিলেন একজন ফিরিঙ্গী ব্যারিস্টার—যাঁর ক্ষুরধার যুক্তি খণ্ডন করা কোম্পানী-নিযুক্ত কোনো

আইনজীবীর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ এই মোকদ্দমায় যদি পরাজয় বরণ করতে হয় কোম্পানীকে, তাহলে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষের কেবল যে মর্যাদাই হানি হবে তা নয়, বাস্তবার দিক থেকেও তাদের ক্ষতিপূরণ হবে অনেক এবং খেসারত দিতে হবে প্রায় কয়েক কোটি টাকা। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁদের এই বিপদের সংবাদ যথাসময়ে অবগত হন হ্যারিংটন সাহেবও এবং অবগত হয়েই তিনি উক্ত মোকদ্দমার নথিপত্র অনুধাবন করেন বেশ মনোযোগ সহকারে। তারপর তিনি স্বেচ্ছায় একজন আইনজীবীরূপে উক্ত ফিরিঙ্গী ব্যারিস্টারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ব'লে প্রস্তাব পেশ করেন কোম্পানীর কাছে। কোম্পানী তাঁর এই প্রস্তাব সানন্দেই গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উক্ত মোকদ্দমার একজন অন্যতম Lawyer রূপে নিযুক্ত করেন তাঁরা। বলা বাহুল্য, যুবক হ্যারিংটন অনায়াসেই উক্ত ফিরিঙ্গী ব্যারিস্টারের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন ক'রে বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন কোম্পানীর স্বপক্ষে। তাঁর এই বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তায় বিশেষভাবেই চমৎকৃত হন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। তাঁরা খুশি হয়ে হ্যারিংটনকে এবার নিযুক্ত করেন সদর দেওয়ানি আদালতের একজন উচ্চতম বিচারপতির পদে। এই বিচারপতির পদপ্রাপ্তি ঘটে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এবং তখনই হ্যারিংটন রচনা করেন "Analysis of Lands and Regulations."

তারপর শুধু বিচারপতিই নন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বোর্ড অব রেভিনিউ' বিভাগের প্রধান সদস্যপদ অধিকার ক'রে গভর্নর জেনারেলের এজেন্টের পদে অভিষিক্ত হন। তারপর ১৮২৫ থেকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বোর্ড অব ট্রেড'-এর সম্মানীয় সভাপতির পদে অলঙ্কৃত থাকেন তিনি। সম্ভবত ১৮২৭ খৃষ্টাব্দেই তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল সেখানেই অবসান ঘটে তাঁর কর্মক্লান্ত জীবনের।

হ্যারিংটন সাহেবের মৃত্যুর পর দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কিছুকাল। এদিকে-ওদিকে বিলোপ সাধিত হয় অরণ্যের। অভিরাম ছন্দে পরিসর বৃদ্ধি ঘটে শহর-কলকাতার। সুশোভন সরণীতে রূপান্তর লাভ করে Road to Kalighat. তার প্রধান অংশ আরও প্রসারিত হয়ে, সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা কিছু আগেই নামধারণ করে চৌরঙ্গী রোড। আর এই চৌরঙ্গী রোডের পূর্ব-পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডে সেই যে উদ্যান-সদৃশ অরণ্যের অস্তিত্ব ছিল হ্যারিংটন সাহেবের আমলে—যেখানে তিনি বসবাস করতেন এক গীর্জা-প্রতিম গৃহে—তারই সম্মুখবর্তী পথটি নাতিদীর্ঘ হলেও, তার সামগ্রিক পরিবেশেও বিভূষণ ঘটে এক রাজকীয় মর্যাদার। শোনা যায় : এ-দেশবাসীদের আবেদনেই পরে সে-রাস্তার নামকরণ হয় 'হ্যারিংটন স্ট্রীট', যার অমলিন দেহলতা আজও বহন ক'রে চলেছে ইংরেজ-ঐতিহ্যের এক স্মরণীয় স্বাক্ষর।

হ্যারিংটন স্ট্রীটের সামগ্রিক সাযুজ্য হ্যারিংটন সাহেবকেই স্মরণ করায় বারে বারে। শহর-কলকাতার অন্য যে-সমস্ত রাস্তা আরও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে—তাতে এ-দেশীয়দের কোনো সমর্থন আছে ব'লে জানা যায় নি। কিন্তু হ্যারিংটন স্ট্রীট নামকরণ হয়েছে এ-দেশবাসীদের আবেদনেই। কারণ হ্যারিংটন ছিলেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মতোই বিদ্যোৎসাহী এবং একজন অকৃত্রিম বন্ধু ভারতীয়দের। অজ্ঞ ভারতীয়দের মধ্যে সহজ শিক্ষা বিস্তারের অবদান তাঁর অপরিমেয়। কিছুকালের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি যখন আইনের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিই তাঁর অনুরাগ ছিল অধিকতর। তাঁরই সহৃদয় সাহচর্যে এ-দেশীয়দের মধ্যে সেদিন যাঁরা সত্যই আইন-অধ্যয়নে পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন—তন্মধ্যে পরবর্তী-কালের বিখ্যাত আইনজীবী মুন্সী আমিনউদ্দীন আহমেদ এবং বাবু জগন্নাথ সিংহ অন্যতম। তাছাড়া এ-দেশীয় দরিদ্র-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে হ্যারিংটন সাহেবই প্রতিষ্ঠা করেন 'স্কুলবুক সোসাইটি'। অবশ্য এই প্রচেষ্টার পেছনে স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টেরও সহযোগিতা ছিল অকৃত্রিম। 'স্কুলবুক সোসাইটি'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : ইংরেজী এবং এ-দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ক'রে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতি সুলভমূল্যে অথবা বিনামূল্যেই বিতরণ করা। এ-সম্পর্কে নিষ্ঠাবান গবেষক শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

"ইং ১৮২৭ সনের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য—ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্মপুস্তক ছাপা ইহার বিধি-বহির্ভুত ছিল। এই সোসাইটির পরিচালনার ভার ... এইচ হ্যারিংটন, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, ডব্লিউ বি বেলি, উইলিয়াম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির উপর ছিল।------কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরে কমিটির সভ্যগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে-আন্দোলন সুরু করেন, তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন

সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়।---" যাই হোক, এই হ্যারিংটন সাহেব নামাঙ্কিত হ্যারিংটন স্ট্রীট চৌরঙ্গীর এক উপরাস্তা হিসেবে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যরেখা অতিক্রম করেও, সে তার সারা বুকের কোথাও ধারণ করে নি কোনো সর্পিলতার চিহ্ন। বরং দিনে দিনে তার লাবণ্য আরও বাড়ছে। আজকাল এই পথে যে-সমস্ত রমণীয় বসতবাটীর সমাহার ঘটেছে—সেগুলিও বিরল দৃষ্টান্তের এক সংঘবদ্ধ চিত্র। এখানে আজিমগঞ্জের নবাব মির্জা মোহাম্মদ রফির আবাসগৃহ যেমন উদ্যান-শোভিত, তেমনই লেঃ কর্নেল গো এবং লেঃ কর্নেল বার্কলে হীল সাহেবের বসতবাটীও বিচিত্র তরুলতার হরিৎ-সাযুজ্যে চির নবীন। স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনিন্দ্য নিবাসগৃহেরও অধিষ্ঠান ঘটেছে এখানেই। বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বিশাল সুদৃশ্য অট্টালিকা। তার সামনে-পেছনে সুবিন্যস্ত উদ্যান বহুবর্ণের পুষ্পমেলায় সমৃদ্ধ। এখানে পল্লবিত বৃক্ষরাজিরও অভাব নেই। সব মিলিয়ে তার সার্বিক পরিবেশের যে-বিকাশ ঘটেছে—তা নিঃসন্দেহেই নিদর্শনযোগ্য।

এ-পথে বিভিন্ন বসতবাটী ছাড়াও বৃটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের কার্যালয় এবং অন্য আরও দু-একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিন্যাস ঘটেছে। তাই সকালে-সন্ধ্যায় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের সংযত পদ-সঞ্চার লক্ষ্য করা যায় এ-পথেও।

আজ যে-অংশে হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা তার পূর্ববর্তী ওলন্দাজ বণিকদের ভারতে আসার অনেককাল আগে সে-অংশই যে সমাচ্ছন্ন ছিল গভীর অরণ্যে—তা জানা যায়। কিন্তু তার প্রকৃত চিত্র বা পরিবেশের সঠিক বিবরণ কোথাও নেই। সেকালে উল্লেখিত অরণ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো কারা—তারও কোনো ইঙ্গিত নেই কোনো ইতিহাসে। তবে কিংবদন্তী আছে : তখন সেই গভীর অরণ্যের অন্তরালে একাকী সাধনা করতেন একজন গাজী বা ফকির। তিনি ছিলেন নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথের সম-সাময়িক। চৌরঙ্গীনাথের সঙ্গে নাকি তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল বহুবার।---

তাজী নামে এক বলিষ্ঠ ঘোড়া ছিল গাজী সাহেবের। সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি মাঝে মাঝেই নাকি অরণ্যের বাইরে এসে, সাক্ষাৎ করতেন তাঁর সাগরেদ বা শিষ্যদের সঙ্গে। এই সাগরেদ বা শিষ্যদের বসতি অঞ্চল ছিল অরণ্যের পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। গাজী সাহেব যেদিন ইহলোক ত্যাগ করেন, তার আগের দিন তিনি নাকি নিজেই এসে তাঁর সাগরেদদের খবর দেন যে, তিনি দেহত্যাগ করবেন। অতএব সাগরেদরা যেন যথাসময়ে অরণ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর শবদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করে।

পরদিন সত্য সত্যই নাকি সাগরেদরা তাঁর শবদেহ খুঁজে পায় অরণ্যের গভীরতম অংশে এবং সেখানেই তারা তা সমাধিস্থ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। তারপর আনুষ্ঠানিক মোনাজাত বা প্রার্থনার পর তারা ফিরে আসে তাদের বসতি-অঞ্চলে।

তারপর অনেক যুগ কেটে যায়। দেখতে দেখতে আসে হ্যারিংটন সাহেবের আমল। সেই আমলে যখন অরণ্যের সংস্কার সাধন সুরু হয়, তখন নাকি গাজী সাহেবের সেই সমাধির চিহ্ন আবিষ্কার করেছিল কেউ কেউ। তাছাড়া হ্যারিংটন সাহেবের বসত-বাটীর আশেপাশে স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করে যে-দরিদ্র জনসাধারণ, তারা নাকি প্রায়ই গভীর রাত্রে শুনতে পেতো অশরীরী গাজী সাহেবের জিগীর। মাঝে মাঝে তাঁর অশ্ব-খুরধ্বনিও নাকি হৃৎ-কম্প জাগাতো অনেকের।

এ-সমস্ত কিংবদন্তীই। সুদূর অতীতের বলেই বেশ খানিকটা কৌতূহলোদ্দীপক এবং নিছক গল্প-রূপেই এ-সমস্তের কিছু মূল্য নিরূপণেরও আয়োজন হয়তো চলতে পারে। কিন্তু এখানে কোনো ইতিহাসের উপকরণ আছে ব'লে বিশ্বাস করা কঠিন।

স্যার বীরেন মুখার্জীর সুশোভন বসতবাটীর বহির্দৃশ্য

দুইকূল

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় ক্লান্ত আমি। এক পাও হাঁটতে পারছি না। তবু থামতে একটুও ইচ্ছা নেই। কিন্তু পারলাম না। আমার এই অবসন্ন নিস্তেজ দেহটাকে নিয়ে টেনে-হিঁচড়ে এগিয়ে চলা আর গেল না। কাছেই, উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপর বসে পড়লাম।

পঁচিশ বছর আমার বয়েস। বাবার দেওয়া হাতঘড়িটাই সে কথা মনে করিয়ে দেয়। বাবা নেই। মারা গেছেন পাঁচ বছর হল। আমি জানতাম, তখন আমার কুড়ি চলছে।

রাস্তা দিয়ে দু-চারজন বেশ সহজেই হেঁটে যাচ্ছে। অন্তত অবসাদ নেই চলায়। কেউ কেউ তাচ্ছিল্যভরে আমার দিকে তাকিয়েও গেল। কিন্তু ক্লান্তিভারে আমি ভেঙে পড়েছি। শুধু অসহ্য মনে হল তাদের উপেক্ষাকে।

সুভাষিণীদি আমাকে কখনও অনাদর করেন নি। কোথায় যাচ্ছেন জানি না। এই অবস্থাতেও আমাকে দেখে হাসলেন। উৎসাহ-ভরা হাসি। আমিও হাসলাম। ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেস, বিদুষী মহিলা। বহুবার তিনি আমাকে প্রয়োজনে দিয়েছেন প্রেরণা, বিপর্যয়ে সান্ত্বনা।

প্রথমে ভাবলাম, আমার হয়ত দাদার মতই অবস্থা হবে। বছর দুয়েক হল দাদাকে হারিয়েছি। এই রাস্তার ধারেই তাকে আর খুঁজে পাই নি। তুচ্ছ আনন্দে সে জীবনকে অপচয় করল। পরের বোঝা বয়ে বেড়াল সারা জীবন। কিছুই না পেয়ে অযথা নিজের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেললো।

অথচ আমি কত হিসেব করে চলি। বুদ্ধিমানের মত আগে সামনে-পেছনে তাকাই। তারপর এগোই।

কিন্তু না, আর পারা যায় না। এই কাঁচা রাস্তার একরাশ ধুলো আর দুধারে বেতবনের শীর্ণ পাণ্ডুরতা এখন আমার পক্ষে বেশ বিরক্তিকর।

সত্যি, এই সময়টুকুতেই কত কি যে হারিয়ে ফেললাম। ফেলে-আসা পেছনের পথ যেন তাতেই ঢাকা পড়ে রয়েছে। যখন ভাবি, স্মৃতির রশ্মি-আভায় তারা শুধু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার চোখ দুটোও তখন জলে ভরে যায়।

আজ দেহটা বুঝি আর বশ মানবে না। অবশ হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। যা সামান্য কিছু এখন বহন করছি, তাও ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

একরকম ছিটকেই ঢিবির ওপাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজিয়ে পড়ে আছি। হয়ত এবার কিছুটা আরাম পাবো। এক মহূর্তের জন্যে একটু বাতাস এল। বেতবনের হাওয়া বলেই মনে হয়।

আমি চোখ খুললাম। এক ঝলক তির্যক আলো এসে পড়েছে আমার মুখে। আলোর তীব্রতায় তাকিয়ে থাকা যায় না একভাবে। পাতা-ঝরা ডালের ফাঁক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়েছে পৃথিবীর মাটিতে। বেতবন তত গভীর নয়। কাঁটা ঝোপও আছে আশে-পাশে। পরিশ্রান্ত, অস[illegible] দেহটাকে আবার টেনে তুললাম। দুর্বল দেহ কাঁপছে, তবুও উঠে দাঁড়িয়েছি। পথ নেই। কোনমতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দুর্নিবার অজ্ঞাত আকর্ষণ আমাকে টানছে। পদক্ষেপ অসংলগ্ন। মনকে বুঝিয়েছি, এক্ষুনি ফিরে আসবো।

ওধারে কি আছে জানি না। কিন্তু আমাকে জানতেই হবে। কোথাও কেউ নেই। খুঁজে-পেতে কাউকে দেখবার তাগিদও আমার নেই। যদিও আমি নিঃসঙ্গ, তবুও এগিয়ে যাচ্ছি নির্ভাবনায়। কেন না, সবার মধ্যে থেকেও আমরা সর্বদাই সঙ্গীহীন পায়। ও নিজের পথে পথ চলি। চেনা-জানা পথই আমাদের আছে আ[illegible]। তা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, স্বীকার্য। অথচ অদেখাকে দেখতে, অচেনাকে চিনতেই আমাদের যত ভয়। ভাবি, যা দেখি নি, চিনি না তা ত অন্ধকারে বিলুপ্ত। তবে যদি দেখতে গিয়ে হারিয়ে যাই। চিনতে

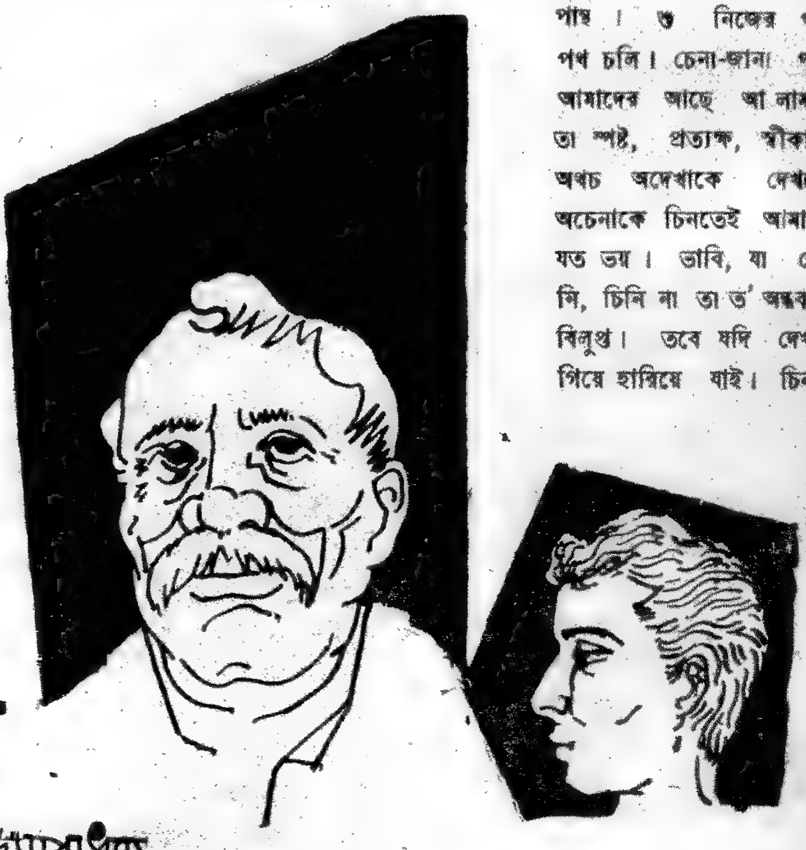

ফিরে ফিরে আর না আসি। তাইতো আমাদের স্থূল মন তা অস্তিত্বকে মানতে চায় না। সংশয়ে সংকীর্ণ হয়ে থাকে।

কাঁটা বিঁধছে। মুখে-হাতে-পায়ে, দেহের সর্বত্র। তা সত্ত্বেও দু-হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করে চলেছি। যা অবস্থা তাতে বিপদ দুটাই এখন একমাত্র সহায়। মাঝপথ থেকেই আমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

অল্প কিছু জিনিষ-পত্তর যা সঙ্গে ছিল, সব ছিটকে পড়েছে চারিদিকে। কিছুই কুড়িয়ে নিতে পারি নি। পরণের পরিচ্ছদও ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেছে। অথচ এখন ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছি, আমি সামনে এগিয়ে যাবোই। যদি আমার শরীরের বাকি শক্তিটুকু লোপ পায়, তবুও। হয়ত মাটিতে লুটিয়েও পড়তে পারি। চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে।

হঠাৎ মাথা পর্যন্ত হিমশীতল জলের স্পর্শ পেলাম। চারদিকে থই থই করছে জল। ধীরে ধীরে আমি নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। একটু পরেই অতল অন্ধকারে ডুবে যাবো। কোনদিন কেউ আর আমার কোন হদিস পাবে না। বনের মধ্যে চলতে চলতে অঘটন এমনি করেই ঘটল। অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এক গভীর জলাশয়ে নেমে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টায় পাড়ে এসে ঠেকলাম। সাহায্য চেয়ে তারস্বরে চীৎকার সুরু করে দিয়েছি।

সহসা কথাটা কানে এল। অন্য প্রান্ত থেকে কে যেন হেসে বলছে, 'এই রে, আবার আরেকজন!'

আনন্দে, বিস্ময়ে সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। রোমাঞ্চ অনুভব করলাম অধীর উত্তেজনায়। একটু বাদে মনে হল, কে যেন আমাকে জল থেকে তুলে শুইয়ে দিল। নিশ্চল হয়ে পড়েছি। কঠিন, রুক্ষ মাটির ওপর নিঃসংশয়ে। কতক্ষণ কেটে গেছে, খেয়াল নেই। জলে-ভেজা দেহটা এতক্ষণে খানিকটা ঝরঝরে লাগছে। দৃষ্টির ঘোলাটে ভাবটাও আর নেই।

তবুও আমি হতভম্ব। দুচোখভরা বিস্ময়ে আমি চেয়ে আছি। সবুজ ঘাসের এমন সজীবতা, শ্যামলিমা আগে কখনও দেখি নি। প্রান্তর যে এত বিস্তীর্ণ হয়, জানতাম না। সূর্যালোকও এখন তেমন উত্তপ্ত নয়।

আকাশ স্বচ্ছ সুনীল। নীচে পৃথিবী সুদূর দিগন্তে তাকে যেন ছুঁয়েছে। একঠাই মিশে গিয়েছে। দূরে পরপারে আঁকা সারি সারি বন। ছোট জনপদ। দৃষ্টির আবছা আলোয় অস্পষ্ট। তারই গায়ে কৃষ্ণচূড়ার বনের চূড়ায় রক্তিমা। যৌবনের আনন্দ। বনবীথি ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধ। বিশ্বের এই প্রান্তে দেখছি প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়েছে।

আচ্ছন্নতার ঘোরটা কাটিয়ে উঠেছি। পেছনে তাকালাম। দেখি, আমার ত্রাণকর্তা দাঁড়িয়ে। অকুতোভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ জায়গাটা কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

'ভগবান জানে, কোথায়!'—বলেই লোকটা হো হো করে হাসলো। উত্তর শুনে রাগ হল। কিন্তু তিনি আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই কৃতজ্ঞতাই শুধু জানাতে হল।

পঞ্চাশ কি ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ। পথে-ঘাটে এমন বয়েসের ওপর একটুও নির্ভর করা চলে না। কিন্তু তার আচরণে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। কণ্ঠের স্বর ভারি মিষ্টি। একজন তরুণের মত।

'কিন্তু কোথাও না কোথাও ত' গেছে!'—আমি সজোরে বললাম।

আমার জবাব না দিয়ে, বৃদ্ধ মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝলে, উনি জানতে চান এ জায়গাটা কোথায় গেছে!'

বেতবনের ওপাশ দিয়ে অচেনা কতগুলো লোক যাচ্ছিল। তারা শুধু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

জলাশয় নয়, ছোট পরিখাই বয়ে চলে। জলে পড়ে আমি ভেবেছিলুম জলাশয়। প্রথমটায় ঠাহর করতে পারি নি। এখন ভুল ভাঙল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। কোথাও ডাইনে, কোথাও বাঁয়ে, বাঁক নিয়েছে। সহস্র শালুক ফুল ফুটে রয়েছে জলে। এ পাড়ে বন বেতবন, প্রায় দুর্ভেদ্য। কিন্তু শুষ্ক, নীরস নয়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবুজ, সতেজ। সযত্নে পরিখার এক পাড় ঘিরে রয়েছে। মনে হয়, তন্বী তটিনী যেন সলাজে বেতসের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। পাছে ভিন্ গাঁয়ের কেউ তার মুখের সুষমা দেখে ফেলে।

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, এতো বাঁধনের বেষ্টনী। সীমিত গণ্ডীর নির্দেশ। অমনি আমার মনের সমস্ত আনন্দোচ্ছ্বাস ম্লান হয়ে গেল। মুহূর্তেকে মনে হল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বনভূমি তমসাবৃত। ঘাসের রঙ কপিল। সংসারে সুখের আনন্দ যেন পাদপ্রদীপের ছায়া। আমার সামনের এই অপার সৌন্দর্য এখানেই বন্দিনী। নির্বাসিতার মত বিষণ্ন, করুণ, এই সৌন্দর্য ব্যাপ্তিহীনা, রুদ্ধ কাতর।

বৃদ্ধ এদিকে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। সমস্ত ভাবাবেগ তাই জলাঞ্জলি দিতে হল। আবার পথ চলেছি। বৃদ্ধ এখন সঙ্গী। তৃণ-প্রান্তর পার হয়ে এলাম। একটা মাটির সড়কে এসে পড়েছি। কাঁচা সড়ক। পায়ে চলা কষ্টসাধ্য। বৃদ্ধ লোকটা পেছনে আসছে। কিছুটা দূরত্ব রেখে আমি সামনে এগিয়ে হাঁটছি। দাদাকে হারানোর পর কারোর সঙ্গে আর পাশাপাশি চলি না। কিন্তু ভাবছি, এভাবে একা একা আমি যাবোই বা কোথায়। লোকটা ত' এমন ভাব করল, যেন এখান থেকে কোথাও যাওয়া যায় না।

নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ বিরক্ত হলেও থামলো, কাতর হয়ে বললাম, 'না, এভাবে চলা ভয়ংকর শক্ত। একলা কেউ এগোতে

পারে না। পৃথিবীতে একলা উন্নতি করা সম্ভব নয়। পথের মানুষ আমরা—'

'তা জানি।'

'আমি কিন্তু বলতে যাচ্ছিলাম, আমরা অনবরত অগ্রসর হচ্ছি।'

'হাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'আমরা সর্বদাই কিছু শিখছি। শিখে তাকে সমৃদ্ধ করছি। তারপর প্রসারিত করছি। কেন, আমার এই ছোট জীবনেই ত' কত কিছুর উন্নতি দেখলাম—নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সৌহার্দ্য, বর্ণ-বৈষম্য, পারমাণবিক শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা থাক্—' বলেই আমি হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। কিন্তু ঘড়ি আর চলছে না।

ম্লান হেসে বললাম, 'ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তা না হলে তোমাকে দেখাতাম, কতক্ষণ তোমার সঙ্গে হেঁটেছি। কিন্তু তার আর উপায় নেই।'

'এখানে অনেক জিনিষই কোন কাজ করে না।' মৃচকি হেসে লোকটা বললো।

'কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মগুলোর প্রয়োগ সর্বত্রই এক। দেশ কিম্বা কালের ব্যবধানে কোন পার্থক্য হয় না। পরিখার জল ঢুকে নিশ্চয় কোন কল-কব্জা বিগড়েছে, তা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় সবকিছুই কাজ করে। বিজ্ঞান আর জীবন ধারণের সংগ্রাম,—এই দুই শক্তির সমন্বয়ে আমাদের প্রাণসত্তা বিকশিত।'—লোকটা আমার কথা একমনে শুনলো।

রাস্তায় যেতে যেতে বার বার দাঁড়াতে হল। বহুজন আমাকে অভিনন্দন জানাল সাদরে। পেছনে তাদের ফেলে এসেছি। তাদের মধ্যে কেউ গান, কেউ গল্প করছিল। কেউ বা ব্যস্ত বাগান নিয়ে। রোদ্দুরে দু-একজন খড় শুকোতে দিচ্ছিল। কাউকে দেখলাম সংসারের অন্য কোন সাধারণ কাজে ব্যতিব্যস্ত। চোখে দেখলে তাদের সকলকে সুখী মনে হয়। কিন্তু আমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, কে জানে কোথায় চলেছি।

অতর্কিত এক যুবক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে রাস্তাটুকু পার হল। সবেগে হাতে একখানা লাঠি ঘোরাচ্ছে। একটা চষা-জমিতে দাঁড়িয়ে লাঠি ঘোরানোর কসরত দেখালো কিছুক্ষণ। শেষে একটা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার

সাধনা দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

কাটিতে সুরু করল। দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক। বললাম, এই হচ্ছে সত্যিকারের উদ্যম

বৃদ্ধকে বললাম, 'বাঃ, বেশ নির্ভয়ে সাঁতার দিচ্ছে ত'। কিন্তু আর সব কই?'

'আর ত' কেউ নেই।'—বৃদ্ধের মুখ গম্ভীর দেখলাম।

সময় আরো খানিকটা এগিয়েছে। আমরাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছি। যাওয়ার পথেই পড়ল বড় বড় ঘাসের বন। বনে আপনমনে মৃদুকণ্ঠে কোন মেয়ে গান গাইছে। সেই গানের সুর অস্পষ্ট ভেসে আসছে বাতাসে।

বৃদ্ধ এবার নিজেই কথা বলে উঠলো, 'এখানেও মেয়েটা ছাড়া আর কেউ নেই।'

সৃষ্টির অযথা অপচয়ে বিমর্ষ হলাম। ইচ্ছা না থাকলেও বলে ফেললাম, 'এ সবের কি মানে হয়, আমি বুঝি না?'

বৃদ্ধ আমার কথা শুনতে পেয়েছে, 'এ ছাড়া এর অন্য কোন মানে নেই।'—আমি যেন তার কাছে অবোধ শিশু। বেশি কিছু বুঝি না।

'বুঝতে পেরেছি,' আমি বললাম, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কাজ যাই হোক না কেন, যদি তার ক্রমবিকাশ না হয়, তবে তা মূল্যহীন। যাকগে, তোমার সঙ্গে আর মনঃকার চর্চা করবো না। কোন পথে আমি এখন ফিরে যেতে চাই। ঘড়িটা আমাকে সারিয়ে নিতে হবে।'

'তাহলেও তোমাকে দরজাগুলো দেখতেই হবে,' বৃদ্ধ বলে চলেছে, 'যদিও আমরা কখনও ব্যবহার করি না। তবুও আমাদের কয়েকটা দরজা আছে।

উপায় নেই। পথ চিনি না একলা ফিরে যাবার। বাধ্য হয়ে লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। অসম্মত হলে হয়ত বিপদে পড়তে পারি।

কিছু পথ হাঁটার পর একটা সাঁকো চোখে পড়ল। নীচে পরিখার জল। প্রবেশমুখে একটা দরজা। উজ্জ্বল কোন ধাতুতে তৈরি। সূর্য-রশ্মিতে জ্বল জ্বল করছে। একটু তফাতে গাছের বন। মাঝখানে খালি জমি পড়ে রয়েছে খানিকটা।

উৎসুক হয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কি বলত?'

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওই ত' দরজা, ওর কথাই বলছিলাম।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। বৃদ্ধ বাইরের দিক থেকে টান মারলো। দরজা খুলে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম ওধার দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। ঠিক আমার আগের রাস্তার মত। তেমনি দুপাশে বিবর্ণ, শুষ্ক বেতবন। আর রাস্তা ধুলোয় ভরা। যতদূর দৃষ্টি যায়, এ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

'ওই ত' আমার রাস্তা!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

লোকটা সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বললো, 'আজ্ঞে না, তোমার রাস্তার একটা অংশও নয়। শোন, এই যে দরজা দেখছো, এই দরজা দিয়েই অসংখ্য বছর আগে মানুষের মনুষ্যত্ব বেরিয়ে চলে গিয়েছে। ধুলো-মাটির পৃথিবীতে পাপের পাঁকে কলুষিত হবার জন্যে।'

লোকটার কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হল না। মনে হল, এখান থেকে আমার পুরনো পথ অনধিক দু'মাইল হবে। কিন্তু তখনও সে বার্ধক্যের স্পর্ধায় বলে চলেছে, 'তোমার পথ আর এ-পথ একই। তবে পথের সুরু এখানেই হয়েছে। তাকিয়ে দেখো, সোজা চলে গেছে বটে, কিন্তু চোখের পলকে দ্বিগুণ হয় বলে তোমার পথ আমাদের জমি থেকে বেশি দূরে নয়। কখনও কখনও আমাদের জমিকে ছুঁয়েও গিয়েছে।'

লোকটা আর দাঁড়াল না। পরিখার ধারে নেমে গেল। আমিও সঙ্গে গেলাম। পাড়ে বসে স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে কি সব অদ্ভুত হিজিবিজি রেখা আঁকলো। ফেরার সময় তাকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু তার ভুল ভাঙাতে পারলাম না।

আবার পথ ধরেছি। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বলতে সুরু করল, 'পথ যে সময়ে সময়ে দ্বিগুণ হয়, খুব সত্যি কথা। জীবনে পথ-চলতে এই নিয়মকে মানতেই হবে। কেউ কি সন্দেহ করতে পারে, এই চলার পথ সমুখে এগিয়ে যেতে স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়? লক্ষ্য অনির্দিষ্ট জানি, —হয়ত কোন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে আকাশও ছুঁতে পারি, কিম্বা সাগরের গভীরে অথৈ আঁধারেও নেমে যেতে পারি। কিন্তু এই চিন্তা আছে বলেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যে যার পথ ধরে সবাইকে পেছনে রেখে সামনে যেতে। এর মধ্যেই অধ্যবসায়ের উৎপত্তি। যা তোমার মধ্যে এক কণাও নেই।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হল না। একটু থেমেই ফের আরম্ভ করল, 'এবার ছেলেটার কথা বলি। ছেলেটা, অস্বীকার করি না, ভালই সাঁতার কাটে। তুমিও দেখেছো। ভাল ছুটতেও পারে। আবার, ঝাঁপও দেয় ভাল। কিন্তু আমাদের এমন বহু লোক আছে যাদের মধ্যে অনেকে আরও ভাল সাঁতারু। অনেকে আরও ভাল দৌড়োয়। অনেকে আরও ভাল ঝাঁপ দিতে পারে। বৈশিষ্ট্যের ভেতর পার্থক্য থাকবেই। বিচার করতে গেলে, আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আর কিছু জুটবে না। আবার যদি সেই মেয়েটার কথা বল,—'

বৃদ্ধকে সহসা এখানে আমি বাধা দিলাম। উচ্চকণ্ঠে বললাম, 'হায়

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩।।০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস।
মূল্য ৩।।০
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ভগবান। নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আমি যে সুভাষিণীদিকেই গান গাইতে শুনেছি।'—বৃদ্ধও দ্বিধা না করে আমার কথা বিশ্বাস করল।

'কিন্তু তা যে একেবারে অসম্ভব। আমি তাঁকে আজই দেখেছি। রাস্তা ধরে সোজা তিনি পোস্ট-আফিসের দিকে চলে গেলেন। এদিকে তিনি আসতেই পারেন না।'—আমি বললাম।

'পথে মানুষে মানুষে দেখা হওয়াটাই অনিত্য। কেউ কাউকে দেখলে তাই আশ্চর্য হয়। পাল্লা দিয়ে সবাইকে পিছে ফেলে জীবনস্রোতে ভেসে গিয়েই হোক, হার মেনে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পড়ে থেকেই হোক, আর মৃত্যুর দ্বারে হাজির হয়েই হোক,—সর্বকালেই জীবজগতের প্রত্যেকে সীমা থেকে অসীমে ছুটে চলেছে। জান, আমি প্রায়ই আমাদের সীমানার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াই। কান পেতে থাকি রাস্তার শব্দগুলো শোনার জন্যে। কেউ পথভ্রষ্ট হলে খুবই কষ্ট হয়। তবে পরিখায় ডুবে-যাওয়া পথিককে বাঁচাতে পারলে আমি চরম শান্তি পাই। তোমাকেও আমি বাঁচিয়েছি। এখন আমাদের রাজ্যে দু-চারজন থাকতে আসে। যদিও আমাদের রাজ্য সবার জন্যে।'—বৃদ্ধের চোখ দুটো ভাবালুতায় নিমগ্ন দেখলাম।

'মানুষের আরও অনেক যাওয়ার জায়গা আছে', আমি ধীরে সুস্থে বললাম, 'এবং আমি তেমনি কোন জায়গায় এবার যেতে চাই।'

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। তারপর অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে রাত আসবে। কিন্তু আমি তার আগেই পরিচিত রাস্তায় পৌঁছুতে চাই। বৃদ্ধকে সবিনয়ে বিদায় জানালাম।

'না, না, এখন কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না।' বৃদ্ধ লোকটা দেহের সর্বশক্তি দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। বজ্র আঁটুনি। আমি শত চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। অসহায়ের মত তাকে শুধু অনুসরণ করলাম।

সম্পূর্ণ এক অপরিচিত জায়গায় বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে এল। আমি আগেই জানতাম, এখানে আমাকে রাত্রিবাসের জন্যে আসতে হবে। কিন্তু আমার মন দৃঢ় নিশ্চয়, দুর্জয়। আমি ফিরে যাবোই আমার পথে। এই রাজ্যকে আমি বিশ্বাস করি না। এখানকার লোকদেরও ওপর আমার কোন আস্থা নেই। তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত আমি। তা সত্ত্বেও তাদের সন্ধ্যাকালীন আহার আমি স্পর্শ করলাম না। কেউ কেউ উপহার দিল নানা ফুল। সবার অলক্ষ্যে সব ফুল পথের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

অস্তরাগের রক্তিম সূর্যের আলোয় পথ চলেছি। দ্রুত, নির্বিবাদে। শূন্যে ঘোর অন্ধকার। অপ্রসন্ন মুখে বৃদ্ধ একপাশে যাচ্ছে।

সারা দিনের পরিশ্রান্তিতে চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। অনাহারক্লান্ত, পিপাসায় কণ্ঠ রুদ্ধ, তবুও অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলাম, 'জীবনে সংগ্রামে হোক, জয়ে-পরাজয়ে হোক, অবজ্ঞায় হোক,—আমাকে শুধু বাঁচতে দাও। জীবনের গভীর অর্থ থাকলেও, লক্ষ্য অনিশ্চিত হলেও,—আমাকে শুধু বাঁচতে দাও।'

আবার পরিখার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। অন্য আর একটা সাঁকো তার দু'পাড়কে এক করেছে। সাঁকোর ওপর উঠলাম। শেষ হবার মুখে আর একটা দরজা। কিন্তু তেমন উজ্জ্বল নয়। সাধারণ কাঠের উঁচু দরজা। দরজার দু'ধারে ঘন বেতগাছের বন। পরিখার এক পাড় ঢেকে রেখেছে। বৃদ্ধ আগে চলেছে। দরজা ভেতর দিক থেকে টানলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ঠিক সেই আগের রাস্তা। তেমনি ক্লেশদায়ক ধুলো, আর রাস্তার দু'ধারে শুষ্ক বেতগাছের বিবর্ণতা। চোখের দৃষ্টির মধ্যে এ ছাড়া অন্য কিছু নেই।

বার বার একি প্রতারণা। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে গেছে। ক্ষুধায় অস্থির। তবুও বৃদ্ধের হাত থেকে নিস্তার নেই। আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছি। একজন লোক আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তার কাঁধে একটা বোঝা, হাতে ছোট ভরা কলসী। নিমেষের মধ্যে সামনের রাস্তার কথা ভুলে গেলাম। আমাদের দুজনের লক্ষ্য যে আলাদা, তাও স্মরণে রইল না। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম ভরা কলসীটা। নিঃসংকোচে মুখে দিলাম কলসী-ভরা মহুয়ার রস।

এক লহমায় নেশার ঘোর লাগল সারা শরীরে। একেই অবসন্ন দেহ দুর্বল, তার ওপর মহুয়ার রসের তীব্র মাদকতা গ্রাস করল আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে পলে পলে। স্বপ্নে যেন দেখলাম, বৃদ্ধ লোকটা দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বলছে, 'এখানেই তোমার পথ শেষ হল। আর তোমার মনুষ্যত্বকে তুমি আমাদের কাছে রেখে গেলে। এই দরজা দিয়ে তা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করল।'

নেশায় চুর হয়ে শরীরটা ঢলে পড়েছে মাটিতে। আমার চোখের দৃষ্টিও সেই সঙ্গে ঝাপসা হয়ে এল। সমস্ত চেতনা অচেতন অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আগে শেষবারের মত যেন সজাগ হল। কোকিলের সুমধুর গানে তন্ময় হয়ে, দূর থেকে ভেসে আসা ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে, আর তারারা মেঘে ঢেকে যাওয়ায় বিমর্ষ হয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে।

লোকটা আমাকে সন্তর্পণে শুইয়ে দিচ্ছে। আমি তার কলসী কেড়ে নিলেও সে আমাকে ছেড়ে যায় নি। কৃতজ্ঞতা জানাবার অবস্থা আমার নেই। তবুও চোখ তুলে চাইলাম সৌজন্যে।

কুয়াসাচ্ছন্ন দৃষ্টি, তাতেই দেখলাম, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার হারিয়ে-যাওয়া দাদা।

(E. M. Forster-এর The Other Side of the Hedge-এর ভাবানুবাদ।)

সুশীল রায়

অনল আয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কোম্পানীর অধিকৃত এলাকার সাতটি অঞ্চলের সাতজন ইউরোপীয় শাসকের কাছে অভিমত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন আমহার্স্ট, তাঁরা সকলেই একবাক্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত জানান। নিজামত আদালতের বিচারপতি স্মিথ এ-প্রথা উচ্ছেদের পরামর্শ দেন, সেনাবাহিনীর মধ্যেও এজন্যে কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি জানান। তবুও আমহার্স্ট ভরসা পেলেন না কিছু করতে। কিছু না করেই বিদায় নিলেন তিনি। তাঁর বুঝি ভয় ছিল হঠাৎ এ-প্রথা উচ্ছেদ করে দিলে তার প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানীর রাজত্বই হয়তো উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

অপরাহ্নের হাওয়া এসে লেগেছে তাঁর বাগানের আম্রকুঞ্জে। ধীরে ধীরে বাগানে গিয়ে পদচারণা করতে লাগলেন রামমোহন। বুঝি ক্লান্তি দূর করার জন্যেই।

ওদিকে গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছে দুটি বালক। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাদের দোল দিতে লাগলেন, দোলনা থেকে তারা নামলে নিজেই দোল খেলেন ঐ দোলনায় বসে। খেলা করতে লাগলেন তিনি ঐ বালকদের মতই। এতে মনের ক্লান্তি হয়তো দূর হল একটু।

এই বালক-দুটির একটি তাঁর পুত্র রমাপ্রসাদ, আর অপরটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ—তাঁর পুত্রের সহপাঠী।

প্রায় প্রত্যহই এরা দু-জন খেলা করে এখানে। প্রত্যহ এসে এদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়তো তিনি পারেন না। কিন্তু আজ এদের সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর মন বুঝি খুবই প্রসন্ন হল।

তাঁর মাথায় চিন্তা আছে, সেইজন্যে বেশিক্ষণ তিনি অতিবাহিত করতে পারলেন না বাগানে। ঘরে এসে বসলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে ঐ ঘরে এল দেবেন্দ্রনাথ ও রমাপ্রসাদ। এসে তারা দেখল, মধু আর রুটি খাচ্ছেন তিনি। ওদের দেখে মৃদু হাস্য করলেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথকে ডেকে তাকে কুশল প্রশ্নাদি করলেন, তার স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে স্কুল জানতে চাইলেন। তারপর বললেন, বেরাদর, দেখচ তো কি খাচ্ছি আমি? কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভক্ষণ করি।

হেঁদুয়ার ধারেই তাদের স্কুল, এখান থেকে বেশি দূর না। সেখান থেকে সোজা চলে এসেছে দেবেন্দ্রনাথ এখানে। এই জন্যে 'বাবা কি করছেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। বেশিক্ষণ আর সে দাঁড়ালও না, প্রস্থান করল।

কয়েকদিন ধরে কাজ করে সব প্রস্তুত করা হয়ে গেছে তাঁর। সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে তিনি ভিতরের ঘর থেকে বৈঠকখানায় এসে দেখেন অনেকে এসে গেছেন। পাদরি অ্যাডাম সায়েব, হেয়ার সায়েব, হরিহরানন্দ, দ্বারকানাথ, অন্নদাপ্রসাদ, কালীনাথ রায়—এবং তাঁদের বন্ধুসভার অনেক সদস্য।

তাঁরা সব শুনেছেন এবং সব জানেন। তাঁর উপরে কি ভার ন্যস্ত করেছেন বেণ্টিঙ্ক তা এ শহরে আর অজানা নেই কারো। ইণ্ডিয়া গেজেট ফলাও করে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে—

An eminent native philanthropist who has long taken the lead of his countrymen on this great question has been encouraged to submit his views of it in a written form...

সেই গেজেট খুলে নিয়েই পড়ছিলেন তাঁরা। আরো কয়েকটি পত্রিকা ছিল—সমাচারদর্পণ, সম্বাদকৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা।

দ্বারকানাথ বললেন, চন্দ্রিকা-সম্পাদক তো ভয়ানক রুষ্ট হয়ে উঠেছেন,

 বিষয়ে আপনার কোনো অভিমত গ্রাহ্য নয় ব'লে মন্তব্য করেছেন।

দ্বারকানাথ কিছুটা পাঠ করে শোনালেন—আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে, দেশাধিপতি মহামহিম যুক্ত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্মসংস্থাপন-করণ জন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।

চন্দ্রিকার এই অভিমত শুনে হাস্য করলেন রামমোহন, প্রতিধ্বনি করে উঠলেন, চিরকালাবধি স্থাপিত ধর্ম।

একটু থেমে বললেন, ওর নাম ধর্ম নয়, অধর্ম। গোঁড়া হিন্দুরা বলুন যা খুশি, সমাচারদর্পণ এই প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে। তা ছাড়া আমাদের পত্রিকা আছে, সম্বাদকৌমুদীতেও আমরা আমাদের অভিমত জানাব। আর, বঙ্গদূতটাও প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে সময়মতই—ওতেও লিখব আমাদের বক্তব্য।

চারদিকে তাকিয়ে তিনি বুঝি খুঁজলেন নীলরত্নকে, বললেন, কই, আজ আসেন নি বুঝি আমাদের বঙ্গদূত-সম্পাদকমশায়।

না। নীলরত্ন আসেন নি আজ।

অ্যাডাম হেয়ার দ্বারকানাথ অন্নদাপ্রসাদ সকলে বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে রামমোহন আলোচনায় বসলেন। কি লিখেছেন তিনি তার খসড়াটি মেলে ধরলেন। সকলে মিলে পাঠ করলেন ওই বিবরণ।

এদিকে রাত্রি হয়ে এল ক্রমশ। শ্রাবণের আকাশে মেঘ জমে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ওই মেঘ, বুঝতে পারা যায় নি। মেঘ ডেকে উঠল গুরুগুরু শব্দে। অবিলম্বে নেমে এল মুষলধারায় বৃষ্টি।

বাইরে সুরু হয়েছে প্রবল বারিপাত, ভিতরেও চলেছে আলোচনার প্রবল ধারাপাত। রক্ষণশীলেরা যত চক্রান্তই করুন, এবার যখন পাওয়া গিয়েছে একজন স্ট্রং গবর্নর-জেনারেল, তখন এই সুযোগ অবহেলায় হারানো হবে না।

সমাচারচন্দ্রিকাটি টেনে নিয়ে পূর্ব বিবরণটি পাঠ করলেন রামমোহন। ২৭ জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office : **8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

প্রকাশিত সংবাদটিকে সূত্র ধরে এরা লিখেছেন এই মন্তব্য। এই সংখ্যাটির তারিখ দেখলেন তিনি—৮ আগস্ট ১৮২৯, ২৫ শ্রাবণ, ১২৩৬।

দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি গবর্নর-জেনারেলের কাছে দাখিল করে দিলেন তাঁর বক্তব্য। কিন্তু এই বিবরণ-দাখিল করাই তিনি তাঁর শেষ কর্তব্য বলে বিবেচনা করলেন না। তাঁর মনে পড়তে লাগল, তাঁর মাতার কাছে তাঁর শপথের কথা; তাঁর চোখে জেগে উঠতে লাগল তাঁর ভ্রাতৃবধূ অলকমণির মুখ।

নিয়মিত তিনি যাচ্ছেন জোড়াসাঁকোয় সমাজমন্দিরের প্রার্থনা-সভায়। কমল বসুর বাড়ি থেকে মাস-কয়েক হল স্বগৃহে উঠে এসেছে তাঁদের ব্রহ্মসমাজ। সেখানে গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দেন। মনে-মনে তাঁর আর-একটি প্রার্থনা, তিনি যেন অনুভব করেন এবার পূরণ হবে তাঁর সেই প্রার্থনাটি।

নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূতে এ-প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে জোর ভাষায় লিখেছেন। সমাচারদর্পণও সমর্থনে আছেন, সম্বাদকৌমুদী তো লিখছেনই। কিন্তু সমাচারচন্দ্রিকায় বর্ষিত হচ্ছে উষ্মা।

রামমোহনের লেখা মূল ইংরেজি বিবরণটি ইণ্ডিয়া গেজেটে ছাপা হয়েছে।

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা দল বেঁধে বিবরণটি পাঠ করছিল। তাদের মধ্যে জন-কয়েকের উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক। রামগোপাল ঘোষ ও রামতনু লাহিড়ী বলছে—এ-ইংরেজি রামমোহনের হতে পারে না; রাধানাথ শিকদার প্যারিচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবও সন্দেহ প্রকাশ করছে; কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করছে না কিছু।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করছে তারা। কিন্তু কোনো মীমাংসায় আসতে পারছে না। অবশেষে মীমাংসায় পৌঁছে গেল তারা। একমত হয়ে তারা বলতে লাগল, এ নিশ্চয় অ্যাডামের ইংরেজি।

তারা আলোচনা করে চলেছে, এমন সময়ে সে-ঘরে ঢুকল ডিরোজিও। বছর-কুড়ি বয়সের একটি ফিরিঙ্গি ছেলে। ধর্মতলার পথে বহুদিন আগে একে আমরা দেখেছি, ডেভিড ড্রামণ্ডের স্কুলেও দেখেছি। সেই ছেলেটি এই কচি বয়সে অধ্যাপক হয়ে এসেছে হিন্দু কলেজে।

কচি হলে কি হবে, এরই মধ্যে ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে সে। ডিবেটিং ক্লাবও খুলেছে। ঘরে ঢুকেই ডিরোজিও জানতে চাইল কি নিয়ে আলোচনা।

বিস্তারিত বিবরণ শুনে রুষ্ট হয়ে ডিরোজিও বলল, আর ইউ অল ওয়াল্‌স্‌। কার ইংরেজি তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, কিন্তু আসল বক্তব্যটি কি সেদিকে মন নেই তোমাদের? আর ইউ অল ওয়াল্‌স্‌?

একটু থেমে ডিরোজিও বলল, ওর ল্যাংগোয়েজের কথা পরে, আগে ওর সাবস্ট্যান্সটা দেখ। অ্যাডামের ইংরেজি হোক আর যারই হোক, এ কথা জেনে রেখো, রামমোহন ক্যান রাইট ভেরি গুড ইংলিশ। অ্যারাম সেন্ট পারসেন্ট সিয়োর ইট ইজ হিজ।

ছাত্রেরা এ কথা শুনে আর কোনো উত্তর দিল না।

সারা কলকাতা মুখর হয়ে উঠেছে আলোচনায়। চন্দ্রিকা-সম্পাদকের কলমের বুঝি বিরাম নাই। বেণ্টিঙ্ক যদি কিছু করে বসেন তাহ'লে কি কি অঘটন ঘটতে পারে, তার সমাচার প্রকাশ করে চলেছেন তিনি।

কলকাতার বাজারে-বাজারে আর গলিতে-গলিতে চলেছে তুমুল আন্দোলন। আহেরিটোলা, বেনেটোলা, দর্জিটোলা, কলুটোলা, বটতলা, বাঁশতলা, আমড়াতলা, চাঁপাতলা, নেবুতলা, বাদামতলা, মানিকতলা, চড়কডাঙ্গা, নারকেলডাঙ্গা, পটলডাঙ্গা, মলঙ্গা, বড়বাজার, শোভাবাজার, মেছোবাজার, বাগবাজার, জানবাজার, ভবানীপুর, খিদিরপুর, চিৎপুর, চুনাগলি, পাঁচিধোপানি-গলি, হাড়কাটা-গলি, বাঁশতলা-গলি, হাঁসপুকুর-গলি, জোড়াবাগান, চোরবাগান, হালসীবাগান, হাতীবাগান, মেহেদিবাগান, রামবাগান—সর্বত্র ঐ এক কথা।

বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এল আকাশে। শরৎ কেটে গিয়ে এল হেমন্ত। ঋতুবদল হয়ে চলেছে। কিন্তু রীতিবদলে কারো কোনো ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে তো নেইই, উপরন্তু এতে আছে আপত্তি।

গরানহাটায় কিছুদিন হল রূপনারায়ণের আবির্ভাব ঘটছে না। এতে রানী-বাইয়ের মনে বুঝি কোনো উদ্বেগও নেই, অশান্তিও নেই। তিনি না আসুন, তার কাছে আসছে তো অন্য কত বাবু। যথারীতি পরিতুষ্ট করাতে তার কোনো প্রতিবাদ নেই। কিন্তু জীবনে কেমন বিস্বাদ এসে গেছে যেন তার, কেমন পরিতাপে মন যেন তার পোড়ে। তার জীবনের শেষ পরিণাম কি, এই কথাই বুঝি চিন্তা তার। ঐ মাসিটাই তাকে আরো ভয় দেখায়, বলে, করে নে, বয়স থাকতে যা পারিস করে নে।

কিন্তু বয়সই বা আর কতদিন তার। আসলে বয়স তো এর মধ্যে তার কম হয় নি।

চুঁচুড়ার বাবুটি আসেন না ব'লে কোনো অশান্তি বা উদ্বেগ তার নেই বটে, কিন্তু মনে হয় যেন, সে একবার এলে হত। আর, বেশিদিন এভাবে না-আসা তো ভালো না, এতে যে না-আসার অভ্যাস হয়ে যাবে।

তিনি আসেন না, এ দিকে তাঁর না-আসা নিয়ে ব্যঙ্গ করে এলোকেশী আর এলাচ।

এলাচ হেসে বলে, পুরুষমানুষরাই অমনি। তারা-সব দারচিনির মত, যেমন মিষ্টি তেমনি ঝাল। এলে মিষ্টি লাগে, না এলেই—

এলোকেশী বলে দূর, ওরা লবঙ্গ, আগাগোড়াই ঝাল। এলেও

জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে, না এলেও জ্বালাযন্ত্রণার শেষ নেই।

কোনো উত্তর দেয় না রানী-বাই। কিন্তু এতদিন কোনো খবর না পেলে খবর তো নিতে হয় একটা।

ভাবতে-ভাবতে কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। শীত নেমে এল শহরে। আজ মাস-তিনেক আসে নি লোকটা। হল কি তার? এবার একটু উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছে রানী-বাই।

ডাকল, মোহন।

পিকদানবরদার এসে দাঁড়াতেই বলল, বকশিস পাবি। তোকে যেতে হবে চুঁচুড়ায়। খবর নিয়ে আসবি ওই বাবুর, বুঝলি? আমি তোকে বাৎলে দেব সব।

মোহনকে সব বাৎলে দিয়েছিল রানী। সব বুঝি বলে দিয়েছিল। তার পর রওনাও করে দিল।

দিন দুই বাদে ফিরে এল মোহন। সংবাদ নিয়ে এসেছে সে।

সে-সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রানী-বাই। তার সমস্ত অতীতটা বুঝি ভেবে নিল সে এক নিমেষে। সেই ফরাসগঞ্জের বাড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে শান্তিপুর চুঁচুড়া রামবাগান গরানহাটা। অতীতটা দেখে নিল। কিন্তু দেখতে পেল না বুঝি ভবিষ্যৎ।

অতি ত্বরায় তৈরি হয়ে নিয়েছে রানী-বাই। এ-বাড়ির কারো কোনো জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছে না। কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, কখন ফিরবে—কোনো উত্তর নেই তার।

মাসি এসে বাধা দিল, বলল, যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না। যেতে নেই।

হীরামতি বলল, চলো, সঙ্গে চলি।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রানী বলল, না। একা যাব।

—ফিরবে কবে?

উত্তর দিল না রানী-বাই।

টাকশালের ঘাট থেকে ভাড়া নিয়েছে পান্সি। মাঝিকে বলল, মিঞাসায়েব, যত টাকা চাও দেব। খুব জলদি চল, খুব জলদি।

এমন খুবসুরৎ যাত্রী পেয়ে মাঝিদের বিক্রম যেন বেড়ে গেছে, তারা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে নৌকো।

জীবনের সহস্র স্মৃতির কিনার ঘেঁসে চলেছে এই নৌকা। রিসড়া মাহেশ শ্রীরামপুর শেওড়াফুলি গৌরহাটি, তরতর করে পার হয়ে চলেছে পান্সি।

গৌরহাটির ধারে ঐ সেই চালতে-গাছটি। শীতের হাওয়ায় পাতাগুলো কেমন-যেন কুঁকড়ে গিয়েছে। তবু, চিনতে অসুবিধে হয় না এতটুকু। এগিয়ে চলেছে তার নৌকা, তবু সে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছে ঐ গাছটি। ওর সঙ্গে তার জীবনের কত স্মৃতি বুঝি বাঁধা। মাটি আঁকড়ে ধরে আছে যেমন গাছটির শিকড়, রানীর মনও যেন অবিকল অমনি আঁকড়ে ধরে আছে ওই গাছটির শিকড়, ডাল-পালা।—বিদায়, বিদায়—মনে-মনে সে যেন ঐ গাছকে শেষ সম্ভাষণ জানাতে লাগল।

ঐ কিনার থেকে তাদের বাড়ি আর কতই-বা দূর। মা কি বেঁচে আছেন? আর বাবা? মুরলী নবীন কত বড় হয়েছে? কি করে এখন তারা?

কিন্তু সে সব খবর নেবার অবসর এখন আর নেই তার।

তার দৃষ্টির সীমার বাইরে চলে গেল ঐ কিনার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ঘুরে বসে তাকাল সম্মুখ দিকে।

আর রানী-বাই নয়। এবার রাধারানী। অভিসারে চলেছে এখন সে। এ তার নতুন নৌযাত্রা—মনে পড়ছে শান্তিপুরে যাত্রার কথা, মনে পড়ছে মাহেশের স্নানযাত্রার কথা।

পরিপাটি সাজে সাজিয়ে নিয়েছে নিজেকে। কোনো সঙ্গী নেয় নি, কোনো সহায় নেয় নি। কেবল নিজের উপর ভরসা রেখে সে যাত্রা করেছে। আজকের এ-নৌযাত্রা তার জীবনের স্মরণীয় যাত্রা।

মাঝে-মাঝেই সে তাড়া দিচ্ছে মাঝিকে, বলছে, কতদূর মাঝি, আর কতদূর?

—এসে গেলাম বিবি-সায়েব। এই তো উড়িয়ে নিয়ে এলাম ময়ূরপঙ্খীর মত।

—আর-একটু জোরে দাঁড় টানো মিঞাসাহেব, আমার বড় তাড়া।

ঝপাঝপ দাঁড় ফেলতে-ফেলতে জিজ্ঞাসা করল টিনু মিঞা, কি হয়েছে মা-ঠাকরুণ, এত তাড়া কিসের?

—তাড়া? রাধারানীর গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখ ছলছল করে উঠল, ঢোক গিলে বলল, আমার স্বামী মারা গিয়েছেন, মিঞা-সায়েব।

চমকে উঠল টিনু মাঝি, আপশোস করে উঠল হাঁসফাঁস করতে করতে, দাঁড় টানার জোর যেন কমেই গেল এতে।

চুঁচুড়ার ঘাটে এসে নৌকা যখন ভিড়ল, বেলা তখন দুপুর। রুমালে-বাঁধা একগুচ্ছ মোহর মাঝির হাতের মধ্যে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে, কাদায় গেঁথে গেল একটা পা, সে পা টেনে তুলে সে উঁচু পাড়ের দিকে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করল।

একঘরে মানুষের যা দশা হয় তাই হয়েছে, একটা দিন ধরে পড়েছিল মড়া। এখন এনে চিতা সাজিয়ে তাতে শোয়ানো হয়েছে শব।

দেরি হয়ে ভালোই হয়েছে, তবু দেখতে পেল রাধারানী।

মাত্র চার-পাঁচ জন লোক এসেছে, তারাই ব্যবস্থা করেছে সব। মোতিলালও নেই, নরহরিও নেই।

চিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাধারানী। এ যেন সামান্য রানী নয়, মহারানীর মত এই রমণীকে দেখে অবাক হয়ে গেছে শ্মশানযাত্রী। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছে না তারা।

রাধারানী একদৃষ্টে চেয়ে আছে রূপনারায়ণের মুখের দিকে। কালো প্রজাপতির মত গোঁফজোড়া চড়াইপাখির ডানার মত বেরঙ হয়ে গিয়েছে

একেবারে। ওই মুখ ওই চোখ সবই কেমন রঙ-চটা দেখাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখছে। শুকনো খটখট করছে তার চোখ। এক ফোঁটা জলও নামে নি তার চোখে।

এখানে হঠাৎ এই রমণীর আবির্ভাবের খবর সারা চুঁচুড়ায় ছড়িয়ে গেছে অচিরে, দলে-দলে লোকজন ছুটে আসছে তামাশা দেখতে। অবিলম্বে এক বিরাট জনতায় পূর্ণ হয়ে গেল নদীকিনার।

—কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, কে তুমি, কেন এসেছ?

রাধারানী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সতী হব। তাই ছুটে এসেছি এখানে।

তার এ-ঘোষণায় ভয় পেয়ে গেল জনতা। দু পা সরে দাঁড়াল তারা। বলে কি এ? কে এ? বারো-চোদ্দ বছর আগে যার বউ করেছে গৃহত্যাগ, তার চিতায় উঠে সতী হবার বায়না ধ'রে কে এল এই মেয়ে?—স্বামীর জলচিতায় আরোহণ করার জন্যে?

এই ভয়ংকর সংকল্পের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল আরো।

শ্মশান-পুরোহিত মহেশ্বর ভট্টাচার্য ছুটে এলেন বুঝি মন্ত্রপাঠ করার জন্যে। ভিড় ভেদ করে তিনি এগিয়ে আসছেন।

এমন সময়ে উঁচু পাড়ের উপর আবির্ভূত হল দুই ঘোড়সওয়ার। খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হ্যালিডে সঙ্গে ডাক্তার ওয়াইজ।

সহিসের হাতে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁরা বালুর উপর ভারি বুটের দাগ আঁকতে-আঁকতে এসে দাঁড়ালেন রাধারানীর কাছে।

—কেয়া মাংতা?

মাথা নাড়তে লাগল রাধারানী—কিছু না, কিছু না।

—কে তুমি?

রাধারানী পরিচয় দিল নিজের, জানাল সে ওর স্ত্রী। বহুদিন সে আত্মগোপন করে ছিল মনের দুঃখে, কিন্তু এই চরম দিনে আর লুকিয়ে রাখতে পারল না নিজেকে, তাই, তাই—

আশ্চর্য, ও বুঝি শোনে নি এখনো গভর্নর জেনারেলের প্রোক্লামেশন—এ সব বে-আইনী হয়ে গিয়েছে। সতী হওয়াই শুধু না, সতী হওয়ার কাজে যে সাহায্য করবে সাজা পেতে হবে তাকেও?

—কেউ সাহায্য করবেন না তবে, আমি একাই উঠব চিতায়।

বিঃ দ্রঃ আগামী সংখ্যা থেকে মহাশ্বেতা দেবীর (ভট্টাচার্য) উপন্যাস 'আঁধার-মানিক' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

ডিসেম্বরের হাওয়া বইতে সুরু করেছে কনকন ক'রে। সেই হিম হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে হ্যালিডে সায়েব আলোচনা করতে লাগলেন ডাক্তার ওয়াইজের সঙ্গে। টু ডে ইজ সেকেণ্ড ডিসেম্বর, আইন চালু হচ্ছে পরশু থেকে; সুতরাং এখন ওকে বাধা দেওয়াই বুঝি বে-আইনী হবে। তাঁরা ওকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেও যখন দেখলেন কিছু হবার নয়, তখন ঠিক করলেন ওর পরীক্ষা নেওয়া যাক।

সে পরীক্ষা দিতে সম্মত হল রাধারানী।

ঘিয়ের প্রদীপ জেলে দেওয়া হল, তরতর করে কেঁপে উঠল তার শিখা। অনড় হয়ে বসে সায়েবদের নির্দেশমত রাধারানী ঐ শিখার মধ্যে ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে বসল। ধীরে-ধীরে পুড়তে লাগল আঙুল। একটা সাড়া নয়, একটা শব্দ নয়, একটা বাড়তি নিশ্বাস নয়, চুপ করে বসে আছে সে। ক্রমে বেঁকে গেল আঙুলটা, তবু নড়ল না রাধারানী।

এ যে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে চলেছে এবং আগুনের জ্বালা কি রকম তা জেনে শুনেই এই সংকল্প করছে তা বুঝতে পেরে হ্যালিডে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অল রাইট।

ডাক্তার ওয়াইজ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, স্টেঞ্জ।

হ্যালিডের হুকুমে নদীর কিনার থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর চেয়ার। চিন্তিত মনে পাইপ টানতে লাগলেন তিনি, দাঁতের চাপে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠেছে পাইপের মুখ।

শঙ্খ ও সিঁদুর নিয়ে জমায়েত হয়েছিল এয়োর দল। বাধা দূর হওয়ায় তারা দল বেঁধে এগিয়ে গেল, রাধারানীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তার সমস্ত চুল রক্তরাঙা করে তুলল।

জোয়ার আসছে নাকি? ছলছল করে উঠেছে হুগলীর জল। এখান থেকে অনেক দূরে ইতিমধ্যে প্রবলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে বুঝি বঙ্গোপসাগর। সাগরসঙ্গমতীর্থ ডুবিয়ে দিয়ে শতমুখী আর চৌমুখীতে প্লাবন সঞ্চার ক'রে, রূপনারায়ণ ও দামোদরের মোহনা ডিঙিয়ে ঘাটে-ঘাটে ত্রাস সঞ্চার করতে-করতে অচিরেই এখানে পৌঁছবে বুঝি সেই জোয়ার।

লেলিহান হয়ে উঠেছে চিতার আগুন ইতিমধ্যে, এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনতা।

সমস্ত স্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে অকস্মাৎ একসঙ্গে উলুধ্বনি করে উঠল সমবেত পুরস্ত্রীরা।

সমাপ্ত

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বরুণেন্দ্র বসাকের চেম্বারে সাধারণত ভিড় জমে বিকেলের দিকে। ইউরোপ ছেড়ে ভারতবর্ষে ফেরার আগে দেশ-বিদেশের বন্ধুমহল সরবে উপদেশ দিতে সুরু করেছিল—'এত বয়সে ওখানে পশার জমানো সম্ভব হবে না। ওদেশের ব্যাধি মানসিক নয়, নেহাৎ দৈহিক। হাজার হোক, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ দর্শনের সুকঠিন তত্ত্ব জলের মত তরল করে গুলে খেয়েছে।'

ডাঃ বসাক কিন্তু বিদেশের শত সুখ-সুবিধার প্রলোভনে দেশের টান ভুলে থাকতে পারেন নি। তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাবালক ছেলে দুটি যখন নিজের নিজের সংসার নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন একা হওয়ার অসুবিধা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলতে দেরী বা দ্বিধা করেন নি। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলো, অতএব চৌরঙ্গীর একটি বিরাট ম্যানশনে বিলাসবহুল আধুনিক একটি ফ্ল্যাট নেওয়া হল। হাতীর দাঁতের ফলকে দামী অক্ষরে নাম লেখা থাকল সুস্পষ্টভাবে। আর আশ্চর্য, ভারতবর্ষের দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ সাধারণ মানুষদের ভিড় সেখানে জমতে দেরী হোল না। আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতার ঢেউ এখানেও কি ভয়ানক উত্তাল হয়ে উঠেছে, সিল্কের ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই নোটবুক খুলে আজকের এনগেজমেণ্ট তালিকা দেখতে দেখতে ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবছিলেন ডাঃ বসাক। বিশেষ করে সমাজের উপরতলার মানুষদের মধ্যে এই সব মানসিক বিপর্যয়ের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। লেডী সুপ্রভা বাসু, স্যার এম, জি, বাসুর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার মন যেন একটা গভীর অন্ধকার রাত্রি। আলো জ্বালিয়ে হাজার অনুসন্ধান করেও তার রহস্য ভেদ করা যাচ্ছে না। তারপর বম্বের পার্সি ভদ্রলোকটি। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পরে একটা প্রচণ্ড শক পেয়ে মনের ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। নীচে কলেজের মেয়ে দুটির নাম। দুই বন্ধু। দুজনেই একটি ছেলেকে ভালবেসে প্রতারিত হয়েছে ও তারপর স্বাভাবিক থাকতে পারছে না। একজন হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় অন্তর্মুখী, যাকে টেকনিক্যাল ভাষায় বলা যায় ইনট্রোভার্ট। অন্যটি বেশি মাত্রায় প্রগলভা হয়ে বেপরোয়া উচ্ছৃংখলতার দিকে পা বাড়াচ্ছে। দুজনের অভিভাবকই ব্যস্ত হয়ে তাদের হাজির করেছেন এখানে। সবশেষে অদ্ভুত আর একটা কেস। বিবাহিত, তিনটি ছেলেমেয়ের বাপ, স্ত্রীর সঙ্গে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক। তবু মধ্যে মধ্যে ভদ্রলোক আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। দুবার প্রায় শেষ মুহূর্তে ওরা টের পেয়ে কোন গতিকে বাধা দিতে পেরেছে।

তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ। এরা নিয়মিত আসে. এ ছাড়াও দিনে দু-তিনটি নতুন কেস আসে। আজ সকাল সাড়ে দশটায় যেমন লাল তারার চিহ্ন এঁকে রেখেছে নার্স ডোরা ডিসুজা। এখন আটটা। আধঘণ্টা স্নানের বিলাস, তারপর নিখুঁত প্রাতরাশের আয়োজন উপভোগ করে ডাঃ বসাক চেম্বারে বসবেন। সকালে সাধারণত রুগী দেখার সময় নয়। দশটা থেকে বারটা চিঠিপত্র লিখে অথবা বিলেত থেকে আমদানী করা বিভিন্ন বই ও জার্নালগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সময় কাটিয়ে দিতে তিনি ভালোবাসেন। নতুন কোন কেস হাতে থাকলে সেই সম্পর্কেও পড়াশুনা করতে হয়। তবে আজকে রুটিন ভাঙবে। সাড়ে দশটার সময় একটি নতুন কেস আসার কথা। ভদ্রলোককে জানানো চলবে না তিনি প্রফেশনাল ভাবে পরীক্ষা করছেন। সামাজিক দেখা-সাক্ষাৎ গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে জটিল মনস্তত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কার করতে হবে।

প্রাতরাশের টেবিলে বসে কলিং বেল টিপলেন ডাঃ বসাক। বেয়ারা ট্রেতে আজকের খবরের কাগজ দুটি সাজিয়ে সেলাম করে দাঁড়ালো।

'মিস ডিসুজা এসেছে? তাকে খবর দাও।'

ডোরা ডিসুজা কাছেই থাকে, আটটার মধ্যে এখানে ডিউটি দিতে তার অসুবিধা হয় না। সকালের দিকে কাজ হাল্কা। একলা মানুষ বলে ডাঃ বসাক প্রাতরাশের টেবিলে হাসিখুশি মেয়েটির সান্নিধ্য পছন্দ করেন। তারপর কিছুক্ষণ কেস হিস্ট্রিগুলো অ্যালফাবেটিকাল অর্ডারে সাজিয়ে নিয়ে মোটা বাঁধানো খাতায় টুকে রাখতে হয়। এ ছাড়াও টেলিফোন

ধরা, কোনও বিশেষ জরুরী কেস এলে তার তদারক করা ইত্যাদি দু-একটি কাজও জমে থাকে। তবে সকালবেলা ডোরা ডিসুজা তার নার্সের পরিচয় খুলে রেখে সাদাসিধে পোশাকে আসে। সকালে প্রাইভেট সেক্রেটারী, বিকেলে নার্স, দুটি বিভিন্ন কর্তব্যই নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করে বলে ডাঃ বসাকের চেম্বারে তার উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়ছে।

'গুড মর্নিং ডক্টার—' সামান্য মাথা হেলিয়ে হাসিমুখে সুপ্রভাত জানালো ডোরা—'আমার মনে আছে। আপনার নতুন পেশেন্টের জন্য সব আয়োজন সম্পূর্ণ। আইসড্ কফি, সল্টেড নাট, চিনির রসে ডোবানো আখরোট আর চেরী সার্ভ করা হবে। তাছাড়া ড্রইংরুমে রেডিওগ্রামে হাল্কা স্প্যানিশ ডান্স-মিউজিক খুব নীচু সুরে বাজবে। ঘরটা খুবই চিয়ারফুল দেখাচ্ছে। নতুন কেনা অয়েল পেন্টিংটা দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছি। সেই যে সোনালি ফ্লাওয়ার ভাস-এ একগুচ্ছ ফুল। লাল, হলুদ, নীল, বেগুনী রঙের মাতামাতি। একবার চোখ পড়লে মন ভালো না হয়ে পারে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ডোরা।' ধোঁয়া-ওঠা কফির পেয়ালা আর অরেঞ্জ মার্মালেড মাখানো রুটির প্লেট সামনে টেনে নিলেন ডাঃ বসাক—'আমি জানি তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। সুনন্দ মিত্রের কাছ থেকে পয়েন্টস টুকে নিয়েছ ত? ফ্যাক্টসগুলো সংক্ষেপে বলে দাও এখনই।'

'খুব ধনী পরিবারের একমাত্র বংশধর, বয়স তেত্রিশ। বিবাহিত কিন্তু নিঃসন্তান। ঠিক পাগল নয় কিন্তু বাতিকগ্রস্ত দু-একজন বংশের ইতিহাসে পাওয়া যায়।'

'সব ধনী পরিবারেই যা হয়ে থাকে—' মাথা নাড়লেন বরুণেন্দ্র। 'খেটে খাওয়া মেহনত করা মানুষদের ওসব বালাই নেই।'

'ভদ্রলোকের ম্যানিয়া দু টাইপের। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে সন্দেহ করেন। তাছাড়া পার্সিকিউশন ম্যানিয়া রয়েছে—অনবরতই ভয় যে কেউ বিষ খাওয়াতে চায়।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'কেউ না। স্ত্রী, প্রাইভেট সেক্রেটারী, পঁচিশ বছরের পুরোন চাকর। তাছাড়া ডাঃ মিত্র নিজে। তিনি প্রায় প্রত্যেক দিন ও বাড়িতে বেশ কিছুটা সময় কাটান।'

'কেন?'

'কারণ ডাঃ মিত্র ঐ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' ডোরা ডিসুজার ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটি নীচের দিকে নেমে এলো।

'ও বুঝেছি'—দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বরুণেন্দ্র সজোরে—'মনে হচ্ছে ভেরি সিম্পল কেস।'

'সব সময় সব মানুষের মনকে একই ছকে ফেলা যায় না—' ঘন চুল দুলিয়ে ডোরা আপত্তি জানালো—'টাইফয়েড অথবা কলেরা হলে রুগীকে অনায়াসে একই ওষুধ ঠুকে দেয় ডাক্তারেরা, তারতম্য হয় কেবল ওষুধের ডোজে। কিন্তু আমার মন আর আপনার মনের রিয়েকশন কি কখনও এক হতে পারে?'

'কদিন আমার সঙ্গে কেস হিস্ট্রি গুলো নাড়াচাড়া কর—দেখবে একটা সুন্দর প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে যাবে সব কিছু।'

'আচ্ছা ডাঃ বসাক'—অনেকক্ষণ কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলে উঠল ডোরা—'ক্রাইম জিনিষটা মানুষের বিবেককে চাপা দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারে কেন? সব মানুষই কি তেমন অবস্থায় পড়লে ক্রিমিনাল হয়ে ওঠে না?'

খবরের কাগজে আজ তিনটে মার্ডার কেসের রিপোর্ট বেরিয়েছে। বরুণেন্দ্র সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে ডোরার মুখের দিকে চোখ তুলে বললেন—'ক্রাইম মানুষের মনের বিকার। সব মানুষ কখনই ক্রিমিনাল হতে পারে না। ধর, তুমি এমন একজনকে ভালোবাস, যে তোমাকে প্রতারণা করেছে। স্বাভাবিক একটি মানুষ এক্ষেত্রে হা-হুতাশ করবে, দার্শনিক হতে চেষ্টা করবে অথবা দু-চার লাইন ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখতে বসবে। কিন্তু যে বরন্ ক্রিমিনাল, তার নিদ্রিত সত্তা এই আঘাতে জেগে উঠে প্রতারককে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করবেই। আমি মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেই বোধহয় অনেকগুলো মার্ডার কেস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টাডি করে দেখেছি যে, এ ক্রিমিনাল ইজ বরন্, নট মেড। ভালো কথা, তোমার সেই ইয়াংম্যানটির খবর কি, সেই যে জিম, না টিম বলে ছেলেটি?'

ডোরার মুখ প্রথমে লাল হয়ে তারপর আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল। লেস বসানো সাদা রুমালের প্রান্ত আঙুলে জড়াতে জড়াতে নিজেকে সামলে নিয়ে জড়ানো গলায় বলল—'জেমস মেরী ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে এনগেজড্, পরশুর কাগজে অ্যানাউন্সমেন্ট বেরিয়েছে।'

সহানুভূতি দেখানো উচিত, তবু আশ্বস্ত হয়ে খুশি খুশি মুখে তাকালেন বরুণেন্দ্র। ডোরার মত কাজে দক্ষ মেয়ে বিদেশেও তিনি বেশি দেখেন নি। অথচ ওর দিকে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিতে সময় লাগে—এমনি জলন্ত রূপ। বরুণেন্দ্র বসাকের বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমানা ছুঁই ছুঁই করছে। সুন্দরী তরুণীদের সংস্পর্শে বার বার এসেছেন, কোনদিন কোন রকম দুর্বলতার দোলায় মনের শক্ত ভিৎ টলে নি। এই প্রথম উনিশ-কুড়ি বছরের এই ছিপছিপে মেয়েটিকে কেমন মনে ধরে গেছে। বাড়িতে ওর অসাধারণ দারিদ্র্য, পাঁচ-সাতটি নাবালক ভাইবোন, অসুস্থ স্বামী-পরিত্যক্তা মা, প্রখর রূপ ও ব্যক্তিত্ব—এই পরিচয় সম্বল করে আর জুনিয়ার নার্সিং-এর সার্টিফিকেটটা হাতের মুঠোয়

ধরে অভিজাত পাড়ার এই ডাক্তারের চেম্বারে কেবল অদম্য মনোবল ও সাহসের জোরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাণ্ডিডেট অনেক ছিলো। এমন কি বিলেতের ডিগ্রীধারী প্রচুর অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন দু-তিনটি ভদ্রমহিলা বিজ্ঞাপনের টাকার অঙ্কটা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিলেন। সকলকে বিস্মিত করে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে কাজটি পেল ডোরা ডিসুজা। বরুণেন্দ্র নিজেও কম আশ্চর্য হন নি। এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের কোন মতামত কাজে লাগছে কিনা, সে কথা কয়েকবার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেছে। নিজের দর্ভাবনার কথা চিন্তা করে মনে মনে হেসেছিলেন বরুণেন্দ্র। মনটা তাঁর শক্ত সিদ্ধ করা ডিমের খোলা, হার্ড বয়েলড এগ, সহজে চিড় খাওয়ার ভয় নেই। বয়স হয়ে গেলে যৌবনের কাছে, তারুণ্যের কাছে অবলম্বনের প্রত্যাশী হয়ে মানষ হাত বাড়ায়। মনস্তত্ত্ববিদ নিজের মনকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উল্টে পাল্টে দেখেও অন্য আর কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি।

'হঠাৎ ক্রাইমের কথা উঠল কেন'—কফি শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন বরুণেন্দ্র। জেমস বলে সেই ছেলেটি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল দেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করায় ডোরা খুশি হয় নি, তা তার থমথমে গম্ভীর মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

'এই ভদ্রলোকের কেস হিস্ট্রি পড়ে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এটা আপনার সাধারণ মন ভাঙাগড়ার কেস নয়।' কোলের থেকে বিছিয়ে রাখা ন্যাপকিন পাটে পাটে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে তুলে রাখল ডোরা—'এখন দশটা বাজল। ডাঃ মিত্র আসবেন দশটা পনের থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। তখন সব শুনলে আপনারও নিশ্চয় সন্দেহ হবে।'

'তাই যদি বল—তাহলে আমার কাছে না এসে ওদের পুলিশের দপ্তরে যাওয়া উচিত ছিল। আমি অসুস্থ মনকে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করি—কিন্তু ক্রিমিনালকে খুঁজে বার করা আমার কাজ নয়।'

'কে জানে, যে ক্রিমিনাল, তার মন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক কিনা—' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ডোরা। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই তারপর ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ডাঃ মিত্রের গাড়িও ততক্ষণে ফটকের পাশে এসে থেমেছে।

নরম গদীতে পিঠ ছড়িয়ে সমরেশকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন বরুণেন্দ্র। শুধু মন নয়, সেই সঙ্গে শরীরটাও ভেঙে গেছে। রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে পাণ্ডুর চেহারা। কোলের কাছে হাত দুটো আড়ষ্টভাবে মুঠি বাঁধা রয়েছে। চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্তির ছাপ।

'আচ্ছা, আমার এই ঘরটা আপনার চেনা চেনা লাগছে না মিঃ চৌধুরী ?' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘরের আবহাওয়া কিছুটা সহজ হয়ে এলে নীচু গলায় প্রশ্ন করলেন বরুণেন্দ্র।

'কই না ?' চমকে উঠে এদিকে ওদিকে তাকালো সমরেশ।

'আমি একবার লণ্ডনে আমার এক ওদেশী বন্ধুর বাড়ি ক্রিসমাস ইভের উৎসবে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। তখন আমি নতুন গিয়েছি, বিলিতি ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা সবই অজানা। যাই হোক, সেখানে আলোয়, বেলুনে, ফুলে, মিসলটো, হলির মালায় সাজানো ঘরে বসে হঠাৎ কেন জানি মনে হোল জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে। কিছুতেই মন থেকে সে অনুভূতিটা যাচ্ছিল না বলে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। শেষে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বুঝিয়ে বললেন—যে কোন আনন্দের বাইরের প্রকাশ ও ভিতরের প্রকাশ দুইই আছে। তুমি হয়তো এরকম আনন্দমুখর আর একটি পরিবেশের কথা অবচেতন মনে ভাব, তাই তোমার কাছে জায়গাটা চেনা ঠেকছে। ভদ্রলোকের কথার তাৎপর্য প্রথমে বুঝি নি। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের গ্রামে বিজয়ার

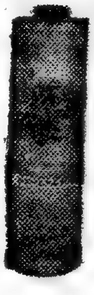
নতুন দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধযুক্ত
উর্বসী ট্যালকম পাউডার
বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড সহযোগে প্রস্তুত
ঘামাচি স্থায়ীভাবে দূর করে

উর্বসীর দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল ও সজীব রাখবে। বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড থাকায় ইহা অতি সত্বর ঘামাচি দূর করিয়া আপনাকে অবস্তিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করে। শিশু ও বয়স্ক সকলের পক্ষে সমান উপযোগী।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই • কানপুর

দিন বিসর্জনের পালা সেরে ঠিক এই-ভাবেই জড়ো হয়েছি সকলে। একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি এমনি আন্তরিকতার সঙ্গে।'

একটানা কথা শুনতে শুনতে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে সমরেশ তাকালো। নীল পর্দার গায়ে রোদের সোনালি আভা কাঁপছে। দেওয়ালের রং হাল্কা নীল। সামনে শ্বেতপাথরের কারুকার্য করা ফুলদানীতে টাটকা তোলা নানা রঙের ফুল আর তারই মিষ্টি গন্ধের রেশ। ডোরা ডিসুজা বাজনার সঙ্গে খুব মিষ্টি আর খুব নীচু গলায় সুর ভাঁজছে। শিশির-ধোয়া গোলাপের একটি গুচ্ছ সাদা জামায় ব্রোচ দিয়ে আটকানো। কোথাও এতটুকু বিশৃংখলার চিহ্ন নেই।

'না ডাঃ বসাক, এ জায়গাটা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। কিন্তু আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন না কেন?'

'কি প্রশ্ন করব?' বরুণেন্দ্র ওর চোখের দিক তাকালেন।

'কেন, সুনন্দ বলে নি আপনাকে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। অদ্ভুত কত-গুলো কল্পনা আমার মনের মধ্যে জট পাকিয়ে জটিল হয়ে উঠছে। আপনার চেম্বারে তো সেই জন্যেই ও নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'এই আমার বড় দুঃখ মিঃ চৌধুরী, সামাজিক মেলামেশার আসরে আমার ঠাঁই হোলো না কখনো। লোকে বিশ্বাস করতেই চায় না, ভাবে কথাবার্তার ছলে বুঝি মনের কথাগুলো জেনে নিচ্ছি।' বরুণেন্দ্র কপট দুঃখের ভাণ করলেন।

'আপনার সঙ্গে আমি একটু একলা কথা বলতে চাই—' সমরেশ ফিস ফিস করে বলল। তারপর ঘর খালি হয়ে গেলে চেয়ারটা আরও একটু সামনের দিকে টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। আমাকে ওরা পাগল প্রমাণ করতে চায় কেন জানেন? তাহলে সত্যি কথা বললেও আদালতে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আমার স্ত্রী মাধবী, আমার বন্ধু সুনন্দ। কথাটা শুনতে ভয়ানক স্থূল, কিন্তু না বলেও উপায় নেই। আমি বেঁচে থাকলে ওদের দুজনেরই প্রচণ্ড ক্ষতি। তাই ওরা আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছে। কাকে বলব, বলার মত কেউ নেই আমার। অথচ কথাটা ভয়ানক জরুরী। যদি এর মধ্যে মরে যাই, তাহলে কাইগুলি পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করবেন। আমার এটর্নিকেও বলা আছে। উইলেও শেষ ইচ্ছা লিখে রেখেছি। আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি পুলিশের কাছে এসব বলছি না কেন? আমার ঠাকুর্দা শেষ বয়সে এক তান্ত্রিক সাধুর পাল্লায় পড়ে মেতে উঠেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পাগল হয়ে যান। মন্ত্রতন্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে তর্ক উঠতে পারে কিন্তু ডাক্তারের সার্টিফিকেট রয়েছে—ইনস্যানিটি। তার হাত থেকে আমাদের বংশের উদ্ধার নেই। বাবা সর্বদা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন, এই বুঝি ব্যাধির চিহ্ন ফুটে উঠে তাঁর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে বিপর্যস্ত করে। সেই কালো মেঘের ছায়া আমার জীবনেও অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে। পুলিশ আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবে না, সে আমি জানি।'

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সমরেশ। সভয়ে দরজার দিকে বারবার চোখ তুলে লক্ষ্য করছিল হাওয়ায় দোলা পর্দার অন্য দিকে আর কারো সচল অস্তিত্ব আছে কিনা। বরুণেন্দ্র তার পিঠে সান্ত্বনার মত আলগোছে হাতটি রাখলেন। এয়ার কণ্ডিশন করা ঘর, তবু সমরেশের কপালে উত্তেজনার স্পষ্ট ছাপ বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে ফুটে উঠেছে।

'আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে আই শ্যাল হেল্প ইউ। দরকার হলে সুইটজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেব আপনাকে। আমার এক বিশিষ্ট জার্মান বন্ধু সেখানে প্র্যাকটিস করে। পরিবেশের প্রভাব আমাদের জীবনে অনেকখানি, একথা সকলে ঠিক জানে না।'

'পারেন আমাকে ওদের দুজনের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে—' সমরেশ ঝুঁকে পড়ে বরুণেন্দ্রর হাত দুটো চেপে ধরল।

'সেখানে সাদা বরফের গায়ে সূর্যের সোনালি আলো ঝলমল করে—ঠিক এক মাসের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।' বরুণেন্দ্র সহানুভূতির সুরে বললেন—'কিন্তু একটা কথা। নিছক আমার কৌতূহল। আচ্ছা, হঠাৎ চোখ বন্ধ করলে আপনার চোখের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ভেসে ওঠে কি?'

চোখ বন্ধ করল সমরেশ। তারপর শিউরে উঠে আর্তনাদ করে বলল—'অন্ধকারে মাকড়সার মত কি যেন একটা নড়ে ওঠে। ডাঃ বসাক, যখন আমি নিজের ভাগ্যের কথা ভাবতে বসি, সমস্ত রাত ঐ বিভীষিকার স্বপ্ন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারেন আপনি?'

'পারি, নিশ্চয় পারি—' মাথা দোলালেন ডাঃ বসাক। 'আপনি ভয় পাবেন না। কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দেওয়ালে এই ছবিটা দেখছেন তো। জীবন শুধুই অন্ধকার আর বঞ্চনা দিয়ে ভরা নয়, আলো হাসি আনন্দ সবই আছে। তবে আপনাকে সেই আনন্দের উৎস খুঁজে নিতে হবে। হাতের কাছে সুখ কেউ তুলে ধরে না, সুখকেও অনুসন্ধান করে নিতে হয়।'

সুনন্দ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবার পেছন ফিরে মৃদু গলায় বলল—'কি রকম দেখলেন ডাঃ বসাক?'

হয়তো সিঁড়িঘরের অন্ধকারে বরুণেন্দ্রর মুখ থমথমে দেখাচ্ছিল। মাথা দুলিয়ে তিনি বললেন—'একদিন দেখে ভারডিক্ট দিতে চাই না। ভদ্রলোক ভয়ানক আনহ্যাপি, ওঁর আত্মা দুঃখের ভারে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আই হ্যাভ নট সিন এ্যাম আনহ্যাপি ম্যান লাইক হিম বিফোর।'

(ক্রমশঃ)

● কলকাতায় আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজধানী ঃ

উনবিংশ শতকে বঙ্গ-জননীর কোলে এসে যাঁরা জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, জাতীয় শিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নতুন করে, তাঁদের অন্যতম পুরুষশ্রেষ্ঠ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান পরম শ্রদ্ধাভরে উদ্‌যাপন করেছে শহর কলকাতার মানুষ। রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলকাতায় এসেছিলেন এই পুণ্যশ্লোক পুরুষের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের উৎসবানুষ্ঠানে আশুতোষের প্রতিভাদীপ্ত, নিরলস কর্মময় জীবনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, গেল এক শতাব্দীতে যে নতুন ভারত গড়ে উঠেছে স্যার আশুতোষ ছিলেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানায়ক। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে, সমাজের লাঞ্ছিত ও অনুন্নত মানুষকে মর্যাদার আসনে বসাতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় দেশের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর অবিরাম ও নিরন্তর সংগ্রামে ভারতের ইতিহাস প্রোজ্জ্বল।

আশুতোষের পৈতৃক ভবনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষা ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধন করেও ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, এই ইনষ্টিটিউট হবে মহান শিক্ষাবিদের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-মন্দির।

* * *

বিজ্ঞান সাধনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিদেশে যে সব ভারতীয় বিজ্ঞানী রয়েছেন তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানে স্নাতক ৪৬০০ জন ভারতীয় আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে বসবাস করছেন। গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলেই এঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের কিছুটা অগ্রগতি হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়েই রয়েছে। বিজ্ঞান-চর্চার ও গবেষণার পরিপূর্ণ সুযোগ এখানে নেই। শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলাও এই সমস্যার সমাধানের বিষয় চিন্তা করছেন। সাম্প্রতিক বক্তৃতায় তিনিও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিজ্ঞান সাধনায় সাফল্যের উপরই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য। সে সাফল্য অর্জন করতে হলে গবেষণা পরিচালনার অতি আধুনিক সরঞ্জাম, গবেষণার ও বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা' করতে পারলে, বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই ভারতে ফিরে আসতে আগ্রহশীল হবেন। বিজ্ঞান সাধনায় ভারত কোন-কালেই পিছিয়ে ছিল না। বীজগণিত ও পাটিগণিত ভারতেরই দান। পরশাসনে—বঞ্চিত ভারতেও স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ সি ভি রমণের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর অভাব ছিল না। তরুণ বিজ্ঞানী শ্রীজয়ন্তবিষ্ণু নারলেকারের গবেষণা সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানজগৎ আজ বিস্মিত। শ্রীনারলেকার আধুনিক বিজ্ঞানের গুরু আইনস্টাইনকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। তরুণ বিজ্ঞানী নারলেকারের গবেষণার বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। বিচারের ফল যাই হোক না কেন, নারলেকারের আবিষ্কারে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় প্রতিভা পুনরায় স্বীকৃতি পেল। দেশে বিজ্ঞানচর্চার অন্তরায় ও বাধাবিঘ্ন দূর করতে পারলে নারলেকারের মত প্রতিভাধর তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সহজেই আকৃষ্ট হয়ে ভারতের মাটিতে সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। ভারতের প্রতিভার অভাব কোনদিন ছিল না—এখনও নেই। প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশেরই এখানে অভাব। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এদিকে নজর দিলেই সে অভাব পূরণ সম্ভব হবে। ভারত আবার বিজ্ঞানজগতে নিজের আসন করে নিতে পারবে।

* * *

এ সপ্তাহে আমরা আরেকজন অপরিমেয় প্রতিভার অধিকারী পুরুষের জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছি। তিনি হলেন স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলার রূপকার, চিকিৎসা-জগতের অন্যতম দিকপাল ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিধান-চন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যুর স্মৃতি বিজড়িত দিন ১লা জুলাই। সেদিন কলকাতার বিভিন্নস্থানে নানা অনুষ্ঠানে দেশবাসী শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করেছে বিধান-চন্দ্রের কর্মজীবনের অবিস্মরণীয়

● বিধানচন্দ্র রায়

অবদানের কথা ; তাঁর পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ আজও সম্ভব হয় নি। ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর সাধের নার্সিং হোমের প্রতিষ্ঠারও সম্যক ব্যবস্থা করা হয় নি। শোনা যাচ্ছে, আসছে বছর এ কাজ হবে। 'সমৃদ্ধ ভারতের পথে' —বিধানচন্দ্রের ভাষণ ও রচনার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়া তাঁর স্মৃতি-রক্ষার আর কোন কাজই এখনও সম্পন্ন হয় নি। স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত অর্থ গচ্ছিত রয়েছে—সুদ বাড়ছে তার। সুদের হিসেব-নিকেশ নিয়ে দেশবাসী মাথা ঘামাচ্ছে না। বিধানচন্দ্রের পরিকল্পনাগুলোর রূপ দেবার ব্যবস্থা করলে, তাঁর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গৃহে নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের মানুষের প্রকৃত উপকার সাধিত হবে। দরিদ্র মানুষও অতি আধুনিক ধরণের চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারকে আমরা এ সপ্তাহে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়েছি। এ সম্বর্ধনা ছিল গতানুগতিকতার উর্ধ্বে—আন্তরিকতায় পূর্ণ, আমাদের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিবাদন। কামরাজ পরিকল্পনার জনক, জাতীয় কংগ্রেসে নতুন প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা কামরাজ নাদারকে কাছে পাওয়ার জন্য কলকাতা উৎকণ্ঠিত হয়েই ছিল। নেহরুর অসামান্য ব্যক্তিত্বের আকস্মিক অবসানের পর দিশেহারা ভারতকে সুসংহত করতে তিনি অমিত বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়ে জনচিত্ত জয় করেছেন। কলকাতাবাসী তাঁর প্রথম দর্শনেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। অগণিত নরনারী সমবেত হয়েছিল ময়দানের সভায় এই কর্মযোগী স্বল্প-বাক্ মানুষটির ভাষণ শুনতে।

শ্রীনাদার ময়দানের সমাবেশে গণতন্ত্রের পথে ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল করার জন্য কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ—জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট খাওয়া-পরার ব্যবস্থা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। কিন্তু সম্পদশালী ব্যক্তিরা সমাজবা প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত ছোট ছোট সমস্যাকে বড় করে তুলে ধরে দেশকে ভ্রান্তপথে পরিচালনার চেষ্টা করছে।

কংগ্রেসের নেতাদের মুখে এ-ধরণের কঠোর ও অপ্রিয় সত্য ভাষণ আগেও আমরা শুনেছি। তাতে আসল কাজ একটুও এগোয় নি। বিত্তবান, সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তিদের চক্রান্ত জাল দিনের পর দিন বিস্তৃতিই লাভ করছে। কংগ্রেসের মধ্যেও তাদের প্রভাব অধিক বলেই দ্বিধা ও সংশয় ত্যাগ করে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেস সমাজবাদের আদর্শের বাস্তবে রূপ দিয়ে উঠতে পারছে না। একথা আজ স্বীকার না করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। দেশের বর্তমান দুর্গতি, জন-জীবনের দুঃস্বপনেয় দুর্ভোগই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীনাদার ও প্রধান-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর যৌথ নেতৃত্বে কংগ্রেস কুণ্ঠা ও সংশয় জড়িত মনোভাব পরিহার করে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারবে বলেই দেশবাসী বিশ্বাস করে। তাঁরা শক্ত হাতে হাল ধরলে নিশ্চয়ই কাজ হবে। সে-কাজে দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনও তাঁরা পাবেন।

দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীনাদার কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও বলেছেন।

উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী

চেম্বার অফ কমার্সের সভায় ভাষণদানরত শ্রীঅশোক সেন

শ্রীঅশোককুমার সেনও কলকাতায় মার্চেণ্টস চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে বলেছেন, কৃষি, শিল্প, খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই হবে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের মহান কর্তব্য। জাপান কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িয়েই যুদ্ধোত্তর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সমস্যার সমাধান করেছে।

পশ্চিম বাংলা সরকার জাপানী প্রথায় নিবিড় চাষের প্রবর্তনও করেছিলেন। চাষের আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে, চাষীর ঘরে উপযুক্ত সময়ে ঋণের টাকা ও সার পৌঁছে দিয়ে ব্যাপক ও নিবিড় চাষের কোন ব্যবস্থাই সরকার করে উঠতে পারেন নি। তাই আজ সারা পশ্চিম বাংলায় খাদ্যের অভাবে উঠেছে হাহাকার। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্র‹ম ি‹কে যতটুকু কাজ হয়েছিল তারপর কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টরেট ও সেক্রেটারিয়েটের দ্বন্দ্বের ফলে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। ঘটা করে প্যাকেজ প্রোগ্রামের কাজ সুরু হয়েছিল। সে কাজেও তেমন কোন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি।

ঘাটতির বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিছুটা প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রীর এ-উক্তি অনস্বীকার্য। উৎপাদনের দিকে সম্যক্ দৃষ্টি না দিয়ে কেবল মূল্য নিয়ন্ত্রণে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেও পশ্চিম বাংলা সরকার ব্যবসায়ীদের অতিমুনাফা লাভের পথ বন্ধ করতে পারেন নি। চাল-তেল ও মাছের চাহিদা মেটাতে পারেন নি।

পশ্চিম বাংলার মখ্যমন্ত্রী কলকাতার পর খাদ্যে ঘাটতি জেলাগুলোতে ন্যায্য-মূল্যের দোকানের মাধ্যমে চাল ও গম সরবরাহের ব্যবস্থা করে খোলাবাজারে সরকার নির্দিষ্ট চালের মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর আশা ফলবতী হোক, এ-কামনাই সকলে করে। কলকাতায় কিন্তু এখনও ন্যায্যমূল্যের দোকান ছাড়া অপর কোন দোকানে চাল সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিম বাংলার উদ্বৃত্ত জেলাগুলোর হাটে-বাজারে সরকারের বাঁধা দামে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এ-সপ্তাহে উদ্বৃত্ত জেলার মানুষের দুর্ভোগের চিত্রটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

মুখ্যমন্ত্রীর সর্বশেষ ঘোষণা অবিশ্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘোষণা অনুযায়ী আগামী আমনের মরশুমের সুরুতে ধান ও চালের পাইকারী ব্যবসায় সরকার নামলে সমস্যা অনেকটা কেটে যাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত, দুর্নীতির সকল পথে সতর্ক প্রহরী মোতায়েন না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ সাফল্যের আশা কম। অসাধু উৎপাদক ও জোতদারদের শায়েস্তা করা এবং প্রশাসন যন্ত্রের দুর্নীতি দূর কঠোর হস্তে আগে করা প্রয়োজন হবে। তা করতে না পারলে লাভের গুড় খাবে পিঁপড়েতে, অপব্যয় যাবে বেড়ে।

বীরভূম :

চাল, ডাল, দেশলাই ও সরষের তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে পড়ছে। ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। দেশলাই বিক্রি হচ্ছে আট নয়া পয়সায়। তেল বাজারে পাওয়া কষ্টসাধ্য। পৌণে চার টাকা থেকে চার টাকায় মাঝে মাঝে যে-তেল পাওয়া যাচ্ছে তা দুর্গন্ধে ভরা, অখাদ্য। তেলের অভাবের সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিচ্ছে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী। রেড়ির তেল থেকে সুরু করে যত রকমের পদার্থ সম্ভব সরষের তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবসায়ীরা তেলের ফলাও কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রেতা-সাধারণ অসহায়। প্রয়োজনের তাগিদে তারা বাধ্য হচ্ছে এই ভেজাল তেল কিনতে।

ডালের দাম এখন এক টাকা থেকে এক টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা। তাও ভেজালশূন্য নয়। যথেষ্ট পরিমাণে কাঁকর ও ভূষি চলছে ডালের সাথে এই দুর্মূল্যের বাজারে। খেসারির ডাল

পর্যন্ত নাম-করা ডালের সামিল হতে চলেছে। পুরো একটি টাকা তার এক কিলোগ্রামের দাম।

রামপুরহাটের চারটে মিলের মালিক চারটে চালের খুচরা দোকান খুলেছেন। পঁচাত্তর নয়া পয়সায় সেখানে চাল পাওয়া যাচ্ছে। ক্রেতারা বলছেন, এই পঁচাত্তর নয়া পয়সার চাল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। খোলাবাজারে চাল পাওয়া দুষ্কর। কালোবাজারে অবিশ্যি চালের কোন অভাব নেই। দাম তার প্রতি কিলোগ্রাম নব্বই নয়া পয়সা।

অথচ এই বীরভূম থেকে রাতের পর রাত অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে লরীভর্তি খাদ্যশস্য পাচার হচ্ছে বিহারে। সম্প্রতি পুলিশ সিউড়িতে ১২৫ বলে আটা বোঝাই তিনটি ট্রাক আটকও করেছিল। তিনটি ট্রাকই বাংলার বাইরের। তাদের ছিল না প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ। পুলিশ তাদের নাকি বেশিদিন আটকে রাখতে পারে নি। তিনদিনের মাথায় আটক গাড়ির চালকেরা খালাস পাওয়ার উপযুক্ত কাগজ-পত্র দাখিল করেছে। এ-দেশে সবই সম্ভব। শক্ত যাদের ঘাঁটি তাদের বেশিদিন আটকে রাখা যায় না। বুদ্ধিমান, চতুর ব্যবসায়ীরা সে পথের সন্ধান রাখে। সেখানে আমাদের শাসনযন্ত্র হয়ে পড়ে একেবারে বিকল।

জেলার কর্তারা কতকটা নীরব দর্শক মাত্র। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা নেমেছিলেন জোতদারদের হাত ধরে ধান সংগ্রহ করতে। মাত্র পাঁচ হাজার মণ ধান চালকলে তাঁরা জোতদারদের সহযোগিতায় পৌঁছে দিতে পেরেছেন। খাদ্য ও পুলিশ বিভাগ দিন কয়েক আগে ধান আটকের অভিযানে নেমেছে। শোনা যাচ্ছে, দিন দশেক অভিযান চালিয়ে তারা আটক করেছে আট হাজার মণ ধান। মিলে ধান যাচ্ছেও, কিন্তু চালের দাম কমছে না।

নিয়ম অনুসারে মিলে উৎপন্ন চালের ২৫ ভাগ সরকারের, ২৫ ভাগ যাবে নদীয়া জেলার ঘাটতি মেটাতে এবং সাড়ে বারো ভাগ বিক্রি হবে স্থানীয় এলাকায়। বাকীটার হিসেব কাগজ-কলমের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নাকি পড়ে না। সেই বাকী ভাগের সাথে আরও কিছুটা চলে যাচ্ছে চোরাবাজারে—পাচার হচ্ছে ভিন্ন জেলায়, ভিন্ন রাজ্যে। সেখানে চড়া দামে বিকোচ্ছে।

অসাধু পাইকার ও আড়তদারদের দাপটে খুচরা দোকানদারদের অবস্থাও কাহিল হয়ে উঠেছে। এদের কারবারের অনেকটা টাকা থাকে ক্রেতার কাছে বাকী পড়ে। ধাপে ধাপে দাম বাড়তে থাকলে ক্রেতা যায় ছুটে। বকেয়া আদায়টা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সিউড়ির মুদিখানার মালিকরা ও খুচরা ব্যবসায়ীরা উপায় না দেখে ঠিক করেছেন চোরাবাজার থেকে আর তাঁরা বেশি দাম দিয়ে মাল দোকানে তুলবেন না। ন্যায্যমূল্যে বেচা যা সম্ভব নয়, সে-মাল খুচরা দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রেতারা আরও ফাঁপরে পড়েছেন। চাল, ডাল, তেল, দেশলাই পাওয়া যাচ্ছে না।

মেদিনীপুর :

স্বল্পবিত্ত গ্রামবাসী, দিন-মজুর ও ক্ষেত-মজুরদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। জিনিষের দাম এদের নাগালের বাইরে। এ-বছর মাঠ থেকে ফসলও উঠেছে বেশি। কিন্তু অন্ন-সংস্থান কেউ করে উঠতে পারছে না। সস্তার বাজারে ধান বিক্রি করে ফেলেছে দরিদ্র চাষী। আজ তার ঘরে খাবার নেই। আসছে বছরও ফসল ভাল হবে বলেই অনেকের ধারণা। এবারে অবস্থা দেখে আগামী দিনের ভরসাও তারা করতে পারছে না। অন্যান্য বছর সরকার টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করেন। এ-বছর টেষ্ট রিলিফের কাজও হয় নি। কাজেই দিন-মজুর আজ কর্মহীন। তার ওপর হাটে-বাজারে সরকারের বাঁধা-দামে ধান-চাল পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিণত হয়েছে প্রহসনে। সেখানে চালের বালাই নেই। মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণ গম পাওয়া যাচ্ছে। সে গমও মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। আলু এক টাকা। সরষের তেল দুষ্প্রাপ্য, দেশলাই সাত থেকে নয় নয়া পয়সা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পর মেদিনীপুরের মানুষ এমন অভাবের মধ্যে আর পড়ে নি।

পশ্চিম দিনাজপুর :

তেল আর তণ্ডুলের সমস্যা জেলার সর্বত্র ব্যাপক আকারে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। এ দুটি দুর্লভ বস্তু সরকারের নির্ধারিত মূল্যে পাওয়ার কোন উপায় নেই। সরষের তেল প্রতি কিলো চার টাকা। দেশলাই সাত থেকে আট নয়া পয়সা। জিনিষপত্র যেভাবে বাজার থেকে উধাও হচ্ছে এবং প্রতিদিন দাম বেড়ে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের সংসারযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

এদিকে ধান-চাল পাচার হচ্ছে আলাদা রাষ্ট্রে—পূর্ব পাকিস্তানে। শুধু ধান-চাল নয়, গবাদি পশু পর্যন্ত বেমালুম চলে যাচ্ছে ভিন দেশে। অবস্থা দেখে জেলা-শাসক বাধ্য হয়েছেন ১৯৫০ সালের পশ্চিম বাংলা নিরাপত্তা আইনের ৩৮ ধারা বলে আদেশ জারী করতে। এই আদেশে জেলার সীমান্তের তিন মাইলের ভেতর সন্ধ্যার পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত জল অথবা স্থলপথে গবাদি পশু এবং পণ্য-সামগ্রী নিয়ে চলাচল ও হস্তান্তর নিষেধ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্য করলে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড অথবা দুটোই একসাথে ভোগ করতে হবে। আপাতত তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আদেশ বহাল থাকবে।

শুধু দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সমস্যাই নয়, দিনাজপুরের সমস্যার শেষ নেই। রাস্তা-ঘাট মেরামতের অভাবে ভেঙে

চুরমার হচ্ছে। আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণেই বালুরঘাটের প্রধান রাস্তাটি জল-কাদায় পথিকের চলাচলের অযোগ্য হয়েছে। দুর্ঘটনাও না ঘটছে এমন নয়। পৌরপিতারা নির্বিকার। তাঁদের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিদায় যাঁদের আসন্ন, তাঁদের যেন আর কিছু করবার নেই। তাই তাঁরা গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

• •

আমাদের সরকার জেলায় জেলায় হাসপাতাল করেছেন—জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনায় আমরা নাকি ভারতের অনেক রাজ্যকেই হার মানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু হয়েছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বালুরঘাট সাধারণ হাসপাতাল। উত্তর বাংলার এটি বৃহত্তম সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র। ১৯৬১ সালে এই হাসপাতালটির উদ্বোধন হয়েছে। একটি সেরা হাসপাতাল পেয়ে সেদিন মানুষ সত্যি উল্লসিত হয়েছিল। সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ঔদাসীন্যে আজ তারা আশাহত। হাসপাতালের জরুরী বিভাগ প্রায় অচল। সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক নেই। ওষুধ-পত্রের অভাব। আজ অবধি আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী হয় নি। ব্লাড-ব্যাঙ্ক চালু করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।

সরকারী হাসপাতালে আসে বেশির ভাগ গ্রামের দুঃস্থ, দরিদ্র পরিবার। বিনা পয়সায় তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকারের নীতি। বালুরঘাট হাসপাতালে ওষুধের কোন বালাই নেই। এ-অভিযোগ চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। কাজেই সেখানে অসাম্যের প্রশ্নও ওঠে না—ধনী ও দরিদ্র সকলকেই বাজার থেকে পয়সা খরচ করে ওষুধ কিনতে হচ্ছে।

যক্ষ্মারোগীদের জন্য হাসপাতালে বিছানা রয়েছে কুড়িটি। রোগীদের দুর্ভোগের সীমা নেই, কারণ, চিকিৎসকের অভাব।

এই হাসপাতালের অব্যবস্থার অভিযোগের প্রতি আমরা স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাসপাতালে অতি সাধারণ ওষুধ সরবরাহ হয় না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। বাংলা দেশের হাসপাতাল থেকে ওষুধ উধাও হওয়ার নজীর কম নেই। স্বাস্থ্য-মন্ত্রী নিজে বালুরঘাট হাসপাতালের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখলে, অভাব-অভিযোগের বোঝাটা অনেকখানি হাল্কা হবে। সাধারণ মানুষও উপকৃত হবে।

২৪ পরগণা :

ক্যানিং এখন মাছের কাঙালদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দূরের গ্রাম থেকে, কলকাতা শহরের আশ-পাশ থেকে প্রতিদিনই মানুষ আসছে। আশা, যদি দুটো মনের মত ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। কলকাতার বাবুদের নিরাশই হতে হয়েছে। প্রচুর পরিমাণ ইলিশ মাছ বোঝাই নৌকো ক্যানিংয়ের ঘাটে ভিড়লেও আড়তদারদের দৌলতে মূল্য তার কমে নি। কলকাতার বাজারের মত এখানে তিন টাকার কম খুচরা বাজারে এক কিলোগ্রাম ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না।

● শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলার মৎস্য দপ্তর নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার চেষ্টায় ইলিশ মাছকেই অপরাধী ঘোষণা করেছিলেন। প্রচার হয়েছিল, সরকারের নৌকো সুন্দরবনের নদীতে পেঁছতে-না-পেঁছতে ইলিশ মাছ লুকোচুরি সুরু করে দিয়েছিল। সরকারের এই অপপ্রচারে ইলিশের ঝাঁক ভোলবার পাত্র নয়। মাতলার মিঠা পানি তাদের মাতিয়ে তুলেছে। প্রতিদিন তারা দলে দলে ধরা দিচ্ছে জেলেদের জালে। দুঃখের কথা, আমাদের মৎস্য-মন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেবের নৌকো 'ময়ূরপঙখী' ফজির থেকে সাঁঝের বেলা পর্যন্ত টহল দিয়েও ইলিশের পুচ্ছের সন্ধান করতে পারছে না। উন্নত ধরণের নৌকো, আধুনিক সরঞ্জাম নিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণ ইলিশ ধরতে পারছে না। ৫০ থেকে ৮০ কে-জির বেশি ইলিশ সরকারের নৌকো আনতে পারে নি।

পারবার কথাও নয়। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী প্রভৃতি পূর্ব বাংলার নদীর ইলিশ ধরার কায়দা-কানুন বিদ্যা আর মাতলায় প্রযোজ্য নয়। এখানে নদীর বুকের চাইতে তার শাখাবাহু খালগুলোতে ইলিশ ধরা পড়ে বেশি পরিমাণে। জোয়ারের প্রবল স্রোতের মুখে গা এলিয়ে দিয়ে ইলিশের দল ঢুকে পড়ে খালগুলোতে। খালের মুখ বন্ধ করে বেড়াজালে ধরা হয় তাদের।

মৎস্য দপ্তরের পদ্মাপারের প্রগল্‌ভ অফিসারের এ-খবর না রাখারই কথা। মৎস্য-মন্ত্রী ফজলুর তাই তো ও পারেরই মানুষ। তাঁর অজ্ঞতার কোন কারণ থাকতে পারে না।

আমরা পূর্বেও বলেছি, প্রচার-বাহুল্য পরিহার করে বরফের যোগান দিন, জেলেদের হাতে সরঞ্জাম তুলে দিন, তাতে কাজ হবে। তা না করলে আড়তদার ও পাইকারদের খপ্পর থেকে মাছ আসবে না। প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ছে। পাইকাররা তার সুযোগ নিচ্ছে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য প্রতিদিন পচা ইলিশ ফেলে দেওয়াও হচ্ছে।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দুরন্ত দেহলী

॥ কুঁড়ি ॥

ক'দিন থেকে সমরের মনটাও একটু উদাস। বহুদিন নেপেনদার সাথে দেখা নেই। অরুণা আজকাল একটু দূরে দূরেই থাকে। তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করে নেবে, সে সুযোগটুকুও জুটছে না। অফিস ছুটির পর সে চলল নেপেনের ঘরের দিকে।

নেপেনের ঘরে কানাই বলাই বসে ঘামছিল। সমর প্রথমে তো তাদের চিনতেই পারে নি। 'গেল গেল হৃদয়টা টুকরো টুকরো হয়ে গেল নেপেনদা গো!' বলে চেঁচিয়ে না উঠলে সমর কখনও কানাইকে চিনতে পারত না।

সমর হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কানাই বলাই নব সাজে সজ্জিত। পরিধানে ওস্তাদদের মতন কলারওয়ালা কুর্তা। চুনোট করা কাঁচি ধুতি। গলায় চাদর। পায়ে নিউ কাট।

দেওয়ালে একটা কিসের যেন ছবি ঝোলানো হয়েছে।

নেপেন সমরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'অমন ভাবে তাকাচ্ছিস কেন? বল্ তো কেমন মানিয়েছে? এঁরা হলেন আমার পত্রিকার আর্ট-ক্রিটিক আর সাহিত্য সমালোচক। ঐ যে ছবিটা দেখছো ওটা এঁকেছেন মুকুল সেন। মডার্ন আর্টের ফাউণ্ডার।' কানাই বলাই ঘামছিল।

নেপেন বলল, 'শোনো সমর, ছবিটা প্রথমে কাছ থেকে দেখবে। তারপরে দূর থেকে দেখবে। তারপর চশমার উল্টো দিক দিয়ে দেখবে। যদি কিছু না বুঝতে পারো তাহলে চোখ কান বুজে লিখবে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট। ও ছবির ক্যাপশন হয় না। দর্শকেরা সেটাকে উটের মাথা, বাঘের কাঁধ, আকাশের মেঘ যে যা খুশি ভেবে নিক তুমি সেটাকে শুধু কম্পোজিশন নাম্বার লিখেই খালাস। মডার্ন আর্ট, মডার্ন কবিতা আর মডার্ন মেয়ে এদের সম্বন্ধে তুমি যা লিখবে তাই ঠিক। কেন না এ হেন বস্তু নেই যা এরা কভার না করে। লেখবার সময়ে চাই শুধু তোমার কনফিডেন্স।'

দেওয়াল ঘেঁষে সমর ছবিটার কাছে গিয়ে বলল, 'ওহো হো নেপেনদা, তুমি যে ছবিটাই উল্টো টাঙিয়েছ।'

নেপেন বলল, 'সে কি কথা? তুই আর্টের কি ছাই বুঝিস? বল কেমন করে জানলি এটা উল্টো?'

সমর বলল, 'কেন? আর্টিস্টের দস্তখতখানা দেখে মনে হচ্ছে ঐ দিকটাই নীচে আসবে। তোমার কি মনে হয়?'

আর্টক্রিটিক কানাই, সাহিত্য-ক্রিটিক বলাইও নেপেন দু-একবার ছবিটা আবার ভালো করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছবিটাকে আবার উল্টো করে টাঙালো। নেপেন বলল, 'বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখছো কি? ওটা হলো আর্টের নেগেটিভ ভিউ।'

উপেন চা নিয়ে এলো। সমরকে দেখে সে খুশি হল। নিজে থেকে গিয়ে নানা রকমের খাবার নিয়ে এলো।

পটলাটা সিনেমা জগতে এখনও কিছু করে উঠতে পারে নি। বেচারা উপেন এখনও তার ভৃত্যের পোস্টটিতে ইস্তফা দিতে পারছে না।

সমর তাকে ভালবাসে। অনেক ভেবে-চিন্তে সমরকে সে বলল, 'শুনেছো তো দাদাবাবু, দিদিমণির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

সমর কিছুই না জানার ভাণ করে বলল, 'কোন দিদিমণির রে? কবে বিয়ে?'

'—আমাদের অরুণাদিদি গো। সে কি কথা? তুমি কিছুই জানো না? পেপেসারের সাথে বিয়ে। আমাকে বলে দিয়েছে কাউকে না বলতে।'

নেপেন বলল, 'হাঁ রে সমর, তুই একটা আস্ত গবেট। তোর দ্বারা কিছুই হ'ল না। এত সুন্দর একটা মেয়ে, এত বড় একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস? কতবার তোকে বোঝালুম ঝুলে পড়।'

উপেন বলে উঠল, 'আজ্ঞে সাহেব ঠিক বলেছেন। পিরতিমার মতন রূপ। এক কথায় বিয়েটা হয়ে যেতো সাহেব

কানাই বলাই নেপেন সমর সবাই হেসে ওঠে।

নেপেন বলল, 'হাঁ রে উপেন, তুই এ সব কথা জানলি কি করে?'

উপেন বলল, 'সেটা যে বলা মানা গো। দিদিমণি নিজে বলেছে কাউকে বলিস নি উপেন। এ সব কথা কাউকে বলিস নি।'

সমর বলল, 'কোন সব কথা?'

উপেন বলল, 'সেকি বলা যায় দাদাবাব? তোমাদেরটা খেয়ে পরেই বেঁচে আছি। যখন জিজ্ঞেস করছো বলছি। আবার তেনাকে বলতে যেও না। ও বাড়িতে এ গরীবের জলাটা মলোটা যা মাঝে-সাজে জোটে, মারা যাবে।'

সমর বলল, 'না। কাউকে বলব না। বল তো।'

উপেন বলল, 'ও বাড়িতে গেলেই দিদিমণি প্রতিটি দিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঐ সরমা না কে, তার কথা জিজ্ঞাসা করে। কি রকম দেখতে। কোথায় বাপের বাড়ি। কেন দাদাবাবুর সাথে দিল্লীতে থাকে না।'

সমর বলল, 'তুই কি বললি?'

উপেন বলল, 'কি আর বলব? বলে দিয়েছি পরীর মতন সুন্দরী। বানিয়ে বানিয়ে বাপের বাড়িরও একটা বর্ণনা দিয়ে দিলম।'

নেপেন রাগের সুরে বলল, 'গজমূর্খ. তোর কি দরকারটা ছিল ও সব সাজানো কথা বলার? তোরা মূর্খের দল আমার সমস্ত প্ল্যানটা মাটি করে দিলি। দেখেছিস তুই কোনোদিন সরমাকে?'

'—আজ্ঞে না।'

'—তবে কেন বলতে গেলি পরীর মতন সুন্দরী?'

'—কি করব? সে যে ঐ সরমা ছাড়া অন্য কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে না।'

'—তুই শুধু সমর সম্বন্ধে বলিস না কেন?'

'—সে কি আর বাকী রেখেছি? হেঁ হেঁ হেঁ। দাদাবাবু সম্বন্ধে সব বলে দিয়েছি। দাদাবাবু মোটা মোটা বই পড়ে, মেলা টাকা মাইনে পায়। আমাকে ঘন ঘন কত টাকা বকশিস দেয়। কোনোটা বলতে বাকী রেখেছি, ভাবো? কিন্তু কি করি সে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ উপেন জানি তুমি দাদাবাবু বলতে পাগল। তোমার দাদাবাবুর সব খবর আমার জানা আছে। তুমি সেই সরমা দিদিমণি সম্বন্ধে কি জানো বলো।'

'—আমি আর কি বলব। বললাম, একদিন দাদাবাবুর অফিস থেকে ফিরতে ভয়ানক দেরি হচ্ছিল। সরমা দিদিমণি তো ভেবেই আকুল। আমাকে ডেকে পাঠালেন। ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ রে উপেন বল্ তো কি করি? আমি তখন ছুটোছুটি করে দাদাবাবুকে দাবার আড্ডা থেকে টেনে নিয়ে আসি। তারপর সরমা দিদিমণি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে যান।'

'অরুণা দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে তোমার দাদাবাবুর দাবার আড্ডাও চলে। কই এখানে তো কখনও ও সব খেলতে দেখি নি।'

আমি বললাম, 'এখানে ও সব খেলে না তোমার ভয়ে।'

নেপেন বলল, 'হাঁ রে উপেন তুই এতগুলো মিথ্যে কথা এক নিঃশ্বেসে বলতে পারলি? তোর নরকের ভয় ডর নেই?'

উপেন ভৃত্য হলেও উপস্থিত বুদ্ধিতে টনটনে। সে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা আমরা আছি কোথায়?'

'—মানে?'

'—মানে হ'ল, এই মেসের ম্যানেজারবাবুর চাকরীর চেয়ে সেই কোথাকার কথা বললেন, নরক না কি, সেখানে থাকায় কি বেশি সুখ?'

নেপেন বলল, 'এই ব্যাটা উপেনই সব মাটি করে দিল। কোন্ মুখে আমি গিয়ে অরুণার সাথে সমরের বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়ি?'

উপেন বুঝলো তার দাবার চালটা ভুল হয়ে গেছে। তার ধারণা ছিল সরমা সম্বন্ধে শত-শত বানিয়ে বলার জন্য যেমন সে অরুণার কাছে সমাদর পেয়েছে, এখানেও ঠিক তেমনই অভ্যর্থনা পাবে। এখন দেখলো এর কোনটাই নেপেন, সমর, কানাই, বলাইয়ের মনঃপূত হয় নি।

উপেন খানিকক্ষণ নীরব রইল। মুহূর্তের ভিতর গলার স্বরটা বদলে উপেন বলল, 'জানো দাদাবাবু, দিদিমণিকে এ সব কথা অবশ্য বলেছিলাম অনেক দিন আগে। এই সেদিন দিদিমণি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও উপেন তোমার সরমা বৌদির কি খবর? কবে আসছেন দিল্লীতে।' আমি বললাম, 'দিদিমণি বলো কেন? সরমা বৌদি আর দিল্লী আসছেন না। দাদাবাবুর সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

নেপেন বলল, 'কি বললি উপেন? সমর তার স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে দিয়েছে। এই কথা ভু-ভারতে কেউ কখনও বিশ্বাস করবে? তোকে এই মেস থেকেই তাড়াতে হবে দেখছি মিথ্যা কথা কে না বলে? কিন্তু তোর মতন এত বড় মিথ্যেবাদী আমার জীবনে কখনও দেখি নি। তুই গিয়ে তাকে বলে এলি, সমর তার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে? তোর ঘাড়ে কটা মাথা শুনি? শোন্, যেমনি করে হোক অরুণা দিদিমণিকে এই আজকালের ভিতরই জানাতে হবে যে সমর দাদাবাবু অবিবাহিত। তার কোনদিন বিয়েই হয় নি। তারপরে সে কি বলে আমাকে জানাবি? বুঝলি?'

বত্রিশপাটি দন্ত বিকশিত করে উপেন মাথা নীচু করে বলল, 'আজ্ঞে দিদিমণির সেটা অজানা নেই। তিনি সবই জানেন।'

(ক্রমশঃ)

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

নিজের রচনায় লিরিকের প্রাধান্য। অনেকের মতে গ্রীনের সহযোগিতায় তিনি 'A Looking-Glass for London' (১৫৯৪) নাটকটি লেখেন।

মারলো (১৫৬৪-৯৩)—স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির সমসাময়িক আর একটি 'ভয়ঙ্কর রসের' জমাট ধরণের নাটক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। যদিও দুটি নাটকের রচনাশৈলী ছিল বিভিন্ন ধরণের। নাটকটির নাম ট্যাম্বারলেন এবং নাট্যকার—কৃষ্টফার মারলো। মারলো তখন সবেমাত্র কেম্ব্রিজ থেকে বেরিয়েছেন এবং এই সময় তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। মঞ্চ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েও মারলো তাঁর নাটকের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে যে বিরাট প্রাণবন্ত উচ্ছলতা এবং অশান্ত, বিদ্রোহী, উদ্দাম মানবাত্মার যে সব চিত্রের অবতারণা করলেন, তার প্রচণ্ড আলোড়ন ইংলণ্ডের নাট্যমঞ্চে স্বর্ণযুগের আবির্ভাবের ইঙ্গিত ঘোষণা করলো। স্টেজে অতিমানুষ সৃষ্টি করবার প্রথম প্রচেষ্টা বোধ হয় মারলোর নাটকগুলিতেই দেখা যায়।

তাতার দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ—সামান্য মেষপালক থেকে যিনি ক্রমে সমগ্র এশিয়ার সর্বময় প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যাঁর মত রক্তলোলুপ জহ্লাদ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল—এই চরিত্রটির ভেতর মারলো যেন অসংহত অতিমানবিক একটা বিরাট উদ্দাম, শক্তির প্রচণ্ডতা দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন:

'Marlowe makes of him a super-man beyond all paltryrules of morality. He is a conqueror: therefore in the right. A poet aspiring to the infinite, Marlowe endows his hero with the unbridled ardours of the Renaissance, devoting two plays to his ascension, triumph, and grandiose death.'

ট্যাম্বারলেনের পরের নাটক ফস্টাস (১৫৮৮)—এ-নাটকের বিষয়বস্তু হল জ্ঞান অর্জনের অসীম আকাঙ্ক্ষা এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে

শিলালি

সর্বক্ষমতার অধিকারী হবার প্রচেষ্টা। মানুষের অর্জিত বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অত্যন্ত সীমিত এবং তুচ্ছ মনে হোল ডক্টর ফস্টাসের। শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করে প্রতিদানে চব্বিশ বছরের জন্য তিনি সর্বরকম ক্ষমতার অধিকারী হলেন। কিন্তু এ-সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত যে সব বিরাট প্রশ্ন তাঁর মনে জাগতো, তার কোনো সমাধানই তিনি পেলেন না। তারপর সুরু হোল তাঁর মনের উপর বিষময় প্রতিক্রিয়া এবং অনুশোচনা।

'Marlowe, the atheist, shaken by his own audacity, describes the deepening agony of Faustus as the hour draws near which is to bring him damnation.'

জ্যু অফ্ মল্টাতে মারলো দেখাতে চেয়েছেন—অর্থগৃধ্নু তার আকাঙ্ক্ষা যেতে পারে। অবশ্য ব্যারাব্বাসের অর্থলোভের পেছনে ছিল ক্ষমতা লাভের প্রচণ্ড প্রয়াস—কারণ সে জানতো অর্থ থাকলেই ক্ষমতা আসবেই। তাছাড়া 'জু'রা খৃষ্টানদের সম্বন্ধে কি প্রতিহিংসাপরায়ণ তাও প্রকট করে তোলা হয়েছে এ-নাটকে।

এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ডে (১৫৯৩) মারলো অনেক বেশি বাস্তবধর্মী—তখন পর্যন্ত এত সার্থক ঐতিহাসিক নাটক ইংরাজী সাহিত্যে দেখা দেয় নি। চরিত্র-চিত্রণ, মানবতা, স্বাভাবিকতা এইসব গুণগুলি অনেক বেশি প্রকট এই নাটকটিতে।

টেকনিকের দিক দিয়ে বিচার করলে সেক্সপীয়ারের পূর্বসূরীদের মধ্যে মারলোর একটা খুব বিশেষ দান নেই। কিন্তু আবেগ, উদ্দামতা, উত্তেজনা, জাতীয় গৌরব-বোধ, বিরাটত্ব প্রভৃতি গুণের প্রবর্তনের জন্য মারলোর নাম চিরকাল ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে:

The fiery declama'ions of

● চার্লস বুশেলের তুলিতে ম্যালভোলিও'র ভূমিকায় স্যার হার্বার্ট ট্রি।

his extravagant character, joined to the victory over the Armada and the discovery of far-off lands, made the English almost giddy with triumphant strength. His choice of subjects, the heroes he moulded, were but the expression of his exorbitant desires. Like him, his characters sought the impossible, and like him they were never satisfied.'

সেক্সপীয়ারের নাটক : নাটক-গুলির বিস্তৃত পরিচয় দেবার উদ্দেশ্য আমার নেই—সামান্য দুখবন্ধ, কাহিনীর উৎস, কবে কোন নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে, এসব বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেবার চেষ্টা করবো।

১। টিটাস এণ্ড্রোনিকাস—প্রথম অভিনীত হয় ১৫৯১-এ। এই রক্ত-লোভী নাটকের আসল রচয়িতা সেক্সপীয়ার কিনা এ-বিষয়েও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, এ-নাটকের অনেকটাই কিডের লেখা। নিঃসন্দেহে নাটকটিকে "ব্লাড্ ট্র্যাজেডির" শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কারো কারো মতে কোন সাধারণ লেখক এটি রচনা করে অভিনয়ের জন্য সেক্সপীয়ারের কাছে আনেন—সেক্সপীয়ার দু-একটি প্রধান চরিত্রকে মেজে ঘসে দেন।

২। হেনরী—৬ষ্ঠ, ১ম পর্ব—(১৫৯০) পুরানো কোন নাটক থেকে নেওয়া—সেক্সপীয়ার অন্যের লেখাকে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে নতুন নাটক রচনা করতেন। প্রথম অভিনীত হয় ১৫৯২-এ।

৩। কমেডি অফ্ এরর্স্ (১৫৯১) এর উৎস বোধ হয় একটি বহু পুরাতন প্লে—'দি হিস্টি অফ্ এরর্স্' অথবা প্লুটাসের মেনিসিমি। রাণী এলিজাবেথের সামনে ১৫৯৭ সালে অভিনীত হয়।

৪। টু জেন্টলমেন অফ্ ভেরোনা (১৫৯২)—বোধ হয় জর্জ ডি মণ্টমেয়োর কৃত স্প্যানিশ্ রোমান্স 'ডায়না' থেকে এর কাহিনী নেওয়া হয়েছে। অগস্টাস ড্যালি এবং রেহান এ-নাটককে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। নারীর পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ, এই নাটকেই প্রথম দেখা যায়।

৫। হেনরী—৬ষ্ঠ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব)—অন্যের সহযোগে সেক্সপীয়ার এ-নাটক দুটি লেখেন—সহযোগীদের পরিচয় অজ্ঞাত—গ্রীন, পিল এবং মারলোর নাম কেউ কেউ করে থাকেন। দ্বিতীয় পর্বের উৎস হিসাবে অনেক পুরানো একটি নাটক

● হ্যারি ফারনেসের তুলিতে স্যার হেনরি আরভিং।

'The first part of contention between the two famous Houses of York & Lancaster'-এর নাম করে থাকেন। তৃতীয় পর্বটি ১৫৯৫ সালে প্রকাশিত 'The True Tragedy of Richard, Duke of York' থেকে গৃহীত।

৬। রিচার্ড—থার্ড (১৫৯৩)—হলিন্সেডের ক্রনিকলস্ অফ্ ইংলণ্ড (১৫৭৭) এবং টমাস্ মোরের দি হিস্টি অফ্ রিচার্ড দি থার্ড থেকেও নেওয়া। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বহু বিখ্যাত অভিনেতা রিচার্ডের ভূমিকায় নাম কিনেছেন।

৭। এ মিড্সামার নাইট্স্ ড্রিম—(১৫৯৩-৯৪) মনোমুগ্ধকর স্বাভাবিক মাধুর্যপূর্ণ এবং তৃপ্তিকর এই নাটকটি ইংরাজী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলে বিবেচিত।

'The fairy poetry', writes Professor Dowden, 'was a new and exquisite creation in English Literature, and the English Stage had previously possessed no group of humorous figures to compare with that formed by 'Sweet bully Bottom' and his compeers. The scene is classic ground, and the time is that of classical autignity : but the spirit of the play is essentially romantic.'

এ-নাটকের উৎস হোল—চসারের 'নাইট্স টেল'। ওভিডের 'মেটামরফসিস্' এবং 'হুঁয়ো অভ বোর্দোয়া' বলে একটি ফরাসী রোমান্স।

৮। রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট—(১৫৯৬)—সেক্সপীয়ারের প্রথম ট্র্যাজেডি। করুণ রসাত্মক প্রেমের নাটক হিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে এর জুড়ি নেই। এর উৎস একটি ইটালীয়ান উপন্যাস—লেখক ব্যাণ্ডেলো। আর্থার ব্রুক এই উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ করেন ১৫৬২-তে। 'হিস্টি অফ্ ম্যারিওট্টো এবং গিয়ানোজ্জো' (ইটালীয়ন ম্যাসুচ্চিও লিখিত) থেকেও হয়তো কিছুটা অংশ নেওয়া হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

চল্লিশ

পাবলিক থিয়েটারের কারসাজি

আন্দাজ ১৯২৭ সাল। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড জলপাইগুড়িতে পাঁচদিন অভিনয় করার জন্য আহূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দিন "সাজাহান" অভিনয় হওয়ার কথা। "সাজাহানের" ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ: সাজাহান—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, ঔরঙ্গজেব—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দারা—তিনকড়ি চক্রবর্তী, দিলদার—নরেশচন্দ্র মিত্র মহম্মদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাহানারা—কৃষ্ণভামিনী, নাদিরা—নিভাননী, পিয়ারা—নীহারবালা।

সে যুগে উল্লিখিত ভূমিকালিপি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। প্রথম দিন "কর্ণার্জুন" নাটকের অভিনয় হয়। প্রথম দিনের ভূমিকালিপিতে অহীন্দ্রবাবু ছিলেন না। কথা ছিল, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ যেদিন "সাজাহান" অভিনয় হবে, সেইদিন সকালে অহীনবাবু জলপাইগুড়ি পেঁছুবেন। কিন্তু সহসা অহীনবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যেতে পারলেন না। যথাসময়ে অহীনবাবু টেলিগ্রাম করে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে দিলেন আর্ট থিয়েটারের তদানীন্তন কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মশাইকে। প্রবোধবাবু তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত বিজয় মুখোপাধ্যায়কে ডেকে, অহীনবাবুর টেলিগ্রামের কথা জানালেন; কিন্তু প্রবোধবাবুর চোখেমুখে এই দুর্ঘটনার জন্যে কোন উদ্বেগ [illegible] উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা গেল না।

টেলিগ্রামের খবর শুনে, বিজয়বাবু তখন কিন্তু খুব ঘাবড়ে গেছেন। তাই প্রবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—তাহলে এখন কি করা যায়? সাজাহানের পরিবর্তে এখন কি অন্য কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হবে?

—না। এই নাটকই অভিনয় হবে। এখন কাউকে কিছু বলো না। টিকিট বেচে যাও।

টিকিট বিক্রি হতে থাকলো অচিরে House full-ও হয়ে গেল। অহীন বাবু যথাসময়ে না আসায়,

● বিজয় মুখোপাধ্যায়

কথাটা চাপাও থাকলো না। দলের সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রবোধবাবু কিন্তু নির্বিকার। ক্রমশ অভিনয় আরম্ভ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। মাত্র আর একঘণ্টা বাকী। প্রবোধবাবু সাজঘরে ঢুকে, প্রথমেই অনুরোধ করলেন তিনকড়িবাবুকে সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে। তিনকড়িবাবু কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন প্রবোধবাবু ধরে বসলেন রাধিকানন্দবাবুকে।

প্রবোধবাবুর প্রস্তাবে রাধিকানন্দবাবু খুবই বিব্রতবোধ করলেন। বললেন —তা কি কর[illegible]? আমি ঔরঙ্গজেব করবো বলে আপনারা বিজ্ঞাপন [illegible]ছেন।

—বিজ্ঞাপন বজায় থাকবে। তুমি ভাই সাজাহান আর ঔরঙ্গজেব দুটি ভূমিকাতেই অভিনয় করো।

—কিন্তু শেষ দৃশ্যে যে সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের একই সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে।

—তা-হোক। শেষ দৃশ্য অভিনয় হতে এখনো চারঘণ্টা দেরী—ভেবেচিন্তে তখন যা হোক করা যাবে।

থিয়েটারের এই রকম দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রবোধবাবুর যেমন একাধারে অসীম ধৈর্য এবং উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। তেমনি অবিচলিত চিত্তে তিনি বিপদকে কাটিয়ে উঠতেন। থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে প্রবোধবাবু যেমন সুদক্ষ, তেমনি দুঃসাহসিক ব্যক্তি।

প্রবোধবাবুর বিপন্ন অবস্থার কথা উপলব্ধি করে শেষ পর্যন্ত রাধিকানন্দবাবু নিমরাজী হলেন। এবং রাধিকানন্দবাবু জানালেন—অভিনয় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দর্শকদের কাছে পরিষ্কারভাবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানাতে হবে।

রাধিকানন্দবাবুর প্রস্তাবমত প্রবোধবাবু তিনকড়িবাবুকে সঙ্গে নিয়ে অভিনয় আরম্ভের পূর্বে দর্শকদের সামনে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তিনকড়িবাবু সবিনয়ে দর্শকদের জানালেন, আমাদের থিয়েটারের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয় আপনাদের কাছে আমাদের এক দুর্ঘটনার কথা নিবেদন করবেন। প্রবোধবাবু টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন—আজ সকালে অহীন্দ্র বাবুর আসার কথা; কিন্তু তিনি সকালের ট্রেনে না আসায়, আমরা পরবর্তী ট্রেনের জন্যে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তারপর টেলিগ্রামটি দেখিয়ে বললেন—এই কিছুক্ষণ আগে, টেলিগ্রাম পেলাম। অহীন্দ্রবাবু সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমন সময় [illegible]টো এসে পেঁছুলো যে এখন আর নাটকের

পাঠক মন

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' একজন নিয়মিত পাঠক। পাঠক হিসেবে এই পত্রিকার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কিছু ব'লবার দাবী আশা করি আমার আছে।

এ-সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায় যে, পাঠকদের নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করবার জন্য 'পাঠক মন' এই পত্রিকার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। 'শহর কলকাতা'র মাধ্যমে ক'লকাতার জন্মের আদিকালের অনেক অজানা, আনন্দদায়ক ও ইতিহাসখ্যাত খবর নবীনের সামনে তুলে ধরবার একটি সার্থক প্রচেষ্টা। 'আজকের মানুষ' আকর্ষণীয়। 'বঙ্গদর্শন' মারফত আপনি যেভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের খবরাখবর আমাদের সামনে তুলে ধরছেন, সেরূপ 'আন্তর্জাতিকে'র মনোগ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার খবরাখবর জানাতেও আপনাদের পত্রিকার জোড়া নেই। এই পত্রিকা প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখা গল্প ও উপন্যাস প্রকাশের যেরূপ ব্যবস্থা ক'রেছে, সঙ্গে সঙ্গে নবীন লেখকেরও কাঁচা হাতের লেখা প্রকাশ ক'রে তাদের মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতেও কার্পণ্য করে নি।

But every system has its demerits like its merits. সেদিক থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতীকে' একেবারে ত্রুটিশূন্য বলা চলে না। প্রথমত এই পত্রিকার ছাপা ও কাগজের গুণবৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যদিও পূর্বের তুলনায় এটা অনেকটা উন্নত হয়েছে, তবু আশানুরূপ হয় নি। দ্বিতীয়ত এই পত্রিকার 'প্রচ্ছদপট' বিশেষ আকর্ষণীয়, যাহা অন্যে দুর্লভ। কিন্তু প্রচ্ছদের কাগজ একটু মোটা হওয়া দরকার। তৃতীয়ত ছবিগুলিও অস্পষ্ট। অনেক সময় আসল ব্যক্তিকেই চেনা যায় না। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে ঐ ত্রুটিগুলি বিশেষ পরিপন্থী। কাজেই এ-সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছি।

গত ৪৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা 'লাল জল নীল জল' গল্পটি বেশ ভাল লেগেছে।

সবশেষে আমার লেখনীর যবনিকা টানবার পূর্বে আমি একটা কথা জানাচ্ছি যে, এই পত্রিকার ত্রুটি যাই থাকুক না কেন, এটা যা দিচ্ছে তা অতুলনীয়। এই পত্রিকার কল্যাণ কামনা ক'রেই আমি এই পত্র লিখলাম।

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৭নং কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলি-৬

'পাঠক মন' শীর্ষক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ইংরাজীতে যাকে 'innovation' বলে, এটা বাংলা সাময়িক পত্রিকা-জগতে ঠিক তাই।

মাত্র ২৫ পয়সায় যে সম্ভার আপনারা প্রতি সপ্তাহে আমাদের দিচ্ছেন, সে জন্যও ধন্যবাদ।

কয়েকটা কথা বলবার আছে, যেমন—

'শ্রীপদাতিকের' শহর কলকাতা অনবদ্য রচনা। নীরস ইতিহাস যে এমন কাব্যময় এবং সরস হয়ে উঠতে পারে তা তো আগে জানা ছিল না। ভদ্রলোক আমাদের রসপিপাসা যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করেন। এঁকে আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের কাছে হাজির করার জন্যও ধন্যবাদ। নাম জানি না, জানলে তাঁকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাতাম।

শ্রীবিকাশ বসুর গল্প 'একবিন্দু নেপথ্য' ভাল লাগল। 'আন্তর্জাতিক' বেশ উঁচুদরের—মান বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন। অবিলম্বে ছাপাটা ভাল করা একান্ত প্রয়োজন—সময় সময় এটা পাঠক এবং লেখকের মাঝখানে বিন্ধ্যপর্বত হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীমতী কমলা দেবী
গ্রাম: বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ রাজপুর,
জেলা ২৪পরগণা

পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। কাজেই আমরা এক বিকল্প ব্যবস্থা করেছি, অবশ্য আপনারা যদি আমাদের এ-ব্যবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতিদান করেন।

প্রবোধবাবুর কথায় দর্শকেরা একযোগে বলে উঠলেন—বলুন, বলুন—কি বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন।

প্রবোধবাবু বলতে থাকেন—আমরা এই ব্যবস্থা করবো মনস্থ করেছি যে, সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদের সম্মুখে যুগপৎ "সাজাহান" ও ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

একজন দর্শক প্রশ্ন ক'রে বসলেন।—তা না হয় করলেন। কিন্তু শেষ দৃশ্যে যে সাজাহান আর ঔরঙ্গজেবের দেখা আছে সেখানে কি হবে।

প্রবোধবাবু সদম্ভে ঘোষণা করলেন—সেখানে পাবলিক থিয়েটারের কারসাজি আমরা দেখাব।

প্রবোধবাবুর কথায় দর্শকেরা সম্মতি জানালেন। মনে করলেন কিনা কি কারসাজি দেখাই যাক।

যাই হোক, অভিনয় সুরু হোল। রাধিকানন্দবাবু যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করতে লাগলেন। সকলেই উন্মুখ শেষ দৃশ্যের জন্যে। ইতিমধ্যে প্রবোধবাবু তাঁর সহকারী বিজয়বাবুকে ঔরঙ্গজেব সাজিয়েছেন। বিজয়বাবুর উচ্চতা এবং চেহারার সঙ্গে রাধিকানন্দবাবুর সাদৃশ্য ছিল। প্রবোধবাবু বিজয়বাবুকে নির্দেশ দিলেন দর্শকদের দিকে যতটা সম্ভব পিছন ফিরে সংলাপ বলবে। বিজয়বাবু প্রবোধবাবুর নির্দেশমত অভিনয় করলেন। যবনিকা পড়লো। তখন দর্শকদের ভিড় সাজঘরে। বিজয়বাবু ততক্ষণে মেক্-আপ তুলে ফেলেছেন এবং সোজা গিয়ে বসেছেন বুকিং অফিসে। আর রাধিকানন্দবাবু তখন সাজাহানের মেক্-আপ তুলছেন। আর দুর্যোগ কাটিয়ে ততক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, প্রবোধবাবু তৃপ্তির হাসি হাসছিলেন।

রঙ্গজগৎ

নাট্য সম্মেলনে বলিষ্ঠ ঘোষণা

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য করে ঘোষণাপত্র গ্রহণ পশ্চিমবঙ্গের নাট্য আন্দোলনের সংকট মুহূর্তে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও 'নবান্ন' নাটক নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে বাংলার নাট্য আন্দোলন জন্মলাভ করেছিল, কিন্তু গত কয়েক বছর সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-প্রাধান্য নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। নবনাট্যের সাইন-বোর্ডকে সামনে রেখে রহস্যময়তা, দুর্জ্ঞেয়তা ও নৈরাশ্যবাদিতাকে কয়েকজন নাট্যকার ও সম্প্রদায় প্রচার করেছেন। সাধারণ মানুষের পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তির জয়গান গেয়েছেন। অবক্ষয়বাদের শিকার হয়ে সিনেমার পশ্চিমী অনুকরণেরও অনুকরণ করেছেন।

সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্যরূপে ঘোষিত এই সম্মেলন যদি নাট্য আন্দোলনের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে পারে, তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই লক্ষ্য নিয়ে নাট্যকাররা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সমস্যা মনে রেখে স্তরে স্তরে দুর্নীতি ও ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিক। কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধতা থেকে মুক্ত হতে মানুষকে সাহায্য করুক। মানুষের মনে জাগিয়ে তুলুক আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ। নাট্যকাররা হয়ে উঠুক জাতি গঠনের কারিগর। তবেই সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য ঘোষণা সার্থক হয়ে উঠবে।---সুজন।

মন্মথ রায়
(সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনের সভাপতি)

চিত্র আলোচনা

পূজা কে ফুল

মাদ্রাজের এ ভি এম-এর নতুন হিন্দী ছবি 'পূজা কে ফুল' এমন একটি ছবি, যে ছবি সম্পর্কে আলোচনা করার কিছু থাকে না। সাধারণ দর্শক—যারা রূপকথার গল্প শুনতে ভালবাসে তাদের গল্প বলা এরূপ ছবির উদ্দেশ্য। স্বভাবতই রূপকথার মত এই ছবিতেও ভ্রাতৃপ্রেম, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর বলা হয়েছে পাপের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ নেই, যথা ধর্ম তথা জয়। এই শিক্ষা প্রকাশ করার জন্য নানা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, নাচ, গান, কৌতুক, বিরহ, মিলন ইত্যাদিতে রস মিশ্রিত করে দীর্ঘক্ষণ উপভোগ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বড় ভাই নিজের সর্বস্ব দিয়ে ছোট ভাইকে মানুষ করেছিল। শহরে পড়তে এসে ছোট ভাই রাজ বড়লোকের মেয়ে শান্তির প্রেমে পড়েছিল। মেয়ের বাবা হুকুমত সিংও এই প্রেমের সহায়ক ছিলেন। তিনি মহৎ ব্যক্তি। দু-জনার বিয়ের কথা যখন পাকা হয়েছে এমন সময় বড় ভাই মারা গেল। বড় ভাইয়ের কন্যা বিজয় গ্রামে এক লম্পট বালনের প্রতি প্রেমাসক্ত। সেই লম্পট সুযোগ বুঝে একটি সর্তে বিয়ে করতে রাজী হলো---যদি প্রেমিকার কাকা তার অন্ধ বোনকে বিয়ে করে। অগত্যা আদর্শ কাকা শহরের হুকুমত সিং ও শান্তিকে সব কথা বুঝিয়ে বলে সেই অন্ধ মেয়েকেই বিয়ে করলো এবং উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও গ্রামের পঞ্চায়েতে কেরাণীর চাকরী নিয়ে দর্শকদের সামনে আরো আদর্শ স্থাপন করলো। হুকুমত সিং ও শান্তি এই বিবাহে আশীর্বাদ জানালে। সততার অগ্নিপরীক্ষা এখনো শেষ হয় নি। বিজয়কে সুখী করার জন্য তার স্বামী বালনের অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়ে রাজ আদালতে দাঁড়ালো খুনী রূপে। শেষ পর্যন্ত পূর্বতন বাগদত্তা প্রণয়িনী শান্তি তার পক্ষে উকিলরূপে দাঁড়িয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করলো। প্রকৃত অপরাধী কোর্টেই বসেছিল, সুতরাং বালনের অপরাধ স্বীকার করতে দেরী হলো না।

এই কাহিনীর প্রতিটি মানুষ

পরিচালনা। সন্ধানী
কাহিনী। সমরেশ বসু
সংগীত। সলিল চৌধুরী
চিত্রগ্রহণ। রামানন্দ সেনগুপ্ত
শিল্প নির্দেশনা। সুধীর খান
সম্পাদনা। সন্তোষ গাঙ্গুলী
চিত্রনাট্য। বিমল ভৌমিক
পরিবেশনা। ছায়ালোক
অভিনয়াংশে:
সৌমিত্র
সুপ্রিয়া
ডঃ. বিশ্বনাথন্
সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামল ঘোষাল
ছায়া দেবী। শম্পা
অপর্ণা
বনানী চৌধুরী
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজন ভট্টাচার্য
জহর রায়
মনি শ্রীমানী
সন্তোষ দত্ত
সন্ধানী প্রডাকসন্স-এর নিবেদন
অয়নান্ত
১০ই জুলাই থেকে রাধা পূর্ণ আলোছায়া

পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর আদর্শে তৈরি। যদিও এ একটি সামাজিক ছবি।

পরিচালক ভীম সিং ভীমমান কতায় ছবি পরিচালিত করেছেন বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন অশোককুমার, মালা সিনহা, নিম্মি, বাংলার সন্ধ্যা রায়, ধর্মিন্দর, প্রাণ, লীলা চিটনিস, মোহন চটি, নানা পালসিকর, সুলোচনা চ্যাটার্জী। গোপীকৃষ্ণ ও সম্প্রদায়ের একটি উপভোগ্য নৃত্য ছবিতে রয়েছে।

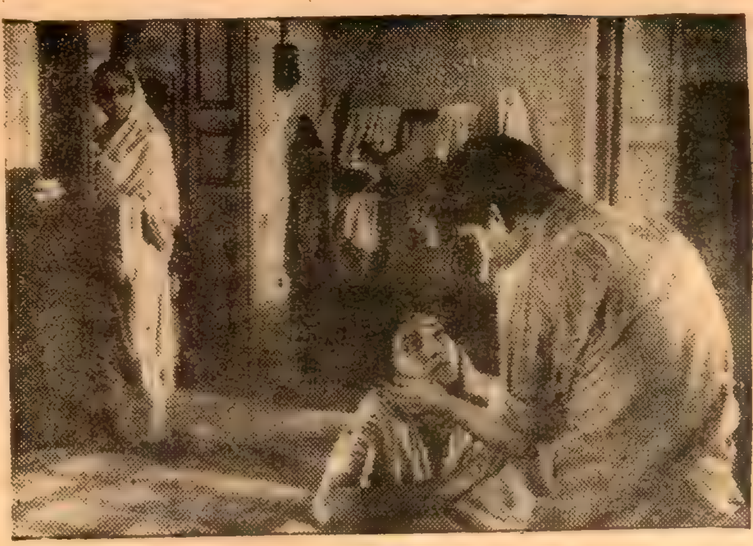

'অয়নান্ত' ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুচন্দ্রা বিশ্বাস ও ছায়া দেবী।

নাটকের কথা

শৌভনিকের ন' ন' না

শৌভনিকের মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে আবার ন' ন' না অভিনীত হচ্ছে। এই প্রহসন নাটকটি পূর্বে অভিনীত হয়ে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। এবারও দর্শকরা নাটকটিকে ভালভাবে যে গ্রহণ করেছেন তা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এবার নাটকটির সংলাপ আরো কিছুটা তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে এবং রূপায়ণ-রীতি ও দলগত অভিনয়ে আরো বেশি নিবিড় হয়ে উঠেছে। রসোত্তীর্ণ নাটকটি তাই সর্বক্ষণ দর্শকদের হাসিতে মাতিয়ে রাখে।

কয়েকজন নতুন শিল্পীকে এবার মঞ্চে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় অভিনয় করছেন। শুভ্রা ঘোষ শৌভনিকের মঞ্চে নবাগতা হলেও চলচ্চিত্র ও মঞ্চে সম্পূর্ণ নবাগতা নয়। প্রতিভাময়ী শিল্পীরূপে স্বীকৃতা। ন' ন' নাতে শুভ্রা ঘোষ সার্থক অভিনয়ে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করছেন। আইনভীতিগ্রস্ত মেজরের ভূমিকায় বীরেশ মুখার্জী এবং তরুণী ব্যারিষ্টাররূপী নিবেদিতা দাস অনবদ্য অভিনয়ে নাটকটিকে সার্থক করেছেন।

নগরীর ছ'টি নাট্যমঞ্চের মধ্যে স্বতন্ত্র ধরণের মঞ্চসজ্জায় ও প্রয়োগ-রীতিতে শৌভনিকের প্রহসনধর্মী ন' ন' না—বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

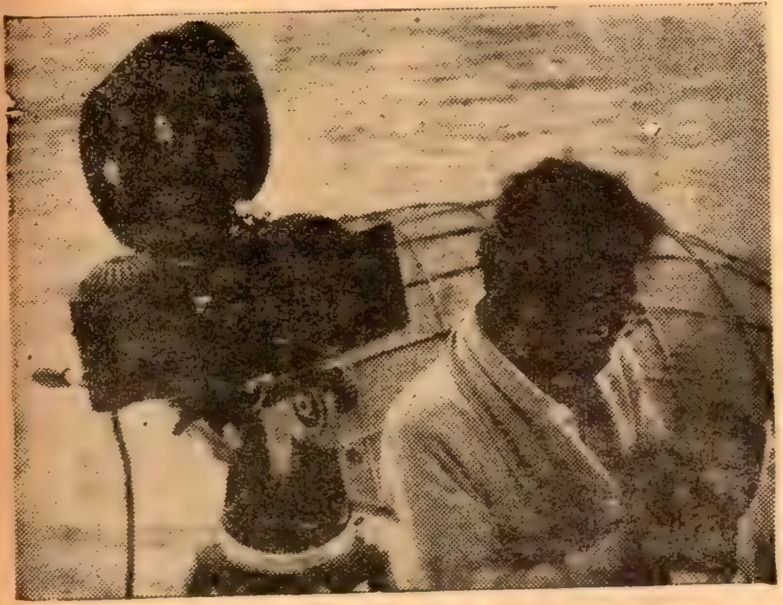

'আলোর পিপাসা' ছবির চিত্রগ্রহণ কালে পরিচালক তরুণ মজুমদার নির্দেশ দিচ্ছেন।

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন

সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য ঘোষণা

গত ২৭শে ও ২৮শে জুন কলেজ স্কোয়ারস্থ স্টুডেন্টস হলে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়।

সম্মেলনে কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল, এবং প্রতিনিধিগণ

দুইদিনব্যাপী বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। কয়েকটি প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা সম্মেলনে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান, বোম্বাই ও দিল্লীর প্রতিনিধিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ-ধরণের সর্বদলীয় সম্মেলনের উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম।

ঘোষণাপত্র

সম্মেলনে বাংলা নাটকের বিকাশের সহায়ক কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং সরকারী বিধিনিষেধ ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়েছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো একটি ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণাপত্র গ্রহণ। বাংলা দেশে এযাবৎ বিভিন্ন নাট্যসংস্থা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ আদর্শ ঘোষণা করেছে। যদিও অধিকাংশ নাট্য-সংস্থা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছি[illegible] কিন্তু এইবার সম্মিলিতভাবে স[illegible]েলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি সং[illegible]ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষিত হলো—সমাজতন্ত্র। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হ[illegible]েছে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য নাট্যকর্মের মাধ্যমে প্রেরণা সঞ্চার করা নাট্যকার ও নাট্য সম্প্রদায়সমূহের কর্তব্য। তার জন্য ঘোষণাপত্রে আহ্বান জানান হয়েছে—'নাট্য রচয়িতাকে যুগ ও জীবন সম্পর্কে কঠোরতম বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে---' 'সমাজতন্ত্র, সাম্য, শান্তি, প্রগতির ধারক-বাহকরূপে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যা কিছু সৌন্দর্য-হন্তারক, অন্যায়, অনাচার ও বিকারগ্রস্ত তার বিরুদ্ধে, জাতির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠন অভিলাষী কর্মের পরিপন্থী যতকিছু প্রতিক্রিয়াশীল ও দমনাত্মক চেষ্টার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ও সংগ্রামী সংকল্পকে আপন সৃষ্টির মাধ্যমে নির্ভীকভাবে উচ্চারণ করতে হবে।'

সর্বসম্মতভাবে এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ সম্মেলনের একটি বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রের আলোচনাটি করা হয়েছে অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে, এবং এমন কয়েকজন প্রতিনিধিকেও দেখা গিয়েছে যাঁরা ঘোষণাপত্র বিষয়ে মোটেই গুরুত্ব দেন নি। এই আলোচনাটি আরো পূর্বে এবং যথেষ্ট সময় নিয়ে করা উচিৎ ছিল।

● হিন্দী ছবি 'পূর্ণিমা'য় অনিতা গুহ

পূর্ববঙ্গের কণ্ঠস্বর

সম্মেলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির আলোচনায় অংশ গ্রহণ এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ দান। পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির কণ্ঠে মাটি ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এক বলিষ্ঠ নাট্য আন্দোলনের সংবাদ শোনা গেছে। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—বাংলা দেশ যদিও রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক-ভাবে আজ বিভক্ত, কিন্তু সংস্কৃতি ও জাতিগতভাবে আজো অবিভক্ত। পূর্ববঙ্গে বাঙালীরা বাঙালীর জাতীয়তা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে। পূর্ববঙ্গে নতুন নাট্যকার অসংখ্য নতুন নাটক রচনা করছে, তা সত্ত্বেও সেখানে পশ্চিম-বঙ্গের নাটক অভিনীত হচ্ছে, এই সংবাদ জানিয়ে প্রতিনিধি অনুরোধ জানান পূর্ববঙ্গের নাট্যকারদের রচিত নাটক অভিনয় করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পূর্ববঙ্গের জীবন ও চিন্তা-ধারার সাথে পরিচিত রাখবার জন্য। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ

● 'প্রভাতের রঙ' ছবিতে বিশ্বজিৎ, শর্মিলা ঠাকুর এবং মঞ্জু দে

প্রতিষ্ঠার জন্য। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের নাট্য-সম্প্রদায়সমূহ এই আবেদনে সাড়া দেবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করে উপায় নেই যে, সম্মেলনে এমন কেউ কেউ ভাষণ দেবার জন্য আহূত হয়ে এসেছিলেন যাঁদের কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের সহায়ক নয়।

প্রকাশ্য অধিবেশন উদ্বোধন করেন শ্রীশম্ভু মিত্র। বক্তৃতাদান করেন ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, জনাব মাহবুল আলম, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য প্রমুখ। অধিবেশনে সর্বশ্রী বিজন ভট্টাচার্য, কালী সরকার ও সতু সেনকে নীরেশ সেনগুপ্ত স্মৃতি-সম্মানী দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সংবাদ বিচিত্রা

নিউ ইয়র্কে মঞ্চশিল্পীদের ধর্মঘট

নিউ ইয়র্কের এক খবরে প্রকাশ, প্রায় ৭ শত মঞ্চাভিনেতা ও অভিনেত্রী বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট সুরু করেছেন। ফলে নিউ ইয়র্কের ১৯টি নাট্যগৃহ ও সঙ্গীতাগার বন্ধ হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্কের মঞ্চশিল্পীদের বর্তমান সাপ্তাহিক সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণ ১১৭ ডলার ৫০ সেণ্ট। তাঁরা আরো ৭৫ ডলার বেতন বৃদ্ধি দাবী করছেন।

ভেনিস উৎসবে 'চারুলতা'

ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ভেনিস উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২৭শে আগষ্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর।

পূর্ববঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্প

২৪ লক্ষ টাকার নতুন পরিকল্পনা

পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৪-৬৫ সালের এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সিনেমা শিল্পের উন্নতির জন্য ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ফিল্ম কর্পোরেশন এই টাকা চলচ্চিত্র উন্নয়নের কাজে লাগাবে।

গত ছ'বছরে কর্পোরেশনের স্টুডিওতে ৩০টি কাহিনীচিত্র, ২০টি প্রামাণিক চিত্র, ৪৯টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং ৯টি সংবাদচিত্র তৈরি হয়েছে।

চলতি বছরে ২৭টি কাহিনীচিত্র, ১০টি প্রামাণিক ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে ফিল্ম কর্পোরেশন ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটি বিরাট স্যুটিং ফ্লোর নির্মাণে ব্যস্ত।

কর্পোরেশন ৫০ জন স্থানীয় টেকনিশিয়ানকে চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছেন, ৪ জন টেকনিশিয়ানকে বিদেশে প্রেরণ করেছেন।

ক্যাপটেনস ডটারের চিত্ররূপ

পরিচালক জহির রায়হান সিনেমাস্কোপে রাশিয়ার বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক পুশকিনের 'ক্যাপটেনস্ ডটার'কে চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন।

স্টুডিও খবর

• উত্তমকুমার ফিল্মসের 'গৃহদাহ' ছবির কাজ এই মাসের মধ্যেই আরম্ভ হচ্ছে। অভিনয় করছেন সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার। ছবিটি পরিচালনা করবেন সুবোধ মিত্র।

• অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরবর্তী ছবির নাম 'জয়-পরাজয়'। ছবিটিতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ।

• একটি নতুন ছবির নাম হবে 'লেডিজ ট্রাম'। গঙ্গাপদ রায়ের পরিচালনায় ছবিটির কাজ আরম্ভ হবে।

• পরিচালক তরুণ মজুমদার 'একটুকু বাসা' নামে একটি নতুন ছবির চিত্রগ্রহণ সুরু করেছে। মনোজ বসু রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়।

খেলাধূলা

রাজনীতি তফাৎ যাও

খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তা বর্তমান সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। দেশে দেশে মিলনের সেতু গড়ে তোলে খেলাধূলা। ভাষা আলাদা হতে পারে, বেশভূষা আলাদা হতে পারে, সরকার আলাদা হতে পারে কিন্তু খেলাধূলার নিয়ম-কানুন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, ভাব সর্বকালে সর্বদেশে অভিন্ন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওরেলের অথবা সোবার্সের ব্যাটের ভাষা, ইংলণ্ডের হাটন অথবা পিটার মের ব্যাটের ছন্দ, অষ্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান অথবা হ্যাসেটের ব্যাটের লীলাময় বাণী সবই এক—সবই অভিন্ন। দেশে দেশে অগণিত লোক এই ভাষা অবলীলাক্রমে বোঝে, অনুপ্রাণিত হয়, হাসে, কাঁদে।

দেশ-বিদেশের টেনিস খেলোয়াড়েরা সমবেত হয় উইম্বলডেনের তীর্থক্ষেত্রে—দেশে দেশে ভেদাভেদ দূর হয়ে যায় যখন খেলোয়াড়রা টেনিস র‍্যাকেট হাতে মাঠে নামে। খেলোয়াড়রাও ভুলে যায় তারা ভিনদেশী আর দর্শকরাও ভুলে যায় তারা বিদেশী। তারা উল্লাসে আত্মহারা হয় এবং বেদনায় ভেঙে পড়ে তাদের প্রিয় খেলোয়াড়ের জয় ও পরাজয়ে—হোক সে অষ্ট্রেলিয়ান, হোক সে আমেরিকান, হোক সে ভারতীয়। অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গনেও সেই একই দৃশ্য; আমেরিকান-রাশিয়ান, ভারতীয়-ইংরাজ, অষ্ট্রেলিয়ান-আফ্রিকান এক হয়ে যায়। তারা ভুলে যায় রাজনীতির চালবাজী, তারা ভুলে যায় পরস্পর-বিরোধী মতবাদের দ্বন্দ্ব, তারা ভুলে যায় অবিশ্বাসের প্রচারবুলি। তারা হাত ধরাধরি করে বিজয়তোরণে দাঁড়ায়—জনতার জয়ধ্বনি মাথা পেতে নেয়। ক্রীড়াজগতের এ এক অপূর্ব অবদান। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি অবারিত করে নীল আকাশের নীচে তারুণ্যের প্রাণচঞ্চল খেলা।

কিন্তু সেই নির্মল আকাশের বুকেও দেখা দিচ্ছে কালো মেঘ। খেলাধূলার নির্মল আনন্দের মাঝে কালো ছায়া এসে পড়েছে রাজনীতির। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার দিশাহারা সাহারার মাঝে খেলাধূলার যে রমণীয় ওয়েসিস ছিল, তাও বুঝি আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। চক্রান্তবাজদের এই নীচ প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই

শ্রীঅমিতাভ

সমূলে বিনাশ না করলে এই বিষবৃক্ষ মানুষের সহজাত আনন্দ-উৎসকে বিষাক্ত করে দেবে।

আমরা জাকার্তার কলঙ্কময় ঘটনার কথা বিস্মৃত হই নি। আর এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ টোকিও অলিম্পিকের প্রাক্কালে এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হতে চলেছিল। এছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে নীচ চক্রান্তবাজদের জন্য ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ বছর উইম্বলডেনের পবিত্র অঙ্গনে রাজনীতির দূষিত স্পর্শ ঘটেছে। শেষ মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার আবু সেগালের সিঙ্গলসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাম প্রত্যাহার করে নিলেন এবং প্রায় এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই আবু সেগালের ডাবলসের হাঙ্গেরীয়ান জুটি তাঁর সঙ্গে খেলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই দুটি ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে রাজনীতির অদৃশ্য হস্ত। তাই মনে হয় ক্রীড়াঙ্গন আজ একটা বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। তবে আশা করা যাচ্ছে, এ দুর্নিবার এ সর্বনাশ প্রতিহত করবার শুভবুদ্ধির অভাব হবে না।

উইম্বলডেনের শেষ পর্বে

জয়ের উল্লাস—পরাজয়ের চাপা দীর্ঘশ্বাস আর অগণিত দর্শকের উৎসাহ, উদ্দীপনা, ও উন্মাদনার ছোঁয়াতে প্রাণবন্ত টেনিস-তীর্থ উইম্বলডেন পেয়েছে সার্থক রূপ। বিগত দিনের মত উইম্বলডেনের কোর্টগুলিতে এবারও হয়েছে অনেক ওলট পালট, সৃষ্টি হয়েছে বহু বিস্ময়ের। বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানীয় বাঘা বাঘা কয়েকজন খেলোয়াড় অখ্যাত এবং অনামীদের কাছে নতিস্বীকার করে ভগ্নহৃদয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। জার্মানীর তরুণ খেলোয়াড় বুঙ্গার্ট, তাঁরই সতীর্থ স্বদেশবাসী কুহনকী এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্টোলে এবারের giant killer. গতবার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রয় এমার্সনকে উইম্বলডেন থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বুঙ্গার্টই। জার্মানীর কুহন্‌কী তিন নম্বর স্পেনের ম্যানুয়েল সান্টানাকে পরাজিত করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন। এবারের চার নম্বর খেলোয়াড় মেক্সিকোর র‍্যাফেল ওস্থনা পরাজিত হয়েছেন বুঙ্গার্টের কাছে। কিন্তু সেমিফাইন্যালে বুঙ্গার্টকে পরাজিত করে এমার্সন সর্বপ্রথম উইম্বলডেন ফাইন্যালে উন্নীত হলেন এবং গতবারের পরাজয়ের যোগ্য প্রতিশোধ নিলেন। গতবার উইম্বলডেন সিঙ্গলস ফাইন্যালে অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলে পরাজিত হয়েছিলেন ম্যাকিনলের কাছে, এবার তিনি সেমিফাইন্যালে সেই ম্যাকিনলেকেই পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার ফাইন্যালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করলেন।

মহিলাদের বিভাগে বাছাই খেলোয়াড়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে। মজার কথা যে, সেমিফাইন্যালে মার্গারেট স্মিথ, মারিয়া বুয়েনো, মফিট এবং টার্নার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এঁরা চারজন এবারকার বাছাই তালিকার পয়লা থেকে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। আশা করি, আগামী বারে উইম্বলডেনের শেষ অধ্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারব।

সামার ক্রিকেট

কলকাতায় সামার ক্রিকেট খেলা সুরু হয়েছিল গতবার। কলকাতার বিভিন্ন স্কুল এই সামার ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে। সকালবেলায় ইডেন উদ্যানে

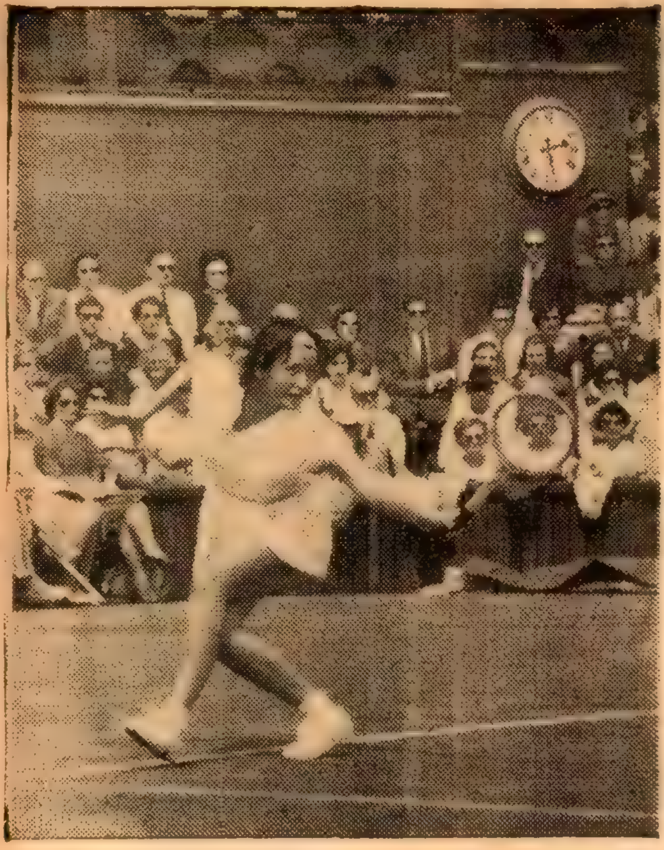

● উইম্বলডেন টেনিস প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার এ্যানা ডিমিত্রিভা আমেরিকার মিসেস কারেণ সুসমানের একটি সট প্রতিহত করছেন।

গুলি অনুষ্ঠিত হত। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য খুব শুভ সন্দেহ নেই, কিন্তু সব ব্যাপারেরই একটা সময়-অসময় আছে। স্কুলের পড়ুয়া ছেলেরা সকালবেলায় ব্যাট-বল নিয়ে মামার ক্রিকেট খেলতে সুরু করলে, সেটা তাদের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক হবে বলে ত আমার মনে হয় না।

গতবার এই প্রতিযোগিতায় টসে বিজয়ী সাব্যস্ত হয়েছিল এথেনিয়াম এবং বিজিত তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশন। এবার তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশন অপরাজিত অবস্থায় বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করেছেন, আর পার্ক ইনষ্টিটিউশন হয়েছে বিজিত। বিজয়ী তীর্থপতি এবং বিজিত পার্ক-স্কুল দলকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি, ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তারা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

ফুটবল লীগ

এই মরশুমের মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের প্রথম চ্যারিটি খেলা অর্থের মাপকাঠিতে সার্থক হলেও মানের দিকে তা আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। এই খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়দের আংশিক প্রাণহীন খেলা, দর্শকদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে নি। প্রধান দলের নামী এবং দামী খেলোয়াড়রা এসে দলের শ্রীবৃদ্ধি করছেন; কিন্তু এবার বোধ হয় ভাল খেলা দেখা আর দর্শকদের ভাগ্যে হবে না।

এবার চ্যারিটি খেলার কথায় আসা যাক। এই খেলায় প্রথম চুণী গোস্বামী মোহনবাগানের পক্ষে এই মরশুমে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। চুণীর দলে আগমনের ফলে মোহনবাগানের আক্রমণভাগের খেলার যথেষ্ট উন্নতি হয়, একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে। ইষ্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগের আক্রমণ-ধারার গতি কেমন যেন ছন্নছাড়া বলে মনে হয়। খেলার মধ্যে মোহনবাগানের প্রাধান্যের ভাগই ছিল বেশি। দু'দলই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করতে পারার ফলে খেলাটির কোন মীমাংসা হয় নি।

লীগের দৌড়ে ইষ্টার্ন রেল মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ছে। তেরোটি খেলায় তারা নয়টি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করে ফেলেছে। অবস্থা এখন বলতে গেলে মোহনবাগানেরই অনুকূলে। কারণ এগারটি খেলায় মোহনবাগান মাত্র পাঁচ পয়েন্ট অপচয় করেছে। ইষ্টবেঙ্গল দল মোহনবাগানের দুই পয়েন্ট পশ্চাতে। তাদের পয়েন্ট অপচয়ের সংখ্যা হল সাত। লীগের প্রথম দিকের খেলা প্রায় শেষ হল। ফিরতি লীগের খেলায় আমাদের জন্য কোন বিস্ময় অপেক্ষা করছে কিনা দেখা যাক।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

a beautiful woman's constant companions

are not her family and friends,
her near and dear ones,
but her box of beauty aids
which help her to look beautiful
anytime, anyplace — always and forever.
ask her and she'll tell you . . .
her constant companions are

AFGHAN SNOW
BEAUTY AIDS

E. S. PATANWALA, BOMBAY-77. (INDIA)

Thursday, 9th July, 1964 | SAPTAHIK BASUMATI | Regd. No. C 71
Price : 25 Paise | GRAM : "BASUMATI" | PHONE : 34-7771, 72, 73

Tiny Tots.. Teen-agers... Grown-ups ..

THE WHOLE FAMILY LOVES ELPHINSTONE FABRICS

Because Elphinstone fabrics are designed to suit every age-group, every taste, every need. Hard-wearing, easy-washing, colour-fast...Elphinstone fabrics come to you in a fascinating array of patterns and shades ... for dainty children's frocks, pretty dresses, gorgeous cholis. And to beautify your home ...there's a brilliant spectrum of Elphinstone furnishing fabrics...in attractive designs and eye catching colours. ***ELPHINSTONE-luxury fabrics at economy prices!***

Also manufacturers of the famous fastest selling CHEETA Leather Cloth

The Elphinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.

9 JUL 19

সাপ্তাহিক বসুমতী

বার্লিনে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে সম্মানিত
'মহানগরে'র মহান স্রষ্টা
শ্রীসত্যজিৎ রায়

র্ষ, ৮ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩২শে আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 16th July, 1964 • Vol. 69, No. 8

ত্বকের মসৃণতা ও
কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৪৫১
আজকের মানুষ	...	৪৫২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৪৫৩
ভারতদর্শন	...	৪৫৭
আন্তর্জাতিক	...	৪৬৩
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৪৬৯
রৌদ্রছায়ায় (গল্প)	চিত্রা সেনগুপ্ত	৪৭১
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৪৭৭
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৪৮১

756.3
·003/3
V.69
no.8

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেক্সে ম্যা মরেক্সে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮৩
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৪৮৭
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৪৯১
সুন্দর (কবিতা)	শ্যাম রায়	৪৯৫
বঙ্গদর্পণ	...	৪৯৬
দুরন্ত দেহলী (কাহিনী-বিচিত্রা)	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৫০১
রঙ্গজগৎ	...	৫০৩
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	৫০৭
পাঠক মন	...	৫১০
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৫১১

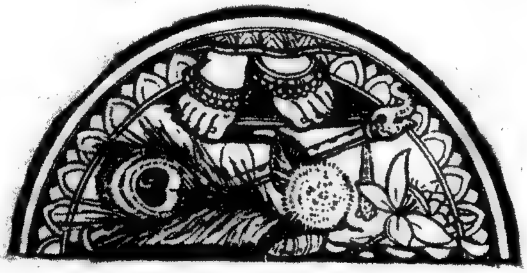

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ।

"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্ব্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সমাজের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৸০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬১ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৩২শে আষাঢ় ১৩৭১ | Thursday, 16th July 1964

"মুনাফাকারীর শেষ নতুবা আমার শেষ"

অতি মুনাফাকারী ও মজুতদারদের শায়েস্তা করার জন্য এবার কেন্দ্রীয় সরকারের সত্যি সত্যি যেন টনক নড়েছে। আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম সোজা কথার সহজ মানুষ; এবার তিনি এমন পণ করেছেন—যা শুনলে মনে হয়, মুনাফাবাজীর শেষ, নয়তো তাঁরই শেষ। বাঙ্গালোরে খাদ্য-ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে তিনি তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়ে বলেছেন যে, এক পক্ষকালের মধ্যে চালের দর বেঁধে দেওয়া হবে, এবং ঐ বাঁধা দরে খাদ্য-ব্যবসায়ীরা যদি খাদ্যশস্য বিক্রি না করেন, তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা ও অন্যান্য আইন প্রয়োগ করতে পশ্চাদপদ হবেন না। খাদ্যমন্ত্রী ঐ সম্মেলনে নিজেদের আচরণ সংশোধন ও আগামী তিনমাস অপেক্ষাকৃত ভালভাবে চলার জন্য ব্যবসায়ীদের ওপর মৌখিক হুকুম জারি করেছেন। মুনাফাবাজী দূরীকরণের সদিচ্ছাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত জানিয়েছেন:

"Either profiteering breaks or I break." অর্থাৎ "হয় মুনাফাবাজীর শেষ, নয়তো, আমিই শেষ।"

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের ঘোষণা শুনে উত্যক্ত জনসাধারণ নিশ্চয়ই কিছুটা আশ্বস্ত হবেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন—সত্যি সত্যিই কি তিনি মুনাফাবাজদের শায়েস্তা করতে পারবেন? দিনের পর দিন নিত্যব্যবহার্য যাবতীয় দ্রব্যের দর বৃদ্ধি করে তারা দেশব্যাপী অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের আগেও আমরা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পূর্বেকার খাদ্যমন্ত্রীদের মুখে অক্ষম অব্যবস্থার মধ্যে কড়া কড়া কথা শুনেছি। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে যে সব চোরাকারবারী ছিনিমিনি খেলে, তারা খাদ্যমন্ত্রীদের কথায় কখনোই কর্ণপাত করে নি। বরং তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গিয়ে ঐসব মন্ত্রিরাই শেষ পর্যন্ত খাদ্যদপ্তর থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। কেন না, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা অভ্রংলিহ মুনাফার প্রাসাদ গড়ে সেখান থেকে অট্টহাসি হেসে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে চায়।

এই কারণে মনে হয়, শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের নিজেরই বিপদ হয়তো আসন্ন। তাই একথা বলা প্রয়োজন, মুনাফাকারী ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্য একমাত্র তাঁরই প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখেও বলা দরকার যে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি মন্ত্রী এই ব্যাপারে যেমন এগিয়ে আসবেন, তেমনি রাজ্য সরকারগুলিও এই মুহূর্তে একই উদ্দেশ্য এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সম্মিলিতভাবে তাঁরা বলবেন: "Either profiteering breaks or we break." নচেৎ অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকবে। শুধু এক-একজন খাদ্যমন্ত্রী আসবেন আর বিদায় নেবেন। এবং কঙ্কালসার জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে শ্মশানযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে।।

সম্পাদকীয়

আজকের — মানুষ

"Contradiction is motion"—এই নাকি সৃষ্টি বা প্রগতির মূল রহস্য। এমনি আপাতবিরোধ নিয়েই পৃথিবী এগিয়ে চলেছে —গতিটাই প্রধান। তাই 'জড়' পৃথিবীর আর এক নাম 'জগৎ'। কিন্তু আকস্মিক পরিবেশ বা দারুণ চমক সৃষ্টির উৎকৃষ্ট অবকাশ বোধহয় একমাত্র রাজনীতিতেই আছে। অন্তত কঙ্গোর নতুন ভাগ্যবিধাতা হিসেবে ময়সে শোম্বের আত্মবিকাশ এ কথাই প্রমাণ করেছে।

এতদিন শোম্বেকে চিনেছি অন্যরূপে: বেলজিয়ান শাসকগোষ্ঠীর হাতের ক্রীড়নক কিংবা কঙ্গোর জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডের ধূর্ত আততায়ী—এমনি নানান ব্যক্তিত্বের ভীষণ কঠিন আবরণে শোম্বে বার বার ত্রাসের সঞ্চার করেছেন বিশ্ববাসীর মনে। স্বতন্ত্র-স্বাধীন কাতাঙ্গার দাবী নিয়ে কাতাঙ্গার অবিসংবাদিত কর্ণধার শোম্বে সেদিন দুর্ধর্ষ, দুর্বার। তখন দুরন্ত ঝড়ের দিনে সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে কঙ্গো—'৬০ সালের জুনে। তখনও দুর্যোগ কাটে নি। শোম্বে কঙ্গোর নিরবচ্ছিন্নতায় কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হ'লেন Union Miniere-র প্ররোচনায়। ঔপনিবেশিকতাবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে, শ্বেতাঙ্গ স্বার্থান্বেষীদের সমর্থনে শোম্বে নিজের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও কুণ্ঠিত হ'ন নি। একদিন তাঁর এই ভয়ংকর স্বভাবের কথা ভেবেই আমেরিকানরাও সমর্থন জানানো থেকে বিরত হলেন। Welensky আর Union Miniere-এর সকলে আর্থিক বা আনুষঙ্গিক সাহায্যও বন্ধ করলেন। স্বীয় প্রদেশের চূড়ান্ত ক্ষমতার আসন শোম্বের পক্ষে আর নিরাপদ নয়। আমেরিকানরা বললেন—তাদের যথার্থ ক্রীড়নক হ'বার পক্ষেও তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন। অগত্যা নিজের প্রাণ আর মানটুকু (?) নিয়ে শোম্বে আত্মগোপন করলেন গতবছর।

ক্রিয়াকাণ্ডের দিক থেকে ত' নিশ্চয়ই, বয়সের হিসেবেও শোম্বে এখনও প্রায় তরুণ। বয়স ছেচল্লিশ। চেহারা মোটেই নজরে পড়বার মত নয়। উচ্চতা সাধারণ, তবে মজবুত গড়ন। নানা চমকপ্রদ ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হ'য়ে নিজেকে তিনি ভাবেন 'বীরেন্দ্র'। আত্মম্ভরিতায় ভরপুর, বুলি-বক্তৃতায় শোম্বের বড় আত্মপ্রসাদ। নিজেকে পরিচয় দেন 'মোয়াতিমাভু' রাজবংশের উত্তরপুরুষ বলে। লুণ্ডাদের একচ্ছত্র প্রধান শোম্বের জীবনের প্রতি অধ্যায়েই এমন অনেক খবর আছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের হ'ল—তিনি নাকি ছেলেবেলায় কোনও এক Methodish mission স্কুলে পড়েছিলেন Junior Secondary মান পর্যন্ত। এরপর বাবার সাথে ব্যবসাতে নেমেছিলেন—(আজ থেকে ১৪ বছর আগে)। কিন্তু পোষাল না। যোগ দিলেন রাজনীতিতে।

তদানীন্তন বেলজিয়ান শাসকগোষ্ঠী তাঁকে কাজে লাগালেন নিজেদের স্বার্থ সাধনে। তাদের সাহচর্যে, পরামর্শে শোম্বে গড়ে তুললেন কুখ্যাত কনাকট পার্টি। এদিকে স্বদেশ-মাতৃকার পূজারী লুমুম্বা তাঁর দেশভক্ত দল নিয়ে সুরু করেছেন স্বাধীনতা বিপ্লব। অবশেষে বেলজিয়ানরা যখন কঙ্গোর স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হলো—শোম্বে দিশাহারা হ'লেন। দাবী করলেন 'স্বাধীন স্বতন্ত্র' কাতাঙ্গা। Union Miniere-র স্বার্থরক্ষায় তিনি কঙ্গোকে বঞ্চিত রাখতে চাইলেন তাঁর প্রদেশের অতুল খনিজ সম্পদ থেকে। বেলজিয়ানদের সহযোগিতায় এই সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব বজায়

ময়সে শোম্বে

রাখতে মরীয়া হ'য়ে উঠলেন। জনশ্রুতি আছে—দেশের প্রচুর অর্থসম্পদও তিনি পাচার করেছেন দেশের বাইরে,—শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতার আসন অটুট রাখতে। এই রহস্যময় শোম্বেই আজ কঙ্গোর রাষ্ট্রবিধাতা। রাজনীতির চলচ্চিত্রে এ যেন ভানুমতীর খেল। শোম্বের নাকি স্বভাব শোধন হ'য়েছে। মেজাজ, মতিগতি বদলেছে অনেক। সমস্যা-সঙ্কুল কঙ্গোর অনিশ্চিত অদৃষ্টের শুভাশুভ আজ রুদ্ধশ্বাসে মুখ চেয়ে আছে তাঁর। আর তাই রাজনীতির রূপোলী পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না কেউ—আবার কি 'বিস্ময়' আসে—অথবা কি 'বিপর্যয়'।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

সেই ২৪এ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬এর আত্মকথায় বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন আমাদের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অনন্ত নাক্ষত্রিক জগতের কথা,—মৎস্যযুগ, অঙ্গারযুগ, সরীসৃপ-যুগের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের বৃত্তান্ত। বলেছিলেন—

'ধূমকেতু নীহারকণা নীহারিকা সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আলোক-বর্ষ পরের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুন অজানা প্রাণীজগৎ, বিশাল প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন,হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, এলুমিনিয়াম—প্রচণ্ড জাগতিক তেজ এক্স-রে, বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জলন্তপুচ্ছ, জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতুপিণ্ড, গ্রহতরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত, রহস্য-ভরা ইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটি প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলা-উৎসব। মৎস্য-যুগ, অঙ্গারযুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা, কত কূলহীন, দিক্‌হীন, গর্জমান মহাসমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে!'

কিন্তু আত্মাকে প্রসারিত হতে দেওয়া কি সহজ কাজ? চারদিকের পরিবেশের প্রভাব কি অস্বীকার করা যায়? মানুষ অবস্থার বশীভূত। পুরো-পুরি না হলেও অনেকটাই।

চোদ্দ বছর বয়সে, ২রা জুন, ১৭৬৪, মহাকবি গ্যেটে ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর এক কিশোর-বালক-সংঘের সদস্য হবার জন্যে এই বলে আত্মপরিচয় দেন যে, নিজেকে তিনি বহুরূপী ক্যামেলিয়ন বলে মনে করেন। বিভূতি-ভূষণের অনন্ত নাক্ষত্রিক জগতের কথা ভাবতে গিয়ে গ্যেটের সেই আত্মকথা মনে এলো।

গ্যেটে লিখেছিলেন—অ্যালেক্সিসকে জিগেস করলেই আমার মনের খবর পাবেন আপনারা। তার অভিজ্ঞতা থেকেই অ্যালেক্সিস সব বলতে পারবে, তাছাড়া আমি নিজেও তাকে খুব জোর করে বলে দিয়েছি যে সে যেন আমার ভালো-মন্দ সব কথাই আপনাদের জানিয়ে দেয়। তবে, অ্যালেক্সিস চালাক লোক,—আমার মধ্যে যেসব লক্ষণ আপনাদের পছন্দসই হবে না, সে-সব সে হয়তো নাও দেখতে পারে,—তার পক্ষে সে-সব না দেখ্‌তে পাওয়াও সম্ভব। তাই, আমি চাই যে, আপনারা নিজেরাই আমাকে দেখে নিন, বুঝে নিন। আমি যেন বহুরূপী ক্যামেলিয়ন। অ্যালেক্সিস যদি আমার সব দিক না দেখে থাকে, তাহলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়?

এই 'বহুরূপী'র সাদৃশ্য তাঁর মনে বেজেছিল অনেকদিন। তাঁর জীবনকথা আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকরা অনেকেই সে-কথা বলে গেছেন। ১৭৬৮তে লেখা তাঁর 'Die Freuden' কবিতায় এই বহুরূপী-রূপকই পুনর্বার দেখা দেয়। ১৭৭১এর শেষ দিকে লেখা Gotz von Berlichingen-এর প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় অঙ্কে খল-চরিত্র Weislingen-কে নায়িকা Adelheid গালাগালি দিয়েছেন 'বহুরূপী-ক্যামেলিয়ন' বলে।

গ্যেটের জীবনী-লেখকদের আদিতমদের মধ্যে গণ্য জর্জ হেনরি লিউয়িস এই বহুরূপীর সঙ্গে গ্যেটের মনের মিল দেখিয়েছিলেন। বার্কার ফেয়ারলির আরো সাম্প্রতিক লেখাতেও সে-কথা পুনরালোচিত হয়েছে।

কীট্‌স তাঁর প্রসিদ্ধ 'বহুরূপী-কবি' বা 'ক্যামেলিয়ন-কবি'-সম্পর্কিত চিঠিতে কবিমনের সৃজনী-ক্ষমতা আর পরিবেষ্টনীর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। ফেয়ারলি এই সূত্রে তাঁর সেই চিঠির উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে গ্যেটে কীট্‌সের মতন পরিবেশের কথা ভাবেন নি বা তা ভেবে ও-কথা লেখেন নি। গ্যেটে শুধু নিজের অন্তরের স্বভাব জানিয়ে গেছেন। তিনি ঐ 'ক্যামেলিয়ন' কথাটার মধ্য দিয়ে তাঁর নৈতিক আত্ম-পরিচয় দিয়ে গেছেন; কীট্‌স্ কিন্তু সৌন্দর্যের কথাসূত্রেই ও-রূপক প্রয়োগ করেছেন।

উইল্যাণ্ডের সঙ্গে ১৭৭৫এ উইমারে গ্যেটের দেখা হয়। তার অল্প আগেই উইল্যাণ্ডকে ব্যঙ্গ করেছিলেন গ্যেটে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সেই পর্বেরই এক চিঠিতে উইল্যাণ্ড লেখেন যে, গ্যেটে দ্রুত পরম্পরায় রোদ, বৃষ্টি দুইই দিচ্ছেন। উইল্যাণ্ডের বয়স ছিল গ্যেটের চেয়ে ষোলো বছর বেশি। সেই ষোলো বছরের প্রবীণতর মানুষটি তাঁর নিজের চিঠিপত্রে এবং কবিতায় মহাকবি গ্যেটের সম্বন্ধে বহুরূপী-স্বভাবের ধারণাই প্রকাশ করে গেছেন।

সাধারণ মানুষ মোটামুটি সবদিকের সঙ্গতি বজায় রেখে বাঁচতে জানে। বিভূতিভূষণ যে অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন থেকে আমাদের বাঁচতে

বলে গেছেন,—তাঁবার গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বিশাল মানব-সংসারের সত্যিকার শোভাযাত্রা আস্বাদনের যাথার্থ। দেখিয়ে গেছেন,—সেইসব কথা থেকেই গোটের এই বহুরূপী-মনের স্মৃতি মনে এলো।

মনের মেজাজের ওপরেই দৈন্যবোধ, নক্ষত্রবোধ সবই নির্ভর করে। বিভূতিভূষণের মেজাজের মধ্যে এই স্থায়িভাবটি ছিল যে,মানুষের কল্পনা আর অনুভব-বৃত্তির ওপর নির্ভর রাখতে তিনি নিত্য উৎসাহী ছিলেন। বলেছিলেন—'দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের বুদ্বুদলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার করেন।'

গোটের মতন বহুরূপী মেজাজের মানুষ ছিলেন না বিভূতিভূষণ। কিন্তু মানব-জীবনের রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলে তাঁরা দু'জনেই পরস্পরের সন্নিহিত। বিভূতিভূষণ বলে গেছেন—

> 'গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল কলকোলাহল যেখানে বেশি,—মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য।'

অতএব, মধুসূদনের মতন রামায়ণ-মহাভারতের দিকে চোখ রাখতেও আপত্তি নেই, বিভূতিভূষণের মতন নিশ্চিন্দিপুরের নিখুঁৎ রূপায়ণেও আপত্তি নেই। শুধু, বোধের দরজা জানলা খুলে রাখতে পারাটাই আসল কথা।

কোনো ব্যক্তি-জীবনের ভবিষ্যৎ, বা তার পরিণতির নিখুঁৎ ছবি আমাদের একজনেরও পকেটে নেই। ভবিষ্যৎ চিরকালের অন্ধকার। বিভূতিভূষণ কেবল সেই কথাটাই পুরোপুরি মানতে পারেন নি। ব্যক্তিমনের ছেদ মানেন নি তিনি। তাই পরলোকের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়েছিলেন। ইমার্সনের 'Imm rtality' প্রবন্ধটি তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছিল।

তাঁর এই পরিণতির চিন্তা, আর গোটের এই বহুরূপী-ভাবনা আজ একসঙ্গে মনে এলো।

সেদিন একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন—পরিণতি না দেখতে পাওয়াটাই রোগ। বললেন—ঐ রোগেই ভুগছি আমি। আমার মন এক-একটা দৃশ্যেই মশগুল। দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের যোগ মনে রেখে পুরো পরিকল্পনা ফুটিয়ে তোলা আমার সাধ্য নয়। অর্থাৎ আমি ঔপন্যাসিক নই। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদ্ভাবনায় কুশলী নই।

বললেন—আমি কবি। মহাকবি নই। আমার মনে হয় আজকের এই দক্ষিণে বাতাসে উতলা এই সন্ধ্যার ভালো লাগাটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রাপ্তি।

আমি স্থির হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলুম। তিনি বলতে লাগলেন—আমার যখন ভালো লাগে, তখন আমি একরকম সম্পূর্ণতার স্বাদ পাই। সেই স্বাদে ডুবে থাকতে পারাই আমার একমাত্র কামনা। আমি ততোধিক কোনো চর্চায় মন দিই নি। আমি খবর-কাগজের দরকারী খবর বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদকীয় বা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন কেটে রাখবার সঞ্চয়ী বুদ্ধিতে মন পাকাই নি। এক-এক সময়ে সত্যিই সন্দেহ হয়, আমি ঠিক পরিণত নই।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে, বাইরে ঝিরু-ঝিরু বিষ্টির ফোঁটাগুলির কাটাকুটি দেখতে দেখতে আমার সেই বন্ধুটি বলতে লাগলেন—আমি যেন উদাসীন। হয়তো ভেতরে ভেতরে উদাসীন হয়ে যাওয়াটাই আমাদের বয়স বাড়বার লক্ষণ। আমার বয়স বাড়ছে যে, সেই কঠোর সত্য আমার মন অধিকার করে আছে। তাই খুঁটিনাটি অন্যান্য খবর আমার আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে না।

ভবসিন্ধু রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল, আজ তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। তবু মনে পড়লো না। এমনি অনেক কথাই ভুলে গেছি। অথচ, ঘটনাগুলো যখন ঘটে, ঠিক সেইসব মুহূর্তে তারা কতোই না উজ্জ্বল মনে হয়।

সেদিন ট্রেনে আসতে আসতে ভবসিন্ধু রায় বললে—'তুমি আমায় চিনতে পারছো না?'

আমি বললুম 'না।'

সে বললে, 'তোমার যখন চোদ্দ-পনেরো কি বড় জোর ষোল বছর বয়স, তখন একদিন আমার বৌদির কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে?' আমি স্পষ্ট করে তার বৌদির কথা মনে করতে পারি নি বটে, কিন্তু তাকে ভুলি নি। বললুম, 'মনে আছে, তবে ঠিক মনে পড়ছে না।'

সে একটু আহত হল। ভেবেছিল, বৌদির নাম শুনলেই সেসব দৃশ্য পুরোপুরি আমার মনে পড়বে। কিন্তু সে কি আজকের কথা? আমার যখন ষোল বছর বয়স, তখন চট্টগ্রামের গুলি-গোলার ব্যাপার শেষ হয়েছে,—কংগ্রেসের হৈ চৈ চলছেই,—আর, কলকাতার ছাত্রজীবনে তখন কতোরকম স্বপ্নের সময়। আমাদের বাড়িতে বোধ হয়, দেশ সম্বন্ধে গুরুজনদের তেমন ধারাবাহিক দৃষ্টি ছিল না, বোধ ছিল না। তাঁরা আমাকে একদিনও আমাদের চারদিকের পরিমণ্ডলের সেকালের চিরস্মরণীয় সেই দেশপ্রেমের কথা

লেন নি। আমার কাকা ছিলেন 'রায়বাহাদুর'। বাড়িতে তাঁরই প্রশংসা শুনতুম। আমি ষোল বছর বয়সে প্রথম বাড়ির বাইরে এসে বাঁচলুম।

ভবসিন্ধু বললে, 'তোমার এক ক্লাস ওপরে পড়তুম আমি, মনে আছে কি?'

আমার তা মনে ছিল। ভবসিন্ধু বিদ্যাসাগর কলজে পড়তো। আমি স্কটিশ-চার্চে। আমরা তখন মাঝে মাঝে রিপন কলেজে যাই। সেখানে রবি রায় মশাই ছিলেন, কবি বিষ্ণু দে ছিলেন, বুদ্ধদেব বসু ছিলেন, প্রমথনাথ বিশী ছিলেন, অজিত দত্তও ছিলেন।

আমার সঙ্গে কোনো মাস্টার-মশায়ের তেমন নৈকট্য ঘটে নি। এমন কি, আমি আমার নিজের মাস্টার-মশাইদের অনেকের নামও মনে রাখতে পারি নি। সেটা আমারই দোষ। হয়তো কতকটা আমাদের বাড়িরও। কীভাবে অপরিচিত মানুষের কাছে যেতে হয়, কীভাবেই বা চেনা-শোনা সহজ করে নিতে হয়, সে-শিক্ষা আমার বাড়ি থেকে আমাকে দেওয়া হয় নি। কিংবা হয়তো সেরকম শিক্ষা কোনো বাড়িতেই কোনো বালককেই দেওয়া হয় না। ওসব নিজেকেই পেতে হয়। আমার নিজেরই সে-শিক্ষা পাওয়া হয়ে ওঠে নি। আমি লাজুক ছিলুম। লাজুক ছেলেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে, এটা আমার বিশ্বাস। বেশি আত্মসচেতনতা ভালো নয়। তাতে জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধা হয়।

তখন বিষ্টিতে দমক বেড়েছে। আমি মন দিয়ে তাঁর আত্মকথা শুনছিলুম। তিনি বলছিলেন—ভবসিন্ধুর বৌদিকে আমি যেটুকু মনে করতে পারি, সে কেবল এই যে, তাঁকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। খুব ভালো লাগার প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন রমণী, আর, আমি তখন কৈশোর-সীমান্ত ছেড়ে যৌবনের অভিমুখী। তা সত্ত্বেও তাঁকে আমার

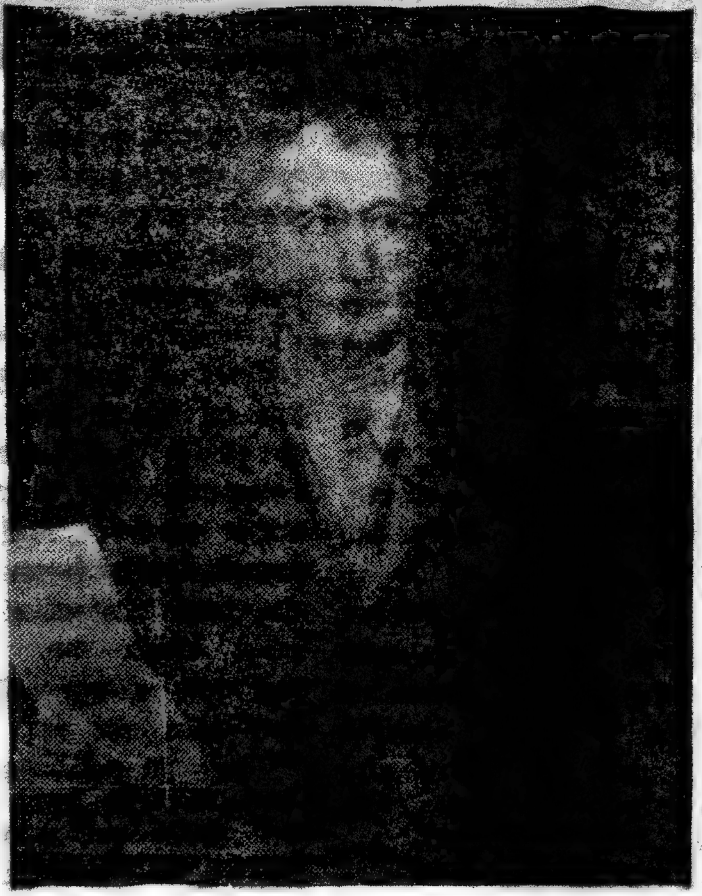

● গ্যেটে

খুব সুন্দরী মনে হয় নি। কিন্তু বেশ স্নেহময়ী তিনি। আমাদের দুজনকে, —ভবসিন্ধুকে, আর আমাকে অনেক মিষ্টি খাইয়েছিলেন বৌদি। মিষ্টি খেতে আমার ভালো লাগতো। এখন আর ভালো লাগে না। সাহিত্যিক হতেও আমার আগে খুব ভালো লাগতো। এখন আর ভালো লাগে না। এখন মনে হয়, বেশির ভাগ সাহিত্যিকই যা ভাবি, তা নন। ষোল বছর বয়সে, সেই ভবসিন্ধুর বৌদি আমাকে যখন মিষ্টি খাওয়াতে খাওয়াতে 'লাজুক ছেলে' বলে অনুযোগ করেছিলেন, সেই সময়েই আমি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' প্রথম পড়ি। ক্ষণিকার সেই লাইনগুলি আমি তখন থেকে আজ পর্যন্ত গুন্‌গুন্ করি—'সুখের হাসি থাকে মুখে, দেহের পুষ্টি পোষে দেহ, প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে, জানে না সেই খবর কেহ।'

এই গভীর কথাটি সেদিন তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেয়ে, আমি গ্যেটের ক্যামেলিয়ন-প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চেয়েছিলুম। তাঁর গল্পে বাধা পড়েছিল। তাঁকে আমি ঠিক এই সময়ে গ্যেটের বহুরূপী-ভাবনার কথা জানিয়েছিলুম। তিনি সেদিকে মন দেন নি।

তিনি তাঁর গল্পে মনোযোগী থেকেই বললেন—ভবসিন্ধুর কোনো দুঃখ ছিল কী ছিল না, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি। সেদিন তার কোনো দুঃখ ছিল না বলেই মনে হয়েছিল। দুঃখ আর নেই, সে কারও মনেই কোনো গভীর কল্পনার

কারণ হতে পারে না। তবে এই কথা আমার মনে ছিল না। কারণ মনে হোলো সবারও দুঃখ আছে। সে দুঃখ জৈব। অর্থাৎ জীব মাত্রেরই যা থাকে স্বাভাবত। 'জৈব' বিশেষণটা হয়তো তাড়াতাড়ি মনে এলো। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝতে গেলে কথাটা সমর্থনযোগ্য হবে কি না, ভেবে দেখি নি। জীবের দুঃখ যে জৈব দুঃখ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খড়্গপুরে নেমে যাবার সময়, ভবসিন্ধু বললে, 'আমার ইস্টিশান এসে গেল, আবার কোনোদিন দেখা হয়ে যাবে হয়তো, যদি বেঁচে থাকি।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় দেখা হবে, কলকাতায় এলে একবার এসো কোনো সময়ে, আমি সকালের দিকে বাড়িতেই থাকি। আমার ঠিকানা লিখে দিলুম তার পকেট-ডায়েরিতে। সে নেমে যাবার সময়ে তাকে বললুম, 'ভাই একবার সিগারেট-ভেণ্ডারকে ডেকে দিও যদি দেখা হয়।'

সে বললে, 'দেবো।'

তারপর খড়্গপুর থেকে কখন ট্রেন ছেড়েছিল, তা ঠিক মনে নেই। রাত দুটোয় বালেশ্বরে ঘুম ভেঙেছিল। অন্ধকারে স্টেশনের নাম পড়তে পারিনি। নাম না দেখেও চিনেছিলুম ঠিকই। প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেল দেখে আবার শুয়ে পড়েছিলুম। ঘুম এসেছিল। ঘুমের মধ্যেই অনেকগুলো ইস্টিশান পেরিয়েছে। তারপর ভোর পাঁচটায় ট্রেন যেখানে থামলো, সে-ইস্টিশানের নাম গড়মধুপুর। তার ডাইনে পাহাড়। পাহাড়ের কোল পর্যন্ত প্রধানত পলাশের জঙ্গল।

তারপর এসেছে হরিদাসপুর। হরিদাসপুরে ভোর হবার দৃশ্য আমার জীবনে আমি অনেকবার দেখলুম। ট্রেন স্টেশনে থামে নি। স্টেশন ছেড়ে খানিকটা এগুতেই দেখা গেল সবুজে আবৃত উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। কয়েকটি শিখরে মেঘ জমেছে। নিচে লাল মাটির রাস্তা, দূরে সাদা সাদা বাড়ির সারি। কপিলাশ রোড কেবিনের কাছেই রেল-কোম্পানির আর-একটা বাড়ি। তাতে চুয়াল্লিশ সংখ্যাটা লেখা। [illegible] ক'টা তাঁবু। তাঁবুর কাছেই রেল-লাইনের কর্মীরা প্রাতরাশের কাজ সেরে নিচ্ছে। পেতলের থালায় ঠাণ্ডা ভাত খাচ্ছে পুরুষেরা। তিনটি মাত্র পুরুষ। দুটি মেয়ে তাদের পাশে বসে পরিপাটি করে চুল বাঁধছে।

আরো এগিয়ে এসে দেখা গেল বিস্তীর্ণ কেয়াবন।

নির্গুণ্ডির কাছে এসে পড়লুম। ডানদিকের সেই লাইনটা দেখলুম যেটা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। সেখানে ট্রেন থামে নি। তারপর পাহাড় দূরে মিলিয়ে গেছে। রাস্তা চলেছে রেল-লাইনের পাশাপাশি। তিনটি লোক চলেছে তিনটি সাইকেলের সওয়ার হয়ে। রাস্তা কোথায় বেঁকে হারিয়ে গেছে। তারপর খানিকটা জলা জায়গা। সবুজ ঘাস। গাঢ় সবুজ কলমী শাক। জলায় গাংচিল আর বক।

তারপর কী একটা নদী। বৈতরণী বোধ হয়। ঠাণ্ডা জলের হাওয়ার ঝলক লাগলো মুখে, চোখে, সমস্ত চৈতন্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নদীর কিনারা বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে বাঁধানো।

এসে গেল কেন্দ্রাপাড়া। সেখানে বড় বড় আমগাছ। গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির।

তিনি এই পর্যন্ত বলে জানলা দিয়ে বাইরের অবস্থাটা দেখে নিলেন।

সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছিল। বৃষ্টির বেগ তখন কমে এসেছে। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। বর্ষা পুরোদমে কাজ আরম্ভ করেছে।

ভদ্রলোক ছাতা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন।

বললেন,—চলি এইবার, ভবসিন্ধুর কথা আর একদিন বলবো।

আমি বললুম—বিভূতিভূষণের কথাও বাকি রইলো। সেদিন প্ল্যাকেটে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, কিন্তু আমার মা এলেন না কিছুতেই। ভেবেছিলুম আপনাকে সে-সব কথা জিগেস করবো। আপনি এরই মধ্যে চললেন।

তিনি স্মিতহাস্যে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামলেন।

যেতে যেতে বললেন—জীবনের সব গল্পই এই রকম—মধ্যপথে সমাপ্ত—অর্থাৎ চির-অসমাপ্ত।

আমি আবার নিজের টেবি
ফিরে বিভূতিভূষণের 'স্মৃতির রে
বইখানা নিয়ে বসলুম। ৩১এ জানুয়া
১৯২৮ তারিখে বিভূতিবাবু লিখে গেছে

'আজ এমার্সনের 'Immortal
প্রবন্ধটা পড়ে মনে হল
মনের কথা অবিকল তাতে লে
আছে। কতদিন বসে বসে ভেবে
অন্য জগতের জীবনেও নি
চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু ক
নিয়ে বসে থাকবার প্রচুর অবক
আছে। হাজার বছর কেটে যে
পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কা
কি? ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃ
ভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবে
করে তবে অনন্ত জীবনপ
দুশো তিনশো বছরের স্মৃ
ঐশ্বর্য কি, তা ভাবলেও পুল
শিউরে উঠতে হয়—হাজার বছরে
দুই হাজার বছরের? বিশ হা
কি লক্ষ বছরের।'

পরলোক আছে কি নেই, থাকলে
তা আমাদের ব্যক্তি-চেতনার ক
রকম আশ্রয়,—সে-সব কথা বিভূতিভূষ
সাহিত্যে কিছু কিছু বলা হয়েছে
আমি ঐসব সাহিত্য-প্রসঙ্গের বাই
পরলোক নিয়ে কতোটুকুই বা চ
করেছি। হয়তো মানুষের অনন্ত জ্ঞান
পিপাসার অবলম্বন হিসেবেই ব্যক্তি-চে
এই পরলোকে উজ্জীবন। হয়তো
সত্যিই সত্যতর অন্য কোনো ভি
আছে তার। যাক্ যাক্ —সে-সব গবেষ
আমার সাধ্য নয়। আমি গ্যেটের ব
রূপী মনের কথা ভাবতে ভাব
সাহিত্যের জগতে হাঁটছি। দেখ
আমাদের একদিকে Fate, Destin
অদৃষ্ট,—অন্যদিকে এই পরলোক,
মধুসূদনের কঠোর অদৃষ্ট,—বিভূতিভূষ
সুনিশ্চিত পরলোক।

হঠাৎ দপ্ করে মনের ম
জ্বলে উঠলো একটি কবিবচন—রবীন
নাথের 'দেবতার গ্রাসে'র উক্তি
'আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে

আমার এই আলোচনার সা
'দেবতার গ্রাসে'র এই উক্তির পৃ
প্রসঙ্গের কোনো যোগ নেই। ত
কোন্ অনুষঙ্গে যে কোন্ কথা ম
আসে।

মন আমাদের বহুরূপী। (ক্রমশ

জধানী :

দিল্লীর আকাশ এখন মেঘে-ঢাকা।
দা, কালো, ধূসর, পিঙ্গল—নানা রঙের
ঘের আনাগোনা চলেছে রাজধানীর
কাশে। একদিন আকাশ একেবারে
ঙেও পড়েছিল। সে কী ভীষণ বর্ষণ।
ত তিনটে থেকে পরের দিন দুপুর
বধি চলেছিল একটানা বারিপাত।
বহাওয়া দপ্তরের হিসেবে বৃষ্টির
রিমাণ ছিল চার ইঞ্চি। শহর প্রায়
বু-ডুবু। জায়গায় জায়গায় জল
মেছিল হাঁটু পরিমাণ। প্লাবনের
শঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল
রের মানুষ। স্তব্ধ হয়েছিল মানুষের
নন্দিন জীবন। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল
নবাহন চলাচল। সেদিনের বৃষ্টিতে
ভিন্ন এলাকায় গৃহ ধ্বসে পড়ায়
হত হয়েছিল সাতজন।

নয়াদিল্লীর রাজনৈতিক আকাশও
তকট মেঘে-ঢাকা, নিষ্প্রভ। প্রধান-
ী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্পূর্ণ
হলেও দুর্বল। বাইরে বেরুচ্ছেন
। ওপরতলার মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই
জধানীর বাইরে। পাঞ্জাবের ঝামেলা
ক যাওয়ার পর উত্তাপ গিয়েছে
নেকখানি কমে। কংগ্রেস সভাপতি
কামরাজ নাদারও এখন রাজধানীতে
ই। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীর
বেশ যেন কিছুটা স্নিগ্ধই হয়েছে।
র শ্যামলিমা অবশ্যি বাজারের
র্গগতির ওপর কোন প্রভাব বিস্তার
তে পারে নি। বর্ষার ঘনঘটার আলো-
ধারিতে বাজারের ভাগ্য-নিয়ন্তারা
উল্লসিতই হয়েছে। আকাশ যতদিন
রচ্ছন্ন না হয়—সরকার যতদিনে
া ও কুণ্ঠাজড়িত মনোবৃত্তি পরিহার
র সুস্পষ্ট নীতি নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে
গিয়ে না আসেন ততদিন চলতে
বে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য।

* * *

অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলোর
রপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের ইতিমধ্যেই প্রধান-
শ্রীশাস্ত্রী দ্রব্যমূল্য হ্রাসের উপযুক্ত
রিকল্পনা প্রণয়নের অনুরোধও

● কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা দিল্লীতে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করছেন।

জানিয়েছেন। প্রেরিত নোটে তিনি জানিয়েছেন, গেল ১৫ দিনে সব জিনিষের দাম বেড়েছে শতকরা ৪'৪ ভাগ। পরিকল্পনা রচিত হলে তা' বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। পরিকল্পনাগুলো বিচার-বিশ্লেষণের পর একটা সুসংহত নীতি অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে।

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম তো ধনুক-ভাঙা পণই করে বসেছেন। তিনি কালোবাজারীদের খতম করতে না পারলে নিজেই বিদায় নেবেন সসম্মানে। বাঙ্গালোরে খাদ্যশস্যের পাইকার ও খুচরা বিক্রেতা এবং সমবায় সংস্থার বৈঠকেই তিনি এ উক্তি করেছেন। বলেছেন, "হয় কালো-বাজারী খতম হবে নতুবা আমি।" সময় দিয়েছেন তিন মাস। কালো-বাজারীদের এতে ভীত হওয়ার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি নে। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারা যতটা পারে মুনাফা লুটে নেবে। অক্টোবরের শেষ থেকে নতুন ফসল সুরু হবে কাটা। তখন খাদ্যের বাজার আপনা থেকেই নেমে আসবে। তা' ছাড়া, এমনি ধরণের চরম কথা আগেও তারা শুনেছে কেন্দ্রের বহু মন্ত্রীর কাছ থেকেই। কোন মন্ত্রীই শেষ পর্যন্ত পণ রক্ষা করেন নি। শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও আসছে তিনটে মাস তারা নির্বিঘ্নেই কাটাতে পারবে। তা' ছাড়া, খাদ্য দপ্তরের হাল ধরে গড়ে দু' বছরের বেশি কেউ টিকতে পারে নি। শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের মেয়াদও আপাতত সোয়া দু' বছরের বেশি নয়।

* * *

অতিলোভী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যও বেশি দিন থাকতে পারে না। জলভরা

● শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

● শ্রীসুব্রাহ্মণিয়ম্

নেয়, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চিরস্থায়ী হয় না। শুককে শোষণের, পিষ্টকে পেষণেরও একটা মাত্রা আছে। দগ্ধকে দাহন করতে করতে তার ভেতরের দাহিকাশক্তি এক সময় বেরিয়ে এসে দাবানলের সৃষ্টি করে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার নজীর রয়েছে। ইতিহাসের সে-শিক্ষার কথা স্মরণ করে মুনাফাবাজের দল একটু সংযত হলে, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের কথা শুনে চললে বুদ্ধিমানের কাজই করবেন। জাগ্রত গণমানস বেশি দিন এ অত্যাচার নিশ্চয়ই সহ্য করবে না—করতেও পারে না। 'দমদম দাওয়াই' আবিষ্কৃত হয়েছে। সে দাওয়াই প্রয়োগে কাজও সাময়িক হয়েছিল। সারা ভারতে সে দাওয়াইয়ের প্রসার হওয়া বিচিত্র কিছুই নয়।

* * *

বস্ত্রশিল্পের মালিকরা সরকারের আদেশের অপেক্ষা না করেই কাপড়ের দাম বাড়িয়েছেন শতকরা ১০ থেকে ১৬ ভাগ। তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট নন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁরা আবেদন পেশ করেছিলেন মূল্যবৃদ্ধির অনুমতি চেয়ে। দামটা আগেভাগে বাড়িয়ে দিয়ে তাঁরা ভেবেছিলেন সরকার বর্ধিত মূল্য হ্রাস করতে দ্বিধা করবেন। সরকার তা' করেন নি। সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, সূতিবস্ত্রের দাম বাড়ানো চলবে না। কংগ্রেসের মূল্যবিষয়ক সাব-কমিটিতে বিষয়টি পুঙখানুপুঙখরূপে বিবেচনার পর ধুতি, শাড়ি ও জামার ছিট প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন।

ভারত সরকারের এ নীতি কতটা কার্যকর হয় তা' বোঝা যাবে আগামী তিন মাসের মধ্যেই। পূজার সময় ঘনিয়ে আসতেই প্রতি বছর কাপড়ের দাম বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীরা এই মরশুমে মানুষের পকেট কেটে সুবিধামত মোটা মুনাফা কামিয়ে নেয়। পূজার বাজারের চাহিদা সুরু হওয়ার আগে মূল্যবৃদ্ধি রোধের কড়া ব্যবস্থাটা না হলে, কাপড়ের দাম ঠেকানো যাবে না। কাপড়ের দাম বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়বে অন্যান্য পণ্যের ওপর।

* * *

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে কি ফল আমরা লাভ করেছি—মানুষের তাতে কতটা উপকার হয়েছে, না শুধু দুর্নীতিই তাতে দানা বেঁধেছে, এ বিষয়ে খোঁজখবর নেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা তদন্তের ব্যবস্থা করছেন। এ-সংবাদ সাংবাদিকদের কাছে পরিবেশন করেছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের পর থেকে। যুদ্ধের বাজারের অস্বাভাবিক অবস্থায় সেদিন বিদেশী শাসক চাল-চিনি-আটা-ময়দা ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও সেই রেওয়াজ চলে আসছে। মাঝে স্বর্গত রফি আহমেদ কিদোয়াই একটু সাহসে ভর করে তুলে দিয়েছিলেন রেশনিং প্রথা। তাঁর মৃত্যুর পরই আবার আংশিকভাবে আমরা ফিরে গিয়েছি পুরানো প্রথায়।

রেশন প্রথায় কম দামে জিনিষ পাওয়ার নিশ্চয়তা ছাড়া আর কো[illegible] উপকার সাধারণ মানুষের সেদিন হয় নি[illegible] বর্তমানে সে-নিশ্চতাও নেই[illegible] ন্যায্যমূল্যের দোকানে চাল থাকে তে[illegible] গম থাকে না; আবার গম মিলে[illegible] চাল মেলে না। এর খারাপ দিকট[illegible] এখনও পুরামাত্রায় বজায় রয়েছে[illegible] চালের সাথে তুঁষ, খুদ, কুঁড়ো ও পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁকর জোটে। মানুষ তার রুচিমাফিক জিনিষ না পেলেই বাইরে থেকে অধিক দামে কিনতে বাধ্য হয়। ফলে, কালোবাজার ওঠে জেঁকে। সঙ্গে সঙ্গে রেশনের দোকানগুলো হয়ে ওঠে কালোবাজারের মাল সংগ্রহের প্রধান উৎস। পশ্চিম বাংলা সরকার ভুয়া রেশন কার্ড ধরেছেন অনেক। অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে বিপদের দিনের সম্ভাবনায় অথবা কেবল চিনি সংগ্রহের আশায় রেশন কার্ড করতে বাধ্য হয়েছিলেন বহু পরিবার। তাঁরা সরকারের দেওয়া অখাদ্য চাল-গম ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে কোনদিন নেন নি। এ ধরণের রেশন কার্ডের ওপর নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট দোকানী সরকারী গুদাম থেকে খাদ্যশস্য নিয়েছে। সেগুলো স্বাভাবিক পথেই গিয়ে ঢুকেছে কালোবাজারে। কণ্ট্রোল কলঙ্কই সৃষ্টি করেছে, তাতে মানুষের উপকার

● শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

যতটুকু হয়েছে তার চাইতে ঢের বেশি হয়েছে অপকার।

বিচারকার্য ত্বরান্বিত করা, আদালত থেকে দুর্নীতি দূর করার উপায় উদ্ভাবনের জন্যও শ্রীনন্দ চেষ্টা করছেন। প্রতিটি রাজ্যে সদাচার সমিতি গঠন করে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেও তিনি রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন।

• • •

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা গত ৭ই জুলাই দিল্লীতে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেছেন।

ছাত্রাবাসের প্রথম অংশটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে—এতে ৯৬ জন ছাত্র ও ৪ জন শিক্ষকের বসবাসের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। সুসজ্জিত বিশ্রামাগার, ভোজনকক্ষ, পাঠাগার ব্যতীতও এখানে নানারকম খেলাধূলার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে মগ্ন মূর্তিতে। অবস্থার অবনতি ঘটছে দিনের পর দিন। বর্ষার সুরু থেকে নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাঘাট হয়ে পড়েছে অত্যন্ত দুর্গম। সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও সুদূর পল্লী এলাকায় ঠিক সময়ে খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না।

খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে রেওয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি হয়ে উঠেছে মারমুখী। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রেওয়া কংগ্রেসের সংঘর্ষ বাধাও বিচিত্র নয়।

রেওয়ার পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। যান চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাও গ্রামাঞ্চলে খুবই কম। বৃষ্টিতে সেগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। সিধির কোন কোন এলাকা এর মধ্যেই রাজ্যের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

রাজ্য সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলেছেন শ' চারেক। জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত পনের হাজার দু' শ' টন গম পাঠানো হয়েছে। আরও সাত হাজার চার শ' টন গম পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। টেস্ট রিলিফের কাজও সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যার তুলনায় এ সব ব্যবস্থাও নগণ্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় চার লক্ষ মানুষ ক্রয়-ক্ষমতা হারিয়েছে। টেস্ট রিলিফের বর্তমান ব্যবস্থায় হাজার কয়েক কপর্দক-হীনের সাহায্য হতে পারে।

উপজাতিদের একটা বিরাট

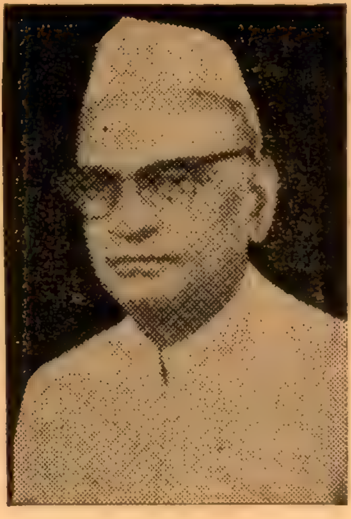

● শ্রী ডি পি মিশ্র

অংশের ঘরে চলেছে অরন্ধন। খাদ্যাভাবে বন্য ফল ও গাছের পাতা খাচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

সমাজতন্ত্রী দল আন্দোলন সুরু করে দিয়েছে। রেওয়া, সিধি, ছাতনা, শাদল, পান্না ও টিকামগড়ে প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে তাদের নেতৃত্বে।

এই অবস্থার সামনে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পড়েছেন বিপদে। রেওয়া কংগ্রেস আবার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধ পক্ষ। তাঁদের ধারণা, সরকার ইচ্ছে করেই খাদ্য সরবরাহে বিলম্ব করছেন। রেওয়া কংগ্রেস কমিটিকে জব্দ করাই সরকারের অভিলাষ বলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন। সমাজতন্ত্রী দল এই সুযোগ পুরোমাত্রায় নিয়ে যে-ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছে তাতে কংগ্রেস পড়েছে অত্যন্ত বে-কায়দায়।

বাঁচার তাগিদে রেওয়া কংগ্রেস সরকারের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে ১৫ই জুলাই থেকে আন্দোলন সুরু করার হুমকী দিয়েছেন। তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং এ-আই-সি-সি'র কাছে এর জন্য অনুমতির প্রার্থী হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের সাবধান করে বলেছেন, সরকার কঠোর হস্তে তাদের দমন করতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

মাদ্রাজ ঃ

পুলিশের লোক যখন জেহাদ ঘোষণা করে তখন সরকার পড়েন বেশি বিপদে। কোয়েম্বাটুরের প্রাক্তন সাব-ইনস্পেকটার অর্জুনন সরকারের মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। প্রকাশ্যে তিনি নিজের হাতে আরক তৈরি করছেন। তাঁর মতে, এ আইন ভাঁওতা মাত্র। তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। তিনি এখন বিচারাধীন আসামী।

প্রাক্তন পুলিশ অফিসারটি এদিকে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ আইনের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালিয়েছেন। শ্রীঅর্জুনন ঘোষণা করেছেন, প্রচারই তাঁর একমাত্র অস্ত্র নয়। তিনি বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সুরু করবেন রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ মিছিলের। কমোরিন থেকে গণ-মিছিল আরম্ভ হবে। শেষ হবে রাজ্য সরকারের প্রধান কার্যালয় সেণ্ট জর্জে গিয়ে। সারা পথে চলবে বিক্ষোভ আন্দোলন।

এখানেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। অন্তরালে যা ঘটে তার পর্দাও তিনি উদ্‌ঘাটন করবেন। পুলিশ দিয়ে ঘেরা উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে কিভাবে ওপরতলার মানুষের ককটেলের হল্লোড় চলে, তা' তাঁর অজানা নেই।

আবার পুলিশের তৎপরতা প্রমাণের জন্য নীচের তলার বাসিন্দারা কিভাবে নির্যাতন সহ্য করে—রাতারাতি নতুন নতুন ঘটনার সৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে করা হয় তারও প্রমাণ তিনি দিতে পারবেন। তিনি বলেছেন, "আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, এ সব ঘটনা আমি ফাঁস করবই।" পুলিশের বড়কর্তারাও নাকি এতে বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ আইন সম্পর্কে আমরা আগেও কয়েকবার আলোচনা করেছি। এ আইনের প্রধান সমর্থক শ্রীমোরারজী দেশাই। তাঁর নিজের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মাদকদ্রব্য বর্জন বোম্বাইয়ের মানুষ করে নি। আইনের চোখে ধুলো দিয়ে মদের আড্ডা কম সেখানে জমে নি। রাজস্বের ক্ষতি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয় নি। নেশা যাদের একবার পেয়ে বসে আইনের কড়াকড়িতে তাদের নেশা ভাঙে না। কাজেই মাদকদ্রব্য বর্জনের ব্যাপার নিয়ে এ ধরণের মাতামাতি দেশে যত কম হয় ততই ভাল।

মহারাষ্ট্র ঃ

ঔরঙ্গাবাদ শহরে দু' মাইলের ব্যবধানে ১৭ ঘণ্টার মধ্যে পর পর দুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নিহত হয়েছে ১৫ জন এবং আহত হয়েছে শতাধিক ব্যক্তি। পরের দিনের বিস্ফোরণে নিহতের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় নি। বিস্ফোরণের পরই ভীতি-বিহ্বল নরনারী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল। বিশৃঙ্খলার মধ্যে হতাহতের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব হয় নি। কারো কারো মতে দ্বিতীয় দিনেই নিহত হয় ২০ জন।

বিস্ফোরণে ভেঙে চুরমার হয়েছে ধাটটি গৃহ। ১৫ মাইল দূরের মানুষও বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে আঁৎকে উঠেছিল। শহরের টেলিফোন ব্যবস্থা পর্যন্ত বিকল হয়ে পড়েছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকেও তলব করতে হয়েছিল।

যে-কারখানায় প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার কোন অনুমোদন ছিল না। দ্বিতীয়টির কথা সরকারীভাবে কিছু এখনও ঘোষণা হয় নি। অনুমোদন থাক, আর না-ই থাক, শহরের বুকে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এমন বিধ্বংসী বারুদের কারখানা থাকার বিপদের দিকটা কর্তাদের আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। সরকার কারখানা ও গুদামের মালিকদের গ্রেপ্তার করেছেন। বিচারে এদের শাস্তিও নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যে-কটি অমূল্য জীবন সরকারের অদূরদর্শিতা, প্রশাসনযন্ত্রের ব্যর্থতায় শেষ হল তার প্রতিকার কে করবে। বিনা লাইসেন্সে শহরের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যের কারখানার অস্তিত্ব প্রশাসনযন্ত্রে চরম ব্যর্থতারই পরিচয়। এ জাতীয় শোকাবহ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি এস দেশাই ঔরঙ্গাবাদে গিয়েছেন। তিনি এখন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনা দুটিকে তিনি নাশকতামূলক বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।। তাঁর সন্দেহ অমূলক বলা যায় না। বিজয়ওয়াড়ার অগ্নি-সংযোগের পর ঔরঙ্গাবাদের বিস্ফোরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়ার

● শ্রী ডি এস দেশাই

ঘটনাবলীর পরই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর সতর্ক থাকা উচিত ছিল। অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা হলেও নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের রেহাই দেওয়া যায় না। তারা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে পর পর এরূপ ভয়াবহ দুটি ঘটনা ঘটতে পারতো না। প্রথম বিস্ফোরণের পরই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

* * *

"সোসাইটি অফ ওয়ার্লড এফার্সে" ভারতের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল শ্রী সি রাজাগোপালাচারী যে-ধরণের বিস্ফোরক বক্তৃতা দিয়েছেন তার প্রচণ্ডতাও নেহাৎ কম নয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির কাঠামোকে ভেঙে তছনছ করাই এই বৃদ্ধ, ঝানু রাজনীতিকের উদ্দেশ্য। কাশ্মীরকে তিনি ভারতের মানচিত্র থেকে কেটে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রীর জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। পাকিস্তানের প্রতি তাঁর দুর্বলতা স্বাভাবিক। । দেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান গড়ে তোলার তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাজাজীর সে-ফরমূলার কথা আজও দেশের মানুষ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে নি। এবারের বক্তৃতায় "কাশ্মীরকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে তুলে দেবার" প্রস্তাবই প্রকারান্তরে করা হয়েছে।

এ ছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ার মাটিতে কমিউনিস্টদের গতিরোধের জন্য তিনি পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তির প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে চীন-পাক মিতালী টিকতে পারে না; কারণ এ মৈত্রী বাস্তবতাবর্জিত।

স্বতন্ত্র দলের নেতার নিশ্চয়ই চিত্ত-বৈকল্য ঘটেছে। ক্ষমতালাভের নেশায় তাঁর দৃষ্টিও সম্ভবত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁর মন পরিষ্কার থাকলে, দৃষ্টি ঝাপসা না হলে দেখতে পেতেন পাকিস্তান গেরিলাবাহিনী গড়ে

তুলছে নয়া চীনের সাহায্যে। লণ্ডনে পা দিয়েই আয়ুব খাঁ চীনের একদফা গুণকীর্তন করেছেন। পররাজ্য গ্রাসের লালসা, অপরের ওপর হামলা করার অভিপ্রায় চীনের নেই বলে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট কমনওয়েলথের সদস্য-রাষ্ট্রের অধিনায়কদের জানিয়েছেন। এ সব কথা রাজাজী হয়তো আমল দেবেন। পাকিস্তানের প্রতি তাঁর অন্ধ-বিশ্বাসও দূরীভূত হবারও নয়।

রাজাজী এক সময়ে ভারতের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তাঁর দেশাত্ম-বোধ সম্পর্কেও সন্দেহের কারণ থাকাই উচিত। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে বিভ্রান্তির

শ্রীরাজাগোপালাচারী

সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি যত বড় এবং শ্রদ্ধাবান নেতাই হোন, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরকে বিকিয়ে দেবার প্রস্তাব তিনি করতে পারেন কিনা, এ প্রশ্ন আজ উঠেছে। গণতন্ত্রে বাক-স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম কেউ করলে তার প্রতিবিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বতন্ত্র নেতার কার্যকলাপজনিত ঘোলা জলে শেষ পর্যন্ত আমাদের যাতে নাকানি-চুবানি খেতে না হয় তার ব্যবস্থা সময় থাকতে করাই উচিত হবে।

স্বতন্ত্র পার্টির সম্মেলনে ভারত সরকারের খাদ্য নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। দেশের খাদ্য-সঙ্কট সৃষ্টিতে ব্যবসায়ীদের, অতি-মুনাফাখোর মিল মালিক, আড়তদার ও ও জোতদারদের সম্পর্কে কিন্তু একটি কথাও সেখানে হয় নি। হতেও পারে না। স্বতন্ত্র দলের অস্তিত্বে টান পড়ার ভয় আছে।

* * *

স্বতন্ত্র দল যেখানে নীরব সেখানেই জোর আঘাত হেনেছে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস। জেলা ও শহর কংগ্রেসের সভাপতিদের সভায়, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটীর সভায় একদিকে যেমন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা হয়েছে কঠোর ভাষায়, অপরদিকে ব্যবসায়ীদের দায়ী করা হয়েছে দেশের কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টির জন্য।

* * *

আহমদনগর জেলার কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। খুবই শুভলক্ষণ বলতে হবে। শুভাশুভের সূক্ষ্ম বিচার কিন্তু সকলে করতে পারেন না। সুখের কথা, আনন্দের কথা সকলের প্রীতির উদ্রেক করে না। এ সব নাকি আপেক্ষিক ব্যাপার। চন্দনের প্রলেপও সকলের সহ্য হয় না। কারও কপালে টান ধরে; আবার কারও ঠাণ্ডা লেগে যায়। মানসিক ও শারীরিক পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। তা' না হলেই সুখ হয় অসুখে পরিণত। কমিউনিস্টদের সাথী হতে দেখে তাদের আগে যাঁরা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল থেকে কংগ্রেসে এসেছেন তাঁরা সুখী হতে পারেন নি। কংগ্রেসে যোগদানের পর তাঁরা যে মর্যাদা পাচ্ছেন তা' খর্ব হওয়ার আশঙ্কা জাগা বিচিত্র নয়। কমিউনিস্টরা এর পর দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিলে পরিণতির কথাটাও তাঁদের আতঙ্কিত করেছে কিনা বলা শক্ত।

বিহার :

ধর্মীয় ট্রাষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বড় বিপাকে পড়েছেন। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পুত্র, ধর্মীয় ট্রাষ্টের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিওশঙ্কর সিংহ একেবারে বেঁকে বসেছেন। তিনি যাকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণ করে নতুন চেয়ারম্যান গেল মার্চে নিয়োগ করেছিলেন সেই বিদায়ী ব্যক্তিকে পুনর্বহাল করে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে নাকি বিদায় দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীসিংহ এ জবরদস্তি সহ্য

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়

করতে প্রস্তুত নন। ধর্মীয় ট্রাষ্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ও অযোগ্যতার অভিযোগও কম ছিল না। এই বোর্ডের প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাজও কিছু এগোয় নি। শ্রীসিংহ চেয়েছিলেন এর জঞ্জাল পরিষ্কার করে দিয়ে কাজের উপযোগী করে তুলতে। পুরোনো চেয়ারম্যানকে বিদায় দেবার কিছুদিন পর থেকে শ্রীসিংহ ও শ্রীসহায়ের মধ্যে মন কষাকষি সুরু হয়েছিল।

শ্রীসিংহ ভূমিহর গ্রুপের একজন

শক্তিশালী নেতা। এই দল বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রধান সমর্থক। শ্রীসিংহ পদত্যাগের হুমকী দিয়েছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভার ভারসাম্য রক্ষা করাও কঠিন। উভয় পক্ষ থেকেই একটা মিটমাটের চেষ্টা এখনও চলেছে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির মধ্যে যাঁরা মন্ত্রিসভার বিরোধী তাঁরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টায় আছেন।

*   *   *

নয়াদিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীরা মিলিত হয়ে খাদ্য সমস্যার সুরাহা করবেন বলে যাঁরা আশা করেছিলেন তাঁরা নিরাশ হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। সাধারণ মানুষের মনে আজ এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, খাদ্যের উপযুক্ত বিলি-ব্যবস্থার জন্য যেরূপ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন তা' রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্য সরকার সকল দায় ও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টায় আছেন। সরবরাহ-মন্ত্রী জানিয়েছেন, যথাসময়ে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে খাদ্য না এলে অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

সরকারী গুদাম প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। শতকরা ৮০টি ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্যশস্য নেই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গম ও চালের দাম বেড়েছে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ। গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গায় দুর্ভিক্ষের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুনাফা-শিকারীর দল এ অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে পুরা-মাত্রায়। ব্যবসায়ীরা সংযত না হলে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসহায় কিছুদিন আগে বলেছিলেন। তাঁর ধমকে কোন কাজ হয় নি। সব দিক দেখে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

*   *   *

তেলের পাইকারী বাজারের একজন পাইকারকে গ্রেপ্তারের পর জামসেদপুরে তেলের দাম ৪ টাকা থেকে নেমে এখন ৩ টাকা ৩৪ নয়া প্রয়সায় দাঁড়িয়েছে। শুধু তেল নয়, অন্যান্য সামগ্রীর দামও নেমেছে। চালের দাম কমেছে মণ প্রতি ২ টাকা। দেশলাইয়ের দামটা কমেছে সব চাইতে বেশি। দেশলাইয়ের দাম উঠেছিল ১২ নয়া পয়সা। এখন ৬ নয়া পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে সব দোকানেই।

চোরা বাজারের কল্যাণে জামসেদপুরে গত এপ্রিলের পর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা ২৫ ভাগ। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ২ মাসে জামসেদপুরের মানুষের পকেট কেটে তেলের ব্যবসায়ীরা মুনাফা করেছে লক্ষাধিক টাকা।

আসাম ঃ

আত্মগোপনকারী নাগাদের স্কট সাহেব এখনও পথে আনতে পারেন

শ্রীচালিহা

নি। তিনি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা ৩রা জুলাই কোহিমা গিয়েছিলেন। চাকহেসাং অঞ্চলে নাগাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি দু' রাত আলোচনাও করে এসেছেন। কোন সুফল হয় নি।

শান্তি মিশনের সঙ্গে নাগাদের আলোচনায় বসবার যে সর্ত হয়েছিল সে-সর্তের ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় সরকার যে-ভাবে করেছেন তা' নাগাদের মনের মত হয় নি। তবে, এ নিয়ে আরেক দফা আলোচনায় বসতে নাগারা প্রস্তুত আছে। শ্রীচালিহা পুনরায় ২০শে জুলাই কোহিমা যাচ্ছেন। সেই সময় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কোহিমায় আসতে পারেন।

*   *   *

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্রীয় খাদ্য-ভাণ্ডার থেকে করার প্রতিশ্রুতির পর আসাম সরকার কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। বর্ষার সুরুতেই আসামের বিরাট এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ায় নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী হিসেব অনুসারে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের জীবন বন্যায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, খাদ্য সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে।

শহরাঞ্চলে চালের দাম সরকার বেঁধে দিয়েছেন। বন্যাপীড়িত গ্রামাঞ্চলে দামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের খেয়াল-খুশির ওপর। দিনের পর দিন জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। এর ওপর সুরু হয়েছে আসামের বাৎসরিক বন্যা। ব্রহ্মপুত্র পাঁচটি গ্রাম ভাসিয়ে নিয়েছে। নেফার একটি ডিভিশনের সাথে স্থলপথে কোন যোগাযোগ নেই। বর্ষার সুরুতেই এই অবস্থা। কদিন পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠবে।

সরকার একেবারে নীরব। তাদের এক কথা। খাদ্যের কোন অভাব নেই; কারণ আসাম খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। দাম বাড়বেই। সারা ভারতে যা' ঘটছে তাকে আসাম সরকার একা রুখবেন কি করে। সারা ভারতের মূল্যবৃদ্ধির ঝোঁকটা আসামে পড়বেই। সরকারের এ মত সকলে সমর্থন করে না। গৌহাটির মত বড় শহরের বাজারে চাল পাওয়া একটা দু:সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষ পড়েছে অশেষ দুর্গতির মধ্যে। দুর্গম রাস্তাঘাট। মুনাফা-খোর ব্যবসায়ীদের মর্জির ওপর নির্ভর করা ভিন্ন তাদের আর কোন উপায়ই নেই।

আন্তর্জাতিক

• নাগরিক অধিকার বিলে স্বাক্ষরদানের পর রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন মার্টিন লুথার কিং-এর সঙ্গে করমর্দন করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

অবশেষে নাগরিক অধিকার বিল আইনে পরিণত হল। প্রতিনিধিসভায় পাশ হবার সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন এই বিলে স্বাক্ষর করেছেন। লিঙ্কনের দাসপ্রথা বিলোপের মতই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে নিগ্রোদের সমানাধিকার দানের জন্য কেনেডির প্রস্তাবিত এই আইন।

মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিসভা থেকে পাশ হয়ে সেনেটে, এবং সেখান থেকে সংশোধিত হয়ে আবার প্রতিনিধি-সভা, মোট ১১৮½ দিন লেগেছে আইনসভায় এই বিলটি পাশ করতে। দক্ষিণের বর্ণবিদ্বেষী সদস্যরা সর্ব-স্তরে এই বিল পাশে বাধা দিয়েছে। শেষ পর্যায়ে প্রতিনিধিসভায় সেনেটের সংশোধিত বিলটি ২৮৯—১২৬ ভোটে পাশ হয়েছে। পক্ষের ২৮৯ ভোটের মধ্যে ১৫৩টি ভোট ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্যদের, আর ১৩৬টি রিপাবলি-কান পার্টির। বিরুদ্ধের ১২৬টি ভোটের মধ্যে ৯১টি ডেমোক্রাটিক পার্টির, আর ৩৫টি রিপাবলিকান পার্টির।

বিলে স্বাক্ষরদানের পর রাষ্ট্রপতি জনসন জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক টেলিভিশন ভাষণে বলেন, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতির প্রতি মর্যাদা রক্ষার জন্য এই আইন প্রস্তুত করা হয়েছে। মার্কিন সমাজে এখন থেকে আর কোন বর্ণবৈষম্য স্বীকার করা হবে না। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যারা সমান, এখন থেকে তারা ভোটকেন্দ্র, ক্লাশরুম, কারখানা, হোটেল-রেস্টুরেণ্ট, সিনেমা-থিয়েটার এবং জনসাধারণের সেবার জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সমান বলে পরিগণিত হবে।"

নাগরিক অধিকার আইন কার্যকরী করার জন্য ফ্লোরিডার প্রাক্তন গভর্নর লে রয় কলিনসকে 'কমিউনিটি রিলেসন্স সার্ভিসের' সভাপতি পদে নিয়োগ, এবং প্রাক্তন কূটনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ আর্থার ডিনকে সভাপতি করে একটি পরামর্শদাতা কমিটী গঠনের কথাও জনসন টেলিভিশন বক্তৃতায় বলেছেন। এই আইন কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের দাবীও তিনি কংগ্রেসের কাছে করেছেন।

নাগরিক অধিকার আইনকে মার্কিন নিগ্রো সমাজ স্বাগত জানিয়েছে।

• জেমস্ ফারমার

বিলে স্বাক্ষরদানের পর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রথম যাঁরা করমর্দন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, নিগ্রো আন্দো-লনের বিশিষ্ট নেতা মার্টিন লুথার কিং, জেমস্ ফারমার, রয় উইলকিন্স্, হুইটনে ইয়াং, ফিলিপ র‍্যানডলফ্ প্রভৃতি।

এখন প্রশ্ন হল : যারা এতদিন ধরে এই আইন পাশের বিরোধিতা করে এসেছে, তারা কি সহজে এই আইন মেনে নেবে? প্রাথমিক সংবাদে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থানেই বিরোধীরা আইনকে স্বীকার করে নিচ্ছে। যে-সব জায়গায় নিগ্রোরা এতদিন প্রবেশাধিকার পায় নি, এখন সেখানে তারা ঢুকতে পারছে। তবে অনেকে এর বিরোধিতাও করবে। মিসিসিপির গভর্নর পল জনসন বলেছেন, এই আইন মেনে নিগ্রোদের সমানাধিকার দেবার পরিবর্তে অনেক শ্বেতকায় তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবে।

মার্টিন লুথার কিং ঘোষণা করেছেন, নাগরিক অধিকার আইন বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী করার জন্য নিগ্রোরা বিমুখী অভিযান চালাবে। প্রথম, তারা

• পল জনসন

দক্ষিণের বর্ণবিদ্বেষীদের বোঝাবার চেষ্টা করবে যে, এই আইন মানলে তাদের ও নিগ্রোদের সকলেরই উপকার হবে, এবং, দ্বিতীয়, তারা নিজেরা বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেণ্ট, স্কুল-কলেজ, সিনেমা-থিয়েটারে প্রবেশের চেষ্টা করে দেখবে, সত্যি সত্যি এখনও কোথাও কোন বৈষম্য করা হচ্ছে কিনা।

মালাউই :

গত ৫ই জুলাই ৭৩ বৎসরের পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে নিয়াসাল্যাণ্ড 'মালাউই' নাম ধারণ করে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মালাউই হল আফ্রিকার ৩৫তম স্বাধীন রাষ্ট্র।

৫ই জুলাই ব্ল্যাণ্টিয়ারে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে লাল, কালো ও সবুজ রং-এর নতুন মালাউই পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাণী এলিজাবেথের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ—এডিনবরার ডিউক। ভারতের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মালাউই-এর স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ হেস্টিংস বাণ্ডার বিরাট অবদান। ৩০ বৎসর স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে থাকার পর মাত্র গত ১৯৫৮ সালে ডাঃ বাণ্ডা নিয়াসাল্যাণ্ডে ফিরেছেন। নিয়াসাল্যাণ্ড তখন 'সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশনের' অন্তর্ভুক্ত। রয় ওয়েলেন্‌সকির কর্তৃত্বাধীন এই ফেডারেশন থেকে নিয়াসাল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করা ও ইংরেজ অধীনতা থেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ডাঃ বাণ্ডা দেশে ফেরেন। এই আন্দোলনের জন্য তাঁকে জেলে যেতে হয়, কিন্তু ইংরেজ সরকারকে তাঁর দাবী মেনে নিয়াসাল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। নিয়াসাল্যাণ্ডের নির্বাচনে ডাঃ বাণ্ডার দলের ৫০ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

• রয় উইলকিন্‌স্

নির্বাচিত হন। দেশবাসী একবাক্যে ডাঃ বাণ্ডার পেছনে। অতঃপর ইংরেজ সরকার এই আফ্রিকীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা দানে সম্মত হয়।

মালাউই অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। অবশ্য অনুন্নত এই দেশটির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে—অব্যবহৃত সম্পদ প্রচুর পড়ে রয়েছে, তবে তার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে এ দেশের বার্ষিক বাজেটে ঘাটতি সোয়া কোটি ডলারের ওপর। এখানকার বহু লোক বেকার।

ডাঃ হেস্টিংস বাণ্ডা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছেন। পর্তুগীজ শাসিত মোজাম্বিকের সঙ্গে তিনি আপোষ করে চলবেন, কারণ মোজাম্বিকের মধ্য দিয়েই তার সমুদ্রে যাবার একমাত্র পথ। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরউড সরকারের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখতে চান, কারণ তাঁর দেশের বেকার লোক সেখানে কাজ পেতে পারে। এর ফলে আফ্রিকীয় জাতীয়তাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, 'বাস্তববাদী' ডাঃ বাণ্ডা এই পথই অনুসরণ করতে চান। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও তিনি বেশ কিছু পরিমাণ আর্থিক সাহায্য আদায় করেছেন।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ডাঃ হেস্টিংস বাণ্ডা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। মালাউই-তে ৯,০০০ ইউরোপীয়, ১১,০০০ এশীয় ও ৩,৯০০,০০০ আফ্রিকীয়ের বাস। ডাঃ বাণ্ডার সরকার ইউরোপীয় ও এশীয়দের সমান সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রাক্তন-শাসক ইংরেজদের প্রতি তাঁর যে কোন বিদ্বেষ নেই, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন শেষ গভর্নর স্যার গ্লিন জোন্‌স্‌কে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর-জেনারেল করার প্রস্তাব দিয়ে।

* হেস্টিংস বাণ্ডা

ডাঃ বাণ্ডার নেতৃত্বে মালাউই নতুন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে, নবরাষ্ট্রের জন্মলগ্নে এই শুভ কামনাই সকলে করবে।

মরোক্কো :

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন বর্তমানে আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে শুভেচ্ছা সফর করছেন। আলজিরিয়া ও মরোক্কো সফরের পর মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন, আফ্রিকার মুক্তির জন্য ভারত সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। আফ্রিকার প্রতিটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করুক, ভারত এই কামনা করে। এর জন্য বরাবর ভারত চেষ্টা করে এসেছে।

ডঃ জাকির হোসেন বলেছেন, আলজিরিয়া ও মরোক্কো ভারতের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। এ সব দেশ অসুবিধার মধ্যেও যেভাবে নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে, উপরাষ্ট্রপতি তার সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

ভারত ও আফ্রিকার দেশগুলির সমস্যা মোটামুটি এক। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষার অভাব, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা—এগুলিই এ সব দেশের প্রধান সমস্যা।

এই সব দেশগুলির মধ্যে ছাত্র, শিল্পী ও কর্মীদের আদান-প্রদান এবং কারিগরী ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্যের মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপনের ওপর উপরাষ্ট্রপতি জোর দেন।

উপরাষ্ট্রপতির এই সফরের ফলে আরব-আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতের প্রতি বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কঙ্গো :

অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হলেও তাই ঘটেছে। যে ময়সে টি শোম্বেকে একদিন কঙ্গো থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, আজ তাঁকেই সাদরে ডেকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে হয়েছে।

কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি যোশেফ কাসাভুবু টি শোম্বেকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানিয়েছেন, এবং টি শোম্বে মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হয়েছেন। গৃহবিবাদে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কঙ্গোকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন বলে টি শোম্বে আশা করেন। তিনি দাবী করেছেন, দক্ষিণপন্থী কাসাই-এর আলবার্ট ক্যালেনজি, মধ্যপন্থী জেনারেল মবুটু, জাস্টিন বোমবোকো, এবং বামপন্থী আলওয়ে লুবায়া, সকলেরই সমর্থন লাভ করেছেন। বিদ্রোহী লুমুম্বা-পন্থী জাতীয় মুক্তি কমিটীর সমর্থনও নাকি তিনি পেয়েছেন। অথচ, এই লুমুম্বার হত্যাকারী বলে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী ছয় থেকে নয় মাস পর্যন্ত নতুন মন্ত্রিসভা কাজ করবে। তারপর নতুন নির্বাচন করতে হবে। এর মধ্যে টি শোম্বে কঙ্গোতে সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কিনা, সবাই তা সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন।

চার বৎসর কঙ্গোতে থাকার পর গত ৩০শে জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর কঙ্গো ত্যাগের প্রাক্কালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন, কঙ্গো সমস্যার সমাধানের জন্য

* মরোক্কোর রাজা হাসানের সঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন

● কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক ও ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমাকে হাস্যালাপ করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রয়োজন সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল। টি শোম্বে কি তা পারবেন?

কঙ্গো থেকে কাটাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য টি শোম্বের চেষ্টাকে কেন্দ্র করেই কঙ্গো সংকট সুরু হয়, এবং কেবল লুমুম্বা নয়, মোট ২৩৫ জনকে সংকটে প্রাণ দিতে হয়, এঁদের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অনেক ভারতীয় সৈন্য আছেন। গত বৎসর জুন মাসে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে টি শোম্বে দেশত্যাগ করেন। আর আজ ঠিক তার এক বৎসর পরে বিজয়ীর মত দেশে ফিরে কেবল কঙ্গোর একাংশ কাটাঙ্গা নয়, সমগ্র কঙ্গোর শাসনভার পেলেন টি শোম্বে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর যে জন্য ৪৩৩,০৫০,০১৫ ডলার ব্যয় হয়েছে —কঙ্গো ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে টি শোম্বের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ভাগ্যের এক অদ্ভুত পরিহাস! (চার বৎসর রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কেন ছিল কঙ্গোতে?) আরও উল্লেখযোগ্য, কঙ্গোর বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী সিরিল আদুলা টি শোম্বেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় আদুলাকে বাদ দিয়ে কাসাভুভু ডেকে নিলেন আদুলারই আমন্ত্রিত টি শোম্বেকে। এও কি অদৃষ্টের পরিহাস নয়?

বৃটেন:

গত ৮ই জুলাই থেকে লণ্ডনে মার্লবরো হাউসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন সুরু হয়েছে। ১৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। কমনওয়েলথ গঠিত হবার পর এবারকার সম্মেলন হল দ্বাদশ অধিবেশন। ১৯৬২ সালে এর পূর্বের অধিবেশন হয়েছিল। যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রের প্রধান-শাসক অনুপস্থিত—তাঁরা হলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স ও জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার বুস্টামাণ্টে। শ্রীশাস্ত্রী ও স্যার বুস্টামাণ্টে অসুস্থতার জন্য যেতে পারেন নি, আর ম্যাকারিয়স যান নি রাগ করে—ক'দিন পূর্বে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনু লণ্ডন গিয়েছিলেন বলে। তবে এঁদের সকলের পক্ষেই অন্যান্য দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতের পক্ষ থেকে আছেন অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী এবং তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সম্মেলনে জওহরলাল নেহরুর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি নবরূপে কমনওয়েলথ গঠিত হবার পর বিগত অধিবেশন পর্যন্ত সব কটি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউম তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে নেহরুর মৃত্যুর উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমবেত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াট্টা ও ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা নেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সিয়েরা লিয়োনের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতেও শোক-প্রকাশ করা হয়।

বৃটেনের নেতৃত্বে কমনওয়েলথ পরিচালিত হয়, প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন সর্বদাই লণ্ডনে বসে, এবং বৃটেনের রাণীকে কমনওয়েলথের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসাবেও মেনে নেয়া হয়, তবু আজকের কমনওয়েলথে বৃটেন বা শ্বেতকায়দের প্রাধান্য নেই। ১৮টি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের মধ্যে বৃটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড

মাত্র শ্বেতকায়-রাষ্ট্র, আর ১৪টি কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের রাষ্ট্র। আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশগুলি ক্রমে স্বাধীন হয়ে কমনওয়েলথের সদস্যরূপে যোগ দেওয়ায়, কমনওয়েলথের সদস্যসংখ্যা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকায়দের প্রাধান্যও বাড়ছে। এবার মালাউই (নিয়াসাল্যাণ্ড) নতুন সদস্যরূপে কমনওয়েলথে গৃহীত হয়েছে এবং মালাউই-এর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ হেস্টিংস বাণ্ডা সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

কমনওয়েলথের এই কৃষ্ণকায়-প্রধান রূপ তার কাজের মধ্যেও প্রকাশ পেতে বাধ্য। এবারের সম্মেলন সুরু হবার আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপার নিয়ে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা সম্মেলনে বিশেষভাবে চাপ দেবেন। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকীয়দের রাষ্ট্রশাসনে সম অধিকার নেই—বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘু ইউরোপীয়রা দেশ শাসন করছে। প্রধানমন্ত্রী আইয়ান স্মিথের নেতৃত্বে দক্ষিণ রোডেশিয়ার ইউরোপীয় সরকারের দাবী, এখুনি দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। বৃটেন স্বাধীনতাদানে অস্বীকৃত হলে, দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকার এককভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। আফ্রিকীয়দের দাবী, আইয়ান স্মিথ সরকারকে বর্তমান অবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেয়া চলবে না। বৈষম্যমূলক বর্তমান সংবিধান পালটে 'এক মানুষ, এক ভোট' এই নীতি অনুসারে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন ও নির্বাচনের মারফৎ নতুন সরকার গঠন করতে হবে। এবং এই নতুন সরকারের হাতে দক্ষিণ রোডেশিয়ার শাসনভার অর্পণ করে বৃটেনকে এই উপনিবেশের স্বাধীনতা দিতে হবে। কমনওয়েলথের আফ্রিকীয় ও অন্যান্য অশ্বেতকায় সদস্যদের চাপে স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউম আইয়ান স্মিথকে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ডাকতে সাহস পান নি, কিন্তু তাঁর পক্ষে বর্তমান সংবিধান পালটে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও শক্ত।

● আইয়ান স্মিথ

দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে সম্মেলনের প্রথম দিকে আলোচনা ও ইংরেজ সরকারের বর্তমান দুর্বল নীতির পরিবর্তনের জন্য আফ্রিকীয় প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে দাবী জানান। ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা সম্মেলনে আসবেন না বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যই তিনি সম্মেলনে এসেছেন, এবং 'দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপারে বৃটেনের দায়িত্ব' এই নামে এক ইস্তাহার প্রচার করেছেন।

এই চাপ সৃষ্টির ফলে কাজ হয়েছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়রূপে বৃটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার সময় দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিয়েরে প্রস্তাব করেছেন, আইয়ান স্মিথ সরকার যদি এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করে, তবে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলি থেকে সৈন্যদল সংগ্রহ করে বৃটেনের কর্তৃত্বে এই সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। জোমো কেনিয়াট্টাও তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারকে দ্বিধাগ্রস্ত নীতি ত্যাগ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী জানান। ভারতের পক্ষ

কেশের পরিচর্য্যায় সিংহ মার্কা নারিকেল তৈল

বাজারে সুগন্ধি এবং গন্ধছাড়াও বহু তেল পাবেন, কিন্তু কেশ-চর্চ্চায় অপরিহার্য্য বিশুদ্ধ তৈল বলতে বুঝায় বহু পরীক্ষিত "সিংহ মার্কা" নারিকেল তৈল।

হিন্দুস্থান
কোকোনাট অয়েল মিল
সাঁইথিয়া, বীরভূম

• কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লণ্ডন বিমান বন্দরে পৌঁছলে খ্যাতনামা ভাস্কর শ্রীমতী ফ্রেডা ব্রিলিয়াণ্ট শ্রীমতী গান্ধীকে সাদর সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

থেকে শ্রীকৃষ্ণমাচারী দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, ইংরেজ সরকার এই সব পরামর্শ বিবেচনা করে দেখতে সম্মত হয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার নিয়েও শ্বেতকায়দের সঙ্গে অশ্বেতকায় প্রতিনিধিদের এক হাত হয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক অবরোধ প্রস্তাব বানচাল করার জন্য বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির অপচেষ্টায় আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলি রীতিমত ক্ষুব্ধ। সিয়েরা লিয়োনের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মারগাই ও কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াটা স্পষ্টই বলেছেন, কমনওয়েলথের কয়েকটি রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য বজায় রাখতে চায়, এমন কি তারা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্রশস্ত্রও দিতে চায়। এই নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেঞ্জিসের সঙ্গে কেনিয়াটার জোর কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। কমনওয়েলথ কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে, এ সব তারই ইঙ্গিত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনায় পূর্ব ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর সম্পর্ক, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যাবলী, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। মালয়েশিয়া প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এই আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বলেছেন—বৃটেনের হিউম, অস্ট্রেলিয়ার মেঞ্জিস, নিউজিল্যাণ্ডের হলিয়োক, নাইজেরিয়ার আবুবকর তফাওয়া বালেয়া, মালয়েশিয়ার টুঙ্কু আব্দুল রহমান ও ভারতের কৃষ্ণমাচারী। পাকিস্তানের আয়ুব খাঁর মতে চীন মোটেই বিপদের কারণ নয়—তাঁর মতে একমাত্র সমস্যা কাশ্মীর। ঘানার নক্রুমাও কতকটা চীনের পক্ষে বলেছেন।

'আন্তর্জাতিকের' বর্তমান নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত (১১ই জুলাই), প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের অর্থনৈতিক আলোচনার বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে অর্থনৈতিক আলোচনা সম্মেলনে খুব বেশি প্রাধান্য পাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কমনওয়েলথের উন্নত দেশগুলি কিভাবে অনুন্নত দেশগুলিকে বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হবে। শিক্ষা, কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য একটি 'কমনওয়েলথ ফাউণ্ডেশন' গঠনেরও প্রস্তাব আছে। তাছাড়া বৃটেনের ইউরোপীয় কমন মার্কেটে যোগদানের বিষয়টিও আলোচনা করা হবে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে বৃটিশ গায়না থেকে দুজন প্রতিনিধি এসেছেন, প্রধানমন্ত্রীদের কাছে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য। একটি কমনওয়েলথ শুভেচ্ছা মিশনের সাহায্যে বৃটিশ গায়নার দুই সম্প্রদায় পূর্ব ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তাঁরা প্রধানমন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এবারের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন বৃটেনের ঘরোয়া রাজনীতির দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর ক'মাস পরেই নির্বাচন। স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউম যদি সাফল্যের সঙ্গে সম্মেলন পরিচালনা করতে পারেন, এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তার দ্বারা বৃটেনের স্বার্থরক্ষা প্রমাণ করতে পারেন, তবে দেশে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পাবে ও নির্বাচনে জয়লাভে সুবিধা হবে। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, এই সম্মেলন তাঁর পক্ষে ভাল না হয়ে, খারাপই হবে। দেখা যাক কি হয়।

তবে বিরোধী লেবার পার্টির নেতা হ্যারল্ড উইলসন বেসরকারী ভাবে প্রায় সকল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছেন। আগামী নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী হবেন, এ বিষয়ে তিনি একরূপ নিশ্চিত। তাই সাংবাদিক মহলে উইলসনের এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনাকে "পাল্টা প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দ্বিতীয় প্রবাহ ॥

"মণ্ডলঘট্ট দক্ষিণে চ হৈজলস্য চহ্যরে,
তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূ ॥"

তাম্রলিপ্ত।

আজ বিস্মৃত একটি নাম মাত্র। কলকাতা থেকে পাশকুঁড়া। পাশকুঁড়া থেকে কয়েক মাইল গেলেই তমলুক। এই তমলুকের রাস্তার দুইধারে সারি সারি আধুনিক কায়দার বাড়ি, বাজার, অফিসের কোথাও সপ্তদশ শতাব্দীর সেই বাংলার বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু—

কল্পদ্রুমে আছে তমোলিপ্তির কথা। আছে ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে তাম্রলিপ্তের অতীত গৌরবের কথা, আছে বিশ্বকোষে।

আধুনিক তমলুক বহু নামে খ্যাত ইতিহাসের পাতায়। তাম্রলিপ্তি, দামলিপ্ত; তমালিনী ইত্যাদি।

এই তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত বুঝতে হলে ভৌগোলিক অবস্থানটা জানা দরকার।

তাম্রলিপ্ত বন্দর। একদিন বাংলার পণ্য নিয়ে বাঙালী বণিক এই বন্দর থেকেই দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেত। সেদিন বাংলার নৌবহনযোগ্য বিশাল নদী গঙ্গা, সপ্তগ্রাম আমতা ইত্যাদি অতিক্রম করে তমলুকের পাদদেশ ধৌত করে মিলেছিল বঙ্গোপসাগরে। বহুদিন আগে সেই গতিপথ পরিবর্তন করেছে গঙ্গা। আজও মেদিনীপুরের পথে-প্রান্তরে খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে ভাগীরথীর সেই সুদূর অতীতের গতিপথের শুষ্ক রেখা।

তাম্রলিপ্তের অবস্থান ছিল গঙ্গা-নদীর মোহানায় পশ্চিমে আর সমুদ্রের উত্তর দিকে। সেই ধনে-জনে সমৃদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তের পরিধি ছিল একশো পঁচিশ ক্রোশ গঙ্গা আর সমুদ্র কাছে পেয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর দিনে দিনে বিপুল সমৃদ্ধিতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সেদিন তাম্রলিপ্তের বৃক্ষশোভিত রাজপথের দুই ধারে অসংখ্য বিপণি-শ্রেণী বিপুল সম্ভারে ঝলমল করতো। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বাঙালী বণিকের বাসস্থান ছিল এই তাম্রলিপ্ত। এই বাঙালী বণিকেরা স্বগৃহে বাস করতেন। গ্রীষ্ম সমাগম থেকে সুরু করে বর্ষা পর্যন্ত। যেই বর্ষার কালো মেঘ আকাশ থেকে অন্তর্হিত হলো, দক্ষিণের বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল আর শরতের সোনা রোদে ঝকমক করে উঠল দিগ্বিদিক, তখন সুরু হতো বাঙালী সওদাগরদের দূরদেশে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে সমুদ্র অভিযানের আয়োজন।

তখনো বাঙালী জমিদার, জোতদার হয়ে ওঠে নি। অন্যোপার্জিত আয় থেকে তখনো বসে খেতে শেখে নি। পরিশ্রমকুণ্ঠ, অলস, স্বপ্নবিলাসী নির্জীব একটা জাতি ছিল না বাঙালীর অতীত বংশধরেরা। সেকালের কথা ভাবতে গেলে বিচিত্র একটা ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

প্রতিটি নারী-পুরুষ পরিশ্রম করছে। শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বাঙালী সমাজ। তারা বিশাল ভয়ঙ্কর সমুদ্র দেখলে ভয় পায় না। শিউরে ওঠে না আকাশে ঘনগর্জিত মেঘ দেখলে।

প্রাচীন বাঙালীর সমুদ্রযাত্রার বিষয় নিয়ে অনেক পুঁথি আছে। একটি পুঁথিতে আছে এক ব্যবসায়ী পিতা-পুত্রের চিত্তাকর্ষক সংলাপ।

পিতা। কি কৌশলে সমুদ্রযান গঠন করতে হয় তা শ্রবণ করো—

পুত্র। বলুন পিতা। আমি আপনার মত সমুদ্রযান নির্মাণ করি—সেই যানে দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করে সাগর পারের দেশে বাণিজ্য করার বড় অভিলাষ আমার পিতা।

পিতা। শোন পুত্র, একথা কখনো ভুলিও না যে—

বেদা যো বীণাং
পদমন্তরীক্ষেণ পততাং।
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥

পুত্র। অর্থ বলুন—অনুগ্রহ করে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন।

পিতা। শ্লোকে বলছে, বরুণ দেবতা খেচরে পক্ষিগণ কোথায় আছে তা যেমন জ্ঞাত আছেন তেমনি সমুদ্রে পোত সকলের বিষয় অবগত আছেন। তুমি দেবতার ওপরে নির্ভর করবে----

তারপরে সমুদ্রযাত্রায় বহুদর্শী পিতা তাকে মহর্ষি শুনঃশেফ রচিত সমুদ্র-যান গঠনকৌশলের ইতিবৃত্ত বলতে সুরু করলেন।

বিস্মিত হতে হয় পুরাকালের ঋষিদের অর্ণবপোতের সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার সম্পদে।

শুধু ঋষি নয়, পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী নয়, সাধারণ লোকরাও সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন জানতো। একটি সুপ্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে সেদিনকার বাঙালীসমাজের অন্তরঙ্গ চিত্র :

'নানা যানপূর্ণ ভোগবিলাস ও প্রয়োজনোপোযোগী নানা প্রকার পণ্য-দ্রব্য সকল নদী ও সমুদ্রতীরে প্রেরিত হইতেছে। স্থানে স্থানে নানা দেশীয় বণিকগণ সমবেত হইয়া আদান-প্রদান সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ করিতেছে। কেহ কেহ বা বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে গমনেব উদ্যোগ করিতেছে। কেহ বা শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে। কাহারও পুত্র—কাহারও স্বামী, কাহারও পিতা—কাহারও আত্মীয়জনের দূরদেশ হইতে পুনরাগমন দেখিয়া স্বজনবর্গ মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে। গৃহে গৃহে আমোদ-প্রমোদাদি চলিতেছে। বহুদিন পরে আগত দেখিয়া স্ব-সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য, পেয় প্রস্তুত করিতেছে। চতুর্দিক উৎসাহপূর্ণ।'

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মী—মা লক্ষ্মীকে অচলা রাখতে গেলে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, যে সাধনা আর নিষ্ঠা তা সেই তাম্রলিপ্তের অতীত পুরুষদের ছিল।

আজ পাশকুঁড়া স্টেশনে নেমে তমলুকের দিকে যেতে যেতে পথের দুইধারে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তরেব দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে; সুদূরকালের বিস্মৃতির ছায়ান্ধকাবে আচ্ছন্ন প্রান্তরের ভেতরে কলহাস্যমুখর নগরীর অস্পষ্ট, ঝাপসা ছবি ফুটে উঠেছে। নগরের পথে পথে বিদেশী বণিকের দল ঘুরছে। তাদের চোখের উৎসুক দৃষ্টি বিপণির বিপুল সম্ভারের দিকে নিবদ্ধ। সেই সওদাগরদের পাশ কাটিয়ে অতি ধীরে সন্তর্পণে চলেছেন একজন শ্রমণ। মুণ্ডিত মস্তক। জ্ঞানের দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে মুখমণ্ডল।

গভীর চিন্তাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি। এই শ্রমণের সেদিনের তাম্রলিপ্তের সম্বন্ধে উক্তিটিও আপনার কানে বাজবে। 'ইহা সমুদ্রতীরের অতি সুন্দর একটি বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।'

কে এই শ্রমণ? উত্তর অত সহজ নয়। পাঠক, যেতে হবে অনেক—অনেক দূরে—খৃস্টের জন্মেরও পাঁচশত বছর আগে। এখানে এসেছিলেন মহাজ্ঞানী ভিক্ষু ফা-হিয়েন। এখানকার পথের ধুলোয় তাঁর পদরেণু মিশে রয়েছে। এইখান থেকে অর্ণবযানে করে ফা-হিয়েন রওনা হয়েছিলেন সিংহলে।

ফা-হিয়েনেব পর হুয়েন-সাং। হুয়েন-সাংও বলেছেন, 'সমুদ্রের মোহানায় এই নগবেব অবস্থান। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। হুয়েন-সাং-এর পরেও এসেছিলেন আর একজন, ইয়াং-সি— (I-Tsing) তিনি এসেছিলেন সমুদ্র পার হয়ে সুদূর চীন দেশ থেকে। তাঁর বিবরণেও আছে—This is the place for embarking for china from East India and very close to the sea. পূর্বভারতের বাণিজ্যসম্ভার রপ্তানীর কেন্দ্র এবং সমুদ্র খুব নিকটে।

মিত্রগুপ্তের রচিত 'দশকুমার চরিতে'ও আছে তাম্রলিপ্তের গৌরবের ইতিবৃত্ত। গঙ্গা থেকে দূরে নয় আর সমুদ্র খুব নিকটে ইহ তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি দি ন দিনে বেড়ে উঠেছিল। গঙ্গাবক্ষের ওপর দিয়ে সমুদ্র পাখীর মত সাদা পাল তুলে যেত সওদাগরদের অসংখ্য বজরা।

উদয়মানার শিলালিপিও বলে, তাম্রলিপ্ত গৌড়বঙ্গে বাণিজ্যকেন্দ্র। আর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে তো স্পষ্ট করেই ঘোষণা করছে।

It first emerges in authentic history as a port at which merchants and others embarked for Ceylon and far East.

ইতিহাসের পাতায় তাম্রলিপ্তের প্রথম অস্তিত্ব পাওয়া যায় বন্দর বলেই। সিংহল ও পূর্বপ্রাচ্যে এখান থেকেই যেতে হতো---।

আরও—আবও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মের অবনতির পরেও তাম্রলিপ্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

কি কি বস্তু রপ্তানী হতো? নীল তুঁত পশম এবং বঙ্গ ও উড়িষ্যার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাচীন এই বন্দর থেকে সিংহলে, ব্রহ্মদেশে পাঠানো হতো।

কিন্তু মহাকাল সর্বধ্বংসী। ধীরে ধীরে তাম্রলিপ্ত তার গৌরব হারিয়ে ফেলল। দূরপ্রাচ্যগামী বন্দর হিসেবে তার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগে। যে বিশাল গঙ্গা তাম্রলিপ্তকে ধৌত করে সমুদ্রে পড়তো—সেই গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করলো। সমুদ্রের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত সংযোগশূন্য হয়ে গেল।

গঙ্গা সরে গেলেও তার গতিপথের ওপরে যে খাল ছিল, সেই খালও অনেক যুগ ধরে নৌবাহন যোগ্য ছিল। তার অস্তিত্ব ছিল ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত।---

ধীরে ধীরে সেই জলপথের গর্ভে বালি জমেছে; ভরাট হয়ে গেছে সেই একদা বিখ্যাত নদী। আর তাম্রলিপ্তের বুক জুড়ে নেমে এসেছে বিস্মৃতির অমানিশা। (ক্রমশঃ)

রৌদ্র ছায়ায়

চিত্রা সেনগুপ্ত

সরোজিনীর নাকের ডগায় চিঠিখানা ছুড়ে দিল অশোক,—'এই নাও, নীলুর বিয়ের চিঠি এসেছে, এখন যা ভাল বোঝ কর। আমার অফিসের দেরি হয়ে গেল, আমি চললাম।'

আর দাঁড়াল না অশোক। অফিসে বেরোবার মুখে নেহাৎ জরুরী চিঠিটা এসে পড়াতে আগ্রহ নিয়ে পড়তে হয়েছিল চিঠিটা। ক'দিনই অধীর আগ্রহ নিয়ে কেটেছে সকলের। পাত্রপক্ষ কি জানান না জানান, তারই ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। কিন্তু যা লিখেছেন তাঁরা এতটা কল্পনাও করতে পারে নি কেউ। অশোকের বিরক্ত হবারই কথা। অগত্যা ফিরে এসে চিঠিটা দিয়ে যেতে হল তাকে।

রান্নাঘরে এ সময়টা সরোজিনীকে ব্যস্ত থাকতে হয় রোজই। ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল-কলেজ যাবার সময় খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করতে হয় তাঁকে : অবশ্য অশোকের চিঠিটা ছুড়ে দেবার ভঙ্গি দেখেই চিঠির মর্মার্থ উপলব্ধি করে নিয়েছিলেন সরোজিনী। তবু অদম্য আগ্রহকে সংযত করে ছেলে-মেয়েদের সামনে চিঠি না পড়ে ধৈর্য ধরে বসে রইলেন তিনি। তারপর সকলে বেরিয়ে গেলে চিঠিটা পড়তে বসলেন।

এটা সরাসরি পাত্রপক্ষের লেখা নয়। তাঁর মেজ মেয়ে অণিমাই লিখেছে। কারণ, এবারের সম্বন্ধটা সেই করেছে। অণিমা লিখেছে—

'মা,

আমি আগে জানলে এ বিয়ের সম্বন্ধ আনতাম না। যাই হোক আপাতত যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে কোন উৎসাহও খুঁজে পাচ্ছি না। তবে জেনে রেখো, নীলুকে ওঁদের অপছন্দ হয় নি। ওঁরা নিজে থেকেই আরেকটা প্রস্তাব দিয়েছেন। ছেলের নাকি খুব ইচ্ছে—বিয়েটা নীলুর সঙ্গে না হয়ে যদি বিভার সঙ্গে হয়, তো খুব ভাল হয়। জানি না ওঁদের এ ইচ্ছের কি কারণ। বলেছেন—তোমার সম্মতি পেলে ওঁরা পাকা কথা বলতে রাজী আছেন। জানি না, এ সম্বন্ধে তোমার কি মত। তবে আমি আমার নিজের মত ওদের জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা নীলুর বিয়ের জন্যেই ব্যস্ত রয়েছি। বিভার বিয়ের চিন্তা আপাতত আমাদের না করলেও চলবে। তুমি ভেবে দেখো—কথাটা ঠিক কি না। বিভা চাকরি করে, দেখতেও ও ভাল। তাছাড়া ওর বিয়ের বয়স চলেও যাচ্ছে না। আজকাল তো এই বয়সে মেয়েদের হামেশাই বিয়ে হচ্ছে। আরেকটা কথা। বিভাকে মানুষ করার ভার তোমাদের ছিল—ও এখন লেখা-পড়া শিখে রোজগার করছে, তাও ওর বিয়ের চিন্তা যদি তোমাকেই করতে হয়, তো তুমি পেরে উঠবে কেন? কিন্তু নীলুর কথা আলাদা। এখন থেকে চেষ্টা না করলে পরে মুস্কিলে পড়তে হবে। যাই হোক তুমি যা ভাল বোঝ, তাড়াতাড়ি জানিও। আমি ওদের সে কথা জানিয়ে দিতে পারব।'

চিঠিখানা পড়া শেষ করে বন্ধ করে আলমারির মধ্যে তুলে রাখলেন সরোজিনী। উদ্দেশ্য চিঠিটা যেন বিভার নজরে না পড়ে। তাহলে হয়তো কি

মনে করবে ও, কে জানে। অন্তত তাঁর মেয়েদের চোখে বিভার স্থান আর অবস্থার পার্থক্যটা ওর মনের মধ্যে নিঃসন্দেহে যে ঝড় তুলবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই সরোজিনীর। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এ অবস্থায় কী করবেন তিনি। সত্যি কথা বলতে কি—তিনি তো নিজেও কোনদিন তাঁর সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাইরে বিভার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন নি।

তাঁর নিজের বড় মেয়ে অসীমার বিয়ে দিয়েছেন বছর সাতেক আগে। তখন থেকেই চাকরি করছে বিভা। বছর পাঁচেক আগে বিয়ে দিয়েছেন অণিমার। তারপর থেকে নীলিমার বিয়ের চেষ্টা চলছে। অথচ বিভা সকলের বড়, বয়স প্রায় সাতাশ। কিন্তু একদিনও কি তার কথা একটুও ভেবেছেন সরোজিনী। নিজের অজান্তে মনের মধ্যে এই আপন-পর ভেদাভেদের বীজ যদি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে গড়ে উঠে থাকে তো তার মূলেও কি তাঁর নিজের কিছু হাত নেই? হঠাৎ এত বড় একটি আবিষ্কারের দুস্তর অস্বস্তি যেন চঞ্চল করে তুলল সরোজিনীকে। নানা দিক ভেবেও কূল পান না—তিনি অণিমার চিঠির কি উত্তর দেবেন। অথচ নিজের মেয়েদের মত বিভা হয়তো আজও সরোজিনীর ওপর তার ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। যদি তাকে এতদিনেও বুঝিয়ে দিতেন তিনি যে, বিভার ভবিষ্যতের দায়িত্ব তাঁর নয়—তা হলে বোধহয় নিজের বিবেকের কাছে সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন তিনি। কিন্তু তা না করে, স্নেহ-ভালবাসার আবরণ দিয়ে ভুলিয়ে রেখে কি সরোজিনী প্রতিদিন ঠকিয়ে যান নি বিভাকে, মাতৃ-পিতৃহীনা ভাসুর-ঝি বিভা তো তাঁরই মেয়ের মত।

একবার ঠিক করলেন—এ চিঠির উত্তর দেবার আগে আজই বিভার সঙ্গে একবার পরামর্শ করবেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন—যদি আজও তার ভাল-মন্দের ভার সরোজিনীর ওপর ছেড়ে দেবার সুযোগ নেয় বিভা—তা হলে কি করবেন তিনি! নিজের মেয়ের বিয়ের আগে বিভার বিয়ের কথা ভাবা যে তাঁর অবচেতন মনের পক্ষেও এত কষ্টকর, তা এমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন নি তিনি। তার চেয়ে অশোকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কি সরোজিনী। বয়সে অবশ্য সে বিভার চেয়ে ছোট, তবুও সেই তো এ সংসারের অভিভাবক। তাছাড়া নেহাৎ অবিবেচকও নয় অশোক।

সেইদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অশোকের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন সরোজিনী। বসে বসে বই পড়ছিল অশোক। মাকে এমন আকস্মিকভাবে আসতে দেখে তার বুঝতে বাকি রইল না যে, অণিমার চিঠির বিষয়ে কিছু বলতে এসেছেন সরোজিনী। তাই নিজের থেকেই জিজ্ঞাসা করল অশোক—'কিছু ঠিক করলে? কি উত্তর দেবে?'

সরোজিনী তক্তপোষে পাতা বিছানার ওপর বসে পড়ে বললেন, 'এমন সমস্যায় পড়ব তা তো ভাবি নি। এখন তুই-ই বল কি জবাব দেওয়া যায়—'

কথাটা ভাল করে শেষ করবার সুযোগ দেয় না অশোক। বিরক্তিতে অধৈর্য হয়ে ওঠে সে। 'এতে চিন্তার কি আছে বুঝলাম না তো। ওরা তো পরিষ্কার জানিয়েছে—নীলুকে পছন্দ নয়। আর দিদির সঙ্গে বিয়েতে ওদের আগ্রহ আছে। এর মধ্যে না বোঝার তো কিছু নেই। আসলে সমস্যাটা তোমার নিজের। নীলুর জন্যে তুমি যতটা চিন্তিত, দিদির জন্যে ততটা নও। কিন্তু দিদির বিয়ে দেওয়াও তো তোমার কর্তব্য, সে কথাটাও চিন্তা কর।'

অশোক থামলো। কিন্তু সরোজিনী যেন নতুন করে জ্বলে উঠলেন। ঐ এক দোষ অশোকের। সবেতেই একটা অধৈর্য ভাব। ও যা বোঝে সেটা স্পষ্ট করে না বলে যেন থাকতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ছেলের ওপর বিরক্ত হন সরোজিনী। আবার ওর অকাট্য যুক্তির কাছে নিজেকে এমন অসহায় বোধ করেন যে, কোনক্রমেই নিজের বিবেচনার মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন না তিনি। তবুও এমন নিষ্করুণভাবে তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি আয়নায় প্রতিফলিত হতে দেখে তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল এবার, 'যদি তাই ভাবি তাতে দোষের কি দেখলি। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি। ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছি—এর বেশি আর করবার সামর্থ্য কোথায় আমার, সেটা ভেবে দ্যাখ—'

'বুঝলাম', সরোজিনীর কথাটা যেন লুফে নেয় অশোক। হাতের বইটা বন্ধ করে এবার ঘুরে বসে মা'র দিকে, 'কিন্তু দিদিরও তো বিয়ে দেওয়া দরকার। আর নিজে না পার তো অন্তত ওকে নিজেকে নিজের পথে চলবার স্বাধীনতা দাও। কোনটা না পারলে চলবে কী করে?'

সরোজিনী এ কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ যে না বুঝতে পারেন, তা নয়। আরেকবার তিনি বড় মেয়ের বিয়ের পরই বড় জামাইকে বলেছিলেন অণিমার বিয়ের জন্যে একটু সচেষ্ট হতে। সেবারও এই রকম একটা বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল সরোজিনীকে। অসীমার বর হেমন্ত জানিয়েছিল যে, তার এক মামাত ভাই-এর জন্যে বিয়ের চেষ্টা চলছে। তবে তাঁরা একটু লেখাপড়া জানা সুশ্রী মেয়ে চান। বড় জামাই ভদ্রভাবে সেবার মূল সমস্যার আবর্তে সরোজিনীকে ঠেলে না দিয়ে বরং কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বাঁচিয়েছিল তাঁকে। অর্থাৎ অণিমার বদলে যদি বিভার বিয়েতে রাজী থাকতেন তো সেবারই হয়ে যেত বিভার বিয়ে। কিন্তু অশোক তখন লেখাপড়া করছে। তাই সেদিন ওর মতামত জানতে এসে এমন অপদস্থ হতে হয় নি সরোজিনীকে। আরও একটা সমস্যা ছিল তখন। স্বামীর সঞ্চিত অর্থের ওপর বিভার রোজগার একটা পরম নির্ভরতা এনে দিয়েছিল

তাঁর মনে। তাই সেদিন সভয়ে পেছু হটে গিয়েছিলেন সরোজিনী। কিন্তু আজও কি সে নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তিনি? অন্তত আজ এই মুহূর্তে অশোকের বক্তব্য শোনার পরও কি তিনি নিজের মনের লেখা পড়তে পারছেন না? কিন্তু এও তো চান নি সরোজিনী। নিজের মেয়েদের মত বিভার ওপর তাঁর ভালবাসার মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি এর আগে বুঝতে পারেন নি।

ফিরে এসেছিলেন সরোজিনী। কিন্তু কোন উত্তরও দিতে পারেন নি অশোকের কথার। তাই প্রথমটা রেগে উঠেছিলেন ছেলের ওপর। নিজের ঘরে এসেও সেই অস্বস্তির হাত এড়াতে পারেন নি তিনি। উঠে বসে পায়চারি করেও যেন নিজেকে শান্ত করতে পারছিলেন না। তাই সোজা উঠে এলেন ছাতে। অশোকের কথার রেশটা ততক্ষণে যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। বরং আজ এই প্রথম অনুভব করলেন যে, এরও প্রয়োজন ছিল তাঁর জীবনে। নিজের অপরাধের সমালোচনা তাঁকে যে এমন পরোক্ষে সান্ত্বনার প্রলেপ দেবে এর আগে ভাবতে পারতেন না সরোজিনী। সে অপরাধ আর কেউ না জানুক, অন্তত তিনি তো জানেন। ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছেন সে ঘটনা এমন কি বিভাকেও বিভ্রান্ত করে তুলেছিলেন, যাতে না সে তাঁকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু, তিনি তো জানেন, সেটা কত বড় অন্যায়। ভেবেছিলেন সে ভুল একদিন শুধরে নিয়ে সুদসমেত ফিরিয়ে দেবেন বিভাকে। কিন্তু আজ এতদিন পর সরোজিনীর মনে হচ্ছে ভুল—ভুলই। সময়ে ভুলের সংশোধন না করলে সেটা চিরদিনই আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়।

বড় জামাই হেমন্তর সঙ্গে অসীমার বিয়ের ব্যাপারটা তাঁর মনে আজও একটা নিদারুণ কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে বাড়িতে শিক্ষক রেখেছিলেন সরোজিনী। বিভা তখনই স্কুলের কাজ নিয়েছে। অতএব, টানাটানির সংসারে যে বাড়তি আয়টা হাতে এল, সেটার যতটুকু সদ্ব্যবহার হয়—সে চেষ্টা বরাবরই ছিল সরোজিনীর। তবুও গায়ে লাগত টাকাটা প্রতিমাসেই যখন একদিন বার করে তুলে দিতে হত মাস্টারের হাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সরোজিনী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই স্বল্প টাকার পরিবর্তে তিনি মোটা রকম একটা লাভই করতে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত। অসীমাকে কেন্দ্র করে হেমন্তর শিক্ষকতায় উৎসাহ সরোজিনীর মনে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। অসীমার ব্যস্ততা, চঞ্চলতা আর অহেতুক খুশির বন্যায় তাঁর আশঙ্কার বাঁধ একটু একটু করে ভেঙে পড়ছিল। প্রথমটা কিছুটা সঙ্কোচ থাকলেও পরে বরং প্রশ্রয়ই দিতেন সরোজিনী। তন্ময় হয়ে গল্প করত দুজনে। দেখেও না দেখার ভাণ করতেন তিনি। বরং ঘর থেকে আর সকলকে কৌশলে সরিয়ে নিতেন। বুঝতেন—ওদের ঘনিষ্ঠতা আরো দূরে এগিয়ে চলেছে। আর অধীর প্রতীক্ষায় থাকতেন প্রতিদিন যে কোন মুহূর্তে বুঝি এসে পৌঁছয় ওদের বিয়ের প্রস্তাব। হেমন্ত এতদিনে যেন বাড়ির ছেলের মত হয়ে উঠেছে। এখন বাইরের ঘর ছেড়ে ভেতরের মহলেও তার আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে। কখনো-সখনো রান্নাঘরে ঢুকেই বসে যেত গল্প করতে। অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য করত সকলকে। হয়তো হেমন্ত এ সুযোগেই বিভার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

তারপর বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছিলেন অসীমার প্রতি হেমন্তর মনোযোগ যেন দিন দিন কমে আসছিল। কারণে অকারণে ভেতরে চলে আসত হেমন্ত। গল্প করত সরোজিনীর সংগে, অণিমা আর বিভার সংগে। প্রথম প্রথম অতটা বুঝতেন না তিনি। কেবল তাঁর নজরে পড়ত অসীমা তখনও সেই পড়ার ঘরে একলা বসে আছে। ভাবতেন হয়তো মান-অভিমানের পালা চলছে। আবার কখনও হঠাৎ অসীমা নিজেই এসে উপস্থিত হত। পড়ার কোন একটা ছুতো করে ঠিক সরিয়ে নিয়ে যেত হেমন্তকে। নিশ্চিন্ত হতেন সরোজিনী। কিন্তু আবার এক সময় যেন সব গুলিয়ে উঠত সরোজিনীর কাছে। কেমন দুর্বোধ্য ঠেকত সব কিছু। অসীমা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। কেমন একটা হতাশার ছায়া পড়ত ওর মুখে। সরোজিনীর মনে হত বেচারী যেন জীবন-যুদ্ধে হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় করে চলেছে নিজেকে। উদ্বিগ্ন হতেন সরোজিনী। কিন্তু কারণটা সঠিক অনুমান করতে পারতেন না তিনি।

ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠল যখন হেমন্ত হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে দূরে চলে গেল

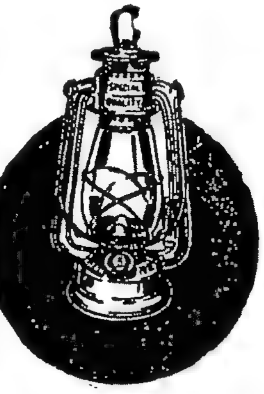
কিম্যান
লন্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৬,৩নং চিনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৩৮০

একটা ভাল চাকরি নিয়ে। বাধা দিতে পারলেন না সরোজিনী। কারণ তাঁর বাড়ির মাস্টারী করে কারো ভবিষ্যৎ তৈরি হতে পারে না। আর সে অধিকারও তাঁর ছিল না। বরং যার সে অধিকার ছিল সে-ই আটকে রাখতে পারল না হেমন্তকে। তবু প্রথম প্রথম সকলের সংগে একই খামে অসীমার নামেও চিঠি আসত। মামুলি চিঠি সে-সব। সরোজিনীর মন থেকে একটু একটু করে আশা যেন নিভে যাচ্ছিল ততদিনে।

কিন্তু আর একটা জিনিস তিনি এতদিন লক্ষ্য করেন নি। সেটা হল বিভার পরিবর্তন, অবশ্য সাবধানী সংযত স্বভাব ছিল বিভার। তবু যেন ইদানীং কেমন মনে হত সরোজিনীর। হাল্কা একটা খুশির আমেজে ডুবে থাকত বিভা। নিত্য নূতন সাজের পরিবর্তনও ঘটেছিল বিভার বৈচিত্র্যহীন জীবনে। সরোজিনীর অনুসন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি বিভা। শেষ পর্যন্ত একদিন আবিষ্কার করলেন সরোজিনী। স্কুলে বেরিয়ে গিয়েছিল বিভা। ছেলে-মেয়েরাও অনুপস্থিত। হঠাৎ একটা গর্হিত নেশায় যেন পেয়ে বসল সরোজিনীকে। জীবনে যা কোনদিন চিন্তাও করতে পারেন নি, তিনি হঠাৎ সেদিন তাই করে বসলেন।

অতি সন্তর্পণে বিভার ঘরে ঢুকে ওর টিনের পুরনো ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললেন সরোজিনী। কোথাও বেরুবার আগে অনেকদিনের পুরনো অভ্যেস বিভার চাবিটা একটা বড় আলমারির মাথায় গুঁজে রেখে যাওয়া। এর বেশি সাবধান হওয়ার কোন দরকার হয় নি ওর। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে তল্লাসী চালিয়ে বার করতে পারলেন না কিছু। নিজের চোখকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সরোজিনী। এমন আশাভংগ হতে হবে ভাবতে পারেন নি তিনি। নিমেষে একটা শূন্যতা যেন গ্রাস করে ফেলল সরোজিনীকে। ছিঃ! ছিঃ! একি করে বসলেন তিনি! কি করে এমন একটা নীচতা তাঁর হৃদয়ে স্থান পেল ভেবে অনুশোচনায় জ্বলতে লাগলেন সরোজিনী।

কিন্তু আরও একটা জায়গায় কঠিন আঘাত খেলেন তিনি। তবু যদি বিভাকে কেন্দ্র করেও হেমন্তের এই আকস্মিক পরিবর্তনের হদিস খুঁজে পেতেন তিনি—হয়তো তাহলে এমন দিশাহারা হয়ে পড়তেন না তিনি। ভেবে পেলেন না সরোজিনী, তাঁর এত সাধ এত আশা সব মিথ্যে হয়ে যাবে এতদিনে। যদি তাঁর মিথ্যে অনুমানই সত্য হত, বিভার জন্যে যদি অসীমাকেই হেমন্তর মায়া কাটাতে হত তবুও তাতে তৃপ্তি পেতেন সরোজিনী। কারণ বিভাও তো তাঁর মেয়ের মত। কে জিতল আর কে হারল; কোন সম্পর্ক নেই তাঁর সংগে সরোজিনীর। কারণ ওদের দুয়ের মধ্যে তো পার্থক্য নেই তাঁর কাছে। নিশ্চয়ই খুশি হতেন সরোজিনী।

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! একদিন সত্যি সত্যিই সে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল সরোজিনীকে। নিজের কাছে নিজের সেদিনের অমার্জনীয় অপরাধকে যে স্নেহ মায়া আর মমতার অলীক প্রলেপ দিয়ে মহিমান্বিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি, আপন পর ভেদাভেদের তুচ্ছতাকে নস্যাৎ করে ফেলেছিলেন সেদিন সেটা হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন, যেদিন হঠাৎ হেমন্তর চিঠিতে সেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হল সরোজিনীকে। দুপুরে একাই থাকেন বাড়িতে। অতএব তাঁকেই লেখা হেমন্তর চিঠির মর্মার্থ কারুর জানার কথা নয়। বিশেষত হেমন্তর বিশেষ অনুরোধ ছিল বিভার সংগে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব যেন তাঁর আর হেমন্তর মধ্যেই আপাতত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সেদিনও পারেন নি সরোজিনী নিজের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা রক্ষা করতে। তাই কৌশলে সে দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হয়তো বা আজ একটু আগে শোনা অশোকের অভিযোগটাই ঠিক, সমস্যাটা তাঁরই। না হলে যে দায়িত্ব তাঁরই সে সম্পর্কে বিভা আর অসীমার মধ্যে ফয়সালার ঘৃণ্য রাস্তাটাই বা তিনি বেছে নিলেন কেন? চিঠিটা পড়ে ছিঁড়ে না ফেলে এমনভাবে রেখেছিলেন যাতে সেটা সহজেই অসীমার চোখে পড়ে। হলও তাই। সত্যিই তাঁর মনের উদ্দেশ্য এমনভাবে সফল হবে তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি।

অসীমা যেন আকাশ থেকে পড়ল। এই বিস্ময়কর আবিষ্কারে, পরাজিত নারীত্বের অবমাননায়, ঈর্ষার লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চেয়েছিল বিভাকে। অণিমাও দিদির হয়ে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল। বিভার বিপক্ষে দুজনের সম্মিলিত শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল বিভা। অব্যর্থ শরসন্ধান ওদের, অমোঘ শক্তিশেল হেনেছিল দুজনে। অতি নরম জায়গায় আঘাত পড়েছিল বিভার। সে আশ্রিতা, পালিতা নারী। অকৃতজ্ঞতা তার অমার্জনীয় অপরাধ। জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তার স্থান ওদের অনেক পেছনে।

সরোজিনীর শ্যেনদৃষ্টিতে এড়িয়ে যায় নি কিছুই। নেপথ্যের এই যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনাই হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন তিনি। বিভার মত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সরোজিনীও। এতটা তিনিও আশা করেন নি। সামনে এসে মধ্যস্থতাও করতে পারতেন তিনি। কিন্তু বরাবরই নিরপেক্ষ থাকতে চান সরোজিনী। বিশেষত এ সমস্যা ওদের—তাঁর নয়। যুদ্ধ শেষে তিনি কেবল জয়পরাজয়ের ঘোষণা করেই খালাস।

অনেকদিন চিঠির কোন জবাব না পেয়ে চিন্তিত হয়ে ছুটে এসেছিল হেমন্ত। তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। চিঠি পান নি সরোজিনী। অতএব সামনা-সামনি কথা বলে তাড়াতাড়ি

ব্যবস্থা করে ফেলাই ভাল। কিন্তু ভাগ্য ভাল সরোজিনীর। তাঁকে মতামতের কোন সমস্যায় পড়তে হয় নি সেবারও। সে দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল বিভা নিজেই। নিজের অপরিসীম কৃতজ্ঞতার চরম মূল্য দিয়েছিল বিভা। শুধু নিজেকে বঞ্চিত করেই নয়, হেমন্ত অসীমাকেই বিয়ে করতে রাজিও হয়েছিল।

কিন্তু কী করে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল, অসীমা অণিমারা না বুঝলেও সরোজিনীর জ্ঞানের অগোচরে থাকে নি। একটি নারীকে শুধু ভালবাসাই নয়, তার প্রতি কত মমত্ব-বোধ আর অপরিসীম মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করলে তবে কোন পুরুষ সেই নারীর এই অন্যায় আব্দার মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে পারে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সরোজিনী। এমন কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আষ্টেপিষ্টে তাঁকে বেঁধে ফেলেছে বিভা যে সে বাঁধনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন সরোজিনী। বিভার দিকে তাকিয়ে অনেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তিনি। নিজেকে বড় ছোট আর অসহায় মনে হত সরোজিনীর। অসহ্য একটা যন্ত্রণায় টনটন করে উঠত তাঁর বুক। ভাবতেন এত বড় অপরাধের জন্যে তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন সেই দিনই যেদিন সুদে-আসলে এ ঋণ শোধ করে দিতে পারবেন বিভাকে।

তাই হেমন্ত যেদিন তাঁর অনুরোধের সংগে সংগে বিভার সংগে তার মামাতো ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল সেদিন সে সুযোগ আর একবার এসেছিল সরোজিনীর জীবনে। কিন্তু কেন পেছিয়ে গেলেন সে সুযোগ এড়িয়ে, সে কথা আর কেউ না জানুক তিনি ভাল করে জানেন।

হেমন্তর জীবনে অসীমা তার নিত্যদিনের সঙ্গিনী মাত্র—আর বিভা তার উন্মুক্ত নীল দিগন্তের কোলে ভেসে বেড়ানো মুক্ত বিহঙ্গ। হেমন্ত যে সেদিকে তখনো মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছে বুঝতেন সরোজিনী। কারণ বিভাকে যে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত হেমন্ত সেটা না বোঝার কিছু নেই। হয়তো সেই জন্যেই কাছাকাছি ধরে রাখার একটা শেষ চেষ্টা করেছিল হেমন্ত। কিন্তু মনের দুর্বলতার জন্যে হয়তো সে প্রস্তাবটাকে জোর দিয়ে বাস্তবে সফল করে তুলতে চেষ্টা করে নি হেমন্ত। আর একটু জোর করলেই রাজি হতে সুবিধে হত সরোজিনীর। কিন্তু তা না করে সে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল তাঁরই ওপর। অতএব সব ভুলে সমস্যার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করতে হয়েছিল অবস্থাটা। এই বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে ছুটে এসেছিল অসীমা। তিনি দেখেছেন মেয়ের মুখে ঝড়ের সংকেত, দুর্যোগের কালো ছায়া। যেন এ বিয়েতে তিনি রাজি না হন। যে বিপদকে একবার অসীমা পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে সে জায়গায় না হোক, তার অত্যন্ত কাছাকাছি যেন বিভা, তার জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ না পায়।

অসীমার মনের সংকীর্ণতার কথা ভেবে বিরক্ত হয়েছিলেন সরোজিনী। কিন্তু কোন নারীর পক্ষে এই অসহনীয় অবস্থাটার কথা না ভেবে পারা যায় কি? তাই রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সরোজিনী। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ ভাবতে না পারার মত কোন জটিল ব্যাপার এটা নয়, তবু দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সরোজিনীর।

যা হোক করে সেবার না হয় এড়িয়ে গিয়েছিলেন সরোজিনী, কিন্তু এবার কী করবেন তিনি। এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করা কী উচিত হবে তাঁর। আর একবার অণিমার চিঠির ভাষাগুলো মনে মনে আউড়ে গেলেন, ভেবে দেখলেন, ভাল মন্দর দিকগুলো বিচার করার চেষ্টা করলেন। না, এতে অমত করার কী কারণ থাকতে পারে ভেবে পেলেন না সরোজিনী। আরো একটা কথা, অণিমার লেখার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলো যেন ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে তাঁর কাছে—আগে জানলে এ বিষয়ে এগোতাম না। কিন্তু কেন? পছন্দ অপছন্দ ব্যক্তিগত বিষয়, পাত্রপক্ষের সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে। নীলুকে অপছন্দ হলে আর বিভাকে পছন্দ হলে সেটা কোন দূষণীয় ব্যাপার হয়ে ওঠে না। তবু সেখানে এত তাড়াতাড়ি অণিমার নিজস্ব মতামত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল ভেবে পান না সরোজিনী। তাছাড়া আরও একটা দিক আছে, সেটাও না ভেবে পারেন না তিনি। যদি বিভার সংগে বিয়েতে অমত জানিয়ে নীলুর সঙ্গে বিয়ের কথাই আবার লেখেন—তখন যদি সোজাসুজি তাঁরা প্রত্যাখান করেন সে প্রস্তাব? সব বুঝে শুনেও নিশ্চিন্ত পরাজয় মেনে নেবারই বা কি যুক্তি থাকতে পারে।

আবার সেই অস্বস্তি পেয়ে বসে তাঁকে। নতুন করে সেই বিহ্বলতা দেখা দেয় সরোজিনীর মনে। নিদারুণ চঞ্চলতায় অধৈর্য হয়ে মাঝ রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েও কোন কূল খুঁজে পান না তিনি। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসেন নীচে, নিজের বিছানায়।

তবুও এতদিন পর যেন হঠাৎ একটা দৃঢ়তা খুঁজে পেলেন নিজের মনের মধ্যে। সারারাত মনের সংগে বোঝা-পড়া করে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন এবার। না, আর কোন দ্বিধা নয়। এতদিন কৌশলে যে পরাজয়কে ফাঁকি দিতে পেরেছেন সরোজিনী, এড়িয়ে যেতে পেরেছেন নিজের দায়িত্ব, সেটা চিরদিনের মত এবার নষ্ট করে দেবেন সরোজিনী।

সকালে উঠেই একান্তে বিভাকে ডেকে মত করিয়ে নিলেন তিনি। প্রথমটা একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল বিভা। লজ্জার রঙিন আভা চকিত ঝলকে ফুটে ওঠার আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল নিমেষে। তবু তা চোখ এড়ায় নি সরোজিনীর। খুশিতে ভরে উঠল তাঁর মন। চিঠির উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিলেন ডাকে।

রাত্রিতে আবার এসে ঢুকলেন অশোকের ঘরে। আগের রাত্রির মত অপদস্থ হবার ভয় নেই ছেলের কাছে, বিবেকের কশাঘাতের আর কোন যন্ত্রণাও নেই মনে। আপন পর ভেদাভেদের সংকীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন সরোজিনী। অতএব গতকালের পরাজয়েরও সমুচিত প্রত্যুত্তরও দিয়ে যাবেন তিনি।

অশোককে অবাক করে দিয়ে সরোজিনী বললেন, 'তাই ঠিক করলাম রে, ভেবে দেখলাম বিভার বিয়েটা আর দেরি করা উচিত হবে না। তাই সেই রকমই লিখে দিলাম —'

কথাটা সবটা ভাল করে শেষ করতে পারলেন না সরোজিনী। হঠাৎ অশোকের ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি লক্ষ্য করে থমকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—'কী হল হাসছিস যে বড়, তুই কী ভেবেছিলি আমায় না বললে বুঝি বিচার বুদ্ধিটুকুও আমার হবে না?'

'না, না,' অশোক সপ্রতিভ জবাব দেবার চেষ্টা করে, 'ভাবছি যেটা আজ থেকে দু'বছর আগে এক কথায় করা যেত, সেটা মিথ্যে এতদিন দেরি করে সেই সম্মতি দিলে। তাই বলছিলাম, কি যে তোমার মন, কখন যে কী হয় তোমার আমি তো এখনও বুঝতে পারলাম না, এই আর কি —।'

'তার মানে?' বিস্মিত চোখ তুলে প্রশ্ন করেন সরোজিনী—'দু'বছর আগে বলতে তুই কী বলতে চাইছিস বুঝলাম না তো?'

অশোক মা'র দিকে এগিয়ে দিল একটা চিঠি, 'নাও পড়ে দেখ, আজ অফিসে গিয়ে পেলাম, হেমন্তদার চিঠি। সেই ওর মামাত ভাইয়ের বিয়ের কথা। অণু যা ঝগড়াটে, কারো তো আর অজানা নয়। তাই পরিচয়টা গোপন রেখেই হয়তো ওকে পাত্রের সন্ধান দিয়েছিল। তবে দোহাই তোমার, এখন যেন আবার মেয়েদের কাছে ঢাক পিটিও না। অনেক করে লিখেছে হেমন্তদা—যেন তোমাকেও এখন কিছু না বলি। যাই হোক ভালই করেছে, আমিও সেই রকম লিখে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থেক।'

অপলকদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন সরোজিনী। যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। অপরিসীম বিস্ময় আর দিগ-দিগন্তহীন একটা অসীম শূন্যতা যেন গ্রাস করে ফেলল সরোজিনীকে।

কথা শেষ করে প্রাণখোলা হাসিতে ভেঙে পড়ে অশোক। কিন্তু নিমেষে চুপসে যান সরোজিনী। তাঁর দৃষ্টিতে একটা অসহায় বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। ভাবেন, তাঁর হৃদয়ের প্রোজ্জ্বল গৌরবের একটা দিক এক ফুৎকারে দপ করে এমন নিভিয়ে দেবে হেমন্ত, ভাবতে পারেন নি সরোজিনী। ভেবে পান না তিনি যে-দিকটা ভেবে বার বার আশংকিত হৃদয়ে সভয়ে পেছিয়ে থেকেছেন এতদিন; শুধু তাই নয় একটু আগেও নিজের মহত্ত্বের কথা ভেবে পুলকিত হয়েছেন সরোজিনী, আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছে যে তা শুধু মিথ্যেই নয়, সুরভিত কুসুমের সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার কাঁটাগুলো এক সংগেই স্বহস্তে গেঁথে ফেলেছেন তিনি।

আর ভাবতে পারেন না সরোজিনী। একবার ভাবেন, তবু এই ভাল। যা করেছেন সেটাও তো ভাল ভেবেই করেছেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় বৈকি, তিনি অসীমাকে কী কৈফিয়ৎ দেবেন। না—সব খুলে বললেও বিশ্বাস করবে না সে। ভয় হয় সরোজিনীর। হ্যাঁ ঠিক তাই। যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন হাসছে অসীমা, অপরিসীম কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়তে চাইছে অসীমা, ঠিক অশোকের মতই হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

সভয়ে কেঁপে ওঠেন সরোজিনী। সব গুলিয়ে ফেলেন আবার। একাকার করে তোলেন পৃথক অস্তিত্বগুলো। মুখটা অশোকের না অসীমার ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না অনেকক্ষণ। হাসিটাও ঠিক চিনে উঠতে পারেন না সরোজিনী। এ কী শুধু কৌতুকের হাসি। কিম্বা হয়তো এতদিনে প্রবঞ্চিত হয়েছেন তিনি দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে তাঁরই আপন সন্তান।

আর স্থির থাকতে পারেন না সরোজিনী। উঠে পড়েন এবার। তারপর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আবার স্বাভাবিক করে তোলবার চেষ্টা করেন নিজেকে

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতি তিমিরমতিঘোরম্।

শ্রেষ্ঠাংশে
উত্তর ব্যানার্জী
অসিতবরণ
শীলা পাল
কেতকী দত্ত
রেণুকা রায়
অপর্ণা দেবী
শ্যাম লাহা
রমা দাস
প্রতিমা চক্রবর্তী
এবং নবাগতা
সঞ্চিতা ব্যানার্জী
ও আরো অনেকে

আরোরার সঙ্গীত-বহুল ভক্তি নিবেদন
রাধাকৃষ্ণ
পরিচালনা: অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত: রবীন ঘোষ
কণ্ঠসঙ্গীত: ধনঞ্জয়-মানবেন্দ্র-সতীনাথ-প্রতিমা
পান্নালাল-উৎপলা-গায়ত্রী ও মাধুরী

শুভমুক্তি ১৭ই জুলাই
শ্রী - প্রাচী - পদ্মশ্রী
রূপায়ণ - পূর্বাশা ও অন্যত্র

● ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐতিহাসিক বাসভবনের সম্মুখবর্তী ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের দৃশ্য।

ওয়েলিংটন অঞ্চলের নানা-কালের চিত্রাঞ্জলি

পশ্চিম-বাহিনী পরিখা উত্তরে; দক্ষিণে কূর্ম-প্রতিম ধর্মরাজের ধাম—যার চতুরঙ্গনে শরণ পেয়েছে তাঁর ভক্তবৃন্দের বসতি; আর পূর্বে মূল পরিখার ধনুকবন্দী বিস্তার এবং পশ্চিমে কসাইটোলা—যার অঙ্গোৎকীর্ণ তীর্থ-সরণীর যবনিকা পাত ঘটেছে দূর-উত্তর থেকে দক্ষিণের কালীঘাটে। মধ্যে নাতি-বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত বনানী। কোনো সাযুজ্য নেই, কৃত্রিম প্রসাধনের কোনো আড়ম্বর নেই তার বিস্তারে। অনেক যুগ—অনেক বসন্তে সে অনাদৃতা। তবু ডালে ডালে তার ফুল ফোটে; আর সৌরভের কারণ পান ক'রে কখনো মদির, কখনো মাতাল হয়ে ওঠে হাওয়া। হয়তো তারই শৃঙ্গারের উৎপীড়নে ভালোবাসা উচাটন হয়ে ওঠে অনাদৃতার মনেও। তাই তখন সে মুখর হয়ে ওঠে পাখির গলায়, প্রখর হয়ে ওঠে হাওয়ার কোলে হেলান দিয়ে। দেখতে দেখতে, এভাবেই সে বয়সিনী হয়ে অতিক্রম করে অনেক ক'টি যুগ, সময় ব'রে আকীর্ণ হয়ে ওঠে তার সূর্যহারা ছায়াতল। তবু কোনো উদাসীন পান্থের পদসঞ্চারেও ঝরাপাতার মঞ্জীর তার বেজে ওঠে না কোনোদিন কারণ তার অবস্থিতির সীমান্ত থেকে দূর অঞ্চলে দ্বিপদচারীদের মেলা। তাদের নিত্য-অনিত্যের চাহিদা লাঘবের কোনো সম্পদ নেই সেই বনানীর। তাই তাদের দৃষ্টি-বন্ধনে উপেক্ষিতই থেকে যায় তার আকর্ষণ। এমন কি, তার অনতিদূরে ধর্মরাজের যে-ভক্তবৃন্দের অধিবাস—তারাও তাকে পাশ কাটিয়ে যায় নিয়মিত। ---কিন্তু একদিন আসে—যেদিন বয়সের ভারে দেহে তার দুর্বহ যন্ত্রণা এবং অলকগুচ্ছে তার আশ্লিষ্ট অশেষ বিবর্ণতার গ্লানি, ঠিক সেদিনই হঠাৎ তার অনেককালের ঝরাপাতা বেজে ওঠে কোনো এক সৌম্য শোভাযাত্রার চরণ-নিক্ষেপে। আর ক্ষণে ক্ষণে তার নিস্তব্ধ ছায়াতল মন্দ্রিত ক'রে তোলে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পূত চরণের রেণু-সম্ভারে ধন্য হলো সেই বনানীর পতিতা মৃত্তিকা। তপোবনের উদার পরিবেশে রূপান্তর ঘটলো তার সূর্যহারা ছায়াতলের। আর তার অলকগুচ্ছের অশেষ বিবর্ণতা পেলো তপস্বিনীর সুষমা। ভিন্ন সুরে কলতান জাগলো বিহঙ্গের। সার্থকতার নতুন তীর্থে নতুন দিনের যাত্রা সুরু হলো আবার।

দিন যায়। শান্ত, সমাহিত আশ্রম গ'ড়ে ওঠে পরম তথাগতের সুবিনয়ী ভক্তবৃন্দের। দূর-বসতি অঞ্চলে ভেসে যায় তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রধ্বনি। এ-ধ্বনি উপেক্ষার নয়, অবিশ্বাসের নয়, এ যেন পরম সত্যকে লাভ করার এক দিব্যাতীত প্রতীতি। তাই দলে দলে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, আশ্রমদ্বারে সমাগম ঘটে জনতার। পরম তথাগতের শরণার্থী হওয়ার প্রত্যাশী তারা সবাই। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই পরিধি বাড়ে আশ্রমের; আরও অজস্র নতুন ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর সংযোজনে এক অভিনব বৌদ্ধবিহারের পরিণতি লাভ ঘটে সেখানে। আশ্রম থেকে কিছুদূরে, প্রায় কসাইটোলার কাছাকাছি একটি বুদ্ধ-মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা ঘটে—যার অনুপম বেদী উজ্জ্বল ক'রে তোলে সোনার বিগ্রহ।

দিনে দিনে, জন-জীবনে যখন এভাবেই প্রভাব বিস্তার ক'রে চললেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, তখন আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় নির্বিরোধ থাকা সম্ভব হলো না তাঁদের পক্ষে—যাঁরা ধর্মঠাকুরের পূজারী। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে, নানাভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন সুরু করলেন বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে। তাঁদের সম্প্রদায়গত এক অষ্টাদশী তন্বীকে ভিক্ষুণীদলের অন্তর্ভুক্ত করে আটক রেখেছেন বৌদ্ধগণ—একদিন এই অভিযোগ নিয়েই আশ্রমের দ্বারদেশে এলেন একদল ধর্মপূজারী। তাঁরা সমস্বরে ফিরিয়ে চাইলেন সেই তন্বীকে।

ধীরে ধীরে, উন্নতশিরে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন আশ্রমের প্রধান ভিক্ষু নীলাদ্রি। তিনি বললেন: সেই তন্বী দুহিতা স্বেচ্ছায় এসে শরণ

শ্রীপদাতিক

দিয়েছে তথাগতের। এ-পথে তাকে কেউ প্রলোভিত করার চেষ্টা করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার স্বগৃহে ফিরে যাওয়ায় বাধা নেই—যদি সে ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করে।

এ-কথা বলেই তিনি ডেকে পাঠালেন সেই তন্বীকে। তন্বী মৃদু চালে এগিয়ে এলো নীলাদ্রির পাশে। কিন্তু এসেই সে ঘোষণা করলো অবিচলিত কণ্ঠে : স্বগৃহে সে কিছুতেই ফিরে যাবে না। কারণ তথাগত বুদ্ধই তার একমাত্র শরণ।

কিন্তু সংকল্পের অটল দৃঢ়তা নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়েছেন ধর্মপূজারীর দল। সুতরাং অত সহজেই তাঁরা নিরস্ত হওয়ার পাত্র নন। তন্বীকে কাছে পেয়ে, হঠাৎ তাঁরা একসঙ্গেই তার হাত ধ'রে আকর্ষণ করেন সজোরে। তারপর জোর করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ফিরে চলেন তাঁদের গৃহাভিমুখে।

যেতে যেতে, পশ্চাৎ-পানে বার বার ফিরে তাকালো ক্রন্দনরতা তন্বী—যেখানে উন্নতশির নীলাদ্রি তখনো দাঁড়িয়ে। যেন অটল, গম্ভীর এক ধ্যানমূর্তি—যাঁর প্রশস্ত ললাটে দক্ষিণ দিগন্তের প্রতিফলন এবং নিষ্পলক নয়নে নিরুত্তাপ জ্যোতি-বিচ্ছুরণ অপরাজেয় প্রাতঃসূর্যের।

সেদিন নিরুপায় তন্বী ফিরে গেল তার স্বগৃহে। পরদিন গৃহ ছেড়ে আশ্রমে আসার চেষ্টা করলো সে আবার, কিন্তু সম্ভব হলো না ধর্মপূজারীদের কঠিন পাহারা এড়ানো। তাই তখন বাধ্য হয়েই সে বার বার উচ্চারণ করলো তথাগতের নাম; তারপর হাসিমুখেই আত্মহত্যা করলো তার আত্মীয়-স্বজনের সামনে। খবর পেয়ে ছুটেই এলেন নীলাদ্রি। তিনি সস্নেহে বুকে তুলে নিলেন মৃতা তন্বীর লাবণ্যময়ী দেহলতা। বললেন : জীবন রক্ষায় যারা অপটু, সেই ধর্ম-পূজারীদের আর কোনো অধিকার নেই এই মৃতার প্রতি।---এ-কথা বলেই তিনি আশ্রমের দিকে ফিরে চললেন ধীরে ধীরে। চলার পথে, তাঁর শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হলো : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

অতি করুণ এবং মর্মস্পর্শী এই দৃশ্য। এ-দৃশ্যেই আর্দ্র হলো অজস্র ধর্মপূজারীর কঠিন মন। চোখের জলে ধুয়ে গেল তাঁদের হিংসা, দ্বেষ এবং নিছক সংস্কারবদ্ধ ধর্মান্ধতা। অতএব দলে দলে, এবার ভগবান বুদ্ধেরই শরণার্থী হতে চাইলেন অনেকেই। দ্বন্দ্ব ঘুচে গেলো, ফিরে এলো শান্তি—যার নিরবচ্ছিন্ন ছায়াতলে গ'ড়ে উঠলো অভাবনীয় এক সুন্দর সমাজ।

এ-কাহিনী আজকের নয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই তার প্রচলন সুরু হয় সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। সুদীর্ঘকালের পথ-পরিক্রমার পর, আজ বর্তমান শতকের তৃতীয় অঙ্কে দাঁড়িয়ে সে ক্লান্ত, অস্পষ্ট, এবং স্তিমিত অতি প্রবীণের স্মৃতিতে। তবু বিপুল ধৈর্য এবং অপরিসীম নিষ্ঠার বিনিময়ে আজ কোনোমতে তার উদ্ধার সাধন হলো বর্তমান নিবন্ধে।

অতি প্রবীণদের অভিমত : সেই বৌদ্ধ মহাজনদের আশ্রম ছিল বর্তমান ওয়েলিংটন অঞ্চলেই। তবে পরবর্তী সময়ে, এমন কি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রারম্ভকালেও সেই আশ্রমের কোনো অস্তিত্ব এখানে লক্ষ্য করা যায় নি। তা ছাড়া দক্ষিণ-পার্শ্ববর্তী ধর্মরাজ-মন্দিরেরও কোনো অভিজ্ঞান আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি ঐতিহাসিকদের পক্ষে। তবে একাধিক ঐতিহাসিক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : এককালে ওয়েলিংটন অঞ্চলেই বুদ্ধ-মন্দির সহ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অস্তিত্ব যেমন ছিল, তেমনই দক্ষিণ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ধর্মরাজ-মন্দিরের পাশে বসবাস করতেন ধর্মপূজারীরাও। এই ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্ববিদদের মধ্যে মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্যতম।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রারম্ভিক যুগে, ওয়েলিংটন অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত বসতি বৃদ্ধি পেলেও সে-অঞ্চলের অধিকাংশ প্রায় জঙ্গলাকীর্ণই ছিল বলা যায়। তাছাড়া, আপনি গ'ড়ে ওঠা তার রাস্তা-ঘাটও বিশেষ কোনো সংস্কারের প্রসাদ লাভে সক্ষম হয় নি তখনো। তবে কিছুকাল পর, যখন বসতি অঞ্চলের পরিধি বিশেষভাবেই স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন জনসাধারণের নিজ-প্রচেষ্টার ফলেই যে ওয়েলিংটন অঞ্চলেরও ক্রমোন্নতি সুরু হয়—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ব্যাপক সংস্কারের ফলে তার সাবিক পরিবেশের রূপান্তর ঘটে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পর। তখন কলকাতার পরিসর বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তার রাস্তা-ঘাট নির্মাণ বা সংস্কারকল্পে Lottery Committee নামে একটি সংস্থার প্রণয়ন ঘটে ইংরেজ সরকারের পরিচালনাধীনে। এই সংস্থা কর্তৃক আহরিত অর্থেই সুপরিকল্পিত সংস্কার সুরু হয় শহর-কলকাতার। এ-সম্পর্কে কিছু পরবর্তীকালের জন-কয়েক পৌর-শাসক বা কমিশনার, তাঁদের যুগ্ম বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন :

"In order further to show the necessity for some such increase of funds, the Committee consider they ought to state that the great improvements in Calcutta effected in past years were made not from the present assessment only, but from funds derived from the Government Lotteries.

"These lotteries were conducted for a series of years under the auspices of Government, and the profits resulting from them were devoted to the improvements of Calcutta."

এই লটারী কমিটীই এক সুশোভন পরিবেশের মর্যাদা দান করে ওয়েলিংটন অঞ্চলকে। বিলোপ ঘটে অনিয়ন্ত্রিত বনানীর। তারপর সেখানে আত্মপ্রকাশ করে এক পরিমার্জিত রাজ-পথ—যা পরে নাম ধারণ করে 'ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট'। পথের ধারে বিন্যাস ঘটে একটি পার্কেরও এবং তাও পরে

নামাঙ্কিত—সেই একই ইংরেজ রাজ-পুরুষের নামে।

এই ইংরেজ রাজ-পুরুষের প্রকৃত নাম আর্থার ওয়েলেসলি। তিনি সর্বাধিক পরিচিত 'ডিউক অব ওয়েলিংটন'-রূপে। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার উপঢৌকন-স্বরূপ এক সময় তিনি 'ভাইকাউণ্ট ওয়েলিংটন' উপাধিও অর্জন করেন। তাই ইংরেজ সরকার তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে 'ওয়েলিংটন' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন বার বার।

তৎকালীন ভারতের অন্যতম শাসনকর্তা মার্কুই ওয়েলেসলির চতুর্থ ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন। তিনি সসৈন্যে ভারতবর্ষের নিষ্পাপ মৃত্তিকা স্পর্শ করেন ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর অগ্রজ মার্কুই ওয়েলেসলি ভারতের প্রধান শাসনকর্তারূপে অভিষিক্ত, তিনি তখন প্রধান সেনানায়করূপে যুদ্ধযাত্রা করেন টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে।

মহীশূরপতি টিপু সুলতান তখন দুর্ধর্ষ। একাধারে পেশোয়া এবং নিজামের বিশ্বাসঘাতকতার পরেও তিনি অমিতবিক্রমে ইংরেজ বিতাড়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন একা। তাঁর সম্মুখবর্তী হয়ে বার বার ব্যর্থকাম হলেন আর্থার ওয়েলেসলি। তাই বাধ্য হয়েই এবার তিনি মহীশূর রাজ্যের এলাকা ছেড়ে পিছিয়ে এলেন অনেক দূর। সম্ভবত সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ পেলেন টিপু সুলতানের সেই কুখ্যাত দাতার—যার সাহায্যে আবার তিনি মহীশূর দুর্গাভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সুযোগ পেলেন লালবাগের পথে। এই লালবাগই মহাবীর হায়দার আলীর সমাধিভূমি এবং সমাধিভূমি বলেই টিপু সুলতান সেখানে কোনো সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেন নি। সুতরাং এই গুপ্ত এবং সহজ পথ ধ'রে প্রবল নির্বাধায় মহীশূর দুর্গে প্রবেশ করে আর্থার-বাহিনী। সুলতানের সৈন্যবাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে অতর্কিত আক্রমণে। ফলে একা নিষ্কোষিত

● ওয়েলিংটন বা রাজা সুবোধ মল্লিক পার্কে উনবিংশ শতাব্দীর ছোট মসজিদ।

তরবারী হাতে প্রায় কয়েক প্রহর সংগ্রাম করার পর সেখানেই শহীদ হয়ে চলে পড়েন মহীশূর-কেশরী টিপু সুলতান

এই যুদ্ধ জয়ে কোনো কৃতিত্বেরই অধিকারী নন আর্থার। তবু, কেবল টিপু সুলতানের পতন ঘটলো বলেই ইংরেজ সরকার তাঁকে বরণ করলেন এক মহানায়করূপে, যে-নায়ক মহীশূর রাজ্যেরই প্রধান শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত রইলেন কিছুকালের জন্য।

মহীশূর রাজ্যের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার কালেই, বিদ্রোহী মারাঠাদের সঙ্গে একাধিকবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন আর্থার ওয়েলেসলি। তিনি এ-যুদ্ধেই নাকি তাঁর বিস্ময়কর যুদ্ধ-বেত্তার পরিচয়দানে সক্ষম হন। তারপর, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে ফিরে যান স্বদেশভূমিতে। অবশ্য সে-দেশে ফিরেও তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহেই জড়িয়ে পড়েন। ১৮০৯ থেকে প্রায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওয়াটারলুতে যুদ্ধ করেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধাবসানের প্রায় তেরো বৎসর পর লর্ড ক্যানিং-এর মৃত্যু ঘটলে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বের পদেও অভিষেক ঘটে আর্থার ওয়েলেসলির। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আশি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন তাঁর স্বদেশেই।

এতদিন এই আর্থার ওয়েলেসলি বা ডিউক অব ওয়েলিংটনের স্মৃতিই বহন ক'রে আসছিল সমগ্র ওয়েলিংটন অঞ্চল। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্রের পৌর-প্রতিষ্ঠান তার নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে, দেশাত্মবোধের এক সার্থক উদাহরণ স্থাপন করেছেন সন্দেহ নেই। এখন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নামাঙ্কিত হয়েছে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নামে এবং রাজা

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে রূপায়ণ ঘটেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারেরও।

আজ যে-ওয়েলিংটন পার্কের রূপায়ণ ঘটেছে সুবোধ মল্লিক পার্কে—সেখানেই এককালে পরিস্রুত জলের ট্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন ইংরেজ সরকার। তখন শহর-কলকাতার পরিমিত অঞ্চল সংস্কার সাধিত হলেও, মহামারীর অব্যাহত প্রাদুর্ভাব থেকে তা মুক্ত ছিল না। এই মহামারীর ব্যাপক বিস্তারের প্রধান কারণ দূষিত জল। ফলে মৃত্যুর ক্ষমাহীন বন্ধন থেকে মুক্তি ছিল না ইংরেজদেরও। যদিও মৃত্যুর হার এ-দেশীয়দের মধ্যেই বেশি, তবু কেবল ইংরেজদেরই রক্ষা করার জন্য পরিস্রুত জলের ট্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ইংরেজ সরকার। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় সাতাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা হয় সুযোগ্য ঠিকাদার, ইঞ্জিন এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি। তারপর পলতা থেকে টালা এবং টালা থেকে ওয়েলিংটন পার্কে উপযুক্ত ট্যাঙ্ক স্থাপন ক'রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয় কেবল ইংরেজদের বসতি অঞ্চলেই। কিন্তু পরে, বিশেষ কোনো আন্দোলনের চাপেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা কেবল ইংরেজদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে এ-দেশীয়দের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। তাই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে একবার এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আরেকবার পলতা, টালা এবং ওয়েলিংটন পার্কের ট্যাঙ্ক যেমন সংস্কার সাধিত হয় বর্ধিত আকারে, তেমনই তার পাম্পিং-স্টেশনগুলিতেও সংযোজন ঘটে আরও অনেক শক্তিশালী যন্ত্রের। এই ট্যাঙ্ক বা পাম্পিং-স্টেশন সম্পর্কীয় তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির বিবরণ সংগ্রহ ক'রে, প্রখ্যাত গবেষক এ কে রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

"The Commissioners in their review of work done by them during the twelve years 1876—1888 claimed to have completed the whole of the original drainage scheme, and to have doubled the supply of water, filtered and unfilterd, by importing new machinery and engines and providing for two large settling tanks and 24 filters at Pulta and laying a second ironmain from Pulta to Tulla, by setting up additional engines at Tulla for requisite pressure to distribute the water direct into the pipes in the day and into the reservoirs at night for which the Tulla reservoir was enlarged to a capacity of three million gallons, by providing additional engine-power to the wellington street engines,.."

পরবর্তীকালে, পলতা থেকে টালা ট্যাঙ্কের মাধ্যমেই জল সরবরাহের সুব্যবস্থা হওয়ায়, ওয়েলিংটন অঞ্চলের ট্যাঙ্ক এবং পাম্পিং-স্টেশনের উচ্ছেদ ঘটে। পৌরসভা এই পাম্পিং-স্টেশনের উচ্ছেদকল্পে যেদিন ঘোষণা প্রকাশ করেন, সেদিন রাতারাতিই তার মুসলিম মিস্ত্রীরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ঠিক সেই অংশে—যে-অংশে এতকাল যাবৎ তাঁরা নামাজ প'ড়ে আসছিলেন। তাঁদের নামাজের পবিত্র স্থান চিরকাল পবিত্র হয়েই চিহ্নিত থাকবে—এই ছিল মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য। সেই মসজিদ আজও ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে পার্কের পশ্চিম-প্রান্তিক রেখায়।

আজ বিংশ শতাব্দীর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বা নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নামাঙ্কিত রাস্তা বিশেষভাবেই বিপর্যস্ত—বিশৃঙ্খল বিপণিভারে। আজ তার শ্রী বা সৌন্দর্যের সংস্থাপন নেই কোনো অংশেই। তবু তা চিরস্মরণীয় বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে। কারণ এ-পথেই ছিল রাজা সুবোধ মল্লিকের বাসভবন—যার অভ্যন্তরে যুগান্তর বিপ্লবী দলের ঐতিহাসিক কার্যক্রম চলেছিল অনেককাল। এ-গৃহেই বসবাস করতেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী পার্কের নীরব মৃত্তিকাতেও আত্মগোপন ক'রে রয়েছে সেকালের অজস্র বিপ্লবীর চরণ-চিহ্ন। আর পার্কের সম্মুখভাগেই দাঁড়িয়ে আছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মরণীয় ভবন—যেখানে সমাগম ঘটেছে ভারতের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ নেতার এবং পৃথিবীর অসংখ্য শ্রেষ্ঠ মনীষীর। অতীতে এ-গৃহেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে একাধিকবার। তাছাড়া নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক গৃহেরও অধিষ্ঠান ঘটেছে এ-পথেই। এ-গৃহের প্রতিষ্ঠাতা নির্মলচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ গণেশচন্দ্র চন্দ্র—যিনি ছিলেন দাক্ষিণ্যের দেবতা। তাই সাধারণ মানুষ প্রায় প্রত্যহই ধন্য হতো তাঁর প্রতি প্রণাম নিবেদন ক'রে। অতএব এ-সমস্ত কারণেই সমগ্র ওয়েলিংটন অঞ্চল আজ বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যে মহিমান্বিত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

সেক্সপীয়রের নাকট সাগরবৎ,
কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে
মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। মনের মতন (As You Like It)—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—
অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
৪। রোমিও জুলিয়েট—
অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৬। জুলিয়াস সীজার—
অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

একত্রে মূল্য আড়াই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

গ্রন্থ মেলা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প : তীয় সংস্করণ : নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। দাম : পাঁচ কা।

বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ তিভা যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তেমনি সাধারণ সৃষ্টি—তাঁর গল্প। রবীন্দ্র-াথের জীবিতকালেই তিনি সৃষ্টি রেছেন নবযুগ, বিস্তৃত করেছেন চতন্যের পরিধি। তাঁর কবিতা, উপন্যাস ও সাহিত্যের অন্যান্য দিকের বিশাল রিচয় দানের কথা স্থগিত রেখে কবল গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা রলেই দেখা যাবে—বাংলা ছোট ল্প তাঁর অসামান্য লেখনীর যাদুস্পর্শে জীবনের রহস্য, বিস্ময়, বৈচিত্র্য ও াভীরতার অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকে ত্তীর্ণ হয়েছে। রচনাশক্তির এই সুদুর্লভ নৈপুণ্যই তাঁকে দিয়েছে বিশ্বময় খ্যাতি। তাই তাঁর ছোট গল্প শুধু বাঙালীদেরই আনন্দ বিধান করে না, রুশ, চেক, ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যে অনুবাদের মাধ্যমে দেয় বিশ্বের সমগ্র মানুষকে গভীর তৃপ্তি ও চরমতম বিস্ময়।

উপরোক্ত গ্রন্থে যদিও মাত্র সতেরটি গল্প শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে সংকলিত হয়েছে, তথাপি একথা উল্লেখ করা অনিবার্যরূপে প্রয়োজন যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের যাবতীয় গল্পই শ্রেষ্ঠরূপে মর্যাদা পাবার যোগ্য। অবশ্য এই শ্রেষ্ঠত্বের বিচার শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের গল্পগুলিকে অবলম্বন করেই নয়, অন্যান্য মহৎ গল্পস্রষ্টাদের সঙ্গে একাসনে তিনি শ্রেষ্ঠ। অবশ্য এই তুলনামূলক বিচারকর্ম উপরোক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তাই বিনা ভূমিকায় গল্পগুলিকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। হয়তো মহৎ সৃষ্টির জন্যে কোনো ভূমিকা বা বিচার তুচ্ছ, তাই প্রতিটি গল্পই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

জয়ন্তী সেন

গ্রন্থভুক্ত 'পুন্নাম—', 'কুয়াশায়, 'হয়তো', 'শৃঙ্খল', 'ভবিষ্যতের ভার', 'সাগর সংগম', 'মহানগর', 'স্টোভ' 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', ইত্যাদি গল্প আমরা একবারই পাঠ করি না, হাজার বার পড়েও যেন আরো হাজার বার পড়তে ইচ্ছে হয়। এসব গল্প কোনোদিনই পুরনো হবার নয়। কেন না, মানব-জীবনের গভীর রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। আমাদের জীবনে যা ঘটছে তা হয়তো সহজে ঘটছে, কিন্তু সেই সহজের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হয় জীবনের আসল রহস্য। অবশ্য সেই রহস্যের শেষ যেন নেই। তবু 'পুন্নাম'-এ একদিন আবিষ্কার করে ললিত নিজেকে। 'কুয়াশায়' আত্মহত্যা করে সরমা, নরেন হয়ে পড়ে জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনীতে' 'করুণা' হয়ে ওঠে অন্যও দুর্বোধ্য। বলা যায় এখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর গল্পে যেমন অন্ধকার পল্লীর জরাজীর্ণ বৃদ্ধাও রুদ্ধনিশ্বাসে আবিষ্কৃত, তেমনি সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয় দিকটির কথাও আমাদের সাহিত্যে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। ছোট গল্পের যাদুকর প্রেমেন্দ্র মিত্র আজও অতুলনীয়, তাঁর যে কোনো একটি নতুন গল্পকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করবো।

নীল চন্দ্রমল্লিকা : কারেল চাপেক। অনুবাদ : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলি-১২। দাম : চার টাকা।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আদান-প্রদান ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। সাহিত্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন গুণী অনুবাদকের প্রয়োজন, তেমনি দরকার অনুবাদযোগ্য বিশ্ব-সাহিত্য—যার আবেদন দেশ ও কালের উর্ধ্বে সকলের কাছে সমান। কারেল চাপেক (জন্ম ১৮৯০—মৃত্যু ১৯৩৮) চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় সাহিত্যিক হলেও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তাঁর সম্মানিত আসন চিরকাল স্বীকৃত। তিনি যে সময়ের মধ্যে চেক-সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন—সে সময় নিঃসন্দেহে সারা য়ুরোপের ঝড়-ঝঞ্ঝার যুগ। তবু তারি মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন তিনি প্রকৃত মানবতা এবং চিরন্তন মনুষ্যত্ব। তাঁর লেখায় সমস্ত তুচ্ছতা, বাধা-বিঘ্ন ও অপরাধশীলতার মধ্যে মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে যা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করে তোলে।

"নীল চন্দ্রমল্লিকা" গল্পগ্রন্থটি পাঠের পূর্বে কারেল চাপেকের নামটি আমরা যখন-তখন অনেকবারই স্মরণ করেছি। তাঁর বিখ্যাত Rossum's Universal Robots নাটকটির দুর্লভ আলোচনা করেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ'

সারভেয়ার শ্রীযুক্ত অশোক সেন। নাটকে বর্ণিত কাহিনীর সময় ১৯৫০-১৯৬০। আর পৃথিবীর এক দূর প্রান্তে একটি নির্জন দ্বীপ নাটকের ঘটনাস্থল। কারেল চাপেক যদিও ১৯৩৮-এই গত হয়েছিলেন, তবু ভাবী পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে নাটকে তিনি যে চমকপ্রদ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তার সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন যান্ত্রিকতাই বড় নয়, মনুষ্যত্বই সর্বাপেক্ষা বড়। যদিও এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে—তথাপি কারেল চাপেক-এর জীবনদর্শন আমাদের অজানা নেই এটাই এখানে জ্ঞাতব্য। তথাপি নাটকটিতে সাঙ্কেতিকতা বেশি থাকায় সকলের পক্ষে সহজবোধ্য ছিল না। কিন্তু "নীল চন্দ্রমল্লিকার" প্রতিটি গল্পে কারেল চাপেক স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, তীক্ষ্ণ হলেও সহজতর, নির্মমতার কথা বলতে গিয়ে চরম হৃদয়বান।

অবশ্য গল্পগুলি আঙ্গিকে চেখভকে স্মরণ করিয়ে দিলেও এদের আবেদন সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাছাড়া এক একটি গল্প পড়া শেষ করলে আমাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের নিজেদের ধারণাই পাল্টে যায়। যেমন, 'ডাকটিকিট' গল্পটি। এটি পৃথিবীর যে কোনো প্রথম স্থানীয় গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। একজন বড়লোক যখন বুড়ো হয়েছে তখন একদিন কার্যকারণের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলো যে, সারা জীবনটা তার ভুলের মধ্য দিয়ে কেটেছে। কি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ চিন্তা, সমাজবোধ ও জীবনদর্শন থাকলে এ-ধরণের গল্প সৃষ্টি হতে পারে। এ-ধরণের ক্লাসিক গল্প পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে পড়েছি বলে জানা নেই। সংগ্রহ যাঁরা করেন তাঁরা দুর্লভ বস্তুকে পাবার জন্যে প্রয়োজন হলে চুরিও করেন, কিন্তু সেই চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে কিভাবে জীবন, ঐতিহ্য, মনষ্যত্ব ও ভবিষ্যৎ—তার পরিচয় পাই 'চিন্তামণি ও পাখী' কিংবা 'চোরাই মনসা' গল্পে। কোনো প্রেমের কথা লেখক বলেন নি, শুধু দুটি নরনারী চেয়েছিল কিছুটা কাছাকাছি হতে—সেই ঘটনা থেকে যে অঘটনের সৃষ্টি হয়েছিল তা পাই 'ডাকঘরের ঘটনাটি' গল্পে। ঐ গল্প পড়লে সত্যিকারের বিচার সম্পর্কে আমাদের চোখ ফোটে। 'কবি' গল্পে তথাকথিত অবাস্তব কাব্যের মহনীয় আদর্শের কথা তুলে ধরে চাপেক এক অপরূপ বাস্তব কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। গল্পগুলি লেখার ভঙ্গিতে যে অনবদ্য কথকতার ধরণটি ফুটে উঠেছে তা আমাদের মুগ্ধ ও আগাগোড়া নিবিষ্ট করে রাখে। বাংলা ভাষায় "নীল চন্দ্রমল্লিকার" মতো গ্রন্থ অনূদিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্য লাভবান হোল—একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা মিনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় যে চমৎকার অনুবাদশৈলীর দ্বারা আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছেন, তার জন্যে তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য হয়েই থাকবে।

Tales From Kalidasa—By Suna K. Surveyor, জয়কো পাবলিশিং হাউস, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই-১। মূল্য : (ভারতে) দুই টাকা।

শ্রীযুক্তা সারভেয়ার কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত 'টেলস ফ্রম কালিদাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে অনুমান হয় যে, কালিদাসের রচনাসমূহের চাহিদা আজো অসামান্য থাকায় পরবর্তী সংস্করণের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় না। উপরোক্ত গ্রন্থে শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, রঘুবংশ ও মেঘদূতের অনুবাদ রয়েছে। বলা বাহুল্য লেখিকা কোথাও হুবহু অনুবাদের প্রয়াস করেন নি, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে—কালিদাসের নাটক ও কাব্যগুলির গল্প নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করা। সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। লেখিকা ভাষার আড়ম্বরের দ্বারা গল্পের ধারাকে কোথাও আচ্ছন্ন করে তোলেন নি, এমন কি মূল সংস্কৃতে যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছে—ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমেও সেই রীতি প্রবহমান। 'দি লস্ট রিং'-এ শকুন্তলা, দুষ্মন্ত কিংবা ধীবররা একই ভাষায় কথা বললেও রীতির পার্থক্য বিদ্যমান। মেঘদূত বা 'দি মেসেঞ্জার-ক্লাউড'-এর অনুবাদে কাব্যের ধারা গদ্যভাষণে পুরোপুরি বজায় রাখা অসম্ভব হলেও, এর চিরায়ত রস সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় হবে। গ্রন্থ শেষে টীকা অংশটিও মূল্যবান। আমরা আশা করি, জয়কো পাবলিশিং হাউস বর্তমানকালের ভারতীয় সাহিত্যসমূহের অনুবাদের কাজে হাত দিয়ে এঁদের গণ্ডি প্রসারিত করবেন।

সালফার
গায়েমাখা সাবান

সকল চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোস, ফোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তেরো ॥

হিরণ্ময় বাড়ির ভেতরে এল অপরাধীর মতো। কতগুলো ক্রনিক অসুখে ভুগছে, কোমরে দারুণ বাত, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেই জন্যেই প্রি-ম্যাচিয়োর পেনশন নিয়েছে। সামান্য টাকা পায়, অল্প সল্প ধান আসে বিঘে কয়েক জমি থেকে, অথচ চার-পাঁচটি অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা বড়ো সংসার টানতে হয়। কাজেই ছোট ভাইয়ের ওপরেই তার ভরসা।

কিরণের সামনে এলেই হিরণ্ময় অস্বস্তি বোধ করে। কোনো কিছু করবার যোগ্যতা নেই, অথচ বসে বসে দিন কাটানো, কখনো কখনো এক হাত তাস-পাশা খেলা আর মধ্যে মধ্যে টাকা চেয়ে ভাইকে চিঠি লেখা। সে লজ্জা তো আছেই, তারও চাইতে বড়ো অপরাধবোধ আছে মনের ভেতর। কিরণ বিয়ে করতে চায় নি, সে-ই জোর করে বিয়েটা দিয়েছিল।

সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, মুখে চোখে বুদ্ধির ছাপ. প্রতিমাকে দেখে বড়ো ভালো লেগেছিল হিরণ্ময়ের। অবস্থাপন্ন ঘর, ভালো বংশ, মেয়ের দাদা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এর চাইতে ভালো কুটুম্ব কি আর আশা করতে পারে মধ্যবিত্ত পরিবার? তখন জানা ছিল না, মেয়ের মায়ের দিকে মাথার গোলমাল আছে; দিদিমা পাগল ছিলেন, এক মামা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে পাগলা-গারদে। ভাগ্য! কে খণ্ডাতে পারে।

কিরণ সাহিত্যিক। বাজারে তার নামডাক আছে, কলকাতায় তার কত জানাশুনো। যদি কোনো মেয়েকে প্রেম-টেম করে বিয়ে করত—হিরণ্ময়ের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু হতভাগা সেদিক দিয়েও গেল না। এদিকে বয়েস বাড়ছে, পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেল, কতদিন আর এভাবে রাখা যায় ভাইটাকে? লোকেই বা কী বলবে? অগত্যা হিরণ্ময় পাত্রী ঠিক করল, বিয়ে হয়ে গেল, দুজনে বেশ সুখীই হয়েছে বলে বোধ হয়েছিল, কিন্তু—

ভাগ্য। ভাগ্যের ওপর কারো কোনো হাত নেই।

আজকাল অবসর সময়ে বসে বসে জ্যোতিষের চর্চা করছে সে। সব গ্রহ-নক্ষত্রের খেলা। মানুষ কী করতে পারে?

তবু মনে হয় জোর করে বিয়েটা না দেওয়াই উচিত ছিল। তা হলে ছেলেটাকে এমন বিবাগীর মতো দিন কাটাতে হত না।

বৌদির কথাটা শোনবামাত্র মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছিল কিরণের। কিন্তু কথা বাড়াতে তার প্রবৃত্তি হয় নি। নিঃশব্দে চলে এল নিজের ঘরটায়। সুইচ টিপে আলো জ্বালল, সুটকেস খুলল, বাচ্চাদের জন্যে কতগুলো টফি-লজেন্স এনেছিল সেগুলো বিতরণ করল তাদের ডেকে, তার বাক্সটা বন্ধ করে এক কোণায় ঠেলে দিল। কিছুক্ষণ রইল দাঁড়িয়ে চুপ করে। টেবিলের ওপর একজোড়া ফোটো-ফ্রেমের ভেতর তার আর প্রতিমার ছবি দুটোর দিকে মিনিট দুই চেয়ে রইল কৌতূহলহীন দৃষ্টিতে, তারপর বাবার আমলের যে পুরোনো ডেক-চেয়ারটা বহুকাল থেকে পড়ে আছে

এ ঘরে আর যার বেতের ছাউনি ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে এখানে ওখানে, ধুলো না ঝেড়েই ধপ করে তার ওপর বসে পড়ল।

দু'ধারে দুটো জানলা। একটা পুবে, একটা দক্ষিণে। বিকেলে বোধ-হয় বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, আসছে যুঁইয়ের গন্ধ। কিরণ চোখ বুঁজল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল নীল পাহাড়ের রেখা, সেই কৃষ্ণচূড়ার বীথি, সেই হরিয়ালের ডাক, সেই নদীর নির্জনতায় তরল-তামার মতো বেলা শেষের আলো, সেই মহাকালের মন্দির, আর—

কিরণ চোখ মেলল। না, আর নয়। সেই আদিম শক্তি, ধীরে ধীরে রক্তের ভেতরে সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া সেই নিঃশব্দ শৃঙখল, তার কাছ থেকে এখন অনেক দূরে সরে এসেছে সে। এখন জটিল জীবন আর তার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা।

আশ্চর্য, গত কুড়ি বছর ধরে বুদ্ধি, বিচার আর সমালোচনার যে নির্মোহ নগ্ন জগতে সে বাস করছিল, এই পনেরোটা দিন তাকে এমন করে তার ভেতর থেকে ছিনিয়ে কেড়ে আনল তাকে, হারিয়ে দিল? আসলে রক্তে মাংসে আমরা সেই চিরাচরিত রোমান্টিক—এতদিন ধরে, এত ভাবে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও কি আমরা এতটুকুও এগোতে পারি নি? একটা বংশগত অনিবার্য ব্যাধির মতো সে আমাদের দেহ-মনের গোপনে বাসা বেঁধে আছে, কেবল সুযোগের একটুখানি অবকাশমাত্র।

বাইরে থেকে বৌদির ডাক শোনা গেল: রান্নার একটু দেরী হবে ঠাকুর-পো, কিছু খাবার দেব?

—খাবারের দরকার নেই, চা দাও এক পেয়ালা।

—একটা ডিম ভেজে দিই চায়ের সঙ্গে?

—আমার খিদে পায় নি, চা-ই যথেষ্ট।

—আনছি—

বৌদি চলে গেলেন। বাইরে থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল, ইংরিজি-বাংলা মিলিয়ে অর্থহীন একটা একতান। পাশের বাড়ির রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত:

'এসেছিলে তবু আসো নাই,
তাই জানায়ে গেলে—'

তার নিজের কথা? মনের সুর?

'তুমি কোথা দূর
কুঞ্জছায়াতে, মিলে গেলে কল-মুখর
মায়াতে—'

কে মিলিয়ে গেল? শর্মিলা?

বাইরে চ্যাঁ চ্যাঁ করে প্যাঁচার তীক্ষ্ণ চিৎকারে সুর কাটল—বোধহয় শিকার ধরেছে। জানলার সামনে উল্কার একটা তীক্ষ্ণ ফলক ছুটে গেল গাছ-পালার আড়ালে। আবার সেই নির্বোধ যন্ত্রণাটা তীরের মতো বুকে বিঁধল।

তখন দরজার বাইরে গলা-খাঁকারি দিলে হিরণ্ময়।

—ঘুমুচ্ছিস?

—না দাদা, এসো।

হিরণ্ময় ঘরে ঢুকল কুঁজো হয়ে। আজকাল আর সোজা হয়ে হাঁটিতে পারে না।

কিরণ উঠে বসল। হিরণ্ময় তাকিয়ে দেখল খাটটার দিকে।

—একি, বিছানা-টিছানা পেতে দিয়ে যায় নি এখনো?

—দেবে, ব্যস্ত হয়ো না।

হিরণ্ময় খাটের ন্যাড়া জাজিমটার ওপর বসে পড়ল। সঙ্গে একটা পুরোনো টিনের কৌটো, তা থেকে বের করল বিড়ি-দেশলাই। কাঁপা হাতে বিড়ি ধরাল, বারকয়েক ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর ভূমিকা করবার জন্যে তৈরি হতে লাগল।

—তোর বৌদি তোকে বলেছে নাকি?—জিজ্ঞেস করবার আগে একবার সাফ করে নিল গলাটা।

অর্থাৎ সেই প্রসঙ্গটাই আসছে। চেয়ারের ভেতরে কিরণ শক্ত হয়ে গেল।

—কী বলতে চাও দাদা?

—মানে, তোর হোল-লাইফটা—

—আমি বেশ আছি দাদা, তোমরা মিথ্যে দুর্ভাবনা কোরো না।

হিরণ্ময় যেন ধাক্কা খেলো একটা। আবার চুপচাপ বিড়ি টানল মিনিট-খানেক। ভিজে-ভিজে হাওয়ায় যুঁইয়ের গন্ধ আরো কোমল হয়ে ঘরময় ছড়াতে লাগল, বাইরে আবার কর্কশ চিৎকার করল প্যাঁচাটা।

বৌদি ঘরে ঢুকে দু' পেয়ালা চা রাখলেন খাট আর টেবিলের মাঝ-খানকার টিপয়টাতে। বললেন, বাচ্চা-দের এখন খেতে দিচ্ছি, তোমাদের একটু দেরী হবে।

হিরণ্ময় বললে, হোক—হোক। আমরা একটু কাজের কথা বলছি।

স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে অর্থময় দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল একবার, কিরণের চোখ এড়াল না। বৌদি বেরিয়ে গেলেন।

তারপর হিরণ্ময় বললে, তোকে এমনি ডাকি নি। অরবিন্দ এসেছিল এখানে।

অরবিন্দ অর্থাৎ কিরণের বড়ো সম্বন্ধী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিরণ আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন?

—কী সরকারী কাজে এসেছিল গাড়ি নিয়ে। আমাদের সঙ্গেও দেখা করে গেছে।

কিরণ অপেক্ষা করতে লাগল। শোনাই যাক, দাদা কী বলে।

—অরবিন্দের সঙ্গে অনেক কথা হল। সেও বৌমার নাম করে বলছিল, ওর তো যা হওয়ার হল—কোনোদিনই আর ভালো হবে বলে মনে হয় না। মাঝখান থেকে কিরণের জীবনটা কেন আর—

—অরবিন্দদা নিজেই বললেন?

—কেন বলবে না? —বিড়িটা বাইরে ছুড়ে দিয়ে হিরণ্ময় বললে, তার তো বুদ্ধি-বিবেচনা আছে একটা।

কিরণ চায়ের পেয়ালায় নিঃশব্দে ছোট্ট কয়েক চুমুক দিলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, আমাদের কী করতে হবে?

হিরণ্ময় যেন আবার একটা ধাক্কা খেলো। চামচে দিয়ে অকারণে চা-টা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, রাস্তা তো একটাই আছে—ডিভোর্স। ব্যাপারটা খুবই আনকাইন্ড—বৌমার মুখখানা মনে পড়লে বড্ড খারাপ লাগে, কিন্তু—

—অরবিন্দদা বলেছেন ডিভোর্সের কথা?

—বলেছে।—হিরণ্ময় যেন অপরাধ স্খালন করতে চাইল: নইলে আমি কি মুখ ফুটে বলতে পারতুম এ-কথা? তুই তো জানিস আমাকে।

ঠিক কথা, দাদা নিষ্ঠুর নয়। কাউকে সে কষ্ট দিতে চায় না। তাই কিরণের দুঃখও আর সইতে পারছে না—অবিলম্বেই একটা প্রতিকার করতে চায়।

একটা বাঁকা হাসির রেখা ঠোঁটে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল কিরণের। চা খেতে খেতে হিরণ্ময় অন্যমনস্ক-ভাবে বলে চলল, অবশ্য বৌমার দিক থেকে—কিন্তু সে-কথা ভেবে কী লাভ? সে তো এ-সবের বাইরে। তার কিছুই যাবে আসবে না।

আধ-খাওয়া চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল কিরণ। কেমন তেতো তেতো লাগছিল, খেতে ইচ্ছে করল না।

তারপর শক্ত মৃদু গলায় কিরণ বললে, না, তার কিছুই যাবে আসবে না। কিন্তু দেখবে কে তাকে? কে তার খরচ দেবে?

—অরবিন্দ বলছিল, বোনকে তো আর ফেলে দেওয়া যাবে না, ভার তারাই নেবে।

কিরণের মনে হল, হয়তো অকারণেই মনে হল, কেমন একটা মুক্তির আশ্বাস যেন দাদার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। সেই মুক্তির আশ্বাসটা জেগেছে একটা নগ্ন স্বার্থপরতা থেকে, অন্তত দেড়শোটা টাকা খরচ বেঁচে যাবে সংসারের। তাতে বাড়িতে আরো খানিকটা প্রাচুর্য আসবে, দাদার স্ত্রী, ছেলেমেয়ের জন্যে আরো কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, কিছু আরাম—

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা তাকে লজ্জা দিলে। সে যদি আবার বিয়ে করে, কলকাতায় গিয়ে আলাদা সংসার পাতে, তাতে তো দাদার আরো ক্ষতির সম্ভাবনা। লেখার একটা আয় তার অবশ্য আছে, কিন্তু তা অনিশ্চিত—কখনো দু' হাজার, কখনো দুশো। উল্টো দিকটাই বরং বেশি সত্যি, দাদা তার জন্যে স্বার্থত্যাগের ঝুঁকি নিয়েছে একটা।

হিরণ্ময় বললে, কী হল, কথা বলছিস না যে?

কিরণ আস্তে আস্তে বললে, অরবিন্দদা যদি তার বোনের ভার বইতে পারে, আমিও আমার স্ত্রীর ভার সইতে পারব।

হিরণ্ময়ের কুঁজো পিঠটা আরো কুঁজো হয়ে যেন নীচের দিকে নেমে এল। কথা খুঁজে পেল না কিছুক্ষণ। ধুঁইয়ের গন্ধ বাতাসে ঘন হতে লাগল, অন্ধকার চিরে দূর থেকে ভেসে এল ইলেকট্রিক ট্রেনের শঙ্খধ্বনি। রাতের শেষ লোকাল ট্রেনটা চলে গেল কলকাতার দিকে। জানলার বাইরে তারাভরা আকাশে হাল্কা হাল্কা হীরের টুকরো মেঘ ভেসে এল।

—তা হলে তুই এইভাবে—

—অনেকে তো বিয়ে না করেও কাটিয়ে দেয়, দাদা।

একেবারে চরম যুক্তি—এর ওপরে আর কথা বলা চলে না। হিরণ্ময় এবার একেবারে চুপ করে গেল।

প্রায় সাত-আট মিনিট কাটল নীরবতার ভেতরে। এর মধ্যে আর একটা বিড়ি শেষ করল হিরণ্ময়, কিরণ কান পেতে শুনতে লাগল রাত্রির শব্দ। বাইরে ঝিঁঝির ডাক, হাওয়ার আওয়াজ, বাদুড়ের ডানায় ধ্বনির ঢেউ, পাতার মর্মর। কিরণ সেই প্যাঁচাটার চিৎকার শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু আর শোনা গেল না, আর কোথাও উড়ে গেছে সেটা।

তারপর ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিরণ্ময়।

—সবই বরাত। কিন্তু তুই কথাটা ওভাবে উড়িয়ে দিস নি। ভেবে দেখিস।

—দেখব।

—তুই যদি বরাবর ব্যাচেলর থাকতিস তা হলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু বিয়ে করেও—

—বিয়ের পরেও তো অনেকে বিপত্নীক হয়, দাদা।

তাতেও অন্তত মনের একটা সান্ত্বনা থাকে, এই কথাটা বলবার ছিল হিরণ্ময়ের। কিন্তু কিরণের মুখের চেহারাটা ক্রমশ পাথরের মতো শক্ত হয়ে আসছে। হিরণ্ময় আর এগোল না।

—আচ্ছা, বিশ্রাম কর তুই। আমি যাই, হাতমুখগুলো একটু ধুয়ে ফেলি।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভাবল, এ-সব সাহিত্যিকদের চেনা যায় না। অথচ, পাগল হওয়ার আগে কিরণের অবস্থা যে কী অসহ্য করে তুলেছিল প্রতিমা সে তো এত সহজেই ভুলে যাবার নয়।

করো, করো—যা খুশি করো তোমার। আমরা তোমার ভালোই চেয়েছিলুম।

কিরণ বসে রইল চুপ করে। আশ্চর্য, হিরণ্ময় ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব আলোচনাগুলো মিলিয়ে গেল পাহাড়ী কুয়াশার মতো। পুবের আকাশে মেঘ সরে গিয়ে আবার তারাগুলো জলে উঠছে, মনে পড়ছে একটি মুখ—

প্রতিমা নয়—সেই শর্মিলা।

'এসেছিলে তবু আসো নাই
তাই জানায়ে গেলে—'

না, গ্রামের বাড়িতে থাকলে শর্মিলার হাত থেকে তার মুক্তি নেই। সব নিস্তব্ধ আকাশ, সব ফুলের গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায়, সমস্ত পাতার শব্দ সেই একটি ছোঁয়াচ লেগে একাকার। কালই তাকে পালাতে হবে, পালাতে হবে কলকাতায়; সেখানে প্রতিদিনের ঘূর্ণির ভেতরে মনে হতে থাকবে জীবন কী দুর্বোধ্য নিষ্ঠুর, আর—আর তার স্ত্রী প্রতিমা পাগল।

দিন চারেক পরেই তাকে যেতে হল সেই প্রতিমার কাছে।

মাসের প্রথম সপ্তাহেই টাকা পাঠাতে হয়। কোনো কোনো বার ডাকেই টাকাটা পাঠিয়ে দেয়, কখনো বা হাতে করে দিয়ে আসে, দেখে আসে স্ত্রীকে। কোনো লাভ নেই, প্রতিমা আর কাউকে চিনতে পারে না, তবু—

জায়গাটা কলকাতা থেকে আট-দশ মাইলের ভেতরে। দু'পাশ দিয়ে দু' দিকের রেল-লাইন মাঝখানে নীচু জমিতে আশ্রমটা। ধানের ক্ষেত, ফলের বাগান, পুকুর—তারই ভেতরে বেশ একটি তপোবনের আবহাওয়া। কিন্তু তপোবনে কেউ তপস্যা করে না, থাকে এক দল পাগল।

আশ্রমটা এক ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিজে ডাক্তার তিনি। তাঁর বড়ো ছেলে পাগল, অনেক চেষ্টা করেও সারাতে পারেন নি। বলেন, 'সেই দুঃখেই তো ওটা নিয়ে সাধ্যমতো রিসার্চ করেছি আমি, খুলেছি এই মেণ্টাল হসপিটাল। পাগল নিয়ে ঘর করবার যে কী কষ্ট সেটা বিলক্ষণ জানা আছে আমার।

বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে জল আসে।

কিরণকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করলেন, আসুন—আসুন—

—আপনার টাকাটা দিতে এসেছি।

কিরণ টাকা দিতে এলেই ডাক্তার যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে যান, এত বড়ো একজন লেখকের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, তা এর জন্যে এত ব্যস্ত হওয়ার কী ছিল? পরে দিলেই তো চলত।

কিরণ চুপ করে রইল, ডাক্তার একটা রসিদ লিখে এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

কিরণ জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে প্রতিমা?

ডাক্তার যেন আবার অপ্রতিভ হয়ে গেলেন।

—চেষ্টা তো করছি। দেখি আর কয়েকদিন।

—দেখুন।

ডাক্তার কিরণের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বললেন, এখনি আশা ছাড়বেন না। রাঁচীর জবাব দেওয়া দু-একজন পেসেণ্টকেও আপনাদের আশীর্বাদে সারিয়ে তুলেছি। মিসেস বোসকে আমি আরো অন্তত ছ'মাস দেখব। একটা নতুন ওষুধ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছি—হয়তো কাজ হতে পারে।

—খুব ভালো কথা।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন: চলুন, পেসেণ্ট দেখবেন।

টালীর চালার একতলা দালান সারি সারি ব্যারাকের মতো ঘর। এইটেই ফিমেল ওয়ার্ড। সামনে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া টলটলে নীল জলের পুকুর, তার পাশে সবুজ ঘন-ঝোপের ভেতরে টকটকে লাল কলকে ফুল ফুটেছে আগুনের শিখার মতো।

নিজের ঘরে বারান্দায় একটা মোড়া পেতে প্রতিমা বসে, সেই কলকে ফুলের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু কোনো দৃষ্টি নেই চোখে। একটা ধূসর শূন্যতার মধ্যে যেন ডুবে আছে সে। রুক্ষ চুল ভেঙে পড়েছে পিঠময়, শীর্ণ দুর্বল শরীর, চোয়ালের হাড়গুলো অতিরিক্ত উঁচু হয়ে উঠেছে, পরণে আধময়লা ছিটের ব্লাউজ আর লালপাড় শাড়ি। এখন দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এক সময়ে সুন্দরী ছিল প্রতিমা, বিয়ের সময় মুখের ঘোমটা সরে গেলে চন্দনের লেখায় প্রতিমার মতোই মনে হয়েছিল তাকে।

প্রতিমা পাথরের মূর্তির মতোই চুপ। এমনি চুপ করেই সে থাকে। তারপর এক সময় প্রলয়ের মতো ফেঁপে ওঠে, কোন অলক্ষ্য শত্রুকে খুন করতে চায়, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হয়। জামা-কাপড় ছিঁড়ে, আঁচড়ে কামড়ে একাকার করে দেয় সবাইকে।

ডাক্তার বললেন, মিসেস বসু, আপনার স্বামী এসেছেন।

প্রতিমা জবাব দিল না। সে শুনতে পায় নি।

এবার কিরণ আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে গেল। একমাথা রুক্ষ চুলে হাত রেখে বললে, প্রতিমা চিনতে পারছ না? আমি।

হঠাৎ কী হল, পাগলের খেয়াল—আকুল হয়ে কেঁদে উঠল প্রতিমা। দুটো উদ্‌ভ্রান্ত আরক্ত চোখ কিরণের দিকে তুলে বললে, সবাই আমায় অন্ধকার ঘরে ফেলে গেল, সবাই ভূতের ভয় দেখাচ্ছে। তুমি যাবে না তো? চলে যাবে না তো। আমাকে ছেড়ে?

কিরণ আবেগভরা গলায় বললে, না প্রতিমা, যাব না।

ঠিক তখন—কোথায় যেন একটা পাগল তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল। আর কিরণের মনে হল, মহাকালের ঝর্ণায় পা পিছলে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন শর্মিলাই। (ক্রমশঃ)

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাগানে সন্ধ্যাবেলা সমরেশ খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ পায়চারী করে ডাক্তারের নির্দেশে। অনিল বিশ্বাস অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। সময়ের ঠিক নেই, কারণ কখনো কখনো আজকাল চায়ের পেয়ালা হাতেই ঝিমোতে সুরু করে সমরেশ। ঠিক ঘুম নয়, আচ্ছন্নতা—তবু ডাক্তারের নিষেধ আছে, সামান্য তন্দ্রারও ব্যাঘাত যেন না ঘটানো হয়।

রঙ্গন ফুলের ঘন ঝোপের ধারে বেঞ্চির উপর বসে অনিল ভাবছিলো। ভাবছিলো এই বাড়ির মানুষগুলোর কথা কেমন একটু অস্বস্তির ভাব নিয়ে। এমন সময়ে কাটা কাটা কথাগুলো কানে এলো।

'আজ রাত্রিবেলা খেয়ে যাবেন ত' কাকাবাবু—'

'আমার কোন আপত্তি নেই?' সত্যজিৎ সামন্তর হাসি—'তোমার রামবিলাসের হাতযশের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে।'

'তারপর উইলটা সংশোধন করতে হবে। আমি স্বীকার করছি কাকাবাবু, মাধবীর উপর আমার কোন দুর্বলতা নেই। ওদের দুজনের জীবনকে বেড অব রোজ করে রেখে যেতে আমার মন চাইছে না। তার চাইতে একটা হাসপাতাল হোক এই বাড়িতে—আমার বাবের নামে।'

'বেশ ত', বেশ ত'।' সত্যজিৎ সামন্ত সম্মতি দিলেন সাগ্রহে—'কিন্তু তার জন্যে এত তাড়া করার প্রয়োজন কি! লেট আস ওয়াচ এণ্ড ওয়েট। তোমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যেতেও পারে একদিন।'

'মানুষের মন ভঙ্গুর কাচের মত—একবার ভাঙলে আর জোড়াতালি দিয়ে দিন কাটে না।' সমরেশের গলার স্বর নীচু হয়ে এলো।

এর পরে রঙ্গমঞ্চে পর্দা পড়ে গেলো। ওরা দুজনেই বারান্দার পাশে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নীচে, ছোট কাছারী-ঘরের দিকে। কাছারীঘর নামেই, এখন সেখানে পুরানো কাগজ-পত্রের স্তূপ। অনিল নিজেই মাঝে-মাঝে সমরেশের কাছ থেকে চাবি নিয়ে ধুলো ঝাড়ে, কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। ওখানে নিরিবিলিতে বসে বোধহয় নতুন উইলের খসড়া করবেন দুজনে।

'কি হল?' মাধবীর নীচু গলার শব্দ ভেসে এলো।

'ডাঃ বসাক সমরেশকে ইউরোপে যেতে বলছেন। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি—সাময়িক মোহের বশে আমরা ওর প্রতি অন্যায় করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে। সত্যজিৎ সামন্ত ... সে কথাই বলছিলেন।'

'কাকাবাবু? উনি কতটুকু জানেন?'

'কারো চোখ-কান চাপা দিয়ে রাখা যায় না মাধবী।'

'তুমিও কি আমাদের মনের দুর্বলতাকে সাময়িক মোহ বলে ঘৃণা করছ?'

'প্রাণপণে নিজের মনকে একটি কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছি মাধবী, যে আমরা পরস্পরকে ভুল বুঝেছি, সে ভুল এখনই সংশোধন করে নিতে হবে। কিন্তু পারছি কই। সব দিক থেকে এখন আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই উচিত।' সুনন্দর গলা ভয়ানক নাটুকে শোনালো।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে অনিল দেখল—মাধবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'তুমি কি কোথাও চলে যাবে ঠিক করেছ?'

'মিঃ সামন্ত বলছিলেন, রোনাল্ড জনসন্ বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক আফ্রিকায় কোকো প্ল্যানটেশনের মালিক। বিরাট বড়লোক। তিনি নাকি ভালো মাইনে দিয়ে কয়েকজন ডাক্তার ওদেশে নিয়ে যেতে চান। আমার এখানে কতটুকু অ্যাটাচমেণ্ট বল? সমরেশ যে দশহাজার টাকা লোন দিয়েছিল, তার একটি কাণাকড়িও বাঁচে নি। সব দিক থেকেই আমি একজন ডুবন্ত মানুষ।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল সুনন্দ। এখানে আমি বাঁচব না।' মাধবীর কথায় অনুনয়ের সুর কেঁপে উঠল।

'তুমি কি পাগল হয়েছ?' সুনন্দ চমকে উঠল—'সমরেশকে এভাবে একা ফেলে রেখে যাওয়ার স্বপ্নও তোমার দেখা উচিত নয়। মিঃ সামন্তকে বলেছি আমি আফ্রিকা যেতে রাজি আছি। এ মাসের শেষেই জয়েন করতে হবে হয়তো।'

'ওকে বলেছ?'

'না, এখনও বলি নি—' সুনন্দ কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করল—অসুস্থ শরীর-মনে এ জাতীয় কোনরকম শক

ওর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যাওয়ার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে যাব।'

'বেশ—' মাধবী অনেকক্ষণ পরে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করল।

'আমাকে তুমি ক্ষমা কোর—' সুনন্দ মাধবীর হাত নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করল একবার। 'আমাকে ভুল বুঝো না। দুদিনের হলেও আমাদের সম্পর্ক একেবারে মিথ্যে নয়।'

'বেশ—' মাধবী আবার মৌনতা ভেঙে বলে উঠল।

অনিল নিজের মনেই হাসল। একবার হাততালি দেওয়ার কথা মনে হয়েছিলো। এরকম রসঘন সিন দেখতে দেখতে আমাদের দেশের দর্শকেরা হাততালি দিয়ে পছন্দ-অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু এর পরে কি? বিয়োগান্ত না মিলনান্ত উপসংহার—তাও এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

আবার পর্দা উঠল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে যদিও। এবারে সত্যজিৎ সামন্ত আর মাধবী। অনিল ভাবছিলো এর পরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক দেখায় না। আড়িপেতে শোনার সপক্ষে বেশিক্ষণ কোনো যুক্তিই খাটবে না ভেবে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও কিন্তু যাওয়া হোল না শেষ পর্যন্ত। মাধবীর কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো অনিল।

'আপনি তো সব জানেন কাকাবাবু, এবারে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

'আমার বয়স হয়ে গেছে মাধবী, আই অ্যাম এ্যান ওল্ড ম্যান। বাইরের খোলস দেখে আমার মনকে বিচার করতে চেষ্টা কোর না। তোমাদের মডার্ন টাইমস আমার চোখে আশ্চর্য মনে হয়। আমাদের কালেও স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হোত, কিন্তু তা বলে কথায় কথায় আইন-আদালতে কেউ ছুটত না।'

'আমি কিন্তু আমার মন ঠিক করে ফেলেছি কাকাবাবু।'

'কোথায় যাবে?'

'যাওয়ার জায়গার অভাব নেই। বাইরে মেয়েদের স্কুলে চাকরী নিতে পারি দরকার হলে।'

'কিন্তু সমরেশের কি হবে?'

'শুনেছি ডাঃ বসাক ওঁকে ইউরোপে পাঠানোর কথা বলছেন। শরীর মন সুস্থ হয়ে উঠলে নতুন করে জীবন সুরু করতে ওঁর অসুবিধা হবে না।'

'যাই বল মাধবী'—সত্যজিৎ সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কেমন যেন বিব্রত হয়ে বললেন—আমার মতে তোমরা দুজনেই অতীতকে ভুলে আবার একসঙ্গে মিলেমিশে জীবন সুরু কর। ভুল সকলেরই হতে পারে, কিন্তু তা বলে সেই ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকারও কোন মানে হয় না।'

কোনো উত্তর দিল না মাধবী। ওর স্থিরসংকল্প মুখে আর কোনো রেখার স্পন্দন দেখা গেলো না। এর পরে অনিল আর দাঁড়ালো না। গল্পের একটা প্লট তার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে সুরু করেছে। ঘর ভাঙার গল্প। সমরেশকে কেন জানি একটা নোঙ ছেঁড়া, হাল-ভাঙা জাহাজের সঙ্গে তুল করতে ইচ্ছা করছিল তার। লক্ষ্যহী ভাবে ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে দিকে। কিন্তু তারপর? তার পরের ক ভেবে অনিলের কপালে অনেকগু খাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বারান্দায় শ্বেতপাথরের টেবিলে রামবিলাস শরবতের গ্লাস রোজকা মতই এনে সাজিয়ে দিয়েছে। নিভন্ত নী বালবের আলোয় মুখ দেখা যায় না অন্ধকারের প্লেটে অস্পষ্ট আঁচড়কাট কয়েকটা মূর্তি। টুকরো টুকরো কথা রেশগুলো কানে তখনও ভাসছে তাই নাটকের একটা সিনের অভিন দেখছে ভেবে, অনিল এগি এল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল কমল রঙের গেলাসের গায়ে ঘেমেওঠ বরফের ভাপ। সরু সরু খড়ের কা ডুবোন। কেউ কোন কথা না ব যন্ত্রচালিতের মত গেলাসগুলো টে নিলো।

'তাহলে?' নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথ কথা বললেন সত্যজিৎ সামন্ত। শব্দট প্রত্যেকের মনে নানাভাবে প্রতিধ্বনি মত বেজে উঠল। অন্ধকারেও বোঝ গেলো ওরা চমকে উঠলো। সমরেশ, মাধবী আর সুনন্দ।

'তাহলে আমার জন্য আই-এ সিতে প্যাসেজ বুক করে দেওয়াই ঠিক?' সমরেশ ম্লান হাসল—'ডাঃ বসাক কি বলেছেন?'

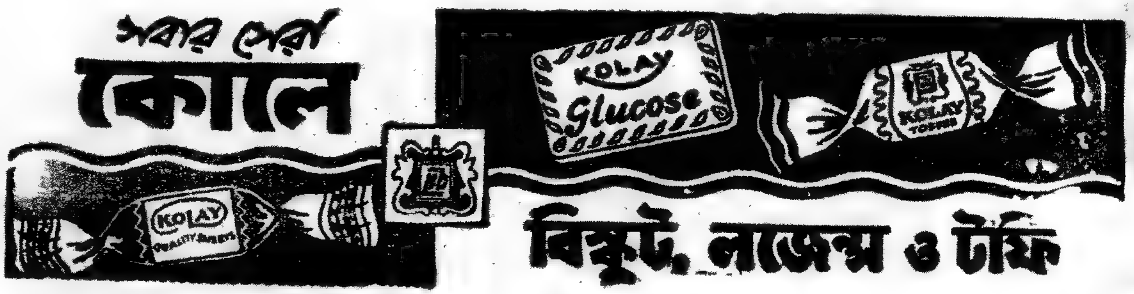

'সমরেশ, তুমি ভালো হয়ে যাবে।' নেন্দ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে রু করল—'অন্তত এক বছর তুমি দি ওদেশে থাকতে পারো।'

'তুমিও কোথায় যেন চলে যাবে লেছিলে—'

'আমাকে যেতে হবে পেটের চিন্তায়। ঃ সামন্তর অনুগ্রহে একটা ভাল কার পেয়েছি।'

'আর মাধবী ? মাধবী, তুমি কি মার সঙ্গে যাবে ?'

নিস্তব্ধতা আরও গভীর হয়ে উঠল য়েক সেকেণ্ডের জন্য। নাটকের াইম্যাক্সে এসে পৌঁছেছি, এবারেই না যাবে গল্পের স্রোত কোন দিকে বে—অনিল নিজের কানে কানে থাগুলো বলল যেন। মাত্র কয়েক কেণ্ড।

'না, আমি তোমার সঙ্গে যাব না—' ধবী নীচু গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

সুনন্দ কাঁপা হাতে লাইটারের আগুন গারেটের মুখে ধরাতে চেষ্টা করছিলো। ঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে বলল—'কি আশ্চর্য মাধবী, অসুস্থ নুষটাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না মরা।'

'বাইরে গেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন, কথা তোমরাই বলছ। তাছাড়া ওদেশে র আত্মীয়-বন্ধু আছেন, যাঁরা যত্ন রবেন আপন লোকের মত।'

'তুমি তাহলে কি করবে ?' সমরেশ য় আর্তনাদ করে উঠল।

'জানি না'—শান্তভাবেই বলল ধবী—'তুমিই বলেছিলে আমাদের ধ্যে একজনকে সরে যেতে হবে। থাটা খুবই সত্যি আজ বুঝতে পারছি। মাদের ঐ ভাঙা-চোরা সম্পর্কটাকে াঁকড়ে ধরে আর বেশিদিন চলতে ারব না।'

আবার নিস্তব্ধতা ওদের কুয়াশার তো ঘিরে ফেলল। সত্যজিৎ সামন্ত স্বস্তির ফলে কপালে রুমাল ঘষতে ষতে বার বার ঘড়ির দিকে চোখ রাচ্ছিলেন। একবার সমরেশ আর একবার মাধবীর মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—

'রাগ করেও ও কথা উচ্চারণ করা অন্যায়। মিসেস ম্যাকলয়েড আমাকে বলতেন—আজকাল ঘরে ঘরে বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণই হোল ছেলেমেয়েদের মনের উচ্ছৃংখলতা। ডিসিপ্লিনের অভাবই এ যুগটাকে নীচুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমার মতে তোমরা দুজনেই দুটি সাইকোলজিকাল কেস। সমরেশের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও চিকিৎসার প্রয়োজন।'

'আপনি যতই রঙিন কাচ চোখে লাগিয়ে জীবনের সব কিছু রঙ-চঙে করে তুলতে চেষ্টা করুন না কাকাবাবু, সেটা ভুল, মিথ্যা। সেই ভুলের স্বর্গ থেকে নেমে আসুন মাটির মরুভূমিতে—' একটানা বলে গেলো সমরেশ।

'আই অ্যাম এ প্র্যাকটিকাল ম্যান', বিরক্তির ঝাঁজ ফুটিয়ে তুললেন সত্যজিৎ

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—
কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র
সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার
সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র জাগ্রত—সদ্য ফলপ্রদ—জীবের মুক্তিদাতা—অন্য শাস্ত্র নিদ্রিত—তাহার সাধনা নিষ্ফল। শ্মশানে সাধনমগ্ন মহাদেব পঞ্চমুখে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—সাধনা, মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তন্ত্রসমুদ্র মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের শক্তি-বীজনিহিত অমূল্যরত্ন এই বৃহৎ তন্ত্রসার আজীবন কঠোরতম সাধনায়—জীবনান্তকর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঙ্কলন সারাৎসার সমাবেশ করিয়া—

মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন

তন্ত্র-মন্ত্র ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ ? গুপ্তসাধন কাহার নাম ? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—
অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই ? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত যন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তার কথার সুরে—'তোমাদের কথাবার্তার হেঁয়ালী আমি বুঝি না। কয়েকটি প্রশ্ন করব—ঠিক জবাব দাও মাধবী। তুমি তাহলে কি ডাঃ মিত্রের সঙ্গেই যাবে ঠিক করেছ।'

'না। দার্জিলিং-এর কনভেন্টে আমি চাকরী নিতে চাই। জীবন সম্পর্কে সব মোহই আমার ভেঙে গেছে।'

'আবার হেঁয়ালীভরা কথা।' প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন সত্যজিৎ সামন্ত।

'আমার একটি অনুরোধ আছে মাধবী—' সমরেশ অনুনয় জানালো—'জানি এখন থেকে রাস্তাটা সমান্তরাল হয়েই থাকবে। তবু তুমি কবে চলে যাবে ঠিক করেছ?'

'ওদের কাছ থেকে ফাইনাল চিঠি এখনও পাই নি, তবে আর তিন-চার দিনের মধ্যেই জানতে পারব।'

'তাহলে পরশুদিন—২৩শে এপ্রিল আমাদের বিয়ের তারিখ, আগেকার মত পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে সেলিব্রেট করা যাক। পারহ্যাপ্‌স ফর দি লাস্ট টাইম। বল—বল তোমার আপত্তি নেই।'

মুখ থেকে অরেঞ্জের গ্লাস নামিয়ে সত্যজিৎ সামন্ত টেবিল চাপড়ে বললেন, 'হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া। মনোমালিন্য মানে বিচ্ছেদ নয়, এই কথাটাই মাধবীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তোমার কোন চিন্তা নেই সমরেশ, আমি আর ডাঃ মিত্র সব কিছুর ভার নিচ্ছি। সোনালী পাড় বসানো আইভরি রঙের কার্ড কালই সকালের মধ্যে ছেপে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেব। লাস্ট গিভ মি দি লিস্ট।'

মাধবীর আপত্তি ছিলো, আপত্তি ছিলো সুনন্দেরও। তবু সত্যজিৎ সামন্তের উচ্ছ্বাসে ওরা বাধা দিতে পারে নি। ২৩শে এপ্রিল সকালবেলা মালঞ্চ নার্সারী থেকে লরি-বোঝাই ফুলের মালা, তোড়া, ফার্ন জড়ানো ফুলের বোকে এসে হাজির হয়েছে। অনেক দিন পর রামবিলাস একতলার বড় হলঘরের জানালাগুলো একে একে খুলে ঝাড়লণ্ঠনের ধূসর কাচ পরিষ্কার করে ফেলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় যেন হীরের চুমকি ঝলমল্ করে উঠছে। ঘরময় মসৃণ মখমলের মত নরম গালিচা বিছানো। দেওয়ালে পুরানো ছবির গায়ে টাটকা ফুলের মালা। ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ ছড়িয়ে আছে সারা বাড়িতে।

সত্যজিৎ সামন্ত নিজে দাঁড়িয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সাদর আপ্যায়নে তৃপ্ত করছেন। ভিড় বেশি নয়। সমরেশের আগেকার চেনা বন্ধু-বান্ধবী-দের মধ্যে বাছাই করে মাত্র কয়েক জনকেই বলা হয়েছে। মনোজ কাপুর, আর তার বাঙালী স্ত্রী মালতী, কমলেশ বসু, অপর্ণা লাহিড়ী, মিঃ ও মিসেস বসন্ত মল্লিক। এছাড়া আছেন বরুণেন্দ্র বসাক, সুনন্দ মিত্র আর ডোরা ডিসুজা। প্রথমে পানীয়ের ব্যবস্থা। বিলিতি প্রথা অনুসারে গোল টেবিল ঘিরে ঘরের একপাশে একটি 'বার' তৈরি করা হয়েছে। ওদিককার ভার নিয়েছে সুনন্দ নিজে। জিনের সঙ্গে লেমন, হুইস্কির সঙ্গে সোডা একের পর এক ঢেলে ঢেলে পরিবেশন করে চলেছে সন্ধ্যা থেকে। মহিলাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সেখানে রঙ-বেরঙের গেলাসে বরফের কুঁচি মেশানো তরমুজের রস, আঙুরের রস, পেস্তা-বাটা সবুজ সরবত। তাছাড়া রূপোর থালায় মুচমুচে কাজু বাদাম ও পেস্ট্রি।

যে ভারী বিষণ্ণতা এ বাড়ির পুরানো ধূসর দেওয়ালের গায়ে ছড়িয়ে থাকে, আজ আলোয়, হাসিতে, আনন্দের প্রকাশে আগাগোড়া তার চেহারা পাল্টে গেছে—অনিল দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবল—একধারে তাসের আসর, মনোজ কাপুর, বরুণেন্দ্র বসাক, অপর্ণা লাহিড়ী আর সমরেশ কনট্র্যাক্ট ব্রিজ নিয়ে বসেছে। গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর ঢাকা তুলে টুং টাং করে বিদেশী সুরের ঝংকার তুলছে মালতী কাপুর। বসন্ত মল্লিক ডোরা ডিসুজার পাশে বসে দু-একটি পানীয়ের প্রভাবে বেশি মাত্রায় প্রগলভ হয়ে উঠেছে যেন। কবে হাজারিবাগের জঙ্গলে বুনো খরগোসের সন্ধানে গিয়ে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল, তারই রোমহর্ষক বিবরণ একটু উচ্ছ্বসিত হয়েই শোনাচ্ছিল ভদ্রলোক। ঘরের উল্টো দিকে গম্ভীর মুখে কান খাড়া করে মিসেস মল্লিক শুনতে চেষ্টা করছিলেন। গল্পটা তাঁরও অজানা। মধ্যে মধ্যে বিষদৃষ্টি দিয়ে স্বামীর চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করছিলেন। সত্যজিৎ সামন্ত যতক্ষণ পাশে বসে সে আমলের ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি শোনাচ্ছিলেন, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দিয়ে ঘাড় নাড়তে হচ্ছিল। এখন তিনি উঠে যাওয়ার ফলে মিসেস মল্লিকের কপালে বিরক্তির স্পষ্ট চিহ্নগুলো ফুটিয়ে তুলতে বাধা ছিল না।

হঠাৎ তাস ফেলে উঠে এসে সমরেশ অনিলকে ইশারায় ডাকলো।

'মাধবী কোথায়? তাকে অনেকক্ষণ দেখছি না।'

ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অনিলেরও মনে হল সত্যিই মাধবী অনেকক্ষণ এখানে নেই।

'বোধহয় উপরে গেছেন কোন কাজে—'

'একবার ডেকে আনতে পার। কমলেশ তখন থেকে ওকে খুঁজছে।'

'যাচ্ছি স্যার। ওধারে টেবিলে খাবার দিতে সুরু করেছে। আর মিঃ ভাণ্ডারকর আসতে পারবেন না, এখুনি টেলিফোনে জানালেন। ওঁর স্ত্রীর অ্যাপেনডিক্স আজই অপারেশন হয়েছে সন্ধ্যাবেলা। একটা প্রকাণ্ড গোলাপের সাজি পাঠিয়ে দিয়েছেন ড্রাইভারকে দিয়ে।'

'মাধবীকে ডেকে দাও।' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সমরেশ।

(ক্রমশঃ)

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

"চৈত্রের বিচিত্র তপ
কহিবেক কেবা।"

সুধন্য চৈত্রমাস। এগারো শ' উনপঞ্চাশ সন। সুবে বাংলার পশ্চিমে রাঢ়ভুমি, বর্ধমান তার শিরোভূষণ। বর্ধমানের অন্তর্গত আঁধারমাণিক গ্রামের আকাশে চৈত্রের দুপুরে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। আকাশ নির্মল। সাদাটে নীল, আগুন ঢেলে দিচ্ছে।

ভরদুপুরে, আঁধারমাণিক গ্রামের শ্মশান প্রান্তর সংলগ্ন সায়রের তীরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সুরকণ্ঠ রায়ের মনে হল মধ্যাহ্নের সূর্য যেন উগ্রতেজা এক উদাসীন সন্ন্যাসী। তপস্যার তেজে দাউ দাউ করে জ্বলছেন, শরণার্থী ভক্তদের যে কত কষ্ট হচ্ছে সে কথা তাঁর মনে নেই। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মনে এল হোমকুণ্ডের কথা। মনে হতে হাসলেন সুরকণ্ঠ। মদের নেশায় মানুষ অমনি ঈষৎ হাসে। এখন সুরকণ্ঠের দুপুরের নেশা লেগেছে। কি দুপুর। চারিদিকে রোদ বন্য উল্লাসে দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে মরীচিকা কাঁপে। কোন শব্দ নেই অথচ এই নীরবতাই যেন অনেক সেতারের ঐকতানের মত সঙ্গীতমুখর। এই অটুট মৌনতার গৌড়সারঙ্গে ডুবে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন প্রাচীন অর্জুনগাছের গায়ে হেলান দিয়ে। এমন একলাটি দাঁড়ালে আজকাল প্রায়ই তাঁর মনে আশ্চর্য সব অনুভূতি জাগে। যেমন এখন মনে হল কোথায় যেন পঞ্চতপা সন্ন্যাসীরা সব ধূনী জ্বেলে শিবপূজোয় বসেছে, স্বয়ং শিব যেমন বসেছিলেন একদিন।

শিব, শিব, শিব, বারতিনেক বলতেই সুরকণ্ঠের শরীর রোমাঞ্চিত হল। রাঢ়বাংলার প্রায় প্রতিটি জানা-অজানা শৈব ও শাক্তপীঠের ধুলো মাড়িয়েছেন তিনি। শিবভক্ত প্রমত্ত যক্ষের মত উদ্দাম দামোদর এবং জয়দেবের সঙ্গীতসিক্ত শান্ত অজয়ের নম্র জলে স্নান করেছেন। কুলীন নদীকন্যা কংসাবতী, গ্রাম্য ললনার মত অস্ফুটভাষিণী মধুগঙ্গা ব্রাহ্মণী ও বাবলার জলে মাথা ডুবিয়েছেন। কখনো স্বচ্ছ জলে পথের রাঙা ধুলো ধুয়ে গেছে, কখনো বা শ্বেত উত্তরীয় লাল করে এনেছেন মহাবর্গার রাঙা জলে।

সুরকণ্ঠ জানেন, রাঢ়বাংলার রক্তাভ মাটি, রুক্ষ প্রান্তর, আর গৈরিক নদীজলে শুধু একটি দেবতার আসনই পাতা। শ্মশানচারী পুরুষ, আত্মভোলা উদাসীন, শক্তির পদতলশায়ী শিব। দেবতাদের সংসারের আদিপুরুষ। এক তাঁর মধ্যেই সকলে আছেন।

এ চৈত্রের আকাশ তাঁর হোমকুণ্ড, আঁধারমাণিক গ্রামখানি ভক্তের মত পড়ে আছে পদতলে।

"কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি।"

যাঁর আদেশে সব হয়, যেন তাঁরই আদেশে কোন বিশ্বকর্মা এখন সুরকণ্ঠের মানস চোখে আঁধারমাণিক গ্রামের

পটখানি লিখতে থাকলেন, চৈত্রমাসের ছবি।

ফুল্লরার দুঃখের পাঁচালীতে চৈত্রমাসের পরিচয় বড় নিষ্করুণ। নিদয়ার বউ ফুল্লরা, সায়বেনের ঝি বিপুলা, সাগর-ছেঁচা রত্ন পাবার আশায় সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে নিরুদ্দেশ সওদাগর ধনপতির ঘরণী খুল্লনা দুঃখের দিনে চৈত্রমাসে বড় কষ্ট পেয়েছে। জীবনে দুই ঋতু। একটি সুখের, আর একটি দুঃখের। একের অন্তে অপরের উদয়। গাঙ্গিনী, বল্লুকা, চাঁপাই নদীর জলে এখনো বোধহয় দুঃখের দিনের বউ-ঝিয়ারীর কান্না ছলছল করে।

বিশ্বকর্মার পটে সে কান্নার ছবি এল না। তাঁর বুঝি মনে হল এ শুভ চৈত্রমাসে স্বয়ং শিব বসেছিলেন পঞ্চতপা। অন্নপূর্ণা মূর্তিতে মহামায়া স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন বাংলার ঘরে। তাঁর প্রসাদে মঙ্গল চৈত্রমাসে অন্নদা-পূজো। তাঁর কৃপায় সামান্য পাটনী সন্তানকে দুধেভাতে রাখে, পদ্মপাতার আবরণ যার অবলম্বন সে দুঃখিনীর দুঃখও নিমেষে তিরোহিত হয়।

একথা যেই মনে হল, সেই তিনি ধনী-দরিদ্র সব গৃহস্থের উঠোনে, ক্ষেতে, গোলাবাড়িতে, দরদালানে হলুদ ও সোনালি রঙে সুপক্ব রবিশস্য আঁকলেন, গোয়ালে গরু, উঠোনে ধান খুঁটে খাওয়া পায়রা, পূজোর দালানের আঁধার কোটরে লক্ষ্মী পেঁচা, গোলাঘরের পাশে শালিক চড়ুই-এর ঝাঁক এঁকে দিলেন। তারপর গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ, লালচে সবুজ রঙে আঁকলেন বেল-শিরীষের কচিপাতা, ডালে ডালে নতুন আম।

পটটি দেখলেন। দেখে দেখে যেন মন প্রসন্ন হল, দোরের পাশে ভরা-কলসী ও জোড়ামাছ, কলাগাছ দেখলে যেমন প্রসন্ন হয় উৎসবগৃহে অনাহূত, শ্রান্ত, উপবাসী আগন্তুকের মন। তিনি লেখেন এবং গোটানো পট প্রসারিত করেন। ক্রমে দেখা যায়, ছোট-বড় ইটের বাড়ি, মাটির চালা সুশোভিত আঁধারমানিক গ্রাম। এ গ্রামের ঘরঘরা দেবপ্রণী তাই ঘরে ঘরে দেবমন্দির। কালচে লাল রঙের প্রাচীন পাতলা ইটের বাড়িগুলির মাঝে মাঝে ঘাটলা শোভিত শ্যাওলা-সবুজ পুকুর এবং দীঘি। মাঝ দিয়ে ইট বাঁধানো পাকা রাস্তা ধুলোয় ঢাকা। দু'পাশের গাছ, কচু ঝোপ, গৃহস্থবাড়ির লাউমাচা সাদা, মিহি, অস্বচ্ছ ধুলোর ঢাকা। পূব আকাশে শিশু সূর্যের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ দেখলে যেমন এই মনে করে কষ্ট হয়, যে মানুষের আশা কত অক্ষম, ধুলোর এ চৈত্রী-রুক্ষতা দেখলেও মন যেন তেমনি বিষণ্ণ হয়। মনে হয় গৃহস্থের চেষ্টাই সার, এ-ধুলো কোনদিন আর স্বচ্ছ হবে না।

গ্রামের মাঝে একটি চওড়া মস্তবড় চত্বর। সবাই একে হাটতলা বলে। শনি-মঙ্গল বারে এখানে যে হাট বসে তাতে "চাইবে বাঘের দুধ মিল্যে গো" বলে এ-গ্রামের বৃদ্ধা কুলাঙ্গনারা ভিন-গাঁয়ের ঝিয়াড়ি, এ-গাঁয়ের বহুড়ীদের কাছে দ্বিপ্রহরে পুকুর ঘাটে গর্ব করে থাকেন।

বিশ্বকর্মা বড় যত্নে হাটতলার পূবের আটচালা ঘরটি আঁকেন। এ-আটচালার বয়সের বুঝি গাছপাথর নেই। তিনদিকে চাপা দেওয়াল, সামনে পাশাপাশি কাঠের দরজা। দরজার কাঠে কত না কারুকাজ। মাঝে মাঝে পেতলের কটকী ফুল। সব দরজা খুলে দিলে আটচালার ভেতরটি আলোয় হেসে ওঠে। দোল পূর্ণিমায় এ-আটচালায় এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে এগারোটি কৃষ্ণবিগ্রহ এনে এগারো ঠাকুরের দোল হয়।

আটচালার শোভা নয়নাভিরাম। এর উন্নত চূড়া, দু' পাশের ঢালু চাল দেখলে মনে পড়ে মন্দিরের কথা। এমন সুষম সুন্দর গঠন রাঢ়বাংলার দেব-মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। কে এই আটচালা গড়েছিল তা কেউ জানে না। এদেশে কি দেবমন্দিরের স্থপতি, কি আটচালা, চারচালা, জোড়চালা ঘরের কারিগর, কেউই নিজের নাম উত্তরপুরুষের জন্যে লিখে রেখে যেতে জানে না। এর ছাউনির খড় এমনভাবে বিন্যস্ত যে দূর থেকে মনে হয় কে বুঝি সশীর্ষ ধানলতা এঁকে দিয়েছে সারি সারি, যেমন ধানলতা লক্ষ্মীপূজোর আলপনায় দেখা যায়। চালের নীচে সারি সারি ছাঁটা খড় ও শোলায় গড়া কদমফুল, ময়ূর। কাঠের খুঁটির গায়ে কত না কারুকাজ, মাটির দেওয়ালে লাল, সাদা, কালো রঙে আঁকা শালিক পাখীর সংসার, কেঁড়ে হাতে গোয়ালিনী বউ। জোড়া সিংহ এবং দণ্ড হাতে স্থূলবপু দ্বারীর কৌতুকচিত্র দেখে মনে হয় এ-ছবির শিল্পী যেন তীর্থচ্ছলে উড়িষ্যা দেখেছিল, সিংহের উত্থিত পুচ্ছে, দ্বারীর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে উড়িষ্যা-শৈলীর প্রভাব আছে। এ-আটচালার প্রাঙ্গণে প্রত্যহ ঝাঁট পড়ে, সন্ধ্যায় ধূপদীপ জ্বেলে দিয়ে বৃদ্ধ সনাতন হরিনাম করে।

রাজপথ গ্রাম থেকে চার ক্রোশ দূরে। মধ্যবর্তী জমিতে একদিন ছিল আম বাগান, এখন গভীর জঙ্গল। জঙ্গলে ঘন নিবিড় অন্ধকার। খটাস, হায়েনা, নেকড়ে, চিতাবাঘ, শেয়াল, সজারু এখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে। মাঝে মাঝে পাখমারারা জাল হাতে এসে পড়ে, তখন তিতির, বটের, হরিয়াল, শ্যামা, দোয়েল, টুনটুনি, টিয়া, ডাহুক, ময়না, ছাতারে পাখীর শঙ্কিত ডাক শোনা যায়। ফলগাছে বলতে গেলে ফলন নেই। আম, সপেদা, জাম, পেয়ারা, লিচু, গাব ও কাঁঠাল গাছের মাঝে মাঝে দেখা যায় শাল, ঘোড়ানিম, গজাড়, শ্যাওড়া, শিমুল গাছের উন্নত মাথা।

এ-বনে কুচিৎ মানুষ প্রবেশ করে। প্রাচীন এক নিমজ্জিত দীঘি ছাড়া অন্য জলাশয় নেই যে পথিক প্রলুব্ধ হবে। সতীনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন বাউরীদের বউ কবে এখানে এসে গলায় দড়ি দিয়েছিল সেই থেকে ঝড়-বাদলের সময়ে এ-জঙ্গলে প্রেতিনীর হাসি, অমানুষী আর্তনাদ শোনা যায় বলে প্রবাদ। অতি বড় দুঃসাহসীও এ-জঙ্গলে সন্ধ্যার পর ঢোকে না।

দিনমানে আসে রাখাল-বালক। আর টানাগাছি পরে, শণের দড়ি

ঝুলিয়ে ত্রিজটার বয়সী অন্ত্যজ জাতের বুড়ীরা কুড়োয় কাঠকুটো লতাপাতা, ওদের শালপাতার কুঁড়েতে খুদভাত রাঁধবার জ্বালানী। তা ছাড়া বুনো সোনাফল, শিমুল তুলো, শেয়ালে খাওয়া কাঁঠাল। বিশেষ বিশেষ তিথিতে শিষ্যদের নিয়ে বৃদ্ধ কবিরাজ আসেন ওষুধ খুঁজতে, বছরে দু'তিনবার।

রাজপথ আর গ্রাম। মাঝে এই বন যেন নিষেধের মত। এ-গ্রামের মানুষ ক্বচিৎ সে নিষেধ অবহেলা করে। মাঝে মাঝে শুধু গ্রাম ছেড়ে চলে আসে রাজ-পথে। দেখে নেয় স্থির, শান্ত গ্রাম-জীবনের বাইরের পৃথিবীর চঞ্চল প্রাণ-প্রবাহ। দেখে তাঞ্জাম শকটে ধনী চলেছেন নীলাচলে রথ-উৎসবে। কাঙালী, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, বৈষ্ণব চলেছে সাথে সাথে। শোনে তাঞ্জাম-বেয়ারাদের পথ চলবার গান। অবাক হয়ে দেখে তাদের লাল জামার আস্তিনের ওপর পরা মোটা মোটা পেতলের বালা, পায়ে মোটা কাপড়ের পটি। দেখে, ঘোড়া উটের পিঠে নাগড়া নিশান দিয়ে, সিপাহী লস্কর ঘোড়া হাতী নিয়ে নবাব চলেছেন উড়িষ্যা। কখনো যুদ্ধে, কখনো মসনদে বসতে। দেখে দাঁতাল হাতী দাঁতে বিরাট লোহার শেকল নিয়ে ঝনঝন শব্দে চলে যাচ্ছে। সার সার রেশমমোড়া পাল্কীতে চলেছে নবাবের হারেম, দাস-দাসী, নফর-বাঁদী, মশালদার, বাজনদার, রসদদার, আমলা, গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা, কাতারে কাতারে মানুষ।

যার যে কাজ, তাকে সে ঠাঁই-এ বসিয়ে তবে বিশ্বকর্মার পটরচনা সাঙ্গ হয়। আঁধারমাণিকের পটে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষ গৃহকার্য, রাজকার্য, দেবকার্যে ব্যস্ত। কুমোরে চাক ঘোরায়, তাঁতি তাঁত বোনে। জেলে ফেলে জাল আর সূত্রধর, কাঁসারি, স্বর্ণবণিক, কর্মকার গড়ে দুর্গাপিঁড়ি, গরু-গাড়ির চাকা, পাল্কী, নালকী, ডুলি, গন্ধেশ্বরী বাটি, থালা, পিকদানী, ঘড়া, বাজু, পৈঁছে, নোলক, মল, লাঙলের ফাল, দা, কুড়োল। বাগদী, তেওট, কেওড়া, বাউরী, পদ্মরাজ, লোহ্‌, বাগালি, এরা চাষ করে, তা ছাড়া চালী, চুনী, ঢাকী, থাছী, ইত্যাদি বৃত্তিতে ব্যস্ত থাকে।

ভিখারী ফকির বৈষ্ণবের ভিক্ষা করাই কাজ। হরিনাম, সত্যপীরের কিচ্ছা বা কালীয়দমনের গান মুখে নিয়ে গৃহস্থের দরজায় দাঁড়ালেই তাদের পাত্র ভরে ওঠে। মাঝে মাঝে কামারবাড়ি গিয়ে তারা ধন্না দিয়ে বসে থাকে এবং নানা মিষ্ট কথায় কর্মকারকে তুষ্ট করে ভিক্ষার কাঠের পাত্রটি লোহার বাঁধিয়ে নেয়।

দেবতার লেখা পটে এগারো শ' ঊনপঞ্চাশ সনে আঁধারমাণিক গ্রামের চৈত্রমাসের আকাশ নির্মেঘ, নির্মল।

অথচ মানুষের মনে শান্তি নেই।

সুরকণ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন অর্জুন-গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। সায়রের কাকচক্ষু জলে তাঁর ছায়া। ঐ জলের মত স্বচ্ছ তাঁর মন। সে মনে সংসারী ভাবনা কৃচিৎ ছায়া ফেলে, তাই মুখের চেহারায় একটি আশ্চর্য প্রসন্নতা। তাঁর প্রৌঢ় চেহারা, কাঁচা-পাকা চুলের সঙ্গে একটু বেমানান, কেন না সে প্রসন্নতা শিশুর মত, নিরুদ্বেগ।

অনুভবে তিনি অনেক কিছু জানতে পারেন। একটু আগে যেন অন্য একটা ভাবের ঘোরে ডুবে ছিলেন। কে যেন তাঁকে গ্রামখানির ছবি বার বার দেখাচ্ছিল। যেন আশ্বাস দিচ্ছিল, সব ঠিক আছে, যেমনটি থাকবার, তেমনিই। উদ্বিগ্ন হয়ো না।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ো না বললেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? মনের ভেতর আরেকটা মন থাকে। 'তোমার ভেতর মহলের পাহারাদার। আমরা বলি হৃদ্‌কমলের ভোমরা। পক্ষ মুড়ে থাকে তাই টের পাও না।'

হাঁটু অবধি কাপড় তুলে অজয়ের জল পেরোতে পেরোতে এক নিদন্ত বাউল এই কথাটি বলেছিল। তা সুরকণ্ঠের সেই মনের ভেতরের মনটি সর্বদা জেগে থাকে। আশ-পাশে, জগৎ-সংসারে নতুন কিছু অঘটন ঘটবার আগে সুরকণ্ঠ খবর পেয়ে যান। শরীরে চাঞ্চল্য হয়, কাঁধের পেশী, বাহুমূল থনথন নড়ে, পেট দিয়ে পিঠ দিয়ে একটা শিরশিরে উত্তেজনা

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

চলে-ফিরে বেড়ায়। আশ্চর্য, ছোটখাট কিছু ঘটলে ত' আগে জানতে পারেন না সুরকণ্ঠ, তিনি সঙ্কেত পান এমন সব ঘটনার, যাকে শাসনে আনা বিধাতারও সাধ্য নয়। তাই, সুরকণ্ঠের মনে হয় বিধাতা তাঁকে নিয়ে পরম কৌতুক করেছেন।

শুধু যে অনুভব তাই নয়। গণনাও মাঝে মাঝে তাঁকে আশ্চর্য পথনির্দেশ দেয়। আজও দিয়েছে। এখন তাই চোখ তীক্ষ্ণ ক'রে দেখছেন তিনি প্রকৃতির কোথায় কি দুর্লক্ষণ চোখে পড়ে। একটা কিছু চোখে পড়া দরকার। নইলে যে আচারী বাবার কথা মিথ্যে হয়ে যায়। আচারী বাবা বলেছেন, 'ভূমিকম্পে জলোচ্ছ্বাসে অগ্ন্যুৎপাতে- - -'

'আঃ ওই যে!'

সুরকণ্ঠ হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন। আকাশ থেকে একটি চিল ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ছে, দুরন্ত তাপে এমন হয়। কিন্তু তিনি গণনায় জেনেছেন এইভাবেই নির্দেশ পাবেন। একটি পাখী বা প্রাণী অতর্কিতে মরে যাবে। তারপর তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল। ভাল নয়, এ ভাল নয়। এরপর কি হবে?

'কি দেখলে? দেখলে কিছু?'

টিলার আড়ালে গাছের ছায়ায় কখন এসে বসেছিল পাগল। সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাতি পুত্র। কেমন জ্ঞাতি, ক'রাত্তিরের জ্ঞাতি, কিছুই জানেন না সুরকণ্ঠ। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর ঘাড়ে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এসে অবিশ্যি বলেছিল, 'খুড়ো, তোমার একটা চাকর-ও ত' দরকার। এ অধীনের সব কিছুই আসে। পা টিপব, হুঁকোয় জল ফেরাব, হাট-বাজার যা বলবে সামলে দেব, মাতাম'র সম্পত্তি যা রেখেছ তার আদায়তশীল যা বল- - -'

'তুমি একা নাকি?'

'এ সংসারে দোকা কে, শুনি? বলি দোকা কে? একলা এয়েছ, একলা চলে যাবে।'

দেহতত্ত্বের কথা ব'লে পাগল টপ ক'রে সুরকণ্ঠের পিসীমার পা দু'খানা কোলে তুলে টিপতে সুরু করে। বলে, 'এমন পা টিপে দেব, বুঝলে ঠানদি, যে মনে রাখতে হবে। বলতে হবে হঁ্যা, পাগল পা টিপেছিল বটে।'

শুধু কি পা টেপা? হেঁইও হেঁইও করে কাঠ চ্যালা ক'রে ঢেঁকশেলে বোঝাই করে পাগল, মেয়েমানুষের মত উঠোন ঝাঁট দেয়। আদায়তশীল কি করে না করে তা ওই জানে, তবে পিসীমাকে হাত করে এ বাড়িতে সে থেকে গেল।

কেমন ক'রে যে সে তাঁর বাড়িতে থেকে গেল তাও এতদিন বাদে মনে পড়ে না। কবে সে ছিল না আজ সে কথা মনে করা মুস্কিল। মাঝে মাঝে সুরকণ্ঠের মনে হয় ও স্বয়ম্ভু। কোথাও কিছু নেই, শূন্য থেকে বাতাস ফুঁড়ে উঠল, আর সেই থেকেই রয়ে গেল এ সংসারে। সে যে একদিন ছিল না, সে কথা সুরকণ্ঠের মনে থাকে না। তবে সে না থাকলে কি হবে ভাবতে গিয়ে ভয় পান। পাগল আছে বলে পিসীকে রেখে নিশ্চিন্ত আছেন তিনি।

সুরকণ্ঠকে আবার সে জিগ্যেস করে, 'বলি দেখলে কিছু?'

'হঁ্যা রে, পঞ্চাশ সনের বর্ষফল দেখছি।'

'ঐ আচাজ্জিদের নেড়া মাঠে? দুগ্গা, 'দুগ্গা বাড়ি চল।' সভয়ে পাগল চারিদিকে চাইল। বিড়বিড় ক'রে বললে, 'আমি নামে পাগল, তুমি জাত পাগল। এই ভরদুপুরে ভূত নামিয়ে বোস কিনা তার ঠিক কি?'

'কি দেখলাম জানিস?'

'জানতে চাই না বাপু, তুমি ঘর চল।'

'দেখতে পেলাম আচারী বাবার কথা সব সত্যি।'

'এই অসময়ে আবার সে মড়াখেগো বামুনের নাম কেন?'

'দেখিস, দেখবি, চত্তির মাসে পাঁচটা রোববার।'

'চড়ক কবে গো?'

'বড় দুর্লক্ষণ, বুঝলি পাগল? ফলে শস্যহানি, প্রাণনাশ, মহামারী, কে জানে কি হয়।'

'সে কি কথা গো? তা' হলে চড়কতলায় সন্ন্যেসীরা নাচবে না?'

পাগলের কথার জবাবে কটমট ক'রে চেয়ে সুরকণ্ঠ টিলা থেকে নেমে এলেন। এখন দুজনে বাড়ির দিকে চলতে থাকেন। সুরকণ্ঠ সুপুরুষ, দীর্ঘকায় প্রৌঢ়, লম্বা হাত দুটি দু'পাশে দুলতে থাকে, চটির আগায় ধুলো ওড়ে, পিরাণের ফাঁকে দেখা যায় গলায় সোনার হার।

পাগল বেঁটে, শীর্ণ, দেহ আন্দাজে মাথাটি বড়, ছাঁটা চুলে লিকলিকে শিখাটি উঁচুতে গেরো দেওয়া। সাদা ছাতাটি প্রভুর মাথায় ধরে সে আধা দৌড়োয়, আধা হাঁটে। তারপর, প্রভুর দিকে প্রত্যাশী নয়নে চেয়ে বলে, 'বুড়ি বলছিল চুঁচড়োয় খবর করবে, আমায় যেতে বলছিল।'

সুরকণ্ঠ শোনেন না। সুর ভাঁজতে থাকেন।

'আমি বললাম তাড়া কি, অক্ষয় তৃতীয়ায় দাঠাকুর নিজে যাবে।'

'আমি কি শ্মশানে ডরি—' সুরকণ্ঠ গুন্‌গুন্ ক'রে গাইতে থাকেন।

'আমায় শুধোলে প্যায়দা আসবে কবে। আমি বলি দাঠাকুর ত' আর নতুন নয় এ কাজে। বায়না নিয়েছে যখন, নির্ঘাৎ গণে দেবে।'

এতক্ষণে সুরকণ্ঠ কথা খুঁজে পান ও গেয়ে ওঠেন—

'আমি কি শ্মশানে ডরি
মা যে আমার শ্মশানবাসী।'

তাঁর গম্ভীর মধুর কণ্ঠ গ্রামের নির্জন দুপুরকে সচকিত করে।

'শ্মশান আমার কৈলাস মা,
শ্মশান আমার গয়াকাশী' - - -

'দেখ পাগল, বলে দিগে যা আমি ঘরে যাব না।'

'এই দেখ, তিনি যে ভাত নিয়ে বসে আছে - - -'

'মুণ্ডমালা মুণ্ডমালা মুখে অট্ট অট্টহাসি--- হ্যাঁ, তুই বলগে যা---মুখে অট্ট অট্টহাসি---যা চলে।'

'আহা বাড়াভাত নিয়ে তিনি যাবে কোথায় শুনি? থালা কোলে বসে আছে ত' বসেই আছে---'

'আরে এ ব্যাটা ত' মহাগোল বাধালে! আমি এখন চড়কতলায় যাব। তারা কতদূর থেকে এসেছে, আমি না গেলে হবে কেন? যা, ঘরে যা!'

'বটে!' টপ করে পাগল ছাতা বন্ধ করে নিলে। সুরকণ্ঠ তালুতে হাত রাখলেন। এতক্ষণে সুরকণ্ঠের দাড়ি দেখা যাচ্ছে। পাগল এবার কোমরে হাত দিয়ে ছাতায় ভর রেখে দাঁড়ায় ও রুক্ষ গলায় পালটা জবাব দিতে থাকে, 'বলি অত গরম দেখাচ্ছ কি, অ্যাঁ? যাবে ত' যাবে, যত রাজ্যের হাড়ি-বাগদীর সঙ্গে বসে গাজা না খেলে হবে কেন, তোমার কোন দোষ নেই ত', উনি ভগীরথ এয়েছেন, সকলকে উদ্ধার করবেন!'

সুরকণ্ঠ পালটা ধমক খেয়ে একটু যেন বোকা হ'য়ে যান। বিব্রত গলায় বলেন, 'এই দেখ! বলি, হ'ল কি?'

'যে চুলোয় যাবে যাও, তিনটে প্রাণীকে উপোসী রাখ কেন বাপু? দুটো চুন দিয়ে পেটে ভাতজল দাও, তারপর যাও না কেন যেথা যাবে।'

সুরকণ্ঠ পরাস্ত। গানের সুর যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেছে। আর ধরা যাবে না।

'আমার যেমন মতিভ্রম, আঁকড়ে পড়ে আছি। চলে গেলেই পারি। এই ত' সেদিনও হাটবারে মদনের সঙ্গে দেখা। বলে, দাদা যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন ফিরে চল দিখি। আমি বললাম, যেতে কি আর মন চায় না রে ভাই, তবে ঐ বুড়ীর জন্য মনটা টানে।'

'না পাগল, তুই যাস নে', সুরকণ্ঠ মিনতি করে বলেন। এখন দেখা যায় বড় বড় গাছেঢাকা নীচু ভিতের বাড়ি, পাঁচিলের ধারে ছোট দরজা। একখানা পাল্লা ভাঙা। ঢোকবার মুখে আগড় দেওয়া। দরজাটি বড় নীচু। সুরকণ্ঠ মাথা নুইয়ে ঢুকলেন।

আম কাঁঠাল সজনের ছায়ায় উঠোনটি ঠাণ্ডা। জবা, রাধামালতী, রঙ্গন, টগর, বারোমেসে অপরাজিতা ও শিউলির গন্ধে আমোদিত। গোয়ালের ছিটেবেড়ার গা বেয়ে উঠে গেছে কুমড়ো-লতা। বাড়ির সামনে টানা রোয়াক। রোয়াকে সজনে গাছের ছায়া। সে ছায়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধা। পেঁজা তুলোর মত ফুরফুরে সাদা চেহারা। সাদা ভুরু, চোখের পাতা সাদা। চামড়া কুঁচকোন রোগা পা দুটি মেলে তিনি শান্ত হয়ে বসে আছেন।

তাঁকে দেখেই সুরকণ্ঠ যেন নিমেষে শান্ত হয়ে যান। উঠোনে দাঁড়িয়ে একটু মাটি খোঁড়েন বুড়ো আঙুল দিয়ে, মাটিতে ছোট ছোট দাগ নাড়েন, অবাধ্য গরু গোয়ালে ঢোকবার আগে যেমন করে।

'দাদাতে কি চায়? বাইরে গেলে ওনার মন যেন ঘুড়ির মত উড়তে থাকে।'

বাইরে যেন চেষ্টা করেও বিবাগী সুরকণ্ঠের মনের নাগাল পায় নি পাগল। দুপুরের নির্জনতা, চৈত্রের রুক্ষতা, নিরাসক্ত সুরকণ্ঠ যেন ছিলেন তাদেরই দলে। পাগলের কথাবার্তা তাঁর ভেতরে যাচ্ছিল না।

বাড়িতে ঢুকে পাগল দেখে ঢেঁকশেলের পাশে অব্যবহৃত হবিষ্যি-ঘরে চরকা, তুলোর পাঁজ, ঢেঁকো। আড়ার সঙ্গে ঝুলছে পুঁটলী বাঁধা শাক, মুলো, বেগুন, সরষে, লাউ-এর বীচি, তুষ ভর্তি জালা। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পাগল মনে জোর পায়। জোরে জোরে বলে, 'কই, তেল গামছা দাও না গো।'

সুরকণ্ঠ রোয়াকে বসে পড়েন ও ধুতির খুঁট নেড়ে বাতাস খান। (ক্রমশঃ)

সুন্দর

শ্যাম রায়

বর্ণে চর্মে বর্ণী কি সুন্দর?
স্নিগ্ধতার সৌন্দর্য বুঝি কুসুমে আস্তীর্ণ?
তাই যাকে ভালবাসি তারই রূপ
আরোপ করি সৌন্দর্যে।
শুধু মুহূর্তের ভাবনায় থেই নাই
তাই গভীরতার পরিমাপ করি না।
ছুটির দিনে ক্লান্তির অবসানে
সুন্দরকে ভেবে দেখি—
দেহের বাইরে—মনের রাজ্য,
দুটো যেন একসূত্রে বাঁধা।
যেখানে সাজানো বাগান—পুষ্পের সুরভি
শক্তির সমারোহ—অমিত আশা,
অশান্তির প্রক্ষেপে—শান্তির কামনা,
সৃষ্টির উল্লসিত স্বপ্ন,
সেখানেই অতনু গৃহের অর্গলমুক্ত নিস্পৃহ প্রবেশ।
শিব-দৃষ্টিচ্যুত ভস্মে তিল তিল করে গড়া
রূপের আবরণ তলে
প্রাণোচ্ছল মোহন জীবনের স্পন্দন।
সেই সৌন্দর্যের প্রতীক প্রতিষ্ঠিত
সর্ব হৃদয়ের শতদলে, মাঠে, ঘাটে, জনতায়
বন্দরে, গঞ্জায়, উদার হিমালয়ে
সুন্দর।

বঙ্গ দর্শন

● মুষলধারে বর্ষণের পর কলকাতার রাজপথের একটি দৃশ্য

রাজধানী :

প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র। শহর কলকাতাতেও এর মধ্যে একদিন মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছিল। একটানা বৃষ্টি শহরবাসীর জীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজপথের যান চলাচল। জলে আটকপড়া সত্তরটি মোটরযান থেকে উঠেছিল সেদিন উদ্ধারের আর্তকণ্ঠ। মেঘের আনাগোনার বিরতি এখনও ঘটে নি। মাঝে মাঝেই বর্ষণও চলেছে। শহরতলীর খানা-ডোবা এখন কাণায়-কাণায় পূর্ণ। একটু জোরে বৃষ্টি নামলেই শহরতলীর রাস্তা-ঘাট ডুবে যায়। কোথাও তিন ঘণ্টা, কোথাও বা আট ঘণ্টা শহরের উপ-কণ্ঠের নিম্নাঞ্চলের মানুষকে চলতে হয় এই জল ভেঙে।

ঋতুর রাণী বর্ষা। কবির কল্প-লোকে সে দেখা দিয়েছিল পরমা-সুন্দরী রূপে। সুন্দরী বর্ষা কাঁখে নিয়ে আসে মঙ্গল-কলস। তার অমৃত ধারায় সজীব হয় অর্ধ-মৃতা ধরণী। বর্ষাই বাংলার বল ও ভরসা। 'ঘনঘোর বরষায়' গৃহের নিভৃত কোণে মুখোমুখি বসে পরমানন্দে 'যে-কথা বাজিবে না কানে' তাও বলা যেতো। আজ আর সেদিন নেই। পরমাসুন্দরী রূপেই বর্ষা এবারেও এসেছে। আদল তার হয়তো বদলায় নি একটুও। নয়ন-মনোহর শ্যামলশ্রী ফুটে উঠেছে আগের মতই দিকে দিকে। কিন্তু 'নয়ন ভরিয়া' তাকে উপভোগের সুযোগ গেছে হারিয়ে। এখন ঘন-বরিষণের দিনে নিরালা বাতায়নে বসবার উপায় নেই। মুখোমুখি বসা তো দূরের কথা সামনা-সামনি হওয়াটাই বিপদ। ঘরে দেশলাই নেই। বৃষ্টিতে ভেজা ঘুঁটে, গুল আর কাঠে অগ্নিসংযোগ দেশলাইয়ের একটি কাঠিতে সম্ভব নয়। দাম বেড়ে যাওয়ায় জাতের দেশলাই সব দোকানে পাওয়া যায় না। কাজেই ছুটতে হচ্ছে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দোকান থেকে দোকানে। একটু চোখোচোখি হতেই গিন্নীর উত্তেজিত কণ্ঠ উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছোয়। অমুক কলের মালিক তেল দিচ্ছে। ভেজাল তেল? ক্ষতি কি? সবাই তো তাই আনছে। কীটদষ্ট শতছিন্ন ছত্র মাথায় নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে 'কিউতে'। চাল পাওয়া যাচ্ছে না এ-তল্লাটে। ছেলেটা স্কুল কামাই করে বৃষ্টিতে ভিজে এ-দোকান, সে-দোকান করে সর্দিজ্বরে পড়েছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানে যা' পাওয়া গিয়েছিল, তিন দিনেই শেষ হয়েছে। কাজেই বে-পাড়ায় খোঁজ করে কালোবাজারীকে সন্তুষ্ট করে চাল আনতে না পারলে হাঁড়ি চড়বে না উনুনে। দুর্ভাবনায়, ছুটোছুটিতে হারিয়ে গেছে বাঙালীর সুকুমার সৌন্দর্য-পিপাসু মন। কর্দমাক্ত, গর্তেভরা, পিচ্ছিল পথের কুৎসিত অবস্থাটা ভেসে উঠছে চোখে। তাড়াতাড়ি ছুটে চলার উপায় নেই। ছুটে চলতে না পারলে অনটনের সংসারের চাহিদা মিটিয়ে আফিসে ঠিক সময়ে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। বড়বাবু, বড়সাহেবের রক্তচক্ষুর ভয় রয়েছে। লাল কালির ঢ্যারা কেটে তাঁরা ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র নন। তিক্ত, কষায় বচন দু'চারটে না ছুড়ে তাঁরা ছাড়েন না।

পূর্ণ যৌবনা, সুন্দরী বর্ষার রূপ-লাবণ্য উপভোগের—তার সাথে অবসর বিনোদনের দিন এমনি করে কবে কোনদিন, কোন সালে আমরা হারিয়েছি স্মৃতিপথচারণ করে তার হদিসও আজ আর করা সম্ভব নয়। তবু, প্রতি বছর বর্ষা-সুন্দরীর প্রতীক্ষায় দিন গুণি। ভুবন-ভোলানো রূপের পূজার সুযোগ হারালেও তাকে আমাদের বড় প্রয়োজন। সে আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের অন্নদায়িনী। তার অমৃতধারা বর্ষিত না হলে এই বিজ্ঞানের যুগেও আমাদের মুরুব্বিরা হতাশ হয়ে পড়েন। বর্ষার অমৃতধারাকে ধরে রেখে বিপদের দিনে সিঞ্চনের অথবা ধরণীর বুক বিদ্ধ করে সঞ্চিত সুধাকে পরিবেশনের মত ক্ষমতা আমাদের মুরুব্বিদের নেই। এ আমার কথা নয়, এ-অপবাদ দিয়ে গেছেন আমাদের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীমন নারায়ণ।

পশ্চিম বাংলার কৃষি ও খাদ্য-দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহযোগিতার অভাব। এ রাজ্যের কৃষি সাবকমিটির বৈঠক গেল এক বছরে একটি মাত্র হয়েছে। প্রতি মাসেই বৈঠক হওয়া দরকার। বর্তমান পরি-কল্পনা কালে ৬১৬টি নলকূপ বসানো সত্ত্বেও মাঠে জল যাচ্ছে ১৫৫টি নলকূপ থেকে; কারণ মাঠের নালার সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাঠে সার দেবার কথা ৫ লক্ষ টন। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত ৭৫ হাজার টনের

বেশি সার রাজ্য কৃষিদপ্তর কৃষিজমিতে দিয়ে উঠতে পারেন নি। ভূমিসংস্কারের জন্য বরাদ্দ অর্থের শতকরা ১৮'৮ ভাগের বেশি সরকার ব্যয় করে উঠতে পারেন নি। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার কৃষির উন্নতির জন্য বরাদ্দ ৭১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩১ ভাগ। শ্রীমন নারায়ণ এই সব অভিযোগের পর আগামী দিনে বর্দ্ধিত হারে বরাদ্দ অর্থ রাজ্য সরকারের ব্যয় করার সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পর্যন্ত করেছেন।

এ অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। রাজ্য সরকারের এ ধরণের ব্যর্থতা এই নতুন নয়। এর আগেও অর্থ ব্যয়ের—পরিকল্পনাকে যথাযথ রূপদানের অসামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। আমাদের প্রশাসনের হাল যাঁদের হাতে, তাঁদের কথা ভিন্ন। লজ্জার বালাই তাঁদের নেই। নিজেদের ব্যর্থতাকে বেমালুম ঢাকবার কৌশল তাঁরা আয়ত্ত করেছেন বহুদিন আগেই। পরিসংখ্যানের সুবিধামত মোচড় ঘরিয়ে তাঁরা দিব্যি সরে পড়েন।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেব উদ্ধার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় চাষের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা পিছিয়ে নেই। তা ছাড়া জমিতে জল ঢালতে না পারলে সার ছিটিয়ে লাভ নেই।

খুবই সত্যি কথা। পশ্চিম বাংলা অপর রাজ্য থেকে পিছিয়ে হয়তো নেই কিন্তু পশ্চিম বাংলার সমস্যা ও অপর রাজ্যের সমস্যা এক নয়। এ রাজ্যের মত অপর কোন রাজ্যের চাষযোগ্য বেশির ভাগ জমি পাকিস্তানে গিয়ে পড়ে নি। উদ্বাস্তু সমস্যা, বহিরাগতের মিছিলও এমন আর কোথাও নেই। পশ্চিম বাংলার পক্ষে উৎপাদনের সামান্যতম অবহেলাও অমার্জনীয়। খাদ্যের অনটন কি বছর এত প্রকট আকারে অন্যত্র দেখা দেয় না।

সরকারের নয়া ব্যবস্থায় খোলা বাজারের রূপ পাল্টাতে সুরু করেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়েছেন। এ বিবরণ দিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে বাহবাও পেয়েছেন। বাস্তবের সাথে সরকারের ভাষ্য মিলিয়ে মানুষ হতাশ হচ্ছে আরও বেশি করে। তেল নেই, ন্যায্যমূল্যের দোকান ভিন্ন খোলা বাজারে চালের অভাব। পেলেও পকেট-কাটা মূল্য দিতে হচ্ছে ক্রেতাকে। খুচরা দোকানদারদের কাছ থেকে বেশি দাম নিচ্ছে পাইকার ও আড়তদার। তাও সব সময়ে পাওয়া মুস্কিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুচরা দোকানদারদের চালের জন্য

শ্রী প্রফুল্ল সেন

পাইকারদের দুয়ারে ধর্না দিতে হচ্ছে। আমাদের সরকার বেশি দামে চাল কিনতে বারণ করে, তেল কম খেতে উপদেশ দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। চালে, ডালে, তেলে ভেজাল চলেছে অতিমাত্রায়। শোনা যাচ্ছে, সরষের সাথে তুলা বীজ, লঙ্কার গুঁড়ো, রেড়ির গোটা থেকে সুরু করে সম্ভাব্য সকল অখাদ্যই ভেজাল হচ্ছে। তূলা বীজ মানষকে দেয় অন্ধ করে। রাজ্য সরকার ও কলকাতা করপোরেশন তার প্রতিকারের সক্রিয় কোন ব্যবস্থায় হাত দেন নি। সম্ভবত ভয়ে। পাছে তেলের নামে যা' চলছে তা বন্ধ হয়ে যায়—পরিস্থিতি হয়ে ওঠে ঘোরালো। এ সন্দেহ জেগেছে সাধারণের মনেই।

* * *

আষাঢ়ে আমরা বন্দনা করি জগন্নাথদেবের। তিনি রথে উঠে যান মাসির বাড়ি বেড়াতে। তাঁর বন্দনা গান গাইতে গাইতে রথে করে মাসির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। সপ্তাহকাল পরে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনি। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পুণ্য দিনে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসে রথের মেলা। হাতা-খুন্তি, ছাঁকনি প্রভৃতি সংসারের নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে আসবাবপত্র পর্যন্ত সংগ্রহ করেন মেলা থেকে সংসারী মানুষ। ছেলে-মেয়ের দল কৃষ্ণনগরের পুতুল, নানা ঢঙয়ের খেলনা ও বেলুন নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। কলকাতায় শনিবারে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনে অন্যান্য বছরের মতই মেলা বসেছিল। মেলা জমেছিল; কিন্তু ছিল না তার আগের দিনের মত জৌলুষ। কারুকার্য খচিত কাঠের জিনিষ তেমন আসে নি। ক্রেতার অভাব। গেল বছরে খরচ করে সৌখিন মাল এনে অনেক দোকাদারকেই গাঁটের পয়সা গচ্চা দিতে হয়েছিল। আর গুনাগারী দেওয়া সমীচীন নয়। তা' ছাড়া, যাঁরা সৌখিন, পকেট যাঁদের ভারী—তাঁরা এখন আর রথের মেলার অপেক্ষায় থাকেন না। বে-হিসেবের পয়সা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের রুচি ও মেজাজ আলাদা। তাঁরা চটপট কাজ সারেন প্রতীচ্যের কায়দায়। পুরোনো আমলের কারুকার্য তাই ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে হাল-ফ্যাসানের আমদানীতে।

২৪ পরগণা :

উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য সমস্যা সমাধানের আহ্বান বহুদিন থেকে আমরা শুনে আসছি। দেশের মানুষ, দরিদ্র চাষী এ কাজে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। উৎপাদন বাড়াতে পারলে তার লাভটাই হবে সব চাইতে বেশি: তবু আশানুরূপ উৎপাদন

বৃদ্ধি হচ্ছে না কেন? তত্ত্বকথা শোনার পর সরকারের তরফ থেকে যে পরিমাণ আয়োজন ও উদ্যোগপর্ব হওয়া উচিত তা আজও হয় নি। শুধু তাই নয়, সরকারের প্রশাসন দপ্তরের গাফিলতি, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগের অভাব এবং দপ্তরগুলোর পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে প্রায় প্রতি বছর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার বিঘা জমির আবাদ নষ্ট হচ্ছে—কঠোর শ্রমের পাকা ফসল চাষীরা পারছে না গোলায় তুলতে।

২৪ পরগণার জলনিকাশী কয়েকটি স্লুইশ গেটের মেরামত না হলে এ বছরও প্রায় ১৯ হাজার বিঘা জমির আবাদের ক্ষতি হবে। মাস-দশেক আগের কথা—ক্যানিং ইউনিয়নের বাসকুনারখালি মৌজার 'বেনার গেট' এবং বয়ারসিং মৌজার 'সোনার গেট' ভেঙে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এ কথা সংশ্লিষ্ট মহলে জানানো হয়েছে। তদবির-তদারক কম হয় নি। মহলের মহাশয় ব্যক্তিরা কিন্তু বেমালুম চাপটি মেরে বসে আছেন। এদিকে অবাধে নদীর জল ঢুকছে মাঠে। প্রায় হাজার-চারেক বিঘা জমির চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গেল বছরের চাষের আমন ধানও এই লোনা জলের জন্যই চাষীরা পুরোটা পায় নি।

বাসন্তী থানা এলাকার হাড়ভাঙ্গির স্লুইশ গেটটির ওপর নির্ভর করে বটতলা, ছড়ানেখালি, আমড়াতলা, হাড়ভাঙ্গি, সোনাখালি ও তেঁতুলতলার প্রায় ১৫ হাজার বিঘা জমির চাষ। গেল বছর গেটের মেরামতের চেষ্টা একবার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত 'রিং' বাঁধ দিয়ে আটকে গেটটি মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। চাষীরা এতে হতাশ হয়ে পড়লো। জল নিকাশের অভাবে ধান জলের তলায় চলে যাচ্ছে। আবেদন-নিবেদন চললো চাষীদের পক্ষ থেকে; কিন্তু ফল হল না। চাষীরা শেষ রক্ষার জন্য নদীর বাঁধ দিল কেটে। সেচ দপ্তরের অনুমতি না নিয়ে বাঁধ ভাঙার দায়ে চাষীদের পরে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হল।

বিনা অনুমতিতে বাঁধ কেটে দেওয়া খুবই অন্যায়। তার বিচার হওয়াও বাঞ্ছনীয়। যাদের গাফিলতিতে হাজার হাজার বিঘার ফসল নষ্ট হচ্ছিল—তাদের কেন বিচার হবে না, উপযুক্ত শাস্তি কেন তারা পাবে না, এর উত্তর কে দেবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। দেশে যখন খাদ্যশস্যের অভাব তীব্র হয়ে উঠছে, তখন যাদের ঔদাসীন্যে দরিদ্র চাষীর সারা বছরের শ্রমের ফসল নষ্ট হয় তাদের অপরাধ অমার্জনীয়। তাদের গুরু দণ্ড হওয়াই উচিত।

* * *

চব্বিশ পরগণার চাল বেচা-কেনার একটি প্রধান কেন্দ্র বারাসত। আমন ধান বারাসত মহকুমায় ভালই ফলেছিল। মানুষ সেদিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। মাস কয়েক যেতে-না-যেতেই ধীরে ধীরে সে আনন্দ উবে যেতে সুরু করে। ধান-চালের অভাব দেখা দেয়। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অবস্থার অবনতি সুরু হয়। জুন মাস থেকে গ্রামাঞ্চলে ধান-চালের অত্যধিক মূল্য বেড়ে যায়। এখনও ওয়াগন-ভর্তি চাল প্রতিদিনই আসছে। সাধারণ মানুষ তার নাগাল পাচ্ছে না। অতি সাধারণ মোটা চাল তিরিশ টাকার কমে কোথাও মেলে না। সরু চালের কথা আলাদা। তার দামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ৩৪ থেকে ৪০ টাকা দরের যে-কোন একটা মূল্য দোকানদাররা সুবিধামত হাঁকছে।

ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে চাল দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে জুন মাসের প্রথম দিকেই। 'ক' শ্রেণীর কার্ড ছাড়া আর কেউ চাল পাওয়ার অধিকারী নয়। 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর কার্ডের মালিকদের বাধ্য হয়েই পড়তে হচ্ছে চোরাবাজারের খপ্পরে। ৩৪ থেকে ৪০ টাকা মূল্যের চালই তাদের কিনতে হচ্ছে।

বর্ষা নেমেছে। মজুররা পাচ্ছে না কাজ। সরকার এখনও পর্যন্ত টেষ্ট রিলিফের কাজের প্রবর্তন করেন নি। দুঃস্থ মানুষের দুর্গতি উঠছে চরমে।

বর্ধমান ঃ

দামোদর নদের প্লাবনের ধ্বংসলীলা থেকে তার তীরের এলাকাগুলো রক্ষা করা এবং জমিতে সেচের ব্যবস্থা করাই দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার ছিল প্রধান লক্ষ্য। দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ক'বছর আগে গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। প্রবল বর্ষণে উন্মাদ দামোদরের জল ছেড়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ আরও বেশি করে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। এ তো গেল দামোদরের উপত্যকা করপোরেশনের কেরামতির কথা। আমাদের সরকারের ঔদাসীন্যে জামালপুর এলাকার দামোদরের দক্ষিণ পাড়ের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এ পাড়ে কোন বাঁধ নেই। গত ২৯শে জুন এক ধাক্কায় দামোদর বেরুগ্রাম ইউনিয়নের হৈবৎপুর গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করবার উপক্রম করেছিল। এর আগে খেলার মাঠটি দামোদর গ্রাস করেছে। সরকার জানেন, বন্ধনহীন দামোদরের এ অঞ্চল নিরাপদ নয়—যে কোন সময় সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। পঞ্চায়েতের প্রধান, বি-ডি-ও এবং স্থানীয় মানুষ এই বিপদের কথা উপরওয়ালাদের কাছে পেশ করেছেন। নিরাপত্তার কোন চেষ্টাই এখনও হয় নি।

দামোদরের আক্রোশ থেকে অচিরে গ্রামটিকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা না করা হলে, বিরাট এলাকার চাষের জমি আবার পরিণত হবে জলাভূমিতে। গ্রামটিকে গ্রাস করার পরই পুরোনো হানার খাতে বইতে সুরু করবে দামোদরের স্রোতধারা। মুণ্ডরা, রায়না,

আরুই, গোতান প্রভৃতি ইউনিয়নের উর্বর জমি জলে ভর্তি হয়ে যাবে।

খাদ্য-উৎপাদনে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সাধারণ মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তারা কাজও কম করছে না। মোহনপুর থানার বাঁধটি সাধারণ মানুষের চেষ্টাতেই সংস্কার হচ্ছে। এ বাঁধ সংস্কার ও রক্ষার দায়িত্ব দেশের সরকারের। এ বাঁধটির সাথে রায়না থানার বহু গ্রামের সমস্যা জড়িত। বাঁধের কাজ যতটুকু এগিয়েছে তাতেই এবারের দামোদরের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভবও হয়েছে।

আমাদের সরকারের আমলাদের কারবারই আলাদা। মাটিতে তাঁরা সম্ভবত সহজে পা ফেলেন না। তাই মাটির সাথে তাঁদের সম্পর্কটাও খুবই কম। দামোদরের অরক্ষিত এলাকার মতই সরকারী উপেক্ষার নজীর পাওয়া যাবে সর্বত্র। মাঠে জল না দিয়ে রায়না থানার ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু চাষীর ওপর ১৯৫৯—৬০ সালের জলকরের নোটিশ জারীর অভিযোগ উঠেছে। জলকর ধার্যের নমুনা থেকেই প্রমাণিত হয় সরকারী কর্মচারীরা সরেজমিনে কাজ কতটুকু করে থাকেন। জল জমিতে না দিয়ে জলকর জমির উপর ধার্য করেই ক্ষান্ত হন নি—খাল, নালা ডাঙার কোনটাই তাঁরা বাদ দেন নি। ফলে চাষীদের হয়রানি বেড়েছে। সরকারের নোটিশের প্রতিবাদে দরখাস্ত নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে কর্তাদের দপ্তরে দপ্তরে।

শুভ খবর ঝুটা হলেও ভাল। ঝুটাই বা হবে কেন? খবর পরিবেশন করেছেন স্বয়ং জেলাশাসক। এ বছর গভীর নলকূপ খনন করে পাম্পের সাহায্যে চাষের জমিতে জল দেওয়া হবে। এতে ব্যয় করা হবে বিশ লক্ষ টাকা। আগে-ভাগেই বলে রাখি—টাকা ব্যয়ের অঙ্কে কাজের পরিমাণ বোঝা যায় না। টাকা দামোদরের বন্যার জলের গতিতেই ব্যয় হচ্ছে প্রতি বছর। টাকা খরচের অঙ্কের হিসেবের সাথে কাজ কতটা এগিয়েছে তার হিসেবটাও দেশবাসী জানতে চায়। দুঃখের বিষয়, এখানেই আমাদের সরকার নীরব।

* * *

আমাদের খাদ্য-ভাণ্ডার বর্ধমান জেলা। 'প্যাকেজ প্রোগ্রামে' উন্নত ধরণের চাষ হচ্ছে এখানে। এই খাদ্য-ভাণ্ডারই আজ সাধারণ মানুষের কাছে বাড়ন্তে পরিণত হয়েছে—চালের অভাবটা দেখা দিয়েছে অত্যন্ত নগ্ন আকারে। সরকারের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ব্যবসায়ী ও জোতদারে মিলে। জেলার বাইরে চাল রপ্তানী নিষিদ্ধ করে সরকার আদেশ জারী করেছিলেন। তাতেও শেষ রক্ষা হয় নি।

উনষাটটি ন্যায্যমূল্যের দোকানও রয়েছে। পাঁচ কে-জি করে চাল দেবার ব্যবস্থাও হয়েছিল এই দোকান থেকে। শহরে চালের চাহিদা সাত হাজার মণের মত। সেখানে সরবরাহ হচ্ছে আড়াই হাজার মণ। নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল দোকানগুলো এ-অবস্থায় দিতে পারছে না।

খুচরা দোকানদাররা পাইকার ও মিল মালিকদের কাছ থেকে চাল পাচ্ছে না। মিল থেকে সরাসরি চাল বিক্রিও ক'দিন হয়েছিল। এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। সরষের তেলও বাজারে মিলছে না।

বীরভূম :

দীর্ঘদিন গড়িমসির পর জেলার কর্তারা সাপ্তাহ-তিনেক আগে ধান আটকের অভিযানে নেমেছেন। সময় ছেড়ে দিয়ে অসময়ে কাজে নামলে যা' হয়— তাই হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় হাজার তিনেক মণ ধান পুলিশ আটক করেছে খাদ্য বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায়। বড় বড় জোতদার আগেই কাজ হাসিল করে নিয়েছে। এখন যারা ধরা পড়েছে, তাদের প্রায় অধিকাংশই ছোট জোতদার। চাষের মরশুমে এদের ধান আটক পড়ায় অসুবিধাও হয়েছে ঢের। বীজ-ধানের অভাব দেখা দিতে পারে।

এদিকে বর্ষা নেমেছে জোর। রাস্তা-ঘাট খুবই খারাপ। দুর্গম বলা যেতে পারে। আটক ধান জোতদারদের ঘর থেকে চালকলে পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। জোতদারদের পক্ষে ধান কলে পৌঁছে দেওয়া এখন অসম্ভব। বর্ষার পরে জোতদাররা একাজ বরাবরই করেন। চালকলগুলো নিজেদের ট্রাক নিয়ে ধান না নিলে সমস্যা আরও ঘোরালোই হবে। ধান আটকের কাজও আর বেশিদূর অগ্রসর হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কর্তাদের আগ্রহটাই এদিকে কম।

* *

বীরভূমি নদীর বুকে বালি, মোরাম বা পাথর বিস্তর। এই সম্পদ নদীবক্ষ থেকে আহরণের ছিল না এতদিন কোন বাধা-নিষেধ। সাধারণ মানুষ মনের আনন্দে ঝুড়ি ভরে নিতে পারতো। রাজ্য সরকারের নজর গিয়ে পড়েছে বালির ওপর। ব্যবস্থা হয়েছে লীজের। দু' ধরণের লীজ—একটি হবে স্বল্প মেয়াদী, এগারো মাসের ; অপরটির

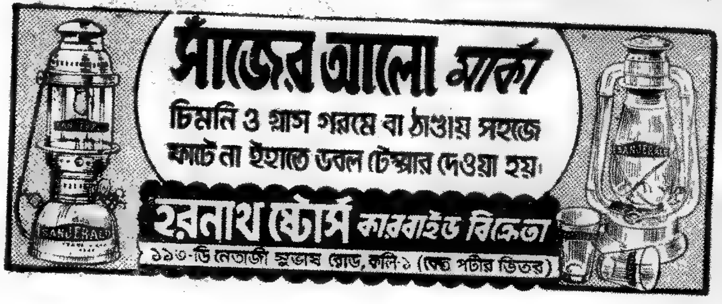

মেয়াদ থাকবে পাচ বছর পর্যন্ত। ফ্যাসাদে পড়েছে যারা দরিদ্র মধ্যবিত্ত। তাদের পক্ষে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত দাখিল করা ও তার সাথে আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেটে দাগের নম্বরসহ মানচিত্র ও সরকারী চালান জুড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

দার্জিলিং ঃ

অবিশ্রান্ত বারিপাত চলেছে ক'দিন থেকে। তার সঙ্গে চলেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া। রাস্তা-ঘাট পাহাড়ের ধ্বস নেমে দুর্গম হয়ে পড়েছে। ভুটিয়া বস্তীর একটি বালক ধ্বসের সাথে খসে পড়েছে চিরনিদ্রার কোলে। বালকটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই অংশ ধ্বসে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে একটি গভীর খাতে। হিলকার্ড রোডের ওপর ধ্বস নামায় শিলিগুড়ি থেকে ক'দিন দার্জিলিং বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল।

নক্সালবাড়ির বারটি গ্রাম এখন জলের তলায়। দুটি কাঠের সেতু ভেঙে গেছে, বড় বড় গাছ, টেলিগ্রামের খুঁটিগুলো প্রবল স্রোতে ধরাশায়ী হয়েছে। মেচি নদীর করাল গ্রাসে প্রতি বছরই এ এলাকার মানুষকে গৃহহারা হতে হয়। ফসলহানি হয় প্রচুর। বালির মোটা আস্তরণ জমিকে করে তোলে বন্ধ্যা। পাহাড়প্রমাণ পাথরও জমিতে জমে। চাষীরা নতুন আশায় বুক বেঁধে নামে নতুন করে —দূর করে তার বন্ধ্যাত্বকে। লাঙল দিয়ে তার বুকে ফলায় সোনার ফসল। মেচি এবার প্রায় হাজার একর জমির আউস ধান, পাট ও তিলের সর্বনাশ করছে। কান্দুয়া, ভীমরাম, দয়ারাম, তোতারাম, কেটুগাবুর, মাল্লাবাড়ি, ব্যাঙাই কাটিয়া প্রভৃতি আজ প্লাবিত বন্যার জলে। এই গ্রামগুলোর মানুষের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। এদের জিজ্ঞাসা, উচ্ছৃঙ্খল মেচিকে কি শৃঙ্খলিত করার কোন উপায়ই নেই? প্রতি বছর এমনি করে তাদের শ্রমের ফল ভেসে যায়?

জলপাইগুড়ি ঃ

তিস্তা ও তোরসা এখন কূল-প্লাবিনী, প্রলয়ঙ্করী। তাদের প্রলয়-নাচনে জলপাইগুড়ি ও আলিপুর-দুয়ার আজ বিপন্ন। তিস্তা দোমোহনীতে বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেছে। জল তার বেড়েই চলেছে। অবিরাম বর্ষণ হয়েছে তার যাত্রা পথের সহায়। জলপাইগুড়ি শহরের ও উপকণ্ঠের নিম্নাঞ্চলে জল থৈ থৈ করছে। অনেকের ঘরের ভেতর জল ঢুকেছে। আকাশ বর্ষণ-মুখর। শহরের রাস্তায় জুতো পায়ে বেরুবার উপায় নেই। নর্দমার ময়লা উপ্‌ছে পড়ছে রাস্তার

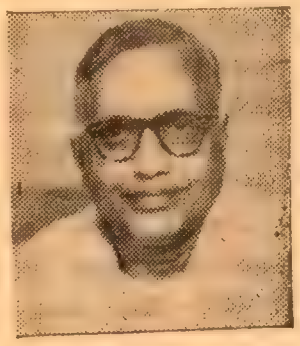

● শ্রীখগেন দাশগুপ্ত

ওপর। কাঁচা রাস্তা ও কাঁচা নর্দমা মিলে শহরে সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। পাকা নর্দমার জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত নেই। নদীতে বাঁধ দিয়ে আমাদের সদাশয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুপ্ত শহর রক্ষা করেছেন। পূর্তদপ্তরের বাঁধ শহরকে করে তুলেছে পূতিগন্ধময়। নর্দমা বয়ে জল গিয়ে নদীতে পড়তে পারছে না। উঁচু বাঁধের ধাক্কা খেয়ে ফিরেআসছে—ঢুকছে গিয়ে আশ-পাশের গৃহের প্রাঙ্গণে।

বাজার চড়াই ছিল। বর্ষায় আরেক ধাপ চড়েছে। দেশলাই পাওয়ার উপায় নেই। তেলও তাই। শহরের প্রধান বাজার দিনবাজার। অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর তার পরিবেশ। ব্যক্তিগত মালিকানার বাজার। প্রতিবাদে, আবেদন-নিবেদনে ফললাভের কোন আশা নেই। সব দিক দিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দুর্বিপাক।

আলিপুরের সিসল বাঁধ গেছে ধুয়ে-মুছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। ব্রডগেজ রেল পাতায় আরও বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা না করে, লাইনের কাজ চলেছে। পাশের মাটি কেটে নেওয়ায় বিরাট খালের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পৌরসভা একটু তৎপর হয়ে রেলদপ্তরের সাথে আলোচনায় বসে এখনই এর একটা মীমাংসা না করতে পারলে হলদীবাড়ি থেকে যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

* * *

কয়েকদিন আগে বিকেলে পাকিস্তানের রাইফেল বাহিনী সীমান্ত এলাকায় হানা দিয়ে ন'জন ভারতীয়কে অপহরণ করেছে, এই ন'জনের মধ্যে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর কর্মীও রয়েছে।

গৃহ নির্মাণের মালপত্র একটি লরীতে করে নিয়ে রাজগঞ্জ থানার নারায়ণ জোত এলাকা দিয়ে যাওয়ার পথে তারা পাকিস্তানী রাইফেল বাহিনীর হাতে পড়ে। লরীসহ তাদের অপহরণ করা হয়েছে। খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি জেলার পদস্থ অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছেন। পাকিস্তান সরকারের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদও যথারীতি জানানো হয়েছে।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

॥ একুশ ॥

অরুণার বিয়ে।

সকাল থেকে খগেনবাবুর নিঃশ্বাস-টুকু ফেলার অবসর নেই। লেডী কিং কণ্ড তাঁর বপুখানা নিয়ে ছুটোছুটি করে হাঁফিয়ে পড়েছেন। নেপেনের মেস থেকে কদিনের জন্য উপেনকে কাজের জন্য আনা হয়েছে। উপেন বার-কয়েক ওপরের ঘরে গিয়ে সমরকে খোঁজাখুঁজি করেছে। অরুণার কাছে জানলো কদিন থেকে তার ঘর খালি। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

বার-কয়েক সে অরুণাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'হ্যাঁ দিদিমণি, দাদাবাবু ওমনি ভাবে না বলে-কয়ে কোথায় চলে গেল তুমি তার ঠিকানাটুকুও লিখে রাখতে পারলে না?'

অরুণা হেসে বলেছে, 'কেন রে তুই তাঁর ঠিকানা দিয়ে কি করবি?'

'—সে কি কথা গো। তোমার বিয়ে আর দাদাবাবু সেখানে আসবেন না? সে কি করে হয়?'

অরুণা বলল, 'সেটা তাঁর ইচ্ছে।'

'—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দিদিমণি।'

অরুণা বলল, 'কি কথা?'

'—অভয় দাও তো বলি।'

'—হ্যাঁ হ্যাঁ বলে ফেল।'

'—তুমি দাদাবাবুর সাথে, মানে, ইয়ে, ঝগড়া-টগড়া কর নি তো?'

অরুণার মুখ রাঙা হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন রে?'

'—না হলে দাদাবাবু তো ওমনি-ভাবে না বলে-কয়ে চলে যাবার ছেলে নয়। কাউকে কিছু না বললেও অন্তত এই উপেনকে ডেকে নিশ্চয়ই চুপি চুপি বলে যেতো।'

অরুণা কোন জবাব দিল না।

গ্রাম থেকে বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। ঘরভর্তি বন্ধু-বান্ধব। অরুণাকে সাজাবার জন্য তার কলেজের বান্ধবীর দল এসেছে।

সবাই উপেনকে মেয়েদের ঘরে দেখে মারমুখো হয়ে তাড়াতে আসে। অরুণা তাদের বাধা দেয়। কদিন থেকে অরুণারও বুকে যেন কিসের একটা অব্যক্ত ব্যথা। এই অশিক্ষিত সরল ভৃত্যটির উপস্থিতিতে তার বেদনা খানিকটা প্রশমিত হয়।

লেডী কিং কণ্ড বহুদিন পরে গা-ভর্তি গয়না পরেছেন। খুশিতে তাঁর মন ভরে রয়েছে। একমাত্র মেয়ে অরুণার বিয়ে।

সমস্ত বাড়িটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার বাতি দিয়ে রাস্তাটার এ-মোড় ও-মোড় সাজানো হয়েছে।

মোহল্লা নবি করিম থেকে ইয়াসিনের সানাই-এর দল এসে সকাল থেকে সানাই বাজাচ্ছে। রেডফোর্টের সামনে ফুলের বাজার। সবাই বলে ফুলমণ্ডী। গোলাপ, যুঁই, বেলা নানা ফুলের হার এসেছে। বরের জন্য এসেছে কুঁদ ফুলের মালা। ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের মালতী, সন্ধ্যা, কেতকী সবাই নানা ঢঙে তাকে নিয়ে হাসি-পরিহাস করছে। সারাটি দিনের উপোসে অরুণার মুখখানা তপঃক্লিষ্ট যোগিনীর মতন দেখাচ্ছে।

উপেনের ধারণা, দিদিমণির মন ভালো নেই তাই অমন শুকনো শুকনো লাগছে। বোধ হয় তার ধারণাটুকুও ভুল নয়।

অরুণা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছে। যদিও লেডী কিং কণ্ড বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে লোক পাঠিয়েছেন, নৃপেন সকাল থেকে একবারটির জন্যও তার টিকিটি দেখাতে আসে নি। সে জানে নৃপেনের থেকে সমরের নিকটতম বন্ধু কেউ নেই।

কে জানে সমরের কি হয়েছে! নেপেন নিশ্চয়ই তার পাশেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণ আত্মভোলা লোক এই সমর। এই বিরাট দিল্লী শহরে কোথাও গাড়ি চাপা পড়ে নি তো! দুপুরবেলা সে নিজে উপেনকে পাঠিয়েছিল নেপেনের খবর আনতে। তার ক্ষীণ আশা ছিল উপেন হয়তো এসে সমরেরও একটা খবর দেবে। কিন্তু সে যখন ফিরে এসে জানালো কদিন থেকে নেপেন মেসেই আসে নি তখন—অরুণার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও মুখ ফুটে সে উপেনকে বলতে পারলো না সমরের কোনো খবর সে আনে নি কেন? আজকাল সমরের আলোচনা করতেও সলজ্জরাগে তার মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। উপেন সরল হলেও পুরুষ মানুষ। তাকে কি সব কথা খুলে বলা যায়?

তাছাড়া এই বিরাট দিল্লী শহরে সরলমতি উপেন কোথায় তাকে খুঁজে বেড়াবে ?

ঘন ঘন সে লেডী কিং কঙকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাচ্ছে সবাই এসেছে কিনা। আত্মীয়-স্বজনরা মহা খুশি। আধুনিকা হলে কি হবে অরুণা কি রকম প্রাচীনাদের মতন সকলের আসা-যাওয়ার খবর নিচ্ছে। এক উপেন ছাড়া সেখানে কেউ জানে না অরুণা কাকে খুঁজছে। কেন খুঁজছে ?

একবার সে বলেই ফেলল, 'হ্যাঁ দিদিমণি নেপেনদা'-ঠাকুরকে এত খুঁজছো কেন ? দেখো সে ঠিক এসে নেমতন্ন খেয়ে যাবে। আর যদি নেপেন-ঠাকুর আসেন দেখো, তিনি নিশ্চয়ই দাদাবাবুকেও ধরে নিয়ে আসবেন।'

উপেনটার ঐ একটা মস্ত গুণ। সে অরুণার মনের কথাটুকুই গুছিয়ে বলতে পারে।

অরুণা উপেনকে বলল, 'যা তো উপেন তুই গিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাক। বলা যায় না তো যা লাজুক মানুষ, হয়তো এসে ফিরেই চলে যাবে। তবে আমার মনে হয় একবার নিশ্চয়ই আসবে সে। তুই কি বলিস ?'

উপেন সায় দিয়ে বলল, 'দাদাবাবু নিশ্চয়ই আসবে। একশোবার আসবে। আলবৎ আসবে। সে না এলে এ বিয়েই নয় গো দিদিমণি। তাকে ছাড়া এই বিয়েই বিয়ে নয়।'

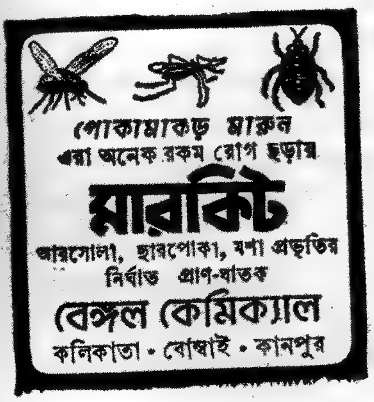

গারু মনোব্যথায়ও অরুণা হেসে ফেলল বেচারা উপেন সুন্দর অভিনয় করে কথা বলতে পারে। অরুণা বলল, 'তুই সুন্দর পার্ট করিস উপেন। আমার ভারি ভাল লাগে তোর পার্ট।'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে উপেন চিপ করে অরুণার পায়ে পড়ে গেল।

'—একটা পেন্নাম করি দিদিমণি। আশীর্বাদ কর যেন ঐ লাইনেই একদিন নাম করে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।'

একদল বান্ধবী ঘরে এসে ঢুকল। অরুণার নির্দেশ মতন উপেন গিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

খগেনবাবু বরযাত্রী আনতে গেছেন। তিনি উপোস সহ্য করতে পারেন না। অরুণার মামা কন্যা সম্প্রদান করবেন।

লগ্নক্ষণ প্রায় সমাগত। সমবেত উৎফুল্ল নরনারী অধীর আগ্রহে বরানুগমনের প্রতীক্ষারত।

অরুণার বুকের ভিতরটা কি রকম অব্যক্ত অনুভূতিতে স্পন্দিত হল। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না সেটা আনন্দঘন না বেদনাবিধুর।

হঠাৎ সানাই বেজে উঠলো। শঙ্খধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। পুষ্প-চন্দন-মালায় সজ্জিত কন্দর্প কান্তি নব বর দেখে সকলের মনে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

অরুণার মামা মন্ত্র পড়তে বসলেন বরের পাশে। খানিক পরে অরুণার সখীর দল বধূবেশে অরুণাকে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। ক্ষণিকের জন্য অরুণা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বরাসনে উপবিষ্ট লোকটিকে দেখে সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। পুষ্প-চন্দন-মালায় সমরকে অপরূপ সুন্দর মানিয়েছে।

লেডী কিং কঙ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আনন্দে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মনে হল যেন আটটা মটকার জল কল কল করে গড়িয়ে পড়ল।

বরকর্তা নৃপেন। বরযাত্রীর দলে এসেছে মেসের সাথী—কানাই, বলাই, পটলা, জগা, গদাধর, বিশু, ভবানী, বটকেষ্ট, কোম্পানীর অফিসের চাকলাদার, সমর শাণ্ডিল্য নাম্বার টু আরও সব। বড় সাহেবের শরীর অসুস্থ। তিনি আসতে পারেন নি। মিসেস সেন এখন আর তাঁকে একা ফেলে কোথাও যান না। সমরকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে উপহার পাঠিয়েছেন।

খগেনবাবু নেপেনের পাশাপাশি ঘোরাঘুরি করছেন। আজকের অনুষ্ঠানের পুরো কৃতিত্ব নৃপেনের।

কানাই বলাইকে ডেকে চুপি চুপি বলল, 'মাইরি অনেকদিন পর একটা সত্যিকারের বিয়ের নেমতন্ন জুটলো।'

উপেন ব্যাপারখানা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। সে পটলার চারিধারে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর দল পটলাকে জোঁকের মত ঘিরে ধরেছে। সবাই তাকে চেপে ধরেছে চার্লি চ্যাপলিনের ভূমিকায় অভিনয় করে তাদের দেখাতে হবে।

ভবানী মাসল ফুলিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঘোরাঘুরি করছে। জগা, গদাধর, বিশু একটা নিভৃত নিরালা কোণ খুঁজছে। সুবিধে পেলেই দাবার ছকটা পেতে বসে আর কি ?

গভীর রাতে যখন নির্বিঘ্নে সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল, নৃপেন এসে সমর ও অরুণাকে আশীর্বাদ করল। বরযাত্রীর দল আগেই ফিরে গেছে। ধীরে ধীরে নৃপেন বেরিয়ে পড়ল। সে আর কোন গাড়ি ডাকলো না। তারই চেষ্টায় প্রিয়তম বন্ধুর জীবন-সাথী জুটেছে। তাতে সে খুশিই। তার নিজের কাছে জীবনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নিদ্রিত দিল্লীর রাজপথে নৃপেন চলেছে সম্পূর্ণ একা।

(সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র অবলম্বনে)

॥ সমাপ্ত ॥

রঙ্গজগৎ

বার্লিন উৎসবে সম্মানিত

সত্যজিৎ রায় তাঁর 'মহানগর' ছবির জন্য বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জুরীগণ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সত্যজিৎ রায়ের পুরস্কার লাভ এই প্রথম নয়। বাস্তবিক পক্ষে তিনিই ভারতের চলচ্চিত্রকে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছেন। একদা তিনি 'স্বর্ণভল্লুক' ও 'স্বর্ণপত্র' স্বর্ণপদক পেয়ে এককভাবে সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন; সেই সম্মানের উত্তরাধিকারী হয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র অর্জন করছে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণ অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা। 'মহানগর'-এর পরিচালককে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান দিয়ে বার্লিন উৎসব চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পণ্য অপেক্ষা শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের এই সম্মানে আমরা গর্বিত, আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই প্রসঙ্গে আমরা 'মহানগর' ছবি প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শ্রীবনশালেরও প্রশংসা করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বিচারকগণ 'মহানগর'কে আঞ্চলিক সম্মান দিলেও—সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র-সমালোচক ও প্রচারবিদ্‌দের সংগঠন বি-এফ-জে-এ তথাকথিত 'এওয়ার্ড'-এ 'মহানগর'কে শ্রেষ্ঠ ছবির স্বীকৃতি দিয়েও সত্যজিৎ রায়কে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান দিতে পারে নি। এই দুটি সংস্থার পরস্কার যে উদ্দেশ্যমলক অজ্ঞতা এবং পক্ষপাতদুষ্ট তা আর একবার প্রমাণ হলো।

সুজন।

● 'নতুন তীর্থ' ছবির নায়ক উত্তমকুমার

শ্বেত আমেরিকার চোখে একটি অপরাধী ছবি

এবারের কানস্ চলচ্চিত্র উৎসবে একটি আমেরিকান ছবি দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ছবিটিকে নিয়ে হৈ-চৈ আর অজস্র প্রশংসা বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। হলিউডে তৈরি নগ্নতা ও বিকৃত-মানসিক কদর্য ছবিগুলির পাশে এটি একটি মহৎ শিল্পকীর্তি। দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার ব্যয়ে এই ছবির নাম 'ওয়ান পোটেটো—টু-পটেটো'। পরিচালক ল্যারি পিয়ার্স—একজন টেলিভিশন পরিচালক। নায়ক-নায়িকাও নবাগত।

মার্কিন সমাজের সর্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক বর্ণবৈষম্যকে আঘাত হানা হয়েছে এই ছবিতে। কাহিনী সংক্ষেপে এই—শ্বেতাঙ্গনী জুলি কালেন তার নিরুদ্দেশ স্বামীকে ডিভোর্স করে একমাত্র কন্যা এলেনকে বুকে নিয়ে চলে গেলো অন্য এক শহরে। সেখানে কারখানায় চাকরী পেল। কাজ করতে করতে এক নিগ্রো সহকর্মীকে ভাল লাগলো জুলির। সেই ভাললাগা অচিরে রূপান্তরিত হল গভীর প্রেমে। ওরা স্থির করলো বিয়ে করবে। কিন্তু বাদ সাধলো দু-জনার আত্মীয়-স্বজন। জুলির শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়রা বললো—কি একটা জানোয়ার নিগারকে বিয়ে করবে। নিগ্রো রিচার্ডের মা-বাবা বললো—হোয়াইট উম্যানকে বিয়ে করা চলবে না। শেষ পর্যন্ত জুলি সন্তানসম্ভবা জেনে উভয়পক্ষ সম্মতি দিল।

বিয়ে হল। সন্তান হলো। প্রথম পক্ষের মেয়েকে নিয়ে জুলি সুখের সংসার পাতলো। হঠাৎ মূর্তিমান কু-গ্রহের মত তার নিরুদ্দেশ স্বামী হানা দিল তাদের আনন্দের সংসারে। সে বললো—তার মেয়েকে সে নিয়ে যেতে এসেছে। সে চায় না এক নিগ্রোর সংসারে তার মেয়ে মানুষ হোক। কিন্তু রিচার্ড মেয়েটিকে ভালবাসতো নিজের মেয়ের মত, জুলিও মেয়েকে ছাড়তে চায় না। ফলে মেয়ের অধিকার নিয়ে

মামলা সুরু হলো। শ্বেতাঙ্গ বিচারক রায় দিল। জুলির প্রাক্তন স্বামী মেয়েকে নিয়ে যাবে। কারণ শ্বেতাঙ্গ মেয়ের তার শ্বেতাঙ্গ বাপের কাছেই মানুষ হওয়া ভাল। শ্বেত আমেরিকার কালো আইনের জয় হলো। জুলি ও রিচার্ডের চোখের জল এই কালো আইনের মালিন্য দূর করতে পারলো না।

কাহিনী, ট্রিটমেণ্ট সব মিলে ছবিটিকে সাধারণ হলিউড ছবির চিন্তাজগতের অনেক উর্দ্ধে তুলে ধরেছে। এতে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মানবিকতার আদর্শকে বড় করে দেখান হয়েছে। উদ্ধত বুক আর গুরুনিতম্ব প্রদর্শনের কদর্য মানসিকতা এখানে প্রশ্রয় পায় নি; আমেরিকান ওয়ে অব লাইফের আনুষঙ্গিক কিলঘুষি-মারামারি, হত্যা, হাল্কা গান আর টুইস্ট বা শেক নাচের হুল্লোড় এখানে স্থান পায় নি। বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল দর্শক ও শিল্পনিষ্ঠ সমালোচকদের কাছে এগুলি গুণ বলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই গুণগুলিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবেচিত হয়েছে অপরাধ হিসাবে। অনেক শ্বেত-আমেরিকান এ ছবির প্রতি ক্রুদ্ধ। মার্কিন পরিবেশকগণ ছবিটিকে দেখাতে চায় নি। তারা এর প্রদর্শনী বন্ধ করতে চেয়েছে। কিন্তু একটি বৃটিশ পরিবেশক কোম্পানী ছবিটি সমগ্র বিশ্বে পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে, এরাই কানস উৎসবে ছবিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে। এই ছবির মাধ্যমে আমরা হলিউডের আমেরিকা নয়, সত্যিকার আমেরিকাকে দেখবার আশায় রইলাম।

● বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'বেনজীর' চিত্রে মীনাকুমারী।

● 'মহানগর' ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়, প্রযোজক আর ডি বনশাল ও সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে।

নাটকের কথা

দিল্লীতে 'আদর্শ স্বামী' অভিনয়

নয়াদিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটার হলে গত ২৮শে জুন ইউনাইটেড আর্টিস্টস্-এর উদ্যোগে 'আদর্শ স্বামী' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটি অস্কার ওয়াইল্ডের 'এ্যান আইডিয়েল হাজবেণ্ড'-এর অনুবাদ। চার অঙ্কের এই নাটকটিতে উর্ধতন সরকারী কর্মচারীদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক পরিবেশ ফুটে উঠেছে, এবং এই নতুনত্ব দর্শকরা উপভোগ করতে পেরেছেন।

নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে এক সরকারী কর্মচারী ও তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে। তাদের দশ বছরের আদর্শ সংসার। কিন্তু তাদের মধ্যে আর এক নারী এসে উপস্থিত হয় এবং স্বামীর অতীত জীবনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংসারে ভাঙন ধরাবার উপক্রম করে। কিন্তু এক বাল্যবন্ধুর সহযোগিতায় তার স্ত্রী বুঝতে পারে যে তার কর্তব্য স্বামীর পাশে দাঁড়ানো। মিলন-মধুর রসে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে জয়ন্তী বসু, নন্দিতা চ্যাটার্জী, শান্তনু রায়চৌধুরী, কানাই মুখার্জী যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জলি সিন্‌হা, রঞ্জন রায়, রাধা চ্যাটার্জী, উৎপল মুখার্জী ও রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। নাটক পরিচালনা করেছেন প্রফুল্লকান্ত বসু।

● 'অয়নান্ত' ছবিতে একটি আবেগময় দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

• সাহিত্যিক সমরেশ বসুর আর একটি গল্পকে চিত্ররূপ দেবার আয়োজন শুরু হয়েছে জেনে আমরা খুশি হলাম। এই "খপাঠ্য গল্পটির নাম 'আলোয় ফেরা'। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এক নতুন পরিচালক বলাই সেন। তপন সিংহের সহকারী হিসাবে ইনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

• প্রণতি ভট্টাচার্য জরাসন্ধের 'পাড়ি'কে চিত্ররূপ দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করবেন বোম্বাইয়ের ধর্মিন্দর ও প্রণতি ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করবে অসীম পাল।

• সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'কে চিত্ররূপ দেবার কথা ভাবছেন। 'চারু-লতা'র পরে 'ঘরে বাইরে' অস্বাভাবিক নয়। 'চারুলতা'র উপর 'ঘরে বাইরের' কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। শ্রীরায় সত্যই যদি 'ঘরে বাইরে' বা 'গোরা'র চিত্ররূপ দেন তবে তা বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক হবে।

মহরৎ

গত ১১ই জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তারামা চিত্রমের প্রথম ছবি 'তারাপীঠ'-এর শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন ভোলানাথ আঢ্য।

সংবাদ বচনা

কার্লোবিভ্যারি। ৫ ব

চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্লোবিভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবে বিমল রায়ের 'বন্দিনী' [illegible] ভারতের প্রতিনিধি চিত্র। বিশেষ আমন্ত্রিত [illegible] হিসাবে দেখানো হবে 'শেহর আউর সপ্না'।

কার্লোবিভ্যারিতে বিচারক মণ্ডলীতে কাজ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন চিত্র-অভিনেতা সুনীল দত্ত এবং তার স্ত্রী অভিনেত্রী শ্রীমতী নার্গিস।

বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি

তুরস্কের 'সামার উইদাউট ওয়াটার' বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে পুরস্কার

লাভ করেছে। জানা গেল ছবিটি বাস্তবধর্মী বলে তুরস্ক সরকার ছবিটির বিরুদ্ধতা করেছে। কিন্তু বে-সরকারী ভাবে ছবিটি উৎসবে প্রেরিত হয়েছিল। বার্লিনে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানলাভ করেছেন যথাক্রমে আমেরিকার রড স্টেইজার ও জাপানের সাচিকো হিদারী। তাঁদের অভিনীত ছবির নাম 'দি পন ব্রোকার' এবং 'দি উওম্যান ইনসেক্ট'।

অভিনেতা থেকে পরিচালক

রিচার্ড বার্টন এতদিন অভিনেতা ছিলেন। এবার তিনি প্যারামাউণ্ট ও সেভেন আর্টস প্রযোজিত টেনেসি উইলিয়ামের 'দিস প্রপার্টি ইজ কনডেমড' অবলম্বনে একটি ছবি পরিচালনা করবেন। নায়িকার ভূমিকায় রিচার্ডের নবপরিণীতা স্ত্রী এলিজাবেথ টেলর থাকবেন।

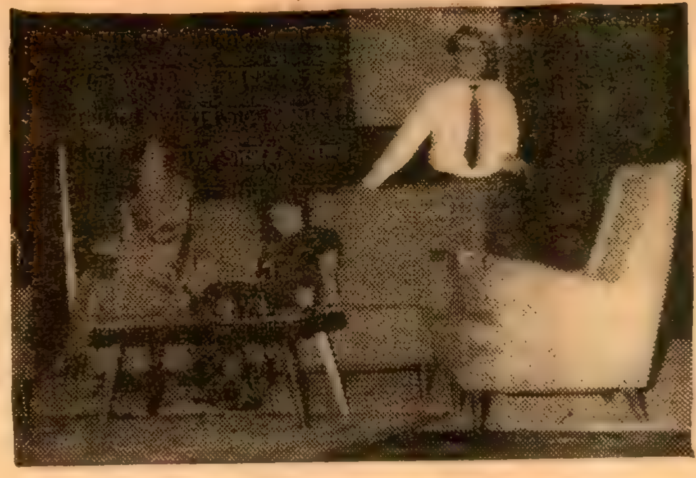

● নয়াদিল্লীতে অভিনীত 'আদর্শ স্বামী' নাটকে অঞ্জলি সিনহা, জয়তী বসু ও কানাই মুখার্জী।

একটি চলচ্চিত্র বুলেটিন

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী বুলেটিনের প্রথম সংখ্যা আমরা পেয়েছি। এই সংখ্যায় কয়েকটি বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ছবির সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে সত্যজিৎ রায় লিখিত চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ছবির অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সকলের পাঠ্য। এরূপ একটি বুলেটিনের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও প্রকাশিত বুলেটিনটি চিত্রামোদী ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে নি। সমালোচনাগুলি সংবাদপত্রের সমালোচনার তুলনায় কিছুটা স্পষ্ট হলেও একই ছাঁচে-লেখা ; এবং পরিচালনা ও কলা কৌশল ও সম্পাদনার দিকগুলিকে আলোচনার মধ্যে যথাযথভাবে আনতে পারে নি। আমরা এই বুলেটিনে আরো সুসম্পাদনা এবং শিক্ষণীয় সমালোচনা আশা করি। বুলেটিনটির সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার প্রামাণিক। প্রাপ্তিস্থান : ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি কার্যালয়—৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলি-১৩।

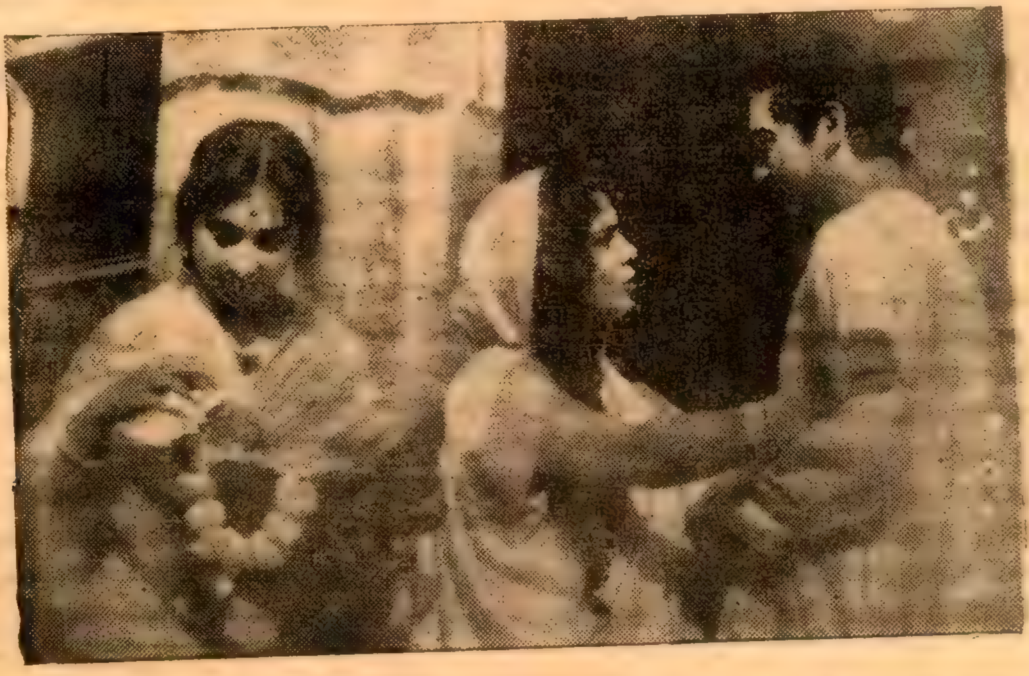

● কনক মুখার্জী রচিত-পরিচালিত 'দীপ নেভে নাই' ছবির কালীঘাট মন্দিরে গৃহীত একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ, নমিতা সিনহা ও সন্ধ্যা রায়।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

৯। রিচার্ড দ্বিতীয়—সম্ভবত ১৫৯৪ সালে রচিত। হলিন্‌সেডের ক্রনিকল্‌স্‌ই এর উৎস। অবশ্য মারলোর এডুওয়ার্ড দি সেকেণ্ড নিশ্চয়ই এ-নাটকটি লিখতে সেক্সপীয়ারকে প্রেরণা দিয়েছিল। কাব্যিক-সৌন্দর্য এবং দেশাত্মবোধক নাটক হিসাবে রিচার্ড দি সেকেণ্ড চিরকালই ইংরাজ দর্শকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের জন্ অফ গণ্টের স্পিচটি উইনস্টোন চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটি বক্তৃতায় ব্যবহার করেছিলেন জাতির আত্মশক্তি এবং আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে :

'This royal throne of kings, this scepter'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-paradise,
This fortress built by Nature for herself
Against infection and the hand of war,
This happy breed of men, this little world,
This precious stone set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands,
This blessed plot, this earth, this realm, this England.'

১০। কিং জন্ (১৫৯৫)—উৎস : ক্রনিকল্‌স্ অফ্ হলিন্‌সেড ও 'দি ট্রাবল্‌সাম রেইন্ অফ্ জন্, কিং অফ্ ইংলণ্ড'। বালক আর্থারের বিষাদপূর্ণ চরিত্রটি কিন্তু সেক্সপীয়ারের মৌলিক সৃষ্টি। এই সময়ে সেক্সপীয়ারের একমাত্র ছেলে হ্যামনেট্ ১১ বছর বয়সে মারা যান—আর্থার চরিত্রে নিজস্ব অন্তরের বিষাদকেই কবি রূপায়িত করেছেন—the play is considered as a sort of literary monument erected to the memory of his only son.

১১। দি মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিস (১৫৯৬)—বও-কাহিনী নেওয়া হয়েছে সের্ গিওভান্নি ফিওরেন্‌টিনো

শিলালি

লিখিত ইল্ পেকোরন (১৫৫৮) থেকে; কাস্কেট স্টোরিটি জেস্টা রোমানোরাম (রিচার্ড রবিনসনের অনুবাদ—১৫৭৭) এর ৬৬-তম গল্প থেকে আহরিত। সেক্সপীয়ার হয়তো তাঁর আগের আমলের প্রচলিত 'দি জু' বলে একটি নাটকের থেকেও (এই নাটকেও কাস্কেট-স্টোরি ও বণ্ড-স্টোরি যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়েছে) মালমসলা সংগ্রহ করেছেন। মারলোর 'জু অফ্ মল্টা'র প্রভাব অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন। There are some parallels to Marlowe's Jew of Malta both in Shylock-Barabas and Jessica-Abigail, It must, however, be pointed out that inspite of much similarity between Barabas and Shylock, Shakespeare drew an entirely different character, more human, more comprehensible, and—more natural.

১২। দি টেমিং অফ্ দি স্রু—(১৫৯৭) উৎস : 'এ প্লেসেণ্ট কন্‌সিটেড হিস্ট্রি কল্‌ড্ দি টেমিং অফ্ এ স্রু' নামে একটি পুরানো প্লে। গ্যাসকয়েন অনূদিত এ্যারিওস্টোর 'সাপোজিটি' থেকেও মালমসলা নেওয়া হয়েছে।

১৩। হেন্‌রি—১ম ও ২য় পর্ব (১৫৯৭-৯৮) উৎস : ক্রনিকল্‌স্ অফ্ হলিন্‌সেড ও একটি পুরানো প্লে 'দি ফেমাস ভিক্টরিজ অফ্ হেনরি ফিফ্‌থ্'। Sir John Falstaff, the immortal impersonation of English humour, 'the sweetest rogue in Christendom', is a character familiar not only to every playgoer but to any educated Englishman. আগেকার একটি সংখ্যায় ফলস্টাফের প্রটোটাইপ স্যার জন্ ওল্ডক্যাসল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

১৪। দি মেরী ওয়াইভস্ অফ্ উইণ্ডসোর (১৫৯৮)—রাণী এলিজাবেথের ইচ্ছানুক্রমেই নাকি এ-নাটকটি লেখা। কাহিনী মূলত মৌলিক। শোনা যায়, এলিজাবেথ প্রেমিকরূপে ফল্‌স্টাফ্‌কে দেখতে চাওয়াতেই এ-নাটকটি লেখা হয়। যদিও—the theme of the lover hidden by the unfaithful wife is common enough in the literature of the period. স্যার টমাস লুসির ক্যারিকেচর হিসাবেই জাস্টিস শ্যালো চরিত্রের অবতারণা।

১৫। হেন্‌রি দি ফিফ্‌থ (১৫৯৮)—উৎস : হলিন্‌সেডের ক্রনিকল্‌স্। তবে এ-নাটকের রচনায় সেক্সপীয়ারের মৌলিক প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

১৬। মাচ্ এ্যাডো এবাউট্ নাথিং (১৫৯৯)—উৎস : এ্যারিওস্টোর অরল্যাণ্ডো ফিউরিওসো। ১৯০৩ সালে গর্ডন ক্রেগ নিজে এই নাটকটি 'প্রডিয়ুস' করেন—তাঁর মা এলেন

টোবী বিয়েট্রিসের রোলে অভিনয় করেছিলেন।

১৭। এ্যাজ্ ইউ লাইক ইট্ (১৫৯৯)—উৎস: টমাস লজের 'রোজালিণ্ড, ইউফিউজ গোল্ডেন লেগেসি'। The 'Melancholy Jacques', the incarnation of pessimism, and Touchstone, that wilty cynic, are Shakespeare's own creations. Melancholy Jacques can 'suck melancholy out of a song, as a weasel sucks eggs'. For the first time in Shakespeare's plays we meet here the cynic and satirist of mankind and of the world.

১৮। টুয়েলভ্থ নাইট (১৬০০)—উৎস: বার্নেবি রিচেসের 'ফেয়ারওয়েল টু মিলিটারী প্রফেসন'-এর (১৫৮১) একটি কাহিনী আছে। 'এ্যাপোলোনিয়াস এ্যাণ্ড সিল্লা'। এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই অলিভিয়া-অরসিনো, ভাওলা-সেবাসটিয়ান প্লট গড়ে উঠেছে। হাস্যকর পিউরিট্যান ম্যালভলিও চরিত্রটি মৌলিক। স্যার এ্যাণ্ড্রু এগুচিক এবং স্যার টোবি বেল্চ, বেন্ জনসনের 'হিউমর্স'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯। অল্স ওয়েল দ্যাট এণ্ড্স ওয়েল (১৬০১-৩)—এ-নাটকটি ঠিক কোন্ সময়ে লেখা বলা বড়ই কঠিন। কারণ লেখাটিতে কবির বিভিন্ন সময়ের স্টাইলের মিশ্রণ দেখা যায়। বোধহয় নাটকটিকে কবি কয়েকবারই পরিশোধন এবং পরিমার্জন করেছেন। উৎস—বোকচিওর ডিক্যামেরন: গিগ্লিয়েটো ডি নার্বোনো কাহিনীর অনুবাদ করেন উইলিয়াম পেণ্টার তাঁর প্যালেস অফ্ প্লেসারে ১৫৬৬ সালে—এই কাহিনীর উপরই নির্ভর করে সেক্সপীয়ার 'অল্স ওয়েল' লেখেন।

২০। জুলিয়াস সিজার (১৬০১)—উৎস: নর্থ কৃত প্লুটার্কের 'লাইভস অফ সিজার, ব্রুটাস ও এ্যান্টোনিয়াসে'র অনুবাদ। নাটকে মহাকবি সিজারের থেকে ব্রুটাস চরিত্রের উপরই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আত্মসংযম, আত্মোৎসর্গ এবং কর্তব্যবোধ ব্রুটাসকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনে একটা মহৎ কার্যসাধনের ভার এসে পড়ল ব্রুটাসের উপর, যে কাজ করবার পক্ষে সে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। হ্যামলেটের সঙ্গে এইখানেই ব্রুটাসের অনেকটা মিল। দুটি চরিত্রই ভাবপ্রবণ এবং চিন্তাবিলাসী—কিন্তু সুষ্ঠুভাবে মহৎ সংকল্প সাধন করবার মতো মনের দৃঢ়তা এঁদের নেই। এইখানেই এঁদের জীবনের ট্র্যাজেডি। Ideas are more real to them than deeds. They are dreamers whom fate calls upon to act, and they fall victims to this implacable decree of cruel destiny.

২১। হ্যামলেট (১৬০০—১): স্যাক্সো গ্র্যামেটিকাসের "হিস্টোরিয়া ড্যানিকা"র ফ্রেঞ্চ রূপায়ণ করেন বেলফরেস্ট 'হিস্টোরিস ট্র্যাজিক্স—এ'—এরই থেকে সেক্সপীয়ার তাঁর নাটকের মূল উপাদান সংগ্রহ করেন। এছাড়া আরও একটি আগেকার লেখা হ্যামলেট প্লে ছিল (The Ur-Hamlet)—এ নাটকটি ১৫৯৪ সালে মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল—বোধহয় নাট্যকার কিড্-ই এর রচয়িতা—পরে নাটকটি হারিয়ে যায়। এ নাটকটি থেকেও সেক্সপীয়ার সাহায্য পেয়েছেন। স্বপ্নবিলাসী এবং কল্পনাপ্রবণ লোককে যদি কাজের পথে নেমে আসতে হয়, তবে তার জীবনে যে চরম ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে তারই কাহিনী 'হ্যামলেট' Hamlet's is the tragedy of the dreamer called upon to act, of the man of great intellectual activity and of deep aversion to real action—

"The time is out of joint: O! cursed spite
That ever I was born to set it right.

২২। মেসার ফর্ মেসার (১৬০৩—৪): সিনথিওর 'হেকাটোম্মিথি'র উপর ভিত্তি করে জর্জ হোয়েটস্টোন লেখেন 'প্রোমোস এবং ক্যাসাণ্ড্রা'—এটিই হচ্ছে সেক্সপীয়ারের নাটকের উৎস।

২৩। ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিডা (১৬০১—২)—উৎস: চসারের ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিড। চসার এবং বোকচিওর রচনায় ক্রেসিডা কোমলপ্রাণা—কিন্তু সেক্সপীয়ারের নাটকের ক্রেসিডা নীতিজ্ঞানবর্জিত এবং উচ্ছৃঙ্খল।

২৪। ওথেলো—(১৬০২—৩)—

● লিয়ার ও কর্ডেলিয়ার ভূমিকায় জন গিলগাড ও পেগি অ্যাশক্রফ্ট

উৎস : এ নাটকের প্লট সিনথিয়োর 'হেকাটোম্মিথি' থেকে নেওয়া। হ্যামলেট চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যদি হয় 'Thought without action' তাহলে ওথেলো চরিত্রের বিশেষত্ব হল 'aciton without thought'; পৃথিবীর সব দেশেই এবং বিশেষত রাশিয়ায় এই নাটকটি সব সময়েই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

২৫। কিং লিয়ার (১৬০৫—৬)—উৎস : হলিনসেডের ক্রনিকল্স থেকে নেওয়া। ট্র্যাজেডি হিসাবে ইসকাইলাসের 'প্রমিথিউস' বা সোফোক্লিসের 'ঈডিপাসে'র থেকেও উচ্চশ্রেণীর।

২৬। ম্যাকবেথ্ (১৬০৫—৬)—উৎস : হলিনসেডের ক্রনিকল্স। উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা ম্যাকবেথের পক্ষে একটা অবসেশনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তারই ফলে তার জীবনটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হোল। সুতরাং এককথায় ম্যাকবেথকে বলা যেতে পারে— tragedy of ambition.

২৭। টাইমন্ অফ্ এ্যাথেন্স (১৬০৪-৫)—উৎস : প্লুটার্কের 'লাইভ্স' ও লুসিয়েনের 'ডায়ালগ'। কবিমনের হতাশা এবং মানুষের প্রতি বিরূপ মনোভাবের দিকটা প্রকট হয়ে উঠেছে এই নাটকে।

২৮। পেরিক্লিস্ (১৬০৮—৯)—গাওয়ারের 'কনফেসিও আমান্টিস'-এর 'এ্যাপোলোনিয়াস অফ্ টায়ার' গল্পটি (১৩৯৩) এবং লরেন্স টোয়াইনের 'দি প্যাটার্ন অফ্ পেইনফুল এ্যাডভেঞ্চারস্' থেকে মালমসলা নিয়ে সেক্সপীয়ার 'পেরিক্লিস্' রচনা করেন। রেস্টোরেশনের পর সেক্সপীয়ারের এই নাটকটিই প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

২৯। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা (১৬০৬—৭)—উৎস : নর্থের প্লুটার্কের 'লাইভস্'-এর অনুবাদ।

● 'কিং রিচার্ড দি থার্ড'-এর ভূমিকায় লরেন্স অলিভার

৩০। করিয়োলেনাস (১৬০৭-৮) : নর্থের প্লুটার্কের 'লাইভস্'-এর থেকে নেওয়া।

৩১। সিম্বেলিন (১৬০৯—১০)—উৎস : ঐতিহাসিক অংশ হলিনসেডের ক্রনিকল্স থেকে নেওয়া—তাছাড়া বোকচিওর ডিক্যামেরনের 'বার্নাবো অফ্ জেনোয়া' গল্পটি খুবই সাহায্য করেছে নাটকটি লিখতে।

৩২। দি টেম্পেস্ট (১৬১১-১২) : স্যার জর্জ সমার্স, উইলিয়াম স্ট্র্যাচী, স্যার টমাস গেট্স, সিলভেস্টার জর্ডান, রিচার্ড রিচ প্রভৃতির বারমুডাজ বিষয়ক বর্ণনাত্মক কাহিনীগুলি সেক্সপীয়রকে টেম্পেস্ট রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

৩৩। দি উইন্টারস্ টেল (১৬১০-১১)—উৎস : রবার্ট গ্রীনের রোমান্স প্যানডোস্টো।

৩৪। হেনরি দি এইট্থ (১৬১২) : উৎস : হলিনসেডের ক্রনিকল্স।

এছাড়া আরডেন অফ ফেবারস্যাম্ (১৫৯২), দি রেইন্ অফ এডওয়ার্ড দি থার্ড (১৫৯৬), এ ইয়র্কশিয়ার ট্র্যাজেডি (১৬০৮) ও দি টু নোব্ল কিন্সমেন প্রভৃতি নাটকের রচনাতেও যে সেক্সপীয়ারের হাত আছে একথা অনেকেই মনে করেন।

পাঠক মন

প্রায় দেড় বছর আগে চোখে পড়লো একটা বিজ্ঞাপন—'সাপ্তাহিক বসুমতী' আবার নবকলেবরে পুষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। মনটা যেন হারানো জিনিষ ফিরে পাওয়ার আনন্দে নেচে উঠলো। পুরানো 'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রকাশকালে আমরা এ পৃথিবীতে আসি নি, যখন এলাম তা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে তা চোখে দেখার আর পড়ার সৌভাগ্য ঘটেছে আমার। পরিচিত হয়েছি তার ক্ষমতাশালী লেখনীর সাথে। তাই তার নতুন আবির্ভাবে ক্ষমতাশালী পরিচালক আর সংগঠকদের পরিচালনায় তার উন্নততর সংস্করণই আশা করেছিলাম। সে আশা আমাদের পুরণ করেছেন আপনারা।

গোষ্ঠীর যাঁতাকলে পেশা অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলো থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' অনেক স্বতন্ত্র, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তার। স্রোতে সে গা ভাসায় না। বক্তব্যে সুদৃঢ়। ঠিক আগের সংখ্যায় কারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে পরের সংখ্যাতেই তার নিন্দা করতে দেখি না নিজস্ব স্বার্থে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' যা বলে, তা মনেপ্রাণে বলে। তাই আপনাদের সম্পাদকীয় নিজস্ব বিশিষ্টতার দাবী রাখে। দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং প্রসারিত। সাংবাদিকতার উচ্চমান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন আপনারা।

'আজকের মানুষ' এই শিরোনামাটি সাময়িক ঘটনা ও মানুষ জানার দিক থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে মানুষটি সাম্প্রতিককালে বিশেষ খবর হয়ে উঠেছেন, তাঁকে আপনারা পরিপূর্ণভাবে হাজির করছেন ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে। সাধারণ পাঠকের কাছে এর মূল্য অনস্বীকার্য। যে মানুষটি সাম্প্রতিককালের বিশেষ খবর, তাকে জানতে হবে আগে, পরে তো তার খবর।

'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' এই নামে যে অধ্যায়টি চালু করেছেন, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যসেবীদের কাছে এর দাম যে কতখানি, তা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। তুলনামূলক বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে পরিচিত হচি। আমরা এর মাধ্যমে। একটি অতি উচ্চ স্তরের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আপনারা।

'ভারতদর্শন' আর 'আন্তর্জাতিক'-এ ভারত এবং সারাটা বিশ্বের সাপ্তাহিক সংবাদের নিখুঁত খবর পরিবেশন করছেন আপনারা। সেই সাথে পর্যালোচনাও। 'বঙ্গদর্শনে' পাচ্ছি আমাদের আশে-পাশের ঘনিষ্ঠ খবর।

আপনাদের 'শহর কলকাতা' বিভাগটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টির দাবী রাখে। কলকাতার পরানো ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠায় আপনাদের পরিশ্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কারণ, কলকাতার মোহময়ী রূপ দেখে আমরা ভুলতে বসেছি তার অতীতকে। নিয়নের আলো-জলা কলকাতা একদিন যে কী ভয়াবহ ছিলো, তা শহর কলকাতার পরিচয়ে ধরা পড়ে।

'দূরন্ত দেহলী' ইত্যাদিতে আমরা দিল্লীকে দেখছি নতুনভাবে, নতুন পরিচয়ে।

'নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী' বিভাগটি বেশ ভালো লাগে। সেদিনের মঞ্চের অন্তরালের অনেক কথাই আমরা জানতে পারছি এই লেখাটি পড়ে।

'রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে' বিভাগটি অত্যন্ত মূল্যবান বিভাগ। বিশ্বনাট্যসাহিত্য আর রঙ্গমঞ্চের এত গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা খুব কমই চোখে পড়ে। লেখক আন্তর্জাতিক নাটক আর রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে যে বিশেষ অভিজ্ঞ তা এই লেখাটি পড়ে বোঝা যায়।

'গ্রন্থমেলা' বিভাগটির প্রয়োজনীয়তার কথা অনস্বীকার্য। ভালোও লাগে। তবে কতকগুলো গ্রন্থকে সমালোচনায় বড় অযৌক্তিকভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়ে থাকে। যেমন ডঃ সুশীল রায় সম্পাদিত 'ধ্রুপদী' (বৈশাখ ১৩৭১) এবং অশোক সেনের 'অভিনয়-শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা' সম্পর্কে উক্তি। উপরোক্ত পত্রিকা ও বইটির সাথে আমি বিশেষ পরিচিত। পত্রিকাটি ও সমালোচনা গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং জ্ঞানগর্ভ—একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু পত্রিকা ও গ্রন্থটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত উক্তি সম্পর্কে আমি একমত হ'তে পারছি না।

'রঙ্গজগৎ' বিভাগটি আরও একটু উন্নত ও কয়েক পৃষ্ঠা জায়গা বাড়ানো দরকার। উন্নাসিকদের কথা বাদই দিলাম—কিন্তু সিনেমা যে একটি শিল্প এবং উন্নতমানের কলা, তা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই সিনেমা থিয়েটার আর সাংস্কৃতিক আলোচনার জায়গা বাড়ুক আরও কিছুটা। সুজনের নিরপেক্ষ বক্তব্য এবং ক্ষমতাশালী কলমের আলোচনা প্রশংসার দাবী রাখে।

খেলাধূলার পাতাও বাড়ুক কিছুটা। ক্রীড়ারসিকের সংখ্যাও তো প্রচুর আমাদের দেশে। আমরাও বটে।

ধারাবাহিক উপন্যাস ইত্যাদি বেশ ভালো লাগছে। একটা কথা, যা আপনাদের মহৎ এবং সৎ প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতেই হবে, তা হোলো অখ্যাত লেখকদের আপনারা বিখ্যাত করতে চাইছেন। তবে এই সাথে কিছু খ্যাতিমানদেরও গল্প-কবিতা দেওয়ার চেষ্টা রাখুন। সেই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের আরও কিছু ভালো প্রবন্ধ।

প্রচ্ছদপট আর ভেতরের কাগজগুলো উন্নতমানের হওয়া দরকার। ছাপার দিকেও একটু নজর দিন। ফটোর মুদ্রণগুলোও বড় অস্পষ্ট, আলোকচিত্রের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সব থেকে বড় কথা পত্রিকাটা 'পত্রিকা'ই, সাহিত্য-সংবাদের ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপনের কাগজ নয়।

নিমাই মান্না

চাকপোতা. আমতা. হাওড়া

খেলা ধুলা

ময়দানের দুঃস্বপ্ন

কলকাতা ক্রীড়াঙ্গনের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছে অশান্তির এক কালো মেঘ, এরই কুটিল ছায়া ময়দানের ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে ক্রীড়ামোদীদের মনে। বর্তমানে ফুটবল, হকি, এমন কি ক্রিকেটের আসরে মাঝে মাঝে গণ্ডগোলের আবির্ভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছে খেলাধূলার মহৎ উদ্দেশ্যকে, রুদ্ধ করছে নির্মল আনন্দের উৎসমুখ। ময়দানের সবুজ গ্যালারীর অবুঝ দর্শকরা অল্পতেই ইট আর সোডার বোতল ছুড়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবুজ গ্যালারীর দুষ্ট ব্যাধি আজ সংক্রামিত হয়েছে মাঠের খেলোয়াড়দের মধ্যে, এর বিষময় ফল ও ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করেই আমরা শঙ্কিত হচ্ছি। কিছুদিন আগে হকি লীগের শেষ খেলা ও বাইটন সেমিফাইন্যালে খেলোয়াড়দের অভদ্র আচরণের কথা আমরা এখনও ভুলি নি। এ মরশুমে ফুটবল লীগে বড় ধরনের কোন গণ্ডগোল না হলেও ছোটখাট গণ্ডগোল প্রায় লেগেই আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লাবের কর্মকর্তাদেরও গণ্ডগোলে জড়িত হতে দেখা গিয়েছে। ব্যক্তিত্বহীন অজ্ঞ রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা গণ্ডগোলের জন্য দায়ী। লিমার ফুটবল ষ্টেডিয়ামের মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার পরও কি হুঁস হবে না ক্রীড়া-পরিচালক ও ক্লাব কর্তৃপক্ষের।

টেনিসের রবার্ট ব্রুস

অধ্যবসায়ের দ্বারা জয়লাভের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে গেলেই স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও মাকড়সার গল্পের কথা মনে পড়ে। এবার উইম্বলডেন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেলায় অধ্যবসায়ের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন নবম প্রচেষ্টায় অপেশাদারী টেনিসের সিংহাসন জয় করলেন। কুইন্সল্যাণ্ডবাসী এই প্রবীণ টেনিস খেলোয়াড়ের বর্তমান বয়স প্রায় ২৯। এ্যামেচার টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্তমানে রয় এমার্সনের সমতুল্য খেলোয়াড় আর নেই। এই দুর্লভ সম্মানের জন্যে এমার্সন ২লক্ষ ৫০হাজার টাকার লোভনীয় পেশাদারী চুক্তি প্রত্যাখান করেছেন। গত বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে বাছাই তালিকার শীর্ষে স্থান পেলেন, কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল কোয়ার্টার ফাইন্যালে জার্মানীর অনামী তরুণ বুঙ্গার্টের কাছে পরাজিত হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। এই পরাজয়ে নিরাশ না হয়ে তিনি তাঁর খেলার সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলি সংশোধন করার কাজে মন দিলেন। দীর্ঘদিন কঠোর অনুশীলন করলেন। এর ফলে ১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপের খেলায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারল না। যদিও আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে ডেভিস কাপ জিতল, কিন্তু এমার্সনের ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করল। এই সময় অষ্ট্রেলিয়ার টেনিস পরিচালকদের সঙ্গে এমার্সনের মতান্তর ঘটল। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাড়ি দিলেন ইউরোপের পথে, সঙ্গী হলেন ফ্রেড ষ্টোলে। আজ তাঁরা বিশ্বের টেনিস উদ্যানের একবৃন্তে দুটি ফুল।

এমার্সন-ষ্টোলে ফাইন্যাল খেলায় এমার্সন প্রায় সর্বদিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেন। তবে ষ্টোলেও শেষ পর্যন্ত সমানতালে যুদ্ধ করার জন্য ফাইন্যাল খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক ও উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ষ্টোলে গতবারেও হয়েছিলেন রানার্স আর এবারও একই সম্মান তাঁর ভাগ্যে জুটল। ১৯৫৯ ও ৬০ সালের উইম্বলডেন বিজয়িনী ব্রেজিলের মারিয়া বুনো শারীরিক অসুস্থতার জন্য এতদিন বড় খেলা থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করেছিলেন, পুনরাগমনেই তিনি গতবারের বিজয়িনী টেনিস-সম্রাজ্ঞী অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন উইম্বলডেনের জয়মাল্য। সর্বতোভাবে মারিয়ার খেলা ভাল না হলেও মাঝে মাঝে তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য ও দুর্ভেদ্য। এবার উইম্বলডেনের বাছাই তালিকা মনাফল অনুসারে সাফল্যলাভ করেছে। সকলেই এবার অল অষ্ট্রেলিয়া উইম্বলডেনের কথা চিন্তা করছিলেন, মারিয়া বুনোকে স্মিথ পরাজিত করতে পারলেই ষোলকলা পূর্ণ হত, অষ্ট্রেলিয়ার একচ্ছত্র প্রাধান্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আর থাকত না।

সিম্পসনের হেডিংলে বিজয়

লীডসের হেডিংলে ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামের একটি কক্ষে দুই দেশের দুই ক্রিকেট সেনাপতি দাঁড়িয়ে। বিজয়োল্লাসে আত্মহারা ভাগ্যবান সিম্পসন চুমুক দিচ্ছেন স্যাম্পেনে, বেচারা ডেক্সটারকে পরাজয় স্পর্শ করেছে তাই বিয়ারের তিক্ত আস্বাদেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। লীডসের তৃতীয় টেষ্টে সাত উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত ইংলণ্ড ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের চতুর্থ টেষ্টে শেষ শক্তি নিঃশেষ করে লড়বে, আপ্রাণ চেষ্টা করবে ভাগ্য ফেরাতে। টেণ্টব্রিজের প্রথম ও লর্ডসের দ্বিতীয় টেষ্টকে বৃষ্টি ঠেলে দিয়েছিল ড্রয়ের দিকে, তৃতীয় টেষ্ট অবশ্য নিরুপদ্রবেই কেটেছে।

টসে জয়লাভ করে ডেক্সটার বয়কট আর এডরিচকে ব্যাট করতে পাঠালেন; ওঁদিকে অষ্ট্রেলিয়া দলপতি সিম্পসন, ম্যাকেঞ্জি ও হককে অর্পণ করলেন বোলিং আক্রমণধারা রচনার ভার। সুরুতেই এডরিচ ম্যাকেঞ্জির বলে ভাইভার্সের হাতে ধরা দিলেন। এরপর বয়কটের সঙ্গে ডেক্সটার যোগ দিয়ে দুজনেই সতর্ক অথচ বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের সাহায্যে ইংলণ্ডের রানসংখ্যা বাড়াতে লাগলেন। ছন্দপতন

● ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের একটি উত্তেজনাময় মুহূর্ত

ষ্টন, দেখতে দেখতে বয়কট আউট, ব্যক্তিগত ৬৬ রানে প্যাভেলিয়ানের পথে পা বাড়ালেন ডেক্সটার, পেছন পেছন ব্যারিংটন। ৬৮ রান সংগ্রহ করে একমাত্র জিম পার্কসই দিলেন কিছুটা প্রতিরোধ। মোট ২৬৮ রানেই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস খতম। ম্যাকেঞ্জি আর হকের জয়জয়কার; ম্যাকেঞ্জি ৭৪ রানে ৪ এবং হক ৭৫ রানে ৫ উইকেট পেলেন।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে কিছুটা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। লরীর অনবদ্য ব্যাটিং এবং ব্যক্তিগত ৭৮ রান দলকে যথেষ্ট সাহায্য করে। পিটার বার্জের এই টেষ্ট জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা বলে অভিহিত করা যায়। ইংলণ্ড বোলিংকে পর্যুদস্ত করে তিনি শতরান লাভ করেন এবং ১৬০ রানে আউট হন। শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে হকের ৩৭ এবং গ্রাউটের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। টিটমাস ৪টি ও ট্রুম্যান ৩টি উইকেট দখল করেন। ৩৮৯ রানে অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ব্যারিংটনের ইনিংস; একজন জাত ক্রিকেটারের মত নিখুঁত এবং নিভুর্ল মারের সাহায্যে তিনি ৮৫ রান সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড আর ২২৯ রানের বেশি এগোতে পারল না। জয়ের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ছিল তখন মাত্র ১১১ রানের, হাতে প্রচুর সময়। তিনটি উইকেট হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে সাত উইকেটে হেডিংলে বিজয় সমাপ্ত করল।

লীগ সমীক্ষা

লীগের দৌড়ে মোহনবাগান এখনও অগ্রগামী রয়েছে। ইতিমধ্যে বি এন রেলের সঙ্গে খেলায় তারা নষ্ট করেছে মূল্যবান একটি পয়েন্ট এবং এই মরশুমের মত হারিয়েছে তাদের সুযোগ্য ব্যাক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীকে। ইষ্টবেঙ্গল এরিয়ান্সের কাছে একটি পয়েন্ট নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে। এরিয়ান্সের তরুণ গোলরক্ষক এস শেঠ (ছোট) এবং ব্যাক আলেখ্য ঘোষালের খেলা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবী রাখে। কালীঘাট-মোহনবাগানের খেলায় কালীঘাটের তরুণ গোলরক্ষক এস রাওয়ের সুন্দর খেলা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে দুটি গোলে কালীঘাট পরাজিত হয় তার জন্য গোলরক্ষককে বিন্দুমাত্র দায়ী করা চলে না। মহামেডান-কালীঘাট, মোহনবাগান-বি এন রেল, বাটা-ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের ব্যবধান এখন দু'পয়েন্টের। দুই প্রধানের অপরাজিত আখ্যা শীঘ্রই ঘুচবে বলে মনে হচ্ছে।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

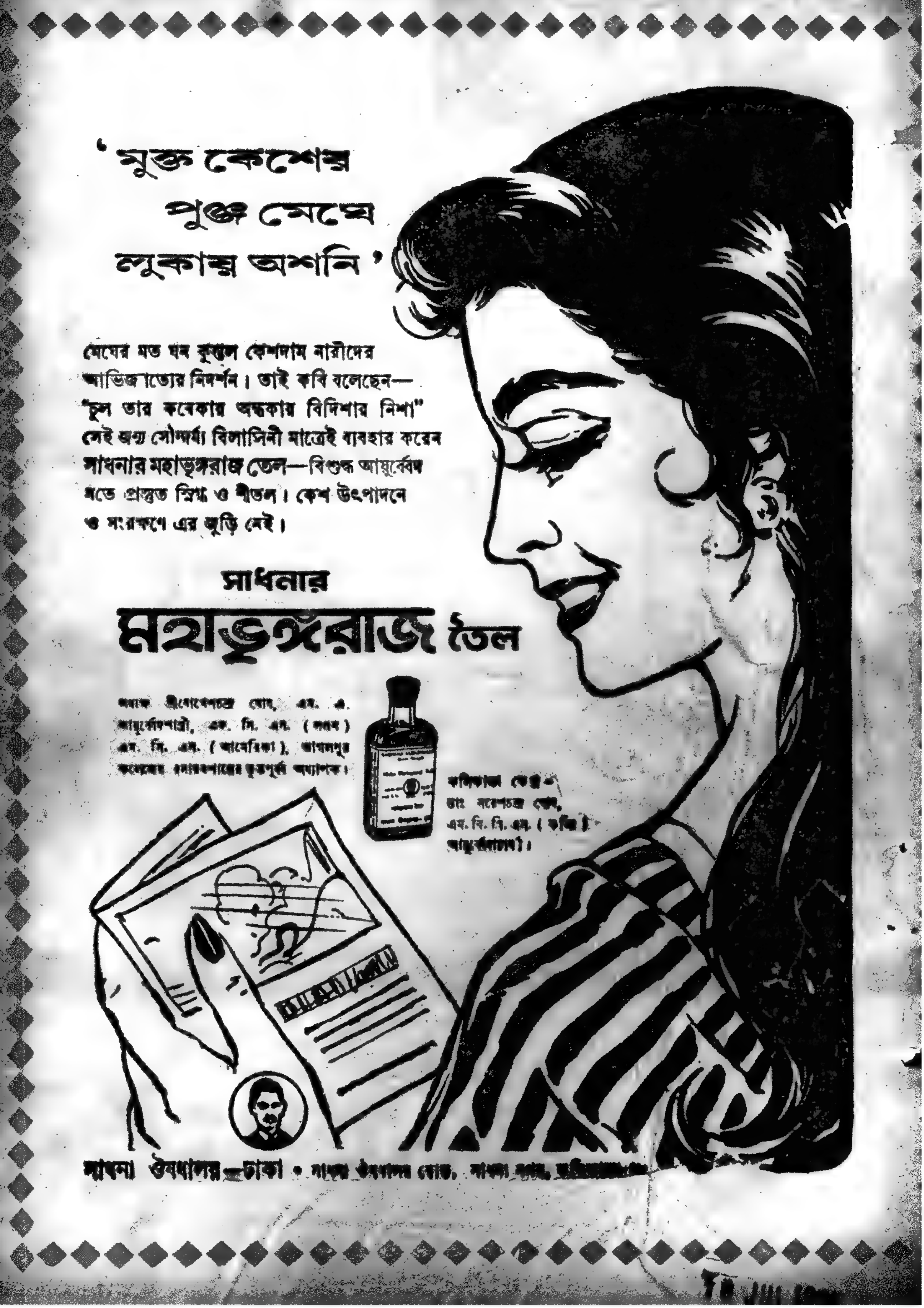
'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র: ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য।
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর,

বসুমতী

মার্কিন আকাশে নয়া ধূমকেতু রিপাবলিকান পার্টির মনোনীত প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী ব্যারী গোল্ডওয়াটার (দক্ষিণে)। বামে : প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত গভর্নর স্ক্র্যাণ্টন।

৬৯ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 23rd July, 1964 • Vol. 69, No. 9

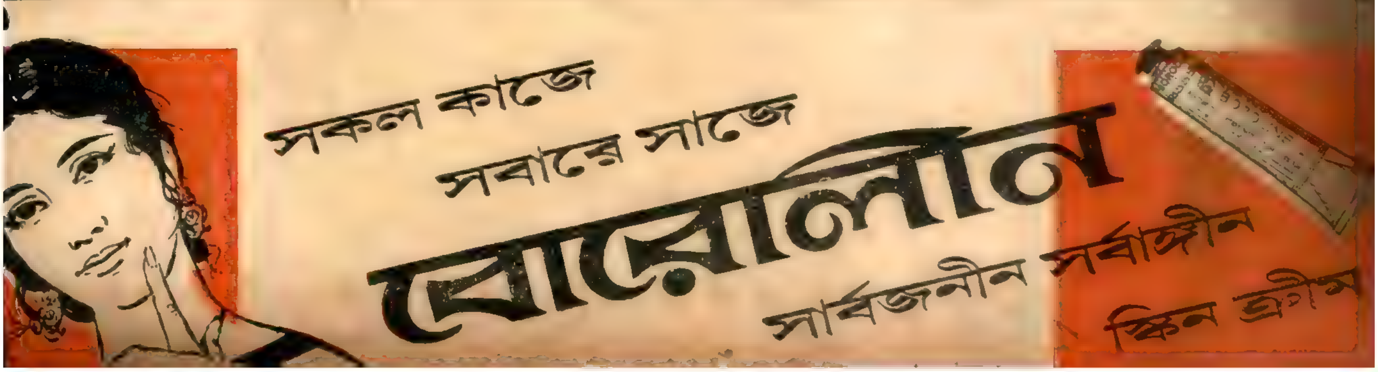

সূচীপত্র

756.3
·005/3
V.69
no.7

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৫১৫
আজকের মানুষ	...	৫১৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৫১৭
আজকের পশ্চিম জার্মানী	মৈত্রেয়	৫২১
ভারতদর্শন	...	৫২৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৫২৮
আন্তর্জাতিক	...	৫২৯
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৫৩৫
বৃত্ত (কবিতা)	গোপাল ভৌমিক	৫৩৬
কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩৭
কবিকণ্ঠ (কবিতা)	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫৪০
বিবর্তন (কবিতা)	বিশ্বেশ্বর সামন্ত	৫৪০
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৫৪১

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
। বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ।
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে: ভাষা - ব্যাকরণ শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ । ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অবিনশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি :
বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কী নাম দেবো (কবিতা)	মুকুল গুহ	৫৪৪
বৃদ্ধের সংসার (গল্প)	দীপংকর ঘোষ	৫৪৫
ভোরের কাকাল (কবিতা)	সূর্যকান্তি ভৌমিক	৫৫১
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৫৫২
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৫৫৯
বঙ্গদর্শন	...	৫৬৩
রঙ্গজগৎ	...	৫৬৭
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৫৭১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদি	৫৭২
পাঠক মন	...	৫৭৪
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৫৭৫

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য— আড়াই টাকা

বাংলার কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভদ্রের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহযাত্রী, সপ্তপদী

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে— বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নবরঞ্জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ ১ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ৭ই শ্রাবণ ১৩৭১ | Thursday, 23rd July 1964

ভেজাল দূরীকরণের একমাত্র উপায়

ভারত সেবক সমাজের জাতীয় ক্রেতা সেবা সমিতি যে তথ্যাবলী দান করেছেন, সে সম্পর্কে খোদ সরকার এখনো কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। সাধারণ মানুষের জীবনকে ভেজাল খাইয়ে পঙ্গু করার প্রকাশ্য প্রচেষ্টা অন্য দেশে আছে কিনা জানি না, তবে ভারতের বুকে বিবিধ বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও ঐ ধরণের দুর্নীতিকে আর যেন দুর্নীতি বলে মনেই হয় না। ধনে ও জিরের সঙ্গে শুকনো ঘাস, মসলা গুঁড়োয় ঘোড়ার নাদ আমরা হয়তো অহরহ খাচ্ছি এবং খেতে খেতে প্রায় অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই এ সব ভেজালের জন্য আমাদের যেন ক্ষোভ নেই, সরকারী হস্তক্ষেপও এ সব ক্ষেত্রে যেন নিষ্প্রয়োজন। তবু কারো কারো মনে হতে পারে, এ হেন অবস্থা চললে একদিন জাতির স্বাস্থ্য ভেঙে যাবেই, সুতরাং ভেজালদানকারীদের গুরুতর দণ্ডদান কর্তব্য।

কিন্তু কর্তব্য-কাজে হস্তক্ষেপ করা সহজ ব্যাপার নয়, কেন না ভেজাল যারা দেয় তারা জেনে শুনেই দেয় এবং যতদিন পর্যন্ত সরকারী খবরদারীর মধ্যেও ভেজাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভেজালদান-কারীরাও নিজেদের স্বার্থরক্ষার অবাধ সুযোগ লাভ করবে। এমন একদিন ছিল, যখন কেবল দুধে জল মেশানোর কথাটাই শোনা যেত, আর বর্তমান কালে এমন অবস্থা হয়েছে যে, জাল জিনিষ তৈরির জন্য এক-একটা কারখানাও গোপনে চলছে। তা যদি না চলে, তাহলে মরণাপন্ন রোগীর মুখে যে ওষুধ দেওয়া হয়—তাতেও ভেজাল কিভাবে ঢোকে?

অবশ্য এই সব ভেজাল সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরে ফেলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, এই ভেজাল প্রস্তুতের জন্য যাঁরা মস্তিষ্ক বিক্রয় করেন—তাঁরাও অর্থোপার্জনকারী এক ধরণের বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অধিকারী হয়ে এঁরাও আত্মবিক্রয় করেন। অবশ্য সরকারী গবেষণাগারে আরেক দল বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁদের কাজ হচ্ছে, পরীক্ষার সাহায্যে যে কোনো প্রস্তুত-দ্রব্যের মান ও বিশুদ্ধতা ঘোষণা করা; কিন্তু বাজারে যখন সর্বত্রই ভেজাল তখন তাঁদের কাজ কতটুকু এগোচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

এতৎসত্ত্বেও দোষটা কার? দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যবসায়ীর—না, আমাদের সরকারের অবহেলা ও অক্ষমতার? দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীনন্দ কোন্ মন্ত্রবলে এই দুর্নীতি দূর করবেন?

অবশ্য উপায় আছে, সরকারী বিধানের কঠোরতম দণ্ডেই একদিনে সব ভেজালের অবসান ঘটতে পারে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিপ্লবের পথে শান্তি আসছে। উদ্দাম দুরন্ত শান্তি। আর বিপ্লব জেগেছে যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ অনিবার্য নয়। শান্তির পথেই আসে সমাজতন্ত্র।—স্তালিনের পরবর্তী যুগে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা, রচনার প্রকাশ্য সমালোচনা সর্বপ্রথম করলেন এক তরুণ জননেতা। বললেন, প্রোলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের বদলে রাষ্ট্র হবে সমগ্র জনসাধারণের। এই অবিচল লক্ষ্য, নির্ভীক চেতনায় জনপ্রিয় হলেন সেই তরুণ নেতা। নাম অনাস্তাস্ আইভানোভিচ মিকোয়ান। সামান্য ছুতোর মিস্ত্রীর ছেলে হয়েও আজ গণবিপ্লবের প্রেরণায় কালের সিঁড়ি ডিঙিয়ে এসে পৌঁছেচেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাষ্ট্র-নেতার প্রাসাদে। মিকোয়ান আজ জয়যুক্ত।

১৯১৭-র বিশ্ববিখ্যাত গণবিপ্লবের সেই অনলস সৈনিক আজ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সম্মানে বিভূষিত। জন্ম আজ থেকে ৬৮ বছর আগে আর্মেনিয়ার তিফলিস জেলার এক অখ্যাত পল্লীতে। কিশোর অনাস্তাস্ প্রস্তুত হচ্ছিলেন ভাবীকালে ক্যাথলিক পুরোহিত হবার জন্য। কিন্তু তরুণ মিকোয়ান সংস্কারমুক্ত করলেন নিজেকে। তাঁর ধমনীতে তখন যৌবনের উন্মাদনা। নবজাগরণের প্রতিশ্রুতি। কুড়ি বছরের যুবক যোগ দিলেন বলশেভিক পার্টিতে। তখন রুশ বিপ্লবের জোয়ার এসেছে। শুধু রাশিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক যুগসন্ধিক্ষণ। অবিস্মরণীয় সেই ১৯১৭-র রুশ গণ-অভ্যুত্থান। বাকু শহরের প্রশস্ত রাজপথের বুকে অত্যাচারী জারের সশস্ত্র সৈনিকদের সঙ্গে জীবন-পণ যুদ্ধ করেছেন মিকোয়ান। সেদিনের স্মৃতিস্বরূপ সৈনিকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার যুদ্ধ-ক্ষত তাঁর নাকের ওপর এখনও চিরচিহ্ন হ'য়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে বাকু শহর চলে গিয়েছে জার্মান-তুর্কী সেনাদলের এক্তিয়ারে। পলায়নরত মিকোয়ান আর তাঁর ২৫ জন সঙ্গীকে বৃটিশরা তুলে দিল বিপ্লব দমনকারী শ্বেত রাশিয়ানদের হাতে। শ্বেত রাশিয়ানরা তাদের অজস্র বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো। শুধু মিকোয়ান গেলেন বেঁচে। কেন না তখনও তিনি তাদের নজরে তেমন কুখ্যাত হয়ে ওঠেন নি। এরপর থেকেই মিকোয়ান সরাসরি জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে।

বর্তমান সোভিয়েট সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব করেছেন। কূটনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে নানা অবকাশে প্রমাণ করেছেন নিজের দক্ষতা। '৬০ সালের ফেব্রুয়ারীতে কিউবায় গিয়ে ওদেশের রপ্তানীযোগ্য চিনি কেনবার জন্য রাশিয়ার পক্ষে পাঁচ বছরের চুক্তি ক'রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর আবার '৬২ সালের শেষ দিকে—তাঁর পত্নীবিয়োগের বছরে মিকোয়ান কিউবা সফরে গিয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই ছিলেন সোভিয়েট সরকারের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের পর দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার অব্যর্থ নজীর রেখেছেন তিনি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর সুদূরপ্রসারী জনপ্রিয়তার উপহার-

অনাস্তাস্ আইভানোভিচ মিকোয়ান

স্বরূপ পার্টির সব চেয়ে ক্ষমতাশালী সেক্রেটারীর আসন তাঁর জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু মিকোয়ান আজ দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ আসনে বসে রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি তাঁর জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতায় নতুন দিগন্তের বুঝি সন্ধান পেয়েছেন। আর সেই সঙ্গেই এই আর্মেনিয়ান রাষ্ট্রনায়ক আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই প্রচলিত প্রবাদটি: 'একজন ইহুদী দশজন গ্রীকের সমান আর একজন আমেরিকান দশজন ইহুদীর সমান।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

মন যে বহুরূপী, সে-কথা অনেকে অনেক অবস্থা থেকে অনুভব করেছেন। সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে মনের এই অশেষ ছটা ছড়িয়ে আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বা গ্যেটের সাহিত্যে, তেমনি আবার ধর্মসাধনার পথে-পথেও এই একই কথা কতোবার বলা হোলো।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দের লেখা 'মন ও মানুষ' বেরিয়েছে ১৩৬৬র ভাদ্র মাসে। তাতে স্বামী অভেদানন্দের কথা আছে। ১৯৩৯র সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন।

প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁর গুরুর নানা কথা লিখেছেন। লিখেছেন যে স্বামী অভেদানন্দ বলতেন,—'ভগবান কখনো কারুবিদ্যার ঐশ্বর্য দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের মন বা হৃদয়কে। ধর্ম-জীবনে উন্নতি করতে গেলে মনকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করতে হয়। প্রথম প্রথম তাই সাধন-ভজনে মন দিতে হয়। মন তৈরি হলে তখন আর কোন-কিছু অনিষ্ট করতে পারে না। তখন পড়তে ইচ্ছে হয় পড়, কিন্তু পড়া হবে তখন আত্ম-বিচারের জন্যে, জগতের কল্যাণের জন্যে—স্বার্থ সিদ্ধি বা পাণ্ডিত্যা-ভিমানের জন্যে নয়।'

সাহিত্যের পথে পথে অনেক ভ্রমণের আনন্দে যাঁরা মগ্ন, আমি তাঁদের দু'একজনকে চিনি না যে, তা নয়। কিন্তু অনেক রকম বই পড়তে যাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের সেই ভালো-লাগার মনোবিশ্লেষণে কী দরকার?

বাইরে থেকে সে রকম বিশ্লেষণ বোধ হয়, সম্ভব নয়। বোধ হয়, প্রত্যেক পাঠক আন্তরিক সততার সঙ্গে শুধু নিজের ভালো-লাগার হেতুটাই বলতে পারেন। অন্যের মনের কথা শুধু অনুমানের বিষয়। অতএব সে-চেষ্টাও অবান্তর।

না, আমি ও-সব অনুমানে, বিশ্লেষণে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে মন দিতে উন্মুখ নই। আমি 'কণিকা'র 'বোঝাপড়া' কবিতাটাই সত্যি বলে বুঝি। থেকে থেকে মনে পড়ে—

> মনেরে আজ কহ যে,
> ভালো মন্দ যাহাই আসুক
> সত্যেরে লও সহজে।

গ্যেটে নিজের বিচিত্র মান-সিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের মনকে চিনেছিলেন 'বহুরূপী' বলে। আমি এই জগৎ-সংসারে নিজের অবস্থানের প্রকৃতি ভাবতে-ভাবতেই 'কণিকা'র সেই 'বোঝাপড়া'র শেষ দিকের কয়েক ছত্র মনে মনে বলতে থাকি—

> নিজের ছায়া মস্ত করে
> অস্তাচলে বসে বসে
> আঁধার করে তোল যদি
> জীবনখানা নিজের দোষে,
> বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
> নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
> দোহাই তবে এ কার্যটা
> যত শীঘ্র পার সারো।

একদিন এই মন নিয়েই পুরোনো একখানি ভ্রমণ-কাহিনীর ধুলো ঝেড়ে পড়তে বসেছিলুম।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লিমেণ্টস. আর. মারখাম-এর লেখা পেরু ও ভারত ভ্রমণের ইংরেজী একখানি বেরিয়েছিল।

১৮৫৯এ ভারত-সচিবের কাছ থেকে মারখাম সাহেব দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতে শিন্‌কোনা বীজ আর শিন্‌কোনা চারা আমদানির কাজে তত্ত্বাবধায়ক পদের নিয়োগ পান। পেরুর গভীর জঙ্গলে ঘুরতে হয় তাঁকে। কারা-ভায়ার শিন্‌কোনা বনে পৌছবার জন্যেই ১৮৫৯এর ১৭ই ডিসেম্বর তিনি ইংলণ্ড থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, পানামা-যোজক পেরিয়ে পেরুর রাজ-ধানী লিমাতে পৌঁছোন ২৬এ জানুয়ারি ১৮৬০। ২রা মার্চ তাঁর অভিযানের দ্বিতীয় পর্বে Isle বন্দরে পৌঁছে, দক্ষিণ-পেরু বা বলি-ভিয়ার শিন্‌কোনা-বনে অগ্রসর হবার সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ পেয়ে-ছিলেন তিনি। সেখানে সমুদ্রের ধারেই খাড়া পাহাড়। নিরন্তর ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে, পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো গুহা তৈরি হয়েছে। ৬ই মার্চ তাঁর ঘোড়া আর খচ্চরের দল নিয়ে নব্বুই মাইল দূরের দেশ আরেক্বিপার পথে বেরিয়ে পড়েন তিনি। পাহাড়, মরুভরি অতিকায় মনসার প্রহরী-চিহ্নিত বালির বিস্তার পেরিয়ে পেরিয়ে তাঁর অভিযান এগিয়ে চলে। সেই মরু-ভূমির মধ্যে তাঁর চোখে পড়েছিল পলাতক এক সেনাবাহিনীর একটি মাত্র সৈন্যের কবর। ১৮৩৬এ সেই ধু-ধু বালি আর দূরে আগ্নেয়-গিরির প্রাকার-বেষ্টনের জনমানবহীন শূন্যতার মধ্যে চলতে-চলতে লোকটি তৃষ্ণায়, শ্রান্তিতে ভেঙে পড়েছিল। আর তার কবরের ওপর সেই বালিতেই একটি কাঠের ক্রস দেখেছিলেন মারখাম। যতোদূর চোখ চলে, শুধু বালির পাহাড়, বালির মাঠ। মাঝে মাঝে বিশ-তিরিশ ফুট উঁচু এক-একটা বালিয়াড়ি,— চুড়োগুলো অর্ধচন্দ্রের

গুতন,—তা থেকে বোঝা যায় হাওয়ার গতি উত্তর-পশ্চিমে। সেগুলোর নাম 'মেডানো'। তারা বাতাসে কেবলই ভাঙছে আর গড়ছে। বাতাসে সাঁইসাঁই শব্দ। সে যেন অশেষ বিলাপ।

সেই মরুভূমিতে,—কতোদিন আগে, একদিন ভোর চারটে বাজতেই মারখামের যাত্রা শুরু হয়। তখন আকাশে তারা ছিল, হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ ছিল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর তুষারে রোদ লেগে ঝকঝক করে ওঠে। সামনেই আরেকিপা (Arequipa) আগ্নেয়গিরির নিখুঁত ত্রিভুজ দেখা যায় ডাইনে চারকানি আর চুকিবাম্বা পাহাড়ের চূড়া। বাঁয়ে পিচু-পিচু গিরিমালা।

মারখাম লিখে গেছেন যে, ভোরের আলোয় সেই নির্জন বিস্তারের মধ্যে সেই পাহাড়ের দৃশ্য যেন সমুদ্রে সূর্যোদয় মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সেখানে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর বোধ হয় বিশ হাজার ফুট উঁচু; আর সে-জায়গাটাই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচু।

সেইসব রুক্ষ পাহাড় আর মরুভূমি পার হয়ে তিনি গিয়ে পৌঁছেছিলেন পেরুর দ্বিতীয় বড়ো শহর আরেকিপাতে। চিলি নদীর দুরন্ত স্রোতের কিনারায়, 'মিস্টি' আগ্নেয়গিরির পাদদেশে তার অবস্থান।

শহরে কোনো গাড়ি চলতে দেখেন নি তিনি,—কোনো আধুনিক জটিলতার চিহ্ন ছিল না সেই শতবর্ষ আগেকার আরেকিপাতে। কেবল ঘোড়া, আর খচ্চর, আর গাধার বাহিনী। সকালে রাস্তায় হাট বসতো। হাটে ঘোরা-ফেরা করতো ঝকমকে দিশী পশমের রামধনু রঙ—লাল, নীল, সবুজ, কমলা, বেগুনী।

পেরু থেকে সমুদ্র পার হয়ে,—নানা দেশ ছুঁয়ে,—বিচিত্র সব ঘটনার আলো-আঁধার অতিক্রম করে, সুদূর অতীতের সেই মারখাম-সাহেবের সঙ্গে আমি এই আমার ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরে এলুম।

তিনি লিখে গেছেন—১৮৬১র বসন্ত ঋতুতে ভারতবর্ষে শিন্‌কোনার চাষ বেশ আশাপ্রদ হয়ে ওঠে। নীলগিরি পাহাড়ে, দক্ষিণের আরো কোনো কোনো অঞ্চলে, ভারতের সমুদ্র পারে সিংহলে এই ফসল ফলতে থাকে। ১৮৪৯এ কোনো-এক ফরচুন-সাহেব বুঝি চীন থেকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন কিছু বীজ। আড়াইশ' চায়ের পেটিতে সে-সব হিমালয় পেরিয়ে এসেছিল, তার মধ্যে দুশ' পনেরোটি পেটি পৌঁছেছিল ভালো অবস্থায়। কিন্তু চীন থেকে ভারতে পৌঁছোনো, আর দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রতট থেকে ভারতবর্ষে পৌঁছোনো ঠিক এক ব্যাপার নয়। বাক্সের মধ্যে ন'দশ ইঞ্চি মাটি ঢেলে সেই মাটিতে ফাঁক ফাঁক করে এক এক সারিতে বীজ বুনে, সেই সব বাক্স চালান দেওয়া তো সহজ কাজ নয়। মাটিতে দস্তরমতো জল ঢেলে, বীজ অঙ্কুরিত হবার সুবিধে করে দেওয়া দরকার। ফরচুন-সাহেব তাই করেছিলেন। আর, মারখাম-সাহেব মন দিয়ে সেইসব খুঁটিনাটি বিবরণই জানিয়ে গেছেন।

কিন্তু শিন্‌কোনা নিয়ে গবেষণার দরকার নেই। মারখাম সাহেবের সেই পেরু ও ভারত ভ্রমণের নানা কথার মধ্যে এক জায়গায় তিনি বলে গেছেন যে, ভারতে প্রথম প্রবেশের সব চেয়ে আনন্দ যদি কেউ পেতে চান, তাহলে তাঁকে এদেশে ঢুকতে হবে ভাস্কো-ডি-গামার পথ ধরে। মালাবার তটে নামুন তিনি, —দেখুন এই অন্তরীপের বাগানটি কী সুন্দর। কালিকট বন্দরে তাঁদের ছোট ইস্টি যখন প্রবেশ করে, তখন দীর্ঘ এক লাইটহাউস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। সমুদ্রতীরে শুধু নারিকেলের বন কুঞ্জ, সারি সারি গাছ। জলের কিনারায় বালির আঙিনা। তারপর, দেশের আরো ভেতরে এগিয়ে যাবার মুখেই পাহাড়ের দৃশ্য। নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা ডিঙির সারি; ডিঙির চালক যারা, তাদের মাথায় প্রকাণ্ড তাল-পাতার টোকা।

মারখামের সেই বইয়ে আমি নায়ার-সম্প্রদায়ের কথা দেখেছিলুম। কালিকটের নামের ইতিহাসও তিনি আলোচনা করেছিলেন। হাজার বছর আগে, সে-রাজ্যের অধীশ্বর চেরুমান পেরমাল তাঁর বীর সভা-সদদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেন। সকলকে সব দেবার পরে তাঁর মনে পড়ে যে, একজন খুব সাহসী অনুচরকে কিছু দেওয়া হয় নি। তখন সেই অনুচরকে তিনি তাঁর তলোয়ার উপহার দেন,— আর সেই সঙ্গে সেই অঞ্চল,—যেখানে ছোটো এক মন্দিরে একটি মোরগ ডাকলে সারা অঞ্চলে সে-ডাক শোনা যায়। বুকানানের বিবরণ অনুসরণ করে মারখাম এই কাহিনী স্মরণ করে গেছেন। বলেছেন,— 'কোলিকোড়ু' কথাটার মানে মোরগের ডাক, তা থেকেই 'কালিকট' নামের উৎপত্তি।

টীয়ার সম্প্রদায়ের এবং মোপ্‌লাদের কথাও তিনি বলে গেছেন। জানি না, সে-সব কথার ঐতিহাসিক ভিত্তি কতোদূর গ্রাহ্য। তাঁর নিজের কথায়—

'The *Moplahs*, or Mohammedans of Malabar, are descended from Arab mariners and traders by native women, and hence their name, from *Mah-pilla* 'Son of the mother'' '

আবার, মালাবারের টোডার সম্প্রদায়ের কথাও তিনি লিখে গেছেন। বলেছেন যে, —এরা সংখ্যায় মাত্র হাজারখানেক বটে, কিন্তু সুঠাম শরীর আর স্বাস্থ্যের অধিকারী। ইহুদীদের মতন দেহের ধাঁচ তাদের, চমৎকার খাড়া

নাক, পুরু ঠোঁট, ঘন কালো চুল। তাদের অসীম আলস্যের বিবরণ,—তাদের স্নানে বিমুখতা,—যাযাবর-বৃত্তি ইত্যাদি ভালো-মন্দ আরো অনেক কথাই মারখাম-সাহেবের সেই ভ্রমণ-কাহিনীতে আমার নজরে পড়েছিল। কিন্তু মানুষের মনের নিত্যচঞ্চলতার ভাবনা মনে ছিল বলেই বোধ হয়, একটি জায়গায় আমার মন নিবিষ্ট হয়েছিল সেদিন।

দক্ষিণ-ভারতের গ্রামের কথা বলতে বলতে এক জায়গায় ভারি উচ্ছ্সিত হয়ে তিনি বলে গেছেন,—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁদের এ-ধারণা নিশ্চয় হয়েছে যে, এই দুনিয়ায় দুঃখের চেয়ে সুখই বেশি, মন্দের তুলনায় ভালোর পরিমাণই বেশি,—আর যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ইতিহাসের বড়ো বড়ো বিপ্লব তো শান্তির সুদীর্ঘ ধারায় সামান্য কয়েকটি বিন্দু।

মনে আছে তাঁর বইখানির শেষাংশের অধ্যায়—তিনি জগতের মানব-সংসার সম্বন্ধে এই মন্তব্য রেখে গেছেন। বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের শান্ত জীবনপ্রবাহ দেখেই এ-কথা তাঁর বিশেষভাবে মনে হয়েছিল।

ঘুরতে ঘুরতে, মারখাম-সাহেবের সঙ্গে বেরিয়েও এইভাবে আবার আমি মনের কথায় ফিরে, আসতে বাধ্য হলুম।

সুখ-দুঃখ,—সুখ-দুঃখ,—সুখ-দুঃখ। মনের সঙ্গে মনের সংযোগ খুঁজছি আমরা। যেখানে সংযোগ নেই, সেখানই শূন্যতা। সংযোগ যেখানে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে, সেখানেই সুখ। মনে এলো 'ক্ষণিকা'র আর একটি কবিতা—'অসাবধান'। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

আমায় যদি মনটি দেবে
দিয়ো, দিয়ো মন—
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ারখানা,
ভোলা আমার প্রাণ—
কখন যে কার আনাগোনা
নইকো সাবধান।

মনে হোলো, সাহিত্যের এই সব দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের এই একান্ত সত্য চিত্তস্বভাবের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার চেনাশোনা ঘটে যায়। সেইটেই সবচেয়ে খাঁটি লাভ। আমরা যে পথিক, আমরা যে চিরযাত্রী, —সেই কথাটাই হঠাৎ কোনো কোনো ক্ষণে উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। তখন বুঝি যে—

পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে—
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামি—
এমনি করে একে একে
সর্বস্বান্ত আমি।

আজ আমার এসব কথা কেন যে মনে পড়লো, জানি না। তবে, এটা অনুভব করতেই হয় যে, আমার মন ভালো নেই। খুব একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। 'সর্বস্বান্ত' কথাটার যেন হঠাৎ মানে বোঝা গেল।

এই অবস্থায় আর-একখানি বই দেখলুম অন্যমনে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের লেখা 'ঘরে চলো'। আলমোড়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর থেকে ১৩৬৮র পৌষের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম স্মরণ করে সে বই প্রকাশিত হয়। বেলুড়মঠের স্বামী নির্বেদানন্দজী এবং স্বামী জগদানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়েছে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের এই লেখাগুলি।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এতে আত্মদর্শনের কথা লিখেছেন। জাগরণ, স্বপ্ন, আর সুষুপ্তি—মানুষের এই তিন অবস্থার দিকে মনোযোগী হতে বলেছেন তিনি। আজ পেরু অঞ্চলের অরণ্য, দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম ইত্যাদি নানা দৃশ্যের নানা রূপের ধারায় দুলতে-দুলতে, ভাসতে-ভাসতে চেতনা এসে ঠেকলো তাঁর সেই 'ঘরে চলো' প্রস্তাবের অভিমুখে। মনে পড়লো তাঁর নিজের কথা—

'আমরা সম্মুখে পশ্চাতে উপরে নীচে সকল দিকে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালে কেবল জাগরণের জগৎই দেখি—জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ, লেন-দেন সেই জগতের সহিতই করি—নিজেকেও ধরিয়া লই জাগরণের জগতের একটি অংশ বলিয়া। কিন্তু স্বপ্ন আসিয়া প্রতিদিন আমাদের এই ধারণাকে খণ্ডন করে। প্রতি রাত্রে স্বপ্নে জাগরণের জগৎ মুছিয়া যায়—নূতন আকাশ বাতাস পাহাড় প্রান্তর জীবজন্তু লইয়া নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠে—জাগরণের আশা আকাঙক্ষা তৃপ্তি অতৃপ্তি সব ওলটপালট হইয়া অভিনব আশা-অভিলাষ সুখ-দুঃখ হাজির হয়—পুরাতন মানুষটি পর্যন্ত বদলাইয়া যায়।'

উপনিষদের ইঙ্গিত ধরেই তিনি এসব কথা তুলেছেন। বলেছেন—

'স্বপ্ন ও জাগরণ, আমারই দুই বিভিন্ন অবস্থার অভিজ্ঞতা—ইহা স্বীকার করিলে চকিতে আমি আমার নিজের সম্বন্ধে এক পরম সত্যের আভাস পাই। সে সত্য এই যে, হয়তো আমি স্বপ্ন ও জাগরণ এই দুটা হইতে পৃথক অপর একটা কিছু। হয়তো আমার এই দুটা হইতে বৃহত্তর একটি স্বরূপ আছে—ইহাদের দুঃখ,

ইহাদের আঘাত যেখানে স্পর্শ করে না—প্রবেশ করে না। নদীর স্রোতে বিচরণশীল বহৎ মৎস্যটি যেমন নদীর একূল ওকূলে দুকূলে খেলা করিয়া বেড়ায়—কিন্তু নিজে সে কোন কূলেরই নয়—সে নদীর বাধাহীন স্বচ্ছ জলের অধিবাসী—কূলের ঘটন-অঘটনের সহিত তাহার কোন সংস্পর্শই নাই—ঠিক সেইরূপ।'

যেমন এই জাগরণ, আর স্বপ্ন, তেমনি সুষুপ্তি আমাদের আর এক অবস্থা। তখন—

'জগৎ রহিল না, সংসার রহিল না—দেহ ভুলিয়া গেলাম, ইন্দ্রিয় ভুলিয়া গেলাম, মন বুদ্ধি অহঙ্কার চাওয়া পাওয়া আবেগ উল্লাস সকলই বিস্মৃত হইলাম।'

এসব হয়তো পরিচিত অর্থে ঠিক সর্বস্বীকার্য 'সাহিত্য' নয়। কিন্তু সাহিত্যও আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ধারণা জাগিয়ে তোলে। এই কথা ভাবতে-ভাবতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আলোচনার মধ্যে অতঃপর আমি সেই প্রশ্নটি দেখেছিলুম—এবং তার উত্তরও। সুষুপ্তির বিস্মৃতি সম্বন্ধে এই কথার পরেই তিনি লিখেছেন—

'কিন্তু আমি নিজেও কি লোপ পাই? না। আমি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে থাকি। জানাজানির পারে, সুখদুঃখের পারে, সকল ব্যবহারের অতীতে আমার এ কিরূপ থাকা? সুষুপ্তির আমি তো জাগরণের আমি নই, স্বপ্নের আমিও নই।'

তিনি প্রশ্ন করেছেন মানুষের অসীম ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে—

'জাগরণে ও স্বপ্নে যদি উহা ঢাকিয়া যায়, তাহার জন্য দায়ী মানুষেরই পক্ষপাত, জাগরণের উপর তাহার অন্যান্য আসক্তি। সে কেন জাগরণের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলে?----মানুষ কেন মনে করে সে শুধু জাগরণের?'

জবাব দিয়েছেন—

'এই তিনটি অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডিত করে এবং তদ্দ্বারা বুঝাইয়া দেয় যে মানুষ তুমি এই তিনটি হইতেই পৃথক। ইহারা আসে যায়, কমে বাড়ে, নানা আকার ধারণ করে, তুমি কিন্তু বরাবরই আছ চৈতন্যময় সাক্ষী—হ্রাসবৃদ্ধিহীন, পরিবর্তনহীন আত্মা।'

পাঠক-পাঠিকারা আমাকে মার্জনা করবেন। সাহিত্যের প্রসঙ্গ ধরেই আমার এ-ভ্রমণ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেছিলুম। কিন্তু মাঝে-মাঝে এক-একদিন এইভাবেই মনের মেজাজ বদলে যায়। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার কথা বিনা-নোটিসে দেখা দিয়ে যায়। মনে পড়ে জন্ম-জন্মান্তরের ধারাবাহিকতা। গ্যেটের কলমে মনের বহুরূপী স্বভাবের কথা পড়ে,—বিভূতিভূষণের লেখায় পরলোকে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ দেখে, বোধ হয় কোনো-কোনো দিন আপনাদেরও মন হঠাৎ এরকম গম্ভীর হয়ে থাকে। বোধ হয় সেই কারণেই এই লেখককে আপনারা মার্জনা করতে পারবেন এবং এইরকম ক্ষমার মেজাজ যদি দেখা দেয়, তাহলে মারখাম-সাহেবের লেখা পেরু আর ভারত-ভ্রমণের কাহিনী ফেলে রেখে, হয়তো স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বইখানিই আপনারা আর-একবার দেখবেন। দেখবেন তিনি লিখেছেন—

'পরলোকমুখীনতাকে বহু মনীষী সুনজরে দেখেন নাই এবং এখনও দেখেন না। অনেকে ইহাকে মানসিক ব্যাধি বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ইহলোকের মানুষ দুনিয়াকে অবহেলা করিয়া ইহার সত্যকে মানিয়া না লইয়া, ইহার সুখদুঃখে তাদাত্ম্য বোধপূর্বক জগতের প্রসার, অগ্রগতির জন্য চেষ্টা না করিয়া চোখ বুজিয়া আসমানের দিকে তাকাইয়া থাকিবে, ইহা যে, প্রকাণ্ড মূর্খতা এবং দুর্বলতা—সাদামাটা যুক্তিতে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি।'

কিন্তু,—তিনিই বলেছেন—

'যতদিন মানুষ ক্রমবিকাশের বর্তমান কোঠায় দাঁড়াইয়া পঞ্চভূতের এই ষড়বিকারযুক্ত দেহ লইয়া ঘর করিতে বাধ্য হইতেছে, ততদিন তাহার আশার বাসা আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইবে না। হেরাক্লিটাস বুদ্ধ বুঝিয়া শুনিয়াই তাই আশার বাসা বাঁধিতে রাজি হন নাই; সোপেনহাওয়ারের দর্শনও বালুকার ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে নাই; ভর্তৃহরির ছড়াগুলাও (বৈরাগ্যশতকম্) পাগলের অসম্বদ্ধ প্রলাপ নয়—বরং জগৎটাকে খুব তলাইয়া দেখিবার পর প্রাণ নিংড়াইয়া লেখা অকাট্য প্রমাণসম্বলিত সিদ্ধান্ত।'

(ক্রমশঃ)

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
—ইহাতে আছে—
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

যেন আলাদিনের প্রদীপ হাতে রয়েছে। নইলে বেশিদিন আগেও নয়, মাত্র আঠারো বছর আগেই যখন গোটা জার্মান জাতি ও দেশটাকে জহ্লাদ হিটলার তার বাদাবাদী নীতির গোঁয়ার্তুমিতে মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, তখন কেউ ভাবতে পারে নি যে এই জাতি, এই দেশ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু জার্মান জাতির রক্তে রয়েছে কর্মচঞ্চলতা আর প্রাণস্পন্দন। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে যা বিরল ; কোন বৃহৎ রাষ্ট্র, শক্তিগোষ্ঠী বা সরকারের এমন ইতিহাসে যা শোনা যায় নি ; তাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম জার্মানীতে। এদেশের সরকার দেশের জনগণমনকে উৎসাহিত করেছে স্বীয় ক্ষমতায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের দেশ ও জাতির উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে।

আজকের দিনে বলা চলে যে পশ্চিম জার্মানী বা সংযুক্ত জার্মান সাধারণতন্ত্র এদিক দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছে। আঠারো বছর আগে এই জার্মান সম্বন্ধে অনেকের বদ্ধ ধারণা হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর নাম চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। অথচ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো এই পশ্চিম জার্মানীও এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মান সাধারণতন্ত্রের অনেক কিছু দেবার আছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলিতে 'বনে'র সক্রিয় সহযোগিতা আছে। একথা অনস্বীকার্য যে, ঘটনাক্রমে জার্মানী ইউরোপীয় ও অতলান্তিক দেশগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। তাই জার্মানীর কাছে আশা করা স্বাভাবিক যে, ইউরোপের ঐক্যসাধনে ব্রতী হ'তে জার্মানী অগ্রণী হবে। গত পনেরো বছরে নতুন পশ্চিম জার্মানী গড়তে আমেরিকার সঙ্গে যে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে স্থায়ী মৈত্রীর বন্ধন ব'লে ধরে নেওয়া যায়। যার ফল এই জার্মানী ইউরোপীয় তথা অতলান্তিক রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার

● আকাশ ভেদ ক'রে চলেছে হামবুর্গ বন্দরের বিখ্যাত একক মানুষ-এর বাসস্থান উপনগরীর গৃহগুলি।

করে নেবে। ইতিমধ্যেই এই বিশেষ স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে।

জার্মানীর দুটো ভূমিখণ্ডে দুটি সরকার দুটি শক্তি—আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য পাওয়ায় উভয় জার্মানীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষেও সহায়ক। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আশঙ্কা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিম জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলর ডঃ এরহার্ড

মৈত্রেয়

সম্প্রতি আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব শ্রীরাস্কের সম্বর্ধনায় উল্লেখ করেছেন—

"আমরা সকলের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করতে চাই। কিন্তু কখনও কখনও এমন হয় যে, এক দলের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে অপরের বিদ্বেষভাজন হতে হয়। আজকের যুগেও যদি এই প্রকার চিন্তা দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে অতি দুঃখজনক বলা যেতে পারে।"

প্রফেসর এরহার্ড পশ্চিম জার্মানীর সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলেছেন, এই নীতি অনুসারে বন সরকার যেমন একদিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে, তেমনি প্যারিসের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে চায়, সম্প্রতি চ্যান্সেলর ডাঃ এরহার্ড এও উল্লেখ করেছেন যে, অর্থনীতি বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী কখনই শুধুমাত্র ইউরোপ বা আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি একথা শোনাতে চান যেন, ইউরোপীয় কমন মার্কেটের ক্ষেত্রও শুধু ইউরোপে সীমিত করে রাখলে চলবে না। 'বাজার' যেন এক সুদূরপ্রসারী উদার নীতির অনুসরণ করে। এরহার্ড নিজস্ব নীতি দ্বারা এশিয়া তথা আফ্রিকার নতন স্বতন্ত্র দেশের প্রগতিতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত আছেন। অর্থনীতির অধ্যাপক এক উদার নীতির কথা উল্লেখ ক'রেছেন বিশ্ব আর্থিক উন্নয়ন কল্পে। তিনি যে পরিকল্পনার কথা প্রকাশ ক'রেছেন তাতে সমস্ত শ্রমশিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন—ওসব রাষ্ট্রের উচিত অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক আদান-প্রদানকে উদারতা দ্বারা প্রসারিত করা। অর্থাৎ এশিয়া তথা আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলি যদি ইউরোপে আমদানী করতে চায় তবে যেন সে সব দেশের দ্বার খোলা থাকে। এই কারণে যদি

শ্রমশিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের কিছু লোকসানও দেখা দেয় তবু উদার্যের প্রসঙ্গে তা মেনে নেওয়াই সঙ্গত হবে। এরই ফলে বিশ্বব্যাপী অসন্তোষের নিরসন হবে। এই যোগাযোগকে বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ এরহার্ডের এই পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ স্বতন্ত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে অধ্যাপক এরহার্ডের নাম সুবিদিত। পশ্চিম জার্মানীতে তাঁর নীতির যে আশ্চর্যজনক সফলতা পাওয়া গেছে তা বাস্তবিকই চমকপ্রদ। এখন তাঁরই পরিকল্পিত আদর্শ আর নীতি অনুসারে পশ্চিম জার্মানী বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নতুন স্থান রচনা করছে।

ডঃ এরহার্ড আর একটি ব্যাপারে এমন বলিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছেন, যাতে গোটা পশ্চিম জার্মানীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ এক জাতি এক প্রাণ একতায় উদ্বেল। বার্লিন প্রাচীর অস্বীকার করা এবং গোটা জার্মানীর আন্দোলনে আজ পশ্চিম জার্মানীর লোক মেতে উঠেছে। গত 'মে-ডে'তে তিনলক্ষ মানুষের এক জমায়েতে চ্যান্সেলর ড. এরহার্ড ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানীর ভবিষ্যৎ স্থায়ী হ'তে পারে না। এই সম্পর্কে আরও বলেন, জার্মানী, গোটা জার্মান জাতির। এদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে সোভিয়েটের কর্তৃত্ব অসম্ভব। এই স্বজাতির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব জার্মান জাতির। তাই তাঁর সরকার মস্কো বা পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে রাজী আছেন। এই জমায়েৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে পুরাতন রাইকস্টেজ বিল্ডিং, বা ভস্মীভূত হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তার পুনর্গঠিত অংশ বিশেষে।

ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানীতে আজ গণতান্ত্রিক মনোভাবের জাগ্রতরূপের সঙ্গে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে নাৎসী নীতির জঘন্যতার উপর। সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফুর্টের সাধারণ বিচারালয়ে গণহত্যার অন্যতম নাৎসী-পাণ্ডা আইকম্যানের সহকারীর বিচার সময়ে ছাত্র-ছাত্রী, যুবসমাজের এক বিরাট অংশের ঔৎসুক্য ও কৌতুক পরিলক্ষিত হয় ওদের উপস্থিতির মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক ও ঔষধ-নির্মাতা বর্তমানে উনষাট বৎসর বয়স্ক হারম্যান ক্রুমি হ'ন আইকম্যানের সেই অন্যতম সহকারী, যে নাৎসী আমলের কুখ্যাত 'এস্ এস্'-এর একজন নায়ক। তার সঙ্গে বিচার চলছে ৫৩ বৎসর বয়স্ক আইনজীবী ওটো হাঙ্ক-এর। এই দুই জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অসংখ্য মানুষের হত্যা হিসাবে। ক্রুমিকে চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত হাঙ্গেরীয় ইহুদী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

এত সবের মধ্যেও পশ্চিম জার্মানীর নগর উন্নয়নের অগ্রগতি সমান ভাবেই চলেছে। সম্প্রতি যে ভাবে গৃহ নির্মিত হয়ে চলেছে—তাতে বোধ করি কিছু কালের মধ্যেই বিশ্ব-বিখ্যাত নিউইয়র্ক শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। পশ্চিম জার্মানীর শহরগুলির বাড়িগুলি ক্রমেই যেন আকাশ ভেদ করে উঠে চলেছে। কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর অনেক শহরের বুকে এমন ভাবে গৃহ নির্মাণ হয়ে চলেছে যে, শহরের আদলই পাল্টে গেছে। পশ্চিম জার্মানীর সর্ববৃহৎ বন্দর হামবুর্গের তথাকথিত 'উপনগরী' আজ দশ বছর হ'ল মাত্র তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তীবাড়ির উপর গড়ে উঠেছে এই পরিকল্পিত অট্টালিকা সমন্বিত উপনগরী। 'বোর্ড অফ ওয়ার্কস'-এর তত্ত্বাবধানে। ছোট ছোট পুটে আকাশচুম্বী গৃহ সম্বলিত এই উপনগরীর ঘরগুলিতে দোকান আর কেবলমাত্র অবিবাহিত যুবক-যুবতী থাকছে এক এক ঘরে।

জার্মানীতে চলতি কথা আছে—মৃত্যু আর কর থেকে কোন লোকেরই রেহাই নেই। সম্ভবত বর্তমানে ওদেশে মানুষ যেমন পরিসংখ্যান আর গবেষণা নিয়ে মেতে উঠেছে তাতে, আরও একটি কথা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। বাজার গবেষক আর অনুসন্ধিৎসুদের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া আজকাল দায় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে খুব কম বিষয়ই রয়েছে যেদিকে এঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ হয় নি। এমন বিষয়ও এঁরা মাঝে মাঝে গ্রহণ করেন যা সাধারণের কাছে যেমন চমকপ্রদ তেমনি চিন্তার খোরাক জোগায়।

ফেডারেল রিপাব্লিক অফ্ জার্মানীতে তিনটি বিষয় নিয়ে অনুসন্ধিৎসুদের আজকাল খুব মাতামাতি চলছে। 'এই শতাব্দীর জার্মানীতে সবচেয়ে ভাল সময় কোনটি ? তাঁদের প্রথম প্রশ্ন হল এই। ১৯৬৭ সালে সবচেয়ে বেশি কি চাও ?—এটি অপর একটি জিজ্ঞাসা। তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল—আপনি কি খুশি ? ইউরোপের সাতটি দেশে এই তৃতীয় প্রশ্নটির 'এপিডেমিক' দেখা দিয়েছে বলা যেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড এবং পশ্চিম-জার্মানীর বিভিন্ন উত্তর থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর তুলনামূলক সমীক্ষার কৌতুক এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাই এটি বড় আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েছে পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ লোকদের মধ্যেও।

মোটের উপর সমস্ত লোকই মোটামুটি সন্তুষ্ট। সব জায়গা থেকেই প্রায় এই ধরণের উত্তর সংগ্রহ করেছেন উৎসুক গবেষকবৃন্দ। 'আপনি কি আপনার চাকুরী বা বৃত্তি, আপনার বাসস্থান, আপনার অবসর সময় এবং আপনার সাধারণ জীবন যাপনের ধরণে খুশি না অখুশি ?—এই প্রশ্নগুলির উত্তরে প্রত্যেক দেশ থেকেই 'আমরা খুশি' এই উত্তর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ওই সন্তুষ্টির প্রকার ভেদও দেখা গেছে। এমনি সন্তুষ্টির শ্রেণীবিভাগ বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে সুইজারল্যাণ্ড ডেনমার্ক এবং নরওয়েতে। সামান্য পার্থক্য দেখা গেছে ফ্রান্স এবং বৃটেনে। আর পশ্চিম জার্মানী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাঝামাঝি অবস্থা। ও দুই দেশের উত্তরদাতারা বলেছেন—'আমরা খুশি।' ব্যাপক শিল্প-কারখানার প্রসারে এই শিল্পযুগের কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত এমন পশ্চিম জার্মানীর শতকরা ৭৮ জন বলেছেন আমাদের কাজে আমরা সন্তুষ্ট। বাসস্থানে খুশি শতকরা ৭১ জন। অবসর সময় উপভোগ করবার সুযোগ আমেরিকার মত কোন দেশেই পায় না। তবুও পশ্চিম জার্মানীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক বলেছে অবসর সময় তাদের কম নয়।

রাজধানী ঃ

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে পাক-ভারত বিরোধের উল্লেখে নয়াদিল্লী অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে দারুণ উত্তেজনার। পার্লামেন্টের সদস্যগণ বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা আলোচনা চালাচ্ছেন। এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথাও অনেকে ভাবছেন। পার্লামেন্টের কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী সদস্য দলীয় অধিবেশনে বিষয়টি আলোচনার জন্য উত্থাপনের দাবীও তুলেছেন। পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যকরী সভার আসন্ন অধিবেশনে এ ব্যাপারে আলোচনার সিদ্ধান্তও নাকি হয়েছে। সে অধিবেশনে যোগদানের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস সদস্যদের মতামতের কিছু আঁচ পাওয়া যাবে পার্লামেন্টারী পার্টির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি থেকে। তিনি প্রকারান্তরে কমনওয়েলথের সদস্য থাকার আর কতটা সার্থকতা আছে, সেই প্রশ্নই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, এবারের ঘটনার পর ভারতের কমনওয়েলথে থাকার গোঁড়া সমর্থকদেরও মোহ কাটবার উপক্রম হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ সিং এর জন্য মুখ্যত দায়ী করেছেন বৃটেনকে। তিনি বলেছেন, বরাবরই বৃটেন পাক-ভারত বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করেছে পাকিস্তানের। কাশ্মীরের ব্যাপারেও বৃটেন পাকিস্তানকেই সমর্থন করে চলেছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী

তাজমহলের অভ্যন্তরে আরব প্রজাতন্ত্রের গভর্নরের প্রতিনিধিদল

কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের মূল নীতিকেই এবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের কোন সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং দু'টি সদস্য রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিরোধ আলোচিত হবে না, এই ছিল মূল নীতি। এবারে সম্মেলনে সে নীতি উপেক্ষা করেই সম্মেলনের ইস্তাহারে পর্যন্ত পাক-ভারত বিরোধের কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

সব চেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন ভারতের প্রতিনিধি শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কথা বাদ দিলেও, তিনি গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হয়ে মাত্র। তা ছাড়া, তিনি ভারতের প্রথম সারির নেতাও নন। তাঁকে পাঠানোই ঠিক হয় নি। শোনা যাচ্ছে, এ সব দিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত শ্রীগুলজারীলাল নন্দ যৌথ নেতৃত্বের সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে করেছিলেন। তার পরই ঠিক হয় শ্রীমতী গান্ধীকে পাঠানো। এ সব দিক বিচারের পর শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে অধিক কিছু বলার নেই। কিন্তু এই চতুর মানুষটি তাঁর ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য দুনিয়ার মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। সম্মেলনের ইস্তাহারে তাঁর মতে 'আপত্তিকর কিছুই বলা হয় নি'। তিনি একে 'সদিচ্ছার প্রকাশ' বলে সাফাই গাইতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী যত চৌকস হোন না কেন, তিনি লণ্ডনে যা হারিয়ে এলেন তার কৈফিয়ৎ দেশবাসীর কাছে দিতে হবে।

* * *

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আবার

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শ্রী সি কে গোবিন্দন নায়ার পূর্বে এ নিয়ে একদফা তোলপাড় করেছিলেন। তখন এ ব্যাপারে ফয়সালার ও তদন্তের ভার নিয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধে দোষের কিছু পান নি।

এবারে আবার নতুন করে অভিযোগ এনেছেন কুড়িজন এম-এল-এ। তাঁরা চিঠি লিখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির কাছে। অভিযোগের উপযুক্ত তদন্ত না হলে তাঁদের বিধান সভার সদস্যপদে ইস্তফা দেবার অনুমতি দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

শ্রীশঙ্কর তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামে দুটো জেলে-নৌকো কিনেছেন, স্ত্রীর নামে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন এবং বন্ধু ও আত্মীয়দের নামে নতুন বিদ্যালয়ের অনুমোদন মঞ্জুর করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ১৯৬০ সালের পর শ্রীশঙ্কর যে সকল সম্পদ আহরণ করেছেন, তার যথাযোগ্য তদন্তের দাবীও জানানো হয়েছে।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ নাকি এখন এই অভিযোগের তদন্তের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করছেন।

* * *

জাতীয় আদর্শে ও জাতির ভাবধারা অনুযায়ী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজবার প্রয়োজনের কথা উঠেছে অনেক আগেই। এতদিন কোন কাজ হয় নি। শিক্ষা দপ্তর ডঃ ডি এস কোঠারীকে চেয়ারম্যান করে সম্প্রতি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এ কমিশন শিক্ষার প্রতিটি স্তর সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে একটা জাতীয় শিক্ষার আদর্শ তুলে ধরতে চেষ্টা করবেন। এ কমিশনে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ রয়েছেন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে কমিশন রিপোর্ট পেশ করবেন। অন্তর্বর্তীকালে প্রয়োজনমত কিছু কিছু সুপারিশ দাখিলও করা হবে।

শিক্ষার ব্যাপারে কমিশন আগেও হয়েছে। স্যাডলার কমিশন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এবং মুদালিয়ার কমিশনের কাজ সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁরা যে-সকল সুপারিশ করেছিলেন আমাদের আমলারা তার সবটা আমলে আনেন নি। যেটুকু গ্রহণ করেছিলেন তারও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আন্তরিকতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

ডঃ ডি এস কোঠারী

নতুন কমিশনের সুপারিশ তেমনি আমলাতন্ত্রের পেষণে পিষ্ট হলে তাল-গোল পাকানো ছাড়া কোন সুফল হবে না। শ্রীচাগলা বিচক্ষণ ব্যক্তি। আশা করি, তাঁর শ্রম সার্থকই হবে।

* * *

দুর্নীতির ব্যাপারে এবার গোয়েন্দা বিভাগের নজর পড়েছে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ অফিসারদের ওপর। বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রচার ও জনসংযোগ অফিসারদের হাত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। এই টাকা তাদের হাত করার জন্য খরচ করা হয়? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্থির করেছেন, গোয়েন্দা বিভাগ এই সব ব্যক্তির কর্মকলাপের ওপর নজর রাখবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ইতিপূর্বেই সমস্ত মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আতিথ্য গ্রহণ না করার জন্য বলেছেন। অবশ্য তাঁর এই পরামর্শ বা নির্দেশ কতজন মেনে চলছেন বলা শক্ত।

* * *

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের গভর্নরদের একটি প্রতিনিধি দল ভারতে এসেছিলেন। তাজমহল দেখেছেন তাঁরা নির্নিমেষ বিস্ময়ে।

গুজরাট :

তিন বছরের শিশু রাজ্য গুজরাট। চলার পথে প্রতিবন্ধকতাও তার অনেক। খাদ্যাভাব তার চিরকালের—পুরোনো ব্যাধি বলা যেতে পারে। এবারে আবার তা বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়েছে। অপরের ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই। বাইরের আমদানী কোন রকমে কমে গেলেই বিপদ ওঠে ঘনিয়ে। তা ছাড়া, সারা ভারতের পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। তাই হাহাকার সুরু হয়েছে চারদিকে—গ্রামাঞ্চলে বেশি করে।

রেঙ্গুনের চাল গুজরাটীদের অত্যন্ত প্রিয়। আগের দিনে গুজরাটে চাল আসতো ব্রহ্মদেশ ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। এখনও এ অঞ্চলে রেঙ্গুনী চোখা (রেঙ্গুনের এক শ্রেণীর চাল) অধিক মূল্যে বেচে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা।

পুরোনো ব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা চলেছে পুরোদমে। রাজ্য সরকার এর জন্য আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কচ্ছের উষর মরুময় এলাকার নয় হাজার বর্গমাইল সংস্কার করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

এ কাজ খুবই শ্রমসাপেক্ষ!

ভবনগর জেলার অভিজ্ঞতা অবশ্যি অনেকটা সাহায্য করবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবলবন্তরাও মেহতা এ বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত।

গুজরাটের অর্থকরী ফসল চীনাবাদাম ও তুলা। শতকরা ৪৭ভাগ জমিতে চাষ হয় এই জাতীয় ফসল। পরিকল্পনা কমিশন এ অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতির ধাঁচের পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। কাজেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন প্রয়োজন। সে জন্য নিবিড় ও ব্যাপক চাষের চেষ্টা চলেছে।

* * *

জৈন এবং বৈষ্ণবদের দেশ গুজরাট। আমিষভোজীদের দেখলেই এখানকার

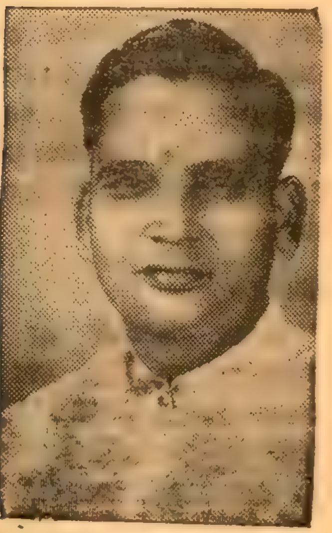

শ্রীমানুভাই শাহ

মানুষের নাসিকা ওঠে আপনা থেকেই কুঞ্চিত হয়ে। পেঁয়াজ খাওয়া পর্যন্ত এখানে নিষিদ্ধ। মাদকদ্রব্য বর্জনের মাতামাতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। মদ্যপায়ীরা সমাজে অপাংক্তেয়। আদিবাসী ও নীচের তলার মানুষ ছাড়া অপর কেউ মদের পিয়াসী নয়। মদ চোলাই বড় একটা হয় না। মদ চলে পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় এবং রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের নিকটতম অঞ্চলে। রাজ্য সরকার চাইছেন, দশ মাইল নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করতে। এখন পুরোপুরি নিষিদ্ধ এলাকা রয়েছে মাইল তিনেক।

* * *

দুর্নীতি দমনের জন্য সরকার সম্প্রতি নতুন সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এই সংস্থার জালে ধরা পড়েছেন এ পর্যন্ত ৭৩ জন সরকারী চাকুরে। পুলিশের প্রাক্তন ইন্সপেক্টার জেনারেলকে সাসপেণ্ড করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

* * *

স্বতন্ত্র পার্টি আগামী সাধারণ নির্বাচনে গুজরাট থেকে সব ক'টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ঘোষণা করেছে। কেন্দ্র পুনর্বণ্টনের ফলে গুজরাটে লোকসভা আসনের সংখ্যা হবে ২৪। এর মধ্যে স্বতন্ত্র পার্টি ২২টি আসনে দলের প্রার্থী দেবে, আর দুটি আসনে নির্দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন করবে বলে জানা গেছে।

কচ্ছ, কথরা ও পাঁচমহল কেন্দ্রের জন্য স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থীদের নাম ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে। নাম প্রকাশ করা না হলেও দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড নাম অনুমোদন করেছেন।

বরোদার মহারাজা ফতে সিং রাও গায়কোয়াড়ের খুল্লতাত যুবরাজ খান্দেরাও সম্ভবত স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থিরূপে বরোদা অথবা মেহসানা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তবে মুস্কিল দেখা দিয়েছে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমিনু মাসানীকে নিয়ে। তাঁর বর্তমান কেন্দ্র রাজকোট থেকে তিনি দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছেন না। কংগ্রেস থেকে সম্ভবত এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ দাঁড়াবেন। শ্রীশাহ শক্ত প্রার্থী হবেন। তাছাড়া কাশ্মীর সম্পর্কে শ্রীমাসানীর বক্তব্যে এখানকার এস-এস-পি ও জনসঙ্ঘ ক্ষিপ্ত। তাই এবার শ্রীমাসানী জামনগরে দাঁড়াবার কথা ভাবছেন।

কাশ্মীর ঃ

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যে জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপন করা হবে, এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। তবে বর্তমান জাতীয় সম্মেলনকে কংগ্রেসের শাখারূপে গ্রহণ করা হবে, না সম্পূর্ণ নতুন করে কংগ্রেস সংগঠন স্থাপন করা হবে, সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নি।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক ১৯৫১ সাল থেকে কাশ্মীরে কংগ্রেসের শাখা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু বক্সী গোলাম মহম্মদের বিরোধিতা এবং কিছুটা কংগ্রেস

বক্সী গোলাম মহম্মদ

হাইকমাণ্ডের ঔদাসীন্যের জন্য এ কাজ এতদিন হয় নি। শ্রীসাদিক জাতীয় সম্মেলন ভেঙে দিয়ে নতুন করে কংগ্রেস গঠন করতে চান, আর বক্সী সাহেবের ইচ্ছা—বর্তমান জাতীয় সম্মেলনকেই কংগ্রেসে রূপান্তরিত করা হোক। জাতীয় সম্মেলনের অধিকাংশ কর্মী সম্ভবত শ্রীসাদিকের মতের সমর্থক।

সম্প্রতি শ্রীসাদিক দিল্লীতে এসে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের সঙ্গে

● শ্রীসাদিক

দীর্ঘ আলোচনা করে গেছেন। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বোধ হয় শীগ্‌গিরই এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

• • •

এ মাসের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ শ্রীনগর যাচ্ছেন। নানা দিক থেকে শ্রীনন্দের এই কাশ্মীর যাত্রা গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বারে বারে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। সীমান্তের অপর পারে পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের মহড়া চলছে। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী গুপ্তচরদের সাহায্যে নাশকতামূলক কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। আবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন করে কাশ্মীর নিয়ে জল ঘোলা করার চেষ্টা করছেন। এর ওপর রয়েছে কাশ্মীরে গণভোট সমর্থকদের দুই নেতা শেখ আবদুল্লা ও মৌলভী ফারুকের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর বিবাদ। সব মিলিয়ে কাশ্মীরের পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

● শেখ আবদুল্লা

শেখ আবদুল্লা জেল থেকে বেরুবার পর মীর ওয়াইজ মৌলভী ফারুক ও তাঁর অনুগামী মোল্লাদের দল শেখ আবদুল্লার সঙ্গে একত্র কাজ করলেও এখন মৌলভী ফারুক প্রকাশ্যে আবদুল্লাকে 'ভারতের দালাল' বলে আক্রমণ করছেন। মনে হচ্ছে, পাকিস্তানপন্থী মৌলভী ফারুক ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের দল আবদুল্লা জেলে থাকার সময় আবদুল্লার ওপর যতটা ভরসা করেছিলেন, এখন আর তা করতে পারছেন না। তাই আবদুল্লা ও মহীউদ্দিন কারার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা সংগঠনরূপে মৌলভী ফারুক নিজস্ব সংগঠন 'আওয়ামী এ্যাকশন পার্টি' গঠন করেছেন।

● শ্রীচাগলা

আবদুল্লা ভারতের পক্ষে চলে গিয়েছেন বলে ফারুক অভিযোগ করায়, আবদুল্লাও এখন নিজের 'সততা' প্রমাণের জন্য প্রাণ ভরে কাশ্মীরের সাদিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গাল দিচ্ছেন। বিশেষ করে আবদুল্লার আক্রমণের লক্ষ্য হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা। কাশ্মীর সম্পর্কে শ্রীচাগলার স্পষ্ট ভাষণ আবদুল্লা হজম করতে পারছেন না।

মহারাষ্ট্র :

শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটেছে। বোম্বাই শহরে প্রতি বর্গ মিটার জমি ৫০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বোম্বাই তথা ভারতে কোথাও কখনও নাকি এত দামে জমি বিক্রি হয় নি। আর এই জমির বিক্রেতা খোদ রাজ্য সরকার।

নরিমান পয়েণ্টে ৩,৪১৬ বর্গ মিটার জমি লিজ দেয়া হয়েছে। একটি বাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ টেণ্ডারে প্রতি বর্গ মিটারের জন্য ৫০৫৩ টাকার প্রস্তাব দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়ক নিজে টেণ্ডার খুলেছেন এবং এই টেণ্ডারটি গ্রহণ করা হয়েছে।

নরিমান পয়েন্ট কেবল বোম্বাই নয়, সমগ্র ভারতের মধ্যে নাকি সবচেয়ে সুন্দর বসতি-এলাকা হবে। প্রথমে ঠিক ছিল, এখানে কেবল আবাসভবন হবে। এখন স্থির হয়েছে, আবাসভবনের পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাড়িও তৈরি হবে। মার্কিন কায়দায় কয়েকটি বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সও হবে এখানে।

মাদ্রাজ :

রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শ্রী আর ভেঙ্কটরমণের মুখ দিয়ে কার কথা বেরুচ্ছে—কংগ্রেস, না স্বতন্ত্র পার্টির? সম্প্রতি হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমার্সের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীভেঙ্কটরমণ ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শ্রীভেঙ্কটরমণের বক্তব্য—ভারী শিল্পের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেবার ফলে অর্থনীতিতে 'ভয়ঙ্কর অব্যবস্থা' দেখা দিয়েছে। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার দিকে বেশি নজর দেয়া উচিত ছিল। মন্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতের মত দেশের উপযোগী নয়—এর বদলে সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়া উচিত। তাঁর তৃতীয়

কথা, ব্যক্তি উদ্যোগ বা 'প্রাইভেট সেক্টারকে' চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেশি সুযোগ দিতে হবে।

রাজাজী অবশ্যই ভেঙ্কটরমণকে আশীর্বাদ করবেন।

* * *

মাদ্রাজ সরকার বিক্রয়কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি জেলা তিরুচি ও মাদুরায় কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসাররা ফাঁকি ধরার জন্য যে অভিযান চালিয়েছেন

● শ্রীভক্তবৎসলম

তাতে দেখা গেছে, মাত্র এ দুটি জেলাতেই বিক্রয়কর ফাঁকির পরিমাণ এক কোটি টাকার ওপর। কংগ্রেসী এম-এল-এ ও এম-এল-সি'রা কর ফাঁকির অভিযোগে ধরা পড়েছেন। কোয়েম্বাটুরে তিনজন বিশিষ্ট মিল-মালিকও আছেন অভিযুক্তদের তালিকায়।

এখন এই সব কংগ্রেস নেতা ও ব্যবসায়ীরা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলমের কাছে কমার্শিয়াল ট্যাক্স বিভাগের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দরবার করছেন। তবে কমার্শিয়াল ট্যাক্স বিভাগ খুবই উৎসাহের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উত্তর আর্কট জেলায় ৩০ লক্ষ টাকা ফাঁকি ধরা পড়েছে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

বর্ষা পুরোদমে সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজ্যে খাদ্যশস্যের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ দোকানে নতুন গম বা চাল আসা বন্ধ হয়েছে, আর পুরোনো মজুত যা ছিল, তাও শেষ হয়েছে। সরকারী ন্যায্য-মূল্যের দোকানে গম বা চাল প্রায় নেই বললেই চলে। সাধারণ মানুষ থলে হাতে দোকানে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। ফলে, খোলাবাজারে সামান্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে, তার দাম ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসে কখনও এরূপ মূল্যবৃদ্ধি হয় নি।

দরিদ্র অধিবাসী, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ও বনাঞ্চলের আদিবাসীরা গাছের পাতা খেয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করছে। রেওয়া বিভাগে খাদ্যের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য সুদূর গ্রামাঞ্চলে কোন খাদ্যশস্য পাঠানো যাচ্ছে না—ফলে সর্বত্র খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতাও নেই। কিছু কিছু সরকারী টেস্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়।

এবারকার খাদ্য সঙ্কটের জন্য অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রকে দায়ী করছেন। খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ভুল পরিসংখ্যান দেবার ফলেই এ রকম অবস্থা হয়েছে। রাজ্যে মোট গমের চাহিদা ১৯ লক্ষ টন। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব অনুসারে, এবার গম উৎপাদন হয়েছে ১৮·৭৬ লক্ষ টন। সুতরাং কোন অভাব নেই। এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার কোন সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নি, সাধারণ মানুষও আশ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবারের গমের উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন। ৪ লক্ষ টন ঘাটতি। এই অবস্থায় অভাব হবেই। তার ওপর অনেকে বলছেন, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটকে মধ্যপ্রদেশের চাল দেয়া ঠিক হয় নি। এর ফলে অভাব বেড়েছে। অভাব সৃষ্টি ও মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে ব্যবসায়ীদের কারসাজী নিশ্চয়ই আছে—তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হয়েছে এবং খাদ্যে ঘাটতি আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

※ ※ ※ ※

প্রাক্তন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও সমাজতন্ত্রী দলের মিলনে প্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটী গঠিত হয়েছে। পি-এস-পি নেতা ঠাকুর নিরঞ্জন সিং এই কমিটীর চেয়ারম্যান ও সোস্যালিস্ট পার্টি'র শ্রীজগদীশচন্দ্র যোশী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মধ্যপ্রদেশে এস-এস-পি দলের সুরুটা ভাল হয়েছে। এখানে পি-এস-পি'র বিশেষ কেউ কংগ্রেসে যোগ দেয় নি। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ঐক্যের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু মুস্কিল দেখা দিচ্ছে নেতৃত্বকে নিয়ে। নেতৃত্বের ভেতরে পরস্পর অবিশ্বাস ও দলাদলি দূর হয় নি। ঠাকুর নিরঞ্জন সিং-এর ওপর অনেকেরই আস্থা নেই। অনেকের ধারণা ছিল, ঠাকুর সাহেব কংগ্রেসে যোগ দেবেন। প্রাক্তন জমিদার ও সামন্তশ্রেণীর নেতারূপে পরিচিত ঠাকুর নিরঞ্জন সিং রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেও তাঁর নেতৃত্বে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি কতটা আন্দোলনের পথে এগোতে পারবে বলা শক্ত। রেওয়ায় এস-এস-পি যে খাদ্য আন্দোলন সুরু করেছে, দলের নতুন কমিটী তা সমর্থন করলেও শোনা যাচ্ছে, ঠাকুর সাহেব তা পছন্দ করেন নি। প্রাক্তন সোস্যালিস্ট পার্টির নেতাদের সমর্থনের ওপর ভরসা করে ঠাকুর নিরঞ্জন সিং তাঁর নেতৃত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন বলে মনে হয়।

গ্রন্থ মেলা

উত্তরপঞ্চাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সম্বোধি পাবলিকেশান্‌স প্রাঃ লিমিটেড, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিঃ-১। দাম : পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের সব প্রান্তেই শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের পরিচিতি ছড়িয়ে থাকলেও, তাঁর মুখ্য পরিচয় এই যে, তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। কাব্য-সাধনা তাঁর অনেক দিনের, জীবনের অনেক ঋতুও তিনি অতিক্রম করেছেন, এই ধরণীর ধুলোয় ঝড়ের মাতন লেগেছে বহুবার—বিপন্ন মানবতা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ, বিপ্লব—অনেক কিছুই তাঁর দু'চোখে দেখা। তাঁর পূর্বতন কাব্যগ্রন্থগুলিতে যেমন জীবন-যন্ত্রণা ও জীবনবোধের পরিচয় পেয়েছি, তেমনি দেখেছি এই বিশাল ভারতের ঔপনিষদিক ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত তাঁর প্রাণের সহজানুরণন।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি থেকে শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যকে যেন আরো গভীর-ভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয়। কারণ, এই কাব্যগ্রন্থ কবির বয়সের মাপের সঙ্গে এ-শতকের বয়সের মাপও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। যদিও গণনার হিসেবে একশত তেরটি কবিতা পাঠের সুযোগ হল, তথাপি বলা যায়, এক একটি কবিতার আস্বাদন রস ও জীবন-জিজ্ঞাসা আমাদের অনুভূতির চরম শিখা স্পর্শ করে। 'উত্তরপঞ্চাশের' সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, সেখানে যেমন ব্যক্তিজীবন তেমনি সামাজিক মানব-সমাজ স্বদেশের মাটি থেকে বিশ্বভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই 'অভীপ্সা'র মতো কবিতা আমাদের সহজেই আবেগে আবিষ্ট করে তোলে। প্রত্যেকটি কবিতার বিষয়বস্তুও একজাতীয় নয়; যেমন কোনোটাতে শুনি—'রোগের রোদন শুনি', অথবা, 'বাষ্পযানে জ্বলে চোখ' কিংবা 'খানিকটা জল তুমি' বা 'আর কত মাংস চাও'। কোনো কবিতায় রয়েছে—'নরকাগ্নি থেকে আসি আমি', তবু যেন কবির খেদ—'শুধু অন্ধকারে যদি বারে বারে ডুবে যাও তুমি'। শেষ পর্যন্ত কবির ভাষণ যেন ছন্দে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এইভাবে : 'আমার অরণ্য হ'তে ফুল ঝরে গেছে,

জয়ন্তী সেন

গেছে সব পাখি উড়ে।' হয়তো এটা মরবিডিটির লক্ষণ, কিন্তু এটাও যেন এ-যুগেরই একটা দিক বলে মনে হয়—যা অন্ততপক্ষে সাধারণ জীবনে কাম্য নয়। তবু যে জীবন-যন্ত্রণায় ব্যক্তিমানুষ কবি হয় সেই যন্ত্রণাই ছড়িয়ে আছে উত্তরপঞ্চাশের অক্ষরে অক্ষরে।

রবীন্দ্র-সুভাষিত—বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত। রবীন্দ্রভারতী। কলকাতা। দাম : বারো টাকা।

'রবীন্দ্রভারতী' যে পুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার প্রথম প্রমাণ হিসেবে উপরোক্ত গ্রন্থের নাম করা যায়। একথা ঠিক, শুধু মৌখিক সাহিত্যচর্চা করলে তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক; সেই কারণে লৈখিক রূপায়ণও প্রয়োজন। আবার একথা কারই বা অজানা যে, কোনো গ্রন্থ যদি তথাকথিত ভাবে জনপ্রিয় হবার যোগ্যতা না রাখে, তাহলে তার প্রকাশক পাওয়াও সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়।

'রবীন্দ্র-সুভাষিত' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন-রূপে গণ্য হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এ-ধরণের সংগ্রহের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যে ত' এ-ধরণের নিদর্শন মেলেই। এমন কি উক্ত সাহিত্যে, বিশেষত কাব্য-রাজ্যকে অবলম্বন করে যে-ধরণের বিভিন্ন রকম অভিধান আছে, অন্য সাহিত্যে তার জুড়ি আছে কিনা, তা জানা নেই। অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর সুভাষিতই পাওয়া যায়। বিভিন্ন কবির রচনা থেকে চয়ন করা সুভাষিতের মধ্যে 'ক্যাসেল্‌স ক্লাসিফায়েড কোটেশন্‌স্' বা ডগলাসের 'ফর্টি থাউজেণ্ড কোটেশন্‌স্'-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-নাথের ব্যঞ্জনাময় উক্তিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলিকে মূল পদের ভিত্তিতে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। সুভাষিত পদের সন্ধানযোগ্য নিয়মাবলীও দেওয়া হয়েছে। যা হোক, এই ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজন আছে, তা বলাই বাহুল্য। তবু গ্রন্থটি উদ্ধৃতি সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বলে মনে হয় না। মূল পদের সংযোজনার ব্যাপারে মত-পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রিয় উক্তি-গুলিকে বাদ দেওয়া অনুচিত। রবীন্দ্র-নাথের গানের অনেক উক্তি সংকলিত হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।' এই ধরণের উক্তিকে কখনোই বাদ দেওয়া যায় না। এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, 'রবীন্দ্র-সুভাষিত' নিঃসন্দেহে উপহার গ্রন্থরূপে গ্রহণীয় হবে। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাটিও মূল্যবান।

বৃটেন ঃ

লণ্ডনে ত্রয়োদশ কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হয়েছে। সম্মেলন শেষে যথারীতি যুক্ত ইস্তাহারও প্রকাশিত হয়েছে। গুরুতর মতভেদের কোনরূপ সর্বসম্মত ইস্তাহার প্রকাশ সম্ভব হবে না এবং সম্মেলন মাঝপথে থেমে যাবে বলে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তা দূর হয়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউম খুশি, দক্ষিণ রোডেশিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মত প্রশ্নে বৃটিশ জনমত ক্ষুব্ধ হতে পারে, এমন কোন পরিণতিতে সম্মেলন পৌঁছয় নি। নানা মতভেদের মধ্যেও ১৮টি ভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রের কমনওয়েলথ ঐক্য রক্ষা করে বৃটেনের প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছেন বলে হিউম আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন এবং বৃটেনের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে এই ঘটনাকে কাজে লাগাবেন। অপর দিকে আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীরাও সন্তুষ্ট—দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারেও অন্তত কিছুটা তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বৃটেন ও অন্যান্য শ্বেতকায় রাষ্ট্রকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পেরেছেন।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রশ্নে আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রধানমন্ত্রীদের দাবী ছিল, অবিলম্বে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সংবিধান পাল্টাতে হবে, এবং এ কাজ করতে গিয়ে সংখ্যালঘু ইউরোপীয়দের সরকার বাধা দিলে সামরিক বাহিনীর দ্বারা সে বাধা ভেঙে দিতে হবে। বৃটেন সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সমর্থন করে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকীয়দের ভোটাধিকার দানের পূর্বে দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতাও বৃটিশ সরকার স্বীকার করবে না। কিন্তু এই উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সংবিধান পরিবর্তনের মত কোন কাজ করতে বৃটিশ সরকার রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয়েছে, নীতিগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সকলেই সমর্থন করেছেন, এবং বলা হয়েছে আইয়ান স্মিথ সরকার যদি

• সাংবাদিকদের সঙ্গে শ্রী টি শোম্বে ও গডফ্রেড মুনেগে.

জোর করে দক্ষিণ রোডেশিয়াকে স্বাধীনরূপে ঘোষণার চেষ্টা করে, তবে সামরিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের নিন্দা করে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা বন্ধের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের বিষয় উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে—প্রধানমন্ত্রীরা এই অবরোধের অসুবিধাগুলির কথাও আলোচনা করেছেন।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারে মালয়েশিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রীদের পক্ষ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৃটেন, ক্যানাডা প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্র অন্যান্য অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে ব্যাপক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, এবং সে-সব সম্মেলনে এ-সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ভারতের পক্ষে এবারের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন ব্যর্থতার কালিমা বহন করে এনেছে। আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে ঘানার কোয়ামে নক্রুমা বা কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা কিংবা ক্যানাডার লিস্টার পিয়ার্সনের মত নেতৃত্ব আমাদের প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী দিতে পারেন নি; উপরন্তু নিজের স্বার্থ যেখানে রয়েছে সেখানেও ভারত তার বক্তব্য ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে নি। মালয়েশিয়া সঙ্কটের উল্লেখ ইস্তাহারে করা হল, কিন্তু ভারতের ওপর চীনের আক্রমণ বা এখনও সীমান্তে চীনের বিপদ কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সম্প্রসারণবাদী আচরণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ভারতের প্রতিনিধিরা এ প্রশ্নটা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে রাখেন নি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়, যুক্ত ইস্তাহারে কাশ্মীর সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। কাশ্মীরের নাম উল্লেখ না করেও বলা

হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ যে কথা বলেছেন, তাতে প্রধানমন্ত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দুই রাষ্ট্রের মধ্যেকার কোন বিষয়ে এরূপ উল্লেখ কমনওয়েলথ রীতিবিরুদ্ধ, এবং পূর্বে কখনও এ রকম ব্যাপার ঘটে নি। ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও এ-কাজ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী এর প্রতিবাদে ইস্তাহারে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। বৃটেন বরাবরই ভারত ও পাকিস্তানের প্রশ্নে পাকিস্তানের পক্ষে। এবার পাকিস্তান তার সমর্থনে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও সিয়েরা লিয়নকে পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অন্য রাষ্ট্রগুলির মনোভাব কি ছিল?

ভারত-পাকিস্তান বিবাদে কমনওয়েলথের এই মাতব্বরিতে ভারতের সর্বত্র তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ সিং তো স্পষ্টই বলেছেন, ভারত কমনওয়েলথে থাকবে কিনা, এই প্রশ্ন বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এবারের কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারতের চরম কূটনৈতিক পরাজয় হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বা নেহরু-কন্যা তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীদের মতামত ভারতের অনুকূলে আনতে পারেন নি। অনেকেই বলছেন, নেহরু উপস্থিত থাকলে কখনও প্রধানমন্ত্রীরা পাকিস্তানের দাবী মানতে পারতেন না। নেহরুর অভাবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত কি অনাথ ও অসহায়? লণ্ডনের ভারতীয় হাই-কমিশনারের কর্মচারীরা কিংবা শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রতিনিধিদের অন্যান্য ব্যক্তিরাও তাঁদের কাজ ঠিক মত করতে পারেন নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃটিশ ও পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের অপপ্রচার রোধ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো খুবই খুশি। ভারতের ওপর তাঁরা টেক্কা মেরেছেন। জোর চেষ্টার ফলে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের অন্তত কিছুটা মানিয়ে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীদের দিয়ে। তবে এই মনোভাব কি ভারত-পাকিস্তান স্থায়ী মীমাংসার অনুকূল?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

যা প্রত্যাশিত ছিল, তাই ঘটেছে। সানফ্রানসিস্কোতে রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে ব্যারি গোল্ডওয়াটার

• লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাগানের সিঁড়িতে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের দেখা যাচ্ছে

• আইসেনহাওয়ার

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। গোল্ডওয়াটার বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হয়েছেন। গোল্ডওয়াটার পেয়েছেন ৮৮৩ ভোট, আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়াম স্ক্র্যান্টন পেয়েছেন ২১৪ ভোট। অন্যান্যদের মধ্যে নেলসন রকফেলার পেয়েছেন ১১৪ ভোট, মার্কিন ইতিহাসে প্রথম মহিলা নির্বাচন-প্রার্থী মার্গারেট চেজ্ স্মিথ ২৭ ভোট ও জর্জ রোমনি ৪১ ভোট।

উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন লাভ করেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে 'প্রতিনিধি সভার' (হাউস অব্ রিপ্রেজেনটেটিভস্) সদস্য উইলিয়াম ই মিলার।

শেষ পর্যন্ত আইসেনহাওয়ার, নিক্সন, এমন কি সেনেটে রিপাবলিকান পার্টির নেতা নাগরিক অধিকার বিল সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা ডার্কসেন সবাই গোল্ডওয়াটারকে সমর্থন করেছেন। গোল্ডওয়াটার কেবলমাত্র একদল উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ কর্মীর প্রার্থীই ছিলেন না। চরম দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থীদের অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেছেন।

মনোনয়ন লাভের জন্য প্রচার অভিযানের সময়েই গোল্ডওয়াটারের বিভিন্ন মত নিয়ে দেশে ও বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। রিপাবলিকান পার্টির অভ্যন্তরেও উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা গোল্ডওয়াটারের নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

গোল্ডওয়াটার আন্তর্জাতিক শান্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, জনকল্যাণকর কাজে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ, শ্রমিক আন্দোলন, নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার লাভ—

শুভমুক্তি শুক্রবার ২৪শে জুলাই!

"রক্তপলাশ"-খ্যাত পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত

আর একটি [illegible] চিত্রোপহার।

পরিচালনা • পিনাকী মুখার্জী • সঙ্গীত • রাজেন সরকার

শ্রেষ্ঠাংশে • অনিল • দিলীপ • জীবেন • দীপক • নীতিশ • জহর রায়

রেণুকা • গীতা • প্রশান্ত • নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস • পরিবেশক • মুভীউইন

রূপবাণী • অরুণা ভারতী • পদ্মশ্রী

সুচিত্রা ॥ পার্বতী ॥ মায়াপুরী ॥ শ্রীমা ॥ বাটা সিনেমা

— মুভীউইন ও মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত —

বলতে গেলে এ সবেরই বিরোধী। তিনি অবিলম্বে ভিয়েৎনামে ভিয়েৎ কং বাহিনীর বিরুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহার করতে চান, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে চান, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আমূল পরিবর্তন চান, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কাজ কমিয়ে এনে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা চান, এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার অবসান চান। এরকম একজন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত না হলেও, রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন লাভে সক্ষম হয়েছেন, এই আশ্চর্য। এই ঘটনার ফলে দেশে ও বিদেশে মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা অনেক কমে গেছে।

গোল্ডওয়াটারের মনোনয়ন লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভেতরে ও বাইরে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য শোনা গিয়েছে। সম্মেলন-মঞ্চ থেকে গোল্ডওয়াটারের জয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৫ জন নিগ্রো প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করে চলে যান। আর কয়েকজন নিগ্রো প্রতিনিধি ঘোষণা করেন, তাঁরা দলের ভেতর থেকে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার বলেন, 'গোল্ডওয়াটারের জয়ের মধ্য দিয়ে যে উগ্র চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে, মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।' সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দ এই মনোনয়নকে 'দুঃখজনক' বলে বর্ণনা করেছেন। বৃটেনে কনজারভেটিভ ও লেবার পার্টি উভয় দলের নেতৃবৃন্দই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ফ্রান্স ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে সর্বত্র বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। সকলেরই বক্তব্য, গোল্ডওয়াটারের হাতে মার্কিন শাসনভার এলে বিশ্বের ওপর এক মহা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে।

অবশ্য গোল্ডওয়াটারের নির্বাচিত হবার আশা খুবই কম। বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন নিশ্চয়ই ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থীরূপে মনোনীত হবেন। এমনিতেই তাঁর জয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। গোল্ডওয়াটার প্রার্থী মনোনীত হবার ফলে তাঁর জয় আরও নিশ্চিত হল।

তবে এবারের নির্বাচনে উভয় দলের মধ্যেই ভাঙন দেখা যাবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। রিপাবলিকান পার্টির উদারনৈতিক অংশ সম্ভবত গোল্ডওয়াটারের পরিবর্তে জনসনকে সমর্থন করবেন। আবার দক্ষিণাঞ্চলের গোঁড়া ডেমোক্রাটিক সদস্যরা যদি আলাবামার গভর্নর ওয়ালেসকে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী নির্বাচিত করতে না পারেন, তবে তাঁরাও নিজেদের দলের প্রার্থীর পরিবর্তে গোল্ডওয়াটারকে সমর্থন করতে পারেন।

অনেকেই এরূপ পরিণতিতে খুশি হবেন। প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সবাই ডেমোক্রাটিক পার্টিতে এবং প্রতিক্রিয়াশীল যারা তারা সবাই রিপাবলিকান পার্টিতে সমবেত হলে মার্কিন দল-ব্যবস্থা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করবে, এবং রাজনীতিও সহজ হবে।

* * *

গত ১৪ই জুলাই ওয়াশিংটনে মার্কিন ও সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও অফিসাররা এক সম্মেলনে মিলিত

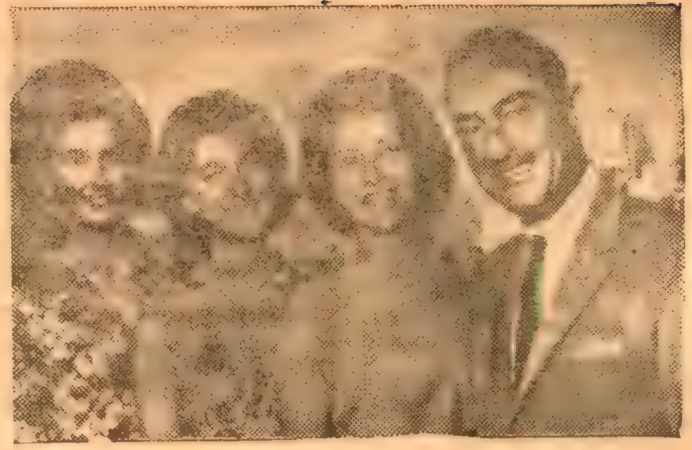

● স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ মিলার

● নেলসন রকফেলার

● লিণ্ডন জনসন

হয়েছেন। লবণাক্ত জলকে সুস্বাদু জলে পরিণত করার কাজে মার্কিন-সোভিয়েট সহযোগিতার উপায় নির্ধারণ করার জন্য সম্মেলনে চেষ্টা করা হবে।

এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞান উপদেষ্টা ডঃ ডোনাল্ড হোরিং, আর সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন বৈজ্ঞানিক কাজের রাষ্ট্রীয় কমিটীর প্রধান অধিকর্তা আলেকজাণ্ডার চুরিন।

সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে রাষ্ট্রপতি জনসন বলেছেন, বৈজ্ঞানিক-ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ফলে বিশ্বের বহু এলাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ খুলে যাবে।

উভয় দেশের যুক্ত উদ্যোগে এই কাজে আণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রশ্নও সম্মেলনে বিবেচনা করা হবে। শান্তির কাজে মার্কিন-সোভিয়েট সহযোগিতার কর্মক্ষেত্র প্রসারের এই প্রচেষ্টা সকল শান্তিকামীর অভিনন্দন লাভ করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

গত ১৫ই জুলাই মস্কোতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে ব্রেজনেভের জায়গায় আনাস্তাস মিকোয়ান সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত কোন রাষ্ট্রপতি নেই—৩৩ জন সদস্য বিশিষ্ট যৌথ সভাপতি-মণ্ডলী প্রেসিডিয়ামের সভাপতিকে অনেকটা রাষ্ট্রপতির মত মনে করা হয়। ঘোষণা করা হয়েছে, ব্রেজনেভ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকরূপে কাজ করবেন।

ব্রেজনেভ

সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন পদ থেকে কেউ পদত্যাগ করলে বা কাউকে অন্য পদে সরিয়ে দিলেই মনে হয়, বোধহয় গুরুতর কোন নেতৃত্ব-সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মিকোয়ান প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি করা হল কেন? একি তাঁর পদোন্নতি, না সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ? ব্রেজনেভকেই বা কেন পার্টির সম্পাদকের পদে আনা হল?

এখনই অবশ্য এ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া শক্ত। ভেতরে যদি কোন ব্যাপার থেকেও থাকে, তবে তা জানা এই মুহূর্তে অন্তত সম্ভব নয়। তবে অনেকের ধারণা, পার্টি-সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার জন্যই এই পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ব্রেজনেভই নাকি রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে ক্রুশ্চেভের উত্তরাধিকারী।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ

১৭ই জুলাই থেকে কায়রোতে আফ্রিকার ২৮টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এক শীর্ষসম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। গত বৎসর আদ্দিস আবাবায় 'আফ্রিকা ঐক্য সংস্থা' (Organisation of African Unity) গঠিত হবার পর সংস্থার পূর্ণ সম্মেলন এই প্রথম বসছে।

আফ্রিকার বর্তমান ৩৪টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ২৮টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ময়সে টি শোম্বেকে যোগদান করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি যোশেফ কাসাভুবু সম্মেলনে আসেন নি। আর ৫টি রাষ্ট্র নানা কারণে সম্মেলনে যোগ দিতে পারে নি।

রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন সুরু হবার পূর্বে এই সব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীরা কায়রোতে প্রস্তুতি-সম্মেলনে বসেছিলেন। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নে সকলে একমত হলেও বিভিন্ন বিষয়ে এই সব রাষ্ট্রের মধ্যে গুরুতর মতভেদ

সুলেখা
স্পেশাল
ফাউণ্টেনপেনের
কালি

৪টি স্থায়ী রঙে পাওয়া যায়
• ব্লু-ব্ল্যাক •
• রয়্যাল ব্লু •
• ব্ল্যাক •
• ব্রাউন •
PRO/SW-2

রয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আলোচনায় এই মত-পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র টি শোম্বের সম্মেলনে যোগদানের বিরোধী ছিল, কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধান তো স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, টি শোম্বে এলে তাঁরা সম্মেলনে আসবেন না। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশের মত অনুযায়ী টি শোম্বেকে যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু কারও কারও এই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয় নি। তাঁরা টি শোম্বের যোগদানের পক্ষে ছিলেন।

আফ্রিকার ঐক্য সকলেই চান। কিন্তু কিভাবে এই ঐক্য হবে? ঘানার নক্রুমা সকল আফ্রিকীয় রাষ্ট্র নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র 'ইউনাইটেড স্টেটস অব্ আফ্রিকা' প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই প্রস্তাবের বিরোধী। ঐক্যের অন্যান্য প্রশ্নেও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি মনরোভিয়া ও ক্যাসাব্লাঙ্কা, এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত।

এবারের শীর্ষসম্মেলনে রাষ্ট্র-প্রধানরা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, একটি যুক্ত সামরিক বাহিনী গঠন, পর্তুগীজ কর্তৃত্ব থেকে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন। কিন্তু সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করবে দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা। কঙ্গোর প্রশ্নও কোন না কোন ভাবে এসে যেতে পারে।

দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে কি করা হবে, এ বিষয়েও সকল রাষ্ট্র একমত নয়। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এখনই সক্রিয় কিছু করা হোক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ঘানা, ট্যাঙ্গানিকা, জাঞ্জিবার, কেনিয়া প্রভৃতি এ দাবী জানালেও নাইজেরিয়া কোনরূপ চরম কার্যক্রম গ্রহণের বিরোধী। আবার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আফ্রিকার সকল রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করুক বলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ঘানা, কেনিয়া প্রভৃতির যে প্রস্তাব—মালাউই তার বিরোধী। শেষ পর্যন্ত কতটা এরা একমত হতে পারে, দেখা যাক।

বার্মা ঃ

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ঈ-কে নিয়ে হঠাৎ

* চৌ-এন-লাই

১০ই জুলাই রেঙ্গুনে উপস্থিত হওয়ায় কূটনৈতিক মহলে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। কোনরূপ পূর্বঘোষণা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এরূপ আকস্মিক আগমন কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কারণে ঘটল?

কয়েকদিন পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আনাস্তাস মিকোয়ান বার্মা ঘুরে গেছেন এবং বার্মার বিপ্লবী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে গেছেন। চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে মিকোয়ান নিশ্চয়ই নে উইনকে বুঝিয়েছেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নে উইন যাতে সোভিয়েটের সমর্থক না হয়ে পড়েন, তার জন্যই চৌ-এন-লাই দৌড়ে এসেছেন চীনের বক্তব্য শোনাবার জন্য। বার্মা চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের দিকে ঝুঁকে পড়লে মুস্কিল। তাছাড়া আসন্ন এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন যোগ দিতে চায়। চীন এই যোগদানের ঘোরতর বিরোধী। বার্মা যাতে সোভিয়েটকে আমন্ত্রণের দাবী সমর্থন না করে, তার জন্যও চৌ-এন-লাই তদ্বির করতে এসেছেন।

অবশ্য অনেকের ধারণা, চৌ-এন-লাই চীন-ভারত সমস্যা সম্পর্কেও নে উইনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চীন-ভারত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য কলম্বোতে যে সব রাষ্ট্রনেতা চেষ্টা করেছিলেন, নে উইন তাঁদের অন্যতম। ইতিপূর্বে তিনি দিল্লীতে ঐ ব্যাপারে দৌত্যকার্যেও এসেছিলেন। হয়তো চীন নতুন কোন প্রস্তাব নিয়ে নে উইনের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন।

দুই রাষ্ট্রের নেতাদের আলোচনার পর যে আনুষ্ঠানিক ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস প্রভৃতির কথা আছে। স্বাভাবিকভাবেই চীন-সোভিয়েট

* নে উইন

দ্বন্দ্ব, কিংবা চীন-ভারত সমস্যার উল্লেখ নেই—থাকতে পারে না। তবে এ সব আলোচনা হয়েছে বলেই মনে হয়।

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তৃতীয় প্রবাহ ॥

["বরেন্দ্রভূমিতে বণিকেরা সাধু ও সজ্জন বলিয়া বর্ণিত ও অভিহিত হইত; সাধু শব্দের অর্থ বণিক।"]

এবার বরেন্দ্রভূমি।

তাম্রলিপ্তের মতই আর এক প্রাচীন দেশ। বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে, ব্যবসায় আর বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল সেদিন এই বরেন্দ্রভূমির প্রতিটি অঞ্চল।

প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল এই দেশ। দূর দূর দেশ থেকে আসতো বিদেশীরা বাণিজ্য করতে, আসতো প্রলুব্ধ হয়ে লুণ্ঠন করতে। যুগের পর যুগ বহির্দেশীয় আক্রমণ মত্ত হস্তীর মত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো এই শান্তবসাম্পদ জনপদের ওপরে।

পৌরাণিক কালের সেই শক্তিশালী নৃপতি পরশুরাম; শিবের উপাসক বলি রাজা, মহাপরাক্রমশালী রাজা বাণের অধ্যুষিত এই বরেন্দ্রভুমির একটি প্রধান অঞ্চল মালদহ আর দিনাজপুর। এই দুইটি জেলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা লেখা আছে প্রাচীন পুস্তকে।

মালদহের পথে-প্রান্তরে লাটাগাছের ঝোপে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সরু সরু ইটের তৈরি এক-একটি প্রাচীন কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। গ্রামের লোক বলে 'রেশম কুঠি'। কে জানে কতদিন এই রেশম কুঠি শত শত মানুষের পদশব্দে মুখরিত থাকতো। হয়তো শত শত শতাব্দী পূর্বে কণ্টুনী মেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে সিল্কের সুতো কাটতো আর দীর্ঘ করে সেই সুতো রোদে শুকোতে দিত। কত দূর দূর দেশ থেকে বণিকেরা আসতো উত্তর বাংলার এই রেশম কিনতে। আজ ভগ্ন, বিলুণ্ঠিত সেই রেশম কুঠির গায়ে শত শতাব্দীর স্মৃতি পরম মমতার মত জড়ানো রয়েছে। মনে হয় এই ধ্বংস, জীর্ণ কুঠিবাড়িতে সেকালের অজস্র মানুষের কলগুঞ্জন, আশা-আকাঙক্ষা সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার গান স্তব্ধ হয়ে আছে।

উইলিয়াম হাণ্টার নিজে পদব্রজে গিয়েছিলেন মালদহে। পরিভ্রমণ করেছেন পল্লীতে পল্লীতে। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে—

There can be no doubt that, there was silk in these parts during the reign of the lest Hindu dynasty at Gour.

গৌড়ের হিন্দু রাজাদের সময়ে সিল্কের প্রচলন ছিল। ঢাকা, সোনারগ্রাম, সপ্তগ্রামে আরও দূরের অনেক দেশে রপ্তানী হতো পট্টবস্ত্র। এই পট্টবস্ত্রের চাহিদা আজও অম্লান। হিন্দুর পূজায়, যাগযজ্ঞে ও বিবাহে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য।

গৌড়ের শেষতম হিন্দু রাজার ওপরে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের লুব্ধ তরবারি ঝল্‌সে উঠেছিল। মুসলমান সম্রাটরা নিয়ে এসেছিলেন সৈন্য। রণবিদ্যা-নিপুণ দুর্ধর্ষ সৈন্যদল আর কোরাণ। ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য শত শত মুস্লিম পীর সাধুও এসেছিলেন। এই পীর সাধুরা দেখলেন, ঘরে ঘরে বহুমূল্য ঝল্‌মলে সিল্কের কাপড়। ইসলামের উপাসকের কাছে বিলাসিতা অমার্জনীয় অপরাধ। নিষিদ্ধ করে দিলেন রেশমের ব্যবহার। রেশম ব্যবসায়ের ওপরে নেমে এল দুর্যোগ।

কিন্তু ধর্মভয়ের চেয়ে সংস্কার অনেক বড়। শত শত হিন্দু-মুসলমানের রক্তের ভেতরে রেশমের গুটি সুতোর কাজের নেশা মিশে আছে। তাই ধর্ম আর রাজভয়কে তুচ্ছ করে রাত্রির অন্ধকারে গোপন পদসঞ্চারে বাঙালীদের

বৃত্ত

গোপাল ভৌমিক

কি হবে আর দেয়াল গড়ে
হোক সে ইট বা কংক্রিটের,
কালের দানব শুনবে কি
হিসাব করে ফাজিল-জের?
মমিব ক্যারাও উঠে বসে
হাসছে দেখি বেদম জোর—
তাদের কালেও ছিল নাকি
এমনি কচি রোদের ভোর
এবং ছিল গভীর রাতে
পাগল-করা সুরের নেশা,
নূপুর পায়ে নাচা পরীর
রূপের সুধা আসব-মেশা।

বাঁচার শখ ছিল তাদের
পাথর দিয়ে দেয়াল গড়ে,
ভাবত বুঝি রেহাই পাবে
নৃত্য-পাগল মরণ-ঝড়ে।
খুঁড়লে মাটি প্রমাণ মেলে,
বিজিগীষার বিফল রূপ
দুহাত তুলে নিষেধ করে,
'ঢের হয়েছে, এবার চুপ।'

সেই কবরে দাঁড়িয়ে আমি
নতুন করে প্রাসাদ গড়ি,
ভাবি এমন কেউ করে নি
আজকে যেটা আমরা করি।

স্বল্পায়ু তাই গর্ব করি,
হিসাব ভুলে মহাকালের
গড়ে তুলি নতুন দেয়াল
পুরানোটার পাশেই ফের!

এই সুপ্রাচীন রেশম ব্যবসা একটু একটু করে পুনরুজ্জীবিত হতে সুরু করল।

যেখানে মাঠের পর মাঠ ছিল মালবেরী গাছ, যে গাছে গাছে রেশম গুটির জন্ম হয়—সেই সমস্ত গাছ নির্মূল ভাবে ধ্বংস করেছিল সুলতান গিয়াসুদ্দীনের অনুচররা। শুধু শূন্য মাঠ নিদারুণ অভিশাপের মত প্রসারিত হয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তরে। সেই মাঠে একদিন সকলের অলক্ষ্যে এক টুকরো সবুজের আশীর্বাদ দেখা দিল।

একটি মালবেরী গাছের চারা।

পীর সাধুরা নিশ্চিন্ত—রেশম গুটির গাছ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তারা জানে না—জানে না কোন জনপ্রাণী। সেই জনহীন প্রান্তরে নিশিরাতের স্তব্ধতাকে তুচ্ছ করে আসে এক দুর্ভাগিনী নারী। আসে নিঃশব্দ পায়ে। আসে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত-ভাবে। শূন্য মাঠের বুকে সেই সবুজ চারাগাছটির গায়ে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দেয়। জল ঢালে। আর গভীর রাতের তারা-জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে—কে জানে।

ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে আসে। ভোরের আকাশে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে। আবার সেই রহস্যময়ী নারী দ্রুতপায়ে লোকালয়ের দিকে ফিরে যায়। কে এই নারী?

উত্তর পেতে হলে যেতে হবে আরও আগে। মুস্লিম পীর সাধুরা রেশম ব্যবসা শুধু বন্ধ করতেই চেষ্টা করে নি। ওস্তাদ কাটুনীদের হত্যাও করেছিল। মালদহ থেকে কিছুদূরে জালালপুরের নুরুদ্দীন ছিল রেশম গুটি থেকে সুতো বের করতে অত্যন্ত সুপটু। রাজরোষকে তুচ্ছ করেও সে গোপনে এই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল। সেইদিন—সেইদিন জালালপুর গ্রামের প্রান্তে একটি কুটিরের অন্ধকার কোণে বসে শুধু নীরবে চোখের জল ফেলে নি সেই দৃপ্ত অসমসাহসিনী নারী। বুক-ভাঙা শোক, সদ্য স্বামী বিয়োগের সেই মর্মভেদী ব্যথাটাই তার মনের ভেতরে একটি কঠোর প্রতিজ্ঞায় একটু একটু করে রূপান্তরিত হচ্ছিল। যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন এই রেশমের ব্যবসাকেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা সে করবে। প্রাণ যায়—যাবে।

স্বামীর মৃত্যুর দুইদিন পরই তার ভাইকে নিয়ে রওনা হলো মুর্শিদাবাদ। সেখানে মাঠে মাঠে রেশম গুটি গাছের অবারিত ঐশ্বর্য। কয়েকটি বীজ নিয়ে ফিরে এল স্বগ্রামে। তার নিজের জমিতেই রোপণ করল মালবেরী গাছের সেই বীজ।

হয়তো তাকেও প্রাণ হারাতে হতো নুরুদ্দীনের মত—অপরিণামদর্শী ধর্ম-প্রচারকদের হাতে। কিন্তু রাজা পাল্টে গেল। এলেন গৌড়ের সিংহাসনে বক্তিয়ার খিলজী। তিনি আদেশ দিলেন, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান বণিকরা অবাধে এই রেশম ব্যবসা করতে পারবে। ইসলামধর্মে এমন কোন অনুশাসন নেই যে, রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করলে অবমাননা করা হয় ধর্মকে।

আবার বরেন্দ্রভূমির দিকে দিকে জেগে উঠল রেশমের সেই অবলুপ্ত-প্রায় প্রাচীনতম ব্যবসা। আর সেই সঙ্গে রেশম ব্যবসার ইতিহাসের সঙ্গে সেই নুরুদ্দীন-পত্নী সীতাবাসিনীর নাম চিরকাল জড়িয়ে পড়ল। আজও আছে মহানন্দার তীরে জালালপুর গ্রামের প্রান্তে সীতাবাসিনীর কবর। মহাকাল সেই কবরকে জীর্ণ করেছে, লুপ্ত করে দিয়েছে তার অস্তিত্ব, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে নি সীতাবাসিনীর আত্মার অমর মহিমাকে। তার প্রতিজ্ঞা, তার বাসনা, তার স্বপ্নই আধুনিক মালদহের শত শত রেশম সুতোর কাটুনীর বাহুতে বাহুতে আলোড়িত হয়ে উঠছে। (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চোদ্দ ॥

দুজনে ফিরে এলেন। ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে।

ডাক্তার, অর্থাৎ ডাক্তার ঘোষাল বললেন. বসুন. কিরণবাবু, চা খান।

—ধন্যবাদ। কিন্তু চায়ের দরকার নেই, আমি এবার চলি।

—না-না, হোক একটু চা।—ডাক্তার ঘর থেকে দু'পা বেরিয়ে গিয়ে কাকে যেন চায়ের কথা বললেন। তারপর ফিরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন কিরণের মুখোমুখি। বাড়িয়ে দিলেন একটা সিগারেটের প্যাকেট।

—নিতান্তই দৈব-দুর্বিপাক, নইলে আপনার মতো লোকের পায়ের ধুলো পড়ত. এখানে?

—আমি কেউ নই ডাক্তারবাবু। খুব. সাধারণ লেখক একজন।

—আপনি তাই বলবেন।—ডাক্তার হাসলেন: কিন্তু আমরা তো জানি কত নাম আপনার। জানেন, আমিও আপনার একজন অ্যাড্‌মায়ারার।

ডাক্তার নিরীহ ভদ্রলোক, ভদ্রতা করেই কথাটা বলেছেন। তবু অকারণেই খানিকটা তিক্ততা ফেনিয়ে উঠল মুখের ভেতর। বলতে ইচ্ছে করল, দেশজোড়া আমার এত অ্যাড্‌মায়ারার—সে কথাটা তো আগে জানা ছিল না। তা হলে বছরে আমার পাঁচশো কপির বেশি বই বিক্রি হয় না কেন? নাকি আমি ভাল লিখি এই স্বীকৃতিটুকুই আমার মহৎ পুরস্কার, আর যারা ভালো লেখে না, অনেক বই বিক্রি হওয়াটা তাদের জন্যে কনসোলেশন প্রাইজ?

পরক্ষণেই নিজের মানসিক রূঢ়তায় কিরণ লজ্জিত হল। ডাক্তারের কথার জবাবে নিঃশব্দে হাসল সে।

ডাক্তার বললেন, আমি যদি লিখতে পারতুম মশাই, তা হলে এই অ্যাশাইলাম নিয়ে বই লিখতুম একখানা। এই আট-দশ বছরে কত রকমের পেশেণ্ট দেখলুম, কত ফিক্সেশন, কত কমপ্লেক্স—কী অদ্ভুত সব কেস হিস্ট্রি। মানুষের মনের ক'টা স্তর আছে মশাই? কন্‌শাস-আন্‌কন্‌শাস—সাব-কন্‌শাস্? আমার ধারণা অনেক—অনেক বেশি। কি রকম জানেন?—ডাক্তার একবার থামলেন: সব যেন ঘন কালো মেঘ দিয়ে ঢাকা একটা অনন্ত আকাশের মতো, তার এক-এক জায়গায় হঠাৎ মেঘ ছিঁড়ে গিয়ে এক-এক ঝলক আলো দেখা দেয়। আকাশের যেমন শেষ নেই, আলো-গুলোও তেমনি অফুরন্ত।

কিরণ আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালো। চীনেমাটির একটা মস্ত অ্যাশ্‌ট্রের ভেতরে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল খানিকটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, এ তো ডাক্তারের কথা নয়, কবির মতো শোনাচ্ছে।

ডাক্তার জিভ কাটলেন: কিছু না—কিছু না, স্রেফ বাচালতা। মাঝে মাঝে নানা রকম আবোল-তাবোল মনে হয়।

সেই কৃষ্ণচূড়ার স্মৃতি—সেই ডাক্তার রায়চৌধুরী। এক সময়ে কবিতা লিখতেন। একটু চুপ করে থেকে কিরণ বললে, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ডাক্তাররা প্রায়ই মনে মনে অল্প-বিস্তর সাহিত্যিক।

—ডাক্তারের আবার সাহিত্য। পোস্ট-মর্টেমের ক্লাসে ছুরি হাতে নেবার পর থেকেই সমস্ত রোমাণ্টিসিজ্‌ম্ শুকিয়ে যায়। তবে নানা রকম মানুষ

হয়তো দেখতে হয়, আর তাই থেকে অদ্ভুত সব ইম্প্রেশ্যন আসে। তবে সাহিত্যিক বলতে পারেন আমাদের বলাইদাকে, যাঁকে আপনারা 'বনফুল' বলে জানেন। ওঁরাই আসলে সাহিত্যিক, ভুল করে ডাক্তার হয়ে বসেছেন।

একটা চাকর চা নিয়ে এল। সঙ্গে কেক।

—এসব কেন ?

—আর লজ্জা দেবেন না। কী আর এখানে খাওয়াব আপনাকে ? একদিন দয়া করে আমার কলকাতার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন না ?

—আসব, নিশ্চয় আসব—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে কিরণ, কেক ভেঙে নিলে একটুকরো। তারপর পাশের জানলা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে বাইরে—পুকুরের জলটা দেখা যায়, ওপারের খানিকটা মেহেদীর বেড়া আর কিছু কিছু ফুলের আভাস চোখে পড়ে। ওইখানেই ফিমেল ওয়ার্ড। প্রতিমা কী করছে এখন ? কাঁদছে ? না—ডাক্তারের ভাষায় একটা অনন্ত আকাশের একরাশ অপূর্ব আলোর মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে তার মন ?

ডাক্তার যেন টের পেলেন। নিজেই তুললেন কথাটা।

—মিসেস মিত্র সম্পর্কে আমি কিন্তু এখনো হাল ছাড়ি নি কিরণবাবু।

কিরণ চায়ের পেয়ালা নামিয়ে ফেলল ঠোঁট থেকে। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল : আশা রাখেন ?

—ডাক্তারের আশার কোনো শেষ নেই।

—কিন্তু সবাই জবাব দিয়েছেন।

—রাঁচী-ফেরৎ দু-একজনকে আমি ভালো করতে পেরেছি, একটু আগেই তো আপনাকে সে-কথা আমি বলছিলুম। সেজন্যে আরো অন্তত ছ' মাস আমি টাইম চাইছি আপনাদের কাছে।

—ছ' মাস কেন, সারা জীবনই হয়তো রাখতে হবে।—কিরণ নীরস হাসি হাসল।

-আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি—ডাক্তারের চোখ সহানুভূতিতে কোমল হয়ে এল : কিন্তু আমি আপনাকে বলছি কিরণবাবু, এখনো হাল ছেড়ে দেবার মতো হয় নি।

—অনেক ধন্যবাদ, আপনারাই বুঝবেন—কিরণ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো : আচ্ছা আজ চলি ডাক্তার ঘোষাল—নমস্কার।

ট্রেনে আসতে আসতে ডাক্তারের কথাই মনে পড়ছিল বারবার। এলোমেলো করে বলেছেন, সবটা গুছিয়ে আনতে পারেন নি। তবু কিরণ তাঁর ইম্প্রেশ্যনের একটা সম্পূর্ণ চেহারা যেন দেখতে পাচ্ছিল। একটা দিক্-চিহ্নহীন আকাশ অন্ধকারের কালো পর্দা দিয়ে মোড়া ; নীচের পৃথিবীতে চেতনার ছোট ছোট প্রদীপ জ্বেলে আমরা যারা সহজ স্বাভাবিক, তারা পথ চলছি, এ-ওর মুখ দেখছি—এই আমাদের চেনা-জানা জীবন। এরই ভেতরে কখন কার পথের প্রদীপ নিভে যায়, তখন এতটুকু এই আলোর বৃত্ত থেকে ওই তমসাবৃত আকাশে তার অবাধ মুক্তি ; তখন তার বাইরের চোখ হারিয়ে গেছে, তখন মেঘের আবরণ ছিঁড়ে একটা অচেনা আলো তার আর এক সত্তাকে অপূর্ব-ভাবে উদ্ভাসিত করে তোলে। তার সেই সত্তাকে আমরা চিনতে পারি না—তাকে বলি পাগল।

এ-ব্যাখ্যা মনস্তত্ত্বে চলবে না, ডাক্তারী শাস্ত্রেও না। তবু কি সম্পূর্ণ মিথ্যে বলব একে ? তা হলে ব্লেকের কবিতায় কোন্ নক্ষত্রের আলো এমন করে জ্বলে উঠেছিল ? আর এজ্রা পাউণ্ড—

ইস, পাউণ্ড কেন ফ্যাসিস্ট হতে গেলেন ?

কিন্তু পাউণ্ডের কথা থাক। প্রতিমা কী ভাবছে ? তার আকাশে কোন্ তারা উঠল ? কোন্ সবুজ ঈর্ষার আলোয় তার পৃথিবী সন্দেহের ছায়ামূর্তিতে একাকার, যেখানে প্রতি মুহূর্তে সে অবিশ্বাস করছে—ঘৃণা করছে, একটা তিক্ত যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে ?

—কিরণদা কোত্থেকে ?

চিন্তাটা থেমে গেল। একজন তরুণ কবি। এইমাত্র যে-স্টেশন ছাড়ল ট্রেনটা, তারই প্ল্যাটফর্ম থেকে চলতি গাড়িতে লাফিয়ে উঠেছে।

—এসো কুণাল।

কুণাল এসে পাশে বসল। এক মাথা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। দাড়ি কামায় নি অন্তত দিন সাতেক। পরণের পাজামাটা ময়লা, গায়ে আস্তিন গোটানো গেরুয়া রঙের শার্ট, পায়ে উদ্ধত ভঙ্গিম মোটা চামড়ার কাবলী চটি।

—কেমন আছেন কিরণদা ?

—ভালো। তোমার খবর ?

—নতুন কবিতার বই বের করছি আর একটা।

—আগেরটা কেমন চলল ?

কুণাল হাসল। ইচ্ছে করে রুক্ষ-কর্কশ সেজেছে, নইলে ছেলেটার চেহারা স্নিগ্ধ, হাসিটাও মিষ্টি। বললে, কবিতার বই যেমন চলে। শ-খানেক কেটেছে, শ-দেড়েক বিলিয়েছি, খান পঞ্চাশেক রিভিয়ু—বাকীগুলোর হিসেব অনাবশ্যক।

—কিন্তু আজকাল তো আধুনিক কবিতার পাঠক বেড়েছে।

—হাঁ, কলেজের ছাত্রেরা পড়ে, কিন্তু ক'জন আর পয়সা দিয়ে কেনে ? কোনো কোনো অধ্যাপক পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁদেরও কিনতে হয় না, উপহার পান। ওরই ভেতরে দু-একটা লাইব্রেরী আর দু-চার জন খদ্দের দেখা দেয়।

—তা হলে তো লোকের মনের কাছে পৌঁছোতে পারো নি তোমরা।

কুণাল একটা মুখভঙ্গি করল : সাধারণ লোকের মনের কাছে কবিতা কোনোদিন পৌঁছোয় না—পৌঁছোয় পদ্য। আর পৌঁছোয় আপনাদের উপন্যাস—বেশ নিটোল একটি গল্প, তৈরি করা প্লট, চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টারে সাসপেন্স।

—আমার কথা ছাড়ো। কিন্তু তোমরা কি একটু বেশি মাত্রায় সেল্‌ফ-সেণ্টার্ড হয়ে যাচ্ছ না ?

—মনকে মিথ্যে ভোলাচ্ছেন কিরণদা। এ-যুগে প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক। সকলের সঙ্গে ইমোশ্যন ভাগ করে নেওয়া মানুষের শৈশব। ব্যক্তিত্ব এলেই বিচ্ছিন্নতা আসবে।

কিরণ বললে, তা হলে তো শুধু নিজের জন্যেই কবিতা লিখতে হয়।

—তাই তো লিখতে চাই। যদি কেউ পড়তে চাও, উপযাচক হয়ে এসো আমার ঘরে। কিন্তু আমার কবিতা নিয়ে গিয়ে হাটে হাটে ফিরি করে বেড়াতে পারব না।

—নিষ্কাম কর্মযোগ?

—অল্ আর্ট ইজ্ ইউজলেস্।

কিরণ চুপ করে রইল। তর্ক করতে ভালো লাগছে না। তবু একটা কথা হয়তো ঠিকই বলেছে কুণাল। আমার মনের যা একান্ত, তা কি দশজনের কাছে আমি কখনো অসংকোচে সাজিয়ে দিতে পারি? একদিন সব মানুষের সুখ-দুঃখগুলো প্রায় এক সুরে বাঁধা থাকত, এক যুদ্ধ, এক কামনা, এক জীবন-সংগ্রাম, একটি ম্যামথের দেহকে ঘিরে ঘিরে বর্শাধারী সব মানুষের মিলিত উল্লাস। সেদিন মানুষ গোষ্ঠিক—আজ মানুষ একা। সেদিন গান সকলের জন্যে, আজ কবিতা শুধু নিজের জন্যেই।

কে কার মনকে বোঝে? কোন্ জটিল অরণ্য কার ভেতরে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে ঘিরে ঘিরে ব্যক্তিত্বের আবরণ কঠিন হতে থাকে। উপন্যাস একক মানুষের দিনলিপি—তার একাকী অরণ্যের পরিক্রমা; কবিতা প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নির্জন সমুদ্র থেকে এক-একটি ঝোড়ো হাওয়ার উচ্ছ্বাস, সে-সমুদ্রের সন্ধান আর কেউ পায় না।

প্রতিমা এক আশ্চর্য আকাশের এক ঝলক আলোয় মগ্ন; শর্মিলা এক বেদনার আড়ালে অস্পষ্ট; আর কিরণ—

ট্রেন শেয়ালদায় ইন্ করল। ট্রেন থামবার আগেই লাফিয়ে নামল কুণাল।

—চলি কিরণদা, তাড়া আছে।

—এসো।

কিরণ গাড়ি থেকে নামবার আগেই উদ্ধত কাবুলি চটিটা ভিড়ের ঘূর্ণিতে হারিয়ে গেল। বেশ আছে। কিন্তু কিরণ তো কিছুতেই ওদের মতো সহজ-সাহসে এগিয়ে যেতে পারে না। পায়ে পায়ে তাকে থেমে দাঁড়াতে হয়, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, মনের ভারে ক্লান্ত হয়ে উঠতে হয়। তার বয়েস বাড়ছে, সে পিছিয়ে পড়ছে, এই যুগের সঙ্গে আর যেন সে চলতে পারছে না।

'একটা রোমাণ্টিক মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখব, নাম দেব কৃষ্ণচূড়া।' এ-কথা বলা যেত কুণালকে?

মেসে ফিরল সন্ধ্যার পর। একটা গল্প নিয়ে বসতে হবে আজকে। কিছু টাকা দরকার। তা ছাড়া পত্রিকাটা অনেকদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছে।

চা খেয়ে লিখতে বসল টেবিলে। একটু বেশি রাতে লেখাই তার অভ্যাস—সন্ধ্যার মুখটা আড্ডা দিয়েই কাটে। কিন্তু আজ আর কোথাও গিয়ে হৈ-চৈ করতে ভালো লাগছে না। নিজেকে নিয়েই বসা যাক খানিকক্ষণ।

টেবিলে পুরোনো চিঠির একটা ছেঁড়া এনভেলপ পড়ে রয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল, কলকাতা ফিরে ডক্টর রায়চৌধুরীদের সে চিঠি দিয়েছিল একখানা। কিন্তু এখনো তার কোনো জবাব আসে নি।

চুলোয় যাক। কলমটা হাতে নিয়ে সামনের জানলা দিয়ে চেয়ে রইল। পথে ট্রাফিকের শব্দ। রাস্তার ওপারে গাছটার মাথায় আলো-আঁধারি। একটা এরোপ্লেনের ধ্বনি-তরঙ্গ। লাল নীল দুটি আলোর বিন্দু মিলিয়ে যাচ্ছে তারাদের ভেতরে।

বারান্দায় ভারী জুতোর আওয়াজ উঠল। সুট আর হ্যাটপরা এক বিরাট মূর্তি দেখা দিলে দরজার ফ্রেমে। ভরাট গলায় ডাক উঠল: কী হচ্ছে, সাহিত্য-সাধনা?

—অরবিন্দদা? আসুন—আসুন—

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরবিন্দ বাড়ি কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকল। হুড়মুড় করে বসে পড়ল তক্তপোষে, সেটা আর্তনাদ করে উঠল।

—পাখাটা বাড়িয়ে দাও হে, হ্যাঁ—রেগুলেটারের শেষ পর্যন্ত ঠেলে দাও। দেখছ না, মোটা মানুষ, হাঁপিয়ে গেছি? তেতলায় কোনো ভদ্রলোক যে বাস করে কী করে, আমি তো ভেবেই পাই না।

হেসে পাখা বাড়িয়ে দিল কিরণ, ঝরঝর হাওয়ার ঝড় বইতে লাগল। টেবিল থেকে কতকগুলো কাগজের টুকরো উড়ে পড়ল নীচে।

—চা খাবেন অরবিন্দদা?

—ইম্পসিবল। চা নয়, টা নয়, কোনো ভদ্রতা নয়। এইমাত্র এক জায়গায় বিকেলের জলখাবার খেয়েছি

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স

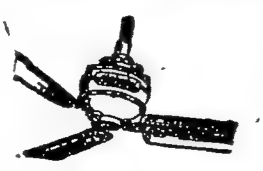

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

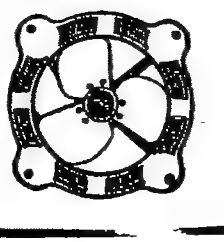

কণ্ঠা পর্যন্ত। শীত কি গ্রীষ্ম। আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য ব্যাপারে।

দাদার কথা মনে পড়ল। অরবিন্দ তাঁকে বলে এসেছে, কিরণ ডিভোর্স করুক প্রতিমাকে। নতুন করে আবার সুরু করুক জীবন। মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে উঠল কিরণ। তাকে বলতে হবে, নিজের জীবন সম্পর্কে যা কিছু ভাবনা সেই ভাববে, আর কারুর ও নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

হ্যাটটা খুলে ঘামে ভেজা টাকটা রুমাল দিয়ে কিছুক্ষণ মুছে নিলে অরবিন্দ। তারপর বললে, আমি আর ব্যারাকপুরে নেই এখন। ট্রান্সফার হয়ে এসেছি আলিপুরে, দিন সাতেক হল। আছি হাজরা রোডে।

—যাব।

—কোনোদিনই যাবে না, সে জানি। ভদ্রতার দরকার নেই, আমিও তোমায় জোর করতে চাই না—অরবিন্দ ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল: আমি এসেছি অন্য একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে।

অর্থাৎ, প্রতিমার আলোচনাটা আসছে। এইবার অরবিন্দ নিজের ঔদার্যের দরজা খুলে দেবে। কিরণ চেয়ারের মধ্যে শক্ত হয়ে বসে রইল।

—কিছু ব্যক্তিগত কথা তোমার সঙ্গে আমার আছে, কিন্তু সেজন্যে আপাতত আসি নি। পরে সময়মতো বলা যাবে সে-সব। আপাতত ভারী মুস্কিলে পড়েছি, তোমাকে আমায় উদ্ধার করতে হবে।

হাওয়ার মোড় ঘুরে গেছে, চেয়ারের ভেতরে একটুখানি শিথিল হল কিরণ।

—মারাত্মক কিছু নয়, আগে থেকেই ঘাবড়ে যেয়ো না।—অরবিন্দ হেসে অভয় দিলে: পরশুর পরের দিন, মানে আসছে শনিবার বিকেলে একবার আমাদের অফিসে যেতে হবে তোমাকে।

—কেন? আমি কী করব গিয়ে?

—তুমি গিয়ে কী করতে পারো আর?—অরবিন্দ ভ্রূকুটি করল: সাহিত্য—সাহিত্য করতে হবে। কী মাস খেয়াল আছে? রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎ—

—তা আমাকে কেন? আমি তো ভালো বক্তা নই।

—তোমাকে বক্তৃতা বেশি দিতে হবে না—ও-সব শুনে লোকের বিরক্তি ধরে গেছে। গান-টান যা করবার ওরাই করবে এখন, তুমি শুধু সভা আলো করে বসে থাকলেই চলবে। কোনো ওজর শুনব না। ওরা আমাকে ভার দিয়েছে, আমি তোমাকে নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছি।

—কিন্তু দাদা—আমি—

—কিচ্ছু শুনতে চাই না—হ্যাটটা মাথায় পরে অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালো: এইটে বলবার জন্যেই এসেছিলুম, নাউ ইট্‌স্ সেট্‌লড্‌। ডাইরি-টাইরি যদি থাকে, লিখে রাখো। আমি শনিবার সাড়ে চারটেয় নিজে গাড়ি নিয়ে চলে আসব।

—আমার কাজ ছিল শনিবারে।

—এ-ও কাজ, দেশের কাজ। এ বিগার রেস্‌পন্‌সিবিলিটি। নাও হে সাহিত্যিক, চলো এবার—রাস্তা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দেবে—অরবিন্দ দরজার বাইরে পা বাড়ালো। (ক্রমশঃ)

কবিকণ্ঠ

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কাঁকর বিছানো পথ। একা একা হেঁটেই চলেছি
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো
হারিয়ে গিয়েছি যেন ক্লান্তিময় বোবা অন্ধকারে
তোমাকে তোমাকে শুধু
সুষুপ্তির এই পোড়ো মাটির উঠোনে
অস্পষ্ট আলোর কোণে
আমার সত্তার খামে তোমাকে পেয়েছি।

তুমি তাই স্থির আজ, শুধুই কি একা একা ছবির আড়ালে
নিজেকে গোপন করে
তৃষ্ণার সুপ্রিয় জল রেখে দেবে অতলে পাতালে!!
তুমি তবে উঠে এসো, মালা নাও কণ্ঠের সীমায়;
আমরা মুখর হবো, জাগো কবি নীলকণ্ঠ—
আমাদের ভাঙা পেয়ালায়।

বিবর্তন

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

এখনো আকাশ থেকে ঝরে বৃষ্টিধারা,
এখনো আকাশে ওড়ে চিল,
এখনো এখানে আছে অথৈ অতল,
এখনো জলের ধারা নীল।

সবকিছু ঠিক আছে—সবকিছু মিল,
সবকিছু একাকার আশ্চর্য অমিল।

এখনো আমি ত' দেখি আকাশের তল,
অন্ধকার শুয়ে আছে এখানে এখন;
সমুদ্র সমুদ্র আছে—লবণাক্ত জল।
কেবল চলেছি ভেসে সাপের মতন।

সবকিছু ঠিক আছে-সবকিছু নীল,
মানুষ মানুষ নেই যন্ত্রের সামিল।

মানুষের কলকাতা ✲ শ্রীপদাতিক

হেয়ার স্ট্রীটের উপাখ্যান

কোনো পরিমাপ নেই যার মাহাত্ম্যের—তিনিই মহাত্মা। এমন মহাত্মার দৃষ্টান্ত নিবিরল নয় কোনো দেশেই। অবশ্য প্রাজ্ঞ-পথিকৃতের আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগেই। যেমন ভারতবর্ষেই জন্মেছেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং পরবর্তীকালে জাতির জনক সুরেন ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। তাঁরা বীর, তাঁরা তপস্বী, তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়। মহাকালের নির্যতি তীর্থপথে নিঃসন্দেহেই তাঁরা অমৃতের পুত্র। অতএব তাঁরা স্বদেশে যেমন বরণীয়, বিদেশেও তেমনই শ্রদ্ধেয়। হয়তো আত্মত্যাগের মহিমা তাঁদের অতিক্রম করেছে দেশ-কালের সীমা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা অপ্রত্যয়ী নয়: কীর্তি এবং অবদান তাঁদের প্রতিষ্ঠিত স্বদেশেই। যে-দেশের নিসর্গে তাঁদের আত্ম-বিকাশ, যে-দেশ তাঁদের পূর্বপুরুষের এবং উত্তরপুরুষের, তারই অন্ধকার-নিবাসী শ্বাপদ বিতাড়নের সংগ্রাম এবং অন্তরাশ্রয়ী কলঙ্ক-মোচনের সাধনা করেছেন তাঁরা অক্লেশে। তাঁরা স্বদেশী। এ-দেশের মাটিতে কেউ প্রবাসী ছিলেন না তাঁরা। কিন্তু সুদূর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। এ-দেশে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। বয়স তখন তাঁর পঁচিশ বৎসর মাত্র। সেদিন থেকে আজ দেড় শতাধিক বৎসর পরেও, এ-দেশবাসীর স্মৃতির মিনারে মূর্তিমান তাঁর অমিত প্রভাব। তিনি এ-দেশে নিবাস বেঁধে নিজেকে দেশান্তরী ভাবেন নি কোনোদিন। সমগ্র পৃথিবীই তাঁর দেশ এবং পৃথিবীর সর্বদেশের সমগ্র মানবগোষ্ঠীই তাঁর দেশবাসী—এই ছিল তাঁর বলিষ্ঠ প্রতীতি। তাই এ-দেশের বৃহত্তর সমাজে, অশিক্ষার অপরিমেয় দুর্গতি লক্ষ্য ক'রেই তিনি বর্জন করেন তাঁর উন্নতিশীল ব্যবসা। তারপর সমাজ-সংস্কার এবং সমাজের সর্বস্তরেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যে-অপরাজেয় সংকল্পে আত্মনিবেশ করেন আমরণ—সম্ভবত তার তুলনা নেই কোথাও। আজ তাঁরই আদি প্রচেষ্টার সার্থক পরিণতির উপহার হেয়ার স্কুল এবং বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হিন্দু কলেজ। অবশ্য এ-দেশের অজ্ঞ সমাজে শিক্ষার রশ্মি-নিক্ষেপের প্রচেষ্টায় উইলিয়াম কেরী সাহেবও অনুল্লেখ্য নন। এ-দেশে বাংলা গদ্যের প্রচলন ঘটিয়েছেন তিনিই। এ-ব্যাপারে তাঁর মহৎ অবদান যে সত্যই অবিস্মরণীয়—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ-সবের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বধর্ম প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্যেরই সাফল্য কামনা করেছিলেন। উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই একদেশদর্শিতার প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলেন না তিনি। কিন্তু মহাত্মা ডেভিড হেয়ার এ-ব্যাপারে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। নিজে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হলেও, বিধর্মীর প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন না তিনি বিন্দুমাত্রও। কাউকে স্বধর্মে আকৃষ্ট করার প্রথাও কোনোদিন অভিনন্দনযোগ্য ছিল না তাঁর কাছে। সর্বধর্মাবলম্বীকে সমগোত্রীয় ভেবেই এ-দেশের শিক্ষা-বিস্তার বা সমাজ-কল্যাণের পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন তিনি। সম্ভবত সে-কারণেই, মৃত্যুর পর তাঁর নশ্বর দেহের সমাধি ধারণ ক'রে ধন্য হওয়ার সুযোগ পায় নি

● বর্তমান কালের হেয়ার স্ট্রীটের দৃশ্য

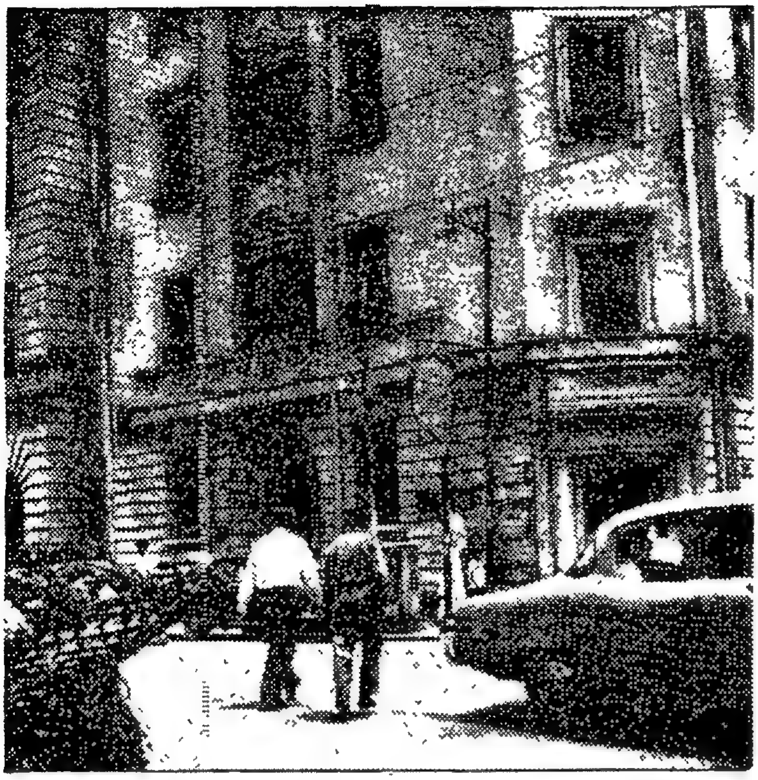

● হেয়ার স্ট্রীটস্থ প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার কার্যালয়

কোনো খৃষ্টান সমাধিক্ষেত্র। আজ তাঁর নিঃসঙ্গ সমাধি অনাদৃত কলেজ স্কোয়ারে।

এ-দেশে হেয়ার সাহেবের আগমন ব্যবসা-উপলক্ষেই। তিনি ছিলেন ঘড়ির সুদক্ষ নির্মাতা বা শিল্পী। প্রথম যুগের কলকাতায় ঘড়ির প্রথম ব্যবসায়ী তিনিই। এই ব্যবসায়ে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যে-প্রতিপত্তি অর্জন করেন—তৎকালীন ব্যবসার ক্ষেত্রে তা বিরল দৃষ্টান্তই বলা চলে। কিন্তু ব্যবসা তাঁর যতোই লাভজনক হোক, মন তাঁর ব্যবসায়ী ছিল না কোনোদিন। তাই ঘড়ির সুদক্ষ শিল্পী এবং ব্যবসায়ীরূপে তিনি তখন অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, কিছুকাল পরেই তাঁর সমগ্র ব্যবসা হস্তান্তর করেন মিঃ গ্রে সাহেবের কাছে। এই হস্তান্তরের সময় জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তিনি যে-বিজ্ঞাপন প্রচার করেন—তা এই :

DAVID HARE
Watch-Maker

'Begs to inform his friends and public in general that he has this day retired from business; and requests they will accept his most sincere thanks for the very liberal support with which they have favoured him for the last eighteen years.'

"He also takes this opportunity of respectfully and earnestly soliciting a continuance of their patronage to the successor, Mr. Gray, who came from England on purpose, and has been his Assistant for five years; which has afforded D. H. such a knowledge of his character and abilities, that feels the greatest confidence in recommending him on their notice."

ব্যবসা হস্তান্তরের পরেই অজ্ঞ জনসমাজের পল্লী-পরিক্রমা সুরু করেন এই মহান শিক্ষানুরাগী ডেভিড হেয়ার। তাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সহজ পন্থা কী—এ-চিন্তাই তাঁকে অস্থির ক'রে রাখলো কিছুদিন। তারপর একদিন, কোনো এক ধর্ম-যাজকের সহযোগিতায় তিনি একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করলেন এক পল্লীতে। সেখানে শিক্ষাদানের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন উক্ত ধর্ম-যাজক এবং তাঁর কিছু সহকর্মী। আর বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার গুরু-দায়িত্বে রইলেন ডেভিড হেয়ার স্বয়ং। কার্যক্রম সুরু হলো। দেখতে দেখতে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় পাঁচশ'। হেয়ার সাহেব ভাবলেন : সাধারণের মধ্যে এত সহজেই যখন সাড়া জেগেছে, তখন তাঁর বিরাট পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ একদিন ঘটবেই। কিন্তু বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই একদিন অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন : উক্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই তাঁদের আত্মীয়-স্বজন সহ দীক্ষা গ্রহণ করেছে খৃষ্টান ধর্মে। শিক্ষার নামে তারা আয়ত্ত করেছে কেবল বাইবেলের কিছু শ্লোক, আর যীশুর নাম। হেয়ার সাহেব অবাক হয়ে সেই ধর্ম-যাজককে প্রশ্ন করলেন : 'এ কী-ধরণের শিক্ষা?' ধর্ম-যাজক উত্তর দিলেন : 'খৃষ্টান ধর্মই একমাত্র সত্য এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ-ধর্মে যার উত্তরণ ঘটে সেই পায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সুতরাং এখানে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

ধর্ম-যাজকের উত্তর শ্রবণে মর্মান্তিক আঘাত পেলেন মহাত্মা ডেভিড। বুঝলেন : এ-পথ অনুসরণ ক'রে

সাফল্যের বর লাভ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং তিনি উক্ত ধর্ম-যাজকের সংস্রব ত্যাগ ক'রে সাক্ষাৎ করলেন তৎকালীন বাংলার অদ্বিতীয় পুরুষ রামমোহন রায়ের সঙ্গে। রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ার—এ-দুই মনীষাদীপ্ত শক্তিধরের সংযোগে যে-নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে—তারই পরিণতির স্বর্ণ-স্বাক্ষর স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পায় একটি বৃহদায়তন বিদ্যালয়। তারপর হেয়ার সাহেবের প্রদত্ত জমিতেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজের। অবশ্য তাঁদের এই প্রচেষ্টার পেছনে স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং তৎকালীন আত্মীয়-সভার বিশিষ্ট সভ্য রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতাও উপেক্ষা করার নয়। সর্বশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দেই দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় হিন্দু কলেজের। এই হিন্দু কলেজ সম্পর্কে মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন—তার কিয়দংশ এই :

"প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।"

একযোগে হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা পদেই আজীবন বহাল ছিলেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। অবশ্য তিনি যে কেবল শিক্ষা-বিস্তারের প্রতিই আত্ম-নিবিষ্ট ছিলেন তা নয়, এ-দেশের বহুবিধ সমাজ-সংস্কারেও তাঁর অবদান অপরিমেয়। তাছাড়া এক দিকে Calcutta School-Book Society প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি যেমন গ্রহণ করেছিলেন পুরোধার ভূমিকা, অন্যদিকে তেমনই ছাপাখানা সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করার পশ্চাতেও তাঁর অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। তৎকালীন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সুদূর মরিশাস এবং বোরবনে ভারতীয় মজুর রপ্তানী করার যে-নির্দয় প্রথা চালু করেন, তার বিরুদ্ধেও সক্রিয় সংগ্রামীর ভূমিকা গ্রহণ করেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। সম্ভবত তাঁরই প্রচণ্ড প্রতিবাদের চাপেই উক্ত দুষ্কর্ম থেকে বিরত হন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। তারপর "ক্যালকাটা কোর্ট অব রিকোয়েস্ট"-এর একজন বিশিষ্ট বিচারকের পদেও তাঁর অভিষেক ঘটে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তার চার বৎসর পরেই, অর্থাৎ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দেই তিনি হঠাৎ দেহরক্ষা করেন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে।

আজ যে-পথ হেয়ার সাহেবের নামেই নামাঙ্কিত, তৎকালে সে-পথেই ছিল তাঁর বাসভবন। তারও অনেককাল আগে সেখানে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম-গভর্নরের প্রমোদ-গৃহ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেন, তখন উক্ত প্রমোদ-গৃহই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "মেরিন ইয়ার্ডে" রূপান্তর লাভ করে শোনা যায়। এই প্রমোদ-গৃহেরই উত্তর ভূমিখণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আরও কয়েকটি গৃহের অবস্থান ছিল—যার মধ্যে সপরিবারে বসবাস করতেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দল। তখন পার্শ্ববর্তী রাস্তা, অর্থাৎ বর্তমান হেয়ার স্ট্রীটের বিস্তার ছিল উভয় দিকেই অনেক দূর পর্যন্ত। তার সামগ্রিক পরিবেশের অধিকাংশই ছিল জন-বিরল এবং কোলাহলমুক্ত। সম্ভবত কোলাহল-মুক্ত ছিল ব'লেই এ-পথের পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডে তখন প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল জেনারেল হাসপাতালের—যার প্রবেশদ্বার ছিল কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর উক্ত রাস্তারই এক নির্লিপ্ত অংশে মাথা তুলে দাঁড়ায় আড়ম্বরহীন বসতবাটী হেয়ার সাহেবের। এই বসতবাটী গ'ড়ে ওঠার বেশ কিছুকাল পর, অর্থাৎ প্রায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের অতিক্রান্তির পর্বে নবীন কলেবরে সংস্কার সাধন ঘটে রাস্তার। এই সংস্কার সাধনের প্রতুল ব্যয় বহন করে তৎকালীন সরকার পরিচালিত Lottery Committee. অবশ্য এই কমিটীর অর্থে কেবল উল্লেখিত রাস্তাই নয়, শহর-কলকাতার আরও কয়েকটি উন্নত সরণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে রমণীয় বৈচিত্র্যে। এ-সম্পর্কে ক্যাথলিন ব্লিচিনডেন তাঁর "Calcutta Past and Present" নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন :

"It is difficult to distinguish between improvements carried out by the Lottery Committee, and changes effected at an earlier date, but from this period date some of the most important streets of the

business quarter of the town, notably the Strand Road from Chandpal Ghat to the Mint, Hare Street and Government place North.'

Lottery Committee কর্তৃক সংস্কার সাধনের পর থেকেই কোলাহল-মুখর হয়ে ওঠে উল্লেখিত রাস্তা। একে একে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একাধিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা পায় সেখানে। তাছাড়া জব চার্নকের পরবর্তী সময়ে উক্ত স্ট্রীটেরই যে-অংশে ছিল হরিনারায়ণ শেঠের বসতবাটী—তারই স্থলাভিষিক্ত হয়ে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অপূর্ব ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়ায় মেটকাফ-হল। এথেন্স মহানগরীর বায়ুদেবতার মন্দির বা Temple of winds-এর বহির্দেশীয় দৃশ্যের অনুকরণে উক্ত মেটকাফ-হলের সম্মুখভাগ নির্মাণ করেন সেকালের এক দক্ষ স্থপতি। অবশ্য সম্পূর্ণ গৃহটির নির্মাণকার্য সমাধা করেন মেসার্স বার্ন এণ্ড কোম্পানী। এই গৃহ-প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল আগে, এসপ্লানেড অঞ্চলে, কলকাতার যে-প্রথম পাঠাগার স্থাপন করেন ডাঃ স্ট্রং—যা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে, পরে অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সে-পাঠাগারই আবার তার নতুন স্থান গ্রহণ করে নবনির্মিত স্যার চার্লস মেটকাফের স্মৃতি-মন্দিরে। এই স্মৃতি-মন্দির বা মেটকাফ-হল প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই তার পার্শ্ববর্তী উল্লেখিত রাস্তাও নাম ধারণ করে হেয়ার স্ট্রীট। আজ বর্তমান কালের হেয়ার স্ট্রীটেও আগের মতোই অটল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে মেটকাফ-হল। কিন্তু তার অভ্যন্তরস্থ পাঠাগারটি আর নেই। কেবল তার নিরানন্দ পরিবেশের একদিকে আজও স্থাপিত রয়েছে স্যার চার্লস মেটকাফের আবক্ষ মর্মর-মূর্তি—যা নির্বাক, নিস্তব্ধ এবং বহুকালের নির্মম উপেক্ষায় মলিন।

মেটকাফ-হলের পাঠাগারটির অপসারণ ঘটে লর্ড কার্জনের আমলে। উক্ত পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এক ট্রাস্টি বোর্ড। এই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন পদস্থ ইংরেজ সম্প্রদায় এবং তৎকালীন কিছু বাঙালী ভূ-স্বামী। কিন্তু তা সত্ত্বেও লর্ড কার্জনের আমলে উক্ত পাঠাগারের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করে। তাই লর্ড কার্জন তখন সরকারের পক্ষে উক্ত পাঠাগার ক্রয় ক'রে, আবার তার স্থানান্তর ঘটান এসপ্লানেড অঞ্চলে এবং সেখানে তার নামকরণ করেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। কিন্তু বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রে উক্ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অস্তিত্বও তিরোহিত। এখন সে অনন্য কলেবরে নব-জন্মের নবীন বেশে নাম ধারণ করেছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং এতদিনে সে তার রাজকীয় স্থান গ্রহণ করেছে আলিপুরের বেলভেডিয়ারে।

বর্তমান হেয়ার স্ট্রীটের পরিবেশ অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডালহৌসী অঞ্চল বলেই এ-পথে অত্যধিক ভীড়ের চাপ যানবাহনের গতিরোধ করে হামেশাই। এ-পথ দিয়েই অবিরাম অতিক্রম করে ট্রাম, বাস, লরি, ট্যাক্সী এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত গাড়ি। তাই দুর্ঘটনার আশঙ্কাও এখানে প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু অভিরাম অট্টালিকার সমাবেশ ঘটেছে এ-পথে। তন্মধ্যে প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া, য়্যালিশ ইণ্ডিয়া এবং টেলিফোন কোম্পানীর দু-একটি কার্যালয় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এ-পথেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কিছু বিত্তবান ব্যবসায়ীর কার্যালয় এবং উক্ত কার্যালয়সমূহের পাশ-ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে Small Cause Court-এর একাংশ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই কর্মব্যস্ত মানুষের অশান্তগতির কোনো বিরাম নেই এ-পথে। তবু এ-পথের বঙ্কিম বুকে চরণ রাখলেই, দুর্মর কোলাহলেও মন ধ্যানস্থ হয় সেই মহাত্মার স্মরণে—কোনো পরিমাপ নেই যাঁর মাহাত্ম্যের।

কী নাম দেব

মুকুল গুহ

যখান মনে ঝরেছে পাতা আহা রে 'পাতা পাখি'
স্মৃতিতে শুধু পাহাড় আছে বাকি যা গেছি ভুলে
নদীতে শুধু মুখের রেখা জরার রেখা নাই
কেমনে তারে বেঁধেছি আমি কেমনে রাখে বাঁধি
দু'হাত তার পায়ের তলে নূপুর গেছে খুলে
দিনের বেলা সকল কাজ দিনের বেলা সাধি
সহজে সে যে চলিয়া যায় স্মৃতিও মুছি চুলে
কেন রে আমি পাব না তাকে কেন বা তাকে পাই।

আমি তো তারে বলি নি যেতে, কিসের ডাকাডাকি
তাহার পদরেখার ছায়া আমি ত' গুণি নাই
সমুখে দ্রুত দ্বিপ্রহরে রজনী গেছে কাঁদি
তাহারি নত আঁখির বাধা আমি কি যাব ভুলে
তুমিও বুঝি জরার রেখা নীরবে যাবে আঁকি
আর কি তুমি বসিবে একা এমন নদীকূলে
আমারি প্রিয় তারাটি নিয়ে করিবে সাধাসাধি
যখন আমি প্রবাস হ'তে কখনো ফিরি নাই॥

আমার ছোট্ট ঘরটাকে সব সময়ই আমার কাছে একটা মর্গ বলে মনে হত। মনে হ'ত অসংখ্য মৃতের ভিড়ে একমাত্র আমিই যেন জীবন্ত জগতের প্রাণী। যেন আমিই শুধু ঐ মর্গটার ভিতরে কথা বলতে পারি, পৃথিবীর রূপ-রসকে উপলব্ধি করতে পারি। অসংখ্য মৃতের ভিড় আমার মনে ঢেউ তুলতো। অতীত দিনের ঢেউ। কত অজানা সুখের চিত্র ভেসে উঠত। ঠাকুরদার মৃতদেহের শেষ চিত্রটির দিকে তাকালে বাবার কথাগুলো মনে পড়তো। সে সময় আমাদের নাকি একটা ঘোড়াশালা ছিল। নানা জাতের কয়েকটি ঘোড়ার ঘর। ঐ আরবী ঘোড়ার ফিটনে চড়ে ঠাকুরদা যখন ঘোড়াউত্রা নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে যেতেন সেই দৃশ্য আমার মনে ভিড় করতো। ঠাকুরদার ওপাশে বাঁদিকে ঝুবি ঠাকুমা শুয়ে আছেন ফ্রেমে-আঁটা ছবির ভেতর। আমি ঠাকুমাকে দেখি নি, তবু বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরটার ওধারে সুন্দর কারুকার্য-করা মঠটার দিকে তাকালে বাবার কথাগুলো মনে পড়ে। ঠাকুমা সুন্দরী ছিল। ঐ কারুকার্য-করা মঠটার মতই সুন্দর।

আমার ঐ মর্গঘরটায় বাবা এবং মা বন্দী হয়ে আছেন। ছবিতে বন্দী। কথাহীন নীরব সময়। এই নীরবতা অনেক সময় আমার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়। মনে হয় এরা সব পর। এরা কোন দিন আমার আপনার ছিল না। তবু বুঝি এই ঘরটাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। ভালোবেসেছিলাম আমার পূর্বপুরুষদের ভিড়ে বসে থাকতে। রাত্রি হ'লে যখন আলো নিভিয়ে আমি শুয়ে পড়তাম তখন মনে হতো এই ছবির মানুষেরা আমার পর নয়। নির্জন অন্ধকারে ডুব দিয়ে আমি যেন মা'র কোলের স্বাদ পেতাম। ঠাকুরদার আমলের ঐ আরবী ঘোড়াটা যেন আমার চোখের সামনে ফুটে বেরুত। মনে হতো আমি যেন ঐ আরবী ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কোন এক অজানা দেশে ছুটে চলেছি ঘুমের ঘোরে।

তবু ইদানীং ঐ ঘরটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। দাদার উপর রাগ হয়। আরো তো অনেক ঘর আছে, তবু ঐ দু'খানি আলতা মাখানো পা আমার ঘরে কেন? ঠাকুরদা ঠাকুমার ছবি কথা বলতে পারে না। বাবা মাও নীরব। তবু তো ওদের মানুষের দেহ আছে। এই নীরবতা কঠিন হলেও অসহ্য নয়। কিন্তু ঐ লাল দু'খানি ছোট পা। ছোট ছোট পায়ের ছবি। ছবি নয় পায়ের রেখাচিত্র আমাকে আজ ক'দিন ধরেই পাগল করে তুলেছে। বহুদিন আগে দেখা একজনের মুখের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেই সজনেখালি ফরেস্টের দুর্ধর্ষ ফরেস্টার মহিমাময় চৌধুরীকে। মাতলা নদীর সেই হারানো দিনের বাড় আমার মনে আবার মাদকতা সৃষ্টি করছে।

আলতা মাখানো দু'খানি পা'কে কেন যেন আমার রক্ত মাখানো মনে হচ্ছে।

জানি এ পা অনুশীলার। এখন বুঝি অনুশীলার সেই নয়নলোভন রূপ নেই। সেই রূপ, সেই রূপের জৌলুস এখন শান্ত। এই রূপোলী অনুশীলা এখন শুধু দু'খানি পা। আলতার একখানি রেখাচিত্র। অনুশীলাকে বৌদি ভালোবাসতো। তাই অনুশীলার স্মৃতি বৌদির কাছে প্রিয় ছিল। আমি জানি অনুশীলার এই স্মৃতিচিত্র হয়তো বৌদির তাগিদেই দাদা এনেছে। সেজন্য দাদার উপর রাগ হ'লেও বৌদিকে দোষ দিই নি আমি। বোনের স্মৃতি কার কাছে না প্রিয়।

কিন্তু আমি যেন এই স্মৃতিকে সহ্য করতে পারতাম না। রাত্রিতে ঘুমোতে গেলে ঐ দু'খানি আলতা মাখানো পা থেকে যেন অনুশীলা বেরিয়ে আসতো। মাতলা নদীর ঝড়ের মাঝে বোটে চড়ে আমরা দুজন যেন কোন অজানা সমুদ্রের অফুরান জলরাশিতে হারিয়ে যেতাম। চালতামুড়ির বন থেকে বাঘের শব্দ যেন মাতলার জলকে কাঁপিয়ে তুলছে। বাঘটা বুঝি শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। সেই আলতা মাখা রেখাচিত্র যেন জীবন্ত হয়ে আমাকে সজনেখালির সেই হারানো বনে নিয়ে যেতো। আমি আর অনুশীলা সেই সজনেখালির ছোট গির্জাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। ফাদার রিচার্ডসন গির্জা থেকে বেরুবার পথে আমাদের দিকে প্রসন্ন চোখে তাকাতো। তারপর তার স্বভাব-সুলভ হাসিতে আমাদের অভিনন্দন জানাতো----গড ব্লেস ইউ সন্---

ঘুমের ঘোরে আমার কান্না পেতো। আমি কাঁদতাম। কঁকাতাম। কে যেন বিদ্রূপ করে আমাকে বলতো---ভীরু কোথাকার। চালতা-মুড়ির বনের সেই বাঘের বিকট আওয়াজটা যেন গভীর হতো। কাছে মনে হতো। বাঘটা যেন হাঁ করে আমাকে গিলতে আসতো। ভীরু কোথাকার সেই শব্দের সুরটা সারা সজনেখালি বনটার বাইন গাছগুলোর মাথায় করুণ ধ্বনি তুলতো বেদনার। সে সময় গির্জার ঘণ্টা বাজলেই বুঝতাম এবার ঘরে ফেরার সময়। আমরা আবার বোটে ফিরে আসতাম। সনাতন বোট চালাতো আবার সজনেখালি ফরেস্টারের বাংলোর দিকে। যেখানে হয়তো এখনও মহিমাময় মদের নেশায় চুর হয়ে আছে।

বাঘের আওয়াজটা এখন অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। দূরে বঙ্গোপসাগরের গর্জন। জলের প্রবাহ। মনে হতো বন্যার জল এসে যেন বাংলোর নীচে আঘাত করবে। ভয়ে আমি জেগে উঠতাম। অনুশীলা আবার দু'খানি পা হয়ে যেতো। আলতা মাখানো দু'খানি পা। আমার অসহ্য লাগতো। মনে হতো এই মর্গটা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই দূরে। অন্য কোথাও দূরে। কিন্তু যেতে পারি নি। সেই চেনা সুরের বিদ্রূপটা আমাকে ব্যঙ্গ করতো ----ভীরু কোথাকার----

সত্যি আমি ভীরু ছিলাম। মহিমাময়ের সঙ্গে হয়তো আমার তুলনা হয় না। ফরেস্টার মহিমাময়ের সুদর্শন সুপুরুষ চেহারার কাছে আমাকে দুর্বল মনে হতো। সেই অতীত দিনের মহিমাময় আজ যেন অন্য জগতের মানুষ। সেই ঘোড়া-উত্রা নদীর কাশবনের পাশে সার্কিট হাউসের মাঠে দেখা সেই মহিমাময়ের সঙ্গে আজকের মহিমাময়ের যেন কোন মিল নেই। অনুশীলা হয়তো জানে না ছাত্রজীবনে মহিমাময় আমার বন্ধু ছিল। দু'জনে একসঙ্গে একই স্কুলে বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছি। তারপর মহিমাময়ের বাবা বদলী হলে আমরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই পৃথক ভুবন হয়তো অনুশীলা না হ'লে আমি আর উপলব্ধি করতে পারতাম না। আজকের এই রাইফেলধারী ফরেস্টার মহিমাময় চৌধুরীর সঙ্গে আমার হয়তো আর দেখা হতো না।

অনুশীলাই আমাকে সজনেখালি আসতে চিঠি লিখেছিল। আজ আবার সেই চিঠির কথা মনে পড়লো। অনুশীলা আজ নেই। তবু অনুশীলার সেদিনের আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। তাই আর অপেক্ষা নয়। সেদিন শ্রাবণমাসের এক বৃষ্টিঝরা সকালে আমাকে সজনেখালি ফরেস্ট অফিসে দেখে অবাক হয়েছিল মহিমাময়। মহিমাময় চৌধুরী। হয়তো আমিও অবাক হয়েছিলাম। তবুও সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে।

ও তাহ'লে তুই-ই ফরেস্টার মহিমাময় চৌধুরী—বলে হাত বাড়িয়ে-ছিলাম ওর দিকে।

শুধু ফরেস্টার মহিমাময় চৌধুরী নয়—অনুশীলার স্বামী মিঃ চৌধুরী। কথাটা বলতে বলতে মহিমাময় দাঁত দিয়ে যেন কেমন একটা বিশ্রী শব্দ করল।

তারপর পাইপ ধরাতে ধরাতে মহিমাময় বলল: আমি কিন্তু জানতাম তুই আসবি দিব্যেন্দু। আর জানতাম দিব্যেন্দু, দিব্যেন্দু ঘোষ ছাড়া আর কেউ নয়। অনুশীলা তোকে চিঠি লিখেছে। আর ওর ডাকে তোকে সাড়া দিতেই হবে। তাই না দিব্যেন্দু।

আমি মহিমাময়ের কথায় সেদিন কোন উত্তর দিতে পারি নি। আমাকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হল। ভাবছিলাম না এলেই হয়তো ভাল হোত। মহিমাময়ের বাংলোর দিকে যেতে যেন আমার পা সরছিল না। তবু যেতে হ'ল।

মাতলা নদীর উপর মহিমাময়ের বাংলোটিকে যেন সজনেখালিকে ঘিরে আমার কাছে একটা বিস্ময়ের দ্বীপ বলে

মনে হ'ল। বাংলোর সমুখে রজনীগন্ধার ঝাড়। অনুশীলার প্রিয় ফুল। ওপাশে কয়েকটা নীলমণি লতা। দক্ষিণ-দিকের খোলা জায়গায় ফরগেট মি নটের উজ্জ্বল সমারোহ। সব কিছু ছাড়িয়ে মহিমাময়ের বসবার ঘর আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আর সেই ঘরের দেয়ালে টাঙানো বাঘের মাথাটা যেন আমাকে দুর্বল করে তুলেছিল। মৃত বাঘের এমন জীবন্ত মাথা হতে পারে এর আগে বোধহয় কোনদিন ভাবতেও পারি নি আমি।

অনুশীলাকে দেখে সুখী হতে পারি নি। সত্যি অনুশীলাকে যেন চিনতেও পারছিলাম না মহিমাময় সেদিন অনুশীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে না দিলে হয়তো ওকে চেনা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। এই কয় বছরের মধ্যে মানুষের যে এত পরিবর্তন হতে পারে তা আমি ভাবতে পারি নি। অনুশীলার সেই কাঞ্চন রঙ যেন জলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। চোখের তলায় যেন একটা বেমানান কালির ছোপ। ঠোঁটের কোণে সেই তিলটাকে যেন আজ বিশ্রী লাগছিল। মৃত মাছের চোখের মত চোখ নিয়ে আমার সামনে একটা মমির মতই দাঁড়িয়েছিল অনুশীলা।

এখন মহিমাময় নেই। ওই সময়টায় সে নাকি বাংলোয় থাকে না। বর্ষাকাল। মাতলা বাংলোর সীমারেখা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছিল তাই মাতলার জল এখন ঘোলা—কেমন গিরিমাটি রঙ যেন মাতলার জলের। অনুশীলাকে দেখে আমার যেন মাতলার কথা মনে হ'ল। ভরা যৌবন মাতলার এই সন্ন্যাসী-বিবাগী রূপের সঙ্গে কোথায় যেন মিল ছিল অনুশীলার।

অনুশীলা আমাকে অভ্যর্থনা করতে পারে নি। কথা বলতে পারে নি। কেমন একটা নীরব ভাষার ইঙ্গিতে যা বলছিল তার সব কিছু বুঝি নি আমি। চোখের ভাষায় ও আমাকে বসতে বলেছিল। এত নীরবতা কোনদিন অনুশীলার চোখে আমি দেখি নি। এই নীরবতা যেন আমাকে অন্য আর এক জগতে নিয়ে গিয়েছিল। সে জগতে অনুশীলা মুখর। এই মাতলার মতই মুখর। এই সজনেখালি বনের পাতার মর্মরের মতোই শব্দোচ্ছলা।

অনুশীলাকে দেখে ভাবছিলাম সেই শব্দ-মুখরা অনুশীলা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সময়ের ভিড়ে। অনুশীলা যেন সুখী ছিল না। ওর চোখ বলছিল কোথায় যেন ওর দুঃখ লুকিয়ে আছে মনের গহনে। ঘন গাছের বনের মতই অন্ধকার ওর মনে। অন্ধকার। দুঃখের অন্ধকার।

দূরে বনে অন্ধকার নেমেছিল। ঝিঁঝির একটানা শব্দ মাতলাকে মাতিয়ে তুলছিল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে দাঁড় টেনে মধুবাউরীয়াদের নৌকোগুলো উজানে চলেছে। মধুবাউরীয়া মেয়েরা নিজেদের গানে উচ্ছল করে তুলছে সজনেখালির বাতাসকে। মাতলার জল গিয়ে পড়বে বিদ্যেধরীতে। আমি তাকিয়ে মাতলাকে দেখছিলাম। শুনছিলাম দূরে বঙ্গোপসাগরের গর্জনকে। বর্ষার আকাশ আবার মেঘে ঢেকেছিল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বাজছিল আকাশ। আমার সামনে বসেছিল অনুশীলা। অনুশীলা সেজেছিল। নীল একখানা শাড়িতে বেশ মানিয়েছিল অনুশীলাকে। তার চুলের দু'গুচ্ছ রজনীগন্ধা আমাকে ফেলে আসা ছয় বছরের একটা সন্ধ্যায় টেনে নিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় অনুশীলার বাবা আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেদিনও অনুশীলার খোঁপায় ছিল রজনীগন্ধার গুচ্ছ। অনুশীলার বাবা বলেছিলেন: আমি অনেক ভেবে দেখেছি দিব্যেন্দু; তোমার কাছে অনুকে দিয়ে আমি তার সারা জীবন দুঃখে ভরে দিতে পারি না। শুধু লেখার রোজগারের উপর আজকের কোন মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে চলতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না। আর জেনে-শুনে আমি বাবা হয়ে অনুশীলার ভবিষ্যৎ নষ্ট করি কি করে? তুমিই বলো দিব্যেন্দু?

আমি অনুশীলার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাই নি। সত্যি, লিখে যা আয়

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

[illegible] তা নিয়ে আমি সংসার সাজাতে পারবো, সেদিন আমার এ আত্মবিশ্বাস ছিল না। তাই আমি পালিয়ে এসেছিলাম। অনুশীলার কথায় সায় দিতে পারি নি। অনুশীলাকে নিয়ে পালাতে পারি নি। হ্যাঁ অনুশীলার চোখেও আজকের মতই বর্ষা সাজিয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল সেদিন।

এর পরও অনুশীলা আমাকে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল তুমি ভীরু। তুমি কাপুরুষ দিব্যেন্দু। আমি সেদিন অনুশীলার চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম। পালিয়ে সুখ নেই অনুশীলা। পালিয়ে পালিয়ে সংসার সাজানো যায় না। তাছাড়া যে পৌরুষ দিয়ে তোমাদের প্রেমের জগতে হিরো হওয়া যায়, সেই অর্থবনিয়াদ আমার নেই। আজ যা স্বপ্ন—কাল তা যখন বাস্তবের আগুনে পুড়ে আসল রূপ নেবে তখন কি তুমি তা সইতে পারবে অনুশীলা? জানি পারবে না।

সেদিন অনুশীলা আর এগিয়ে আসে নি। শুধু আরেকবার আমার শরীরে বিদ্রূপের বাণ ছুড়েছিল সে—ভীরু—সত্যি তুমি ভীরু দিব্যেন্দু।

অনুশীলার বাবা যে সুখ চেয়েছিলেন অনুশীলা সে সুখ পায় নি। মহিমাময়ের অর্থ ছিল। কিন্তু ওর বোধহয় প্রাণ ছিল না। হৃদয় ছিল না। হৃদয় থাকলে এমন সুন্দরী বৌকে একলা রেখে মহিমাময় এমন নির্জন সন্ধ্যা বাইরে কাটাতে পারতো না। পারতো না এমনি বর্ষায় ঘুরে বেড়াতে বাইন বনে—শিকারীর মত শিকারের আশায় আশায়।

অনুশীলা বলেছিল: আমার জন্য দুঃখ করো না দিব্যেন্দু। আমার জন্য কেউ কাঁদুক এ আমি চাই না। আমি তোমাকে ডেকেছি আমার জীবন নিয়ে একটা গল্প লিখতে। এই মাতলা, গির্জা, বাইন বন, এই বোট—সব—সব যা দেখছো সব নিয়ে। আমাকে নিয়ে একটা বাস্তব গল্প কি তুমি লিখতে পারো না দিব্যেন্দু?

হ্যাঁ অনুশীলার জীবন গল্পের মতই ছিল। অনুশীলাকে আমি গল্প করতে চেয়েছিলাম। আমার জীবনের সেরা গল্প। বাদ সেধেছিল অনুশীলার বাবা। আমি বুঝেছিলাম। অনুশীলার বাবা অনুশীলাকে গল্প হতে দেয় নি।

তবু অনুশীলা বুঝি এখনো গল্প হতে পারে। আমি অনুশীলার আগামী দিনের গল্পের কথা ভাবছিলাম। ঘরের ভেতর মাতলার পাগলা হাওয়ায় লণ্ঠন-বাতি দুলছিল। আলো-আঁধারির খেলা চলছিল অনুশীলার চোখে। আমি দেখছিলাম অনুশীলার চোখ যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনুশীলা জানালার কাছে গিয়ে যেন স্থির হয়ে গেল। কেমন পাথর যেন অনুশীলা।

আমি অনুশীলাকে ডেকেছিলাম। আমার কোন ডাক যেন অনুশীলার কানে গেল না। আমি অনুশীলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। জানালা দিয়ে মহিমাময়কে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বোটের ছাদে বসে আছে। চাঁদের আলোয় মাতলার জল খেলছিল। বাইন গাছের ফাঁক দিয়ে মহিমাময়ের পাশে বসা মেয়েটাকে আমি চিনতে পারি নি। তবে কি মহিমাময় শিকার পেয়েছে?

অনুশীলা বলছিল: বাবা আমার সুখ চাইছিল তাই না দিব্যেন্দু? আমার সুখ তো দেখলে। অনুশীলার কথাগুলো কেমন যেন কান্নার মতো শোনাচ্ছিল।

রাতে ঘুমোতে পারি নি আমি। একটা ময়াল সাপের শিস যেন সুন্দরী কাঠের বন থেকে কেঁপে কেঁপে বাংলোর দিকে আসছিল। সেদিন রাত্রে আমি ঐ শিসটাকে ভয় পাই নি। দূরে বঙ্গোপসাগরের গর্জনও আমাকে কাঁপাতে পারে নি। কিন্তু একটা গ্লাস ভাঙার শব্দ যে এতটা করুণ হতে পারে তা সেদিনের আগে আমি আর কল্পনা করতে পারি নি। গ্লাস নয় যেন কাচের ঘর ভাঙছে। সেই গ্লাস ভাঙার করুণ শব্দটায় ভয় পেয়েছিলাম।

মহিমাময়ের ঘর থেকেই শব্দটা এসেছিল। আমি ওর জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মহিমাময় টেবিলে মাথা রেখে প্রলাপ বকছিল। কয়েকটা অবিন্যস্ত বোতল ও গ্লাসে টেবিলটা যেন মাতাল হয়ে উঠেছিল। মহিমাময় বলছিল: তুমি তোমার পুরোনো বন্ধুকে নিয়ে মেতে উঠেছ দেখে আমিও বাইরে স্ফূর্তি করে এলাম অনু। মদ তো বরাবরই খাই, আজ বাউরীয়া মেয়েটা নিজের হাতে ঢেলে দিয়েছিল তাই একটু বেশি গিলে ফেলেছি—বুঝলে?

অনুশীলা কাঁদছিল। অনুশীলা বলছিল: তুমি মদ খাও তাতে আমি বাধা দিই নি। বাউরীয়া মেয়েটাকে ভালোবাসো তাতেও অনুযোগ করি নি। কিন্তু দিব্যেন্দুর কাছে আমার মাথা হেঁট করে দেবে তুমি, আমি সইতে পারবো না। অনুশীলা ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

মহিমাময় বিদ্রূপ করছিল অনুশীলাকে? সইতে শেখো অনু, সইতে শেখো---তা না হলে নিজের তৈরি কষ্টের কাঁটা ফুটে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করবে। তোমার বাবা তোমাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে বলেছিলেন—আশা করি অর্থের তোমার অভাব নেই অনু। মহিমাময় ওর ঐশ্বর্যের দিকে একবার তাকাল। হাতের চার-চারটে গ্রহরত্ন-খচিত আংটির দিকে তাকাল সে। বাঘের মরা মাথাটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল মহিমাময়। মনে হচ্ছিল একটা বাঘই যেন মহিমাময়ের মধ্যে ফঁকাচ্ছে।

মহিমাময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনুশীলা কাঁদছিল। আমি ভাবছিলাম। দূরে মাতলায় তখন রাত্রিশেষের আলো। বাইন গাছগুলোর পাতায় তখন সোনার ঝিলিমিলি। কাঠ কাটার শব্দ আসছিল চালতামুড়ির বন থেকে। কুড়ি বছরের আয়ু শেষ করে এবার বাইন গাছগুলো মাটিতে শুয়ে পড়বে। তারপর মাতলা বিদ্যেধরী হয়ে বন্দরে গিয়ে উঠবে

অসাড়কণ্ঠে। এই তো গাছের আয়ু। এইতো বৃক্ষের সংসার। আমার মনে হচ্ছিল আমরাও যেন এক-একটা গাছ, আয়ুর সীমানায় বাঁধা। তারপর একদিন কাটবার দিন আসবে। সেদিন মাটিতে শুয়ে পড়বো। মনে হচ্ছিল সারারাত, যেন অনুশীলা ঐ গাছ কাটার শোকেই কেঁদেছে। কে যেন অনুশীলার যৌবনকে ঐ গাছগুলোর মত কেটে কেটে শুইয়ে দিয়েছে।

আমাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। অনুশীলার বাবার কথাটা না রেখে যদি অনুর কথাটা রাখতাম, তবে? তবে বুঝি আজ এই গাছ কাটার শোকে আমাকেও অনুশীলার মতো দগ্ধাতে হোত না। মহিমাময়কে কি বোঝানো যায় না? মহিমাময় কি আমাকে অবিশ্বাস করে। হয়তো করে। তবু আমি ভেবেছিলাম অনুশীলার জন্য আমি মহিমাময়কে বলবো। মহিমাময়কে শোধরাব।

কিন্তু মহিমাময়কে বুঝি শোধরানো যায় না।

সেদিন দুপুরে কাঠবাংলোয় মহিমাময় আমাকে ডেকেছিল। সেই ঘোড়াউত্রা নদীর ডাক। সেই দুপুরে স্কুল-পালানো, দুপুরের কাশবনের নির্জনতাকে যেন আমি আবার মহিমাময়ের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলাম। মহিমাময় বলেছিল। মহিমাময় বলতে বলতে যেন সেই চালতামুড়ি বনের বাঘটার মতো হাঁফাচ্ছিল। সত্যি মহিমাময় অর্থের প্রাসাদ তৈরি করেও অনুশীলাকে বন্দী করতে পারে নি। অনুশীলাদের মতো মেয়েদের বুঝি টাকা দিয়ে বশ করা যায় না। মহিমাময় বলেছিল এখনও নাকি অনুশীলা স্বপ্নে আমার কথা বলে। স্বপ্নের জগতের অনুশীলা যেন বাস্তব জগতের অনুশীলার কেউ নয়। সত্যি অনুশীলা মহিমাময়ের কাছে ঐ সজনেখালি বনের একটা সুন্দরী গাছ ছাড়া বোধহয় আর কিছু নয়। অনুশীলা একটা গাছ, সত্যি ঐ কাটা গাছের মতই হাসি স্পন্দনহীন নির্বাক অনুশীলা মহিমাময়ের জীবনে ছয় বছরের আয়ু। শুধু দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

বাংলোর দক্ষিণ খোলা বারান্দায় বসে মহিমাময় পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছিল। ধোঁয়াগুলি সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে বাংলোর বাতাসকে আবিল করে তুলছিল। আমি বুঝেছিলাম মহিমাময় অনুশীলাকে ভালোবাসতে পারে নি। আর অনুশীলার ভালোবাসা না পেয়েই মহিমাময় বুঝি মদ ধরেছিল; বাউরী মেয়েটার মধ্যে নিজের একটা জগৎ খুঁজছিল মহিমাময়। অনুশীলাদের মতো মেয়েদের মন যেভাবে জয় করতে হয় সে প্রস্তুতি হয়তো মহিমাময়ের ছিল না। কিংবা আমার প্রতি অনুশীলার অনুরাগকে হয়তো মহিমাময় শুধু চাবুকের জোরে দমিয়ে দিতে চেয়েছিল। অনুশীলা গল্প হতে চেয়েছিল, মহিমাময় অনুশীলাকে গল্প করতে পারে নি। অনুশীলার বাবা অনুশীলাকে গল্প হতে দেয় নি। অনুশীলার বাবা অর্থকেই সুখের মূল ভেবেছিল। আর মহিমাময় বুঝি সেই অর্থের জোরে অনুশীলার দেহকে কিনতে চেয়েছিল।

মহিমাময় অনুশীলাকে কিনতে পারে নি।

অনুশীলা মহিমাময়কে ভালোবাসতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। অনুশীলা মহিমাময়কে ঘৃণা করতো। ঘৃণা করতো মহিমাময়ের অর্থকে। মহিমাময়ের এই অর্থ, এই সম্পদের মূল আমি আবিষ্কার করেছিলাম। না আমি আবিষ্কার করি নি, অনুশীলাই আমাকে দেখিয়েছিল। এখনও স্পষ্ট মনে আছে। চোখে স্পষ্ট ভাসছে সেই দৃশ্য।

ছিপ নৌকা করে সেই লোকটা এসেছিল মহিমাময়ের বাংলোয়। পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে একতোড়া নোট মহিমাময়ের হাতে তুলে দিয়েছিল সেই ভোঁৎকা মতন বেঁটে লোকটা। একটা পিপে যেন বসেছিল মহিমাময়ের সম্মুখে। ওরা দুজনে গ্লাসে মদ ঢেলেছিল। তারপর বোতলটা খালি করে ওরা ফিসফাস স্বরে কি যেন বলছিল। ওদের কথার অর্থ সেদিন বুঝতে পারি নি।

অনুশীলা পরের দিন যে ছবি আমাকে দেখাল তাতে মহিমাময়ও যেন ওর টাকার মত আমার কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠল। মহিমাময়ের লোভে আমি আঁৎকে উঠেছিলাম। মাতলা নদীর জল বেয়ে অসংখ্য বেহিসেবী বাইন, সুন্দরী কাঠ অন্ধকারে সেই ভোঁৎকা লোকটার পেছনে মিছিল করে চলে যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে? এমনি চোরা পথে কত টাকা মাতলার জল বেয়ে মহিমাময়ের হাতে এসেছে তার হিসেব বুঝি মহিমাময়ও দিতে পারবে না। মহিমাময়ের এই লোভকে ঘৃণা করতো অনুশীলা। মদের নেশার চেয়েও বুঝি বড় এই নেশা। কাঞ্চনের নেশা। অনুশীলা জানতো এই কাঞ্চন, এই কাঞ্চন থেকেই একদিন জন্ম নেবে কামিনী। আর তাই হয়েছিল মহিমাময়ের জীবনে। সেই বাউরী মেয়েটা মহিমাময়কে কামিনী কাঞ্চনের স্বর্গে পৌছিয়েছিল। ঘরের বউ নারী হতে পারে, কামিনী নয়, মোহিনী নয়—অন্তত অনুশীলা তা হতে পারে নি।

মহিমাময়ের জীবনে অনুশীলা বুঝি মৃত ছিল। একটা নিঃসাড় দেহ। সন্দেহের আগুনে পুড়ে পুড়ে সত্যি অনুশীলা বুঝি ছাই হয়ে গিয়েছিল। অনুশীলার কাছে এই বুঝি ভাল ছিল। মহিমাময়ের শরীরে মদের গন্ধ। মহিমাময়ের ঘরে সেই বাউরী মেয়েটার আনাগোনা সমস্ত বাতাসটাকে যেন অপবিত্র করে তুলেছিল। মাতাল বেহুঁস মহিমাময়ের এই ক্লেদাক্ত শরীরে আর নিজেকে বিলীন করতে যেন ভার লাগছিল না অনুশীলার।

আর মহিমাময়?

মহিমাময়ের চোখে বাঘের নেশা। মাংসের লোভ। আর মনে সন্দেহের আগুন। এই আগুন বহুবার দেখেছে অনুশীলা মহিমাময়ের চোখে। বনের দাবানলের মতো আগুন, যে আগুন

বৃক্ষের সংসারকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় সেই আগুনের তাত যেন অনুশীলার গায়েও লেগেছিল। এখন আর বাউরী মেয়েটা লুকিয়ে-চুরিয়ে মহিমাময়ের ঘরে আসে না। এখন মহিমাময়ের বসবার ঘরে যখন তখন এসে বসে মেয়েটা। বেয়ারাকে অর্ডার করে। মহিমাময়ের ড্রয়ার খুলে গ্লাসে মদ ঢালে। তারপর অনুশীলার চোখের উপর দিয়েই দু'জনে মাতলার ঢালু পাড়ে কাশবনের ওধারে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

এমনি করেই একদিন হারাতে চেয়েছিল অনুশীলা। আমার সঙ্গে। আজ আবার অনুশীলার মনে পড়েছিল সেদিনের কথা---পারবে, পারবে দিব্যেন্দু আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে। অনেক দূরে। এই দহনদগ্ধ কাচের সংসার থেকে তোমার স্বপ্নের জগতে। বৃক্ষের সংসারে।

আমি অনুশীলার কথায় জবাব দিতে পারি নি। আমি যে ওর বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দু'দিন বাদেই ওর বিয়ে। কাচের সংসার হয়তো ভাঙতে পারতাম কিন্তু মানুষের সংসার---মহিমাময়ের সংসার আমি ভাঙতে পারি নি।

আমি বুঝি ভুল করেছিলাম। আর এই ভুলের জন্যেই বুঝি নারীত্বের এই অবমাননা অনুশীলাকে সইতে হচ্ছে আজ। কিন্তু এই অবমাননা সয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকতে পারে নি অনুশীলা। অনুশীলা কামিনী হতে পারে নি, মোহিনী হতে পারে নি কিন্তু নাগিনী হয়েছিল।

সেদিন রাতে বোধহয় ছোবল কেটেছিল অনুশীলা মহিমাময়কে ----পারবে না---না না কিছুতেই তুমি ওই বাউরী মেয়েটাকে বাংলোয় আনতে পারবে না। অনুশীলার কণ্ঠের ঝংকার আমার ঘুম ভেঙে দিয়েছিল। আমি মহিমাময়ের জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

মহিমাময়ের জিভ অবশ হয়ে এলেও চোখ বুঝি নিভে আসে নি। মদের ভেজে সিঁদুর মাখা চোখ দিয়ে একবার তাকিয়েছিল অনুশীলার দিকে। তারপর আড়ষ্ট অস্পষ্ট ভাষায় বলছিল মহিমাময়----নৌকো অনেক দূর চলে গেছে অনু, ওকে আর নোঙরে ভেড়াতে চেয়ো না। মহিমাময় চেঁচিয়ে উঠেছিল সেই বাউরী মেয়েটার নাম ধরে-----

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল অনুশীলা। বুকে তার পাথর। এতক্ষণ অনুশীলা যেন অন্য অনুশীলা ছিল। অন্য কেউ। এমনভাবে কাঁদতে অনুশীলাকে কোন দিন দেখি নি।----তুমি ফিরে এসো মহিমাময়, ফিরে এসো। ও সব ছেড়ে দাও----

মহিমাময় হেসে উঠেছিল। ওর হাসিতে যেন বিকার। মহিমাময় বলছিল----তোমার কিসের অভাব অনু, তোমার তো সব আছে, সব---দিব্যেন্দুই তো তোমার সব। তাই না অনু। বিদ্রূপ বুঝি মহিমাময়ের চোখে।

আমি অনুশীলার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম। কামনা করছিলাম----তুমি বল অনুশীলা, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি বল আমি চলে যাব। তোমার আর মহিমাময়ের শান্তির সংসারই আমার কামনা----আমার ভালোবাসা।

অনুশীলা কোন কথা বলে নি। মহিমাময়ের বিদ্রূপে অভিমানে ফুলে উঠেছিল অনুশীলা। বেদনায় ওর চোখ ছলছল করছিল। এবার ও শক্ত হ'ল। আমার পরিচিত অনুশীলা—আঘাতেও যে অনুশীলা টলে পড়ে না সেই অনুশীলাকেই আবার আমি দেখলাম।

সিঁথির সিঁদুর বুঝি মুছতে গিয়েছিল অনুশীলা। না, সিঁথির সিঁদুর নি সে। সিঁথির সিঁদুর ছুঁয়ে বোধহয় অন্য প্রতিজ্ঞা নিচ্ছিল মনে মনে। মহিমাময় ওর মনের কথা বুঝতে পারে নি। আমি বুঝেছিলাম। অনুশীলার ঠোঁট কাঁপছিল----ও বলছিল----এ কি বললে মহিমাময়----তুমি না আমার স্বামী।

মহিমাময় স্থির হয়ে বসেছিল দেয়ালে টাঙানো সেই বাঘের মাথাটার নীচে। আর মহিমাময়ের হৃদয়ে জ্যান্ত বাঘটার চোখের তারায় আমি যেন সেই বাউরী মেয়েটাকেই দেখছিলাম।

মহিমাময় এবার উঠে দাঁড়াল। অনুশীলার কাছে গেল। ডান হাত দিয়ে বুঝি ওর সিঁথির সিঁদুরটা মুছতে গেল। মহিমাময় ও সিঁথির সিঁদুর মুছলো না---ওসব অনেক পুরোনো হয়ে গেছে তাই না অনু। তার চেয়ে তোমার আলতা মাখা পায়ের একটা ছবি রেখে দেব এই বৈঠকখানায়, এই বাঘের মাথাটার ডান ধারে----জানবো তুমি বাঘটার মতোই আমার জীবনে মৃত। একটা মৃত শিকার।

অনুশীলা প্রতিবাদ করে নি। অনুশীলা বোধ হয় মহিমাময়ের জীবন থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিল। তাই আলতা মাখা পায়ের ছবি তুলতে আপত্তি করে নি অনুশীলা। অনুশীলা ভেবেছিল---শুধু মহিমাময় কেন, সবাই জানবে অনুশীলা মৃত। বাবা, দিদি সবাই জানবে---অনুশীলাকে আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

সত্যি অনুশীলা বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিল। হয়তো বিস্মৃতির অতলে ডুবে গিয়েছিল অনুশীলা। আর মহিমাময় ডুবে ছিল, একেবারেই ডুবে গেছিল মদে আর নরকের পাতালে। সুন্দরবনের মাতলা, বিদ্যেধরী, বাইন বন আর কোন দিন ফিরিয়ে দেয় নি অনুশীলাকে। অনাত্তম কেঁদেছিল।

লজনেখালি গির্জার ফাদার রিচার্ড-সন অনুশীলার খবর শুনে বলেছিল ----আমেন গড ফরগিভ হার।

চালতামুড়ি বনের সেই বাঘটার গর্জনটা এখন থেমে গেছে। সনাতন কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে-ছিল। না, এমন অলক্ষুণে কথা সে বলতে পারবে না।

ফাদার রিচার্ডসনের ছায়া বনের ছায়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করতে পারি নি ফাদারকে----ভগবান আমাকে কি ক্ষমা করবেন? হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে করলে অনুশীলাকে বাঁচাতে পরতাম। মহিমাময়ের মতো একটা বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে পারিলে এই বৃক্ষের সংসারে বনের বাঘ অনুশীলার কি-ই বা করতে পারতো?

আজ আমার মর্গঘরটায় বসে অনুশীলার আলতা মাখানো পা দু'খানি দেখছিলাম। আমার চোখে সেই রাতে পায়ে আলতা মাখতে গিয়ে অনুশীলার শরীরের কম্পনের দৃশ্যটি ফুটে উঠল। সতীদাহের আগে বুঝি এমনি ভাবেই কাঁপতো মেয়েরা। সে রাত্রে যতক্ষণ অনুশীলা মহিমাময়ের ঘরে ছিল অনুশীলাকে যেন একটা শায়িত শবের মতোই মনে হয়েছিল আমার।

স্বামীকে ভালোবাসতে না পেরে, যৌবনের প্রেমাস্পদকে জীবনের সঙ্গী করতে না পেরে জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল অনুশীলার—আর ব্যর্থতাই বুঝি মৃত্যু। অনুশীলাকে দেখে তাই মনে হয়েছিল আমার।

সত্যি আমি আর মহিমাময় দু'জনে মিলেই হয়তো অনুশীলাকে হত্যা করেছি। চালতামুড়ির বাঘটা যেমন এমনি সময় প্রতিবছর একটা করে মানুষ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়—তেমনি করেই যেন ছিঁড়ে-কুঁড়ে খেয়েছি অনুশীলাকে। মহিমা-ময় পেয়ে ওকে মেরেছে, আর আমি না পেয়ে ওকে তিলে তিলে হত্যা করেছি। ছিঁড়েকুঁড়ে খেয়েছি বলেই অনুশীলা অবয়বহীন একটা ছবি। আলতা মাখানো অস্পষ্ট দু'খানি পা।

আমাদের সেই মর্গঘরটায় দু'খানি পা রেখে অনুশীলা যেন ঠাকুমা, বাবা, মা'র মতোই বলতে চাইছে--আমি মৃত, আমি তোমাদের সংসার থেকে মুক্ত, দেখ দিব্যেন্দু তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি কেমন পালিয়ে এসেছি এই বৃক্ষের সংসারে। মনের বাঘ তিলে তিলে দগ্ধাতে জানে, শান্তি দিতে জানে না। বনের বাঘ তা পারে বুঝলে দিব্যেন্দু।

তখন বাতাসে পায়ের ছবিটা দুলছিল। বাতাসটা যেন আজ আর্তনাদ করছিল। চালতামুড়ির সেই বাঘটার গর্জন যেন আমি শুনছিলাম। বাঘে ধরলে বাঁচবার শেষ চেষ্টায় মানুষ যেমন আর্তনাদ করে তেমনি করুণ কণ্ঠে কে যেন ডাকছিল আমাকে।

আমি তার ডাকে সাড়া দিতে পারি নি।

বাতাসটা যেন আমাকে আজও সেই পরিচিত সুরেই বিদ্রূপ করছিলো--ভীরু---ভীরু---ভীরু তুমি দিব্যেন্দু।

ভোরের কাকলি

বরিস পাস্তারনাক

('Day Break' কবিতার অনুবাদ)

আমার অস্তিত্বের সাম্রাজ্যে তোমার ভাবনার অবস্থিতি।
তারপর যুদ্ধ এলো, এলো ধ্বংস
অনেক, অনেকদিন হয়ে গেল—
তোমার সাড়া নেই; তুমি নিঃসংবাদে লীন।
অতিক্রান্ত বছরগুলোর দীর্ঘ পথ বেয়ে
হঠাৎ একদিন তোমার স্বর
ক্লান্তিতে করল উন্মুখর আমার সত্তাকে।
রাত্রি কোজাগরে পাঠ হল শেষ। তোমার সত্তার-নান্দী
এ যেন মূর্ছাহত আত্মার উন্মীলন।
ভিড়ে আর ভোরের কলরোল উচ্ছ্বাসে
মানুষের মাঝে লীন হতে চাই।
তাই সব ভেঙে চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে
পদভারে দলতে চাই।
তারপর সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাই
এ যেন জীবনের প্রথম অবতরণ—
সেই সব শূন্যতার মোড়কে ঘেরা তুষারের পথে।

চারিদিকে আলো, ব্যস্ত গার্হস্থ্যের ব্যগ্রতা।
জনতার উদ্যস্ততা।
কেউ চা খাচ্ছে, কেউ বা চলেছে দ্রুত ট্রামের পথে।
এই মুহূর্তের আবর্তে ব্যাপ্ত এ নগর যেন অচেনা।
গীর্জার কটকে ঘনীভূত তুষারপাত—
শৈত্যময়ী যেন তুষার বৃষ্টির জাল বুনছে।
তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবন-সড়কে নেমে
রেখে যেতে হয় খাবার—অসমাপ্ত, চা অনিঃশেষ।
আমার অনুভূতির সংরাগে তারা সব পড়ে ধরা
যেন মনে হয় আমি তাদের ত্বকের গভীরে
গলিত বরফের মত গলে যাচ্ছি;
আর চেয়ে আছি জাগরণঘোর বলি-কুঞ্চিত ললাটে
ভোরের কাকলির দিকে।
তাই আমার সত্তায় হ'ল লীন—
নামহীন মানুষ, শিশু, গৃহবাসী, গাছ—
আমি সবার দ্বারা বিজিত,
এ আমার সোহংবাদ, এ আমার একমাত্র গর্ব।

অনুবাদক: সুরথকান্তি ভৌমিক

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর

সুরকণ্ঠের অন্দর। রোদ আরও হেলেছে। আম কাঁঠাল সজনের চূড়োয় সোনালি রোদের মুকুট। উঠোনে ছায়া আরও ঘন, ফুলের গন্ধে ভাবী। ক্রমে পাখ-পাখালীর কিচির-মিচির বাড়তে থাকে।

অন্দরের ঘরে দিনেরাতে ছায়া। কেন না এদিকের ঘেরা পাঁচিল পেল্লায় উঁচু। সে পাঁচিলের গায়ে দুটো-একটা ফোকর আছে এই যা রক্ষে। সে ফোকর দিয়ে এক টুকরো রাঙা রোদ অন্দরের ঘরে এসে পড়েছে।

সে আলোতে পিঁড়ে পেতে বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে সুরকণ্ঠকে দেখে হঠাৎ হাতের বেণী ছেড়ে দিলেন প্রসাধনরতা। পাটির মত ঠাস বুনোট চওড়া বেণীর নীচে সযত্নে আঁচড়ানো কোঁকড়া চুল দুলতে লাগল। হাতে রাঙা কড়, রুপোর চুড়ি ঠিন্ঠিন্ বাজে। দাঁতে মিশি, কালো চোখে হাসি আর ধরে না। গলায় সোনার বেলকুঁড়ি মালা, নাকে চুনীর লবঙ্গ, কানে চারটি করে মাকড়ি। খয়েরী ফুলতোলা শাড়ির আঁচল টেনে মাথায় দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

'ডেকেছ কেন?' সুরকণ্ঠের চোখ অন্যদিকে, একটু রাগত ভাব।

'পাগলকে ভয় দেখিয়েছ কেন?'

'কি ভয় দেখিয়েছি?'

'তা কি আমিই জানি? তুমি নাকি বলেছ, বছর না যেতে আমরা সবাই ভূমিকম্পে শুকনো ডাঙায় ডুবে মরব?'

'এই কথা বলেছে বুঝি?'

'তাই ত' বললে। তা-যদি সত্যি না হয় ত' বল না শুনি।'

'হ্যাঁ:, আমার আর কাজ নেই মেয়েমানুষের সঙ্গে পুঁথির কথা বলি।' সুরকণ্ঠের গলায় আশ্চর্য, কি তীব্র অবজ্ঞা।

যাঁকে বলা হ'ল তিনি একটু চেয়ে রইলেন অবাক হয়ে। তারপর আস্তে, বিচিত্র হেসে বললেন, 'তুমি না বৈরেগী মানুষ? ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে আপনমনে কথা কও? তা এখনো দেখছি রাগঝাল কিছুই ছাড়তে পার নি।'

ভর্ৎসনা করতে গিয়ে গলাটি করুণ হয়ে গেল। সুরকণ্ঠ বুঝলেন তাঁরই ব্যবহারে বিচ্যুতি ঘটেছে। বুঝে আরও চটে উঠলেন। রুক্ষ গলায় বললেন, 'তোমারও বলিহারি যাই। দু'দিনের জন্যে এসেছ, ওকে ডেকে সব সময় কথা কইবার দরকার?'

'মনে হচ্ছে সত্যিই চটেছ।' আবার বেণী রচনায় মন দেন। নোয়ানো ঘাড়ের গড়ন বেশ প্রতিমা প্রতিমা।

'কি মনে ক'রে কি কথা বলি তা কি পাগল বোঝে? বললাম এই চৈত্রে পাঁচটি রবিবার, বড় অলক্ষণ, তা না বুঝে----।'

'থাক রায়মশায়, ও কথা শুনতে আমি তোমায় ডাকি নি। আমার আবার লক্ষণ-অলক্ষণে ভয় কি বল?'

'তবে কেন?'

এখন সুরকণ্ঠের কণ্ঠ মদ।

অভাগিনীর দুঃখে ছোট একটি নিশ্বাস পড়ে। কুলীনের মেয়ে, কুলীনের বউ-এর দুঃখ কেউ দূর করতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওদের জীবন শুধু কুল-কাঠের আঙরার ওপর দিয়ে হাঁটা। দ'গ্ধে দ'গ্ধে বেঁচে থাকা। শান্তি শুধু চিতার আগুনে।

'কথা কও ফুলি।'

'না ডাকলে তুমি কি একবারের জন্যেও আস?'

ফুলেশ্বরীর কণ্ঠস্বর সহসা অপরূপ এক লাবণ্য ধারার মত উছলে পড়ে। আঁধার আকাশে বাজী যেমন জ্বলে উঠে মালা হয়ে দুলতে দুলতে খসে পড়ে ঠিক যেন তেমন। গলার স্বরে কি যেন আছে তাই ঘরের আঁধার যেন উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। সুরকণ্ঠের মনে হয় মেঘাচ্ছাদিত বিজয়াদশমীর নিশীথে, পরিপূর্ণ ভাগীরথীর বুকে; বিসর্জনের প্রধূমিত মশালের সামান্য আলোয় দেখেছিলেন, দেবীপ্রতিমার মুকুট থেকে জরীর কল্‌কা খসে পড়ে, অন্ধকারকে চমকে দিয়ে গাঢ়তর অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল।

সুরকণ্ঠ এতক্ষণে ভাল ক'রে তাকান। ফুলেশ্বরীকে দেখতে পাচ্ছেন। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ফুলেশ্বরী।

'একটি উপকার তোমায় করতে হবে ভাগ্না। তুমি বিনে আর কারেও জানি না।'

আবেগভরে ফুলেশ্বরী সুরকণ্ঠের হাত চেপে ধরেন। পেছনের পা সামান্য তুললেন। একপায়ের ওপর শুকনিতম্বের ভার রাখলেন। সুরকণ্ঠ হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

'বল কথা রাখবে।'

'ভাগ্না? তুমি আমায় ভাগ্না বললে ফুলী?' সুরকণ্ঠ আশ্চর্য হয়েছেন, 'আমি তোমার ভাগ্না কিসে? তোমার ভগ্নী আমার মা হলেন বটে, তবে তার আগে না তোমার সঙ্গে আমার----তা ভালই হয়েছে ফুলী। আমার হাতে পড়লে কত কষ্টই পেতে।'

'সে সব কথা থাক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিলক্ষণ। মনে কি আর সর্বসময়ে পড়ে ফুলী? মাঝে মাঝে মনে হয় বটে তখন ভাল করে চেয়ে দেখি নি তাই বিয়ের নামে পালিয়েছিলাম। এখন দেখলে বোধ হয় আর পালানো হত না।' হেসে ঘর ভরিয়ে ফেললেন সুরকণ্ঠ। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন, 'নাও, কি বলবে বল।'

'বলি।'

হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে যায় ফুলেশ্বরী। হাতড়ে হাতড়ে চকমকি পেড়ে নেয়। কুলুঙ্গি থেকে। ঠুকে পিদীমের সলতেটা ধরায়। আধ-রচা বেণীই একহাতে জড়িয়ে নেয়। তারপর, তেলের ভাঁড় ও একগোছা সলতে নিয়ে অন্য ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে একটু থমকে দাঁড়ায়। টিকলো নাকের ডগায়, ঠোঁটের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। চোখের দৃষ্টি বিপন্ন, কাতর। গলার স্বর মৃদু।

'তাঁর সঙ্গে একবারটি আমার দেখা করিয়ে দিতে পার?'

'কার সঙ্গে?' সুরকণ্ঠের চোখ থেকে প্রত্যাশার আলো নিভে গেছে। ভ্রূকুটি করেন। তিনি। মনে ঘা লেগেছে। যদিও সন্ন্যাসী হতে চলেছেন তিনি, এখন আর বিচলিত হওয়া শোভা পায় না। তবু তিনি বিচলিত হন। ছি ছি, অন্তরে আসক্তির দাস, বাইরে বড় বড় কথা, নিজেকে ঘেন্না হয় তাঁর।

'তাঁর সঙ্গে।'

ফুলেশ্বরী দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে। সুরকণ্ঠের সামনে আবার লজ্জা কি? ওঁকে সে বৈরাগী বলেই জানে। বৈরাগী বিবাগীকে লজ্জা নেই। ফুলেশ্বরী প্রত্যাশী নয়নে চাইল।

॥ ২ ॥

"যেখানে কুলীন জাতি"—

চৈত্রের সে অপরাহ্নে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী সৈদাবাদে স্বগৃহের বৈঠকখানায় বসে মহীপতি আচার্য আরো ক'জনের সঙ্গে খুশ্‌গল্পে ব্যস্ত আছেন। মহীপতি সদ্যো দিল্লী প্রত্যাগত। নিজামতে চাকরী করলেই সকলের অবস্থা ফেরে না। তাঁরও ফেরে নি। ছোটবেলা থেকে রাজমহল ও মুর্শিদাবাদে মানুষ হবার দরুণ মাতৃভাষার চেয়েও ফারসী এবং উর্দুটা জানেন ভাল, বিশেষ করে সেরেস্তার হিসেব। মাথায় পুঁটলী 'ক' শেখাবার সময়ে তাঁর কোমরে কাপড় থাকবার বয়স নয়। তাঁর পিতার বিশ্বাস ছিল যত শৈশবে গুরুমশায়ের খোঁয়াড়ে ঢোকানো যায় ততই পুত্রের মঙ্গল। বর্ণ পরিচয়ের সময়ে মহীপতি মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে গুরুমশায়ের উঠোনে আঁচড় কেটে অক্ষর অভ্যেস করেন, তখন ঘন ঘন কাদানুটি দিয়ে উঠোন মুছে দিতে হত। শুভংকরী শেখবার সময়ে গুরুমশায় সিধে মাটির নুটি মুখে পুরে দিতেন। মহীপতি তখনো জানেন না একদা এ দেহ আবার মাটিতে লীন হবে। অতএব কেঁচো-মাটির স্বাদ থেকে জিভকে বাঁচাবেন বলেই জোর করে হিসেব, অঙ্ক শিখে নিলেন। কোন উচ্চাশা না থাকার জন্যে পরজীবনে উন্নতি হয় নি। তাতে বিশেষ খেদ নেই। পঞ্চাশোর্ধে বয়স। ছিপছিপে পাকানো শরীরটি দেখলেই মনে হয় অনেকখানি বেগ সম্বরণ করে রেখেছেন; ক্ষিপ্রগতি, চঞ্চল মানুষ। অতিশয় নকুলে স্বভাব। রাজপুরুষদের আওতায় থাকার জন্যে কথায়বার্তায় শিষ্টতার অন্ত নেই। এদিকে হাসি, ঠাট্টা, রসিকতা সবই চলে।

দেখলে বোঝা মুস্কিল এঁর পূর্বপুরুষ একদিন আঁধারমাণিক

গ্রামের সম্মানিত ভূস্বামী ছিলেন এবং গৌড় থেকে গদ আনিয়ে 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করতেন। আরো বোঝা কঠিন, যে এই অতি-সাধারণ লোকটি সততা ও সাধুতাব সঙ্গে সঙ্গে কাজে দক্ষতার অধিকারী বলে সবাই তাঁকে খাতির করে।

সৈদাবাদ ও খাগড়া অতি বর্ধিষ্ণু জায়গা। ব্যবসা-বাণিজ্যের মস্ত বাজার। রাজধানীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক মা'র পেটের বোনের মত, অঙ্গাঙ্গী। মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি হওয়াতে এ-সব জায়গা শনৈঃ শনৈঃ ফুলেফেঁপে উঠেছে। একে রাজধানীর কাছাকাছি, তাতে রেশম-ব্যবসায়ীদের ঠাঁইবসত, সৈদাবাদের ইদানীং বড়ই বাড়বাড়ন্ত।

মহীপতির বাড়ি রাধাপ্যারীর মন্দির সংলগ্ন গলিতে। পেছনে গঙ্গা, বাড়ির কাছে শাঁখারিবাজার। পাতলা ইটের নাচু দোতলা বাড়ি; সামনে ইট বাঁধানো গলি। বাঁ-পাশে হরি রাহুতের ময়দার গোলা, বোঁদেলা পাহারাদারদের গান-বাজনা হৈ-হল্লায় এ গলি সব সময়ে মুখরিত থাকে।

মহীপতি বসে আছেন বৈঠকখানায়। অন্দর আর বাইরের মধ্যে এক মস্ত পাঁচিল। পাঁচিলটা মহীপতির দাদা জগৎপতির তোলা। সংসারের আয় যত বাড়বে, পাঁচিলটা তত উঁচু করা হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু এ ত' ফকিরদের সংসার নয়: তাই এক বাড়িতে দুজনকে আঁটল না। মানুষের অহঙ্কার যখন স্ফীত হ'তে থাকে তখন তার আয়তন দেখা যায় না বটে, কিন্তু দিব্যি টের পাওয়া যায়। কেন না সে অহঙ্কার অন্যদের যেন একেবারে কোণঠাসা ক'রে ফেলে।

জগৎপতি যখন ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, মেদ ও মজ্জায় কেবলই ফুলতে থাকলেন, তখন একদিন মহীপতিই বললেন, 'দাদা, ধনবানে পুরী গড়ে ভাগ্যবানে বাস করে। এ মুর্শিদাবাদ নগরী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আপনার পদমর্যাদা অনুযায়ী এখন উপযোগী বাড়ি দরকার। এখন বাংলায় প্রচুর অর্থ, নবাবের সুব্যবস্থায় কুঠিয়ালরা ব্যবসা-বাণিজ্যে কত উৎসাহ পাব। তাই দেখি এ নগরী ভাগীরথীতীরে কেবলই ছড়িয়ে পড়ছে। আপনাদের অবস্থার লোকেরা বাড়ি করছে বলেই মুর্শিদাবাদের গৌরব।'

জগৎপতি মনে মনে খুব আনন্দিত হলেন। অপ্রিয় কথা আর নিজেকে বলতে হল না। তবে মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না। যেন কতই চটিতং, এই ভাব দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাপু হে, এই এক নতুন হাওয়া দেখছি। চাকুরীস্থলে এসে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়া। অথচ এতে ভাল ফল দর্শায় না। আমি ত' যেদিকে তাকাই সেদিকেই এক দৃশ্য দেখি, ভাবি এ দেশের হল কি?'

জগৎপতি নিশ্বাস ফেলে কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন এ ধরাধামে সর্বত্র শুধু স্বার্থের লড়াই, তাকাতে হলে উর্ধ্বমুখী হওয়া ছাড়া সৎলোকের উপায় নেই।

মহীপতি মনে মনে হেসে বললেন, 'দাদা, ও পাত বাড়লে ভাতে কুলোয় না, এক বাড়িতে তিনহাঁড়ি হয় সে ত' নতুন কথা নয়। তবে এখানে দেখি কি জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, কি আমাদের আঁধারমাণিক গ্রামের রামাই বাগদী সকলেই যে যার নিজের লোকের সঙ্গে জোট বাঁধতে ব্যস্ত।'

'হবে না কেন?' জগৎপতি সময়োচিত গম্ভীরতা অবলম্বন করে বলতে লাগলেন, 'তার মানে একতাই বল। সবাই ত' তোমার মত ভায়া, গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে বসে নেই। বিদেশে-বিভুঁয়ে দুটো কামাবে বলেই না এসেছে তারা। একসঙ্গে থাকলে বুকে ভরসা কত।'

'তাই ত' দেখি', মহীপতি সঙ্কোচে বলতে থাকেন, 'এ নিজামতে সকলেই যেন তেন প্রকারেণ টাকা পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত।'

'বটে! সেটা অন্যায় কি? বলি অন্যায়টা দেখলে কোথায় তুমি? টাকার জন্যে না ত' কিসের জন্যে এসেছে হে এরা? হিন্দুস্থানের নানা জায়গা দেখে তবে সব এখানে এসেছে। এই তোমার নবাবের কথা বলছি। দেখে নিয়েছে যে, হ্যাঁ, হিন্দুস্থানে আর কোথাও এমন সুখের রাজত্ব নেই। এর মধ্যে অন্যায়টা কি দেখছ তুমি?'

'তা বটে!' মহীপতি নিমেষে সায় দিলেন।

'যাক, এসব কথাই অবান্তর। আমরাও ভায়ে ভায়ে একঠাঁই থাকব এই আশাতেই---।' জগৎপতি নিশ্বাস ফেললেন, 'তা, তোমার যখন এতই আপত্তি, তখন আমি আর দোনামনা করব না।'

সেই থেকেই জগৎপতি আলাদা। যতদিন না আলাদা বাড়ি হয় ততদিন তিনি বাইবে বলে বেড়িয়েছেন, 'সাধ ক'রে সংসার ফেঁদেছিলাম, ভায়া আমার সাবালক হয়েছেন, বড় বড় লোকের সঙ্গে নিত্য গতায়াত। এখন অ[illegible] [illegible]কে অন্নে থাকতে চান না।'

জগৎপতি চলে যাবার [illegible]কে মহীপতির পক্ষে বাড়িটা সত্যিই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারে লোক বলতে তিনটি। স্ত্রী চিররুগ্ন, বোন চিরকুমারী এবং এ সংসারে হালের মাঝি। আর আছে প্রাচীন চাকর, তা মৌতাতের সময়ে আফিম না পেলে তার যা মেজাজ হয় তাতে কে প্রভু কে ভৃত্য মনে করা কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু গৃহিণীর বিবিধ বাতিক, বোনের সঙ্গে নিত্য খিটিমিটি, মহীপতি আজও বৈঠকখানায় বসে বসে দুঃখের কথা ভাবছেন। তাঁর কণ্ঠে মৃদু মৃদু গান শোনা যায়। এমন সময়ে নাগরা মশ-মশিয়ে দার্শনিক হেকিমসায়েব [illegible]বং আজিম কাশ্মীরীর প্রবেশ। তাঁদের দেখেই মহীপতি নমস্কার করে বললেন, 'আসুন আসুন। আস্তেজ্ঞা হোক।

আমি নিজেই নিজেকে খেতাব দিচ্ছিলুম, আপনারা ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন।'

হেকিমসায়েব আসন গ্রহণ ক'রে ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন, 'কি রকম?'

'ভেবে দেখলুম আমার নাম মহীপতি না হয়ে গেরাজ হলেই ভাল ছিল।'

'তার মানে?'

'আহা, সংসারের সদস্য বলতে ত' তিনটি পাখী, ছাতারে, চিল আর ফটকটে।' মহীপতি হাত নেড়ে সুর ক'রে বলতে লাগলেন, 'গিন্নী যদি বলেন যাব ডাইনে, ভগ্নী বলেন বটে। বাঁ-এর চেয়ে ডান ভাল লিখেছে কোন আইনে, আর চাকর ব্যাটা চেঁচায় শুধু, চুকিয়ে দাও বকেয়া সব মাইনে। হেকিমসাহেব, এ মাইনের চাকর, চাকরানের চাকর নয়। তাই মাইনে চায়।'

'আর আপনি?'

'কাক ভূষণ্ডী। তা সকালবেলা কি মনে ক'রে?'

'খবর-টবর শুনতে।'

মহীপতি এবং আগন্তুকদের কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে তাঁরা না জানি কি না কি খবর নিয়ে কথা কইবেন। কিন্তু মহীপতির দৈনন্দিন জীবনে যাঁদের আনাগোনা, তাঁরা শুধুই বন্ধুবান্ধব। হেকিমসায়েব নেহাৎই ছা-পোষা চিকিৎসক। নিজে যেমন গেরস্ত ভাবের মানুষ, তাঁর পসারও তেমনি গরীব-গুরবো সাধারণ লোকের মধ্যে। ভরসা রাখেন তাঁর আবিষ্কৃত আশ্চর্য সকল প্রকার ঘা-এর মলম, গোলাপ জল ইত্যাদি একদিন না একদিন কোন না কোন রাজপুরুষের কৃপায় জনসমক্ষে প্রকাশ পাবে। হঠাৎ। নবাবরা মসনদে বসবার দিনে, বা অন্য কোন বিশেষ উৎসবের দিনে ধাঙ্গীকরের তরি নকলতোপ যেমন দুম ক'রে হঠাৎ ফাটে।

একথা মনে করলেই হেকিমসায়েব আবুহোসেন। সবাই তাঁর ওষুধ চাচ্ছে, নবাবের তিন ভাইপো, বোনাই, বোনের জামাই, সবাই তাঁকে বৃত্তি দিচ্ছে। বলছে, 'হেকিমসায়েব, আর্মানী গির্জের পাশের গলির আঁধারে এমন সূর্য ছাইচাপা হয়ে পড়েছিল কে জানত।'

ভাবনাটা বেশ জমে উঠলেই হেকিমসায়েব চোখটা বুজে একটু একটু দুলতে থাকেন। আবুহোসেনকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে তাঁর গৃহিণীর একটি ধমকই যথেষ্ট। এক মুহূর্তে ফিরে আসেন আর্মানী গির্জার গায়ের ছোট বাড়িটিতে। তুড়ি মেরে বলেন, 'শোভানাল্লা, শোভানাল্লা, কি হ'ল? রুগী এল না কি?'

'হ্যাঁ, রুগী এসেছে। দিনের বেলা উনি খোয়াব দেখছেন। কতবার বলি একবার মুর্শিদাবাদ যাও। সেখানে সব তা' বড় তা' বড় লোকের বাস। নবাবের জামাইদের দান-খয়রাতের হাত কেমন।'

হেকিমসায়েব মনে মনে খোদা-তাল্লাহর নাম জপেন। বিবিকে বোঝাবে কে, মুর্শিদাবাদের পথে-ঘাটে কিছু সোনা-রূপো গড়াগড়ি যাচ্ছে না। নবাবদের দান-খয়রাতি যদি বা থাকে, তবু তেলামাথাতেই তেল পড়ে বেশি, কেন না যাদের মাথায় সত্যি সত্যি তেল পড়া প্রয়োজন তারা নবাব-বাদশাদের সমীপে পৌঁছতেই ভয় পায়। স্বামীকে নিরুত্তর দেখলেই হেকিমের বিবির মেজাজ সপ্তমে চড়ে। তাঁর প্রথম সুযোগেই নাগরায় পা-জোড়া গলিয়ে একেবারে মহীপতির বাড়ি। সত্যি বলতে কি, হেকিমসায়েব যখন চশমা আঁটিতে আঁটিতে সৈদাবাদের পথ দিয়ে মহীপতির বাড়ি ছুটতে থাকেন, তখন তাঁকে দেখে মনে হওয়া সম্ভব যে, বাঘের অথবা সাপের হাত থেকে পালাচ্ছেন।

মহীপতির কথাবার্তা শুনে হেকিম-সায়েব বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি খুবই ভাবিত। কেন সকাল থেকেই কি ঝড়, গর্জন, বর্ষণ চলেছে না কি?'

'বিলক্ষণ। ভেসেছি না ভেসেই আছি। ওতে আর ভয় করি নে মশায়।'

আজিম কাশ্মীরী বাজে কথা পছন্দ করে না। সর্বদাই ব্যস্তবাগীশ ভাব। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখে বসন্তের দাগ, বিস্ফারিত চোখ, অতি দামী সুতির কাপড়ের আধময়লা পাঞ্জাবী ও লক্ষ্ণৌই পায়জামা পরণে। চেহারা দেখে বোঝা ভার কেন এবং কি কারণে তার নামের সঙ্গে কাশ্মীরের নাম জড়িত। শীত-প্রধান দেশের লোকদের সঙ্গে যদি তার কোন বিষয়ে মিল থাকে, তা হ'ল স্নানবিমুখতা। কখনো-সখনো তাকে আড়ম্বর সহকারে স্নান করতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তার উপলক্ষ্য অতি অদ্ভুত। কারবারের লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন ক'রে সন্ত পিতর দিবসে স্নান করে, সেদিন সৈদাবাদের রেশম কারবারীদের পার্টিতে ফল ও মেওয়া সওগাত যায়। অথচ রেশম কারবারী হয়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ করবার প্রয়োজনীয়তা যে কত গুরুতর তা বোঝালেও বুঝবে না। সন্ত পিতর সম্পর্কে তার এ বিশেষ সম্মান দেখাবার কারণটুকু কি, একথা জিগ্যেস ক'রে কেউই জবাব পায় নি। অন্তত সৈদাবাদ, খাগড়া, মুর্শিদাবাদের লোক নয়। আজিম কাশ্মীরীকে তারা জন্মেও কাশিম-বাজারের কুঠিয়ালদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে নি। দেখলে না হয় ক্রীশ্চান সন্ত সাধুর ওপর ভক্তির কারণটা অনুমান করা যেত।

মহীপতি তাকে কচিৎ ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখেছেন। তাঁর সন্দেহ হয় আজিম কাশ্মীরী আধা-মুসলমান। পুরোপুরি ধর্মান্তরটা ঘটে নি। ব্যক্তিগত কথাবার্তা কইলেই মহিষাসুরসুলভ বৃহৎ মাথাটি ঝাঁকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় দু'টো-একটা মন্তব্য ক'রে চুপ ক'রে যায়। ভাষাটি পর্তুগীজ, উচ্চারণে সুরাটের স্থানীয় লোকের মত সুর, চেহারায় হাবসী সর্দার, আজিম কাশ্মীরী একটি চরিত্র বিশেষ।

ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হবার সময়ে শুধু নয়, এই দু'বছর আগে শুধু মহীপতির কথায় সে পাঁচ বোঝাই কাঁচা টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে ফতেচাঁদের মহুরীকে। গিরিয়ার যুদ্ধের পর তখন একদিকে যেমন লক্ষ কোটি টাকা পাওয়া গেল। অন্যদিকে তেমনি দিতে দিতে নবাব কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। টাকা পাঠিয়ে দিল্লীর ধূমায়মান রাজনীতির তপ্তকুণ্ডে ঠাণ্ডা জল ঢালা হ'ল। সৈন্যসামন্ত, বিশ্বস্ত অনুগতদের বকেয়া মাইনে, পারিতোষিক, আর জনে জনে খেলাৎ দিয়ে খুশি রাখা। নবাব জানেন ফতেচাঁদরা হচ্ছেন, জ্যান্ত তোষাখানা, নাড়া দিলেই পড়বে টাকা। আর, সুবাদারের দরকারে সুবা বাঁচাতে যদি টাকা না দেন, তবে আর ফতেচাঁদরা আছেন কেন?

সেই সময়ে, সরফরাজ খাঁর আত্মীয়-পোষ্যদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাবার জন্যেই হোক বা দিল্লীর প্রতিভূ মুরিদ খাঁকে প্রতিশ্রুত সাত লক্ষ টাকা দেবার জন্যে, হঠাৎ বেশ কিছু কাঁচা টাকার দরকার পড়ে যায়। এমনই আশু প্রয়োজন যে, নিয়মমত দস্তখত দেখিয়ে পাশ করিয়ে নিয়ে মালখানার শীলমোহর ভেঙে টাকা আনবার সময় নেই। ভগবান-গোলার গঙ্গার বুকে বজরায় বসে পরামর্শ করতে করতে দু'ঘণ্টার নোটিশে ফতেচাঁদ টাকাই বা পান কেমন করে? সোজাসুজি হৈ চৈ করে চাওয়াও মুস্কিল, কেন না ফতেচাঁদের সঙ্গে পরামর্শে লিপ্ত ছিলেন এক অজ্ঞাতনামা রাজপুরুষ। যাঁর তখন রাজমহলে থাকবার কথা এবং সবাই জানে তিনি রাজমহলেই আছেন।

এ হেন সঙ্কটকালে বিপদবারণ আজিম কাশ্মীরী মহীপতিকে প্রতিশ্রুত সে টাকা দিয়ে বাঁচায়।

'বড় উপকার করলে', ফতেচাঁদের মহুরী বলেন।

'তা করলাম বটে।' আজিম কাশ্মীরী বৃথা বিনয়ের ধার ধারে না।

'মালিক এ উপকারের কথা স্মরণে রাখবেন।'

'কেন?'

এ হেন প্রশ্ন শুনে মহুরী থতমত। মহীপতি অপ্রস্তুত। আজিম কাশ্মীরী বললে, 'পেশকার মশায় মাঝখানে আছেন বলে টাকা দিয়েছি।'

মহীপতির প্রতি তীব্রদর্শন লোকটির এ আনুগত্য কেন তা বোঝা কঠিন। আজ মহীপতির কথা শুনতে শুনতে সে হঠাৎ বললে, 'ব্যাপার কি বলুন ত', বালুচর জিয়াগঞ্জের তাঁতী-গুলো দাদন দিতে গেলে নিতে চায় না, বলে, কাশিমবাজারের সায়েবরা আগেই দাদন দিয়ে বসে আছে। আমার বাঁধাঘরগুলো পর্যন্ত—শোনা যাচ্ছে গাঁই-গুঁই করছে। ব্যাপার কি?'

'সৌলদজঙ্গ।' হেকিমসায়েব ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন।

'তার মানে?'

'মানে অতীব সোজা। সৌলদজঙ্গকে উড়িষ্যায় বসালে হবে কি, সরফরাজের আত্মীয়-কুটুম্ব সহজে ছেড়ে দিলে? ভাইপো-কে এমন নাস্তানাবুদ করলে যে, বুড়ো বয়সে নবাবকে ছুটতে হ'ল না?'

'হ্যাঁ, দেখছি বটে ইংরেজ কুঠিয়ালরা ব্যবসা-বাণিজ্য সব একচেটে করতে চায়। নবাব যখন যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত, দিই রেশম—তাঁতীদের মোটা দাদন। আর আমরা ব্যাটা আঙুল চুষি।'

হেকিম বললেন, 'আর তাঁতীগুলোর কি ইমান-টিমান বোধ নেই? এ্যাদ্দিনের কারবার যাদের সঙ্গে---'

'আহা ব্যবসার নিয়মই ত' ওই। আমরা চেষ্টা করব যত কম টাকায় যত ভাল তাঁতীকে পেতে পারি। ওরা কারিগর, ওরা দুটো পয়সা চাইবে বই-কি।'

মহীপতি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে সদ্ভাব নেই, তাই মুর্শিদাবাদের রেশমের বাজারে এতরকম ফন্দীবাজ লোক ঢুকে পড়লে।'

আজিম কাশ্মীরী হঠাৎ হাসলে। ফটকটে সাদা দু'পাটি দাঁত বের ক'রে বললে, 'আপনার দেখছি ছতরমল আর দুধওয়ালার ওপর রাগটা পড়ে নি।'

'না, ভেবে দেখবার কথা বটে। কথা তুললে এমন কি আলমচাঁদ পর্যন্ত বলেন মন্দ কি, রেশম ব্যবসা-টা বড় করবার জন্যে ওরা কত টাকা খাটাচ্ছে।'

'কেন, টাকার ঝুঁকি ওরা একা নিয়েছে?'

'না, তা নেয় নি বটে। আমার ধারণা ঝুঁকি ওরা কোনদিনই নেয় নি। তাঁতীদের নিজেদের জাতের মহাজনরা টাকা খাটিয়েছে, তাঁতীদের চাষের জমি, ঘরবসতের জায়গা দিয়েছে, তারপর সত্যি বলতে কি রেশমের এ উন্নতির জন্যে চেষ্টা হয়ত' সবাই করেছে, যে যখন মালিক থেকেছে। কিন্তু শতখানেক বছরও হয় নি, বাইরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যটার পথ খুলে দিলে ঐ দিল্লীর বাদশারাই। দেখুন, সেই থেকে নানা জাতের সায়েবরা এসে রেশমকুঠি ফাঁদলে। মাড়োয়ারীরা ত' এসে তৈরি কারবারে টাকা খাটাচ্ছে। ঝুঁকিটা নিলে কোথায়?'

'তবে টাকা খাটাবার কথা বলছেন কেন?'

'এইজন্যে বলি, যে টাকা খাটাচ্ছে বলে ওরা বাংলা দেশের রেশমের ব্যবসায়ে ফাটকা ঢুকিয়ে দিলে। এ থেকেই ব্যবসার সর্বনাশ ঘটে।'

'তা যা বলেছেন। এই করেই সুরাট আর কালিকটে হার্মাদরা মশলার ব্যবসায়ে সর্বনাশ এনেছিল।'

'পরিণামে যে অবস্থা হ'ল তা দোজখেরও বাড়া।'

হেকিমসায়েব এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'কিন্তু মশায়রা এই যে বাক্যালাপ করছেন, আমি শুধু এ কথাটাই বুঝছি না আজমীরি আর জয়সলমীরি কারবারীদের ওপর আপনাদের রাগ কেন? আমার শ্বশুর ত' বলতেন ব্যবসায়ে পাল্লাপাল্লি করা ভাল। পাঁচটা ব্যবসায়ী কে হারে কে জেতে বলে রোখের ভরে চললে পরে কারবার না কি বাড়ে।'

'হ্যাঃ।' হেকিমের শ্বশুরের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পর্কে আজিম কাশ্মীরী একটি শব্দে তার মতামত জানালে।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে হেকিম বললেন, 'আমার শ্বশুর এলেমদার মানুষ ছিলেন। তিনি সম্পর্কে আমার চাচা-ও বটে। আমার যা কিছু হেকিমী তাঁর কাছে শেখা। জানেন, একমাত্র ফোড়ার মলম বেচে তিনি দিল্লীতে তিনখানা বাড়ি তুলেছেন?'

মহীপতি বললেন, 'তিনি বিদ্যে বেচতেন, ব্যবসাদার ছিলেন না। ভেবে দেখুন, যদি খদ্দেরদের বাজারটাও সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে, তাহ'লেই এক জায়গায় অনেকে ব্যবসা করলে ক্ষতি নেই। নইলে সমূহ ক্ষতি। কেনবার লোক নেই অথচ কারবারীরা জিনিষের জোগান দিয়েই চলেছে।'

'কিন্তু বাংলার রেশম তসর গরদ মটকার বাজার এখন সর্বত্র।' হেকিম-সায়েব একটু অবাক হ'য়ে বললেন।

'অস্বীকার করি না। কিন্তু এই মাড়োয়ারী কারবারীরা কি করতে চায় জানেন? পলু'র চাষ কেমন হবে না হবে সেটা আন্দাজে কষে নিয়ে তাঁতীদের দাদন দিতে চায়। দেবার সময়ে মোটা হাতে কড়ি ঢালে, আর কেনবার সময়ে কেনে সস্তায়। জিনিষটা চোখে দেখার আগেই এই যে ফাটকা হিসেব কষা একি ব্যবসার পক্ষে ভাল?'

আরেকটু বিশদ ক'রে বললেন, 'এখানে একটা আন্দাজ কষে টাকা ঢাললে, দিল্লীর বাজারে বা চন্দননগর চুঁচড়োর ফরাসী বেনেদের কাছে এবার এত রেশম দেব বলে টাকা আগে-ভাগে নিলে। যদি তেমন তেমন হয় ত' ওদের দুনো লাভ। যদি না হয় ত' তাতেও পরোয়া নেই, কেন না মরতে মরবে যেসব খদ্দেররা টাকা ঢেলেছে।'

আজিম কাশ্মীরী হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেললে। বললে, 'সুরাটে কারবার করেছি, হায়দ্রাবাদে একবার হীরের ব্যবসায়ে কাজ শিখতে গেছলাম, কিন্তু এখন মুর্শিদাবাদে যেমন দেখি, এমন বাজার আমি কোথাও দেখি নি।'

মহীপতি বললেন, 'ভাল, আপনি কি হায়দ্রাবাদেও ছিলেন না কি?'

'এখনই ত' শুনলেন।'

মহীপতি একটু যেন স্বগতভাবে বললেন, 'সত্যিই। মুর্শিদকুলীর সময় থেকে কি উন্নতিই হল। এই বিকেলবেলার চৌকে দাঁড়িয়ে যখন দেখি আরবী, ইরাণী, তুর্ক বণিক, হাবসী সেপাই-শাস্ত্রী দাসদাসী, ফরাসী, দিনেমার, আলিমান ফিরিঙ্গী কারবারী, সব এক জায়গায়, দেখে কি আশ্চর্যই লাগে।'

'হ্যাঁ এদেশে আর এমন বাজার

কোথায়? বড় ব্যবসার জায়গা বলতে এখন মুর্শিদাবাদ।'

'বৎসরান্তে কত কোটি টাকার লেনদেন হয় জানেন?'

হেকিমসায়েব কি ভাবছিলেন, মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'দাদন দেবার কথা বলছিলেন, সে ত' ইংরেজরাও দিয়েছে।'

'তা দিয়েছে বটে', মহীপতি বললেন, 'তবু ওদের সঙ্গে পারে কিনা সন্দেহ। একখানা তেলধুতি আর ময়লা পিরাণ প'রে ওরা কোথায় যাচ্ছে আর কোথায় যাচ্ছে না। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে, নদীনালায় ভয় নেই, ট্যাঁক ঝাড়লেই লাখ টাকা, আর দাদন দেওয়াই যেন কাজ। চাল, নারকেল, সুপুরি, সর্ষে, ওদের মাথায় কি এত আসে।'

হেকিম প্রাজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্যে বললেন, 'তা চাষাদের হাতে দুটো কড়ি আসে বলুন।'

'দাদন নেওয়া মানে হাতে দড়ি, কড়ি পেলে কি আর সে বিপদের আসান হয়? দাদন হ'ল শাঁখের করাত, আসতে কাটে, যেতে কাটে।'

আজিম কাশ্মীরী যেন অবাক হয়ে বললে, 'তা যে দাদন দেবে সে মাল চাইবে না?'

'আপনারা কি কোনদিন এসব জায়গায় ঘুরেছেন? আমি গেছি। দেখেছি পলুর চাষ যে করে সে ব্যাটার সঙ্গে ধানচাষীর কোন তফাৎ নেই। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সব সময় জোটে কি? একখানা বাঁশপাতার ছাউনী আর একমুঠো ভাত এই ত' চায় তারা। বরং ইংরেজ কুঠিয়ালদের ভালবাসি, অনেক সময় ওরা চাকরান জমি দেয়-টেয়।'

'তা আপনি যাই বলুন, কারবারী তা ব'লে জমিজমার বন্দোবস্ত করতে পারে না।'

'পলুচাষীর মুখ চেয়ে একটা কিছু ত' করা দরকার। পলুচাষী রেশমের মৌসুম ফুরোলে বেকার। ধানও কিছু বারমাস চাষ হয় না।'

হেকিমসায়েব বললেন, 'যা বললেন সেটা কি সত্যি? বছরে কোটি টাকার লেনদেন? এই মুর্শিদাবাদের বাজারে? না, মনটা আপনি খারাপ ক'রে দিলেন বটে। আজ আর দিল্লীর খবর-টবর শোনা হ'ল না।'

যাবার সময়ে যেন মনের ভুলে এক শিশি উৎকৃষ্ট গোলাপ আতর ফেলে গেলেন। সেটি কুলুঙ্গীতে রাখতে রাখতে মহীপতি বললেন, 'মনে হচ্ছে আলাদা ক'রে কিছু বলতে চাইছিলেন?'

আজিম কাশ্মীরী নীরবে জেবের পকেট থেকে একটি বিবর্ণ কাগজ বের করে।

বাঁদী বিক্রির রসিদ। মরক্কো দেশীয় ব্যবসায়ী, হায়দ্রাবাদের রাজ্যে নিজামের অনুমোদনে দাস বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্ত মির্জাইস্পাহানী চট্টগ্রামের আব্বা কারুকীর কাছে গুলরুখ নামে একটি পনেরো বছরের মেয়েকে বিক্রি করেছে। বয়স পনেরো, স্বাস্থ্য সাধারণ, সৌন্দর্য সাধারণ, বিশেষ কোন গুণপনা নেই, শরীরে জন্মচিহ্ন বলতে কিছু নেই তবে পিঠে একটি গোলাকৃতি পোড়া দাগ আছে। দাম নিজামী মুদ্রায় একান্ন টাকা। পায়ে নিজামী নিজামতের বান্দী ছাপ।

'দাম একান্ন টাকা, পায়ে বাঁদীছাপ।' আজিম কাশ্মীরীর কণ্ঠস্বর এত উত্তেজিত কেন? বিস্মিত মহীপতি প্রশ্ন করেন, 'কি ব্যাপার বলুন ত'?

'মেয়েটিকে আমি চাই।'

'মেয়েটিকে আপনি চান?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। হায়দ্রাবাদ থেকে চট্টগ্রাম, আকিয়াব থেকে মুর্শিদাবাদ, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত খুঁজেছি তা জানেন? কাল জানলাম সে এখানেই আছে, কাশিমবাজার ছাড়িয়ে বানঝাটিয়ার রেশমকুঠির সায়েবের বাড়িতে।

মহীপতি কথা কইলেন না। আশ্চর্য, মানুষ চিনতে কি তিনি ভুল করেছিলেন? লোকটার গায়ের জামা ময়লা হলেও মনটা ধপধপে মনে হয়েছিল। পরিচয়ের প্রগাঢ়তা সে ধারণাকে নষ্ট করে নি। অথচ আজ সেই লোকটাই একটা বাঁদীকে চাইছে।

আজিম কাশ্মীরী তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। চোখ লালচে হয়ে উঠল, নিশ্বাস একটু দ্রুত, নিচু গলায় বললে, 'আপনি যা মনে করছেন তা সত্যি নয়।'

'কি সত্যি? কি সত্যি নয়?'

মহীপতির এ-হেন দার্শনিক প্রশ্নের জবাব আর শোনা হল না। কেন না তখনি রাধাপ্যারীর সংকীর্ণ গলির দু-পাশের কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ জল ছিটিয়ে, ময়দাগোলার দরোয়ানদের গরুকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে হেঁই-হো, হুম্-হো, হেঁই-হো, হুম্-হো শব্দে একটি ঝালর ঢাকা পাল্কী এসে খিড়কী দোরের সামনে দাঁড়ালো।

জগৎপতি আচার্যের পাল্কী।

ত্রস্তে মহীপতি ভেতরে আসেন। বউঠাকরুণ এসেছেন। এ বাড়িতে ধনী গৃহিণীর পদার্পণ কৃচিৎ ঘটে। মহীপতির গৃহিণী স্বভাবসিদ্ধ তড়বড়ে এবং বেহিসেবী মন্তব্য ক'রে বসলেন, 'আজ যে দেখি গরীবের উঠোনে রাজার হাতীর পা পড়ল।'

জগৎ-গৃহিণীর বপুর আয়তন, অহঙ্কারে ফাটো-ফাটো ভাব, কানের আটটি মাকড়ির ঝামটার সঙ্গে উপমাটা এমন লাগসই হ'ল যে, এর থেকেই চমৎকার একটি কলহ সুরু হতে পারত; কিন্তু হস্তিনীর আজ কলহে মন নেই। দেবরের সঙ্গে এমন অসঙ্কোচে সচরাচর কথা কন না, সে হুঁস নেই। চোখ ছলছল, মুখ উদ্বেগে থমথমে, শান্তিপুরে বুটিদারের আঁচল আজ অবহেলে মাটিতে লুটোচ্ছে। আকুল হয়ে তিনি বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে ঠাকুরপো।'

'কি হ'ল? আহা বসুন না, বসুন। ধীরে-আস্তে বলুন।'

'আর ধীরে-আস্তে।' ছ্যাঁচা সোনার অমৃতিপাক বালা দিয়ে কপাল ঠুকে জগৎ-গৃহিণী বললেন, 'এ জন্মে আর শান্ত হব না গো, আমায় বিপদ হতে বাঁচাও। তোমার দাদা কালই ফিরছেন। আমি গেছলাম মুর্শিদাবাদ গঙ্গাস্নানে, ইদিকে ষোলভরা সর্বনাশ। বুনি কারুকে কিছু না বলে চুপিচুপি আঁধারমাণিক পালিয়েছে।'

'তাই বল। শ্বশুরবাড়ি গেছে।'

'হা কপাল। জামাইয়ের লোক যে আজই তার খবর নিতে ছেলের জন্যে কাপড় সন্দেশ নিয়ে এয়েছে। বুনি ত' সেখানে যায় নি? ছেলেটাকে ফেলে কোথায় গেল, অ্যাঁ? কার সঙ্গে গেল? তিনপুরুষে ভঙ্গর ঘরে মেয়ে দেব না, কুলীন জেতের মুখ পোড়াব না, ও ঠাকুরপো, কুলের অহঙ্কারে তোমার দাদা বুনির সর্বনাশটি করলেন।' (ক্রমশঃ)

কমলেশ বসু কোটের পকেটে হাত দিয়ে মাধবীর চিঠিটা অনুভব করছিলেন বার বার। আর একটা চিঠিও ছিলো। সোনালি বর্ডারে ছাপানো বিবাহ-বার্ষিকীর নিমন্ত্রণপত্র। জীবনের ছন্দে অনেক অমিল, বহু অসঙ্গতি, তা এত স্পষ্ট করে বুঝি কোনদিনই বুঝতে পারেন নি।

মাধবী লিখেছে, 'একদিন আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু তারপর বারবার ভুলের মাশুল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগামী-কাল দেখা হবে। কিছু কথা আছে, তখন বলব। —মাধবী।'

এখানে এসে মাধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। প্রসাধনের সযত্ন প্রলেপ মুখে মুখোশের মত আঁটা, সাজসজ্জার অভাব নেই, তবু তার ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি কমলেশের চোখ এড়ায় নি। ভুল সে সত্যিই করেছে। টাকা দিয়ে, বাহ্যিক আড়ম্বরের সমারোহ দিয়ে মনের ফাঁককে ভরানো যায় না, এই অতি সহজ সরল কথাটা মাধবী সেদিন অনায়াসে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু আজ এতকাল বাদে তাকে নতুন করে মনে পড়ল কেন?

'আমাদের হোস্টেস আজ নিজেকে লুকিয়ে রাখছে দেখছি', অপর্ণা লাহিড়ী পেন্সিল আঁকা টানা টানা ভুরু কাঁপিয়ে সশব্দে ঘোষণা করলো। 'আপনি শুনেছি—মাধবীর ওল্ড ফ্লেম। বিবাহ-বার্ষিকী উৎসবে দাম্পত্য-কলহের সূচনা আপনার জন্যই দেখা দিয়েছে নাকি? মিঃ সামন্ত বলছিলেন আপনার নাম মাধবীই জোর করে তালিকায় ঢুকিয়েছিল।'

'আগুনের শিখা যখন নিভে আসে, তখন বুকে ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' কমলেশ বসু বিষণ্ণ হওয়ার ভাণ করলো, 'আর অতীতের কবর খুঁড়ে মানুষের কি-ই বা লাভ। বর্তমানের পানপাত্র আনন্দের উচ্ছল সুরায় ভরে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

'কিন্তু, আপনার ওমর খৈয়ামই বলেছেন—'যে ফুল ঝরেছে একবার, তার আয়ু চিরনিঃশেষ'—তাই না?' অপর্ণা

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

লাহিড়ী সশব্দে হেসে উঠলেন—'এমনও দৃষ্টিভঙ্গী কারো কারো থাকে, যারা কবর খুঁড়েই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দেয়।'

'আমি তাদের দলে নিশ্চয়ই নই—' কমলেশ কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো। অপর্ণা লাহিড়ীকে সে চেনে। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ক্রমশই মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলছে মেয়েটি। বিশেষজ্ঞদের মত, সাবধান না হলে নার্ভস ব্রেক ডাউন হতে পারে। এই হাসছে হয়তো, আবার পরের মুহূর্তে দুঃখ, ক্ষোভ আর অনুশোচনায় ভেঙে পড়বে। যা হতে পারত আর যা হোল না, তারই ফিরিস্তি শুনতে হবে বিষণ্ণ মুখ করে।

'আচ্ছা কিছুক্ষণ আগেই আপনি মাধবীর সঙ্গে বারান্দায় টবে ঝোলানো অর্কিড দেখতে গিয়েছিলেন, যখন ফিরে এলেন আপনাকে ভীষণ অন্য-মনস্ক আর উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আশা-করি, প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে মনোমালিন্য হয় নি কোন কারণে—' কমলেশ কি? না ভেবেই প্রশ্ন করে বসলো।

অপর্ণার মুখ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। হাতে ধরা শরবতের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে নীচু গলায় বলল—'আমার জীবনে শনির মত ওর যোগাযোগ হয়েছিল কমলেশবাবু। আপনি বোধহয় জানেন না, সমরেশ আর আমি প্র্যাকটিকালি এনগেজড্ ছিলাম। ঝড়ের বাতাসের মতো কোথা থেকে এসে সব উল্টো পাল্টা করে দিল। লুক অ্যাট সমরেশ —ওর জীবনটাও নষ্ট হয়ে গেল। এক একবার মনে হয়—'

'কি মনে হয়?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অপর্ণাকে চুপ করে যেতে দেখে কমলেশ হাল্কা করে ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিলো।

'আমি ওর মৃত্যু কামনা করি।' চোখের পাতা বিস্ফারিত করে অপর্ণা। ফিস ফিস করে বলে উঠল—'ঝড় তাহলে থেমে যাবে, ল্যাণ্ডস্কেপ আবার মসৃণ তুলির আঁচড়ে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হয়ে উঠবে। দুটো মানুষকে অসুখী করার অধিকার ওর কখনই নেই। সুনন্দ মিত্রকে লক্ষ্য করেছেন কি?'

এখুনি সুনন্দ আর মাধবীর নাম জড়িয়ে অশোভনীয় কাহিনী রচনা সুরু হবে বুঝতে পেরে কমলেশ উঠে পড়লো। মিসেস মল্লিক তখনও সেই একভাবে বসে। বসন্ত মল্লিক বাঘ শিকার পর্ব শেষ করে এবারে সুশ্রী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীটিকে আফ্রি-কার গভীর জঙ্গলে বুনো হাতীর রোমাঞ্চকর গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলতে সুরু করেছেন। বেশ বোঝা যায় ডোরা ডিসুজা নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে পারছে না, কিন্তু বার

বার বিপন্ন চোখ তুলে ডাঃ বসাকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

'মাধবীকে দেখেছেন মিসেস মল্লিক?' কমলেশ পাশে এসে দাঁড়ালো।

'এই তো কিছুক্ষণ আগে উপরে গেল। মাথা ধরেছে, অ্যাসপিরিন খেতে হবে তাই শুনলাম।' অপ্রসন্ন সুরে মিসেস মল্লিক মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'আমরা বেশ আছি। মাথাই নেই—তার মাথা ধরা।'

বড় হলঘর পেরিয়ে ঘোরানো সিঁড়ির অন্ধকার। আলোয় ধাঁধিয়ে ওঠা চোখের সামনে আবছা কুয়াশার ঢেউ। তবু আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে গেলো কমলেশ বসু। সিঁড়ির রেলিঙের উপর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো মার্বেল পাথরের নারীমূর্তি। নির্মম অবহেলার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের ভাঙা ধূলি-ধূসরিত অবয়বের গায়ে। একটি জীবন্ত মূর্তি নীচু হয়ে কি যেন কুড়িয়ে পকেটে তুলল, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো সামনে। সত্যজিৎ সামন্ত। কমলেশ বসুর সঙ্গে কেবল মুখ চেনা, পরিচয় হয় নি ভালো করে। একটু যেন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর এগিয়ে এসে সহজ ভাবে বললেন—

'আচ্ছা মিঃ বসু, আপনি তো এদের দুজনকেই অনেক দিন চেনেন। মাধবী আর সমরেশ। একটু ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন না। দুটো-পাগলা ঘোড়ার মত ওরা দু-মুখো ছুটেছে। সমরেশ বলে একজনকে সুসাইড করতে হবে, আর মাধবী চায় কোর্টে গিয়ে ডিভোর্সের মামলা করতে। আমি বুড়ো মানুষ, এসব অতি আধুনিক আইডিয়া ঠিক বরদাস্ত করতে পারছি না। কিন্তু খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে মনে মনে। দুজনেই সাংঘাতিক রকম ডেসপারেট হয়ে উঠেছে কিনা।

সত্যজিৎ সামন্ত আর কমলেশ বসুকে সিঁড়ির মুখে কথা বলতে দেখল অনিল, তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে। টেবিলে বুফে ডিনার সার্ভ করা হয়ে গেছে, বড় বড় রূপোর থালায় ও বাটিতে দেশী-বিদেশী নানা খাদ্য-সম্ভার। ডাইনিং রুমের সুইচ নেভানো, বড় বড় মোমবাতির নরম আলো অন্ধকারের বুকে ছোট ছোট ঝর্ণার মত গড়িয়ে পড়ছে। মাধবী না এলে বাইরের গেস্টদের ডাকা যাবে না। প্রথমে দোতলার বারান্দায়, তারপর ঘরে ঘরে খুঁজতে খুঁজতে সমরেশের লাইব্রেরী ঘরের দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো অনিল। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। মাটিতে লুটিয়ে পড়া একটা শরীর। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভেবে অনিল তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ঝুঁকে অবস্থাটা বুঝতে চাইল।

'বিষ—শরবতের গ্লাসে'—টেনে বিকৃত সুরে বলল মাধবী। কার্পেটের কোণ দু' হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ভীষণ যন্ত্রণায় থর থর করে কেঁপে উঠল তারপর।

কয়েক মুহূর্ত যে কি ভাবে কেটেছিল, তা এখন মনেও করতে পারে না অনিল। একবার কাচের জগে রাখা ঠাণ্ডা জল খানিকটা চোখে-মুখে ছিটিয়ে দেবার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কি কিছু লাভ হবে। ডাক্তার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল নীচে দুজন ডাক্তার রয়েছেন। সুনন্দ মিত্র আর ডাক্তার বসাক। পাগলের মত নীচে নেমে সেই অন্ধকার নির্জন সিঁড়ি-ঘরে বিভীষিকার স্বপ্ন দেখে উন্মত্তের মত ছুটে এসে হলঘরের কাছে নিবিঘ্ন নিষ্কম্প ছবিটার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে চিৎকার করে উঠল অনিল।

'ডাক্তার মিত্র কোথায়—কোথায় গেলেন তিনি।'

সমরেশ তার অস্বাভাবিক চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে হাতের তাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

'কি হয়েছে?'

'উপরে লাইব্রেরী ঘরে—' আর কিছু কথা ওর মুখ দিয়ে যেন বেরোতে চাইল না।

'মাধবী?' সমরেশ এবারে এগিয়ে এলো সামনে। 'কি হয়েছে মাধবীর?'

'জানি না—বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

সুনন্দ তখন ঘরে ছিল না, কিন্তু ডাঃ বসাক ডোরাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ি-ঘরের দিকে।

'কোনদিকে লাইব্রেরী ঘর?'

'সোজা উঠে আসুন'—সত্যজিৎ সামন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আগে আগে—'আপনি সমরেশকে পেশেণ্ট হিসেবে দেখেছেন, কিন্তু মাধবীও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। আমি ওদের দুজনকেই বলছি. লম্বা ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে। মানুষের শরীর বা মন কোনটাই মেশিন নয় যে দম দিলেই অনন্তকাল ধরে তাকে চালানো যাবে। নেচার মাস্ট রিভোল্ট।'

'ওঁকে কিছুক্ষণ আগেও দেখলাম, কই তেমন অসুস্থ বলে তো মনে হোল না'—চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন ডাঃ বসাক।

পেছনে ব্যস্ত হয়ে সকলেই উঠে এসেছে। কমলেশ বসু একবার অপর্ণা লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'না, আমিও সে রকম কিছু লক্ষ্য করি নি। হয়তো সারাদিন অতিরিক্ত খাটুনির ফলে হঠাৎ মাথা ঘুরে গেছে।'

'বাড়িতে ব্র্যাণ্ডি আছে ত'? আর গরম দুধ? কিন্তু আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।' আবার ব্যস্ত আগ্রহে সকলে লাইব্রেরীর দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু দেখার আর প্রয়োজন হল না। মাটিতে ঝুঁকে বসে হাতটা একবার তুলে নাড়ী পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার বসাক তারপর ঘরময় ছড়ানো শরবতের গ্লাসের সবুজ কাচের টুকরোর দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মানুষের জীবন ঠিক ঐ ঠুনকো কাচের মতই ক্ষণভঙ্গুর। সময় ফুরোলে ঠিক ঐ ভাবেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

'কি হল?' সত্যজিৎ সামন্ত ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন সামনে। মাথা নাড়লেন ডাক্তার বসাক।

'কি হয়েছিল?' করোনারি অ্যাটাক—না আর কিছু?'

'এদের বাড়ির ডাক্তারকে খবর দিন। আমি ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না, আন্দাজে কি বলব? কিন্তু আই অ্যাম নট লাইকিং দি লুক অফ ইট। আপনারা সকলে দয়া করে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান—হয়তো পুলিশকেও একটা খবর দিতে হতে পারে।'

'পুলিশ?' সত্যজিৎ সামন্ত অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ফিরে তাকালেন—'মাপ করবেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

জবাব না দিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিলেন ডাঃ বসাক। অনেকগুলো সচকিত বিস্মিত ভয়ার্ত চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, তবু ধীর স্থির ভাবে একটিও কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করলেন।

আশ্চর্য, সুনন্দ মিত্রকে কোথাও পাওয়া গেল না। অথচ কিছুক্ষণ আগেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই তাকে দেখেছে। নীচে যেখানে পোর্টিকোর পাশে সারি সারি গাড়িগুলো দাঁড় করানো ছিলো, সেখানে সেই শ্যাওলা-সবুজ রং গাড়িটা ঠিকই এক পাশে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে। রামবিলাস অথবা অন্য চাকর বা মালী গেটক দিয়ে কাউকে বাইরে যেতে দেখে নি।

'মিঃ সরকার, আমি আপনাকে খুবই দুঃসংবাদ শোনাতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার স্ত্রী—'

'মাধবী?' আচ্ছন্নের মত সোফায় এলিয়ে দেওয়া শরীরটা এতক্ষণে নড়ে উঠল।

'মাধবী আর নেই—শি ইজ্ ডেড—' সত্যজিৎ সামন্ত হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন।

'জানতাম আমি জানতাম।' সমরেশ অসহায় চোখ মেলে তাকালো সমবেত সকলের দিকে।

'আমার নিজের মতে এই মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না'—ডাঃ বসাক সত্যজিৎ সামন্তর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। টেকনিকাল আলোচনা করে এখন শুধুই সময় নষ্ট হবে। পুলিশের কাছে আগে ফোন করে দেওয়া হোক। আর ডাঃ মিত্রকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আর একজন মেডিক্যাল ম্যানকে খবর দিয়ে দিন।'

'আমরা বরং বাড়ি ফিরে যাই—' মিসেস বসন্ত মল্লিক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর স্বামী আর ডোরা ডিসুজার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। 'তখুনি তোমাকে বলেছিলাম এসব গোলমেলে জায়গায় গিয়ে কাজ নেই। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়তে হবে বুড়ো বয়সে, সেই তোমার কপালে আছে।'

হুইস্কির নেশা বোধ হয় ছুটে গিয়েছিলো, কেমন ভীত ত্রস্ত ঘোলাটে চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন বসন্ত মল্লিক।

'মাধবী তাহলে সুইসাইড করল'—অপর্ণা লাহিড়ীর কাঁপা কাঁপা গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হোল নিস্তব্ধ ঘরের দেওয়ালে। অপর্ণার মুখ ছাই-এর মতো সাদা, ওর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে।

'হতেও পারে'—নীরস গলায় ডাঃ বসাক বলে উঠলেন। 'কিন্তু আপনারা এখন কেউ এ-ঘর ছেড়ে যাবেন না। পুলিশের তাতে আপত্তি হতে পারে। তবে সকলেরই নার্ভ ও মনের উপর যথেষ্ট চাপ পড়েছে। আমার মতে বেশ কড়া কয়েক কাপ কফি ও তার সঙ্গে দু-এক রকম বিস্কিট আনিয়ে নিন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না—মিঃ সামন্ত অলরেডি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

সবাই চুপচাপ বসে ছিল ড্রইংরুমে। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটার পরে এবারে সকলে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ঝাড়লণ্ঠনের উগ্র উজ্জ্বল আলো ঝলমল করছে ওদের হাতে ধরা কফির পেয়ালার তরল গাঢ় রঙের উপর। দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির সেই একটানা অশ্রান্ত শব্দের রেশ। প্রত্যেকটি মানুষ যেন প্রাণহীন ধূলি-ধূসরিত মূর্তিগুলোর মতো বোবা হয়ে গেছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রামবিলাস, তার চোখেও একটা অব্যক্ত অনুভূতির আভাস। মিঃ ভাণ্ডারকরের পাঠানো সেই রক্ত গোলাপের সাজি তুলে রাখার কথা কারো মনে হয় নি। ফুলগুলো ক্রমশ যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, পাপড়ি খসে পড়ছে একটি-দুটি করে।

হঠাৎ সেই নিষ্কম্প অচঞ্চল মুহূর্তকে চুরমার করে সুনন্দ মিত্র ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের মধ্যে বসে বোঝা যায় নি, বাইরে হঠাৎ ঝড় উঠেছিল, প্রচণ্ড হাওয়ার বেগে বৃষ্টির জল ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছিল আচমকা উল্লাসে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে

সুনন্দ মিত্রের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

'কোথায় ছিলেন আপনি ?' সত্যজিৎ সামন্ত তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন।

'আমি, মানে এই একটু বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কেমন হাঁপ ধরছিল'—স্পষ্টই বোঝা যায় কৈফিয়ৎ বানিয়ে বলতে হচ্ছে আমতা আমতা করে, 'হঠাৎ যে এমন বৃষ্টি এসে পড়বে বুঝি নি। আর এতো দেরি হয়ে গেছে, তাও বুঝি নি। খাবার টেবিলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে যে বসে থাকেন নি কেউ—

কথা বলতে বলতেই লক্ষ্য করল সুনন্দ, ওরা কেউ কোন কথা জানতে চাইছে না। প্রত্যেকের মুখে বিস্ময়ের বদলে নিরাসক্ত ভাব। কি যেন ভাবছে ওরা সকলে।

'একবার উপরে চলুন ডাঃ মিত্র', বরুণেন্দ্র বসাক ওর কাঁধে হাল্‌কাভাবে হাত রাখলেন।

'আপনি ঠিকই বলছেন ডাঃ বসাক।' পুলিশ ও-সি রামদুলাল দত্ত মোটা ভুরু কাঁপিয়ে বলতে সুরু করলেন—'সিম্‌পটম্‌ শুনে এই মৃত্যুকে ঠিক ন্যাচারাল বলতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি যখন প্রথম দেখলেন, তখন কি প্রাণ ছিল ?'

'না', ডাঃ বসাক মাথা নাড়লেন—'দুর্ভাগ্যক্রমে তার অল্প আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।'

'তাহলে এটা যে পয়জনিং কেস, সে কথা আপনার মনে হোল কেন।'

'মৃত্যুর আগে ভদ্রমহিলাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এমন কি কার্পেটের একটা অংশ হাতের মুঠোয় প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা ছিল, যেটা ছাড়াতে আমাদের দস্তুরমত বেগ পেতে হয়েছিলো।'

'কি ধরণের বিষ, বলতে পারেন কি ?' রামদুলাল দত্ত আবার প্রশ্ন করলেন।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বরুণেন্দ্র বসাক বললেন—'আন্দাজে হয়তো বলা উচিত নয়, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে ভদ্রমহিলা বমি করেছিলেন। তাতে একটা অস্পষ্ট গন্ধের আভাস ছিলো। অয়েল অফ বিটার আমণ্ড বলেই মনে হোল আমার। তাতেই মনে হয় হয়তো—'

ভারি অ্যাশট্রেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে রামদুলাল দত্ত ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'সায়ানাইড।' বরুণেন্দ্র বসাক গলা নামিয়ে বললেন, 'অবশ্য একেবারে নিশ্চয়ই করে বলা যায় না। সে জন্যে পোস্টমর্টেমের প্রয়োজন রয়েছে।'

'কেস অফ সুইসাইড'—এবারে রামদুলাল দত্ত সত্যজিৎ সামন্তের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

উত্তেজনা আর আশঙ্কায় ভদ্রলোক কেমন মিইয়ে গেছেন। কোন গতিকে গলা ঝেড়ে ঢোঁক গিলে বললেন—'সম্ভবত তাই। এদের পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না।'

'কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেছে কি ?' সকলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন রামদুলাল দত্ত। তারপর মুখ ফিরিয়ে দুজন ইন্‌সপেক্টারকে নীচু গলায় লাইব্রেরী আর উপরের বাকি ঘরগুলো সার্চ করার অর্ডার দিলেন।

'অথচ আজ আমরা ওদের দুজনের বিবাহ বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করেছিলাম, কি ভীষণ ট্র্যাজেডি'—সত্যজিৎ সামন্ত আক্ষেপের সুরে বলতে সুরু করলেন—দিস ওয়ার্লড্ ইজ এ স্টেজ আর আমরা হচ্ছি অসহায় দড়ি বাঁধা পুতুল। ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যাবে, সেদিকেই যাব।'

'আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।' রামদুলাল দত্ত বিচিত্র হাসি হাসলেন—'আজীবন ক্রিমিনালদের নিয়ে কাজ করে এটুকু বুঝেছি মানুষ অনেক ক্ষেত্রে নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। লোভ, হিংসা, কামনার তাড়নায় অন্ধ পশুর মত সে কেবল অপরের সর্বনাশই করে না, নিজের চরম ক্ষতিও ডেকে আনে। যাই হোক, পোস্টমর্টেমের আগে কোন কাজ হয়তো এগোবে না। তবু আজকে আপনাদের সকলকে এক এক করে প্রশ্ন করব। দয়া করে আপনারা পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। ডেকে পাঠালে আসতে যেন দেরী না হয়।'

সারিবদ্ধ হয়ে একে একে সকলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। রাত তখন দেড়টা। মেঘের কালো অন্ধকার সরে গিয়ে ফিকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক রচিত কয়েকখানি ভাল বই

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী

৬ষ্ঠ ভাগ—৷৷০

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

মায়াদেবী বসুর—

আঁখির ভুলে ৸০

সরসীবালা বসুর—

শিবানী ৷৷০

বিজনপ্রভা দেবীর—

দাড়ী মাহাত্ম্য ৷৷০

চারুবালা বসুর—

পতিব্রতা ৷৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

● কলকাতা বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান-বিধ্বংসী জাহাজ 'ব্রহ্মপুত্র'।

রাজধানী :

ক'দিন থেকে শহর কলকাতার আকাশে চলেছে মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলা। সকালের দিকে দিকচক্রবালে প্রথম ফুটে ওঠে প্রসন্ন হাসি। তারপরই আকাশ হয়ে ওঠে গোমড়ামুখী। কয়েক পশলা ঢেলে দিয়ে আবার ওঠে একটু হেসে। স্নিগ্ধোজ্জ্বল পরিবেশ চলে বেশ কিছুক্ষণ। দুপুর গড়াতে-না-গড়াতে ঘন কালো মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে যায় আকাশের। বিকেলের দিকে সুরু হয় অঝোরে বৃষ্টি। সে বর্ষণে কলকাতা পরিণত হয় একটা ভাসমান নগরীতে। চরম দুর্দশায় পড়ে শহরের মানুষ। বাস চলে রুট বদল করে। ট্রাম চলাচল অধিকাংশ রুটেই বন্ধ হয়ে যায়। খপ্-খপ্, ছপ্-ছপ্ আওয়াজ তুলে জুতো হাতে চলতে হয় আফিস-ফেরৎ ঘরমুখো মানুষকে। ভাগ্যবান, বিত্তশালী যাঁরা তাঁদের দ্রুতগামী মোটর পাশে পাশে চলে পথের ময়লা জল ছিটিয়ে। মোটরের চাকার আঘাতে নিক্ষিপ্ত কর্দমাক্ত জলে জামা-কাপড় সিক্ত হয় অনেক পথিকের। ফুটপাথের বাজারের ওপর যাদের জীবন নির্ভর করে তাদের আর দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

প্রাক্তন বৃটিশ ভারতের দ্বিতীয় সুন্দরী নগরী, স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম মহানগরীর নাগরিক জীবন পৌরপিতাদের এবং সরকারের অকর্মণ্যতায় আজ বিপর্যস্ত। এ-অবস্থা আগের দিনে ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বছরের পর বছর নাগরিক জীবনের দুর্গতি বেড়েই চলেছে। পৌর-ভবনের সভাকক্ষে এ-নিয়ে মাঝে মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়, তাও নয়। গরম হাওয়া কিছুটা উদ্গীরণ করেই সকলে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েন। কলকাতার জল নিকাশের জন্য ৩৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার পরিকল্পনাও একবার রচিত হয়েছিল। ফাইলবন্দী অবস্থায় জমাট ধুলোর তলায় তা' এখন কোথায় চাপা পড়ে আছে, তার খবর হয়তো কর্তাদের সকলের জানাও নেই। ওদিকে বানতলার আউটফলেও ব.ন ডাকার অবস্থা দেখা দিয়েছে। কলকাতা করপোরেশন তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে নারাজ। সেটাকে হস্তান্তর করা হবে সরকারের হাতে। অথচ হস্তান্তরের পাকাপাকি ব্যবস্থাও হচ্ছে না। পৌরপিতাদের দৌলতে যে-কোনদিন শহর কলকাতার জল-নিকাশী নর্দমার জল উল্টো মুখে প্রবাহিত হয়ে শহর ভাসিয়ে দিলে অভাবনীয় কিছু ঘটবে না। শহরবাসীকে আগে-ভাগে তার জন্য প্রস্তুত থাকাই উচিত হবে।

*　　*　　*

আকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন আমাদের সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরা। লুকোচুরি খেলা চলছে ব্যবসায়ী মহল আর সরকারী মহলের মধ্যে। মাঝে-মধ্যে কর্তারা শোনাচ্ছেন আশার কথা। এমন ভাব-ভঙ্গী তখন তাঁরা দেখান যেন সকল মুস্কিলের আসান হতে আর দেরি নেই—মুনাফাবাজ সায়েস্তা হয়ে যাচ্ছে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম শীগ্গিরই নেমে যাচ্ছে হু-হু করে। তারপরই আর সে-কথার মূল্য থাকে না—কাজ হয় না কথা অনুযায়ী কালোবাজারে নতুন করে দেখা দেয় মেঘের ঘনঘটা। সে মেঘে ঢাকা পড়ে যায় সব আশার আলো। দিন কয়েক সবাই অবলম্বন করেন নীরবতা। তারপরই সরব হয়ে বলেন নতুন কথা।

তেল কম খাওয়ার উপদেশ এবং তেলের দাম না-বাড়াবার হুমকীর পর বাজার থেকে তেল গেল বিলকুল উধাও হয়ে। ফয়দা কিছুই হল না দেখে আবার কর্তারা মতলব করেছেন, তেলের দাম বাড়িয়ে দেবেন। তেলের কারবারীরা আবদার করেছেন, এবারে আর পঁচিশ পয়সা নয়, পঞ্চাশ পয়সা বাড়িয়ে তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা করতে হবে।

খোলাবাজারে চালের দাম হয়েছে প্রতি কে-জি এক শ' থেকে এক শ' দশ পয়সা। নয় লক্ষের অধিক রেশন কার্ড বাতিল হওয়ায় সরকার একটু ভরসা পেয়েছেন। এই কার্ডগুলোর জন্য চাল উদ্বৃত্ত হচ্ছে। সেগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ চালের পরিমাণ, আর এক সপ্তাহ বিচার-বিবেচনার পর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এতদিন এই রেশন কার্ডগুলো ধরে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে চাল বিলির যে-হিসেব সরকার পরিবেশন করে আসছিলেন, সে-চালের সঠিক তথ্যও সরকার বাহাদুরের কাছে মানুষ দাবী করে। এ-কার্ডগুলোতে নিশ্চয়ই কেউ কোন-কালে চাল-গম নেয় নি। অথচ চাল সরকার সরবরাহ করে গেছেন।

না করে থাকলে, সরকার সঠিক তথ্য পরিবেশন করেন নি—মানুষকে ধাঁওতা দিয়েছেন। কোনটা সত্য? সরকারের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া উচিত হবে।

ব্যবসায়ীদের সরকার সায়েস্তা করতে পারছেন না। তাঁরা নাকি উড়িষ্যায় গিয়ে জমিয়ে বসেছেন। সোজা কথায় সরকার ব্যবসায়ীদের চালে মাৎ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছে সরকারের সকল চেষ্টা। মানুষ ভেবে পাচ্ছে না কোন কূল-কিনারা। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এ-নমুনা নিশ্চয়ই গৌরব-জনক নয়। ক্ষুধার অন্ন মানুষ না পেলে সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার জয়গান নিশ্চয়ই করবে না।

* * *

ব্রহ্মপুত্র কলকাতায় এসেছে। ভারতীয় নৌবহরের বিমানধ্বংসী রণতরী আই-এন-এস ব্রহ্মপুত্র কলকাতা বন্দরে এই প্রথম এলো। আড়াই হাজার টন তার ওজন, লম্বায় ৩৪০ ফুট। ভারতীয় নৌবহরের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং রিয়ার এডমিরাল বি এ স্যামসনের পতাকাবাহী জাহাজের বুকে বসানো রয়েছে ৪·৫ ইঞ্চি কামান। এ-রণতরীর কমাণ্ডার হচ্ছেন ক্যাপ্টেন এস এইচ শর্মা।

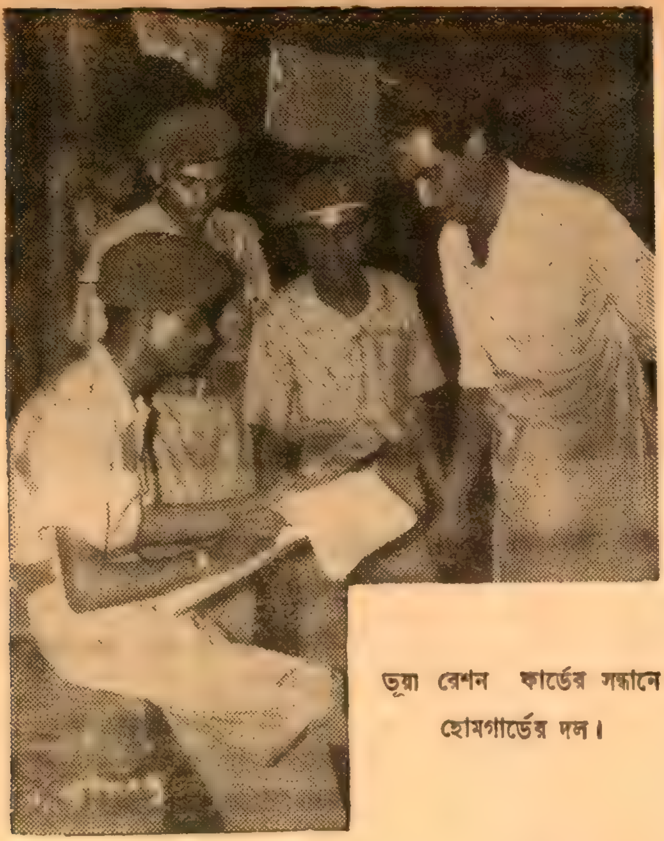

ভুয়া রেশন কার্ডের সন্ধানে হোমগার্ডের দল।

কুচবিহার:

দলে দলে আবার উদ্বাস্তু আসছে পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানত্যাগী জনস্রোত জুন মাসে একটু কমে ছিল। জুলাই মাসের গোড়া থেকেই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে। গেল এক সপ্তাহে দিনহাটায় উদ্বাস্তু এসেছে প্রায় এক হাজার। এদের অধিকাংশই ময়মনসিংহের মানুষ। ফরওয়ার্ড ব্লক পরিচালিত বে-সরকারী আশ্রয়শালায় দু-চারদিন অবস্থানের পর নবাগত উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়ছে আসামে এবং উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

কুচবিহারের মানুষের আর্থিক দুর্গতির বিষয় আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সে সময়ে একথাও বলেছি সম্পূর্ণ কৃষি-নির্ভর এই জেলায় শিল্প গড়ে তুলে মানুষের জীবিকার নতুন নতুন পথ খুলে না দিতে পারলে চীনের চেলাদের পীঠস্থান হবে কুচবিহার। সেখান থেকে সারা উত্তর বাংলায় চীনাপন্থীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে।

দিনহাটা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে চীনাপন্থীরা সম্প্রতি কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ঘরোয়া সভা হচ্ছে প্রায় প্রতি রাত্রিতে কমিউনিস্ট কর্মীদের। সেখানে 'মহান চীনের' মহিমা কীর্তন হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে, চীনের কোন অপরাধ নেই—কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কখনো স্বেচ্ছায় ভারত আক্রমণ করতে পারে না। অপরাধ ভারত সরকারের। সামান্য সীমান্ত বিরোধকে ভারত সরকার নিজের ভুলে বিরাট সংঘর্ষে পরিণত করে তুলেছেন। কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটি সভাও হয়েছে। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিম বাংলা বিধান সভার সদস্য শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার। ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপার নিয়ে তিনি আপত্তিকর মন্তব্য করলে সভায় অসন্তোষের সৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সভার কাজও তিনি চালিয়েছিলেন।

কুচবিহারের মানুষের অভাব-অভিযোগের প্রতি রাজ্য সরকারের তাচ্ছিল্যের মনোভাব চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে কমিউনিস্টদের ঠেকানো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।

সরকার একটু সচেতন হলে বিনা অর্থ ব্যয়ে অতি সহজে মানুষের অনেক কষ্টই লাঘব করতে পারেন। হলদিবাড়ি থেকে কুচবিহার সদরে যাওয়ার কোন সুবিধে নেই। বর্ষায় তিস্তা হয় অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। খেয়া নৌকো আকাশের অবস্থা বুঝে অনেক সময় বিপদের ঝুঁকি নিতে চায়না।

এই নদী পার হয়ে অথবা নিউ-জলপাইগুড়ি জংসন ও আলিপুর-দুয়ার জংসনে গাড়ি বদল করা ছাড়া হলদিবাড়ির মানুষের কুচবিহার যাওয়ার আর কোন সহজ পথ নেই। সহজ পথ করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। হলদিবাড়ি থেকে জলপাই-গুড়ির দূরত্ব ১৬ মাইল মাত্র। জলপাইগুড়ি থেকে কুচবিহার শহর অবধি স্টেট বাস চলছে নিয়মিত। হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির মধ্যে রয়েছে পাকা, প্রশস্ত রাজপথ। সরকারের সদিচ্ছা হলে জলপাইগুড়িতে যে-বাস কুচবিহার থেকে বেলা তিনটায় এসে পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত পড়ে থাকে, তাকে হলদিবাড়ির যাত্রী আনতে পাঠাতে পারেন। আমরা এ-বিষয়টি সম্পর্কে পরিবহন দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২৪ পরগণা :

শিবিরত্যাগী সর্বহারা কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার যাযাবরের মত জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা প্রভৃতি অঞ্চলে। এদের সামান্য তৈজসপত্র পেটের দায়ে হাতছাড়া হয়েছে। বাঁচার তাগিদে এরা যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। লঞ্চ ও রেলের যাত্রীদের মাল বইতে, দিনমজুরের কাজ করতে এবং গৃহভৃত্যের কাজ সংগ্রহের চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে। অর্ধাহারে, অনাহারে শীর্ণকায় মানুষ-গুলো ছায়ামূর্তির মত দ্বার থেকে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে কারো মায়ার উদ্রেক করতে পারে নি। সরকারও উদাসীন। সামান্য সহানুভূতির কথাও এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর কাছে গিয়ে বলবার কেউ নেই। স্থানীয় বি-ডি-ওর কাছে সাহায্যের প্রার্থী হয়ে কোন ফল হয় নি।

এরা এসেছে মানা, কুরুদ, মওগাও, চুনাপুটি ও উড়িষ্যার সোনাবেড়া শিবির থেকে। অপরাধ এদের যথেষ্ট—সরকারী ভাষায় হয়তো অমার্জনীয়। সরকার বাহাদুর আশ্রয় একবার দিয়েছিলেন। সে আশ্রয়শালায় নিদারুণ অব্যবস্থায় টিকতে না পেরে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে অর্বাচীনের মত। দরিদ্র নীচের তলার মানুষ এরা। আমাদের শাসকদের মত বিবেকবুদ্ধি সকলের থাকা সম্ভব নয়—এদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কাজেই কর্তাদের মর্জিমাফিক চলতে পারে নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, এই উদ্বাস্তু পরিবারের নরনারীরা নিশ্চয়ই অপরাধী। কিন্তু একথাও সত্যি যেদিন তারা, পাকিস্তান থেকে এসে সরকারের খাতায় নাম লিখিয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিল সেদিন

আভা মাইতি

থেকে এরা ভারতের নাগরিক। আমাদের ত্রাণমন্ত্রী শ্রীআভা মাইতির কি দুঃস্থ, নিঃসম্বল, কপর্দকহীন এই শিবির-প্রত্যাগত পরিবারের মানুষ-গুলোর প্রতি কিছুই করণীয় নেই? তিনি কি এদের কাছে গিয়ে একটু সহানুভূতির মন নিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার শিবিরে পাঠাবার চেষ্টা করে-ছিলেন? তা' না করে থাকলে, আসনটি দখল করে বসে থাকবার কোন অধিকার তাঁর আছে কি? এ-প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক, স্বাধীন দেশের আর্তের, দুর্গতের দুঃখ মোচনের দায়িত্ব তাঁর। জনকল্যাণ রাষ্ট্রের জনগণের সেবার মহান কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে তাঁর ওপর। তাঁর অবহেলা ও তাচ্ছিল্যে কুকুর-বেড়ালের মত মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরলে, কেউ তাঁকে ক্ষমা করবে না।

* * *

অচ্ছিন্য, ঔদাসীন্য অবশ্য আমাদের সরকারের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকারের প্রায় প্রতিটি দপ্তরেই তাই অবস্থার চূড়ান্ত চিত্র নজরে পড়ে সকলের আগে। সেচ দপ্তরের গাফিলতিতে, যথাসময়ে কর্তব্য পালনের অক্ষমতায় সুন্দরবনের চাষীদের সর্বনাশের কথা গেল সপ্তাহে আমরা এক দফা বলেছি। এবারে অভিযোগটা বাসন্তী মণ্ডল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করেছেন। বাসন্তীর ছোট গেঁওখালি এবং রাধাবল্লভপুরের জল নিকাশের দুটি সুইস গেটই অকেজো—মেরামত চলছে তিন মাস ধরে। এদিকে বৃষ্টির জলে মাঠ ভরে গিয়েছে। বীজ ধানের চারা জলের তলায় পড়ে পচে গিয়েছে। যে-গুলো একটু বেশি মাথা তুলেছিল তাও ক'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। বাসন্তী, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর, কালিডাঙা, বল্লারটোপ, রাধাবল্লভ-পুর ইউনিয়নের কয়েক হাজার জমির চাষ এখন সর্বনাশের মুখে। যাদের অবহেলায়, যাদের গড়িমসিতে এই সর্বনাশটা হতে চলেছে তাদের কোন উদ্বেগ নেই। বিচিত্র এ-দেশ। এদিকে চলেছে ফলন বাড়াবার ফলাও প্রচার, অপরদিকে প্রশাসনের অযোগ্যতায় আবাদী জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে, আবাদী জমি পরিণত হচ্ছে অনাবাদী জমিতে।

বর্ধমান :

দুর্গাপুর স্টেশনের নতুন গৃহের উদ্বোধন করে গেলেন রেল দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিংহ। প্রাণচঞ্চল শিল্প-নগরী দুর্গাপুরের যাত্রী-সাধারণের সুবিধার জন্য এরূপ একটি ভবনের প্রয়োজন ছিল। বছরে সেখানে প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ যাত্রী এবং আট

● দুর্গাপুর রেল স্টেশনের নতুন ভবন

হাজার ওয়াগন ভর্তি মাল চলাচল করে। এ-ছাড়া, রয়েছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও কোক ওভেন কারখানার মাল। দুর্গাপুর গড়ে ওঠার আগে খু সামান্য সংখ্যক যাত্রীই যাতায়াত করতো।

এক শ' বছর আগে এখানে পত্তন হয়েছিল ছোট্ট এ টি স্টেশনের। ব্যয় হয়েছিল তখন সাড়ে একুশ হাজার টাকা। নতুন গৃহ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

ডঃ রামসুভগ সিংহ উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, দেশের দ্রুত শিল্পায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে মাল পরিবহনের ওপর রেল সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেও যাত্রী চলাচলের সুযোগ-সুবিধার জন্যও তারা সচেষ্ট।

যাত্রীদের সুবিধা বিধানের জন্য রেল দপ্তর একেবারে কিছু করেন নি, বললে অন্যায় হবে। কিন্তু তা' প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। লোক্যাল ট্রেনগুলোর অধিকাংশ চালান হয়ে থাকে বাতিল-করা ইঞ্জিন ও কামরা দিয়ে। এবারের বর্ষার সুরু থেকেই অনেক যাত্রীকে রেলের কামরায় বসে ভিজতে হয়েছে। যাতায়াতের অন্য সুখ-সুবিধার কথা না তোলাই ভাল। অন্তত যথাসময়ে গাড়িগুলো চলাচল করলে লোক্যাল ট্রেনের যাত্রীদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হবে। রেলের কামরায় আলো না-থাকা, অচল পাখাগুলো ঝুলিয়ে রাখা এবং ভাঙাচোরা বসবার আসন রেল দপ্তরের যাত্রীদের প্রতি দরদের সাক্ষ্য দিচ্ছে না।

* * *

দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সব চাইতে দুর্গতির মধ্যে পড়েছে কালনা মহকুমার গ্রামাঞ্চলের মানুষ। ক্ষেত-মজুর, দরিদ্র চাষী ও দিন-মজুরের দল পড়েছে বেশি বিপদে। এদের ঘরে না আছে খাদ্য মজুত, না আছে বেশি দামে খাদ্য কেনবার মত পর্যাপ্ত অর্থ। সরকার সম্প্রতি কালনা শহর ও পূর্বস্থলীতে চালু করেছেন সংশোধিত রেশনের ব্যবস্থা। সে-ব্যবস্থায় ৭৫ পয়সার অধিক করদাতা রেশন গ্রহণের অধিকারী নয়। পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর করভার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সকলের বেলাতেই। কাজেই অধিকাংশ পরিবার বঞ্চিত হয়েছে রেশন গ্রহণের অধিকার থেকে। রেশন প্রথা চালু হওয়ার আগে মানুষ যে-তিমিরে ছিল—চালু হওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আর আলোর মুখ দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। সরকারের সুযোগ্য আমলাদের বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অভাবের তাড়না মানুষকে করে বিপথগামী। সে তখন সদাচারের বুলি আওড়াতে যায় ভুলে—হয়ে পড়ে ভ্রষ্টাচারী। চুরি, পরস্ব-অপহরণ ও ডাকাতি হয় সুরু। কালনার মন্তেশ্বর থানায় এর মধ্যে দু-দুটো ডাকাতি হয়েও গেছে।

* * *

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নিকটবর্তী গ্রামের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী শ্রীদামোদর খেমানী সেদিন নিহত হয়েছেন ডাকাতের গুলীতে। খেমানীকে হত্যা করে নগদ টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে তারা পালিয়েছিল। পুলিশ খবর পেয়ে তাদের সতের জনকে গ্রেপ্তারও করেছে।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস মূল্য ৩৷৹ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৹

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

রঙ্গজগৎ

● 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিতে
সঞ্চিতা ব্যানার্জী।

নাট্যজগতের অপূরণীয় ক্ষতি

সাংস্কৃতিক জগতে একটি জ্যোতিষ্ক পতন হয়েছে। ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতের নাট্যজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ডঃ চৌধুরী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার গবেষক হিসাবে শিক্ষাজগতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে নতুন জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ নাট্য আন্দোলনে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে একালের মানুষের পরিচয় ঘটাবার জন্য তিনি প্রথমে কালিদাস প্রমুখ প্রাচীন ভারতের নাট্যকারদের যথাযথভাবে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে উপস্থিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় সংলাপ এবং সঙ্গীত তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর নিজের রচিত সংস্কৃত নাটকে মীরাবাঈ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত বহু মহাত্মার জীবন-চরিতের নাট্যরূপ দান করেন। এমন কি সংস্কৃত ভাষায় বর্তমান ভারতের রূপ ও পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি নাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন। তাঁর এই আধুনিক সংস্কৃত নাট্য-প্রচেষ্টায় তিনি সদলে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। মাদ্রাজ থেকে দিল্লী, বোম্বাই থেকে কলকাতা তাঁর রচিত নাটক অভিনীত হয়েছে। একালে আর কেউ তাঁর মত এত অধিক সংখ্যক নাটক রচনা করেন নি, তাঁর রচিত সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক।

ডঃ চৌধুরীর সংস্কৃত নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষার সরলতা। যাঁরা বাংলা বোঝেন তাঁদের পক্ষে এই সরল সংস্কৃত বুঝতে অসুবিধা ছিল না। দক্ষিণ ভারতেও তাঁর নাটক সমাদৃত হয়েছে। এই নাট্য-প্রচেষ্টায় ডঃ চৌধুরী প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ঐতিহ্যকে তিনি আধুনিক মানুষের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর এই নাট্য-কীর্তি অবিস্মরণীয়। আমরা এই মঞ্চকীর্তির কথা মনে রেখে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। —সুজন।

বার্লিনে একটি অনন্যসাধারণ ছবি

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'মহানগর'-এর জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন। ছবিটি সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের' বিশেষ সংবাদদাতা সিন্থিয়া গ্রেনিয়ের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন (২রা জুলাই)।

"এবারের ১৪শ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব জাঁকজমকে, শ্রেষ্ঠ চিত্র সমাবেশে ক্যান্স এবং ভেনিসকে নিষ্প্রভ করে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। প্রধান-মন্ত্রী উপস্থিত থেকে উৎসবের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করেছেন।

আজ (১লা জুলাই) বার্লিন উৎসব ভারতীয় পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর'-এর মত ছবি উপস্থিত করে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'অপু চিত্র' ও 'দুই কন্যা'র দ্বারা দর্শকদের কাছে সুপরিচিত।

'মহানগর' এমন একটি বাস্তবধর্মী চিত্র যা ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেক তরুণ দম্পতির নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তারা স্বীকৃত; স্ত্রী প্রথম চাকরীতে যাচ্ছে স্বামীর সংসারে সহায়তার জন্য। এটা সর্বদেশের চিত্র, কিন্তু শ্রীরায় সার্বজনীনতা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না করে আশ্চর্যজনকভাবে ভারতীয় মেজাজে রক্ষা করেছেন।

তরুণী স্ত্রী চাকরী পাবার পর নিজের উপর আত্মবিশ্বাস লাভ করে, স্বামী বিরক্ত হয়ে ওঠে; এ নিয়ে দু-জনার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীরায় এই পরিস্থিতি ও মানসিকতা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোভাব, সন্তানের প্রতি তাদের মা-বাবা বা শ্বশুর-শাশুড়ির মনোভাব এবং তাঁদের ছেলের বৌয়ের প্রতি মনোভাব এমন বুদ্ধি দিয়ে ও এমন অনুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তা আশ্চর্যজনক নতুনত্ব লাভ করেছে; যেন সদ্যোজাত সন্তানের মত তাজা। এই ছবির সব কিছু—অভিনয়, চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত। এটা এমন একটি ছবি, যা দেখার পর আপনি পরম তৃপ্তি লাভ করবেন, একটা ভাল শিল্পকর্ম দর্শনের আনন্দ লাভ করবেন।"

নাটকের কথা

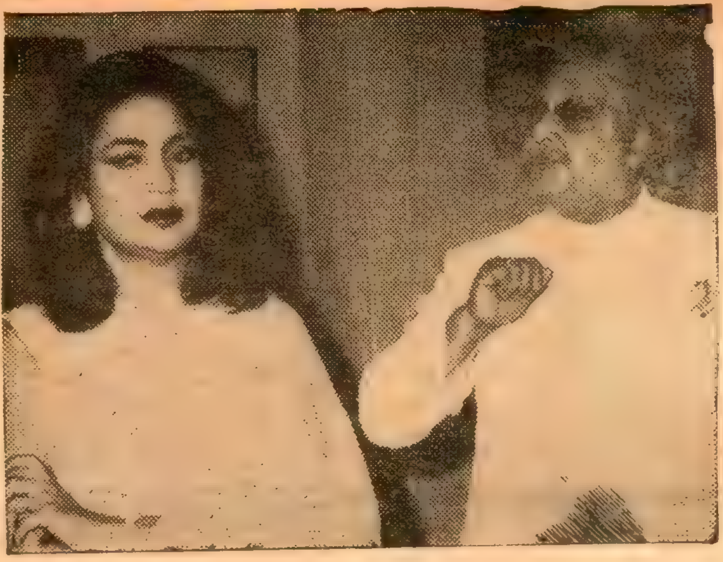

● স্টার থিয়েটারে 'তাপসী' নাটকে মঞ্জু দে ও শ্যাম লাহা

পশ্চিম স্বর্গ

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সীমান্তিক শাখার উদ্যোগে গত ১২ই জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে 'পশ্চিম স্বর্গ' নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন চিররঞ্জন দাস। তিনি মিঃ জেমসের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন।

সুসভ্য আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যের কথা আজ কারো অজানা নেই। বর্ণ-দলনের জন্য সেখানে যে কেবল নিগ্রোরা অসহায়ভাবে প্রাণ হারায় এমন নয়, এযাবৎ দু-জন প্রেসিডেণ্টকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। আজো সেখানে নিগ্রোরা সকল রেস্টুরেণ্টে যেতে পারে না, নিগ্রো ছেলেমেয়েরা শ্বেত আমেরিকানদের স্কুলে পড়তে পারে না। সম্প্রতি আমেরিকার মত ধন ও সভ্যতা-গর্বী দেশে বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আইন পাশ করতে হয়েছে; কিন্তু আইনের স্বীকৃতি এখনো শ্বেত আমেরিকানরা দিচ্ছে না। 'পশ্চিম স্বর্গ' নাটকে এই বর্ণ-বিদ্বেষের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে; বর্ণ-বিদ্বেষের বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে বর্তমান আমেরিকার একটি কলঙ্কজনক দিকের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগে এই বর্বর মানসিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে নাট্যকার প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এই নাট্য-প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।

কিন্তু নাটকটি যেমন রচনায় তেমনি অভিনয়ে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। রচনার দিক থেকে নাটকটিতে বর্ণ-বিদ্বেষ অপেক্ষা গৃহিণীর বদ মেজাজটা যেন বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত নিগ্রোরা যে অসহায়ের মত এই বিদ্বেষের বলি হচ্ছে এমন নয়, তাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড বেগে আজ আমেরিকা কম উদ্বিগ্ন নয়। অভিনয়ের দিক থেকে নাটকটি বিশেষ রেখাপাত করতে পারে না। সংলাপে মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক্য ব্যবহারের কোন সার্থকতা বুঝি না। বরঞ্চ শ্রুতিকটু হয়। নাট্য-পরিচালনা আরো সুচিন্তিত হলে হয়তো নাটকটি সার্থক হতো।

'পশ্চিম স্বর্গ' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সুনীল মিত্র, সন্দীপ চক্রবর্তী, মণিলেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়, আশীষ মুখোপাধ্যায়, গৌরব সাহা, অমল নাথ, সৌমিত্র চক্রবর্তী, রেবা কুণ্ডু, সীমা চক্রবর্তী।

এই নাটকটি পুনঃ সম্পাদিত হয়ে উপযুক্ত অনুশীলনের পর বার বার অভিনয়ের প্রয়োজন আমরা অনুভব করি।

● 'নীল আকাশে' ছবিতে মালা সিন্হা

হরিণঘাটা ফার্ম মহিলা সমিতির উদ্যোগে "নৃত্যবিচিত্রা"

১১ই জুলাই, শনিবার হরিণঘাটা ফার্ম আই-ডি-ডি প্রেক্ষাগৃহে হরিণঘাটা ফার্ম মহিলা সমিতির ব্যবস্থাপনায়—

নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা "নৃত্যবিচিত্রা" প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন নৃত্যে অনুপশঙ্কর, আলো বাগ্চী, কৃষ্ণা রায়, পাপ্ড়ি বোস, তন্দ্রা কোণার, কল্পনা সাহা, সাথী গুপ্তা, নীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবহসঙ্গীতে ছিলেন শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কেদার নন্দী, শঙ্কর পণ্ডিত ও নন্দকুমার মুখার্জী।

তাপসী'র তিনশত রজনী

স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'তাপসী' নাটক গত ২৪শে মে ৩০০তম অভিনয় অতিক্রম করেছে। তদুপলক্ষে আগামী ২৫শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় ৩০০তম অভিনয়ের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি এবং নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় 'তাপসী' নাটক অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও কর্মীদের ঐ দিন পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।

সংবাদবন্যা

জন্ম : ১৮০৫

বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘায়ু মানুষ শিরালি মুসলিমফকে নিয়ে লেনিনগ্রাডের নিউজ রীল স্টুডিও একটি ছবি তুলেছে। ছবির নাম 'জন্ম : ১৮০৫'। ছবিতে মুসলিমফ এবং তাঁর ৯২ বছর বয়স্কা স্ত্রী, তাঁদের সন্তানসন্ততি এবং ১৫৯-তম জন্মদিনের উৎসব দেখান হয়েছে। মুসলিমফের জন্ম ও বাসস্থান আজের বাইজানের পার্বত্য অঞ্চল। এরূপ অভিনব ছবি দর্শকদের কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

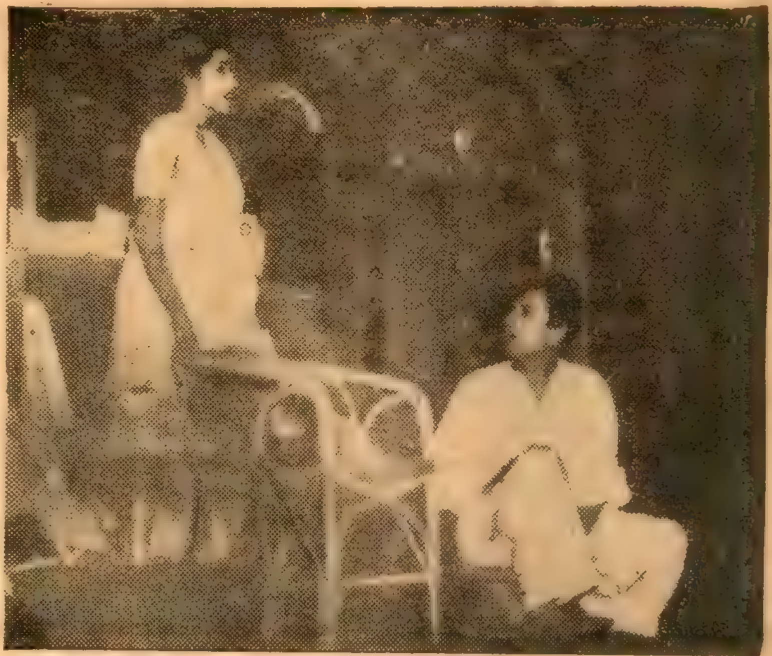

বহুরূপীর প্রযোজিত ইবসেনের 'পুতুল খেলা' নাটকের একটি দৃশ্যে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র।

কলকাতার নাট্য তরঙ্গে—আর একটি তরঙ্গ

কলকাতার পেশাদারী মঞ্চে ছয়টি নাটক নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে। ছয়টি নাট্যালয় দর্শকে গমগম করছে। নাটক ভাল কি খারাপ সে পরের কথা; দর্শকরা আজ নাটক দেখার জন্য আগ্রহী। কলকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই নাটকের দর্শক বেড়েছে একথা আজকাল কেউ কেউ বলে থাকেন; কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে নাটক-দর্শকের সংখ্যা আজ বেড়েছে। জীবনে নানা সমস্যা, নানা কষ্ট, কিন্তু মানুষ আজ জীবনকে জানতে চায়, তার জীবনেরও কথা ও জিজ্ঞাসার উত্তর মঞ্চে দেখতে পেলে খুশি হয়। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজ নাটক-দর্শকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনসংখ্যার প্রশ্ন তেমন বড় নয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দরুণই সেখানে মানুষ বেশি করে নাট্যালয়মুখীন হয়েছে। আমাদের দেশেও জনসংখ্যা কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার উপরে আরো কারণ আছে।

কিন্তু আমাদের নাট্যালয়গুলি মানুষের মনের এই ক্ষুধা মেটাতে পারছে কি? প্রশ্ন আসে, যুদ্ধোত্তরকালে বাংলা দেশে যে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এবং নাট্যরসিক ও দেশের মানুষ যে নাট্য প্রযোজনা ও রীতি এবং বাস্তবধর্মিতাকে গ্রহণ করেছে আমাদের পেশাদারী মঞ্চগুলি কি আর তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারছে? দর্শকদের মনে আজ এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং আজ হোক, কাল হোক—পেশাদারী নাট্যদলকে এ-বিষয়ে ভাবতে হবে।

স্টার থিয়েটারে চলেছে 'তাপসী'।

নাটকটি তিনশত রজনী অতিক্রম করেছে। আরো কয়েক শত রজনী নিঃসন্দেহে [illegible] রঙমহল থিয়েটারে স্বীকৃত একটি জনপ্রিয় নাটক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বরূপায় নতুন নাটক 'নগ্ন' এখনো ঠিক জমে উঠতে পারে নি। নানা পরিবর্তনের মধ্যে হয়তো এই নাটকও এক জায়গায় এসে দাঁড়াবে। মিনার্ভায় আবার 'অঙ্গার' অভিনীত হচ্ছে 'অঙ্গার' বাংলার নাট্যমঞ্চে নতুন ভাবধারা, নতুন প্রয়োগরীতির জন্য একটি বিদ্রোহী নাটক রূপে অভিনন্দিত। আমাদের সমাজ শ্রেণী বিভক্ত। উপরের তলার মানুষের হাতে সমাজ পরিচালনার ভার। নাটকে, সিনেমায় উপরের তলার মানুষের মহত্ত্ব ও তাদের প্রতি মমতা সৃষ্টির চেষ্টা সযত্নে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই একটি মাত্র নাটকে নীচের তলার মানুষের প্রতি মমতা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। আর সমাজ-পরিচালকদের মুনাফালোলুপ চেহারাটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সমাজের একদল লোক এই নাটকের বিরুদ্ধে আক্রমণমুখী। মুক্ত অঙ্গনে শৌভনিকের হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'ন' ন' 'না' দ্বিতীয়বার অভিনয়েও বেশ দর্শক লাভ করছে। থিয়েটার সেণ্টারে 'নিশাচর' অনেকটা নিঃশব্দে হলেও, ডিটেকটিভ নাটক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কলকাতার থিয়েটারগুলির এই নাট্য তরঙ্গের মধ্যে সম্প্রতি শম্ভু মিত্রের বহুরূপী সম্প্রদায় সাতদিনের অনুষ্ঠানে আর একটি প্রবল তরঙ্গ তুলেছে। এই তরঙ্গ নাট্যরসিকদের মনে বিরাট রকমের দোলা লাগিয়েছে। পুরানো আর নতুন নাটকের স্বাদে দর্শকরা এবার প্রশ্ন করছেন অপেশাদার সম্প্রদায়গুলির প্রতি। ওঁরা কি নাটক পরিবেশন করেন, কেন করেন? গণনাট্য আন্দোলনে এককালে শম্ভু মিত্র এক নতুন নাট্যসত্তা জাগিয়ে তুলেছিলেন। 'ছেঁড়া তার', 'পথিক'-এর পথ ধরে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন 'রক্তকরবী' ও 'দশচক্রে'। সে নাটকগুলির বিশ্লেষণ, চমকপ্রদ অভিনয় এখনো আমাদের মনে দোলা দেয়। তাঁর 'পুতুল খেলা'কেও আমরা ভুলি কি করে। তারপরে কিছুকাল আমরা তেমন চমক, তেমন নতুনত্ব অনুভব করতে পারি নি।

● নির্মীয়মাণ 'নিশাচর' ছবির একটি দৃশ্যে স্মিতা মজুমদার, সুমিতা সান্যাল ও দিলীপ রায়।

এবারের উৎসবে সাতটি নাটকের মধ্যে সবচেয়ে সাড়া জাগিয়েছে একটি গ্রীক অনুবাদ নাটক। রাজা ওয়েদিপাউস; বহুরূপীর দেওয়া নাম 'অন্ধকারের নাটক'। আড়াই হাজার বছরের পুরানো এই নাটক দিয়ে বহুরূপী উৎসব আরম্ভ করেছিল। একটি সুপরিকল্পিত শিল্পরস সমৃদ্ধ, সরল উপস্থাপনা রীতিতে এই নাটক দর্শকমনকে নতুন চেতনায় আলোড়িত করেছে। অভিনয় এখানে চড়া পর্দায় বাঁধা ছিল। শম্ভু মিত্রের রাজা এখানে উদ্বেগ, বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ, সংশয় ও আশঙ্কায়, সত্যের আঘাতে যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। তৃপ্তি মিত্রের রাণী ধীর, স্থির ও আত্মতুষ্ট; তারপরে সত্যের সম্মুখে ভেঙে পড়ায় মর্মন্তুদ। এঁদের দু-জনের সঙ্গে সমানতালে সঙ্গতি রেখেছেন অন্যান্য অভিনেতারা।

দ্বিতীয় নতুন নাটক রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'। রাণী সুদর্শনার রূপের সাধনা আর অধ্যাত্ম সাধনা, অভিমান আর আত্মনিবেদনের দ্বন্দ্ব নিয়ে এই প্রতীক নাটক। এই নাটকের সুদর্শনা তৃপ্তি মিত্র। তিনি অসাধারণ অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু তবু নাটকের বিশ্লেষণে ও রূপায়ণে কোথায় যেন অপূর্ণতা রয়ে গেছে মনে হয়।

অন্য নাটকগুলি 'পুতুল খেলা', 'রক্তকরবী', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'চার অধ্যায়' ও 'দশচক্র' বহুরূপীর পুরানো নাটক এবং বহু আলোচিত। এই পাঁচটি নাটক নিঃসন্দেহে দর্শকদের সন্তুষ্ট করেছে।

সমাপ্তি রজনীতে শম্ভু মিত্র বলেছেন—নিছক প্রমোদ পরিবেশন [illegible] উদ্দেশ্য নয়। যে দর্শকরা এই নাটকগুলি দেখেছেন তাঁরাও প্রমোদ কিনতে এখানে আসেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য নাট্যচেতনা সৃষ্টি করা এবং উভয়ের মধ্যে যৌথ চেতনা জাগিয়ে তোলা। শ্রীমিত্রের এই উক্তিতে আমরা আশান্বিত। তাঁর কাছে আমরা নাটক চাই, এমন নাটক চাই—যে নাটক সত্যিই চেতনা সৃষ্টি করে।

—দর্শক।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

একচল্লিশ

রঙ্গজগতের কাপ্তেন

অভিনেত্রী মনোরমা। অভিনয় জগতে কাপ্তেন মোনা নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করেছিলেন। অভিনেত্রীর নামের সঙ্গে কাপ্তেন শব্দটা শুধু বেমানান নয়, একটু যেন শালীনতার অভাব ঘলেও মনে হয়। কিন্তু ঐ শব্দটা নামের আগে যুক্ত হওয়ার অবশ্য কারণও ছিল। যৌবনে অভিনেত্রী মনোরমা যেমন প্রচুর অর্থের ও সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, তেমনি সে অর্থ তিনি রীতিমত কাপ্তেনী করেই দু'হাতে উড়িয়েছিলেন। তাই নাম হয়েছিল—কাপ্তেন মোনা।

কাপ্তেনীর বহরও ছিল তেমনি, যা আজকের দিনে কল্পনাও করা যায় না। মনোরমার সখ হোল, ঘুড়ি ওড়াবার। ঘুড়ির সঙ্গে দশ টাকার নোট বেঁধে ঘুড়ি ওড়াতে লাগলেন! এ ছাড়া বিলাস-ব্যসনের ব্যয়ও ছিল প্রচুর। জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে রেড রোডে হাওয়া খাওয়া ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বছরে একবার করে বাইরে চেঞ্জে যাওয়ার খরচ ছিল মোটা রকমের। দাসদাসী, রিজার্ভ ট্রেন, বড় হোটেলে ওঠা ইত্যাদি ব্যাপারে মুঠো মুঠো টাকা তিনি ব্যয় করেছেন। দশ টাকার একটা নোট, তাঁর কাছে ছিল সেদিন একটা পয়সার সামিল। অর্থের প্রাচুর্য এমনি করেই সেদিন তাঁর জীবনে বহু অনর্থ ঘটিয়েছিল। তার মধ্যে ঘোড়দৌড়ের নেশাটিও অন্যতম। অভিনেত্রী মনোরমা এইভাবে চরম কাপ্তেনী করে, রঙ্গজগতে কাপ্তেন মোনারূপে, পরম পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

এ যুগের নাট্যরসিকদের কাছে কাপ্তেন মোনার বিশেষ কোন পরিচয়-পরিচিতি ছিল না। কিন্তু সে যুগে কাপ্তেন মোনা ছিলেন নামকরা অভিনেত্রী। নাচতে পারতেন, গাইতে পারতেন, আর সেই সঙ্গে সবরকমের চরিত্রে রূপদান করতে পারতেন।

মনোরমার অভিনেত্রী-জীবন সুরু হয়েছিল কিশোরী বয়সে। অভিনেত্রী জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের আর অর্দ্ধেন্দুশেখরের কাছে। তখন ছোট ছেলে বা মেয়ের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন। ক্রমে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম চরিত্রে তিনি রূপদান করতে থাকেন।

১৯০০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। এই সময় থেকেই

শ্রীমতী মনোরমা—কাপ্তেন মোনা

মনোরমার ভাগ্যের মোড় ফিরতে থাকে। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন নানাদিক থেকেই অর্থাগম সুরু হতে থাকে। তাই সে যুগের প্রায় প্রতিটি ছায়াছবিতেই তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং অর্থ প্রাপ্তি ঘটেছে। এমন কি সুদূর লাহোর থেকেও তাঁর ডাক এসেছিল হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু অর্থের আতিশয্যেই হোক, আর খাম-খেয়ালীপনার জন্যেই হোক তিনি মধ্যে মধ্যে রঙ্গজগৎ থেকে আত্ম-গোপন করে থাকতেন।

শৈশব-কৈশোরে যিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে কাটিয়েছেন, যৌবনে তিনি অর্থের আতিশয্যে অতীত দিনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আবার শেষ জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সে সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটেছে, আজ মাস দেড়েক হোল।

দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন কাপ্তেন মোনা। আর এই দীর্ঘ-জীবনের মধ্যে যতদিন তিনি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছেন, তার চেয়ে বেশিদিন তাঁকে দুঃখে কষ্টে কাটাতে হয়েছে। ইদানীং মধ্যে মধ্যে সে-যুগের কোন কোন নাটকে—যেমন, প্রফুল্লতে জগমণি, রঘুবীরে সখার মা ইত্যাদি ভূমিকায় তিনি সৌখীন সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করে কিছু কিছু উপার্জন করতেন।

মৃত্যুর মাস পাঁচেক আগে এই রকম এক সৌখীন সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে এসেছেন স্টার থিয়েটারে। আমায় দেখে, মনোরমা এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। বললাম—আপনারা বয়েসে বড়, দেখা হলেই এই যে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন, এতে বড় সঙ্কোচবোধ করি।

—তা ত' করেন। কিন্তু আমি যে এতে তৃপ্তি পাই। জানেন, মহারাজ নন্দকুমার লক্ষ বামুনের পায়ের ধূলো সংগ্রহ করেছিলেন। আমি ত' আজ পর্যন্ত তার সিকির সিকি ভাল লোকেরও পায়ের ধূলো নিতে পারলাম না।

—আছেন কেমন?

—আছি এখনও। মরণটা ত' নিজের হাতে নয়, তাই থাকা।

—এ্যামেচারের কাজকর্ম কেমন?

—খুব কম। মধ্যে মধ্যে যা আসে তাতে পেটের ভাত, পরণের কাপড়ও জোটে না।

—আপনার অদৃষ্ট! নইলে এ কষ্ট ত' আজ আপনার পাওয়ার কথা নয়।

—না দাদা, আমারই পাওয়ার কথা। যা আমার পাওনা তাই আমি পাচ্ছি। এর জন্যে অবশ্য আমার কোন দুঃখু নেই। বরং এক এক সময় ভাবি, এ-অবস্থা না হলে হয়ত ঠাকুরকে ডাকতে পারতাম না। আশীর্বাদ করুন, তাঁকে ডাকতে ডাকতে এবার যেন যেতে পারি।

মনোরমার কথাগুলো বলার মধ্যে সেদিন কোন ক্ষোভ ফুটে ওঠে নি, বরং পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বলেছিলেন।

প্রথম জীবনের কাপ্তেন মোনা অনেকদিন আগেই মরেছিল, আর সেদিন যে ইহলোক ত্যাগ করলো—সেই ছিল মনোরমা।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

সাঙ্কেতিক মঞ্চরীতি :

বাস্তবধর্মী নাটকে স্বাভাবিক মঞ্চসজ্জা এবং সাঙ্কেতিক নাটকে ইঙ্গিতপূর্ণ মঞ্চসজ্জা করাটাই চিরাচরিত রীতি। বাস্তবাদের ভেতরেও আবার শ্রেণী বিভাগ আছে—ফোটোগ্রাফিক অনুকরণকে বলা হয় ন্যাচারেলিজম্, আর বাস্তবের বাছাই করা অনুকরণকে বলা হয় রিয়ালিজম। চেখভের নাটকের মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রডাকসনে স্টেজ সেটিং হত ন্যাচারেলিজম্ ঘেঁসা।

এসব সূক্ষ্ম বিচারের কথা বাদ দিয়ে সহজভাবে বলা যেতে পারে যে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে একটি ঘরের স্টেজ সেটিং করতে গেলে প্রডিউসার চান বাস্তব জীবনে যেভাবে ঘরটিকে আমরা দেখি ঠিক সেইভাবে মঞ্চে ঘরের দৃশ্যটি সৃষ্টি করতে—এক্ষেত্রে একমাত্র ঘরের চতুর্থ দেয়ালটিকে বাদ দিতে হয়। এক সময় আঁকা দৃশ্যের দ্বারা একাজ সারবার চেষ্টা হোত—পরে থ্রি ডিমেন্সনের প্রয়োজনবোধে স্টেজ আর্কিটেকচার ব্যাপারটার আবির্ভাব হয়। আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার ক্রমশ মঞ্চ থেকে অপসারিত হচ্ছে।

উপরে বর্ণিত ঘরের দৃশ্যটিই আবার সিম্বলিস্টিক প্রথায় অন্য রূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রডিউসার চান ঘরের বিশেষত্বগুলিকে কয়েকটি ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে। যেমন ধরুন, খাড়াভাবে দুটি কাষ্ঠদণ্ড দাঁড় করিয়ে দিয়ে দরজার সাজেশচেন্ দেওয়া হয়। বাস্তববাদী নাটকে এ-ধরণের মঞ্চসজ্জাকে সাঙ্কেতিক না বলে সাজেশটিভ বা ইঙ্গিতধর্মী স্টেজ

শিলালি

সেটিং বলাই ভাল। এই পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই Thornton Wilder-এর নাটকগুলির কথা মনে হয়। এ-ধরণের নাটকে প্রধানতই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অ-স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার দিকটা।

সাজেশটিভ সেটিং-এ অনেক সময়েই প্রডাকসন্ কস্ট অনেক কমে যায়। যেমন, পেছনের ব্ল্যাক কার্টেনের উপর জানলা বা দরজার ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া হয় কয়েকটি রেখার দ্বারা। ঐতিহাসিক নাটকে কেল্লার দৃশ্য বাস্তববাদী প্রথায় করতে গেলে প্রচুর খরচ—সেক্ষেত্রে সামান্য উঁচু দেয়ালের মত করে, কয়েকটি ঢাল, তরোয়াল ঝুলিয়ে দিলেই কাজ চলে যাবার মত হয়।

কিছুকাল আগে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'তাসের দেশ' নাটক দুটি দেখলাম নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। অভিনয় ও গানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শান্তিনিকেতনের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ট্র্যাডিশন আছে—যে কারণে এঁদের মঞ্চসজ্জাও হয় অত্যন্ত সহজ, সরল এবং পরিচ্ছন্ন। অথচ এই সহজের ভেতর দিয়েই আভাস পাওয়া যায় কল্পনা-প্রবণতা এবং সঙ্কেত-ব্যঞ্জনার। এঁদের মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত নায়ার যে শুধু কারপেণ্টার নন সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্ট সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আশ্রমিক সঙ্ঘের 'বাল্মীকি

ফ্রিট্জ ফন্ আনুরুর অভিব্যক্তিবাদী নাটকের মঞ্চসজ্জা

প্রতিভা'র মঞ্চরূপ দেখে। কয়েকটি বল্লম, ঢাল ইত্যাদি একপাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল দস্যুদের আস্তানা বুঝিয়ে দেবার জন্য। আর ব্ল্যাক কার্টেনের উপর সাদা কাপড় এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে মনে হচ্ছিল আকাশের উপর মেঘের সারি—সহজভাবে দৃশ্যসজ্জা কি সুন্দর হতে পারে, শ্রীযুক্ত নায়ার তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সেটে।

সিম্বলিস্টরা মনে করেন যে, রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই থিয়েটারের ভবিষ্যতের ইতিহাস তৈরি হবে। ব্রেখ্‌ট আবার তাঁর পদ্ধতিতে রিয়ালিজম এবং সিম্বলিজমের একটা সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সাঙ্কেতিক পদ্ধতির ভেতর প্রকট হয়ে ওঠে প্রডিউসারের পদ্ধতির শিল্প-কৌশল ও শিল্পচাতুর্য জাহির করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা। একটা চেয়ারকে মোটর গাড়ি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আর্থিক ও আর্টিস্টিক ইকনমি হয় যথেষ্ট—কিন্তু দর্শক বেচারীদের কল্পনাশক্তির উপর অত্যন্ত জুলুম করা হয়। এর থেকে সত্যিকার গাড়ি দেখানোটাই সবদিক থেকে সহজ এবং স্বাভাবিক।

লণ্ডনে 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক্ সারকল্' প্রডাকসন-গুলিতে দেখেছি ব্রেখ্‌ট পার্টি মঞ্চ মঞ্চাভিনয়ে photographic representation-ও করেন না, যা অদ্ভুত সব সঙ্কেতের সাহায্যও নেন না। বাস্তব দৃশ্যের কয়েকটি খুব বাছাই করা জিনিষের সাহায্যেই এঁরা মঞ্চসজ্জা করে থাকেন। ঘরের সমস্তটা না দেখিয়ে হয়তো একটা দিকের দেওয়াল, দরজা এবং কিছু আসবাবপত্র সাজিয়ে দিলেন—অতি বাস্তবতাকেও পরিহার করা হোল—আবার সাঙ্কেতিক কৌশলকেও প্রকট করে তোলা

● বিখ্যাত বাস্তববাদী প্রযোজক স্তানিস্‌লভস্কি

হোল না। Poland-এর Lodz-এ 1952 সালে ব্রেখ্‌ট পার্টি যখন প্লে করেন, সেখানকার কাগজে লিখেছিল—

'A great surprise for the audience of Lodz was the excellent use of Props. None of them was for mere decoration.

In Brecht's plays there is no decoration in the usual traditional sense of the word..Every object on the stage is there in order to make the action of the play more understandable...Action and setting are an indivisible unity.'

আমাদের বাংলা থিয়েটারের অভিনয়েও cost of production কমাতে গিয়ে এ্যামেচার নাট্যসংস্থারা সাঙ্কেতিক মঞ্চরীতির সাহায্য নিয়ে থাকেন। দু'এক সময়ে এঁদের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসা অর্জনের দাবী রাখে। কিন্তু অপেশাদারী নাটুকে দল বছরে একটি নাটকের অভিনয় করেন, দুবার বা তিনবার মাত্র। সেই কারণেই বাংলার নাট্য-আন্দোলনে মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে এঁরা কখনই খুব একটা গভীর ছাপ রেখে যেতে পারেন না।

পেশাদারী থিয়েটারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই realistic নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে এবং খুব সঙ্গতভাবেই এঁরা অনাবশ্যক বাস্তববাদী নাটকে সাঙ্কেতিক মঞ্চরীতির সাহায্য গ্রহণ করেন না। কিম্ভুত কিমাকার সিম্বলের সাহায্যে অভিনয়ের সময় নাটকের গতিকে ব্যাহত করেন না, শুধু এই কারণেই দর্শকদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই সব পেশাদারী দলের কাছে, যাঁরা নিত্য-নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে তিনদিন অভিনয় করে বাংলার থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু মুস্কিল হয়ে পড়েছে বাংলা দেশের 'ক' বাবু 'খ' বাবু এবং 'গ' বাবুর দলকে নিয়ে। কিছু কৃষ্টিবিলাসী তথাকথিত পণ্ডিতেরা এবং কাণ্ড-জ্ঞানহীন কাগজের সমালোচকদের কৃপায় এঁরাই আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন বাংলা থিয়েটারের কেষ্ট-বিষ্টু দল। এঁদের সত্যিকার সমালোচনা করতে যাওয়ারও বিপদ আছে। (ক্রমশঃ)

পাঠক মন

নব-পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা থেকেই আমিও 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আগ্রহী পাঠককুলের অন্যতম। ইদানীং প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রিকাসমূহের মধ্যে এই পত্রিকা অতি সূচনা থেকেই আপন বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনের মহৎ ঐতিহ্যের যোগ্যতম বাহক বলে অতি স্বাভাবিক কারণেই পত্রিকাটি জনপ্রিয়ও বটে। সংবাদ পরিবেশনে সুস্থ মানবতাবোধ ও চিন্তাদর্শের অতি শুভ প্রতিফলন পত্রিকাটিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

পত্রিকা প্রকাশনের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সংকীর্ণ ব্যবসায়মতি বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' একাধারে রসসাহিত্য, দেশী-বিদেশী রাজনীতি, সমাজ পরিস্থিতি ও তথ্য প্রকাশের গুরুদায়িত্ব যথাযথই পালন করে চলেছে। সে কারণে একে অধিকতর মনোগ্রাহী করে তোলার প্রসঙ্গে এলাম। বলা বাহুল্য বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত আজকের মানুষ, ভারত-দর্শন, বঙ্গদর্শন, আন্তর্জাতিক, শহর কলকাতা, দুরন্ত দেহলী, গ্রন্থমেলা, রঙ্গমঞ্চ—ওদেশ এবং এদেশে—নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশেষত সম্প্রতি সংযোজিত সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর, সংবাদ-বিচিত্রা এবং পাঠক মন শীর্ষক বিভাগত্রয় স্থায়ী ও বিস্তৃততর হওয়াই বঞ্ছনীয়। এগুলির সঙ্গে প্রতি সংখ্যায় একটি সাধারণ প্রশ্নোত্তর বিভাগ কাম্য; কারণ এতে পত্রিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

একত্রে তিনটি ধারাবাহিক উপন্যাসের স্থলে একটা করে সামাজিক ও রহস্য উপন্যাস এবং তৃতীয়টির পরিবর্তে একটি ধারাবাহিক নাটক প্রকাশিত হলে ভাল হয়। প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি করে সুখপাঠ্য কবিতা, ছোটগল্প, রসরচনা ও কার্টুনচিত্র আশা করছি। সর্বোপরি পত্রিকাটির মূল্য ও প্রচার বৃদ্ধি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক সংখ্যায় গ্রাহক এবং এজেন্সির নিয়মাবলীর বিজ্ঞাপন প্রকাশ পত্রিকাটির পক্ষে কল্যাণপ্রদ হতে পারে।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন, যে শুভ আদর্শের অনুসারী হয়ে, প্রবীণ নবীন নির্বিচারে প্রকৃত প্রতিভা মাত্রকেই চিন্তাজগতে সমআসনে প্রতিষ্ঠিত করে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' তার অগ্রগমন অব্যাহত রেখেছে, সেই আদর্শের জয় সুনিশ্চিত।

শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৯

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন উৎসাহী পাঠক। আপনাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় আমরা সত্যিই আনন্দিত। এর আরও দিন দিন উন্নতি হোক, এই কামনা করি।

আমার কাছে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। এই পত্রিকার সংবাদ পরিবেশনের ধারা অপূর্ব। এইরূপ অন্য কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত দেখি নি। অন্যান্য বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি অর্থের দিক বিবেচনা করে পত্রিকা-প্রকাশ করে; সেই জন্য পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনে ভর্তি থাকে, এতে পড়তে অসুবিধা হয়, বিরক্তি আসে। কিন্তু 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এই দোষে দোষী নয়। নতুবা খুব কম মূল্যে এই পত্রিকার এইরূপ মানের সৃষ্টি হত না। এতে এই কথাই প্রক শ পায় যে, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকা কে. রূপ ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে নি। এর উদ্দেশ্য লোকের জ্ঞানের মান ক্রমশ উন্নীত করা।

এই পত্রিকার কতকগুলি জিনিষ আমার সবচেয়ে ভা লা লাগে। যেমন, 'সম্পাদকীয়', 'আজকের মানুষ', 'ভারত দর্শন', 'আন্তর্জাতিক', 'শহর কলকাতা', 'রঙ্গজ তে' সুজনের মন্তব্য ও নাম ...শের প্রবন্ধ এবং মাঝে মাঝে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা। এ ছাড়াও গল্প ও উপন্যাসগুলিও সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযুক্ত।

আ. কর মানুষ ও 'শহর কলক. পর্যায়ের লেখাগুলি এবং 'অনল আয়তী' উপন্যাসটি ইতিহা সর্ব দিক থেকে মূল্যবান। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যারা উৎসুক তাদের 'অনল আয়তী' উপন্যাসটি অনেক সাহায্য করতে পারবে। 'আন্তর্জাতিক' ও 'ভারত দর্শন' পাঠে দেশের বিভিন্ন অংশের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাচ্ছে। এক দেশ অন্য দেশকে জানবার সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ যদি কোনদিন সফল হয়, তবে তার পেছনে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ন্যায় পত্রিকাগুলির অবদান কম থাকবে না।

শ্রীপদাতিকের 'শহর কলকাতা' লেখাটি প্রশংসার যোগ্য। তিনি গল্পের ছলে আমাদের সামনে এক ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরেছেন। কালের কবরে কলকাতার যে ইতিহাস চাপা পড়ে গিয়েছিল তা আবার শ্রীপদাতিকের হাতের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে।

তাই আমার আবার বলতে ইচ্ছা করছে, এত কম মূল্যে সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযুক্ত পত্রিকা হয়তো বাংলা দেশে আর দুটি নেই। সব কিছু সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে গেলে আমার লিখিত পত্রে ধরবে না। তাই এককথায় আমার ভালো লাগাকে প্রকাশ করছি। যখন কোন জিনিষ বা কাকেও ভালো লেগে যায়, তখন তাদের সম্বন্ধে কারও কাছে কিছু বলতে না পারলে মনটা কি রকম আইটাই করে। তাই আমিও আমার মনের ভাব পত্রের দ্বারা প্রকাশ করলাম।

তবে আমার একটি অনুরোধ যে, ছাপার দিকে (কম্পোজ ও প্রিণ্টের) নজর রাখলে ভালো হয়। তবে কাগজ ভালো দিতে বলছি না। কেন না, এত কম মূল্যে এর চেয়ে ভালো কাগজ দেওয়া সম্ভব নয়। এবং বর্তমান নির্ধারিত মূল্যই যেন চিরদিন বজায় থাকে।

শ্রীমাখনলাল ঘোষ
ক্যানিং ডেভিড সেস্থন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখীন বিদ্যালয়। পোঃ—ক্যানিং টাউন, জিলা—চব্বিশপরগণা।

খেলা ধূলা

বর্ণচোরার দল

বাংলা দেশে ছড়া আছে, 'খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে, বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে'। অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শুভলগ্নে ভারতীয় দলের বিদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে এক ধরণের সুবিধাবাদী হুলোর আবির্ভাব হয়। অপূর্ব কৌশলে এরা ম্যানেজার বা কোচের নামাবলী গায়ে দিয়ে দলের মধ্যে নিজের স্থান করে নেয় এবং সরকারের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার শ্রাদ্ধ করে সরকারী পয়সায় বিদেশ সফর করে আসে। এঁদের অনেকে আবার খেলাধূলার কোন কিছু বোঝেনই না। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফরে দলের ম্যানেজার ওখানে নিজের ব্যবসা-পত্তর গুছিয়ে দেশে ফিরলেন, আর দলের ভাগ্যে জুটল শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি। রোম অলিম্পিকে এই সব অকর্মাদের কার্যকলাপ তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। এই বিষয়ে একটা তদন্ত কমিটী গঠিত হল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল। দুঃখের কথা যে, ভারতবর্ষের ক্রীড়া সংস্থাগুলি এখনও এই সব সুচতুর বর্ণচোরাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারে নি; এই ধরণের লোকেরা শুধু ক্রীড়াজগতের শত্রুই নয়—দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু। টোকিও অলিম্পিকে যাবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছেন, তবে আশা করি, বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কটের দিনে, নির্বাচনী কমিটী এ-সম্বন্ধে এবার সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

ময়দান নবরূপে চঞ্চল

ময়দান ফুটবলের বন্ধ্যাত্ব ঘুচল, গোলের বন্যা বইয়ে দিল মোহনবাগান। প্রথম ডিভিসন লীগে মরশুমের প্রথম হ্যাট্রিক করলেন মোহনবাগান দলপতি চুণী গোস্বামী, হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে। মোহনবাগান পর পর দুটি খেলায় মোট তেরটি গোল দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। রাজস্থানকে ছয় গোলে পরাজিত করার পর তারা হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত করল সাত গোলে। চুণীর অনুপস্থিতিতে মোহনবাগানের খেলা কেমন যেন ছন্নছাড়া হচ্ছিল, পুরোভাগে সংহতির অভাব স্পষ্ট করে দেখা দিয়েছিল; চুণী দলের পুরোভাগে এসে যোগ দান করার পর দলের খেলায় এসেছে ছন্দোময় গতি, আক্রমণ ধারায় এসেছে ক্ষুরধার। মোহনবাগানের বিমল চক্রবর্তী সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে ব্যর্থ, কিন্তু রক্ষণভাগে খেলায় তিনি আশাতীত সাফল্যলাভ করেছেন। রাইট আউটে শেষ পর্যন্ত শেখ আলিকেই যোগ্য বলে মনে হল। দুই পয়েণ্টের ব্যবধানে থেকে মোহনবাগান এখনও লীগের শীর্ষে অবস্থান করছে।

ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের দুই পয়েণ্ট পশ্চাতে থেকে লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের সামগ্রিক খেলায় কিছুটা দৃঢ়তা এবং সংহতির আভাস ফুটে উঠেছে। পূর্ববর্তী কয়েকটি খেলাতেই তারা জয়ী হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে সুশীল সিন্‌হা, প্রশান্ত সিন্‌হা এবং আক্রমণভাগে শম্ভু দাসচৌধুরীর অনবদ্য ক্রীড়াধারা ইষ্টবেঙ্গলকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করছে।

বি এন রেল দলের সুসংবদ্ধ এবং ছন্দোময় ক্রীড়াধারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবী রাখে; কিন্তু দশটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করে তারা লীগের দৌড়ে কিছুটা পিছনে পড়ে গেছে। কলকাতা ময়দানের ছোট দলগুলি প্রধান ক্লাবগুলির বিপক্ষে ভাল খেললেও শেষরক্ষা করতে পারে না, নিজেদের দোষে নিশ্চিত জয় হাতের মুঠো থেকেও ফস্কে যায়। ফিরতি লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলকে প্রথমে গোল দিয়ে অগ্রগামী থেকেও কালীঘাট শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। কালীঘাটের তরুণ ষ্টপার এস রুদ্রর পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অতীতের ঐতিহ্যশালী মহামেডান স্পোর্টিং আজ বিগত দিনের ছায়ামাত্র। মাঝারী দলগুলির মধ্যে একমাত্র এরিয়ান্সই শীর্ষের দলগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। লীগের উপরের দিকেও যেমন একটা প্রতিযোগিতা চলছে লীগের সম্মানের জন্য, লীগের নীচের তলায় তেমনি একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে প্রথম ডিভিসন লীগে নিজেদের অস্তিত্ব

● চুনী গোস্বামী

বজায় রাখবার জন্য। লীগের নীচের তলায় বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেছে—রাজস্থান, বাটা, জর্জ টেলিগ্রাফ, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

চতুর্থ টেষ্টের পূর্বাভাস

হেডিংলে বিজয়ের পর সিম্পসনের দলবল চতুর্থ টেষ্টে ইংলণ্ডের সঙ্গে মিলিত হবে আগামী ২৩শে জুলাই ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ক্রীড়াজগতের সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, খেলায় জয়ী হতে গেলে

ভাগ্যলক্ষীর কৃপাও খুবই প্রয়োজন। খারাপ আবহাওয়া, নিরুৎসাহব্যঞ্জক ব্যাটিং এবং নিম্নস্তরের ফিল্ডিং নটিংহ্যাম এবং লর্ডসের টেষ্টে ইংলণ্ডের জয়ের সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। প্রথম দুটি টেষ্টে ইংলণ্ড দলের অনুকূল অবস্থা ইংলণ্ডের সমর্থকদের মনে আশার আলো জ্বালালেও, লীডসে অষ্ট্রেলিয়ার সাত উইকেটে

● ডেক্সটার

বিজয়ের পর সে আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। বর্তমানে সিরিজে অগ্রগামী অষ্ট্রেলিয়া দলের এখন অটুট মনোবল, অদম্য উৎসাহ।

এখন এইরকম অনুপ্রাণিত দলের হাত থেকে এ্যাসেজ ছিনিয়ে নেওয়া ডেক্সটারের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্যই বলা চলে। অবশ্য বলা যায় না কখন কি ঘটে যায়, কারণ অনিশ্চয়তাই ক্রিকেটের আপন বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডের ব্যাটিং-শক্তির মধ্যে কয়েকটি গলদ আছে। এঁদের ব্যাটস-ম্যানদের কয়েকজন খেলেন আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে, আবার কেউ কেউ একেবারে উইকেট কামড়ে পড়ে থাকেন। এই ধরণের বিপরীতধর্মী ব্যাটিংয়ের ফলে দল শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংলণ্ডের ব্যাটিং-শক্তির মধ্যমণি ব্যারিংটন তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী ঠিক খেলতে পারছেন না। তাঁর সাফল্যের ওপর আবার দলের অনেক কিছুই নির্ভর করছে। নবাগত বয়কট, অধিনায়ক ডেক্সটার এবং এডরিচ দলের অন্যতম প্রধান ভরসা। ইংলণ্ডের ফাষ্ট বোলাররা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করতে পারছেন না। ফ্রেডি ট্রুম্যানের পূর্বের খেলা আজ অনেকাংশে ম্লান। ইংলণ্ডের বর্তমানে তেমন কোন ভাল বোলার নেই, যাঁদের দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের বনিয়াদ টলানো যায়। ব্যাটসম্যানেরা আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করলেই ইংলণ্ডের মঙ্গল হবে বলে মনে হয়, তবে সমস্যা ইংলণ্ডের বোলিং-শক্তিকে কেন্দ্র করে।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম দুটি টেষ্টে ব্যর্থতা প্রদর্শন করে, তৃতীয় টেষ্টে বাজীমাৎ করে দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের ফিল্ডিং প্রথমের দিকে খুবই নিম্নমানের হয়, কিন্তু অল্পদিনেই তারা এই দোষ কাটিয়ে উঠেছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের সুবিধা এই যে, তাদের দলের মধ্যে অলরাউণ্ডারের সংখ্যাই অধিক। তাই বোলিংয়ে কেউ ব্যর্থ হলেও ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে সে ক্ষতি পূরণ হয়ে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত।

অষ্ট্রেলিয়া দলে একমাত্র ব্রায়ান বুথ ছাড়া অন্য সকলেই মোটামুটি ভালই ফলাফল প্রদর্শন করছেন। আগামী টেষ্ট দুটিতে সমস্ত দোষ কাটিয়ে উঠে বুথ যদি তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখাতে পারেন, তবে অষ্ট্রেলিয়ার পোয়া বারো। আশা করা যায়, ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে বেরসিক মেঘের আবির্ভাব ঘটবে না। এই টেষ্টে ইংলণ্ড যদি জয়ী হতে পারে তবেই তাদের শেষরক্ষা হবে, নতুবা অষ্ট্রেলিয়ার জয়-জয়কার।

ভুল ভাঙলো

শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ান লন টেনিস এ্যাসোসিয়েশন বিদ্রোহী টেনিস খেলোয়াড়দের সভাপতি এবং সম্পাদকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন। আর না করে উপায়ও নেই—সভাপতি রয় এমার্সন উইম্বলডেন বিজয়ী হয়েছেন এবং সম্পাদক ফ্রেড ষ্টোলে এবারও হয়েছেন বিজিত। দিনে দিনে অষ্ট্রেলীয় টেনিসের একচ্ছত্র আধিপত্য কমে আসছিল। কিন্তু এমার্সন এবং ষ্টোলের সাফল্য প্রমাণ করে দিল যে, অষ্ট্রেলিয়া এখনও টেনিস জগতের শীর্ষে অবস্থান করছে। দেশে আর কোন ভাল খেলোয়াড় নেই, আর ডেভিস কাপে এমার্সন এবং ষ্টোলে-বিহীন দল খেললে অষ্ট্রেলিয়ার সম্মান যে কোন সময়ে ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার টেনিস সংস্থা তাই ডেভিস

● ব্যারিংটন

কাপ খেলার প্রাক্কালে দলের বিপদ বুঝতে পেরে—নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দুজনকেই ডেভিস কাপে খেলবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

লক্ষ্য ক্যাসিয়াস

হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধাদের এখন প্রধান লক্ষ্য হল—বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিয়াস মহম্মদ আলি ক্লে। এখন ক্লের সঙ্গে কে লড়বেন তাই সমস্যা। তাই ঠিক হয়েছে, একটা বাছাই যুদ্ধ হবে। তাতে যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, সেই লড়বে ক্লের সঙ্গে। ষ্টকহলমে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটার্সন এডি ম্যাচেলকে পরাজিত করেছেন। আমেরিকার বক্সিং ফেডারেশনের তালিকায় প্যাটার্সন ষষ্ঠ স্থান পেয়েছিলেন। ম্যাচেলের স্থান ছিল জোন্সের পর—দ্বিতীয় স্থানে। সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে আশা ত্যাগ করলেও তিনি বলেছেন যে, আবার তিনি তাঁর হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করবেন।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

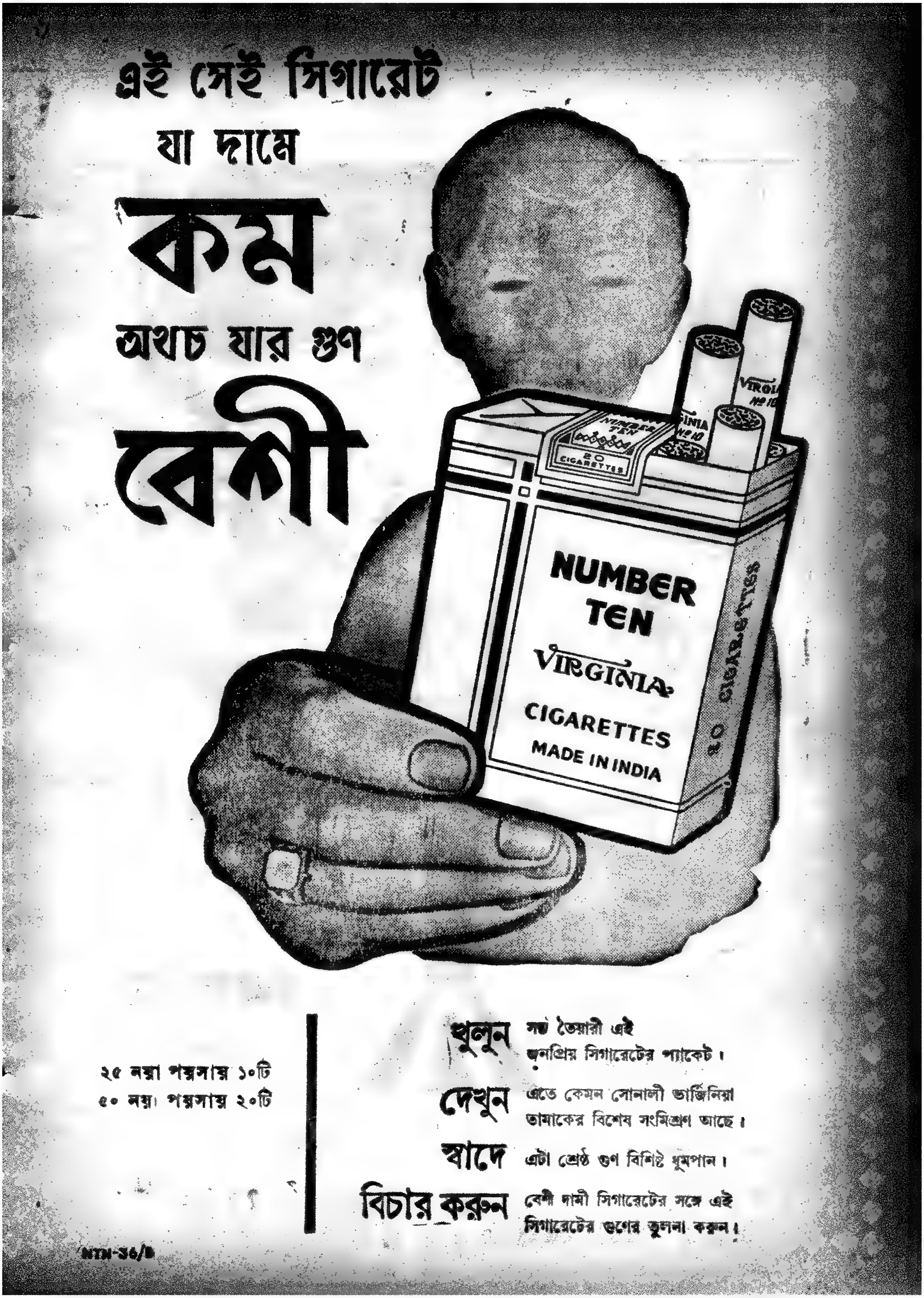
এই সেই সিগারেট
যা দামে
কম
অথচ যার গুণ
বেশী
NUMBER TEN
20 CIGARETTES
NUMBER
TEN
VIRGINIA
CIGARETTES
MADE IN INDIA
২৫ নয়া পয়সায় ১০টি
৫০ নয়া পয়সায় ২০টি
খুলুন সদ্য তৈয়ারী এই
জনপ্রিয় সিগারেটের প্যাকেট।
দেখুন এতে কেমন সোনালী ভার্জিনিয়া
তামাকের বিশেষ সংমিশ্রণ আছে।
স্বাদে এটা শ্রেষ্ঠ গুণ বিশিষ্ট ধূমপান।
বিচার করুন বেশী দামী সিগারেটের সঙ্গে এই
সিগারেটের গুণের তুলনা করুন।
NTN-36/B

Thursday, 23rd July, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 77, 78

2 3 JUL 1964

সাপ্তাহিক বসুমতী

"জাতীয় অবমাননা দিবস"-এর দশম বার্ষিক স্মরণোপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন রত ভিয়েৎনামী ছাত্রদল।

৬৯ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 30th July, 1964 • Vol. 69, No.

সূচীপত্র

756.3
'003/3
V.69
no.10

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৫৭৯
আজকের মানুষ	...	৫৮০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৫৮১
একটি উদ্দীপক সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রবন্ধ)	মোহিত রায়	৫৮২
কাকের আকাশ (কবিতা)	পিনাকরঞ্জন সাহা	৫৮৪
তুমি (কবিতা)	ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার	৫ ৮
ভারতদর্শন	...	৫৮৯
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৫৯৫
আন্তর্জাতিক	...	৬০০
বঙ্গদর্শন	...	৬০৪
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৬০৯

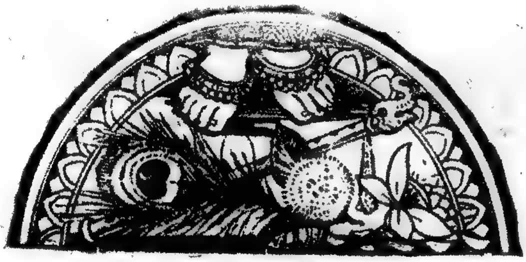

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অনবদ্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্ব্বে আর হয় নাই।" —স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৷৷০ টাকা

অনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩৲

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপত সওদাগর	৬১৪
একটি বিবর্ণ চিঠি (কবিতা)	মিলন দত্ত	৬১৬
নির্বেদ (কবিতা)	শিপ্রা ঘোষ	৬১৬
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৬১৭
রহস্যহীনা স্ফিংক্স (গল্প)	উল্কাপাত চক্রবর্তী	৬২১
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬২৪
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৬২৮
রঙ্গজগৎ	...	৬৩১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	৬৩৫
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৬৩৬
পাঠক মন	...	৬৩৮
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৬৩৯

প্রচ্ছদ পরিচয় : ৬০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ত্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, কয়েদে ম্যা মরেছে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিভাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কালকাতা—১২

৬১ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ — 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৪ই শ্রাবণ ১৩৭১ — Thursday, 30th July 1964

'একি কথা শুনি আজ—'

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এতোদিন পর সত্য কথা প্রকাশ করেছেন। প্রায় ষোল বছর তিনি খাদ্য দপ্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। সেখানে তাঁর সংখ্যাতত্ত্বের চাপে ফাইলের পর ফাইল রাইটার্স বিল্ডিংস-এ স্তূপীকৃত হয়েছে। তবু যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের মূল্য যে ভয়ঙ্কর রকম বৃদ্ধি পেয়েছে এই হিসেবটা এতোদিন তাঁর কাছে ধরা পড়ে নি। জনসাধারণের পরম সৌভাগ্য যে, এবার তিনি আমাদের মতোই মূল্যবৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছেন।

স্বল্পবিত্ত অসহায় মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে এই যে মূল্যবৃদ্ধি এর জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে? মুখ্যমন্ত্রীর মতে এক-শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত অর্থই মূল্য-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। মুখ্যমন্ত্রীর এই কারণতত্ত্বে আমাদের পক্ষে সায় দেওয়া অসম্ভব। কেন না, বর্তমানে যাদের হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। দিন আনে দিন খায় এই ধরণের নিরুপায় মানুষের সংখ্যাই আজ স্বাধীন ভারতে সর্বাধিক। প্রতিটি জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ভারতের এই সমাজ রুগ্ন, নির্জীব ও ভগ্নদশায় আজ শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। আমাদের সরকার হয়তো স্বচক্ষে দেখেও এই দুর্দশা দেখতে পান না। তাই সরকারী অক্ষমতাকে অস্বীকার করে আর এক নতুন তত্ত্ব হাজির করা হয়। এবং এই ঘটনা যদি ক্রমাগত চলতে থাকে তাহলে অনাহারী মানুষের মধ্যে বেপরোয়া ভাব জাগাই সম্ভব।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এতোদিন ধরে জনসাধারণকে খাদ্যের অভ্যাস বদলাবার জন্যও উপদেশ দান করেছেন। তাঁরই উপদেশে বাঙালী আটা, আলু ও কচুতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এখন খাদ্যের যে অবস্থা চলছে তাতে তিনি অভ্যাস বদলাবার জন্যে কোন্ ফিরিস্তি দান করবেন? তিনি বলেছেন, 'চেঁড়স ও ঝিঙা ছাড়া আর সব কিছুরই দাম বেড়েছে।' দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাঁর এই অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত নই। কেন না বাজারে যারা যায় তারা জানে এই দুই বস্তুরও দাম বেড়েছে। তবে চেঁড়স ও ঝিঙা দিয়ে অভ্যাস বদল করা যাবে কিনা সেটা হয়তো পরে জানা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এবার অনুরোধ, তিনি যখন মূল্যবৃদ্ধিরূপ সত্যটা দীর্ঘকাল পরে হলেও উপলব্ধি করেছেন—তখন তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্তির আসল কারণটার খোঁজ করুন। যে মুনাফাবাজী ও কালোবাজারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষকে হার মানিয়ে দিয়েছে—তা নিবারণ করতে গিয়ে তিনি যদি অপ্রাসঙ্গিক কথা তোলেন কিম্বা এখনো কোনো নতুন আইন রচনার জন্য সময় চান এবং অযথা কালক্ষেপ করেন—তাহলে বলা বাহুল্য, সমস্যা জটিলতর হবে। তবু আমরা প্রাথমিকভাবে আশ্বস্ত যে অনেক তথ্য অজ্ঞাত থাকলেও একটা সত্য তিনি প্রকাশ করে দিয়ে দেখালেন যে, সরকার নিজেও কি রকম অপ্রাজ্ঞ, অপরিণামদর্শী ও অসহায়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আমরা নাকি এগুচ্ছি। হয়ত বা হ'বে। অন্তত জীবন নিয়ে জুয়া খেলায় আমরা যে যথেষ্ট উন্নত (?), যথার্থ সিদ্ধ হ'য়েছি একথা নিছক গুজব নয়। তাই এই প্রচলিত 'যুগের হাওয়ার' বিরুদ্ধে যিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে যান তাঁর প্রতি নজর পড়ে সহজেই। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই 'প্রতিশ্রুতি' পরিণতিতে হ'য় 'প্রতারণা'। আর 'আশ্বাস' হ'য়ে ওঠে 'অভিনব চাতুরী'। তবুও এমনি দিনে রুদ্ধ বাতাসে যখন শুনি : Either profiteering breaks or I break—'হ'য় মুনাফাকারীর শেষ নতুবা আমার শেষ'—কোথায় যেন আত্মবিশ্বাসের ঝংকার, অঙ্গীকার কানে বাজে। আর সে কারণেই বুঝি শ্রীসুব্রহ্মণিয়মকে ঘিরে আমাদের আশা-ভরসার অন্ত নেই। ভারতের নতুন খাদ্যমন্ত্রী দারুণ খাদ্য-সংকটের দিনে মুনাফাবাজ মজুতদারদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন আপোষহীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের নায়ক হ'বার যোগ্যতা তাঁর অবশ্যই আছে। তিনি তারুণ্যদীপ্ত উচ্চাভিলাষী। সর্বোপরি একনিষ্ঠ সত্যসেবী।

মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর জেলায় ১৯১০ সালে শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের জন্ম। আইনে স্নাতক হ'বার পর মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে আত্মোৎসর্গ করলেন তিনি। সহাস্যে বরণ করে নিলেন (তিনবার) কারাবাস। স্বাধীন ভারতে মাদ্রাজের অর্থমন্ত্রী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন শ্রীকামরাজের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। কংগ্রেসের দলীয় শক্তির রেষারেষি থেকে আত্মসম্বরণ করে এসেছেন চিরদিন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। ক্ষমতাসীন নেতাদের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও জনকল্যাণ চেতনার একান্ত অভাব তারই বিপরীত সার্থক বিকাশ শ্রীসুব্রহ্মণিয়মের চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদে প্রথম তিনি যোগ দিয়েছেন ইস্পাত ও ভারী শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে।—১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর। এরপর তাঁর ওপর খনিজ বিভাগের দায়িত্বও ন্যস্ত হ'য়েছিল। ভারতের সামগ্রিক শিল্পোদ্যোগে শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় দপ্তরের ক্ষমতাশালী মন্ত্রীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি সারা ভারতের শিল্পপ্রসারে এনেছেন বিপুল সাড়া। তাঁর মত নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অর্জন আর পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাহচর্যলাভ। বিশেষ করে বৈদেশিক আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর দূরদৃষ্টি ও কঠোর মনোভাব ভারতের আত্মমর্যাদা আর নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশী মূলধনের সুনিয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর। শিল্পপ্রয়াসের ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোকপাতে বারবার আমরা আপ্লুত হ'য়েছি। তাই বোকারো পরিকল্পনায় আমেরিকার সাহায্য বন্ধ হ'লে তিনি বিচলিত হ'ন নি। বরং নতুন উদ্দীপনায় তিনি উপায় সন্ধান করেছেন। আবার বোকারোয় সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য প্রকল্পেও তিনি এই ভারতীয় পরিকল্পনার ওপর কর্তৃত্ব হারান নি। মনে করেন নি এটা সোভিয়েট মন্ত্রণাগোষ্ঠী—Dasturco-র অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য তাঁর এই মনোভাবের দরুণ সন্দেহবাদী আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছে প্রচুর। কিন্তু স্থিরলক্ষ্য সুব্রহ্মণিয়ম অপরাজিত থেকেছেন প্রতি ক্ষেত্রেই। শিল্পোন্নয়নে বা কারিগরী প্রচেষ্টায় প্রভূত আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হ'য়েছেন সুব্রহ্মণিয়ম। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ভারতীয় বা বিদেশী ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে তিনি অদমনীয় কর্মপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

সুব্রহ্মণিয়ম

এই হ'ল সুব্রহ্মণিয়ম—এতদিন যাঁর কথা আর কাজ, সাধ আর সাধ্য সমান তালে পা ফেলে এসেছে দ্বিধাহীনভাবে। আজ শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় তাঁকে আমরা পেয়েছি আরও জটিল, গুরুত্বপূর্ণ, সমস্যাসংকুল আসনে—ভারতের খাদ্য ও কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীরূপে। ভারতের অগণিত জনতার ক্ষুন্নিবৃত্তির দায়িত্ব নিতে হ'য়েছে তাঁকে। সুব্রহ্মণিয়ম সফল হ'বেন—এটাই আমাদের কাম্য। তবে অসাধু ব্যবসায়ীদের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর একা দাঁড়ান সত্যি দুরূহ। তাই জনগণের প্রতিনিধিদেরও সক্রিয় সাহচর্যে দাঁড়াতে হ'বে তাঁর পাশে। আর আমরা—জনসাধারণ—আমাদের শুভেচ্ছাসহ সামগ্রিক জনশক্তির প্রয়াসসিদ্ধ 'পাশুপত' অস্ত্র তুলে দেব এই তরুণ সারথীর হাতে। আমাদের সংঘবদ্ধ সোচ্চার সংকল্পেই সুব্রহ্মণিয়মের সিদ্ধি।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

ভর্তৃহরি কে ছিলেন,—একজনই ছিলেন না একাধিক ছিলেন, এসব সমস্যার মীমাংসা হয় নি। 'শৃঙ্গার-শতক' যদি তাঁর লেখা হয়, তাহলে 'বৈরাগ্য-শতক'ও তাঁরই লেখা। তবে, 'নীতি-শতকে'র লেখক বোধ হয় তিনি নন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত,—তাঁর এবং অধ্যাপক সুশীলকুমার দের প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে সেই কথাই বলা হয়েছে।

জীবনের সমস্ত আকর্ষণ সত্ত্বেও আমাদের এই ইহলীলা যে হঠাৎ একদিন ফুৎকারে ফুরিয়ে যায়,—আমরা যে সত্যিই কালের পুতুল, ভর্তৃহরি তাঁর এইসব চমৎকার উক্তিতে সে-কথা বলে গেছেন। কালিদাসের পরে, সংস্কৃত-সাহিত্যে দু'তিনটি শ্লোকে সমাপ্ত অজস্র যেসব প্রকীর্ণ কবিতার ধারা বয়ে গেছে, ভর্তৃহরি ছিলেন সেই ধারার কবি। তিনি একক নন। তাঁর সমধর্মী ছিলেন আরো অনেকে।

এইসব প্রকীর্ণ প্রেমের কবিতার সব চেয়ে আগেকার সংকলন ছিল 'অমরুশতক'। খ্রীষ্টাব্দের ১১০০র কাছাকাছি কোনো সময়ে আমাদের এই বাংলা দেশে প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতার সংকলন বেরিয়েছিল। বৌদ্ধ সংগ্রাহক বিদ্যাকরের সংকলনখানির নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ' বা 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়', আর, লক্ষ্মণ সেনের এক মন্ত্রীর ছেলে শ্রীধরদাসের সংকলনের নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

আজ এসব সংকলনের কথা থাক্। ভর্তৃহরির প্রসঙ্গই আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, এইরকম শৃঙ্গারধ্বনিময় আধ্যাত্মিক কবিতার আর এক প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন দ্বাদশ শতকের কেন্দুবিল্ব গ্রামের কবি জয়দেব।

জয়দেবের যাঁরা সমকালীন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর্যা-সপ্তশতীর কবি গোবর্ধন। কবি হাল-এর গাথা-সপ্তশতীর আদর্শে তিনি তাঁর এই কাব্য লিখে গেছেন।

আবার, বাণ লিখে গেছেন 'চণ্ডী-শতক'। তাতে কিন্তু অন্য ধরনের আবেদন। প্রধানত ধর্ম-সাধনার দিকেই চোখ রেখেছিলেন তিনি।

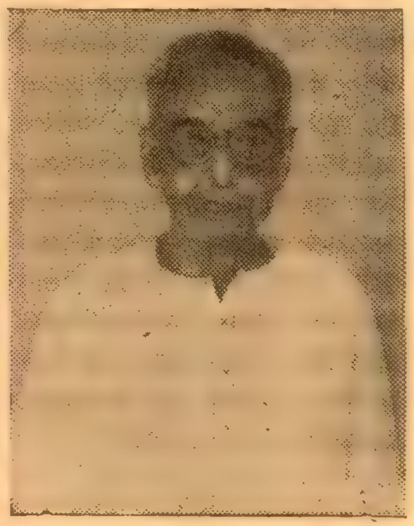

ডঃ সুশীলকুমার দে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মন্তব্যে ভর্তৃহরির উল্লেখ দেখে, সংস্কৃত কাব্যধারার এই বিশেষ দিকটির সব-কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করা অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু সে-দায়িত্ব নেওয়া অন্য মজির সাধ্য; সে অন্য প্রেরণা। আজ, পুরুষের মনে রমণী-রূপের আকর্ষণের তত্ত্ব একদিকে,—আর, সেই কঠিন টানের সমস্ত অনিবার্যতা সত্ত্বেও পৃথিবীতে আমাদের এই পার্থিব অস্তিত্বের নশ্বরতার চিন্তা অন্যদিকে,—এই দু'দিকের সাহিত্য-ভাবনা ভাবতে-ভাবতে জয়দেব-অমরু-শতক-ভর্তৃহরির কথাই এক ঝলকে মনে এলো।

শোনা যায়, জয়দেবও সন্ন্যাসী ছিলেন। 'শৃঙ্গার-শতকে'র নিরানব্বুই -এর শ্লোকে ভর্তৃহরি বলে গেছেন যে, আগে তাঁর কাছে জগৎ ছিল রমণীমাধুর্যের ক্ষেত্র,—পরে বিবেচনার অঞ্জনের গুণে তাঁর দৃষ্টি বদলে যায়,—তখন তিনি বোঝেন যে, এ-জগৎ ব্রহ্মময়। উনিশ—আর কুড়ি-নম্বর শ্লোকে তিনি বলেছেন পুরুষের পক্ষে এ-জীবনে দু'টিমাত্র পথই খোলা আছে,—হয় হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে ঘোরো,—না-হয় সুন্দরীর আলিঙ্গনে চেতনা মুছে যেতে দাও।

অধ্যাপক সুশীলকুমার দে এ-উক্তির উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, এ-থেকে বোঝা যায়—ভর্তৃহরির মন দুল্‌তো এই দুই প্রান্তের মধ্যে। নর-নারীর শরীর যে পুতুল। আসঙ্গ যে ক্ষণস্থায়ী। চুয়াল্লিশের শ্লোকে সেই কথাই বলে গেছেন ভর্তৃহরি।

একালের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে সেকালের ভর্তৃহরিকে আমি সাহিত্যের একই মহাদেশে বিদ্যমান দেখছি যে, তা নয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন উপনিষ-দের বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভর্তৃহরির অনেক সংশয় ছিল। সে-সংশয় তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত সন্ন্যাসের গল্পগুলিতেই ধরা পড়ে।

কে জানে, 'শৃঙ্গার-শতক' যাঁর লেখা, সেই একই ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' লিখেছিলেন কী না! চীনা-পরিব্রাজক ই-সিঙ তাঁর ভারত-ভ্রমণকথা লেখেন

খৃষ্টাব্দের ৬৯১এ। তার পঞ্চাশ বছর আগে, ভর্তৃহরির মৃত্যু হয়। ই-সিঙ অবিশ্যি পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকাকার এবং বাক্যপদীয়ের লেখক যে কোন্ ভর্তৃহরি, সে-বিষয়ে কিছু বলেন নি; তবে তিনি ভর্তৃহরি সম্বন্ধে চমৎকার একটি কাহিনী লিখে গেছেন। ডক্টর দের লেখাতেই সেটি আমার প্রথম নজরে পড়ে। কাহিনীটি এই যে, ভর্তৃহরি পর পর সাতবার গৃহী হয়েছিলেন,—সাতবার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। সংসারের বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাওয়া যে কতো শক্ত কাজ, ভর্তৃহরি তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলেন। ই-সিঙ এ-বিষয়ে ভর্তৃহরির একটি শ্লোকও স্মরণ করে গেছেন, আর ম্যাক্সমুলার সেই ভিত্তিতেই তাঁর এই মত দাঁড় করিয়েছেন যে, কবি-ভর্তৃহরিই সেই বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি; অর্থাৎ তাঁরা দুজন নন,—দুয়ে মিলে এক,—দু'য়ে এক, একে দুই।

কিন্তু এ-মত গ্রাহ্য নয় অনেকের কাছে। কারণ, শতক-কাব্যের কবি যে ভর্তৃহরি, তিনি ছিলেন বৈদান্তিক শৈব-ধর্মে বিশ্বাসী; তাঁকে বৌদ্ধ মনে করবার কারণ নেই।

যিনি বৈরাগী, তিনি সংসারীও হতে পারেন; কিন্তু যিনি শৈব, তিনি বৌদ্ধ হবেন কোন্ উপায়ে? এ-সমস্যাও সমস্যা! মানুষের সমস্যা যে কতো রকম,—কতো সমাধানহীন অন্ধকার আমাদের এই জীবনযাত্রার পদে পদে,—আজ সে-কথা ভাবতে গিয়ে কিছুতেই গুরুগম্ভীর কিছু মনে আসছে না। বরং গ্যেটের সেই কথাই আজ আবার গভীরভাবে মনে এলো যে, মানুষের মন 'বহুরূপী'!

যিনি সাতবার সন্ন্যাস নিয়েছেন এবং সাতবার ঘরে ফিরে গেছেন, তাঁরই একটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ মনে এলো। ভর্তৃহরির এই অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক সুশীলকুমার দে। আমাদের একালের তরুণ কবিরা এসব দেখেছেন কিনা জানি না। হয়তো একালের তরুণদের কাছেও ভর্তৃহরি সমাদরণীয় বলে বিবেচিত হবেন। আমি সুশীলবাবুর সেই অনুবাদটি ভুলতে পারি নি—যাতে তিনি ভর্তৃহরির সত্যিকার আধুনিক বাণী-বাহক হয়েছেন। অনুবাদে ভর্তৃহরির মন্তব্য খুবই স্পষ্ট কথায়, অথচ গভীর ভাবে সরস হয়ে উঠেছে—

অতি-দুরারোহ রয়েছে সমুখে
  পর্বত দুটি উচ্চরূপ;
ভীম দেহ-বনে ঘন ভুজলতা,
  রয়েছে আড়ালে নাভির কূপ;
সে-অঙ্গ ভ্রমে অনঙ্গ ব্যাধ,
  কটাক্ষ হয় শরটি তার,
  কান্তার সেই দেহ-কান্তারে,
  হে মন-হরিণ ঘুরোনা আর।

যৌবনে একসঙ্গে তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-চেতনা এবং শান্ত মন পাওয়া ভাগ্যের কথা। যাঁদের তা আছে, তাঁরাই জানেন যে, সুস্থ পুরুষের জীবনে একদিকে আকর্ষণ করে আশ্চর্য এই রমণী-লাবণ্য, আর অন্যদিকে দেখা দেয় এই অনিবার্য অবসানের শ্মশান! মনের হরিণকে তাই সাবধান করে দিতেই হয়। ভর্তৃহরির সাতবার গৃহত্যাগের যন্ত্রণার কিছু চিহ্ন থেকে গেছে এই শেষ ছত্রটিতে।—'কান্তার সেই দেহ-কান্তারে হে মন-হরিণ ঘুরো না আর'।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর দে সংস্কৃতভাষা থেকে কেবল ভর্তৃহরির অনুবাদটুকুই দেন নি, তিনি নর-নারী-আসঙ্গলিপ্সার আরো কিছু কিছু চমৎকার অনুবাদ লিখেছিলেন এক সময়ে। সন্দেহ হয়, সেগুলি অনুবাদই তো?—নাকি তাঁর নিজের কথা? বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে অমরুর উক্তির প্রতিধ্বনি—তাঁর আর একটি রচনা দেখেছিলুম—

'যৌবরাজ্যে নূতন নৃপতি
  বসিল মদন ক্ষণেকতরে
অরাজক ভাবি সকল অঙ্গ
  লুণ্ঠন করে পরস্পরে;
নিতম্ব লুটে কটির গুরুতা,
  বক্ষ-তনিমা উদর হরে
চরণের যত চঞ্চল গতি
  লোচন আসিয়া হরণ করে।'

আবার, কবি হাল-এর নামে পরিচিত তন্বী নারীর তনিমার ব্যাখ্যা অধ্যাপক-কবি সুশীলকুমারের অনুবাদে আমি প্রথম বাংলায় উচ্চারণ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সে-দু'ছত্রও স্মরণীয় কবিচাতুর্যের উদাহরণ—

'কত নারী তব হৃদয় ভরেছে,—
  সেথা হায় আর স্থান ত নাই;
তন্বী নিজের অতি ক্ষীণ তনু
  আরো ক্ষীণ আজ করেছে তাই।'

অশ্বঘোষ এবং ভর্তৃহরি, দুজনের নাম স্মরণ করে, অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-ই তাঁদের এই উক্তি বাংলায় লেখেন—

'মুখে শুধু মধু ঝরে রমণীর,
  বুক তার শুধু গরলে ভরে,—
তাই সে-অধরে পান করে সবে,
  বুকে বুঝি তাই পীড়ন করে।',

রাজশেখরের এই মন্তব্যও তাঁরই অনুবাদে বাংলায় পাওয়া গেছে—

'কর্ণাটী নারী অধর,
  চাহনি গৌরী মারাঠির,
বক্ষ-গরিমা অন্ধ্রদেশের
  প্রগলভা রমণীর
লাটীর কোমল বাহু,
  মলয়ীর তর্জনী-তর্জন,—
সব ছাড়ি কবি রাজশেখরের
  কাশী যেতে আজ মন।

রমণীরূপ-লাবণ্যের এই ভূস্বর্গ ছেড়ে, রাজশেখরও মনে মনে কাশী যেতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মানুষের মনের এই বহুরূপী মেজাজ কি শুধু জার্মানির, না-কি একলা গ্যেটের-ই? সংসারের উল্টোপিঠেই সন্ন্যাস! আসক্তির পরপৃষ্ঠাতেই এই অবসাদ।

অবিশ্যি, সাহিত্যের ধারায় এমন মেজাজও আছে, যাতে ধর্ম-দর্শন-বৈরাগ্যও কটাক্ষের বিষয় হয়ে ওঠে,—যেমন

সুশীলবাবুর অনুবাদে ধর্মকীর্তির এই সংকীর্ণ কবিতায়—

'বুঝি না—এ হেন রূপটি স্রষ্টা
নয়ন মেলিয়া কেমনে গড়ে;
নয়নে পড়িলে, মুগ্ধ বিধাতা
ছাড়িত কি তারে ক্ষণেক তরে?
নিমীলিত-চোখে এ রূপ-সৃষ্টি
সম্ভব নহে, বুঝেছি তাই—
বুদ্ধের এই কথাটি সত্য—
জগতের কোনো স্রষ্টা নাই।'

জগৎ কার্যকারণের অমোঘ পারম্পর্যমাত্র। এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না যে, বিশেষ কোনো স্রষ্টা চোখ চেয়ে, বিশেষ কোনো ফলের আশায়,—নিশ্চিত কোনো লক্ষ্যের অভিলাষে রমণীর মোহিনী রূপ সৃষ্টি করেছেন। তথাকথিত বুদ্ধবচনের উল্লেখ করে, সুচতুর ধর্মকীর্তি এই সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। তাঁর এ-মেজাজ ত্যাগের নয়,—এও রূপানুরাগ। তবে, রূপ-স্তুতি বলা যায় না একে। এতে দক্ষ কবির চাতুর্যের ঝোঁকটাই স্পষ্ট।

ধর্মকীর্তি যেমন বুদ্ধবচনের উল্লেখ করে চাতুর্য দেখিয়ে গেছেন, একজন অজ্ঞাত কবির দু'ছত্র কবিতায় তেমনি পাণিনির লিঙ্গ-প্রকরণ সম্বন্ধে এক চতুর প্রয়োগ দেখিয়েছেন সুশীলকুমার। তিনি লিখেছেন—

'হায় রে পাণিনি, বলেছ মনেরে
নপুংসক যে কি ভুল করি,—
তাই শুনে তারে প্রিয়ার নিকটে
পাঠানু—এখন বিপদে মরি।'

পুরুষের মনও তা নয়, স্ত্রীলোকের মনও তা নয়। অজ্ঞাত কবি ঠিকই বলে গেছেন। মন আমাদের নপুংসক নয়। আমাদের দেহের মধ্যে দেহীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে। সে কতোবার কতো ভেক ধরেই যে নিজেকে অনুভব করতে উদ্যত। লক্ষ্মীধর-এর নাম উল্লেখ করে সুশীলবাবু এই অনুবাদে সে-বিষয়ে ইশারা দিয়েছেন—

'বিশীর্ণ বপু, সকল বিষয়ে নিস্পৃহ
অন্তর,
নাসায় বদ্ধ নয়ন, মৌনে একান্ত
তৎপর;
সবে মনে হয় একাভিনিবেশ
করিয়াছ বুঝি ধ্যন,—
কোন্ জন সেই একজন,
সখি,—বুদ্ধ, না বল্লভ?'

মর্তের এই প্রেম আর মুক্তির বাসনা দুইই বোধ হয় পাশাপাশি বাস করে। এ শুধু একজনের মেজাজের কথা নয়। এই আমাদের স্বভাব। লক্ষ্মীধর যে একাভিনিবেশের উল্লেখ করে গেছেন সেটা আপাতদৃষ্টিতে কটাক্ষ বটে, কিন্তু একটু সুর বদলে দিলেই ও-কথা প্রায় রবীন্দ্রনাথের কথার কাছাকাছি এসে পড়ে। আমি 'কড়ি ও কোমলের' 'চুম্বন' কবিতাটির এই ক'টি ছত্রে সেই সান্নিধ্যের ব্যঞ্জনা বোধ করি—

'অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।'

এই তীর্থযাত্রার মেজাজই বৈরাগ্যের সিঁড়ি ধরে যখন আর কিছুদূর এগিয়ে যায়, তখন মনে পড়ে রামপ্রসাদের কথা—

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

এবং—

গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে
ভক্তিবারি সেঁচে দে না
একা যদি না পারিস মন
রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।

মনের স্বরগ্রামে এসব পরস্পরের খুবই সন্নিহিত ধ্বনি। ভাবলে অবাক হতে হয় বটে, কিন্তু এই তো আমাদের স্বভাব।

আমরা বাঙালীরা,—তথা ভারতবর্ষের মানুষরা, হয়তো স্বভাবতই একটু বেশি রকম ভক্তিবাদী,—একটু চোখে পড়বার মতন তীর্থঘেঁষা। তাই, আমাদের দেহনির্ভর প্রেমের অনুভূতিতেও কথায় কথায় তীর্থের কথা এসে পড়ে।

কিন্তু তাই কি? অন্য দেশেও কি ঠিক এই অবস্থায় এইরকম প্রতিবর্ত বা প্রতিক্রিয়াই চোখে পড়ে না?

বোদ্‌লেয়ারের 'লে পারফুঁ' নামে ছোটো একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। তাতে বোদ্‌লেয়ার তাঁর পাঠককে জিগেস করেছিলেন,—

'গির্জার হাওয়ায় ধূপের যে গভীর সৌরভ, আপনি তা কি কখনো ফুসফুসে ভরে গ্রহণ করেন নি? গন্ধপাত্রে কস্তরীর সুগন্ধের যে রেশ থেকে যায়, তার স্বাদ পাননি কি কখনো? সে যেন গভীর কোনো এক যাদুমন্ত্র,—যাতে আমাদের অতীত রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে বর্তমানে,—যাতে নেশা লাগে মনে। প্রেমিকের কাছে রমণীর রমণীয় শরীর তেমনি স্মৃতির পরমাশ্চর্য ফুল তোলবার বাগান।

তার নরম, নিবিড় চুল সেই গন্ধপাত্র,—সে যেন কুঞ্জবনের ছায়ার ঘ্রাণ—বনের কটুতিক্ত ঘ্রাণ যেন,—তার নির্ভেজাল যৌবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা তার পোষাকের মসলিন আর ভেলভেট থেকে পশমের গন্ধ উঠলো।

গভীর আস্বাদন এইভাবে কোনো দেশে তীর্থের অনুষঙ্গ নিয়ে আসে, কোথাও বা গির্জার। কথাটা একই। শুধু ভাষার রকমফের এসব।

অর্থাৎ যা সুন্দর, যা সুখানুভূতির নিবিড় স্বাদ দেয়, সে-কোনো স্থূল পদার্থের বাধা নয়,—বাঁধন নয়। মসলিন ভেলভেট, রক্তমাংস সবই কোনো এক নিবিড় ঘ্রাণে গিয়ে পৌঁছোয়। সেই জন্যেই সাহিত্য আমাদের প্রিয় পথ। আমরা নিত্যপথচারী।

মর্তের ধুলো-জল-খড়-মাটিকে এইভাবে দেশে দেশে মনের প্রতিমা বানিয়ে তুলছেন কবিরা। সমস্ত প্রতিমার মধ্যে আবার সেই খড়মাটির নিরেট উপস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছেন বৈরাগী। ভর্তৃহরির মধ্যে এই দুই বিপরীত গতিরই সহ-অবস্থান নয়,—পাশাপাশি অবস্থান। শৃঙ্গার আর বৈরাগ্য এ-জগতে দুই-ই এক সত্যেরই এপিঠ-ওপিঠ।

কিন্তু এসব কি শুধু সাহিত্যের কথা আর সাহিত্যিকদেরই কথা?

তোৎ মনের মধ্যে অন্য এক গূঢ় কণ্ঠের জবাব শুনতে পাই। মনে হয়, মানুষ মাত্রেরই আত্মকথা এসব। সমস্ত অনুভূতির মধ্যেই বৃহৎ সাধারণ অসামান্য এক 'আমি'-র গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যেন। অমরু, ভর্তৃহরি, জয়দেব, বোদ্‌লেয়ার—পৃথিবীর নর-নারী-শরীরের সমস্ত রূপতৃষ্ণা আর আসঙ্গলিপ্সার স্বপ্নসমারোহের মধ্যে বেজে ওঠে আকস্মিক এক ঝঙ্কার—

> 'আমি উন্মাদ।—পর্ণকুটীরে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছি, সাগরবালুকায় গৃহ-রচনা করিয়াছি। আমি নিদাঘ-ঝটিকায় তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছি—আমি ভালবাসিয়াছি। হায় উন্মাদ। ক্ষয়িতমূল নদীতটে আসন্ন আঁধারে কার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছ? ধূলি ধূলিকে আলিঙ্গন করিতেছে। মৃত্যু-পুরোহিত বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। উহার নাম কি? প্রেম। মৃত্যুরোগের অব্যর্থ ঔষধ? একা থাকিলে মরিয়া যাইব তাই আর একজনের হাত ধরিতে হইবে? এক ভিখারী আর এক ভিখারীকে অন্ন দিবে, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইবে? বর্ষারাত্রে বজ্রবিদ্যুন্ময় আকাশতলে গৃহহারা আমি কাহাকে জড়াইয়া ধরি? যখন মস্তকের উপর কৃতান্তের শাণিত কৃপাণ দুলিতেছে, তখন নিমীলিত নয়নে কাহার অধরসুধা পান করিতেছি।'

এই অন্য কণ্ঠই সেকালের ভর্তৃহরির,—একালের মোহিতলাল মজুমদারের। মোহিতলাল সম্বন্ধে এই কথাটাই আমার বিশেষ ভাবে মনে হয়। তাঁর 'জীবন-জিজ্ঞাসা'র 'আমি' প্রবন্ধ থেকে এই অনুবাদটি তাই মনে এলো।

কিন্তু মানুষের এ-অদৃষ্টের কথা শুধু প্রেমের ব্যাপারেই নয়, সমস্ত আশা, যুদ্ধ, —সমস্ত জয়-পরাজয়ের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। আমরা ভাবি এক, হয় আর এক। সাহিত্যের দেশে-মহাদেশে আমাদের এই অভিজ্ঞতাই নানারূপে ছড়িয়ে আছে। ১৩২১-এর পৌষের 'মানসী'তে মোহিতলাল এই যেসব কথা লিখেছিলেন,—প্রতিমা থেকে বস্তু-মাটিতে পৌঁছোবার এই যে তাঁর দুঃখদাহ,—এই কথাই ১৩৪৩এর ১৫ই জ্যৈষ্ঠের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অন্যভাবে—

মানুষের অহংকার পটেই
  বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
    না, না, না,
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
  না আমি, না তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন
                সাধনা
  মানুষের সীমানায়
  তাকেই বলি 'আমি'।

'শ্যামলী'র এই 'আমি'র কথা কে না জানেন?

প্রেমে, প্রেমাতিশায়ী গূঢ় আকর্ষণে পৃথিবীর মানুষ চলেছে রূপ থেকে তত্ত্বে, তত্ত্ব থেকে রূপে। দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া। আমেরিকার হুইটম্যানও সেই একই কথা বলে গেছেন। আজ সে-দেশে হুইটম্যানের ভক্ত পাঠক ঠিক কী রকম সংখ্যায় বিদ্যমান? আশা করি, হুইটম্যানও আমাদের এই বিব্রত, বিভ্রান্ত, বিচলিত বর্তমানকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি। মনে পড়ছে তাঁর কথা—

হে হৃদয়, চলো ভারতে;
উপলব্ধি খোঁজো এশিয়ার পুরাণকথার
    আদিম সব উপাখ্যানের।
বিশ্বের উদ্ধত সব সত্য শুধু নয়,
শুধু নয় আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার
প্রাচীন পুরাণ আর উপকথাও শুনব
    —এশিয়ার ও আফ্রিকার।
  —আত্মার দুরন্ত আলোকচ্ছটা
    মুক্ত অবাধ স্বপ্ন,
অতলস্পর্শী জীবন-বেদ ও কিংবদন্তী
কবিদের দুঃসাহসিক জল্পনা—
প্রাচীন সব ধর্মপথ
প্রভাত সূর্যস্নাত কমলের চেয়েও সুন্দর
        সব দেবায়তন,
স্বর্গাভিমুখী সেই সব কাহিনী
আমাদের জ্ঞানের সীমার শাসন
    অবজ্ঞায় যা এড়িয়ে যায়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কথার সূত্র ধ… আমার মন আজ ভর্তৃহরির শৃঙ্গার আ… সন্ন্যাস থেকে হুইটম্যানের 'ভারত পথিক' কবিতায় এসে পৌঁছোলো। হুইটম্যানের এ-অনুবাদ প্রেমেন্দ্র মিত্রের। আবার, শুধু জাগে… সেই হুইটম্যানও কি আজকের অতি সাম্প্রতিক অন্ধকার দুর্দিনে হারিয়ে যাবেন? আজকের তথাকথিত অন্য যে 'জাগরণ'-কে আমরা আধুনিকতার একমাত্র গণনীয় মর্জি বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করছি, সেই অধ্যাত্মবোধবর্জিত ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, ভয়ঙ্কর জাগরণই কি একমাত্র সত্য? আমরা কি এই দুর্দিনে অনড়, সুস্থির, অচল বৃক্ষের মতো এই অন্ধকারেই শিকড় বেঁধে রাখবো?

থাক্, থাক্—এসব প্রশ্ন থাক্। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককেই বোধ হয় এই প্রশ্ন শোনাচ্ছি আজকাল। আমরা ছটফট করছি। আমাদের কিছুই যেন ভাল লাগছে না। খবর-কাগজে প্রতিদিন রুগ্ন ঘোড়ার একই হ্রেষাধ্বনি। ছ্যাকরা গাড়িটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাৎরাচ্ছে। অনেক খুনে, বদমাইশ, বখাটে আমাদের রাস্তায়। আমাদের নদীর জল ছাই-ছাই। আমরা অন্নের ক্ষতরোগে জর্জর। ক্ষয় আমাদের প্রত্যহের প্রদাহ। কব্জীতে ঘড়িটা ঠাণ্ডা। হে হৃদয়, তুমি অসুখী। তুমি অসুখী, তুমি অসুখী তুমি অসুখী।

হুইটম্যানের এই কয়েক ছত্র তবু আমি তোমাকেই শোনাতে চাই—

যাত্রার তর সয় না,
  শিরায় শোণিত আমার চঞ্চল
নোঙর তোল এখুনি হে হৃদয়
কাটো তীরের বন্ধন
  তোলো সমস্ত পাল।
এই মাটিতে গাছের মত
  কত দীর্ঘকাল থাকব দাঁড়িয়ে,
পশুর মত শুধু ক্ষুধা মিটিয়ে।
  অনেক গ্লানির দিন কি কাটেনি?
শুধু পুঁথি পড়ে মনকে উদ্‌ভ্রান্ত অন্ধ
      করিনি কি বহুদিন?

(ক্রমশঃ)

একটি উদ্দীপক সঙ্গীতের ইতিহাস

মোহিত রায়

উদ্দীপক একটি সঙ্গীত : 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।' এই সঙ্গীত একদা আমাদের প্রবল প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছিল, গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নিবিড় দেশপ্রেমে জাগরিত করেছিল, স্বদেশ-সত্তায় সঞ্জীবিত করেছিল। এই সঙ্গীতের বীরত্বব্যঞ্জক মর্মস্পর্শী সুরে অনুরণিত হয়েছিল আমাদের সারা দেহ-মন, উন্মাদনা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল আকাশ-বাতাস-ধরাতল। বৈদেশিক শাসন-শোষণ-উৎপীড়নে শাসিত শোষিত উৎপীড়িত বাঙালী-চিত্তের মুক্তি ঘটেছিল এই সঙ্গীতে, সেই কর্মচঞ্চল জাতীয় জীবনের অভীপ্সা রূপায়িত হয়েছিল এই সঙ্গীতে, দেশ-প্রেমময় হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগ কল্লোলিত হয়েছিল এই সঙ্গীতে। ফলে, আমাদের সাময়িক অবসাদগ্রস্ত হতাশাকীর্ণ নির্জীব নির্জিত হৃদয়ে এসেছিল অসীম আগ্রহ, অধীর আনন্দ, অপূর্ব উদ্যম, প্রমত্ত উৎসাহ। সেদিনের কথা ভোলা যায় না, ভোলবার নয়।

আমাদের জাতীয় চারণকবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই সঙ্গীতের রচয়িতা। এই সঙ্গীত রচনার পিছনে আছে একটি উজ্জ্বল ইতিহাস।

১৯০৭ সালের জুন মাস। সারা দেশ তখন স্বদেশী-আন্দোলনের বন্যায় প্লাবিত। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন চাকরী-উপলক্ষে গয়ায় আছেন। সেই সময় তাঁর কাছে গেলেন অতিথি হয়ে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রলালও ছিলেন জগদীশচন্দ্রের পরিচিত, বন্ধুবিশেষ। গয়াবাসকালে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, বন্ধুত্ব নিবিড় হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত, নাটক ও অন্যান্য রচনার সাথে জগদীশচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র-জীবনের বীণকার দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একখানি পত্র থেকে জানা যায় :

'কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

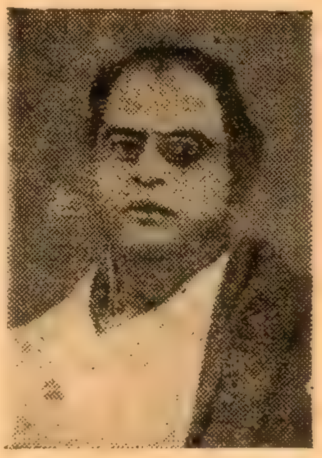

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যে ভাষার করুণ-ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল। ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভারবহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার-মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে ?—ধর্ম-যুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্র-ধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।'

জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেছিলেন : 'আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙলা দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া-উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত' একবার সেই আদর্শ বাঙালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।'

স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেন—জুলাই ১৯০২। তার পাঁচ বছর পরের ঘটনা। তাই একথা সহজেই অনুমেয় যে, হয়তো জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বামী বিবেকানন্দের মহান আদর্শের কথাই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করতে অনুরোধ করেছিলেন।

২৫শে জুন ১৯০৭ সাল তারিখের এক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখেন : 'গত পরশু স্বদেশপ্রাণ মনীষী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে স্বদেশী সঙ্গীত-রচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন।'

সেদিনের ঘটনার প্রতিবেদন :

দ্বিজেন্দ্রলাল জগদীশচন্দ্রকে 'মেবারু পাহাড়' সঙ্গীতটি গেয়ে শোনালেন। জগদীশচন্দ্র আত্ম-সমাহিত হয়ে পড়লেন। তখন জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে বললেন : 'আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতাম

তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা—বাঙালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।'

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বিজ্ঞানী জগদীশ-চন্দ্রের স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করবার সেই অনুরোধ রেখেছিলেন। দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন: 'মাতৃভূমির সুসন্তান, দেশভক্ত জগদীশ-চন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখনই এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং তাহারই ফলে মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধের মহান সঙ্গীত—আমার দেশ—রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ও বাঙালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।'

সঙ্গীতটি রচিত হয় এক বিশেষ দিনে। শারদীয় মহাষ্টমীর পুণ্যদিনে দেবকুমার রায়চৌধুরী তখন গয়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আছেন। দুপুরবেলায় আহারাদির পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও দেবকুমার বসে গল্প করছেন। হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন: 'দেখ, আমার মাথার মধ্যে একটা গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া তারি জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বোসো ভাই,—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।'

দ্বিজেন্দ্রলাল কক্ষান্তর হলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দূর থেকে হাত-তালি দিয়ে 'গুন্‌-গুন্‌' করে গাইতে গাইতে সেখানে এসে দেবকুমারকে বললেন: 'উঃ কি চমৎকার গানই লিখেছি। শুনবে?—শুনবে নাকি? আচ্ছা, তবে শোন।'—এই কথা বলে গেয়ে উঠলেন: 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।' দ্বিজেন্দ্রলাল বারবার কয়েকবার সঙ্গীতটি করলেন। দেবকুমার অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সেদিন রাত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে এলেন গয়ার জেলা-জজ সুপণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক লোকেন্দ্রনাথ পালিত। আবার গাইলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দেবকুমার লিখেছেন:

'আমার দেশ—গানটি শুনিয়া প্রৌঢ় পালিত সাহেবের সেই যে অপূর্ব উন্মাদনা দেখিয়াছি, এ জীবনে তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।'

পরের দিন এলেন জেলা-জজ কবি বরদাচরণ মিত্র। সেদিনও দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতটি করলেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিতও তখন সেখানে ছিলেন। সঙ্গীত শেষ হলে মুগ্ধ হয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন: **'Oh, how wonderful—how magnificent! Let me confess My dear Dwiju, it's undoubtedly the very-very-very best and noblest national song that I've ever heard or read in my life. It's indeed a Divine inspiration.'**

সঙ্গীতটিকে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও খুব ভালবাসতেন। আর তাই হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে গাইতেন। এই প্রসঙ্গে দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন:

'গানটা রচনার সময়েই যে, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে তাঁহার সারাটা হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিলেন শুধু তাহাই নহে; গায়বার কালেও ইহাতে তাঁহার মন-প্রাণ একান্তেই নিমজ্জিত করিয়া দিতেন এবং অদম্য ভাবাবেগে তিনি তখন প্রকৃতই তন্ময় ও আত্মহারা হইয়া যাইতেন।'

'আমার দেশ'—এর সাঙ্গীতিক পরিচয়—মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা। এই সঙ্গীতটির দুটি চরণ প্রথমে ছিল:

'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ।
দেবি আমার। সাধনা আমার।
স্বর্গ আমার। আমার দেশ।'

—পরে লোকেন্দ্রনাথ পালিত, বরদাচরণ মিত্র ও দেবকুমার রায়-চৌধুরীর অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল বদলিয়ে লেখেন:

'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য।
মানুষ আমরা নহি ত মেষ।
দেবি আমার। সাধনা আমার।
স্বর্গ আমার। আমার দেশ।'

—এই পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন: 'সে-যুগে রক্তের কথা থাকলে সরকারের রক্ত গরম হয়ে উঠত।' কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ও এই মত পোষণ করেন।

সঙ্গীতটি ভাব, ভাষা ও সুরের বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে উজ্জ্বল। কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন:

'বঙ্গ আমার, জননী আমার—এই গানটি শুনে বাঙালী প্রথম বুঝল ঐ গানের কবিত্বটাই বড় নয়, তার চেয়ে ঢের বড় ওর সুর, যে সুর তারা আগে কখনো শোনে নি। গানের সুর যে হৃদয়কে এভাবে জাগিয়ে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারে তা তারা কখনো কল্পনাও করে নি। এ-গান তার সুরবাহনসহ একদা প্রত্যাদেশের মতোই তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়—যেন বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো।—দ্বিজেন্দ্রলালের এই গান বাংলার সহস্র সহস্র তরুণ হৃদয়কে শুধু যে অনুপ্রাণিত করেছিল তাই নয়, তরুণ হৃদয়কে জাতীয় সংগ্রামে, বহু দেশভক্তকে সর্বস্ব উৎসর্গ করতেও প্রণোদিত করেছিল।'

সঙ্গীতটির সাঙ্গীতিক-ধর্মের উৎকর্ষ বিচার করলে দেখা যায় যে, সঙ্গীতটির সুরে ও ভাষায় অন্তর্নিহিত আছে একটি বীরভাব। সঙ্গীতটি গীত হলে অনুভূত হয় সেই ভাব। এই সঙ্গীতটিতে সুর ও বাণীর মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে, ফলে হয়েছে অপূর্ব সুন্দর। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতগুলিতে সাধারণত সুরেরই প্রাধান্য ছিল। বাণী সেখানে মুখ্য ছিল না, ছিল সুর। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত এবং ইংরাজ-ফরাসী-জার্মান সঙ্গীতের সুর নিঙড়িয়ে নিয়েছেন। তারপর সুরে দিয়েছেন বাণী। তাই সুরের তানে মুগ্ধ হয়ে মর্মগত ভাবরস আমরা গ্রহণ

করি নিবিড়ভাবে। এই সঙ্গীতে পরিবেশনযোগ্যতা এবং সৃষ্টির নবীনত্ব—এই উভয় শিল্পধর্মের খাতিরে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বহির্বিন্যাসকে যদিও আহরণ করেছেন; কিন্তু এর মর্মমূলে রয়েছে সনাতন মার্গসঙ্গীতের আত্মিক-ধ্বনি।

দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বদেশ-ভাবাত্মক সমবেত সঙ্গীতের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করে নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন: 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক এষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের বাণী যেমন ওজোগুণসমৃদ্ধ, তেমনি সুরের বাঁধুনিতেও বলিষ্ঠতা ও বীর্যব্যঞ্জকতা। সুর থেকে একটা সাংগ্রামিক চেতনা যেন স্বতঃই ঝ'রে পড়ছে।'

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: 'আগে তাঁর কণ্ঠে এসেছে সুর, তারপর সুরকে তিনি দিয়েছেন বাণীরূপ। সুরের সঙ্গে বাণীর এমন রাজযোটকতা বাংলার খুব কম গানেই দেখা যায়।'

দ্বিজেন্দ্র-দুহিতা মায়া দেবী (বন্দ্যোপাধ্যায়) লিখেছেন: 'দেশ-মাতৃকার প্রতি তাঁর প্রেম গানে অপরূপ-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমার দেশ—গানের কথা অত্যন্ত সহজ কিন্তু প্রাণের, তাই আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে, হৃদয়কে আপ্লুত করে।'

এই সঙ্গীত প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য ঐতিহাসিক তাৎপর্য-মণ্ডিত। তাঁর মতে (অর্ঘ্য, শ্রাবণ, ১৩২০): 'বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ'-এ তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে।'

শশাঙ্কমোহন সেনও লিখেছেন (বঙ্গবাণী, ১৯১৫): 'বাংলার এমন গ্রাম নাই যেখানে - - - দ্বিজেন্দ্রলালের আমার দেশ - - -বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী নব-স্পন্দনে ঝঙ্কারিত করে নাই।'

পৃথ্বীশচন্দ্র রায় কৃত 'Life and times of C. R. Das—The story of Bengal's self-expression' গ্রন্থে আছে: 'The national song composed during the period by Dwijendralal Roy - - - smote on the heart of the people as on a giant's harp, awakening out of it a storm and a tumult such as had never been known through the long centuries of her political serfdom.'

এই সঙ্গীত প্রসঙ্গে ডক্টর রথীন্দ্র-নাথ রায় লিখেছেন: 'অতীত গৌরবের ইতিহাস-চিত্রকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, দেশের বর্তমান দুরবস্থার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, আশাবাদী কবির কণ্ঠ এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। - - - এই স্বদেশী গান শুধু বীররসের উদ্দীপক নয়, শুধু চিত্ত আলোড়নকারী উল্লাস-মাত্র নয়—উদ্দাম ভাবাবেগ থেকে গভীর ভাবসত্যের এক অবিচলিত উপলব্ধি।'

কবিপুত্র সুগায়ক দিলীপকুমার রায় লিখেছেন: 'কথা ও সুরের সংমিশ্রণে যে আগুন জ্বলে উঠত, সে আগুন আর কোনো বাংলা গানেই জ্বলে ওঠে নি।'

তৎকালে বাংলার আকাশে-বাতাসে যখন স্বদেশ প্রেমের উন্মাদনা ও জননী-জন্মভূমির উজ্জীবন মন্ত্রের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট গোচর, সেই অগ্নিক্ষরা যুগে তদানীন্তন তরুণ কবি মোহিতলাল মজুমদারের প্রত্যক্ষ শ্রবণজাত অনুভূতি এখানে উদ্ধৃত হল: - - এক বিরাট সভায় সহসা একটি সদ্যমুদ্রিত গান বিতরিত ও গীত হইবার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। উচ্চকিত চমকিত হইয়া সেইগান শুনিয়াছিলাম; সেই স্থান ও কালের নাটকীয় সংস্থানে, সে গানের ভাব ও সুর প্রাণে যে অননুভূতপূর্ব আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল, আর কখনও অনুরূপ অবস্থায় তেমন হয় নাই। সেদিন সার্কুলার রোডের সেই ভাবী মিলন-মন্দিরের শূন্য প্রাঙ্গণে, বিপুল জনসভায়, বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতেছিলেন; সেই বক্তৃতার পূর্বাহ্নে মুদ্রিত গানটি বিতরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে—বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ—যে অপূর্ব সুরে, উদাত্ত মধুর দৃপ্ত স্বর-সংযোগে গীত হইতে লাগিল, এবং সেই বিশাল জনমণ্ডলীর হৃদয়ে তাহার নীরব প্রতিধ্বনি বায়ুমণ্ডলে যে তাড়িত সঞ্চার করিতেছিল, আজও যেন তাহা শুনিতেছি ও অনুভব করিতেছি—সেই আকাশ-বাতাস যেন আমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। - - -

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীতের মতো এইটিও একটি 'কোরাস—গর্ভগীত।' এই সঙ্গীতগুলির 'প্রাণোচ্ছল শক্তি' নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে নিয়েছেন বা অনুকরণ করেছেন—একথা অনেকে বলে থাকেন। প্রসঙ্গত, প্রাজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বক্তব্য স্মর্তব্য: 'এই গানগুলিতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণ নেই, মূর্ছনাগুলি কোন না কোন রাগের আকৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু সবগুলি গান পাশ্চাত্য

কাকের আকাশ

পিনাকরঞ্জন সাহা

কাকের আকাশে আলো, হবিষ্যান্ন লোলুপ জিহ্বায়;
যেন বা অর্গলমুক্ত চারিভিতে, অভুক্ত থালার
পুণ্যে, তর্পণের আলো খেলা করে হাবড়ে সভায়;
মুক্ত চোখে বিশুে আলো সুপ্ত চোখে পিতল আঁধার।

কাকের আকাশে ফেরে কারো পিতা, কারো পিতামহ,
বিদেহী নামে না স্রোতে, প্রতিবিম্বে পুরানো প্রহরে,
কাঙাল ভোজনে, দানে, সংকীর্তনে, শীতল প্রবাহ
খেলা করে, অনুজের অশ্রু ছোটে গহীন সায়রে।

কাকের আকাশে আলো, যেন কেউ ভুবনবিদিত
ছড়িয়ে গেছেন ক্ষমা, অসামান্য তণ্ডুলের দান;
বিকল্পে আকাশ কালো, স্মৃতিলতা, যেন বা নিশিত
ঝড়ে অকস্মাৎ ছেঁড়ে, রৌদ্রে ভাসে ভাগানের গান।

কাকের আকাশে আলো আলোছায়া দীপ্ত পৌষ মাস,
পিতল আঁধারে নামে কারো মূর্ত শোক সর্বনাশ।

তুমি

দিবারঞ্জন মালাকার

সমস্ত জীবন তুমি দুই চক্ষে শুধু ঘুমঘোর
সমস্ত জীবন তুমি অন্তিম শোকের পটভূমি;
সকল ঘটনাগুলি অবলীলাক্রমে ঘটে গেলে
জাহাজঘাটায় একা তুমি।

সারাদিন কার সঙ্গে যুদ্ধ করি, তোমার, আমার?
সারাদিন স্বপ্নে ছায়া মেঘের মতন আয়োজন,
সমস্ত জীবন আমি মনে মনে সোচ্চারে তোমাকে
সব বলে চেয়ে দেখি হৃদয়ের ছায়ায় বিজন।

এখন চীৎকার করি মনে মনে, রক্তের জাহ্নবী
বহে না চরণ ছুঁয়ে, ধরে না সকল দেহভার;
ভাটিয়ালী নক্ষত্র ভেসে আসে সিনেমার মত
বদ্ধ ঘরে, এই কোলকাতার।

কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের ধাঁজে পরিবেশিত হইবার আশ্চর্য যোগ্যতা রাখে।'

একদা (১৩২১ সালে) অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'আমার দেশ' সঙ্গীতটির সুরের সম্বন্ধে বলেছিলেন (কলকাতায় টাউন হলে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি রূপে): 'দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতের সর্বনাশ সাধন করেছেন।' (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২)।—এর উত্তরে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রে লিখেছিলেন :

'আমার দেশ'-এর সুর ঝিঁঝিট। কিন্তু এ ঝিঁঝিট এবং বাংলা ঝিঁঝিটে তফাৎ এত বেশি যে, প্রচলিত ঢঙে এ গান গাইতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়বে। অথচ, আমার দেশ-এ ঝিঁঝিটের সকল সুর বজায় আছে এবং তার তালও পুরামাত্রায় একতালা। ---দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতকে যে একটি নূতন পথে চালাতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে করে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞতার নয়, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।'

এই উদ্দীপক সঙ্গীতটি রচিত হয় বিশ শতকের প্রথম দশকে। সেই রেনেসাঁস যুগে চলেছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন। বাংলা দেশে তখন এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণ। বিশ শতকের সেই দশক বাংলা দেশ ও জাতির কাছে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গের পূর্বের, পরের ও রদ হবার সময়ের আমাদের দেশের প্রবল উৎকণ্ঠায় ভরা অবস্থা ইতিহাস-খ্যাত।

এই সময়কার সাহিত্যকর্মীদের চিন্তা-ভাবনা সবই একই সুরে বাঁধা। সর্বচিত্তে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার সার্বিক প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের পুরোধা। তাঁরা শুধুমাত্র শিল্পী ছিলেন না—ছিলেন শিল্প-সাধক। উনিশ শতকের যে সমস্ত মানবপথিক পরাধীন ভারতবর্ষের উজ্জীবনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—তাঁদের সোন্নত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব শিল্পকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম করেছিল। তাই শিল্পকর্ম তাঁদের পরিচয় বহন করে বটে, কিন্তু শিল্প-বিচারে বারবার শিল্পীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উত্তরকালে তাঁদের প্রাণশক্তি কেবলমাত্র শিল্পে নয়, স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব-ধর্মে দীপ্যমান হয়ে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালও ছিলেন এমনি ব্যক্তি-মানসের অধিকারী। তাঁর 'আমার দেশ' সঙ্গীতটি আজও সুরে-বাণীতে অম্লান হয়ে আছে দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তি-মানসের স্বাতন্ত্র্যে, চরিত্রের শক্তিতে, স্রষ্টার জীবন-সাধনায়, কবি-ব্যক্তিত্বের পৌরুষে। এই সঙ্গীতটির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব নিবিড়ভাবে মিশে আছে বলেই সঙ্গীতটির উদ্দীপকধর্ম আজও আমাদের প্রবল প্রেরণা জাগায় এবং আশা করা যায়, আগামী-কালেও এই কারণেই সঙ্গীতটি স্মর্তব্য হয়ে থাকবে।

রাজধানী :

নয়াদিল্লীর গরম এখনও কমে নি—প্রবল বর্ষণও গরম কমাতে পারে নি। অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের ভূমিকা নিয়ে যত গরম পুঞ্জীভূত হয়েছিল সে-উত্তাপ আর এখন নেই। পালাম বিমানঘাঁটিতে বিলাত-ফেরত অর্থমন্ত্রীকে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে-ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাতে গণমনের উত্তেজনা কিছুটা ছাইচাপা পড়েছে মাত্র—নিবু নিবু করলেও সহজে নিভে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী সাংবাদিক সম্মেলনে কম নাজেহাল হন নি। পঞ্চাশ মিনিট ধরে কাঠগড়ার আসামীর মত তাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ সইতে হয়েছে। আসামীর মতই জবাবও তিনি দিয়েছেন—তিনি নির্দোষ। তিনি এমন কিছুই করেন নি যা আপত্তিকর। কমনওয়েলথ সম্মেলনের প্রচারিত ইস্তাহারে পাক-ভারত সমস্যার উল্লেখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সুবিধা কোন দিক দিয়েই হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী ভুলে যাচ্ছেন, দেশের মানুষ কলুর বলদ নয়। চোখে ঠুলি লাগিয়ে ইচ্ছেমত ঘুরপাক খাওয়াবার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ভারতের প্রধান শত্রু তার দুই পড়শী—পাকিস্তান ও তার দীক্ষাগুরু নয়া চীন। পাকিস্তানের কূটনৈতিক চালে তিনি ভারতের

শ্রীকৃষ্ণমাচারী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন : পালাম বিমানঘাঁটিতে সম্বর্ধনা

ইজ্জৎ—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছেন। জঙ্গী চীন ভারতের বুকে আঘাত হেনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির, তার সমাজ-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে চীনই আজ প্রধান অন্তরায়। তার থাবার আঘাতকে ঠেকাবার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে বিরাট অঙ্কের টাকা। অর্থমন্ত্রী নিজেকে যত বুদ্ধিমান ও চতুরই মনে করুন না কেন, চীনের ভারত আক্রমণের ব্যাপারে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করে ইস্তাহারে চীনের পররাজ্যগ্রাসী দৌরাত্ম্যের কথা ঢোকাতে পারেন নি।

এ বিষয়ে কেন তিনি পীড়াপীড়ি করলেন না ? প্রশ্নটি সাংবাদিকরাই তুলেছিলেন। অর্থমন্ত্রীর জবাব যেমন চমকপ্রদ তেমনি হাস্যকর। তিনি উত্তর দিয়েছেন, "আমি সিংহাসনে বসে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের কাছে 'নজরানা' দাবী করবো—এ-আশা আপনারা করেন কি করে ?" সত্যি তো, এ-আশা অন্যায়। তিনি নিজে কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের দাবী তামিল করে নজরানা দিয়ে এসেছেন। সাধারণ মানুষের কানে এ-জবাব শ্রুতিকটু হয়েছে। তাদের মতে জবাবটা বৃটিশ আমলের খয়ের খাঁর মতই হয়েছে।

আসল কথা দিন গেছে পাল্টে। পাল্টিয়েছে কমনওয়েলথের গোটা আবহাওয়া। অর্থমন্ত্রীর মত সেকেলে মানুষের কর্ম নয়। তাই তাঁর ওপর টেক্কা মেরেছে আয়ুব। তাঁকে না পাঠিয়ে বেশ ক্ষুরধার যুক্তির, নতুন চিন্তাধারার অধিকারী কাউকে পাঠানোই উচিত ছিল। লোকেরও অভাব ছিল না। ছিলেন শ্রীচাগলা, ছিলেন শ্রীঅশোক সেন। এঁদের একজনকে অথবা যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজনে দুজনকে পাঠালে ভারতের গৌরব কমনওয়েলথে ম্লান হতো না। নয়াদিল্লীর মানুষ, সারা ভারতের মানুষ তাই মনে করে। শ্রীসেন সম্প্রতি মালাউই ও কেনিয়াতে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। এর আগেও তিনি বুদ্ধিমত্তা এবং কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন আরন দেশে ভারতের বক্তব্য পেশের সময়।

দক্ষিণের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের কথাও কেউ কেউ তুলেছেন। জলভরা ভারী হাওয়ার চাপটা নাকি নেতৃত্বকে নরম করে দিয়েছিল। এ-অভিযোগ অবাস্তব হওয়াই স্বাভাবিক। মুস্কিল হলো, এদেশে আবার অসম্ভবও সম্ভব

হয়, অবাস্তব ও বাস্তবের আকারে আবির্ভূত হয়ে বিষম বিপাকের সৃষ্টি করে। তেমন অঘটন ঘটে থাকলে সমূহ বিপদ বলতে হবে। দেশের স্বার্থ আঞ্চলিক আবদার রক্ষায় বিপন্ন করে তোলার নজীরের অভাব আমাদের কম নয়। নেতৃত্ব এখন থেকে হাল শক্ত করে না বাঁধতে পারলে আখের সামলাতে পারবে না। কাজেই সাবধান থাকা প্রয়োজন।

* * *

মালাউই ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ ঘুরে এসে বাইরে ভারতের প্রচার-কার্যের কঠোর সমালোচনা করে আইন ও সমাজ নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে।

ভারতের আজ বড় প্রশ্ন হ'ল তার নিরাপত্তা। চীন ও তাঁবেদার

● শ্রীঅশোক সেন

পাকিস্তান একযোগে ভারতের সর্বনাশের সূচনা করে তুলেছে। মালাউই ও টাঙ্গানিকায় এ-বিষয়ে ভারতের প্রচার শ্রীসেনের মতে অত্যন্ত দুর্বল এবং বলিষ্ঠ চিন্তাধারা-বর্জিত। ভারতের বক্তব্য সে-দেশের মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছয় নি। চীনের প্রচার-কার্য সেখানে যেমন জোরদার তেমনি সুসংগঠিত।

আইন ও সমাজ নিরাপত্তা মন্ত্রীর রিপোর্টের পর বিদেশে ভারতের প্রচার ব্যবস্থাকে আধুনিক ধাঁচে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনটা সরকার উপলব্ধি করেছেন। আমরা এই প্রয়োজনের কথা বারবার উল্লেখ করেছি। এবার একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সরেজমিনের অভিজ্ঞতা কাজটা ত্বরান্বিত করবে বলেই আমরা আশা করি।

* * *

বলছিলাম, দিল্লীর গরম এখনও কমে নি। শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে কেন্দ্র করে সঞ্চারিত উত্তাপ হ্রাস পেলেও পণ্য-মূল্যের বাজারের আগুন, শ্রীবিজু পট্টনায়কের সাম্প্রতিক মন্তব্য, নাগা-দরদী রেঃ মাইকেল স্কটের শান্তির ছলনা, কালোবাজারী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের কারসাজী ও দুর্নীতি-দমনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রচেষ্টা নয়াদিল্লীতে গুমট গরমের সৃষ্টি করেছে।

খাদ্যাভাব ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশ-ছোঁয়া মূল্যে সারা ভারতে উঠেছে ব্যাকুল আর্তনাদ। আর্তকণ্ঠের সে-আওয়াজ এসে আছড়ে পড়ছে দিল্লীর দরবারে। গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিহার, পশ্চিম বাংলা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্র প্রভৃতি প্রতিটি রাজ্যে উঠেছে হাহাকার। ধাপে ধাপে দিনের পর দিন অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে প্রত্যেকটি জিনিষের দাম। মানুষ দেখতে পাচ্ছে বেশি পয়সা দিলেই চোরাবাজারের গোপন পথে সব জিনিষই পাওয়া যাচ্ছে অঢেল। গেল এক সপ্তাহেই মূল্য বেড়েছে আট শতাংশ। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ছে সরকারের অসহায় অবস্থা দেখে। কয়েকটি রাজ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দল এর মোকাবিলার জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব চালাচ্ছে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম থেকে সুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের হুঙ্কারে কাজ হয় নি। গরীব মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে ব্যবসায়ীদের জুয়াখেলা তাঁরা বন্ধ করতে পারেন নি। খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের নয়া নক্সা এখনও রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে। রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্ধান্তও সমস্যার সুরাহা করতে পারে নি। সম্মেলনের নীতিকে সক্রিয়ভাবে সর্বত্র কার্যকরী করা হয় নি। মহারাষ্ট্র সরকার এতদিনে আদেশ জারী করেছেন মজুতদারদের হাত থেকে খাদ্যশস্য বের করে আনার। বিহার সরকার গ্রামাঞ্চলে রেশনিং চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এইসব আদেশ ফলাও করে প্রচার করলেই খাদ্যশস্য বেরিয়ে আসবে না। আদেশ অনুযায়ী কাজ করার আন্তরিকতার অভাব হলেই হৈ-হল্লাই সার হয়—কাজ তাতে কিছু এগোয় না। পশ্চিম বাংলা তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

এ-ভাবে চলতে পারে না। এর বিপদের কথা আমরা আগে অনেকবার বলেছি। আগ্রা, রাজকোট, কলকাতা প্রভৃতি এলাকায় বুভুক্ষু মানুষ খাদ্য-শস্যের গাড়ি আটক করেছে, দোকানের তালা ভেঙে লুঠ করেছে। এর পর সমস্যা আরও ঘোরালো হবে। দেখা দেবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা। কাজেই সরকারের পক্ষে আর গড়িমসি করা উচিত হবে না। বোম্বাই বন্দরে অপেক্ষমাণ খাদ্য বোঝাই জাহাজের দেরির কথা অভুক্ত মানুষের পেট বুঝতে চাইবে না বেশি দিন।

* * *

পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেলদের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ পুলিশকে গুণ্ডা দমনে তৎপর হতে উপদেশ দিয়েছেন। পুলিশের কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। গুণ্ডা দমন, শিষ্টকে সাহায্য পুলিশের প্রধান কাজ।

আমাদের পুলিশের আচরণ ঠিক তার উল্টো। চোর, অসাধু ও অপরাধ-পরায়ণ, দাগী অপরাধী ও গুণ্ডাদের হাতে-নাতে ধরিয়ে দিতে গেলে পুলিশের পেরেশানীতে মানুষকে পিছিয়ে আসতে হয়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের প্রতিই যেন তাদের অনুকম্পাটা অধিক। পুলিশ এমন হ'ল কেন? সকল পুলিশই কি অসাধু? তা' হতে পারে না। গুণ্ডারা অনেকেই দাদাদের বড় অনুগত। তারা দাদাদের দরবারে হাজির হয়ে খালাসের হুকুম আনতে পারলে পুলিশকে তোয়াক্কা করবে কেন? শ্রীনন্দের কাছে এ-সব ঘটনা অজানা থাকার কথা নয়। তবে, শ্রীনন্দের আন্তরিকতা ও সাহসিকতা সন্দেহাতীত। তিনি গুণ্ডা দমনে, দুর্নীতি দমনে সফল হবেন, এই কামনাই দেশবাসী করে।

* * *

উড়িষ্যার জবরদস্ত নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক রুষ্ট হয়ে উঠেছেন। রাগটা তাঁর কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের ওপর। দুর্নীতির বিরুদ্ধে নন্দজীর অভিযান তিনি যেন সহ্য করতে

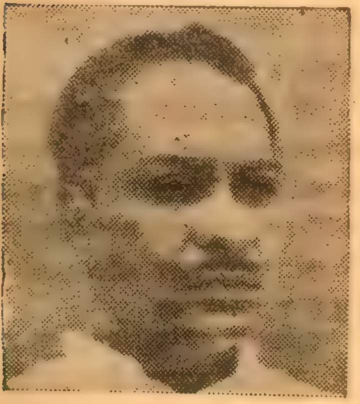

● শ্রীবিজু পট্টনায়ক

পারছেন না। তাই তাঁর মুখ থেকে কড়া কড়া বৈপ্লবিক বুলি বর্ষিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এতে একটু হকচকিয়ে উঠলেও, ওয়াকিবহাল মানুষ শ্রীপট্টনায়কের সংগ্রামী চেহারার ভুলবে না। উড়িষ্যার নেতাদের মুখে বিপ্লবাত্মক বাণী তারা আরও শুনেছে। ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের মুখে আমরা কংগ্রেসের ও সরকারের সমালোচনা আগে শুনেছি। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীপট্টনায়কের গুরু। শিষ্য তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

শ্রীপট্টনায়কের অনুগ্রহভাজন হলেন উড়িষ্যার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র। কামরাজ পরিকল্পনা গ্রহণ করেই শ্রীপট্টনায়ক গদী ছেড়েছিলেন। গদীটা একেবারে হাতছাড়া যাতে না হয়, তার জন্যই অনুরাগী ব্যক্তিকে কৌশলে গদীতে বসিয়েছেন। যে-পরিকল্পনার গালভরা প্রশংসা এককালে করেছেন আজ তার প্রতিও কটাক্ষপাত করতে তিনি কসুর করেন নি।

শ্রীপট্টনায়কের বক্তব্য মর্যাদার আসনে আসীন ব্যক্তি ও মন্ত্রীদের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপন করা হচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে। উড়িষ্যার কোন কোন মন্ত্রী, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে চারদিক থেকে। নয়াদিল্লীতে আবার সে অভিযোগের তদন্তের তোড়জোড় চলেছে। শ্রীপট্টনায়ক এর পর আর চুপ করেই বা থাকেন কি করে। তিনি তূণ শূন্য করে চোখাচোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছেন দিল্লীর দিকে।

আমলারা সব সাধু, মন্ত্রীদের সকলের হাত ক্লেদমুক্ত পরিচ্ছন্ন, কালোবাজারের ব্যবসায়ীরা ফোঁটা-তিলক কেটে সত্যের নামাবলী পরেছেন এমন কথা নিশ্চয়ই শ্রীপট্টনায়ক বলবেন না। দুর্নীতি আজ দেশের টুঁটি চেপে ধরেছে। দুর্নীতির যাঁতাকলের পেষণে একেবারে পিষ্ট হতে চলেছে সাধারণ মানুষ। কোটিপতি শ্রীপট্টনায়ক আজ বেসামাল হয়ে দিল্লীর দিকে যত ধারালো বাক্যবাণই নিক্ষেপ করুন না কেন, সাধারণ মানুষ তাকে অযথা বিষোদ্গার ভিন্ন কোন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নয়।

* * *

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে আড়াল করে রেখেছিলেন অর্থমন্ত্রী। এ অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্মেলনে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও শ্রীমতী গান্ধী নিজের কাজ করে এসেছেন অনেকখানি। তিনি বিদেশে প্রচার-যন্ত্র, বিশেষ করে, প্রচারক্ষেত্রে রেডিও এবং টেলিভিশনের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। আশা করা যাচ্ছে, এর পর ভারতে টেলিভিশন প্রবর্তনের আপত্তি বেশি জোরদার হতে পারবে না।

নাগাভূম :

আত্মগোপনকারী নাগাদের সাথে শান্তির আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নাগারা ভারত সরকারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। এর পর কি করা উচিত হবে? এই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। আলোচনার সর্তের সামান্য পরিবর্তনে নাগারা যে মনোভাব প্রকাশ করেছে তারপরও কি আলোচনার পথ খোলা রাখা উচিত হবে?

বিদ্রোহী নাগাদের মনোভাব শান্তি মীমাংসার অনুকূল নয়। অদূর ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে মিটমাটের আশাও কম। এ সব কথা রাজ্য সরকারের কর্ণধারগণ অস্বীকার করেন না। কিন্তু মীমাংসার পথের কোন সুযোগই তাঁরা হারাতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা আলোচনার পথ

● ফিজো

একেবারে রুদ্ধ করে দিতে চাইছেন না। প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শিলু আও ভারত সরকারকে রাজ্য সরকারের অভিমত জানিয়েও দিয়েছেন। নাগাভূমির বাসিন্দারা সামরিক সমস্যার ফয়সালা অপেক্ষা রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসাটাই অধিক কাম্য বলে মনে করে।

● ডঃ শিলু আও

বিদ্রোহী নাগাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় শান্তিকামী নাগারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বিনাসর্তে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার সদিচ্ছা ফিজোর মুখ থেকে প্রকাশের পর রাজ্যের সর্বত্র একটা বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল। ফিজোর চেলাদের মধ্যে চরমপন্থীরা এখন বেঁকে বসেছে। তারাই এখন বিদ্রোহী নাগাদের আসল নেতা। বিনাসর্তে অস্ত্র সম্বরণ করতে এবং আলোচনায় বসতে তারা প্রস্তুত নয়।

তাদের সর্ত মেনে নেওয়ার অর্থ পাল্টা আর একটি নাগা সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া। আলোচনার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তে প্রতিরক্ষাবাহিনীর টহল বন্ধের দাবীও তারা করেছে। ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তানের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ কাজ ভারত সরকার করতে পারেন না। তা ছাড়া, এ দাবী দূরভিসন্ধিমূলক। নাগাদের একটা অংশ এখন বিদেশে গেরিলাযুদ্ধ শিখছে। প্রতিরক্ষাবাহিনীর সতর্কতার জন্যই বিদেশী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা নাগাভূমিতে প্রবেশ করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক সীমান্তের টহলদারবাহিনী তুলে নিলেই দলে দলে তারা ফিরে আসতে পারবে।

এদিকে বিদেশী পাদ্রী মাইকেল স্কটের কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা কানা-ঘুষা চলেছে। নাগারাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার ব্যাপারে একজন বিদেশীকে এমনি করে নাক গলাতে দেওয়াটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত হয় নি। তাঁর উপস্থিতিই বিসদৃশ। অনেকের ধারণা, এই ব্যক্তিটি না থাকলে আলোচনার পথ সুগম হত।

রাজ্য সরকারও এ বিষয়ে একমত। তবে, এই মুহূর্তে স্কট সাহেবকে বিদায় দেওয়ার বিপদের কথা উপেক্ষা করা যায় না। চরমপন্থী বিদ্রোহী নাগারা এতে বিরোধিতার এবং পরিবেশ ঘোরালো করে তোলার সুযোগ পাবে। নরমপন্থীদের তখন পরাজয় স্বীকার করতে হবে চরমপন্থী নেতাদের কাছে। শান্তির পথে বোঝাপড়ার পথটা তাতে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকারের এ অভিমত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাইকেল স্কটের আচরণ কিন্তু সন্দেহাতীত নয়। ভারতের বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় দু'মাসের জন্য সীমান্তে তিনি নিরপেক্ষ শান্তিবাহিনী বহালের আবেদন পেশ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, নাগা-দরদী বিলাতী এই সাহেবটি নাগাভূমিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছেন। এ আশঙ্কা আমরা পূর্বেও করেছিলাম। ভারত সরকার স্কট সাহেবের কূটচক্রে জড়িয়ে পড়লে নাগাভূমিতে সৃষ্টি হবে কাশ্মীরের মত আরেকটি চিরস্থায়ী ক্ষত। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষবাহিনীর হাতে অতি অল্প সময়ের জন্যও সীমান্তের ভার তুলে দিলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

শোনা যাচ্ছে, ভারত সরকার বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা চালাতে সম্মত আছেন। ডঃ শিলু আও সে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। আলোচনার সময় ভারত সরকার নাগাভূমির সর্বত্র বিদ্রোহী নাগাদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা স্থগিত রাখবেন।

● শ্রীচালিহা

শান্তি মিশন নাগাদের সঙ্গে আশানুরূপ সংযোগ রাখতে পারেন নি। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা আসামের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়-প্রকাশও নতুন চিন্তায় মগ্ন। পণ্ডিত নেহরুর তিরোধানের পর খোলা মাঠ পেয়ে তিনি আবার রাজ-নীতিতে প্রবেশের চিন্তায় মশগুল হয়ে আছেন। এ অবস্থায় মাইকেল স্কটের ওপর নির্ভর না করে ডঃ শিলু আওকে নিয়ে নাগাদের সর্তে মুখোমুখি বসবার ব্যবস্থা করলে ভালই করবেন।

আসাম ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর আসামের ভেতরের কিছুটা অঞ্চল জনবসতিশূন্য করে পাকিস্তানী নাগরিকদের বে-আইনী অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করার প্রস্তাব ভারত সরকার অনুমোদন করেছেন।

এ প্রস্তাবটি প্রথম দানা বাঁধতে সুরু করে এ বছরের প্রথম দিকে—শ্রীগুলজারীলাল নন্দের আসাম সফরের সময় থেকে। বাস্তবে একে রূপ দেওয়ার নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করেই এতদিন পাকাপাকি কিছু করা সম্ভব হয় নি। আলাপ-আলোচনা এবং তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণের পর মূল প্রস্তাবের কিছুটা

কাটছাঁট করতে হয়েছে। ৬২০ মাইল সীমান্তের পুরোটাই বসতিশূন্য না করে, পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা যে-সব অঞ্চলে বেশি, সে-এলাকার আধ মাইল ভেতর পর্যন্ত বসতিশূন্য করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

এতে রক্ষীবাহিনীর টহল দেবার যেমন সুবিধে হবে, তেমনি বিরাট এলাকার বাসিন্দাদের অপসারণ ও পুনর্বাসনের ব্যয়সাধ্য কাজের ঝঁকিটাও আর নিতে হবে না।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সীমান্তের কোন কোন অংশে বিভ্রান্তির সৃষ্টিও করেছে। ফলে, দেখা দিচ্ছে নতন সমস্যা। গারো পাহাড়ে জমির লেন-দেন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এ জেলার শতকরা পঁচিশটি পরিবারের বাস সীমান্তের আধ মাইলের মধ্যে। সেরা আবাদী জমিও এখানেই। ধান, পাট ও সরষে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে। এ অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য।

জমি বিক্রি করার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; কিন্তু ক্রেতা নেই। ভয়, আধ মাইল জনশূন্য হয়ে যাবে। রাজ্য সরকার তাড়াতাড়ি এ এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত-ভাবে অবিলম্বে কিছু ঘোষণা না করলে গারোরা জলের দামে জমি মুসলমানদের কাছে বেচে ফেলে নতুন বিভ্রাট ঘটাবে।

পাঞ্জাব :

বিরোধীদের সঙ্গে রামকিষেণ মন্ত্রিসভার একটি জায়গায় কোন গরমিল নেই। রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাকে কায়রোঁ-প্রভাবমুক্ত করার ব্যাপারে উভয় পক্ষই একমত।

এ কাজ সহজ সাধ্য নয়। যেটুকু এ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়েছে, তার পূর্ণ সমর্থন এসেছে রাজনৈতিক মহলের কাছ থেকে। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, জেলদারী এবং গ্রামাঞ্চলের ইমানদারীর উৎখাত ঘোষণা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

বৃটিশ আমলের এই আবর্জনাকে সর্দার কায়রোঁ বহাল করেছিলেন গ্রামাঞ্চলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের জব্দ করবার উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারও কায়রোঁর এ কাজের বিরোধিতা করেছিলেন। সিমলায় গ্রীষ্মকালীন রাজধানী পত্তনের প্রস্তাবও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয়বাহুল্য হ্রাস পাবে এবং পাশের রাজ্য হিমাচল প্রদেশের বিরূপ মনোভাবও কেটে যাবে।

পুলিশকে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাবের ওপরও খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সর্দার কায়রোঁ নাকি তাঁর প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিদের দিয়ে পুলিশ-বাহিনী ভর্তি করে ফেলেছিলেন। এরা সর্দারজীর হুকুম তামিল করতে

● সর্দার দরবারা সিং

বিন্দুমাত্র কসুর করতো না। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বকেও তার প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হয়েছে। পুলিশবাহিনীতে প্রমোশনের বেলায় স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রিয়জনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার দরবারা সিং একটি উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন বোর্ড গঠনের প্রস্তাবও তুলেছেন। কঠোর ভাষায় পুলিশের ত্রুটিবিচ্যুতির নিন্দা করে তিনি বলেছেন, পুলিশের কাজ অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করা—অপরাধীকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা; রাজ-নৈতিক এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন পলিশের কাজ নয়।

নতুন মন্ত্রিসভা সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেও বিপদ তার কাটে নি। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস এখনও কায়রোঁপন্থীদের কবলে। সর্দার কায়রোঁ নীরবে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছেন। কংগ্রেসের ঘাঁটিটি জঞ্জালমুক্ত করা খুব কঠিন। সরকার পক্ষকে সেদিকে নজর দিতে হচ্ছে। এ কাজে প্রথম প্রয়োজন হাইকমাণ্ডের সমর্থন। জেলার স্তরে কংগ্রেস-কর্মীদের সুসংহত করে দলে টানতে না পারলে বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের কথা ইতিমধ্যেই কোন কোন মহলে উঠেছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সতেরটি জেলার অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটিই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের পরিবর্তন কামনা করছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীভগবৎ দয়ালের বড় ঘাঁটি আই এন টি ইউ সির রাজ্য শাখাটি। এ ঘাঁটিও এখন টলটলায়মান। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আসন পেয়েও শ্রীদয়াল আই এন টি ইউ সির সভাপতির পদটি ছাড়েন নি। এ নিয়ে আগেও কয়েকবার কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। এবারে তারা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন।

* * *

আকালীরা আবার মুখোমুখি সংঘর্ষ সুরু করেছে। প্রায় প্রতিটি জেলাতেই সন্ত ফতে সিং ও মাস্টার তারা সিংয়ের অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি।

বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন মাস্টার তারা সিং। হিমাচল প্রদেশের গুরুদ্বারে গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগ এনেছেন সন্ত ফতে সিংয়ের বিরুদ্ধে। নিহাং শিখ ও হিমাচল পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ে মাস্টারের দলটিই কিন্তু আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আন্দোলনের ধরণটাও ছিল মারমুখি।

সন্ত দল পরে সুরু করে বন্দী-মুক্তি আন্দোলন। এই দাবী আদায়ের জন্য একদল কর্মী গিয়েছিল অমৃতসর থেকে হিমাচল প্রদেশে। হিমাচল সরকার যখন বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন সেই সময় এ আন্দোলন চালিয়ে নতুন সঙ্কট সৃষ্টির অভিযোগ তুলেছেন মাস্টার তারা সিং। হিমাচল সরকার কিন্তু সন্ত দলের দাবী মেনে নিয়েছেন।

"শিখ সম্প্রদায়ের পৃথক ও স্বাধীন অস্তিত্বের"—সোজা কথায় শিখ রাজ্যের দাবী নতুন করে তুলে গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগ এনেছেন সন্ত দল মাস্টারের দলের বিরুদ্ধে। এই দাবীর পেছনে সর্দার কায়রোঁর গোপন হস্ত কাজ করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

উভয় দলের অভিযোগের বাস্তব রূপ যাই হোক না কেন, পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা বিগত সাধারণ নির্বাচনে পাঞ্জাবে যেরূপ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল

● সন্ত ফতে সিং

তারই পুনরাবৃত্তির জন্য মাস্টার তারা সিং উঠে পড়ে লেগেছেন।

পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মাস্টার তারা সিং নিশ্চয়ই আগের মত আমল পেতে পারেন না। তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থই হবে। তিনি নিজে এবং তাঁর এ খেলার সন্দেহভাজন সহযোগী খেলোয়াড় সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়েছেন। জনমত যেখানে বিরূপ সেখানে খুব বেশি হলে গোলযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে—অযথা অশান্তিকে ডেকে আনা যেতে পারে। তাতে সাফল্য আসে না। মাস্টার তারা সিং ও সর্দার কায়রোঁর মত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও একথা স্বীকার নিশ্চয়ই করবেন।

* * *

অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী দুটি কমিউনিস্ট উপদলই মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঠেকাবার দাবীতে তারা আন্দোলন সুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ আই টি ইউ সি এক দিনের ধর্মঘট আহ্বান করেছে। তাদের বাম পথের সাথীরা বিক্ষোভ আন্দোলন পরিচালনার এবং বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হলে বিধান সভা ভবনের সামনে সভার সদস্যদের অনশন ধর্মঘটের হুমকী দিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ :

সরকারী পরিচালনায় মধ্য প্রদেশে এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি নাকচ করা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন, বিলাসপুর জেলার কোরবাতে এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি ইউনিট মাত্র স্থাপন করা হবে—পূর্ণাঙ্গ কারখানা খোলা সম্ভব হবে না।

তিরিশ কোটি টাকা ব্যয় করে এখানে একটি পরিপূর্ণ কারখানার

● শ্রী ডি পি মিশ্র

পরিকল্পনাই আগে করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত ইউনিট হবে আয়তনে তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার নিরাশ হয়ে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র নাকি রাজ্য সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে কেন্দ্রের দরবারে আবেদন পেশ করেছেন। স্বার্থান্বেষী ধুরন্ধরদের কারসাজিতেই কেন্দ্রের কলকাঠি নড়েছে বলে অনেকের ধারণা।

শ্রীমিশ্র রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থ এবং দেশের সামগ্রিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। এ্যালুমিনিয়াম কারখানার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের এবং অপরাপর সুযোগ-সুবিধা বিধানের ব্যবস্থাদি ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তা' ছাড়া, এ্যালুমিনিয়াম নির্মাণের কাঁচা উপকরণ বক্সাইট এ অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর।

কোরবায় কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবটি অনেক বিচার-বিবেচনার পরই গৃহীত হয়েছিল। এর জন্য বিশেষজ্ঞ এসেছিল সুদূর হাঙ্গেরী থেকে। তাঁরাই এ জায়গা খুঁজে-পেতে বের করে গেছেন। বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়ে থাকলে কেন্দ্রের পক্ষে বর্তমান সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

দিল্লী থেকে—

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

মহানগর গড়ে উঠছে। দিল্লী মহানগর—পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর আশা-ভরসার প্রাণকেন্দ্র, নবজাগ্রত হিন্দুস্থানের রাজধানী মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের মহাসভায়। শ্রমিকের দল পাথর কাটছে—আরাবল্লীর অঙ্গ কেটে তৈরি হচ্ছে মহানগর। সাত-সাতটা সাম্রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠছে নবজাগ্রত ভারতের রাজধানী—কাল-ভৈরবের মহাশ্মশানে এ যেন কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ের নব তপস্যা।

কুতুব মিনারের শিখরে দাঁড়িয়ে আজ কত দৃশ্যই না চোখের সামনে ভাসছে। দেখতে দেখতে আড়াই হাজার বছর কেটে গেল। দিল্লী মহানগরীর জীবনে আড়াই হাজার বছর ভারতের মহান ইতিহাসের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। একটা জাতির ইতিহাসে এ আর কি? মহাকালের ভালে যেন একটা বিন্দুমাত্র।

অদূরে ঐ তো যমুনা। দিল্লীবাসীর জীবন-কাহিনীর সাথে যার কলপ্রবাহ নিবিড়ভাবে পরিচিত। ঐ তো উত্তরে বাঁকা তলোয়ারের মতন ক্ষীণস্রোতা যমুনা। অদূরে ডানদিকে দেখা যাচ্ছে তোগলকাবাদের ভগ্নাবশেষ। ঐ তো লালকেল্লার চূড়ায় উড়ছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। কুতুব মিনার এখন আর নির্জন টুরিস্ট স্পট নয়। মহানগর দিল্লী ধীরে ধীরে আপন পরিধি বিস্তৃত করছে। নিদ্রিত পাখী ঘুম থেকে উঠেছে। ডানা দুটো ধীরে ধীরে খুলছে যেন। পাহাড় কেটে শ্রমিক দল গড়ে তুলছে মহানগর। ঐ তো হুমায়ুন বাদশার কবরের অদূরে মহাভারতের যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ মহানগরীর উঁচু র‍্যাম্পার্ট।

মহাভারতের যুগ থেকে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতের সম্রাটদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে কেন? ইন্দ্রপ্রস্থের উন্মুক্ত উদ্যানে হয়েছে কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রাম। ভাগ্যের জুয়া খেলা। সে খেলা আজও শেষ হয় নি। পঁয়তাল্লিশ কোটি জনতার ভাগ্য নিয়ে যাঁরা আজ প্রতিদিন জুয়া খেলছেন, তাঁরাও কিন্তু এ রাজধানীর মায়া ছাড়তে পারেন নি।

অদূরে রয়েছে গুরুগ্রাম। লোকেরা স্নেহের সাথে বলে গুরগাঁও। গুরু মানে কুরু-পাণ্ডবের গুরু দ্রোণাচার্য। এখানে ছিল তাঁর আশ্রম। এই পুরানা কিলায় বসতো পাণ্ডবদের কোর্ট। আজ যেখানে ইণ্ডিয়া গেটের ওয়ার মেমোরিয়াল সেখানে সমবেত হত রথিবৃন্দ। কারুর জেট, কারুর ভাইকাউণ্ট। বর্ণনা থেকে তাই মনে হয় না কি? সেদিনের ইন্দ্রপ্রস্থ বিস্তৃত ছিল যমুনার তীর পর্যন্ত। নিগমবোধ ঘাট ছিল তার সীমানায়। পরে সেখানেই গড়ে উঠেছিল সেলিমগড়।

নিগমবোধ ঘাটে শহরের সীমানা-রেখা কে নির্ধারিত করেছিলেন জানি না। তবে সেই প্রাচীন আর্কিটেক্ট-এর নিশ্চয়ই ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। পাথস্ অব্ গ্লোরি লীড্ বাট্ টু দি গ্রেভ। জীবন-সন্ধ্যায় সব মোহ, সব আকাঙ্ক্ষা মুছে মনকে মুক্তি দেয় যে মহাশ্মশান সেই নিগমবোধ ঘাট ছিল সেদিনের ইন্দ্রপ্রস্থের প্রান্তদেশে। সেদিনের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের স্পর্শ বোধ হয় আজও লেগে রয়েছে ঐ মন্দিরটার গায়ে। আজকাল ওটা নীলীছাত্রী মন্দির বলেই পরিচিত। সেদিনের ইন্দ্রপ্রস্থের ছোঁয়া রয়েছে বিশ্বের প্রাচীন মহল্লা রাজধানী দিল্লীর দরিবা কলানে।

কুরু-পাণ্ডবের রাজত্ব গেল। তাদের সেদিনের রাজত্ব বাঁধা রেখে দ্যূতক্রীড়া আজ শুধু ইতিহাসের অঙ্গমাত্র।

তারপর?

তারপর মহাকালের ভালে পড়লো কয়েকটা বিন্দু—মাত্র কয়েক শ' বছর।

রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ লোকের মন থেকে মুছেই গেল। কোথায় গেল তার সে রাজদরবার? সেই বিরাট প্রাসাদ? ঘন সবুজ অঞ্চলে কে তাকে লুকিয়ে রাখলো অবগুণ্ঠনের অন্তরালে? গভীর অরণ্যের বাহু-বন্ধনে ঘুমিয়ে পড়লো রাজধানী মহানগরী।

তারপর?

এই মহানগরী ধীরে ধীরে হাতছানি দিয়ে ডাকলো কাকে? আজও দিল্লীর আকাশে-বাতাসে যাদের ক্রন্দনরোল মিশে রয়েছে—কোথায় সেই জনতা? ইতিহাসে তাদের কথা লিখিত হয় নি কেন? সাম্রাজ্যলোলুপ এ্যাডভেঞ্চারিস্টদের যূপকাষ্ঠে আপন প্রাণ দিয়ে যারা যুগের পর যুগ শুধু তাদের খেয়াল-মর্জি বজায় রেখে এসেছে—কেউ লিখেছেন সেই বলীয়ান জনগণের অশ্রুপূর্ণ কাহিনী! প্রিয়ার বাহুবন্ধন, পুত্রকন্যার সজল চোখের স্বপ্ন দেখে বিদেশাগত যে সাহসী বীর সেনানী শুধু প্রভুর মদমত্ত স্বপ্নকে রূপায়িত করতে গিয়ে সুদূর

হিন্দুস্থানের রাজধানীর ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে—শুনেছেন তাদের কাহিনী? দিল্লীর আকাশে-বাতাসে আজও শোনা যায় তাদের আর্তনাদ। আমি শুধু কান পেতে রই। তাদের প্রাণহীন দেহ যে ধুলোয় মিলিয়ে গেছে—আমার দেহে সেই স্বর্ণরেণুর স্পর্শ রয়েছে। আমি জনতার একজন।

এলো শক, এলো হুণ, এলো পাঠান, এলো মোগল। তারা সব দিল্লীর ধূলোয় এক দেহে লীন হয়ে গেল।

ইন্দ্রপ্রস্থের পর গড়ে উঠলো সুরযকুণ্ড। তুমর রাজপুত অনঙ্গপাল নিজের নামে গড়লেন আনন্দপুর। কর্কশ জমি, রুক্ষ পরিপার্শ্ব ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত হতে পারে, রাজ্য শাসনের পক্ষে সেটা কতখানি কার্যকরী? কার টানে এলেন অনঙ্গপাল? নিরাপত্তা? তা হবে। সুরযকুণ্ডের পাশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো নতুন শহর লাল-কোট।

তুমর রাজপুত নিরাপত্তা পেলেন না। গদী হাতছাড়া হলো। আজমীরের রাজপুত বিগ্রহরাজ দখল করলেন দিল্লীর সিংহাসন। এলেন পৃথ্বীরাজ—বংশের সর্বোজ্জ্বল মণি। শুধু রাজ্য জয়ের ব্যাপারে নয়, হৃদয় জয়ের দিকেও ভারতের ইতিহাসে পৃথ্বীরাজের নাম চিরদিন রইবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে কে আপন প্রেমিকাকে জয় করেছিলেন? পৃথ্বীরাজের পরাজয় দিল্লীর ইতিহাসে এক করুণ অধ্যায়।

'দাস' নগরে এলো দাসের রাজত্ব।

মহম্মদ ঘোরির সাথে দিল্লী পেল নবজীবন। নব শক্তি। ক্ষুদ্র রাজপুত রাজন্যবর্গের রাজ-কাজের কেন্দ্রস্থল নয়, এবার দিল্লী হলো ভারত সাম্রাজ্যের সর্বপ্রথম রাজধানী। হর্ষর মৃত্যুর পরে ভারত সাম্রাজ্যের মানচিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। এবার রাজ্য আবার পরিণত হলো সাম্রাজ্যে। তার প্রাণ রইলো যে সোনার কাঠি রূপোর কাঠির ভিতর তার নাম হলো দিল্লী। দিল্হী—শুধু প্রাণই নয়, প্রাণকেন্দ্র।

সুলতান মামুদ গজনীতে ফিরে গেলেন—আপন সতীর্থ কুতুব-উদ্দীনকে ভারত শাসনের ভার অর্পণ করে। দিল্লী সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের অগ্রদূত হয়ে এগিয়ে এলেন নতুন সুলতান। শরীরের শক্তি, মনের বলকে দ্বিগুণ প্রেরণা জোগালেন পীর কুতুব সাহেব। গজনীর বিজয়স্তম্ভের অনু-করণে গড়ে উঠলো কুতুব মিনার—

দূর থেকে কুতুব মিনারের একটি রমণীয় দৃশ্য।

ভারতে মুসলিম প্রভুত্বের বিজয় ঘোষণা করে। দাস রাজত্বে রাজধানী দিল্লী ছিল শুধু 'ফর্টিফায়েড টাকিস ক্যাম্প'। দাসের দাসত্ব অবসান করে রাজধানী দিল্লী এলো খিলজীদের হাতে।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠল কলরব-মুখরিত মহানগর। শুধু নিরাপত্তার আশ্রয় নয়, শুধু ফর্টিফায়েড টাকিস ক্যাম্প নয়, এবারের রাজধানী হলো পূর্ণাঙ্গ মহানগর। শুধু সশস্ত্র সেনানীর শহর নয়, শুধু রাজা প্রহরীর নগর নয়, মানদণ্ড হাতে নব মহানগরকে সম্বর্ধনা জানাতে এলো বণিক, এলো শিল্পী, আর এলো নবসুপ্রভাতে পাখীর কলকাকলির উষার গানের সুরের গায়ক কবির দল। যে শহর এতদিন ঝুলছিল শুধু জীবন-মরণের পেণ্ডুলামের মত, শুধু রণক্ষেত্রের প্রতীকরূপে সে পেল নবজীবন। সেনানীর প্রয়োজন কে অস্বীকার করবে। তবুও শহরে এতদিন শুধু সশস্ত্র জনগণের বিচরণে দিল্লীবাসীর প্রাণভরে দমটুকু ফেলার ফুরসৎ মিলতো না। এ যেন একটা পাষাণপুরী। রাজধানীর রক্তস্নাত রাজপথে পথচারীর প্রাণের কোনো মূল্য ছিল না। বনের পাখীরা গান ভুলে গিয়েছিল। যমুনার কলতানে ছিল না প্রকৃতির পরম সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনা। আরাবল্লীর গায়ে পলাশের আগুনে ফাগুন এসে লুকিয়ে থাকতো। ফাগুয়া খেলার একটা মাত্র পথই ছিল সবার জানা। সেটা ছিল জনরক্তে রঞ্জিত ফাগুয়া। সেই দিল্লী। নিষ্ঠুর দানবপুরী। পঁয়তাল্লিশ কোটি জনতার জীবন-মৃত্যুর চাবিকাঠি হাতে রোজ-যে যাদু খেলা হচ্ছে তার প্রাচীন রঙ্গভূমি!

আরাবল্লীর বনে বসন্ত এলো। এলো নব পল্লবিত মুকুলিত আম্রকুঞ্জের শাখায় শাখায়। এলো রাজধানী দিল্লীর নবযৌবনে, এলো মাধবী মঞ্জরীর প্রাণমাতানো রূপ-রস-গন্ধে। এলো কবির দল। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে পথপ্রদর্শক—চিরসারথী দার্শনিক।

এবার রাজধানী দিল্লীর আকাশে-বাতাসে শুধু ওয়ার স্ট্যাটেজির আলোচনা নয়। এবার মহানগরীর রাজপথে পথচারীর মুখে নেই ভীত-চকিত চাহনি। অন্ধকার থেকে দিল্লী মহানগর যেন চলেছে আলোর পথে, তমসা থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে চলেছে অমৃতের পথে। বুদ্ধ, অশোক, চৈতন্যর সাথে সুর মিলিয়ে নতুন মন্ত্রগুরুর দীক্ষায় দীক্ষিত দিল্লীবাসী গাইলো নতুন গান—মহামানবের জয়গান। এলেন মহাযোগী

সিদ্ধপুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়া। এলেন আমীর খসরু।

লালকোটের মাইল দুই দূরে আলাউদ্দীন যে নতুন নগর গড়ে তুললেন, তার নাম দেওয়া হল সিরি। দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ আজও প্রাচীন রাজধানীর সাক্ষ্য বহন করে। সেদিনের নতুন রাজধানীর সর্বোৎকৃষ্ট আকর্ষণ ছিল সহস্র স্তম্ভের সভাগৃহ—হল্ অব থাউস্যাণ্ড পীলার্স। নগরের অদূরে নির্মিত হল হউজ খাস—সুইমিং পুল। সুন্দরীদের অবগাহন-বিলাস উপভোগের জন্যই হয়েছিল এ দীর্ঘিকার খনন। পশ্চিমে বেদিং বিউটির আবিষ্কার কবে হয়েছিল জানা নেই, তবে প্রাচ্যে এর জন্ম বললে ইতিহাসের কতখানি পান থেকে চূণ খসবে ঠিক জানি না। নতুন রাজধানীতে নির্মিত হলো হিন্দুস্থানের সর্বপ্রথম মুসলিম প্রার্থনাগৃহ—কোয়াৎ-উল্-ইসলাম মসজিদ। আলাই দরওয়াজার নিপুণ কাজের নিদর্শন আজকের আর্কিটেকচারের শিল্পি-বৃন্দের মনেও নিশ্চয়ই ঈর্ষার উদ্রেক করবে।

আলাউদ্দীন উপযুক্ত পাত্রের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে যান নি। খিলজী বংশের শেষ নৃপতি 'সুইপার কিঙ' খসরু খানের বিরুদ্ধে সবাই শুধু বিদ্রোহই ঘোষণা করল না, তারা খিলজী বংশকে সমূলে শেষ করে দিল। দিল্লীর তখত-তাউস গেল গিয়াসুদ্দীন তোগলকের হাতে।

নব নৃপতি প্রাচীন নগরে তৃপ্ত নন। লালকোট, সিরি হয়ে দাঁড়ালো শুধু ইতিহাসের অঙ্গ। শুধু আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নয়, তখত-তাউসের নিরাপত্তার জন্যও দিল্লীর নৃপতিবৃন্দ আপন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করেছেন নব নব নগর নির্মাণে। দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে নগর প্রাচীরের গাঁ নি। কেউ বা ছুটেছেন উত্তরে, কেউ বা পূবে।

গিয়াসুদ্দীন তোগলক নির্মাণ করলেন তোগলকাবাদ। পুরোনো শহরের পাঁচ মাইল পূবে তৈরি হল নতুন শহর—বদরপুর থেকে ফরিদাবাদের পথে আরাবল্লীর পাহাড়ের গা ঘেঁসে। দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এক একটা দৈত্য, ঠিক যেন গ্রীক সাইক্লোপীয়ান ওয়াল। চাইনিস ওয়াল বললে হয়তো ভুল হত না। চীনের সাম্প্রতিক ব্যবহারে, বর্বরতায় তার নামোচ্চারণেও আজ ঘৃণার উদ্রেক হয় কেন?

● দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার অভ্যন্তরে অবস্থিত হামাম-এর একটি কর্নার।

তোগলকাবাদ নগর হয়েছিল সত্যি, সেখানে হয় নি কোনো আবাদ। স্থানীয় লোকের বদ্ধ ধারণা পাষাণপুরীর জনহীনতার পিছনে রয়েছে মহাপুরুষের অভিশাপ। নতুন নগর নির্মাণের ব্যস্ততায় বাদশা গিয়াসুদ্দীন মহাযোগী নিজামুদ্দীন আউলিয়া সাহেবের মনোবেদনার কারণ ঘটান।

দিল্লীর শ্রমিকবৃন্দ নৃপতির হুকুম তামিল করতো পেটের দায়ে, রাতে করতো পীরের নির্দেশে পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তালাব খনন। রাতের শ্রান্তির জন্য শ্রমিকদের দিনে শহর নির্মাণে ব্যাঘাত ঘটে। শ্রমিকদের সেজন্য মাথা পেতে নিতে হলো সাজা। খাজা সাহেব শুনলেন সব। শুনে বললেন, 'বাদশার এ শহরে হবে শুধু গুজর শিয়ালের বাস।'

কি আশ্চর্য?

হলোও তাই। তোগলকাবাদে পনেরো বছরও রাজধানী রইলো না। রাজধানীই শুধু নয়, শহরের অস্তিত্বটুকুও মুছে গেল। জনমানব-বর্জিত হয়ে এ নতুন মহানগর শ্মশানপুরীতে পরিণত হলো। পুণ্যাত্মা ফকিরের অভিশপ্ত পাষাণপুরী!

রাজধানী পরিবর্তিত হলো।

মহম্মদ বিন তোগলক রাজধানী পরিবর্তনের হুকুম দিলেন। রাজধানী পরিবর্তিত হলো সাতশো মাইল দূরে দৌলতাবাদে।

বাদশার হুকুম হলো সবাইকে দিল্লী ছাড়তে হবে। কেউ থাকতে পারবে না পুরোনো শহরে। কেউ না।

সৈন্য-সামন্তর দল নগর ঘুরতে বেরুলো। আবিষ্কার করলো একজন বৃদ্ধকে। বার্ধক্যের জন্য বেচারা শহর ছেড়ে যেতে পারে নি। শুধু কি বার্ধক্য? আর কিছু না? পিতৃপুরুষের ভিটে-বাড়ি ছেড়ে যেতে কার না মনে বেদনা জাগে? সম্রাটের হুকুম অমান্য করার অপরাধে হতভাগা বৃদ্ধকে বেঁধে দেওয়া হলো একটা বিড়ালের লেজের সাথে। সেই অবস্থায় সৈন্যরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল নতন রাজধানী দৌলতাবাদে।

কাহিনী নয়। বাস্তব ঘটনা। ইতিহাসে এর নজীর রয়েছে যে। সেদিনের জনতা নিশ্চয়ই ছিল মক, বধির, অন্ধ মানুষ নামক জীবের সমষ্টি। যুগ পাল্টেছে। বদলেছে জন-মানসের দৃষ্টিভঙ্গী। আজ তারা অত্যাচারের উত্তর দিতে শিখেছে।

দস্যুর অত্যাচারের করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে দিল্লীর রাজপথের রক্তরাঙা বুকে। শুধু কি 'পাগলা রাজাই' অত্যাচার করেছিল?

মনে পড়ে তৈমুরের তাণ্ডব দলন? খঞ্জ তৈমুরের খড়্গো সেদিন দিল্লীর রাজপথে বয়েছিল রক্তগঙ্গা। দিল্লীর বুকে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে তৈমুর। একটিমাত্র হুকুম। ধৃত এক লাখ ভারতবাসীর ঘাড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল! মানবতার ইতিহাসে এ অত্যাচারের ক্ষমা নেই।

এলো পাঠান।

এলো মোগল।

রাজ্য ভাঙাগড়ার কাহিনীভারে মহানগর দিল্লী তখন শ্রান্ত।

বিদ্যানুরাগী হুমায়ুন বাদশার প্রিয় পাঠাগার থেকে পদস্খলনে মৃত্যু এই দিল্লীতেই ঘটেছে। তখনও দিল্লীর পদমর্যাদা ওঠে নি শিখর সোপানে। পাকাপোক্তভাবে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীর পদমর্যাদা লাভ হলো শুধু সেইদিন। সম্রাট সাজাহানের আগ্রহাতিশয্যে। এবার নতুন রাজধানী বসলো যমুনার তীরে। রাজপ্রাসাদ আড়াল করে দাঁড়ালো রেডফোর্ট। এর পশ্চিম দিকে দুনিয়ার সেরা বাজার চাঁদনীচক। নতুন শহর সাজাহানাবাদ গড়ে উঠলো দিল্লীর বুকে। দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেদিনের সাজাহানাবাদ শহরের ছিল চোদ্দটা গেট। কয়েক শ' বছর কেটে গেছে। আজও তার অম্লান মূর্তি কালের মহাগ্রাসকে তুচ্ছ করে, বিজয়ীর মহোল্লাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাশ্মীরী গেট, দিল্লী গেট, আজমীরী গেট, তুর্কমান গেট কে তৈরি করেছিলেন মনে পড়ে? সাজাহানাবাদের অঙ্গ আজও ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। বৃটিশ ভারতে নির্মিত ইণ্ডিয়া গেটের তুলনায় মোগল যুগের এ দরওয়াজার গাঁথনি যেমন লৌহোপম, সৌন্দর্যেও তেমনই অনুপম। সমস্ত সাজাহানাবাদ শহরটা ছিল ছত্রিশটা মহল্লায় বিভক্ত।

চাঁদনীচক! পুরোনো কলরব-মুখরিত রাজপথগুলোর ভিতর আজ একমাত্র এই চাঁদনীচকই প্রাণবান। কে তাকে বলবে বিগতযৌবনা?

কোথায় আজ সেই সৈন্যদল যাদের চরণতলে ধরণী করত টলমল? রাজরক্তে রঞ্জিত এই পথের বায়ুতেই তো তাদের স্মৃতি বিলীন হয়ে রয়েছে। অদূরের জুম্মা মসজিদ তৈরি হয়েছিল সাজাহান-দুহিতা ধর্মপ্রাণা জাহান আরার অনুরোধে। চাঁদনীচকের সাথে জাহান-আরার জীবনের কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য লুকোনো আছে। দিল্লীর রাস্তা-জগতে চাঁদনীচক সম্রাজ্ঞী। ডেলাইটের ঝলমলে আলোর অলঙ্কারেই ছিল চাঁদনীচকের রূপচ্ছটা। নির্বাক জাহান-আরার মত এই চাঁদনীচক নিজের বুকের উপরের হত্যা, লুণ্ঠন, অরাজকতার নীরব সাক্ষী। এই রাজপথেই অনাবৃত রুগ্ন হস্তীপৃষ্ঠে নিরাভরণ ছিন্নবস্ত্র পরিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ শাহ বুলন্দ একবালকে করানো হয়েছিল শহর পরিভ্রমণ। শাহ বুলন্দ একবাল— ভাগ্যবান শাহজাদা—দারার উপাধি! কি বেদনাবিধুর পরিহাস! অলিন্দে

● দিল্লীর চাঁদনীচকের একটি দৃশ্য

বিচলিতা অসহায়া পুরনারীরা সেদিন অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ফেলেছিল ঝরঝর অশ্রু-অর্ঘ্য। ভীরু কাপুরুষ পুরবাসীরা জানাতে পারে নি তাদের স্পষ্ট প্রতিবাদ।

চাঁদনীচকের অদূরে কোণের বটগাছটায় তিন তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বাহাদুর শাহের পুত্র-পৌত্রের মৃতদেহ। বিশ্বাসঘাতক বিদেশী। আত্মসমর্পণের পর তোমরা না দিয়েছিলে সম্রাট-পুত্রদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি? ভীতি-বিহ্বল জনতা সেদিন শুধু প্রণতি জানিয়েছে বিশ্বস্রষ্টাকে আর ভূমি চুম্বন করে মৃত রাজপুত্রদের জানিয়েছে সেলাম।

এই পথেই চলেছিল প্রেম-পাগলিনী জাহান-আরা প্রিয়তম দুলেরার সাথে মাত্র একটি সন্ধ্যা। সেদিন এ দৃশ্য দেখতে সজ্জিত করীযূথ তাদের মন্থর গতিকে আরও সংযত করেছিল। বিটপী বীথির চারিদিক থেকে সেদিন ভেসে এসেছিল কি কস্তুরী, জাফরান, অগুরু, চন্দনের স্নিগ্ধ সুবাস?

এই চাঁদনীচকই তো মহামানবের মিলনতীর্থ। এখানকার কিসপিল বিপণিতে সমবেত হয়েছে জাঞ্জিবার, ইংল্যাণ্ড, সিরিয়া, তুরস্ক, হল্যাণ্ড, খোরাসান, জাবুলীস্থান, চীন, কাবুল, তুর্কীস্থান আরও কত দেশের লোক। তাদের পদচিহ্ন আজ কোথায় গেছে মিলিয়ে?

এই পথেই নাদীর শা বাজিয়েছিল জয়ডঙ্কা। এই পথেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়েছিল আহমদ শা আবদালী। এই পথে রণ-বিষাণ বাজিয়েছিল মারাঠা নায়ক মাধোরাও সিন্ধিয়া। এই পথে দামামা নিনাদে এসেছিল গোলাম খাদির। মোগল যুগে এই চাঁদনীচকের মাঝখান দিয়ে বয়ে যেতো একটা ক্যানাল। তার জীর্ণতা সংস্কার করেন আলী মর্দান, প্রায় দেড়শো বছর আগে। বছর-পঞ্চাশ হলো সেটা ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। আজও সে ক্যানাল বয়ে চলেছে নিঃশব্দে ভূমিতলে। পৃথিবীতে এত পুরোনো, এত ঘটনা-সঙ্কুল প্রাণবান রাজপথ বিরল।

একে একে নিভিল যে দেউটি।

মহানগরী দিল্লীতে রাজ্য ভাঙা-গড়ার কাহিনীতে ছুটি নিল মহাভারতের পাণ্ডবকুল, ছুটি নিল রাজপুত, দাস, পাঠান, মোগল। এলো বণিক মানদণ্ড হাতে। মনে পড়ে জন সুরম্যানের অর্থনৈতিক এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী? এলেন চিকিৎসক ডাক্তার হ্যামিলটন ধন্বন্তরীরূপে। সম্রাট অনুগ্রহ লাভে সেদিন তিনি যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন—পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। লর্ড ক্লাইভ কামানের জোরে ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। সত্যি। ইংরেজের ভারত বিজয়ের প্রকৃত গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে ডাক্তার হ্যামিল্টনের স্বদেশপ্রেমে। সম্রাট ফারুক শায়ারকে রোগমুক্ত করার বিনিময়ে হ্যামিল্টন সেদিন কি চেয়েছিলেন? মনে পড়ে? চেয়েছিলেন ভারতে ইংরেজ বণিকের বাণিজ্য সুবিধা। তখনও বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয় নি।

তারপর?

তারপর এলো মারাঠা। এলো নাদীর শা। তৈমুরের পর দ্বিতীয়বার দিল্লীর রাজপথে মানুষের রক্তের নদী প্রবাহিত হল। নাদীর শা নিজে বসে এ তাণ্ডবলীলার নির্দেশনা দিয়েছিল চাঁদনীচকের সোনারী মসজিদ থেকে। দিল্লীর লুটে নাদীর সেদিন পৃথিবীর অন্যতম ধনী লোকের পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো। সে যুগের সত্তর কোটি টাকা নিয়ে পালালো ডাকাত। শুধু টাকা নয়, অলঙ্কার নয়, নাদীর সেদিন নিজের সাথে নিয়ে গেছে দিল্লীর ভুবনবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। একদিন-দুদিন নয়। জনাব বেবাদল খাঁ সাত বছর ধরে শাহানশা সাজাহানের হুকুমে এ সিংহাসন তৈরি করেছিলেন। সিংহাসনের পায়া চারখানা ছিল খাঁটি সোনার। রাজছত্রটা ছিল বারোটা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে ছিল দুটো করে মুক্তোর ময়ূর। প্রতি ময়ূরজোড়ার মাঝে ছিল মণি-মাণিক্যের নকল গাছ। সেই সিংহাসন যার লোভে পুত্র পিতার বিরুদ্ধে, ভ্রাতা আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে করেছে যুদ্ধ ঘোষণা। কোথায় গেল সেই সিংহাসন?

এলো আহমদ শা আবদালী।

এলো মারাঠা। এলো ইংরেজ। পলাশীর রণপ্রাঙ্গণে ভারতের রাজ্য রবি বহুপূর্বে অস্তমিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। ইংরেজ শাসক মহানগর কলকাতা ছেড়ে রাজধানী গড়লো দিল্লীতে—সাত-সাতটা সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠলো নতুন দিল্লী।

এলেন স্যার এড্ উইন লুট ইয়েন্স। এলেন স্যার হার্বার্ট বেকার। নতুন পরিকল্পনা, নতুন নক্সা, নতুন নগর। পুরোনো দিল্লী থেকে রাজধানী পরিবর্তিত হলো ঠিক আঠারো বছর পরে। কেউ সেদিন কল্পনা করতে পেরেছেন কি এই ভাইস্ রিগ্যাল লজে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়তে আর দেরি নেই? নতুন উষার দ্বার খুলতে বিলম্ব কত আর? ভেবেছেন কেউ?

কুতুব মিনারের ময়দান জনশূন্য। পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। মিনার শিখর থেকে এখনও সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। চোখের সামনে ছবিগুলো এখনও যেন ভাসছে—এই দিল্লী মহানগরীতে রাজ্য ভাঙা-গড়ার ছবি। উত্থান-পতনের ছবি। যমুনার কলতরঙ্গ যেন এতক্ষণ সেই কাহিনীই শোনাচ্ছিল—জোয়ার আর ভাটা—উত্থান আর পতন। একটা জাতির সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের, ইতিহাসের একটা খোলা পাতা। একটা ঐকতান—সিম্ফনি।

সে ঐকতান আজও স্তব্ধ হয় নি। ঐ যে শ্রমিকের দল পাথর কাটছে। অটল সঙ্কল্পে তারা গড়ছে নতুন নগর। আরাবল্লীর অঙ্গ কেটে তৈরি হচ্ছে মহানগর—দিল্লী মহানগর। সাত-সাতটা সাম্রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংস-স্তূপের ওপর গড়ে উঠছে নবজাগ্রত ভারতের রাজধানী। কালভৈরবের মহাশ্মশানে এ যেন কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ের নব তপস্যা।

আন্তর্জাতিক

• ইয়েমেন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুক্ত কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্তে পর প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং আবদুল্লা আল্ সালালকে দেখা যাচ্ছে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র:

কায়রোতে আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার (Organisation of African Unity) দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। আফ্রিকার ৩৪টি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান—রাজা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, যুবরাজ প্রভৃতি এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে আফ্রিকার ঐক্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা করেন।

সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, আফ্রিকার ভবিষ্যৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ:

(১) দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য সকলের কাছে আবেদন করা হয়েছে। যে সব রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকাকে তেল ও পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করে, তাদের তা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সমুদ্র, নদী, স্থলপথ, বিমানপথ, সব দিক দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাতায়াত বন্ধ করবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলি যদি এই সব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার চেষ্টা করে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আংশিক অর্থনৈতিক অবরোধ এখনই সুরু হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে, আফ্রিকার দেশগুলি এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবে। সেনেগলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেনেগলের প্রধানমন্ত্রী সেঙ্গর ঘোষণা করেছেন, তাঁরা কায়রো সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবেন।

(২) এংগোলা, মোজাম্বিক ও পর্তুগীজ গিনি থেকে পর্তুগীজ শাসন অবসান দাবী করা হয়েছে এবং এর জন্য আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলি সর্ব-প্রকারে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করবে বলে স্থির হয়েছে।

(৩) দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যা-গরিষ্ঠ আফ্রিকীয়দের শাসন দাবী করা হয়েছে।

(৪) আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে সীমান্ত রয়েছে, তা মেনে চলা হবে। কোনরূপ পরিবর্তন করতে হলে তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা করতে হবে। বিভিন্ন আফ্রিকীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রতিক সীমান্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সোমালিয়া ও মরক্কো এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয় নি।

(৫) ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার সদর দপ্তর স্থাপন করা হবে।

(৬) সংস্থার পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন ঘানার রাজধানী আক্রায় অনুষ্ঠিত হবে।

(৭) আগামী বৎসর মার্চ মাসে আলজিয়ার্সে যে বান্দুং ধরণের দ্বিতীয় এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, ২।১টি বাদে সকল আফ্রিকীয় রাষ্ট্রই তাতে যোগ দেবে।

এ ছাড়া সকল আফ্রিকীয় রাষ্ট্র নিয়ে একটি সংযুক্ত আফ্রিকা রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে ঘানার রাষ্ট্রপতি কোয়ামে নক্রুমার প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক সংস্থার বিভিন্ন কমিশন বিবেচনা করে দেখবেন বলে স্থির হয়েছে।

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য নক্রুমার প্রস্তাব কমিশন-স্তরে পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলা হলেও, শীর্ষ সম্মেলনে এক গিনির সেকু টুর ছাড়া আর বিশেষ কেউ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। ৩৪টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২০টি রাষ্ট্র সরাসরি এর বিরোধিতা করেছে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য, নক্রুমার বিশিষ্ট বন্ধু ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নিয়েরে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এর সমালোচনা

• জুলিয়াস নিয়েরে

করেছেন। নিয়েরে নক্রমাকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, আফ্রিকার পর্তুগীজ শাসন প্রভৃতির ওপর সম্মেলনে সব চেয়ে জোরালো বক্তৃতা করেন কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াট্টা।

সীমান্ত বিরোধ, ব্যবসায় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ নানা বিষয় আফ্রিকার ঐক্যের পথে বাধা হলেও, নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণের অদম্য আগ্রহ আফ্রিকার ঐক্যের পথকে সুগম করবে।

* * *

২৩শে জুলাই মিশরীয় বিপ্লবের দ্বাদশ বার্ষিকী দিবস উপলক্ষ্যে কায়রোর গুমহারিয়া স্কোয়ারে এক বিরাট জনসমাবেশে, ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের বৃটেনকে ইয়েমেনের ব্যাপারে সাবধান করে দেন। নাসের বলেন, ইয়েমেন থেকে মিশরীয় সৈন্য সরাবার কোন চেষ্টা যদি বৃটেন করে, তবে বৃটেনকে তার ফল ভোগ করতে হবে। আরব-স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলে তিনি ‘বৃটেনের পা খোঁড়া করে দেবেন’ বলে ধমকান।

• আলেক ডগলাস হিউম

• লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত পুলিশ নিউইয়র্কের হার্লেমে দাঙ্গাকারী নিগ্রোদের ওপর বেটন চালাচ্ছে।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম সম্প্রতি কমন্স-সভায় আবার ঘোষণা করেছেন, বৃটেন ইয়েমেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারকে স্বীকার করে না। নতুন রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা আল সালালের পরিবর্তে বিতাড়িত রাজা ইমাম বদরকেই এখনও বৃটেন ইয়েমেনের শাসনকর্তা বলে মনে করে। সুতরাং ইমাম বদরকে পুনরায় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য বৃটেন চেষ্টা করবে।

নাসের স্যার হিউমকে সাবধান করে বলেছেন, এডেন ও সৌদি আরব থেকে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে বৃটেনের নাশকতামূলক কাজ সহ্য করা হবে না। ইয়েমেনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ৪০,০০০ মিশরীয় সৈন্য ইয়েমেনে রয়েছে এবং তারা সেখানেই থাকবে।

ইতিমধ্যে বৃটেনের একান্ত বশংবদ দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের ফেডারেল কাউন্সিলের সভাপতি সুলতান আমেদ বিন ফাদলি লণ্ডনে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ফেরার পথে কায়রোয় নেমে ঘোষণা করেন, তাঁর রাজ্য দক্ষিণ আরব ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসবে। সুলতানের মতে এই ফেডারেশন গঠন বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার একটি কৌশল মাত্র। কিভাবে বৃটেন ইয়েমেনের বর্তমান প্রজাতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটাবার জন্য চক্রান্ত করছে, সে বিষয়েও সুলতান অনেক তথ্য প্রকাশ করেন।

এ সব ঘটনা থেকে মনে হয়, আরব জগতে বৃটিশ প্রাধান্যের দিন শেষ হয়ে আসছে। যেটুকু সামান্য কর্তৃত্ব এখনও আছে, তাও নিশ্চিহ্ন করার জন্য আরব জাতীয়তাবাদীরা তৈরি হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

নাগরিক অধিকার আইন পাশ হবার পরেও নিগ্রোদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার কমে নি। বরং ব্যারি গোল্ডওয়াটার রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত হবার পর আবার নতুন করে নির্যাতন সুরু হয়েছে।

এবার দাঙ্গা সুরু হয়েছে নিউইয়র্কে। হার্লেম অঞ্চলে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার গুলী করে ১৫ বৎসর বয়স্ক নিগ্রো বালক জেমস পাওয়েলকে হত্যা করার পর থেকেই ব্যাপকভাবে দাঙ্গা সুরু হয়েছে। ওয়াশিংটনের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কর্নেল লেমুয়েল পেনকে শ্বেতাঙ্গরা গাড়ি থেকে গুলী করে

হয়েছে। কর্নেল পেন আরও দুজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে একটি স্কুল পরিদর্শন করতে যাচ্ছিলেন।

চিকাগো, মিসিসিপি প্রভৃতি অঞ্চলেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। মিসিসিপি রাজ্যের জ্যাকশন শহরের সন্নিকটে ম্যাডিসন কাউন্টিতে একটি নিগ্রো প্রোটেস্টান্ট চার্চ শ্বেতাঙ্গরা পুড়িয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১০টি নিগ্রো চার্চ ভস্মীভূত হল।

দায়িত্বশীল নিগ্রো নেতারা এখন উত্তেজিত নিগ্রোদের থামাবার চেষ্টা করছেন। নিগ্রোদের প্ররোচিত করে নাগরিক অধিকার আইনকে চাপা দেয়া এবং আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে শ্বেতাঙ্গদের চরম নিগ্রো-বিরোধী করে গোল্ডওয়াটারের জন্য ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণপন্থী শ্বেতাঙ্গরা এবারের দাঙ্গার পরিকল্পনা করেছে, নিগ্রো নেতারা বেশ ভালভাবেই সে কথা বুঝতে পেরেছেন। তবে তাঁরা নিউ-ইয়র্কের পুলিশ কমিশনার মাইকেল মারফি ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ওয়াল্টার আরমের পদত্যাগ দাবী করেছেন।

রাষ্ট্রপতি জনসনও একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, নাগরিক অধিকার আইন বানচাল করার জন্যই শ্বেতাঙ্গরা এই দাঙ্গা বাধিয়েছে।

কিউবা

কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফাইডেল ক্যাস্ট্রো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিটমাটের প্রস্তাব করেছেন। বিগত মে দিবসের বক্তৃতায় ক্যাস্ট্রো প্রথম এ প্রস্তাব করেন। তখন এ কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু সম্প্রতি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধি রিচার্ড এডারের সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ক্যাস্ট্রো মীমাংসার জন্য সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন।

এডারের রিপোর্ট সকল মার্কিন পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে; ক্যাস্ট্রোর সুর নাকি খুব নরম। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা উভয়েই ভুল করেছে। প্রথম বিপ্লবের আবেগে কিউবার পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক বলে তিনি উল্লেখ করেন। ক্যাস্ট্রো বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এগিয়ে এসে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

মীমাংসার জন্য ক্যাস্ট্রোর প্রস্তাব—(১) কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকল প্রকার কাজ থেকে বিরত হবে। প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করা ও অর্থনৈতিক অবরোধ বন্ধ করতে হবে। (২) কিউবা ল্যাটিন আমেরিকার দেশ-গুলিকে বিপ্লবের প্রসারের কাজ থেকে বিরত হতে হবে। এই সব কাজ দেখার জন্য একটি আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থা করতে হবে।

এডারের কাছে ক্যাস্ট্রো বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন অনেকদিন থেকে কিউবার ওপর চাপ দিচ্ছে।

অবশ্য মার্কিন সরকারী-কর্তারা ক্যাস্ট্রোর এই মীমাংসা-প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের ধারণা, ক্যাস্ট্রো দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাই মীমাংসার জন্য ব্যস্ত। অন্তত নভেম্বরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে কিউবার সঙ্গে কোনরূপ আপোষ প্রচেষ্টার কোন আশা নেই।

মালয়েশিয়া ঃ

সিঙ্গাপুরের গেল্যাও অঞ্চলে মালয়ী ও চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। হজরত মহম্মদের জন্মদিবস উদ্‌যাপনের দিনে কয়েকজন চীনা দুর্বৃত্তের হাতে একজন মালয়ী মুসলমান নিগৃহীত হবার পর থেকেই সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়েরই বহু ব্যক্তি হতাহত হয়েছেন।

মালয়েশিয়ার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আবদুল রেজ্জাক ও সিঙ্গাপুরের মুখ্যমন্ত্রী লিন কুয়া হক দাঙ্গা থামানোর জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করেছেন এবং দাঙ্গাকারীদের দমন করার জন্য সৈন্যদল নিয়োগ করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের দাঙ্গা নেহাতই একটি

• এডারের সঙ্গে আলোচনারত ক্যাস্ট্রো

লিন কুয়া হক

বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর পেছনে সুপরিকল্পিত কোন ব্যাপার নেই। তবে এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, এখানে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন। এই দাঙ্গার পেছনে ইন্দোনেশিয়ার কোন হাত ছিল না ঠিকই, তবে মালয়েশিয়ার বর্তমান অবস্থায় ইন্দোনেশিয়া এর থেকে যে সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

* * *

কুয়ালালামপুরের বিখ্যাত মালয়ী দৈনিক পত্রিকা 'উতুসান মেলায়ু' ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া দ্বন্দ্বে মাতব্বরি না করার জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁকে পরামর্শ দিয়েছে। আয়ুব খাঁ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মালয়েশিয়ার বিবাদ মিটিয়ে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 'ইতুসান মেলায়ু' আয়ুবকে এই বিবাদে নাক গলানোর আগে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বলেছেন। মালয়েশিয়ার প্রধান সম্প্রদায় মালয়ী মুসলমানদের মুখপত্র এই পত্রিকা স্পষ্টই বলেছে, 'আমাদের মতে পাকিস্তান মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া বিবাদে মালয়েশিয়ার দিকে নয়, ইন্দোনেশিয়ার দিকে।' পত্রিকাটির মতে, 'সিয়েটো' ও সেণ্টো'র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারত-চীন বিরোধে চীনের পক্ষে, সুতরাং ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া বিরোধেও পাকিস্তান চীনের বন্ধু ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে থাকবে।

মালয়েশিয়া এশিয়ার অন্যতম মুসলমান প্রধান দেশ। সেখানে পাকিস্তানের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

বৃটেন ঃ

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের পর ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কয়েক দিন লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডনে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী কাশ্মীর সম্পর্কে কয়েকটি স্পষ্ট কথা ইংরেজদের শুনিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, পাকিস্তানই কাশ্মীর আক্রমণ করে। কাশ্মীরের মহারাজা, রাজনৈতিক দল ও জনগণের অনুরোধে ভারত কাশ্মীর রক্ষায় অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর ভারতে যোগদান করে। এ সব সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয় তখন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল।

শ্রীমতী গান্ধী এই কথাই বলতে চেয়েছেন, মাউণ্টব্যাটেনের সম্মতিতে যে কাজ হয়েছে, ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ জনসাধারণ তা সমর্থন করবে না কেন?

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের নতুন দোস্তির ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ইংরেজরা সে বিষয়টাও বুঝতে চান না বলে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কাশ্মীরের সঙ্গে কেবল পাকিস্তান নয়, চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নেরও সীমান্তের যোগ রয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেছেন, লাদাকের কিছুটা অংশ চীনকে দিয়ে পাকিস্তান তার নতুন বন্ধুকে খুশি করতে চায় বলেই পাকিস্তান এখন কাশ্মীরের ব্যাপারে এত উৎসাহী।

* আয়ুব খাঁ

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

১৯শে জুলাই সায়গনের সর্বত্র 'জাতীয় শোক দিবস' পালন করা হয়। ১৯৫৪ সালে এই দিনে জেনেভা চুক্তি অনুসারে ইন্দোচীনকে ভাগ করে উত্তরাংশ কমিউনিস্টদের হাতে এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণপন্থীদের হাতে দেয়া হয়। তখন থেকেই এই দিনটিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিবাসীরা শোক দিবস রূপে পালন করে আসছে এবং উত্তর ভিয়েৎনামকে 'মুক্ত' করার শপথ গ্রহণ করছে।

এবার সায়গনে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রকাশের সময় দ্য গল ও হো-চি-মিনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। সায়গন শহরের ফরাসী যুদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভকেও তারা ভেঙে ফেলে। দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্স বর্তমানে ভিয়েৎনামকে নিরপেক্ষ করার প্রস্তাব করায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট বিরোধীরা ক্ষিপ্ত।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন খান জাতীয় শোক দিবসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে কিন্তু ভিয়েৎ কং বাহিনীর হাতে সরকারী সৈন্যদল ক্রমাগত মার খাচ্ছে। জেনারেল টেলর ভিয়েৎনামে আসার পরও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি।

তণ্ডুল-তাণ্ডবে ভাণ্ডার সন্ধানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আর্ত আকুতি—'এক কে-জি চাল দাও।'

মাঃধানা :

শহর কলকাতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি সপ্তাহকালের মধ্যে। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। এ ছাড়া করবারও হয়তো কিছু নেই। খোদ সরকার বাহাদুরই নাকি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন—খুঁজে পাচ্ছেন না চলার পথ। একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে আছেন। তাঁর রথের কাছি ধরে টানা-টানি করতে করতে মানুষও হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—দেহমন তাদের সম্ভবত হয়ে পড়েছে অবসন্ন।

বৃষ্টির বেগটা অবিশ্যি কমে গেছে। সুবিধে হয়েছে তাতে—উৎকণ্ঠিত চিত্তে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার। লাইন ছাড়া এখন আর উপায় নেই—সর্বত্র কারবার চলছে লাইনে। সোজা কথা, গোটা কলকাতাই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। লাইন পড়ছে ন্যায্য-মূল্যের চাল-গম ও চিনির দোকানে, লাইন দিতে হচ্ছে তেলকলের মালিক-দের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে মোছোহাটা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে অগণিত মানুষকে। লাইন নেই কোথায়? ডাকঘরে লাইন, ছেলে-মেয়ে কলেজে ভর্তি করতে লাইন, রেলের টিকেট কিনতে লাইন, এমন কি, তেলের দাম ও মাছের দাম জানতে হলে লাইন ধরে যেতে হবে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমরা লাইনে দাঁড়ানোর অভ্যাস করেছি। তারপর থেকে সমানে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছি। আগের দিনে লাইনে দাঁড়ালে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল ষোল আনাই। এখন যাঁরা লাইনের ল্যাজের দিকে থাকেন তাঁদের ফিরতে হয় মাছের পরিত্যক্ত ল্যাজটুকু দর্শন করে. শূন্য তেলের টিন বাজাতে বাজাতে।

মাছ নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এক হাত হয়ে যাওয়ার দিন তিনেক পরে গিয়েছিলাম গড়িয়াহাটা বাজারে মাছের আশায়। দু'বার দু'লাইনে ঘণ্টাখানেক করে দাঁড়িয়ে বিফল হয়ে ফিরতে গিয়ে দেখি দু'খানা বড় বঁটি-দায়ের সামনেও লাইন পড়েছে। শ'খানিক মানুষ আছে বঁটি-দায়ের মালিক মাছ নিয়ে হাজির হবে আশা করে। একটু দূরেই জটলা দেখে এগিয়ে গেলাম। সেখানে চুণো মাছ বিক্রি হচ্ছে আড়াই টাকা করে। অনেকটা কসরতের পর কাছাকাছি গিয়ে পেঁৗছতেই—দোকানী বললে, কতটা চাই বাবু। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটি ঠোঙা দেখিয়ে বললে, চারশ' আছে, লেবেন? জিজ্ঞেস করলাম, ওজন ঠিক আছে তো? কর্কশ কণ্ঠের উত্তর এলো, আমরা কি চুরি করতে বসেছি! লেবেন তো লেবেন। না লেবেন তো ভিড় ছাড়ুন।

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। এ অবস্থায় কখনো পড়ি নি। নিজের এলাকা ছেড়ে এসেছি বহুদূরে। চেনা-জানা এমন কোন লোক নেই যার কাছে অন্তত খেদোক্তিটা পর্যন্ত করতে পারি। তা ছাড়া, কিছু বলতে গেলে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। হাঙ্গামা সৃষ্টির অভিযোগে থানার হাজতবাসও বিচিত্র নয়। কাজেই দ্বিরুক্তি না করে ফিরে এলাম বিমর্ষ হৃদয়ে।

ঢাকুরিয়া স্টেশনে এসে দেখা হল চেনা মাছের খুচরা ব্যাপারীর সাথে। মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আড়াই টাকা করে চিংড়ি মাছ কিনে এনেছে. ক্রেতাদের চাপে দু'টাকা করে বেচতে হয়েছে। পনের সের মাছ বেচে সাড়ে সাত টাকা লোকসান।

জিজ্ঞেস করলাম, মাছের বাজারে আগুন লাগলো কেন রে? তার মতে

মাছের দাম বেঁধে দিয়েই সরকার আগুন লাগিয়েছে। গেল বছর এমন দিনে তারা ক্যানিং থেকে ঝুড়ি ভরে তাজা ট্যাংরা, পারশে, ভেটকি, রুই-কাৎলার বাচ্চা আনতো। জলের মাছ নিঃশেষ হয় নি। ধরাও পড়ছে প্রচুর পরিমাণে। বাইরে যাচ্ছে—আসছে না কলকাতার বাজারে। পাইকার ও আড়তদাররা জোট বেঁধে আমাদের মৎস্যমন্ত্রীর আইনের বেড়াজালের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে।

রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং মৎস্যমন্ত্রীর অবগতির জন্যই ঘটনাটির উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আড়তদাররা, ঠাণ্ডাঘরের মালিকরা বেশি পয়সা না পেলে খুচরা দোকানদারদের মাছ দেয় না। খুচরা দোকানদারও বিপন্ন। সরকারের পুলিশ ঠাণ্ডাঘরের মালিকদের, মাছের পাইকারদের ধারে-কাছেও যায় না। দু-চারটে চুণোপুঁটি খুচরা ব্যাপারী ছাড়া আর কেউ তাদের জালে তাই ধরা পড়ছে না।

পুলিশই বা করবে কি? সরকারকে সেলাম দিয়ে চলাই তাদের কাজ। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনই বলেছেন, সরকার দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তার অর্থ, সরকার কিছুই করতে পারেন নি—করতে পারছেন না, অথবা করতে পারবেন না।

এবারে যা' হোক তিনি একটি খাঁটি কথা বলে ফেলেছেন। ব্যর্থ হয়েছে তাঁর প্রচেষ্টা। তেলের ব্যারনদের তিনি কিছু করতে পারেন নি। তারা মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে গেছে, তেলের দাম নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকার তাদের হাতে তুলে না দিলে তেলে ভেজাল কমবে না—বাজারে তেল পাওয়া যাবে না। ব্যবসায়ীদের দম্ভোক্তির জবাব তিনি দিতে পারেন নি—পারেন নি সেদিন সাহস করে তাদের কাউকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করতে। মুখ্যমন্ত্রী যাদের গ্রেপ্তার করতে পারেন নি, তাদের আর পুলিশ ধরতে যাবে কোন সাহসে? এ অবস্থা কতকাল চলবে বলা শক্ত। তবে, একথা ঠিক, চিরদিন চলতে পারে না। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ দিশেহারা হলে যা হয়, তার পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে। চালের গাড়ি মাঝপথে আটক করছে বুভুক্ষু মানুষ। জোর করে দোকান থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনছে তেলের টিন। জাগ্রত যুবশক্তি এমনি করেই একদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে কালোবাজারের ওপর। অতি-মুনাফা লোভীরা লোভ সম্বরণ না করলে

● শ্রীপ্রফুল্ল সেন

সে শক্তির আঘাতে একদিন তাদের ধরাশায়ী হতেই হবে।

* * *

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ঢেঁড়স ও ঝিঙে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি নিজে ঢেঁড়স-ঝিঙে খেতে সুরু করলেই জানতে পারবেন এ দুটি সব্জীর মূল্য ৪০ পয়সা থেকে ৮০ পয়সা। একটু জাতের মাল হলে তো কথাই নেই। তার দাম আরও বেশি। এ প্রসঙ্গেই তিনি জনসংখ্যাবৃদ্ধি, মানুষের ক্রয়-ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলেছেন।

তার পরিসংখ্যানের আলোচনা না করেই বলা যেতে পারে, বিদেশী মালের দাম বেড়েছে দুর্নীতি দমনের জোরদার কোন বন্দোবস্ত না থাকাতেই। যাঁরা সেগুলো কিনতে বাধ্য হন তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে নি। ক্রয়ক্ষমতা যাঁদের বেড়েছে তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সাধারণ মানুষ আজ ঋণের ভারে মুষড়ে পড়েছে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে মানুষ হীনবল হয়ে পড়ছে—কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে দিনের পর দিন। তিনি আফিসের চারদিকে তাকালেই দেখতে পাবেন দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য মুখ। কোন মুখেই ক্রয়-ক্ষমতাবৃদ্ধির কোন লক্ষণ খুঁজে পাবেন না।

* * *

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের শোচনীয় ফলাফলের জন্য শুধু পরীক্ষার্থীদের দোষ ধরা উচিত নয়; মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃপক্ষও ফেলের দায় থেকে কোনোমতেই অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় যে সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাদের প্রথম দল ইস্কুলের টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে, দ্বিতীয় দল প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বোর্ড অনুমোদিত ইস্কুলের মাধ্যমে আর তৃতীয় দল প্রাইভেট উইদাউট টেস্টের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এ বছর ইস্কুল ফাইনালে পাশের গড় হার ২৫.৮%. হলেও মধ্যশিক্ষা পর্ষতের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীসমর সরকার জানিয়েছেন যে, 'প্রাইভেট উইদাউট টেস্ট'-এর ছাত্র-ছাত্রীদের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যেই ঐ রকম ফলাফল দাঁড়িয়েছে। আসলে স্কুল ফাইনাল, রেগুলার পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৪৫%. এবং প্রাইভেট উইদাউট টেস্ট ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার ১৫%.।

শ্রীসরকার রেগুলার ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার দেখে ইস্কুলের পড়াশুনো সম্পর্কে যেমন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তেমনি আবার প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রীদের শোচনীয় অবস্থার জন্য সন্তোষজনক কোনো অভিমত দিতে পারেন নি। তাই এখন তাঁরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের

অন্য সতর্কতামূলক স্ক্রিনিং-এর কথা চিন্তা করছেন। তাঁরা একবার দুবার নয়—হাজার বার চিন্তা করুন—আমাদের আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু স্বল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনারম্ভে সেই জীবন নিয়ে ছেলেখেলার বিরুদ্ধে। কেন না জীবনের সুরু থেকে যদি বছরের পর বছর তাদের মধ্যে নৈরাশ্য দানা বাঁধে, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। তবু প্রাইভেট উইদাউট টেস্ট ব্যবস্থা এতোদিন বোর্ড চালু রেখেছেন কিসের খাতিরে? এই ব্যবস্থায় অনেকের উপকার হয়, তবু জ্ঞানপাপীর মতো বোর্ডের আচরণে মনে হয়, এই ব্যবস্থায় তাঁদের ব্যবসায়িক আয়টাও অগ্রাহ্য করার নয়।

রেগুলার ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের শতকরা হার সন্তোষজনক বলে আমরা মনে করি না। হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে যদি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সমপর্যায়রূপে পরিগণিত হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ওপর বোর্ডের ভরসা আছে। তবু সেই বিদ্যালয়গুলি থেকেই টেস্টে পাশ করার পর ছেলেরা ফাইনালে অধিক হারে কোন কারণে ফেল করে—সে কথাটাও চিন্তার বিষয়। এই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের দিকটাও বিবেচ্য। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় তাদের অপুষ্টি বারবার যতো বেশি স্বীকৃত হয়েছে, প্রতিবছর তাদের বই-এর বোঝাও যেন ততো বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুতরাং ফেলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ী করা অন্যায়, তার আগে বোর্ড আত্ম-সমালোচনা করুন—যাতে বিরাট জাতীয় অপচয় দূরীকৃত হতে পারে।

জলপাইগুড়ি:

তিস্তা আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। সুরু হয়েছে তার প্রলয় নাচন। নৃত্যের তরঙ্গাঘাতে দোমহনীর কাছ দু'কূল ভেঙে সে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে—ঢুকে পড়েছে আশে-পাশের গ্রামাঞ্চলে। বীজ ধান নষ্ট করে জাঁক দেওয়া পাট ভাসিয়ে দিয়ে, পানীয় জলের অভাব সৃষ্টি করে গ্রামের মানুষকে তিস্তা নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। তার দাপটে বাকালী, পদমতী, ধর্মপুর, কান্দাইৎপাড়া, মৌলভীপাড়া, বোয়ালমারী, কচুয়ার চর প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনে নেমে এসেছে অশেষ দুর্গতি। গরু-বাছুর নিয়ে ডাঙায় বসে চাষীরা নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

সরকারের ত্রাণ দপ্তরের মহিমা অপার। খয়রাতি সাহায্য গিয়ে পৌঁচেছে—গম বিতরণ করা হচ্ছে খয়রাতি সাহায্য হিসেবে। গম আঁচলে বেঁধে বসে চাষীবউ কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। গম দিয়ে সে করবে কি? ভাঙাবে কোথায়? রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার হয়েছে। চারদিক জলে ভরা। শহরে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

মানুষের দুঃখের দিনে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার এবং সরকারের ভাণ্ডার থেকে দু'মুঠো খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব যাদের, তাদের একটু সহনশীল, একটু হৃদয়বান হওয়া উচিত। অনায়াসে তাঁরা আটা, ময়দা অথবা গমের বদলে চাল দিতে পারতেন। বিপন্ন মানুষগুলো খেয়ে বাঁচতো।

* * *

মদের ঢালাও কারবার চলেছে শহর ও গ্রামাঞ্চলে। চায়ের দোকানগুলো মদের গোপন আড্ডায় পরিণত হচ্ছে। মদ বিক্রি হচ্ছে স্টেশনে ও শহরের চার নম্বর গুমটিতে। বেকার, অর্ধবেকার ভদ্রসন্তানেরা নেশায় মাতাল হয়ে ঘরে ফিরছে। প্রকাশ্য রাজপথে, ভদ্রপল্লীর ভেতরে চলছে মাতালদের মাতামাতি।

মদ বাংলায় নিষিদ্ধ নয়। সেটা বড় কথা নয়। নিষিদ্ধ নয় বলেই যেখানে-সেখানে, খেয়াল-খুশিমত মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে অসামাজিক কাজ করবার অধিকার সরকারী কর্মচারীরা পেতে পারেন না। এ কাজ সমাজ-দ্রোহিতারই সামিল। সমাজের ওপরতলার মানুষের কাছে, বিত্তবানদের গৃহে মদের আদর বাড়লেও সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে মদ এখনও অচল। মফঃস্বলের সমাজে মদ্যপায়ীরা অপাংক্তেয়। লাইসেন্স বিতরণের সময় এ সব কথা কর্তারা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন। তা না হলে গয়েরকাটা রাস্তার মোড়ে মদের দোকান বসাতে পারতেন না।

এ এলাকাটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ—চারদিকে ভদ্রলোকের বাস। দোকানটিকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে মাতালদের স্বর্গরাজ্য। মেয়েদের পক্ষে শালীনতা বজায় রাখাও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। নেশায় চুর, অপ্রকৃতিস্থমস্তিষ্ক মাতালের সামনে পথচলা কোন মেয়ের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। পুলিশ কতকটা নির্বিকার। জুয়ার আড্ডা ও মদের আড্ডার তারাও অংশীদার। মদের প্রাচুর্যে প্রাদুর্ভাব হয়েছে জুয়াখেলার। জুয়ার ও মদের পয়সা জোগাতে ছিনতাই দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। দুদিনের বাজারে সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ যত বাড়ে পুলিশের পকেটও তত ভারি হয়।

স্থানীয় লোকদের অভিযোগ, জুয়া খেলাটা পুলিশের লোকই জমিয়ে তুলেছে বেশি করে। তারাই নাকি বেশি জুয়া খেলছে। এ অভিযোগ সত্য হলে খুবই মারাত্মক বলতে হবে। শান্তি ও শৃঙখলা বিধানের, সমাজের শুচিতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, তারা সমাজ-বিরোধী কাজের সহযোগী হলে প্রশাসন যন্ত্র ভেঙে খান খান হবে। আমরা এ বিষয়ে ওপরওয়ালাদের একটু নজর দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম মৌজাকে কেটে নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার সঙ্গে জুড়ে দেবার কথা উঠেছে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই নাকি ডাবগ্রামকে শিলিগুড়ির অন্তর্ভুক্ত

করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসকর্মীদের সভায় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, ডাবগ্রাম ও তার সংলগ্ন এলাকা উদ্বাস্তু সমাগমে স্বাভাবিকভাবে উন্নত হচ্ছে। কাজেই ডাবগ্রামকে জলপাইগুড়ি থেকে বিছিন্ন করার প্রচেষ্টা ভ্রমাত্মক ও ক্ষতিকর। এতে জেলাবাসীর মনে সৃষ্টি হবে অহেতুক তিক্ততা।

* * *

সরকারের উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন দপ্তরের তাচ্ছিল্য, অবহেলা ও ঔদাসীন্য এবং স্থানীয় একটি চিকিৎসাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীদের নির্মম, অমানুষিক ব্যবহারে স্বামীহারা, সরলপ্রাণা, অসহায়া নারীর জীবনের একটি মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেসের এম-এল-সি শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত 'জনমত' সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার হবিগঞ্জ থানার নাটাখোলাচরের চাষী নিতাই মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী খুকীবালা। নিতাই মণ্ডল মুসলমানদের হাতে নিহত হলে আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা খুকীবালা ইজ্জৎ বাঁচাবার প্রয়াসে নাবালক তিনটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে পড়শীদের পিছনে পিছনে বেরিয়ে আসে শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে সে ছিটকে এসে পড়ে মালে। সঙ্গীহারা খুকীবালা আশ্রয় নিয়েছিল একটি গৃহের বারান্দায়। স্থানীয় সহৃদয় কয়েকটি যুবক ইউনিয়ন বোর্ড, বি-ডি-ওর দপ্তর থেকে সুরু ক'রে জেলা সমাহর্তার দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছিল এই নিরুপায় নারীর ও তার তিন সন্তানের উপায়ের ব্যবস্থাপনার জন্য। কোন উপায় কেউ করে দেন নি।

মালে আসার কদিন পরই খুকীবালাকে হাজির হতে হ'ল মাল স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে। অসহ্য যন্ত্রণা, ব্যথায় সে কাতরাচ্ছে। বেলা দশটা থেকে বিকেল পর্যন্ত যন্ত্রণাকাতর এই নারীটির দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকায় নি। জনৈকা যাত্রীর অনুগ্রহে শেষে সে প্রবেশাধিকার পায় হাসপাতালে।

পরের অধ্যায়টি অত্যন্ত বীভৎস। তার মাথার চুল দড়ি পাকিয়ে বাঁধা হল খাটের সাথে। হাত-পা বেঁধে দেওয়া হল মোটা দড়ি দিয়ে। এ কাজ নাকি করেছেন হাসপাতালের নার্স। অসহ্য যন্ত্রণায় যখন সে ছটফট করছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে ভাবী সন্তানের জননীর মাথার চুল, কাতর আবেদন জানাচ্ছে বন্ধন-মুক্তির জন্য—তখন কর্তব্যরতা নার্সের মুখ থেকে বর্ষিত হচ্ছে গালিগালাজ। নারী হয়ে আরেকটি অসহায়া নারীর চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করে চলেছে। লজ্জায়, ক্ষোভে খুকীবালা কাঁদতে কাঁদতে তার দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে সেদিন 'দিদিমণি'র

● শ্রীপূরবী মুখার্জী

বঞ্চিত, আশাহত, ক্ষুব্ধচিত্তে সম্ভবত প্রতিহিংসার উদ্রেক করে ফেলেছিল। তা না হলে বন্ধনমুক্তির কাতর আবেদনের পর খুকীবালার হাতের আঙুল মুচড়ে দেবার মত নৃশংস কাজ করতে দিদিমণি পারতো না।

খুকীবালা হাসপাতালে একটি কন্যা প্রসব করেছে। তিনদিন পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে মা তার কন্যাকে দিয়েছে বিলিয়ে।

আমাদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রী একজন মহিলা। স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারও কিছুদিন আগে আমরা মহিলার ওপরই অর্পণ করেছি। ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতির কথা আলাদা। তিনি তাঁর পিতার পুণ্যফল পেয়েছেন অধিকারসূত্রে। কংগ্রেস ভবনের খোদকর্তারও তিনি আশীর্বাদধন্যা। তাঁর ভয় কম—সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অনেক উর্ধ্বে তিনি বসে আছেন। কোন সমালোচনাই নাকি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। খুকীবালার মত সামান্যা উদ্বাস্তু নারীর আকুল আর্তনাদ তাঁর নারীচিত্তকে হয়তো ব্যাকুল করে তুলতে সক্ষম হবে না।

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জীর ক্ষেত্রে এ সকল কথা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। ছাত্রীজীবন থেকেই তিনি দেশের সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। কঠোর সাধনা তাঁকে করতে হয়েছে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে। কর্মী হিসেবে, কাজের মেয়ে বলে এখনও সুনাম তাঁর আছে। মাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যে-ঘটনাটির বিবরণ 'জনমত' কাগজ থেকে আমরা উদ্ধার করে দিলাম. তার অনুসন্ধান করা শ্রীমতী মুখার্জীর উচিত হবে। একটি অসহায়া নারীর প্রসব-যন্ত্রণার সময় হাসপাতালের কর্মীদের এ আচরণ নর্বরোচিত। আমাদের হাসপাতালগুলোতে অবশ্য প্রায়ই নতুন ইতিহাসের রচনা হয়ে থাকে। অনুসন্ধান করলে খুকীবালার মত অনেক নারীর বেদনার্ত কণ্ঠের আক্ষেপের সংবাদ পাওয়া যেতেও পারে। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে একবার হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

হুগলী ঃ

বালি ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। ধানজমি, গোচারণ-ভূমি, পুকুর পর্যন্ত নষ্ট করে এরা নির্বিচারে বালি সংগ্রহ করে চলেছে। আমাদের সরকারের আমলারা এ-সব ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। যেন করণীয় কিছুই নেই।

মগরা থানার মগরা-খন্নপুর রোডের কয়েক একর দো-ফসলা জমির ওপর সম্প্রতি বালি ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে। তারা যেভাবে এ-এলাকা থেকে বালি খুঁড়ে নিচ্ছে তাতে এ-জমিগুলোর সর্বনাশ। বালি-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিবৃত্ত করতে না পারলে রাস্তাটি ধ্বসে পড়বে। মগরা থেকে বনেখালি পর্যন্ত বিরাট এলাকার মানুষের জীবনে নেমে আসবে চরম দুর্ভোগ—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে গ্রামবাসীর বাইরের জগৎ থেকে।

স্ম র ণে

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের পরলোকগমনে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-গগনের একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের পতন ঘটলো। এই মৃত্যু অমোঘ, কিন্তু একান্ত হৃদয়বিদারক। যে সময় তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্য সৃষ্টির পরিমণ্ডলে, গবেষণার জগতে ও শিক্ষার পবিত্র মন্দিরে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হোল।

১৩০৮ সালের ৩রা ফাল্গুন শশিভূষণ দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বরিশালের চন্দ্রহার গ্রাম। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিস্ময়কর মেধার পরিচয় দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষা পাশ করেন। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি-এ পাশ করার পর তিনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর আজীবন তিনি ছাত্রদের মতো অধ্যয়ন-চর্চায় আত্মনিমগ্ন থাকলেও অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। এ ছাড়া তিনি স্বয়ং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং পি-এইচ-ডি উপাধি অর্জন করলেও একালের অধিকাংশ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বৃত্তিধারী ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরা তাঁর কাছে চিরকাল নিজেদের ঋণ স্বীকার করবেন।

তাঁর বিভিন্নধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে নানামুখী প্রতিভা বিধৃত হয়ে রয়েছে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যানমূলক কাব্য রচনায় তিনি বিশেষ কবিমনের পরিচয় দিয়েছেন। 'শিশুসাথী'তে নিয়মিত প্রকাশিত ছোটদের জন্য রচিত তাঁর গল্পগুলিতে সরল মনের সহজ দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। শশিভূষণের নাটকগুলির মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে লোকচরিত্র, একালের সমাজ-কথা ও প্রচুর রঙ্গরস।

এমনই আশ্চর্যের কথা, যিনি রস-সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজেকে এভাবে নিবেদন করেছিলেন, তাঁরই হাত দিয়ে গবেষণামূলক যে সব গ্রন্থ পাই—তার তুলনা খুঁজে পাওয়া শুধু অসম্ভব ব্যাপারই নয়,

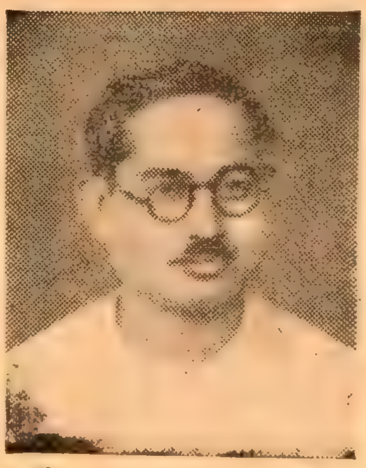

● শশিভূষণ দাশগুপ্ত

গবেষণার যে কোনো প্রান্তে তাঁর নাম সুদূর ভবিষ্যতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবে। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'Obscure religious cults as background of Bengali literature', 'An Itroduction to Tantric Buddhism' প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থ। এই সব অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের ফলে শুধু ভারতীয়রাই নয়, বিদেশীরাও ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে একালে গভীর আকর্ষণ বোধ করেন।

১৯৬১ সালে 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমী ডঃ শশিভূষণকে পুরস্কার দান করেছেন। তবু কোনো পুরস্কারের মোহে আচ্ছন্ন ছিল না তাঁর মন। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তিনি সাহিত্যসৃষ্টি ও গবেষণার কাজে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক', 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', 'সাহিত্যের স্বরূপ,' 'শিল্পলিপি,' 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ,' 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়' প্রভৃতি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থগুলি বিদগ্ধজনের চিন্তাশক্তিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

ঐ সব গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অবশ্য ডঃ শশিভূষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামতনু লাহিড়ী ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সমূহের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পর—স্বয়ং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি হিন্দি, উর্দু, নেপালী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁর এই আত্মদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান হিসেবে তিনি যে কাজ সুরু করেছিলেন—তাও অতুলনীয়। একদা ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ। এঁদের পর একমাত্র শশিভূষণই ঐ পদে যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই যুক্তরাজ্য থেকে এসেছিল তাঁর সম্মানজনক আমন্ত্রণ। সেখানে গিয়েও তিনি প্রাচ্য-সঙ্গীত-বিশারদ ডক্টর আনল্ড বেক-এর মতো ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ডঃ বেক কর্তৃক টেপরেকর্ডে গৃহীত নেপালী লৌকিক সঙ্গীতে বাংলা ভাষাকে—যে সুপ্রাচীন ভাষার নমুনা আজ কোন পুঁথিতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে ডক্টর শশিভূষণ নতুন উৎসাহে ছুটেছিলেন নেপালে। নেপাল থেকে ফেরার পর বৃদ্ধি পায় তাঁর উদরের পীড়া। তবু মনের শক্তি তিনি একদিনও হারান নি। কিন্তু গত ২১ শে জুলাই মঙ্গলবার তিনি ঐ পীড়াতেই দেহত্যাগ করেন।

আজ তাই বঙ্গদেশের চারদিকে কেবল শূন্যতা। দুঃখের দিনেও মনে হয়, যে কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন সে কাজ সমাপ্তির দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? কে এমন নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ, নিষ্ঠাবান, মহৎ চরিত্র-সম্পন্ন, নির্লোভ, নিরপেক্ষ, উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন গবেষক-আচার্য রয়েছেন—যিনি শশিভূষণের স্থানাধিকারের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হতে পারেন? রামতনু লাহিড়ী—অধ্যাপক পদের জন্য আজ আমরা চিন্তিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার ঐ পদের গৌরব যেন শশিভূষণের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুণ্ণ ও অন্তর্হিত না হয়।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তিন ॥

"সেই গড়ে নানা জাতি
বৈসে মহাজন।"

'চুপ চুপ।'

উদ্বিগ্ন মহীপতি বউঠানের কাছে মিনতি করেন। তাঁর বোন এতক্ষণ কপাটে হাত রেখে সব শুনছিলেন। নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ছোটকর্তার কথা শুনুন বউঠান, এসব কথা পাঁচ কানে তুলে কি হবে?'

'এ-বিপদে উপায় কি ঠাকুরঝি? তুমি কি বাপ-মা'র মুখ পোড়ালে?'

'ছি বউঠান!'

মহীপতি গম্ভীর গলায় ধমক দেন। জগৎপতির বউ চেষ্টা ক'রে ফোঁপানি চাপলেন। মনের দুঃখে মুখে দেশের কথা বেরিয়ে এল, 'ভেয়ে বোনে যে চুপচুপ কত্তে লেগেছ, চুপ আমি করি কেমন করে?'

ননদ এ-কথার জবাব দিতে পারতেন, দিলেন না। এক সময়ে বড়বউ তাঁকে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছেন। তা ব'লে এখন আর পাল্টা নেওয়াটা সমীচীন হয় না। হাজার হলেও তিনি উঁচু বংশের মেয়ে। উঁচু কুলের শিক্ষাই আলাদা।

'ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কিছু?' ননদের ধীর, শান্ত প্রশ্ন।

'না না, পারলে তার বাপ বলে বুনি তুই আমার চক্ষের মণির ওপর এসে বোস্। আর নাতিকে ত' পলকে হারায়।'

'শ্বশুরবাড়ির জন্যে মেয়েটা অস্থির-উতলা হয়েছিল বটে।' ছোট জা আড়াল থেকে বললেন।

'ছোটবউ, অবাক ক'রো না বাবু। এ-বাড়ির মেয়েরা কে কবে শ্বশুরঘর করেছে, যে বুনি করবে? আমার আপত্তি ছিল না, তবে মেয়েও নেচে উঠলে, আমি যেন বলতে ভরসা পেলাম না ওর বৈমাত্তর বোন টুনিকে দিয়েও শিক্ষে হল না, আবার এর বেলা জেদ করছ? তোমার দাদার জেয়াদা গো ঠাকুরঝি।' বড়বউ চোখে আঁচল দিলেন।

ননদ মলিন হাসি হাসলেন। বললেন, 'এরা কি মেয়েদের দুঃখ বোঝে?' তাঁর সে কথায় গভীর বিষাদ নিশ্বসিত হল। কুলীনের মেয়ে জানে কুলীনের মেয়ের দুঃখ কোথায়। পুরুষের জগৎ বড়। মেয়েদের পক্ষে চোখ তুলে আঙিনার ওপরের আকাশটুকু দেখলেও বড় দোষ। বাইরের সব দোর বন্ধ, তাই মনে মনে শুধু সংসার-স্বামী-সন্তানের স্বপ্ন দেখে সবাই। অথচ সে-স্বপ্ন কৃচিৎ ফলে। যে-ঘরে জন্ম, সে-ঘরেই মরতে হয়। মহীপতির বোন জানেন কুলগর্বে গর্বিত দাদা তাঁকে আজীবন সংসারের প্রয়োজনে আটকে রাখলেন, অনূঢ়া বোনের সামনে নিঃসঙ্কোচে তিলে তিলে সাজিয়ে তুললেন নিজের দু'বিয়ে, সাত সন্তানের সংসার। কুলীন-

কন্যার দুঃখে রাঢ়েবঙ্গে বাঁশঝাড়ে সন্‌সন্ শব্দে বাতাস কাঁদে। তিনি স্বগত বললেন, 'সব মরে ঝরে ওই একটি, তাই বড় আদর দিয়েছ।'

মহীপতি বোনের মুখ দেখছিলেন আর মনে মনে ব্যথা পান। সেই সঙ্গে অজানা আশঙ্কা। ত্রিশ বছরের বোনের দিকে তাকালে আজকাল মাঝে মাঝে তাঁর ভয় হয়। মনে হয় ভরাবর্ষার আমোদী নদীর কথা। যেমন পরিপূর্ণ, তেমনি খরস্রোতা, বর্ষায় তার বুকে চোরাবালির দহ, সর্বনাশা চোরাস্রোত, দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

'বউঠান, আপনি বাড়ি যান, আমি খোঁজখবর করি।'

'কর্তা এলে—'

'সত্যি কথা বলবেন।'

'সাহস হয় না ঠাকুরপো।'

'দু' দিনে ফিরে আসতে পারে, হয়ত বা পলাশী গেছে। আর যদি জামাইয়ের সন্ধানে গোবিন্দপুর-----কিন্তু বুনির কি এমন সাহস হবে?'

'হবে, আমি জানি। ঐ বাপেরই মেয়ে, ঐ রক্তেই জন্ম, হারামজাদীকে পেটে ধরেছিলাম বলে কি আমায় এমন কষ্ট দিচ্ছে?'

'এ-ক্ষেত্রে লুকোচুরি ভাল নয়। দাদা অসন্তুষ্ট হবেন।'

'আমি কেমন করে বলব ঠাকুরপো? ঠাকুরঝি তুমি যাবে?'

'যাবি, নিদুলী?'

নিদুলী বিষণ্ণ হেসে হাতের নারকেলফুল জোড়া ঘোরাতে থাকেন। ধীরে বলেন, 'তাঁর সঙ্গে কি আমি কথা কই?'

তাঁর কথার প্রচ্ছন্ন কোমল বিষাদ সকলকেই বিস্মিত করল। আজকাল কচিৎ তিনি এমন মৃদুস্বরে কথা ক'ন। বড় ভাই, বড় ভাজ, ছোট দাদা, রুগ্ণা ভাজ, প্রায় একবয়সী ভাইঝি বুনি, সকলকে উপলক্ষ্য করেই তাঁর কথায় আজকাল জ্বালা প্রকাশ পায়। এ-সংসারে সবাই যেন তাঁর ওপর অবিচার করেছে।

মধ্যাহ্নে, আহারান্তে, সত্বর মহীপতি জামাজোড়া গায়ে বেরোলেন। বাড়িতে স্ত্রী ও বোন ভাবলেন বুঝি ভাইঝির খোঁজ করতে বেরুচ্ছেন। কিন্তু পথে বেরিয়েই মহীপতি পারিবারিক সমস্যাটি মনের এক কোণায় রেখে টুপ করে পলো চাপা দিয়ে দিলেন। বংশের একমাত্র সন্তান হিসেবে বুনিকে তিনি স্নেহের চোখেই দেখেন। তা ব'লে তার চরিত্রের বড় বড় দোষ সম্পর্কে তিনি ইচ্ছে ক'রে কানা সাজতে পারেন না। জামাই-এর সম্পর্কে বুনি সুবিচার করে নি।

এখন সে-কথা ভাবে কে? রাধাপ্যারীর গলির সামনে দিয়ে সার সার পাল্কী যায়। একটিতে চেপে বসলেন। সিন্দুকে যেমন সার সার খোপ থাকে, প্রত্যেকটি একটি একটি ক'রে বন্ধ করা যায়, মহীপতির মনও তেমনি। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা এখন অপ্রাসঙ্গিক তাই মন থেকে বুনি, বউঠান এবং দাদাকে কি ভাবে বলা যাবে সে-সব চিন্তা সরিয়ে ফেললেন। হেলান দিলেন পাল্কীর গায়ে। স্বভাবকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেন নি মহীপতি, অভ্যাস দ্বারা শাসনে রেখেছেন।

সৈদাবাদের পথে পথে এখন জলবাহকদের আনাগোনা। মুখ ঢাকা তামার কলসী নিয়ে তারা এমন সময়ে বাড়ি বাড়ি গঙ্গাজল দেয়। চৈত্র-বৈশাখে নিষ্ঠাবান হিন্দুপরিবার মাত্রেই বাড়ির সুমুখের রাস্তা জলে ধুয়ে দেন ও পানীয় জলের জালা বসিয়ে পথচারীকে জলদানের পুণ্য-সঞ্চয় করেন। অলস দৃষ্টিতে মধ্যাহ্নের জনপথ লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ মহীপতির মনে হল আশ্চর্য, নিদুলীর মুখখানা ত' অনায়াসে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছেন না? ছোটবেলা ঘুমকাতুরে ছিল—তাই নাম হয় নিদুলী। তাঁর ধারণা নিদুলীকে তিনিই ভালবাসেন। কিন্তু সে কি তাঁকে বিশ্বাস করে? আশ্চর্য, বুনির বরের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ঠিকঠাক, দাদা যেন টপ্ ক'রে মাঝ থেকে ডাকাতি করে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপরও বিয়ে হতে পারত। এমন বিয়ে অনেক হয়। কিন্তু নিদুলী কিছুতে দোর খোলে নি, কারো কথা শোনে নি।

তাঁকে শুধু বলেছিল, 'ছি!'

তারপর আর পাত্র জোগাড় করা গেল না। জগৎপতি দূরে থাকলেও আজও সংসারের কর্তা, সকলের অভিভাবক। কিন্তু অন্যে পরে কা কথা। বউ-মেয়ের কথা অবধি সব সময়ে ভাবেন না। জগৎপতির জগৎ তিনি নিজে।

মহীপতি চোখ তুলে দেখলেন, বারাণসী বসাকের বাড়ির ফটকে পাল্কী ঢুকছে।

বারাণসী বসাক একজন সমৃদ্ধ রেশম ব্যবসায়ী। পরিবারবর্গ সৈদাবাদে রেখে তিনি তরুণী ভার্যা সহ মুর্শিদাবাদে থাকেন। সৈদাবাদে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করেন। ভাগীরথীর বুকে তাঁর বড় বড় নৌকো প্রতি বর্ষায় গাঁট গাঁট রেশম, তসর, সরেস গরদ এবং নিকৃষ্ট কেঠে কাপড় নিয়ে উত্তর ভারতে বারাণসী ও পুবে ঢাকা-চট্টগ্রামে যাওয়া-আসা করে। কি নবাব, কি জগৎশেঠ, সকলের কাছ থেকেই তিনি অবাধে কারবার চালাবার অনুমোদন পান। স্বাধীন ও সৎভাবে ব্যবসা করেই বারাণসী বসাক সন্তুষ্ট। তিনি জানেন, তাঁর মত লোকরাই নিজামতের প্রকৃত ভরসা। যদিও, বাইরে শুধু আমীর ওমরাহদের হইচই লক্ষ্য করা যায়। এ দেশের আসল টাকা জোগায় জমিদার, আর কিছু ব্যবসায়ী। [illegible] টাকা দেয় তাদের সঙ্গে [illegible] জনক সম্পর্ক রেখে চলবার পক্ষপাতী। মহীপতির

মনে পড়ল সেদিনই শুনেছেন, দেশী ও বিদেশী সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা যাতে সমান সুখ-সুবিধে ভোগ করতে পারেন, সেদিকে নবাব বর্তমানে নজর রেখেছেন।

সুবৃহৎ ফুলবাগানে ছোট একটি জলাশয়। সে জলাশয়ের স্থির কালো জলে যে সুরম্য ঘরটির ছায়া একটু একটু কাঁপছে, যার সাদা ছায়ার ওপর ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খেলা করছে, সেই ঘরটির দরজার গোড়ায় বসে প্রশস্তবপু বাঘেলা রাজপুত দরোয়ান নিবিষ্টমনে মাছকে খাওয়াবার জন্যে আটার গুলী পাকাচ্ছে। মহীপতি তার সসম্ভ্রম অভিবাদন উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকলেন। চারদিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'চাঁদের হাট।'

শেঠ, বসাক, সাধু, কয়েকজন শঙ্খবণিক কাঁসা-পেতলের ব্যবসায়ী, সৈদাবাদ, খাগড়া ও মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকজন লোক উপস্থিত। প্রশস্ত ফরাস। একপাশে অজিম কাশ্মীরী ও বঙ্গপ্রবাসী তাতার দেশীয় অস্ত্র-ব্যবসায়ী সিপার, পৃথক আসনে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের সার সার অলবোলা সুসজ্জিত। শীর্ণ শরীর, কৃষ্ণকায়, ঢুলুঢুলু চোখ, প্রায় বৃদ্ধ বারাণসী বসাক তপ্ত ঘি-এ গোলমরিচের মত ছিটকে ছিটকে সকলকে আপ্যায়ন করছেন। গলায় সোনা ও রুদ্রাক্ষের জপমালা, কানে সোনার নিমকাঠি, ছটফটিয়ে ঘুরতে ঘুরতেই তিনি মাঝে মাঝে আহা। আহা-হা। ইত্যাদি শব্দে আরাম জানিয়ে পুটপুট ক'রে ঝিনুক সহযোগে গলার ঘামাচি মারছেন। মহীপতির কথার জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তবে আমাবস্যের চাঁদ।'

'কেন ?'

'চাঁদ কি আর নিজে আলো দেয় আচায্যি মশায় ? একশো চাঁদেও আলো হয় না, যদি না দিবাকর কৃপা করেন। তা কিরীটেশ্বরীর কৃপায় এতক্ষণে সূর্য উদয় হ'ল।'

এ-হেন কুশলী বাক্য প্রয়োগে সন্তুষ্ট হয়ে সকলেই তারিফ জ্ঞাপন করলেন।

'বসতে আজ্ঞা হোক,' মহীপতি বসলেন।

মহীপতি আচার্য এঁদের এবং এদেশের দেওয়ানীর অন্যতম নিয়ন্ত্রা জগৎ শেঠদের মধ্যে সেতুবন্ধ বিশেষ। বড় এবং আরো বড়-র মাঝামাঝি যিনি চলতে জানেন তিনিই চালাক। ক্রমেই মধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

'এবার খবর-টবর হোক।' বারাণসী বসাক প্রত্যাশী নয়নে চাইলেন। বর্ধিষ্ণু হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ী হীরালাল শেঠ তাকিয়া ঠেস দিয়ে পড়ে আছেন। ফর্সা, মোটা, আঁটসাঁট শরীর, মেরজাই-এর ফিতের বাঁধন ঠেলে ভুঁড়ির ভাঁজ দেখা যায়। যেন আর একটি বড় তাকিয়ার ওপর পাগড়ী বাঁধা মুণ্ডু গজিয়েছে।

চোখ বুঁজেই তিনি বললেন, 'বেশি কিছু জানতে চাই নে, তবে ঘাটের শুল্ক, পথের শুল্ক, বাজার শুল্ক, এত রকম রকম তহুরী আর দিতে পারছি না। কি মনে হচ্ছে, আবার যুদ্ধটুদ্ধ লাগবে ?'

'কেন, যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে ?' মহীপতির সকৌতুক প্রশ্ন।

'অ্যাঁ ? শেষ হয় নি ? হীরালাল শেঠ তড়াক ক'রে উঠে বসেন।

'তবে যে এত বোম ফাটলে, বাজি পুড়লে, সৌলাদজঙ্গকে এতগুলো টাকা নজর দোয়া হ'ল, সে কি মিছেমিছি ?'

'আহা, কটকের যুদ্ধের কথা কে বলছে ? শোনা যাচ্ছে রাধারঘাটে গদীতে বসে আপনি নিত্য যুদ্ধ করছেন ভাস্তের সঙ্গে, আর তদ্বিরের পয়সা খেয়ে আপনার মুন্সী আরেক শেঠ হচ্ছে ?'

'অ:।' হীরালাল শেঠ আবার গড়িয়ে পড়লেন, 'আপনার নকুলেপনা। না না, লড়াই-যুদ্ধকে আমি বড় ডরাই। শুল্ক জোগাতে জোগাতে প্রাণ যায়। তাই শুধোচ্ছি।'

সকলেই মহীপতির দিকে চাইলেন। যেন মহীপতি সব জানেন। যেহেতু তিনি দিল্লী ঘুরে আসছেন, সেহেতু শেষ সংবাদটি তিনিই জানেন। মহীপতি বিশেষ গর্ব অনুভব করেন। যাদের অন্যরা মান্য করে, তাদের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে মনটা উৎফুল্ল হয়। আত্মবিশ্বাসের অবধি থাকে না। একটু হেসে বলেন, 'আর যুদ্ধের সম্ভাবনা কোথায় ?'

বৃদ্ধ সিপার এতক্ষণ কৌতূহলের সঙ্গে কথাবার্তার টানাপোড়েনের ওপর চোখ রেখে বসে আছেন। মনে মনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন। যুদ্ধই যদি না হবে, তবে আর দামাস্ক কার্দোভা, গুজরাট, লাহোর, গুলবর্ণা থেকে ছোরা, কিরীচ, ভালা, বর্শা, তরোয়াল

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যুক্স

মার্কনী ফ্যান

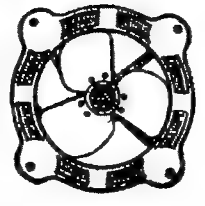

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত
কোন বাড়তি খরচ নেই
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রা:) লি:
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা
হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

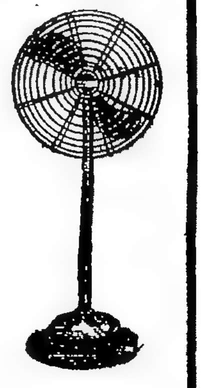

আমদানী ক'রে লাভ কি? আমদানীর শুল্ক কিছু কম দিতে হয় না।

মহীপতির কথার ভাবে বুঝলেন, লড়াই করবার মত গোঁয়ার-গোবিন্দ প্রতিপক্ষ পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তিত হলেন। লড়াই যদি না হবে তবে এত এত কামান-বন্দুক কি হবে? নবাবই বা কেন লক্ষ লক্ষ সৈন্য মিছে পুষবেন?

অথচ প্রতিপক্ষও পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক চিন্তা করে বললেন, 'কেন, নিজাম আসফ জাঁ?'

তখন বারাণসী বসাক, মেয়ে-কোঁদলের প্রধানার মত হাত নেড়ে বললেন, 'নিজামের কোমর ভেঙে গেছে, বুঝলেন সেখসায়েব?'

সিপার যেন দুঃখিত হলেন। নিজামের কোমর যদি ভেঙেই থাকে, তবে তাঁর আমদানী করা বন্দুকের বাঁটে ভাঙলেই যেন ভাল হ'ত। কোমর ভাঙার আসল মানেও তিনি জানেন না। তিন প্যাঁচ কোমরবন্ধ বসাবার কোমর ঠিকই আছে নিজামের, অথচ সরফরাজের আত্মীয়-স্বজনকে আলীবর্দীর ভাইপোর বিরুদ্ধে ক্ষেপাবার চেষ্টা কাদাসই হয়ে গেছে, এ কথা সিপার জানতে চান না।

বারাণসী বসাক আবার বললেন, 'বয়স হলে কি হয়, নবাব দড় আছে।'

হীরালাল শেঠ বললেন, 'এবার যে ঝাংটা হ'ল, সেটা আর কিছু নয়। বাংলা সুবার ঐ কটক জায়গাটা কেমন যেন। ওখানে গেলেই খালি যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়।'

বারাণসী বসাক আজিম কাশ্মীরী এবং সিপারের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে বললেন, 'যে জেতের যা। গরম দেশের মানুষ, সর্বদা রক্ত ওদের গরম হয়েই আছে। যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বোঝে না কি?'

মহীপতি তাড়াতাড়ি বললেন, যাক গে, এখন ত' আর অদূর ভবিষ্যতে কোন হাঙ্গামা-টাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা দেখি নে। এ নবাব, লোক অতি জবরদস্ত। টাঁ্যা ফোঁ করলে বিশেষ সুবিধে হবে না।'

'আর সুবিধে।' যুদ্ধ হবে না শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে হীরালাল বললেন, 'সকলের সামনেই বলি। বাজার লাগাৎ গঙ্গার মাটি একেকবার আমরা একেকজন কাটাই। গত বছর শাঁখারীপট্টি থেকে একেবারে দর-দস্তুরের ওপর দু'গুণ বেশি কড়ি দেওয়া হ'ল। কাজটা ঠিক হয় নি। এবার তুঁতে পট্টির পালা। এখন থেকেই জানতে পারছি এবার বাগদী বেটাদের জেয়াদা গরম হয়েছে। দুনো কড়ি চাই, তেল-সুপুরী চাই, মাটি কাটবার কথা ছিল, ঘাট বাঁধবার কথা ছিল না, হ্যানো ত্যানো নানান্ কথা।'

বারাণসী বললেন, 'হ্যাঃ, কড়ি ফেললে আবার লোকের ভাবনা, সূতীতে খবর দিলে অমনি দু'শো লোক আসে। তা ছাড়া পাথমারা সাঁওতাল-গুলোর আর কর্ম কি, ওদের এখন রাজমহলে বেশ জঙ্গল কাটতে দেখেছি, কথা কইলেই হ'ল।'

হীরালাল বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সে কথা সবাই জানে, তবে কথা কি, নিকটে মুর্শিদাবাদ, এই সৈদাবাদ, খাগড়া উত্তম গঞ্জ জায়গা, আমরা সকলে এখানে মিলেমিশে ব্যবসা করি। 'অন্যে পরে কা কথা, কুঠির ফিরিঙ্গী, সুরতী বেণেরা সকলে বলে সপ্তগ্রামের পরই মুর্শিদাবাদ, এর কাছে ঢাকার গৌরবও যেন লজ্জা পায়।'

'বলতে পারেন বটে।' আজিম কাশ্মীরী জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করে দেওয়ালে পঙ্খঝিনুকের শোভা দেখতে ব্যস্ত হ'ল।

'গঞ্জ কি আর এমনি এমনি হয় রে ভাই, ব্যাপারীদের চেষ্টাতেই না গঞ্জের শোভা।'

সম্মতিসূচক নানারকম শব্দ হ'ল। বোঝা গেল চৈত্রের এ তাতফাটা দুপুরে এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা কেউই এ-সব বিষয়ে দ্বিমত নন। হ্যাঁ, সবাই জানে ব্যাপারীদের চেষ্টাতেই গঞ্জের শোভা। আর দেশের সমৃদ্ধির মূলে ব্যাপারী-ব্যবসায়ীর চেষ্টার দাম কিছু কম নয়। বিদেশীরা ভাবে তারা এসেই বুঝি সাগরপারের পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্যের পথ খুলে দিলে ভারতের। অথচ জানেও না, অনাদি অনন্তকাল ধরেই এ দেশের মানুষ বাণিজ্যের ডিঙা ভাসিয়েছে নতুন বন্দরের সন্ধানে। আগগলুই পাছগলুইয়ে তেল-সিঁদুরে চোখ এঁকে দিয়ে বেণেগোষ্ঠীর এই যে মানত, ধ্রুবতারা যদি বা দুর্যোগের মেঘে ঢাকা পড়ে, তবু যেন দিব্যদৃষ্টিতে ডিঙা নিকষ কালো অতলান্ত অন্ধকারে তার পথ খুঁজে নেয়, সে মানত কি আজকের? কালিকট, সপ্তগ্রাম আর তাম্রলিপ্তই কি বন্দর? ইরাণ, ইরাক আরব থেকে বালুচ দস্যুদের দেশ হ'য়ে কারোয়াঁর পর কারোয়াঁ নিয়ে যে-সব ব্যবসায়ীরা আসে, তাদের দেশে যে গল্পে কিসসায় আরো কত কত বন্দরের কথা শোনা যায়?

আর এ-কথাও সবাই জানে, যারা বাণিজ্য চালায় তারা নিজেরাই আদ্যিকাল থেকে নিজেদের শাসনে রাখবার মত নিয়ম-কানুন গড়ে নিয়েছে, সময়ের প্রয়োজনে একটু-আধটু বদলাতে হয়েছে, এই যা। ভাষার মিল থাকুক আর না-ই থাকুক, শেঠ বসাকদের কথা ভরোচ, সুরাট, আর কাম্বের বণিকরাও যেমন বোঝে, তেমনি বোঝে আলিমান, ওলন্দাজ আর ফরাসী ফিরিঙ্গীরা। এ-সব কথাই জানাশোনা, তবে হীরালাল আজ কি বলতে চান?

মহীপতি আচার্য মৃদুস্বরে বললেন, 'যে-যার জাতব্যবসার শুভাশুভ দেখে রাখে, তাতেই ব্যবসা বাঁচে।'

তাঁর একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়েছে। সপরিবারে রাজমহল যাবার পথে তাঁরা নৌকো বেঁধেছিলেন। বুনি তার টিয়া নাওয়াবে। সেই টিয়া গেল উড়ে। মহীপতি যত বলেন, 'এক খাঁচা টিয়া এনে দেব. ওক যেতে দে',

বুনি কিছুতে শোনে না। আর কিছু চাই না, ঐ ওড়া পাখী নেব, ওড়া টিয়ে ধরে দাও ব'লে সে কি কান্না। সবুজ ঘাসের ওপর হলুদ ছুরে শাড়ির আঁচল বিছিয়ে কাঁদতে বসল। কপালের সিঁদুর লেপটে ধেবড়ে একাকার। জেদ দেখে মহীপতির যত রাগ হয়, ততই মনে হয় মোটে আট বছরের মেয়ে, ওব আর কি জ্ঞান আছে।

নৌকোর দুলুনিতে শরীব অস্থির হচ্ছিল ব'লে বউঠান শুয়েছিলেন। দাদা চাকরকে দিয়ে পা টেপাচ্ছেন, অগত্যা বুনির হাত ধরে মহীপতিই গেলেন।

মনে পড়ল টিয়া খুঁজতে গিয়ে বুনি পানের বরজে ঢুকে গিয়েছিল, আর এককালে রূপোর লবঙ্গ পরা একদল বারুই-এর সে কি রাগ। বুনি তাদের বরজে ঢুকেছে, পান ছিঁড়েছে। জগৎপতি তাদের পাল্টা শাসালেন বটে, বললেন, 'না-জানতে ঢুকেছিল, দোষ নেই।' কিন্তু জাত-কর্মের শুভাশুভ জ্ঞান কারো মধ্যে কম নয়, সতেজে একটি পানচাষী বলেছিল, 'পান-বরজে মেয়েছেলে ঢুকে ?'

বুনির কথা মনে পড়ল কেন? ঐ বরুজীবীটির প্রসঙ্গে ? মহীপতি চোখ তুললেন, হীরালাল কি বলছেন।

'কথাটা যে তুলেছি, আমারও একটা যুক্তি আছে। এমন কিছু আমরা করতে পারি না যাতে ভবিষ্যতে অন্য লোকের অসুবিধে হয়। তা শাঁখারীপটিতে নবীনসাধু মহাশয়ের মতো মহাজনরা থাকতেও আলটপ্কা ঘাটবান্ধনীদের দুনো কড়ি দেওয়া হল কেন? এটা একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল না ? ওদের ছাড়া আমাদের চলে না, আমাদের ছাড়াই বা ওদের চলবে কেন ? একে ত' যুদ্ধ-বিগ্রহের ধান্দায় ঘাটমাশুল বেড়ে যাচ্ছে, এখন ঘাটবান্ধনীদের কদর জেয়াদা, নদীর পাড় বেঁধে তারা কম কামায় না। এত এত হাতী ঘোড়া সেপাই-লস্কর যাতায়াত করে, ঘাট বাঁধার কাজ নিত্য লেগে আছে। এমন করে হঠাৎ দস্তর বাড়ানো ঠিক নয়, শহরবাজারে ছোট জেতেদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়।'

বারাণসী বললেন, আ। দস্তর বা বাড়াব কেন ? এখন কিছু নিত্যি-নিত্যি যুদ্ধ-লড়াই হচ্ছে না।

নবীনসাধু কিছুটা দোষী বোধ করছেন, তাই অযথা উত্তপ্ত হলেন। বললেন, 'দেশে এমন অরাজকতা, ছোট জেতের আস্পর্দা বাড়তে কি আর উপলক্ষ্য লাগে ?'

আজিম কাশ্মীরী হঠাৎ বললে, 'অরাজকতা আর নেই কবে, তবে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করি তাদের পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া থাকা দরকার বই-কি।'

হীরালাল শেঠ সনিশ্বাসে বললেন, 'ফিরিঙ্গীরাই আছে ভাল। বেটারা সুতোনুটিতে এমন কারবার ফাঁদলে যে, ফরাসডাঙ্গা চুঁচড়ো কানা হব হব।'

বারাণসী বসাক বললেন, তা আর হতে হচ্ছে না। নবাবের বুদ্ধি আছে, দাপ ও আছে, কুঠির সায়েবদের একে চটিয়ে ওকে তুষবে না।'

হাতে তুড়ি দিয়ে নবীনসাধু বললেন, 'আগের চে' আমরা স্বস্তিতে আছি বাবু, সেখেদের রাজত্বে যতদূর থাকা যায়।'

কথাটির মধ্যে রুচির অভাব ছিল। সকলেরই কানে লাগল। বারাণসী তাড়াতাড়ি বললেন, 'হ্যাঁ, যুদ্ধ-বিগ্রহ না হলেই বাঁচি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, উলুখড়ের চিন্তা।'

নবীনসাধু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'স্বস্তিতে থাকবার কি কম আরাম ? আমার লোকেরা কেষ্টনগরে এ-সময়ে বিলক্ষণ বাণিজ্য করে, অন্নদা-পুজোয় ঘরে ঘরে ধুমধাম। তা ছাড়া বড়গাঙের ওপারে এ-সময়ে বাসন্তী-পুজোর মরশুম। আমাদের আর কি, শান্তিতে পথঘাটে চলতে ফিরতে পারলেই হ'ল।

যুদ্ধ-বিগ্রহে নবীনসাধুর বড় ভয়। কেন না, তাঁর বেশ কিছু টাকা জমেছে। কখন কার নজর পড়ে সর্বদা সেই চিন্তায় আছেন। বিশেষত ফতেচাঁদ ব্যক্তিটি সোজা নন, কে কত টাকার ব্যাপারী সে তাঁর নখদর্পণে।

হীরালাল কিন্তু সকলকে অবাক ক'রে বললেন, 'এত ডরাস কেন? আমাদের ব্যবসার কি, যেখানে হোক সেখানে যাব, যুদ্ধ-বিগ্রহে এক জায়গা ভাঙে, আর জায়গা গড়ে।'

এ-কথা তিনি বলতে পারেন, কেন না তাঁরা বংশানুক্রমে যখন যেখানে যে জায়গাটি বড় হয়েছে সেখানে ব্যবসা করেছেন। দিল্লী, ঢাকা, আজিমাবাদ, অনেক জায়গার উঠতি-পড়তি দেখেছেন। তাঁর লক্ষ্মী জমিতে বাঁধা নেই, তাই কোন একটি জায়গার প্রতি অন্ধ আনুগত্য হীরালালের স্বভাবে নেই।

এমন সময়ে মহীপতি বললেন, 'আমি কিন্তু যা শুনলাম তাতে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।' একটু থেমে বললেন, 'জোর গুজব, ভয়ানক যুদ্ধ হবে। এই হ'ল বলে। আজ হয় কি কাল।'

(ক্রমশঃ)

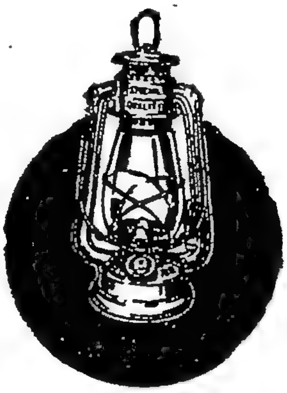

কিম্যান
লণ্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,৩নং চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৫৮০

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চতুর্থ প্রবাহ ॥

["একদা মালদহের বস্ত্রব্যবসায়ী রাশিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল।"]

বাংলার প্রাচীনতম মৃত্তিকা বরেন্দ্রভূমি। তার প্রাচীনতম ব্যবসা রেশম ব্যবসা। এই রেশম ব্যবসার বিষয়টাই আরও বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীন এক ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলছে, এই জেলাতেই প্রায় একুশ হাজার নারী-পুরুষ এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত রয়েছে। দশ হাজারেরও বেশি ছিল মৎস্যব্যবসায়ী, আর বস্ত্রবয়নকারী ছিল তেইশ হাজার।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান পরিষ্কার আভাস দেয় সমগ্র জনসমাজ স্বাধীন ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করতো। সেকালে কল-কারখানা হয় নি। নির্মল আকাশ সেদিন কলের ধোঁয়ায় কালো হয়ে ওঠে নি। শুধু পৃথিবীর আদিমতম শিল্প —কৃষিশিল্প সেদিন দেশের বুকে প্রভুত্ব করছিল। কিন্তু কৃষির কাজ হয় বছরে ছয়মাস। তাই দেশের মানুষকে কিছু না কিছু করতে হতো।

কোন কাজে নিযুক্ত থাকার বাধা ছিল না। প্রাচীনকালে এই জেলার মাটি ছিল উর্বরা। মাঠে মাঠে ফলতো অজস্র আমন ধান: বাগানে বাগানে আমগাছের ডাল ভরে আমের মুকুল আসতো। পর্যাপ্ত আমের ভারে ডাল ঝুলে পড়তো। গাছভরা আমের বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখতো বাগানের মালিক। এই আম তাদের ঘরে আনবে সোনা।

সবচেয়ে আশ্চর্য! আমবাগানের মালিক দূরদেশে আম রপ্তানীর জন্য এতটুকু পরিশ্রম করতো না; করতো না এতটুকু চিন্তা।

বৈশাখে দু একবার কালবৈশাখী হয়। কখনো সখনো দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়। জ্যৈষ্ঠের সুরুতে আম পাকে। ঠিক এই সময় মহানন্দায়, গঙ্গায় দেখা যেত ব্যাপারীদের বজরা। তারা আসতো পদ্মা পার হয়ে পাবনা থেকে, আসতো ঢাকা থেকে, রাজসাহী থেকে আরও দূরের নানা জেলা থেকে। ব্যাপারীরা মালদহে এসেই আমবাগানের মালিকের আম নিয়ে দর-দস্তুর করতো। আম কিন্তু তখনো গাছে। কখনো কখনো গোটা আম-বাগানটাই জমা নিত ব্যাপারীরা। দর ঠিক হয়ে গেলে ব্যাপারীরা নিজেদের লোক দিয়েই আম পাড়িয়ে নিয়ে নৌকোর পাটাতনে তুলতো। তারপর আবার বজরা ভাসিয়ে চলে যেত নিজেদের জেলায়। মালদহের বিখ্যাত সুস্বাদু আম্রফল বিক্রি করে আবার তাদের ঘরেও দু'টো পয়সা আসতো।

একটি অতি পুরানো দলিলে বলছে, রেশমের মতই আমের ব্যবসাও বাঙালীদের একটি অতি প্রাচীন ব্যবসা।

আধুনিক মালদহের যে জায়গাকে বলে ইংলিশবাজার, সেখানে একদিন বাঙালীর পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবসা জমে উঠেছিল। আজ কেউ কামারশালা খুলে পেটের ভাত করতে পারবে, এমন দুরাশা পোষণ করে না—কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ইংলিশবাজারে আর নবাবগঞ্জের ছয়শো তিপান্নজন বাঙালী শুধু লোহালক্কড় ও পিতলের ব্যবসা করে আনন্দে হেসে-খেলে জীবন কাটিয়েছে, তার নজীর আছে ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে।

মালদহের বাইশ মাইল দূরে আধুনিক মাণিকচক। মাণিকচকের ওপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই গঙ্গার ওপারে সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পাহাড়ের নীলাভ আভাস দেখা যায়। এই পাহাড় ডিঙিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে এই জেলায় এসেছিল সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা। তারা নিয়ে এসেছিল লাক্ষাগাছের বীজ। এখন লাক্ষা ব্যবসা লুপ্ত হয়ে গেছে এই জেলা থেকে।

মাছের ব্যবসাতেও একদিন এই জেলার অধিবাসীদের কিছু কিছু অন্নসংস্থান হয়েছে। কিন্তু এই মাছ, আম, ধানে যত লোকের জীবিকা নির্বাহ হতো, তার চেয়ে বেশি লোকের পেটের ভাত

ছড়িয়েছে একলা রেশম ব্যবসা, তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা।

রেশম শিল্পে লোকের প্রযোজন হয় অনেক বেশি। এই শিল্পের তিনটি বিভাগ আছে। রেশম গুটিকে ইংরেজীতে বলে 'Cocoon.' প্রথম বিভাগটির নাম কোকুন রিলিং। গরম জলে ভরা একটি পাত্রে রেশম গুটি ছেড়ে দেওয়া হয়। উত্তপ্ত জলের প্রভাবে গুটির গা থেকে ধীরে ধীরে সুতোগুলো খুলে আসে। খুব সহজে রেশমের গুটি থেকে সুতো উঠে আসে না। গরম জলে ফুটন্ত রেশমের গুটিটিকে ডান হাতের লাঠি দিয়ে দ্রুত ঘুরোতে থাকে। গরম জল থেকে ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া উঠতে সুরু করে। তারপর রেশমকীটের যেদিকে সুতোটা একটু খুলতে আরম্ভ করেছে, ডানদিকটা ইংরাজী 'টি' আকৃতিযুক্ত লোহার ফ্রেমে পোঁচিয়ে যায়। একজন রেশমকীটের গা থেকে সুতো তোলে আর একজন পেঁচিয়ে চলে। তারপর সুরু হয় বয়নকার্য—যাকে বলে 'উইভিং'।

আশিবছর আগে লেখা একটি পুরানো গেজেটিয়ার বলছে, তখন ইংলিশবাজারের কাছে সাহাপুরে এবং শিবগঞ্জে প্রায় একশো চল্লিশটি বাঙালী পরিবার সিল্কের কাপড় বুনতো। এই একশো চল্লিশের ভেতরে আবার পঞ্চাশটি পরিবার তৈরি করতো মটকা আর বাদ বাকী গরদ কিম্বা খাঁটি সিল্কের কাজ করতো।

রেশম সিল্কের বাহ্যিক চেহারাটা যদিও কুটিরশিল্পের মতো, তবুও লোক দরকার হয় বেশি। একথা আগে বলা হয়েছে। রেশমকীটের গাছ, অর্থাৎ মালবেরী গাছের চাষ, রেশমকীট থেকে সুতো তোলা, সিল্ক সুতো দিয়ে বস্ত্র বয়ন—এই তিনটি বিভাগের ভেতরে হাজার মানুষের কর্ম-প্রবাহ প্রসারিত হয়ে থাকতো।

শুধু গেজেটিয়ারে নয়, কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের মত প্রাচীন গ্রন্থেও বরেন্দ্রভূমির এই বস্ত্রশিল্পের উচ্ছসিত প্রশংসা রয়েছে। কৌটিল্য বলেছেন, দুকুল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। এই চার প্রকার বস্ত্র উৎপন্ন হতো এই দেশে। এই অঞ্চলের দুকুল বস্ত্র খুব নরম ও সাদা, মণির মত পেলব। ক্ষৌমবস্ত্র দুকুলের মতই, তবে একটু মোটা। পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক খুব উঁচু দরের বস্ত্র… পরিশেষে কৌটিল্য বলেছেন আরও—বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকুল যেমন উৎপন্ন হইত তেমন শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্রের অন্যতম উৎপত্তিস্থল এই দেশ। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বার বার বাংলার বস্ত্রশিল্পের কথা বলেছেন।

রেশমবস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে Gangetic Muslin গাঙ্গেয় বস্ত্র-সম্ভারের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল দূরদূরান্তরে। ত্রিপুরার সুবর্ণবণিকরা ঢাকায় বাণিজ্য করতে এসে সূক্ষ্ম মসলিনের অপরূপ শোভা দেখে বিস্মিত হয়ে যেত, চোখে ফুটে উঠতো মুগ্ধ তন্ময়তা। কোন মসলিনের রঙ নবোদিত সূর্যের মত; কোনটার রঙে দূর-সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার আভাস। সুবর্ণবণিকরা নিজেদের স্বর্ণ উজাড় করে দিয়ে নিয়ে যেত সেই অপরূপ শোভাময় বস্ত্রসম্ভার।

উত্তর বাঙলার এই সুপ্রাচীনকালের রেশমশিল্পের কথা লিখতে বসে মনের ভেতরে ফুটে উঠছে অপরূপ একটি ছবি।

ষোড়শ শতাব্দীর বরেন্দ্রভূমি। বাণিজ্যে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিদ্যায় তার খ্যাতি দূর দেশময় ব্যাপ্ত। সেই সময়—সেই সময় গৌড় মহানগরীর প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় বাণিজ্যতরী ভাসিয়েছিল এক অতি সাধারণ আর অতি নগণ্য রেশমবস্ত্র ব্যবসায়ী। কিন্তু সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর হলেও তার দু'চোখে স্বপ্ন ছিল অগাধ। তার এই স্বপ্নের জন্য, অসম-সাহসের জন্য আর সাগরপারের দূরদেশে বাণিজ্যকে প্রসারিত করে দেওয়ার জন্যই তার নাম রেশমশিল্পের ইতিহাসে সোনার লেখার মত জ্বল জ্বল করছে।

তার নাম ভিক্ষু শেখ। পত্নীবিয়োগ হয়েছিল বহুদিন আগে। কিন্তু দার-পরিগ্রহ করে নি আর। স্ত্রী, সন্তান স্নেহমায়ামমতার সংসারের বন্ধন তার কাছে ছিল তুচ্ছ। তার রক্তের ভেতরে নেশার মত ছিল এই রেশম ব্যবসা।

ভিক্ষু শেখ রেশমবস্ত্রের সওদাগর। গঙ্গায় বজরা ভাসিয়ে সিল্কের কাপড় নিয়ে যায় ঢাকায়, যায় কলকাতায়। কিন্তু এবার যেন প্রস্তুতির ভেতরে অন্য কিছুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তিনটি বিশাল বাণিজ্যতরীকে ভিক্ষু শেখ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রঙ করালো। পাটাতনগুলোয় হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে দেখলো সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার আঘাত সইতে পারবে কি না!

—কি ভিক্ষু মিয়া এবার কোনদিকে?

—দেখি। আর কিছু বলে না। মনের ভেতরের বাসনাটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উদ্বেল হয়ে ওঠে।

—এত খাওয়ার জিনিষ নিচ্ছিস, এত লোক নিচ্ছিস। এবার তুই কোনদিকে যাচ্ছিস ভিক্ষু, বুড়িমার চোখে আশঙ্কার ছায়া কাঁপে থর থর করে।

—তুমি চিন্তা করো না মা, যেখানেই যাই ঠিক ফিরে আসবো—

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

একটি বিবর্ণ চিঠি

মদন দত্ত

"প্রত্যুষেই স্নান করে নীলাম্বরী শরীরে জড়িয়ে
উড়িয়ে দিয়েছি আমি মুঠো মুঠো আবিরের কণা
তোমার উদ্দেশ্যে আজ যুগপৎ আনন্দ যন্ত্রণা
প্রেম আর এ শরীর সেই সাথে দিলাম ছড়িয়ে।"

একটি বিবর্ণ চিঠি : উদ্বেলিত স্বপ্নিল হৃদয়
গভীর যন্ত্রণা নিয়ে দুই চোখে বিস্ময় অগাধ
সেই চিঠি পাঠ করে যৌবনের সমুদ্রের স্বাদ
সেদিন পেয়েছে জানি কেন যেন এ এক বিস্ময়।

আজ জানি সেই চিঠি শুধু শুধু শব্দ নিয়ে খেলা
সুসজ্জিত মিথ্যাবাক্য কল্পনার ছবি বিমিশ্রিত
জাল বুনে লিখেছিল সে যে এক পত্র-বিলাসিনী
যৌবনের যন্ত্রণায় তারপর হল যেই বেলা
খেলাঘর ভেঙে দিয়ে সেই নারী দূরে পলায়িত।

একটি বিবর্ণ চিঠি : যৌবনের বিচিত্র কাহিনী॥

নির্বেদ

শিপ্রা ঘোষ

এ জীবন আমি কখনো চাই নি : আমি কী চেয়েছি
ঢেউ গুণে গুণে বেঁচে থাকা এই কম্প্র আতুর,
আর্ত আকুল আসবসিক্ত কস্তুরী দিন ;
মুছে যাওয়া ম্লান স্মৃতির দৃশ্য জলের ধারে ?
ভাঙা পাঁজরের ভিজে চৌকাঠে জাফরান রোদ
ঝাপসা স্মৃতির শ্যাওলা জড়ানো সুঠাম শরীর,
ঢেউ ছলোছলো আতর-হৃদয় বিলোল বিলাপ,
নিয়তির কোনো অমোঘ বিধান প্রাজ্ঞ স্থবির ?

আর্দ্র শপথ পঁচিশ বছর গণিকা শহর,
কোনো কবিতার নিটোল চরণে নীলাভ অ-সুখ ;
বুভুক্ষা প্রেম বন্ধ্যা প্রকৃতি : ঝাড় লণ্ঠনে
মিছে আশ্বাস বেহায়া হাওয়ার ভরা কৌতুক।

এ জীবন আমি কখনো চাই নি : আমি কী চেয়েছি
ক্ষুধিত সুখের ক্লান্তি, ঘৃণার রঙিন আতর,
পথ ভুলে যাওয়া ধু ধু যন্ত্রণা : ধূসর রাতের ;
অসহ কান্না : গৈরিক রোদ, গণিকা শহর ?

কাউকে কিছু বলে না। চেপে থাকে। তাই তাকে নিয়ে কৌতূহল আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সত্যিই একদিন রাত্রি-শেষের অন্ধকারে যখন গৌড়ের সোনা মসজিদ থেকে আজানের প্রভাতী ঘোষণা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল—সেই সময়ে তিনটি বাণিজ্যতরীতে সিল্কের কাপড় বোঝাই করে রওনা হলো কে জানে—কোনদিকে।

কে জানে গন্তব্যস্থান। জানে মাঝিমাল্লারা। গৌড় মহানগরীর জনপ্রাণীও সেদিন জানতে পারে নি—কোথায় গিয়েছিল ভিক্ষু তার বজ্রসম্ভার নিয়ে। জানতে পারতো না কোনদিন, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের পাতায় ভিক্ষু শেখের নামটা জ্বল জ্বল করতো না, যদি পারস্য উপসাগরের আকাশে ঘন দুর্যোগের মেঘ দেখা না দিত যদি—

থাক সে কথা। ভিক্ষু শেখ বজরার ওপরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতে লাগল প্রাসাদপুরী গৌড় মহানগরী। একটু একটু করে তীরভূমি দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সোনা মসজিদের উচ্চশীর্ষ।

ভিক্ষু শেখের বাণিজ্যতরীর বহর পার হয়ে গেল বঙ্গোপসাগর। এসে পড়ল ভারত মহাসাগরে। যেদিকে তাকাও বিশাল সমুদ্রের নীলিমা দূরদিগন্তে উধাও হয়ে গেছে। ভিজাগাপট্টম থেকে কুমারিকা অন্তরীপ, পশ্চিমঘাট পর্বতমালাকে ডাইনে রেখে ধীরে ধীরে এসে পড়ল আরব সাগরে।

দিনের পর দিন যায়। মাস যায়। ভিক্ষু শেখ দিগন্তবিস্তারিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে, মালদহের বিখ্যাত সিল্কের কাপড়ের খ্যাতি বসোরা, ইরাক, তুরস্কের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

—মধ্য এশিয়া পার হয়ে রাশিয়ায় যেতে আর কতদিন লাগবে ?—মাঝিমাল্লারা অধৈর্য হয়ে ওঠে।

—এই তো এসে পড়েছি, তোমরা ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? আর কিছু বলে না ভিক্ষু। ভাবে পারস্য উপসাগর পার হয়ে বন্দরে আরামে বজরা বেঁধে বসোরা, ইরাক, তুরস্ক, সমরখন্দ পদব্রজে পার হয়ে যাবে রাশিয়ায় কিন্তু—

পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যতরীর বহর প্রবেশ করা মাত্র আকাশের দিকে দিকে দেখা দিল ঘন কালো ঝড়ো মেঘের চক্রান্ত। লক্ষ অজগরের মত ফুঁসে উঠল পারস্য উপসাগরের ঢেউ। মাল্লারা প্রমাদ গণল। দূরদেশে পত্নীপুত্র একান্ত আপনজনের কথা মনে পড়ল। কিন্তু ঝড়ের সমুদ্র গ্রাস করল দুইটি জাহাজকে। ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিল ভিক্ষু শেখ।

রাশিয়ায় মালদহের সিল্কের কাপড়ের ব্যবসাটাকে প্রসারিত করার স্বপ্ন সত্যে রূপায়িত হলো না। কিন্তু বাঙালী বণিকের এই অভূতপূর্ব সাহসের কথা, দূরদেশে বাণিজ্য বিস্তারের ইতিবৃত্তটা এ কালের দুর্বল অক্ষম সামান্য কেরাণী হওয়ার স্বপ্নে মশগুল বাঙালী যুবকের কাছে এক অত্যাশ্চর্য প্রেরণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'বিষটা সায়ানাইড, কাজেই খাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে'—পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটা খুলে রামদুলাল দত্ত মাথা নাড়লেন। কালকের উৎসব-আয়োজনের চিহ্ন এখনও বিশৃংখলভাবে চারদিকে ছড়ানো। দেওয়ালের গায়ে শুকনো ফুলের মালা, ঘরের মধ্যে বাসি ফুলের গন্ধ। সমবেশ নির্জীব হয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে।

পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে একে সুইসাইডের কেসই বলা উচিত। কেবল আমার প্রশ্ন বিষটা উনি পেলেন কোথায়?'

কথাটা কাল থেকে সকলে ভাবছে, জল্পনা-কল্পনাও অনেক হোল। কিন্তু, মীমাংসায় পৌঁছতে পারা যায় নি।

'সার্টিফিকেটে তাই লিখতে হবে অগত্যা আমাকে, যদিও কয়েকটা পয়েণ্ট একটু গোলমেলে ঠেকছে'—মুখ তুলে প্রত্যেকের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন রামদুলাল দত্ত—'যেমন ধরুন, আত্মহত্যা করার সময় সাধারণত মানুষের মনে আত্ম-প্রচারের চেষ্টা থাকে বলে বেশ স্পষ্ট করেই সে কৈফিয়ৎ লিখে রেখে যায়। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখছি। তারপর আসে মোটিভের কথা। একেবারে ডেসপারেট না হলে মানুষ সুইসাইড করে না। মাধবী দেবীর চরিত্র সম্পর্কে কাল সকলকে প্রশ্ন করে যেটুকু ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় ভদ্রমহিলা নার্ভাস টাইপের মানুষ ছিলেন না।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি—ওদের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত অসুখী ছিল এবং একেবারে একটা চরম পথ বেছে নেওয়ার জন্য ওরা দুজনেই প্রস্তুত হয়েছিলো'—সত্যজিৎ সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিভে যাওয়া বর্মী চুরুটে বার-কয়েক টান দিয়ে বলে উঠলেন—'আত্মহত্যার পক্ষে সেটা কি যথেষ্ট মোটিভ নয়?'

'দেখুন মিঃ সামন্ত, আপনি একজন আইনজ্ঞ। আইন নাড়াচাড়া করার সময় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বিবাহিত জীবনে অসুখী মানুষের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। কত সময় স্ত্রী স্বামীকে হতাশ করেছে; আবার স্বামীদের স্ত্রীর প্রতি অমানুষিক নির্যাতনের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কিন্তু তা বলে কি আর সকলে আত্মহত্যা করতে ছুটছে। তাছাড়া মাধবী দেবী নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের মোটামুটি একটা ছক এঁকে নিয়ে দার্জিলিং-এর কনভেণ্টে যাওয়ার প্রস্তুতিও সুরু করেছিলেন। আগের দিন বিকেলে চৌরঙ্গীর দোকান থেকে গরম ওভারকোট কেনার রসিদ এখনও ওঁর টেবিলের টানায় রয়েছে।

স্বাভাবিক মানুষও অনেক সময়ে হঠাৎ ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে। আমাদের ডাঃ বসাক কাল বলছিলেন টেম্পোরারি ইনস্যানিটির ফলে এ জাতীয় কেস দু'চারটি উনি হতে দেখেছেন'—সত্যজিৎ সামন্ত আবার মুখ খুললেন।

'কিন্তু বিষ উনি পেলেন কি করে?' রামদুলাল দত্ত তির্যক ভঙ্গীতে ফিরে তাকালেন—'আগে থেকে আত্মহত্যার কথা উনি মনে মনে চিন্তা না করলে হাতের কাছে সায়ানাইডের মত কড়া বিষ কে জুগিয়ে দেবে?'

'তাহলে—আপনি কি তাহলে এটাকে মার্ডার কেস বলে প্রমাণিত করতে ইচ্ছুক'—সত্যজিৎ সামন্ত চিন্তিতমুখে ফিরে তাকালেন—'এক-বাড়ি লোক, কেই বা এ কাজ করবে। কেনই বা করবে।'

'একবাড়ি লোকের সুযোগ নিয়েই তো একাজ করা সম্ভব'—রামদুলাল দত্ত পেপার-ওয়েট দু'হাতে নাড়তে নাড়তে গম্ভীর গলায় বললেন। 'আর মোটিভের কথা যদি বলেন তাহলে এ বাড়িতে কাল যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মাধবী দেবীর বিরুদ্ধে কিছু না কিছু অভিযোগ রয়েছে। সমরেশবাবুর কথা ছেড়েই দিলাম। উনি তো স্পষ্টই বলেছেন ওঁদের দুজনের মধ্যে একজনের সরে যাওয়া দরকার। তারপর ধরুন ডাঃ সুনন্দ মিত্র।'

ঘরের মধ্যে হঠাৎ নিস্তব্ধতার ঢেউ আছড়ে পড়ল। সকলে সচকিত হয়ে তাকালো এদিকে। শুধু রামদলাল দত্ত নয়, আরও অনেকেই লক্ষ্য করলে অনিল বিশ্বাসের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। একটু আগে রামবিলাস চা দিয়ে গেছে। চায়ের পেয়ালা ধরে থাকা হাতটা তার ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?' রামদলাল দত্তের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

'না, না, মাথাটা কেমন ঘুরে গেছে'—আমতা আমতা করে বলে উঠল অনিল।

'আপনিই তো প্রথম মাধবী দেবীকে

দেখেন। আচ্ছা, ওঁর কি সে সময় একটুও জ্ঞান ছিল না ? বেশ করে ভেবে দেখুন—কোন কথা সে সময়ে উনি বলবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা। অন্তত একটা-দুটো শব্দও যদি উচ্চারণ করে থাকেন, সে থেকেও হয়তো—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে অনিল বিশ্বাস সজোরে মাথা নাড়ল। না, কোন কথাই মাধবী বলতে পারে নি। যখন সে লাইব্রেরী ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল, মাধবীর শরীরটা নিশ্চল হয়ে কার্পেটের উপর পড়ে রয়েছে। একবার মনে হয়েছিল, ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা মুখে চোখে দিলে হয় তো জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তার পরেই ডাঃ বসাক ও সুনন্দ মিত্রের কথা মনে পড়াতে সে তাড়াতাড়ি নীচে ছুটে চলে আসে।

'খুবই আপশোসের কথা'—রামদুলাল দত্ত ঝিমানো গলায় বললেন—'কিন্তু যা হয় নি, তার জন্যে বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বলছিলাম সুনন্দ মিত্রের কথা। আপনারা সবাই জানেন, ওঁকে কেন্দ্র করেই সমরেশ-বাবু আর মাধবী দেবীর মধ্যে মনান্তর চলছিলো।'

সুনন্দ মিত্র মুখ লাল করে আপত্তি জানাতে চেষ্টা করল, কিন্তু রামদুলাল দত্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চললেন—'অথচ ডাঃ মিত্র নিজে এই পরিবেশে ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠছিলেন। কিছুটা অজ্ঞান্তে, কিছুটা নিজের স্বার্থে জড়িয়ে পড়লেও মুক্তির উপায় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ওঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মিঃ সামন্ত যে চাকরীর সন্ধান দিয়েছেন তাতে দেশ ছেড়ে একেবারে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ এসে গেছে। কাজেই —'

'কাজেই আমি মাধবীকে খুন করব ? বাঃ চমৎকার। একেবারে ওরিজিনাল আইডিয়া'—হাততালি দিয়ে উঠল সুনন্দ—'কিন্তু কেন ?'

'না, চলে যাওয়াটাই একমাত্র কারণ নয়। হয়তো আপনার বিদেশ যাওয়ার মতলবের সঙ্গে অন্য আরও পরিকল্পনা ছিলো। এবারে সাংসারিক হওয়ার কথা ভাবছিলেন মনে মনে। একটি ধনী অভিজাত পরিবারের উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে কিছু কিছু ঘনিষ্ঠতাও হচ্ছিল—তাই না ?'

'কে এসব বলেছে ?' সুনন্দ ফ্যাকাশে মুখে নীচু গলায় বলল।

'কৈফিয়ৎ আমি দেব না ডাঃ মিত্র, সেটা আমার কাজ নয়। আমি ভাবছি মাধবী দেবী আপনার এই ইচ্ছের কথাটা জানতে পেরেছিলেন কিনা এবং জেনে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।'

সুনন্দ মিত্রের পর অপর্ণা লাহিড়ীর প্রসঙ্গ উঠল। সমরেশের সঙ্গে তার আলাপ অনেক দিনের এবং তার মতে দুজনের মাঝখানে মাধবী না এসে দাঁড়ালে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারত। আশাভঙ্গের পর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে জগদীশ লাহিড়ী বলে এক ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে বাগদত্তা হয়ে সাতদিনের মধ্যে রেজিস্টারী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে আসে। সে বিয়ে সুখের হয় নি। এধারে সমরেশকেও অসুখী দেখে মনের জ্বালা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে ও সমস্ত আক্রোশ মাধবীর উপরে গিয়ে পড়ে।

তারপর কমলেশ বসু। তাকে সেদিন কার্ড দেওয়ার কথাই ছিলো না, অথচ অনিল বিশ্বাস বলছে একটা চিরকুটে ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা লিখে তাকে টাইপ করতে দেওয়া হয়েছিলো। কার হাতের লেখা, সে কথা মনে পড়ছে না। মাধবীর নিজের হস্তাক্ষর হতে পারে। কমলেশ বসু একটি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। শোনা যায় এককালে মাধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিলো যথেষ্ট।

'এ বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে অনিল বিশ্বাসের নামও কিন্তু বাদ দেওয়া চলে না। ওর মোটিভ খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবে শুনেছি সমরেশবাবুর অনুগত বলে ছেলোট মাধবী দেবীর আচরণ ইদানীং সহ্য করতে পারত না। এখানে কাজ করার আগে একটি নামজাদা কেমিস্টের দোকানে চাকরী করত, এ খবরও আমার কানে এসেছে।'

'আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ দত্ত'—সত্যজিৎ সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন—'জীবন এত জটিল ভাবলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। আমি কিন্তু এখনও নিশ্চিত, মাধবী সুইসাইড করেছে।'

'না, কাকাবাবু'—হঠাৎ সমরেশ এতক্ষণ বাদে ঝিমন্ত ভাব কাটিয়ে উঠে বসল—'আপনারা কেউ আমাদের ইতিহাস পুরোপুরি জানেন না। আমার, মাধবীর আর সুনন্দর ইতিহাস। আমরা দুজনে মিলে ওকে মেরেছি। মারতেই হোত—তাছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।'

'কি যা তা বলছ তুমি ?' চেয়ার ছেড়ে সুনন্দ এগিয়ে এসে সমরেশের কাঁধে ঝাঁকুনি দিলো সজোরে—'আবার তোমার বাজে বকুনি সুরু হয়েছে।'

'বাধা দেবেন না ডাঃ মিত্র'—রামদুলাল দত্ত কড়া গলায় ধমক দিলেন—'প্রত্যেকের জবানবন্দী শোনা আমাদের কর্তব্য। সমরেশবাবু, খুলে বলুন সব কিছু। আপনার কথা ভালো করে বুঝতে পারছি না।'

'সুনন্দ এখুনি আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবে—তখন আর কিছুই বলা হবে না।' ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে সমরেশ বলল—'মাধবীর মৃত্যুর জন্য আমরা দুজনেই দায়ী। এজন্যে যা শাস্তি দেবেন, তা মাথা পেতে নিতে রাজী আছি। আমার কথা বিশ্বাস করুন, মাধবী যদি সেদিন কমলেশের মত আমাকেও প্রত্যাখ্যান করত, তাহলে এই নিদারুণ পরিণতি ওর হোত না। আমার শরীর মন সব কিছুই ফসিলের মত মরে গেছে। মরা মানুষের সঙ্গে কেউ জীবন কাটাতে পারে না।'

'কিন্তু ডাঃ মিত্রকে জড়াচ্ছেন কেন মিছি মিছি।'

'আপনি কি বলছেন মিঃ দত্ত! সুনন্দই তো ওর স্বপ্নকে চুরমার করে ভেঙে দিয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সুনন্দ ওকে ঠকিয়েছে। আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যই ও সুনন্দর মিথ্যা প্রতারণাকে বিশ্বাস করেছিল। তারপর যখন মিথ্যার খোলসটা খসে পড়ল, তখন বিষ খাওয়া ছাড়া ওর অন্য উপায় ছিল না।'

'আপনি যা বলছেন, সে তো হোল অন্য আর এক দিক। দুজনে তার জন্য নিজেদের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবেন—আইনের কাছে নয়। আইন দেখবে অ্যাসিড কে দোকান থেকে কিনেছিলো, কি করে ওঁর গেলাসে মিশিয়ে দিয়েছিলো।'

'বিবেক কি আইনের চেয়ে বড় নয়?' সমরেশ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'শাস্তি যদি আপনি আমাকে না দিতে চান, আমি নিজেই নিজেকে দিতে পারব। সুনন্দও বাদ যাবে না।'

'তুমি বরং বিশ্রাম করতে যাও সমরেশ'—সত্যজিৎ সামন্ত সমরেশের দিকে সস্নেহে ফিরে তাকালেন—'কাল সমস্ত রাত তোমার ঘুম হয় নি, রামবিলাস বলছিলো। এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করে যা হোক কিছু খেয়ে দেখো যদি ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পারো। তারপর আমরা সবাই তোমার কথা শুনব।'

আচ্ছন্ন, ঘুমন্ত মানুষের মত টলতে টলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সমরেশ। স্পষ্টই বোঝা যায় একটু একটু করে ক্ষয়ে আসা শরীর এবারে একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

'আচ্ছা ওঁর অসুখটা কি?' রামদুলাল দত্ত পেন্সিল দিয়ে চিঠি লেখার প্যাডের উপর গোলাকার বৃত্ত রচনা করতে সুরু করলেন।

'অসুখ যে ঠিক কি, তা ভগবান আর ডাক্তারেরা বলতে পারেন। ও নিজে বলে ওকে স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে। রোগ আসলে শারীরিক নয় বলেই আমার ধারণা। শুনেছি ওর ঠাকুর্দা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। ওর বাবারও নানা বাতিক ছিলো। মামলা-মোকদ্দমা করে এত বিশাল সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি এস্টেটের সলিসিটর হিসেবে সেদিন অনেক মানা করেছি, কিন্তু এমনই খাপছাড়া জেদ কি বলব! সমরেশকে সেদিন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় তাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।'

রামদুলাল দত্ত হঠাৎ সুনন্দ মিত্রের দিকে ফিরে বললেন—'ভালো কথা ডাঃ বসাক তো এখনও এলেন না। টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভালো হোত।'

টেলিফোনে যা কথা হোল তার সারাংশ এই রকম: ডাঃ বসাকের মতে মাধবীর মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা বলে মনে করা সম্ভবত ভুল হবে। মাধবী ডাঃ বসাকের কাছে স্বীকার করেছে, সমরেশের অসুস্থতার জন্যে হয়তো সে নিজেই কিছুটা দায়ী। এখন ভুল শোধরানোর বোধহয় আর উপায় নেই বলেই এখানকার পাট তুলে নিয়ে দার্জিলিং কনভেন্টে চাকরী নিয়ে চলে যাওয়ার কথা সে ভাবছে। ডাঃ বসাক বেশ জোর দিয়েই বললেন যে, মাধবীর মানসিক জগতে নৈরাশ্য বা ভেঙে পড়ার মতো কোনো চিহ্নই কাল ছিল না। বরং বলা যেতে পারে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনে মনে সে বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলো। কনভেন্টের মাদার সুপিরিয়রের পাঠানো একখানি রূপো বাঁধানো ক্রস দেখিয়ে সে এমন কথাও বলেছিলো যে, 'মানুষের সঙ্গ আমাকে যে শান্তি দেয় নি, অন্য আর কোথাও আমাকে তা খুঁজে নিতেই হবে। আপনি শুধু আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলুন। এখানকার অসুস্থ পরিবেশ থেকে বাইরে তাঁকে নিয়ে যান, তাহলেই ওঁর ভালো হয়ে উঠতে দেরি হবে না।'

'আমার নিশ্চিত ধারণা মিঃ দত্ত, আত্মহত্যা করার আগের মুহূর্তে মানুষ উত্তেজিত, অশান্ত এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অতি মাত্রায় নার্ভাস হয়ে

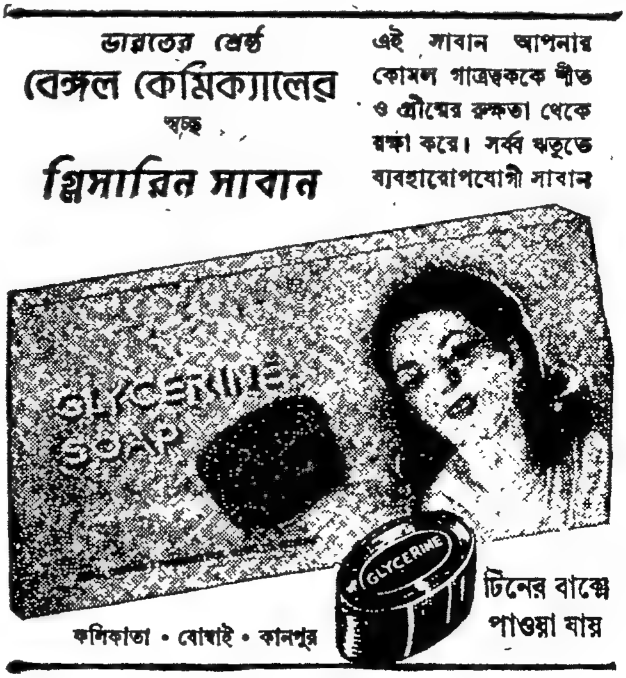

পড়ে। মিসেস সরকার কিন্তু খুব স্টেডি ছিলেন। তাছাড়া একবার বলছিলেন ছেলেবেলায় ওঁর নাকি হাঁপানি ছিলো। দার্জিলিং-এর স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় অসুখটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা তিনি জানতে চেয়েছিলেন মৃত্যুর মাত্র আধঘণ্টা আগে।'

'তাই তো, আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন ডাঃ বসাক।' রামদুলাল দত্ত মাথা চুলকোতে সুরু করলেন।

'আর একটা পয়েণ্ট মিস্ করে গেছেন আপনারা'—ওধার থেকে ডাঃ বসাক গম্ভীর গলায় বললেন,—'মানুষের মন বিচার করাই আমার পেশা জানেন তো। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি লাইব্রেরীতে বই-এর আলমারীগুলোর খোলা তাক। কেবল একটি মাত্র আলমারী গডরেজের তৈরি, আগা-গোড়া লোহার। আলমারীর গায়ে একগোছা চাবি ঝুলছিলো। বাড়ি ফিরে হঠাৎ চাবিটার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে সমরেশবাবুর সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে জানতে পারি যে, মিসেস সরকার ঐ আলমারীতে নিজের দরকারী কাগজপত্র রাখতেন। আমার মনে হয়, হঠাৎ কোন কারণে ঐ আলমারীটা খুলতেই তিনি এসেছিলেন। যে সবুজ রঙের গেলাস হাতের থেকে ছিটকে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটি নীচের ঘরে সুনন্দ মিত্র নিজে মিসেস সরকারের হাতে তুলে দেয়। শরবতের গেলাস হাতে আলমারীর তলায় চাবি ঝুলিয়ে হঠাৎ কেউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে কি?'

'আজ্ঞে না।'—জোরে জোরে মাথা নাড়লেন রামদুলাল দত্ত—'আমি দেখেছি বিছানায় দিব্যি করে শুয়ে অথবা ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে তবে লোকে আত্মঘাতী হয়। আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যায় তার ফলে।'

'আর একটা কথা, আপনি সমরেশ-বাবুর সেক্রেটারীকে একটু ভাল করে জেরা করুন। আমার মনে হয় ছেলেটি যা জানে তা বলছে না।'

'আমিও ওর হাবভাব লক্ষ্য করেছি, খুব রহস্যজনক হাবভাব বলেই মনে হয়েছে আমার। গিল্‌টি মাইণ্ড না হলে ঠিক এমনটি হোত না।' রামদুলাল দত্ত সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'যখন আমি মিসেস সরকারের পালস পরীক্ষা করি, তখনও একবার প্রাণের স্পন্দন পেয়েছিলাম'—ডাঃ বসাক আবার বলতে সুরু করলেন—'অর্থাৎ অনিল বিশ্বাস যখন ওঁকে দেখতে পায়, তখনও উনি বেঁচে আছেন এবং সম্ভবত যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। সে অবস্থায় একেবারে কোনো কথাই ভদ্রমহিলা বলেন নি বা বলতে চেষ্টা করেন নি, তা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আপনি কাল যাওয়ার সময় এ সব কথা বলে গেলে ভালো করতেন ডাঃ বসাক'—অনুযোগের সুরে কথা বললেন রামদুলাল দত্ত। রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা উঠে গেলেন লাইব্রেরী ঘরের দিকে।

মাধবী সরকারের রাইটিং টেবিলের টানাগুলো পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, কিন্তু আলমারীতেও যে আরও কাগজপত্র থাকতো, একথা এতক্ষণ কেউ তাঁকে বলে নি।

না, চাবিটা এখনও ঝুলছে না। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ভালো করেই দেখলেন রামদুলাল দত্ত। তারপর ডেকে পাঠালেন অনিল বিশ্বাসকে।

'এর চাবিটা কোথায় বলতে পারেন?'

কথা না বলে পকেট থেকে চাবির গোছাটা বার করে টেবিলের উপর রাখল অনিল।

'আপনি কাল পুলিশের কাছে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, তা কি সত্যি?' চাবির গোছা হাতে নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন রামদুলাল দত্ত—'একটু ভেবে চিন্তে জবাব দেবেন অনিলবাবু। পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলে পার পাওয়া যায় না।'

এক মিনিট কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিল। তারপর শুকনো মুখে বলল—'আপনার প্রশ্নের তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কালকে কি বলেছি এখন আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

(ক্রমশঃ)

একদিন বিকেলে কাফে দ্য লা পাই-এর বাইরে বসে পারীর জীবন-যাত্রার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করছিলাম আর আমার ভারমুথে চুমুক দিতে দিতে সদাহঙ্কার ও দারিদ্র্যের অপূর্ব সমাবেশে বিস্ময় বোধ করছিলাম। এমন সময় আমার নাম ধরে ডাকতে শুনে তাকিয়ে দেখি লর্ড মার্চিসন্। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। তারপর বছর দশেক হয়ে গেল। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দিত হলাম ও আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলাম। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় আমাদের খুব ভাব ছিল। তাঁর সৌন্দর্য, তেজস্বিতা ও উন্নত মনের জন্যে তাঁকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তাঁর সম্বন্ধে আমরা বলাবলি করতাম যে, সব সময় তিনি যদি সত্যকথা না বলেন, তা'হলে তাঁর মতো লোক আর হবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর স্পষ্ট কথা বলার জন্যেই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনি অনেকটা বদলে গেছেন দেখলাম। তাঁকে চিন্তিত ও উদ্‌ভ্রান্ত দেখলাম এবং মনে হোল তিনি যেন কোন বিষয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়েছেন। আমি জানতাম যে সেটা আধুনিক সংশয়বাদ নয়, কেন না মার্চিসন ছিলেন গোঁড়া টোরী পার্টির ভক্ত আর তিনি বাইবেলের পঞ্চতন্ত্রে যেমন বিশ্বাস করতেন সেইরকম পার্লামেন্টের লর্ডসভার বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আমি স্থির করলাম নিশ্চয়ই এর মূলে আছে কোন নারী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বিয়ে করেছেন কিনা। তিনি বললেন, 'আমি মেয়েদের ভাল বুঝি না।' আমি বললাম, 'ওহে জেরাল্ড, মেয়েদের ভালবাসতে হয়, তাদের বুঝতে হয় না।' তিনি বললেন, 'আমি যাকে বিশ্বাস করতে পারি না, তাকে ভালবাসতে পারি না।' আমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই তোমার জীবনে কোন রহস্যের আবির্ভাব ঘটেছে। আমাকে সেটা খুলে বল।' তিনি উত্তর দিলেন, 'চল গাড়িতে করে একটু বেড়িয়ে আসা যাক, এখানে বেজায় ভীড়। না, না, হলদে রঙের গাড়ি নয়, অন্য যে কোন রঙ,—ঐ যে, ঐ গাঢ় সবুজ রঙের গাড়িটা নেওয়া যাক।' আমি বললাম, 'আমরা যাব কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার যেখানে খুশি। আমরা বয়া-এর রেস্তোরাঁতে যেতে পারি। সেখানে আমরা রাতে খাব আর তুমি আমাকে তোমার কথা বলবে।' আমি বললাম, 'আগে আমি তোমার কথা শুনতে চাই। তোমার রহস্য খুলে বল।' তিনি তাঁর পকেট থেকে রূপা-বাঁধান মরক্কো কেস বার করে আমাকে দিলেন। আমি সেটা খুলে তার ভিতরে একটি স্ত্রীলোকের ফটো দেখতে পেলাম।

স্ত্রীলোকটা লম্বা ও ছিপছিপে ধরণের। তাঁকে তাঁর বড বড় চোখের উদাস দৃষ্টিতে ও খোলা চুলে একেবারে ছবির মত দেখাচ্ছিল, যেন তিনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি-সম্পন্ন। তাঁর পরণে ছিল দামী ফার। তিনি বললেন, 'ঐ মুখ দেখে কি তাঁকে সত্যবাদী বলে মনে হয়?' আমি ভাল করে দেখলাম। আমার মনে হোল যাঁর ঐ মুখ, তাঁকে ঘিরে কোন রহস্য আছে, কিন্তু সেই রহস্য ভাল না মন্দ, তা' আমি বলতে পারি না। সেই সৌন্দর্য ছিল স্পৃ রহস্যাবৃত—বস্তুত সৌন্দর্য মনেরই সৃষ্টি, বাইরের নয়—আর তাঁর ওষ্ঠাধর ঘিরে যে ঈষৎ হাসির রেখা, তা' এত চাতুর্যপূর্ণ যে, সত্যই মধুর হতে পারে না।

তিনি অধৈর্য হ'য়ে বললেন, 'তুমি কিছু বলছ না যে?' আমি উত্তর দিলাম, 'তাঁকে কৃষ্ণবসন পরিহিতা মোনালিসার মত দেখাচ্ছে। তাঁর কথা আমাকে খুলে বল।'

তিনি বললেন, 'এখন নয়, খাবার পর।' তারপর তিনি অন্য কথা বলতে লাগলেন।

বয় এসে আমাদের কফি ও সিগারেট দিয়ে গেল। আমি জেরাল্ডকে তাঁর কাহিনীর কথা মনে করিয়ে দিলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করে আরাম-কেদারায় বসে পড়লেন ও তাঁর কাহিনী বলতে লাগলেন :

তিনি সুরু করলেন, 'একদিন সন্ধ্যা পাঁচটার সময় আমি বণ্ড ষ্ট্রীট ধরে যাচ্ছিলাম। গাড়ির এত ভীড় যে, সব গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। ফুটপাথের ধারে একটা ছোট হলদে রঙের ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। সেই গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ি থেকে একটা মুখ বেরিয়ে এল, যেটা আমি তোমাকে আজ বিকেলে দেখিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি মোহিত হয়ে গেলাম। সারারাত্রি, এমন কি তারপর সারাদিন ধরে সেই চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সেই অভিশপ্ত রাস্তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত প্রত্যেক গাড়িকে ভাল করে দেখলাম, আর সেই হলদে রঙের ব্রুহামের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার সেই অচিন বঁধুয়ার আর দেখা পেলাম না। শেষে আমি স্থির করলাম, আমি বোধ হয় স্বপ্নে তাঁকে দেখেছি।

প্রায় হপ্তাখানেক পরে মাদাম স্ত রাস্তাইলের বাড়িতে আমার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি আটটায় খাবার কথা, কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেলেও আমরা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষকালে একটা চাকর দরজা ঠেলে ভিতরে এসে জানাল, লেডী অ্যালরয় এসে পৌছেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হোল, তাঁকেই আমি খুঁজেছিলাম। খুব ধীর-গতিতে তিনি এলেন। তাঁর মাথায় ধূসর রঙের লেসের কাজ করা কাপড থাকায় তাঁকে একফালি চাঁদের কিরণের মত মনে হচ্ছিল। আমাকেই তাঁকে খাবারের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে শুনে আমার খুব আনন্দ হল। আমরা আসনে বসলাম ও কিছু না ভেবেই তাঁকে বললাম, 'লেডী অ্যালরয়, আমার মনে হয় আপনাকে আমি বণ্ড ষ্ট্রীটে দেখেছি।' তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন ও মৃদুস্বরে আমাকে বললেন, 'দয়া করে জোরে বলবেন না, হয়তো কেউ আপনার কথা শুনে ফেলবে।' আরম্ভটা খারাপ হল দেখে আমি দমে গেলাম ও মরিয়া হয়ে ফরাসী নাটকের প্রসঙ্গ ওঠালাম। তিনি বিশেষ কিছু না বলার মতন সব সময়েই মৃদু ও সঙ্গীতের সুরে কথা বললেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, পাছে কেউ শুনে ফেলে বলে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। উন্মাদের মত, বোকার মত আমি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম, আর তাঁকে ঘিরে ছিল যে অবর্ণনীয় রহস্যের জাল, তার জন্যে হল আমার অদম্য কৌতূহল। খাওয়া শেষ হলেই তিনি যাবার জন্যে তৈরি হলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি তাঁর বাড়িতে দেখা করতে পারি কিনা। তিনি একটু ইতস্তত করলেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ কাছে আছে কিনা ও তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, আগামীকাল পৌনে পাঁচটার সময়।' মাদাম স্ত রাস্তাইলের কাছে আমি তাঁর কথা জানতে চাইলাম। আমি জানলাম তিনি বিধবা ও পার্ক লেনে তাঁর সুন্দর একটা বাড়ি আছে। তারপর একজন বিষবাদের প্রসঙ্গ নিয়ে লম্বা লেকচার সুরু করে সকলের বিরক্তির উদ্রেক করলেন ও আমি বাড়ি চলে গেলাম।

'তার পরদিন আমি পার্ক লেনে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় হাজির হলাম। কিন্তু খানসামা আমাকে বলল যে, লেডী অ্যালরয় এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন। অত্যন্ত বিভ্রান্ত ও মনমরা হয়ে আমি ক্লাবে ফিরে গেলাম। তারপর অনেক চিন্তা করে আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে জানতে চাইলাম যে, অন্য আর একদিন বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা। কয়েকদিনের মধ্যে আমি কোন উত্তর পেলাম না। শেষে তাঁর লেখা একটা ছোট্ট চিঠি পেলাম যে, রবিবারে চারটের সময় তিনি বাড়ি থাকবেন। পুনশ্চ দিয়ে লেখা ছিল, 'দয়া করে আমার আর এই ঠিকানায় চিঠি লিখবেন না, আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।' রবিবারের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হোল ও তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। আমি যখন চলে আসছিলাম, তিনি আমাকে অনুরোধ করে বললেন যে, আবার যদি তাঁকে চিঠি লিখি, তাহলে যেন 'মিসেস নক্স, কেঃ অঃ হুইটটেকারের লাইব্রেরী, গ্রীন ষ্ট্রীট' এই ঠিকানায় লিখি, তিনি বললেন, 'আমার নিজের বাড়িতে কেন আমার নামে চিঠি আসতে পারে না, তার কারণ আছে।'

'সেই সময় আমি তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশলাম, কিন্তু তিনি রহস্যময়ী রয়েই গেলেন। এক এক সময় মনে হল তিনি কোন পুরুষের খপ্পরে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর কাছে কেউ ঘেঁষতে পারে বলে মনে হল না। আমার পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল না। তাঁকে মনে হল মিউজিয়ামে রাখা স্ফটিক পদার্থের মত, কোন সময় স্বচ্ছ, কোন সময় অস্পষ্ট। অবশেষে স্থির করলাম, তাঁকে বিয়ে করবার কথা বলব। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় ও তাঁকে আমি যে দু'চারখানা চিঠি লিখেছিলাম, তা' নিয়ে তিনি যে রকম গোপনতা অবলম্বন করলেন, তাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। লাইব্রেরীতে আমি তাঁকে লিখে পাঠালাম, আগামী সোমবার ছটার সময় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন কিনা। তিনি সম্মতি জানালে আমি একেবারে সুখের সপ্তম স্বর্গে উঠে গেলাম। তিনি যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিলেন। তখন আমি মনে করতাম, তাঁর রহস্য থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর মোহে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সেই রহস্যের জন্যে ঐরকম হয়েছিল। না, তা' হতে পারে না, আমি ভালবাসতাম সেই নারীকে, আর

কিছু নয়। সেই রহস্য আমাকে পীড়া দিত, আমাকে একেবারে পাগল করেছিল। কেন ভাগ্য আমাকে সেই পথে নিয়ে গেল?'

আমি চীৎকার করে বললাম, 'তুমি তাহলে সেই রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলে?'

তিনি বললেন, 'বোধ হয় পেয়েছিলাম। তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।'

'যখন সোমবার এল, আমি আমার কাকার বাড়িতে দুপুরে খেলাম ও চারটের মেরিলবোন রাস্তায় হাজির হলাম। তুমি তো জান, আমার কাকা রিজেন্ট পার্কে থাকেন। আমাকে পিকাডিলি যেতে হবে, সেইজন্যে কতকগুলি নোংরা রাস্তা দিয়ে সোজা গেলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে দিয়ে লেডী অ্যালরয় লম্বা ঘোমটা দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছেন। সেই রাস্তার শেষ বাড়িতে এসে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন ও বাইরে থেকে দরজা খোলার চাবি বার করে ঘরে ঢুকলেন। আমি মনে মনে বললাম, 'এইখানেই রহস্য আছে' ও তাড়াতাড়ি গিয়ে বাড়িটা ভাল করে দেখলাম। মনে হল বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়। দরজার গোড়ায় তাঁর রুমাল পড়ে ছিল, তিনি সেটা ফেলে গিয়েছিলেন। আমি সেটা উঠিয়ে আমার পকেটে রাখলাম। তখন আমার কি করা উচিত—চিন্তা করলাম। ভেবে দেখলাম, তাঁর উপর গোয়েন্দাগিরি করবার আমার কোন অধিকার নেই—আমি ক্লাবে চলে গেলাম। ছটার সময় আমি তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। তিনি চা-রঙের একটা গাউন পরে সোফায় শুয়েছিলেন। তাঁকে খুব চমৎকার লাগছিল। তিনি বললেন, 'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। সারাদিন আজ আর বার হই নি।' অবাক হয়ে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম ও পকেট থেকে রুমালটা বার করে তাঁকে দিলাম। আমি উত্তেজিত না হয়ে বললাম, 'লেডী অ্যালরয়, আপনি আজ বিকেলে এই রুমালটা কাম্নার স্ট্রীটে ফেলে এসেছিলেন।' ভয় পেয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু রুমালটা ফেরৎ নেবার কোন চেষ্টাই করলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি সেখানে কি করছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কোন্ অধিকারে?' আমি উত্তর দিলাম, 'তোমাকে ভালবাসি—সেই অধিকারে। আজ আমি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম।' তিনি তাঁর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অঝোরে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমি বললাম, 'তোমাকে বলতেই হবে।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'লর্ড মার্চিসন, আপনাকে বলবার মত কিছুই নেই।' আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই তুমি সেখানে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে—এই হচ্ছে তোমার রহস্য।' তিনি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন ও বললেন, 'আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে যাই নি।' আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তুমি কি সত্য কথা বলতে পার না?' তিনি বললেন, 'আমি সত্য কথাই বলেছি।' আমি একেবারে অধীর, উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি তাঁকে কি বলেছিলাম মনে নেই, কিন্তু তাঁকে আমি রূঢ় কথা শুনিয়েছিলাম। শেষে আমি বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরদিন তিনি আমাকে একটা চিঠি লিখলেন; আমি সেটা না খুলেই ফেরৎ পাঠালাম। তারপর অ্যালান কোলভিলের সঙ্গে আমি নরওয়ে চলে গেলাম। একমাস পরে আমি ফিরে এলাম ও 'মর্নিং পোষ্ট' কাগজে যা আমি দেখলাম তা হল লেডী অ্যালরয়ের মৃত্যুসংবাদ। থিয়েটার দেখতে গিয়ে তাঁর ঠাণ্ডা লাগে ও পাঁচদিন পরে নিউমোনিয়ায় মারা যান। আমি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলাম ও কারও সঙ্গে দেখা করলাম না। আমি তাঁকে কত ভালবাসতাম, উন্মত্তের মত তাঁকে ভালবেসেছিলাম। হায় ভগবান! কি ভালই না আমি তাঁকে বেসেছিলাম।'

আমি বললাম, 'তুমি পরে সেই রাস্তায়, সেই বাড়িতে গিয়েছিলে?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'একদিন আমি কাম্নার স্ট্রীটে গিয়েছিলাম। আমার না গিয়ে উপায় ছিল না, যেহেতু আমি সংশয়ের মধ্যে ছিলাম। দরজায় টোকা দিতেই একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা দরজা খুলে দিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোন ঘর ভাড়া দেবেন কিনা।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মশায়, বসবার ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া হয় কিন্তু তিন মাস হয়ে গেল এখনও সেই ভদ্রমহিলার দেখা নেই। আর তিনি যখন ঘর ভাড়া বাকী ফেলেছেন, তখন আপনি ঐ ঘরগুলি ভাড়া নিতে পারেন।'

লেডী অ্যালরয়ের ফটোটা দেখিয়ে আমি বললাম, 'আপনি কি এই ভদ্রমহিলার কথা বলছেন?'

তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এঁরই কথা বলছি; তা' তিনি কখন ফিরে আসছেন?'

আমি বললাম, 'ভদ্রমহিলা মারা গেছেন।'

তিনি বললেন, 'বলেন কি মশায়? এরকম ভাড়াটে আর আমার নেই। শুধু বসবার ঘরে এসে সময় সময় বসবার জন্যে তিনি আমাকে হপ্তায় তিন গিনি দিতেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতেন?' কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, লেডী অ্যালরয় একাই আসতেন ও কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। আমি চীৎকার করে বললাম, 'তাহ'লে তিনি সেখানে কি করতেন?'

তিনি বললেন, 'তিনি কেবল বসবার ঘরে বসে বই পড়তেন ও সময় সময় চা খেতেন।'

'আমি আর তাঁকে বলার মত কিছু পেলাম না ও তাঁকে এক সভরেন দিয়ে চলে গেলাম। এখন, তোমার এ সম্বন্ধে কি মনে হয়? তোমার কি বিশ্বাস হয় যে সেই মহিলা সত্য কথা বলেছিলেন?'

'আমার মনে হয় তাঁর কথা সত্য।'

'তাহ'লে লেডী অ্যালরয় সেখানে যেতেন কেন?'

আমি বললাম, 'ওহে জেরাল্ড, লেডী অ্যালরয়ের রহস্য-ম্যানিয়া ছিল। তিনি এই ঘরগুলি ভাড়া নিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ঘোমটায় মুখ ঢেকে সেখানে যাওয়া ও নিজেকে একজন কল্পনার নায়িকা মনে করা। নিজেকে ঘিরে রহস্যের জাল বিস্তার করার তাঁর একটা তীব্র আবেগ ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ছিলেন রহস্যহীনা স্ফিংক্স।'

'তুমি কি সত্যই তাই বিশ্বাস কর?'

আমি বললাম, 'এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।'

তিনি মরক্কো কেসটি খুলে ফটোটা দেখলেন। খানিক পরে তিনি বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য!'

অনুবাদক: **উষাপতি চক্রবর্তী**

(অস্কার ওয়াইল্ডের 'The Sphinx Without a Secret' গল্পের অনুবাদ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পনেরো ॥

শর্মিলা থাকেন প্রফেসার্স মেসে। জন পাঁচেক মিলে এই মেস। এখন ছুটিতে, আর সবাই নিশ্চয় যে যার বাড়িতে চলে গেছেন। কিন্তু মিসেস শর্মা নিশ্চয় আছেন একথা শর্মিলা জানতেন। মিসেস শর্মা মেস ছেড়ে কোথাও কোনোদিন যান না—অন্তত এই তিন বছরে শর্মিলা তাঁকে যেতে দেখেন নি।

শর্মিলাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

—ব্যাপার কী মিসেস রায়চৌধুরী?

—চলে এলুম।

—এত তাড়াতাড়ি? কলেজ খুলতে তো তিন সপ্তাহ দেরি আছে এখনো।

—তা হোক। ভালো লাগল না।

মিসেস শর্মা অর্থাৎ গায়ত্রী নিঃশব্দে একটু হাসলেন। তারপর সরে গেলেন সামনে থেকে। শর্মিলা চেয়ে দেখলেন তাঁর ভিজে চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা। পরণে লাল পাড় গরদের শাড়ি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। পুজো করছিলেন।

গায়ত্রী এই এক ধরণের মানুষ। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির নামকরা ছাত্রী, কলেজে ইংরেজী পড়ান। কিন্তু নিজে পড়েন গীতা, উপনিষদ, দর্শনের বই। কাশীর মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে, পুজো-অর্চনা করেন, নিরিমিষ খান। নিজের চারদিকে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে প্রায় একাই কাটান তার ভেতরে।

শর্মিলার সঙ্গে তাঁর অনেকটা মেলে, সবটা নয়; শর্মিলা অতখানি আত্মকেন্দ্রিক নন। জীবনের যে দিকটা তাঁর চিরকালের মতো ফুরিয়ে গেছে, সেখানে তাঁর নিঃসঙ্গ স্মৃতি-পূজা। বাইরে তিনি সাধ্যমতো মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, হৈ চৈ করে তাদের নিয়ে এক্সকার্শনে যান, বোটানির স্পেশিমেন সংগ্রহ করেন। ভেবেছিলেন, এইভাবেই দিনগুলো একরকম করে কেটে যাবে, কিন্তু—

হঠাৎ কোথা থেকে ঝোড়ো হাওয়া ছুটে এল খানিকটা—ডাকাতের মতো খুলে দিলে একটা বন্ধ জানলাকে, প্রদীপের শিখাটাকে কাঁপিয়ে দিলে, চার বছর ধরে জমানো ধূপের গন্ধকে কেড়ে নিতে চাইল, থালার ফুলগুলোকে উড়িয়ে দিলে। শর্মিলা দেখলেন তিনি কত দুর্বল, মন কী বিশ্বাসঘাতক, আর নিজেকে চেনা কত কঠিন!

যখন সব কিছু একটা দারুণ বিপর্যয়ে একাকার হতে চলেছে, তখন ছুটে পালিয়ে এসেছেন রাঁচীতে। দেখবার সুযোগ থাকলেই দেখার লোভ সামলাতে পারবেন না, কথা বলতে গেলেই বুকের ভেতরে ঢেউ উঠবে, বিকেলের নদীর ধারে দেখা করবার ডাক এলেই প্রাণ ছুটে যেতে চাইবে—কোনো বাধা মানবে না। তাব চাইতে দূরে পালানোই ভালো। সেইটেই বাঁচবার রাস্তা।

সারাটা দিন ভাবলেন, কাগজ কলম নিয়ে বসে লেটার প্যাডের অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপরে শেষ পর্যন্ত এক টুকরো চিঠি

ছেড়ে দিলেন কিরণকে। চিঠিটা পোস্ট করবার আগেও অনেকবার দ্বিধা এসেছিল, তবু শেষ পর্যন্ত মনে হল, নিজের ব্যবহারের জন্যে অন্তত একটুখানি কৈফিয়ৎও ভদ্রলোককে দেওয়া দরকার।

এইবারে ভুলতে হবে সব। অর্থহীন কয়েকটা চঞ্চলতার দিনকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে জীবন থেকে। আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে হবে আগের মতো। কলেজের লাইব্রেরি খোলা ছিল, কয়েকটা নতুন বোটানির বই নিয়ে এলেন। দিল্লীর একজন পাবলিশার একটা টেক্সট বই লেখার কথা বলেছিল। ভাবলেন, এক-আধটু চেষ্টা করে দেখা যাক।

কিন্তু—

কিন্তুটাই আর কিছুতে যায় না। একাগ্র হতে পারেন না কোনো জিনিষে। লেখার টেবিলে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুজে আসে চোখ দুটো। দেখতে পান কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দুলছে বসন্তের হাওয়ায়, যেন পৃথিবী পূজারিণীর মতো অঞ্জলি তুলে ধরেছে আকাশের আনীল পাদপদ্মের দিকে। মনে হয় ঝর্ণার জলে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, পুরুষের দুটি বাহু কোথা থেকে এসে নির্ভয়ে আশ্রয় দিয়েছে তাঁকে, স্পর্শের বিদ্যুতে থরো থরো করে কেঁপে উঠেছে তাঁর সারা শরীর।

আর—

আর চমকে জেগে ওঠেন শর্মিলা। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে। নদীর ধারে সেই পড়ন্ত বিকেলে কিরণের হাত চেপে ধরেছিলেন, সেই অনুভূতি আঙুল বেয়ে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নিজের ওপর অসহ্য একটা ঘৃণা হয় শর্মিলার। এ কী হল? এমন করে কোন সর্বনাশা মোহের মধ্যে তিনি জড়িয়ে গেলেন।

কোথা থেকে রাহুর মতো এল এই লোকটা।

অথচ, তার মনের খবরও তো অজানা নেই শর্মিলার। নিজের মুখেই বলেছিল, 'যখন এখান থেকে চলে যাব, চারদিকের এই কুহক আর থাকবে না, তখন এখানকার সব কিছু রোমান্টিক আবেশ দেখতে দেখতে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাবে।' অর্থাৎ শর্মিলাও সেই কুয়াশার ভেতরে একটা অবাস্তব ছায়ামূর্তি, ভুলে যেতে কয়েক লহমার বেশি সময় লাগবে না।

শর্মিলা চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সেদিন। ভেবেছিলেন ঘোর কেটে গেল, এই একটি আঘাতেই তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, মোহ তো কাটল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে তাঁকে নদীর ধারে টেনে আনল, ক্যাকটাসের উপলক্ষকে ছাড়িয়ে বার বার একটি প্রত্যাশাই মনের ভেতর বাজতে লাগল: প্রায়ই রোজই বিকেলে এখানে সে বেড়াতে আসে, এখানেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

তারপর—

তারপর পালানো ছাড়া আর পথ ছিল না।

কিন্তু পালিয়েও যদি নিষ্কৃতি না মেলে, যদি এত দূরে চলে এসেও রক্তের মধ্যে বারে বারে টান পড়তে থাকে, তাহলে কোথায় যাবেন শর্মিলা? মানুষটার কাছ থেকে চলে আসা যায়, কিন্তু নিস্তার কোথায় মনের কাছ থেকে?

তবু চেষ্টা করতে হবে। এই দুর্বলতাকে কিছুতেই বাড়তে দেওয়া যায় না। না—না।

প্রাণপণে শর্মিলা আজ সকালে লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু লাইন কয়েক লেখবার পরে মনে হল, সমস্ত ইংরেজি বানান-ব্যাকরণ যেন তিনি ভুলে গেছেন। হতাশ হয়ে কলমটা কামড়ে ধরে বসে রইলেন, ইচ্ছে করতে লাগল সমস্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন।

ঘরে ঢুকলেন গায়ত্রী। হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন, কাজ করছেন নাকি কিছু?

শর্মিলা হিন্দীতে জবাব দিলেন। বললেন, না—না, এমনি বসে আছি, আসুন।

গায়ত্রী শর্মিলার বিছানার ওপর বসলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, মন ভালো নেই—না?

একটু চুপ করে থেকে শর্মিলা বললেন, না, আমি বেশ আছি।

—বেশ নেই আপনি। তিন-চারদিন ধরেই তো দেখছি।—গায়ত্রী হাসলেন। বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে?

শর্মিলা হাসতে চেষ্টা করলেন জোর করে: আমাকে কি ঝগড়াটে বলে মনে হয় মিসেস শর্মা?

—তা ঠিক। ঝগড়াটে আপনি নন। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, আপনি চুপ করে নির্ঝঞ্ঝাটে পড়ে থাকতে চাইলেও দুনিয়া আপনাকে ছাড়তে চায় না। জোর করে গায়ে এসে পড়ে।

শর্মিলা প্রতিবাদ করলেন না। একদিক থেকে তাঁরই কথা বলছেন গায়ত্রী। তিনি তো জীবনটাকে নিজের

মতো করে একটা ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিলেন ; নানা কাজে ভরা প্রত্যেকটা দিনের একটা হিসেব ছিল, এক-একটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার কিংবা নিস্তব্ধ রাত্রিতে ধ্যানের একান্ত ক'টি মুহূর্ত ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঝড় এল—আর প্রায় চক্ষের পলকেই সব এলোমেলো করে দিয়ে গেল। ঠিক কথা, নিজেকে নিয়ে থাকতে চাইলেও থাকা যায় না—হঠাৎ কখন বাইরের জগৎটা ডাকাতের মতো এসে হানা দেয় সেখানে।

গায়ত্রী যেন নিজের মনেই একটুখানি হাসলেন। বললেন, জানেন আজ সকালেই ওর একটা চিঠি পেয়েছি।

শর্মিলা চকিত হয়ে উঠলেন।

—কা'র চিঠি ? মিস্টার শর্মার ?

গায়ত্রী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। তাঁর শান্ত ঠোঁটের ওপর সেই হাসির রেখাটুকু স্থির হয়ে রইল।

—আপনাকে মনে পড়েছে তা হলে

—শুধু মনে পড়ে নি। আমাকে যে কত ভালোবাসেন, সে-কথাও জানাতে ভোলেন নি।

শর্মিলা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। গায়ত্রীর ইতিহাস স্টাফের সবাই কিছু জানেন, ছাত্রীদের সম্পূর্ণ অজানা নেই। সব চাইতে বেশি করে জানেন শর্মিলা। কারণ বেদনার একটি পট-ভূমিতে দুজনের অনেকখানি মিল আছে।

গায়ত্রী বিধবা নন—কিন্তু বৈধব্যের চাইতেও নিরানন্দ তাঁর জীবন। তাঁরই বাবার ছাত্র মিস্টার শর্মা। গরীবের মেধাবী ছেলেটি তাঁদেরই বাড়িতে আশ্রিত হয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। ধীরে ধীরে গায়ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল, গায়ত্রীর বাবা রাগ করলেন না, বরং ভাবলেন বিয়ে হলে দুজনে সুখীই হবে। গায়ত্রী এম্‌-এ পাশ করলেন, শর্মা পি-এইচ ডি পেলেন। বিয়ে হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ওইখানেই মিটল না। শ্বশুরের টাকায় শর্মা হায়ার স্টাডিজের জন্যে পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। সে আজ দশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু সেই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। দু-বছর পরে শর্মার চিঠিপত্র আসা একে-বারে বন্ধ হয়ে গেল, আরো এক বছর পরে আমেরিকা ফেরৎ ছাত্রদের মুখে খবর এল, শর্মা আমেরিকায় বিয়ে করেছেন, সিটিজেন হয়েছেন, একটা কলেজে অধ্যাপনাও নিয়েছেন।

সেই থেকে গায়ত্রী নিজের জীবন নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। ইংরেজি পড়ান, দর্শন পড়েন। গীতা-উপনিষদ তাঁর সঙ্গী ; নিয়মিত পুজো-অর্চনা করেন—একভাবে সুখে না হোক শান্তিতেই আছেন তিনি। তার মাঝখানে হঠাৎ—

শর্মিলা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা ভেবে নিলেন। বললেন, দশ বছর পরে তা হলে অনুতাপ হয়েছে ওঁর ?

—বিকজ হিজ অ্যামেরিকান ওয়াইফ হ্যাজ ডিভোর্সড্‌ হিম।—গায়ত্রী সেই শান্ত হাসিটাই টেনে রাখতে চেষ্টা করলেন মুখের ওপর, কিন্তু তিক্ততাটা এবারে আর চাপা রইল না।

শর্মিলা বললেন, উনি কি ভারতবর্ষে আসছেন ?

—না, আমাকে যেতে বলেছেন ওঁর কাছে। লিখেছেন হার্ট অ্যাণ্ড হোম সব আমার জন্যে তৈরি। গেলেই প্রাণ খুলে বরণ করবেন আমাকে। লেটস স্টার্ট লাইফ অ্যানিউ অ্যাণ্ড বেরি আওয়ার হ্যাচেটস।—গায়ত্রী বিস্বাদ

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ।
  আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক।

মূল্য—তিন টাকা

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্‌

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গলার দীক্ষা করলেন : যেন আমি ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলুম—উনি অ্যামেরিকায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। এখন সন্ধির প্রস্তাব।

শর্মিলা ধীরে ধীরে বললেন, কিন্তু আপনি তো ওঁকে ক্ষমা করতে পারেন।

—ক্ষমা আমি অনেকদিন আগেই করেছি। যে আমাকে ভালোবাসে নি, তার ওপর অভিমানের দাবিটুকুও রাখব, এত লোভী আমি নই।

—তা হলে তো আপনি যেতে পারেন ওঁর কাছে।

—না, পারি না।

—কেন পারেন না?

—আজ উনি আমার কাছে অনেকদিন আগেকার একটা চেনা মুখ ছাড়া কিছু নন। এখন ওঁকে আমার আবার নতুন করে স্বামী বলে ভাবতে হবে, ভালোবাসতে হবে। কিন্তু এখন আমার বয়েস তেত্রিশ অ্যাণ্ড টু লেট!

শর্মিলা কিছুক্ষণ গায়ত্রীর চন্দন-আঁকা উজ্জ্বল সাদা কপাল আর দুটি গভীর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি স্বামীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছেন আপনি?

তখনই গায়ত্রী কথাটার জবাব দিতে পারলেন না। কয়েক সেকেণ্ড জানলা দিয়ে দূরের মোরাবাদী পাহাড়ের চূড়োর ওপর ছোট মন্দিরটার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর দৃষ্টিটা শর্মিলার দিকে ফিরিয়ে এনে বললেন, মনের কথা মানুষ কি সব জানে, না জোর করে কিছু বলতে পারে? তবে আমি সাত বছর ধরে চেষ্টা করেছি, হয়তো সবটা ব্যর্থ হয় নি।

শর্মিলা যেন একটু আহত হলেন। ঠিক কোনখানে যে বিঁধল বুঝতে পারলেন না, কিন্তু গায়ত্রীকে তাঁর নিষ্ঠুর বলে মনে হল। বললেন, তা হলে আপনি আমেরিকায় যাবেন না?

—কোনো দরকার আছে যাবার?

—সত্যি বলছেন, আপনার একটুও খারাপ লাগবে না মিসেস শর্মা?

গায়ত্রীর দৃষ্টিটা আবার ঘুরে গেল মোরাবাদী হিলের দিকে। সেই ভাবেই জবাব দিলেন, একটু ঢেউ যদি ওঠেই, তাকে থামাতে পারব। জানি, যা আমাকে টানবে—তা প্রেম নয়, প্রলোভন। ওইখানেই আমি ছোট হতে চাই না।

শর্মিলা চমকে উঠলেন। যেন তাঁরই কথা বলছেন গায়ত্রী। আজ তাঁকেও বাইরে থেকে টানছে ওই রকম একটা প্রলোভনের শক্তি, থেকে থেকে তাঁর সব চিন্তা চেতনাকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। রাহুর মতো একটা মানুষ এসে পড়েছে কোথা থেকে, তাঁকে বিকেন্দ্রিত করছে, বিচ্ছিন্ন করছে, তাঁর এতদিনের সাধনাকে ভেঙে চুরে ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। এ তো প্রেম নয়। এ সেই কৃষ্ণচূড়ার নেশা—যা আদিম, যা অন্ধ—যা যুগে যুগে মানুষের যোগভঙ্গ করে?

শর্মিলা বললেন, আপনার শক্তি দেখে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে মিসেস শর্মা।

—শক্তি?—গায়ত্রী হাসলেন : ঠিক জানি না। কিন্তু বন্যা এলেই ভেসে যেতে পারব না। আমার বাবা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কিছু সংযমের শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তা ছাড়া আমার গুরুদেব আছেন।

—আপনার গুরুদেব!—শর্মিলা উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন : তিনি মানুষের মনকে আশ্রয় দেন?

—দেন বই কি। লোকে নইলে কেন যাবে গুরুর কাছে?

মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে শর্মিলা বললেন, আপনার গুরু কোথায় থাকেন?

—এখন কাছেই রয়েছেন। নাম-কুমে। —গায়ত্রী হাসলেন : কিন্তু জানতে চাইছেন কেন?

—আমাকে একবার নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে?

গায়ত্রী কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে শর্মিলার দিকে চেয়ে রইলেন।

—কিন্তু আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্রী। এ-সব মানেন কী?

—বিজ্ঞান অর্থোডক্স নয়।—শর্মিলা গভীর স্বরে বললেন, সে সব সময়ে সত্যকে খুঁজতে বলে। সে সত্য কোথায় আছে কোথায় নেই, আজো জবাব কেউ দিতে পারে নি। আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর কাছে।

—সত্যি যাবেন?

—সত্যি যাব।

গায়ত্রী বললেন, বিজ্ঞানের কৌতূহল মিসেস রায়চৌধুরী?

—না মিসেস শর্মা। একটু শক্তি—একটু আশ্রয় আমার দরকার। মনের দিক থেকে কোথায় যেন ফাঁকা হয়ে গেছি, কিছুতেই জোর পাচ্ছি না।

গায়ত্রী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিছু একটা বুঝলেন, কিন্তু কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন, আচ্ছা, তাই হবে। আজ বিকেলের দিকে তাঁর ওখানে যাব দুজনে।

গায়ত্রী বেরিয়ে গেলেন।

লেখার টেবিলে বসে আবার চোখ বুজলেন শর্মিলা। না—কৃষ্ণচূড়া নয়। তিনি আবার তাঁর নিভৃত মন্দিরটিতে ফিরে আসতে চান, আবার নিঃসঙ্গ নিভৃত অবসরে ধ্যানে বসতে চান সেখানে, আপনার নিঃশব্দ বেদনায় মনের ধূপ-দীপ ফুলের মালায় যার আরতি করতে চান—সে অমিতাভ ছাড়া কেউ নয়।

শুধু একজন সদ্‌গুরু চাই। যিনি সেই আত্ম-দেউলের সব দরজা-জানলাগুলোকে বজ্রের অর্গল দিয়ে চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

"পিচ্ছিল"

সমাজের মুখচ্ছবি কথাকাহিনী

(বিশেষ সংবাদদাতা)

দেবুথৎ-এর "পিচ্ছিল" এক দুঃসাহসের পরিচয়। কাউকে ছেড়ে কথা কয় নি, এই পুস্তকের সংলাপ। ভিখিরী থেকে মন্ত্রী, সবাই এর কলমের ডগায় চাবুক খেয়েছে। দাম পঞ্চাশ পয়সা। "পাণ্ডুলিপি"—৩৯, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬ থেকে প্রকাশিত। সবাইকার কিনে পড়া দরকার।

● সদর স্ট্রীটের দৃ[illegible]

॥ নানা অধ্যায় অতিক্রান্ত সদর স্ট্রীট ॥

"In May, 1797, Mr. Speke had refused to receive a petition from a young Sikh, who, becoming importunate, was turned out of the house. Resenting this treatment the unfortunate man, rushing into the house, killed two servants, and tried to enter Mr. Speke's room, His bearer with great presence of mind locked his master's door and misled the murderer, who, ascending the wrong staircase, reached the terraced roof and was trapped. A party of sepoys, after trying in vain for some hours to reach the roof—the murderer keeping them at bay by pulling up the balustrades, and throwing the masoury on them in the narrow passage —broke loopholes in the wall of the staircase, and shot him dead, in the sight of an immense crowd gathered below",

কে এই দুরন্ত দুঃসাহসিক শিখ? বয়সে নবীন, অতএব অতীত তার সামান্য, ভবিষ্যৎ বিরাট। এই বিরাট ভবিষ্যতের কোনো এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, হয়তো সে অর্জন করতে পারতো অভিলাষের সমস্ত জয়। হয়তো যৌবনের পর্যাপ্ত পাথেয় দিয়েই, সে অমৃত সন্ধানের জীবন-সমুদ্রে নায়কের ভূমিকা পেতে পারতো সহজে। অথচ কেন এমন হলো? কেন এমন ভবিষ্যতের দুর্লভ উপহার ফিরিয়ে দিয়ে, সে নিজেও অতীত হওয়ার অভিশাপকেই স্বাগত জানালো নির্দ্বন্দ্বে? স্পীক সাহেব এমন কী আবেদন তার অগ্রাহ্য করেছিলেন—যার ফলে স্পীক সাহেবেরই প্রাণনাশের দুর্দমনীয় সঙ্কল্পে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে? --- এ-সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই ক্যাথলিন ব্লিচেনডেনের গ্রন্থে। এমন কি, অন্য কোনো ইতিহাসবিদও এ-সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থে কোনো আলোকসম্পাতের চেষ্টা করেন নি। প্রতিজনের গ্রন্থ-পত্রে তাঁদের স্বকীয় ভঙ্গীতে এ-কথারই উল্লেখ ঘটেছে: উক্ত তরুণ শিখের কোনো এক আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন মিঃ স্পীক। তাই তরুণ শিখ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, স্পীক সাহেবকে হত্যা করবে বলেই প্রবেশ করে তাঁর সুরক্ষিত গৃহে। প্রবেশপথেই সে হত্যা করে দুজন কর্মচারীকে। তারপর স্পীক সাহেবের সঠিক কক্ষ অনুসন্ধান করতে করতেই সে ভুল সিঁড়িপথে আরোহণ করে ছাদে এবং সেখানেই তার অপমৃত্যু ঘটে জন-কয়েক সিপাইয়ের সংঘবদ্ধ গুলীতে।

কিন্তু তরুণ শিখের সেই আবেদন-পত্রের বিষয়বস্তু কী ছিল, স্পীক সাহেবের দরবারে সে পেশ করেছিল এমন কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধির আর্জি—তার কোনো বিবরণ নেই কোথাও। হয়তো তৎকালীন ইংরেজ সরকার অথবা সম্মানীয় স্পীক সাহেবের স্বার্থেই ইতিহাস রচয়িতাগণ তা গোপন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সম-সাময়িক কালের অথবা কিছু পরের 'এম্পায়ার' পত্রিকার সূত্রে তার যে-সংকেত পাওয়া যায়, আজ তা অতি সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করতে চাইলেও, মোটামুটি তার পরিগ্রহণ ঘটবে যে-কাহিনীর মূর্তিতে—তা এই:

উক্ত তরুণ শিখের নাম ছিল সুন্দর সিং। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে অথবা তার কিছু আগে, পিতা যোগীন্দর সিংয়ের সঙ্গে কলকাতায় আসে সুন্দর। তখন সে অবুঝ কিশোর। পিতা যোগীন্দর সিং কলকাতায় এসেই তৎকালীন এক বিখ্যাত ইংরেজ পরিবারের গৃহে একজন প্রহরীর কাজে নিযুক্ত হয়। সুন্দর মাতৃহীন। সুতরাং পিতার সঙ্গে সেদিন থেকে সে'ও বসবাস করতে থাকে উক্ত ইংরেজ পরিবারের গৃহেই। দেহের গড়ন তার বলিষ্ঠ, এবং মুখমণ্ডলেও তার নিখুঁত লাবণ্যের উদ্ভাসে প্রতিষ্ঠা ঘটেছে নিষ্পাপ কান্তির। সম্ভবত সে-কারণেই সে মেলামেশা করার সুযোগ পায় সেই ইংরেজ পরিবারের কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই সে খেলাধূলা করে নিয়মিত এবং মাঝে মাঝে আহারেও বসে নির্বাধায়। সুতরাং দিনে দিনে এভাবেই প্রশ্রয় পেয়ে, উক্ত পরিবারের সঙ্গে সে তার অবিচ্ছিন্নতাই প্রতিষ্ঠা করে এবং ধীরে ধীরে বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই সে আয়ত্ত করার প্রয়াস পায় তাঁদের ভাষা।

তারপর? তারপর দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় কয়েকটি বৎসর। এতদিন সে কিছুই বুঝতে পারে নি। কিন্তু বছর-কয়েক পর, যেদিন সে

কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনের বাসন্তী-দিনের সাক্ষাৎ পেলো প্রথম, সেদিনই সে বুঝতে পারলো : সেই ইংরেজ-পরিবারের সুন্দরী দুহিতা লীটাকে সে ভালবাসে। একদিন কিশোরী ছিল লীটাও। সে'ও আজ সুন্দরের পাশাপাশি, প্রথম যৌবনের রঙীন সোপানে চরণ তুলেছে হাসতে হাসতে। আজ লীটার চোখেও সুন্দরই একমাত্র সুন্দর। উভয়ের কাছে উভয়ই তারা প্রথম নারী এবং পুরুষ। অতএব প্রথম ভালো লাগার এই দুর্নিবার আকর্ষণ উপেক্ষা করবে—এমন ক্ষমতা তাদের নেই। পরস্পরের মন এলো কাছে, আরও কাছে। এবার সুরু হলো তাদের আরেক পৃথিবীর খেলা।

কিন্তু তাদের এই গোপন সম্পর্কের কথা অচিরেই অবগত হলেন লীটার অভিভাবক। তিনি অবগত হয়েই সুন্দরকে বহিষ্কৃত করালেন তাঁর গৃহ থেকে। তারপর লীটাকে তিনি কোনো এক ইংরেজ-যুবকের সঙ্গে ইংলণ্ড পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন মিঃ স্পীকের সহায়তায়।

এদিকে লীটা তার অভিভাবকের সমস্ত ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেই এক গোপন চিঠিতে সে সুন্দরকে জানালো : মিঃ স্পীক তাদের আত্মীয় হলেও, একজন উদার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর কাছে কোনো ন্যায়সঙ্গত আবেদন অগ্রাহ্য হয় না। অতএব সুন্দর যদি লীটার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ ক'রে মিঃ স্পীকের দরবারে এক আবেদন-পত্র পেশ করে, তাহলে হয়তো অনায়াসেই স্থগিত হতে পারে লীটার ইংলণ্ড যাত্রা।

লীটার এই চিঠি পেয়েই সুন্দর আর কালক্ষেপ না ক'রে স্পীক সাহেবের সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু সাক্ষাৎলাভ অত সহজ নয়। দিন-কয়েক অবিরাম চেষ্টা করার পর যেদিন সে সাক্ষাতের অনুমতি পায়, ঠিক সেদিনই লীটাকে নিয়ে জাহাজ ভাসবে ইংলণ্ডের উদ্দেশে। সুতরাং এক ভয়ঙ্কর উন্মাদের মতোই ছুটে আসে সুন্দর এবং সিপাইদের প্রখর পাহারা উপেক্ষা ক'রে সে প্রবেশ করে মিঃ স্পীকের কক্ষে। তারপর পেশ করে তার আবেদন-পত্র। কিন্তু মিঃ স্পীক তার আবেদন-পত্র পাঠ করেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ভীষণ। তারপর জন-কয়েক সিপাইয়ের সাহায্যে সুন্দরকে তিনি তখনই বহিষ্কৃত করেন তাঁর গৃহ থেকে।

বাইরে এসেই খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে সুন্দর। তারপর মুক্ত কৃপাণ হস্তে আবার সে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে স্পীক সাহেবের গৃহে। প্রবেশপথেই সে দুজন কর্মচারীকে হত্যা করার পর, বিভ্রম বশত ভিন্ন সিঁড়িপথে আরোহণ করে ছাদে। তারপর সিপাইদের দ্বারা সে তার অপমৃত্যুকে বরণ ক'রে নেয় সেখানেই। ---আর অন্যদিকে, তখন সুন্দরহীন লীটাকে নিয়ে জাহাজ ভেসে যায় গঙ্গা ছাড়িয়ে সমুদ্রের সীমায়।

● সদর ষ্ট্রীট থেকে যাদুঘরের একাংশের দৃশ্য

এই ঘটনা ঘটে সদর ষ্ট্রীটেই ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। বর্তমান যাদুঘরের যে-অংশ সদর ষ্ট্রীটের দক্ষিণ রেখায় অবস্থিত, সেকালে সেখানেই বসবাস করতেন মিঃ স্পীক। এই যাদুঘর এবং তৎসংলগ্ন আর্ট-স্কুলের গৃহের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। তিনি সত্যই একজন বিশিষ্টতম ব্যক্তি ছিলেন তৎকালীন কলকাতার। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একজন মহামান্য সদস্য ছিলেন সুপ্রীম কাউন্সিলের। তাঁর "Long and ruling voice'-এর প্রতি ইংরেজ সরকারের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাছাড়া তিনি Marine Board এবং Board of Trade-এর সভাপতিরূপেও প্রতুল দক্ষতার নজীর স্থাপন করেছেন সেকালের ইতিহাসে। তাঁর কর্মক্লান্ত জীবন নশ্বরদেহ ত্যাগ করে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর।

মিঃ স্পীক ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান যাদুঘর বা আর্ট স্কুল গৃহের নির্মাণ-কার্য সমাধা করেন। নির্মাণ-কার্যের সমাপ্তি ঘটতেই তিনি এই বিশাল গৃহের এক বৃহৎ অংশ ব্যবহার করতে দেন তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে: বর্তমান

সদর ষ্ট্রীটের তৎকালীন ভূমিখণ্ডের কোনো এক বিশেষ অংশে ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর উক্ত আদালত মিঃ স্পীকের গৃহেই স্থানান্তরিত করেন ইংরেজ সরকার। ঐতিহাসিকদের মতে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতেই পুনর্বিচার সমাধা হতো মফঃস্বলবাসীদের।

তৎকালীন সেই সদর দেওয়ানী আদালত বা যাদুঘরের উত্তর-পার্শ্ববর্তী রাস্তা প্রথমদিকে নাম ধারণ করে 'স্পীক ষ্ট্রীট'। কিন্তু পরবর্তীকালে আদিকালের সেই আদালতকে স্মরণ করেই স্পীক ষ্ট্রীটের রূপান্তর ঘটে 'সদর ষ্ট্রীট'-এ। এই রাস্তা ও আদালত সংক্রান্ত যে-বর্ণনা আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায়—তা এই :

"This Street owes its name to the fact that in the early part of 18th Century the Sudder Dewany Adalat was located in its neighbourhood. The Adalat was a court which heard appeals from mofussills and continued till High Court was established. The court building is now incorporated in Museum buildinrs."

এই আদালত সম্পর্কে আরও অনেক বিক্ষিপ্ত সংবাদের উল্লেখ ঘটেছিল তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়—যার বিশদ উদ্ধৃতি খুব একটা অনিবার্য নয় এই নিবন্ধে। 'কাজী-উল-কোজ্জাৎ' উপাধি-ধারী জনাব সিরাজউদ্দীন আলি খাঁ সদর দেওয়ানী আদালতেরই এক উচ্চতম পদে নিযুক্ত ছিলেন প্রায় চল্লিশাধিক বৎসর। তিনি কেবল বিচারকার্যেই একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন তা নয়, একজন অনন্য বিদ্যোৎসাহী-রূপেও তাঁর উল্লেখযোগ্য আসন ছিল তৎকালীন সমাজে। তাছাড়া শোনা যায় : সদর ষ্ট্রীট এক উল্লেখ-যোগ্য সরণীরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে। তাঁর মৃত্যুর পর বাং ১২৩২ সালের ৬ই ভাদ্র, 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশ ঘটেছিল :

"সিরাজউদ্দীন আলি খাঁ নামে কাজী-উল-কোজ্জাৎ অর্থাৎ প্রধান কাজী সম্প্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি আরবি ও পারসি বিদ্যাতে অতি নিপুণ ছিলেন এবং মুসলমানদের ব্যবস্থা-গ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমা-বস্থাতে অনেক দিবস পর্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতের মুফ্‌তি ছিলেন, পরে কাজী-উল-কোজ্জাৎ পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেম। অনন্তর জরাগ্রস্ত হইলে কোম্পানী তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি নিরুপণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

সম্ভবত হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পরেই সদর ষ্ট্রীট থেকে অপসারণ ঘটে সদর দেওয়ানী আদালতের। তারপর মিঃ স্পীক নির্মিত বিশাল গৃহটির সর্বাংশই অন্তর্ভুক্ত হয় যাদুঘরের। কক্ষে কক্ষে দুর্লভ সংগ্রহের বিস্ময়কর সমাবেশ নিয়ে, সেকাল থেকে একালের বর্তমান পরিচ্ছেদে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে যাদুঘর। কিন্তু যে-অংশ তার সদর ষ্ট্রীটের দিকে, সে-অংশের একটি বিশেষ কক্ষ অব্যবহৃত অবস্থায় 'কুলুপ-আঁটা' রয়েছে একালেও। কারণ এ-কক্ষেই তৎকালীন বাংলার অমর দধীচি মহারাজ নন্দকুমার কিছুদিন বন্দী-জীবন যাপন করেছিলেন ফাঁসীর পূর্বে। যেদিন হেস্টিংস-অঞ্চলের কোনো এক বটবৃক্ষের ফাঁসীমঞ্চে তিনি গলায় ধারণ করেন মহামৃত্যুর রজ্জু, সেদিন এ-কক্ষ থেকেই ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যবাহিনী তাঁকে পরিবেষ্টন ক'রে নিয়ে যায়। সম্ভবত সে-কারণেই বর্তমান সরকার সেই কক্ষটিকে এক পবিত্র স্মৃতিরূপে চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন অব্যবহৃত অবস্থায়।

উনবিংশ শতাব্দীর যবনিকা-পাতের কিছু পূর্বেই, যাদুঘরের উত্তর-পার্শ্ববর্তী রাস্তা বা সদর ষ্ট্রীট সংস্কার সাধিত হয় আরও। ফলে, বিশেষ এক রমণীয়তার প্রসাদ লাভ করে সে পরিমার্জিত লাবণ্যে। চৌরঙ্গী থেকে ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীট পর্যন্ত তার সুদৃশ্য অঙ্গে তখন অজস্র তরুলতার ছায়াঘন আড়ম্বর ছিল বলেই সেখানে পত্তন ঘটে এক কাব্যিক নিসর্গের। তাই উভয় বাহুতে তার দিনে দিনে বসতি স্থাপন করেন জন-কয়েক উল্লেখযোগ্য বিত্তশালী। তার মদির নিসর্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর কাব্য-জীবনের কয়েকটি অমূল্য দিন এখানে অতিবাহিত করেছিলেন—তা ইতি-পূর্বেই উল্লেখ করেছি ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীট সংক্রান্ত নিবন্ধে।

তবে বর্তমানে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল পরিনির্বাণের পর, সদর ষ্ট্রীটের পূর্ব পরিবেশ অপহৃত হয়েছে অনেকাংশেই। আজকাল এখানে বসতবাটীর অপেক্ষাকৃত আধিক্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনই গণনীয় একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং কিছু বিচিত্র বিপণির সারিবন্দী বিস্তৃতি। আজকাল তার চারিত্রিক বিবর্তনও ঘটেছে খানিকটা। তাই প্রতি মধ্য-রাত্রে গোপন অভিসারের মন্থর পদ-সঞ্চারে তার ঘুম ভেঙে যায়। বিশেষ কোনো হোটেলে, সুরার পাত্রে সাঁতার কাটতে কাটতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে সদর ষ্ট্রীটের এক-একটি রাত, তখন তারা নিঃশব্দেই সমাধিলাভ করে বিবশ তনুর অবারিত নগ্নতায়। তারপর ভোর আসে হামাগুড়ি দিয়ে, সূর্য ওঠে সুরাপায়ী দেউলিয়ার মতো। তার ক্লান্ত কিরণে গতরাত্রের কলঙ্কের স্বাক্ষর তখনো বেশ স্পষ্ট।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রঙ্গজগৎ

বিকিনি-টপলেস, আওয়ারা—নর্দমাচোঙা

পশ্চিম জগতে নাচে যেমন রুচি পরিবর্ত্তন চলেছে ঘনঘন, তেমনি পোষাকের পরিবর্ত্তন চলেছে সমান তালে। মেয়েদের স্ল্যাক্স-সার্ট গেছে, এসেছিল বিকিনি; এবার এসেছে টপলেস। অর্থাৎ বুকখোলা। ছেলেদের নর্দমাচোঙা—আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। বিটকবিরা অন্তর্বাস পরে এই কলকাতার রাস্তায়ও হেঁটে গেছে, তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবি, নামে আত্মপ্রচারক কপি দল ছাড়া বেশি লোককে উৎসাহিত করতে পারে নি। যারা পোষাকে শরীরের এনাটমি প্রকাশ করার পক্ষে, তারাও এবার টপলেসের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে; সম্ভবত দর্জিদের কাজ যাবার আশঙ্কায় তারা উদরের জেনোনেস্ট্রেশন মেনে নিলেও তার বেশি যেতে দিতে রাজী নয়। তাই হৈ-চৈ, নিষেধাজ্ঞা বেশ উচ্চৈস্বরে শোনা যাচ্ছে।

ওদের দেখাদেখি আমাদের যারা আওয়ারা প্যাণ্ট ছেড়ে নর্দমাচোঙা পরেছিল, এলবার্ট টেরি কেটে, ইটালিয়ানকাট জুতা পরে বিটলামী করতো; আর মেয়েদের মধ্যে যারা টাইট স্ল্যাক্স পরে, নাভিদেশ অনাবৃত রেখে সালোয়ার ও পাতলা টাইট পাঞ্জাবীতে দেহের অংশবিশেষ দেখাবার বাসনায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো, তারা এবার বিপদে পড়েছে। ওরা কেবল জনমতে ধিকৃত নয়, পুলিশও তাদের পেছনে লেগেছে। হাতকাটা জামা পরা, উদরদেশ প্রদর্শিকারাও এই ধিক্কার থেকে রেহাই পায় নি।

কিন্তু কেবলমাত্র পুলিশী অভিযান এই রুচিবিকার রোধ করতে পারে না। ধনতন্ত্রের অন্তিম দশায় বিকারের লক্ষণস্থান হলিউডের বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন নামে পরিচিত ছবি এবং আমাদের দেশের নকলসর্বস্ব এক ধরণের হিন্দী ছবি এই বিকারের উৎস। গত এক বছরের মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউডের ও হিন্দী ছবির দিকে লক্ষ্য রাখলে পোষাক ও রুচিবিকৃতির কারণ কিছুটা বোঝা যায়। এই কারণে হলিউড ও হিন্দী ছবির সেন্সারের ব্যাপারে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। হলিউড ও হিন্দীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ছবি বেশি প্রদর্শনে উৎসাহ দেওয়া উচিত। —সুজন।

● মুক্তিপ্রাপ্ত 'অশান্ত ঘূর্ণী'-র একটি চরিত্রে দিলীপ মুখার্জী।

চিত্র আলোচনা

রাধাকৃষ্ণ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রাধাকৃষ্ণ' মুক্তিলাভ করেছে। ভক্তিপ্রাণ ও সঙ্গীতরসপিপাসু নরনারীর কাছে কাছ রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক লীলা-কাহিনীর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে। এই প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শোনার জন্য এখনো ভক্তিমতীরা আগ্রহী। কৃষ্ণলীলার সঙ্গীত রসে একদা বাংলা দেশ প্লাবিত হয়েছিল। সংকীর্তন আর বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী গানে বাংলার নরনারী আকুল হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গীত শ্রবণে আজো সেই আকুলতাই আনে।

যুগের পরিবর্তনে মনেরও পরিবর্তন হয়েছে। আজো বৈষ্ণব পদাবলীর সুধামৃতের আকুলতা রয়েছে সত্য, কিন্তু মন এখন যুক্তিমুখীন। মহাজনদের 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর' কথাটাকে এখন আর সকলে মেনে নিতে পারে না, কারণ যুগটাতো মহাকাশ অভিযানের। সুতরাং কৃষ্ণলীলার মত কাহিনীর চিত্ররূপে চিত্রনাট্যকারের লক্ষ্য থাকা উচিত ছিল—যাতে ছবিটি বাস্তবতার ছোঁয়া পাবার পরিবর্তে স্বপ্নলোকের পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুবা রাধার অভিসার মুহূর্তে কৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর সঙ্গে রাত্রিবাস আর গালে সিন্দুরের দাগ ইত্যাদি পরকীয়া-রসে আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে জৈবিক দিকটাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে; এবং এতে বৈষ্ণব ভক্তদের আপত্তির কারণও ঘটতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা ভক্তিরসের ছবি বলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাঁরা কিভাবে তাদের বোঝাবেন? এদিক থেকে চিত্রনাট্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যেমন ব্যর্থ, তেমনি পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী কল্পনাকে গভীরে নিয়ে যাবার মত কষ্ট স্বীকার করেন নি। তাই দৃশ্যাদিতে মিথিলা বৃন্দাবনের পরিবর্তে আজকের দিনের ধূলি-রুক্ষ শ্যামলিমাহীন প্রাকৃতিক পরিবেশ

● 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিতে কৃষ্ণের ভূমিকায় উত্তর ব্যানার্জী।

পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নীল যমুনা, স্রোতস্বিনীর পরিবর্তে আবদ্ধ জলে কচুরিপানাযুক্ত খালকে যমুনা কল্পনা করতে আমরা পারি নি। পরিচালকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় পীড়িত বোধ করেছি।

ছবিটির একমাত্র এবং প্রধান আকর্ষণ---সঙ্গীত। রথীন ঘোষ সঙ্গীত পরিচালনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। জয়দেব, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, যদুনন্দন থেকে পরবর্তীকালের মনোহর দাস পর্যন্ত অনেক ভক্ত-রচিত ২৩টি বিভিন্ন রসের গানে শ্রোতারা তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। বিশেষ করে যখন এই পদাবলী সঙ্গীতে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলার জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকারা।

অভিনয়ে অধিকাংশ নতুন শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে। নবাগতরা উল্লেখ-যোগ্য কিছু করতে পারেন নি। পুরোনো শিল্পীদের পরিচালক যাত্রাধর্মী অভিব্যক্তি ও সংলাপের নির্দেশ দিয়েছেন। কেতকী দত্ত, রেণুকা রায়, শীলা পাল, দ্বিজু ভাওয়াল অন্যাদের তুলনায় প্রশংসনীয়। কৃষ্ণ এবং রাধার রূপ দিয়েছে যথাক্রমে উত্তর ব্যানার্জী এবং সঙ্কিতা ব্যানার্জী।

নাটকের কথা

গত ১৯শে জুলাই সৈলুশিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ললিতকলা একাডেমি হলে 'অথ-কিম্' নাটিকা ও 'চণ্ড-কৌশিক' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে।

অথ কিম

'অথ-কিম্'— ব্যঙ্গ নাটিকা। রচনা ও পরিচালনা করেছেন দুলেন্দু ভৌমিক। এক আত্মসর্বস্ব ভদ্রলোক চোরা কারবারের দৌলতে রাতারাতি অভিজাত হয়েছেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পোষাকে, ব্যবহারে উগ্র আধুনিকতার বদহজমের ছাপ পরিস্ফুট। সেখানে 'টপলেস' 'ড্রেন পাইপ' কাল-চার চলছে। এরূপ এক বাড়িতে এক অভিজাতের আগমন উপলক্ষে সাজ-সাজ রব পড়েছে। গৃহকর্ত্রী নিজেকে তরুণী সাজাবার জন্য নামটাই পাল্টে বেবী করে ফেললেন। এরূপ আধুনিক-দের শিল্পরসের পরিচয়ে নাটিকার শেষ তাদের অপরিণত-মানসিক গঠন এবং দুর্বোধ্যতার আড়ালে আত্মরক্ষার করুণ চেষ্টায় মোঁপাসার গল্পের গাধার পায়ের ছাপের মত এখানেও এক কষ্টকল্পিত অর্থহীন ছবিতে এদের শিল্পবোধের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এই ব্যঙ্গ নাটিকাটি কালোপযোগী। কালোবাজার আর দুর্নীতির দাপটে সমাজ আজ যক্ষ্মারোগীর মত ধুঁকছে। কালোবাজার আর দুর্নীতির জারজ সন্তানরা আজ সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। এদের আধিপত্যে আমাদের ঐতিহ্য ও শিক্ষা উপেক্ষিত, সে স্থলে পশ্চিমী বিকৃত মানসিকতা-প্রসূত অবক্ষয়তা আভিজাত্যের রূপ গ্রহণ করেছে। এরূপ অভিজাত মানসিকতার নিদর্শন—ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার জাতির লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে। তরুণ মনকে এরা টানছে বিকৃত মানসিকতা ও যৌনসর্বস্ব চিন্তার দিকে। আধুনিকতার নামধারী সমাজের এই গর্ভস্রাবদের বিরুদ্ধে আজ কেবল পুলিশী অভিযান নয়, সর্বতোভাবে ধিক্কার ধ্বনিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দুলেন্দু ভৌমিকের এই নাট্য-প্রচেষ্টা তাই প্রশংসনীয়। আমরা নাটিকাটির বহুল অভিনয় আশা করি।

তবে নাটিকাটির পরিচালনায় ত্রুটি রয়ে গেছে। পাত্র-পাত্রী পোষাকে-আসাকে যথাযোগ্য ভাবে উগ্র আধুনিকদের প্রকাশ করতে পারেন নি। অভিনয়ও আড়ষ্ট। একমাত্র জনের চরিত্রে সনৎ গাঙ্গুলী সার্থক হয়েছেন।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, পরেশ ঘোষ, সীমা চক্রবর্তী, ঝর্ণা ব্যানার্জী, শ্যামলী চ্যাটার্জী, অঞ্জু দাস, দুলেন্দু ভৌমিক, তপন সেনগুপ্ত, বরুণ মুখার্জী, সমর বসু, দিলীপ চক্রবর্তী।

● 'প্রথম প্রেম' ছবিতে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

স্টুডিও খবর

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এ সপ্তাহে হৈ হৈ করে প্রায় গোটা সপ্তাহকাল ধরে স্যুটিং চললো বলাকা চিত্রমের 'জয়া' ছবির। ছবিটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র যে বই লিখতে সুরু করেছিলেন আর শেষ করেছেন প্রেমেন মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ জনপ্রিয় সাহিত্যিক—সেই 'রসচক্র' বারোয়ারী উপন্যাসটি অবলম্বন করে 'জয়া' ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রবীণ পরিচালক শ্রীচিত্ত বসু। বই নির্বাচনে যেমন প্রযোজক শ্রীভূপেন সরকার নতুনত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি পরিচালক তাঁর সহকারী নির্বাচনেও কম নতুনত্ব দেখান নি। এই অভিজ্ঞ পরিচালকের সহকারী হিসাবে ফ্লোরে দেখলাম উজ্জ্বল ব্যানার্জীকে। যাঁকে রাজেন তরফদারের সহকারী হিসাবেই দেখেছি। দেখলাম—তপন সিংহের সহকারী পঙ্কজ ঘোষকে। দেখলাম আর একজন নতুন সহকারী তরুণ মৈত্রকে—যিনি সাহিত্যিক-সাংবাদিক রূপেই আমাদের কাছে পরিচিত। এই নতুনদের সাহচর্যে চিত্তবাবু 'জয়া' ছবিটির কাজ করছেন সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্তা, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তীকে নিয়ে। এস বি ফিল্ম বিশ্ব-পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রধারক অনিল গুপ্ত। সম্পাদক অমিয় মুখোপাধ্যায়।

নির্মীয়মাণ 'কাঁটা তার'-এর দুটি ভূমিকায় অসীমকুমার ও মঞ্জুলা সরকার।

• বিহিম সেন রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে এম বি প্রোডাকসন্সের 'শেষ তিনদিন' ছবির চিত্র-গ্রহণের কাজ চলছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। অভিনয়াংশে আছেন অনুপকুমার, তরুণকুমার, সুমিতা সান্যাল, গীতালি, গীতা দে, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী প্রমুখ।

চেকোস্লোভাকিয়ার নারী চিত্র পরিচালিকা ভেরা চাইটিলোভা

চেকোস্লোভাকিয়ার চিত্র পরিচালিকা ভেরা চাইটিলোভা পূর্ব ইউরোপের চলচ্চিত্র জগতে সুপরিচিতা। চেকোস্লোভাকিয়ার শীর্ষস্থানীয় পরিচালকদের মধ্যে তিনি অন্যতমা। মহিলা চিত্র পরিচালিকাদের মধ্যে তাঁর শিল্পকৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসিত।

ভেরা চাইটিলোভা চেয়েছিলেন স্থপতি হবেন। কিন্তু হয়ে গেছেন চিত্র পরিচালিকা। কি করে। সে কথাই তিনি নিজে বলছেন।

১৯৪৯ সালে বুনো কলেজে স্থপতি বিদ্যা পড়ছি। গ্রীষ্মকালীন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশের জন্য আমাকে প্রাগে পাঠানো হলো। তখন প্রাগে বাণিজ্য মেলা হচ্ছিল। আমি সেখানে ফ্যাসন শো'তে মডেল হিসাবে কাজ নিলাম। ক্লাশের অবসর সময়ে কিছু অতিরিক্ত আয়ের জন্য। সে সময় বারান্দাব স্টুডিও থেকে 'দি এমপেররস বেকার' ছবির জন্য কয়েকজন মেয়ের খোঁজ করছিল। আমি তাদের নজরে পড়ে গেলাম।

এই ছবি আমার জীবনে একটা নতুন জগতের দ্বার খুলে দিল। মনে হলো আমি যেন এতদিন ফিল্মের কাজের জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম। ক্যামেরা - - - লাইট - - - - পরিচালকের চিৎকার রেডী! একশন!- - -সবকিছু যেন আমার কাছে উদ্দীপনার বিষয় হয়ে উঠছিল।

প্রথমবার আমার পাঠ বলতে অসুবিধা লাগে নি,- - -দ্বিতীয়বার বলতে বললে—আমার ভয়ানক লজ্জা হয়—মনে হচ্ছিল আমি অভিনয় করছি। তৃতীয়বার পরিচালকের কড়া নির্দেশ পেয়ে আমিও অনেকটা সংকল্প করে বলার মত বললাম। তখন আমি ভেবেছিলাম, কোনদিন আমি যদি পরিচালিকা হই, তবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়বার ছবি 'টেক' করার নিয়ম রাখবো না। এতে শিল্পীরা সহজ হয় না, কৃত্রিমতা এসে পড়ে।

আমি ভেবেছিলাম কোন পরিচালকের সহকারী হবো, তারপরে নিজে পরিচালক হবো। কিন্তু স্টুডিও আমাকে সে সুযোগ দিল না। সে বছর আমি বিয়ে করলাম। আমার স্বামী একজন ক্যামেরাম্যান। স্থপতিবিদ্যা পড়ায় আমার আর মন রইল না, ফিল্মেও স্থান পেলাম না। একটা রসায়নাগারে চাকরী নিলাম। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় সে চাকরীও করতে পারলাম না। তারপরে অনেকদিন বসে থাকার পর বারান্দাব স্টুডিওতে 'ক্ল্যাপার'-এর কাজ পেলাম। কাজটা হলো পরিচালক যখন বলবে—একশন। তখন ক্ল্যাপার ক্যামেরার সামনে দৃশ্যের নম্বর বলবে। কিন্তু 'ক্ল্যাপার' থেকে সহকারী পরিচালক হতে আমার দেরি হলো না। কিন্তু তারপরে আর না, তিনবছর

● ভেরা চাইটিলোভা

এভাবে থাকতে হতো। পরিচালকরা সবাই পুরুষ, যখন কোন পরিচালকের পদ শূন্য হতো—পুরুষদের মধ্য থেকেই নেওয়া হতো। আমার পালা আর আসতো না।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম প্রাগের ড্রামাটিক আর্টস একাডেমিতে ভর্তি হবো, নতুবা পরিচালক হবার সুযোগ আমার হবে না।

বন্ধুবান্ধবরা বলেছিল এখানে ভর্তি হওয়া বড় কঠিন। কিন্তু ৬০ জনের মধ্য থেকে আমি নির্বাচিত হলাম। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দশম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রামাণিক চিত্র নির্মাণের জন্য সরকার একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করে। আমি তাতে যোগ দিলাম, এবং 'গ্রীন লাইট' ছবি তৈরি করে পুরস্কার লাভ করলাম।

চলচ্চিত্র নির্মাণে আমার আদর্শ বাণী হচ্ছে—সততাই সাফল্যের একমাত্র পথ। আমার ছবি বাস্তবজীবনধর্মী। একাডেমিতে পড়ার সময় আমি দুটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করেছি। এই দুটো ছবি চিত্র-সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে; দর্শকরা দলে দলে দেখেছে এবং প্রশংসা করেছে। প্রথম ছবিটি ফ্যাসন মডেলদের ব্যক্তিগত ও বাইরের জীবনকে কেন্দ্র করে, দ্বিতীয়টি কাপড়ের কলের শিক্ষানবিশীদের হোস্টেলের অব্যবস্থা সম্পর্কে।

পাঁচ বছর পরে আমি বারান্দাব স্টুডিওয় ফিরে এলাম; ক্ল্যাপার—বা—একস্ট্রা হিসাবে নয়। এবার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে। এখানে আমার প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'এনাদার ওয়ে অব লাইফ'। এই ছবিতে দু-টি মেয়ের দুই রকমের জীবনের কথা বলা হয়েছে। একটা সংকল্পবদ্ধ জীবন, আর একটি সংকল্পহীন জীবন। এক জীবনের নায়িকা সুখে ভরা চ্যাম্পিয়ন জিমন্যাস্ট ইভা বোসাকোভা, আর এক জীবনের নায়িকা কোন অজ্ঞাত গৃহবধূ। দু-জন নায়িকার কেউ কখনো ক্যামেরার সামনে আসে নি। আমি এদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নির্দেশ দিই নি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছি এবার তোমরা নিজেরা কাজটা কর, কেবল আমার শেখানো কথাগুলি বলবে। তারা বুঝতেও পারে নি ক্যামেরা কি ভাবে ছবি তুলছে। আমরা সুবিধা-মত অবস্থায় ছবি তুলে নিয়েছি। এতে দৃশ্যগুলি জীবন্ত হয়েছে। অবশ্য ছবি তোলার আগে আমি ক্যামেরাম্যান ও সহকারীদের সঙ্গে দৃশ্যটা সম্পর্কে ভালভাবে আলোচনা করে নিতাম।

ছবিটা আজ দর্শকরা দেখছে। একদিকে বিশ্ববিজয়িনী বোসাকোভা আর একদিকে অসুখী বিবাহিত জীবন। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ছবিটি ম্যানহেম চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে পুরস্কার লাভ করেছে।

—আমার ছবি যে প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছে, সেকথা আমি জানতাম না, ম্যানহেম চলচ্চিত্র উৎসবের কথাও আমি জানতাম না। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি ভাল ছবি করেছি।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

বন্ধুবর ডাক্তার অজিত ঘোষের একবার মহা বিপদ হয়েছিল 'ক' বাবুর দলের এক অভিনেত্রীর অভিনয়ের ভুল-ত্রুটি দেখাতে গিয়ে। 'ক' বাবু 'খ' বাবুরা আবার বছরে মাঝে মাঝে নিজেদের বিরাট বিরাট কৃতিত্বের কথা লোকের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য নিজেদের গোষ্ঠী থেকে পত্রিকা বের করেন। 'ক' বাবুর পত্রিকায় ডক্টর ঘোষকে ভূমিসাৎ করা হোল এই বলে—হাস্যরসের উপর থিসিস লিখে যিনি ডক্টরেট পেয়েছেন ইত্যাদি। এটি পড়ে আমারও হাস্যোদ্রেক হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে বের্গসঁর কথা মনে হয়েছিল—তুমিই বা কি দার্শনিক! Creative Evolution লিখেছিলে—সবার শ্রদ্ধা পেয়েছিলে। Philosophy of Laughter লিখতে গেলে কেন আবার? ভাগ্যে 'ক' বাবুর দৃষ্টি তোমার ওপর পড়ে নি। আর এক হতভাগ্যও বেঁচে গেছে—চার্লি চ্যাপলিন। যতোই pathos create করবার চেষ্টা কর—আসলে তো তুমি হাস্যরসের অভিনেতা। সুতরাং খুব সাবধান—কখন তোমার ঘাড়ে খাঁড়া পড়ে কে জানে। মস্কো আর্ট থিয়েটারও 'ক' বাবুর চাবুকের হাত থেকে বাঁচে নি।

এ হেন 'ক' বাবুর ভূতপূর্ব এক মঞ্চসজ্জাকর বলছিলেন—'ক' বাবুর একটি বিলিতী নাটকের অনুবাদের মঞ্চসজ্জায় তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে, রাশভারী স্বামী স্টেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি vertical tubes of light জ্বলে উঠবে। আর তাঁর স্ত্রী এলেই curved ভাবে সাজানো tubes জ্বলবে। জিজ্ঞেস করলাম—এই বিশ্ববিখ্যাত বাস্তববাদী নাটকটিতে এভাবে অযথা symbol use করবার অধিকার আপনার নেই, কথা কি একবারও ভেবে দেখেন নি।

তাছাড়া ঐ নাটকেই একটি হিন্দুস্থানী-মার্কা সিম্বলের ব্যবহার দেখে ডক্টর অজিত ঘোষের হাস্যরসের কথাই স্মরণ হয়েছিল। একটি পুতুলকে চাবি দিয়ে নাচিয়ে দেওয়া হোল—এবং তার উপর আলোর ফোকাস ফেলা হোল। দেখে মনে হোল সত্যিই গর্ডন ক্রেগের পর এতবড় প্রডিউসার পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় জন্মান নি। হাস্যরসাভিজ্ঞ ডক্টর অজিত ঘোষের কি দুঃসাহস—এঁদের সম্বন্ধে সমালোচনা করতে যান। 'খ' বাবু এবং 'গ' বাবুর productions সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা যেত, কিন্তু তাতে অনর্থক সময় নষ্ট হবে। এবার আসল সাঙ্কেতিক নাটকের সাঙ্কেতিক মঞ্চপ্রযোজনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চে গর্ডন ক্রেগই প্রথম দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে photographic representation of nature ব্যাপারটাকে বাতিল করে দেবার চেষ্টা করেন তাঁর productions এবং লেখার ভেতর দিয়ে। আভাস-ইঙ্গিতের ভেতর দিয়েই দৃশ্যসজ্জাকে বেশি কার্যকরী এবং গভীর অর্থপূর্ণ করা যেতে পারে, একথা প্রথম ক্রেগই ইউরোপ এবং আমেরিকার মঞ্চকুশলীদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন।

ক্রেগের পূর্বে ইউরোপের থিয়েটারের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে Dr. Alexander Havesi (Dramatic Regisseur of the

● গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্থ্স'—প্রডিউসার ডানচেঙ্কো।

state Theatre, Budapest, July 10, 1911) বলেছেন :—

'For more than a hundred years there have been two men working on the stage, spoiling almost all that is to be called theatrical art. These two men are the Realist and the Machinist. The Realist offers imitation for life and the Machinist tricks in place of Marvels. So we have lost the truth and the marvel of life - that is, we have lost the main thing possessed by the art. The art of the theatre as pure imitation is nothing but an alarming demonstration of the abundance of life and the narrowness of art.'

ক্রেগ বলেন—'বালতি বালতি জল তুলে সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলতে যাওয়ার প্রচেষ্টা যেমন বাতুলতা, তেমনি রিয়ালিজমের দ্বারাও জীবনের বিরাটত্বকে বুঝতে যাওয়ার চেষ্টাটাই অপরিণত মনের পরিচায়ক।

মেসিনিস্ট স্টেজের উপর যে সব ভেল্কীর খেল দেখিয়ে থাকেন, তার ভেতর একটা চমৎকারিত্বের আভাস পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু তা সৌন্দর্যের পর্যায়ে স্থান পায় না।

সত্যিকার আর্টিস্ট সাধারণ ব্যাপার এবং ঘটনার ভেতর থেকেই মার্ভেল আবিষ্কার করেন।'

Art is not imitation but vision. মঞ্চের সম্বন্ধেও যে এ কথাটা কত সত্য, গর্ডন ক্রেগই তা প্রথমে দেখিয়ে দেন নাট্যরসিকদের।

ক্রেগ বলেছেন—শেক্সপীয়ারের চারটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডির যে কোনোটির প্রস্তুতির জন্য একবছর থেকে দু'বছর সময় লাগে।

দৃশ্যসজ্জা এবং গতিবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে, যার ফলে দর্শকের উপর একটা large and sweeping impression তৈরি করে তোলা যায়। শেক্সপীয়ার যা যা বলে গেছেন তাকে জলজ্বলে করে তুলতে হবে general and broad effects-এর দ্বারা। এর জন্য প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে দৃশ্যসজ্জার উপর। দেখতে হবে কি ভাবে রঙ্গস্থলটিকে মহাকবির চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং সঙ্গতি রেখে গড়ে তোলা যায়—ম্যাকবেথের উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। কি ভাবে এ নাটকটি আমাদের মানসদৃষ্টি এবং বহির্দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে। দুটি বিষয় প্রথমেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে—

(১) খুব উঁচু পাহাড়।

(২) জলভরা মেঘে ঢাকা রয়েছে পাহাড়ের চূড়া। অর্থাৎ এমন একটা জায়গা, যেখানে ভয়ঙ্করদর্শন যোদ্ধারাই ঘুরে বেড়াতে সাহস পায়। অশরীরী আত্মাদের যেখানে বাসভূমি। পরিণতিতে মেঘপুঞ্জ এসে পাহাড়কে বিলুপ্ত করে দেবে, অশরীরী আত্মারা মানুষদের সর্বনাশ করবে। কিন্তু কি ভাবে দর্শকের চোখের সামনে জিনিষটাকে তুলে ধরা যাবে? একটা খুব খাড়া উঁচু পাহাড় তৈরি করতে হবে—চূড়ার কাছে দিতে হবে মেঘের suggestion। এর পর আসে রংয়ের কথা। প্রথমেই প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে নাটকটির ভেতর ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। রং বলতে দুটি—পাহাড়ের জন্য মানুষ, আর মেঘের জন্য অশরীরী আত্মারা। এছাড়া অন্য কোন রংয়ের দরকারই নেই। সহজ সংক্ষিপ্ততার ভেতর দিয়েই আর্টের মূল্য বাড়ে। এর অভাবে সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত সিন-ডিজাইনারেরা একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে সব কিছু নষ্ট করে ফেলেন—শুধু পাহাড় আর মেঘ করেই তাঁরা তুষ্ট হন না—সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের শেওলা দেখাতে হবে। আগস্ট মাসের বিশেষ ধরণের বৃষ্টি দেখাতে হবে, দেখাতে হবে স্কটল্যাণ্ডের ফার্ন। ফলে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে কোন কথাই বলা হবে না। অথচ আভাসে-ইঙ্গিতে এ-সবই করা যেতে পারে। (ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

[illegible]

শাসন ও সাফল্য

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগে অভিনেত্রী তিনকড়ি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে-যুগে একাধিক নাটকের দুরূহ চরিত্রে তিনি রূপদান করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। যেমন গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে জনার চরিত্র-চিত্রণে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। যার ফলে, পরবর্তীকালে তারাসুন্দরীর মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীও জনার ভূমিকায় অভিনয় করতে ইতস্তত করেছিলেন।

তিনকড়ি ছিলেন অশিক্ষিতা নারী। কিন্তু নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে, পরবর্তীকালে তিনি 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডী ম্যাকবেথের মত কঠিন ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করেছিলেন। এ ছাড়া 'আবুহোসেন' নাটকে দাই, 'কেরামতী বাঈ' নাটকে নামভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেন।

তিনকড়ির অভিনয়ের ওপর সে-যুগের দর্শকদের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

অত্যন্ত এক কুৎসিত পল্লীর মাঝে জন্ম নিয়েছিলেন তিনকড়ি। আর যে পল্লীর পরিবেশটা ছিল ততোধিক জঘন্য। বার বছরের কিশোরী। নাচে, গান গায়। চেহারাটিও সুশ্রী। যেন গোবরে পদ্মফুল। মেয়ের দিকে চেয়ে, তিনকড়ির মা মনে মনে

আশা-আকাঙ্ক্ষার জাল বোনেন। আর ক'টা বছর। তারপরেই ত' মেয়ে সাবালক হয়ে উঠবে। মায়ের দুঃখ ঘুচবে।

মায়ের সঙ্গে মেয়ে গিয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'রাবণ বধ' নাটকের অভিনয় দেখতে। ঐটুকু মেয়ে নাটকের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছে। প্রলুব্ধ হয়েছে, নাট্যশালার সংস্পর্শে আসার জন্যে। মায়ের আঁচল ধরে, বায়না ধরেছে—আমায় থিয়েটারে ভর্তি করে দাও না মা। আমি ওদের মত নাচবো, গাইবো।

মেয়ের বায়না শুনে মা ভাবে, তা মন্দ কি। থিয়েটারে ভর্তি করতে পারলে, দু-পয়সা ঘরেও আসবে আর সেই সঙ্গে নাচ-গানটাও ভালভাবে শিখতে পারবে।

মেয়েকে থিয়েটারে ভর্তি করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনকড়ির মা। বেশ ক'বছর কেটে গেল। মায়ের চেষ্টা বিফল হোল। শেষে ১৮৮৭ সালে স্টার থিয়েটারে 'বুদ্ধসনাতন' নাটকে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ এলো তিনকড়ির জীবনে। প্রথম রাত্রের অভিনয়ের পর পারিশ্রমিক বাবদ একটি টাকা জুটলো তিনকড়ির ভাগ্যে। টাকা ত' নয়—ওটা মোহর। তার জীবনের প্রথম উপার্জিত অর্থ। টাকাটি বার বার কপালে ঠেকিয়ে সযতনে তুলে রাখেন তিনকড়ি। শোনা যায়—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই টাকাটি নাকি তাঁর বাক্সে তোলা ছিল।

এর কিছুকাল পরে তিনকড়ি বীণা থিয়েটারে যোগদান করেন। মাইনে মাসিক কুড়ি টাকা। টাকার অঙ্কটা যাই হোক না কেন, অভিনয়ের সুযোগ এলো তিনকড়ির জীবনে। 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেলেন।

কিশোরী তিনকড়ি এখন ভরা-যৌবনা। বীণা থিয়েটারের 'মীরাবাঈ' নাটকের অভিনয়ে তিনকড়ি মুগ্ধ করেছেন দর্শকসমাজকে। সঙ্গীতে স্বপ্নজাল রচনা করেছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখেও আশার আলো দেখা দিয়েছে।

মায়ের চোখে যে আশার আলো ছিল এতদিন সুদূরে —একদিন শুভসন্ধ্যায় তা নিকটবর্তী হোল। তিনকড়িদের ঘরে এলো দুটি অবস্থাপন্ন সুদর্শন যুবক। তাদের মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা জানান তিনকড়ির মা।

—আপনার মেয়ের অভিনয় দেখে আমরা মুগ্ধ। তাই, এলাম তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে।

—বেশ, বেশ। বসুন। তিনকড়ি থিয়েটারে গেছে। রিহার্সাল দিতে।

—কখন আসবে?

—আসার ত' কিছু ঠিক নেই। তবে রিহার্সাল থাকলে আসতে একটু রাতই হয়।

—থিয়েটারের খাটুনী ত' কম নয়।

—খাটুনী আছে বৈকি। কিন্তু উপায় কি? রোজগার ত' করতেই হবে।

—তা ত' বটেই। শুনেছি, থিয়েটারের মাইনে ত' বেশি নয়।

—না, না। মেয়ের সখ তাই থিয়েটারে দেওয়া।

—থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়ে দিন, আমরা প্রতি মাসে দুশো টাকা করে দেব।

যুবকদের প্রস্তাব শুনে, তিনকড়ির মায়ের চোখমুখ খুশিতে ভরে যায়। এই ত' চেয়েছিল তিনকড়ির মা। কোথায় মাস মাইনে মাত্র কুড়ি টাকা। আর কোথায় দুশো টাকা। তিনকড়ির মায়ের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই, যুবকদের মধ্যে একজন সর্ত আরোপ করে বসে:

—আপনার মেয়েকে কিন্তু থিয়েটার ছাড়তে হবে।

—নিশ্চয়ই ছাড়বে। তোমরা মাস গেলে এতগুলো করে যখন টাকা দেবে—

মায়ের সম্মতি পেয়ে সেদিনের মত যুবকদ্বয় চলে যায়। আর সেই সঙ্গে জানায়—পরের দিন সন্ধ্যায় তারা আবার আসবে।

তিনকড়ি থিয়েটারের রিহার্সাল থেকে ফিরে এসে, মায়ের মুখ থেকে সব কথা শুনলেন। সমস্ত দেহমন ঘৃণায় আর বিরক্তিতে ভরে উঠলো। মাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তিনকড়ি—থিয়েটার ছেড়ে দুশো টাকার বিনিময়ে মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারবেন না তিনি।

মায়ের মাথায় দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। বচসা চলে। পরের দিন সন্ধ্যায় যাতে তিনকড়ি থিয়েটারে যেতে না পারে তার জন্যে, বাড়ির আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে তিনকড়ির মা। পরের দিন শুধু তিনকড়ির মা-ই নয়—সেই সঙ্গে বাড়ির মেয়েরাও চোখে চোখে রাখে তিনকড়িকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, আর সেই সঙ্গে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনকড়ি যথারীতি থিয়েটারে পালিয়ে যান।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনকড়ির ঘরে এসে হাজির হলেন আগের দিনের বাবু দুটি। কিন্তু তিনকড়িকে না পেয়ে তিনকড়ির মাকে বেশ গোটাকতক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে চলে গেল তারা।

মেয়ের জন্যে না-হোক কতকগুলো কথা শোনবার মেয়ে তিনকড়ির মা নন। থিয়েটার থেকে মেয়ে ফিরে এলে, শুধু যে গালাগালি দিয়েই নিরস্ত হয়েছিল তিনকড়ির মা, তা নয়—সেই সঙ্গে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিল মেয়ের অঙ্গে। যার ফলে, গায়ের ব্যথায় ও প্রবল জ্বরে, বেহুঁস অবস্থায় ক'দিন কাটাতে হয়েছিল তিনকড়িকে।

সেদিন যদি মায়ের শাসন-বারণকে উপেক্ষা করতে না পারতেন তিনকড়ি—তাহলে হয়ত ঐ দিনই তাঁর জীবনে নেমে আসতো, শিল্পি-জীবনের যবনিকা।

পাঠক মন

'সাপ্তাহিক বসুমতী' সাহিত্য-পত্রিকার 'পাঠক মন' বিভাগ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নিঃসন্দেহে এই বিভাগ পত্রিকাটির সাথে পাঠকের মানসিক আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর করেছে। সেই সাথে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র কর্তৃপক্ষও পাঠকের ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পত্রিকার উন্নত মান ও সেই সাথে জনপ্রিয়তা বরাবরের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পাঠকের অভিমতকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য। বসুমতীর কর্তৃপক্ষ যে এ বিষয়ে সম্যকভাবে সচেতন, 'পাঠক মন' বিভাগের সংযোজনই সে কথা কুণ্ঠাহীনভাবে সপ্রমাণ করে।

আমি গত কয়েক মাস ধরে নিয়মিতভাবে ও যত্নসহকারে পাঠকদের সুচিন্তিত অভিমতগুলি পাঠ করেছি। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র বিচার করলেও এবং কিছু কিছু নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করলেও এ বিষয়ে সবাই ঐকমত প্রকাশ করেছেন যে, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বাংলার সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে এক অনবদ্য সৃষ্টি। পাঠকের মনে এই পত্রিকার আবেদন অপরিসীম ও অভূতপূর্ব।

সত্যিই তাই। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আকর্ষণ সার্বজনীন। আর পাঁচটা সাহিত্য-পত্রিকার মত 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র জনপ্রিয়তা সাহিত্য-রসিকদের স্বল্প-পরিসর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বস্তুত এই পত্রিকা সম্পূর্ণ বিপরীত রুচির লোককেও সমান আনন্দ দিয়ে থাকে।

তার কারণ, এটা মুখ্যত সাহিত্য-পত্রিকা হলেও মূলত বিশেষ ধরণের সাহিত্যাশ্রয়ী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। তাই এতে জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের কোন বিভাগের সংবাদ পরিবেশনেই বিন্দুমাত্র তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চিহ্ন নেই।

আমি কয়েকজন পাঠক-পাঠিকার পছন্দের কারণ যাচাই করে দেখেছি। তাদের রুচি ও বয়সের বিভিন্নতা তাদের পছন্দেও রকমফের এনে দিয়েছে।

আমার পরিচিত একজন বয়োবৃদ্ধ সুপণ্ডিত ভদ্রলোক 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র উৎসাহী পাঠক। তাঁর মতে—দৈনিক খবরের কাগজের পাতায় ভারত ও বহির্বিশ্বের যে রাজনৈতিক খবর পাওয়া যায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি, নাগাল পাওয়া ভার, মনে ধরে রাখাও শক্ত। কিন্তু 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র খবর সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমন্বিত। তাই এগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারলে ভারত তথা সাম্প্রতিক বিশ্বরাজনীতির কলকাঠি জানা হয়ে যায় এক লহমায়।

আমার পরিচিতা অপর একটি স্বল্পশিক্ষিতা প্রাচীনা মহিলার বসুমতীর উপর আকর্ষণের কারণ এর সুনির্বাচিত সুখপাঠ্য উপন্যাসগুলি ও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হাল্কা ধরণের রস-রচনাগুলি।

আবার সবে গোঁফ উঠতে আরম্ভ করেছে এমনি একটি ছেলের কাছে এই পত্রিকার আকর্ষণ রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের গল্পগুলো।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই পত্রিকার এই ধরণের সার্বজনীন জনপ্রিয়তা এর গৌরবময় ভূমিকার ভিত্তিস্বরূপ।

তবু এই পত্রিকা সমালোচনার উর্দ্ধে নয়, মুদ্রণের ত্রুটি ও অপরিচ্ছন্নতা পাঠক-মনকে পীড়া দেয়। রঙজগতের ছবিগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন নয়। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র কর্তৃপক্ষমণ্ডলী এই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূরীকরণে সচেষ্ট হলে ভাল হয়।

কেউ কেউ এই পত্রিকার পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি বা কাগজের মান উন্নয়নের প্রস্তাব স্থাপন করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাহলে এই পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। ফলে এই পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মূল্যের সুলভতা আর বজায় থাকতে পারবে না। পরিণামে বাধ্য হয়ে কিছু সংখ্যক দরিদ্র পাঠককে এই পত্রিকা সংগ্রহে বিরত হতে হবে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল জনপ্রিয়তার পক্ষে এ হবে মারাত্মক রকমের আঘাত। তাই এ প্রস্তাবগুলোর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া বোধ হয় বাঞ্ছনীয় হবে না। তবে মূল্য অপরিবর্তিত রেখে যতটা মান উন্নয়ন সম্ভব ততটা করলে বাধিত ও কৃতজ্ঞ থাকব।

অরুণ ভট্টাচার্য, এম-এ (ডবল)
'প্রান্তিক'
স্বামী বিবেকানন্দ রোড
বিরাটি, কলকাতা-৫১

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পাঠক হিসেবে স্বীয় মতামত পরিস্ফুট করতে চাই।

'সম্পাদকীয়', 'আজকের মানুষ', 'ভারতদর্শন', 'আন্তর্জাতিক' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি বিভাগগুলি পড়তে ভালো লাগে। হরপ্রসাদ মিত্র রচিত 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' ধারাবাহিক প্রবন্ধটিও পড়তে ভালো লাগে।

কিন্তু অন্য পাঠকদের মতো আমিও বলব মুদ্রণ আরও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

প্রবীরগোপাল মুখোপাধ্যায়
২৪, লোকনাথ চ্যাটার্জী লেন
শিবপুর, হাওড়া

খেলা ধুলা

নানা মুনি—নানা মত

সর্বভারতীয় ক্রীড়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন পরিচালন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। ভারতীয় ক্রীড়াজগতে আজ নানা মুনির সমাবেশ ; তাঁদের মতামতও পরস্পরবিরোধী। এঁরা বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তার পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। এই সমস্ত ক্রীড়াসংস্থাগুলি আবার সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার জন্য জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁদের মতামত এবং কার্যকলাপ হল তাঁদের স্বার্থপরতার ঘৃণ্য প্রতিফলন। দেশের এবং দশের খেলাধুলার উন্নতির জন্য যে সময়টা তাঁদের আত্মনিয়োগ করা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেই সময়টা তাঁরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত থাকেন। বিভিন্ন সংস্থার কার্যকলাপও বিভিন্ন ধরণের। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের কার্য শুধু ভারতীয় শিক্ষা-দপ্তরকে কোন খেলার খাতে কত ব্যয় করা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে মন্ত্রণা দেওয়া। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল বরাদ্দ টাকার কি ভাবে সদ্ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়েই মাথা ঘামায়। আর ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত পাতিয়ালার ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিলে শিক্ষাদানের নামে চলছে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের পূর্বেই ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় ; বিশ্বের দরবারে ভারতীয় এ্যাথলেটরা যাতে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য নেই। এখন প্রয়োজন, এই সমস্ত ছোট ছোট সংস্থার এককেন্দ্রীকরণ। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করতে হবে, যার চিন্তাধারা হবে—কিরূপে ভারতীয় ক্রীড়ায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভব। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা নির্দেশিত এবং অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থার আসল উদ্দেশ্যকে কার্যে রূপ দেবে।

একটি শোচনীয় পরাজয়

ময়দানী ফুটবল আসরে এই মরশুমের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হল—ইষ্টবেঙ্গলের কাছে গতবারের শীল্ডবিজয়ী বি এন রেল-দলের আকস্মিক শোচনীয় পরাজয়। বি এন রেলের এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী তাদের গোলরক্ষক এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষও বটে। নিয়মিত গোলরক্ষক দীপক দাস আহত হবার পর বি এন রেল খুবই সমস্যার সম্মুখীন হয়। খুবই আশ্চর্যের কথা যে, এতবড় একটি দলে দ্বিতীয় একটি নির্ভরযোগ্য গোলরক্ষক নেই। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে তাদের অদূরদর্শিতা এবং এই মারাত্মক ত্রুটির মাশুল দিতে হল, ঠিক পূর্বের খেলাটিতে কালীঘাটের কাছে রেল দল একটি মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়েছে। ফলে লীগের দৌড়ে বি এন রেল ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে।

ইষ্টবেঙ্গল—বি এন রেলের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় প্রবীণ গোলরক্ষক এস ঘোষ, যাঁর নাম এখন অবসরপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত, তাঁকে গোলরক্ষকের গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেখে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার হয় এবং তখনই অনেকে রেল দলের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। গোলরক্ষকের একটি দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ ফিস্টের ফলে রেল দলের সম্মুখে জটলার সৃষ্টি এবং অরুণ ঘোষের হাণ্ডবলের জন্য একটি পেনাল্টি। পেনাল্টি থেকে মৌলিক দলের প্রথম গোল করলেন। এরপর পি, দে'র একটি অপূর্ব হেড থেকে দ্বিতীয় গোল—যা প্রতিহত করা ছিল দুঃসাধ্য। কিছু পরে মৌলিকের একটি জোরালো মাটিঘেঁষা সট থেকে তৃতীয় গোল। এই সটটি প্রতিরোধ করা একজন প্রথম ডিভিশন গোলরক্ষকের উচিত ছিল। গোলদাতাদের তালিকায় ১৪ টি গোল করে অসীম মৌলিক শীর্ষে অবস্থান করছেন। সুযোগসন্ধানী সেণ্টার ফরোয়ার্ড মৌলিকের খেলা উচ্চাঙ্গের না হলেও মোটামুটি ভালই হচ্ছে বলা চলে। রক্ষণভাগে প্রশান্ত সিনহা, সুশীল সিনহা, চন্দন ব্যানার্জী, মুস্তাক এবং আক্রমণভাগে শম্ভু দাসচৌধুরী এবং পি দে'র অনবদ্য ক্রীড়াধারা প্রশংসার দাবী রাখে। ইতিমধ্যে ইষ্টবেঙ্গল রাজস্থানকে ২-১ গোলে এবং হাওড়া ইউনিয়নকে ৪-০ গোলে পরাজিত করেছে।

মহামেডানের সঙ্গে চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগান একটি মূল্যবান পয়েন্ট অপচয় করেছে। মহামেডানের তরুণ গোলরক্ষক মুস্তাফা এইদিন ছিলেন দুর্ভেদ্য। মোহনবাগানের পুরোভাগের আক্রমণধারার ঢেউ একাই বীরের মত তিনি প্রতিহত করেন। এইদিন খেলায় মোহনবাগান প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বটে ; কিন্তু মহামেডানও কয়েকবার পাল্টা আক্রমণ চালায়। মোহনবাগানের পুরো-ভাগে অকময় এবং অশোক চ্যাটার্জীর খেলা উল্লেখযোগ্য হয়, কিন্তু অধিনায়ক চুনী এবং অমল চক্রবর্তী এইদিন আশানুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হন নি। মোহনবাগান পরবর্তী খেলায় পোর্ট দলকে মাত্র এক গোলে পরাজিত করে। মোহনবাগান দল শোচনীয় ব্যর্থতা করে বালি প্রতিভা দলের সঙ্গে খেলায়। বালি দল প্রথমে গোল দিয়ে মোহনবাগানের অপরাজিত আখ্যা প্রায় ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছিল। কোনক্রমে একটি গোল পরিশোধ করে মোহনবাগান পরাজয় এড়িয়েছে। অজস্র সুযোগের অপচয়ের ফলে মোহনবাগানের এই দুরবস্থা। এখন লীগে দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গলের সমানসংখ্যক পয়েন্ট, ফলে লীগের আকর্ষণ এখন খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সব ভাল—যার শেষ ভাল।

● মোহনবাগান-মহামেডান দলের খেলার একটি উত্তেজনাময় মুহূর্ত

ডেভিস কাপ সমাচার

উইম্বলডেন পর্ব শেষ হল, এখন টেনিস জগতের সমস্ত আকর্ষণ ডেভিস কাপের খেলায় কেন্দ্রীভূত। গতবারে অষ্ট্রেলিয়ার একচ্ছত্র প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করে আমেরিকা ডেভিস কাপ জয় করেছে। এবার তাই অষ্ট্রেলিয়াকে ডেভিস কাপের খেলার জন্য মণ্টি্লে যেতে হল, কানাডার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। অষ্ট্রেলিয়া দলে এবারের উইম্বলডেন বিজয়ী এমাসন এবং ষ্টোলে; ডুবল কানাডাকে তাই অষ্ট্রেলিয়া অনায়াসে ৫—০ খেলায় পরাজিত করেছে। এখন অষ্ট্রেলিয়া মিলিত হবে শক্তিশালী মেক্সিকোর সঙ্গে। মেক্সিকো ৩—১ খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে। মেক্সিকো এবং নিউজিল্যাণ্ডের খেলায় একটি সিঙ্গলস খেলা অসমাপ্ত থাকে।

ফ্রান্স ইউরোপ জোনের সেমি-ফাইন্যালে বৃটেন দলকে পরাজিত করে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার করে। খেলার প্রথম দিন বৃটেন ২—১ খেলায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু শেষ দিনের দুটি সিঙ্গলসে ফ্রান্স জয়লাভ করে শেষ পর্যন্ত ৩—২ খেলায় বিজয়ী হয়। ফ্রান্সের সেরা খেলোয়াড় পিয়ের দারমো সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী। ইউরোপ জোনের অপর একটি সেমি-ফাইন্যালে ৩—২ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে সুইডেন ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। ফাইন্যালে ফ্রান্স সুইডেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এশিয়ান জোনে ভারত পূর্বেই ফিলিপাইনের কাছে পরাজিত হয়ে ডেভিস কাপ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতীয় এ্যাথলেটদের বিদেশ যাত্রা

টোকিওর অলিম্পিক গেমসের পূর্বে নিজেদের শক্তি পরীক্ষার জন্য ভারতীয় এ্যাথলেট দল পশ্চিম জার্মানীতে উপনীত হয়েছে। ভারতীয় দলের বারোজন এ্যাথলেটের মধ্যে দু'জন মহিলা এ্যাথলেটও আছেন। এ্যাথলেটিক্সে পশ্চিম জার্মানীর বেশ নাম আছে। এদের এ্যাথলেটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভারতীয় দলের কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে একথা স্বীকার করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টোকিওর আসরে ভারত এত নিম্ন মান নিয়ে যে, কোন স্থানই পাবে না একথা স্থির নিশ্চিত। অলিম্পিকে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় মানের কাছাকাছিই প্রায় এ্যাথলেটরা পৌছাতে পারেন নি, তাই এই ধরণের খেলোয়াড়দের অলিম্পিকে পাঠান কিছু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্স কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Thursday, 30th July, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C. 71
Price : 25 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73

বসুমতী

ব্রহ্মদেশ থেকে জীবিকা-চ্যুত ভারতীয়দের জাহাজযোগে ভারত-যাত্রার একটি দৃশ্য।

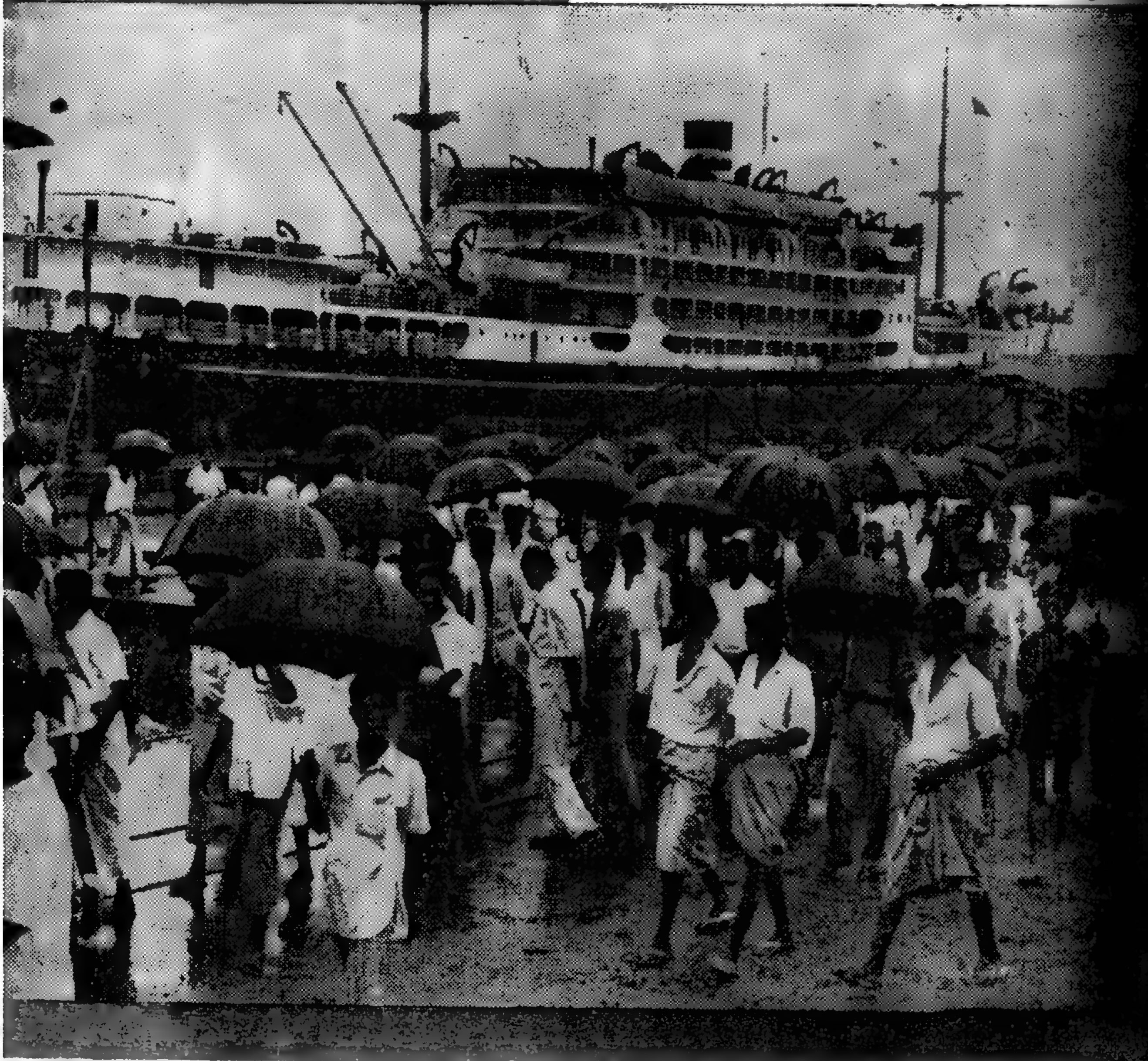

বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 6th August, 1964 • Vol. 69, No. 11

সূচীপত্র

756.3
003/3
V.69
no.11

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৬৪৩
আজকের মানুষ	...	৬৪৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৬৪৫
ভারতদর্শন	...	৬৪৯
আন্তর্জাতিক	...	৬৫৫
ওয়াশিংটনের চিঠি	বিজন চট্টোপাধ্যায়	৬৬০
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৬৬৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৬৬৫
আদিম অন্ধকার ঃ হিরন্ময় সকাল (কবিতা)	সুধীর চৌধুরী	৬৬৬
বঙ্গদর্শন	...	৬৬৭
কবিগুরুর খেয়া	প্রীতিনিধান রায়	৬৭১
দুপুরের ছায়া (গল্প)	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৬৭৩

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৬৭৬
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৬৮১
ভালবাসা (অনুবাদ—গল্প)	কল্পতরু সেনগুপ্ত	৬৮৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৬৮৮
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৯১
জীবন যেটুকু বাকী (কবিতা)	অতুলরঞ্জন দেব	৬৯৪
খেলা ঘর (কবিতা)	মণিভূষণ ভট্টাচার্য	৬৯৪
রঙ্গজগৎ	...	৬৯৫
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৬৯৯
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৭০০
পাঠকমন	...	৭০২
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৭০৩

প্রচ্ছদ পরিচয় : ৬৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

খ্যাতনামা কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপত্নী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩১ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২১শে শ্রাবণ ১৩৭১ | Thursday, 6th August 1964

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীনন্দ আমাদের বিশ্বাস রক্ষা করুন

কথায় আছে: 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী আপন সদিচ্ছার গুণে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তাতে মনে হয় সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীদের কাছে মাথা নত করার মতো কোন অবস্থা যদি না ঘটে, তাহলে দেশের মানুষ নগদ পয়সা দিয়েও দু'মুঠো খেতে পাবেন। যেদিন থেকে খাদ্যশস্যের অনটনের কথা শোনা গেছে, সেদিন থেকেই আমরা জানিয়েছি যে, এই অনটন নামমাত্র। কেন না, সরকারী হিসেবের সঙ্গে যখন এর কোনো মিল নেই, তখন অশুভ হস্তের কারসাজিতেই খাদ্যশস্যের অনটন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কারণে সরকারের কাছে আমাদের আবেদন ছিল, দেশের জরুরী অবস্থায় কঠোরতম আইনের সাহায্যে দুষ্কৃতকারীদের সায়েস্তা করা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমরা সকাতরে এই আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু এমনি ব্যাপার যে, তিনি ব্যবসায়ীদের বারবার আহ্বান জানিয়ে কাকুতি-মিনতি করলেও তারা তাঁকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাবতীয় খাদ্যশস্য দিনের পর দিন গুদামজাত করেছে; তারপর সেই খাদ্যশস্য অতি উচ্চমূল্যে বিক্রি করে আসছে। ন্যায্যদরের দোকান থেকে সময়মতো চাল, গম, তেল না-পাওয়ায় নিরুপায় মানুষকে প্রাণরক্ষার তাগিদেই উচ্চমূল্যে জিনিষ কিনতে হচ্ছে। আমাদের কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় নেতা অবশ্য বলেছেন যে, অন্তত তিনদিন কিছু না কিনলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবু আজো এমন অসহায় অবস্থা যে, উচ্চমূল্যে ক্রয়-ক্ষমতায় অসমর্থ অনেককে দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে থাকতে হচ্ছে—তবু সরকার কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারেন নি। জনস্বার্থে আইন প্রয়োগের শক্তি হাতে রেখেও তাকে কাজে লাগানোর মতো দুঃসাহস দেখাতে পারেন নি। শেষ-পর্যন্ত কি ঘটে, তা দেখার জন্যে আমরা বর্তমানে গভীর ঔৎসুক্য বোধ করছি।

শ্রীনন্দের নির্দেশে ভারতরক্ষা আইনের সাহায্যে দিল্লীতে ও অন্যান্য রাজ্যের অনেক বে-আইনী মজুতশস্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে সেই আইন কিভাবে প্রযুক্ত হয়, তা-ও দর্শনীয়। সাধারণ মানুষ আজ ধৈর্যচ্যুত। শ্রীনন্দ এই সময়ে আরো সচেষ্ট এবং ক্ষমার অযোগ্য মজুতদারদের প্রতি কঠোর হলে সমস্যার সমাধান হবেই। তাঁর অবলম্বিত ব্যবস্থা থেকেই এ বিশ্বাস আমাদের জন্মেছে। তিনি এই বিশ্বাস রক্ষা করুন।

সম্পাদকীয়

আজকের——
——মানুষ

এক চিলের দুই পা। চার চিলের (চাচিলের) কয় পা? —দুই পা। খুব সোজা উত্তর। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচিলের দুই পা। ছোটবেলা থেকেই এই ধাঁধার প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। কিন্তু আজ বড় হয়ে ভাবতে অবাক লাগে: সত্যি ত' মাত্র দুটো পা নিয়েই তিনি পৃথিবীর এত উত্তেজনাময় বহু-বিস্তৃত ইতিহাসের যাত্রাপথ অতিক্রম করে এসেছেন। সব মানুষেরই ত' দুটো করে পা। কিন্তু তবু তাঁরা 'চাচিল' হন নি। চাচিলের দু'পায়ের জোর আর সকলের থেকেই আলাদা। তাই এই দু'পায়ের ওপর তাঁর নব্বুই বছরের শরীরটা যখন সেদিন বেসামাল হ'য়ে পড়ল, সবাই অবাক হয়ে ভেবেছেন তাহলে চাচিলও বৃদ্ধ হয়েছেন। অবসাদের দরুণ তাঁকেও বিদায় নিতে হল কমন্সসভা থেকে।

বিশ্ব ইতিহাসে 'চাচিল' এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কিংবা নিজেই এক স্মরণীয় ইতিহাস, তাই বৃটেনের অনেক প্রধানমন্ত্রীর মধ্যেও স্যার উইনস্টন স্পেনসার চাচিলের নামটাই জনপ্রবাদের মত মনে পড়ে সব চেয়ে আগে। বিচক্ষণ কূটনৈতিক চাচিলের বিশেষ লক্ষণীয় তাঁর অফুরান কর্মশক্তি আর দূরদর্শী নেতার চরিত্রবিকাশ। তাঁর বাবা র‍্যাণ্ডল্ফের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন এই স্বভাবের প্রেরণা। মালবোরোর উত্তরাধিকার হিসেবেও বুঝি তাঁর মধ্যে এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল।

চাচিল বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েছেন আজ থেকে ৬৪ বছর আগে। তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই আজ আর পৃথিবীতে নেই। চিরতরে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই বিখ্যাত ত্রয়ীর (স্তালিন-রুজভেল্ট-চাচিল) দু'জন। তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে ভিড় করে আসে অসংখ্য ঘটনা অগুণতি চরিত্রের মিছিল। মনে পড়ে—ডানকার্কের শোচনীয় পশ্চাদপসরণের পর '৪১—'৪২ সালের বৃটেনের যুদ্ধকালের কথা। তখন বৃটেন বলতে বোঝাত প্রধানমন্ত্রী চাচিলকেই। একটি নামেই সারা দেশের পরিচয়। একটি ব্যক্তিত্বের অমোঘ নির্দেশে সারা দেশের মানুষের জীবন-পণ জাগরণ, আর একটি সংকল্পের সঙ্গেই সংযোজিত হ'য়ে সারা বৃটেনের সংকটসমুদ্র উত্তরণ। একি রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর নয়?

সেদিনের কাণ্ডারী চাচিল তাই আজও ইংলণ্ডের শ্রদ্ধার মানুষ। তাঁর রণকৌশল, কূটনৈতিক বিচারবুদ্ধি আজও আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকায় যে মানুষ সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য, শান্তির আবহাওয়ায় তাকেই সব চেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়। তাই যুদ্ধনায়ক চাচিল আপামর জনসাধারণের নির্বাক কৃতজ্ঞতা পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু শান্তিযুগের নেতৃত্ব নির্বাচনে জনতার সমর্থন পান নি। গণতান্ত্রিক বৃটেন সেদিন নির্ভুলভাবেই তাঁর জঙ্গীবাদী মনোভাব আর রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার মধ্যে অশুভ পরিণতির সংকেত শুনেছিল। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেনে গণতান্ত্রিক সরকারের এই আত্মরক্ষার সঙ্গেই সেদিন মেঘমুক্ত হয়েছিল ভারতের ভাগ্যাকাশ। কেন না, চাচিলই ছিলেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সব চেয়ে বড় শত্রু। ভারতের স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদী চাচিলকে বস্তুত মর্মাহত করেছে।

বুদ্ধিমান পুরুষের মতই তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিভাবানকে সহ্য করতেন না। পরাজয়, মৃত্যু আর অসম্ভাব্যকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। রাজনীতি ছাড়াও পূর্ণোদ্যমে সৈনিকের শিক্ষা নিয়েছেন। ঝড়ের বেগে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কর্মক্ষমতা আর বহুমুখী জ্ঞান সম্বন্ধে কারও সংশয় নেই। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিষনজরে দেখলেও স্তালিনের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করে-ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট তাঁকে অপছন্দ করলেও নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন ধুরন্ধর চাচিল। অংশত রক্ষণশীল মেজাজের এণ্টনি ইডেনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করাও তাঁর এক অদ্ভুত চাল। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে নানাভাবে ব্যস্ত করে রেখেছিলেন। এই

উইনস্টন চাচিল

দু'পায়ে ভর দিয়েই পার হয়েছেন বহু প্রশংসাকীর্ণ পথ—মাড়িয়ে এসেছেন অনেক নিন্দার নুড়ি। আজ সেই দামাল মানুষ ঘরে ফিরে এসেছেন। এতদিন জীবনের সায়াহ্নকে দোর গোড়ায় দাঁড়াতে বলে পরিক্রমায় মত্ত ছিলেন। আজ তাকেই খিড়কি দুয়ার দিয়ে ঘরের ভেতরে ডাকলেন স্যার চাচিল, আর লক্ষ্য করলেন—তাঁর জীবন-নাট্যশালার সদর দরজার ঝাঁপ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

হুইটম্যানের 'ভারত-পথিক' কবিতার এইসব ছত্রের সঙ্গে আমার নিজের দেশের কবি অমিয় চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে। অমিয়বাবুর 'শিল্প-দৃষ্টি' প্রবন্ধটি তাঁর 'সাম্প্রতিক' বইখানির প্রথম প্রবন্ধ। তাতে তিনি মহাভারতের উক্তি স্মরণ করেছেন—'যে নিজে বেঁচে থাকতে চায় সে কেমন করে অন্যকে আঘাত বা হত্যা করে? নিজের জন্যে যা ইচ্ছা কর অন্যের জন্যেও তা-ই ইচ্ছা কোরো।'

বলেছেন—'দুঃখের বিষয় সমাজে মানবধর্মের পতন ঘটে, এবং সেই দুষ্টতারও যথাযথ রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কবির। তাছাড়া আদি রচনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত অংশের উগ্র সমর্থকেরও অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও অর্জুনের চোখে দেখা শিল্পীর আদর্শ রয়েই গেল।'

'বৃহত্তর অস্মিতা' কথাটি তাঁরই। শিল্পী নিজের দেশে, কালে, সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থেকেও দেশ-দেশান্তরের সঙ্গ পেয়ে থাকেন। মনে পড়ে তাঁর 'পালা-বদল'-এর 'সঙ্গ' কবিতার ক'টি ছত্র—

'সমবায় নেই, যেই
ঝোড়ো অরণ্যের মর্মে চলে
শিল্পের তন্ময়ী গুরু বেঠোভেন
শব্দধ্যানে একা
তর্জমা করেন সৃষ্টি
মগজের সংগীতের ঝড়ে
অসম সুষম এক প্রকাণ্ড
একক সিম্ফনিতে;
সেখানে বহুর পার,
জর্মানীর ঐশ্বর্য সংস্কৃতি
ভুলে যাওয়া ব্যাকরণ,
ধ্বনির অগম তলে—'

শেক্সপীয়রের 'কোরায়লনাস' থেকে তাঁর ঐ 'শিল্পদৃষ্টি' প্রবন্ধে কয়েক ছত্র তুলে দেখিয়েছেন তিনি। বলেছেন—'শেক্সপীয়র বা মিলটন যেখানে জাতি ধর্ম মতবৈরিতা বর্ণ সম্প্রদায় সকলের ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পীর দৃষ্টি পেয়েছেন সেখানে বৃহত্তর অস্মিতার আলো এসে পড়েছে তাঁদের শিখরকাব্যে। সেইখানেই তাঁদের কবি-দৃষ্টির স্বাভাবিকতা।'

ভর্তৃহরির শৃঙ্গার আর বৈরাগ্য ধ্বনিময় কবিতার কথা থেকে শিল্পীর গভীরতর দৃষ্টির প্রসঙ্গে এসে পৌঁছোনো গেল।

এইসব অনুভূতির সুতো ধরতে-ধরতে আমার কলম এগিয়ে চলছে। এসব একজনেরই মনের কথা বটে, কিন্তু পাঠকের কাছেই নিবেদন এসব। তাঁরা আমার এই স্বল্প-ভ্রমণের আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে আমার উদ্দেশ্যটা ধরতে পারবেন তো? আমি কোনো শেষ ইস্টিশানে নজর রেখে পথে পা বাড়াইনি। আমি যেতে যেতে অনেকের সঙ্গ পাই। ভাবি বিদেশের নানা সাহিত্যের কথা, ভাবি আমার আপন দেশের, আপন কালের কথা।

তাই মনে পড়ে অমিয়বাবুর আরো কথা। তিনি বলেছেন—'সাহিত্যিকদের নূতন প্রেরণার জন্যে ফিরে যেতে হবে সহজ দৃষ্টির কাছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্পে 'স্বপ্ন' বলে রচনাটিতে আছে সেই সৃষ্টির সুর; তাঁর রচনায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে দেখাবু চরম শিল্প। দেখব মানুষকে, স্বদেশের স্বদলের বিশেষ ধর্ম বা মতাবলম্বী মানুষকে নয়। শিল্পীর চক্ষু হারালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আরো দূরে সরে যাবে।'

তাঁর এইসব কথা সকালের প্রথম ঠাণ্ডা বাতাসের মতন আমার চেতনায় সুস্থ হবার প্রত্যয় দিয়ে যায়। আজ তাঁর সেই বিশ্বাসই পুনর্বার মনে মনে পাঠ করি—'শিল্পীর গতি সর্বত্র, হাটবাজারে তার বিহার, রাজদ্বারে শ্মশানে চ; অথচ তার মন একাকী দর্শক। তাকে আজ চাই পুনর্বসতির ক্ষেত্রে, আর্তের হাসপাতালে; মন্দিরে গুরুদ্বারায় মসজিদে। সংসারের মানুষকে সে চিনবে রাষ্ট্রসীমানার দুই পারে এবং তাকে নিয়ে রচবে মহাকাব্য।'

গদ্যের প্রবাহে এই 'রচবে' ক্রিয়াপদটি হঠাৎ একটু ধাক্কা দিয়ে যায় তো যাক্। আমি সে-সব কথা ভাবছি না আজ। হুইটম্যানের কবিতার যে অনুবাদটি একটু আগে আমার মনে এসেছিল, তারই পাশাপাশি মনে পড়ছে কবি-অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর লেখা 'যুগসংকটের কবি ইকবাল'-এর অন্তর্ভুক্ত ইকবালের ক'টি ছত্রের এই বঙ্গানুবাদ—

সবাইকে দেখাব তোমাতে বিশ্বাস কাকে
বলে হে হিন্দোস্তান,
নিবৃত্ত হব না যতদিন জীবনের
ত্যাগ পূর্ণ হয় নি তোমার কাছে।
আমার এই একমুঠো প্রাণধূলি করব বপন,
অঙ্কুরিত বেরোবে তাতে নূতন হৃদয়,
প্রাণে ভরা, জাগবে কুঁড়ি হয়ে।
ধর্মান্ধতা বাসা বেঁধেছে আমার এই
দেশের মাটিতে,
আমি সেই ঝড়
যাতে ভাঙবে ধূলোয় সেই ইমারত।

ইকবালের সঙ্গে অমিয়বাবুর প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৭-এ। পাঞ্জাবের কবি ভাই বীর সিং-সম্বন্ধেও অমিয়বাবুর একটি প্রবন্ধ আছে তাঁর এই 'সাম্প্রতিক' বইখানিতে। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সমকালীন এইসব কবির কথা কতোটুকুই বা চর্চা করি।

অমিয়বাবু লিখেছেন—'ভাই বীর সিং যদি আণ্ডেস পর্বতের ওপারে থাকতেন তাহলেও বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁর দুরধিগম্যতা বাড়ত না ; গুরুমুখী হরফের আড়ালে তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিবেশী। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো দূরত্ব আধুনিক নানা-প্রদেশীয় প্রকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের নিরুৎসুক মন।'

তিরিশের দশকের শেষে,—চল্লিশের মধ্যেও এই নিরুৎসুক ভাব আমাদের মধ্যে টিকেছিল ; স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত,—এই প্রায় দু-দশকের মধ্যেও সে মানসিক দৈন্য কি দূর হয়েছে? অমিয়বাবু তাঁর 'ভাই বীর সিং' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলেন—'বুঝলাম আজও ভারত-ভবিষ্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে আমরা অপ্রস্তুত। খুব সম্প্রতি আমাদের বাংলা কাব্যে প্রাতিবেশিক শিল্পপ্রভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখনো আমরা স্ব-ভাষার বাহিরে যেতে হলেই সমুদ্র পার হবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি নি।'

আমরা সময়ের অতীতমুখী রেখা ধরে দেশের মধ্যেই দেশান্তরে গেছি, ভাষান্তরে গেছি। কিন্তু একই বর্তমানের দেশ-দেশান্তর জুড়ে আমরা আজও যথেষ্ট পরিমাণে ভারত-পথিক হতে পারিনি। সাহিত্য-আকাদেমী পেয়েছি আমরা। সাহিত্য-আকাদেমী যে এ-কাজ কিছু পরিমাণে করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেনের অনুবাদে মারাঠী গীতার বঙ্গভাষা-সংস্করণ দেখলুম। 'জ্ঞানেশ্বরী' জ্ঞানদেবের রচনা। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন—'জ্ঞানদেবের সমসাময়িক শ্রীনামদেবের রচিত 'অভঙ্গ' হইতে জানা যায় ইং ১৩৫০ সাল পর্যন্ত জ্ঞানেশ্বরীর পঠন, পাঠন ও লেখন প্রচলিত ছিল। ইহার পর প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত মারাঠী ভাষার একটি অন্ধকারময় যুগ।'

আমাদের কাছে, সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিপুল, বিচিত্র সাহিত্য-জগৎ কিন্তু এখনো অন্ধকার হয়ে আছে। বাংলায় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন কিছু অনুবাদ করেছেন বটে,—এই রকম আরো কেউ কেউ। কিন্তু ভারত-উপমহাদেশের মধ্যে দেশান্তরে যেতে হলে এখনো আমরা প্রধানত অতীতেই নজর দিয়ে থাকি—এবং প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই আমাদের যা কিছু বিচরণের বৈচিত্র্য।

কিন্তু দেশ তো অতীতে দাঁড়িয়ে নেই। জগৎ নিত্যই সরে যাচ্ছে। আমরা কি অমিয়বাবুর কথাটা সমুচিত-ভাবে ভেবেছি? সাহিত্য-আকাদেমী একটা আসর খুলে রেখেছেন বটে। সেটুকুর জন্যে ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে অমিয়বাবুর কথাটাও মনে থাক্। তিনি লিখেছিলেন—'বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র প্রতিষ্ঠিত প্রাণবন্ত করবার একটি উপায় তাকে সমসাময়িক ভারতীয় মৃত্তিকায় সংশ্লিষ্ট করা এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

আমরা গাছের মতন মাটিতে বদ্ধমূল নই। আমরা পাখির মতন ভাবের আকাশে উড়ি, মর্তের মাটিকে ভুলি না। আমরা স্বাধীন, তবু অদৃষ্টের শাসনে আবদ্ধ। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮এ লেখা পাঞ্জাবের ভাই বীর সিং-এর একটি কবিতার অনুবাদ দিয়েছেন অমিয়বাবু। তাতে ভাই বীর সিং এই কথা বলেছেন—

চোখ আছে বটে কপালে
সঙ্গে আছে বিধিদত্ত ঘাড়
ইচ্ছামতো চোখকে উঁচু-নীচু
চালাবার জন্যে।
বিধিনির্দেশে চোখ দিয়ে
দেখায় নেই মুক্ত দৃষ্টি,
ইচ্ছায় উপরে চোখ চালাবার
অধিকার মানুষের।

ভাই বীর সিং বলেছেন—মর্তের মাটি থেকে জল থেকে আকাশের মেঘ জমে ওঠে। তাতে হয় বিদ্যুৎ-সঞ্চার। বেজে ওঠে বজ্র। দেখা দেয় ক্ষণিক উজ্জ্বলতা। মেঘের আত্মদহনে মর্তের অন্ধকার আলো হয়ে যায়।

সংসারে কার আত্মদহনে কোথায় যে আলো জ্বলে, কে বলতে পারে? কিন্তু একথা ঠিকই যে শুধুই 'অদৃষ্ট' 'অদৃষ্ট' করে টিকে থাকাটা যথেষ্ট পরিমিত জীবন নয়।

থাক্, থাক্—এসব গুরু-বিতর্ক স্থগিত থাক্। আমি আমার প্রাচীন প্রিয় কালিদাসের একটি দৃশ্য ভাবছি আজ। এই অতীতে বিচরণের প্রসঙ্গ থেকেই সে-কথা মনে এলো—

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর সপ্তম অঙ্কের একটি দৃশ্য। রাজা দুষ্মন্ত রথে যেতে যেতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী'। মাতলি বলেন, 'আয়ুষ্মন্, আপনি ঠিকই দেখেছেন, পৃথিবী সত্যিই সুন্দরী।'

রাজার রথ তখন শূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে নামছিল।

রাজা বলেন, 'খুব জোরে নামছে বলেই রথ থেকে পৃথিবী বড়োই আশ্চর্য দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের শ্রেণী যেন মাথা উঁচু করে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে; পৃথিবী যেন গিরিশৃঙ্গ থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে পাতায় ঢাকা গাছের মেলা। দূর থেকে নদীর যে-সব অংশ নজরের বাইরে ছিল, এখন সে-সবই চোখে পড়ছে।

পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে স্নান-করে-ওঠা সন্ধ্যার মেঘের মতন এক পাহাড় চোখে পড়েছিল সেই যাত্রাতেই।

মাতলি বলে দিয়েছিলেন সেই পাহাড়ের নাম কিম্পুরুষগিরি। তারই মধ্যে হেমকূট। সেখানে তপস্বীদের বাস। সুরাসুরের জন্মদাতা ঋষি কশ্যপ সেখানে সস্ত্রীক তপস্যায় নিযুক্ত।

আশ্রমে নেমে, রাজা বলেন,—'কই? কশ্যপ কোথায়?'

মাতলি দেখান—ঐ যে ঐখানে,—ঐ দেখুন ঋষির অর্ধ-দেহ, বল্মীকস্তূপে

আবৃত, সর্পকঞ্চুক তাঁর দ্বিতীয় যজ্ঞসূত্র,—তাঁর কণ্ঠে জীর্ণ লতাবলয়, তাঁর স্কন্ধদেশ জটাজালে আচ্ছন্ন,—আর, সেই জটাতেই পাখিরা বাসা বেঁধেছে। সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিশ্চল রেখে কশ্যপ ঐ যে স্থির হয়ে আছেন।

কাঞ্চনপদ্মরেণুর প্রাচুর্যে সেখানে সরোবরের জল পিঙ্গলবর্ণ। সেখানে গুহাগুলি রত্নশিলাময়।

নিজের সন্তান সর্বদমনের সঙ্গে, আর তাঁর পরিত্যক্তা পত্নী,—সেই সর্বদমনের জননী শকুন্তলার সঙ্গে সেই আশ্রমেই তাঁর দেখা হয়েছিল। রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনর্মিলন।

সর্বদমন বলেছিলেন—'মা, এ কে?'

শকুন্তলা জবাব দিয়েছিলেন—"অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'—'ভাগধেয়াইং পুচ্ছেহি'।

অদৃষ্টের সেই নির্মম মোহজালের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন শকুন্তলা।

অদৃষ্টের এই অন্ধকার তোরণ পেরিয়ে, আজ এই ভারতভূমির সমকালীন অন্য দেশ-দেশান্তরের ভাবনাসূত্রে মন গিয়ে পৌঁছুলো একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিতে। আজ সে-কথাও লিখে রাখি—

চারটে কুড়ি মিনিটে ঝন্-ঝন্ করে অ্যালার্ম বেজেছিল। ঘুমটা ফিকে হয়ে এসেছিল বটে, তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে পা ওঠেনি। ডান দিকের দেয়ালে ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল আলোর সুইচটা, তবু আলো জ্বালতে দেরি হয়েছিল। তখনো হিম-হিম ঠাণ্ডা রাতের রেশ ছিল চৈতন্যের মধ্যে। তিন ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে বটে, তবু আর একটু শুয়ে থাকলে ক্ষতি কি? এই রকম ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলা লাগে মাঝে-মাঝে। মনের স্বভাবই তাই। কলকাতার ঠাসা, ভ্যাপসা, অন্ধকার আড়াইখানা ঘরের মধ্যে জীবনের দশ-বিশ বছর কেটে যাবার পরেও সুখের মাধ্যাকর্ষণ কাজ করতে থাকে,—আরামের আকর্ষণ, বিরতির আকাঙ্ক্ষা।

দক্ষিণ-ভারতের এ-অঞ্চল যে সত্যিই নাতিশীতোষ্ণ, সেটা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করা গেল তাহলে। ঘুম-ভাঙার কর্তব্য ছাড়াও ঘুম-ভাঙার আনন্দ বলে দ্বিতীয় একটা বিশেষত্বের স্বাদ পেয়ে মন তার দেখা-ছবির ওপরেই স্মৃতির আঙুল বোলাতে লাগলো। বাগানের হাতার মধ্যেই শীর্ণকায় দুটি চন্দনগাছ,—পাঁচিলের লাগোয়া এক সারি ঝাউ,—তারই গা দিয়ে সটান সোজা পথ চলে গেছে জনবহুল শহরের দিকে। সেই সোজা

● অমিয় চক্রবর্তী

পথ ক্রমশ ঘুরেছে, উঁচু-নিচু ঢেউ খেতে-খেতে আগের এক জায়গায় পৌঁছে ঝক্‌মক্ করে উঠেছে কলকাতার চৌরঙ্গির মতন। গান্ধী-রোডের শিল্প-ভাণ্ডার থেকে চন্দন-কাঠের টুকি-টাকি আসবাবের নিশ্বাস বুকে নিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে এসে, আবার মনে পড়েছিল দুপুর বেলার সেই খাবার-টেবিলের দৃশ্য। ডান-দিকের ছোটো ঘরে হাত ধোবার কল, বেসিন, পাশের দেয়ালে মাখন-রঙের কাঠের শেল্‌ফ্, তাতে রাঙা পেয়ালার সারি; টেবিলে পেয়ালা-পিরিচ রাখবার ছোটো ছোটো চাক্‌তি—ঘাসের তৈরি।

—এলাহাবাদ থেকে কিনেছিলাম, বারো টাকা ডজন----

শ্রীমতীর সাদা রেশমী শাড়ির ওপর চকোলেট রঙের ছোটো-ছোটো ফুলের কাজ। ঘাসের চাক্‌তির দামের খবর শুনে সেই ফুলগুলোর ওপর নজর পড়েছিল। ঘোষ-সাহেব তখন জাফরি-ঘেরা বারাণ্ডায় বসে আপিসের ফাইল দেখছিলেন।

একে একে বারাণ্ডাতেই এসে জড়ো হয়েছিলেন সবাই। তারপর কথার পরে কথা উঠেছিল। আলাপের ধারায় কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়েনি—বাংলা দেশের দুর্দশা, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব, ভারতবর্ষ থেকে সবাই আজকাল য়ুরোপ-আমেরিকায় বেড়াতে যাচ্ছে, টুশিদিদির মেয়ের বিয়েতে শ্রীমতী এবং ঘোষ সাহেবও যেতে পারেন নি, এইসব নানা প্রসঙ্গের মাঝে মাঝে এক সারি পুতুলের মধ্যে বিশেষ একটির দিকে আঙুল দেখিয়ে শ্রীমতী বলেছিলেন— ঐ দেখুন, আন্দামানের পুতুল, কোমরে কালো ফিতে ঝুলছে,—ফিতেটা কি জানেন?

—না, তো।

—অনেকদিন আগেকার কথা। সৃষ্টি ডুবে গিয়েছিল বন্যায়। জল, জল, অন্তহীন জল। তারই মধ্যে জেগে রইলো একটি-মাত্র বাড়ির সামান্যমাত্র ছাদ, তাতে একটি-মাত্র পুরুষ, এবং—

—একটি মাত্র নারী

—আজ্ঞে না,—কুকুরী।

হেসে উঠেছিলেন শ্রীমতী। তাঁর হাসির শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের শেষটা জুড়ে দিয়েছিলেন ঘোষ-সাহেব—সেই আদি-পুরুষের ঔরসে কুকুরীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিল মানুষ,—এই পুতুলের কোমরবন্ধটা সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন, আর, কালো ফিতেটা সেই লেজের স্মৃতি।

তারপর এক লহমায় ঘুরিয়ে দেওয়া

বেজে কথার স্রোত। অনেক পুতুল ছিল পাশাপাশি—বাঁশের মাচার খুদে নমুনা, তার পাশে খড়ের চাল বানানোতে আর বেতের কাজে ব্যস্ত পুরো একটি পুতুল পরিবার,—তারই লাগোয়া নির্বসনা নারীমূর্তি,—কেষ্টনগরের মাটির তরি-তরকারি,—আরো কতো কী। তবু সেই কুকুরের গল্পটাই প্রধান হয়ে উঠলো।

আমি হঠাৎ নির্বোধের মতন অন্য কোনো কথা হাতড়ে না পেয়ে, বলেছিলুম—কুকুরের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা তো আজকের নয়,—ওটা আমাদের পূর্বপরিচয়।

ঘোষ-সাহেব বোধ হয়, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের কথা তুলেছিলেন।

শ্রীমতী বলেছিলেন—কুকুরকে নিন্দে করাটা আমাদের কতোদিনের স্বভাব কে জানে। যাই বলুন, মানুষের মতো অকৃতজ্ঞ আর কোনো জীব নেই।

আজ অমিয় চক্রবর্তীর কবিমনের নানা ভ্রমণের কথা ভাবতে ভাবতে এইসব ব্যক্তিগত পূর্বশ্রুতি আর পূর্বদৃশ্য মনে পড়লো। মনে পড়লো এই আলাপের পরের সকালেই আমাকে কলকাতায় ফেরবার ট্রেন ধরতে হয়েছিল। ট্রেনে আসতে আসতে মাদ্রাজের সেই যুবকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। গভীর রাত্রে ঘুমন্ত ট্রেনের কামরায় আমরা বিশাল ভারতবর্ষের নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা আচারের বিচিত্রতার কথা নিয়ে আড্ডা দিয়েছিলুম।

কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাঘবন্। জানলার কাচ বন্ধ ছিল। তাতে তার ঘুমন্ত মুখের ছায়া পড়েছিল। আমি সে-সব কথা লিখে রেখেছিলুম। আজ সেই লেখাটাও এখানে জুড়ে দিলুম—

ওর ঘুমের মধ্যেও নিশ্চিন্ত এক প্রত্যয় ফুটে উঠেছে যেন। জানলার কাচে রাঘবনের গাঢ় সবুজ রঙা কম্বলের ছায়ার মধ্যেই গাড়ির সীলিঙের আলোটার ছায়া। সেই আলো-ছায়ার চিত্রলিপিময় মসৃণতার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে পড়ে কালকের সেই অতিক্রান্ত দৃশ্য—বিছানা ছেড়ে উঠতে প্রায় আধঘণ্টা লেগেছিল,—চারটে কুড়ি মিনিটের আগে ওঠা হয় নি। সে-ছবির সঙ্গে নিজের জীবনের অসংখ্য সব ভোরের স্মৃতি মিলিয়ে দেখলে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জেগে ওঠে, সেটা মমতাও নয়, হিংসেও নয়, উৎসাহও নয়,—'গান্ধী মহারাজের শিষ্য, কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব।'

পীত শাড়ি, পীত উত্তরীয়,—ওড়না নয়, আলোয়ান, স্কার্ফের মতো হ্রস্ব কাশ্মীরী শাল—দক্ষিণের ঈষৎ ঠাণ্ডা সকালের পটে, রঙীন ফুলে ফুলে অফুরন্ত উচ্ছ্বাসময় রোদ-ঘাস-হাওয়ার মধ্যে উজ্জ্বল কয়েকটি রঙের সম্মোহ। কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ-করা কেৎলির ঢাকনিটাতে ঢালা নীলের ওপর তিনটি করে লাল ফুলের ক্ষীণ স্তবক। আর, সেই টাটকা চায়ের বাষ্পের আশ্চর্য ঘ্রাণের সঙ্গে মিলেছিল শ্রীমতীর ঝক্‌ঝকে দাঁতের হাসি।

যেখান থেকে ঐ-রকম হাসি হাসা যায়, শরীর-মন-আত্মার তেমনি প্রসন্নতা আসুক দেশের ঘরে ঘরে, মনে-মনে। আজ, চিরলা স্টেশন পেরিয়ে যেতে যেতে ভালো-লাগা আর বেদনার মধ্য দিয়ে মনে পড়ছে সেই হাসির স্বাস্থ্য। ঘোষ-সাহেবের পরিমণ্ডলটাই ছিমছাম। তাঁদের বাগানে লাল পাতা, সূর্যমুখী, মাটিতে ঝাক বেঁধেছে প্যানসি, ফ্লক্স্, লার্কস্পার। ছেলে দুটি প্রায় সমবয়সী—দু' এক বছরের ছোটো বড়ো তারা,—ছোটোটি আট পেরিয়েছে। সাইকেলে সওয়ার হয়ে খানিকটা এদিকে-ওদিকে চক্কর দিয়ে এসে হঠাৎ মাকে বলে, 'আর একটা সিঙাড়া খাবো।'

আবার, কালকের কাহিনীর ওপর আজকের চাদর বিছিয়ে দিলুম,—নিত্য ঘটমানের নিত্য নিপুণ এই অপসরণ। অতীত আর ভবিষ্যৎ,—মাঝখানে চলন্ত সেতু এই বর্তমান। মাদ্রাজ মেল এইমাত্র যে স্টেশনটা ছেড়ে এলো তার নাম গ্যাঞ্জাম। হাতঘড়িতে রাত শেষ হবার ইশারা—পৌনে চারটে বেজেছে। কামরার মধ্যে বন্ধ জানলার কোণে কোণে কোথায় যেন ফাঁক আছে—হাওয়া আসছে, ঠাণ্ডা হাওয়া। ভিড় নেই গাড়িটায়। মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর,—অন্ধ্র, উৎকল আর বাংলা—কাঠের বেঞ্চিতে পাশাপাশি শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। জানলার কাচের ওপারে অন্ধকার। শুয়ে থাকলে সেই কাচের ওপর নিজেদের কামরাটিরই ছায়া দেখা যায় কেবল। উল্টোদিকের বার্থে শুয়ে আছে আঠাশ বছরের ছোকরা রাঘবন্, কোবিল স্ট্রীটের যৎসামান্য একটা মনিহারী দোকানে খাতা কিনতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারপর মন্দির দেখতে গিয়ে সেই রাঘবন্-ই চিনিয়ে দিয়েছিল পেতলে আর পাথরে খোদাই করা এক-একটি মূর্তি,—রাম, হনুমান, বিষ্ণু,—তারপর অলিন্দ পেরিয়ে, দ্বিতীয় দরজা পেরিয়ে ভেতরে আরো সব মূর্তি—রুক্মিণী, কৃষ্ণ, পার্থসারথি, সত্যভামা,—সাত্যকী, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

মাদ্রাজ শহরের সঙ্গে স্মৃতিতে জড়িয়ে রইলো এই রাঘবন্। চিত্তরঞ্জন কারখানায় চাকরি পেয়ে চলেছে বাংলা দেশে। আর, গ্যাঞ্জাম ছুঁয়ে, ওর দেশের মাটি পেছনে ফেলে, দুর্বার একটা জন্তুর মতন এই ট্রেনটা ওকে যে ক্রমশ কল-কারখানার বিচিত্র সম্ভাবনাময় বাংলা দেশের সেই নতুন শহর চিত্তরঞ্জনের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ কিসের? কিন্তু ও কি সুখী হবে সেখানে গিয়ে? ও কি বিশাল ভারতবর্ষকে পাবে? ওর মন কি সেই অনুকূল দর্পণ—যাতে বিশালের ছায়া পড়ে? আমি ট্রেনে যেতে যেতে যা ভাবছি, রাঘবন্ কি সেরকম কিছু ভাবে কখনো?---আমরা বোধ হয় কালের রেখা ধরেই অতীতে-ভবিষ্যতে বেশি হাঁটি। আমরা কি সমকালের দেশ-দেশান্তরে যাই?

(ক্রমশ:)

● রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং

রাজধানী ঃ

রাজধানীতে সুরু হয়েছে অভিযান। একযোগে ত্রিমুখী সাঁড়াশী অভিযান—দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান, "মূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে" অভিযান এবং মজুতদারদের গোপন গুহা থেকে মজুত খাদ্যশস্য উদ্ধারের অভিযান। দুর্নীতি দমনের অভিযানটা নতুন নয়—অনেক আগেই সুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মুনাফাশিকারী হাঙরের দলকে বেড়াজালে ছেঁকে তোলবার কথাও উঠছে। সদাচার সমিতির কাজও চলেছে অব্যাহত গতিতে। কিন্তু এ অভিযান এখনও পুরোপুরি দানা বাঁধতে পারে নি—পারে নি সাধারণ মানুষের মনে তেমন কোন আশার সঞ্চার করতে।

"মল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে" অভিযান সুরু করেছে জনসঙ্ঘ। দলে দলে অনশন করছেন জনসঙ্ঘের কর্মীরা এল-আই-সি'র মাঠে। বেশ ঘটা করে, জমকালো কায়দায় এ অভিযান চলেছে। এক-একদিন পাঁচ শ' থেকে ছ' শ' কর্মী অনশন করছেন। জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক মতবাদ, জোতদার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও মজুতদারদের সম্পর্কে তাঁদের নীতি আজ আর কারো অগোচর নেই। কাজেই "জনসঙ্ঘ কা মঁহগাই বিরোধী" আন্দোলনের সাফল্য নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে—জনসঙ্ঘ সকলের ওপর টেক্কা মেরেছে।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীরা এখনও সংযত, সংহত নয়। তাদের দুটি বাহুর—প্রজা-সমাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে জোড়াতালির কারবার এখনও শেষ হয় নি। সমাজতন্ত্রীদের এখন আর ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। প্রজা-সমাজতন্ত্রীর যাঁরা এখনও পেছনে পড়ে শিকড় আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁরা অত্যন্ত হীনবল। তাঁদের অনেকেই আবার ঘর বদলের চিন্তায় বিভ্রান্ত। কেউ কেউ তাকিয়ে আছেন সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের ভবিষ্যতের দিকে। আরেকদল কংগ্রেসের কোলে ফিরে যাবার ফিকির করছেন।

যাঁরা এতকাল দীনের দরদী ছিলেন, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির আলোকজ্বালনাসার নামাবলী পরে আসর জমিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা ঘর সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছেন। দক্ষিণ-বামের সঙ্ঘর্ষে কেবল নামাবলীই নয়, আসল মখোসটা পর্যন্ত তাঁদের খসে পড়ছে।

ফল যাই হোক না কেন, খোলা মাঠ পেয়ে জনসঙ্ঘ খেলাটা জমিয়েছে ভাল। একথা তাদের পরম শত্রুও অস্বীকার করতে পারবে না।

মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশীদার অনেকে—এ অভিযান সুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ, সরবরাহ দপ্তর ও রাজধানীর সাধারণ নাগরিকের সমবেত সহযোগিতায়। একদিনেই তাঁরা আঠারোটি ঘাঁটি ঘেঁটে উদ্ধার করেছেন প্রায় দ' লক্ষ মণ চাল ও গম। বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে নয়াদিল্লীর পথে-ঘাটে।

এ সব মজুতদারদের অনেকের নাকি ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্সই নেই। হিসেবপত্রও সঠিকভাবে রক্ষিত হয় নি। দিল্লীর এ অভিযানে প্রমাণ হল গোপন গুদামের মালিকরা কোন হুমকীতেই কাবু হওয়ার পাত্র নয়। এই দুঃসাহসী ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন না করলে তাদের শুভবুদ্ধি কোনদিনই ফিরে আসবে না। সরকার সে কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এলে সাধারণ মানুষের সহযোগিতার অভাবও হবে না। কয়েকটি গুদাম ছিল পল্লীর ভেতরে। পল্লীর গৃহস্থরাই তার সন্ধান দিয়েছেন পুলিশকে। সরকার এই গুদামের মালিকদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা' দেখার জন্য জনচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে এরা মুক্তি পেলে ফল শুভ হবে না। সরকারের মূল্যমান বজায় রাখার, খাদ্যশস্যের ব্যবসা পরিচালনার ও বণ্টনের পরিকল্পনার ঢাক-ঢোল বাজনাই সার হবে; কারণ এরাই আগলে আছে সকল স্তরের ঘাঁটিগুলো। এদের সমুচিত শিক্ষা দিতে না পারলে খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে কোন লাভ হবে না।

পশ্চিম বাংলা সরকার মূল্য বেঁধে দিয়েছেন। বাংলার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার পরামর্শ অন্য রাজ্যকে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রশংসায় তিনি এখন পঞ্চমুখ।

দিল্লীর গোপন গুদামের মালিকদের চেয়ে পশ্চিম বাংলার ব্যবসায়ীরা

অনেক অভিজ্ঞ। তারা হাত পাকাতে সুরু করেছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়। আজ তাদের দাপটে পশ্চিম বাংলার নাভিশ্বাস উঠেছে। রেশনের দোকানের চাল ভিন্ন কলকাতার খোলা বাজারে চাল এক টাকা পঁচিশ পয়সার কমে মেলে না। তাও সব দোকানে পাওয়া যায় না। শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম নিশ্চয়ই সে সংবাদ পান নি। পশ্চিম বাংলার আদর্শ অনুকরণ যেখানেই হবে সেখানেই দিল্লীর গোপন গুদামের ভাই-বেরাদররা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে তুলবে।

* * *

রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতের বিজ্ঞানকর্মী সঙ্ঘের সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনা সভায় খাদ্য সঙ্কটের সুরাহার জন্য ত্রিমুখী অভিযান চালাতে বলেছেন। সমবণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন, সমাজবিরোধীদের অর্থাৎ কালোবাজারীদের উচ্ছেদ এবং খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সকল লোক তাদের পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে সহজ বণ্টন ব্যবস্থার পথগুলো রুদ্ধ করছে তাদের সরাতে পারলেই দেশবাসীর মুখে খাদ্য তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

আমরাও এই কথাই বারবার বলেছি। এদের সরাতে না পারলে কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হবে না। খাস রাজধানীতে যারা হাজার হাজার মণ খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখে মুনাফা শিকারের জাল বিস্তার করেছিল তারা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাই নয়াদিল্লীর মানুষ উৎসুক হয়ে আছে মজুতশস্য আটকের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দেখার প্রত্যাশায়।

* * *

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী টি এন সিং কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

● শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম

গত ২৫শে জুলাই। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, তাঁর রোগমুক্তির পর এই প্রথম রাষ্ট্রপতি ভবনে এবং পরে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে আসেন।

বিহার :

বর্ষার সুরু থেকে উত্তরোত্তর খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি এবং খাদ্য সঙ্কট নিয়ে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন কংগ্রেস দলের ওপর কোন আঘাত হানতে পারে নি। বিধানসভায় কংগ্রেস দল বরং আগের চাইতে অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। আইনসভায় এখন কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা ২০৫ থেকে ২১৮ হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের পর এই দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের কলেবর বৃদ্ধি পেল। সাধারণ নির্বাচনের পরই

● ডঃ রামমনোহর লোহিয়া

ঝাড়খণ্ডের ২০ জন সদস্য যোগ দিয়েছিল কংগ্রেসে। এবারে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১১ জন সদস্য এবং দু' জন নির্দলীয় সদস্য।

বিধানসভায় পি-এস-পি'র সদস্য ছিলেন ৩০ জন এবং এস-পি'র সদস্য ছিলেন ৬ জন। এখন তাদের মিলনের পর এস-এস-পি'র সদস্য দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৫ জনে। এই ২৫ জনের ৫ জনও উড়ি-উড়ি করছেন। শীগ্‌গিরই তাঁরা এস-এস-পি'র নীড় ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন।

কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন বিহার বিধানসভার কমিউনিস্টদের মধ্যে কোন ফাটল ধরাতে পারে নি। বিহার বিধানসভার ১২ জন কমিউনিস্ট সদস্যের কেউ বামঘেঁষা নন।

সাধারণ নির্বাচনের পর বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৩৭ জন। হ্রাস পেতে পেতে এখন দাঁড়িয়েছে ১০১ জনে।

* * *

নয়াদিল্লীতে লোহিয়া-জয়প্রকাশ বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী-পন্থীরা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। বিমর্ষ হওয়ার অবশ্যি তেমন কোন কারণ ছিল না। এ দুজন নেতার রাজনৈতিক মতবাদ, সি-এস-পি, এস-পি এবং পি-এস-পিতে দীর্ঘকাল এঁদের সম্পর্কের কাহিনী যাঁরা জানেন, তাঁদের মনে আলোচনার ফলাফল দেখে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হতে পারে না। একমাত্র সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিকে যুক্ত করে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন ভিন্ন অপর কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে লোহিয়া-জয়প্রকাশ মিলন এ-পর্যন্ত ঘটে নি। বছর তিনেক যেতে-না-যেতেই সে বন্ধনও ছিঁড়ে গিয়েছিল। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ রাজনীতিতে ইস্তফা দিয়ে হলেন জীবনদানী। ডঃ লোহিয়া বাধ্য হলেন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ছেড়ে যেতে। তারপর সুরু হয় উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পথে

যাত্রা। আজ তাঁরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে। তাঁদের চিন্তাধারাও সম্পূর্ণ আলাদা।

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া কংগ্রেসের ওপর ভীষণ খাপ্পা। যে-কোন উপায়ে কংগ্রেসকে ঘায়েল করাই তাঁর লক্ষ্য। শ্রীনারায়ণ এখন মোহান্তের পর্যায়ে উঠেছেন। উপদেশ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া এবং সুযোগ-সুবিধা মত আশীর্বাদ বর্ষণ করা হয়েছে এখন তাঁর কাজ। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদে বিশ্বাসীদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শ্রীঅশোক মেহতার কংগ্রেসে যোগদান তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ লাভ করেছে। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সকল সদস্য কংগ্রেসে যোগ যাতে দেন, সে জন্য শ্রীনারায়ণ চেষ্টা করছেন। ডঃ লোহিয়া মশগুল হয়ে আছেন তাঁর মনগড়া তত্ত্ব নিয়ে। ফলে, এস-পি এবং পি-এস-পিকে নিয়ে নতুন দলকে জোরদার করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় পড়েই এস-এস-পি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজনারায়ণ সর্বোদয় নেতার সঙ্গে ডঃ লোহিয়ার একটা আঁতাতের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অনুরোধেই ডঃ লোহিয়া সম্মত হয়েছিলেন শ্রীনারায়ণের সঙ্গে আলোচনায় বসতে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীদের মধ্যে জয়প্রকাশের প্রভাব সর্বজনবিদিত। বিহারের কর্মীদের মধ্যে তাঁর প্রভাবটা সর্বাধিক। শ্রীঅশোক মেহতাকে নৈতিক সমর্থন জানাবার পরই বিহার আইন-সভার প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীকানোরী ঠাকুরকে নিয়ে দলের অপরাপর নেতাদের সঙ্গে তিনি ঘরোয়া আলোচনায় বসেছিলেন। তাঁদের শ্রীমেহতার অনুগামী হতে তিনি পরামর্শও দিয়েছেন। ১১ জন বিধানসভার সদস্য, একজন পার্লামেণ্টের সদস্য এবং বেশ কিছুসংখ্যক নেতা ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। শ্রীঠাকুরও নাকি কংগ্রেসে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মুজাফরপুর জেলার সীতামারীতে গেল সপ্তাহে অনুষ্ঠিত প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীদের অধিবেশনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী কর্মীদের কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বানও জানানো হয়েছে। এ-অধিবেশনে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত রাজেন্দ্র মিশ্র।

* * *

এদিকে এস-এস-পি'র নীতি ও ও কার্যক্রম নিয়ে বিতণ্ডা থেকে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এস-পি এবং পি-এস-পি'র নেতৃত্বের মধ্যে। ডঃ লোহিয়া

শ্রীঅশোক মেহতা

দু' দলের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করতে এসে আরও বিভ্রাটের সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি নিজের মতবাদ ও কর্মসূচীতে জোর দেওয়ায় পি-এস-পি'র নেতাদের মনে নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ডঃ লোহিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে আট দফা যে-কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলেন তাতে দেশের মৌলিক ও জরুরী কোন সমস্যারই উল্লেখ নেই। কংগ্রেসের উৎখাতই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সে কাজ হাসিল করতে সমাজবাদী নেতা গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছেন জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের সাথে। তাঁর আট দফা কর্মসূচী হল—ইংরেজী ভাষার খতম করা, সরকারী কর্মচারীদের বেতন হাজার টাকা পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া, মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েতের পরিচালনাধীন বিদ্যালয় ভিন্ন অপর প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দেওয়া, রেলের 'আপার ক্লাশ' বন্ধ করা, অলাভজনক চাষের জমির খাজনা মকুব, সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার রদ, উৎপাদনের খরচ-খরচার পঞ্চাশ ভাগের অধিক সকল কর রহিত করা এবং সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার চুক্তি সাধন।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতৃত্ব এ-কর্মসূচী মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন না। অথচ এই মিতালীর আশায় ডঃ লোহিয়া তাঁর কর্মসূচীতে দেশের আসল সমস্যাগুলোকে বেমালুম এড়িয়ে গেছেন। ডঃ লোহিয়ার কর্মসূচীকে প্রজা-সমাজতন্ত্রীদের নেতারা সুবিধাবাদীর কার্যক্রম আখ্যা দিয়েছেন।

সম্প্রতি ডঃ লোহিয়া সুর পঞ্চমে তুলে আরও বিপদ ডেকে এনেছেন। তাঁর মতকে যাঁরা মেনে নিতে পারছেন না—স্বতন্ত্র দল ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে আঁতাতে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁদের তিনি কংগ্রেসের দালাল বলায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বেশি করে। এস-এস-পি'র পার্লামেণ্টারী বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীশিশিরকুমার এস-পি পাল্টা বিবৃতিতে ডঃ লোহিয়ার রাজনৈতিক জীবনে লালবাতি জ্বালাবার উপক্রম করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজ-তন্ত্রের শত্রুদের সঙ্গে মিলনের উমেদার মাত্রেই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বস্ত অনুচর।

উভয় পক্ষে খেউড়টা বেশ জমে উঠেছে। এ-অবস্থা চলতে থাকলে বিহারে রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে এস-এস-পি'র টিকে থাকাই দায় হবে।

মহারাষ্ট্র ঃ

মদ বর্জনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপলাশপাগরকে নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়েছেন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। এ-অভিযোগ পেয়ে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড নাকি মন্ত্রিসভা থেকে শ্রীপলাশপাগরকে বাতিল করে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

মাদকদ্রব্য বর্জনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজেই নাকি অত্যন্ত মদ্যাসক্ত। মদ্যপানের পর ঘরে ফিরে মাতাল অবস্থায় তিনি একেবারে উগ্রমূর্তি

● শ্রীপলাশপাগর

ধারণ করেন। স্ত্রীর ওপর চলে তখন অত্যাচার। তাঁকে প্রহার করেন নির্মমভাবে। এ-সব অভিযোগ এনেছেন তাঁর স্ত্রী নিজে। প্রহারের পর স্ত্রীর কাছ থেকে জবরদস্তি করে স্বাক্ষর আদায় এবং স্বামীর প্রহারজনিত আঘাতের সম্পর্কে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটের অভিযোগ সম্বলিত একটি আলোকচিত্র সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীপলাশপাগরের নিজের জেলা আকোলার কংগ্রেস নেতারাও তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ। তাঁরা জেলার প্রশাসনিক সমন্বয় বিধানের দায়িত্ব পলাশপাগরের হাত থেকে অন্য কোন মন্ত্রীর হাতে সমর্পণের দাবী তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, মন্ত্রী মহোদয়ের মনোবিকার দেখা দিয়েছে। তিনি গণকগোষ্ঠীর সাথে ভাগ্য গণনা নিয়ে দিন কাটিয়ে দেন। কেউ কেউ সরাসরি হাই-কমাণ্ডের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে আর্জি পেশ করেছেন।

প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও নায়েক এক চিঠিতে শ্রীপলাশপাগরকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেরল ঃ

রাজনৈতিক দলগুলো আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব স্থরু করে দিয়েছে এর মধ্যেই। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী জানুয়ারীতে। প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে, শ্রীচাকোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাদা ছিটাছিটি দেখে অনেকের মনে ধারণা জন্মেছিল সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে যাবে।

প্রদেশ কংগ্রেসে উপদলীয় তিক্ততা যতই থাকুক না কেন, কেরলের কমিউনিস্ট পার্টির আগামী নির্বাচনে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। কেরলের কমিউনিস্টদের বড় দুরবস্থা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এ বিষয়ে সচেতন। তিনি জুটেছেন গিয়ে বামপন্থী কমিউনিস্টদের দলে। তেনালী সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। সে-সম্মেলনেই আগামী অক্টোবর থেকে আলাদা পার্টি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের বেদীতে চীনের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা শ্রীমাও-সে-তুংয়ের প্রতিকৃতি যেভাবে স্থাপন করে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে তাতেই আরো সর্বনাশটা হয়েছে বেশি। এর কঠোর সমালোচনা হয়েছে সারা ভারতে। কেরলের সাধারণ মানুষও চীনের নেতার প্রতি এই আনুগত্যে বিরূপ হয়ে উঠেছে।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ পড়েছেন বিপদে—একেবারে অগাধ জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তেনালী সম্মেলনের অপযশ স্খালনের চেষ্টায় একের পর এক বিবৃতি দিতে হচ্ছে তাঁকে। তিনি বোঝাতে চাইছেন, প্রত্যেক কমিউনিস্টের ঘরেই মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন ও মাও-সে-তুংয়ের ছবি থাকে। কাজেই এটা কোন অপরাধ হয় নি। তাঁর চেষ্টায় কোন ফল হচ্ছে না—ভারতের প্রধান শত্রুর ছবি অত ঘটা করে সম্মেলনের বেদীতে রাখাকে সাধারণ মানুষ গুরুতর অপরাধ বলেই

● শ্রীবসন্তরাও নায়েক

ধরে নিয়েছে। তাদের মতে এ-কাজ দেশদ্রোহিতারই সামিল।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ তাঁর বিরোধী পক্ষ কমিউনিস্টদের সাথে নির্বাচনী চুক্তির জন্যও উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁর মতে, কমিউনিস্টদের দক্ষিণ ও বামের মধ্যে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোন মতভেদই নেই। গোলমালটার সৃষ্টি হয়েছে প্রতিরক্ষার নামে কংগ্রেস সরকারের নীতি নিয়ে। এ-ক্ষেত্রেও নাম্বুদ্রিপাদের সাফল্যের আশা কম। অাঁতাত হলেও কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। এখন থেকে কমিউনিস্ট কর্মীরা

অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাকে কাছে টানবার জন্য সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেল ৩১শে জুলাই। হিন্দ মজদুর সভা, এ-আই-টি-ইউ-সি এবং ইউ-টি-ইউ-সি মিলে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ধর্মঘটের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার কেরল কংগ্রেসের নেতাদের একটু সংযত হয়ে চলতে বলেছেন। তাঁদের আচরণে ক্ষতিকর কোন বিস্ফোরণের সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলতে বলেছেন।

শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তরেই নাকি কংগ্রেস সভাপতি প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের এই পরামর্শ দিয়েছেন। শঙ্করের বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের অভিযোগ এনেছেন।

অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু অভিযোগ-পত্রের সুরে এবং তাতে মন্ত্রিসভাকে বিপদে ফেলার হুমকী থাকাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতির পরামর্শে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের সম্বিৎ ফিরে আসবে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহল আশা করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে আত্মকলহ শুভ ইঙ্গিত নয়। এতে বিরোধী দলগুলোরই শক্তি বৃদ্ধি হবে। কেরলের কংগ্রেস নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই সে ভুল করবেন না।

মধ্যপ্রদেশ :

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের হাতে সত্যি সত্যি কি ডাকাতের দল সায়েস্তা হবে? আগের সরকারের প্রচেষ্টার মত এবারের তোড়জোড়ও শেষ পর্যন্ত হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাবে কি? এ-প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে সর্বত্র।

ডাকাতদের দমন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে-সকল ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে অভিনবত্ব নেই খুব বেশি। এ সব ব্যবস্থা আগের সরকারও করেছিলেন। ব্যবস্থামত কাজ তাঁরা করেন নি। টাকার অভাব, পরিবেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবও তখন ছিল। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা এবং চম্বল অঞ্চলে সামাজিক কাঠামোটিও অন্তরায় হয়েছিল। সর্বোপরি আমাদের সরকারের প্রশাসনযন্ত্রে আত্মপ্রসাদের জন্য কাজ এগোতে পারে নি। প্রশাসনযন্ত্র সব ব্যাপারেই একটু দম নেবার সুযোগ পেলেই হাল ছেড়ে গা ঢেলে দিতে অভ্যস্ত।

ডাকাতদের দৌরাত্ম্য শুরুলেই সরকারের কান খাড়া হয়—চলে ডাকাত দলের বিরুদ্ধে পুলিশের

শ্রী হরি শঙ্কর

অভিযান। অভিযানে ডাকাতরা একটু কোণঠাসা হয়ে পড়তে-না-পড়তেই আসে শাসনযন্ত্রে শৈথিল্য—সন্তুষ্টচিত্তে ছাড়ে তখনি আরামের নিশ্বাস। সুযোগ পায় ছত্রভঙ্গ ডাকাতেরা আবার জোট বেঁধে নতুন করে দল গুছিয়ে নিতে। তারপরই সুরু হয় তাদের অপরাধের অভিযান।

পুরোনো ঢঙে চললে শ্রীমিশ্রের ব্যবস্থায় কোন কাজই হবে না—পুরোনো ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। ডাকাতদের দলগুলোকে ভেঙে চুরমার না করা পর্যন্ত, তাদের দলপতিদের শৃঙ্খলিত না করা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অভিযান প্রয়োজন হবে। সঙ্গে সঙ্গে চালাতে হবে সে-এলাকার সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের কাজ।

ডাকাত দলের সর্দারকে গুলী করে হত্যা করার পর অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। নরহত্যা, লুঠতরাজ কমে গেছে। লোক অপহরণ অবশ্য এখনও কমে নি। রাজ্য সরকারের অভিযান আরও জোরদার হওয়া আবশ্যক।

• • •

স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজগমোহন দাসের অকাল মৃত্যুতে তথৎমল-দেশলেখোয়ার দল অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছে।

তরুণ জগমোহন ছিলেন সকলের অতি প্রীতিভাজন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সরল আচার-আচরণ সহজেই জয় করতে পারতো অপরের হৃদয়। প্রশাসনের ক্ষেত্রেও তিনি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নর্মদা উপত্যকায় তিনিই ছিলেন মন্ত্রিসভা-বিরোধী কংগ্রেসীদের প্রধান শক্তি। তাঁর অভাব এ-রাজ্যের রাজনীতিতে বিরাট শূন্যতারই সৃষ্টি করেছে।

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধ পক্ষের অন্যতম প্রধান হলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার অভাব ছিল না। তাঁকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের চেষ্টাও শ্রীমিশ্র করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের বিড়ি-ব্যারন শ্রীপরমানন্দ প্যাটেল প্রবল বিরোধিতার জন্যই শ্রীমিশ্র পিছিয়ে গিয়েছিলেন।

"পিচ্ছিল"
সমাজের মুখচ্ছবি কথাকাহিনী
(বিশেষ সংবাদদাতা)
মেঘুৎ-এর "পিচ্ছিল" এক দুঃসাহসের পরিচয়। কাউকে ছেড়ে কথা কয় নি, এই পুস্তকের সংলাপ ভিখিরী থেকে মন্ত্রী, সবাই এর কলমের ডগায় চাবুক খেয়েছে। দাম পঞ্চাশ পয়সা। "পাণ্ডুলিপি"—৩৬, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬ থেকে প্রকাশিত। ম্যাইকায় কিনে পড়া দরকার।

মাদ্রাজ ঃ

সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ মুখ খুলেছেন। তিনি এখানে এক সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন রাজনীতিতে তাঁর যোগদানের জল্পনা-কল্পনা একেবারে অন্তঃসারশূন্য। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর রাজনীতিতে নামবার কোন বাসনাই নেই। তবে, দেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য তাঁর আন্তরিক চেষ্টার কোন অভাব হবে না। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে না নামলেও পরামর্শ ও উপদেশ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না।

দলগত সুবিধা এবং ক্ষমতা-দখলের রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর মত বৃদ্ধের কর্ম নয় বলেই তিনি মনে করেন। রাজনীতির খাতিরে রাজনীতি তাঁর কাম্য নয়। জনগণের দ্বারা কল্যাণ-কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতিই এদেশে প্রয়োজন। তিনি মানুষ গড়ে তোলা এবং রাজনীতির শোধনে বিশ্বাসী। কাজেই তাঁর পক্ষে রাজনীতি ধ্বংস করা—কংগ্রেসকে ধ্বংস করার জন্য ডঃ লোহিয়ার আহ্বানে সাড়া দেওয়াও সম্ভব নয়।

শ্রীকামরাজ নাদারের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের ভিতের ওপর সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা গঠনের কাজে সমাজতন্ত্রীদের যোগদান তিনি অন্যায় মনে করেন না।

সর্বোদয় নেতার সঙ্গে এ-বিষয়ে মতবিরোধ দেশপ্রেমিক কোন মানুষের হতে পারে না। ব্যক্তিগত, দলগত স্বার্থ এবং ক্ষমতা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা যাঁদের কাছে বড় নয়, তাঁদের পক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পত্তনে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করাই উচিত। একমাত্র ডঃ লোহিয়া ও তাঁর অনুগামী গোষ্ঠী ভিন্ন বিদেশী সাম্যবাদের শিরোপা যাঁদের নেই তাঁরা সকলেই একে-একে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে এগিয়েও আসছেন। কিন্তু বিপদ ঘটে তখন, সর্বোদয় নেতা যখন মোহন্ত সেজে উচ্চাসনে বসে নির্লিপ্ত হয়ে সকল ব্যাপারেই আশীর্বাদ বর্ষণ করতে থাকেন। তখন তাঁকে সামলানো যায় না।

* * *

ব্রহ্মদেশ ফেরত উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে ব্রহ্মের সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য তৎপর হতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছেন।

গেল বৃহস্পতিবারেই দেড় হাজার উদ্বাস্তু এসেছে ব্রহ্মদেশ থেকে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে অধিক সংখ্যায় আসবে বলে মনে হচ্ছে। এরা পেছনে

● শ্রীকামরাজ নাদার

ফেলে আসছে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে ব্রহ্ম সরকারের সাথে বোঝাপড়া না করে সে-দেশের সরকারের এক-তরফা সিদ্ধান্ত মেনে নেবার বিপদের কথাও রাজ্য সরকারের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিনা প্রতিবাদে এ-অবস্থা চলতে দিলে সিংহল ও অন্যান্য রাষ্ট্রও সুবিধা পাবে।

গুজরাট ঃ

অভ্যাস একবার হয়ে গেলে তার পরিবর্তন বড় কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নেশার অভ্যাস হলে তো কথাই নেই। নেশার প্রতি আসক্তি দুর্নিবার। ক্যান্সারের (কর্কট রোগের) আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত আমেরিকানরা সিগারেট ছাড়লেও ধূমপান ছাড়তে পারে নি। সিগারেট ফেলে ধরেছে তারা সিগার (চুরুট)। এখন নাকি তারা ভারতীয় বিড়ির ভক্ত হতে চাইছে।

এই বিড়ি পর্যন্ত যাতে আর নামতে না হয়—ধূমপানের অপ্রতিরোধ্য আসক্তি থেকে যাতে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এ আবিষ্কার রাজ্য সরকারের গবেষণাগারের। নিকোটিনের বিকল্প 'লোবেলাইন' মিশিয়ে নতুন ট্যাবলেট তৈরি করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে তার 'বিদিনা'। বিদিনা নেশার অভ্যাস পরিবর্তনে বিজয়ী হয়েছে। ঘাগু নেশাখোরকেও নাকি ঘায়েল করেছে। বিদিনাকে আমেরিকায় চালান দিতে পারলে নিশ্চয়ই বিশ্ববিজয় করে ফেলতে পারবে। ভারতের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হবে বিদেশী মুদ্রায়। গুজরাট সরকার নিশ্চয়ই এ সুযোগ ছাড়বেন না।

* * *

তিন বছরের শিশুরাজ্য গুজরাটের কর্মক্ষমতার তারিফ করতেই হয়। সেদিন গুজরাটের পাহাড়ে পাওয়া গেছে ক্ষুধাহর লতা। এবারে আবিষ্কার হল ধূমপানাসক্তদের আসক্তিনাশী বটিকা। একদিন হয়তো শুনবো গুজরাট আরও এগিয়েছে। আবিষ্কার করে ফেলেছে সকল নেশা—পলিটিকসের পথ পঙ্কিল, পিচ্ছিল করে তোলার নেশা, অতি মুনাফাখোরদের মুনাফা শিকারের নেশা, ছাত্রদের বই ফেলে রকবাজীর চোঙদার প্যাণ্ট পরে চারমিনার মুখে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবার নেশা কাটাবার ওষুধও আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমরা সেই শুভমুহূর্তের আশায় রইলাম। মাভৈঃ গুজরাট, তোমার জয় হোক।

আন্তর্জাতিক

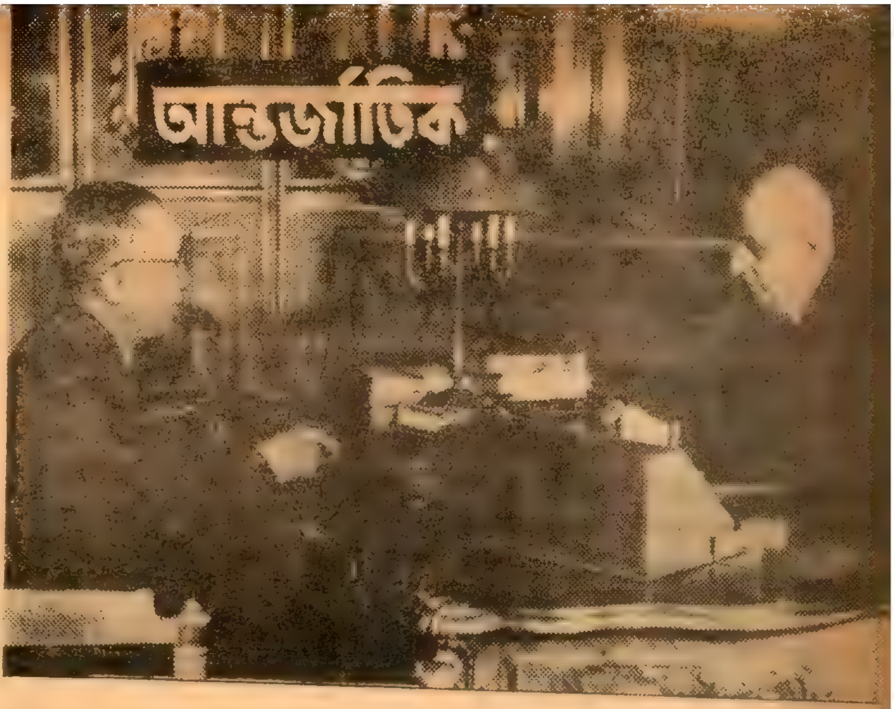

ফ্রান্স ঃ

রাষ্ট্রপতি দ্য গল প্যারিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যথারীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর এক দফা বিষোদ্গার করেছেন। দ্য গলের কথা, ইউরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলবে না। তাঁর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইউরোপের সকল রাষ্ট্রকে চেষ্টা করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসন অবশ্য দ্য গলের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপের ওপর কর্তৃত্ব করার কোন ইচ্ছা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউম, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ডঃ এরহার্ড ও ইতালীর প্রধানমন্ত্রী সিনর নেনি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন বলে জনসন ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী নীতির ব্যাপারে ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপে সম্পূর্ণ একা।

পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্য গল তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এরহার্ড সরকার এখনও মার্কিন কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। সম্প্রতি দ্য গল-এরহার্ড সাক্ষাৎকারের পরেও এরহার্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলার নীতিই বজায় রেখেছেন। অবশ্য পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলার ও ক্ষমতাসীন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ার-ম্যান আদেনুর এবং সহযোগী ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন দলের নেতারা দ্য গলের সঙ্গেই চলতে চান। দ্য গল আশা রাখেন, পশ্চিম জার্মানীতে এরহার্ডের নীতির পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত আদেনুরের নীতিই জয়ী হবে এবং পশ্চিম জার্মানী ফ্রান্সের সহযোগী হতে রাজী হবে।

• দ্য গলের সঙ্গে আলোচনারত ইউ থাণ্ট

লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে দ্য গল আবার বলেছেন, এই অঞ্চলকে নিরপেক্ষ অঞ্চল রূপে ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন সবাইকে এখান থেকে সরে যেতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। তাদের বক্তব্য, এ অঞ্চলকে নিরপেক্ষ করা ও মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেবার অর্থ হল সমগ্র অঞ্চলটিতে কমিউনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও এতে রাজী হতে পারে না।

• • ডঃ এরহার্ড

লাওস সঙ্কট সমাধানের জন্য দ্য গল যে চার রাষ্ট্র অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাও অগ্রাহ্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এর দ্বারা 'আক্রমণকে' স্বীকার করে নেয়া হবে।

* * *

ভারত হয়ে বার্মা যাবার পথে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট প্যারিস গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দ্য গলের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের কাছে ইউ থাণ্ট বলেন, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমস্যা সামরিক নয়, রাজনৈতিক ; অর্থাৎ, সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এর সমাধান হবে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে,—দ্য গলের এই অভিমতের সঙ্গে তিনি একমত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে 'আমেরিকার রাষ্ট্র সংস্থার' (Organisation of American states) অধিবেশনে কিউবার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক

● অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াশিংটনের প্যান আমেরিকান বিল্ডিং-এ ১৯টি মার্কিন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কিউবার সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন।

কিউবায় ফাইডেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির রাগ তো ছিলই, এবার তাদের অভিযোগ: ভেনিজুয়েলার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য ক্যাস্ট্রো উস্কানি দিচ্ছেন এবং অর্থ ও লোকজন দিয়ে এই কাজে সাহায্য করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক অন্যান্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আজ ভেনিজুয়েলায় যা ঘটছে, আগামীকাল অন্য যে কোন রাষ্ট্রে তা ঘটতে পারে।" সুতরাং এখনই কিউবার বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে।

কিউবার সঙ্গে সকল প্রকার কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছেদের প্রস্তাব এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নি। ১৫টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও, মেক্সিকো, চিলি, বলিভিয়া ও উরুগুয়ে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তারা এখনই কিউবার বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী নয়।

• ফাইডেল ক্যাস্ট্রো

যাই হোক, অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ঠিক হয়েছে: (১) ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্রে ক্যাস্ট্রোর লোকজন গোলমাল করার চেষ্টা করলে তা 'সেই রাষ্ট্রের ওপর কিউবার আক্রমণ' বলে গণ্য করা হবে, এবং এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে ও অন্য যে কোন রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করা চলবে; (২) 'আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার' অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্র কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে; (৩) খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ কিউবায় পাঠানো চলবে না, এবং কিউবা থেকে কোন জিনিষ কেনা চলবে না; (৪) কিউবার সঙ্গে কোনরূপ যাতায়াত সম্পর্ক রাখা চলবে না। তবে, মেক্সিকোর সঙ্গে হাভানার বিমান-যোগাযোগ বজায় রাখতে দেয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। নেহাৎ মানবিক কারণেই মেক্সিকোর এই দাবী অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মেনে নিয়েছেন—তা না হলে কিউবা-পলাতকরা কিউবা ছেড়ে আসবে কোন পথ দিয়ে।

কবে আমেরিকান রাষ্ট্রগুলি কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রগুলির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রের পক্ষেই এখনই সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা দূর করে তবে এ কাজ করতে হবে, এবং এর জন্য সময় লাগবে।

আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যাস্ট্রো অত্যন্ত কড়া কথা বলেছেন। সান্টিয়াগোতে দুই লক্ষ লোকের এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে ক্যাস্ট্রো বলেছেন, "যে সব রাষ্ট্র কিউবার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিউবাও তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না।" ক্যাস্ট্রো আরও বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি রাষ্ট্র যদি কিউবার প্রতি-বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে, তবে কিউবাও নিশ্চয়ই এই

• ডিন রাস্ক

সব রাষ্ট্রে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করবে।" অর্থাৎ, ক্যাস্ট্রো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, ভেনিজুয়েলা থেকে কিউবার লোকজন সরিয়ে আনা তো দূরের কথা, ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রেও তিনি অর্থ, অস্ত্র ও লোকজন দিয়ে বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করবেন।

সব দিক দিয়ে কিউবা-পরিস্থিতি আবার ঘোরালো হয়ে উঠল।

* * *

নিউ ইয়র্কের হার্লেম, ব্রুকলিন, রচেষ্টার প্রভৃতি অঞ্চলে নিগ্রোদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের দাঙ্গার ফলে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সুতরাং যত উত্তেজনাই থাক না কেন, নিগ্রোদের শান্ত হতে হবে। নিগ্রোদের প্রতি এই শান্তির আবেদন জানিয়েছেন, আমেরিকার বিখ্যাত নিগ্রো নেতা রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং। মার্টিন লুথার কিং নিউ ইয়র্ক তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের

মার্টিন লুথার কিং

কাছে শান্তিরক্ষা ও পারস্পরিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছেন। নিউ ইয়র্কের মেয়র রবার্ট ওয়াগনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মার্টিন লুথার কিং নিগ্রোদের বাসস্থান ও জীবিকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় পুলিশী আচরণ সম্পর্কে তদন্তের দাবীও জানিয়েছেন।

এবারের দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিকরা কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দেখা গেছে, যারা দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের অধিকাংশই তরুণ—১৪ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে তাদের বয়স। এদের অধিকাংশই বেকার—স্কুল-কলেজেও পড়ে না, কোথাও চাকুরীও করে না। হোটেলে-বারে ফুর্তি করে বেড়ায়, আর পথে-ঘাটে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। এরাই দাঙ্গার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। (এ যেন ঠিক একেবারে কলিকাতা শহরের অবস্থা।) হার্লেম অঞ্চলে একজন ১৫ বৎসরের নিগ্রো বালকের হত্যাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা সুরু হলেও, শেষ দিকে নিগ্রোরাই দাঙ্গায় বেশি অংশগ্রহণ করেছে। সমাজে সমান মর্যাদার অভাব, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বাস, শিক্ষার অভাব, চাকুরীর অভাব প্রভৃতির জন্য নিগ্রো-সমাজের মধ্যে যে ব্যাপক হতাশা রয়েছে, দাঙ্গার মধ্য দিয়ে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নিগ্রো-শ্বেতাঙ্গ সম্পর্কের উন্নতির জন্য তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিগ্রোদের অবস্থার উন্নতি। নাগরিক অধিকার আইন এই কাজে অনেকটা সাহায্য করতে পারবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

লাওস সম্পর্কে জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি সোভিয়েট ইউনিয়ন অপর যুগ্ম-সভাপতি বৃটেনকে স্পষ্ট

বাটলার

জানিয়ে দিয়েছে, আগষ্ট মাসের মধ্যে জেনেভা সম্মেলনে যোগদানকারী ১৪টি রাষ্ট্রের সম্মেলন ডাকতে হবে, আর তা না হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগ্ম-সভাপতির পদ ত্যাগ করবে, এবং লাওস সংকট সমাধানের জন্য নিজের ইচ্ছামত অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিযোগ, ১৯৬২ সালে জেনেভা সম্মেলনে লাওসের নিরপেক্ষতার জন্য যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে লাওসের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে ও মার্কিন সামরিক বাহিনী নিয়োগ করছে। অবিলম্বে এ সব বন্ধ করতে হবে।

তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতির পদ ত্যাগ না করার জন্য বৃটেন সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে আবেদন করেছে। বৃটেনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আর এ বাটলার মস্কো গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বৃটেন ১৪-রাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বানের বিরোধী নয়, কিন্তু তার বক্তব্য, এই সম্মেলন ডাকার আগে তিনটি সর্ত পালন করতে হবে। সর্তগুলি হল : (১) নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে সমগ্র লাওসের প্রধানমন্ত্রী রূপে প্যাথেট লাও পক্ষকে মেনে নিতে হবে ; (২) সকল পক্ষকে অবিলম্বে

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে; এবং (৩) ফেব্রুয়ারী মাসে যে পক্ষের সৈন্যদল যেখানে ছিল সবাইকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

জেনেভা সম্মেলন আহ্বানের পূর্বশর্ত রূপে বৃটেনের এই সব শর্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রহণ করতে রাজী হয় নি বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

* * *

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট মস্কোতে গিয়ে ক্রুশ্চেভ ও গ্রোমিকোর সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য পরিচালনা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইউ থাণ্ট ক্রুশ্চেভ ও অন্যান্য সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, কিউবা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করেছেন। আলোচনা শেষে ইউ থাণ্ট বলেছেন, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর মূল্যবান আলোচনা হয়েছে।

ইউ থাণ্টের মস্কো গমনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয় নি। কঙ্গো ও মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্য প্রেরণের জন্য যে ব্যয় হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার অংশ বহন করতে রাজী হয় নি, এবং এর জন্য কোন অর্থ দেয় নি। সোভিয়েটের মতে, এভাবে সৈন্য প্রেরণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ নীতিসম্মত নয় এবং পশ্চিমী স্বার্থেই এ কাজ করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এর জন্য অর্থ দেবে কেন? ইউ থাণ্ট সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের মত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ মত পরিবর্তন বা অর্থ প্রদানে রাজী হন নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের মতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হলে তা অন্যভাবে করতে হবে। কিভাবে তা করা যায়, সে সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ, গ্রোমিকো, জোরিন প্রভৃতি ইউ থাণ্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন খানকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড্ড বিপদে পড়েছে। 'জাতীয় শোক দিবস' উদ্‌যাপন সভায় নেগুইন খান ঘোষণা করেছেন, তাঁরা উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রমণ করবেন। উত্তর ভিয়েৎনামে হো-চি-মিন শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বলে নেগুইন খান খবর পেয়েছেন, সুতরাং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সৈন্য ও লোকজন প্রেরণ করা হলে উত্তর ভিয়েৎনামকে কমিউনিস্টদের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

• নেগুইন খান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনার বিরোধী। এর ফলে এই অঞ্চলের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়তে হবে। নানা কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তা পছন্দ নয়। তাই নেগুইন খানের এই ঘোষণার পরই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর নেগুইন খানের সঙ্গে দেখা করে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না পেলে নেগুইন খানের একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হবে না। তবে কথা হল, নেগুইন খান এমন একটা হুমকী দিলেন কেন? পর্যবেক্ষকদের ধারণা, এর কারণ দু'টি হতে পারে। সাধারণ ভিয়েৎনামীদের মধ্যে নেগুইন খানের বিশেষ কোন জনপ্রিয়তা নেই। তাই, সাধারণ মানুষের জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তিনি একটি চমক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। অথবা এমনও হতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ব্যারি গোল্ডওয়াটার রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় নেগুইন খান মার্কিন কর্তাদের ওপর চাপ দিয়ে বেশি করে মার্কিন সাহায্য আদায়ের জন্য এই ঘোষণাকে একটি কৌশল রূপে গ্রহণ করেছেন। গোল্ডওয়াটার ভিয়েৎনামে 'যুদ্ধজয়ে' মার্কিন ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, আরও পাঁচ থেকে ছয় হাজার মার্কিন সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রেরণ করা হবে।

বার্মা ঃ

বার্মা থেকে সকল ভারতীয়কে চলে আসতে হবে, বার্মার সমাজতন্ত্রী সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইন বার্মাকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবার যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তারই অন্যতম হল এই ভারতীয় বিতাড়ন। ঠিক হয়েছে, বিদেশীদের কোন কাজ দেয়া হবে না—তাদের সকল ব্যবসা (অতি ক্ষুদ্র ব্যবসা পর্যন্ত) বন্ধ করে দেয়া হবে। আর ভারতীয় মাত্রেই বিদেশী!

এ কথা ঠিক, বার্মার অর্থনীতি-ক্ষেত্রে—ব্যবসা, খনি, কাঠ প্রভৃতি ব্যাপারে একদল ভারতীয় ধনীর কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু তাদের দমন করার জন্য সাধারণ দরিদ্র ভারতীয়দের বিতাড়ন করতে হবে কেন? লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বংশপরম্পরায় বার্মাকেই নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই সুদূর পল্লী

অঞ্চলের চাষী। দীর্ঘদিনের ঘর-বাড়ি ও জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে এদের ভারতে তাড়িয়ে দেয়া মানবতার দিক দিয়ে তো বটেই, সমাজতন্ত্রের দিক দিয়েই বা কি করে সমর্থন করা যায়? আসল কথা, সমাজতন্ত্র নয়, উগ্র জাতিবিদ্বেষই এর কারণ।

বার্মা থেকে প্রায় দুই কোটি ভারতীয়কে চলে আসতে হচ্ছে। এদের অধিকাংশই মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আসবার সময় সামান্য সঞ্চয়ও এরা নিয়ে আসতে পারছে না।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বার্মা থেকে আগত এই উদ্বাস্তুদের জন্য জাহাজ ও উড়োজাহাজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, ভারত সরকারের প্রতিনিধি বার্মা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এদের সঞ্চিত ধনের কিছু অংশ আনার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। ফলে এরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে ভারতে আসছে, এবং পাকিস্তান-উদ্বাস্তুদের মত আর একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্র থেকে আজ ভারতীয়রা তাড়া খাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যে হিন্দুরা আসছে, তারা আমাদেরই অস্থি-মজ্জার অংশ। সিংহল থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বের করার চেষ্টা চলছে। বার্মা থেকেও ভারতীয়দের তাড়ানো হচ্ছে। অথচ, ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা নাকি অত্যন্ত বেশি।

তুরস্ক :

ইস্তানবুলে তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল। তুরস্কের অসুস্থ রাষ্ট্রপতি জেনারেল গুরসেন, ইরাণের রাজা রেজা শাহ পহলবী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ এই সম্মেলনে মিলিত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনু ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোও সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন।

● জেনারেল নে উইন

এই তিনটি রাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি মুসলিম কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব আয়ুব খাঁর অনেক দিনের। তবে ইস্তানবুল সম্মেলনে এ বিষয়ে খুব একটা আলোচনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

সম্মেলনের কর্তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এই সম্মেলন রাজনৈতিক কারণে আহ্বান করা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরী বিষয়ে সাহায্য করার জন্যই এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, এবং এ বিষয়ে নাকি তাঁরা অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছেন।

তবে সম্মেলনের কর্তারা যাই বলুন না কেন, ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরা সবাই 'সেণ্টো'র সদস্য। 'সেণ্টো'র

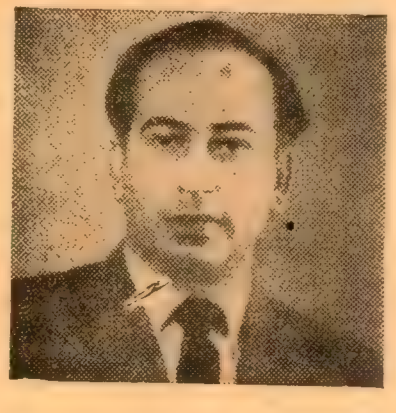

● ভুট্টো

বাইরে এদের হঠাৎ এভাবে মিলিত হবার প্রয়োজন হল কেন? 'সেণ্টো'র অপর সদস্য বৃটেন, বিশেষ করে পর্যবেক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে বসার কারণ কি? আসল কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরা সবাই ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের বক্তব্য, ভারতের হাত থেকে কাশ্মীর ছিনিয়ে আনার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে না। তুরস্কের কথা, সাইপ্রাসের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য তারা পাচ্ছে না। ইরাণের অভিযোগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের যথেষ্ট অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে না। তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারি করে লাভ কি?

ইস্তানবুল সম্মেলন এদের এই বিক্ষোভেরই মিলিত বহিঃপ্রকাশ।

ইন্দোনেশিয়া :

ইন্দোনেশিয়ার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ভাতের পরিবর্তে ভুট্টা খাবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। বাঙালীর মত ইন্দোনেশীয়দেরও প্রধান খাবার ভাত। শত শত বৎসর ধরে তারা এই অভ্যাস গড়ে তুলেছে। মুহূর্তের আদেশে এই অভ্যাস পাল্টানো যায় না। তাই সাধারণ ইন্দোনেশিয়াবাসী সরকারের এই প্রচেষ্টা ভালভাবে গ্রহণ করে নি। ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ভাত খাওয়া কমানো ছাড়া উপায় নেই। এই বৎসরই ইন্দোনেশিয়ায় চালের ঘাটতির পরিমাণ ২০ লক্ষ টন। এই চাল সংগ্রহ করার জন্য ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়েছে ইন্দোনেশিয়াকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক থেকে এ ব্যবস্থা চলতে দেয়া যায় না। তা ছাড়া এর ফলে ইন্দোনেশিয়াকে চিরকাল বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তার ওপর প্রতি বৎসর এদেশে ২,৩০০,০০০ লোক বাড়ছে। এভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়বে।

ওয়াশিংটনের চিঠি

● নিগ্রোদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ওয়াশিংটনে লিঙ্কনের মর্মরমূর্তির পাদদেশে সমবেত জনতা।

বিজন চট্টোপাধ্যায়

আমার বাসার কাছেই গ্যাবরিয়েল-দের বাড়ি। তার বড় ভাই স্যামসন গীটার বাজিয়ে বর্ষার দিনে যখন গান ধরে, তখন মনে হয় যেন সমস্ত প্রকৃতিতে কান্না ছাড়া আর কিছুই নেই—আকাশ পৃথিবী জুড়ে একটি সুর ছাড়া আর যেন কোন সুরই বাজে না। গানে গানে সে নালিশ জানায় ঈশ্বরের কাছে, 'হায় ভগবান, আজকের দিনে কেন আমায় নিগ্রো করে সৃষ্টি করেছো, আমি কি অন্যায় করেছি' —কতবার তার মুখে এ গান শুনেছি। এ গান শুনলেই মনে পড়তো—আমাদের অন্তর-উদাসী অতুলপ্রসাদের গানের কথা—যেখানে না পাওয়ার অনন্ত দুঃখ কান্নার সরোবরে কমল হয়ে ফুটে উঠেছে।

গ্যাবরিয়েলের বাড়ির সবাই গাইতে পারে। খেলার ধূলায়ও সবাই ওস্তাদ। সাদা আমেরিকানদের পাড়ায়ই তাদের বাড়ি। সাধারণত ওরা থাকে নিজেদেরই এলাকায়। সে এলাকা সাদা আমেরিকানদের এলাকার মত পরিচ্ছন্ন নয়। রাজধানী ওয়াশিংটন এলাকায় মোট অধিবাসীর প্রায় অর্ধেকই তো নিগ্রো। চার লাখেরও বেশি নিগ্রো রয়েছে এই শহরে। আর প্রায় তের-চোদ্দটি বড় বড় শহরের প্রত্যেকটিতে এদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। শতকরা ৯০ জনই লেখাপড়া জানে। বহু বড় বড় সরকারী চাকরীতে নিগ্রো রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীও আছেন। আমেরিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০'৫ জনই নিগ্রো। সংখ্যায় এরা আজ প্রায় ২ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

আফ্রিকার এই সরল সন্তানদের একদিন এই অহল্যা-ভূমিতে ফসল ফলানোর জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল পায়ে বেড়ি আর হাতে হাতকড়া দিয়ে। সেদিন তারা ছিল কয়েক লাখ। তারা ছিল ক্রীতদাস—'কালো ঘোমটার নীচে অপরিচিত ছিল তাদের মানব-স্বরূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।' ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই দিয়ে সব অত্যাচার, অপমান, উপেক্ষা তারা মুখ বুজে সয়েছে যুগের পর যুগ। তাদের ভাষাহীন ক্রন্দন ব্যথিত করেছে যুগে যুগে বহু মানুষকে। এব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন এদেরই একজন। একশ' বছর আগে তিনিই তাদের মুক্তি দিয়ে গেলেন। সেদিন সে মুক্তি তাদের অর্জিত মুক্তি ছিল না—সেই নিরুপায়ের দলের শ্বেতকায়দের অর্থ-নৈতিক দাসত্ব স্বীকার করে নিতে হল; কিন্তু মানবপ্রেমিক লিঙ্কন তাদের প্রাণের দরদ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে চেতনা সঞ্চার করে গেলেন, শতাব্দীর শেষে দেখি আজ ধীর পদসঞ্চারে হলেও তারা অনেক দূর এগিয়েছে, তাদের মধ্যে এসেছে নতুন প্রাণস্পন্দন। গায়ের রং কালো বলে তারা যে-কোন দিক দিয়েই অন্য কারোর চেয়ে হীন নয়, এই কথা আজ প্রত্যেকটি নিগ্রো মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে। তাদের জন্য অনেক জায়গায়ই দুয়ার ছিল রুদ্ধ—সেই রুদ্ধদুয়ার খোলার জন্য, সমান আসনে তাদেরও গ্রহণ করার জন্য নিগ্রো ও শ্বেতকায় উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন।

শ্রীমতী গ্যাবরিয়েল এদেরই একজন, ছাত্রসমাজের অন্যতমা নেত্রীস্থানীয়া মহিলা।

কালবৈশাখীর আকাশের ঝিলিক-মারা বিদ্যুতের মত ঐ মেয়েটি প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বুদ্ধি তার খাপখোলা তলোয়ারের মত—চলার ভঙ্গী দৃপ্ত। কালো পাথরের মত গায়ের রং—আর স্বাস্থ্যটি ভরা-গঙ্গার মতো। কলেজে সকলেই তাকে ভালবাসে। ছাত্রমহলেও তার খুব সুনাম। কারণ মেয়েটি আদর্শবাদী হলেও অন্ধ নয়, দৃষ্টি তার সজাগ। নিজের দেশ জাতি ছাড়িয়ে বিশ্ব-মানবলোকে তার দৃষ্টি প্রসারিত।

গ্যাবরিয়েল বলছিল—দেখো চ্যাটার্জী, ভারতের মানুষকে আমার বড় ভাল লাগে। তাদের দেশের আদর্শ মানুষের আদর্শ যেমন উঁচুতে বাঁধা এমন আর কোন দেশে দেখি নি। আমি তোমাদের মহাভারত, রামায়ণ পড়েছি। প্রত্যেকটি চরিত্র অপূর্ব, অনবদ্য। সংসার-পথিকদের পথের নিশানা এই দু'খানি পুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে। এই মহান পুস্তক যে-দেশের

সৃষ্টি, সে-দেশে মহাত্মা জন্মাবে না তো কোথায় জন্মাবে।

—তুমি মহাত্মার নাম শুনেছো ?

—আমাদের নেতা মার্টিন লুথার কিং-এর কাছে তাঁর নাম আমরা অনেক আগেই শুনেছি। তবে আমাদের

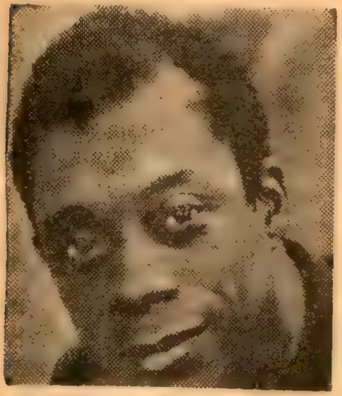

● প্রখ্যাত নিগ্রো সাহিত্যিক জেমস বলডুইন।

সমাজের সাধারণ লোক তাঁর কথা তেমন কিছু জানে না। তুমি জানো, বাসে আমরা শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারতুম না—অনেক রেস্তোরাঁয় আমাদের প্রবেশ ছিল নিষেধ। আলাবামার মণ্টোগোমারীতে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস আন্দোলন আমরা চালিয়েছিলুম। সে আন্দোলনে আমরা জয়ী হয়েছি।

—এতে জয়-পরাজয়ের কি আছে গ্যাবরিয়েল, তারা কি তাদের সমাজে তোমাদের গ্রহণ করেছে ?

—না সকলেই করে নি, তবে অনেকেই করেছে—তবে তার জন্য আমাদের আরও আন্দোলন করতে হবে। আমিও এখন এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবো।

—আচ্ছা গ্যাবরিয়েল, কালো-সাদার এই লড়াই-এর অবসান কি কোন কালে হবে ?

—কেন হবে না ?

—কি দিয়ে হবে ? তোমাদের কোন্ হাতিয়ারই বা আছে!

—মামুলী হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই—এই লড়াই-এর কৌশল তো তোমাদের দেশের নেতার কাছ থেকেই পেয়েছি। তবে আমাদের যে হাতিয়ার আছে, তা পৃথিবীর সকল হাতিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী,—দুঃখই সেই হাতিয়ার। এই দুঃখই তো সমগ্র জাতিকে সংহত করেছে, লক্ষ্যাভিসারী করেছে। দেখা দিয়েছে ত্রাণকর্তা শক্তিরূপে—এ দুঃখকে আমরা বরণ করেছি—

বলতে বলতে উচ্ছ্বাসে আবেগে সে যেন ফেটে পড়ছে। মাঝে মাঝে গলার আওয়াজ উঠেছে সপ্তমে। গ্যাবরিয়েল পরিবারকে জানি অনেক কাল ধরে। ধর্মনিষ্ঠ পরিবার, বাবা যাজক। বাকী অন্যান্যরা কেউ বা মাস্টার, কেউ বা ডাক্তার। অন্যান্যরা ছোটখাট কাজকর্ম করেন। আমেরিকার বে-সরকারী শ্বেতকায়দের প্রতিষ্ঠানে নিগ্রো কর্মচারী যে নেই, তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় তের জন। সরকারী বহু উচ্চপদেই নিগ্রো কর্মচারী রয়েছেন। ইউ-এস-আই-এস-এর প্রধান কর্মকর্তাই তো একজন নিগ্রো—তাঁর নাম কার্ল টি রোয়ান। তারপর সাহিত্যের ক্ষেত্রে জেমস বলডুইন, কাব্যের ক্ষেত্রে ডানবার, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পল রবসন, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে র‍্যালফ বাঞ্চ-এর মত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরা রয়েছেন। নিগ্রোরা আজ সকল ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শ্বেতকায়দের হারে নয়, সমান অধিকার থেকেও তারা অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত। তাদের মধ্যে শিল্পী, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক অনেকেই রয়েছে, কিন্তু দক্ষ কারিগর ও বিজ্ঞানীর সংখ্যা কম। কারণ, হাতে-কলমে শেখবার সুযোগ তারা পায় নি। আজ সমসুযোগের দাবী তারা তুলেছে। আইন তাদের সহায়ক হয়েছে। তবে কার্যক্ষেত্রে

● ওয়াশিংটনে নাগরিক অধিকার অভিযানের একজন অভিযাত্রী

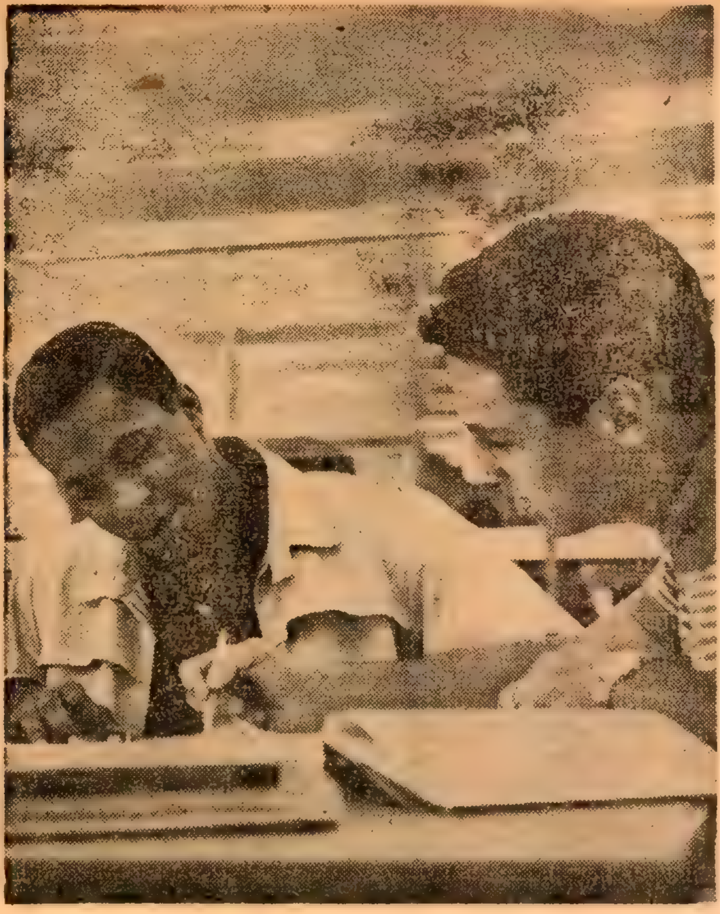

বিদ্যালয়ে বৈষম্যনীতি বিসর্জন

তা কতটুকু সাফল্যলাভ করবে, তা বলবার সময় এখনও আসে নি।

আমি গ্যাবরিয়েলকে বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি বলছো—ভারত দুঃখের জোরে, অহিংসার পথে স্বাধীনতা পেয়েছে, ইংরেজ দিয়েছে সেই স্বাধীনতা—গ্যাবরিয়েল, এ তো আংশিক সত্য। কারণ—স্বাধীনতা, স্বাধিকার কি কেউ দিতে পারে? গায়ের জোর, মানসিক শক্তি কি কেউ দিতে পারে—এ যে অর্জন করতে হয়, তপস্যা ও সাধনায় অর্জন করতে হয়—কেউ কাউকে দিতে পারে না, তবে সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন বুদ্ধিজীবী, উন্নত, সহৃদয় ইংরেজ ভারতের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। সে সমাজ রয়েছে আমেরিকায়ও—বর্তমান নাগরিক অধিকার আইনটি তার প্রমাণ। ভারতের এই অহিংস সংগ্রামের পেছনে রয়েছে কত হাজার বছরের ইতিহাস, কত দীর্ঘদিনের তপস্যা—দেশ বিদেশের কত মনীষীর ভাবনা। চেয়ে দেখো অতীত ইতিহাসের দিকে—দেখবে নিরন্ধ্র অন্ধকার আকাশে ঔপনিষদিক আদর্শ বুদ্ধ, অশোক, হর্ষবর্ধনের জীবন, তারপর এ যুগে টলস্টয়, থোরোর বাণী এবং মহাত্মাজীর জীবন ও বাণী উজ্জ্বল তারার মত জ্বল জ্বল করছে—এরা ভাবীকালের পথের মশাল। মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন, এ তো কৌশল নয় গ্যাবরিয়েল।

—যাঁরা নেতা তাঁদের পক্ষে নয়—কিন্তু তাঁদের অনুগামীরা সকলেই তো সত্যাগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না, মিঃ চ্যাটার্জী। অতীত ইতিহাসের সকল যুগের সকল শ্রেষ্ঠমানবের ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী পরবর্তী যুগের মানুষরা। যোগ্য অধিকারী হয় ক'জন।

—উত্তরাধিকার যে অর্জন করতে হয়, গ্যাবরিয়েল। সমান অধিকার দাবী করলেই তো তা পাওয়া যায় না।

—অর্জন করার পথ তো চাই মিঃ চ্যাটার্জী। পথ তৈরির জন্যই আইন রচিত হয়েছে। এমনি আইন রচিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালেও। সুপ্রীম কোর্ট তার আট বছর পরে সেই আইনে আমাদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা কেড়ে নিলে। আইনের প্যাঁচে তা সেদিন টেকে নি। এবার আর একটি যুগান্তকারী আইন রচিত হয়েছে, কিন্তু আইন যে লেখা থাকে পুঁথির পাতায়।

—সত্যি গ্যাবরিয়েল, আইন লেখা থাকে পুঁথির পাতায়, সে কথা বলে না। মানুষ তা নাকচ করে দেয়। আবার সেই মানুষই আইন কার্যকরী করে, তাই আজ মানুষের অন্তরের পরিবর্তন চাই। হোটেল, রেস্তোরাঁ, থিয়েটারে, চাকরী-বাকরী, ভোটদান এবং পড়াশুনার সকল ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য নীতি এই আইনে নিষিদ্ধ হয়েছে। এটিকে কার্যকরী করার জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন—কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও এজন্য নিয়োগ করা হয়েছে। মোটা মাইনের চাকরী ছেড়ে দিয়েও কেউ কেউ এটিকে কার্যকরী করার কাজটি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ যে সামাজিক সমস্যা—বৃহত্তর সমাজের অন্তরের পরিবর্তন ছাড়া তো এ সম্ভব নয়—

—কি করে সেই পরিবর্তন ঘটবে।

—এই অহিংস লড়াই-এর মাধ্যমেই। এই অহিংস সংগ্রামই অপর পক্ষের শুভবুদ্ধি, কল্যাণবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলবে। আর এই আইন জাগিয়ে তুলবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে—তার পরাভব ঘটতে পারে এই অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমেই। তাই যারা কালো তারা ত্যাগ, তপস্যা ও চরিত্রে যেদিন আলো হয়ে জ্বলবে, সেদিন 'আমাদের গ্রহণ করো, আমাদের গ্রহণ করো' বলে চেঁচাতে হবে না—অতীত সংস্কার মুছে নিয়ে সেদিন পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেবে কলঙ্কমুক্ত মানব। ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে কেবল ২ কোটি মানুষেরই নয়, সেদিন হয়তো বিশ্বমানব-সমাজের বহু সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

ওয়াশিংটনের আবহাওয়ায় গ্রীষ্মের আমেজ—সন্ধ্যায় নিয়ন আলো জ্বলে উঠেছে। এই ঘরে আমার প্রদীপের আলো আকাশের নক্ষত্রলোক, সব আলো ঢেকে রাখে, মানুষের বেলায়ও তাই-ই।

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পঞ্চম প্রবাহ ॥

("উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যসম্ভার ছিল তণ্ডুল।")

বরেন্দ্রভূমি যেমন প্রাচীন, তেমনি এর নদীগুলিও পৌরাণিক কালের। নদীগুলি এ-অঞ্চলের জীবন-সরণি। রামায়ণে, মহাভারতে তাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

করতোয়া নদীর তর্পণঘাটে মহাকবি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। পঞ্চপাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকাল একদিন আত্রাই নদী অতিক্রম করে গিয়েছিল করদহ গ্রামে।

করতোয়া।
আত্রাই।
পুনর্ভবা।
টাঙ্গন।
মহানন্দা।

এই পঞ্চ নদী। পঞ্চকন্যার মত যুগ যুগ ধরে উত্তর বাংলার রুক্ষ-কঠিন খিয়ার মটিকে শস্যে সম্পদে শ্রীময়ী করে রেখেছিল। একদিন করতোয়া আর আত্রাই, পুনর্ভবা আর টাঙ্গনের স্রোতে বজরা ভাসিয়ে দূর-দূর দেশ থেকে আসতো বাঙালী বণিকরা। ঘাটে ঘাটে তরী বেঁধে পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা চলে যেতো দেশের অভ্যন্তরে জনবহুল নগরের দিকে।

আজ শত শত শতাব্দী পরে আত্রাই, পুনর্ভবার কৃশ-করুণ রিক্ত রূপের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করা যায় না যে, একদিন বগুড়া, দিনাজপুর জেলার বাণিজ্য সুসম্পন্ন হতো এই নদীপথে। করতোয়ার দু'পাড়ে রুক্ষ-অনুর্বর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আজ আর কেউ ভাবতে পারবে না এই নদীর দুই তীরে নিবিড় শালবনের অপরূপ ছবিটি। একদিন করতোয়ার তীরের এই শালের ঘন অরণ্য ছিল বাঙালী কাষ্ঠব্যবসায়ীদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। নদীর তীরে নৌকো নোঙর করে তারা লোকজন নিয়ে যেত অরণ্যে। আসতো দূর দেশ থেকে কবিরাজদের অনুচররা। লুব্ধ দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াতো কোথায় আছে অনন্তমূল, কোথায় আছে শতমূলী। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানমতে ওষুধ প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীরা ভারে-ভারে নিয়ে যেত শতমূলীর শিকড়, অনন্তমূলের গাছ।

কিন্তু, এই উত্তর বাংলা অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যসম্ভার—তণ্ডুল। মাঠের পর মাঠ জুড়ে ফসল হয় আমন-ধানের। বছরের এক মাত্র ফসল। কিন্তু হয় অপর্যাপ্ত। যেই আষাঢ়ে আকাশ কালো করে মেঘ জমে, কৃষকদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঝম্ ঝম করে বৃষ্টি নামে। বরিন্দের আদিগন্ত প্রান্তর মহাসমুদ্রের রূপ ধরে। কৃষাণরা বীজ ছড়িয়ে দেয়। ভাদ্র-আশ্বিনে উত্তর বাংলার মাঠকে মনে হয় সবুজের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় নীবার ধান্য-মঞ্জরী বাতাসে মাথা দোলায়। ধান পাকলে সে আর এক অপরূপ দৃশ্য। মনে হয়, মাঠে-মাঠে কে যেন সোনার স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে। ধান্যের বিপুল সম্ভারে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিগন্তরে। ঠিক এই সময় ঢাকা থেকে, পাবনা থেকে আসতে সুরু করতো বাঙালী তণ্ডুল-ব্যবসায়ীরা।

দিনাজপুরের পশ্চিম অংশের চাউল রপ্তানী হতো মহানন্দা নদী দিয়ে। মহানন্দা নদীর বুকে ব্যাপারীদের নৌকোর ভিড় লেগে যেত। নদীতীরে বড় বড় আড়তে মজুত-চাউল বস্তাব করে বোঝাই করা হতো। তারপর বাণিজ্যতরীর বহর আবার একদিন সাদা পাল তুলে চলে যেত বিহারে,

যেত উত্তরপ্রদেশের সুদূর অভ্যন্তরে। আর—

এই জেলার পূর্বপ্রান্তের সমস্ত তণ্ডুল-রপ্তানী—তিস্তার উপনদী আত্রাই, করতোয়া আর পুনর্ভবার নদীপথে। কল্পদ্রুমে লেখা আছে এই ধান্য-ব্যবসায়ের ইতিহাস সবিস্তারে। লেখা আছে পুরাণে।

স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, সমগ্র গণসমাজকে সেকালে পরিশ্রম করে চিদান্ন সংগ্রহ করতে হতো। তখনও জমিদারীপ্রথা চালু হয় নি। বাঙালীর মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে তখনো অলসতা আর স্বপ্নবিলাসের বিষ প্রবাহিত হয়ে যায় নি। হয় কৃষিকাজ, না হয় কার্পাসশিল্প, কিম্বা তাঁতের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতো বাঙালী।

পাবনা জেলার অতি পুরোনো ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে দেখেছি, সেই এককথা---The weaving of cotton cloths on hand-looms is old industry in Pabna.

বস্ত্রবয়ন পাবনার অতি সুপ্রাচীন-কালের একটি শিল্প। অনেক ঝড়-দুর্যোগ গেছে। বহু বাধা-বিপত্তি কাটিয়েও এই তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা সাধারণ লোকের পেটের ভাত জোগাতো।

পাবনার তাঁতের সুতোর খ্যাতি সুদূর চট্টগ্রাম ও ঢাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকার সেই বিখ্যাত মসলিন যে সুতো দিয়ে তৈরি হতো, সেই সুতোর মত মসৃণতা আর সূক্ষ্মতা ছিল পাবনার কাটুনীদের তৈরি সুতোর।

শুধু মালদহের রেশমবস্ত্র নয়, পাবনার সূক্ষ্ম সুতোর প্রশংসা করলে বস্ত্র-ব্যবসার সব কথা বলা হবে না।

এই প্রাচীন বঙ্গদেশের কার্পাসবস্ত্রের ব্যবসার উল্লেখ আছে ইবন খুর্দদবা নামে এক আরবীয় পণ্ডিতের ভ্রমণ-কাহিনীতে। তিনি বলেছেন, 'এ দেশে এক প্রকার সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হইত, অন্য কোন দেশে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হইত না, এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও কোমল ছিল যে, একটা আংটির ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যাইত।'

এই কার্পাসশিল্পের কথা উঠলেই মন ভেসে ভেসে চলে যায় অনেক—অনেক দূরে ইতিহাসের কুয়াশাময় অন্ধকারে।

শত শত শতাব্দী পূর্বে এই বঙ্গদেশের শহরে নগরে পরিভ্রমণ করতে এসেছিলেন এক বিদেশী। এই সুপ্রাচীন জনপদের বিদ্যার খ্যাতি, সংস্কৃতির খ্যাতি তিনি শুনে-ছিলেন। কিন্তু চমৎকৃত হলেন জ্ঞানে গরিমায় উন্নত এদেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দেখে। বিদেশীর নাম—চাও-জু-কুয়া পিং-কলো। কার্পাসবস্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

এসেছিলেন দুঃসাহসী মার্কো পোলো। তিনিও এই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কার্পাস-প্রীতি দেখে লিপিবদ্ধ করেছেন কয়েকটি অমূল্য কথা: 'এদেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন করে এবং তাহাদের ব্যবসা ছিল খুব সমৃদ্ধ। ----'

তার অনেক—অনেক দিন পরে আরও একজন চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান এসেছিলেন বঙ্গদেশে। তাঁর বিবরণের ভেতরে এদেশের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সুখী আর সম্পন্ন জীবনধারার ছবি ফুটে উঠেছে। ------এদেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়; এদেশে রেশমের কীট পালিত ও রেশমনির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়-----.

কার্পাস—কার্পাস—কার্পাস। বাংলার অতীত ইতিহাসে যেন শুধু কার্পাস-শিল্পের খ্যাতির মহিমা ছড়িয়ে আছে। এই বস্ত্রশিল্প, তাঁতশিল্প আমাদের সুদূর অতীতের জীবনকে, মনকে একেবারে যেন কুয়াশার মত বেষ্টন করেছিল।

আমার মনে হয়, শুধু ত্রয়োদশ শতক কি পঞ্চদশ শতক নয়, একেবারে পৌরাণিক কালের সেই রামায়ণ-মহাভারতকে ছুঁয়ে চলে আসতে হবে চর্যাগীতির কালে। এখানেও আছে আমাদের দেশের কার্পাসের প্রশস্তি।

চর্যাগীতি আনন্দ-সংগীত। গানে আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস আছে। সব কথা স্পষ্ট নয়, তবুও বুঝতে পারা যায়, গায়ক তুলোর বন্দনা গাইছে:

'হেরি সে মেরি তইলা বাড়ি খসমে
সমতুলা।
সুকত এসে রে কপাসু ফুটিলা ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না
বাড়ি উএলা ॥
ফিটেলি অন্ধ্যারি রে আকাশ
ফুলিআ ॥'

এই কয়েকটি লাইনের তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃত করা হয়েছে:

মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্ট্বা
খসম সমতুল্যাম্
কার্পাসপুষ্পম্ প্রস্ফুটিতম অতার্থ।
আনন্দিত ভবতি।

বাড়ির বাগানে কার্পাসের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়াই আনন্দ যেন ঘরের চারপাশে উজ্জ্বল হইল, আকাশের অন্ধকার টুটিল।

শান্তিপাদের একটি পদে আছে—

'তূলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু।
আঁসু ধুনি ধুনি নিরুবর সেসু ॥
তূলা ধুনি ধুনি শুনে আহা রিউ।
পুন লইয়া অপনা চটারিউ ॥'

তুলো ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ বাহির করা হইতেছে—আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছুই বাকী থাকে না। তূলা ধুনিয়া শূন্যে উড়াইতেছি। আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি----

এই বস্ত্রশিল্প যে জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তুলো-ধোনার বাস্তব চিত্রটি তার প্রমাণ। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ মেলা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুধু প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাগুলিই ফসল ফলায় না, সেখানে ছোট ছোট পত্রিকার অবদানও স্বীকার্য। ছোট ছোট পত্রিকাগুলির অর্থাভাব থাকলেও, উক্ত পত্রিকাসমূহের পরিচালকবৃন্দের প্রচেষ্টায় পত্রিকার মান অনেক সময় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার চেয়েও অধিকতর উন্নত হয়। অবশ্য ঐ সব পত্রিকা দীর্ঘায়ু নয়। কেবল যাঁরা ঐ সব পত্রিকায় রচনা দান করে থাকেন, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে রথী-মহারথী হিসেবে পরিগণিত হন। বর্তমানে এমন অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, যাঁরা একদা তথাকথিত ছোট ছোট কাগজে রচনা দান করে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সেই প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হয়েছিল তাঁদের জীবনবোধের গভীরতায়। তাই পত্রিকা ছোট কি বড়—সে প্রশ্ন ছিল অবান্তর। লেখার মানদণ্ডে পত্রিকার মান নির্ধারিত হত। ঐ কারণে 'কালি-কলম', 'কল্লোল', 'অভ্যুক্ত' একদিন অর্থবলে বলীয়ান না হয়েও নতুন পথ প্রশস্ত করেছিল।

আর একালে ছোট ছোট পত্রিকা বের হয়। সেকালের মতো পত্রিকা প্রকাশের সমস্যা এখন ততোখানি গভীর নয়। যে কোনো অনামী লেখক তার প্রথম দিনের রচনা প্রকাশ করার সুযোগ নিজেই খুঁজে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যিকারের কিছু সৃষ্টি হয় কিনা—সে প্রশ্নটা সে সব ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র খাস কলকাতায়। কয়েকজন নবীন সাহিত্যব্রতী যেমন এক একটি গণ্ডি রচনা করে পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন, তেমনি মফস্বল শহরেও আজকাল ছোটখাট পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু সাহিত্যধর্মী পত্রিকা ছাড়া অন্য জাতীয় পত্রিকাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়; যেমন পূজা-পার্বণ ও জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা। এ ছাড়া রয়েছে ইস্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন। ঐ সব পত্রিকার দেহে 'ম্যাগাজিনে'র গন্ধটুকু থাকলেও—আসলে উদ্দেশ্য সবারই মহৎ। অবশ্য ম্যাগাজিনগুলি নিয়মিত প্রকাশের সুযোগ পায় না—পায় না যথার্থ স্বাধীনতা। তাই বাধাও থাকে প্রচুর। পূজা-পার্বণ বা জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্য থেকে অনেক সময় গবেষণালব্ধ কোনো বস্তু

জয়ন্তী সেন

হঠাৎ লাভ করা যায়। কিন্তু তাদের বাহ্যিক মূল্য সামান্যই। তাই বলা যায় বড় বড় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার পাশে ছোট ছোট পত্রিকাগুলি যে ক'টা দিন বেঁচে থাকে, সে'কটা দিন একটা আয়োজনের ঘোষণা নিয়েই বাজার মাৎ করতে চায়।

'সোভিয়েত দেশ': সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকাটি ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগের পক্ষ থেকে ও পি বেঙ্গুখ-এর সম্পাদনায় যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে মনে হয় শুধু বার্তা প্রচার করাই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য নয়। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোতেই পত্রিকাটির গৌরব। বিগত জুন মাসের ১২শ সংখ্যাটি শ্রীনেহরুর স্মৃতি-তর্পণ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি কেবলমাত্র শ্রীনেহরু সম্পর্কিত রচনাতেই সমৃদ্ধ নয়, এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের দুর্লভ আলোকচিত্র। ১৯২৭ সালে জওহরলাল নেহরু যখন প্রথম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেন তখন মস্কোতে তোলা তাঁর একটি আলোকচিত্র এই পত্রিকায় সংযোজিত হয়েছে। আলোকচিত্রটি নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রীর মানসচিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে।

বিভিন্ন রচনার মধ্যে বেনেদিক্তভের "ভারতের মহান সন্তান", ইলিয়া এরেন গোর "যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন", রাহুল বর্মার "ভারত-সোভিয়েত অর্থ নৈতিক সহযোগিতা", কে গোপালকৃষ্ণণের "জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী", গিরিজাকুমার সিংহের "ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা" ও সেমিওন পোত্রোকের "চাচা নেহরু" তথ্যবহুল ও মর্মস্পর্শী। সচিত্র "সোভিয়েত জনগণের চোখে নেহরু" এবং শ্রীনেহরু ও ক্রুশ্চেভের অন্তরঙ্গ দৃশ্যপট ভাবীকালের মানুষের কাছে প্রেরণার বস্তু হয়ে থাকবে। দুই দেশের মিলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশের গৌরব সমৃদ্ধতর হোক—একথা আমরা মনে প্রাণে কামনা করি।

নজরুল ইসলামের পঁচাত্তরতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটিতে (৬, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলি: ৯) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কাজী আবদুল ওদুদ, নরেন্দ্র দেব, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, বাণী রায় ও শ্যাম রায় প্রভৃতির রচনা নতুন তথ্য সরবরাহের গুণে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের পত্রিকার আয়ু যে কী তা সবারই জানা, তবু এর অবদান অসামান্য।

কলেজ ম্যাগাজিন হিসাবে অধ্যাপক সুধাংশু শাসমল সম্পাদিত **কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ পত্রিকা**'র নাম এখানে উল্লেখনীয়। কলেজ-শিক্ষক ও ছাত্রদের বাংলা ও ইংরেজি রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকায় যেমন কাঁচা তেমনি পাকা হাতের লেখাও রয়েছে। অবশ্য পত্রিকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বিজেন্দ্রলাল, স্বামীজি, ক্ষীরোদ-প্রসাদ ও উপেন্দ্রকিশোর সম্পর্কিত শত-বার্ষিকীর রচনাবলী। এছাড়া 'হলদিয়া' 'গান্ধীজি', 'নজরুল' ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে রচনাগুলিতে নতুন দিকে আলোকপাতের চেষ্টা আছে।

কলকাতার বাইরে ছোট ছোট যেসব পত্রিকা বের হয়—তাদের সংখ্যা নগণ্য না

হলেও এখানে যে কয়টির নাম উল্লেখ করা হল, তারা আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দার্জিলিঙ থেকে শ্রীমতী রেবা বসু সম্পাদিত 'কিংশুক' আবির্ভাব মুহূর্তেই নতুনত্বের আস্বাদ দান করে। পত্রিকাটিতে বহু লেখক-লেখিকার মধ্যে শ্রীনরেন দেব, হরেন ঘোষ, অরুণ মৈত্র প্রভৃতির নাম আকর্ষণীয় হলেও আমরা চাই পত্রিকাটিতে যাতে আরো বেশি আঞ্চলিক তথ্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়।

অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্তী সম্পাদিত ও শিলিগুড়ি 'মিলেমিশে' সাংস্কৃতিক সংস্থা-প্রকাশিত **'উত্তরা'**র মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে উত্তর বাংলারই বৈশিষ্ট্য। আবার নিত্যগোপাল সামন্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক **'আভাতি'**র (বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা) কবিতা, গল্প ও অনুবাদগুলি সুলিখিত। শেক্সপীয়রের রচনার অনুবাদে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের দক্ষতা প্রশংসনীয়। অজয় সেনগুপ্তের নাটিও পাঠযোগ্য। হরিদাস চক্রবর্তী ও চিদানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত ও আগরতলা থেকে প্রকাশিত **'শুভার'** পত্রিকার প্রবন্ধগুলি সযত্ন-লিখিত। আমাদের মনে হয়, 'শুভায়' যেন ধীরে ধীরে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে।

কলকাতা থেকে অজস্র ছোট ছোট পত্রিকা বের হচ্ছে। 'ছোট' শব্দটি অবশ্য সর্বত্রই একইভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত **'নবজাতক'** (১৩/১ পাম এভিনিউ, কলিকাতা-১৯)। এর মূল্য মাত্র ৭৫ পয়সা, কিন্তু পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। কেন না পত্রিকাটিতে যে মানবোচিত আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে, একালে তার জন্যে ক'জনই বা সাধনা করেন! এতে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ, অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিঠি, নির্মলকুমার বসুর প্রবন্ধ, মৈত্রেয়ী দেবীর 'কাব্য ও উদ্ধৃতি' এবং প্রখ্যাত কবিদের কবিতা। এই ধরণের পত্রিকার প্রচার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কাম্য। গিরিজাশঙ্কর মিশ্র ও শঙ্কর চক্রবর্তী সম্পাদিত **'ছায়ানট'**-এর (১৩/৩ মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট, খিদিরপুর) ক্ষীণকায় অবস্থা দেখে পরবর্তী সংখ্যার প্রকাশ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। তবু কয়েকটি রচনার মধ্যে মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিত্তাকর্ষক। তুষার রায় সম্পাদিত **'অয়ন'**-এর (১২ জে, পাইকপাড়া ফাষ্ট রো কলি: ৩৭) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রচুর সম্ভাবনাময় একটি মাসিক পত্রিকা। এতে লিখেছেন বিনয় ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু প্রভৃতি খ্যাতিমান লেখক। তাছাড়া পত্রিকাটির সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতিরূপে সমরেশ বসু থাকায় এর গৌরব অবশ্যই বৃদ্ধি লাভ করবে। অমিত রায় সম্পাদিত **'অধুনাতন'** (২১৯ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট, কলি: ১২) প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার ত্রৈমাসিক সংকলন। আষাঢ়ে প্রকাশিত 'অধুনাতন' বিশেষভাবে রবীন্দ্র-শেক্সপীয়র সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে অজিতকুমার ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, বীরেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম রায়, বিশ্বনাথ কয়াল, শান্তনু দাস ও শ্যামল বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন চৌধুরী সম্পাদিত **'তন্দ্রা'** '২৮, মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট, কলি: ২৩ (, প্রতি তিন মাস অন্তর নতুন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়। কবিতা, গল্প ও রম্যরচনা ছাড়া এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ খ্যাতনামা কবিদের একগুচ্ছ অনুবাদ কবিতা। 'প্রফেসার যাদব' গল্পে বিমল করের সৎসাহস ও অসামান্য শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। বরুণ মজুমদার সম্পাদিত **'সাত্বক'** (১, উমাচরণ ভট্টাচার্য লেন, হাওড়া) ও মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত **'আগন্তুক'** (৬৮।৪ সি, পূর্ণ দাস রোড, কলি: ২৯) কবিতার সংকলন। বর্তমান কালে বাংলাদেশের কবিতা-পত্রিকার মান এমনই উন্নত যে, উক্ত দুটি পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পর্কে আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। দুটি পত্রিকাতেই প্রবীণ ও নবীন কবিদের সমারোহ ঘটেছে। অবশ্য কোনো কোনো নবীন কবি 'আগন্তুক' পত্রিকায় কবিতার নামে যা পরিবেশন করেছেন তা শুধু অরুচিকর নয়, জঘন্য ও সুস্থ জীবনবিরোধী। বর্তমান সমাজে যখন সুস্থতার প্রয়োজন, তখন এসব কবিরা কিভাবে অসুস্থতা বহনের ভার গ্রহণ করেন—তা বোঝা মুস্কিল।

আদিম অন্ধকার : হিরণ্ময় সকাল

সুধীর চৌধুরী

চোখ মোছ।
সারারাত কেঁদেছো একলা
এখন সকাল।
চোখ মোছ।

দেখ, আমি সারারাত মেদ, মাংস
লোভী পশুদের সাথে যুদ্ধ করেছি।
আদিম অন্ধকারের যন্ত্রণাকে দু'হাতে ঠেলে ঠেলে
অতলান্ত প্রত্যাশার প্রাচীর কাঁধে বয়ে বয়ে
এখানে এসেছি; হিরণ্ময় সকাল
দেখবো বলে।
চোখ মোছ।

ঘরের কোণে প্রদীপটা জ্বলছে।
নিবিয়ে দাও। বন্ধ দরজা
জানালা খুলে দাও। চেয়ে দেখ,
বাইরে এখন প্রবাহিত সকাল।

এসো আমরা বাইরে দাঁড়াই।
এখন সকাল। মুখ তোল।
কেন না
বাইরের প্রগত রোদ্দুর
আমাদের যৌবন।

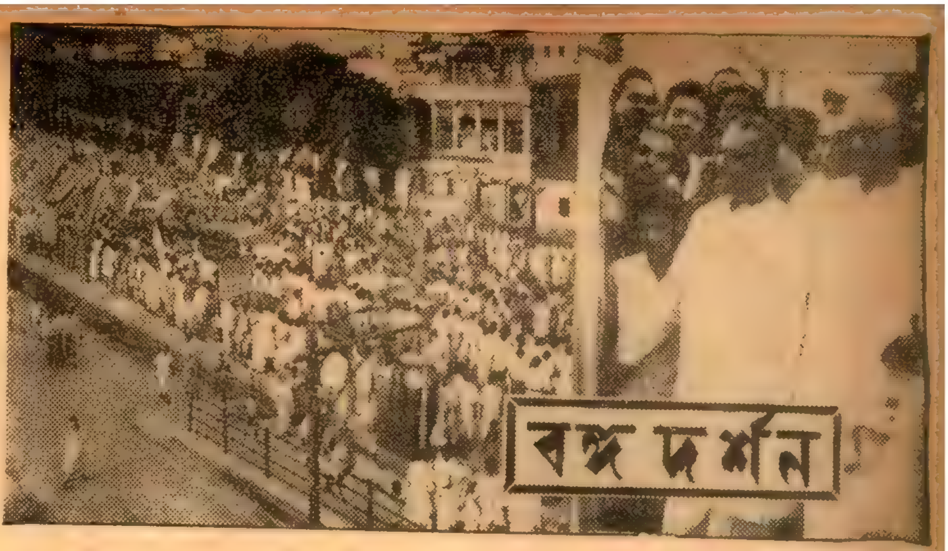

● নূতন ঢালা পুলের উদ্বোধন

রাজধানী :

প্রবল ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এবার সুরু হয়েছে পশ্চিম বাংলার বিধানসভা অধিবেশন। ঝড়ো হাওয়া মাঝে মধ্যে একটু স্তিমিত হতে-না-হতেই আবার তা' সুরু হয় দ্বিগুণ বেগে। সে বেগে নিস্তরঙ্গ সভাকক্ষে ওঠে উথালি-পাথালি ঢেউ। তার প্রচণ্ড আঘাতে কেউ কেউ ছিটকে পড়েন সভাকক্ষের বাইরে। অবস্থা দেখে অধ্যক্ষকে সভার কাজ স্থগিত রাখতে হয় সাময়িকভাবে।

প্রথম দিনের ঘটনাটি যেমন দুঃখের তেমনি লজ্জাকর। সেদিনের ঝড় কিন্তু কোন রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে ওঠে নি—উঠেছিল ভারতের তথা বিশ্বের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিরোধান উপলক্ষে শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রস্তাবটি নিয়ে। বিরোধী পক্ষের আশা ছিল চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিধান-সভার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন স্বয়ং অধ্যক্ষ।

এবারে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তা' ছাড়া প্রস্তাবের ভাষা ও বয়ানে ছিল বিরোধী দলগুলোর আপত্তি। একথা স্বীকার করতেই হবে প্রস্তাবের খসড়াটি একেবারে ত্রুটিহীন নয়। প্রস্তাবে রয়েছে, "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার মত আর কোন ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাইব না।" এ সব উচ্ছ্বাসবাক্য বিতর্ক-মূলক। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর উত্তরকালের জাতীয় জীবনে যে সকল মহামানব ও নেতা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের স্থান তা' হলে কোথায়? জাতির ভবিষ্যৎ কি নেহরুর পরে একেবারে অন্ধকার? এমনি ধারা নানা প্রশ্ন উঠতে পারে।

অধ্যক্ষ বিরোধী পক্ষের আপত্তি শুনে সংশোধনের পর প্রস্তাবটি নিজে উত্থাপন করতেও সম্মত হয়েছিলেন। সরকার পক্ষের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দিতে হয় এবং হট্টগোলের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে তা' পাশ হয়।

• • •

এর পর থেকেই খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং চাল-তেল ও মাছের কালোবাজার নিয়ে অল্প-বিস্তর ঝড়-ঝাপটা লেগেই ছিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ওপর মুলতুবী প্রস্তাবগুলো যেদিন এলো সভার সামনে সেদিন ঝড়ের বেগটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। বিরোধী দলগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ পেয়েও সম্ভবত প্রস্তুতির অভাবে ক্ষুরধার অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন নি। সুযোগ হাতে পেয়েও শেষ পর্যন্ত ছাড়তে বাধ্য হন—ন'টি মুলতুবী প্রস্তাবই তাঁরা প্রত্যাহার করে নেন।

ঝড় আবার পূর্ণবেগে সুরু হয়

● শ্রীকমল গুহ

বৃহস্পতিবারের বিকেলে খাদ্য পরিস্থিতি ও সরকারের খাদ্যনীতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ভাষণের পর। শুক্রবারেও চলে তা' পুরাদমে। সভাকক্ষে সুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। মুখ্যমন্ত্রী বার বার বিতর্কের উত্তর দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অধ্যক্ষ শ্রীকেশব বসু নজীর সৃষ্টি করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য শ্রীকমল গুহকে একদিনের জন্য সাসপেণ্ড করে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই গোলযোগের মধ্যে অধ্যক্ষ অধিবেশনের মুলতুবী ঘোষণা করেন।

খাদ্যের ওপর বিতর্কের উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন, তীব্রতর খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে সরকার আর নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করবেন না। আগামী জানুয়ারী মাসেই যাতে ধান-চালের ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলা যায়, সে প্রশ্ন সরকার এখন সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে দেখছেন। মজুতদার ও মুনাফাখোরদের চ্যালেঞ্জ সরকার গ্রহণ করেছেন এবং তাদের সায়েস্তা করার অভিযানও সুরু হয়েছে।

ধান-চালের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারে কারোই আপত্তি নেই। মুনাফাশিকারীদের জব্দ করার এটিই প্রকৃষ্ট উপায়। এতে বিরোধী দলেরও কোন আপত্তি থাকতে পারে

না। তাঁদের অভিযোগ, ন্যায়-নীতির ধার কোন ধার ধারে না সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সরকারী মহলের "দহরম-মহরম" সম্পর্কে। এই "দহরম-মহরম" যেভাবে চলেছে তা' বজায় থাকলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসাও বেহাত হওয়ার ভয়ে ভীত বিরোধী পক্ষ।

বিরোধী পক্ষের এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। সরকার চাল-তেল ও মাছের মূল্য বেঁধে দিয়েছেন। মার্চ মাসের পর থেকে বেশ কিছুসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারও কর হয়েছে এবং বিচারে তাদের শাস্তি হয়েছে। কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতি চলে গিয়েছে সরকারের আওতার বাইরে। প্রকাশ্যে চাল বিক্রি হচ্ছে এক টাকা পঁচিশ পয়সা কে-জি। তেল পাওয়াই দুষ্কর। সাড়ে চার টাকার নীচে কোন তেলই পাওয়া যাচ্ছে না। গেল এক সপ্তাহে তিল তেল ও বাদাম তেলের দাম বেড়েছে মণপ্রতি বিশ টাকা। সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারেন নি। রণক্ষেত্রে পিছু হটে যাওয়ার কৌশল সরকার অবলম্বন করে থাকলে ভিন্ন কথা। সরষের তেলের রাজাদের ঘায়েল না করে সরকার চিন্তা করছেন সরষের তেলের বিকল্প চালু করার কথা। প্রথম সংবাদ বেরিয়েছিল তিল ও বাদাম তেলের কোন একটা অথবা দুটির মিশ্রণে তৈরি হবে বিকল্প তেল। এরপরই তিলের তেল ও বাদাম তেলের দাম বেড়ে যায় কুড়ি টাকা। এখন শুনছি চা-বীজ থেকে বিকল্প তেল বেরুবে। কোনটা ঠিক এখনও সরকারী সূত্রে ঘোষিত হয় নি। বিকল্প হিসেবে সরকার যা চালু করবেন তাতে আগুন লাগবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সরকারের হাতের স্পর্শ বাজারের যে জিনিষে পড়ে সে জিনিষই দুর্মূল্য হয়ে ওঠে দুদিন বাদে। চা-বীজ বাজার থেকে উবে যাওয়াও বর্তমান অবস্থায় বিচিত্র নয়।

আসল কথা, সরকার যে-কোন কারণেই হোক, গোড়া ঘাটে হানা দিতে পারেন নি। পারলে চোরা-বাজার এতদিনে সায়েস্তা হ'তো —মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সাহস তারা পেতো না। সরকার যা' কিছু করেছেন তাকে সাধারণ মানুষ "লোক দেখানো" ছলনা হিসেবেই ধরে নিয়েছে। চাল-তেল ও মাছের বাজারের রুই-কাতলা ধরার টোপ ফেলা হয় নি। তারা নির্ভয়েই বিচরণ করছে—মুনাফা লুঠছে দু' হাতে। এদের দমনে সরকার সাহসিকতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতো না।

ধান-চালের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারে ব্যয়-বাহুল্য, উপযুক্ত

● মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান

সংগঠন, পরিবহন ব্যবস্থা ও বিপুল-সংখ্যক গুদামের সংস্থানের ঝামেলার কথা ছেড়ে দিলেও সরকার ধান সংগ্রহে, ধান ছাঁটাই করা ও বণ্টনের কি নীতি গ্রহণ করবেন তার ওপর নির্ভর করবে সে ব্যবসার সাফল্য। সরকার নিজে ধান সংগ্রহ না করে ব্যবসায়ীদের হাতে সংগ্রহের ভার দিলে অথবা চালকলের মালিকদের ধান কেনার চালাও আদেশ দিলে সব ব্যবস্থাই যাবে একেবারে বানচাল হয়ে। লাভের গুড় যাবে পিঁপড়ের পেটে।

বিধানসভার বিরোধী পক্ষের নেতাদের সন্দেহ, এ সব দিক বিচার করলে, একেবারে অমূলক বলা চলে না। তবে, বিরোধী দল বিধানসভায় শাণিত যুক্তির অবতারণা করে, সমস্যা সমাধানের কোন পথ বাতলাতে পারেন নি। মানুষের দুর্বিষহ দুঃখের করুণ চিত্রটা পর্যন্ত তাঁরা তুলে ধরতে পারেন নি। একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তি এবং হৈ-হল্লা করে আমাদের উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা মেছোহাটার সৃষ্টি ছাড়া কোন কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। মৎস্য-মন্ত্রীর কেরামতিতে মাছের অভাবে মেছোহাটা যখন উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে—মৎস্য-বিক্রেতারা গোল হয়ে বসে বাজারে তাস পিটুচ্ছে তখন বিধান-সভায় মেছোহাটার অভিনয়ে কেউ কেউ হাততালি যে না দেবেন তা' নয়। আমরা এ অভিনয়ের প্রশংসা করতে পারছি নে।

বিরোধী পক্ষ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সোমবার আরেক দফা আসর গরম করেছিলেন। এ-দিনের আক্রমণটা একটু জোরদারও হয়েছিল। ফয়দা অবিশ্যি তাতে কিছু হয় নি। পরাজিত হয়েছেন ভোটে।

* * *

খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য ভোগ্য-পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে যখন দেশের সর্বত্র উঠেছে হাহাকার তখন পশ্চিম বাংলার নেতা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ জব্বলপুরের বারোলায় কংগ্রেস-কর্মীদের সভায় পরিবেশন করেছেন অমূল্য তথ্য। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসকর্মীদের ঘাড়ে যে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে তা' স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, সব রকম সম্পদের সদ্ব্যবহার করে ভারত বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত বলে দ্রব্যমূল্য আরও বাড়বে। যে সব কর্মীর একথা জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে

বলার সাহস নেই তাঁদের কংগ্রেস ত্যাগ করাই উচিত।

অতুল্যবাবু এখন সর্বভারতীয় নেতা —এ-আই-সি-সি'র তিনি কোষাধ্যক্ষ। তাঁর কথা নিশ্চয়ই 'অমৃত সমান'—বেদবাক্যও বলা যেতে পারে যাঁরা মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন তাঁরাও হবেন পুণ্যবান। তা' না হলে কংগ্রেসের সংগঠনে তাঁদের ঠাঁই হবে না। পশ্চিম বাংলার কোন কোন কংগ্রেসকর্মী কিছুদিন আগে মূল্যবৃদ্ধির বেয়াড়া প্রশ্নটি উত্থাপন করেও তাঁর কাছে ধমক খেয়েছিলেন। তাঁদের তিনি নাকি অর্থনীতির গোড়ার পাঠ ভাল করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মুস্কিলটাই হ'ল অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ নিয়ে। উন্নয়নমূলক কাজ চলার সময় মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে তিনি নতুন তত্ত্ব কিছুই পরিবেশন করেন নি। মূল্যবৃদ্ধিরও একটা সীমা আছে। সে কথাটা কি তিনি বেমালুম অস্বীকার করছেন? তা' করলে, কেবল কংগ্রেসকর্মী কেন, অর্থনীতির পণ্ডিতদের কাছেও তিনি নতুন কথাই তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে আনন্দে বগল বাজানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাঁর এই উক্তির পর কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী থেকে সুরু করে প্রধানমন্ত্রীর পর্যন্ত কিছু আশ্বস্ত হওয়া উচিত। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে কালোবাজারের চক্রান্তে তাঁরা সকলে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। দেশ জোড়া সকলে মূল্যমান হ্রাসের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

শ্রীঘোষ পশ্চিম বাংলার প্রচ্ছন্ন শাসকও বটেন। মুনাফাশিকারীদের দাপটে পশ্চিম বাংলা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে—ঘরে ঘরে সুরু হয়েছে আর্তনাদ। এ অবস্থা তিনি অবগত নন, এমনও নয়। অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া, দুর্গতিকে অস্বীকার করা, দুর্জনকে প্রশ্রয় দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা বেদব্যাসই মহাভারতে বলে গেছেন? অতুল্যবাবু কি সে কথাও ভুলে গেছেন? তিনি মুনাফালোভী নীতিজ্ঞানবর্জিত ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি-মুনাফার লিপ্সা দমনের জন্য কংগ্রেস-কর্মীদের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে বলেন নি। অতুল্যবাবুর মত বলিষ্ঠ নেতা এদিকে নীরব কেন? এ প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মনে।

তিনি দেশের অবস্থাকে সাঁতারুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তোফা তাঁর যুক্তি। সামনে তীর দেখে সাঁতারু ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতে পারে না।

● শ্রীঅতুল্য ঘোষ

এ যুক্তি অকাট্য। অতুল্যবাবু কি দেখছেন জানি নে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ-ছয় বছর পরে জিনিষের দাম নামবে। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতা কিন্তু ১৯৭৭ সালের আগে তীরের সন্ধান দিতে পারেন নি। অতুল্যবাবুর কথা বেদবাক্য ধরে নিলেও পথ চলবার শক্তি যাঁদের ফুরিয়ে গেছে, সাঁতার কাটতে কাটতে দেহ যাঁদের হয়ে পড়েছে অবসন্ন তাঁরা কি করবেন? দেহ অবসন্ন হলে নামজাদা সাঁতারুও টুপ করে তলিয়ে যান। বেপরোয়া চোরাকারবারে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের আর নেই। শ্রীঘোষের নেতৃত্বের ওপর অনেকেই আশা রাখেন। তিনি একচক্ষু হরিণের মত দোষটা সাধারণ মানুষ ও কংগ্রেসকর্মীদের ওপর চাপিয়ে দিলে পর্বতপ্রমাণ ভুলই করবেন।

* * *

উত্তর কলকাতার দুয়ার আবার উন্মুক্ত করেছেন তরুণ ইঞ্জিনীয়ারগণ আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে টালার পুলের নির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। নির্দিষ্ট সময়ের ন' মাস আগে কাজটি শেষ করে তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন দেশের তরুণ দল শ্রমবিমুখ তো নয়ই—কারিগরী দক্ষতাও তাঁদের কম নয়। ৭৫২ ফুট লম্বা ও ৪২ ফুট প্রশস্ত এই পুলের নির্মাণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার চাইতে খরচটাও দেশের ইঞ্জিনীয়ারদের হাতে অনেক কমই হয়েছে। অথচ আমাদের সরকার এই পুল নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক টেণ্ডারও আহ্বান করেছিলেন।

যে-পুলের কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হল তার নির্মাণ নিয়ে আমাদের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে টালবাহানা চলেছিল আট বছর। একটি দোতলা বাস পড়ে গিয়ে কয়েকজন নিহত হওয়ার পর পুলের ভাঙার কাজ ও নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় একযোগে। পুলটির উদ্বোধন করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন, "ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরাও যে যথাসময়ে অনেক কাজ শেষ করতে পারি, টালা ব্রীজই তার প্রমাণ।" শ্রীসেন সত্যি কথাই বলেছেন। এই ঐকান্তিক চেষ্টাটা ওপরতলায় কম বলেই দেশের কর্মীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারছেন না। শ্রীসেন নিশ্চয়ই সে-বিষয়েও সচেতন।

টালা পুলের উদ্বোধনের কাজটা সমারোহের মধ্যেই হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এ কাজে দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও কৃতিত্বের অংশীদার সেই তরুণ

ইঞ্জিনীয়ারদের সম্মানিত করলে, তাঁদের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলে অনুষ্ঠান আরও সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত।

নদীয়া :

এক সপ্তাহ আগে আমাদের মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানের গৃহে নদীয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি ছিল না। একে খোদ মন্ত্রীর বাড়িতে অনুষ্ঠান, তার ওপর তিনি নিজেই ছিলেন মূল সভাপতি। আরেকজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন—কৃষি দপ্তরের প্রতি-মন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সহকারী সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। অধিবেশন ভালই জমেছিল। না জমবার কারণও থাকতে পারে না। দু-দু মন্ত্রী। তাও আবার মানুষের পেটের খোরাক যোগান দেবার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁরা পেটের খোরাক যোগাতে ব্যর্থ হয়ে মনের খোরাকের পসারীদের কাছে উপদেশবাক্য বর্ষণ করে ফিরেছেন।

তাঁরা রাজধানীতে ফিরতে-না-ফিরতেই নদীয়ার চারদিকে সুরু হয়েছে খাদ্যশস্যের হাহাকার। শহর ও গ্রামাঞ্চলের কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। শহরাঞ্চলের বহু পরিবার দিন কাটাচ্ছে পাঁউরুটি খেয়ে। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের অসীম ক্ষমতাও এবার হার মেনেছে ব্যবসায়ীদের ক্ষমতার কাছে। তাঁরাও চালের নাগাল পাচ্ছেন না।

কদিন আগেই জেলা কর্তৃপক্ষ পাইকারদের সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তি করে বসেছিলেন। সে-চুক্তিও ব্যর্থ হয়েছে। একজন পাইকার কিছুটা কথা রক্ষা করে এখনও চলছে। তার দোকান থেকে পরিবার পিছু এক কে-জি চাল বিক্রি হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, বীরভূম থেকে ৬৫ হাজার মণ চাল আমদানীর চেষ্টা হচ্ছে। কবে সে চাল আসবে তা' সঠিক কেউ বলতে পারে না। আমাদের মৎস্য-মন্ত্রী ও কৃষি দপ্তরের উপমন্ত্রীর নজরে নদীয়ার এই ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়েছে কিনা, জানি নে। নজরে পড়লে, তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসে একটা বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করতেন। গ্রামের মানুষকে শাকসব্জী সিদ্ধ করে খেতে হত না।

এদিকে বুভুক্ষু মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। বিক্ষোভ চলছে হাটে-বাজারে চালের দোকানের সামনে। সেদিন বাদকুল্লায় তারা চাল ও আটার গাড়ি আটক করেছিল। ৫০ মণ চাল ও আটা তাদের চাপে মালিক ন্যায্যমূল্যেই বিক্রি করেছে বাধ্য হয়ে। এসব ঘটনা শুভ লক্ষণ নয়।

বর্ধমান :

বর্ধমান জেলায় উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গেছে সাতাশ হাজার একর। এই জমি বিতরণ করা হবে ভূমিহীন চাষী ও ছোট চাষীদের মধ্যে।

পশ্চিম বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য সম্প্রতি বর্ধমানে এসেছিলেন। জেলা-শাসক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি উদ্বৃত্ত জমির বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে গেছেন।

সব জমি এখনই বিলি করা সম্ভব হবে না। সাত হাজার একর জমির মামলা এখনও ঝুলছে। বড় রায়তদের জমি এখনও দখল করা হয় নি। মাস-দুয়েকের মধ্যেই নাকি তাদের ওপর নোটিশ জারি করা হবে। আপাতত জমি বিলি হবে মাত্র দশ হাজার একর।

● স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ●

জমি দখলের জন্য সরকারকে খেসারত দিতে হয়েছে এক কোটি টাকা। ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর ও ছোট চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করার সময়, যাতে একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ জমি চাষীর হাতে পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হবে। আমাদের দেশের চাষীদের জমির পরিমাণ খুবই কম। সেইজন্য চাষ তাদের পক্ষে লাভজনক হয়ে ওঠে না। সম্ভব ক্ষেত্রে সরকার সমবায়-চাষের ব্যবস্থাও করতে পারেন। টুকরো টুকরো জমি একত্র করার সুযোগ থাকলেই সমবায়-চাষ গড়ে তোলা সহজ হয়। অনেক দূরে না হলে, কাছাকাছি বিচ্ছিন্ন জমি নিয়ে সমবায়-চাষ হতে পারে।

কোচবিহার :

দিনহাটা থেকে মাইল পনের দূরে পাকিস্তান-সীমান্তে চৌধুরীহাট। সীমান্তের চোরাকারবার বন্ধ, সীমান্ত দিয়ে গোপনে পাকিস্তানী নাগরিকদের বে-আইনী প্রবেশ প্রতিরোধ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বৈঠকের কথা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রতিনিয়তই বড় বড় হরফের শিরোনামায় ছাপা হচ্ছে। চৌধুরীহাটের সীমান্ত একবার ঘুরে এলেই বঙ্গ-দর্শনের পাঠক-পাঠিকা বুঝতে পারবেন, আমাদের পুলিশের যোগসাজসে কিরূপ ব্যাপক হারে চোরাকারবার চলেছে। গাড়ি গাড়ি পাট আসছে অবাধে পাকিস্তান থেকে। হাঁস-মুরগী-ছাগল নিয়ে প্রবেশ করছে হাটে পাকিস্তানী মুসলমান। রাস্তার পাশেই পুলিশের ফাঁড়ি। ছোট একটি চায়ের দোকানে বসে থাকে আমাদের প্রহরীরা। পাকিস্তানী নাগরিক পসরা নিয়ে এসেই প্রবেশ করে চায়ের দোকানে। মোলাকাত হয় পুলিশের সাথে। লেন-দেন শেষ করে দিব্যি তারা হাটে গিয়ে বেচা-কেনা করে। কেউ ফিরে যায়, আবার কেউ থেকেও যায়।

কবিগুরুর "খেয়া"

প্রীতিনিধান রায়

১

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলে স্বীকার করেন নি, সাধারণের ভিতরেও অসাধারণত্বের আবিষ্কার করেছেন, ব্যর্থকে বিফলকে অবজ্ঞা করেন নি, তাদেরও সার্থকতার ক্ষেত্র খুঁজেছেন। "খেয়া" কাব্যের বহু কবিতার মূল ভাব এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরেই পাওয়া যাবে।

কবিগুরু মানুষের বাহ্যিক সাধারণ জীবনের আড়ালে এক অসাধারণ, অতৃপ্ত তৃষ্ণার সন্ধান পেয়েছেন এবং তাঁর একটি চিঠিতে মানুষের এই দ্বৈতজীবনের নামকরণ করেছেন "ক্ষণিক জীবন" ও "চিরজীবন":

"আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে। আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখদুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন সেই সুখদুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করছে, আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমরা যখন খুব বড় রকমের আত্মবিসর্জন করি, তখন কেন করি? একটা মহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক জীবনটি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখদুঃখ আর আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই, আমরা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বড়, আমরা প্রাতিদিনের তুচ্ছবন্ধন থেকে মুক্ত।"

এই যে ক্ষণিক জীবন ও চিরজীবনের বিরোধ এটাই মানুষের অন্তরাত্মার চিরন্তন বেদনা। ক্ষণিক জীবনে মানুষ ক্ষুদ্র ও সাধারণ। চিরজীবনের অতৃপ্তি, বেদনা ও হাহাকারের মধ্যেই মানুষ মহৎ, শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ।

২

খেয়া কাব্যের বহু কবিতায় কবি ছবির পর ছবি এঁকে মানুষের এই অতৃপ্তি ও ক্রন্দনকে রূপ দিতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে কবির যে ছবিটি একান্তভাবে পাঠকের মনোহরণ করে সেটি হচ্ছে পল্লীবধূর জল আনার ছবি।

নববধূ সারাদিন গৃহকাজে ব্যস্ত থাকে। গুরুজনের পরিচর্যা, সংসারের ছোটবড় বহু কাজ তাকে করতে হয়। কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি নেই, ঘাটের পথের আহ্বান তার মনে দুর্নিবার হয়ে ওঠে:

"যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা।
আপনার মনে একা পথে চলি
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা।
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।
ওগো দিনে কতবার করে
ঘর বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।"

(ঘাটের পথ)

অথবা "দিঘি" কবিতায়:

"জুড়াল রে দিনের দাহ; ফুরাল সব কাজ
কাটল সারাদিন।
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্মহীন।
তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু
এইটুকু সময়
সেই গোধূলি এল এখন সূর্য ডুবুডুবু
ঘরে কি মন রয়?"

কিন্তু এই যে অতৃপ্তি, এই যে ঘাটের পথের আকর্ষণ, এটাই কি সব?

কবি "প্রভাতে" কবিতায় আশ্বাস দিয়েছেন অতৃপ্তিই শেষ নয়। দিঘির জল আলো করে একদিন "শ্বেত শতদল" ফুটে ওঠে। কবি তার নামকরণ করেছেন "দুখযামিনীর বুকচেরা ধন।" এই বুকচেরা ধনের কোনও ব্যাখ্যা কবি তাঁর কাব্যে করেন নি। ব্যাখ্যার চেয়েও বা মহত্তর অর্থাৎ চিত্র, তাই এঁকেছেন খেয়া কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়:

"হেরো, হেরো মোর অকূল—
অশ্রুসলিল মাঝে,
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল,
কখন ফুটিল বল মোরে বল
এমন সাজে,
আমার অতল অশ্রুসাগর সলিল মাঝে!
আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখযামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী!
ইহারি লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি।
দুখযামিনীর বুকচেরা ধন হেরিনু
একি!"

(প্রভাতে)

৩

কবি যাঁকে "দুখযামিনীর বুকচেরা ধন" বলেছেন, তিনি কখন কি ভাবে, কি বেশে মানুষের জীবনে আবির্ভূত হন, তার স্থিরতা নেই। কখনও তিনি আসেন— "দুঃখরাতের রাজা" রূপে:

"ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।"

(আগমন)

কখনও তিনি আসেন রাজার দুলালরূপে:

"ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে?"

সে দিন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "একটা মহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখদুঃখ আর আমাদের স্পর্শ করতে পারে না।"

কিন্তু যিনি রাজার দুলালের সাক্ষাৎ পেয়েও কাব্যের কৃপণ ভিক্ষুকের মত ক্ষণিক জীবনের তুচ্ছতাকে ত্যাগ করতে না পাবেন, "রাজ-ভিখারি কে" সকল শূন্য করে দিতে না পারেন, তাঁর অকিঞ্চনতা ঘুচবে কি করে?

"ঘরে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কি-
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
এখন কাঁদি চোখের জলে
দু'টি নয়ন ভরে'
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে।"

(কৃপণ)

কাব্যর বুকচেরা ধন" কখনও আবির্ভূত হন বাঁশিরূপে:

"ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাও গো আমার করে।
শরৎ-প্রভাত গেল বয়ে
দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে
বাঁশি বাজা সাজ যদি
কর আলসভরে,
তবে তোমার বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাওগো আমার করে।"

(বাঁশি)

কখনও তিনি আসেন অসিরূপে:

"এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র হেন-ভারি,
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে
কী পেলি তুই নারী?
নয় এ মালা, নয় এ থালা
গন্ধজলের ঝারি
এ যে ভীষণ তরবারি।"

(দান)

সমগ্র খেয়া কাব্যখানিতে কবি তাঁর দুঃখযামিনীর বুকচেরা ধনের বিচিত্র আবির্ভাবের কথাই পাঠককে শুনিয়েছেন। ক্ষণিক জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতায় যিনি অতৃপ্ত, অথচ যাঁর জীবনে ফুলের বাহার নেই, ফসলেরও সম্ভাবনা নেই, যাঁর দিনের আলো ফুরিয়েছে, সাঁঝের আলো জ্বলে নি, সেই অকৃতী-অভাজনের কানে কানে কবিবন্ধু আশার বাণী শুনিয়েছেন:

"বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়।
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবনমৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।"

এই লজ্জাবতী লতাও খেয়া কাব্যের মর্মবাণীর প্রতীক।

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিন্যস্ত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র জাগ্রত—সদ্য ফলপ্রদ—জীবের মুক্তিদাতা—অন্য শাস্ত্র নিদ্রিত—তাহার সাধনা নিষ্ফল। শ্মশানে সাধনমগ্ন মহাদেব পঞ্চমুখে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—সাধনা, মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তন্ত্রসমুদ্র মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের শক্তি-বীজনিহিত অমূল্যরত্ন এই বৃহৎ তন্ত্রসার আজীবন কঠোরতম সাধনায়—জীবনান্তকর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঙ্কলন সারাৎসার সমাবেশ করিয়া—মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন

তন্ত্র-মন্ত্র ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? শুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্বতন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত মন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দুপুরের ছায়ায়

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সামনের যে পথটা গাছের ছায়ায় ছায়ায় শরীর জুড়িয়ে দূরের ঘন অরণ্যে নিরুদ্দেশ, সেই পথটার দিকে তাকিয়ে গাছের মাথায় লেগে-থাকা পাতলা সরের মত রোদ দেখল সুধা। বেলার হিসেব কষে দেখল, প্রায় এক ঘণ্টারও ওপর সারা শরীরে রোদের আদর মেখে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছে। টেস্ট-পেপারটা খুলেছে আর বন্ধ করেছে। একটা অঙ্কও কষে নি। ঠাণ্ডা রোদের আদর সারা শরীরে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে সুধার মন খুশির ঢেউ হয়ে বাগানের পেয়ারা, নিম, কামরাঙা গাছের ছায়ায় ছায়ায় আছড়ে পড়েছে। কিন্তু এখন পরীক্ষার কথা ভেবে কাতর হয়ে ইতিহাস পড়ার কথা মনে পড়ল সুধার। টেস্ট পরীক্ষার পর ইতিহাস প্রায় ছোঁয়ই নি। ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে 'মোগল সাম্রাজ্যের পতনে'র কাছে এসে থেমে গেল সুধা। মেজদির ঘুমজড়ানো চোখে টেনে টেনে সুরকে বিলম্বিত করে ইতিহাস মুখস্থ করার কথা মনে পড়ল। চোখের ওপর নেমে আসা চুল একহাতে সরিয়ে মাঝে মাঝে লম্বা হাই তুলে পড়া মুখস্থ করার সুরটাকে বিকৃত করত মেজদি। ওর ঘুমজড়ানো বিকৃত সুর মাতালের মত টলতে টলতে এক সময় বোবা অন্ধকারের দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এক-পা ভাঙা কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর ভাঁজ করা হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ত মেজদি। সামনে বই খোলা। হ্যারিকেনের পলতের শীষ খাবি খাচ্ছে।

ধোঁয়ার পুরু প্রলেপ জমা চিমনির কঠিন দেয়ালে আঁচড় কাটবার কান্না তাতানো লোহার রঙের মত লাল হয়ে পলতের মাথায় জমত। আবছা আলোয় মেজদির পরিশ্রান্ত মুখ দেখে মায়া হোত সুধার। বিছানায় শোবার জন্যে ডাকত। চোখ কচলে শরীরের আড়ামোড়া ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত মেজদি। পাশের ঘরে চলে যেত হ্যারিকেনে তেল ভরে আনার জন্যে। অসহ্য রাগে সুধার মনে হোত ওর যেন সবতাতেই বাড়াবাড়ি। সুধা পাশ ফিরত। ঘুমে আবার চোখ জড়িয়ে আসত। পুরনো সময়ের বাসি গন্ধ মন থেকে মুছে ফেলল সুধা। খুশির স্রোত এঁকে ক্লান্ত পাখনাজা প্রজাপতিটার সংগে উড়তে উড়তে নিমগাছের ছায়াঢাকা ছাদের ভাঙা কার্নিশে গজানো অশ্বত্থপাতার নরম শরীরে সাঁতরে বেড়াল। সাদা রঙের কোমল উত্তাপ মেঘ ছেঁকে আসা রোদের মতন মগজ থেকে নেমে এল। শিরা-উপশিরা বেয়ে সারা শরীরের রক্তে ছড়িয়ে খুশির সুর হয়ে বাজল। সাদা প্রজাপতিটাকে এক সময়ে

ছাদের পেছনদিকে সরে যেতে দেখে বারান্দার তারে ঝোলানো ফ্যাকাশে, নীল শাড়িটার দিকে তাকাল সুধা। শাড়িটার রঙ ঝল্‌সানো। জায়গায় জায়গায় পোকায় কাটা। এটা আর পরা যাবে না—যেভাবে পোকায় কেটেছে। এটাকে কেটেছেঁটে ট্রাঙ্ক-সুটকেশের ঢাকনা করা যায়। এই শাড়িটা পরবার জন্যে সুধা মেজদির সংগে কি ঝগড়াটাই না করেছে। চুলোচুলি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত। মেজদি তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। সুধা তখনও শাড়ির বায়না ধরতে সাহস পায় নি। মেজদির এই শাড়িটাই লুকিয়ে চুরিয়ে পরত। ধরা পড়লে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেত।

বড়দা এসে সুধার পক্ষে রায় দিয়ে গোলমাল মিটিয়ে দিত। সুধার দিকে বড়দার পক্ষপাতটা বরাবর একটু বেশি। এজন্যে বড়দার কাঁধে আবদারের বোঝা চাপিয়ে দিতে সুধার এতটুকু কুণ্ঠা হোত না। বড়দাও হাসিমুখে সব আবদার সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত থাকত। বড়দার বলিষ্ঠ, সুন্দর, পেশল শরীরের দিকে তাকিয়ে সুধার বুক ফুলে উঠত গর্বে। এমন একটা দাদার বোন হতে পারার সৌভাগ্য কল্পনা করে সুধার মন খুশিতে ভরে উঠত।

সেই বড়দার দিকে এখন তাকানো যায় না। চোয়াল, কণ্ঠা, পাঁজরের হাড় জেগে ওঠার স্পষ্টতা সুধার চোখে বড় বাজে। ঘণ্টা-তিনেক ট্রেন জার্নি করে অফিস যাওয়ার ধকল, রাত্রে ট্যুইশানির ঝামেলা পোহাতে গিয়ে বড়দার শরীর এমন করে ভেঙে গেছে। অফিসের তাড়ায় বড়দাকে খুব ভোরেই উঠতে হয়। মার উনুনে আগুন দেওয়া, বড়দার বাজার করা শেষ হয়ে গেলেও সুধা লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। ঘুমভাঙার নেশায় চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকার সময় দেয়ালের ওপাশের ঘর থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো শব্দ সুধার আচ্ছন্ন চেতনার ওপর আঁচড় কাটে। ডুবসাঁতার কাটার সময় জলশব্দের শিহরণ রক্তে রক্তে ছড়িয়ে যাওয়ার মতন। চায়ে চুমুকের শব্দের ফলস্বরূপ শীতের আড়ষ্টতা জুড়োনো বড়দার নিঃশ্বাসের শব্দ সুধার ঠাণ্ডা ঠোঁট গলে একচুমুক উত্তাপের মত জিভের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গলনালী বেয়ে পাকস্থলীতে নেমে আসে।

মেঝেতে বাটি ঘষড়ানোর শব্দ বড়দার চোয়ালের পেশীর নড়াচড়ার সাথে মুড়ি গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দের মধ্যে থিতিয়ে যায়। বড়দার নস্যি-টানার শব্দ সুধার নাসারন্ধ্রে লোমশ পা ঢুকিয়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মৃদু উত্তেজনা ছড়ায়। খবরের কাগজের পাতা ওল্টানোর শব্দ দ্রুতগতিতে হেডিংগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়ার উৎসুক ক্ষিধেটাকে উস্কে দিয়ে সুধার বোজা চোখের পেশী-সঞ্চালন-জনিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থির থির করে কেঁপে নিভে যায়। বড়দার গালে ক্ষুরঘষার শব্দ ঠাণ্ডা-জলে গোলা সাবানের ফেনা ক্ষুরের গা থেকে গলে পড়ার দৃশ্যরচনার সংগে সংগে শীতালু অনুভব সুধার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যায়। বড়দার লোমশ বুক, পিঠে তেলহাত ঘষার শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে শীতার্ত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, কলঘরে জল-ভরা বালতি হ্যাঁচড়ানোর শব্দ, জলঢালার শব্দ সুধার সারা গায়ে বরফশীতল হাত বুলিয়ে অস্বস্তি ছড়ায়। শুকনো পাতার সর সর শব্দ সুধার গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল রোমশ পা বুলিয়ে। শব্দটা ঘাস মাড়িয়ে তেঁতুল গাছের ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে রোদের নরম গন্ধের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ছেঁচা বাঁশের বেড়ার গায়ে আটকে থাকল।

বাড়িটা এখন ঘুমন্তপুরীর মতন নিঝুম। দাদা অফিসে। খোকন পুবের ঘরটায় ঘুমোচ্ছে। মা বারান্দায় পড়ন্ত রোদে পিঠ মেলে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। মার পিঠের কাপড় থেকে মুক্ত হওয়া উজ্জ্বল চামড়ার পালিশে রোদ ঠিকরে পড়ছে। মার চোয়ালের মাংসপেশী অল্প অল্প নড়ছে পান খাওয়ার অভ্যস্ত নিয়মে। মা জিভে আঙুল বুলিয়ে পাতা ওল্টায়। পাতার ওপর পান খাওয়া ঠোঁটের ছোপ পড়ে। মেজদিকেও এই বিচ্ছিরি স্বভাবে পেয়ে বসেছিল। মার স্বভাবগুলো রপ্ত করে নেওয়ার আশ্চর্য দক্ষতা মেজদি যে কেমন করে আয়ত্ত করেছিল, কে জানে। টাকার শব্দ আঙুলের ওপর বাজানোর মত জিভের শব্দের সাথে সাথে ঠোঁট, নাক, চোখ কুঁচকে তোলার অভ্যাস মেজদি মার কাছ থেকে অবিকল পেয়েছিল। মার আর একটা অভ্যাস আছে যার প্রভাব মেজদির মধ্যে আদপেই পড়ে নি। পানের খয়েরী ছোপধরা সিক্‌নি দেয়ালে মুছে ফেলা মার স্বভাব। কিছুদিন পর সিক্‌নিটা দেয়ালে শুকিয়ে চটচটে হয়ে যায়। খুব ঘন করে দুধ জ্বাল দেওয়ার পর কড়ার ধারের দুধ খয়েরী রঙ ধরে শুকিয়ে চটচটে হয়ে থাকার মতন। ভাত খাবার পর একনিঃশ্বাসে জল খেয়ে একটুখানিক হাঁপিয়ে নিতে গিয়ে যেমন মার নাকের পাটা দুটো ঈষৎ ফোলে। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে মৃদু দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসত তার অবিকল প্রতিফলন সুধা মেজদির মধ্যে দেখেছে। এমন কি ঠোঁটটাকে ছুচলো করে পানের পিক ফেলতে গিয়েও মেজদি মার কথাই মনে করিয়ে দিত। হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে টান টান করে হাই তুলতে গিয়ে সুধা দেখল, হলুদ পেন্সিলটার মাথায় দাঁতের কামড়ের দাগ। দাগের ওপর আঙুল বোলাতে থাকে সুধা। এ খোকনের কাণ্ড ছাড়া আর কারুর নয়। সামনের ফোক্‌লা দাঁতের ফাঁকে জিভটা ঢুকিয়ে দিয়ে খোকনের অদ্ভুত শব্দ করার কথা মনে পড়ল। পেন্সিল দাঁতে কামড়ানোর স্বভাব মেজদিরও ছিল। ওর মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁতের সারি নিখুঁতভাবে সাজানো। হাসলে সুন্দর দেখাত মেজদিকে। ঠোঁটের পাখনা মেলে ঝকঝকে দাঁতের দুধ-সাদা শরীর দেখানোর খুশি নেচে উঠত ওর চোখে। মার ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের সারি বড্ড বেশি অসমান। পানের রঙে কালশিটে পড়া দাঁতগুলো দেখে সুধার

সিংগী কিংবা মাগুর মাছের পেছলানো হ্যাংলাতে শরীরের স্পর্শ মনে পড়ে। ভীষণ ঘেন্নায় সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠতে চায়। পেয়ারা গাছটার নীচে কখনো রোদ, কখনো ছায়ার রঙ মেখে নেওয়ার খুশিতে ডগমগ একটা শালিকের দুলকি চালে লাফিয়ে চলা দেখতে দেখতে সুধা টের পেল—ওর সমস্ত শরীর ছেয়ে অবসাদ ঘনিয়ে আসছে। অবসন্নতার থকথকে কাদার মধ্যে ক্লান্ত মোষের মত লেপ্টে শুয়ে থাকার ইচ্ছায় বার বার শীতার্ত হাওয়াটার ঝাপট বাদ সাধছে। পাখীর শব্দমদির এই পড়ন্ত রোদের কোমল ঠাণ্ডা আমেজ সারা গায়ে চাদরের মত জড়িয়ে নেওয়ার লোভে উস্‌খুস্‌ করে উঠল সুধা। বারান্দার তারে ঝোলানো বিছানার চাদর পেড়ে নেবার জন্যে ঘাসের মধ্যে পায়ের শব্দ শুষে যেতে দিয়ে বারান্দার ওপরে উঠে এল। মা চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বইটা বুকের ওপরে মেলা। সুধার অসাবধানী পায়ের ঠোক্করে খোকনের ছোট্ট টিনের বাক্সটায় লেগে শব্দ হোল। শব্দের ঝাপটা লেগে মার চোখের পাতা খুলে গেছে। তন্দ্রা ভেঙে যাওয়ার বিরক্তির রেখা ভ্রূর মধ্যে ফুটে উঠেই আগুনের ফুলকির মত উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

মার চোখের পাতা বুজে আসার সাথে সাথে ঢোক গেলার দরুণ কণ্ঠাটা ঈষৎ ওপরে উঠে স্বস্থানে ফিরে গেল। মা পাশ ফিরে শোওয়ার দরুণ বুকের ওপরে মেলা বইটা বন্ধ হয়ে শব্দ করে খাটে পড়ার শব্দ, চাবির রিঙের শব্দ, চুড়ির শব্দ, খাটের মড়মড় শব্দ, মেরুদণ্ডের হাড় মটকানোর শব্দ, জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ যেন একসঙ্গে জট পাকিয়ে তালগোল পাকানো নানা রঙের মত স্ব স্ব পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করে নিভে গেল। সুধা বারান্দার তার থেকে বিছানার চাদরটা হ্যাঁচকা টান মেরে কেড়ে নিল। থির থির করে কাঁপা তারের শব্দ থিতিয়ে আসার আগেই বারান্দা থেকে নামল। পলকা ঘুমের নরম রেখা-রেখা মার নির্লিপ্ত মুখ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। শিথিল পা ফেলে কামরাঙা গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘুমের প্রশান্তিমাখা এই মুখ-দাঁত খিঁচিয়ে চোখ, ঠোঁট, চোয়ালের পেশী মুচড়ে প্রচণ্ড রাগের ঝাঁঝ ফুটিয়ে কত কুৎসিতই না হতে পারে। বড়দার রক্ত জল করা টাকা খরচ করে ম্যাট্রিক পাশ করার পরও মেজদির কেন চাকরী জুটল না, এই অপরাধে মা ক্ষেপে গিয়ে কতদিন কুৎসিত ভাষার একরাশ নোংরা উগরে দিত। মেজদি যে একটা অকর্মার ধাড়া, গুচ্ছের গুচ্ছের গেলা ছাড়া আর কিছু জানে না, একথা গলা ফাটিয়ে জাহির করতে গিয়ে মার গলার রগ ফুলে দপ্‌দপ্‌ করত। রক্ত খেয়ে ফোলা জোঁকের মত। চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ডান হাতের কনুই-এর ভার ঘাসের ওপর রেখে হাতের তালুর ওপর মাথা দিয়ে সুধা শুয়ে পড়ল। সারা শরীর ঘিরে কেমন একটা ক্লান্ত আলস্যের ভার-বোধ। হাত, পা অবশ লাগছে। মেজদি পরীক্ষায় পাশ করে একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে, এই বিশ্বাস ভেঙে চুর চুর হওয়ার পর, মা প্রায়ই সুধার পড়াশোনা বন্ধ করে দেবে বলে শাসাত। সুধা মেজদির ওপর রাগে জ্বলে উঠত। ভাবত, পোড়ারমুখী নিজে কিছু জোটাতে পারল না বলে পড়াশোনা করার এত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হবে। দাঁতে দাঁত ঘসে অসহ্য রাগে ছটফট করতে করতে কতদিন ভেবেছে সুধা, পথের কাঁটার মত এই মেজদি যদি ছোটবেলায়ই অক্কা পেত, তবে ওর পড়াশোনায় কেউ বাদ সাধতে আসত না। এখন সেই কথা চিন্তা করে লজ্জায় ঘেন্নায় সুধার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

সুধার সমস্ত শরীরে অবসাদ ঘনিয়ে আসছে। হাত, পা ভীষণ ভারী। শিথিল শরীরের এই সুখতপ্ত আলস্য ঘাসের মধ্যে ঢেলে শুয়ে থাকার নেশায় সমস্ত শরীরটা যেন বুঁদ হয়ে আছে। বাগানের ওপরে ঘনিয়ে আসা পড়ন্ত বেলার গম্ভীর বিষণ্ণ ছায়ার দিকে তাকিয়ে সুধার মনে পড়ল—এমনি সময়ে গাছের নরম ছায়ার ভিজে আঙুলে রোদের রঙ একটু একটু করে মুছে আসার সময়ে মেজদি বালিশের ওপর কনুই-এর ভর রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত জানলার ফ্রেমে আঁটা এই বাগান—বাগান ছাড়িয়ে দূরের পথ—পথ ছাড়িয়ে আরও দূরের গাছপালার ঘন জটলার দিকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শরীর চুইয়ে পড়া রক্তের ফোঁটার মত অতল শূন্যতায় দিকে ঝরে পড়তে দেখে মেজদির স্তব্ধ কঠিন চোখ এতদিনের পরিচিত রঙ, শব্দ, গন্ধের স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার নিঃশব্দ কান্নায় ছটফটিয়ে উঠত। বালিশের ওপর চাপ দিয়ে বসার অসহায় ক্লান্ত ভঙ্গী, টাইফয়েডে চুল উঠে গিয়ে শূন্য ফাঁকা কপালটার থমথমে ভাব।

দূরের দৃশ্যের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া বিষণ্ণ দৃষ্টি ঝাপসা-ধূসর, স্বপ্নের বিচিত্র অচেনা রঙের মত সুধাকে টানছে। ফেঁসে যাওয়া স্বপ্নের ভাঙা টুকরো অংশ সুধার আচ্ছন্ন চেতনার ওপর পাখীর পা থেকে পালক খসার শব্দের মতন ঝরে পড়ছে। সুধার শরীর এখন জলজ গাছের মত জল ছেঁকে আসা রোদের কোমল-মদির উত্তাপ চুমুকে চুমুকে পান করার আস্বাদে বিবশ। বাগান ছেয়ে আসা ঠাণ্ডা-নরম ছায়া স্বপ্নের গভীর আস্বাদের ভিতরে সুধাকে টানছে। এই পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, শব্দের বৃন্ত থেকে খসে পড়তে চেয়েও সুধা পারল না। ফ্যাকাশে রোদ-ঢাকা আকাশের রক্তহীন বিবর্ণতার নীচে তালগাছটার কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে সুধার মনে হোল পায়ের নীচে থেকে বালু ঝরে পড়ার ঝুর ঝুর শব্দের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুভয়ের আঁকাবাঁকা স্রোত শুকনো পাতা মাড়িয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। বুকের রক্ত জমে হিম হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘাসের ওপর থেকে ত্রস্তহাতে বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে সুধা টলতে টলতে বারান্দার দিকে ছুটে গেল।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চার ॥

"এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান"

হীরালাল আর বারাণসীরা যখন ফুটকচালিতে সৈদাবাদের বাতাস গরম করছেন, এদিকে ততক্ষণে মেদিনীপুরের সীমান্তে পৌঁছে গেছেন নবাব ঘরে ফেরার পথে। চৈত্র মাসের বিকেলে প্রশান্তিটুকু যেন হাজার গোলমালে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে কারা।

কানাত পড়েছে সারি সারি। সাদা সাদা তাঁবু যেন লাল মাটির ওপর হাজার সাদা ঢেউ। নবাব চলা মানে যেন একটা জনপদ চলা। হাজার হাজার সেপাই, হাজার হাজার সওয়ার। এই রুক্ষ গরমে সবাই খোলা ময়দানে ঘুমিয়ে পড়ে এই যা রক্ষে। মাঝে নবাবের কানাতটি সবচেয়ে উঁচু। ধবধবে সাদার ওপর লাল-সোনালীর মুকুট মাথায়। এতগুলো লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, ঘোড়ার খিদমত-তদবির, হাতীর জন্যে পুকুরের তল্লাস। বাংলার নবাবের হাতী, মেজাজে দিল্লীর বাদশা। শুঁড়ে তুলে ঠাণ্ডা জল মাথায় না ঢাললে যুদ্ধের হাতীর মাথা ঠাণ্ডা হতে চায় না।

দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যে হবার আগেই নবাবের সঙ্গের এ চলমান মিছিলে বিশ্রামে যাবার জন্য হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে। ওদিকে কানাতের সামনে গালচের ওপর কুর্শী পেতে বসে আছেন আলীবর্দী। বিকেলের উপাসনা সেরে একেবারে ফিটফাট তৈরি। ছেষট্টি বছর বয়স হয়েছে কে বলবে। শরীরের কোথাও একটু বাড়তি মেদ নেই। একদিন বোধ হয় রঙটা ফর্সা ঘেঁষা ছিল। আজিমাবাদ থেকে কটক, দিল্লী থেকে রাজমহল, সাত জায়গার রোদ খেয়ে খেয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বাজপাখীর মত ক্ষিপ্র। কাঁধ এবং হাতের কব্জা দেখে বোঝা যায় এ-শরীর ভেতরে বাইরে খাঁটি ইস্পাতে গড়া। কর্পূর সুবাসিত সরবৎ একটু একটু খাচ্ছেন আর সস্নেহ চোখে চেয়ে দেখছেন।

চেয়ে দেখছেন ঐ নীল কানাতটির দিকে। নীল কানাতের চুড়োর ওপর জর্দারঙের আঁচলা যেন সোনার টোপরের মত ঝলমল করছে। কানাতের ভেতরে বসে আছেন বাংলার রাজ্ঞী, আলীবর্দীর বেগম। সামনে খোলা ময়দানে দরবার বসেছে। ডাচ-কুঠিয়ালদের উপহার ঐ কারুকাজ করা কুর্শীটি গদী আঁটা। বর্তমানে ওটি মির্জার সিংহাসন। গদীয়ান হয়ে বসে সে হাঁটুতে রেখেছে ডান হাত। ঠিক নানাকে যেমনটি দেখে, তেমনি করে বসা চাই। তার সামনে সম্মানজনক দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে দরবারের প্রার্থী প্রত্যাশীরা। বাতাস বিচিত্র কলরবে মুখরিত।

'এরা কারা?' আলীবর্দীর অলস প্রশ্ন।

'এরা সবাই চিড়িয়াখানার, মালিক হুজুর।' খাস খিদমদ্‌গার হায়দর বললে।

সুদূর দিল্লীতে আরো সুদূর অতীতে, যাদের নিয়ে মির্জা মহম্মদ আলীর যাত্রা সুরু হয়েছিল হায়দর তাদেরই একজন। অওরঙ্গজেবের ছেলে সুলতান মহম্মদ আজমশাহের দয়াতে সেদিন মির্জা মহম্মদ আলী ভার পেয়েছিল দিল্লীর পিলখানা আর জরদোজখানার। জরদোজখানায় হায়দরের বাপের কাজ ছিল সোনার আর রূপোর জরি পরখ করা। আঙুল দিয়ে নেড়ে-চেড়ে পরখ করেই সে বলতে পারত কোন জরিটা খাঁটি আর কোনটা নকল। পরখ করে ওজন করে সে ভাল ভাল জরি জরদোজ-খানার মালখানার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখত। বাদশাহের যেমন আজমীরাবাদী, হায়দ্রাবাদী, জৌনপুরী, উদিপুরী বেগম থাকে, তারও তেমনি তিন তিনটে বাঁদী ছিল, আর তাদের নামও ছিল তেমনি বাছাই করা। ফৈজাবাদী, মোরাদাবাদী, ইমনপুরী। তারও ছিল বান্দা-নফর, দাসী-বাঁদী, দুটো পাল্কি আর খুপরি খুপরি ঘরে খুলখুলির মত ছোট্ট জানলা বসানো একটা দুইমহলা বাড়ি। চাঁদনীচকে।

কিন্তু সেখানে হায়দরকে পাওয়া যেত না। হায়দর থাকত পিলখানার আশে-পাশে, মির্জা মহম্মদ আলীর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত। তারপর অনেক-দিন কেটেছে। সেদিনের মির্জা মহম্মদ আলী দাবার ঘুঁটির মত ঘর বদল করতে করতে একেবারে বাংলার নবাব হয়ে বসেছেন। হায়দরের ভাগ্যও ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন, হায়দর কিন্তু নবাবের খিদমদ্‌গারীই বেছে নিয়েছে।

এখন আলীবর্দীর মনে হয়, হায়দরকে ছাড়া যেন তাঁর এক মুহূর্তও চলবে না। তার অধীনে এত নফর-বান্দা, তবু নবাবের পরিচর্যার ভার সে কারো হাতে ছাড়ে না। সর্বদা ফিটফাট ধোপদুরস্ত, বয়স পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু বেঁটে, রোগা শরীরটিতে জড়তার লেশমাত্র নেই। ওকে ছাড়া কেন নবাবই বা চোখে অন্ধকার দেখেন তা নিয়ে মুস্তাফা খাঁ আফঘান, মুসাহেব খাঁ, মীরজাফরের চিন্তার অবধি নেই।

অনেকে অনেক কথা বলে। হায়দর মুচকে মুচকে হাসে। ইউসুফ আলীকে শুধোয়, 'মালিক, এতজন

সাধনা
দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ: যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস (লণ্ডন), এম.সি.এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র- ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য্য

এত কথা বলে, আমি কি জবাব দিই বলুন ত'?'

'বল, নতুন জুতো আমার চেয়ে পুরনো জুতো আমায় আরাম বেশি। কেন? না, ওগুলো তোমার অভ্যেস। ওতেই আরাম পাও। তা তুমিও মাননীয় নবাবের সেই রকম একটি অভ্যেস। তোমার কাজকর্মে ওঁর আরাম হয় বেশি।'

কেতাবী লোকের কথা শুনে হায়দর মহা চিন্তিত। একটু মাথা চুলকে বলে, 'হুজুর, পুরনো জিনিষ অকেজো হলে ত' লোকে ফেলেও দেয়।'

'আহা, তোমাকে কি আর উনি ফেলবেন? আমি যা বললুম সে ত' কথার কথা। মানুষকে কি আর এক কথায় ফেলে দেওয়া যায়?'

হায়দর তখন ঠোঁট টিপে হেসে ছোট মুখে একটা বড় কথা বলে ফেলে, 'তা হুজুর হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় সুবার মালিক হতে গেলে আজকের কেজো মানুষ কালকে অকেজো হয়ে যায় বই-কি। তখন ফেলে না দিয়ে উপায়?'

'ঠিক।' ইউসুফ মাথা নাড়েন। 'লাখ কথার এক কথা বলেছ। তা, সে কথা যদি তোল, তবে বলি—ফেলে দিতে হয় সেই মানুষকে যে উন্নতির পথে কাঁটা। তোমার প্রসঙ্গে ত' সে ভয় নেই হায়দর? তুমি কি ওঁর সমান?'

হায়দরের যেন চট করে মনে পড়ে যায়, ইউসুফ সরফরাজের এক জামাই। শুধু ত' সরফরাজ খাঁকে গিরিয়ার প্রান্তরে সরিয়ে দেন নি আলীবর্দী, এই ত' ফিরছেন উড়িষ্যা থেকে। সরফরাজের শালা রুস্তমজঙ্গ, বোন দর্দনাবেগম আর বোনপো মির্জা বখর সবাইকে পরাস্ত ক'রে। এখনই এমন কথাটা বলাটা হয়ত উচিত হয় নি। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'না হুজুর।'

ইউসুফ তার দিকে একটু চেয়ে থাকেন। ধূসর চোখ দুটি কুঁচকে ভাবেন, হারজিতের খেলায় তাঁর শ্বশুর বংশের যখন পতন হয়েছে, তখন সামান্য নফরও কথা শোনাবে—এই হল দুনিয়াদারীর নিয়ম। শুধু ক্ষমতার লড়াই, শুধু জেতবার জন্যে দড়ি টানাটানি। এসব কথা তাঁর ভাল লাগে না বলেই ত' সুফীসাধকদের কবিতা, হাফিজের দিওয়ান, এ-সব নিয়েই ভাল থাকেন তিনি। আস্তে বলেন, 'হায়দর!'

'হুজুর!'

'আমার কাছে যেমন বললে, এমন অবহেলে এ-সব কথা কিন্তু অন্যদের কাছে ব'ল না।'

'না হুজুর। আপনি বিদ্বান পণ্ডিত---সবাই বলে আপনার মত মানুষ হয় না।'

ইউসুফের একবার বলতে ইচ্ছে হল, 'তা ছাড়া, আমার কোন উচ্চাশা নেই। আমি বিশ্বাস করি একমাত্র ভাগ্যকে। কিন্তু রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ। এখানে মুখের কথা হিসেব ক'রে খরচ করতে হয়।'

বলতে ইচ্ছে হল না। উদ্যমের অভাব, উৎসাহ পান না। বলেই বা লাভ কি।

হয়ত' ইউসুফের কথা একেবারে মিথ্যে নয়। অনেকদিন থেকে, সেই দিল্লীর প্রাসাদে মহম্মদ আজমের করুণাকণায় ধন্য থাকবার দিন থেকে হায়দর তাঁর সেবা ক'রে আসছে। সাতকুলে কেউ নেই ওর, একটা বউও ভাগ্যে টেকে নি। সব সময়েই ত' সাবধান থাকতে হয় আলীবর্দীকে। সর্বদা তিনি এক এক জায়গায় এক এক রকম। সিংহাসনে বসবার মজাই ওই। চেহেলসুতুন-এর 'খোলা দরবারে মসনদটির মজাই ওই। বসবার জন্যে এত চেষ্টা, আবার বসেও শান্তি নেই। সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। সতর্ক না থাকলে যা হয় সে ত' দেখা গেল। সরফরাজের সরফরাজী বেরিয়ে গেল।

মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দীন, সরফরাজের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে সতর্ক থাকা, এদিকে মীরজাফরকে মনে হয় উচ্চাকাঙক্ষী। জগৎশেঠদের দু'ভাইকে ঠিক বিশ্বাস পান না, এদিকে আফঘান-পাঠান সর্দাররা কখন তুষ্ট কখন রুষ্ট ঠিক নেই। সব সময়ে কি এমন সতর্ক থাকতে পারে। মানুষ? মাঝে মাঝে সব আবরণ নামিয়ে একটু হাল্কা হতে সাধ যায় বই-কি। আর নিজের ঘরে, একেবারে একলা, অনুগত এবং বিশ্বাসী হায়দরের কাছে যেমন সহজ হতে পাবেন তিনি এমন সুযোগ আর কোথায় পান?

কেতাবী লোক ইউসুফ ঠিকই বলেছেন, হায়দর আলীবর্দীর অভ্যেস। পুরনো অভ্যেস। ও এমন একটা লোক যে, ঘরে আছে কি নেই তাও যেন খেয়াল থাকে না।

এখন, চৈত্রের এই তপ্ত অলস অপরাহ্নে মির্জার দরবারে খাঁচায় পোরা পাখীর কলরব শুনতে শুনতে আবার আলীবর্দী জিগ্যেস করলেন, 'এক বিকেলে এত চিড়িয়ামার জোগাড় করলে কি করে?'

'জোগাড় কি আর আমরা করেছি মালিক? খবর দিতে না দিতে সব ভিড় করে এসেছে।'

'কি বলছে দেখ ত'?'

পাখমারাদের গায়ের রঙ রোদে পোড়া। এই কালো কালো তেলমাজা শক্ত শরীর, ধবধবে সাদা কাপড় পরণে। খাঁচায় পাখী, ঝাঁকায় পাখী, জাল ঢাকা চুপড়িতে পাখী, ময়না, শালিক, টিয়া, মনুয়া, কাকাতুয়া, বুলবুলি, খঞ্জনী, শিকরে, বাজ, দোয়েলের ডাকে কান পাতা দায়। এ বলে আমার বুলবুলি শিস দেয় ভাল, ও বলে আমার শিকরে শূন্যে উঠে পায়রা মারে। এ বলে আমার টিয়া কথা কয়, ও বলে আমার কোকিল আশ্চর্য গান গায়।

ওদের মুখপাত্র এক বুড়ি। এই কালো শরীর, ধবধবে চুল, মাথা কেবলই একটু একটু কাঁপে।

হায়দর তাকে ডেকে আনে। সঙ্গে সঙ্গে পাখমারারা আসে। সেপাইদের গুঁতো খেয়েও নড়তে চায় না, শুধু এগিয়ে আসে।

'নবাব নবাব বলে তুমি কি বলছ?'

বুড়ি হাসে। বলে, 'নবাব দেখব বলে কোথা থেকে আসছি, তোর লোকরা এগোতে দেয় কই?'

বুড়ির কথা শুনে সবাই তাজ্জব। খাস দরবারের একজন বয়স্ক নকীব সসম্ভ্রমে বললেন, 'গরীবনেওয়াজ, এরা জঙ্গলী জাতি। অপর সম্বোধন জানে না।'

বুড়ি নির্বিকার। বলে, 'দেখা যখন পেয়েছি তখন আমাদের কথা একটা শুনতে হবে তোকে।'

কি কথা? কি এমন কথা থাকতে পারে যা শোনবার জন্যে দুর্মূল্য এ-বিশ্রামের অবসরটুকু নষ্ট করবেন নবাব? কিন্তু নবাব আঙুল নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'দেখ্, আমরা জাতে পাখমারা। পাখী মারি, পাখী ধরি।'

'বুড়ি তাড়াতাড়ি কর্।' নকীব আস্তে বললেন।

'কেন, তাড়াতাড়ি করব কেন? কথা যে আমাদের অনেকগুলো। না কি, বল্ তোরা?'

বুড়ির সঙ্গীরা সমস্বরে বললে, 'হ্যাঁ. অনেকগুলো।'

'আমরা এই জঙ্গলের প্রজা। কোথাও ঘর-বসত করে থাকি না, খাজনাও দিই না।'

খাজনা দেয় না শুনে আলীবর্দী সচকিত হলেন। খাজনা দেয় না, সে আবার কি? এ-অঞ্চলের জমিদার কে? এরা কতজন খাজনা দেয় না?

তার জবাবে বুড়ি মাথার চুল নাড়িয়ে বললে, 'আমরা অনেকজন। এই মাথায় যতগুলো চুল, আমরা ততগুলো পাখমারা।'

'খাজনা দেয় না কেন?'

বুড়ি ত' দীনদুনিয়ার মালিকের এ হেন প্রশ্ন শুনে অবাক। 'খাজনা দেব কেন? তুই ত' দেশের নবাব, তুই জানিস না যে জাত-পাখমারারা চাষ করে না, এক ঠাঁইয়ে থির হয়ে থাকে না? আমরা ত' শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি, কাঠ কাটি, পাখী মারি, এই আমাদের কাজ।'

'সত্যি কথা।' আলীবর্দী মাথা নাড়লেন। জমি-জমা যাদের নেই তারা আবার খাজনা দেবে কোথা থেকে। দেবেই বা কেন? বেশ লাগছে তাঁর এই আদিবাসী বুড়ির সহজ সবল কথা।

'আমার কথা যে ঠিক, তা তুই নবাব হয়ে স্বীকার যাচ্ছিস। আর সকালে ক'টা পাগমাথার সেপাই গিয়ে শাসিয়ে এসেছে যে, এখন থেকে নাকি খালি যুদ্ধই হবে।'

'যুদ্ধই হবে।' সমস্বর প্রতিধ্বনি।

'আর যুদ্ধ করতে করতে, যাওয়া-আসা করতে করতে এ-বনের ভেতর দিয়ে নাকি বড় বড় পথ তৈরি করে ফেলবি সব।'

'হ্যাঁ, নদীর মত পথ। তেমনি বড় আর তেমনি সাদা।'

'তাই তোর অনেক অনেক টাকা লাগবে। আকাশের তারার মত এত এত টাকা তুই পাবি কোথায়, তাই আমাদেরও খাজনা দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, সেইটি শুনে আমরা এসেছি।'

'তা জঙ্গলের পাখমারা আমরা, আমরা খাজনা দেব কোথা থেকে? তাই পাখী নিয়ে এলাম। শিকার করে আর ক'টা পাখী মারা যায়?' বুড়ি একটি কিশোর ছেলেকে ডাকলে। এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আমাদের এই ছেলেরা পাখীর মত ডেকে ডেকে এত এত পাখী এনে ফাঁদে ফেলতে পারে। এখন থেকে বরং আমরা যখন পারব পাখী নিয়ে আসব।'

আলীবর্দী বিব্রত হয়ে বললেন, 'কে ওদের বিরক্ত করেছে খবর নাও। বলে দাও খাজনা-টাজনা দিতে হবে না। তবে জঙ্গল এমন কেটে কেটে নষ্ট না করে। আর পাখীগুলো নিয়ে যেতে বল।'

যেতে বললেই বা বুড়ি যাবে কেন? তারা ত' আর আগেকার মত একেবারে জংলী পাখমারা নয়। এখন তারা অনেক কথা শিখেছে, সভ্য হয়েছে। জানত না ত' জানত না। এখন একবার যখন জেনে ফেলেছে যে, চাঁদসূর্যের রাজার মত ক্ষমতাশালী নবাব তাদের মধ্যে যখন এসে পড়েছেন, তখন তারা প্রণামী নজর দেবে। রাজ-সকাশে গেলে যে খালি হাতে যেতে নেই এ ত' সবাই জানে। জঙ্গলের ইজারাদারকে তারা মধু, পাখীর মাংস, হরিণের ছাল দেয় না? গাঁয়ের যে হাটে যখন গিয়ে পাখী বেচে তার হাট-পেস্কারকে একমুঠো কড়ি দিতে হয় না? এ ত' রাজাদের প্রাপ্য।

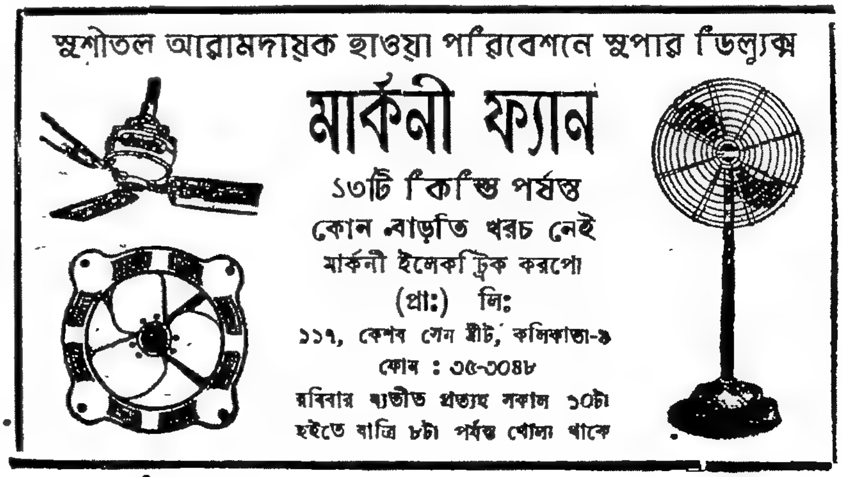

প্রণাম না দিলে তারা পাবে কোথা থেকে।

বালক মির্জা বুড়ির কথা শুনে হাসলে।

'বেশ ত', পাখী না নিস ত' বল্ নাচ দেখবি। মেয়েগুলোকে ডাকি।'

নবাব ভাবলেন এর চেয়ে পাখী নেওয়া ছিল ভাল। উড়িয়ে দেওয়া যেত।

বুড়ি ভাবলে বিপদে পড়লে বাঁচবার জন্যে সব কিছুই করা চলে। শাস্ত্রের কথা। আমাদের শাস্ত্র ত' বইয়ে লেখা থাকে না, মুখে মুখে শিখি। মনে মনে থাকে। আমাদের দেবতা চাঁদসূর্যের দেবতা। নেহাৎ বিপদে পড়ে তবে এ মাটির রাজার কাছে আসা। তা এমন বেরসিক যে নাচ দেখলে না।

সে নকীবের দিকে মুখটি তুলে বললে, 'নবাব নজর নেয় না কেন? রাজাকে কিছু না দিয়ে ফিরে যাই যদি তবে যে আমাদের দোষ লেগে যাবে। ঠাকুর রাগ করবেন। আমার মন্ত্রতন্ত্র সব বিফলে যাবে।'

হঠাৎ হায়দরের কান খাড়া হ'ল। বললে, 'মন্ত্রতন্ত্র জান নাকি?'

বুড়ির গালে একগাল হাসি। বলল, 'ঐ যে তোদের নকীবটি দাঁড়িয়ে আছে ওকে জিগ্যেস কর্ না কেন? ও ত' এই জানগড় গাঁয়েরই মানুষ। বছরে দু'বছরে একবার গাঁয়ে আসে। কত ওষুধ খেয়েছে আমার হাতে, জিগ্যেস কর না কেন।' এবার বুড়ির হাসিটা আর তত সরল দেখাল না। একটু একটু দুলে ও গুন্‌গুন্ করে কি গান গাইতে থাকে। সে গান শুনেই তার সঙ্গীসাথীরা এ ওর মুখের দিকে চাইলে এবং উঠে পড়লে।

আলীবর্দী নকীবের দিকে চাইলেন। জীবনে এই প্রথম নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত একটা ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দুলাল হাতী ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। পেটের ভেতর সব ঠাণ্ডা হতে থাকে। কি বিপদ, কি বিপদ। মুর্শিদাবাদে থাকলে কে আর নবাবকে দেখতে পায় সহজে? তাও ত' চোখ তুলে চাইবার হুকুম থাকে না। কি কুক্ষণে ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিল আর ছুটির পর সোজাসুজি মুর্শিদাবাদ গিয়ে সেরেস্তার ছোটবক্সী সদানন্দ মল্লিকের কাছে হাজরে না দিয়ে এখানেই হাজরে দিয়েছিল। বুড়িটার চোখে কি ভয়ানক হাসি। কোনদিকে যায় দুলাল?

'মালিক খুদাবন্দ বলছেন বুড়ির কথা কি সত্যি?'

দুলাল হাতী ভীত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, ওষুধ খেয়েছি ওর, কিন্তু ও যে ডাইনী।'

'ডাইনী।' উপস্থিত সজ্জন ব্যক্তিরা হাসতে থাকেন। সকলেই যোদ্ধা, কেউ আফঘান, কেউ বা রোহিলা পাঠান। কেউ এসেছেন নিজাম আসফ জাঁর তোপখানা থেকে, কেউ বা পানিপথের বাসিন্দা, যুদ্ধবিদ্যা রক্তে। হাসি পাবারই কথা।

অসম্ভব ভয় দুলাল হাতীকে সাহস জোগাল। সে মরিয়া হয়ে বলল, 'বাণ ছুড়ে মানুষকে মেরে ফেলে হুজুর, সবাই জানে ওদের ঠাকুরের থানের ওপর ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল বলে হারসীকে ও বাণ মেরে দিয়েছে।'

কেউ বললে 'পাগল।' কেউ বললে, 'দেখেছ, পাগলামির সঙ্গে বজ্জাতিও আছে।'

মীর মহম্মদ জাফর খাঁর ভুরুটা শুধু কুঁচকে গেল। মির্জার সখের কুঁজো বামন হাবসীর কি হয়েছে তা তাঁর মত আর কারুর জানবার কথা নয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অতি প্রিয় হবার ফলে হাবসী ইদানীং বড়ই উদ্ধত হয়েছিল। কিন্তু সেকথা এমন জায়গায় বলে কে? নকীবটা বড় মূর্খ বলে মনে হচ্ছে।

তোপখানার পেস্কার রতনলাল নাকে নস্যি টিপে খিশখিশে গলায় বললেন, 'আপনি ভাবছেন কেন? ও কিছু ভেবে চিন্তে বলে নি।'

'জানল কি করে?'

'মীরজাফর খাঁ সায়েব, আপনি দেখছি হাসালেন। ওদের গোলাম-গর্দিসে পৌঁছয় না এমন খবর নেই। ওদের কাছেই ত' খবর পেয়েছিলাম যতই অসুখ থাক, উড়িষ্যা আপনাকে যেতেই হবে। তাই দেখলেন না, কিরীটীশ্বরীর থানে পুজো দিয়ে এলাম?'

মীরজাফর বললেন, 'মুর্শিদাবাদ ফিরেই একবার চুঁচড়োয় খবর নিতে হচ্ছে। মির্জাকে আর একটা বামন কিনে দিতে হবে।'

বুড়ি এতক্ষণ নবাবের মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। আবার জিগ্যেস করে, 'আমার কথাটা শুনলি না?'

না। কানাতে যাবার সময় হয়েছে। ঐ ঘড়িয়াল ঘড়ি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজবার গম্ভীর মধুর শব্দ। একঝাঁক টিয়াপাখী সোনালী আকাশে সবুজ ডানায় মরকতমণি ছিটিয়ে দিয়ে ঝুপঝাপ নেমে আসে বেগমের তাঁবুর সামনে দানা খাবার লোভে। শাস্ত্রীরা পাহারা বদল করে, ঝাড়ুদাররা ঝাঁট দিয়ে যায়, ভিস্তি মশক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জল সেঁচতে থাকে মাটিতে।

নবাব উঠে পড়েন দেখে শণের নুড়ি দুলিয়ে বুড়িও উঠে পড়ে। চলে যেতে যেতে দুলাল হাতীকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। মাথা থেকে উকুন বের করে কটাস করে নখে টিপে বলে, 'তুই আমায় ডাইনী বলে গাল দিলি।'

'কে বললে?' দুলাল বেদম ভয় পেয়েছে।

'গালটা দিলি আমি শুনলাম। তা তোর নবাব আমার কথা শুনল না কেন বলত?'

'বাড়ি যা বুড়ি।'

'শুনল না যেমন, তেমনি নাকাল হবে, হ্যাঁ। এমন একটা বাণ মেরে দেব যে ছটফটিয়ে বেড়াবে—হ্যাঁ।' বুড়ি বকতে বকতে চলে যায়।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সকালবেলা ভিজিটার এলে সাধারণত দেখা করেন না বরুণেন্দ্র। সত্যি কথা বলতে কি, আত্মীয়-বন্ধুবিহীন মানুষটির কাছে বিনা কারণে শখ করে বেড়াতে আসার মত বিশেষ কেউ নেই। যাঁরা আসেন, অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের খাতায় তাঁদের নামের তালিকা লেখা হয় আগে থেকে। যৌবনের দিনগুলো ঝোড়ো হাওয়ার মত কেটে গেছে, এখন ঝিমিয়ে পড়ার পালা। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখার বিলাসে গা ঢেলে দিতে ভাল লাগে। অবসরটুকু যেন এক টুকরো গরম রোদের ফালি। হলদে মধুর মত জমাট, সোনালী অগ্নিশিখার মত উষ্ণ। লণ্ডনের সেই কুয়াশাঘন বিকেলগুলোর কেনসিংটনের ফ্ল্যাটে সাবেককালের ফায়ার প্লেসের গন্‌গনে আঁচের মতই মিষ্টি আমেজ ভরা।

আজকে সকালে বিনা-নোটিশে দরজার কলিংবেল কর্কশ স্বরে বেজে ওঠা মাত্র, কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন বরুণেন্দ্র। ডোরার উৎসাহের অন্ত নেই, সমরেশ সরকারের স্ত্রী মাধবীর মৃত্যু নিছক আত্মহত্যা কিনা তা নিয়ে নানা গবেষণায় সে দস্তুর মত মেতে উঠেছে। ডায়েরীর একটি পুরো পাতায় সে-রাত্রে উপস্থিত সকলের নাম ও পরিচয় পর পর লিখে গল্পে পড়া গোয়েন্দা-কাহিনীর মত রসঘন পরিকল্পনা সুরু করেছে সে। অনেকটা ক্রস ওয়ার্ড পাজ্‌ল-এর মতো।

'নিশ্চয় পুলিশ অফিসার নিজেই এসেছেন'—পেন্সিলের একটা অংশ দাঁতে চেপে কিছুক্ষণ ভেবে ডোরা মন্তব্য করল—'একটা দারুণ ক্লু কিছু পাওয়া গেছে হয়তো।'

'তুমি আর তোমার মার্ডার স্টোরি।' কপট বিরক্তির ভাণ করলেন ডাঃ বসাক—'এমন কেউ কেউ আছে, ক্রিমিনালদের প্রতি যারা একটা সহজাত আকর্ষণ বোধ করে ও ইচ্ছে না থাকলেও ক্রাইমঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। আমার স্থির বিশ্বাস তোমাকে সেই দলে ফেলা যায়।'

'আমাকে না আপনাকে?' বলে হেসে উঠল ডোরা। সেই হাসির উচ্ছ্বাস দেখে একটা ছবি মনে পড়ে গেল। গাছের সবুজ চূড়োর উপরে আলোর পালক দুলছে, শিশিরবিন্দুগুলো যেন মণি-মুক্তার ঝালর, ড্যাফোডিলের বন যেন খুশির হাসিতে দুলে উঠছে। সস্নেহে ডোরার দিকে তাকিয়ে বরুণেন্দ্র বললেন—'কে অভাগা তার মীমাংসা পরেই হবে। আপাতত অতিথি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। অবাঞ্ছিত কেউ হলে আমি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে গেছি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।'

কমলেশ বসুকে বসতে বলে ডোরা তাড়াতাড়ি বরুণেন্দ্রর অফিস ঘরের দিকে রওনা হয়েছিলো, কিন্তু ভদ্রলোক তাকেই ডাকছেন যেন।

'হ্যাঁ, মিস ডিসুজা—সেদিন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ ক্ষণিকের। তবু ডাঃ বসাককে অসময়ে বিরক্ত করতে চাই না বলেই চিঠিটা আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই।'

'কোন চিঠি?' একটু আশ্চর্য হোল ডোরা।

'আমার মতে পুলিশ সম্পূর্ণ ভুল পথে যাচ্ছে—মিস ডিসুজা। মিঃ দত্ত কাল মাধবীর আলমারীতে কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে নাকি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পান নি। ঐ যে অনিল বিশ্বাস বলে ওদের সেক্রেটারী, সে কি বুঝিয়েছে জানি না। তবে অপর্ণার সঙ্গে একটু আগে টেলিফোনে আমার যে কথা হোল, তাতে বুঝলাম ওরা এটাকে সুইসাইডের কেস বলেই মেনে নিতে চায়।'

'অথচ আপনি তা মানতে চান না?' ডোরা চোখ তুলে তাকালো। 'একটা প্রশ্ন কিন্তু মনে আসছে মিঃ বোস। এসব ব্যাপারে আমার অবশ্য কোন রকম অভিজ্ঞতা নেই। তবু ভাবছি—মিসেস সরকারের মৃত্যু একমাত্র তাঁর স্বামী ছাড়া আর কেউ চাইবেন কি? অথচ সেই ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে আছেন আজ কতকাল।'

ডাঃ বসাক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কমলেশ বসুকে বিলিতি প্রথায় সামান্য ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালেন। তারপর ডোরার দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন—'অতিথি সৎকারের ত্রুটি অমার্জনীয় অপরাধ। এত গরমে ভদ্রলোক দস্তুর মত টায়ার্ড হয়ে পড়েছেন। কি মশাই, আইসক্রিম চলবে—না অন্য কোন কোল্ড ড্রিঙ্কস।'

'নো থ্যাঙ্কস'—কমলেশ বসু সজোরে ঘাড় নাড়লেন—'শুধু এক গ্লাস জল হলেই চলবে। আপনি ব্যস্ত মানুষ, বিনা অ্যাপয়েণ্টমেণ্টে দেখা পাব ভাবি নি। তাই চিঠিতে আমার যা বলার, জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। মাধবী কখনই আত্মহত্যা করে নি।

ওকে হত্যা করা হয়েছে। এবং যে এ কাজ করেছে, সে অত্যন্ত ধূর্ত। ভেবে-চিন্তে মাথা খাটিয়ে অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে খুব মেলোড্রামাটিক পরিবেশে এমনভাবে ড্রপসিন উঠিয়েছে যে দর্শকেরা শেষ পর্যন্ত ঠকবেই।'

'অত উত্তেজিত হবেন না, মিঃ বোস। আপনাকে একজন ধীর, স্থির, স্টেডি টাইপের মানুষ বলেই আমার বিশ্বাস হয়েছিলো। আপনি তো মিসেস মাধবী সরকারকে অনেক দিন ধরেই চেনেন। বরং তাঁর অতীত-জীবনের কথা আমাদের একটু খুলে বলুন। আমাদের এ বিষয়ে প্রচুর কৌতূহল।'

নিজেকে সংযত করে নিলেন কমলেশ বসু। এক গ্লাস জলের বদলে বরফের কুচি মেশানো হিম-শীতল সরবৎ পরিবেশিত হয়েছে ইতিমধ্যে। দামী সিগারেটের টিন সামনে আর ঝকমকে পাথর বসানো দামী জাপানী লাইটার হাতের কাছে রাখা। ম্যান্টল-পিস থেকে সুদৃশ্য তামার উপর সোনার জলের কারুকার্য আঁকা অ্যাশট্রে টেবিলের উপর নামানো হয়েছে। দুজন আগ্রহান্বিত শ্রোতার দিকে তাকিয়ে কমলেশ মাধবীর গল্প সুরু করল :

'মাধবীর আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রথম কথাই ডাঃ বসাক বলেছিলেন, এঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিন। কিন্তু সকলেই সেদিন সে প্রসঙ্গে চুপ করে গিয়েছিলো। কমলেশ বসু বললেন, 'মাধবীর বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ কোনদিনই ছিল না। শোনা যায়—এক অরফ্যানেজে ওকে দেখে রাণীগঞ্জ কলিয়ারীর ম্যানেজারের স্ত্রীর কেমন মায়া পড়ে যায় এবং স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অমত সত্ত্বেও তিনি মেয়েটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসে মানুষ করে-ছিলেন। মাধবীর যখন সাত বছর বয়স তখন ভদ্রমহিলা অসময়ে মারা যান। স্ত্রীর শেষ অনুরোধটুকু ফেলতে না পেরে ম্যানেজারবাবু কথা দিয়ে-ছিলেন, কনভেন্টের বোর্ডিং-এ রেখে মাধবীকে লেখাপড়া শেখাবেন। ফলে সাত বছর বয়স থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত সে কনভেন্টের চার দেওয়ালের মধ্যে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

'স্কুল-জীবনের পর কলকাতার কলেজ-জীবন।... অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে পড়ে একদিকে যেমন দিশাহারা হয়ে উঠেছিলো মাধবী, আবার অন্যদিকে জীবনের অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্বাদ তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে সুরু করেছিলো। অভিভাবক-হীন ঐ বয়সের মেয়ে যদি সুন্দর হয়, তা'হলে তার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। রাণীগঞ্জ থেকে মাসে মাসে মনিঅর্ডার আসত নিয়মিত। মধ্যে মধ্যে পোস্ট-কার্ড লিখতেন রাণীগঞ্জের ম্যানেজার-বাবু। লেখাপড়া ভালোভাবে শেখাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একথা মাধবী যেন ভুলে না যায়। ভবিষ্যতে কনভেন্টের স্কুলের চাকরীতে পাকাপাকি ঢুকলে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন এবং তাঁর স্বর্গতা স্ত্রীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

'মাধবী কিন্তু তার আশ্রয়দাতা ও পালক-পিতা'র মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারে নি। কনভেন্টের কঠোর বিধি-নিয়মের পর স্বাধীন জীবনের মুক্তির স্বাদ তাকে কিছুটা বেপরোয়া করে তুলেছিলো। মেয়ে-কলেজের পাশেই ছিলো আমাদের এক কুখ্যাত জমিদার-নন্দনের বিলাসভবন। বলা বাহুল্য, বাড়ির মালিক এবং অনুচরবর্গের লুব্ধদৃষ্টি এধারে প্রায়ই ঘোরাফেরা করত। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কড়া হুকুম এমুখী জানালাগুলো সন্ধ্যার পরে খোলা হবে না। মেয়েদের ফটকের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। অপর্ণা বলে একটি ভিন্ন-প্রকৃতির মেয়ের সঙ্গে মাধবীর যোগাযোগ হওয়াতে এই সময়ে তাকে নিষিদ্ধ জীবনের হাতছানির ইঙ্গিত ক্রমশ বিপরীতমুখী করে তুলল।

'আমি আর সমরেশ সরকার মাধবীকে প্রথম সুদর্শন চৌধুরীর বৈঠক-খানায় দেখেছিলাম। অপর্ণাই ওকে রাত আটটার ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর জানলা দিয়ে পেছনের বারান্দার বুনো লতা-পাতায় ঢাকা অব্যবহৃত ভাঙা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে এনেছিলো। অপর্ণার আর যাই হোক, সাহসের ঘাট্‌তি ছিলো না কোন-দিনই। কিন্তু মাধবীকে ঐ কুৎসিত পরিবেশে দেখে আমার মাথা হয়ে-ছিলো।' কমলেশ বসু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।' ঠিক অনাঘ্রাত একটি ফুলের মতো নিষ্পাপ, সরল, সুন্দর।'

'তারপর?' ডাঃ বসাক আর একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন সামনে।

'তারপর আর কি? সমরেশ ওদের কবল থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই মাধবীকে বিয়ে করেছিলো সেদিন। মিথ্যা বলব না, মোহ-দুর্বলতা আমারও জন্মেছিল। কিন্তু—তবু প্রত্যাখ্যাত হয়ে সমরেশ সরকারের জন্য চেয়ার

ক্রিমান
লণ্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৬,৩নং চিনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

ছেড়ে দিয়ে নিছক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলাম। হাজার হোক, আমার বয়স হয়েছে, জীবনে ঘা খাওয়ার অভিজ্ঞতাও ঘটেছে। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'মন দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে'—।

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—মিসেস সরকারকে তাঁর অতীতের পদস্খলনের সুযোগ নিয়ে কেউ ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করছিল'—ডোরা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল।

'হোল না, হোল না'। ডাঃ বসাক অহাস্যে ডোরার ভুল শুধরে দিলেন, "সমরেশ সরকার মাধবীর অতীত-জীবনের সব কিছু জেনে-শুনেই তাকে বিয়ে করেছিলো। আর এদিকেও আত্মীয়-স্বজন বলতে মেয়েটির আর দ্বিতীয় কেউ ছিলো না। কাজেই ব্ল্যাকমেলার এ-ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। গোলমালের সূত্র অন্য কোথাও রয়েছে—তাই না কমলেশবাবু?'

'আমার বিয়ের প্রস্তাব মাধবী প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কিন্তু সমরেশকে নিয়েও ওর মন তৃপ্ত হয় নি। আসলে জীবন সম্পর্কে ওর এক বিচিত্র ধারণা ছিলো। তারপর ঐ ডাক্তারটি কিছুকাল প্রেমের অভিনয়ের শেষে সরে পড়ার মতলব করাতে বোধহয় বেচারীর মন একেবারেই ভেঙে পড়ে। দোষ দিই না মাধবীকে, সমরেশ কোনকালেই নর্মাল ছিলো না। ওরকম মানুষকে নিয়ে যে জীবনে সুখী হওয়া যায় না, আনফরচুনেটলি মাধবী সেদিন সেকথা বুঝতে পারে নি।'

'একটা নয়, পর পর দুটো ভুল বেচারী করেছিল। সুনন্দ মিত্র ইজ্ এ স্কাউণ্ড্রেল—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু দেখা যাচ্ছে কমলেশবাবু এটা আত্মহত্যা বলে প্রমাণিত হলে গল্পটার শেষটুকু মিলে যায়, তাই না?'

'কিন্তু আত্মহত্যা মাধবী করে নি, তার প্রমাণ আমার আছে।' বলে মাধবীর লেখা সেই চিঠিটা এগিয়ে দিলো কমলেশ। 'আমি পরে শুনলাম ও আবার কনভেন্টে ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছিল। হয়তো যাওয়ার আগে জীবনের ভুল-ভ্রান্তির কথা আমাকে বলে যেতেই চেয়েছিলো শেষবারের মতো।'

চিঠিটা কয়েকবার পড়লেন ডাঃ বসাক। দামী পুরু কাগজ, সবুজ কালিতে পরিচ্ছন্ন ছাঁদে টানা টানা অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা চিঠি। তারিখটা ঘটনার দু'দিন আগেকার। হস্তাক্ষর দিয়ে চরিত্রচিত্রণ করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে দস্তুরমতো গবেষণা করা হয়। হয়তো জিনিষটা একেবারে বোগাস নয়। হরফগুলোর জোরালো টান দেখে মনে হয়, যে লিখেছে তার মনে কোথাও কোন দুর্বলতার চিহ্ন নেই।

'সেদিন আপনার সঙ্গে মিসেস সরকারের নিভৃতে দেখা হয়েছিলো কি?' ডাঃ বসাক ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন।

'মাধবী বলেছিলো ওপরে লাইব্রেরী ঘরে আমার জন্য সাড়ে দশটার পরে অপেক্ষা করবে। অর্পণা আমাকে কিছুতেই ছাড়ছিলো না বলে একটু দেরি হয়ে গেলো।'

'আপনি যান নি?'

'গিয়েছিলাম'—বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কমলেশ বসু বললেন, 'পুলিশের কাছে কথাটা চেপে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছিলো যদিও। মাধবী লাইব্রেরী ঘরে দাঁড়িয়ে আলমারীতে চাবি লাগিয়ে কি যেন ভাবছিলো। ওর হাতে সবুজ সরবতের একটা গ্লাস দেখেছিলাম। বললাম, 'এতদিন বাদে আমাকে মনে পড়ল।' বেশি কথা ও বলত না কোনদিন, কিন্তু আমি ওর চোখে ভয় দেখলাম। মাধবী এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল।'

'তোমাকে সব কথা বলার সময় এখন নেই। আমি পরশুই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। একবার রাণীগঞ্জে যেতে হবে। মায়ের একটা ছবি আমার কাছে রাখতে চাই। কাল সকালে এগারটা আন্দাজ হ্যাপিলুক কাফেতে অপেক্ষা কোর।'

কবিত্ব করেছিলাম তখন—'চলেই যদি যাবে, তাহলে আবার কেন এই আহ্বান।'

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

মাধবী বলল, 'কয়েকটা কথা তোমাকে বলে যাব। এখানে আমার কি রকম একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটছে। আমিই বোধ হয় তোমাদের সকলকে অসুখী করেছি, আর সেই পাপের শাস্তি আমাকে পেতে হবে। আজ না হোক, একদিন। হয়তো সেই ভয়েই আমি আজ এস্কেপিস্ট হয়ে জীবনের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।'

'ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ির কাছে কার পায়ের শব্দ পেলাম। মাধবী তাড়াতাড়ি বলল—'এখন নীচে যাও। আমার একটু দরকার আছে এখন এ-ঘরে।'

'বিষণ্ণ মনে নীচে চলে এলাম তারপর।'

'কিন্তু সেই যে পায়ের শব্দ শুনলেন, সেটা কার?'

'বলতে পারব না। আসলে সিঁড়িঘরটা অন্ধকার ছিল, আর আমারও ততটা খেয়াল হয় নি। আমি মাধবীর কথাই ভাবছিলাম।'

'তাহলে আপনিই বোধ হয় ভদ্রমহিলাকে জীবিত অবস্থায় সব চাইতে শেষে দেখেছিলেন'—ডাঃ বসাক চিন্তিত গলায় বললেন।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন কমলেশ বসু, কথাটা হয়তো তাই কানে গেল না। ঠিক এ-সময়ে টেলিফোনের কর্কশ বাস্তব আওয়াজে উপস্থিত সকলের ভাবনা-চিন্তার খেই হারিয়ে গেল।

'মিঃ বসন্ত মল্লিক আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছেন। অত্যন্ত জরুরী দরকার—দশ মিনিট টাইম পেলেই ওঁর হবে।'

'বসন্ত মল্লিক? সে আবার কে?' কমলেশ বসুর অন্যমনস্ক চেহারার দিকে এক মনে নিবিষ্ট হয়ে ডাঃ বসাক কি যেন ভাবছিলেন। পরক্ষণেই অবশ্য মনে পড়ে গেলো। 'ও আমাদের সেই অসম সাহসী শিকারী ভদ্রলোকটি, তোমাকে দেখে যে বেচারী সামান্য আন-ব্যালেন্সড্ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে ওঁর স্ত্রীর আসার কথা আছে। তুমি বরং বলে দাও এখুনি যদি আসতে পারেন। দুজনের আমার চেম্বারে দেখা না হওয়াই ভালো।'

ইংগিত বুঝতে পেরে ডোরাও হাসল।

'আপনার সব তাতেই ঠাট্টা। অথচ লোকে মনে করে যে ডাক্তার মানুষের মনের অসুখ সারায়, সে না জানি কত সিরিয়াস।'

রামদুলাল দত্তের সঙ্গে ফোনে কমলেশ বসুর সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে চেয়ার ছেড়ে সবে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় কলিংবেল বাজলো। ঘরে ঢুকলেন বসন্ত মল্লিক। বেশ মিয়োন নরম, বিনীত চেহারা। এমন কি ডোরাকে দেখেও সেদিনের উৎসাহ আজকে জাগলো না।

'আপনি আমাকে বাচান ডাঃ বসাক। পুলিশের লোক কাল আমাদের বাড়িতে এসেছিলো তাই নিয়ে আমার ওয়াইফ এমন হাঙ্গামা বাধিয়েছেন যে, বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না।'

'পুলিশের লোক কেন?' ডাঃ বসাক কিঞ্চিৎ অবাক হলেন—'সেদিন ঘটনাস্থলেই তো সব জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেলো। আপনারা এই কেসের সঙ্গে একেবারেই যুক্ত নন, মাধবী সরকারের মৃত্যুতে আপনাদের লাভ বা লোকসান কোনটাই হচ্ছে না।'

'একটা কথা আমি সেদিন গোপন করে গেছলাম ডাঃ বসাক'—বিব্রত হয়ে বলে উঠলেন বসন্ত মল্লিক—'মাধবী, মানে মিসেস সরকার দুদিন আগে আমার অফিসে এসেছিলেন নেহাৎ একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে। তাঁকে কথা দিয়েছিলাম এ-খবর আমি কাউকে জানাবো না, এমন কি আমার স্ত্রীকেও নয়। সে জন্যে পুলিশকে সেদিন বলতে পারি নি কিছু। যতই হোক, একজন ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়েছি—বড়ই ডেলিকেট ব্যাপার তো।'

'মাধবী সরকার গিয়েছিলেন আপনার অফিসে? আপনি ভয়ানক ভুল করেছেন মিঃ মল্লিক। কথা যাঁকে দিয়েছিলেন, তিনি বেঁচে নেই। কাজেই আপনার গোপন করে যাওয়াটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ টের পেলো কি করে?'

'আমার অ্যাসিস্টাণ্ট মুকুন্দ বড়ুয়ার দোষ। জানি না রামদুলাল দত্ত কি কারণে আমাকে অফিসের নম্বরে সেদিন ডেকেছিলেন। ছোকরার উৎসাহ বেশি, নিজে থেকেই বোকার মতো বলে ফেলেছে মাধবী সরকার আমার ঘরে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন। শুনে আমার ওয়াইফ একেবারে আগুন। মেয়েদের তো জানেন মশাই, সম্পূর্ণ অবুঝ আর বাতিকগ্রস্ত। ভাবছিলাম চিকিৎসার জন্য ওঁকে আপনার এখানেই নিয়ে আসব। আপনি তো আমার মনের ডাক্তার।'

'কি হয়েছে মিসেস মল্লিকের?' ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ডাঃ বসাকের মুখে।

'সন্দেহ। স্রেফ সন্দেহ বাতিকই ওঁকে পাগল করে ছাড়বে। কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই উনি ভাবেন আমি প্রেমে পড়ে গেছি।'

'আচ্ছা, আপনি কোন্ অফিসে কাজ করেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ডাঃ বসাক।

'দি ওরিয়েণ্ট ইলেকট্রোপ্লেটিং কম্পেনী। আগে ইংরেজদের ম্যানেজমেণ্ট ছিলো এখন মাড়োয়ারীদের হাতে। আগেকার সুখ নেই মশাই। এরা বড় বেশি ব্যবসাদার জাত।

'ইলেকট্রোপ্লেটিং সলিউশনে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড কিন্তু কাজে লাগে। যাকে আমরা সংক্ষেপে সায়ানাইড বলি। একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি মিঃ মল্লিক। মাধবী সরকার যে বিষ খেয়েছিলেন, তা ছিলো সায়ানাইড।'

ডাঃ বসাকের কথা শুনে বসন্ত মল্লিকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন—'বিশ্বাস করুন ডাঃ বসাক, আমি এ-বিষয়ে কিছু জানি না। সব খুলে বলছি আপনাকে, তাহলেই বুঝবেন আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।' (ক্রমশঃ)

ট্রামটা চলেছে ইনভালিডোভনার দিকে। যাত্রী তেমন নেই। আধাখালি ট্রামের জানলাগুলি ঝাঁকুনিতে খট্ খট্ আওয়াজ তুলছে।

তার ধারণা ট্রামের গতি স্বাভাবিক অপেক্ষা শ্লথ। বার বার সে উঠছে, দু-এক পা প্লাটফরমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে এসে বসছে; সময় যেন কাটতে চায় না। ট্রামরাস্তার দক্ষিণ দিকের খালি জায়গাটা তার চোখে পড়লো। তাকে যেন দিবাস্বপ্নে পেয়ে বসেছে;—এই খালি জায়গায় কত বাড়ি তৈরি হতে পারে, কত লোকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। তারও তো একটা বাড়ি হতে পারে। বিরাট বাড়ি সে কল্পনা করে না; সে চায় একটা ছোট বাড়ি, সামনে থাকবে সবুজ ঘাসে ভরা একফালি খালি জায়গা। বাড়িটির বড় বড় দরজা-জানলা। হয়তো শ্রমিকদের জন্য বাড়ি তৈরির পাঁচসালা পরিকল্পনায় তার বাড়িটা তৈরি হবে। তা যে পরিকল্পনাতেই হোক, একটা বাড়ি হলেই হলো। বাড়িটি তৈরির সময় সে চার-পাশে ঘুরেঘুরে দেখবে; বার বার দেখবে। আর নিজেকে নিজে বলবে: এটা হবে বাথরুম, এটা বৈঠকখানা, আর এটা—

থাক্, এ কেবল কল্পনা। তাকে আরো দু-বছর অপেক্ষা করতে হবে। তার পড়া শেষ হতে আরো দু-বছর বাকি। তার পরেও হয়তো তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এ কয়টা বছর তাকে আর এনিকাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে; নিজেদের একটু কাছা-কাছি পাবার জন্য পার্কের কোন এক কোণে একটা খালি বেঞ্চ পাওয়া যায় কিনা নজর রাখতে হবে।

এমন কি সে যখন রীতিমত স্থপতি হবে, অন্য লোকের জন্য বাড়ি তৈরি করবে, তখনো হয়তো তাদের বাড়ি হবে না। এনিকা অবশ্য আশা করে, অন্তত একটা কামরা তারা পাবেই। বেচারী। তার ওপর এনিকার গভীর বিশ্বাস। কিন্তু বাড়ির ব্যাপারে তাকে হতাশ হতেই হবে।

এনিকা বড় সুন্দরী, মিষ্টি মেয়ে। তার চেয়ে এনিকা বয়সে ছোট, ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। তারও শিক্ষার বিষয় স্থপতি-বিদ্যা। তাই পড়াশোনার বিষয়ে সে এনিকাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু, তাদের দেখা হলে ক্লাশের কথা ছাড়া অনেক কথা আলোচনা করে। তারা রাজনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলে, প্রেমের কথা বলে। পরস্পরকে তারা নতুন নতুন নামে ডাকে। কখনো কখনো মেতে ওঠে দেশ-ভ্রমণের পরিকল্পনায়, সে আলোচনা উত্তেজনায় ভরে ওঠে; কখনো বা হাত ধরে রাস্তায় হাঁটে নীরবে।

এক এক সময় এমন হয় যখন তারা একাকী থাকতে চায়। এরকম সাময়িক বিচ্ছেদের পূর্বে হয়তো দু-জনে অস্বস্তি বোধ করে, নতুন কথা কাটাকাটি হয়। রেগে দু-জনে

দু-দিকে চলে যায়। কিন্তু, পরের দিন সকালেই দেখা যাবে একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা জানে এই অস্বস্তির জন্য তাদের দোষ নেই। তাদের মাথার ওপর তো একটিমাত্র ছাদই আছে; সেই তারাখচিত ছাদ সার্বজনীন।

গতকাল এনিকা ছোট্ট একটা চিঠি ফ্যাকালটিতে রেখে গিয়েছিল। ওতে লেখা ছিল—তার মা বাবা আজ চারটের গাড়িতে চলে যাচ্ছে। এখন সোয়া চারটে; আর ট্রামটা যেন চলতেই চায় না। বিরক্তিকর ধীরগতিতে চলেছে।

অবশেষে ট্রামটা এসে স্টপে থামলো। অধীর হয়ে সে একরকম লাফিয়ে নামলো। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো, তারপরে অন্ধকার সরু রাস্তা ধরে দ্রুত এগুতে লাগলো। রাস্তার দু-পাশের পুরানো ভগ্নোন্মুখ যে বাড়িগুলি দেখলে সে বিরক্ত হতো, আজ কিন্তু সেই বাড়িগুলি তার নজরেই পড়লো না।

বাড়িতে পৌঁছে সে দরজায় বেল টিপলো, এনিকা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো। ছিপছিপে দেহের তন্বী মেয়ে, মুখের গড়ন গোল, তাতে মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

সে ঝুঁকে পড়লো চুমু খাবার জন্য। এনিকা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেও সতর্ক হয়ে গেল, বাড়িতে কাদের যেন কথা শোনা যাচ্ছে না।

'আমার দাদা আর বৌদি এসেছে বেড়াতে।'

সে এমনভাবে তাকালো—তাতে হতাশাটা আর লুকাতে পারলো না।

'তুমি রাগ করো না';—একথা বলে এনিকা পুরানো বর্ষাতিটা নিয়ে এল। তারপরে দু'জনে চলা সুরু করলো সেই সরু রাস্তা দিয়ে,যার দু-ধারে জীর্ণ বাড়িগুলি যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশ ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। ভিজে রাস্তা হয়ে ওঠেছে পিচ্ছিল। সুতরাং বেশি দূরে যাবার মত অবস্থা নয়।

এনিকাই কথা বলছিল। ভেবে ভেবে নানা কথার সূত্রপাত করছিল তাকে উৎসাহিত করার জন্য। সে কিন্তু আনমনা হয়ে পড়ছিল।

তারা ট্রামস্টপে এসে পড়লো। সোঁ—সোঁ—ট্রাম আসার শব্দ হচ্ছিল।

'এবার তাহলে আমি চলি? ট্রাম এসে থামলো।

এনিকা প্রস্তাব করলো—'চল আমরা কোথাও যাই।'

'কোথায়?'

অন্য দিকে চোখ রেখে এনিকা জবাব দিল—'গ্রামের দিকে কোথাও।'

সে পাল্টা বলতে চাইল তার বাড়ি ফেরার কথা এবং এনিকাকে তার দাদা বৌদির কাছে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু ট্রামের কণ্ডাক্টার তাদের জন্য অপেক্ষা করছে লক্ষ্য করে কোন কথা না বলে তারা ট্রামে চড়ে বসলো।

রেল স্টেশনে পৌঁছলে এনিকা দুটো টিকিট কেটে আনলো। হঠাৎ সে অপ্রস্তুত বোধ করলো। তার পক্ষে এটা কি বাড়াবাড়ি হলো না? সে ভাববে কি? হয়তো তাকে নির্লজ্জ মনে করবে। এনিকা তার দিকে আর যেন তাকাতে পারছে না। বারান্দার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, যেখানে পরিত্যক্ত কাগজ আর কমলালেবুর খোসা ছড়ানো রয়েছে। 'আমি একটা জায়গার কথা জানি'—কমলার খোসার দিকে চোখ রেখে এনিকা বললো। 'সেখানে ঘন সারিবদ্ধ বড় বড় গাছ স্টেশন থেকে পুল পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছে।'

ট্রেন চলতে সুরু করে ও ক্রমে গতি বাড়লো। গাড়িতে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। দূরে একটা লাল আলো তারার মত অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে। রাস্তার বাতিগুলি কুয়াশায় অনেকটা ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। রেল লাইনের পাশে বাড়িগুলিতে আলো জ্বলছে। একটা বাড়ির জানলা দিয়ে দেখা গেল—টেবিল ঘিরে বসে কয়েক জন লোক খোসমেজাজে গল্প করছে। তার মন কেবল যে জানলার ভেতরে গিয়ে পৌঁছলো তা নয়, সে যেন দূরের আলোকিত বাড়িগুলির কথাও কল্পনা করছিল। এই লোকগুলির সৌভাগ্যে তার ঈর্ষা হচ্ছিল না, বরঞ্চ এত লোকের সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ হচ্ছিল। অথচ এই আলোর রাজ্যে তারা যেন নিঃসঙ্গ। তার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল—এভাবে দু-জনের একসঙ্গে থাকা ভাল, নতুবা নিঃসঙ্গতায় তার দম আটকে আসবে। কিন্তু কথা সে বলতে পারলো না, এনিকার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল।

স্টেশনে ট্রেন থামলো। গাড়ি থেকে নেমে ওরা গাছের সারির ভিতর দিয়ে লোহার পুলটা অতিক্রম করে গেল। বাতাসে ভিজেমাটির গন্ধ; ঝরা-পাতা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির রূপ উপভোগ করার মত তার মনের অবস্থা নয়। সে ভাবছে এনিকার কথা, তার সঙ্গ পাওয়ার চেয়ে তার কাছে বড় আনন্দ আর নেই। এনিকাকে সে পাশে—আরো কাছে টেনে নিল—'আমার প্রিয়তমা!'

এনিকার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। গাছের নীচে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলো—কিছু দূরে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। সেদিকে তাড়াতাড়ি পা চালালো। সেখানে পৌঁছনর জন্য আর যেন দেরি সয় না।

বাড়িটির প্রবেশপথের পাশে কালো পাথরের ওপর লেখা রয়েছে হোটেলের নাম। তারা এক নজরে নামটি দেখে দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করলো।

একজন পোর্টার বসে বসে ঝিমোচ্ছে। তার পাশে একটা বড় কাঠের বোর্ডে পনেরটি চাবিশূন্য হুক।

তারা একবার সেই বোর্ডের দিকে আর একবার সিঁড়ির লাল কার্পেটের দিকে তাকালো। মাথার ওপর একটা ছাদ পাওয়া এবং পরস্পরকে নিবিড় করে পাওয়া আর হাতে হাত, মুখে মুখ, দেহের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

এনিকা বললো—'চল আমরা আর একটা হোটেলে চেষ্টা করি।'

আবার তারা লোহার পুল অতিক্রম করলো, একই পথে গাছের ভেতর দিয়ে ফিরে চললো। কুয়াশায় এনিকা অস্বস্তি বোধ করছিল।

একটা বিরাট বাদাম গাছের নীচে ওরা দাঁড়ালো। সেখানে ঘন অন্ধকার। এনিকা তার মুখটা বাড়িয়ে দিল চুমু খাওয়ার জন্য, তার ঠোঁট যেন জ্বলছে, শরীর কাঁপছে।

স্টেশনের বিশ্রামাগার থেকে এক যাযাবর নারীর নাক-ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে বেশ দূরে এক কোণে একটা বেঞ্চ রয়েছে। দু-জনে গুটিয়ে গিয়ে বসলো।

একটা মালগাড়ি ধীরে ধীরে চলেছে। ইঞ্জিনের হুইসেলের পরে ঘরর ঘরর শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুয়াশার মধ্যেও লাল বাতিটা জলজল করছে। যুবকটির মন আবার চলে গেল সেই স্বপ্নে, বড় বড় বাড়ি, লম্বা বারান্দা, বিরাট দরজা-জানলা; প্রেমময় জীবন নিয়ে মানুষ সেখানে বাস করে, যাদের জীবনে প্রেম নেই তারাও। তার উদাস দৃষ্টি দূরের আলোর দিকে।

এনিকা এটা লক্ষ্য করলো, 'তুমি কি আমায় ভালবাসো?'

'তোমায় আমি ভালবাসি।'

'তুমি সুখী?'

এমন সময় নীল পোষাকপরা রেলের কর্মচারী সিগন্যাল বক্সের দিক থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। হাতের বাতিটা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের মুখ দেখলো।

'তোমরা যদি পিলসেনের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে থাক—তাহলে কিন্তু সেই গাড়ি এক ঘণ্টা আগে চলে গেছে।'

'না, তা নয়। আমাদের রাত্রে ঘুমাবার জায়গা নেই।'

দু-জনেই একটা প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রইল।

'আ---আ---' লোকটা বিড় বিড় করে বললো—'আজকাল থাকার জায়গা পাওয়া বড় কঠিন।' পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলো—'তোমাদের পরবর্তী গাড়ি চারটে পনের মিনিটে।'

কর্মচারীটি গুদামঘরের দিকে এগিয়ে গেলো; হয়তো সে তখন ভাবছিল—বহুকাল আগে তাকেও এরকম থেকে বসে থাকতে হয়েছে। অনেক কাল আগে, এত আগে যে, এখন মনে করাও কষ্টকর। তার খেয়াল হলো—এখন নভেম্বর মাস, এ সময় তাদের ছাদের নীচেই থাকা প্রয়োজন ছিল।

আবার এনিকা প্রশ্ন করলো—'সত্যিই কি তুমি সুখী হতে পেরেছো?'

জনশূন্য স্টেশনে তারাই কেবল রয়েছে। পরস্পরের জন্য এত আকুল তারা আর কখনো হয় নি।

এনিকাকে সে বলতে চাইল—তাকে এত ভালবাসে যে, কোথায় রাতটা কাটলো তাতে কিছু আসে যায় না। এই অনেকের জগতে, বহু বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে তারা যে পরস্পরকে এত কাছে পেয়েছে, এত নিবিড়ভাবে মিলিত হয়েছে, এটাই তো বড় কথা।

—তারা গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ।

'তোমাকে পেয়ে আমি খুব সুখী, জীবন সার্থক।'

'আমিও'—এনিকা বললো।

সেই নীল পোষাকপরা কর্মচারীটি গুদাম থেকে বার হলো; হাতে বাতিটা জ্বলছে। সেদিকে ওদের খেয়ালই নেই।

কর্মচারীটি তাদের দিকে একবার দেখে বাতিটা নিবিয়ে দিল। তারপর সাবধানে পা ফেলে তাদের পাশ দিয়ে সিগন্যালপোস্টে ফিরে গেল।

অনুবাদ: কল্পতরু সেনগুপ্ত

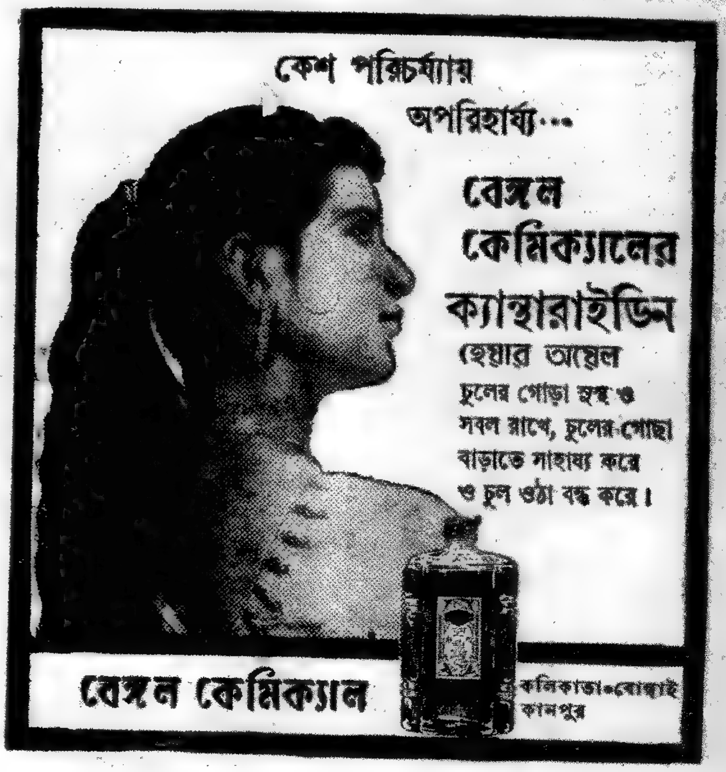

শহর কলকাতা ✲ শ্রীপদাতিক

॥ সেকালের সুকলা অঞ্চল থেকে একালের মহাত্মা গান্ধী রোড ॥

আদি সপ্তগ্রামের তরুণ অধ্যায় যখন নদী-সরস্বতীর অকাল বিরহে স্তিমিত, তখন ভাগীরথীর পূর্ব-উপকূলে সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশের সৌভাগ্য অর্জন করে সুতানুটী। কেবল এক সুশোভন জনপদরূপেই নয়, বাণিজ্যের বিনিময় কেন্দ্ররূপেও সে তখন বণিকসমাজের এক অদ্বিতীয় গৌরব। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পরিচ্ছেদে প্রথম নিবাস এখানেই নির্বাচন করেন বিদেশী জব চার্নক। তাঁরই নির্ধাতি প্রত্যয় এবং প্রচেষ্টা সুতানুটীর সার্বিক পরিবেশে আরও বিপুল সমৃদ্ধির যে উত্তরণ ঘটায়—তা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন অরণ্যের আদিম প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না চিৎপুর। তার অধিকাংশ অঞ্চল বনবনের গভীর ছায়ায় আত্মলীন ছিল তখনো। তবে আজ যে-অংশে পরিমিত প্রস্থের মুলাম্যে হ্যারিসন রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোডের বিন্যাস ঘটেছে, সেকালে সে-অংশেরই উভয়বাহু-বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে বিক্ষিপ্ত বসতি ছিল কৃষকসমাজের। আর তাদেরই বিভিন্ন বসতির উপকণ্ঠ জুড়ে শ্যামল শস্যক্ষেত্রের সংস্থাপন ছিল অবারিত। তখন কৃষকসমাজের একাত্মবোধের দৃঢ়তা যেমন ছিল, তেমনই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসও ছিল অপরিসীম। সম্ভবত এই নির্বিচার ধর্মের অনুশাসনেই কালে কালে কিছু কুসংস্কারকেও আত্মসাৎ করে তারা। তাদের মধ্যে সতীদাহের নির্দয় নীতির প্রচলন যেমন ছিল, তেমনই ছিল কুষ্ঠ-রোগীকে জীবন্ত দাহ করার পৈশাচিক প্রথার ধারাবাহিকতা। তাদের বিশ্বাস: কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত দাহ করলে পরজন্মে সে লাভ করবে সুন্দর জীবন। ঠিক কোন সূত্রে এমন এক নিষ্ঠুর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটে তাদের জীবনে—তার কোনো ইতিহাস নেই। এই অমানবিক বিধানের সঙ্কেত নেই কোনো ধর্ম-গ্রন্থেও। অথচ তৎকালীন কৃষকসমাজে তার ধারাবাহিক প্রচলন ছিল পুরুষানুক্রমেই। এ-সম্পর্কে একটি কাহিনী উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি। কাহিনীটি এই:

বর্তমান হ্যারিসন রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোডের উভয়-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুতানুটীর যুগে যে-কৃষকসমাজের অবস্থান ছিল—বনমালী ছিল তাদেরই একজন। কর্মদক্ষ বলিষ্ঠ যুবক সে। তার কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়েই তার হাতে একমাত্র কন্যাকে সম্প্রদান করে গাঁয়ের মোড়ল। মোড়ল-কন্যা বধূরূপে এসে পাশে দাঁড়ায় বনমালীর। বনমালীর প্রতীক্ষমাণ সংসারের সবুজ শাখা-প্রশাখায় হঠাৎ বসন্তের ফুল ফোটে নানাবর্ণে, আর বিচিত্র সুরে গান গেয়ে ওঠে কোকিল-যৌবন। সুখী দম্পতির গভীর ভালোবাসার শুভ্র চূড়ায় হাসতে হাসতে মূর্তিমান হয়ে ওঠে অক্ষয় আনন্দ।

তারপর আনন্দের ঘোরেই তারা যখন উভয়ে অতিক্রম করে আসে একটি বছর, তখন গর্ভধারণের প্রথমাবস্থার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মোড়ল-কন্যার। অদূর ভবিষ্যতেই এক অভিনব অতিথির আবির্ভাব ঘটবে তাদের সংসারে। অতএব স্বাভাবিক কারণেই তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আরও। খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে নতুন অতিথিকে বরণ করার প্রস্তুতিই চলতে থাকে তাদের। কিন্তু সপ্তাহ-খানেক কাটতে-না-কাটতেই এমন এক খুশির জোয়ারে ভাঁটার টান পড়ে হঠাৎ। কারণ সবিস্ময়ে উভয়েই তারা লক্ষ্য করে: বনমালীর দেহে ধরা পড়েছে কুষ্ঠরোগের আভাস। শিউরে ওঠে মোড়ল-কন্যা। সে জানে: পল্লীবাসীরা খবর পেলেই জীবন্ত দাহ করবে তার স্বামীকে। তাই সে রোগের সংবাদ গোপন রেখে, বনমালীকে লুকিয়ে রাখে ঘরে। তারপর সে পার্শ্ববর্তী মির্জাপুর পল্লীর এক মুসলমান ফকিরের কাছে আসে এবং তাঁর কাছ থেকেই তাগা-তাবিজ সংগ্রহ ক'রে স্বামীর রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে আসন্ধ্যা-সকাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আক্রান্ত হওয়ার মাস-দুয়েক পরেই গলিত কুষ্ঠের দুর্বহ ক্ষত প্রকট হয়ে ওঠে বনমালীর সর্বাঙ্গেই। দেখতে দেখতে অতিমাত্রায় মুমূর্ষু হয়ে ওঠে রোগী।

তারপর যেভাবেই হোক, রোগের খবরও আর চাপা থাকে না। পল্লীবাসীদের গৃহে গৃহে এ-সংবাদ এক আতঙ্কের সঞ্চার করে যথারীতি।

অতএব নিয়ম অনুসারেই, একদিন পল্লীবাসীরা একে একে এসে সমবেত হয় বনমালীর গৃহে। তারা তাকে বলপূর্বক বাইরে এনে শিবিকায় তোলে। নিয়ে আসে ভাগীরথীর তীরে। তারপর এক নৌকোর সাহায্যে ভাগীরথী পার হয়েও তারা আরও পশ্চিমের এক নির্জন প্রান্তরে এগিয়ে আসে। সঙ্গে আসে পতিব্রতা মোড়ল-কন্যাও। প্রান্তরের মধ্যভাগে এক গভীর গর্তের সৃষ্টি করে পল্লীবাসীরা। তারপর সেখানেই মুমূর্ষু বনমালীকে নিক্ষেপ ক'রে, তার গলিত দেহের চারপাশে স্তূপাকারে সাজানো হয় কেরোসিন-সিক্ত জ্বালানী কাঠ। সেই কাঠে পল্লীবাসীদের দৃঢ় নির্দেশেই কাঁপতে কাঁপতে অগ্নি-সংযোগ করে মোড়ল-কন্যা স্বয়ং। আর্তনাদ ক'রে ওঠে বনমালী। কিন্তু তার আর্তনাদ ছাপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বেজে ওঠে ঢাক, ঢোল আর করতাল এবং সেই সঙ্গে আকাশ মাতিয়ে তোলে পল্লীবাসীদের বীভৎস উল্লাসধ্বনি। তব এমন এক পরিবেশেও সেই গর্তোৎগত অগ্নিদেবের প্রতি নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে গর্ভবতী মোড়ল-কন্যা। দেখতে দেখতে, অগ্নিদেবের সেই করাল শিখা যখন আকাশ-পথে উদ্ধত হয়ে ওঠে আরও, তখন গর্ভের শিশু গর্ভে নিয়েই হঠাৎ সেখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মোড়ল-কন্যা নিজেও।

থেমে গেল ঢাক-ঢোল-করতাল। মোড়ল-কন্যার এই আকস্মিক আত্ম-বিসর্জনে পল্লীবাসীরা অবাক হলেও, যন্ত্রণায় কাতর হলো না কেউই। কেবল কৌতূহলবশতই খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে এ-দৃশ্য অবলোকন করছিলেন যে-বিদেশী—শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। তিনি তাঁর অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিবদ্ধ রেখেই শপথ নিলেন: যেভাবেই হোক, এতদঞ্চলে কুষ্ঠ-রোগীদের সুচিকিৎসার জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন একটি হাসপাতাল।...

এই মহাপ্রাণ বিদেশী আর কেউই নন, তিনিই শহর-কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক।

উল্লেখিত ঘটনা ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্তির লগ্নে। তারপর কেটে যায় সুদীর্ঘ কাল। কালে কালে প্রয়োজনের কুঠার হস্তেই এগিয়ে আসে মানুষ। দেখতে দেখতে অরণ্যের অপসারণ ঘটে চিৎপুর থেকে। বর্তমান হ্যারিসন রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোডের উভয়-পার্শ্ববর্তী তৎকালীন আবাদী অঞ্চলও ভরাট হয়ে ওঠে এবং এই ভরাট অঞ্চলের খণ্ড খণ্ড জমিতেই দিনে দিনে মাথা তুলে দাঁড়ায় বণিকসম্প্রদায়ের অসংখ্য বসতবাটী। এই বণিক-সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে সপ্তগ্রাম থেকে। কারণ রূপবতী সরস্বতী নদী তখন মহাকাল কর্তৃক অপহৃতা বলেই সপ্তগ্রামে ছায়া ঘনায় দুর্দিনের।

তারপর ক্লান্তিহীন কালস্রোতেই ভেসে যায় সপ্তদশ শতাব্দী। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাত্রারম্ভ থেকেই জ'মে ওঠে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহুমুখী বাণিজ্য। বাণিজ্য-সূত্রেই তারা ধীরে ধীরে মিত্রতা স্থাপন করে এ-দেশীয় বণিক এবং জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে। তারপর একসময় দিল্লীশ্বর ফাররুক শায়ারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারাই হস্তগত করে সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কালীক্ষেত্র বা কলিকাতা। সময় ঝ'রে ঝ'রে পাথর হয় এবং পাথরের বুকে দাঁড়িয়েই তারা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পতন ঘটায় এ-দেশীয় নবাব সিরাজদ্দৌলার। ভারতীয় দালালশ্রেণীর চক্রান্তেই সারা দেশব্যাপী অচিরেই প্রতিষ্ঠালাভ করে ইংরেজ-জালিয়াতদেরই রাজত্ব।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পর্ব থেকেই বর্তমান হ্যারিসন রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোডের উভয়-পার্শ্ববর্তী তৎকালীন অঞ্চলের সংস্কার সুরু হয়। তারপর সংস্কার সাধিত অঞ্চলের প্রায় সর্বাংশেই সুশোভন কলেবরে আরও বিস্তারলাভ করে বণিক-সমাজের বসতি। এ-অঞ্চল থেকে চিরতরে বিলোপ ঘটে কৃষকসমাজের এবং প্রাগ-নগরের পরিবেশে সমাধিলাভ ঘটে আবাদী অঞ্চলেরও; কিন্তু বুদ্ধিজীবী বা বাণিজ্যজীবীদের পরিমার্জিত বসতির সুবিন্যাস ঘটলেও, চলাচলযোগ্য রাস্তাঘাট তেমন আত্মপ্রকাশ করেনি তখনো। কেবল না হলেই যা নয়—এমন কয়েকটি কাঁচাপথ এবং কিছু সরু গলির পরিবেষ্টন ছিল সেকালের সমগ্র বসতি অঞ্চলে। বর্তমান হ্যারিসন রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোডের মত দীর্ঘ এবং সুদৃশ্য সরণী প্রতিষ্ঠার কোনো পরিকল্পনাও তখন ছিল না।

● মহাত্মা গান্ধী রোডের একটি দৃশ্য

প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকালের নির্বাণলাভের পর, হ্যারিসন রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোডের প্রতিষ্ঠা ঘটে ইংরেজদেরই প্রচেষ্টায়। প্রথম দিকে এ-রাস্তার নামকরণ হয়েছিল সেণ্ট্রাল রোড। কিন্তু পরে স্যার হেনরী লেল্যাণ্ড হ্যারিসন যখন একযোগে পুলিশ কমিশনার এবং কর্পোরেশনের সম্মানীয় চেয়ার-ম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন তখন তিনিই উক্ত সেণ্ট্রাল রোডকে স্বনামে নামাঙ্কিত করেন তৎকালীন গভর্নরের অনুমোদনক্রমে। সুতরাং তারপর থেকেই সেণ্ট্রাল রোড 'হ্যারিসন রোড' নামেই তার স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে শহর-কলকাতায়।

স্যার হেনরী লেল্যাণ্ড হ্যারিসন ছিলেন সেকালের একজন কীর্তিমান আই সি-এস। তিনি বাংলা দেশে আসেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। প্রথম দিকে কিছুকাল বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর, তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের জুনিয়র সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এ-কাজে অপরিসীম যোগ্যতার সঙ্গে তিনি বহাল থাকেন বেশ কিছুকাল। তারপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউ বিভাগের প্রধান সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এই পদে মাত্র বছর-কয়েক বহাল থাকার পরেই তিনি একযোগে পুলিশ কমিশনার এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ লাভ করেন। এ-উভয় পদেই অধিষ্ঠান-কালে যে-কর্মদক্ষতার নজির স্থাপন করেন তিনি—তারই যোগ্য উপঢৌকন স্বরূপ তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে বিভূষিত করেন ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন চট্টগ্রামে।

এই হ্যারিসন সাহেবের নামেই হ্যারিসন রোড। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আগে আলোর তেমন সুব্যবস্থা ছিল না হ্যারিসন রোডে। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পর হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ায় এ-রাস্তার রাতের মনোহারিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাগরিকবৃন্দের দৃষ্টিতে। সম্ভবত তখন থেকেই এ-রাস্তার উভয় বাহুতে আরও অনেক ঘনবসতির বিন্যাস সুরু হয় বিত্তশালীদের। এই বিত্তশালীদের মধ্যে এ-দেশীয় বাণিজ্যজীবীদের সংখ্যাই অধিকতর। সম্ভবত সে-কারণেই আজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় অঙ্কে রাস্তার উভয় বাহুর সমগ্র জমিই চাপা পড়েছে বসতির তলায়। আজ এ-রাস্তার কোনো অংশে এক কাঠা জমিও সস্তা পাবেন না কেউ। কেবল বাড়ির পর বাড়ি, দেয়ালের পাশে দেয়াল এবং গলির মুখে উপগলির

সংস্থাপন ঘটেছে সমগ্র রাস্তার উভয় বাহুর সর্বাংশেই। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের পৌরসভা 'হ্যারিসন রোড' নামটির বিলোপ সাধন ক'রে রাস্তার নামকরণ করেছেন 'মহাত্মা গান্ধী রোড'। মহাত্মার নামে বিভূষণ ঘটায় রাস্তা অনেক মহিমান্বিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিবেশগত দিক থেকে লুপ্ত গৌরব তার প্রত্যাবর্তন করে নি কোনো অংশেই।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে একই প্রস্থের সমতায় বিস্তার লাভ করেছে মহাত্মা গান্ধী রোড। পূর্বে শিয়ালদহ, পশ্চিমে হাওড়া অথবা ভাগীরথী। ভাগীরথীর পূর্বতটে মহাত্মা গান্ধী রোডের উত্তর বাহুতেই অবস্থিত বড়োবাজার। এ-বাজারই একমাত্র বাজার—যেখানে আলো-আঁধারের অব্যাহত প্রতিযোগিতার বাহার আছে যথেষ্ট। এখানে শহর-কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে যেমন উৎপন্ন হয় অমৃতের ফসল, তেমনই তাকে অপমৃত্যু বরণ করার সুযোগ লাভের জন্যেও হলাহল সরবরাহ করা হয় এখান থেকেই। কালোবাজার, ভেজাল বাজার এবং মহৎ প্রতারণার বাজার কেন্দ্রীভূত বড়োবাজারেই। এ-বাজারের অধিকর্তাদের অধিকাংশই রাজস্থানী মহাজন। তাদের কাছেই গচ্ছিত এ-দেশের জীয়নকাঠি, তাদের হাতেই অর্পিত স্বাধীন সরকারের ইজ্জৎ রক্ষার ভার। এখানে আলো জ্বলে তাদের ইচ্ছায়, অন্ধকার নামে তাদেরই নির্দেশে। এখানে তাদের ডাকেই বাঁচতে আসে শত শত, মরতে আসে হাজার হাজার। কারণ মৃত্যুর অদৃশ্য বাণ এখানে অপরিমেয়।

পরিবেশগত দিক থেকেও বড়োবাজার যেন রাবণাধিকৃত ত্রিদিব। রাবণ ত্রিদিব অধিকার ক'রে কেবল নিষিদ্ধ করেছিলেন বরুণদেবেরই প্রবেশাধিকার, কিন্তু এখানে একাধিক রাজস্থানী রাবণ একযোগে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন বরুণদেব এবং সূর্যদেবের গমনাগমন। এই দুই দেবের অনুপস্থিতিতে কলিকালের ত্রিদিব-প্রতিম বড়োবাজার আজ স্বাভাবিক কারণেই মহানরক।

বড়োবাজার ছাড়াও মহাত্মা গান্ধী রোডের সর্বাংশেই সমাহার ঘটেছে অসংখ্য বিপণির। প্রাচীন এবং নবীন বসতবাটি সমূহের নীচের তলাতেই সেগুলির প্রতিষ্ঠা। এ-রাস্তায় দু'একটি বস্তিরও সমাবেশ ঘটেছে নিম্নশ্রেণীদের—যারা দিন আনে, দিন খায়। তাছাড়া একাধিক সিনেমাগৃহ এ-রাস্তার উভয় বাহুতে দাঁড়িয়ে আছে কিংশুক কৃষ্ণচূড়ার মতো—যেগুলির অভ্যন্তরে শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালেও বসন্ত ফোটে লক্ষ্মীছাড়াদের উদ্দেশে।

এককালে এ-রাস্তাতেই প্রতিষ্ঠা ঘটে আলফ্রেড থিয়েটার-গৃহের—যেখানে নটসূর্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বসন্তোৎসব করেছিলেন প্রথম। সেদিনের সেই আলফ্রেড থিয়েটার-গৃহ ভিন্নরূপে এবং ভিন্ন নামাঙ্কনে আজও দাঁড়িয়ে আছে তার স্বস্থানেই।

মহাত্মা গান্ধী রোডের পূর্ব সীমান্তেই অবস্থিত উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মিত্রভবন। এ-ভবনের প্রতিষ্ঠাতা সেকালেরই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাঃ লালবিহারী মিত্র। বিদ্যাসাগরের উপদেশক্রমে এ-দেশে তিনিই প্রথম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়াও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান ছিল প্রতুল। একজন উল্লেখযোগ্য বিদ্যোৎসাহীরূপেও সেকালের সমাজে তাঁর আসন ছিল বিশিষ্ট স্তরে। তাঁরই আকর্ষণে মিত্র-ভবনে প্রায় প্রত্যহই এসে আসর জমাতেন বিদ্যাসাগর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তাছাড়া এ-ভবনেই সাময়িকভাবে এসে বসবাস করতেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও সাময়িক অবস্থান-কেন্দ্র ছিল মিত্র-ভবন। ডাঃ লালবিহারী মিত্রের উত্তরপুরুষদের মধ্যে বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীভাস্কর মিত্র প্রভৃতি আজও বসবাস করছেন সেই উনবিংশ শতাব্দীর মিত্র-ভবনেই। তাছাড়া এ-পথেই অবস্থিত রিপন কলেজ—বর্তমানে যা অমরস্মৃতি বহন করছে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর।

কলেজ ষ্ট্রীট এবং মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে হয়তো অনেকেরই নজর-বন্ধনে ধরা পড়ে একটি প্রাচীন মর্মর-মূর্তি। এ মূর্তি ভিক্টোরিয়া-যুগের একজন বাঙালী সাংবাদিকের। নাম তাঁর কৃষ্ণদাস পাল। সেকালে সাংবাদিকতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখার উদ্দেশ্যেই এমন এক মর্মর-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন সহৃদয় দেশবাসিগণ, আজও যা অবিকৃত অবস্থায় অবাক দৃষ্টি আকর্ষণ করে অজস্র পথিকের।

মহাত্মা গান্ধী রোড দুটি স্মরণীয় শোভাযাত্রাকে আপন বক্ষে ধারণ ক'রে ধন্য হয়েছিল এককালে। এ-দুটির মধ্যের একটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শবানুগমনের ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা; আরেকটি মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অবিস্মরণীয় মহামিছিল। শেষোক্ত মিছিলের জি-ও-সি ছিলেন দেশের দুলাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি অমিত বীর্যের প্রতীকরূপে অশ্বারূঢ় অবস্থায় পুরোভাগে ছিলেন মিছিলের।

যাই হোক, মহাত্মা গান্ধী রোডের আসীমান্তই আজ শব্দমুখর—যার কোনো বিরাম নেই দিবসে অথবা নিশীথে। ট্রাম-বাস থেকে সুরু ক'রে রিক্সা, ঠেলাগাড়ি এবং ট্যাক্সীর অবিরাম পদসঞ্চারে মহাত্মা গান্ধী রোড আজ পরিশ্রান্ত, জরাগ্রস্ত। তবু ঐতিহ্য তার স্মরণ করবো আমরা এবং মহাত্মার নামে নামাঙ্কিত বলেই আজীবন স্বীকার করবো তার মহিমা।

● বড়োবাজারের কর্মচঞ্চল ক্ষেত্র

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ষোল ॥

'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরো থরো কাঁপে আজি
এমনতরো—'

সমাপ্তি সঙ্গীত সারা হল। সভাও শেষ। ধন্যবাদের পালা আধখানা পর্যন্ত না এগোতেই ঘর খালি হতে আরম্ভ করল।

হাসিমুখে এগিয়ে এল অরবিন্দ।

—বেশ সুন্দর বলেছ ব্রাদার। আধুনিকতার চোখে রবীন্দ্রনাথ। বেশ অ্যাপ্রেসিয়েট করেছে সবাই।

কিরণ ম্লান ভাবে হাসল : বাড়িয়ে বলছেন অরবিন্দদা। বক্তৃতা আমার আসে না।

—আরে, প্রফেশনাল স্পীকারদের একঘেয়ে ইমোশ্যান আর কার ভালো লাগে আজকাল। সবাই এখন কিছু নতুন কথা শুনতে চায়। এ যুগের মন রবীন্দ্রনাথকে কতটা নিচ্ছে, কতখানি নিতে পারছে না, আর কেনই বা পারছে না—তার চমৎকার অ্যানালিসিস করেছ তুমি। এই ধরণের আলোচনাই তো আজকাল দরকার। নইলে গাদাখানেক কোটেশন আর একঘণ্টা ধরে ফাঁপানো উচ্ছ্বাস—অ্যাবসোলিউটলি মীনিংলেস—লোকে হাই তুলতে থাকে।

অনেকখানি বেশি বলছে অরবিন্দ, অনেক বেশি কমপ্লিমেণ্ট দিচ্ছে। ভদ্রতা। কিরণের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। কী হবে কথা বাড়িয়ে?

—এবার যাওয়া যাক দাদা।

—চলুন, একটু চা খাবেন আগে—উদ্যোক্তারা এগিয়ে এলেন।

—কিছু দরকার নেই।

—না—না, সে কি হয়।

আবার সেই ভদ্রতার জের টানা। অফিস ঘরের টেবিল থেকে ফাইল লেজার বুক সরিয়ে চীনেমাটির প্লেটে সন্দেশ-রসগোল্লা-সিঙাড়া। আধঠাণ্ডা খানিকটা চা। বক্তার পারিশ্রমিক। খুব ভালো লাগে তা নয়, কিন্তু উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার কথা ভেবে তাঁদের বিমুখ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

অরবিন্দের জন্যেও চা খাবার এসেছিল—সে এদের 'বস' এবং অনুষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট। আর খাবার এসেছিল বারো-তেরো বছরের সেই ছোট মেয়েটির জন্যেও—যে আসরে সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইল।

মেয়েটির মাথায় একটি টোকা দিয়ে অরবিন্দ বললে, টুলুর গান কেমন লাগল, তাই বলো।

—খুব ভালো।

—দক্ষিনীতে শিখছে। ওঁরা বলছেন খুব প্রমিজ আছে গলায়—অরবিন্দের চোখ-মুখে স্নেহ উছলে পড়ল।

টুলু অর্থাৎ ইন্দ্রাণী অরবিন্দের বড়ো মেয়ে। একবারের জন্যে কিরণের মনে হল, আজকের আসরে টুলু গান গাইতে পারবে বলেই কি অরবিন্দের এত উৎসাহ, সেই জন্যেই কি সে অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়েছে? কিন্তু পরক্ষণেই নিজের সিনিক চিন্তায় কিরণ লজ্জিত হল। সরল সুকুমার মেয়েটির মুখ, টানা-টানা বড়ো বড়ো চোখ; প্রতিমার চেহারার সঙ্গে স্পষ্ট আদল আসে, মেয়েটি যে তারই ভাইঝি সে-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

প্রতিমা। প্রতিমা কী করছে এখন? সে কি চুপ করে বসে আছে? তার শূন্য চেতনার ওপর দিয়ে এখন কোন্ অর্থহীন, কোন্ বিকৃত দুর্ভাবনার যুক্তি-শৃঙখলাহীন ছায়ামিছিল? আবার কি কোনোদিন সহজ স্বাভাবিক হতে পারবে সে? ডাক্তার ঘোষাল কি বিশ্বাস করেন যে, এখনো অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়?

সন্দেশটাকে কোনোমতে গিলে খাবারের প্লেটটা সে দূরে সরিয়ে দিলে। আধঠাণ্ডা চা এতক্ষণে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, এক চুমুকেই সেটা শেষ হল।

কিরণ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

—এবার আমায় যেতেই হবে অরবিন্দদা।

—দাঁড়াও হে সাহিত্যিক, দু' মিনিটেই তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে না। —অরবিন্দ হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল: জাস্ট সেভেন। চলো, আমিই তোমায় পৌঁছে দেব।

—আপনি আর কেন কষ্ট করে—

খাবারের প্লেটে মন দিয়ে অরবিন্দ সংক্ষেপে বললে, ডোন্ট বী সিলি।

একটা ছোটখাটো ধমক এবং দস্তুরমতো অফিসিয়াল গলায়। কিরণ মৃদু হেসে জানলার ধারে সরে গিয়ে সিগারেট ধরালো। গোটা তিনেক অটোগ্রাফের খাতা এসেছিল, সই করে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। লালদীঘির গলা টিপে ধরে হাজার চোখে ধারালো হাসি হাসছে দুরভাষ ভবন। ছেলেবেলার লাল-দীঘিকে মনে পড়ল—কোথায় সেই সবুজ—সেই ফুল—সেই সন্ধ্যার পরে ঘনিয়ে আসতে থাকা শান্ত নির্জনতা। আজ এই সাতটার পরেও বড়ো বাজারের মতো ভিড়—কোলাহল, ট্রাফিকের স্রোত—কত আলো যে বেড়ে গেছে এখন। কলকাতায় প্রকৃতি আর বেঁচে নেই—বেঁচে থাকবার উপায় নেই তার।

চিন্তাটা মনে আসতেই ভ্রূকুটি করল কিরণ। প্রকৃতি—সবুজ—অনেকখানি আকাশ। কেন এ-সব কথা মনে পড়ছে তার? এতদিন ধরে এ সমস্ত নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায় নি—চারদিকের এই প্রচণ্ড মানুষের বন্যায় সে-ও মেলে দিয়েছে নিজেকে, রক্তে রক্তে অনুভব করেছে তার তরঙ্গ, তারই কথা লিখে গেছে পাতার পর পাতা। কিন্তু হঠাৎ কেন তার এই প্রকৃতি-বিশ্বাস, কেন তার দীর্ঘশ্বাস বিলুপ্ত বনস্পতি, আর ঝরে যাওয়া ফুলের জন্যে? একি কৃষ্ণচূড়ার বীজাণু—হাজারীবাগ জেলার আদিম প্রকৃতির কাছ থেকে নিজের মধ্যে বয়ে এনেছে, এখনো নিস্তার পাচ্ছে না?

—কী, উপন্যাসের প্লট?

পাশে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ। মুখ মুছছে রুমালে।

—না দাদা, প্লট নয়। ডালহাউসি স্কোয়ার দেখছিলুম।

—দেখবার মতোই বটে।—অরবিন্দ হাসল: সারা ইণ্ডিয়ার মানি-মার্কেট—দেশ-বিদেশের কত মানুষের ভিড়। তোমরা এ নিয়ে একটা উপন্যাসও লিখতে পারলে না। নিদেনপক্ষে একখানা ক্লিন্টার ব্যারিটিও যদি দাঁড় করাতে পারতে, হঁ।—বুঝতুম তবু একটা কাজের মতো কাজ করলে বটে।

কিরণ চুপ করে রইল। কাজের মতো কাজ—অ্যাম্‌বিশান লেখা। কিন্তু জীবনে কোথাও কি কারো অ্যাম্‌বিশন আছে আজ—অন্তত মধ্যবিত্তের ইতিহাসে। এখন কোনোমতে একটা অস্তিত্ব টেনে নিয়ে চলা, তারই ফাঁকে ফাঁকে কিছু যন্ত্রণা আর খানিক বুদ্ধির আবর্ত ফেনিয়ে তোলা—এর বেশি কী আর করা যায় বাংলা দেশে? কিরণ যদি রাজনীতি করত, যদি পলিটিকাল নভেল লিখতে পারত, তা হলে অন্তত মানুষকে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারত সে। কিন্তু সে তো পলিটিকসে বিশ্বাস করে না।

অরবিন্দ বললে, কী, যাবে নাকি?

—বাঃ যাব না?

—লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে না। তুমি তো ডালহাউসি স্কোয়ারকে নিয়েই ধ্যানস্থ হয়ে আছো।

—আপনাকে নিশ্চিন্তে সন্দেশ খাওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলুম। চলুন।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। গাড়িতে উঠল অরবিন্দ, কিরণ আর টুলু।

মীটিঙের সেক্রেটারী একজোড়া মালা গাড়ির ভেতরে গুঁজে দিয়ে বললে, স্যার তা হলে আর আমরা—

অরবিন্দ বললে, ঠিক আছে, আমিই তো নিয়ে যাচ্ছি।

ট্যাক্সি চলল। অরবিন্দ বললে, বালীগঞ্জ।

—সে কি দাদা। আমাকে আগে কলেজ স্ট্রীটে পৌঁছে দিয়ে—

—হবে এখন কলেজ স্ট্রীট। তার আগে চলো একবার আমার বাসায়। আমার গিন্নী বহুকাল ধরে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল। আমি বলি, সে একজন বাঘা সাহিত্যিক, তার দর্শনলাভ কি সোজা কথা। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, বিস্তর ধর্না দিতে হয়। যাই হোক, আজ যখন তোমায় ধরেছি, বাসায় না নিয়ে গিয়ে ছাড়ব না।

—আমি আর একদিন যেতুম দাদা। সত্যি বলছি, আজ আমার কিছু জরুরি কাজ ছিল।

অরবিন্দ নিজের পাইপে আগুন ধরিয়ে বললে, তোমার জরুরি কাজ চিরদিনই থাকবে এবং সেই আর একদিন কোনোদিনই আসবে না। অতএব চালাকি করো না, চুপচাপ বসে থাকো।

টুলু মিনতি করল এবার।

—সত্যি পিসেমশাই, চলুন না আমাদের ওখানে। জানেন, আমাদের স্কুলের বাংলার দিদিমণি আপনার লেখার কথা খুব বলছিলেন। আমি বললুম, আপনি আমার পিসেমশাই। শুনে দিদিমণি বললেন, একদিন আলাপ করিয়ে দিয়ো তো।

অরবিন্দ হেসে উঠল: আর কী চাও? টুলুর বাংলার দিদিমণি পর্যন্ত

তোমার অ্যাডমায়ারার—এর পরে তোমার কোনো আপত্তিই আর চলতে পারে না।

কিরণ চুপ করে রইল। যখন নিজেকে নিয়ে থাকতে ভালো লাগে, তখন বাইরের থেকে ক্রমাগত অকারণ টান আসতে থাকে, মনটাকে বিতৃষ্ণ আর ক্লান্ত করে তোলে। কিন্তু এ-সব অরবিন্দ বুঝবে না। তার প্রকাণ্ড শরীর, বিশাল স্বাস্থ্য, বিপুল অট্টহাসি। জগতের সব কিছু তার সামনে সরল রেখায় চলছে, কোনো জটিলতার কথা সে ভাবতে পারে না, ভাবতে চায়ও না।

অতএব যেতে হল অরবিন্দের বাসায়। সিঁড়িতে পা দিয়েই পাড়া কাঁপিয়ে অরবিন্দ হাঁক ছাড়ল : ধরে এনেছি।

অরবিন্দের স্ত্রী মাধুরী বোধহয় তৈরিই ছিল। ছুটে এল ঘর থেকে।

—সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছে গো ?

প্রণাম করে ক্লান্ত হাসি হাসল কিরণ : পশ্চিমে নয়।

—বিশ্বাস হচ্ছে না। যাই হোক দয়া করে যখন এসেছ, তখন কি দরজা থেকেই চলে যাবে, না ভেতরে পা দেবে ?

কিরণ ঘরে ঢুকল।

তারপরে আবার চা। এটা-ওটা গল্প। সাড়ে আটটার সময় কিরণ বললে, দাদা—তা হলে—

মাধুরী বললে, দাঁড়াও রান্নার একটু বাকী আছে।

—সেকি, খেয়ে যেতে হবে ?

—কেন, জাত যাবে নাকি ?

—সে কথা নয়। মেসে বলে আসি নি, খাবার নষ্ট হবে ওখানে।

—হয় হোক, সেটা এমন কিছু রাজভোগ নয়। পালাবার চেষ্টা কোরো না। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই সব রেডি করে দেব।

কিরণ ফিরল সাড়ে দশটায়।

যা অনুমান করেছিল, ঠিক তাই। খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটতেই অরবিন্দ তাকে ছাড়ল না।

—আরে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ট্যাক্সি করেই তো যাবে—তাড়াহুড়ো কিসের ?

তারপর—এতক্ষণ যে নামটা কেউ করে নি, সেই প্রতিমার প্রসঙ্গটাই এল।

—কী ভাবছ প্রতিমার সম্পর্কে ?

কিরণের সমস্ত মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটু চুপ করে থেকে বললে, ট্রীটমেন্ট তো করাচ্ছি।

—পণ্ডশ্রম। ও কোনোদিন ভালো হবে না। আমরা সব বড়ো ডাক্তারের ওপিনিয়ন নিয়েছি।

—ডাক্তার ঘোষাল বলছেন, এখনো আশা আছে।

—বলবে। নইলে ওর অ্যাসাইলামে পেসেন্ট থাকবে কেন ?

নিষ্ঠুরের মতো শোনালো। অরবিন্দ প্র্যাকটিক্যাল। তার বিশাল শরীরটার মতো চিন্তাগুলোও স্থূলকায়। কোনো জিনিষের ওপর সে অকারণে আবরণ রাখতে চায় না, কোনো সূক্ষ্মতায় তার কৌতূহল নেই। সোজাসুজি বুঝতে চায়, সহজভাবেই বিচার করে।

কিরণ সিগারেট ধরালো। অরবিন্দ গুরুজন হলেও এ অনুমতিটা বহুকাল আগেই দিয়ে রেখেছে। বলেছে, তোমার সাতখুন মাপ—স্পেশাল কনসিডারেশন, তুমি সাহিত্যিক।

অরবিন্দ আবার বললে, ডিভোর্স হাব।

—তারপর ?

—আমার বোন আবার কুমারী হয়ে আমার কাছেই ফিরে আসুক। তমি মুক্তি পাবে।

কানের কাছে তৎক্ষণাৎ যেন তীব্র আর্তনাদ ফেটে পড়ল কিরণের। প্রতিমা হাহাকার করছে : ওরা সবাই —ওরা সবাই আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়। তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে ? হৃৎপিণ্ডে যেন তীর বিঁধল একটা।

—তুমি মুক্তি পাবে, কিরণ।

—আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে এত গরজ কেন আপনাদের ? —ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিরণের গলার স্বর বিস্বাদ হয়ে উঠল।

—স্বার্থ আমার নয়।—অরবিন্দ গভীর হল : আমি এ-নিয়ে হিরণ্ময় বাবুর সঙ্গেও আলাপ করেছি। তুমি বড়ো শিল্পী, দেশের জন্যেই তোমার বাঁচা দরকার—সুস্থ, স্বাভাবিক হবে

PRO/SW-9

বাঁচা। ইউ কান্‌ট ক্যারী এ লিভিং ডেথ্‌ ডে অ্যাণ্ড নাইট অন ইয়োর শোল্‌ডার।

—যদি বলি, তাতে আমার কোনো কষ্ট হয় না?

—তা হলে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি একজন বিগ রাইটার হতে পারো হয়তো, কিন্তু সুপারম্যান নও।

না—সুপারম্যান সে নয়। মানুষের দুর্বলতা তার আছে, ষোলো আনাই আছে। হাজারীবাগ জেলার সেই নির্জন ডাক-বাংলো। প্রকৃতির একটি আদিম মোহাবেশের মাঝখানটিতে বসে, সামনে আগুন-রাঙা ফুলের মঞ্জরী আর দূরের পাহাড়ের নীল হাতছানির দিকে তাকিয়ে বারে বারে যার সঙ্গ পেতে মন চাইত, সে প্রতিমা নয়। এমন কি, প্রতিমার আলোচনা যখনই উঠেছে, তখনি সে অনুভব করেছে একটা অদৃশ্য ফাঁস ধীরে ধীরে তার গলায় এঁটে বসছে, মৃত্যু ছাড়া তার কাছ থেকে আর নিস্তার মিলবে না!

তবু ডিভোর্স!

কী নগ্ন আর নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ালো সামনে। প্রতিমা দেখা দিল উন্মাদ-আশ্রমের সেই ধূসর বিবর্ণ পটভূমিতে, যন্ত্রণার ছবি একখানা—একটা তরল স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে তার চেতনা—যার ওপর থেকে থেকে ঢেউ ওঠে, অথচ কোথাও কোনো চিহ্নমাত্রও থাকে না।

আর সেই কান্না: 'তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে?'

সিগারেটের আধখানাই অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে দিয়ে কিরণ উঠে পড়ল।

অরবিন্দ বললে, কী হল?

—এসব আলোচনা এখন ভালো লাগছে না দাদা।

—কিন্তু আলোচনাটা জরুরি।—সোফায় পিট দিয়ে শুয়েছিল অরবিন্দ, এবার সোজা হয়ে উঠে বসল: একটা ডিসিশন তোমায় নিতেই হবে, বিফোর ইট ইজ টু লেট। তোমারও তো বয়েস বাড়ছে, এরপরে আর—

—আমি ভেবে দেখব অরবিন্দদা। এখন থাক।

—ট্রাই টু বি রিজ্‌নেবল্‌।—অরবিন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলল: নিজের বোনকে ডিভোর্স করার কথা বলতে হচ্ছে আমাকে—এই ট্র্যাজিডিটা তুমি ভাবতে পারো? কিন্তু আমার সেন্টিমেন্টের চাইতেও মানবিকতা অনেক বড়ো জিনিষ। একজন নষ্ট হয়ে গেছে বলে তার সঙ্গে আর একটা জীবনকেও নষ্ট করতে হবে?

—জীবন নষ্ট হচ্ছে কিনা—তাই বা কে বলবে।—কিরণ বললে, তা ছাড়া ডক্টর ঘোষাল যতক্ষণ আশা না ছাড়ছেন, ততক্ষণ এসব কথা আমি ভাবতেও পারব না। তারপরেও ভাবতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু দাদা, এখন আমায় যেতেই হবে, অনেক রাত হয়ে গেছে।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ঝিমুনি ধরেছিল। কলকাতার আলোগুলো বদলে গিয়েছিল হঠাৎ। দেখা দিয়েছিল দিনের আলো—শাল-শিমুলের বনে বসন্ত দেখা দিয়েছিল, দূরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল মহাকালের পাহাড়, মনে পড়ছিল, ঠিক তার পিছনটিতেই নিঃশব্দে বসে আছেন শর্মিলা। তারপরেই চটকা ভাঙল। দেখল, গাড়িটা কলেজ ষ্ট্রীটে ঢুকেছে।

মেসে পৌঁছে, নিজের ঘরে ঢুকে দেখল দরজার সামনেই একখানা এন্‌ভেলপ্‌। বিকেলের ডাকে এসেছিল, চাকরটা ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে। আলো জ্বেলে খামটা তুলে নিলে—কোণায় চোখে পড়ল ক্রম: ডক্টর এ কে রায়চৌধুরী—ভিলেজ—ডিস্‌ট্রিক্ট হাজারীবাগ।

(ক্রমশঃ)

জীবন যেটুকু বাকী

অতুলরঞ্জন দেব

এ কোন্‌ বন্দরে এসে সঙ্গীটিরে হারিয়ে এখন
জনারণ্যে খুঁজে মরি! চেনা চেনা অজানার হাটে
যদিও কঠিন পাওয়া মেঘ হাওয়া সমুদ্রের মন,
হরেক রকম পণ্যে জাহাজের ভিড় ঘাটে ঘাটে;
নতুনে নোঙর ফেলে, পুরাতনে শূন্য করে স্থান।
বিচিত্র খদ্দের সব বোঝা-পিঠে সাবলীল হাঁটে
বাণিজ্যভিত্তিক হার্দ্যে; ওঠা-নামা করে মূল্যমান।
দর্শকের ভূমিকায় চিত্রপটে দিনমান কাটে।

নিজের অজান্তে বুঝি সব কিছু জানা হলে পর,
হঠাৎ দায়িত্ব বাড়ে। প্রত্যাসন্ন জীবিকা স্বচ্ছল;
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে সপ্তডিঙা মধুকর
নির্ভয়ে প্রস্তুতি চলে; পাড়ি দিয়ে সপ্তসিন্ধু জল
একেক যাত্রায় হত্যা করি ভিন্ন দ্বীপের তিমির।
জীবন যেটকু বাকী, সবটুকু সুর্যময় ভিড়।

খেলাঘর

প্রাণভূষণ ভট্টাচার্য

বৃষ্টির ভিতর নয়, বাতাসের বুক ছিঁড়ে এলে
সব আলো নিভে যায়, অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে,
যে সব পরীর গল্প ভুলে গিয়ে নিভন্ত বিকেলে
রৌদ্রের কলস ভেঙে পাহাড়ের দূরে ও নিকটে
উত্তেজনা হয়ে যাই, প্রবল উদ্বেগ বুকে ক'রে
পরীর শরীর নয়, পরীর অধিক কিছু ঋণ
শোধ ক'রে দিতে চাই, আমরণ জ্যোৎস্নার ভিতরে
বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি বহুদিন।

শালবন পার হয়ে উপত্যকা পার হয়ে দূরে
নুড়ি সাজানোর ছলে দূরতম আলোর খেলায়
খেলাঘর ভেঙে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি সব, আমি
পুতুলের বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি,
সমতল পার হয়ে বিবাহবাসরগুলি দূরে
শালের ছায়ার দিকে পার্বত্য নিয়মে ভেসে যায়।

রঙ্গজগৎ

● মঞ্জু দে

সিনেমার সামনে বিক্ষোভ

এক সংবাদে প্রকাশ, বেহালার কোন এক সিনেমার সামনে ছাত্র ও পাড়ার ছেলেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তাদের দাবি ছিল হিন্দীর পরিবর্তে বাংলা ছবি দেখান হোক। তাদের অভিযোগ ছিল—কুরুচিপূর্ণ হিন্দী ছবি প্রদর্শনের ফলে পাড়ায় সমাজবিরোধী লোকের যাতায়াত বেড়েছে। শালীনতাহীন ব্যবহার দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি।

বাংলা দেশে হিন্দী ছবির প্রভাব এত বেড়েছে যে, বাংলা ছবি মুক্তিলাভ পর্যন্ত করতে পারে না। সিনেমার মালিকরা লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় স্বার্থ ও বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা চিন্তা করেন না। অথচ শিল্প-গুণাগুণের দিক থেকে বাংলা ছবি যে শ্রেষ্ঠ, একথা হিন্দী চিত্রনির্মাতারাও নিয়ত স্বীকার করে থাকেন। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের এই অসহযোগিতায় ও অর্থ-লালসায় কোণঠাসা হয়ে বাংলা ছবির প্রযোজকরা ছবির মান নিম্ন করে ফেলেছেন। এখন বাংলাতেও এ কারণে নিম্নমানের ছবি হচ্ছে।

বহুকাল থেকে সরকারের কাছে দাবি উঠেছে বাংলা ছবি প্রদর্শন প্রত্যেক সিনেমায় বাধ্যতামূলক করা হোক। অর্থাৎ বছরে অন্তত ১২ সপ্তাহ প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হবে। এতে কুরুচিপূর্ণ হিন্দী ছবির একচেটিয়া প্রদর্শন যেমন বন্ধ হবে, তেমনি সকল ভাষাভাষী মানুষ বাংলা ছবি দেখারও সুযোগ পাবেন। কিন্তু ক্ষমতাশীল হিন্দী ছবির প্রযোজক ও পরিবেশকদের চাপে পড়ে সরকার এমন কোন আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করছেন না। বাংলা-দেশে থেকে, বাঙালীর টাকার লাভ করে এই শ্রেণীর পরিবেশকরা বাংলা ছবির বিরোধিতা করে থাকেন।

বেহালার যুবকদের এই বিক্ষোভ সমর্থনীয়। কিছুকাল পূর্বে অশালীন প্রাচীর-চিত্রের বিরুদ্ধেও এরূপ বিক্ষোভ হয়েছিল, এবং তারই ফলে সরকার প্রাচীরচিত্র সেন্সার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।

—সুজন।

চিত্র আলোচনা

অয়নান্ত

'অয়নান্ত' ছবিটি দর্শকমহলে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে। এই ঔৎসুক্য কেবল যে প্রচার বৈশিষ্ট্যের গুণে ঘটে নি, সেকথা ছবিটি দেখতে বসে অনুভব করা যায়। ছবিটির প্রথম অংশ বাস্তবিকপক্ষে গতানুগতিক বাংলা ছবির বহু উর্ধ্বে। একদল নতুন পরিচালকের হাতে যে এমন সুন্দর ছবি হতে পেরেছে তার জন্য পরিচালকগণ ও চিত্রনাট্যকার অভিনন্দনীয়।

সমরেশ বসু লিখিত কাহিনী অবলম্বনে 'অয়নান্ত'র চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। 'গঙ্গা' ব্যতীত সমরেশ বসুর অন্যান্য যে সকল গল্প চিত্ররূপ পেয়েছে তার মধ্যে 'অয়নান্ত' (প্রথম অংশ) নিঃসন্দেহে একটি সার্থক ছবি। এই ছবিতে বর্তমান বাঙালীসমাজের এক বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে অল্পবিত্ত ও দরিদ্রের দল আর একদিকে উচ্চবিত্তের দল। উচ্চবিত্তরা মুষ্টিমেয় হলেও ওরা সমাজের নিয়ন্তা। উৎপাদন ও ধনবণ্টন ওদের হাতে। ধনবণ্টন ক্ষমতা ওদের হাতে থাকায় সমাজে লাভের ও লোভের এক জুয়াখেলা চলেছে। এই জুয়াখেলার টানাপোড়েনে কনকের বাবার মত ধর্মভীরু সৎ মানুষ স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাবার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করার পরও অফিসের ক্যাশ ভাঙতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে ওঠে। মাঝখানে রয়েছে প্রতুল, যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কনকের কুমারীজীবনকে শেষ করে দেয়; সেখানে বিবেকের প্রশ্ন নেই, সে যেন মনুষ্যত্বহীন পশু। আর উপরের তলায়? এখানে লোভের শেষ নেই। এক উচ্চাভিলাষী ধনী আর একজনের সম্পদ হরণের জন্য এক সরলহৃদয় যুবক রাজাকে নিয়োগ করলো প্রতারণার কাজে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল লোভের পাপের ফল, বরেন মল্লিকের মৃত্যু। আর রাজা ও কনক? অতল তলে তলিয়ে গিয়ে হৃতসর্বস্ব হয়েও একদা পরস্পরের দেখা পেয়েছিল, আবার তারা বাঁচতে চেয়েছিল।

সমাজের অতি পরিচিত মানুষের ভিড়ে এই কাহিনী হৃদয়গ্রাহী। অনেক চেনা মানুষের নক্সায় ছবিটি বাঙালীর ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কনক আর রাজাদের দুটো পরিবার আজকের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক নিখুঁত চিত্র। রাজা প্রাণোচ্ছল, জীবনের প্রতি ভালবাসা ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসী এক যুবক। ছবির প্রথমাংশে বাস্তববোধ, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং সময়-বোধটুকু পরিচালকগোষ্ঠী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের এক নিখুঁত চিত্র দেখে আমরা অভিভূত হয়েছি। এই অংশে (স্বপ্ন দৃশ্যের সঙ্গীত ছাড়া) শিল্পনৈপুণ্য ও উপস্থাপন রীতি মনোমুগ্ধকর। কিন্তু শেষাংশ শিল্প-চেতনার দিক থেকে সঙ্গতিহীন, এবং আতিশয্যের দোষে গতানুগতিক হয়ে উঠেছে। যে শিল্পপতি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী রাজার ভাইকে খুন করেছে, তার কন্যা ও জামাতাকে মহৎ দেখাবার জন্য রাজা মুক্তির দিন তাদের জেলে-গেটে উপস্থিত করা এবং রোচনাকে দিয়ে এত কথা বলানো অবাস্তব ব্যাপার। নিজের জীবন রক্ষার জন্য রোচনা মনে মনে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে বড় জোর বলতে পারে,—লোকটা ছোটলোক হলেও ভাল ছিল। কিন্তু স্টেশনে গিয়ে স্বামীকে পাশে রেখে সজল চোখে এত প্রীতিপূর্ণ কথা বলবে এমন অতি নাটকীয়তা ভাবাই যায় না। রোচনা ও তার স্বামীকে উপস্থিত করার এই অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যে ছবির প্রথমাংশে সৃষ্ট মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেছে। এমন প্রতিশ্রুতিবান পরিচালকগোষ্ঠীর কাছে আমরা এই অসতর্কতা আশা করি নি।

● নির্মীয়মাণ 'দুই পর্ব' ছবিতে অপর্ণা দেবী, নবাগত সুমন মুখার্জী ও জহর গাঙ্গুলী।

● 'ফুলোঁ কী সেজ' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে বৈজয়ন্তীমালা।

সম্পাদনার ব্যাপারেও আরো সতর্কতা প্রয়োজন ছিল। শেষাংশে ছবিটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করার বহু সুযোগ ছিল। নিভৃত আলাপনমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত, এবং যন্ত্রের সঙ্গতসহ স্বপ্ন সঙ্গীত শ্রবণ এরূপ বাস্তবনিষ্ঠ ছবির ধর্মবিরোধী। সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী এই শিল্পবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু দুটি গানই সুগীত।

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে সকলেই সার্থক। তার মধ্যে বিশেষভাবে রেখাপাত করে সুপ্রিয়া চৌধুরীর সার্থক চরিত্র সৃষ্টি। রাজার ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং একটি ক্রূর ধনী চরিত্রে বিশ্বনাথন ছবির সার্থকতার সহায়ক হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্য, ছায়া দেবী, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ রূপদান করেছেন। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী প্রমুখকে কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়েছে।

যদিও ছবির শেষাংশে পুনঃ সম্পাদনার প্রয়োজন রয়েছে, তথাপি 'অয়নান্ত' একটি অবশ্য দর্শনীয় বাংলা ছবি। আমরা প্রত্যেক চিত্রামোদীকে এই ছবিটি দেখতে বলি।

অশান্ত ঘূর্ণা

(সিলভার স্ক্রীন (ডাকমন্দ)

ছবির পরিচয়লিপিতে বলা হয়েছে—একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে কাহিনী রচিত হয়েছে। (হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়)। কিন্তু একের দোষে অন্যের শাস্তিভোগ করার দৃষ্টান্তের অভাব আমাদের দেশেও কম নেই। পুলিশের কেরামতি বা নির্বুদ্ধিতার জন্য কয়েক বছর আগে এক প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মীকে যেভাবে সুনাম ও যশ হারাতে হয়েছে ছবিটি দেখবার সময় আমাদের সে মামলার কথা মনে হয়েছে। চেহারার সাদৃশ্য থাকলে তো সন্দেহের অবকাশই থাকে না।

এই কাহিনীর নায়ক রবীন একজন সঙ্গীত পরিচালক। সঙ্গীত আর ছোট্ট পরিবারের মধ্যে প্রিয়তমা স্ত্রী ও স্নেহের কন্যাকে নিয়ে তার জীবনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে আরো মধুর করে তোলার জন্য সে একটা বাড়ি করার কথা চিন্তা করে। এই চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য একটু খোঁজখবর করতে গিয়েই তার জীবনের গতি যেন পরিবর্তিত হয়ে যায়। কোথায় সঙ্গীতের সুরমাধুরীর জগতে বিচরণ করছিল, আর অভাবিতভাবে সে আজ লালবাজারের লক আপে আবদ্ধ। অভিযোগ, তিন-তিনটে ডাকাতির সে নাকি নায়ক। বাড়িতে স্ত্রী হতবুদ্ধি, বন্ধুবান্ধব সকলে বিস্মিত। তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। শেষ চেষ্টা করলো ব্যারিস্টার গুপ্ত। যার সাথে বিয়ের প্রস্তাব রবীনের স্ত্রী দীপা একদা প্রত্যাখ্যান করেছিল। মামলা যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন আশঙ্কা ও উদ্বেগে দীপা পাগল হয়ে

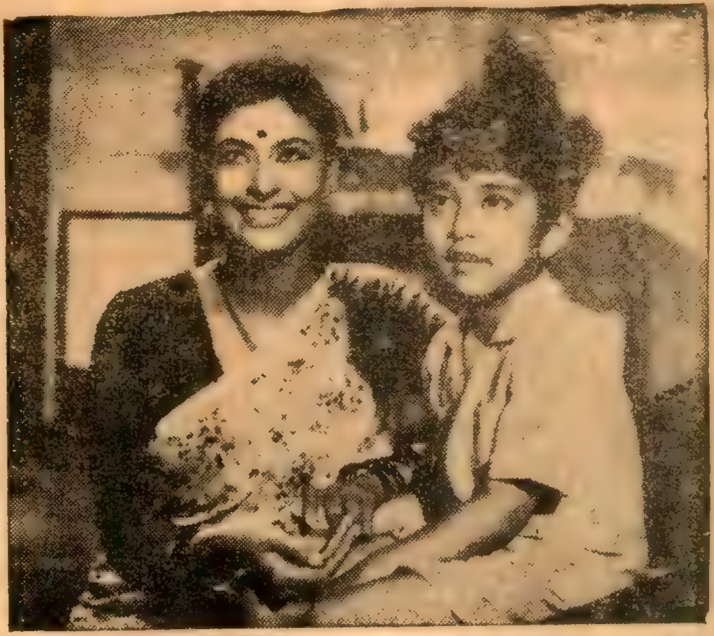

● হিন্দী 'বেগানা' ছবিতে একটি শিশুর সাথে সুপ্রিয়া চৌধুরী

গেল। এ সময় আসল অপরাধী ধরা পড়ে। দেখা গেল রবীনের চেহারার সাথে হুবহু মিল এই ভুল সনাক্তকরণের কারণ।

এই ছবির পরিচালক পিনাকী মুখার্জী অপরাধ-রহস্যমূলক ছবিতে ইতোপূর্বে সার্থকতা লাভ করেছেন। এই ছবিও অপরাধমূলক ছবির রহস্যময়তা সৃষ্টির দিক থেকে সার্থক। দর্শক মনোরঞ্জনের দিক থেকে তো ছবিটির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এক সঙ্গীতশিল্পীকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়ে পরিচালক যেভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘটনাজাল বিস্তার করেছেন তাতে যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়, শেষ দেখার জন্য দর্শকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অথচ নায়ক যে এমন কোন রহস্যময় চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তি নয়, এরূপ ধারণাও সৃষ্টি হতে থাকে। এদিক থেকে পরিচালক প্রশংসনীয়। কিন্তু দীপার পাগল হওয়াটা আতিশয্য-পূর্ণ মনে হওয়ায় স্বাভাবিক গতিবেগে কিছুটা চোট লাগে। যেভাবে ছবিটি নাটকীয় রসোপলব্ধির দিকে গেছে তাতে এই ঘটনার প্রয়োজন ছিল বলে হয় না, এবং পরে ভাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি গতানুগতিক মনোরঞ্জনী ছবির ছকে বাঁধা মনে হয়েছে। পূর্ণবেগসম্পন্ন মোটর গাড়ির পেছনে পুলিশের কুকুরের ধাওয়া করে অপরাধীকে ধরে ফেলাটাও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। মোটর গাড়ির পরিবর্তে অপরাধী দৌড়ালে সেটা বেশি বিশ্বাস্য হয়ে উঠতো।

অভিনয়ে রবীনের ভূমিকাকে দিলীপ মুখার্জী যথাযথভাবে রূপ দিয়েছেন। ব্যারিস্টার গুপ্ত রূপে অনিল চ্যাটার্জী প্রশংসনীয়। দীপার ভূমিকায় নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস প্রশংসনীয় রূপদান করেছেন। তাঁকে আমাদের ভাল লেগেছে। জীবেন বসু, রেণুকা রায় ও জহর রায়ের অভিনয় কিছুটা আতিশয্যপূর্ণ হলেও দর্শকদের তাঁদের ভাল লাগে। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ রূপ দিয়েছেন সুখেন দাস, প্রশান্ত কুমার, গীতা দে, দীপক মুখার্জী, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানী, অর্ধেন্দু মুখার্জী, নীতিশ মুখার্জী প্রমুখ।

নাটকের কথা

'চণ্ড কৌশিক' নৃত্যনাট্য

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্যের রূপ কল্পনা করেছেন দুলেন্দু ভৌমিক এবং নৃত্যরূপ দিয়েছেন বরুণ মুখার্জী। রাজা হরিশ্চন্দ্র কাহিনী প্রতি ঘরে পঠিত এবং কথিত, তা সত্ত্বেও এইরূপ পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আকর্ষণের শেষ নেই। ছোটবেলা থেকে চরিত্র গঠন ও সমাজের নৈতিক মান প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ কাহিনীর প্রচলন রয়েছে। আজকের দিনের আত্মকেন্দ্রিক মানসিক গঠনের কালে এরূপ শিক্ষণীয় বিষয় নৃত্যনাট্যে রূপ দেওয়া সমাজ-কল্যাণ মূলক প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশংসনীয়।

সহরতলীর কোন নাট্য সম্প্রদায়ের পক্ষে এরূপ নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা সহজ কথা নয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পী সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে সম্ভবত এই কারণে একই দৈর্ঘ্যের শিল্পী-নির্বাচন করা সম্ভব হয় নি। কয়েক জন বালিকাকে বে-মানান এবং আড়ষ্ট মনে হয়েছে। তা সত্ত্বেও হরিশ্চন্দ্র-রূপী বরুণ মুখার্জীর নৃত্য-অভিব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য। সমর বসু এবং নবেন্দু ঘটকও যথাবিধ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

সুরসাগর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সঙ্গীত নৃত্যনাট্যকে উপভোগ্য করেছে।

স্টুডিও খবর

• মভি ফাইনানন্সিয়ার'স এণ্টারপ্রাইজের 'দুইপর্ব' ছবিটির কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি আর ডি বি এণ্ড কোং-এর পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করবে। এই ছবির কাহিনী এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দুই বন্ধুর সুখ-দুঃখের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছবিটিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমোদের সমাজ-জীবনকে দেখানো হয়েছে। 'দুইপর্ব' পরিচালনা করেছেন বিনু বর্ধন। অভিনয়ে আছেন—কালী ব্যানার্জী, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, শীতল ব্যানার্জী, অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং নবাগত সুমন মুখার্জী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীন।

• পারশমল দীপচাঁদ প্রযোজিত 'অন্তরাল' অগ্রদূত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় বর্তমানে চিত্র গ্রহণ সমাপ্তির পথে।

শ্রীমতী নীতা সেনের এই প্রাণধর্মী কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনাও করেছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। এই ছবিটিতে সঙ্গীতেরও একটা বিশেষ অংশ থাকবে। সুরারোপ করেছেন তরুণ সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত।

চিত্র ও নাট্য জগতের অসংখ্য কলা-কুশলী দ্বারা অভিনীত এই চিত্রের মধ্যে—সাবিত্রী চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, অরুণকুমার, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অপর্ণা দেবী, দিলীপ রায়, দীপিকা দাস, রুবি মিত্র, মৃণাল মুখার্জী, লতিকা দাসগুপ্ত, শিশির বটব্যাল ও সতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

● সন্ধ্যা রায়

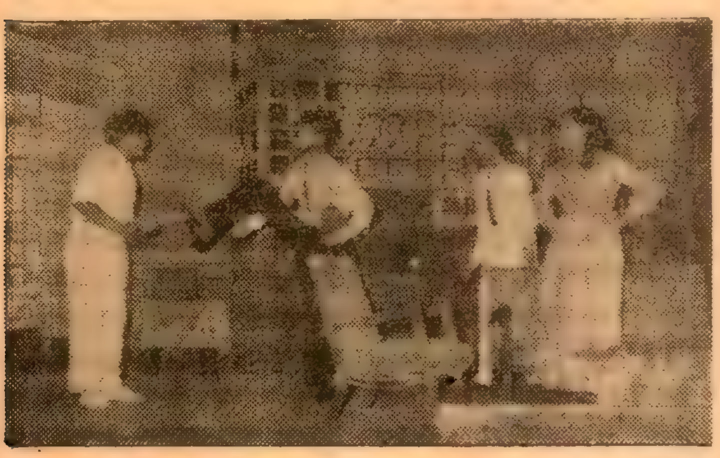

● ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখা প্রযোজিত 'পশ্চিম স্বর্গ' নাটকের একটি দৃশ্যে মণিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিররঞ্জন দাস, সুনীল মিত্র ও রেবা কুণ্ডু। নাটক ও পরিচালনা : চিররঞ্জন দাস।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

তেতাল্লিশ

সসম্মানে পিট্‌টান্

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের পুত্র অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ অর্থাৎ দানীবাবুর নামটি রঙ্গজগতের লোকেদের কাছে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। সামান্য কিছু বাংলা লেখা-পড়া আর সেই সঙ্গে কোনরকমে ইংরাজীতে নিজের নামটি সই করা ছাড়া, পুঁথিগত কোন বিদ্যাই তিনি অর্জন করেন নি। কিন্তু, তাঁর পিতার কাছে যে অভিনয়-বিদ্যা তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, উত্তরকালে সেই বিদ্যার প্রভাবে তিনি লোকপ্রিয় ও সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর যেমন অভিনেতার উপযুক্ত চেহারা আর ভরাট গলা ছিল, তেমনি অভিনেতার উপযুক্ত ভাব-ভঙ্গিমা প্রকাশের ক্ষমতাও ছিল। বিশেষ করে যে সকল ভূমিকা তিনি তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা করেছিলেন, সেইসব ভূমিকা অভিনয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর আগে ও পরে সেইসব ভূমিকায় অন্যান্য অভিনেতারা কেউ কেউ রূপদান করে থাকলেও দানীবাবুর তুলনায় তা নিষ্প্রভ। তাই আজও সেইসব নাটক যদি কখনও কোথাও অভিনয় হয়, তাহলে সর্বাগ্রে দানীবাবুর কথা মনে পড়ে।

মনোমোহন থিয়েটারের অবলুপ্তির পর দানীবাবু বেশ কিছুদিন রঙ্গালয়ের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। এই সময়ে ষ্টার থিয়েটারে, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরেশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় আর্ট থিয়েটার অতি অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর সেই সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের নাট্য-শিক্ষাদান-নৈপুণ্যে বহু নূতন নূতন নটনটীর আবির্ভাব হয়।

সে সময়ে পেশাদারী থিয়েটারগুলিতে সপ্তাহে চারদিন করে অভিনয় হোত। অপরেশচন্দ্র মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণরূপে পুরানো নাটকগুলি অভিনয়ের মনস্থ করেন এবং আর্ট থিয়েটারে ডিরেক্টারদের কাছে দানীবাবুকে নিয়ে আসার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বেশি টাকা মাইনে দিয়ে দানীবাবুকে নিয়ে আসার ব্যাপারে ডিরেক্টারদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি জানান। অপরেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টারদের যুক্তিতর্কের দ্বারা সম্মত করান এবং মাসিক ১০০০৲ টাকা মাহিনায় আর্ট থিয়েটারে দানীবাবুকে নিয়ে আসেন।

দানীবাবু আসার পর সপ্তাহে একদিন করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা করা হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ভূমিকালিপিতে ছিলেন—চাণক্য—দানীবাবু, সেলুকস—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রগুপ্ত—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এণ্টিগোনস—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কাত্যায়ন—

দানীবাবু

নরেশ মিত্র, নন্দ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, বাচাল—সন্তোষ দাস (ভুলো)। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়ে ২০০০৲—২৩০০৲ টাকা পর্যন্ত এই সময় বিক্রি হোত। কাজেই অপরেশচন্দ্রের নতুন ব্যবস্থায় আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টাররা শেষ পর্যন্ত দানীবাবুকে নিয়ে আসার ব্যাপারে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

একদিন জনৈক রাশিয়ান নাট্য-রসিক চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখতে আর্ট থিয়েটারে আসেন। অভিনয় দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। বিশেষ করে চাণক্যের অভিনয়ে তিনি এতই প্রীত হন যে, অঙ্কের বিরতির মাঝে অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে জানান যে, তিনি দানীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে চান। অপরেশচন্দ্র তাঁকে অভিনয়ের শেষে তাঁর কক্ষে আসতে আমন্ত্রণ জানান এবং দানীবাবুকে সাজঘরে খবর পাঠান তিনি যেন অভিনয়ের শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

অভিনয়ের শেষে রাশিয়ান ভদ্রলোকটি দানীবাবুর সঙ্গে পরিচয় করার বাসনায় অপরেশচন্দ্রের ঘরে আসেন এবং এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করেন দানীবাবুর মত বড় অভিনেতা থিয়েটারের কাছ থেকে মাসে কত টাকা মাইনে পান।

উত্তরে অপরেশচন্দ্র জানান—মাসে ১০০০৲ টাকা।

—মাত্র! আমাদের দেশে এই রকম অভিনেতা এক রাত্রি অভিনয়ের জন্য কমপক্ষে একশো পাউণ্ড পেয়ে থাকেন।

তারপর থিয়েটারের নানা বিষয় নিয়ে অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে বিদেশী ভদ্রলোকের আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যাওয়ার পর অপরেশচন্দ্র গ্রীনরুমে লোক পাঠান দানীবাবুকে ডেকে আনার জন্যে কিন্তু তার অনেক আগেই দানীবাবু সাজপোষাক ছেড়ে, মেক্‌-আপ তুলে বাড়ি চলে গেছেন। লোকটি গ্রীনরুম থেকে ফিরে এসে, দানীবাবুর চলে যাওয়ার কথা জানান। রাশিয়ান ভদ্রলোক হতাশ হয়ে চলে গেলেন। আর সেই সঙ্গে দানীবাবুর ব্যবহারে অপরেশচন্দ্র মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন।

পরের দিন দানীবাবু থিয়েটারে এলে, অপরেশচন্দ্র তাঁর কাছে আগের দিন রাত্রে দেখা না করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

দানীবাবু বললেন—আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না মশাই। কাজের ব্যাপারে আপনি ডাকলে ঠিকই দেখা করতাম। কিন্তু ও সাহেবসুবোদের নাম শুনলে বড় ভয় পাই।

—সাহেবসুবোদের কথা আপনি জানলেন কার কাছে? আমি ত সে সব কথা আপনাকে জানাই নি।

—আপনি না জানালে কি হবে! থিয়েটার বলে কথা, এখানে দেওয়ালেরও যে কান আছে।

—কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই বা আপনার এত ভয় বা কুণ্ঠা কেন? জানেন? আপনার অভিনয় দেখে সাহেব কত সুখ্যাতি করে গেল—

—ঐ পর্যন্তই ভাল। দূর থেকে অভিনয় দেখে, যা বলে গেল, কাছে থেকে দেখে কি আর তাই বলতো? আমি মশাই মুখ্যু মানুষ, ইংরাজীতে কথা বলতে পারতাম না। সাহেবটার ধারণা হোত, এ দেশের সব অভিনেতারই বুঝি বিদ্যের দৌড় আমার মত। পাছে জাতের অসম্মান হয়, তাই সসম্মানে নিজেই পিটটান দিয়েছিলুম।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিল্পে সাঙ্কেতিকতা কি, বোঝাতে গিয়ে Arthur Symons বলেছেন :

'in which art returns to one pathway, leading through beautiful things to eternal beauty. It is all an attempt to spiritualize literature.'

মানুষ ভাবপ্রবণ—মানুষ স্রষ্টা ও শিল্পী। অনাদি, অনন্ত, অসীম, অতনু ঐশ্বরিক শক্তির নানাবিধ অরূপ-রূপের বিবিধ প্রতিচ্ছবি নানাভাবে এবং নানারূপে প্রতিনিয়ত মানুষের শিল্পিমনের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। এই প্রতিচ্ছবিগুলিই সে চায় মন থেকে মনে, প্রাণ থেকে প্রাণে চালনা করতে, ব্যাপ্ত করতে এবং উৎক্ষিপ্ত করতে। এই কাজে তার প্রধান সহায় এবং বাহন সাঙ্কেতিকতা।

জীবন ছন্দোময়—বস্তুজগতে, ভাবরাজ্যে, প্রকৃতির সর্বত্র আমরা ছন্দের নৃত্য (rhythmic dance) দেখতে পাই। একে ঠিক কবির উদ্ভট কল্পনা বলে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। এমন কি, জড়বস্তুর বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকরাও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বস্তুকেই শেষ পর্যন্ত electron এবং proton বা positive and negative charges of electricity-তে ভাগ করা যায়। এরাও আবার স্থাণু নয়—এরাও নৃত্যময় এবং ছন্দোপূর্ণ। সাহিত্যিক বা শিল্পীর কাজ হোল এই ছন্দকে তাঁদের স্বষ্টির মধ্যে রূপায়িত করে তোলা। ছন্দের মাত্রাই স্রষ্টা তাঁর নিগূঢ় চিন্তা এবং অনুভূতিগুলিকে একটা রূপ এবং আকার দিতে সমর্থ হন। কত ভাব, কত সত্য, কত উপলব্ধিভূত সৌন্দর্য শিল্পীর মনে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। এগুলিকে দীর্ঘসূত্রী না করতে পারলে, অর্থাৎ

শিলাজি

খানিকটা স্থায়িত্ব না দিতে পারলে সৃষ্টির সার্থকতা আসে না—এইখানেই ছন্দের আবশ্যকতা।

কবি বা শিল্পী বা সৌন্দর্যস্রষ্টা যখন ছন্দের বন্ধনের ভেতর দিয়ে অনুভূতিলব্ধ ভাবরাশিকে রূপ দিতে থাকেন, অর্থাৎ স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করবার মাহেন্দ্রক্ষণে উপনীত হন, সে সময় তাঁর মানসিক অবস্থা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতর অবস্থান করে। এই সৃষ্টির পরমক্ষণে তিনি একই সঙ্গে নিদ্রিত এবং জাগ্রত, চেতন এবং অচেতন, সুপ্ত এবং সচকিত। ছন্দের বাহ্যিক সমস্বরতাই এই নিদ্রা অচেতনতা বা সুপ্তির দিকে শিল্পীকে টেনে নিয়ে যায়। আবার ছন্দের অন্তরে নিহিত ভাবে যে অনুরণন এবং বৈচিত্র্য আছে, তাই তাকে জাগ্রত, সচেতন এবং সচকিত করে রাখে।

এই না-জাগ্রত এবং না-নিদ্রিত অবস্থার ভেতর দিয়েই শিল্পিমন একটা অবচেতনতার স্তরে গিয়ে উপনীত হয়। এই অবস্থায় স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—ইচ্ছাশক্তির পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পিমন নিজেকে ব্যাপ্ত, বিকশিত ও প্রকাশিত এবং রূপায়িত করে নানারূপ প্রতীক সৃষ্টির ভেতর দিয়ে।

নাটকে এই ধরণের গভীর এবং ব্যাপক সাঙ্কেতিকতার পরিচয় পাওয়া যায় মেটারলিঙ্কের The Sightless, The Intruder, Palleas et Melisanda, Interior প্রভৃতি রচনায়। স্ট্রিণ্ডবার্গের Road to Damuscus-এ, আন্দ্রেয়েভের The life of Man এবং রবীন্দ্রনাথের রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা প্রভৃতি লেখায়। এ-সব নাটকের সাঙ্কেতিকতাই সত্যিকার উঁচুদরের সাঙ্কেতিকতা। কারণ—এ-সব হচ্ছে সেই জাতীয় রচনা—in which the visible world is no longer a reality and the unseen world no longer a dream. এবং in which art returns to the one pathway, leading through beautiful things to the eternal beauty

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটোর মঞ্চপ্রয়োগ-রীতিও সম্পূর্ণভাবে সাঙ্কেতিক পদ্ধতি অনুসারেই হওয়া দরকার। মঞ্চসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গী, মুভমেণ্ট,

সাঙ্কেতিক নাট্যকার মেটারলিঙ্ক

অভিনয়ে আলো-ছায়ার খেলা

জেস্‌চার, আলোছায়ার খেলা, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ সব কিছুই হবে সাঙ্কেতিকতা-পূর্ণ।

সাঙ্কেতিক নাটকের চরিত্রগুলো বাস্তবজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত করে তোলবার চেষ্টা করে না। এ-সব চরিত্র হচ্ছে ভাবের বাহন বা abstracted ideals. সাঙ্কেতিক নাট্যের অভিনয় এবং সেটিং-ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় stylised form-এ। সাঙ্কেতিক নাট্যের মূল ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনেক সময়ই রং-বেরং-এর আলো ব্যবহারের আবশ্যকতা দেখা দেয়। অবশ্য একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে—কোন রং-এ কি বোঝাচ্ছে, এ নিয়ে আবার সঙ্কেত-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা আছে—সুতরাং এদের সাহায্য নিয়ে আলোকসম্পাত করলেও অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যাভিনয়ের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়—প্রযোজক কি বোঝাতে চাইছেন দর্শক তা উপলব্ধি করতে পারে না। একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, সময় বিশেষে নাটকের বিশেষ জায়গাকে বিশেষ রং-এর আলোর সাহায্যে সঙ্কেত-পূর্ণ এবং সার্থক করে তোলা যায়। কিন্তু তাই বলে একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, অমুক রং-এর আলো শুধু অমুক জিনিষকেই বোঝাবে বা আরেক রং-এর আলো খালি আর এক ভাবেরই সঙ্কেত দেবে। ধরুন—পাপ এবং দুষ্কৃতি বোঝাতে গিয়ে যদি নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় যে, সবুজ আলোর বন্যায় মঞ্চ ভরে দিতে হবে—আসল কার্যক্ষেত্রে হয়তো দেখবেন ফল হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। সুতরাং to reduce this symbolism of colour to a fixed convention, in which each colour is said to represent this or that, and to possess such and such a significance, is to impose too binding a limitation.

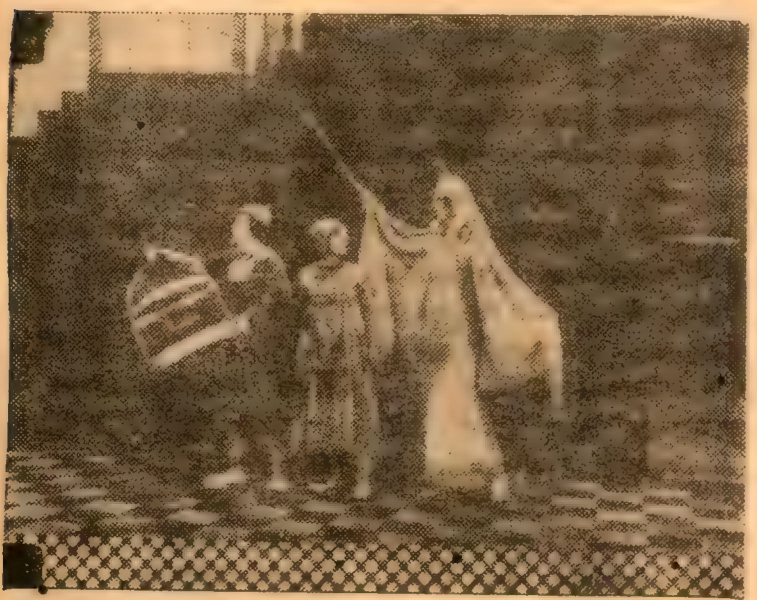

সঙ্কেতধর্মী নাটক 'ব্লু বার্ড' (মেটারলিঙ্ক) প্রডিউসার সুলারজিট্‌স্কি।

অনেক সময়ে আবার বৈপরীত্য প্রথায় আলোকসম্পাতে নাটকের ভাবকে বেশি স্পষ্ট করে তোলা যায়—একে বলে Juxtaposition of opposites. বিষাদপূর্ণ বা tragic দৃশ্যে gloomy lighting কার্যকরী হবে না—বিশেষত এই কারণে যে, এ-ধরণের দৃশ্যে দর্শক চাইবে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে বিচার করে দেখতে। সুতরাং এক্ষেত্রে দরকার intense lighting, so as to make the characters and their movements appear sharp and clear—cut, and by creating contrasts, give the scene itself the stark and dynamic quality it may require for its full expression.

পাঠক মন

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক সংখ্যার দিক থেকে ভারতে সম্ভবত বাংলা দেশের জুড়ি নেই। তার মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' একটি আশ্চর্য সংযোজন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নিজস্ব ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এসেছে পত্র-পত্রিকার আসরে। সম্ভবত পাঠকের মন জয়ে সমর্থও হয়েছে। এর জন্যে সম্পাদিকা, পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মিগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ক'টা কথা জানাতে চাই—

(১) প্রচ্ছদপটে সপ্তাহের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সংবাদের পটভূমিকার আলোকচিত্র নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রচ্ছদের কাগজ অতি সাধারণ পর্যায়ের। এর উন্নতি বাঞ্ছনীয়।

(২) ছাপার ভুলের কথা বাদ দিলেও (কারণ—সম্প্রতি উন্নতি পরিলক্ষিত) লেখার মানের কথা বাদ দেওয়া যায় না। নতুন লেখকের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আরো সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। গল্প বা প্রবন্ধ নীচু মানের হলে পত্রিকার মানও স্বাভাবিক কারণেই নীচে নেমে যায় আর পাঠকের মনের প্রতিক্রিয়াও পত্রিকার সুনাম অর্জনের অনুকূলে যেতে পারে না।

(৩) সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার চলচ্চিত্র বিভাগ ও কার্টুন অংশ সম্ভবত সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। নানা বিচিত্র রসে এ অংশটুকু অনেক অভাব অভিযোগকে ছাপিয়ে যেতে পারে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র কার্টুন নেই। আর 'রঙ্গমঞ্চ'? এত সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ যে, অনেক সময়ে বিরক্তির কারণ ঘটে থাকে। এ দুটো সমস্যারই আশু সমাধান বাঞ্ছনীয়।

(৪) কবিতা প্রকাশের ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্কতার অভাব রয়েছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলা দেশে কবিতার পাঠক ও সমঝদারদের সংখ্যা কমে গেছে বলে অনেক সময়ে অনেক অভিযোগ শোনা যায়, এর পেছনে অর্থহীন কতকগুলো শব্দের সমষ্টি গোছের কবিতা রচনার প্রভাব কতখানি আছে—একবার ভেবে দেখার দরকার। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশিত কোন কোন কবিতা ভাল লাগে নি। নাম উল্লেখ করে বা কারণ প্রদর্শন করে কোন কবির রোষানলে পড়তে চাই না বা নিজের অজ্ঞতা (?) জাহির করতে চাই না বলেই এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলুম।

(৫) 'ভারত দর্শন' অংশে ছবি সংযোজনের প্রচেষ্টা অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের দাবী রাখে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন দু'একটি ছবি ছাপা হয়েছে যা অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়। সেদিক থেকে আর একটু সতর্ক হয়ে সংবাদ আলোচনার পরিমাণ বাড়ালে কেমন হয়?

(৬) বহু সমস্যার চাপে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের অভিযোগ স্বভাবতই অনেক। আপনার এ পত্রিকায় এমন একটি বিভাগ (অন্তত এক পৃষ্ঠার) খুললে কেমন হয় যেখানে শুধু স্থান পাবে নিপীড়িত, নির্যাতিত, ন্যায়বিচারে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের কথা, যাদের কথা শুনবার বা প্রতিকারের কথা ভাববার মত কোন লোক বা সংস্থা নেই, আর থাকলেও তাঁরা এত উপরে থাকেন যে নীচের লোকের আর্তনাদ আর হাহাকার তাঁদের কাছে পৌঁছয় না, শব্দরোধকারী পাথরেই সে আর্তনাদ মাথা কুটে মরে।

যবনিকা টানার আগে একটা কথা জানাচ্ছি। মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে নানাভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায়, চায় শুধু ভালটুকু নিতে আর পেতে। খারাপটুকু বাদ দিতে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' ভাল লেগেছে। ভাল লাগছে। আরো ভালোভাবে পেতে, সম্পূর্ণ দোষমুক্ত (Sterilised) করে পাবার ইচ্ছেটাই এ চিঠির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

শ্রীরণধীররঞ্জন দাস
রেস্ট কট ২৩, হায়াৎ খান লেন
কলিকাতা-৯

* * *

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন উৎসাহী পাঠিকা। অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির তুলনায় এই পত্রিকাটিকে বেশ উন্নত ধরণের বলে মনে হয়। এই বিষয়ে সর্বাগ্রে আপনাকেই ধন্যবাদ জানাই। উন্নত ধরণের বললাম এই কারণে যে, এই পত্রিকাটিতে বিভিন্ন রচনার সমাবেশ দেখতে পাই। একদিকে যেমন আছে বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন, শহর কলকাতা আবার অপরদিকে আছে রঙ্গজগৎ, উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা প্রভৃতি।

শ্রীপদাতিকের 'শহর কলকাতা', এই অংশটি আমি খুবই আগ্রহের সঙ্গে পড়ি। এতে পুরানো কলকাতার অনেক অজানা ঘটনার কথা জানতে পাই।

বর্তমান ধারাবাহিক উপন্যাসগুলির মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচূড়া' উপন্যাসটি খুবই ভাল লাগছে। বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যাটি আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে কবির যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল—তা এই রচনাগুলির মাধ্যমে আরও সুস্পষ্টভাবে জানতে পারলাম।

আপনাদের বঙ্গদর্শন ও ভারতদর্শন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভাগ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিকগুলির বিভিন্ন খবরাখবর নিয়মিত পাই।

ছাপার দোষে পত্রিকাটির লেখা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট বলে বোধ হয়। এইরূপ একটি পত্রিকার শুধু রচনায় নয়—এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন একান্তই বাঞ্ছনীয়।

অনীতা চৌধুরী
২৬এ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

খেলা ধুলা

টেষ্ট টিকিটের মোহ

সব গণ্ডগোলের মূলই হল টেষ্ট ক্রিকেটের টিকিট। ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব কে করবেন, এই নিয়ে সিণ্ডিকেট এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের মধ্যে যে ঠাণ্ডালড়াই চলছিল, তার নগ্ন-বহিঃপ্রকাশ ঘটতে চলেছে আজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য নির্বাচনকার্য সম্পন্ন করেন সিণ্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলা বিষয়ক যাবতীয় গুরুদায়িত্বই এই স্পোর্টস বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, কোনবারই সি-এ-বি বা আই-এফ-এ-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে স্পোর্টস বোর্ডের কোন সদস্য যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন না; প্রতিবারই দেখা যায় যে, ক্রীড়াজগতের সঙ্গে যার কোন সংযোগই নেই, এমন একজন ব্যক্তির নাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চাসনে আসীন এই ভাগ্যবান ভদ্রলোক সিণ্ডিকেটের জ্ঞাতসারেই নিজেই নিজের নাম পাঠান। প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কোনদিনই কোন সভাতে উপস্থিত থাকার তেমন প্রয়োজন অনুভব করেন না, কারণ তাঁর লক্ষ্য শুধু টেষ্ট ক্রিকেট আর চ্যারিটির টিকিট। তাই টিকিট ভাগ-বাটোয়ারার সময়ই তিনি কেবল সশরীরে দর্শন দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য টিকিটগুলি করতলগত করেই খালাস। এই ব্যাপারে স্পোর্টস বোর্ড বহুদিন থেকে প্রতিবাদ জানালেও সিণ্ডিকেট এ বিষয়ে কর্ণপাত করছে না। খেলাধূলা বিষয়ক সমস্ত কিছুর ভারই যখন স্পোর্টস বোর্ডের ওপর অর্পিত তখন এই বোর্ডেরই মনোনীত কোন সদস্যেরই প্রতিনিধি হিসেবে সি-এ-বি বা আই-এফ-এ-তে যাওয়া উচিত। পদাধিকার বলে বা গায়ের জোরে শুধুমাত্র টিকিটের লোভে প্রতিনিধির আসন আঁকড়ে থাকা খুবই লজ্জাকর। তাই আর বেশি জল ঘোলা না করে সময় থাকতে স্পোর্টস বোর্ডের যে নায্য দাবী তা মেনে নিলেই সব দিক রক্ষা হবে।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে রানের বন্যা

বাছাই করা পাঁচজন বোলারকে দলে নিয়ে ইংলণ্ড ভেবেছিল, ওল্ড ট্রাফোর্ডে বাজীমাৎ করবে। কিন্তু হায়, এ্যাশেজ উদ্ধার করার আশা তাদের প্রায় দূরীভূত হতে চললো বলা চলে। কারণ, ওল্ড ট্রাফোর্ডের ইঙ্গ-অষ্ট্রেলীয় চতুর্থ টেষ্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। সিরিজে অষ্ট্রেলিয়া অগ্রগামী, আর বাকি শুধু ওভালের পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট।

আপন মাধুর্যে চতুর্থ টেষ্ট দর্শকদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। কিন্তু রানের বন্যা, সেঞ্চুরী, ডাবল সেঞ্চুরী, ট্রিপল সেঞ্চুরী আর রেকর্ডভাঙ্গা কীর্তি-কলাপ মাঝে মাঝে অবশ্য দর্শকদের দিয়েছে উত্তেজনার ছোঁয়াচ। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ববি

শ্রীঅমিতাভ

সিম্পসন ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ লাভ করেও জয়ের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন নি।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে অধিনায়ক সিম্পসন এবং লরী। রামসে এবং প্রাইস ইংলণ্ডের বোলিং আক্রমণধারা রচনার ভার গ্রহণ করে। রামসে বল হাতে সংহারমূর্তি ধারণের চেষ্টা করে, কিন্তু সিম্পসন এবং লরী ছিলেন দুর্ভেদ্য এবং অপরাজেয়। প্রথম-দিনের খেলায় ইংলণ্ডের বোলাররা অষ্ট্রেলিয়ার মাত্র দুটি উইকেট লাভ করল; অষ্ট্রেলিয়ার রানসংখ্যা তখন ২৫৩, লরী শতরান করার সৌভাগ্য অর্জন করে ১০৬ রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন; সিম্পসন তখন ১০৯ রানে অপরাজিত। দ্বিতীয় দিনে অধিনায়ক সিম্পসন ইংলণ্ডের বোলিং আক্রমণকে পর্যুদস্ত করলেন বেপরোয়া অথচ সতর্ক ভাবে খেলে এবং পূর্বের খেলা ফিরে পেয়ে বুথও গ্রহণ করলেন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। খেলার শেষে সিম্পসন ২৬৫ রানে এবং বুথ ৮২ রানে রইলেন অপরাজিত; ৪ উইকেট হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়া তখন সংগ্রহ করেছে ৫৭০ রান।

তৃতীয় দিনের খেলা সিম্পসনের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়। ব্যক্তিগত ৩১১ রানে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে বিদায় নিলেন,—সৃষ্টি করে গেলেন এক নতুন ইতিহাস। প্রথম দিনই তিনি এবং লরী প্রথম উইকেট জুটিতে ২০১ রান সংগ্রহ করে ১৯০৯ সালে গ্রেগরী এবং কর্ডসলের ইংলণ্ডের বিপক্ষে স্থাপিত ১৮০ রানের রেকর্ডটি ভঙ্গ করেন। ৩১১ রান সংগ্রহ করার ফলে ক্রিকেটের অবিস্মরণীয় রথী-মহারথীদের পাশে সিম্পসনেরও নাম লেখা থাকবে ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায়। ডন ব্রাডম্যানের

● ববি সিম্পসন

পর তিনিই একমাত্র টেস্টের আসরে ব্যক্তিগতভাবে এত রান সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। বেচারা রথ মাত্র দুই রানের জন্য শতরানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। ৮ উইকেটে ৬৫৬ রান সংগ্রহের পর সিম্পসন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ইংলণ্ডের বোলারদের মধ্যে প্রাইস ৩টি, রাসেল ২টি এবং কার্টরাইট ২টি উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইংলণ্ড এদিন ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। বয়কট ৬২ রানে পরাজিত এবং ডেক্সটার ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে এল ইংলণ্ডের রান তোলার পালা। মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের হল ৪১১ রান। দলপতি ডেক্সটার অধিনায়কোচিত দৃঢ়তা দেখিয়ে ১৭৪ রানে বিদায় নিলেন; দিনের শেষে ব্যারিংটন ১৫৩ রানেও অপরাজিত। চতুর্থ টেস্টের শেষ দিনে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হল ৬১১ রানে। স্কোরবোর্ডে ব্যারিংটনের ব্যক্তিগত রানসংখ্যা তখন ২৫৬ এবং জিম পার্কসের একটি মনোরম মারে-ভরা ৬০ রান। অষ্ট্রেলিয়ার বোলার ম্যাকেঞ্জি একাই মাৎ করে দিলেন ৭টি উইকেট সংগ্রহ করে এবং ভাইভাসের ভাগ্যে জুটল অবশিষ্ট ৩টি উইকেট। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করতে করতেই সময় শেষ হয়ে গেল। চতুর্থ টেস্টের কোন মীমাংসা না হবার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার তেমন কোন ক্ষতি হল না, কারণ তারা এখন সিরিজে অগ্রগামী; অবশ্য এও হতে পারে যে, তারা কোন ঝুঁকি নিতে ঠিক সাহস করে নি। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হল ইংলণ্ড টেস্টটিকে কোন কাজে লাগাতে না পেরে, এখন একমাত্র তাদের আশা ওভালের পঞ্চম এবং শেষ টেস্ট।

দুই প্রধানের সহাবস্থান

শেষ অধ্যায়ে এসে নাটক প্রায় জমে উঠেছে। নিম্নমানের জন্য এতদিন যে লীগ ফুটবল ছিল নীরস তা বর্তমানে আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কার ভাগ্যে লীগ এ নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। লীগের দৌড় শেষ করতে দুই প্রধান মোহনবাগান এবং

● ব্যারিংটন

ইষ্টবেঙ্গলের বাকি মাত্র ছ'টি খেলা, কিন্তু পয়েন্টের মানদণ্ডে দু' দলই এখন সমান। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের লীগের পুনরাবৃত্তি না হয়। সেবার শেষ পর্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সমসংখ্যক পয়েন্ট থাকার জন্য একটি নিষ্পত্তিমূলক খেলা হয় এবং মোহনবাগানই বিজয়ী গৌরব অর্জন করে।

ইষ্টার্ন রেল দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান একটি শক্ত বাধা অতিক্রম করল। এদিন খেলায় মোহনবাগানের একচ্ছত্র প্রাধান্য এবং উন্নত ক্রীড়াধারা মোহনবাগানের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছে। একটি দর্শনীয় সটে প্রদীপ ব্যানার্জী যে গোল করেন তার তুলনা মেলা ভার। চুনী গোস্বামীর হেড থেকে দেওয়া দলের তৃতীয় গোলটি দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। পরবর্তী খেলায় মোহনবাগান কালীঘাটের কাছ থেকে বহু কষ্টে দু'টি পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। জার্ণালের আংশিক ত্রুটির সুযোগ নিয়ে কালীঘাটের পি সরকার গোলরক্ষক থঙ্গরাজকে পরাস্ত করেন। কালীঘাটের এই অগ্রগতি ক্ষণস্থায়ী হয়, দলপতি চুনী গোস্বামী দুটি গোল দিয়ে দলকে বিপন্মুক্ত করেন।

ইষ্টবেঙ্গল জর্জ টেলিগ্রাফকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে বটে, কিন্তু তাদের আরও বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। প্রাপ্ত সুযোগ ফরোয়ার্ডরা অপচয় করার ফলে ইষ্টবেঙ্গল দলের এই অবস্থা। ইষ্টবেঙ্গলের পুরোভাগে সন্তোষ চ্যাটার্জীর ব্যর্থতা খুবই দৃষ্টিকটু লাগছে। উয়াড়ীকে পরাজিত করতে ইষ্টবেঙ্গলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। উয়াড়ী ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের শেষ পর্যন্ত আক্রমণধারা রচনার প্রয়াসের প্রশংসা করতে হবে। তাদের আক্রমণভাগের পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর খেলা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে আর লাহিড়ীর খেলা ত' অনবদ্য।

লীগের নিয়ে এখন অবনমন এড়াবার জন্য পয়েন্ট ম্যানেজের এক জঘন্য খেলা চলছে। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রা:) লি:-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্স কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Tiny Tots.. Teen-agers... Grown-ups...
THE WHOLE FAMILY LOVES ELPHINSTONE FABRICS
Because Elphinstone fabrics are designed to suit every age-group, every taste, every need. Hard-wearing, easy-washing, colour-fast...Elphinstone fabrics come to you in a fascinating array of patterns and shades ... for dainty children's frocks, pretty dresses, gorgeous cholis. And to beautify your home ...there's a brilliant spectrum of Elphinstone furnishing fabrics ... in attractive designs and eye catching colours. ELPHINSTONE-luxury fabrics at economy prices!
Also manufacturers of the famous fastest selling CHEETA Leather Cloth
The Elphinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.
32, NICOL ROAD, BALLARD ESTATE, BOMBAY 1

সাপ্তাহিক
বসুমতী

বিগত পনেরোই আগষ্টে
উদ্বেল জন-সমুদ্রের মুখর সৈকতে দাঁড়িয়ে
দৃপ্ত সেনাবাহিনীর
শেষ সম্ভাষণ গ্রহণ করছেন
প্রিয় অধিনেতা নেহরু।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৬৯ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 13th August, 1964 • Vol.

ত্বকের মসৃণতা ও
কোমলতায়
হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

756·3
·003/3
V. 69
no. 12

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৭০৭
আজকের মানুষ	...	৭০৮
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কট (প্রবন্ধ)	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৭০৯
পনেরোই আগষ্ট (কবিতা)	আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন	৭১২
আর এক সর্গ (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	৭১২
ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যা (প্রবন্ধ)	প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	৭১৩
স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরা (প্রবন্ধ)	চিদানন্দ গোস্বামী	৭১৫
স্বরাজ-সাধনার রূপান্তর (প্রবন্ধ)	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৭২০
আন্তর্জাতিক	...	৭২৩
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৭২৮
সিপাহী বিপ্লব ও বাঙালী (প্রবন্ধ)	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩০

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

***Head Office* : 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সীমান্তিনা (গল্প)	দেবেশ দাশ	৭৩২
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৭৩৮
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৭৪১
লণ্ডনের চিঠি	অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৪৪
বঙ্গদর্শন	...	৭৪৬
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৪৯
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৭৫৫
খাটি মানুষ শশিভূষণ	সুরজিৎকুমার সেন	৭৫৯
পনেরোই আগষ্ট	তরুণ মৈত্র	৭৬১
গণতান্ত্রিক সমাজ রচনার প্রথম পদক্ষেপ	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৭৬৩
চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ	কল্পতরু সেনগুপ্ত	৭৬৫
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৭৬৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ত্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেছে যা মরেছে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিভাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

৬১ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ প:
বৃহস্পতিবার, ২৮শে শ্রাবণ ১৩৭১

25 Paise
Thursday, 13th August 1964

১৫ই আগষ্ট

পনেরই আগষ্ট আসন্ন। এই তারিখটির সঙ্গে যোগ রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের। ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুর দিনগুলির কথা মনে রেখে এই তারিখটিকে তুলে ধরলে দেখা যাবে আমাদের নবজীবনের সুরু হয়েছে এই দিনের সেই স্মরণীয় মুহূর্তে—যখন আমরা ইংরেজ শাসনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছি। অনেক সংগ্রামের পর সেই দিন থেকেই আমরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি, তেমনি একথা অনুভব করেছি যে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা জাতি গঠনের মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনগণের—সেই প্রিয় জওহরলাল আজ জীবিত নেই। আমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর অফুরন্ত প্রেরণা ও ভালবাসা। এই ভালবাসার মূল্য অনুধাবন করেও—'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই মনোভাব নিয়ে যদি দেশ গঠনের কাজে আমরা নিযুক্ত থাকতে পারি, তাহলে সত্যি সত্যি এই দেশ একদিন কবির স্বপ্নের ভূমি হয়ে উঠবে। সুখে দুঃখে দেশের মানুষ স্বদেশের মর্যাদা নিজেরাই অক্ষুণ্ন রাখবে।

কিন্তু এই দেশের মানুষ দুর্যোগের দিনগুলিতে সংহতির অখণ্ড স্পৃহাকে শীর্ষে তুলে ধরলেও এমন কথা বলা যায় না যে, তারা সত্যিকারের একাত্মানুভবে গরীয়ান। কেন না, আমাদের দেশে পর পর কয়েকটি পরিকল্পনার সাফল্য সত্ত্বেও এখানে এখনো ধনী-গরীবের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও পরিপূর্ণ কারিগরী শিক্ষার অভাব এখনো হৃদয়-বিদারক। বেকারদের অবস্থা দুর্ভাগ্য-জনক। বাসস্থানের, যানবাহনের সমস্যা আজো মেটে নি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুর দল ছন্নছাড়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দেশের শিল্প ও কৃষির সামঞ্জস্যের অভাব অভাবনীয়। এ ছাড়া সমাজবিরোধীদের মূল্য বৃদ্ধি সহ ভেজালের অত্যাচারে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। এই কারণে স্বাধীনতার দিনটিতে জনগণের প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, গান্ধীজী যে স্বাধীনতার কল্পনা করেছিলেন তা কি সত্যিই লাভ করা গেছে? তাই জাতির কর্ণধারদের কাছে আমাদের আবেদন—যথার্থ স্বাধীনতাকে তাঁরা জনগণের নিকটবর্তী করে তুলুন—আর তা একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রূপায়ণের দ্বারাই সম্ভব।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মনে করুন মহাভারতের সেই দৃশ্যই নতুন ছবি হ'য়ে উঠেছে আজকের দিনে। বক রাক্ষস অপেক্ষায় আছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। একে একে আহার্য আসছে। কিন্তু তার পরেই মহাবীর ভীম। আর তারপর? তারপরের কথা সবাই জানেন। কিন্তু এ যুগের বক রাক্ষস যদি চীন হয়, ভীম তবে কে? এখনও ভাবতে পারি নি। তবে চীনের লোলুপ দৃষ্টির সামনে স্নিগ্ধ শান্ত ভুটানের নেতৃত্বে যিনি অভিষিক্ত হ'য়েছেন তাঁকে তাঁর সাহস, শৌর্য আর তারুণ্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে আমাদের (ভারতবাসীর) কুণ্ঠা নেই। সবচেয়ে আনন্দের কথা সেই শুভেচ্ছা-ফুল কুড়িয়ে নিতেই রাজধানী দিল্লীতে এসেছেন সেই যুবক নেতা—ভুটানের সম্ভাবনাময় প্রধানমন্ত্রী লেন্দুপ দোরজী। এখনও অস্থায়ী হিসেবে অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে স্থায়ী সম্মান দেবে বলেই বিশ্বাস। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জিগমী দোরজীর শোণিত সিক্তিত আসনে বসে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেন্দুপ ভুটানের জনগণের বিচলিত মনের কাছে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। মাত্র ২৮ বছরের তরুণের পক্ষে এ এক দ্বিধাহীন প্রতিশ্রুতি। অত্যন্ত আধুনিক মনোভাব আর সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তি তাঁর একান্ত নিজস্ব। অবশ্য দোরজী পরিবারের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবপ্রবাহ তাঁর এই শক্তিকে বিকশিত করেছে সন্দেহ নেই।

দার্জিলিং-এর বিখ্যাত সেণ্ট জোসেফ কলেজে তাঁর ছাত্র-জীবন কেটেছে। এরপর গিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার্থে দু'বছর কাটিয়েছেন লেন্দুপ। মার্কিন জীবনের প্রভাব এ সময়েই আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। তাঁর গ্রহণশীল মন পাশ্চাত্যের আবেদনকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই ভুটানের সমাজজীবনে তাঁর চরিত্রের এই নূতন সংমিশ্রণ কতটা উপযোগী হ'বে তা ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু লেন্দুপকে ধন্যবাদ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অকস্মাৎ নিহত হবার পরে দেশের দুর্যোগের দিনে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে সঠিকভাবেই দৃঢ়হস্তে রূপ দিতে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি।

ভুটানের রাজা জিগমী দোরজীর উত্তরাধিকার নির্বাচন করেছেন যথার্থই। তাঁর নির্বাচন বিশেষভাবে ভারতের প্রতি ভুটানের সম্প্রীতির প্রসার এনেছে। প্রগতিবাদীদের এই সম্মানে ভারত আনন্দিত ত' নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে ভুটানের সুযোগসন্ধানী রক্ষণশীল দলের বিষদাঁতও প্রায় ভোঁতা হ'য়েছে। জিগমী হত্যার অবকাশে অনেকেই প্রচার করেছেন রাজা এবার কাউকেই বসাবেন না ওই দায়িত্বে। বসালে তা রাজার নিজের নিরাপত্তাকেই আহত করবে। কিন্তু এই দারুণ পরিস্থিতিতেও রাজা বিশ্বাস আর ভরসা রেখেছেন তরুণ লেন্দুপের ওপর। ভরসা রাখি আমরাও। আমরাও আশা করি: এর মূল্য দেবার মত সম্পদ লেন্দুপের আছে।

প্রধানমন্ত্রী লেন্দুপ দোরজী

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কট

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এশিয়া মহাদেশ যখন মহাসংগ্রামের মধ্যে জড়াইয়া পড়িল এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণের প্রয়োজন ঘটিল, তখন আর্ল অব্ মাউণ্টব্যাটেনের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড বা 'South-East Asia Command' গঠিত হইল। তখন হইতে এশিয়ার সামরিক মানচিত্রে সর্বপ্রথম 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' নামে একটি পৃথক অঞ্চল চিহ্নিত হইল এবং পরবর্তীকালে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ ও সুপণ্ডিত সর্দার পাণিক্কর এশিয়ার রাজনৈতিক ভূগোলে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' কথাটি চালু করেন। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান, অতীত ইতিহাস ও সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, এমন কি নৈসর্গিক প্রকৃতিরও একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বলিয়া এই নতুন নামকরণ অতি দ্রুত সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করে। তখন হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে আমরা যেন এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম। যদিও এই দেশগুলির নামের সঙ্গে আমরা অনেক আগেই পরিচিত ছিলাম, কিন্তু এই সমস্ত দেশের অধিকাংশেরই আভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্র আমাদের জানা ছিল না—একমাত্র ব্রহ্মদেশ ছাড়া। (কারণ, ভারত-ব্রহ্ম একই বৃটিশ শাসনের অধীন ছিল এবং প্রচুর বাঙালী ও ভারতীয় ব্রহ্মদেশের বাসিন্দা ছিলেন। আজ অবশ্য স্বাধীন ব্রহ্মদেশ সমস্ত ভারতীয়কে 'সমাজতান্ত্রিক গলাধাক্কা' দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। আর ভারত সরকার অসহায়ের মত সেই দৃশ্য দেখিতেছেন।) ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুরু এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দূর পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশগুলি হইতেছে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। এই সমগ্র এলাকার জনসংখ্যা ৩০ কোটির কম নহে। প্রাকৃতিক সম্পদে এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। চাউল, চিনি, কুইনান, সেগুন কাঠ, রবার, টিন, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, পেট্রল এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থে ও অরণ্যের ঐশ্বর্যে এই অঞ্চল বিখ্যাত। বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের—ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও মার্কিন শক্তির একাধিপত্য ছিল। এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আবার জাপানের নতুন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৪১-৪২ সালে প্রচণ্ড আঘাত হানিল এবং এই সমস্ত এলাকা কাড়িয়া লইল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা-কামী শক্তিগুলি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল এবং একে একে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে পিছনে হটাইয়া দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করিল।

আর্ল অব্ মাউণ্টব্যাটেন্

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনই কোনও দেশের পক্ষে একমাত্র শেষ কথা নহে। আভ্যন্তরীণ সমাজ-জীবন যদি শক্ত ভিত্তির উপর গড়িয়া না উঠে, যদি অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বাসগৃহের প্রাথমিক সমস্যাগুলির মীমাংসা না হয়, যদি সমগ্র জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রতিষ্ঠা না হয়, যদি ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি লইয়া অনবরত বিরোধ চলিতে থাকে, তবে, একমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কোনও দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এশিয়া মহাদেশের নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সমস্যার ইয়ত্তা নাই। ইহার সঙ্গে দেড় হইতে দুই শতাব্দীর পরাধীনতা ও বৈদেশিক প্রভাব যুক্ত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু স্থানে যেন দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। মাঝে মাঝে এই সমস্ত ক্ষতমুখ দিয়া যে রক্ত ঝরিয়া থাকে, তাহা দীর্ঘ পরাধীনতারই বিষক্রিয়ার ফল। এ জন্য কোন কোন বিদেশী পর্যবেক্ষক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বলকান্ অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন এবং ইহাকে 'এশিয়ার বলকান' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান্ অঞ্চল একদা 'ইউরোপের বারুদাগার' নামে পরিচিত ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকেও অনুরূপভাবে

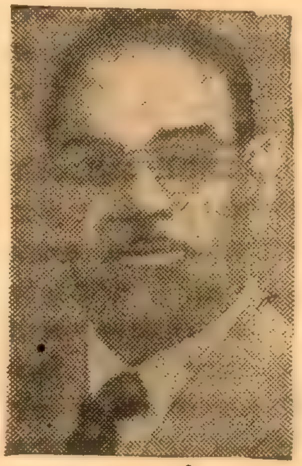

সর্দার পাণিক্কর

'এশিয়া মহাদেশের বারুদাগার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এবং এই বারুদাগারে অগ্নিসংযোগের জন্য যেন বার বার চেষ্টা হইতেছে।

এই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া মতবাদ বনাম কমিউনিজম, আবার কমিউনিজম বনাম ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং জোটবদ্ধতা বনাম নিরপেক্ষতাবাদ এক বিচিত্র এবং অভিনব জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, ফিলিপাইনে এবং ইন্দোচীনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। এই সংঘর্ষ গিয়াছে দুই স্তরে—বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে এবং স্বদেশী শাসন শক্তির সঙ্গে। আপাততঃ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ফিলিপাইন কমিউনিজমের প্রশ্নে বাহ্যিক শান্তি বজায় রাখিলেও ভিতরে ভিতরে অন্তর্জ্বালা রহিয়াছে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে কমিউনিস্ট মতবাদের উগ্রতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে; যদিও আগের মত আর সশস্ত্র সংঘর্ষ নাই। কিন্তু এই সংঘাত রহিয়াছে ইন্দোচীনের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এবং লাওসের প্যাথেট লাও ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে। কিন্তু সমস্যাটি কেবল এই স্তরেই সীমাবদ্ধ নাই। চীন, উত্তর ভিয়েৎনাম ও উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছে এবং যা'তে আর কোন দেশ কমিউনিস্ট খপ্পরে না পড়িতে পারে, তার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি এই অঞ্চলে রণনীতির হাত ধরিয়া চলিয়াছে। একদা প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের আমলে পরলোকগত মিঃ ডালেস এশিয়া সম্পর্কে যে 'brinkmanship' বা 'যুদ্ধের কিনারা ঘেঁষিয়া' চলিবার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, ১৯৬৪ সালের ভিয়েৎনাম ও লাওস সম্পর্কে সেই নীতিরই যেন পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে টংকিন উপসাগরে উত্তর

● আইসেনহাওয়ার

ভিয়েৎনাম ও মার্কিন নৌ-শক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটিয়া গেল, তাহা এই নীতিরই অনিবার্য পরিণতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল ডেমোক্রাট ও রিপাব্লিকান এই বিষয়ে একমত যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের অধিকতর প্রসার হইতে 'রক্ষা' করিতে হইবে এবং এজন্য ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'South-East Asia Collective Defence Treaty Organisation' কিম্বা সংক্ষেপে SEATO (সীয়াটো) নামক সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ৮টি দেশ এই সামরিক সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারী—অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যদিও 'সম্ভাব্য আক্রমণ' হইতে যৌথ আত্মরক্ষা ও পারস্পরিক সাহায্য দানের জন্য উপরোক্ত ৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তথাপি ইহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ বিস্তারে বাধা দান এবং কমিউনিস্ট অন্তর্ঘাতি কার্যকলাপ নিরোধ। কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর ১৯৬৪ সালের মধ্যে দশ বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

কিছু নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। যেমন, ১৯৬২ সালের শেষের দিকে চীন কর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রান্ত হওয়ায় চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চীন আর ভারতবর্ষের বন্ধু নয়, বরং ভারত-বিদ্বেষী পাকিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া চীন পাকিস্তানের কাশ্মীর দাবী সমর্থন করিয়াছে এবং 'আজাদ কাশ্মীর' সীমানার কিছু জমি হস্তগত করিয়াছে। ফলে, আজ চীন সম্পর্কে ভারতবর্ষের মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। এজন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সামরিক মতবাদের প্রাবল্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের দিক হইতে কোন প্রতিবাদ নাই। অথচ ১৯৬২ সালের পূর্ববর্তী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে ভারতীয় জনচিত্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর ছিল।

দ্বিতীয়তঃ চীন ও ভারতবর্ষের বিরোধের সুযোগ লইয়া পাকিস্তান চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়াছে এবং ভারতবর্ষকে কাশ্মীর নিয়া সর্বপ্রকারে বেগ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। পাছে চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকা ভারতবর্ষকে কোন সামরিক অস্ত্র সাহায্য দেয়, এজন্য পাকিস্তান সীয়াটো চুক্তি হইতে

● সোয়েকার্নো

...ের হইয়া আসিবার জন্য মাঝে মাঝে ...কি দিতেছে। এই কারণে ভারত-...র প্রতি মার্কিন নীতি কিছুটা ...গ্রস্ত।

তৃতীয়তঃ নতুন মালয়েশিয়া ...ডারেশন গঠিত হইবার পর দক্ষিণ-... এশিয়ায় আর একটি জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। কারণ, ইন্দোনেশিয়া ইহাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংহত রূপ মনে করিয়া নিজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিতেছে। ফিলিপাইনও মালয়েশিয়ার বিরোধিতা করিতেছে। কারণ, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া উভয়েরই মালয়েশিয়ায় কোন কোন দ্বীপ ও অঞ্চলের উপর ভূমিগত দাবী রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার সুয়েকার্নো তো প্রকাশ্যেই একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবেন! অপর পক্ষে মালয়েশিয়ার জবরদস্ত প্রধান মন্ত্রী টেঙ্কু আবদুল রহমানও ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনিও দেখিয়া লইবেন! এদিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন করিতেছে, আমেরিকা ফিলিপাইনের মুরুব্বি সাজিয়াছে আর বৃটেন তো মালয়েশিয়ার গার্জেন আছেনই! অপর পক্ষে ভিয়েৎনামের স্থলপথে ও জলপথে মার্কিন নৌ-বহর ও কামান বন্দুক প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব 'নাটুকে' অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। তবে, এই নাটকের শেষ অঙ্কে কোন্ ভয়াবহ ট্র্যাজিডি ঘটিবে, তাহা কে জানে? হয়তো এশিয়ার এই নতুন বারুদাগারে আবার কোরিয়ার মত আগুন জ্বলিয়া যাইবে এবং পৃথিবী আর একটা মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হইবে।

টেঙ্কু আবদুল রহমান

কথাসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের
ডিকেন্স গ্রন্থাবলী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।
২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি। বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কবিতা

পনেরোই আগষ্ট

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

স্বপ্ন ছিল : তীর্থরজে মুছে দেবে রক্তের অঞ্জলি
সপ্তদশ চক্রবর্তী যৌবনের বাসন্তী-প্রত্যয় ;
দৃষ্টির আসনে থাকবে অনির্বেদ প্রাচুর্য্যে আসীন,
এবং দু'হাতে মুক্তি—ক্লীবের বীতংস ক'রে জয়
উদাত্তে বাজাবে কণ্ঠ, ধ্বনি যার পবিত্র প্রাচীন।
অমৃত সেখানে সত্য—যেখানে অসুর-দেবতার
সমান শরিক তার, দুষ্ট লক্ষ্মী সুদর্শনহারা।
এবং উর্বশী ব্যর্থ, মুদ্রায় অমূর্ত কথাকলি।

অথচ আশ্চর্য তুমি, উদাসীন সন্ন্যাসী তরুণ।
ভগ্নপ্রায় জীর্ণ যষ্টি, কমণ্ডলু সর্ব শূন্যতার ;
হায়-হায় ক্লান্ত চোখে বঞ্চিত আকাশ দেখে মুখ ;
তোমার অস্তিত্বে তুমি অসত্যের মৌন অবতার।
দুর্বিষ্ঠের পূজ্য তুমি ! যারা ছিল একদা উৎসুক
তোমারই সংহার তরে গ্রহণের সমুদ্র-বেলায়,
তারাই পূজারী আজ ! বেহুলার নির্যতি ভেলায়
ভাসে শুধু ভক্তবৃন্দ ; তুমি তাই বিপন্ন, করুণ।

ভক্তের তপস্যা তুমি, অথচ নিষ্ফল কোন্ পাপে!
সপ্তদশ চক্রবর্তী, যৌবনের প্রথম সুন্দর,
এ কোন্ বৈরাগ্যে তুমি নদীকে দিলে না তার চাওয়া—
তুমি যদি সত্যমেব, ভক্ত তবে কেন লখিন্দর ?
হে সন্ন্যাসী যষ্টি তোলো, মুক্ত হোক দক্ষিণের হাওয়া,
সে-হাওয়ায় উড়ে যাক ছিন্নভিন্ন গেরুয়া বসন,
বেহুলা এয়োতি হোক জয় ক'রে তোমারই শরণ।
নতুবা যে ভস্ম হবে ভক্তের অন্তিম অভিশাপে ॥

আর এক সূর্য

দুর্গাদাস সরকার

জ্বলছে আরেক সূর্য আমাদের রক্তের ভেতর।
তারো সপ্তরশ্মি আছে : মৃত্তিকার অঙ্কুরে উত্তাপ
দিয়ে যাবে উর্ধ্বাকাশে : নক্ষত্রের অশান্ত বিলাপ
শুনে' এসে এ-মাটিতে ব্যাপ্ত হবে দিগদিগন্তর।
শতের বছর থেকে আরো কতো হাজার বছর
দীপ্ত র'বে। তবু আজ ন্যাড়া বুকে ক'টা যেন পাপ
রক্তের পিপাসা নিয়ে মাঝরাতে ছড়ায় প্রলাপ।
তবু জানি, স্বাধীন ভারতবর্ষ সবুজ সুন্দর।

স্বর্গের সোনার সিঁড়ি ভেঙে গেছে,—যাক। প্রতিদিন
জীবন-সিঁড়িতে শান্ত আমাদেরি আকুল প্রত্যাশা
এক এক ধাপ ওঠে। মানুষের জন্যে ভালবাসা
পেয়েছে হৃদয়, তাই এই মাটি চির অমলিন।

জ্বলছে আরেক সূর্য আমাদের চেতনাকে ঘিরে।
আমরা যেখানে যাই এখানেই আসি ঘুরে ফিরে ॥

ভারতবর্ষের ভাষাসমস্যা

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ভারতবর্ষের ভাষাসমস্যা যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তা সঙ্গতই। এর সঠিক সমাধানের উপর ভারতের জাতীয় সংহতি খানিকটা নির্ভরশীল। অতএব যথাসম্ভব শীঘ্র এ সমাধান হওয়া অত্যাবশ্যক।

আমাদের সংবিধানে বর্তমানে সরকারী ভাষারূপে চালু ইংরেজী বাদে ১৪টি ভাষা (অহমিয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কান্নাডা, কাশ্মীরী, মালয়ালাম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও উর্দ) স্বীকৃতি পেয়েছে। সংবিধানে এ কথাও আছে যে, আগামী ১৯৬৫ সাল হতে দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী হবে সরকারী ভাষা। ইহা সংবিধান-ভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে এই নিয়ে হয়েছে যথেষ্ট বিরোধিতা। ১৯৬৫ সাল যত নিকটবর্তী হচ্ছে বিরোধিতা তত প্রবল হচ্ছে। কিছুদিন পর্বে লোকসভায় এই মর্মে একটি সংশোধনী পাশ করা হয়েছে যে, হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীও সহযোগী সরকারী ভাষারূপে চলতে থাকবে। এতে সমস্যার সমাধান হয় নি, তা স্থগিত করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু প্রয়োজন আশু সমাধান।

সমস্যা সমাধানের পাঁচটি পথ আছে :—

(১) হিন্দী ভিন্ন অপর একটি ভারতীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা করা।

(২) আপত্তির কারণগুলি দূর করে হিন্দীকেই সরকারী ভাষা করা।

(৩) ইংরেজীকে চিরকালের জন্য সরকারী ভাষা করা।

(৪) একাধিক অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ৫।৬টি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ভাষাকে সরকারী ভাষা করা।

(৫) সংবিধানে স্বীকৃত সব কয়টি ভাষাকে সরকারী ভাষা করা।

এক এক করে সব কয়টিকেই বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌছতে চাই।

(১) সংস্কৃতকে সরকারী ভাষা করা কোন কোন বিশিষ্ট লোকের দাবী। সম্প্রতি এই মর্মে লোকসভায় একজন কংগ্রেস-সদস্য একটি বিলও পেশ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে সংস্কৃতের দান অপরিসীম। অধিকাংশ ভারতীয়ের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত উত্তর ভারতের কয়েকটি ভাষার জননী। তা সত্ত্বেও বলব এ প্রস্তাব অবাস্তব। আজ আর সংস্কৃত কথ্যভাষা নয়। গত একশত বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় উল্লেখ-যোগ্য কোন সাহিত্য বা বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত হয় নি। এককথায় সংস্কৃত আজ প্রায় মৃত ভাষা। সংস্কৃতানু-রাগী হয়েও বলছি—সংস্কৃতকে সরকারী ভাষা করার প্রস্তাব অযৌক্তিক। কেউ কেউ বলেন, ইজরায়েল একটা মৃত হিব্রুভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করল আর আমরা কেন আমাদের দেশে সংস্কৃতকে পুনরায় গৌরবের আসন দিতে পারব না! নানা কারণে ইজরায়েলের উপমা দেওয়া চলে না।

(২) সংবিধানে একবার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এখন এর পরিবর্তন করতে গেলে হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মনে একটা তিক্ততা আনবে। সম্ভবপর হলে এটা যে এড়ান দরকার সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তা নির্ভর করে অনেক পরিমাণে হিন্দী ভাষাভাষীদের উপর। তাদের মন থেকে দুটো জিনিষ দূর করতে হবে :— (ক) হিন্দী ইংরেজীর স্থান অধিকার করবে আর (খ) হিন্দী ভাষাভাষীদের বিশেষ সুবিধা হবে। এই দুই ধারণাই অধিকাংশ হিন্দী ভাষাভাষীদের মনে বদ্ধমূল। ইংরেজী বিজেতার ভাষা। হিন্দী তা নয়। ইংরেজী আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার একটি ভাল মাধ্যম।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ

লেখকবৃন্দ : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

বার্ষিক সদস্য চাঁদা (ডাকব্যয়-সহ) চার টাকা।

বার্ষিক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :

পত্রিকা-সম্পাদক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র : বিভিন্ন পত্রিকা স্টল এবং

পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেড,

১২/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

হিন্দী তা নয়। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যেও হিন্দী সবচেয়ে অগ্রসর নয়। হিন্দীর স্থান পঞ্চম কি ষষ্ঠ। সম্প্রতি সর্বভারতীয় পরীক্ষা ইংরেজী ও হিন্দী এই দুই ভাষায় নেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ মাতৃভাষায় যতটা দক্ষ অন্য ভাষায় ততটা নয়। কাজেই যারা মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবে তাদের সুবিধা হবে বেশি। অর্থাৎ শুধু ইংরেজী কৌলীন্যের বদলে ইংরেজী ও হিন্দী কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার দিকে চলছে। কৌলীন্যপ্রথা কুলীন-অকুলীন উভয়েরই অকল্যাণ সাধন করে। এতে অন্য ভাষাভাষীদের মনে বিরূপ ভাব হওয়া স্বাভাবিক। হয়েছেও তা-ই। কাজেই হওয়া উচিত—সবগুলি স্বীকৃত ভাষায়ই পরীক্ষার ব্যবস্থা। নির্বাচিতহলে অহিন্দী-ভাষীদের হিন্দীভাষায় একটি পরীক্ষা পাশ করা এবং হিন্দীভাষীদের অন্য একটি ভারতীয় ভাষায় পরীক্ষা পাশ করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তাহলে সকলেরই সুবিধা বা অসুবিধা সমান হবে। হিন্দীভাষীদের এরূপ উদার মনোবৃত্তি হলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠত। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখছি না।

(৩) কল্পনার আতিশয্যেও ইংরেজীকে একটি ভারতীয় ভাষা বলা চলে না। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ইংরেজীকে তাদের মাতৃভাষা বলে দাবী করে। তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এত অল্পসংখ্যক যে, তার জন্য কোন ভাষাকে কোন দেশে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তবে ভারতবর্ষে পৌনে দু'শত বৎসরেরও উপর ইংরেজ শাসন চলেছিল। ফলে ইংরেজী ভাষা চালু হয়। কাজেই রাতারাতি ইংরেজী হটান হয়তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইংরেজীকে চিরকাল সরকারী ভাষা-রূপে চালু রাখার প্রস্তাব শুধু ভারতীয় ভাষার প্রতি অবমাননাকর নয়, জাতির পক্ষে অকল্যাণকর। একটি বিদেশী ভাষায় কোনদিন জাতির প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর নয়। ইংরেজীভাষায় সেক্সপীয়র, জার্মানভাষায় গ্যয়টে, বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য আমাদের দেশে আজকাল 'কাল ইংরেজ' হওয়ার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। ইহা সাময়িক ব্যাধি। আর একদল লোক অবশ্য হিন্দীবিদ্বেষবশত ইংরেজীকে চালু রাখবার প্রস্তাব করছেন। বিদ্বেষ মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। তাই দেখছি অনেক বুদ্ধিমান লোকেরও বুদ্ধি-বিভ্রম। ইংরেজীকে চিরস্থায়ী সরকারী ভাষারূপে চালু রাখার অপচেষ্টা যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভাল।

(৪) উত্তর ও দক্ষিণ ভারত মিলিয়ে ৫।৬টি অগ্রসর ভাষাকে সরকারী ভাষা করবার প্রস্তাব হলে প্রবল বিরোধিতা আসবে অন্য ভাষাভাষীদের কাছ থেকে। কাজেই ওরূপ কোন প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা যাবে না।

(৫) এখন একমাত্র বাকী থাকে সবগুলি স্বীকৃত ভাষাকে সরকারী ভাষা করা। তাতে প্রশাসনিক অসুবিধা খানিকটা নেই একথা বলছি না। কিন্তু ভারত সরকার যদি প্রত্যেক ভাষার জন্য ২ জন করে অনুবাদক রাখেন এবং প্রত্যেক স্টেটেও যদি অনুবাদক রাখা হয় তাহলে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। খরচের প্রশ্ন অবশ্য আছে। বৎসরে ২০।২৫ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। এই টাকা খরচ করেও যদি ভারতীয় সংহতি রক্ষা করা যায় তা পরিণামে লাভজনক। আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় সবগুলি ভাষাকে সরকারী ভাষা করাই সর্বোত্তম পন্থা।

সর্বভারতীয় সমস্যার যদি এভাবে সমাধান হয়, তবে যে সব স্টেটে একাধিক ভাষা প্রচলিত আছে তার কি সমাধান হবে তাও বিবেচনা করা দরকার। নতুবা এর মারফতেও গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। অতীতে হয়েছেও। অধিকাংশ স্টেটেই মাত্র এক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মনোবৃত্তি। ভাষাভিত্তিক প্রদেশের অপব্যাখ্যা হতে এর উদ্ভব। এরও একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। ফিনল্যাণ্ডের সুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারি এখানে। সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ ফিনিস ভাষাভাষী আর ১০ ভাগ সুইডিস ভাষাভাষী। দুই ভাষাই সমভাবে স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, সুইডিস ভাষায় কবিতা-লেখক কবি রুনেবার্গ ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় কবি বলে সম্মানিত। আমরা যদি প্রত্যেক প্রদেশে বা স্টেটে শতকরা ১০ জন যে ভাষা বলে সে ভাষাকেও সমভাবে স্বীকৃতি দিই, তাহলে প্রত্যেক প্রদেশেও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার হবে এবং তাদের মনে সন্তুষ্টি আসবে। ভারতবর্ষে ধর্মগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার অবশ্য করণীয়।

এর সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে প্রশ্নও জড়িত। ছাত্রের প্রতিভা যথাযথ বিকাশের জন্য শেষ পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত মাতৃভাষা। কিন্তু আর্থিক কারণে প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এজন্য এক প্রদেশের স্কুলকে প্রয়োজনমত অন্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার অনুমতি দেওয়া সঙ্গত। বাংলা দেশের তামিল স্কুলকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে দেওয়া উচিত। এই প্রকার নিয়ম সব প্রদেশেই প্রযুক্ত হতে হবে। প্রাদেশিক সরকার অবশ্য ভাষা নির্বিশেষে সকল স্কুলকেই সমভাবে সাহায্য দেবে। এরূপ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হলেই ভাষাসমস্যার সমাধান হবে, নতুবা জটিলতা ক্রমেই বাড়বে। এ ব্যাপারে আপত্তি উঠবে এই নিয়মে এক বিশ্ববিদ্যালয় হতে অপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা যাবে কি করে? ভারতবর্ষ হতে জার্মানীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যেতে হয় তখন ত' সে প্রশ্ন করি না। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম যে ভাষা তা শিখে নিতে হবে। তাতে কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ হবে না। একজন ভারতীয়ের পক্ষে অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আর কয়জন ছাত্রই বা বিশ্ববিদ্যালয় বদল করে। তাদের খানিকটা অসুবিধা হবে ধরে নিলেও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তা শিরোধার্য করা উচিত।

আমাদের প্রস্তাব সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষা বা সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রদেশের বা স্টেটের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ লোকের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে যদি তা ১৪টি ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রস্তাব বিপ্লবাত্মক মনে হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরা

চিদানন্দ গোস্বামী

'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভশক্তি হোল দেশীয় রাজ্যগুলো, তাই আগে এই স্তম্ভগুলো চুরমার ক'রে দাও।' —এই মানসিকতা ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছিল ভারতের সবগুলো দেশীয় রাজ্যেই। স্বাধীন ত্রিপুরাও ছিল এমনি দেশীয় রাজ্য। এদেশের শাসন আয়োজন ছিল স্বতন্ত্র। বৃটিশ সরকারকে বার্ষিক করদানের বিনিময়ে এ রাজ্যের রাজা শাসনে, আইন প্রণয়নে, বিচারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কাজেই এ রাজ্যে পরাধীনতার গ্লানি ভোগের কারণ নেই, বিক্ষোভের বা আন্দোলনের কারণ নেই!—রাজতন্ত্রের এমনি ধামাধরা মামুলি জ্ঞানের বাণীতে সন্তুষ্ট হন নি যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকরা। তাই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ত্রিপুরা সমগ্র ভারতের সঙ্গে সমবোধেই ভাবিত হোল। অসুখী ও অস্থির হোল পরাধীন ভারতের মর্মযন্ত্রণায় একই সঙ্গে। মাতৃভূমি ভারতের বন্ধন-দশায় পরশাসনের অসহ অবমাননায় সংগ্রামী হোল ত্রিপুরাও। দু' শতকের বন্ধন থেকে মুক্তির যে সর্বভারতীয় সংগ্রাম তা বিরাট ব্যাপক বিস্তৃত ও গভীর।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মৃত্তিকার রেণুতে জলতরঙ্গে ও বায়ুর ইথারে সেই সংগ্রামের বাণী ছড়িয়ে গেছে। অলিখিত অগণিত ত্যাগের মূল্যে, নির্যাতন, যন্ত্রণা, বঞ্চনা এবং নিশ্চিহ্ণমৃত্যুর মল্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্ত শক্তি কেনা হয়েছে। দাবানল জ্বলেছে যেমন ভারতের উজ্জ্বল অতিখ্যাত নগরে-বন্দরে, তেমনি নাতিখ্যাত ম্লান গণ্ডগ্রামেও সংগ্রামী-তৃষ্ণার একটি ছোট্ট শিখা জ্বলেছে। সাফল্যের ইতিহাসে অনামী সেই অখ্যাত শহর-গ্রামের। অশরীরী হয়েই আছে। ভারতের কয়েক কোটি মানুষ বিধৃত হয়েছে সংগ্রামের একটি মাত্র আদর্শে। মাথার ওপরে ছিল তাদের একটা আকাশ—এক সূর্য, পায়ের নীচে এক অখণ্ড মাটির বিস্তার। এই অদ্বিতীয় আন্তর-আদর্শের গৌর-আলোয় স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও জাগ্রত হোল।

নানা কারণেই ভারতের একটি বিশেষ অঙ্গরাজ্যের গৌরবেও ত্রিপুরা আজ চেনা নাম। অথচ এ নাম মাত্র দু' দশকেরও কম সময় পূর্বে অনেকেরই কাছে অখ্যাত ছিল। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে রাজ্যের ভূমিকা ছিল, দ্বাপরের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে যে রাজ্যের ভূমিকা ছিল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনে ও সাহিত্যে যে রাজ্যের ভমিকা ছিল, সে-ত্রিপুরা একালে ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাষ্ট্রিক-নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রয়োজনে রাজনীতিক দিক থেকেও সহজেই অতিপরিচিত হয়ে গেছে। বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে পৌছোবার পর্বে ত্রিপুরা প্রসঙ্গে ধারণার একটি রেখাচিত্র পেশ করা প্রয়োজন মনে করি। এ রাজ্যের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-প্রান্ত ধরে পূর্বপাকিস্তানের বিস্তার। পর্বাঞ্চলে রয়েছে আসামের সঙ্গে যোগাযোগের শৈলবিস্তৃতি। প্রায় বার লক্ষ লোকের বাস ত্রিপুরার ভৌগোলিক আয়তন হচ্ছে ৪১১৬ বর্গমাইল। ত্রিপুরার স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে, অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত সময়ে লোকসংখ্যার অনুমান নব্বই হাজার প্রায়। বর্তমানে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বার লক্ষ।

কিন্তু সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার আন্দোলনের মূল্য কতটুকুই বা ছিল বা আদৌ ছিল কিনা, এ প্রশ্ন ক্ষুদ্রায়তন ত্রিপুরা সম্বন্ধে যদি জাগে? জাগলে বলব, মাতৃপূজার বিরাট উৎসবের সমারোহ, চাঞ্চল্য ও মুখরতার একান্তে কোনো অন্তরের একটি আত্মনিবেদনের কি কিছু মূল্যই নেই? মূল্য নেই অন্তরের রক্তপদ্মের সনিষ্ঠ সমর্পণের? নির্জন পূজার মূল্য নেই? মিসিসিপি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাঙ্গ কবির জীবনযন্ত্রণার বিলাপ, আত্মবিশ্লেষণ ও শক্তিসঞ্চয়নের মূল্য নেই? ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি ছোট্ট দেশীয় রাজ্য হলেও কয়েক সহস্র মানুষ সে-যুগে আপন আপন সাধ্য নিয়ে দেহমনের সবটুকু শক্তি খরচ করে, আত্মসুখের সর্ব চিন্তা মুলতুবী রেখে মাতৃপূজায় আত্মসমর্পণ করেছিল।

বাংলা ভেঙে দুখান হোল ১৯০৫-এ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথায় এ পর্ব বিশেষ বটে। এর অনেক আগে থেকেই ভারতের সংগ্রাম-প্রস্তুতি চলতে থাকলেও ত্রিপুরার ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজবপন হোল এ সময়েই। 'অনুশীলন' নামে গুপ্তসমিতি এ রাজ্যে প্রথমতম দেশাত্মবোধে দীক্ষিত রাজনীতিক ও সংগ্রামী সংস্থা। সংস্থার মূল ঘাঁটি ঢাকা। ঢাকায় পুলিন দাস ও ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ ছিলেন সর্বাধিনায়ক। অনুশীলনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় যে স্বদেশী চিন্তা ও কর্মের কিছু পরিচয় মেলে তার সঙ্গে উল্লেখ্য নাম হচ্ছে নিশিকান্ত ঘোষ, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন বসু, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়,

মতিলাল   ত্র, যতীন সেন প্রভৃতিরা। বিদ্যালয়ের ছুটিতে ঢাকায় গেলে পুলিন দাসের অনুপ্রেরণায় নিশি ঘোষ আগরতলায় ১৯০৬-এ 'অনুশীলনের' শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।

এই গুপ্তসমিতির কাজ ছিল ব্যায়াম করা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শেখা, সমাজসেবা ইত্যাদি মাত্র। ১৯১০-এ বোমার মামলায় ধরা পড়লেন বারীন ঘোষ। এ উদাহরণ উত্তাপ সঞ্চার করল 'অনুশীলনে'। এ সময় থেকে এই ক্ষুদ্র দলের চিন্তা ও প্রয়াস হোল কেমন করে রিভলবার সংগ্রহ করা যায়, বোম তৈরি করা যায় আর বৃটিশদের উচ্ছেদ করা যায়। তখন ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। প্রধানমন্ত্রী নবদ্বীপ বাহাদুর।

১৯১২ সাল। ১২ই ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করলেন নিশি ঘোষকে। অপরাধ? ত্রিপুরা থেকে ঢাকায় পড়তে যেত, সে সব ছাত্রদের চার-জনকে সুপারিশ-পত্র দেন নিশি ঘোষ, যাতে ঢাকায় অনুশীলনে ওরা কাজ করতে পারে। ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন যামিনী সেন। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নিরাপদ ভেবে রিভলবার, স্বদেশী বই প্রভৃতির সঙ্গে নিশি ঘোষের তেমনি একটি পত্রও থেকে গেছল ম্যাজি-স্ট্রেটের পুত্রের ট্রাঙ্কে। কলেজে পড়তো সেই স্বদেশপ্রেমিক পুত্র। মায়ের কাছে ধরা পড়লো রিভলবার সাফ করতে গিয়ে। অমনি সাফ চলে গেল মা থেকে বাবা, বাবা থেকে শ্রীঘর! নিশি ঘোষও অভিযুক্ত হলেন Preparation of Dacoity-র অভিযোগে।

এক মাস দশ দিন পর মুক্তি পেলেন তিনি, ১৯১৩-এর মে মাসে (লর্ড কারমাইকেল সাহেবের ত্রিপুরায় আসার পর দিন) ১২১ 'ক' ধারায় Conspiring to wage war against the King of England and Emperor of India—অভিযোগে পুনর্বার গ্রেপ্তার হোতে। ত্রিপুরা থেকে পুলিশ-সুপার আনন্দ গুহ বরিশালে গিয়ে এই মোকদ্দমার সাক্ষী হোলেন। বছর দেড়েকের ট্রায়াল। বিভিন্ন সাতটি জেলা থেকে ৩৫ জন জড়িয়েছিলেন এ মামলায়। বৃটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনের অপরাধে ত্রিপুরার নিশি ঘোষ ৪ বছরের কারাদণ্ড ভুগলেন। এ শাস্তির মেয়াদ ছিল আরো বেশি। কিন্তু লর্ড কারমাইকেল সাহেবের

● ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্বের নায়ক নিশিকান্ত ঘোষ। বর্তমান বয়স ৭৩ বৎসর।

সঙ্গে গোপন চুক্তি অনুসারে শাস্তির মেয়াদ কমল সবারই, শুধু অধীনতার স্বীকৃতি দানের সর্তে। মুক্তির পরের আদেশটি ছিল—'You shall not reside and remain in the limits of Bengal.' প্রথমে ঠিক হোল হরিদ্বারে যাবার, তারপরে ঠিক হোল ত্রিপুরায় (ত্রিপুরা রাজনীতিক অর্থে বাংলার বাইরে)। প্রায় ১৯১৮-১৯-এ সংগ্রামী শ্রীঘোষ ফিরলেন ত্রিপুরায়।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতা আন্দোলনের এটিকে প্রথম পর্ব বলা যায়। এ পর্বেই প্রায় সমান্তরালভাবে ত্রিপুরায় আরো একটি বিপ্লবী সংস্থার উদয় হয়েছিল। 'যুগান্তর' নাম। সনৎ দত্ত, হররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরেশ মজুমদার প্রমুখরা ছিলেন এর সভ্য।

ইতিমধ্যে এ আন্দোলনের একটি নতুন পর্বের জন্মলগ্নের সূচনা দেখা দিচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গ, সর্বভারতীয় সংগ্রাম, বারীন ঘোষের মামলা, 'অনুশীলনে'র ত্রিপুরায় ভূমিকা এবং রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মানসিকতার সৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে বিদ্যালয়ের একটি তরুণমনে স্বপ্ন দেখছিল সংগ্রামের, স্বাধীন ভারতের। ছোট্ট রাজ্য, কিন্তু অনন্ত ছিল, বিরাট ছিল সে-তরুণের মনোবল। ত্রিপুরার ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতি লঙ্ঘন করে কেরপূজার রাত্রে যার জন্ম। নাম তার শচীন্দ্রলাল সিংহ। বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে ঝাঁপ দিলেন একটা চ্যানেল ক্রশ করবেন বলে। স্বপ্নের সঙ্গে মিশল সাধনা।

১৯২১-এ নিলেন তিনি আন্দোলনের ভূমিকা। 'অনুশীলন' এবং 'যুগান্তরে'র দুটো ধারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্ম-নিরীক্ষণ করলেন একবার। যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস মানুষের সর্ব-সাফল্যের কবচকুণ্ডল, তা নিয়ে তিনি আপন বিশ্বাসে ও আদর্শে আন্দোলনে উদ্যোগী হলেন। বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও আত্মশক্তিতে সনিষ্ঠ এই উদ্যোগ থেকে হোল জন্ম 'ছাত্র সংঘের' ১৯২৬-এ। সেবাশুশ্রূষা, ব্যায়ামচর্চা, স্বেচ্ছাসেবক দল ও বয়স্কাউট দল সংগঠন এবং তারও আগে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজের মধ্যে ছাত্রসংঘ মানসিক প্রস্তুতি নিল। এবং 'ছাত্র সংঘের' ক্রমপরিণতি 'ভ্রাতৃসংঘ' মাত্র দু' বছরেই।

শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে যাঁরা সম-আদর্শে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হোয়ে ভ্রাতৃসংঘে সভ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উমেশলাল সিংহ, হরি-গঙ্গা বসাক, তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত,

নীলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কালীকুমার দে, সুকুমার ভৌমিক, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, অসিত ভট্টাচার্য, বীরেন দত্ত, সুখময় সেনগুপ্ত, অনন্ত দে প্রমুখদের নাম উল্লেখ্য। অজ্ঞাত আরো অনেক সভ্য এ সংঘকে সমৃদ্ধ করেছিল। নানা দেশে ব্যায়াম দেখানো এবং এ সুযোগেই সংগঠন করা ছিল সংস্থার অন্যতম কাজ। চিটাগাং, হবিগঞ্জ প্রভৃতি জায়গাতেও এরা সংগঠন করেছিল। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, 'ছাত্রসংঘের' সহজ পরিণতি 'ব্রাতৃসংঘ' নয়। ছাত্রসংঘের কেউ কেউ চেয়েছিল একে একটি ননপলিটিক্যাল সংস্থা রূপে রাখতে। এখানেই সিংহের সঙ্গে বিরোধ। এ বিরোধেরই ফল 'ব্রাতৃসংঘ'। 'ব্রাতৃসংঘে' থেকেই সিংহ ১৯৩২-এ গেলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জেলে। মাত্র এক বছর কারাবাসের মূল্যে খরিদ হোল মনোবল ও সংগ্রামীশক্তি।

এর কিছু পূর্বে এ রাজ্যে অনুশীলন ফের সরব হোয়ে উঠল যেন। মতানৈক্যের ফলে শ্রীসিংহের 'ব্রাতৃসংঘ' ছেড়ে বীরেন দত্ত, অসিত ভট্টাচার্য, অনন্ত দে প্রমুখ কয়েকজন অনুশীলনে যোগদান করলেন। অনুশীলন অসিত ভট্টাচার্যকে প্রভাবিত করল। ১৯৩০-এ মেদিনীপুরের কণ্টাই সাব-ডিভিশানে চলছিল সত্যাগ্রহ—লবণ আন্দোলন। অসিত ভট্টাচার্য তখন রাঁচীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। খবরের কাগজের পাতায় গান্ধীজীর আহ্বানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করে ত্রিপুরার অসিত ভট্টাচার্য ও পার্বতীবাবু (ব্রাতৃসংঘ) ছুটে গেলেন মেদিনীপুরের সাগর পারে। সুরু হোল সাগর থেকে মাটির হাঁড়িতে লবণ তৈরি। এই সংগ্রামের হাই-কম্যাণ্ড ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের শচীন্দ্র মাইতি, সতীশ জানা, সতীশ দাসগুপ্ত, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল, হুগলীর গৌরহরি সোম, সিরাজুল হক, হামিদুল হক প্রভৃতি। এঁদের নায়কত্বে কণ্টাই সাব-ডিভিশানের কালিনগর, মীরজাপুর, পিছাবনী, সমুদ্রপুর, তাকিয়া গ্রামে সংগঠন সুরু হোল। সুরু হোল সূর্যোদয় থেকে লবণ তৈরি—যে পর্যন্ত না বৃটিশ সৈন্যের বেয়নেট চার্জ হয়। শ্রীভট্টাচার্যের উপবীত ছিঁড়ে ফেলে উলঙ্গ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দেয়া হোল। দৈনিক বসুমতী আর আনন্দবাজারের সমকালীন সংখ্যায় সে-ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। ছ'মাস এই কর্ম আর তারপর ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড হোল তাঁর কণ্টাই জেলে।

● শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ

ত্রিপুরায় ফিরলেন তিনি ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী প্রায়। প্রত্যাবর্তনান্তে 'অনুশীলন' আর ব্রাতৃসংঘের দ্বিধাবিভক্ত আবর্তে পড়লেন অসিতবাবু। কারমাইকেল সাহেবের ব্রীজের পশ্চিমে হুগলী নদীর পারে মহাশ্মশানের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে শচীন্দ্রলাল সিংহ সারারাত 'পথের দাবী' (বঙ্গবাণীতে মুদ্রিত) ব্যাখ্যা করে পাঠ করেন ব্রাতৃসংঘের সভ্যদের কাছে। অসিত ভট্টাচার্য অনপ্রাণিত হোলেন ব্রাতৃসংঘের আদর্শে। অন্ধকার আকাশের নীচে মহাশ্মশানের হরিবোল কাঁপা বাতাসে সে-রাতের দৃশ্য আজো রক্তে শিহরণের চমক আনে। কিন্তু 'অনুশীলনের' বিপ্লবীরা শ্রীভট্টাচার্যকে প্রভাবিত করলেন। তাছাড়া ধনাঢ্য অমর ভট্টাচার্যের পোষ্যপুত্র অসিত ভট্টাচার্যের সাহায্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয় ছিল। বীরেন দত্ত, দেবপ্রসাদ সেন, অনন্ত দে, প্রভাত রায়, ধীরু দত্ত, প্রেমাংশু চৌধুরী, জিতু দত্ত, নলিনী সেনগুপ্ত, মুকুল মিত্ররা অসিত ভট্টাচার্যকে অনুশীলনে নিলেন। ১৯৩২-এ ত্রিপুরা রাজ্যে ইতিহাসখ্যাত ডাকাতি ঘটল শ্রীঅমর ভট্টাচার্যের দোকানে অসিত ভট্টাচার্যের যোগসাজসেই। তেরো হাজার নগদ অর্থ এবং পনেরো সের স্বর্ণালঙ্কার (বন্ধকী সোনা দোকানে গচ্ছিত ছিল) অনুশীলনের ভাণ্ডারে স্থান পেল। ত্রিপুরা রাজ্যে হুলুস্থূল পড়ল। পুলিশ বেষ্টনীতে রইল দোকান। গিরীশ ভুইঞা ধরলেন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, শচীন দত্ত ও পবিত্রবাবুকে। কিন্তু মাল পাচার। কিছুদিন পরে শ্রীভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রীর ১০০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারও দান করলেন অনুশীলনে। স্বদেশী গ্রন্থ পাঠ, নৈতিক চরিত্র রচনা, ব্রহ্মচর্য পালন, বোম তৈরি ইত্যাদি কাজের মধ্যে অনুশীলন ব্যাপৃত হোল।

কিছুদিনের মধ্যেই এর সভ্যরা মহারাজার মিলিটারী ব্যারাক থেকে অস্ত্র স্মাগ্লিং করলেন। এই স্মাগলিং-এর পর অস্ত্রাগারের ভার পড়ে ক্যাপটেন নগেন্দ্র দেববর্মার ওপর। কিন্তু মাহারাজা বীর বিক্রম তাঁকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মহারাজ বললেন তাঁকে, 'তোমার নামেও দাগ আছে, আমি সাবধান করে দিচ্ছি তাই।' কিন্তু ডাকাতিটির কিছুকালের মধ্যেই অনুশীলনের কর্মাদর্শে প্রাক্-চাঞ্চল্যের অভাব দেখা দিল। বেগে ও আবেগে 'ব্রাতৃসংঘ' সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সুপরিকল্পিত কর্মের মাধ্যমে। সে-কারণে 'অনুশীলন' এখানে 'মিলন প্রতিষ্ঠান' নাম রচনা করে নতুন ক্লাব গড়লেন। এবং বীরেন দত্ত, বংশীঠাকুর, প্রভাত রায়, দশরথ

দেবধর্মা প্রমুখ ক'জন অনুশীলন থেকে সরে গিয়ে ১৯৩৮ (?)-এ 'জনমঙ্গল' নামে নতুন সংস্থা করলেন। এঁরা ট্রাইবেলদের মধ্যে গণশিক্ষার আন্দোলন করতে সুরু করেন। মত ও পথে 'ভ্রাতৃসংঘের' সঙ্গে এঁদের পার্থক্য বিপুল হোল।

স্বদেশী আন্দোলনে এ রাজ্যের ভূমিকার ইতিকথা আলোচনায় আরেকটি সংস্থার উল্লেখ অনিবার্য। এ সংস্থা প্রত্যক্ষ কর্মান্দোলনে নামে নি ; কিন্তু মানসিকতায় এ সংস্থা পরাধীনতার নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলার সাধনা করছিল। বস্তুত সে সময়টা যেখানেই কয়েকজন মিলিত হোত, সেখানেই খেলাধূলা, ব্যায়াম, নাটক ইত্যাদির মাধ্যম নিয়েও বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহ-মানস রচনা হোয়ে যেত। তাই নাটক করা, গুপ্ত সভা করা ইত্যাদির মাধ্যমে 'তরুণ সংঘ' ভাবত কি করে বৃটিশ-শাসনের মূলোচ্ছেদ করা যায়। বৃহত্তর ভারতের বৃহৎ শক্তির আন্দোলনের পাশাপাশি এই 'তরুণ সংঘের' অত্যল্প শক্তির ক্ষীণ প্রকাশ উল্লেখ্য নয়। কিন্তু, তথাপিও উল্লেখ্য এই যে, আদর্শের একই সূর্যের নীচে এদের অবস্থান। ক্ষুদ্র হলেও, অল্প শক্তির হলেও। 'তরুণ সংঘে' যাঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে প্রমথেশ দাসগুপ্ত, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচাঁদ গোস্বামী, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সলু গুপ্ত, নরেশ ভট্টাচার্য প্রমুখরা উল্লেখ্য। এ রাজ্যে 'শ্রীপাট' ছিল বিশেষ সম্মানী বাড়ি। এবং সর্বসাধারণের প্রবেশ সহজ ছিল না এ বাড়িতে। তাই স্বদেশী-আন্দোলনের বহু বিপ্লবীকর্মী, যাঁরা পুলিশের শিকার হয়ে লুকোচুরি খেলেছেন 'শ্রীপাটে' নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিতে পেরেছেন তাঁরা। তৎ-কালীন পুলিশ দারোগা রোহিণী ভট্টাচার্য, অনাথ চৌধুরী প্রভৃতিরাও গোপনে 'তরুণ সংঘের' কার্যাবলীর সহায়ক ছিলেন।

● শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত।

ত্রিপুরার স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি নতুন পর্বের স্রোত বইছিল 'ভ্রাতৃসংঘের' মাধ্যমে। 'ভ্রাতৃসংঘ' অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য, কর্মপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করল। নায়কত্ব নিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ। ১৯৩২-এ জেলে গিয়ে ১৯৩৩-এ ফিরলেন তিনি। তারপর উল্লেখ্য অধ্যায় ১৯৩৩-এ সিংহের নেতৃত্বে সুরু হল প্রজা আন্দোলন। নানাদিক থেকে ১৯৩৬-এর কাল এই ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বৃটিশ সম্রাটের অনুগত দেশীয় রাজার শাসনের প্রথম নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলার পরিকল্পনায় মহারাজা বীর বিক্রমের সঙ্গে বিরোধ বাধল জননায়ক সিংহের। ১৪ দফা সর্ত পেশ করলেন তিনি।

১। পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠন, ২। কৃষকের জমি বিনা ক্ষতিপূরণে নেয়া যাবে না, ৩। কৃষক উচ্ছেদ চলবে না, ৪। তুই-তুং প্রথার (Force Labour) অবসান চাই, ৫। তাওকর (বৃটিশ চাকলার যে প্রজারা আদেশ নিয়ে এ রাজ্যে প্রবেশ করে গাছ কাঠত, ছার কর) রহিত হোক, ৬। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হোক, ৭। হায়জন শিক্ষা চালু কর, ৮। অস্পৃশ্যতা দূর কর, ৯। কৃষককে হাল তৈরি, ঘর তৈরি ও জ্বালানীর জন্য বিনা পারমিটে ছন বাঁশ কাঠ কাটতে দেয়া হোক, ১০। ভূমিহীনকে জমি দিতে হবে, ১১। নাগরিকত্বের জন্য ২০ বৎসরের স্থলে ১২ বৎসর বাসের অধিকার যথেষ্ট করা হোক, ১২। জুমিয়া পুনর্বাসন চাই, ১৩। বকেয়া খাজনা মাফ চাই, ১৪। চাকলা রোশনা-বাদের প্রজাদের বকেয়া খাজনা মাফ চাই—এই চোদ্দ দফা সর্ত পেশ করা হোল।

গণ-আন্দোলনের স্রোতে রাজ্যময় উদ্বেল। মিছিল, হরতাল, পিকেটিং, স্লোগান, সভা, পাহাড়াঞ্চলে হানা, বক্তৃতা—নতুন জীবনবোধের পূজারী মুক্তিকামী স্বদেশীদের আন্দোলন সুরু হোল। এ সময় 'All India States People Movement.' সুরু হয়ে গেল সারা ভারতে। প্রথমে জয়নারায়ণ ব্যাস এবং পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এর সভাপতি হন। শ্রীসিংহ নেহরু এবং কংগ্রেসের সংস্পর্শে এসে গেলেন। নেহরুর এই Movement-এরই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় প্রথম সম্মেলন আহ্বান করলেন শ্রীসিংহ ১৯৩৬-এ। এই সম্মেলন থেকেই জন্ম নিল 'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ' (১৯৩৬)। সভাপতি হলেন মুন্সী আবদুল ওয়াহেদ। আর এ বছরেই জন্ম হোয়ে গেল এখানে 'ত্রিপুরা রাজ্য স্টেট কংগ্রেসের'। প্রথমতম সভাপতি হবেন উমেশলাল সিংহ। 'ভ্রাতৃসংঘে'র নায়কদের অক্লান্ত উদ্যোগে ও পরিশ্রমে ইতিমধ্যে অনেক বিবর্তন-পরিবর্তনের পথ ধরে অনেক কাজ এগোল। অনেক আত্মবিশ্বাস গড়া হোল, আদর্শ ও লক্ষ্য অনেক স্বচ্ছ হোল, মানস সংগঠন দৃঢ় হোল, কর্মপন্থা সহজ ও সবল হোল। ইতি-মধ্যে ১৪ দফা সর্তের উত্তরে মহারাজা বকেয়া খাজনা মাত্র মাফ করতে

চাইলেন। এবং Communal Basis-এ প্রতিনিধিও নিতে চাইলেন শাসনপরিষদে। কিন্তু শ্রীসিংহ তা বয়কট করলেন। ১৯৩৭-এ মহারাজা ডাকলেন প্রজা কনফারেন্স। কনফারেন্সের দিন সকালে সদলে শ্রীসিংহ গ্রেপ্তার হোলেন। সঙ্গে রইলেন হরিগঙ্গা বসাক, উমেশ সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, নীরোদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নীলু মুখার্জি, নরেশ চ্যাটার্জি প্রমুখ সারকেরা। ত্রিপুরার বীর সাহসী সেনা হরিগঙ্গা বসাক, সুখময় সেনগুপ্ত প্রমুখদের অন্তরে তখন সংগ্রামের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। গ্রেপ্তার হয়ে এঁরা কারাবরণ করলেন এবং ১৯৩৮-এ ত্রিপুরা জেলা থেকে বহিষ্কার। সিংহ-সম্প্রদায় আসামে গেলেন। সেখান থেকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বহিষ্কার। তাই আসাম থেকে ঢাকা। ফরিদপুর। যশোহর। সেখানে গ্রেপ্তার। বন্দী হয়ে ত্রিপুরা জেলে প্রত্যাবর্তন করলেন এঁরা। বন্ধনদশা আর ক্ষণমুক্তির মধ্য দিয়ে অপরিমিত সংগ্রামীশক্তির সাধনা করে চললেন শচীন্দ্রলাল, সুখময়রা। অন্যদিকে প্রজা-আন্দোলনের অপরাধে গয়াপ্রসাদ ত্রিবেদীর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন মহারাজা। ১৯৪০-এ পুনর্বার কারাবরণ করলেন শচীন্দ্রবাবুরা। মহাযুদ্ধে বৃটিশ সম্রাটকে দেশীয় রাজার সাহায্যের কঠোর প্রতিবাদেই বন্দী হয়েছিলেন এবার। 'এ লড়াইমে এক পয়সা আওর এক আদমী দেনা হারাম হ্যায়।'—'Not a man, not a pie',—স্লোগান তুলেছিলেন সিংহ সদলবলে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকলেন এঁরা।

১৯৪৩ এল। দেখা দিল রিয়াং বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের মন্ত্র ছিল 'Not a man not a pie' নায়ক ছিলেন পাহাড়ের বিদ্রোহী সর্দার রতনমুনি এবং তছলম ফা। ধরা পড়লেন নেতৃদ্বয়। মহারাজের প্রহারে মৃত্যু বরণ করলেন রতনমুনি। তবু দেশপ্রেমের আদর্শ ত্যাগ করে যান নি। তছলম ফা ও বিদ্রোহী রিয়াংরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

এদিকে ত্রিপুরার জেলে বসে তখন সিংহবৃথ দেখছিলেন কেমন ক'রে অরণ্যে পর্বতেও সংগ্রামী চেতনা, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় এবং দেশাত্মবোধের দাবানল জ্বলছে। দেশাত্মবোধের সাধনার সমান্তরালে সুখময় সেনগুপ্ত জেলে বসে বি-এ পড়তে লাগলেন। ত্রিপুরা সেণ্ট্রাল জেলে প্রহরারত 2nd Tripura Rifles-এর সৈনিকদের ক্ষণিক সন্দর্শনের সুযোগ পেয়েই শচীন্দ্রলাল সুখময় উমেশলাল বোঝাতেন—'এ যুদ্ধে তোমরা যেও না। বৃটিশ আমাদের শত্রু। তাঁদের পক্ষে সাহায্য করতে যাওয়া আমাদের দেশদ্রোহিতা। মিছিমিছি শত্রুর জন্যে প্রাণ দিতে যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদে তোমরা যেও না; বরং দেশের জন্য কাজ করো, আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও।'

কারাবাসের এ চক্রান্তে সিংহের সঙ্গে নীরোদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নীলু মুখার্জিরাও ছিলেন। পরদিন এলেন

● রিয়াং বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বর্তমানে ত্রিপুরার উপমন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী (তছলম্ ফা)।

একজন আমেরিকান এবং একজন ইংরেজ সেনানায়ক। এসেই প্রশ্ন সাহেবের—'শ্রীসিংহ কোথায়?'

উত্তর—'আমি এখানে মশায়।'

'সৈনিকদের যুদ্ধে না যেতে পরামর্শ দিয়েছ তুমি? উস্কানী দিয়েছ?'

উত্তর—'আমি তো কারাগারে। কারাগার থেকে কি করে সম্ভব তা?'

প্রশ্ন—'জানো, তোমাকে মেরে ফেলতে পারি?'

সিংহের উত্তর—'এ পুরাতন জ্ঞান! এ আমি জানি, এবং গোটা দেশটাও জানে যে তোমরা রাজবন্দীদের মেরে ফেলতে পটু। এবং আমি সে-অবস্থার সম্মুখীন হ'তে সর্বদা রাজী।' সিংহকে পাঠানো হোল মৈমনসিংহ জেলে। সেখানেও আগ্নেয়মন আগুন ছড়ালো প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যে। যেদিন শচীন্দ্রলাল সিংহ মৈমনসিংহে গেলেন, তার পরদিনই সম-অভিযোগে উমেশ সিংহ, হরিগঙ্গা বসাক, সুখময় সেনগুপ্তের দলকেও মৈমনসিংহ জেলে নেয়া হোল। নীলু মুখার্জিকে ঢাকায় পাঠানো হোল। নীরোদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যও গেলেন ঢাকা জেলে প্রথমত। তারপর প্রেসিডেন্সী জেল। লাহোর জেল। লাহোর জেল থেকে পরবর্তীকালে নীরোদকৃষ্ণের আর কোনো খবর নেই। এ রহস্য অপরিমিত দুঃখের!

১৯৪০-এর পর থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ত্রিপুরার প্রায় সকল জননায়কই অন্তরীণ অবস্থায় কাটালেন। তাই ত্রিপুরায় প্রত্যক্ষ আন্দোলন আর কিছু চলল না এ পর্বে বড় একটা। শুধু অগ্নি-নায়কদের আদর্শের উত্তাপ ছড়িয়ে রইল ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে মাটিতে।

অনেক কারাবরণ, অনেক দুঃখবরণ, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন আর অনেক মৃত্যুবরণের রক্তরাঙা পথে স্বাধীনতার মহারথ এসে পৌঁছল ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষে। ভারতের অগণিত নর-নারীর জয় ঘোষিত হোল বিশ্বময়। ভারতের কোটিকণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ত্রিপুরা উচ্চারণ করল—'বন্দে মাতরম', 'জয়হিন্দ'! স্বাধীনতা লাভের বছর দুইয়ের মধ্যেই ত্রিপুরার উদার ও দূরদর্শী মহারাজা দেশীয় রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারত য়ুনিয়নে যোগদান করলেন। ১৯৪৭-এ ত্রিপুরা স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি হলেন ত্রিপুরার অধুনাকালের মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরার জনপ্রিয় নায়ক শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ।

স্বরাজ-সাধনার রূপান্তর

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে মুদ্রিত একটি চিরস্মরণীয় দিবস, জাতির জীবনে পুণ্যাহের আনন্দে সগৌরবে পালনীয়।

সংগ্রামের পথে যাত্রারম্ভে আমাদের সম্মুখে ছিল দুস্তর বাধা, সঙ্কট-সমাকীর্ণ সে যাত্রায় আমাদের পাথেয় ছিল হৃদয়ের আবেগ ও উন্মাদনা, আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা ছিল অপ্রমেয়, দুর্জয় সাহসের সঙ্গে ছিল কঠোর সঙ্কল্প—আর সর্বোপরি ছিল আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। সে আদর্শ কালে কালে বদলেছে। একদিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মৃত্যুভয়হীন অভয়ব্রতীর দল, অন্যদিকে ছিল আইনানুগ আন্দোলনকারী—কনস্টিটিউশনাল এজিটেটরস্।

অর্ধ শতাব্দীর বেশি কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যেও এসেছে নরম-গরম দলের কর্মকাণ্ড নিয়ে মতবিরোধ। বৃটিশের করুণার প্রতি আস্থা এবং বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি অপ্রত্যক্ষ অনুরাগে চলতে লাগল আবেদন-নিবেদনের পালা। সে পালা শেষ করে দিলেন বিপ্লবী কংগ্রেসের নেতৃবর্গ লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল। অরবিন্দ ঘোষের অগ্নিসাধনায় দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার মন্ত্রগুপ্তিতে অনুপ্রাণিত বিপ্লবীদলের কাজ চলতে লাগল লোকচক্ষুর অন্তরালে—বিপ্লবী বাংলার প্রথম পদক্ষেপ দেখলাম—আলিপুরের বোমার মামলায়। সেতো ইতিহাসের কথা। ভগ্নী নিবেদিতার সাহায্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন বিপ্লবীদের গুরু অরবিন্দ ঘোষ, সেই ইতিহাসের মূল সূত্রটি হাতে তুলে নিলেন যতীন্দ্র মুখার্জী (বাঘা যতীন) কেই বা না জানে সে সব রোমঞ্চকর কাহিনী।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের মানসলোকে গান্ধীজী নিয়ে এলেন নূতন স্বপ্ন, নূতন সাধনার চিন্তাধারা—অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান এল। সমগ্র ভারতবর্ষ নূতন ভাবধারায় নূতন আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। আমাদের জীবনে আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ সাধনায় সর্বস্ব ত্যাগের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর অমিত শক্তি ও অসামান্য প্রভাবে

● বালগঙ্গাধর তিলক

আকৃষ্ট হয়ে এলেন বিপ্লবী বাংলার নেতৃবর্গ—এই সুবর্ণ যুগেই আমরা পেয়েছিলাম আর একজন ত্যাগের আদর্শে উদ্দীপ্ত যৌবনশক্তির প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে—আসা মাত্রই তিনি জয় করে নিলেন দেশের মন।

কংগ্রেসের মধ্যে তখনও দুটি বিরুদ্ধমত প্রবল হয়ে উঠেছে—বিধান-সভায় প্রবেশের প্রশ্নে। সেদিনের 'চেঞ্জার' ও 'নো-চেঞ্জারের' মধ্যে বিরোধকে তুচ্ছ করে জয়ী হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তিনি প্রবেশ করলেন বিধান সভায়। তাঁর তখনকার অকাট্য যুক্তিতে যাঁরা কর্ণপাত করে নি, আজ স্বাধীন ভারতে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা সে যুক্তির তাৎপর্যই শুধু নয়, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলভোগও করছেন।

বৃটিশ সরকারকে চরমপত্র দিতে কংগ্রেসকে রাজী করতে না পারায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছাড়লেন, কিন্তু ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সেই চরমপত্রেরই নামান্তর মাত্র। তবে ভারতের ভাগ্যবিধাতা সেদিন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। জাপানে আত্মনির্বাসিত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনলস প্রস্তুতি এবং পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব শৌর্য ও বীর্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরাই সে হাসির তাৎপর্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাবহুল দিনগুলিতে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

১৮৫৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ করে এসেছে। মুষ্টিমেয় হলেও মানুষ নিঃসংশয়ে প্রাণ দিয়েছে, দ্বিধাহীনচিত্তে নির্যাতন সহ্য করেছে। অপমানে অবিচারে অত্যাচারে তারা সঙ্কল্প থেকে বিন্দুমাত্র টলে নি—তারা হেলায় কারাবরণ করেছে, অন্তরীণে নিঃসঙ্গ জীবনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছে। কেউ কেউ হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু জন্মভূমির মুক্তি সাধনের কথা কি মৃত হয় নি—অবিরাম

● মহাত্মা গান্ধী

চলেছে ঘরের ও পরের শত্রুর সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম; দারিদ্র্যে দুঃখে মর্মান্তিক যাতনায় সঙ্কল্প হয়েছে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর; নির্ভয়ে উদ্যত অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছে—"বন্দেমাতরম।"

তাঁদের কথা আজ স্মরণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের দুশ্চর তপস্যা ও দুর্গম পথপরিক্রমার পটভূমি যাঁরা প্রস্তুত করে মরণজয়ী জীবনকে স্বদেশের যজ্ঞানলে আহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ স্মরণ করার দিন। ব্যক্তি বিচারে নয়, কৃতকর্মের

● শ্রীঅরবিন্দ

সফলতার বিচারে আজ হয়ত সকলের কথা মনে করতে পারব না, কিন্তু কার না মনে পড়বে—তাঁদের নাম—কে না অনুভব করবে সেই শত-সহস্র শহীদের উৎফুল্ল আত্মার আবির্ভাব।

কিন্তু শহীদ-স্মরণেই তো আমাদের কর্তব্যের শেষ হবে না। এখনো আমাদের যাত্রা শেষ হয় নি—এখনো সম্মুখে দীর্ঘপথ—সে পথ শত্রুর চক্রান্তে দুর্গম নয়, অত্যাচারীর গোপন অস্ত্রও সেখানে উদ্যত হয়ে বাধার সৃষ্টি করবে না। এতকাল দুশ্চর তপস্যার ফলে যে শক্তি অর্জন করেছি—সেই শক্তির দুর্বার গতিতে সকল বাধা অপসৃত হবে, সেই শক্তিতে আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টির সাধনা, নব ভারত সংগঠনের কঠোর সাধনা। সেই সাধনাকে মহত্তর করবে আমাদের মানুষকে বড় করার সঙ্কল্প—সেই সঙ্গে হবে দেশকে বিশ্বমানবের মঙ্গল সাধনার কর্মে বিপুল চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার শুভবুদ্ধির জাগরণ।

কারণ আমাদের স্বরাজ-সাধনার রূপান্তর ঘটেছে। একটি প্রচণ্ড কল্যাণ-ধর্মী পরিবর্তন আসন্ন। ঠিক এই উপযুক্ত সময়ে "সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকার গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ. সেই পথের বাধা অতিক্রম করিবার মতো পাথেয় এবং উপায় ভারতের সংগ্রামী কার্যক্রমের মধ্যেও নির্দিষ্ট হইয়া আছে।" তার মধ্যে সাময়িক উৎসাহ, উৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস ও আবেগ নেই, আছে উদ্দীপনা ও অনুরাগ; সেখানে আশু লাভের অবিলম্ব সম্ভাবনা নেই; আছে বৃহৎ লাভের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি—শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, কিন্তু সমষ্টির জন্য। একটি বৃহৎ সমাজের মহান অভ্যুদয়ের জন্য আজিকার এই সংগ্রামের আহ্বান সমগ্র দেশের কাছে। জাতিবৈষম্য, শ্রেণী-বিভেদ, অর্থ ও মর্যাদার তারতম্য দূরীভূত করে সর্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যে একটি বিপুল ঐক্য ও সহমর্মিতা

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিষ্ঠাই এই সংগ্রামের লক্ষ্য; কল্যাণকে সর্বতোমুখী ও সর্বজন-লভ্য করার জন্যই আজ রাষ্ট্রের সংগ্রাম—দেশবাসীর সংগ্রাম। আদর্শ এক, লক্ষ্য এক, কর্মপন্থা এক, পথ ও পাথেয় এক।

সেকালের হিংসাত্মক বিপ্লব, পরবর্তীযুগে অর্থাৎ গান্ধীযুগে অহিংসাত্মক কর্মধারা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বৈপ্লবিক গঠনমূলক কার্যক্রম যা আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনাকে রূপায়িত করে চলেছে—

● দেশবন্ধু

এ সকলের মধ্যেই জাতির ব্যাপক ও বিস্তৃত সংগ্রামের নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে আমাদের বৈপ্লবিক-সংগ্রাম ছিল এক এবং অনন্য শত্রুর বিরুদ্ধে। তার শাসনযন্ত্র বিকল ও বিনষ্ট করার যে সংগ্রাম কালে কালে নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছিল, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তার চাইতে আজকের স্বাধীন ভারতের সংগ্রাম যেমন কঠোর তেমনি তার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির প্রয়োজন পঁয়তাল্লিশ কোটি নরনারীর মধ্যে—জাতির নবজীবন সংগঠনে। সে সংগ্রাম অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বহু কষ্টসাধ্য, কিন্তু তাতে রক্তক্ষয় নেই, জীবনের অবক্ষয় নেই—শক্তির অপব্যবহারের উপায় নেই, নেই কোনো ব্যক্তিস্বার্থের প্রলোভন। দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম, দীনতা-হীনতা-তুচ্ছতার সঙ্গে সংগ্রাম, জাতীয় চরিত্রের বিচ্যুতি ও অবনতির সঙ্গে সংগ্রাম, দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম-আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে আত্মতুষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম, স্বদেশী-স্বজনের বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম, দেশবৈরিতার সঙ্গে সংগ্রাম, সর্বোপরি আত্মিকশক্তি লাভের জন্য আত্মসমীক্ষার সংগ্রাম।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণীয়—'জগতের যে সমস্ত বৃহৎ ক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে—সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব, যে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব, তাহা হইলে সমগ্র দেশের যে আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহা যথাযথভাবে সফল করিতে

আজ রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে নির্বিশেষ আত্মসমর্পণ করতে বলে না, বলে—"এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তাহলেই সার্থক হবে আমাদের উদ্যোগ। আজ তোমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা করো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে চেষ্টা করছি। কেন না তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবী আছে।"

আজ ভারত পরশাসন থেকে বিমুক্ত, পরবশ্যতার গ্লানি আর তাকে দুর্বল করতে পারবে না। কিন্তু তবুও আমাদের দৈন্য আছে, দুর্বলতা আছে, আছে আত্ম-অবমাননায় জাতিসত্তার অবক্ষয়। এ সমস্তই ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে যদি আমরা আমাদের জনশক্তির মহামূল্য সম্বলকে ঐক্য ও সংহতিকে আশ্রয় ক'রে দেশের কাজে লাগাতে পারি। এ ছাড়া দেশকে বড় করার অন্য পন্থা নেই। আজ "দেশের জন্য চাই ত্যাগের ভিক্ষা।"

১৯২৬ সালের একটি বিশেষ দিনে পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।"

আজ ভারতরাষ্ট্র সেই ভিক্ষাই চাইছেন—দারিদ্র্যের মাঝখানে, নৈরাশ্য ও অবসাদের মাঝখানে, দেশের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও মনুষ্যত্বের অবমাননার মাঝখানে আত্মপ্রতারণা ও হীনমন্যতার মাঝখানে।

জাতীয় জীবনের গতিকে ব্যাহত করে যে বিরুদ্ধশক্তি ও বিরূপ মানসিকতা—আজ সর্বস্তরে তারই সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম। এই রূপান্তরিত স্বরাজ-সাধনা কোনো ব্যক্তির নয়, কোনো দলের নয়,—এ সাধনা সমগ্র জাতির। সেই সাধনার ক্ষেত্রই হবে সর্বস্তরের সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র—বিশাল ভারতবর্ষের দিগ-দিগন্তরের সাধন-ক্ষেত্র। আশার কথা, আনন্দের কথা—জাতি-চরিত্রের উজ্জ্বল দিকটাও আজ ক্রমশ আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে উঠছে। "আমাদের কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা' অন্তরে অনুভব করছি। আমরা যদি তা' না করি, তবে বৃথা জন্মেছি এ দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায়নি তখন আমরা জেগেছি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্ব গগনে দেখা দিয়েছে—ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। দেশে যখন বিধাতার আলোক-অতিথি এল তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে এই সৃজনের প্রারম্ভে তাই প্রণাম করি তাঁকে, যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেছেন ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য।" আজ রবীন্দ্রনাথের মহতী বাণীকে স্মরণ করে তার তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে।

১৫ই আগস্ট তার দীর্ঘ সতেরো বৎসরের বিচিত্র পটভূমিতে নিজেকে প্রকাশিত করে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন। আজ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনার রূপরেখা প্রতিফলিত হয়েছে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সেই "ফিরে চল মাটির পানে"র ডাক উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। যে মাটি আঁচল পেতে আমাদের মুখের পানে চেয়ে আছে।

"যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল সে গানে গানে
দিক হতে ওই দিগন্তরে
কোল রয়েছে পাতা,
জন্ম মরণ তাঁরই হাতের
অলোক সূতোয় গাঁথা।"

আন্তর্জাতিক

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একেবারে শান্তি ও মৈত্রীতে পরিপূর্ণ, একথা বলা না গেলেও, আর একটি মহাযুদ্ধ সুরু হবার মত আশংকা নেই, এরকম অভিমত অনেকেই পোষণ করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুই প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়েই বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্রের অধিকারী—সুতরাং কেউ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় না। বিপরীত দিকে এই দুই শক্তিই নানা কারণে বর্তমানে পারস্পরিক সহযোগিতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিবাদ যত বেড়েছে, মার্কিন-সোভিয়েট বন্ধুত্ব তত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানে গোলযোগ দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত তা বড় রকমের যুদ্ধের আকার ধারণ করবে না, একথাই অধিকাংশ লোক মনে করেছে। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তাতে সবাই রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে। টংকিং উপসাগরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ভিয়েৎনাম ও তার মুরুব্বি চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে উঠবে বলে অনেকেই আশংকা করছেন। অন্তত পরিস্থিতি যে অত্যন্ত গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজম ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শগত বিরোধ আছে। সহাবস্থানের নীতির কথা বললেও ঠাণ্ডা লড়াই-এর কল্যাণে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দুই পক্ষই কর্তৃত্ব প্রসারের চেষ্টা করে এবং পরিণতিতে বিবাদ উপস্থিত হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় চীনের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টাও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্ত দেশগুলিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা নিয়েও গোলমালের সৃষ্টি হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড—এদের পুরোনো উপনিবেশের মুক্তিসংগ্রাম

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উঃ ভিয়েৎনামের যে সব স্থানে আক্রমণ চালিয়েছে প্রতিরক্ষাসচিব ম্যাকনামারা মানচিত্রে সে সব স্থান দেখাচ্ছেন।

এবং কোথাও কোথাও স্বাধীনতালাভের পরও এদের ওপর নানাভাবে কর্তৃত্ব করার বিষয় নিয়ে কলহ দেখা দেয়। আবার কোথাও বা নতুন দুই স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের মধ্যে স্বার্থের বিবাদ উপস্থিত হয়।

এই সব বিভিন্ন কারণে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত কোনটাই ব্যাপক যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। চীন ভারত আক্রমণ করার পর প্রবল আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ও ভারতীয় জনগণের দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে, পিছু হটেছে। চীন এখনও ভারতীয় অঞ্চল ছেড়ে যায় নি এবং আপোষ মীমাংসার জন্য কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে নি—একথা ঠিক, তবু তার আক্রমণকে প্রসারিত করতে পারে নি। সীমান্তে এখন শান্তি বিরাজ করছে।

কঙ্গোর প্রশ্নে আফ্রিকার ব্যাপক অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার আশংকা দেখা দিয়েছিল এবং এতে

• টি শোম্বে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন প্রভৃতি জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হত। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর উপস্থিতি, রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থান্টের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কঙ্গোর বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে সে আশংকা দূর হয়েছে। এখনও গৃহযুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান না হলেও, টি শোম্বে, গিজেঙ্গা, কালোনজীর সমবেত প্রচেষ্টায় কঙ্গো-সংকটের তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস পাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেরউর্ড সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতি ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু ইউরোপীয়দের নেতৃত্বাধীন আইয়ান স্মিথের সরকারের গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেও, এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সুরু হবার কোন আশংকা নেই। আর তা ছাড়া বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কেউই ভেরউর্ড বা আইয়ান স্মিথকে প্রকাশ্যে সমর্থন করছে না।

কিউবার প্রশ্নে একদিন যুদ্ধ সুরু হয়ে যেতে পারে, এমন আশংকা হয়েছিল। এখনও যেভাবে 'আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা' (Organisation of American states) কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে ভয়ের কারণ আছে। তবু মনে হয়, ফাইডেল ক্যাস্ট্রো যখন আপোষের কথা বলছেন এবং ও-এ-এসও কবে কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ওপর ছেড়ে দিয়েছে, তখন সামনা-সামনি সংঘর্ষ সুরু নাও হতে পারে।

সাইপ্রাসের গ্রীক-তুর্কী বিরোধকে অবলম্বন করে একদিকে গ্রীস ও অপরদিকে তুরস্ক এবং তারও পেছনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধের আশংকা কারও কারও মনে দেখা দিয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর তদারকি এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপোষমূলক মনোভাবের ফলে সাইপ্রাস সমস্যা ভয়াবহ আন্তর্জাতিক পরিণতির পথে অগ্রসর হবে না বলেই মনে হয়। হঠাৎ তুর্কী জেট বিমান কর্তৃক সাইপ্রাসে বোমাবর্ষণের ফলে অবস্থার অবনতি হলেও, খুব বেশি চিন্তার কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত এর থেকে যুদ্ধ বেঁধে যাবে না।

• আইয়ান স্মিথ

ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের ব্যাপারে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। নাসের বারে বারে বৃটেনকে ধমকাচ্ছেন। তবু এর থেকেও কোন বড় রকমের সংঘর্ষের আশংকা নেই।

লাওস ও ভিয়েৎনামে একদিকে কমিউনিস্ট এবং অপরদিকে কমিউনিস্ট বিরোধীদের দ্বন্দ্বের ফলে অবস্থাটা ঘোরালো হয়েছে। কমিউনিস্টদের পক্ষে চীন ও কমিউনিস্ট বিরোধীদের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই এই গৃহবিবাদে অংশ নিয়েছে। কিন্তু তবু বারে বারে মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হবে—যুদ্ধের মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না। লাওসে প্যাথেট লাও বাহিনীর বিরুদ্ধে মার্কিন

• ক্যাস্ট্রো

বিমানবাহিনীর আক্রমণের পরেও যুদ্ধ বাধে নি।

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সোয়েকার্নো অনেক তর্জন-গর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধে নি।

বার্লিন বা জার্মানীর প্রশ্নে পশ্চিমী গোষ্ঠীর সঙ্গে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর বিবাদ তো বাধেই নি, বরং নতুন করে আপোষের মনোভাব দেখা গিয়েছে। সোভিয়েট-পূর্ব জার্মানী চুক্তিতে পশ্চিম জার্মানী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষিপ্ত হয় নি। এরহার্ড শীগগিরই ক্রুশ্চেভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আংশিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদিত হবার পর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রমেই শান্তির ভাব ফিরে আসছিল। ফ্রান্সের প্রকাশ্য মার্কিন বিরোধিতা কিম্বা বৃটেনের কিছুটা মার্কিন-নিরপেক্ষ স্বাধীন নীতি গ্রহণের চেষ্টা, অথবা সোভিয়েটের সঙ্গে চীনের বিবাদ ও চীনের সম্প্রসারণবাদী আচরণ কোথাও কোথাও এই শান্তি-প্রসারে বাধা সৃষ্টি করলেও, সামগ্রিক-ভাবে বিশ্বযুদ্ধের পথ পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পশ্চিম ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্য-প্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সর্বত্রই বিবাদ আছে, কিন্তু কোথাও তা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হবার মত হয় নি। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থা একটু বেশি বিস্ফোরক হলেও খুব বেশি বিপদের আশংকা অনেকের মনেই আসে নি।

এই পরিস্থিতিতে ভিয়েৎনামের ঘটনা রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনাম নীতির পরিবর্তনের কথা ভাবছিল। কোটি

• এরহার্ড

কোটি ডলার ব্যয়ের পরেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিস্ট ভিয়েৎ কং গেরিলাদের শায়েস্তা করা যাচ্ছে না,—বহু মার্কিন সৈন্য এখানে রয়েছে, তাও কিছু হচ্ছে না। এই অবস্থার পরিবর্তনের কথা মনে রেখেই রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন খানও উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রিপাবলিকান দলের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ব্যারি গোল্ডওয়াটার দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছিলেন।

তাই যখন, ৫ই আগস্ট জনসন ঘোষণা করলেন, টংকিং উপসাগরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ম্যাডক্স ও সি টার্নার জয়ের ওপর উত্তর ভিয়েৎনামের টর্পেডো আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তখন বিচলিত বোধ করলেও অনেকেই বিস্মিত হয় নি। এর কম একটা ঘটনা যে ঘটবে, অনেকদিন ধরেই সে কথা মনে হচ্ছিল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ব্যাপারে মার্কিন মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে এ ছাড়া উপায় নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, টংকিং উপসাগরে আন্তর্জাতিক সমুদ্র অঞ্চলে উত্তর ভিয়েৎনামের টর্পেডো বোট মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ম্যাডক্স ও সি টার্নার জয়কে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছে। সুতরাং তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েৎনামের ৪টি টর্পেডো ঘাঁটি ও একটি পেট্রোল

ক্রুশ্চেভ

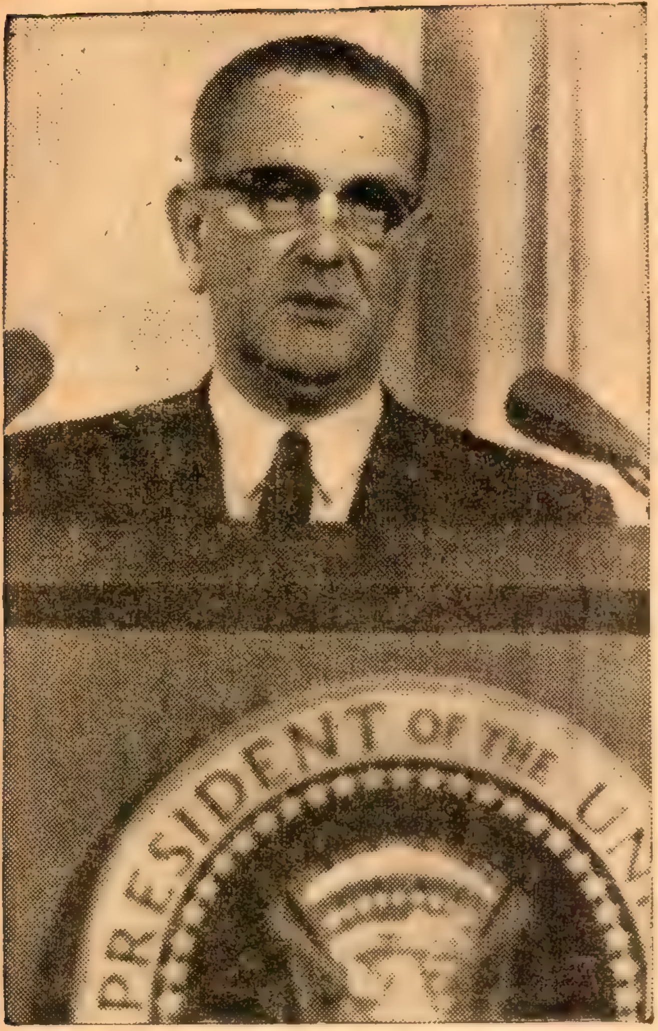

• উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতি জনসনের ঘোষণা।

চীন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। চীন ঘোষণা করেছে, উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে কোনরূপ আক্রমণ চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে। তা ছাড়া টংকিং উপসাগরে যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে চীনের সীমানা খুবই কাছে। তাই চীনের পক্ষে এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নও একেবারে নীরব থাকতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক আচরণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর না হলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট জগতে চীনের দ্বারা সে ধিকৃত হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়নও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।

বৃটেন, জাপান প্রভৃতি টংকিং উপসাগরের এই ঘটনাকে খুবই গুরুতর বলে অভিহিত করেছে। ভারতও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ফ্রান্স তো সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনাই করেছে।

একদিকে চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের ঘাঁটির ওপর বোমা নিক্ষেপ করেছে। জনসন ঘোষণা করেছেন, উত্তর ভিয়েৎনামের 'নগ্ন আক্রমণের' বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আক্রমণকেই প্রশ্রয় দেয়া হত।

উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে মার্কিন কাযের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য, ম্যাডক্স ও সি টার্নার জয়, এই দুটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার টংকিং উপসাগরের যেখানে এসে পৌঁচেছিল, তা উত্তর ভিয়েৎনামের আঞ্চলিক সাগর। সুতরাং এখানে বিদেশী যুদ্ধজাহাজ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তাকে আক্রমণ করার অধিকার উত্তর ভিয়েৎনামের আছে।

একথা সকলেই জানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল লক্ষ্য উত্তর ভিয়েৎনাম নয়, পেছন থেকে যে উত্তর ভিয়েৎনামকে পরিচালনা করছে, সেই চীনই হচ্ছে মার্কিন হুমকির প্রকৃত লক্ষ্য। কেবল উত্তর ভিয়েৎনাম নয়, লাওসেও চীন কমিউনিস্টদের অস্ত্র ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করছে। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট হামলা রোধ করার জন্য চীনকে সতর্ক করা প্রয়োজন।

• টেলর

পক্ষে এগিয়ে এসেছে, আর অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রাটিক প্রেসিডেণ্ট জনসন ও আসন্ন নির্বাচনে তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারি গোল্ডওয়াটার একত্র উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সুতরাং অবস্থাটা খুবই জটিল।

অবশ্য এখনও অনেকে ভাবছেন, ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়। মার্কিন সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী ব্যারি গোল্ডওয়াটারের প্রভা হ্রাস করার জন্য এ জনসনের একটা চাল মাত্র। বড় রকমের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই।

যাই হোক, আপাতত নিরাপত্তা পরিষদের চেষ্টায় ভিয়েৎনামের সংকট কিছুটা চাপা পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ এনেছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তাব করেছে, এই বিষয় আলোচনা করতে গেলে উত্তর ভিয়েৎনামের বক্তব্যও শুনতে হবে। ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত এই দাবী মেনে নিয়েছে। করে আবার

• গোল্ডওয়াটার

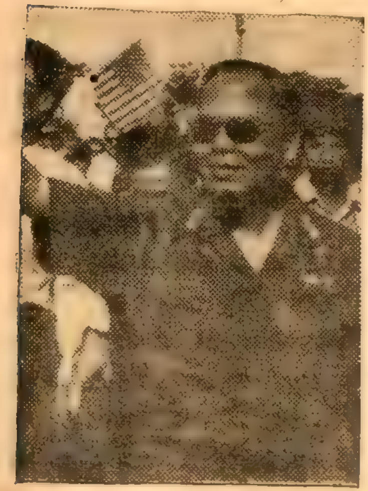

• নেগুইন খান

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসবে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে, তা এখনও ঠিক হয় নি। তবে তার পূর্বে অবস্থার আরও অবনতি হবে না বলেই মনে হয়।

গত কয়েক বৎসর ধরে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচেষ্টার ক্রমপ্রসারে যাঁরা আশান্বিত হয়েছিলেন, তাঁরা ভিয়েৎনাম ঘটনার এই নাটকীয় পরিণতিতে স্বাভাবিক ভাবেই বিচলিত বোধ করবেন। তবু এখনও তাঁরা এই আশাই করবেন, নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় এবং বিশ্ব-জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত হবে। তবে চীনের উস্কানিতে কমিউনিস্ট বাহিনীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা প্রয়োজন। তা না হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা নেই। কিন্তু চীনকে সংযত করবে কে?

ভারত লাওস ও ভিয়েৎনামের ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে। সুয়েজ বা কঙ্গোর ব্যাপারে ভারত যে নেতৃত্ব দিয়েছে, অনেকদিন ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত সে নেতৃত্ব আর দিতে পারছে না। ভিয়েৎনাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের নতুন নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন কিনা, অনেকেই সাগ্রহে তা লক্ষ্য করবেন।

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক সুনীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
৪। রোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু (নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন—অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
৬। টুয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য

একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ষষ্ঠ প্রবাহ ॥

"বাঙালী বণিক একদিন আরব জলদস্যুর ভয়ে ভীত না হয়ে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল।"

বাঙালীর বাণিজ্য বিস্তারের ইতিবৃত্ত রয়েছে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লেখা **Periplus**-এ। পেরিপ্লাসে বলছে: মহাকবি ভার্জিল হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যাঞ্চলের শালকাঠের প্রশস্তি গেয়েছেন। ভার্জিলের চোখে ফুটে উঠেছিল তরাইয়ের শালবনের অপরূপ শোভা।

এই বাংলা দেশের কাঠ খৃষ্টের জন্মের শত শত শতাব্দী পূর্বে রপ্তানী হয়ে যেত আবিসিনিয়ায়, যেত সোমালিল্যাণ্ডে। মিশরের একটি প্রাচীন শিলালিপি বলে—ভারতের হাতীর দাঁত, কাঠ আর কার্পাসের খুব আদর ছিল এই দেশে। ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে এদেশের পণ্যসম্ভার জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে যেত আফ্রিকায়। আফ্রিকা থেকে দূর দূরান্তরের দেশে ছড়িয়ে পড়তো এই ভারতের তথা বাংলা দেশের বিচিত্র পণ্যবস্তু।

পূর্ব আফ্রিকার নগরে বন্দরে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো এদেশের তৈরি তলোয়ার, কুড়াল, রঙিন এবং সাদা কাপড়। সেকালের আবিসিনিয়ার হস্তীশিকারীরা গভীর জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়ার আগে তীব্রভাবে অস্ত্র পরীক্ষা করতো। কুড়াল দিয়ে অরণ্যের সবুজ দেহে আঘাত করতে হবে, করতে হবে নির্মূল। কুড়ালটায় যথেষ্ট ধার আছে তো? ভারতীয় অস্ত্র পেলে তারা আর কোন কথা বলে না। খুব খুশি হয়। এদেশে তৈরি কাটারির খ্যাতি সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ।

বাঙালী বণিকরা তলোয়ার, কুড়াল আর বস্ত্র দিয়ে নিয়ে আসতো মিশর থেকে, দক্ষিণ আর পূর্ব আফ্রিকা থেকে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য। অথর্ববেদ সংহিতায় আছে: ভারতের এবং বাংলার পুরনারীরা মিশরীয় সুগন্ধি আতর অগুরু ব্যবহার করতে ভালবাসতো। সুন্দরী আলুলায়িতকুন্তলা রমণী স্নান সমাপনান্তে মিশরীয় আতর ছিটিয়ে দিত তার বস্ত্রে। তারপর সূর্য যখন পশ্চিম দিকচক্রবালে ধীরে ধীরে অস্ত যেত, তখন তারা গবাক্ষপথে এসে দাঁড়াতো। আর সুগন্ধের ভারে সন্ধ্যার বাতাসে ভারী হয়ে উঠতো। পুরাণে, অথর্ববেদ সংহিতায় আরও বহু গ্রন্থে আছে এই মিশরীয় আতরের কথা।

যেমন এদেশের রমণীরা ব্যবহার করতো মিশরীয় অগুরু, তেমনি দেখা যায় সুদূর পুরাকালে রাজা সোলেমান মহীশূরের অরণ্যের চন্দনকাঠের সুগন্ধে অভিভূত হয়েছেন। আরব বণিকরা উটের পিঠে করে ভারে ভারে নিয়ে যেত সুগন্ধি চন্দনকাঠ মিশরে, সিরিয়ায়। কিন্তু চন্দন কাঠ দিয়ে বাণিজ্য হয় না। বহু মূল্যবান পাথর, মণিমুক্তা, হস্তিদন্ত, বানর আর ময়ূর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেশ-দেশান্তরে সেই প্রাচীন বাণিজ্য বিস্তারে দুটো দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারের আদান-প্রদান হতো অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। মিশরের সেকালের ভাষা ছিল হীব্রু। আমাদের দেশের অনেক জিনিসের নামে হীব্রু নামের প্রভাব আছে। যেমন বানরকে সংস্কৃত ভাষায় বলে কপি, হীব্রুতে বানরকে বলে কাফ।

হাতীর দাঁতের ইংরাজী আইভরি, সংস্কৃতে ইভাদন্ত; কিন্তু হীব্রুতে বলে শেন হেভেরিয়ান। কিন্তু ইভাদন্ত থেকেই হীব্রু 'শেন হেভেবিযান' কথাটা এসেছে কিনা বলা কঠিন; সংস্কৃত ভাষা-ভাষী লোকের সঙ্গে মিশরের, সিরিয়ার লোকের দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিল।

শুধু ভাষা নয়, সংস্কৃতি নয়, মিশরীয় উপকথার ভেতরে আমাদের দেশের পুরাণের কাহিনী মিশে রয়েছে, প্রাচীন এক ঐতিহাসিক কর্নেল উইলফোর্ড লিখেছেন: মিশরের বৃদ্ধ পুরোহিত আর গ্রামবৃদ্ধরা প্রাচীন উইলোগাছের শান্ত ছায়ায় বসে বলে ভারতের মহাভারত আর রামায়ণের কথা।

উইলফোর্ড আরও বলেন, হিন্দু বণিকরা বাঙালী সওদাগররা তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানকে নিজেদের দেশের অতীত ঐতিহ্যের ইতিহাসকে মিশরের সিরিয়ার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু—

এই সুদূর দেশে বাণিজ্য বিস্তার আর সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিময় একেবারে বাধাহীন ছিল না। অনেক বাধা, অনেক ঝড়-দুর্যোগের সঙ্গে দু'হাতে পাঞ্জা লড়ে বণিকদের অগ্রসর হতে হতো।

একেই তো সমুদ্র পার হয়ে দূরদেশে যাওয়া। সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়া, ঝড় আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই উত্তাল জলরাশি ডিঙিয়ে যাওয়ার বিপদ ছাড়াও আরও একটা বিপদ ছিল।

আমাদের দেশের সঙ্গে মিশরের, আফ্রিকার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল, মিশরের বাজার, আফ্রিকার বাজার ভারতের পণ্যসম্ভারে ছেয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে দেখছিল আরব বণিকরা আর হিংসায় জ্বলে মরছিল। শুধু হিংসা করেই ক্ষান্ত হলো না।

ভারত থেকে মিশরের প্রধান বাণিজ্যপথ লোহিত সাগর আর পারস্য উপসাগর। এই লোহিত সাগর আর পারস্য উপসাগরে রাত্রির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে এক-একটা জাহাজ ক্ষিপ্রগতিতে চলতে লাগল। দূর থেকে মনে হতো অতিকায় প্রেতচ্ছায়ার মত কতগুলো কালো ছায়া সমুদ্রের বুকে ইতস্তত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের চলা উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন। কিন্তু তা নয়।

রাত্রিচর ক্ষিপ্রগতি রহস্যময় সেই জলযানের আরোহীদের শ্যেনদৃষ্টি থাকতো অন্ধকার সমুদ্রের দিকে। তাদের রক্তচোখে কুটিল হিংসা আগুনের মত দপ্‌-দপ্‌ করে জ্বলতো। বিশাল সমুদ্রের কোথায় কত দূরে রয়েছে বিপুল পণ্যসম্ভারে বোঝাই বীবগামী ভারতীয় জাহাজ। দেখতে পেলেই হয়। তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। টুকরো টুকরো করে কেটে ভারতীয় বণিকদের সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।

সত্যিই মিশর আর আফ্রিকা যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর আর ভারতীয় বণিকদের কাছে এতটুকু নিরাপদ মনে হল না। তবুও যেত। যাওয়ার চেষ্টা করতো। বেদ, মনুসংহিতার কাল থেকে যারা সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করতে গেছে, যে দেশের শিশুরা মায়ের বুকে শুয়ে সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোয়, তারা তাদের রক্তধারায় প্রবাহিত দুঃসাহসের অহঙ্কারকে বিসর্জন দেবে আরব জলদস্যুদের ভয়ে? কিন্তু—

লোকক্ষয়। হিমালয়ের তরাইয়ের শালকাঠ, মহীশূরের অরণ্যের হাতীর দাঁত, আর রেশমের অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার বারে বারে সমুদ্রের জলে বিনষ্ট হবে? এদেশের সওদাগররা নতুন পথ খুঁজতে লাগল। দিন নেই। রাত নেই। তারা চিন্তা করে। সেদিনের ভারতের সওদাগরদের বাঙালী বণিকদের সেই দুশ্চিন্তার কথা, নতুন জলপথে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করার উপায় বের করার সেই বিচিত্র ইতিবৃত্ত লেখা আছে 'পেরিপ্লাসে':

They decided to sail straight to Abyssinia with help of monsoon, the Indian traders avoided pirates, dominated Red Sea and Persian gulf. Arabians with the help of Arab pirates prevented the Indian goods in Egypt market.

তাদের সিদ্ধান্তের ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এদেশের সওদাগরদের আরব জলদস্যুরা রুখতে পারে নি। বরং বাধা পেয়েই তাদের ওপরে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদ ঝরে পড়েছিল। পরে আরও জানা যাবে—

(ক্রমশঃ)

কিমান

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,৩৫ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৫৮০

সিপাহী বিপ্লব ও বাঙালী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, সিপাহী বিপ্লবের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না ঐতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন : বাংলার অনেক জায়গায় সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু কোথাও তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সহানুভূতি পায় নি। কলকাতার শিক্ষিত নাগরিকরা এবং জমিদারশ্রেণী খোলাখুলিভাবেই বিপ্লবের নিন্দা করেছেন।

বিপ্লবের দিনেও রাজভক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। কিন্তু রামমোহনের সময় থেকে স্বাদেশিকতার যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির বক্তৃতায় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা যে-ভাবে প্রচার লাভ করেছে, তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা কঠিন যে ১৮৫৭ সালে শিক্ষিত বাঙালীর স্বদেশপ্রীতি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেছিল। ১৮৪৯-৫০ সালে 'কালো কানুন' নিয়ে কলকাতায় প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

১৮৫৮ সালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তাঁর বিখ্যাত লাইন 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' লেখেন। সুতরাং স্বাধীনতা-কামী সিপাহীদের প্রতি বাঙালীর সহানুভূতি ছিল না, তা মনে করা ভুল হবে। পূর্বে এবং পরে স্বদেশ-প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু মধ্যবর্তী এক বছরের জন্য একটা জাতির চরিত্র বদলে যেতে পারে না।

বাঙালীর সহানুভূতি চোখে না-পড়বার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, বাঙালী যুদ্ধবিমুখ বলে একমাত্র বাঙালীদের দ্বারা গঠিত কোনো রেজিমেণ্ট ছিল না। বাঙালী রেজিমেণ্ট অন্যান্য সেনাদলের মতো বিদ্রোহ করলে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে কোনো সংশয় দেখা দিত না। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ বাংলায় প্রথম এসেছিল বলে ভারতের মধ্যে এখানকার শাসনব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো ছিল। অন্য অনেক প্রদেশই তখনো প্রায় স্বাধীন ছিল, নামে মাত্র ইংরেজের অধীন। তাই সে সব প্রদেশে বিপ্লবাত্মক সংগঠন গড়ে তোলা সহজ ছিল। বাংলায় সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা থাকায় বিপ্লবের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা, অথবা এ জন্য কোনো গঠনাত্মক কাজ করবার পথে অন্তরায় ছিল।

ঐতিহাসিকরা যা-ই বলুন না কেন, কোম্পানীর গভর্নমেণ্ট কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের রীতিমতো সন্দেহের চোখে দেখত। বাঙালী লেখকরা বই ও পত্রিকার মারফৎ বিপ্লবের বাণী প্রচার করছে এরূপ আশঙ্কা হওয়ায় সরকার রেভারেণ্ড লঙকে অনুরোধ করেছিলেন ১৮৫৭ সালে বাংলা দেশে প্রকাশিত সকল পুঁথিপত্র পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবার জন্য। উত্তর ভারতের যে-সব অঞ্চলে বিপ্লব প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল সেখানে এরূপ অনুসন্ধানের কথা সরকারের মনে হয় নি।

কলকাতার কয়েকটি কাগজ বিপ্লবের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। 'দুরবীণ' এবং 'সুলতান-উল-আখবর' নামক দু'টি ফার্সী সংবাদপত্রে দিল্লীর বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আর একটি সংবাদপত্রে বিপ্লব সম্পর্কে অনেক সংবাদ ও মন্তব্য ছাপা হয়েছে। এই পত্রিকাটির নাম 'সমাচার সুধাবর্ষণ'। এটি দ্বিভাষিক দৈনিক পত্র ছিল। এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অন্য পৃষ্ঠায় হিন্দী সংবাদ ছাপা হত। পত্রিকাটি প্রথম বের হয় ১৮৫৪ সালের জুন মাসে। এটি প্রথম হিন্দী দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন শ্যামসুন্দর সেন।

১৮৫৭ সালের 'সমাচার সুধাবর্ষণ' কোথাও পাওয়া যায় না। সরকারের নির্দেশে হয়ত সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। তবে সরকারের তরফ থেকে 'আপত্তিকর' অংশগুলির যে অনুবাদ হয়েছিল, সেগুলি সরকারী দলিলে পাওয়া যায়। আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এদের উপর কেন যে পড়ে নি তার কারণ বুঝা যায় না। দলিলে উদ্ধৃত ইংরেজী অনুবাদের বাংলা ভাবানুবাদ নীচে দেওয়া হল।

১৮৫৭ সালের ২৬শে মে সংখ্যায় 'সমাচার সুধাবর্ষণে' লেখা হয়েছে : ইংরেজরা সম্প্রতি আমাদের ধর্ম ধ্বংস করবার উদ্যোগ করেছে। সুতরাং ভগবান তাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন। ইংরেজদের সাম্রাজ্য হারাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভৃত্য যখন প্রত্যুত্তর দেয় তখন প্রভুর মৃত্যু সমাসন্ন। সিপাহীরা যে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। জাত খোয়াবার আশঙ্কায় সিপাহীরা ক্রুদ্ধ হয়েছে। এক অশুভ মুহূর্তে গভর্নর দাঁত দিয়ে টোটা খোলবার আদেশ দিয়েছেন। এ আদেশ কেউ মানবে না, অথচ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে। এখন গভর্নর নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু বিদ্রোহী সেনাদের আর আস্থা নেই এবং যুদ্ধ ত্যাগ করবার অভিপ্রায়ও নেই তাদের। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে এবং বহু অঞ্চলের অধিবাসীরা সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ইংরেজদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারলে গয়ার গদাধরের সেবাইতদের পূজার দক্ষিণা হিসাবে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে রেওয়ার রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পুরুতরা গদাধরের পূজা করছে বিজয় কামনা করে।

আগ্রা শহরের চারপাশের গ্রামবাসীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনছে। তারা বলছে, আমরা সকল শক্তি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। এতে যদি মৃত্যু হয় তাও ভালো।

৫ই জুনের সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে : মীরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহ গভর্নরকে আতঙ্কিত করেছে। সুতরাং তিনি তাঁর দেহরক্ষী-দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন চব্বিশ জন নতুন লোক নিযুক্ত করে। তিনি গভর্নর হাউসের সব প্রবেশপথ রাত ঠিক আটটায় বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর যেই আসুন না কেন কিছুতেই দরজা খোলা হবে না। গভর্নর প্রত্যহ দমদম, ব্যারাকপুর ইত্যাদি ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সিপাহীদের দুই হাতে সেলাম করে মধুর ভাষায় বলেন, 'তোমাদের ধর্ম ক্ষুণ্ণ হতে পারে—এমন কিছুই আমি করব না। তোমাদের ধর্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা আছে। পার্লামেণ্ট থেকে লর্ড ক্যানিং-এর নিকট নির্দেশ এসেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের বিদ্রোহ বন্ধ কর, না হলে তুমি বিপদে পড়[illegible]' এই নির্দেশ পাবার পর চ[illegible] কাগজে মোড়া সকল কার্টিজ পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু গভর্নরের উপর সিপাহীদের আস্থা ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।

'সমাচার সুধাবর্ষণে'র ৯ই জুনের সংখ্যায় বিপ্লবীদের রণসজ্জার সংবাদ দেওয়া হয়েছে : 'লক্ষ্ণৌর এক পত্র থেকে আমরা জানতে পারলাম যে তুলসীপুর, সালিতিপুর এবং গোরা-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের জমিদাররা ৬০,০০০ সিপাহী ও এক লক্ষ বারো হাজার গ্রামবাসী সংগ্রহ করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। লক্ষ্ণৌর নবাব এখন কলকাতায় আছেন। তাঁকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, এ বিরাট বাহিনী ইংরেজদের ঐ অঞ্চল থেকে তাড়াবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু নবাব সম্মতি দিলেন না ; ভয়ে তটস্থ হয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন চুপ করে থাকতে। নবাবের নির্দেশ সত্ত্বেও জমিদাররা চুপ করে থাকবে বলে মনে হয় না। শীগ্‌গিরই সাংঘাতিক গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে। দিল্লীর সিপাহীদের বিদ্রোহ দেখে গভর্নর খুব ভয় পেয়ে গেছেন এবং সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছেন।---'

১০ই জুনের সংখ্যায় 'সমাচার সুধাবর্ষণ' মন্তব্য করেন : আমাদের গভর্নর ক্ষুদ্র ও মহৎ, ধনী, জ্ঞানী ও সৎ সকলের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ঘোষণা করেছেন, যে বর্তমান বিদ্রোহ দমন করতে পারবে, তাকেই দৈনিক পাঁচশত টাকা এবং এতে না হলে দৈনিক হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। গভর্নর নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। এই প্রতিশ্রুতি আজ থেকে এক সপ্তাহ বলবৎ থাকবে। সুতরাং যাঁরা পুরস্কার পেতে চান তাঁদের এখন থেকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে। গভর্নর যদি বিদ্রোহ দমন করতে পারেন, তবে তাঁর ক্ষমতারই প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু সিপাহীরা ভালোরূপেই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত আছে, সুতরাং মিষ্টি কথায় তারা ভুলবে না।

সপারিষদ গভর্নর জেনারেল ১২ই জুন, ১৮৫৭ 'সমাচার সুধাবর্ষণ' এবং ফার্সী সংবাদপত্র দুটিতে প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। ঐ সভাতেই স্থির হয় যে, বিপ্লবের সমর্থন করায় এই সব সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দূরবীণের স্বত্বাধিকারী আহমেদ আলী, 'সুলতান-উল-আখবরে'র প্রকাশক মহম্মদ তাহের এবং 'সমাচার সুধাবর্ষণের' সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেনকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৭ই জুন তাঁদের সুপ্রীম কোর্টে আনা হল বিচারের জন্য। আহমেদ আলী এবং মহম্মদ তাহের ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পেলেন। কিন্তু শ্যামসুন্দর সেন ক্ষমা না চেয়ে বিচারের সম্মুখীন হলেন।

শ্যামসুন্দর সেনের বিচার হয় সারাদিন ধরে। বিচারে তিনি মুক্তি পেলেন। কারণ, ঐ জাতীয় মন্তব্যের জন্য শাস্তি দেবার মতো আইন ছিল না। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র সংবাদ ও মন্তব্যে ভীত হয়ে গভর্নমেণ্ট 'দি সাপ্রেশান অব দি প্রেস অ্যাক্ট' ১৩ই জুন, ১৮৫৭ পাস করেন। আদালতে শাস্তি না হলেও সরকার শ্যামসুন্দর সেনকে আর কাগজ বের করতে দেন নি বলেই মনে হয়। কারণ, ঐ তারিখের পরে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' যে আর বেরিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে ভারতের বহু সংবাদপত্র এবং সম্পাদক স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু শ্যামসুন্দর সেন ও 'সমাচার সুধাবর্ষণ' এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক। যখন স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু হয় নি, অসহযোগের কথা ওঠে নি, তখন শ্যামসুন্দর সেন ক্ষমা চেয়ে মুক্তিলাভের সহজ পথ নির্বাচন না করে বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত শ্যামসুন্দরের নাম উল্লেখ করা হয় নি।

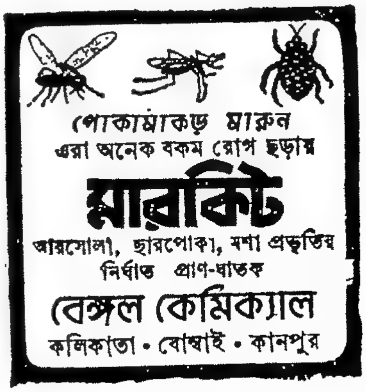

রাশিয়া থেকে হেরে পালানো নেপোলিয়নের সৈন্যদলের চেয়ে বেশি দুঃখ এদের।

একটুখানি লড়াইও করতে পারল না। যুদ্ধ জেতার প্রশ্নই উঠল না।

চীনে শত্রু পিছন থেকে চোরা অভিযান করে এদের কাবু করে দিয়েছে।

তাই যেন নিশিতে পাওয়া লোকের দল পিছু হঠে পালিয়ে চলেছে। সাধারণ লোক নয়। আমাদেরই সৈন্যদল। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘন জঙ্গল ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে ওরা দক্ষিণের পানে চলেছে। যমের দুয়ার থেকে পালিয়ে দক্ষিণ মুখে চলেছে।

ওদের পিছনে সূর্য অস্ত গেছে। চারপাশে পিলপিল করছে নিজেদেরই দীর্ঘায়ত ছায়া। ওদের পদক্ষেপে নেই প্রাণ, নেই মার্চ করে যাওয়ার টান। নেই একটুও ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।

কারণ মিহি ধুলো সব শব্দকে রবারের মত চেপে রাখছে।

আর সেই ধুলো পায়ের তলায় মথিত হতে হতে উপরে উঠে এই সৈন্যদলের মাথার উপর চাঁদোয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু স্থাণু না থেকে ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

মেজর নীরো অর্থাৎ নীরেন চৌধুরী আর সকলের মতই নিজের মুখ বন্ধ করে জোর করে বুজিয়ে রেখেছে। কিন্তু চোখ খুলে রাখতেই হবে। তা-ও অনেক কষ্টে। নাকেরও সেই অবস্থা। সব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে চলতে হবে। পরম যোগীদের মত। খোলা রাখলেই ধুলো খেতে হবে। যোগীরা বায়ু খেয়ে নাকি যোগসাধনা করতে পারে। কিন্তু এরা যা খেতে পারে, তা হচ্ছে শুধু ধুলো। ধুলোভুক যোগীদের কথা কি নীরো কোথাও শুনেছে?

নিজেকেই মেজর নীরেন চৌধুরী এই প্রশ্ন করল।

কিন্তু নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। না নাক খোলা যায়, না মুখ। অথচ শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। যেটুকু হাওয়া ভিতরে টেনে নেওয়া যায় সেটুকুও ভেজাল গ্যাসের মত। অর্থাৎ হাল্কা হাওয়া। ফুসফুস তাতে ভরে না। এগার হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়িয়া জঙ্গলে কোন কিছুতেই ভরে না।

কোন কিছুই ভরে না। শুধু অবসন্ন মন ভরে যায় এলোমেলো পাগলা হাওয়ার মত রাশি রাশি চিন্তায়। নীরো এক পলক উপরে নজর করে ধুলোর কুণ্ডলীর দৃশ্য দেখে হঠাৎ দিশেহারা হয়ে গেল। ওই আকাশ ভরে, ওদের ব্রিগেডের সবটা লাইন ঘিরে এ তো ধুলোর কুণ্ডলী নয়, এ যে এটম বোমা বিস্ফোরণের পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পাকিয়ে পাকিয়ে উপরের দিকে উঠছে। উপরের স্তরে হাল্কা একটু আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে। ঠিক—ঠিক—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হিরোশিমার উপরে এটম বোমা বিস্ফোরণের যে ছবি সিনেমায় দেখেছিল ঠিক সেই ছবি। ঠিক সেই।

হঠাৎ যেন মাথার পিছনে ধড়াস করে একটা ধাক্কা লাগল। যেন সে আঘাতে চৈতন্য ফিরে এল। নীরো নিজেকে সামলিয়ে বুকটা আবার

দেবেশ দাশ

একটু টান করে মাথা তুলে নিল। না, মেজর নীরোর মাথার উপর আজ অনেক ভাব।

রাইফেলধারীদের কোম্পানীগুলির সঙ্গে এলোমেলোভাবে মিশে গিয়েছে আরো অন্য সৈন্যরা। যারা খচ্চর আর গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারাও। মাল আর অস্ত্র দুই-ই চলেছে এক সঙ্গে। খচ্চরদের গতি সৃষ্টির আদিকাল থেকে সেই চিরন্তন দু-মাইল ঘণ্টায়। আমাদের মার্চ করা দলের গতিও এখন তার চেয়ে বেশি নয়। এদিকে চীনেরা তেড়ে-ফুঁড়ে আসছে যেন পায়ে তাদের মোটরের এঞ্জিন আর পাহাড়িয়া নতুন কাটা সদ্যধ্বসা রাস্তাগুলি ফ্রান্সের রেসিং ট্র্যাক।

কিন্তু চীনেদের অস্ত্রের চেয়ে বেশি ভয়ের কথা ওদের রোড ব্লক—অর্থাৎ লুকানো পথে এগিয়ে এসে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। তার পর ইঁদুরকে যাঁতাকলের মধ্যে পুরে বন্দী করে—তারপর? তারপরের খবর ওরা জানে না। ভাবতেও নেই। ভাবলেই ভয়। ভয় মানেই অবশ অসহায় আত্মসমর্পণ।

তার আগে বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ করবার অবশ্য সুযোগ নেই। শত্রু এগিয়ে আসছে শমনের মত। কামান নয় ধাক্কা-না-দেওয়া রাইফেলের ধাক্কাই যথেষ্ট। তার পাল্টা জবাব দেবার মত কিছু নেই ওদের। হাতে নেই হাতিয়ার, পায়ে নেই বুট, গায়ে নেই কম্বল। কিছু হয় নি নেওয়া, কিছু গেছে খোয়া। যা বাকী আছে তা হচ্ছে দুষমনের ধেয়ে আসা। সেটাই সত্য। আর সব মায়া। উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উপরে মুক্তির রঙমাখা আকাশের মতই মায়া।

সামনে আছে একটা দলং অর্থাৎ পোল। আগে পিছনে রাস্তা হিসাবে ম্যাপে দেখানো একটা সরু মাটির-লাইন • আর তার দুটো টুকরোকে জোড়া দিয়েছে কাঠের গুঁড়ি আর

প্রকাশিত হল

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১ - বর্ষ ২১ সংখ্যা ১

শেক্সপীয়রের চতুর্থ-জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন
বিশ্বভারতীর আচার্য জওহরলাল নেহরু স্মরণ
উপলক্ষে বিশেষ প্রবন্ধ

বিষয়সূচী

বিশ্বকবি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেক্সপীয়র-প্রসঙ্গ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চা	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শেক্সপীয়র আর আমরা	শ্রীকেতকী কুশারী
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি ও পুরাণ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়
ঋতুরাজ জওহরলাল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আচার্য জওহরলাল	শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
জওহরলাল নেহরু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
জওহরলাল ও শান্তিনিকেতন	শ্রীঅমিয়কুমার সেন

গ্রন্থপরিচয়: শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল - শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র - শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ: শেক্সপীয়র-উদ্যানের জন্য মাধবীলতা রোপণ
শেক্সপীয়র গার্ডেন, ক্লিভল্যাণ্ড, ওহিয়ো

জওহরলাল নেহরু: বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে, রবীন্দ্র-সমীপে, শান্তিনিকেতন মেলায় নাগরদোলায়, শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে, মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালার শিশুদের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আশ্রমবাসী-সহ, বিদেশাগত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১.০০। বার্ষিক চাঁদা রেজেস্ট্রি ডাকমাশুল-সহ ৭.৫০
শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

আটাতনে সাজানো একটা পোল অর্থাৎ 'দলং'। দুষমন নিশ্চয়ই দলংয়ের খবর আগে থেকেই রেখেছে আর একজন সৈন্যই ওটাকে লোপাট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাহলে এই দলংয়ের উত্তর পারে দলের সবগুলি সৈন্য ইঁদুরের মত আটকিয়ে পড়বে। তাহলে চীনেদের আর কষ্ট করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসে এই হিন্দুস্থানী সৈন্যদলকে পাশ কাটিয়ে অর্থাৎ আউট ফ্ল্যাংক করে আটকিয়ে ফেলার কোন দরকারই হবে না।

অন্ধকার নেমে আসছে। আশাও তাই বাড়ছে। রাস্তাঘাট তৈরি করবার স্যাপাররা পোলটা যাচাই করে দেখে নিল। না; ঠিকই আছে। এবং যেখানে যেখানে দরকার কিছু ঠেকা দিয়ে আরো মজবুত করে নিল। মেজর নীরো একবার চারপাশে ভাল করে দেখে নিয়ে ক'জন সৈন্যকে দূরে দূরে ঘাঁটিতে মোতায়েন করে রাখল। পাহারা দিতে হবে যাতে হঠাৎ চীনে হামলা সুরু না হয়। কে জানে, অন্ধকারে নিশ্চয়ই প্যারাট্রুপ নামাবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎ ভেরি লাইট ফেলে সবুজ আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে দিতে পারে। সবুজ আলোয় রহু দূর থেকে রাইফেলের গুলীর লাল বিদ্যুৎ কেমন দেখাবে তা কল্পনা করবার সময় কেউ পাবে না। অথবা ঠিক মাথার উপরের চূড়া থেকে তাক করে লাটুর মত বোঁ বোঁ করে গ্রিনেডও ছুটে আসতে পারে।

বাকী সৈন্যরা যেন স্রোতে ভেসে এগিয়ে চলল। অর্ডার দেবার দরকার নেই। ওরা জানে যে সাঁকো মানেই মুক্তি; অন্তত এ যাত্রার মত প্রাণে বেঁচে যাওয়ার প্রথম সোপান। ওরা ধুঁকতে ধুঁকতে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে চলল। যেন গড্ডালিকা। কিন্তু প্রবাহ নয়। নিশিতে পাওয়া অবসন্ন আত্মবিস্মৃত পলাতকের দল।

নীরো এক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিল। ট্রেনিং-এর সময় এরকম ক্ষেত্রে আর এরকম সময়ে কি কি যুদ্ধের মাল নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়, একবার ভেবে নিল। ওর ডিফেন্স কলেজে শেখার সময়কার বক্তৃতা মনে এল। কোহিমার যুদ্ধে ক্যামেরন হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদল গ্রান্ট ট্যাঙ্ক আর মাউন্টেন ব্যাটারী নিয়ে জাপানীদের রোড ব্লক ভেঙে দিয়েছিল। তারপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে একলা পড়ে যাওয়া ১৬১ নং ব্রিগেডকে উদ্ধার করেছিল। ডিফেন্স কলেজে নীরো আর তার সহকর্মীরা শুনেছিল যে, আমাদের নয়া দেশের নওজোয়ানের দল অনেক বেশি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আছে। ইংরেজ আমলের 'স্ট্র্যাটেজির' ভুল এখন হবে না।

নীরো আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে যাচ্ছিল সে সব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কথা। কিন্তু ওর সমস্তটা চৈতন্য হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে মুচড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। ও নিজের সঙ্গে রেখেছিল শুধু পিছু দলের অর্থাৎ রিয়ার সেক্শনের সৈন্যদের। অন্য সবাইকে পার করে দিয়ে তবেই সে এদের পার করাবে। সবার শেষে সে নিজে দাঁড়িয়ে এই পোলটা ভেঙে এগিয়ে যাবে। মুক্তির পথে। দেশের পথে। সীমার পথে। যে ওর কাছে অসীমা সেই সীমা। তার পথে।

কিন্তু মোটে পঞ্চাশ গজের মধ্যেই অন্ধকারের কোন্ কোণা থেকে চীনে সাব-মেশিনগান চলতে সুরু করেছে? পোলটা মেশিনগানের তাকের ঠিক মাঝখানে। এখনো অনেকগুলি জোয়ান পার হতে বাকী। নিজের রিয়ার সেকশন আর নিজে পার হতে অনেক বেশি দেরি এখনো।

জায়গাটা এমন যে, সেখান থেকে ঘুরে নিজের সেকশনের গুলী চীনেদের উপর চালাতে পারবে না। ঠিক মত ওখানে পৌঁছাবেই না। আর অন্ধকারে কোন টেরে যে মেশিনগানের পাখীর কুলায় পাতা হয়েছে, তা-ও টের পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ—হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন আরেকটা ধাক্কা খেল নীরো। হঠাৎ মনে পড়ল আরেকটা সন্ধ্যার কথা। সে সন্ধ্যায় অন্ধকার ছিল না বাইরে। আলো ঝলমল হাসি-তামাসার উচ্ছল সন্ধ্যায় অন্ধকার ছিল শুধু মনে। যাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছিল তারাও শত্রু। তবে যুদ্ধক্ষেত্রটা ছিল অন্য রকমের। সেখানেও সে জিতে আসতে পারে নি। তবুও ত' ছিল আশা, ছিল একটা গোপন আশ্বাস। ঠিক এখনকার মতই একটা অসম্ভব আশা। সেদিন ফিরে আসবার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখেছিল অন্ধকারের ওপারেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সীমা। সেই সন্ধ্যাটা আজ আবার ব্যাকুল উন্মাদনায় ঘিরে ফিরে এসেছে।

সঙ্গের সেকশনের সবাইকে আঁকাবাঁকা পা ফেলে দৌড়ে পোলটা পার হতে সে হুকুম দিল। হুকুম না দিলেও ওরা হয়ত দৌড়াত। কিন্তু নীরো, নীরেন চৌধুরী নিজেকে একা পিছনে রেখে ওদের এগিয়ে যেতে হুকুম দিল। নিজে রয়ে গেল একা। ঠিকই ত'। একা, জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি হতে সে গিয়েছিল একা। মরণের সঙ্গেও তাই। চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল।

তার শেষ হ্যাণ্ড গ্রিনেড সে তুলে নিল। চার সেকেণ্ডের গ্রিনেড। তার লেভার কলের মুখটা খুলে নিয়ে নিজের হাতেই দু-সেকেণ্ড গ্রিনেডটা রেখে দিল। এতে বেশি মোক্ষম ফল পাওয়া যাবে। তাই দু-সেকেণ্ড পরে সেটা ওই মেশিনগানের কুঞ্জের উপর ছুঁড়ে মারল। দুড়ুম দুড়ুম দুম। সব চুপচাপ।

ওদিকে পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে নিঃশব্দে ওর কোম্পানীর সব লোক সাঁকোটা পার হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না; যেতে পারছে না।

কারণ মোশনগানের কাছাকাছি জায়গাটাতে আরো সৈন্য লুকিয়ে ছিল। তারা আবার গুলী ছুড়ছে। এবার মরিয়া হয়ে নীরো সেই কুঞ্জের উপর ফিক্স্‌ড বেয়নেট নিয়ে তেড়ে গেল। চারজনকে গুলী করে মারল। পঞ্চম জনের বুকের মধ্যে বেয়নেটের ফলা এমনভাবে গেঁথে গেল যে, আর ওটাকে ওঠাতে পারল না। ইতিমধ্যে—ইতিমধ্যে যে কি হয়ে গেল তা নীরো জানতে পারল না।

॥ দুই ॥

সেদিনও যে কি হয়ে গিয়েছিল তা নীরো জানতে পারে নি।

সীমাদের বাড়িতে জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ। খব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সবাই।

বিশেষ করে নীরোর বন্ধুরা। বন্ধু ঠিক বলা চল না। প্রতিদ্বন্দ্বী বললেই ঠিক হয়। সীমার মত মেয়েকে লাভ করবার জন্য কলকাতায় যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে রেষারেষির শেষ নেই।

অথচ মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করাও ভদ্রতায় বাধবে। এত যোগ্য যুবকের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে যোগ্যতর বলে ভাবছে। সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা, বংশের কৌলীন্য, রোজকারের জোর, এটিকেট-দুরস্ত পালিশের চমক সব কিছু অস্ত্রশস্ত্রই সীমাকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা চলছিল।

যাদের কোন আশা নেই তারা নিঃশ্বাসে বুক খালি করে ফেলে বলত—হায় রে কলিকাল। নেই স্বয়ংবর প্রথা, নেই পৃথ্বীরাজের মত সংযুক্তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবার ব্যবস্থা। না হলে শেষ চান্স একটা লড়ে দেখা যেত।

ঠিক সেই শেষ লড়াই করনে-ওয়ালাদের মধ্যে নীরেন চৌধুরীর নাম ছিল না। কিন্তু সীমার পাণিপ্রার্থী-দের মধ্যে সেই ছিল একমাত্র লড়নে-ওয়ালা। তবে শুধু মেজরের ভাগ্যে সীমার শিকে ছিঁড়বার কি-ই বা আশা থাকতে পারে।

পুরুষানুক্রমে খাস কলকাতার বাসিন্দা বড়লোকের দুলাল একজন প্রার্থী ছিল সুশোভন। সীমাদের বাড়ির সেই পার্টিতে সেদিন সে যুবকদের সামনেই নীরোর সম্বন্ধে যা বলেছিল তাতে সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল। দূর থেকে মেজর নীরেনকে আসতে দেখেই সে টিপ্পনি কাটল—ওই যে আসছেন আমাদের মেজর। মেজর, না হাতী। সম্ভবত প্রেমে জর জর—তাই আমি ওকে প্রমোশন দিয়েছি মেজর।

সওদাগরী অফিসের ছোট পার্টনার সুবীরও তুখোড় কম নয়। নীরেনের মিলিটারী ইউনিফর্মে ঢাকা সুঠাম দেহের সঙ্গে পাল্লায় নিজে অনেকখানি পেছিয়ে আছে এটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝত। সে জন্যই সে নীরেনের নাম দিয়েছিল নীরো। বলেছিল,—ব্রাদার আমার বাপ-মার একমাত্র ছেলে। সাধ হয়েছে হিরো হতে। আছেন ত' জিরো। কিন্তু হবেন হিরো, নীরেন দি হিরো। এক কথায় নীরো। হিপ হিপ হুরো।

সেই সুবীর দূর থেকেই নীরোকে আসতে দেখে বলে উঠল,—আরে, ব্রাদার, এযে একেবারে স্ক্যাণ্ডাল হয়ে গেল।

সুশোভন প্রতিবাদ করল,—না, মোটেই স্ক্যাণ্ডাল নয়। একেবারে গসিপ। মিলিটারী মহলের চালু খবর।

ইংরেজীর অধ্যাপক তমালকান্ত সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছে। সীমার জন্য তারও আশার শেষ নেই। সে-ও ফোড়ন কাটল,—ও দু-ই এক। গসিপ হচ্ছে জনপ্রবাদ; লোকের মুখে মুখে ফেরে। ওটাতে একটু রঙের ছোপ লাগলেই হয়ে ওঠে স্ক্যাণ্ডাল। ওই দেখ না—মেজরের মুখ লাল হয়ে উঠছে।

হাঃ হাঃ। উনি জঙ্গী কিনা। শুধু শত্রু নিপাতের স্বপ্ন দেখেন, আমাদের ড্রয়িংরুম নীরো। ওর হাতে যা সাজবে ভাল তা বন্দুক নয়।

ব্যায়লা—একেবারে ভাঙা বেহালা। সে জন্যেই ত' ভেবে-চিন্তে নাম দিয়েছিলাম—নীরো।

নীরো ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। তার দীর্ঘ সবল দেহ আজ ইউনিফর্মে আরো বেশি চোস্ত দেখাচ্ছে। তার মধ্যে উচ্চতা আছে, উদ্ধত নয়। সম্ভ্রম আছে, সচেতনতা নেই।

সীমার মা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। অন্যান্য যুবকদের মত কথা-বার্তায় মুখর বা বংশে, সম্পদে অগ্রসর নয়। কিন্তু তবু ভাল ছেলে। এর মনের হদিস পাওয়া যায়। কথার মানে পাওয়া যায়। এমন ছেলেকেই সীমা পছন্দ করলে ভাল হয়। কিন্তু মেজরের মাইনেতে? মেজরের মর্যাদাতে?

তার চেয়ে সুশোভন ভাল। সুবীরও মন্দ নয়। তা ছাড়া আরো কত ছেলেও ত' আছে। আহা আমার সীমার মত মেয়ে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, সীমা নীরোকেই অন্যদের চেয়ে বেশি পছন্দ করে। বেশি পাত্তা দেয়।

সীমার মা কুশল প্রশ্ন করার পর চীনে হামলার কথা তুললেন। ওরা আজকাল হিমালয় এলাকায় বড় গোলমাল দৌরাত্ম্য করছে। তবে নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে না। তুমি, বাবা নীরো, তুমি ত' এখানেই এখন পোস্টেড থাকবে।

একটু চুপ করে থেকে, তারপর গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে নীরো বলল,—সেই কথাটাই জানাতে এসেছিলাম। কালই---

একবার দূরে অন্য কোণায় দাঁড়ানো সীমার দিকে সে তাকাল। সীমার সঙ্গে ওর কয়েকটি সহপাঠিনী কথা বলছে। ওর দিকে তাকিয়ে—যেন ওকেই জানাচ্ছে এমনভাবে বলল,—কালই আমায় রওনা হয়ে যেতে হবে। এমার্জেন্সী অর্ডার।

হ্যাঁ।

হ্যাঁ বলেই সীমার মা একবার ঘুরে মেয়ের দিকে তাকালেন। আজকের সন্ধ্যাটা বড় লম্বা ঠেকছে। তাড়াতাড়ি রাত হয়ে গেলে বাঁচা যায়। পার্টিটা ভাঙতে সুরু করলেই ভাল হত। ঘড়ির কাঁটাগুলো কারো সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাকায় না।

ঘরে সাজানো রয়েছে আজকের দিনে জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেওয়া ছোট ছোট সুন্দর উপহার। নিমন্ত্রিত-বন্ধু আর বান্ধবীরা সবাই প্রথমে সীমাকে তাদের উপহার দিয়ে এসেছে। কিন্তু নীরো কি সীমাকে দেবে শুধু দুটি ব্যাকুল চোখের নীরব দৃষ্টি? ওর হাতে ফিনফিনে কাগজে মোড়া রক্তগোলাপের স্তবকটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে না কেন?

সুবীর ছাড়ল না। সে-ও ত' বীর বটে। ব্রাদার সুশোভনকে কানে কানে বলল,—আমাদের প্রেমে জর জর মেজর, এখনই জড়সড়। মানে খরচার বেলায়। দেখ না, বিয়ের আগে দিচ্ছে শুধু ফুল। পরে দেবে খালি কাঁটা। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি রে ব্রাদার, দিব্যচক্ষে।

দু-চোখ কপালে তুলে সুশোভন বলল,—কেন ব্রাদার, এমন আর কি সর্বনাশ হবে?

হবে না? ওই চরিত্রবান জঙ্গী একেবারে জঙ্গলী। সিগারেটটা পর্যন্ত খায় না। খরচার ভয়ে। ওরকম লোকের বিয়ে করা মানেই সর্বনাশ। সিগারেটের মতই ডিমর-ল্যাইজিং। প্লাস অঢেল খরচান্তের ব্যাপার।

ওরা সবাই সীমার প্রতি দরদে বিগলিত হয়ে গেল। সত্যিই সীমা ওদের প্রতি অবিচার করে নিজেরই বিপদ ডেকে আনছে।

তমাল বলল,—সত্যিই ত'। এখনি তার নমুনা দেখা যাচ্ছে। হাতে করে এনেছে শুধু ফুলের তোড়া। অবশ্য আজকাল সবারই টানাটানির দিন। তবু দুটো মিষ্টি কথা ছাড়া আর কিছু দিতে গেলেই দেউলে হতে হবে কিনা।

এদিকে ততক্ষণে নীরো সীমার কাছে এসে পৌঁছিয়েছে। ওর বান্ধবীরা পরের দিনই সীমান্তে কোন্ জায়গায় নীরোকে রওনা হতে হবে শুনে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল।

নীরো ধীরে ধীরে গোলাপ-স্তবকের মোড়ক খুলে টকটকে লাল ফুলগুলি সীমার হাতে তুলে দিল। ওর মুখের দিকে নীরবে তাকাল। ওর হাতের দিকে, ওর মাথার সিঁথির দিকে।

নীরোর ভীরু চাহনি আজ ভরে উঠেছে সাহসে, বিশ্বাসে, বলিষ্ঠতায়। তার মুখ যেন হয়ে উঠেছে মুখর; অধরকে লাজুক ভাব আর ধরে রাখতে পারছে না। বার বার সে তাকাচ্ছে সীমার সিঁথির দিকে।

সীমা অবশেষে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে বলত? আমার চুলে কিছু গোলমাল দেখছ নাকি?

না। দেখছি তোমার মাথার সিঁথিতে আমার পথ। আশা ছিল একদিন সেখানে আমার জন্য রাঙা রেখা তুমি রচনা করবে। তাই ত' আজ এনেছিলাম রক্তগোলাপ।

বিব্রত হয়ে, বিবশ হয়ে সীমা বলল,—তুমি কেন খালি-খালি রাঙা আর রক্ত এ সব কথা মনে আনছ। আমি ত' জানি নিশ্চয়ই ক'দিনের মধ্যে তুমি ফিরে আসবে। তখন দেখা যাবে।

ধীর কিন্তু দৃঢ়স্বরে নীরেন বলল,—না, অত সহজে সব থেমে যাবে বলে মনে হয় না। একটা পুরোপুরি যুদ্ধই বোধ হয় লেগে উঠছে। যাই হোক, অনেক দিন যুদ্ধ চললে বোধ হয় আমার কোন আশা থাকবে না।

অসহায়ভাবে সীমা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। নিজের মন আর নিজের মা একরকমভাবে ভাবে না। নিজেই যে ঠিক মানুষ বেছে নিয়েছে সে সিদ্ধান্তও এখনো হয় নি পুরোপুরি। অথচ যে বীর আজ বিদায় নিয়ে যেতে এসেছে, তার উঁচু মাথাকে সে নীচে নামিয়ে দেবে কি করে? এদিক-ওদিক সে অসহায়ের মত তাকাতে লাগল।

ওদিকে সুবীরের দল সবই লক্ষ্য করে যাচ্ছে। বাঃ, বেড়ে জমিয়ে নিয়েছে দেখছি ব্রাদার। তবে এখনি এসব পালা সেরে রাখা ভাল। আমাদের পোড়া চোখের সামনে এত পীরিত করা ত' পরে আর চলবে না। লোকে তাহলে ভাববে যে, সামনে চলাচলি করছে পেছনে ঠেঙাঠেঙি করে বলে। তায় আবার মেজর। ওরে বাবা। লড়াইটা ঘরের মধ্যেই চালাবে আমাদের ড্রয়িংরুম হিরো।

এদিকে সীমার মা ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পেরেছেন। মেয়েকে এমন একটা জটিল অবস্থার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া মায়ের অবশ্য-কর্তব্য। উনি হাতে মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে এগিয়ে এলেন।

তা লক্ষ্য করে নীরেন বলল,—সীমা, সীমা তুমি বল। একটুখানি হেসে প্রসন্নমনে বল তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

সীমা হাসল। হ্যাঁ, হাসল। যে হাসি পৃথিবীর সব কান্নার চেয়ে বেশি করুণ সেই হাসি হেসে নিজের সীমন্তের উপর রক্তগোলাপের স্তবকটা বুলিয়ে দিল।

নীরেনের চোখের সামনে সিঁদুরে সিঁদুরে সব কিছু একাকার হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

যুদ্ধ ত' প্রায় কিছুই হল না। কিন্তু বন্দী আর আহতের সংখ্যা কম নয়।

তাদের সবাইকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে শত্রুরা ইনটারোগেশন চালাচ্ছিল। বুক উঁচু, মাথা উঁচু কিন্তু মুখ বন্ধ সব জোয়ানের দল। যে জোয়ানরা পোলের ওপারে পালিয়েছে, যারা ওপারেই ছিল আর পাহাড়ি উপত্যকায় তৈরি হয়ে আছে তাদের সংখ্যা, গতিপথ এ সব জরুরী খবর

বের করতে হবে। কিন্তু কোন ভয়, লোভ, তর্জন-গর্জন অত্যাচার কিছুতেই কোন ফল হল না। শেষ পর্যন্ত যত রকম পন্থা আছে কিছুতেই খবর বের করা যায় না দেখে দৈহিক অত্যাচার আরম্ভ করল।

এমন সময় শত্রুসৈন্যরা রক্তাক্ত নীরোকে নিয়ে হাজির হল। ওরা পরামর্শ করে ঠিক করল যে সম্ভবত জোয়ানরা সত্যি সত্যিই সব খবর জানে না। কিন্তু এই অফিসার জানবে। অতএব একেই - - -

না। নীরো কোন খবরই দেবে না। সর্বাঙ্গে রক্তধারা। দেহ বিবশ, মাথার বাঁধন প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন খবরই সে দেবে না।

হঠাৎ একটা প্রহারে মাথাটা সামনে থেকে যেন সটান পিছনে ঘুরে গেল। অন্ধকারে শুধু আহত আর প্রহৃত জোয়ানদের আর্তনাদ ছাড়া প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করে নীরোর চোখের তারার সামনে জ্বলজ্বল করছে রক্ত-রেখা। ওর চোখ দিয়েও কি রক্ত ঝরছে?

কিন্তু ভাববার ক্ষমতা নেই। শুধু নীরোর চোখের সামনে সীমার সীমন্তরেখা। বাকী জোয়ানরা যারা দলং পার হয়ে যেতে পেরেছে তারা ওয়ালং গিরির শহরে পৌঁছালে আবার যুদ্ধ করতে পারবে। শত্রুকে রুখতে পারবে। দেশটা রক্ষা পেয়ে যাবে।

দেশ। দেশ! কিন্তু কোথায় দেশ? রক্তধারাকে ছাপিয়ে দেশ ত' জেগে উঠছে না চোখের সামনে। কই সে সব শ্যাম অরণ্য, নীল আকাশ, ধূসর পাহাড়? সে সব কি সীমার মধ্যে অসীমরূপে মিশে গেল এখন?

সেই সীমাকে বাঁচাতে হবে। তারই মধ্যে বাঁচবে দেশ। সেই সীমার রক্ষার জন্য লড়েছে নীরো। লড়বে নীরোর আত্মোৎসর্গের মধ্যে রক্ষা পাওয়া জোয়ানরা। তাদের নিরাপদে সীমান্তের ওয়ালং শহরে পৌঁছাতেই হবে।

লাট্টুর মত ঘুরপাক খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে গেল মেজর নীরেন চৌধুরী।

না। শুধু ওই জোয়ানরা নয়। সে নিজেও বাঁচবে, সীমাকে বাঁচাবার জন্য, চেষ্টা করবার জন্য। এখনি মরে গেলে চলবে না। এখন বাঁচলে আবার লড়তে পারবে। আবার সীমান্তে ফিরে আসতে পারবে।

সে নিজের মুখে মাথায় নিজেরই ঝরা রক্ত ভাল করে মাখাতে লাগল। রক্তপাত হতে হতে সে মরে গেছে এটা বুঝিয়ে দিয়ে শত্রুকে ঠকাতে হবে।

শত্রুসৈন্যরা দলবেঁধে সরে যাবার জন্য তৈরি হল। মুর্দা হিন্দুস্থানী অফিসারের পেট থেকে কোন কথা বের করা গেল না। রাগের চোটে ওদের নেতা নীরোকে শেষবার নেড়ে-চেড়ে দেখে নিল। তারপর মাটিতে থুথু ফেলে, দিব্যি গেলে ওর গায়ে একটা শেষ লাথি মেরে চলে গেল। বন্দীদের পায়ের শব্দ, গায়ের ছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চীনে পাহারায় ঘেরাও হয়ে।

যেমন করে হোক, এবার সে উঠে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। নীরেন ধীরে ধীরে মুখটা মাটি থেকে তুলে তাকাল। রাশি রাশি রক্ত তার চারপাশে মাটিকে রাঙা করে দিয়েছে। লাল টকটকে। সিঁদুরে টকটকে। এই যে আমার সীমা। আমার সীমার সীমন্তে এই সীমান্তের মাটির উপর সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছি। ওগো আমার সীমন্তিনী।

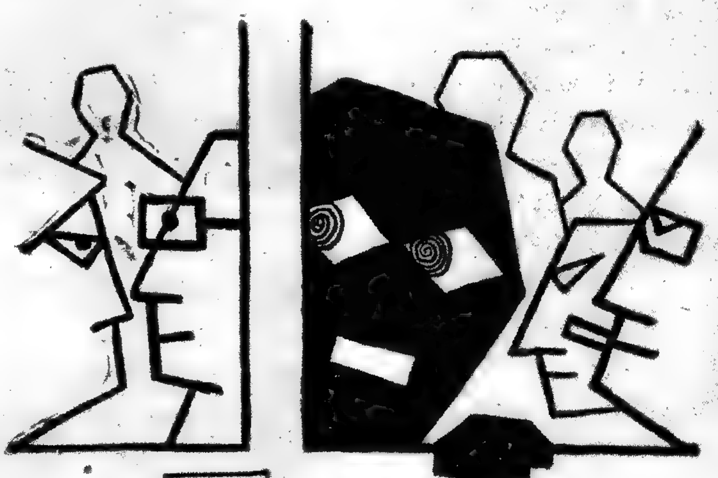

ওদের নিরস্ত্র করুন

লোকটা নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। বিনা-টিকিটের যাত্রী—চিনে নিতে কষ্ট হয় না। টিকিট ফাঁকি দিয়ে লোকটা অন্যের জায়গা দখল করেছে, রেলকে ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করছে, ফলে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—এদের দুষ্টচক্র জাতীয় জীবনে দুর্নীতির এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করছে

আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বসন্ত মল্লিক কিছু বলতে সুরু করার আগেই ডাঃ বসাকের চোখের ইশারায় ডোরা গরম দুধের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে নিয়ে এলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই আকস্মিক দুঃসংবাদের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না এবং ব্লাডপ্রেশারের রুগীর মত অত্যন্ত বিচলিত হওয়ার ফলে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের আভাস দেখা গেছে। চক্ চক্ করে কড়া পানীয়টি খাওয়ার পরে ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখে রঙের আভাস ফুটে উঠল। আকস্মিক অবসাদে ঝিমিয়ে-পড়া শরীর খাড়া করে বলতে সুরু করলেন তিনি—

'না স্যার, এ ব্যাপারে আপনার রহস্য-টহস্য কিছু নেই। প্রত্যেক মানুষের অতীতজীবন একটা থাকেই। আগেকার জানা-চেনা এমন অনেক লোক থাকে, যাদের সঙ্গে পরে ঠিক সেভাবে খাপ খাওয়ানো যায় না। আমার ওয়াইফ্‌কে সে কথা কিছুতেই বোঝাতে পারি না। আরে বাপু, এখন তো তুমি খুশিমত দাবার ছক পেতে নিয়েছ, আগে কি হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি? সে কথা কে বোঝায়—চিঠি এলেই আগে খুলবেন তিনি, ডায়েরী লিখি কিনা তা দেখবেন দেরাজে ঘেঁটে-খুটে, টেলিফোন এলেও ধরা চাই তাঁরই। সোসাইটিতে মেলামেশা করে কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকাবো না, একি হয় কখনো।'

'বিশেষ করে সে মেয়ে যদি সুন্দরী ও তরুণী হয়'—স্বগতভাবে বললেন ডাক্তার বসাক, ডোরার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে।

'কিছু বললেন স্যার'—বসন্ত মল্লিক ঘুরে তাকালেন।

'না, না। আপনি বলে যান।' বরুণেন্দ্র বসাক সিরিয়াস হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'মাধবী, মানে মিসেস সরকার ছেলেবেলায় রাণীগঞ্জের কাছে একটা কোলিয়ারীতে থাকতো জানেন বোধ হয়। ওকে যিনি মানুষ করেন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবার আমাদের সম্পর্ক রয়েছে একটা। ছুটিতে যখন যেতাম, মাধবীও প্রায়ই আসত স্কুলের বোর্ডিং থেকে। ছোট থেকে দেখেছি বলেই ওর উপর একটু দুর্বলতা ছিল। তাই সেদিন সুইসাইডের ব্যাপারে অত শক্ পেয়েছিলাম। আমার ওয়াইফ্ আবার ভুল বুঝে তাই নিয়ে রাত-দুপুরে কি কেলেঙ্কারীই না করলেন। সে যাক গে, মাধবীর কথাই বলি। অদ্ভুত ছিলো মেয়েটা, ওর মনের মধ্যে কখন কি খামখেয়াল চাপত বোঝাই যেত না। বাড়িতে এক মামা-মা ছাড়া আর সকলের কাছে খুবই খারাপ ব্যবহার পেয়েছে বেচারী। ভদ্রমহিলা তো মারাই গেলেন, ভদ্রলোক এধারে নেহাৎ গোবেচারী গোছের ছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে মাধবীর নামে কিছু টাকা ও স্ত্রীর কিছু গয়না ব্যাঙ্ক ডিপজিট করে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন বোর্ডিং-এ। ছেলে-মেয়েরা ধুয়ো তুলেছিল অনাথ-আশ্রমের মেয়েকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি কেন।'

'সে টাকা ও গয়নাগুলোর ভ্যালু কত হবে?' ডাঃ বসাক আবার প্রশ্ন করলেন।

'বেশি নয়, নগদ টাকা বোধ হয় পাঁচ হাজারের মতো। গয়না দু-চারটে যা আছে, তাও খুব দামী নয়। মাধবী তিন-চারদিন আগে আমাকে হঠাৎ ফোন করে বলল—বসন্তদা', তোমার সঙ্গে একটু দরকার। কোথায় দেখা হবে।'

'বাই দি ওয়ে মিঃ মল্লিক, একটি প্রশ্ন আমার ছিলো।'—বরুণেন্দ্র বসাক বাধা দিলেন কথার মাঝখানে—'সমরেশ সরকারকে আপনি কি আগে থেকেই চিনতেন?'

'আজ্ঞে না। ওদের রেজিস্ট্রেশন করে বিয়ে হয়েছিলো এবং মাধবী সাক্ষী হিসেবে আমাকে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানায়। মিঃ সরকারকে সেদিনই প্রথম দেখি। তারপর ন্যাচারালি আমাদের দেখা হয়েছে আরো, যদিও আমার ওয়াইফ্ এ নিয়ে অসন্তুষ্ট হতেন। বাড়িতে ডাকার সুবিধে নেই বলে ওর বাড়িতেই যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু মাধবী বলল, ব্যাপারটা অত্যন্ত কন্‌ফিডেন্সিয়াল। অফিসের পর কোন রেস্টুরেন্টে অথবা টি-রুমে দেখা হতে পারে। ওসব পাবলিক জায়গায় যাওয়ার ঝামেলা বোঝেন তো। কে কোথায় ফস করে লাগিয়ে দিলো, আর বাড়িতে আমার প্রাণান্ত।'

'কি কথা বলেছিলেন মিসেস সরকার?'

'না. না. খুন-জখম সুইসাইড—

এসব কোন কথাই সে বলে নি। বলেছিলো—মানে আমার কাছে একটা জিনিষ ও গচ্ছিত রাখতে এসেছিলো। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় এবং ডেলিকেট। আমি কথা দিয়েছিলাম—মাই ওয়ার্ড অফ অনার।'

'কিন্তু তখন কি জানতেন মার্ডার কেসের চার্জে এভাবে জড়িয়ে পড়বেন। পুলিশ খুব সম্ভবত আপনার বিরুদ্ধে চার্জশিট ফ্রেম করছে। এক নম্বর, মাধবী কেন আপনার অফিসে গিয়েছিল তারা জানতে চাইবে। দুই নম্বর, সে কথা আপনি পুলিশের কাছে গোপন করেছিলেন কেন। তিন নম্বর, আপনার অফিস থেকে সায়ানাইড সংগ্রহ করা সম্ভব, চার নম্বর—'

'হয়েছে হয়েছে'—আর্তনাদ করে উঠলেন বসন্ত মল্লিক—'আপনাদের পুলিশী চাল বুঝি না, শেষ পর্যন্ত দেখব আমার হাতেই হাতকড়া পড়েছে। তাহলে আমার ওয়াইফ্ আমাকে আর আস্ত রাখবে ভেবেছেন? হোটেল-রেস্টুরেন্ট নয়, আমার অফিসেই আমি ওকে আসতে বলেছিলাম। মাধবীকে সেদিন খুব বিমর্ষ, গম্ভীর, আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একটু কফি আনিয়ে বললাম—

'কি ব্যাপার বলত? তোমার কি অসুখ করেছে?'

'আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি বসন্তদা'—বলে ও আমাকে ওর অসুখী জীবনের কথা বলতে লাগলো। সে সব তো আপনি জানেন ডাঃ বসাক, পুরোন কথা আলোচনা করে সময় নষ্ট হবে শুধু শুধু। শেষে একটা প্যাকেট আমাকে দিয়ে বলল—

'এটা যত্ন করে রেখে দিতে হবে তোমাকে। কয়েকটি চিঠি আছে এর ভেতরে।'

'কার চিঠি?' আমি বোকার মত বলে ফেললাম।

'মাধবী হাসল। তারপর কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বলল—'শুনে তোমার লাভ নেই বসন্তদা'। তবে ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন টের না পায়। পরে হয়তো আমার কাজে লাগবে।'

'কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় ওর সারা শরীর কেঁপে উঠল। কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'বলতে পারি না, যেখানে যাচ্ছি, সেই জায়গার প্রভাবে হয়তো বদলে যেতেও পারি। তখন তোমাকে লিখে জানালে চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলো।'

'আমি তখন ওর সামনেই সেই প্যাকেটটা লোহার সিন্দুকের একপাশে গুঁজে রেখে দিয়ে বললাম—

'নিশ্চিন্ত থাকো মাধবী, এ চিঠির কথা কাকপক্ষীও টের পাবে না। কিন্তু মিঃ সরকারের সঙ্গে তোমার কি কিছুতেই একটা বোঝাপড়া হতে পারে না? ঝগড়া-ঝাঁটির কথা যদি বল, তাহলে আমার আর তোমার বৌদির জীবনে তো সর্বদাই সাইক্লোনের আবহাওয়া চলে। তবুও তো একরকম কেটে যাচ্ছে।'

'মাধবী গম্ভীর হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল—

'আমার স্বামী নিজেকে নিজে স্লো পয়জনিং করছেন—আমাকে আর সুনন্দকে বিপদে ফেলার জন্য। ওঁর হাব-ভাব দেখলেই বুঝবে নর্মাল একেবারেই নয়। আমার মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করে বসন্তদা'। একটা কালোছায়া যেন একটু একটু করে সবকিছু ঘিরে ধরছে। সেই ভয়েই তো পালিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। ওখানে সুখ বলতে আমরা যা বুঝি, তা হয়তো নেই। কিন্তু শান্তির অভাব ঘটবে না।'

'তুমি আর ফিরবে না?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'কে বললে ফিরব না'—মাধবী জোর দিয়ে বলল—'দরকার বুঝলে আবার ফিরে আসব।'

'এরপরে সেই পার্টির দিন ওকে একটিবার মাত্র দেখেছি। কোন কথা হয় নি। প্যাকেটটা কাল খুলে চিঠিগুলো দেখছিলাম ডাঃ বসাক। সুনন্দ মিত্রের লেখা কয়েকটা প্রেমপত্র। স্কাউণ্ড্রেলটা মাধবীকে ভরসা দিয়েছিলো সমরেশ সরকারের সঙ্গে ডিভোর্স হলে ওকে বিয়ে করবে। এদিকে তলে-তলে শ্রীপতি সিংহের নাতনীর সঙ্গে নাকি দস্তরমতো পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—সেকথা আমার ওয়াইফের কাছেই শুনেছিলাম। যদি আত্মহত্যা করে থাকে, তাহলে মাধবী মনের ঘেন্নাতেই তা করেছে।'

'কিন্তু আত্মহত্যা উনি করেন নি—সে বিষয়ে আমি আর পুলিশ

লোকেরা প্রায় নিশ্চিত।' বরুণেন্দ্র বসাক গম্ভীর গলায় বললেন।

'তাহলে সুনন্দ মিত্রই ওকে মেরেছে। সে ডাক্তার, বিষ জোগাড় করা তার পক্ষে খুবই সহজ। মোটিভও যথেষ্ট রয়েছে। মাধবী যদি ব্ল্যাকমেইল করে, তাহলে মাল্টি মিলিওনেয়ার শ্রীপতি সিংহের নাতনীর সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর একটা কথা আমার ওয়াইফের নজর এড়ায় নি—সেদিন গ্লাসে সরবৎ ঢেলে দিচ্ছিল সুনন্দ মিত্র নিজে। তাছাড়া যখন মাধবীর খোঁজে আমরা সবাই ওপরে গিয়েছিলাম—সুনন্দ মিত্র ধারে-কাছে কোথাও ছিল না। গিল্‌টি মাইণ্ড হলেই মানুষ এ ধরণের অদ্ভুত ব্যবহার করতে থাকে তাই না?'

'কথাটা ভুল বলেন নি মিঃ মল্লিক।' বরুণেন্দ্র বসাক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন—'আজ এ পর্যন্ত থাক। আপনি আটটা নাগাদ আমার চেম্বারে সেই চিঠির প্যাকেটটা পৌছে দিয়ে যাবেন। ডোরা রিসিভ করবে। পরে খবর দিলে কিন্তু দেখা করবেন।'

'কিন্তু পুলিশ।' বসন্ত মল্লিক হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন—'তারা কি আমার কথা বুঝবে। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তারা যদি বলে মাধবীকে আমিই সেদিন সায়ানাইড যোগাড় করে দিয়েছিলাম।'

'সে ভার আমার উপরেই দিন না কেন।' বরুণেন্দ্র ভরসা দিয়ে বললেন—'আমি ওদের সব কথা বুঝিয়ে দেব। আপাতত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যান।'

'ঘরে ফিরব নিশ্চিন্ত হয়ে। ও বাবা, আমার ওয়াইফকে তাহলে এখনো চেনেন নি'—বেশ ভীতু ভীতু চেহারা করে বসন্ত মল্লিক তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

অপর্ণা লাহিড়ীর গাড়ি ফুল স্পিডে এগিয়ে চলেছে যশোর রোড ধরে। শহর ছাড়িয়ে শহরতলী. তারপর দৃশ্যপটের আরও বদল হয়েছে। এখন দুধারে ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, ছোটখাট জল-জমা নালি আর একটি-দুটি হাটের সওদা মাথায় বয়ে নিয়ে যাওয়া নির্বিকার পথচারী।

কমলেশ বসুর আপত্তি ছিলো। মন যখন স্পিডোমিটারের কাঁটার মতো থর থর করে কাঁপতে থাকে, তখন মানুষের হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক বৈকি। কিন্তু অপর্ণা সেকথা শোনে নি। অপরের শাসন বা নিষেধ মেনে চলার মত নম্রতা তার বেপরোয়া চরিত্রে কোনোকালেই ছিল না। আজকে যেন তার স্বভাব আরও উগ্র, আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। অসংযমকে চিরকালই ভীতির চোখে দেখেন কমলেশ বসু। জানলার কাচে সবুজ চলন্ত ছবির দিকে চোখ ফিরিয়ে সামান্য ইতস্তত করে বললেন—

'গাড়ি আপনার, কিন্তু পৈত্রিক প্রাণটা তো আমারই। দয়া করে সে কথা স্মরণ রাখবেন।'

অপর্ণা শুনলো না। নাইলন শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উদ্দাম দুলছে, কপালের চুল রুক্ষ, এলোমেলো অসংযত। স্পিড না কমিয়ে আরও জোরে এগিয়ে যেতে যেতে অপর্ণা বলল—

'কমলেশবাবু, থামতে আমি চাই না। জীবনে চলাটুকুই আমার সুখ। যেখানে যখন শেকড় গাঁথতে চেয়েছি, সেখানেই ঘা খেতে হয়েছে প্রচণ্ড। যদি সব কিছুর থেকেই এমনি ভাবে পালিয়ে যেতে পারতাম।'

'সব কিছুর থেকেই পালানো যায় মিসেস লাহিড়ী, কিন্তু ধরা পড়তে হয় কেবল নিজের মনের কাছে। আমার পক্ষে উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতা, তবু যখন নিজে থেকে আজ এই সান্ধ্যভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাই সসংকোচে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আপনি কেন জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলছেন এভাবে?'

'অর্থাৎ'—সজোরে ব্রেক কষে দেওয়াতে গাড়ি থেমে গেলো। ভীষণ শক পেলেন কমলেশ বসু দেহে এবং মনে। তবু কোনগতিকে সামলে নিয়ে বললেন—

'সমরেশ সরকারের নিঃসঙ্গ জীবনকে একমাত্র আপনিই বোধ হয় ভরিয়ে তুলতে পারেন। মাধবীর মৃত্যু অবশ্য কুয়াশার মত এখনও সব কিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার বা সমরেশের ভবিষ্যৎ জীবনে সে ঘটনা এমন কিছু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। প্রমাণাভাবে কেসটা হয়তো সুইসাইড বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে শীগ্‌গিরি।'

হেসে উঠল অপর্ণা লাহিড়ী। রুক্ষ পাথুরে জমির উপরে উগ্র পাহাড়ী ঝর্ণার ঢেউ খেলে গেল যেন।

'আপনি নিজেকে গল্প-লেখকের রোলে নামিয়ে বেশ মানানসই উপসংহার রচনার চেষ্টায় নেমেছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মানুষের জীবন গল্প নয় কমলেশবাবু। মাঝে মাঝে অনুতাপ হয় বিধাতা-পুরুষ কেন ভিক্টোরিয়ান যুগের আদর্শ সাহিত্যিক হলেন না। তাহলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো মেপে মেপে রাস্তা চলত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতো। আর আমাদেরও এরকম হয়ছাড়া খোড়ো হাওয়ায় নোঙর-ছেঁড়া জাহাজের মতো দিগ্বিদিকে ভেসে বেড়াতে হোত না। আপনি কি শুনেছেন মাধবীর মৃত্যুর ফলে যাদের নাম সন্দেহের তালিকায় উঠেছে, তাদের মধ্যে আমি একজন।'

'বলেন কি।' কমলেশ বসু চমকে উঠলেন—'তবে যে শুনলাম সুনন্দ মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

'সুনন্দ মিত্র, সমরেশ, আপনি, আমি—আমরা সবাই পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছি। কাউকে বলবেন না কথাটা, বরুণেন্দ্র বসাকের সঙ্গে কাল সারা সন্ধ্যা এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে।'

'আমাকে আর বেশিক্ষণ অন্ধকারে ফেলে রাখা কিন্তু অনুচিত হচ্ছে'—গাড়ির স্পিড বাড়তে দেখে কমলেশ অস্বস্তিভরা গলায় বললেন।

'ভয় নেই, ফিরে যাচ্ছি। আমার ফ্ল্যাটে আজ আপনার নিমন্ত্রণ। সব কথা খুলে বলব সেখানেই। কিন্তু বুঝতে পারছি না, অন্ধকার না আলো—কোনটা মানুষের পক্ষে শ্রেয়।' (ক্রমশঃ)

দিল্লী থেকে—

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

এত কাছে থেকেও যাঁকে জীবনে কখনও মালা দিই নি মরণে কেন তাঁকে ফুল দিতে এলাম? বাগান থেকে সদ্যপ্রস্ফুটিত ক'টা গোলাপ নিয়ে হঠাৎ ছুটেছিলাম তাঁর বাড়িতে।

সকালবেলার খবর ভালোই ছিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে আগে কিছু বলি নি। গাড়িটা চলতে সুরু করার সাথে সাথে বললাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে সে বলল, "এ সব ব্যাপার নিয়ে তামাসা করাটা কি ভালো? বিশেষ করে যখন তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা?"

সে বলল, "তুমি কি মনে করেছো আমরা একেবারেই অশিক্ষিত? জানবে আমরাও খবরের কাগজ পড়ে থাকি। সত্যি বলো তো আজকের সকালের কাগজে ছিল না—তিনি দেরাদুন থেকে বেশ সুস্থ শরীরেই দিল্লী ফিরেছেন!"

কিছু বললাম না। বলার ছিল না কিছু। নিজেই যে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—জওহরলাল নেহরু নেই! কিন্তু সেইটেই যে সত্যি, বিশ্বাস না করলেও।

এগারোটার সময়ে একজন সতীর্থ সাংবাদিক এসে খবরটা দিলেন। খবরটা তিনি বয়ে এনেছেন পার্লামেণ্ট থেকে। নির্ভরযোগ্যই বলতে হবে।

ঘণ্টাতিনেকও কাটলো না। এর ভিতরই সব শেষ হয়ে গেল।

গাড়ি গিয়ে থামলো তিন মূর্তির সামনে—প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের বাড়ির সামনে। একাধিকবার এখানে আসতে হয়েছে কাজে। এবারের আসা বেদনাঘন। সাদর অভ্যর্থনায় যেখানে প্রতিটিবার প্রবেশ করেছি, আজ সে দুয়ার বন্ধ কেন?

ভিতরে তারা আমাকে প্রবেশ করতে দিলেন না। প্রথমত আমি পরিচয়-পত্র টেবিলের ওপর ফেলে এসেছি। দ্বিতীয়ত ভেতরে এখনও ভি আই পি ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সাংবাদিকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যেতে পারছেন পরিচয়-পত্র দেখিয়ে।

হতবাকভাবে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলুম। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম মনে নেই। তবে যখন জনতার জলপ্লাবনে আমাকে ভিতরের দিকে ঠেলে নিয়ে চললো তখন রাত নেহাৎ কম নয়।

আমি শুধু ভাবছিলুম এত কাছে থেকেও জীবনে যাঁকে কোনো দিন মালা দিই নি, মরণে তাঁকে ফুল দেবার এ উৎসাহ কেন? জনতার প্রিয় নেতা জনতার চিন্তায়ই প্রাণ বিসর্জন দিলেন না কি?

আজ যাঁরা বিশ্ববন্দিত শান্তির যে অগ্রদূতকে জানাতে এসেছে তাঁদের শেষ প্রণতি, তাঁর মৃত্যুর জন্য তাঁরাই কি দায়ী নন? ভ্রাতৃকলহের কালো-ছায়াতে এ চিরভাস্বর মূর্তিটিকে তিলে তিলে করে তুলেছিল ম্রিয়মাণ। ফুটন্ত গোলাপকে ধীরে ধীরে ঝরে পড়তে দেখেছেন কি? ঠিক যেন তাই। অকাল বসন্তের ফুল এক পশলা বৃষ্টিতে যেন ছিটকে পড়লো এদিক—পাপড়িগুলোতে এখনও মৌমাছির দল মধু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সে আজ অনেক দিনের কথা।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের

অন্তিম শয়নে নেহরু

প্রথমার্ধ। আমরা তখন ছিলাম এলাহাবাদের কর্নেল গঞ্জে। বাড়ির সামনেই ছিল একটা বিরাট অট্টালিকা। সেখানে ব্যাণ্ডের সাথে সাথে রোজ সকালে হাওয়ায় উড়তে থাকত জাতীয় কংগ্রেস পতাকা। আবার সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডের সাথে সাথে নামানো হত সেই ত্রিবর্ণ পতাকা। শিশুর মনে সেদিনের সে দৃশ্য আজও চিরজাগ্রত। প্রাসাদটার নাম ছিল আনন্দভবন। যাঁর প্রাসাদ তাঁর নাম তখনও ভুবনবিখ্যাত। ভারতবর্ষে নিজের নামটি শেখবার আগে থেকেই অনেকে জওহরলালের নামের সাথে পরিচিত।

সালটা বোধ হয় উনিশ শো তেত্রিশ। মুঙ্গেরে ঘটেছে ধ্বংসাত্মক ভূকম্প। সে ধ্বংসাত্মক বিভীষিকা সমগ্র ভারতবর্ষকে স্পর্শ করেছিল। ঘরে ঘরে সবাই বেরিয়ে এসেছিলেন দানপাত্র হাতে। আমার মাতৃদেবী উত্তর প্রদেশের দুহিতা। বাংলার চেয়ে তিনি অনেক ভালো হিন্দী জানতেন। তাই কমলাজী হয়তো সেদিন তাঁর মুখে বাংলা শুনে অবাক হয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে টাঙানো একটা বিদেশী শিরস্ত্রাণ দেখে তিনি সমান-ভাবে অবাক হয়েছিলেন। সেটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে পিতৃদেব কমলাজীর হাতে একটা জাতীয় শিরস্ত্রাণ পেয়েছিলেন, আজকাল লোকে যাকে বলে থাকেন গান্ধী-টুপি। সেদিন থেকে জওহর-লালের নামের সাথে ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর সাথে আমরা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরাও পরিচিত হলাম।

রাজনীতি সর্বদাই আমার কাছে একটা ত্রাসের ব্যাপার। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের সমানভাবে শ্রদ্ধা করি। যত মত তত পথ। গন্তব্য একই। জওহরলালজীর চিত্র আমার মানসপটে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র। স্বাধীনতার "সিপাহী" হিসাবে (কথাটা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল) তিনি জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ; শান্তির বাণী প্রচার করে তিনি সমগ্র বিশ্বে তাঁর শীর্ষ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন আমার ছোট্ট মনের গহনে যে জওহরলালের ছবিটি চিরভাস্বর সেটি হল কবি জওহরলাল।

অত শত কাজের মাঝেও, অত শত কার্যসূচীর চাপেও আর্টিস্ট মনটি ঠিক যখন তখন যেন উঁকি মেরে গেছে। ঐ উঁকি-ঝুঁকি মারার ছবিটি আমাকে মুগ্ধ করেছে, যেমনটি সে করেছে সমগ্র বিশ্বের দরদী হৃদয়কে।

হিমালয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা, তাঁর কবিতাপ্রীতি, তাঁর সঙ্গীতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অজানার সাথে লুকোচুরি, বিজ্ঞানের রহস্যানুসন্ধানী মন যে কোনো মানুষের হৃদয় হরণ করবে।

আমি সুন্দরকে ভালবাসি। সুন্দরের পূজারীকে তাই আমার ভাল লাগে। একাধিকবার তাঁর সান্নিধ্যলাভ ঘটেছে। তাতে নিশ্চয়ই ধন্য হয়েছি। কাছে গিয়ে দেখেছি, তাঁর ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য-সম্ভারে তাঁকে যেন আরও কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছে।

● প্রেস কনফারেন্সে দেবিকারাণী

আজ সে ঘটনাগুলো ছবির মত ভেসে উঠছে। আর্টিস্ট স্বেতোস্লাভ রোয়েরিক-এর ছবির প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করবেন জওহরলাল। চিত্রশিল্পীর সহধর্মিণী দেবিকা শহরের ভি আই পি-দের নিয়ে বিরাট কমিটী করেছেন। তাঁরা পণ্ডিতজীকে গেটে অভ্যর্থনা জানাবেন। দেবিকারাণীর কোনো কাজে খুঁত ধরা শক্ত। তিনি এ অভ্যর্থনা কমিটীর সদস্যদের রিহার্সেল করিয়ে ছাড়লেন। আমি জনতার লোক। তাদের মুখপাত্র সাংবাদিকদের অভ্যর্থনার ভার, আমার। সম্পূর্ণ একা গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। দশটা বাজতে তখনও মিনিট পনেরো-কুড়ি বাকী। হঠাৎ গেটের সামনে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি এসে থামলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দু'হাত বাড়িয়ে সেদিন বিশ্বের শান্তির অগ্রদূতকে জানিয়েছিলাম সাদর স্বাগতম। তিনি শুধু একাধিকবার বললেন, "একটু আগে এসে পড়েছি না ? কেন আগে এসেছি জানো ? ছবিগুলো সম্বন্ধে কিছু বলার আগে সেগুলো দেখতে চাই।"

প্রদর্শনী-গৃহে একশো তিরিশখানা ছবি ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে তিনি সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন যে, শত শত লোক তাঁর জন্য হলে অপেক্ষা করছে। চিত্রশিল্পী ভাগ্যবান। জওহরলাল তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "তুমি ভাগ্যবান। ইয়োর পেণ্টিংস আর পোয়েম্‌স্ ইন কালার।" ক'টা আর্ট-ক্রিটিক ছবির এ বর্ণনা দিতে পারেন?

দিল্লীতে সাহিত্যিকের সভায়, বৈজ্ঞানিকের মহাসভায়, দার্শনিকের সান্নিধ্যে যে জওহরলালকে দেখেছি সে স্বপ্নভরা দার্শনিক চোখ দুটো শুধু মোনালিসার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর্টিস্ট জওহরলাল সমগ্র বিশ্বে সাংস্কৃতিক মিলনের মহান সুরের সন্ধান দিয়েছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ঐতিহ্য তাঁর প্রতিটি রন্ধ্রকে অভিভূত করেছিল। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর তাঁকে সর্বদাই হাতছানি দিয়ে ডেকেছে ঠিক যেমনটি তাঁর রক্তপ্রবাহে সাড়া দিয়েছে উত্তাল গঙ্গার কলতান।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অগাধ স্নেহের পাত্র। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে উনিশ শো চৌত্রিশ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখটি বিশেষ স্মরণীয়। কমলাকে সাথে নিয়ে জওহরলাল সেদিন এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী তখন শান্তিনিকেতনে স্নাতক। কবিগুরু তাঁদের জানান প্রাণভরা আশীর্বাদ।

বিবেকানন্দের "অভীঃ" মন্ত্র জওহরলালের সমগ্র জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আপন ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়ার পাতায় পাতায় তিনি বিবেকানন্দের এ মহান দানের ঋণ স্বীকার করে গেছেন।

সাহিত্যিক জওহরলাল আপন সৃষ্টিতে যখন গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন তখন যে দার্শনিক মন তাঁকে আচ্ছন্ন করে থাকতো তার প্রকাশ একদিন এসেছিল ভারতের তপোবনের শ্যাম-মন্ত্রে। হিমালয়ের বর্ণনায়, ভারতবর্ষের বর্ণনায়, নদনদীর উল্লেখে, প্রিয় জীবনসাথীর মৃত্যুর বর্ণনায় যে জওহরলালকে দেখি তার নাগাল রাজনীতির অনেক উর্দ্ধে। ফুলের প্রতি তাঁর আজীবন ভালবাসা, শিশুর প্রতি বাৎসল্য শুধু তাঁর কবি-মনটিকে তুলে ধরে না কি? কে বলেছিলেন, "ফ্লাওয়ারস্ আর লভ্‌স্ ট্রান্সেণ্ট ল্যাংগোয়েজ?" গ্যেটেই বোধ হয় বলেছিলেন, "ইন প্রেইসিং অর লভিং এ চাইল্ড উই লভ্ এ্যাণ্ড প্রেইস্ নট্ দ্যাট্ হুইচ্ ইস্, বাট্ দ্যাট হুইচ উই হোপ ফর্।" আগামী দিনের ভারতবর্ষের ছবি তিনি দেখেছেন যে শিশুর মুখে সেই তাঁর মন হরণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেহরু। একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। ভারতের ইতিহাসের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

শান্তিঘাটে কখন সবার সাথে মিলে এসে পৌঁছে গেছি খেয়াল করি নি। দূর থেকে দেখলাম পরম পবিত্র অগ্নির লেলিহান শিখা।

মনে মনে বললাম,

"অগ্নিমীড়ে
পুরোহিতম্।"

শান্তিঘাটে বসে সেদিন অশান্ত মনে যেন দূর-দূরান্ত থেকে কার মহান সঙ্গীত লহরী শুনছিলাম। শুনছিলাম এ যুগের জীবনদর্শনদাতা মহান কবির কণ্ঠ আকাশ-বাতাস, দ্যুলোক-ভূলোক ভেদ করে অসীম অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল যে মহাসঙ্গীত—

"সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

ভিড়ের চাপে হাতের গোলাপগুলো কখন ঝরে গেছে। কাল সন্ধ্যায়ও তারা কুঁড়ি ছিল। তারা আর ফুটবে না।

কেশবিন্যাসে
আমাদের
ঐতিহ্য

লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত এই প্রাচীন ভাস্কর্যটি ভারতীয় কেশবিন্যাসের একটি ঐতিহ্যময় সাক্ষ্য। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্য্যের।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারল চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল
সুরভিত গন্ধযুক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

সেণ্ট জেম্‌স্‌ পার্কের অপরূপ সুন্দর লেকের ধারে "হোয়াইট হল"-এর নয়ন বিমোহন দৃশ্য।

জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে লণ্ডনে প্রতিক্রিয়া

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন কিছুদিন পূর্বে শেষ হয়েছে। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসী প্রতিটি মানুষেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবারকার কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে নেহরুজী নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু বিগত ২৭শে মে'র আকস্মিক দুঃসংবাদ চিরদিনের মতো সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। নেহরুজী আর নেই—এই তীব্র বেদনা এদেশের জনমনকেও যে কি অসাধারণ-ভাবে বিচলিত করেছে, তা আজো পর্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করা যায় এদেশের খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদচিত্র প্রভৃতির প্রতিটি প্রকাশে, প্রতিটি ব্যঞ্জনায়। বিগত ১৯৬৩ সালে পোপের মৃত্যু এবং তার কয়েক মাস বাদে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডির আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার ব্যাপারও এদেশের সংবাদপত্র-জগতে আর জনসাধারণের মনে এমন বিস্ময়কর আলোড়ন-বিলোড়নের সৃষ্টি করে নি, যতটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে নেহরুজীর মৃত্যু। নেহরুর পরে কে? —এ প্রশ্ন গত কয়েক বছর ধরে এদেশের রাজনৈতিক মহলে প্রভূত জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে আস্‌ছিল। গত ২৭শে মে তারিখে সেই জটিল প্রশ্ন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো। নেহরুর পর কে?—সে প্রশ্নেরও সমাধান হল একদিন।

জওহরলাল নেহরুকে এদেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বটেই, সাধারণ ইংরেজরাও বড্ড বেশি আপনার জন বলে ভাবতেন। নেহরুর শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা অনেকটা বিলেতী আদর্শে মাজিত বলে তিনি এদেশীয়দের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন, এমনি মনে করে নেওয়া খুব সমীচীন নয়; কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে তিনি হ্যারোতে এবং কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা করেন, পরে তিনি এদেশে ব্যারিস্টারী পাশ করেন, কাজেই ইংরেজ জনসাধারণ নেহরুজীকে তাঁদেরই একজন বলে ভাবতেন, এমনি ধারণা করে নেওয়াও খুব বাঞ্ছনীয় নয়। আসলে তিনি ভারতীয় হয়েও অত্যন্ত সুগভীরভাবে তত্ত্বানুশীলনে, যে-কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়, অসাধারণ কর্মতৎপরতায়, আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগে ছিলেন খাটি ইয়োরোপীয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি মানুষ জানেন এমন অতুলনীয় দেশপ্রেমিক বীর পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। ভারতভূমির প্রতি তাঁর অনন্ত ভালোবাসাই তাঁকে আজ সমস্ত বিশ্ববাসীর সামনে চিরবরণীয় ও চিরস্মরণীয় করে তুলেছে।

একজন বিশিষ্ট বাঙালীর কাছে লণ্ডনে নেহরুজী সম্পর্কে শোনা একটি গল্প। এই বিশিষ্ট বাঙালীর নাম ডক্টর শশধর সিংহ। এখন ডক্টর সিংহ স্থায়িভাবে লণ্ডনে বাস করছেন। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়মের উল্টো দিকে লিটল রাসেল স্ট্রীটে ডক্টর সিংহের একটি বইয়ের দোকান ছিল। সেকালে বহু ভারতীয় তাঁর বইয়ের দোকানে আসতেন আড্ডা দিতে, আড্ডা জমাতে। একদিন এলেন সুভাষ বসু, সুভাষবাবু বইয়ের দোকানে সাজিয়ে রাখা বইগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। নানান্ বিষয়ের উপর নানা ধরণের বই। ডক্টর সিংহ জিজ্ঞেস করলেন 'কি সুভাষবাবু, একটু চা খাবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন সুভাষচন্দ্র, 'হ্যাঁ, চা খাবো বইকি, নিশ্চয়ই খাবো। একমাত্র চা-র উপরেই তো আছি। বই-টই পরে পড়া যাবে। কি?'

দিন কয়েক বাদে ডক্টর সিংহের বইয়ের দোকানে এলেন জওহরলাল নেহরু। বই দেখতে দেখতে নেহরু বলে উঠলেন, 'ডক্টর সিন্‌হা, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদেশের যত বই আছে, সব বই দয়া করে দিন না পাঠিয়ে আমার সাউথ কেনসিংটনের ফ্ল্যাটে। সব বই, স-ব বই আমাকে এই কয়দিনের মধ্যে পড়ে ফেলতেই হবে।'

এদেশের প্রাচীনপন্থীদের ধারণা, যদিও নেহরু ছিলেন ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক, আসলে তিনি পশ্চিমী সভ্যতারই সৃষ্টি। হ্যারো ও কেম্‌ব্রিজে শিক্ষালাভের ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্য সংগীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের যথার্থ সমঝদার। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যদি এইবারে নেহরুজী উপস্থিত থাকতে পারতেন, তবে বৃটিশ সরকার নাকি নেহরুজীকে অর্ডার অব মেরিট উপাধির দ্বারা ভূষিত করতেন। তেমনি সব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত একজন মাত্র ভারতবাসী এই সম্মানজনক উপাধি লাভ করেছেন। তিনি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ। গত বছর যখন তিনি

ইংলণ্ডে আসেন, তখন তাঁকে এই উপাধির দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল।

দশ বৎসর পূর্বে নেহরুজীকে একবার হ্যারোর প্রাক্তন ছাত্রদের এক সম্মেলনে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করা হয়। যখন হ্যারোর ছাত্ররা সবাই মিলে একসঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে গান স্লুরু করে, 'Forty years on'—তখন দেখা গেল নেহরুজী স্যার উইনস্টন চার্চিলের হাত ধরে আছেন, দুই জনেরই চোখে জল।

লণ্ডনের ওয়েস্টবোর্ন পার্কের ট্যালবোট রোডের যে বাড়িটিতে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এক সময়ে থাকতেন, সেই বাড়িটিকে "তিলক স্মৃতি-ভবন" রূপে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছে। দুই বছর পূর্বে নেহরুজী যখন লণ্ডনে আসেন, সেই সময়ে তিনি এই বাড়িটিতে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং বাড়িটিকে "তিলক স্মৃতি-ভবন" রূপে রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেন। দুই বছর পূর্বে নেহরুজী ঐ বাড়িটিতে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই বলে ওঠেন, 'আমার বলতে গর্ব হয়, এই বাড়িটিতে এক সময়ে আমিও বাস করেছিলাম, আর আমি এখানে বাস করি লোকমান্যজী এখানে আসবার দশ বৎসর পূর্বে।' "তিলক স্মৃতি-ভবনে"র একটি বিশেষ অধিবেশনে তিনি এই জুলাই মাসে উপস্থিত থাকবেন বলে পূর্ব থেকেই তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা আর হ'ল না।

জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে লণ্ডনে পৃথিবী-বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র "দি অবজার্ভার" (The Observer) মন্তব্য করেন :

"নেহরুর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে একটা অনিশ্চয়তা এবং পরিবর্তনের সময় আসবে। এবং এর প্রতিক্রিয়াও সারা জগৎ জুড়ে হতে বাধ্য। কেননা, নেহরুই যে শুধু বিরাট মানুষ ছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষ এখনো বিরাট দেশ, সে নেহরু থাকুন বা না থাকুন। ভারতবর্ষে যা ঘটছে অথবা ঘটছে না, তার প্রতিক্রিয়া অন্যত্র হবেই। নেহরুবিহীন পৃথিবী যে অন্যরকম-অন্যরকম লাগছে না, তার খানিকটা কারণ হ'ল আন্তর্জাতিক সুস্থিতি, যা সম্ভব হওয়ার পেছনে ওঁর চেষ্টা রয়েছে, আর দ্বিতীয়ত তাঁর নিজের মৃত্যুর আগেই তাঁর পৃথিবী বিলীন হতে আরম্ভ করেছিল। তিনি ছিলেন যে আন্তর্জাতিক ছকটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে উঠেছিলুম তার একটি কীলক—সেই ছক এপার পশ্চিম, ওপার কমিউনিস্ট—মধ্যিখানে ঝাপসা একটা চর, যাকে কখনো বলা হচ্ছে অপ্রতিশ্রুত, কখনো অযোগনাহ, কখনো উদাসীনো মধ্যস্থঃ।

অনেক বছর ধরেই নেহরু মাধ্যাকর্ষণী সাম্যশক্তি হয়ে বিরাজ করছিলেন, শুধু তাঁর নিজের দেশে এবং আফ্রো-এশীয় জাতিসমূহের বৃহত্তর বৃত্তেই নয়, দুটো প্রধান শক্তিজোটের মাঝখানেও।

পৃথিবীর এই ছকটাই পালটে গিয়েছে তাঁর মৃত্যুর আগেই। ভারতবর্ষের ওপর চীনা আক্রমণ, কিউবা সঙ্কট এবং তদনুষঙ্গে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের পরিবর্তন, রুশ-চীন আড়ি—এই সবই একটি যুগাবসানের বিষাণ ঘোষ। রুশ-মার্কিন আড়াআড়ির আড় ভাঙলো। কমিউনিস্ট এবং পশ্চিমা জোট দুই-ই ভাঙতে এবং ধরনধারণ বদলাতে সুরু করল। এবং 'তৃতীয় পৃথিবী' তার প্রাকৃত টানাপোড়েন এবং বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করতে লাগলো। এই নতুন পৃথিবীর ছবি নেহরুর তিরোধানে হয়তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং এর কয়েকটি টান-টোন, বিশেষ করে এশিয়ায—হয়তো দুর্ঘাতী হতে পারে।"

লণ্ডনের "দি ডেইলী টেলিগ্রাফ" দৈনিক সংবাদপত্র নেহরুজীর মৃত্যুকে সমগ্র এশিয়ার একটি যুগের অবসান বলে মন্তব্য করেছেন। "দি ডেইলী টেলিগ্রাফ" বলেন, "নতুন অথবা নবজাগ্রত জাতির নায়কদের মত জওহরলাল নেহরুও নায়কের চেয়ে 'কিছু বেশি' ছিলেন, ছিলেন জাতির সঙ্গে অভিন্নাত্মা। সেই কবে থেকেই তিনি শুধু গান্ধীর দক্ষিণহস্ত এবং সর্বসম্মত উত্তরাধিকারীই নন, গান্ধী-দার্শনিকের চোখে বলতে গেলে একেবারে রাজা। ভারতবর্ষে তাঁর স্থান যা, তার ধারে-কাছেও আর যাওয়া সম্ভব হবে না কারো পক্ষে। একদিক থেকে বলতে গেলে তিনি ছিলেন উঠতি পৃথিবীর স্বাধীনতার বিগ্রহ। মুক্ত উপনিবেশগুলির মধ্যে তিনি প্রথম, মনীষায় ভাস্বরতম এবং বহু গুণে বিপুলতর ভূমির ভৌমিক। উঠতি দেশগুলির অগ্রনেতা হিসেবে তাঁর এবং ভারতবর্ষের যা করণীয় সে সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন তিনি, আর আফ্রো-এশীয় দলবন্ধে তাঁর যা ব্যক্তিগত স্থান, তা-ও আর কারো পক্ষে লাভ করার আশা দুরাশা। উভয়বিধ নেতৃত্বের ব্রত তিনি প্রাজ্ঞোচিতভাবে সম্পাদন করেছিলেন কি না, তা যেমন অতীতে হয়েছে তেমন ভবিষ্যতেও তুমুল বিতর্কের বিষয় হবে। তিনি শান্তির সন্ত ছিলেন কি না তা-ও। গোয়া শিরোনামাঙ্কিত হবার বহু আগে তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন যে, কোন কোন দিক থেকে তিনি উগ্র ক্ষত্রিয়। কিন্তু দুটি বিষয় নিঃসন্দেহে তর্কাতীত, একটি হ'ল তাঁর মানুষের জন্য বুকভরা দরদ, অন্যটি ইতিহাসের উপরে তাঁর প্রবল প্রতিক্রিয়া। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের—সেই সঙ্গে উঠতি পৃথিবীরও কিছুটা—ইতিহাস অধ্যায় পালটালো।"

লণ্ডনের "হোয়াইট হলে" বৈদেশিক দপ্তরের বাড়ি। এই বাড়িতে কমনওয়েলথ্ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে গেল।

● শিল্পনগরী দুর্গাপুরের একটি দৃশ্য

একটি সমীক্ষা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একদিন আনন্দ-মঠের উজ্জ্বল জীবন-স্রোতের গভীরে আমাদিগকে মাতৃরূপ দর্শন করিয়ে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন : এই দেখ মাকে। মা শুধু মৃন্ময়ী নয়, মা চিন্ময়ী। চিদানন্দময়ী। সেই মা, সেই দেশ-জননী। কিন্তু সেই মায়ের ত্রিরূপমূর্তি সেদিন আমাদের ধমনীতে উত্তাল স্রোত সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে আমরা সেদিন মাকে দেখেছিলাম —ত্রিকালমূর্তি, মা যা ছিলেন, মা যা আছেন, মা যা হবেন।

আজ বাংলা দেশের দিকে-দিকে বুঝি মায়ের সেই বিবর্ণ মূর্তি। স্বাধীনতার সতের বছর পর আজ বাঙালীর আত্মদর্শনে বুঝি একটি শব্দই রয়েছে। সেই শব্দ, সেই কথামালা—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তা না হ'লে বাঙালী আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের বিলুপ্তি ঘটিয়ে হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের সেই ফটিকচাঁদের মতই মুক্তির উপায় খুঁজছে। অথচ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাঙালী বোধহয় এমন ছিল না। আজো মহাজাতি সদনে সেই অতীত যুগের বাঙালী মানসের প্রতিচ্ছায়ার দিকে তাকালে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালী-চেতনা বোধহয় আমাদের রক্তে আবার ঢেউ খেলে। সেই বাঙালী-চেতনা—

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।'

স্বাধীনতার সতের বছরের মধ্যেই সেই বাঙালী মরেছে। বাঙালীর আত্ম-সমীক্ষার প্রতিটি অধ্যায়ে আজ বাঙালীর সেই মৃত চোখের চাহনি আমাদের প্রেতের ভয় দেখায়। সেই প্রেত বুঝি বাঙালীর আত্মায় ভর করেছে। তা না হলে যখন জাতীয় সংহতির চৈতন্যে আমাদের গণতন্ত্র নতুন আলোক-বর্তিকা নিয়ে অগ্রসর, তখন বাঙালী অন্য প্রান্তিক দেশে সেই সংহতির মুষ্ট্যাঘাতে আত্মলুপ্ত হবে কেন? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই স্বাধীনতার সতের বছর পরে বাঙালীর কাছে নতুন আত্মসমীক্ষা।

স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই বাঙালী যে অভিশাপ তার নিজের ললাটে লিখে এনেছে সেই লিখন মোছবার মত শক্তি বোধহয় বিধাতা বাঙালীকে দেয় নি। তাই পাঞ্জাব যা পেরেছে, বাঙালী তা পারে নি। পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু-সমস্যা বোধহয় আজ আর সমস্যা নয়। কিন্তু বাংলা দেশ আজো সেই নাগপাশের বন্ধনে জর্জরিত। দণ্ডকারণ্য বাঙালীর সেই সমস্যাকে সমাধান করতে পারে নি। আন্দামান ছিন্নমূল বাঙালীর জীবন-প্রত্যয়কে গভীর শেকড়ে এখনও বাঁধতে পারে নি। কেন পারে নি, কেন বাংলা দেশের এই সমস্যা এখনও জিইয়ে রয়েছে—তার গভীরে আমরা যেতে চাই না। দণ্ডকারণ্যের সাময়িক ইতিহাসের যে কালিমালিপ্ত অধ্যায় আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে, সেই লজ্জা বাঙালীর নয়—আমরা জানি, কিন্তু সেই চক্রান্তের মূল যদি এখনি আমরা উৎপাটন না করতে পারি তবে আজ ছিন্নমূল বাঙালী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দিন আসছে, সমগ্র বাঙালী সেই মর্মগ্রাসী চক্রান্তের আবর্তে ঘুরপাক খাবে।

স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, আর সেই স্বাধীনতা বোধহয় এসেছে সেই সীমান্ত-পারের হতভাগ্য মানুষদের আত্মবলির মধ্য দিয়েই। অথচ আশ্চর্য, আজ সেই সীমান্ত বন্ধ। যাঁরা বলেছিলেন, পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য ভারতের দ্বার, বাংলার তোরণ খোলা থাকবে, আজ তাঁরা বর্তমান থাকতেই সে তোরণ বন্ধ হয়েছে। আর যারা সীমান্তের পাহাড় ডিঙিয়ে এখানে এসেছে মানুষের দাবীতে বাঁচবার আশায়, আজ তাদের এক বিরাট অংশ শিবিরবাসী হয়ে জীবনের উত্তাপ ও গভীরতা হারাতে বসেছে। যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ দিয়ে মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়—অসংখ্য সরকারী উপনিবেশ ও পল্লীসংগঠনের মধ্যে দাঁড়িয়েও বলা যায় ছিন্নমূল মানুষদের সেই অর্থনৈতিক স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন নি বলেই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত মানুষ তাঁদের

স্বাধীনতা দিবসে যাদের কথা সবাগ্রে মনে পড়ে—সেই সব ছিন্নমূল মানুষ

প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়ে জাতির দুর্দিন ঘনিয়ে আনছেন। স্বাধীনতার সতেরো বছরে এই ক্ষত কেন শুকাল না তা কে বলবে!

অথচ প্রকল্প, পরিকল্পনা, যোজনার অন্ত নেই। মাটির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে যে পরিকল্পনা—সেই ত' পরিকল্পনা। তা না হলে তার সবটাই বুঝি কল্পনা। তবু একথা সত্য যে, স্বাধীনতার পর দেশের সম্পদ বেড়েছে। ভাবী শিল্পের প্রগতিও আমাদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে। শিল্পনগরী দুর্গাপুর, উপনগরী কল্যাণী, শহর কলকাতার আকাশচুম্বী প্রাসাদ সব কিছু মিলিয়ে বাংলা দেশের চেহারা পাল্টেছে। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল শহর ও মহানগরী বুঝি অতীত বাংলার নতুন যৌবন। তবু রবীন্দ্রনাথের কথাটি বুঝি এখানে আবার বলতে ইচ্ছে করে: সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালন না হয়ে শুধু মুখে রক্তসঞ্চালন হলেই তাকে স্বাস্থ্য বলে না। আজ এ পরিকল্পনার পরেও বাংলা দেশের শহরের উপকণ্ঠে গ্রাম-বাংলার দিকে একবার চোখ ফেরালে বুঝি বাংলার সেই রুগ্নদেহই আমাদের চোখে পড়ে। রামা কৈবর্ত্ত কিংবা হাসিম সেখের সমস্যার বুঝি এখনো সমাধান হয় নি।

আশ্চর্য, এই রথের রশি যাঁরা ধরেছেন তাঁরা আজ বাংলা দেশের এই সচল রথকে জগদ্দল পাথরের মতই বুঝি এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন। তাই আজকের বাংলা দেশে দাঁড়িয়ে:

'ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি'—

বললে বোধহয় নিছক কাব্যি হবে এখন—প্রাণের কবিতা নয়, প্রাণের অভিজ্ঞান। সেই পুকুরভরা মাছ, গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরুর বাংলা দেশ বুঝি এখন স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে। চাল নেই, তেল নেই, চিনি নেই, মাছ নেই। এখন বাংলা দেশে বুঝি একটিই কথা: নেই—নেই—নেই।

এই নেই নেই-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার উৎসব বুঝি নিরর্থক মনে হয় আমাদের জীবনে। ব্যর্থ মনে হয় জীবনের আন্দোলন যখন দেশের ভাগ্য-বিধাননিয়ন্তা বিধানসভা হলে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হৈ-হল্লায় সময় কাটাতে দেখি, যখন জাতীয় সমস্যার চেয়ে দলীয় স্বার্থ দেশের নেতাদের কাছে আদর্শ বলে বিবেচিত হতে দেখি, তখন মনে হয়, এই স্বাধিকার বুঝি প্রহসন। এই প্রহসনেই বাংলা দেশের, বাঙালীর জাতীয় সত্তা আজ ভাগীরথীর জলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে।

শুধু রাজনীতি নয়, এই প্রহসনের ঢেউ বুঝি আমাদের সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরকেও প্রকম্পিত করছে। তা না হলে সাহিত্যের বিকৃতিতে আজ বাংলা দেশের তরুণসমাজের একটি অংশ অবগাহন করবে কেন? শিল্পের পবিত্রতাকে নগ্ন যৌন অনুভূতিতেই বা নষ্ট করবে কেন? এই প্রহসনই বুঝি বাংলার পথে-ঘাটে 'পথভ্রষ্ট পথবাচাল চলতি-হাওয়া-পন্থী' প্রেমিক দলের সৃষ্টি করেছে। শিসই যাদের প্রেম, রকবাজীই যাদের প্রেমের অবলম্বন—তাদের জন্যও আমাদের সমাজের

উঁচু স্তরের মানুষদের নিত্যব্যবহারিক জীবনের 'কালোবাজারী' মনোবৃত্তিতেই সম্ভব হয়েছে। দোষ হয়তো সবটা তাদের নয়। মানুষের জীবনের চাহিদাকে তাদের জীবনে হয়তো তুলে ধরতে পারে নি। বেকারীর কিউ থেকে সোজা রকের পথই তারা ধরেছে যখন দেখেছে সামনে অন্ধকার। চাকুরীর আলো তাদের সামনে নেই। জীবনের আলো তাদের সামনে নেই।

সত্যি বাংলা দেশে আজ একটি অন্ধকার অধ্যায়। কেউ বলবে আজ বাঙালীকে ভাতে-মাছে বাঙালী। তেলে-জলে বাঙালী সেই পরিচয়ও বোধহয় আজ বাঙালী হারাতে বসেছে। স্বাধীনতার উৎসব আজ বাঙালীর সামনে আলোর তোরণ নয়—তুবড়ী নয়, অন্ধকার। অথচ এই অন্ধকারকে দূর করতে একদিন বাঙালী ফাঁসির কাঠে জীবনের জয়গান গেয়েছিল। আলোর বন্দনা করেছিল শত শহীদের রক্তে। জীবনের আলপনা রচনা করেছিল সেই পবিত্র রক্তে। আজ বোধহয় অকর্মণ্যতা, দেশাত্মবোধহীনতা আমাদের মনের সেই আলপনাকে অন্ধকার করে দিয়েছে। সরকারপক্ষীয়রা সেই আলোকবর্তিকার সলতেকে এগিয়ে দিতে পারে নি। বিরোধীরা জনমানসের সক্রিয় বেদনাবোধকে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন একতার অভাবে। তাই বাংলা দেশ আজ কালোবাজারী, মুনাফাশিকারীদের অন্ধকার রাজত্ব।

দেশের নাড়ীর স্পন্দন রাজত্বের প্রভুরা পেয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু আমরা বাংলা দেশের শিরা-উপশিরায় চাঞ্চল্য অনুভব করছি। বাংলা দেশের চোখের জল বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে। এখন সেই চোখে বুঝি আগুন জ্বলবে। অচলায়তনের উত্তর দিকের জানলাটা বেশিদিন বন্ধ করে রাখা যায় না। এবার বুঝি সেই জানলা খুলবে।

স্বাধীনতা উৎসবের আনন্দে মসগুল দেশের কর্ণধারদের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন, আপনারা দেশের মুষ্টিমেয় মোসায়েবদের চেহারা না দেখে দেশের আসল মানুষদের চেহারা দেখুন, সেই ক্ষেত-খামার, কল-কারখানার মানুষদের দেখুন, ওদের কণ্ঠের আওয়াজ শুনুন। কান পাতুন ওদের কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে। ওদের কণ্ঠে নিশ্চয়ই ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান আপনারা শুনতে পাবেন। সুমনের মার করুণ আর্তনাদ যেন আবার বাংলা দেশের আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে তুলছে। পাগলা বৃদ্ধ বটুর কণ্ঠ কি শুনতে পাচ্ছেন না----জাগো ভৈরব---জাগো। হয়তো ভৈরব জাগবে। তার আগেই সাবধান হোন। আত্মসমীক্ষা করুন। তা না হলে মুক্তধারার উচ্ছল জলধারায় আবার বাংলা দেশ ভাসবে।

নেই । নেই ।। নেই ।।।

স্বাধীনতা দিবসের অব্যবহিত পূর্বে বাঙালী-জীবনের ট্র্যাজেডি

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গায়ত্রীর গুরুদেব আছেন নামকুমে। এখানে তিনি থাকেন না, হরিদ্বারের ওদিকে কোথায় তাঁর আশ্রম। ভক্তদের ডাকে মধ্যে মধ্যে তাদের সেবা নিতে নেমে আসেন, এবারেও তাই এসেছেন। উঠেছেন একজন বাঙালী ডাক্তারের বাড়িতে।

গুরুদেবের নাম বোধ হয় পুণ্যানন্দ—অন্তত সেই রকমই যেন বললেন গায়ত্রী। ভালো করে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না শর্মিলা, কোথায় যেন সংকোচ বাধল। গুরুদেব গুরুদেবই, তিনি স্বয়ংদীপ্ত একটি জ্যোতির্ময় সত্তা; লৌকিক নাম তাঁর বাইরের একটা মৃন্ময় মাত্র; পাত্রের মধ্যে যিনি আছেন—তিনিই আসল, তিনিই অমৃতময়।

বাড়িতে জনারণ্য। গেটের সামনে গোটা তিনেক ইউক্যালিপ্‌টাসের হাল্কা ছায়ায় ভারী ভারী কয়েকটা মোটর গাড়ি ঝকঝক করছে। ইউক্যালিপ্‌টাস! একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন শর্মিলা, আর একটা বাড়ির কথা মনে পড়ল, স্মৃতির অনুষঙ্গে ভেসে উঠল কয়েকটা মুখ, একজন মানুষকে দেখা গেল চায়ের টেবিলে, শর্মিলা শিউরে উঠলেন।

গায়ত্রী বললে, চলিয়ে, অন্দরমে চলিয়ে।

ভেতর থেকে ভজনের সুর উঠছিল। অনেকগুলো মিলিত কণ্ঠ।

সামনেই মস্ত হলঘর। তার তিন-চারটে খোলা দরজা দিয়ে গোটা কয়েক পাঁচশো পাওয়ারের আলোর দীর্ঘ ধারালো রেখা। ভেতরে গিজ গিজ করছে লোক। চন্দন আর ফুলের গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছে হাওয়ায়।

—খুব ভিড় দেখছি।

গায়ত্রী হাসলেন: শান্তি সবাই চায়। গুরু ছাড়া আর কে দিতে পারে? রাজরাণী মীরাজীও মাথা রেখেছিলেন চামার রইদাসজীর পায়ের তলায়। 'গুরু মিলিয়া মেরী রইদাসজী জিন্‌হি জ্ঞান কি গুট্‌কি—'

পুরু কাচের চশমা চোখে, গলায় সিল্কের চাদর, কপালে চন্দনের তিলক আঁকা, মাথায় চকচকে টাক এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন: আইয়ে গায়ত্রী দেবী, আইয়ে—

শর্মিলাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন গায়ত্রী: মিসেস রায়চৌধুরী—শর্মিলা দেবী। মেরি কলিগ্। আপ গুরুজীসে মিলনে আয়ী।

ভদ্রলোকই বোধ হয় গৃহস্বামী। বললেন, নমস্কার, আসুন, আসুন।

হলঘরের মাঝখানে একটি পথ রেখে দু-পাশে ভাগ হয়ে বসেছেন মেয়ে-পুরুষেরা। মেয়েদের সংখ্যাই যেন বেশি। তাঁদের মুখোমুখি একটি বেদীর ওপর হরিণের চামড়ার আসনে গুরুদেব ধ্যানস্থের মতো বসে। বেদীর ওপর রাশি রাশি ফুল, গুরুদেবের গলায় মোটা গোড়ের মালা, দু-পাশে দুটি বড়ো বড়ো ধূপদানী থেকে ধুনোর মেঘ উঠছে। সামনের কিছু শিষ্য-শিষ্যা চোখ বুজে করতালি দিয়ে গেয়ে চলেছেন: 'রামনাম ভজো, রামনাম ভজো, বোলো বোলো রাম শ্রীরাম'—

গুরুদেবের উদ্দেশে দূর থেকে প্রণাম করেই বসলেন দুজন।

ভজন শেষ হল। গুরুদেব ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। শর্মিলা দেখলেন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুপুরুষ, বয়েস পঞ্চাশ থেকে ষাটের ভেতর। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, কপালে রাম-তিলক। দেখলে ভক্তি হয়।

গম্ভীর মধুর গলায় ভক্তির কথা বলতে সুরু করলেন হিন্দীতে।

—ভক্তি কী? সন্ত তুলসীদাস বলছেন, রামচন্দ্রজী, লছমনজী আর সীতা মাইজী চলেছেন বনবাসে। পথে পড়ল নদী। খেয়া ঘাটের মাঝি এসে পায়ের ধুলো নিলে। ভগবান রঘুরাই বললেন, 'আমাদের পার করে দাও।' পাটনী করযোড়ে বললে, 'প্রভু, মাপ করো, তোমাকে তো আমার ডিঙায় তুলতে পারব না।' রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন?' পাটনী বললে, 'রাম, তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ। একটুখানি চরণের ছোঁয়া দিয়েছিলে, তাই পাষাণী অহল্যা উদ্ধার হয়ে গেল। আমার এই কাঠের ডিঙিতে তুমি পা রাখবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেও যে উদ্ধার হয়ে যাবে। প্রভু, কমলনয়ন, তা হলে আমার চলবে কী করে? আমি বড়ো গরীব, এই নৌকোটিই আমার ভরসা, তুমি একে ত্রাণ করলে যে আমি সপরিবারে অনাহারে মারা যাব।' একেই বলে ভক্তি—এই হল বিশ্বাস।

গুরুদেব বলে যেতে লাগলেন, ভক্তদের চোখ ছলছল করতে লাগল, গায়ত্রী একবার চোখ মুছলেন শাড়ির আঁচলে। সময় চলতে লাগল। ধূনোর মেঘ আরো ঘন হল, ফুল আর চন্দনের গন্ধ আরও নিবিড় হল, সমস্ত পরিবেশে গভীর মোহাচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ল একটা। শর্মিলা মগ্ন হয়ে বসে রইলেন। ঠিক এইরকম একটা আবহাওয়ায় এর আগে তিনি কখনো আসেন নি। ধর্ম সম্পর্কে কোনো সংস্কারের ভেতরে তৈরি হয় নি তাঁর মন—বাপ ছিলেন কড়া যুক্তিবাদী লোক, প্রত্যক্ষের বাইরে কোনো জিনিষকে তিনি বিশ্বাস করতেন না; যে পরিবারের বধূ হয়ে গিয়েছিলেন সেখানেও এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, শুধু কল্যাণীর একটা লক্ষ্মীর আসন আছে, সেখানে সকালে দুখানা বাতাসা সাজিয়ে দেন তিনি—বিশ্বাসের চাইতেও অভ্যাসটাই বড়ো। আর অমিতাভ ছিল পুরো সাহেবী ধাঁচের মানুষ, বাড়ির প্রথা অনুযায়ী বিজয়া দশমীর দিন অন্তত একবার একখানা নতুন ধুতি পরতে হত তাকে—তাতেই তার বিরক্তির অন্ত থাকত না।

শর্মিলা বলতেন, 'বছরের একটা দিনও ধুতি পরতে চাও না?'

'আমি পরতে জানি না।'

'ধুতি পরতে জানো না বাঙালীর ছেলে হয়ে?'

'লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই।'—অমিতাভ পাইপে আগুন ধরাতো: সেলাইবিহীন কাপড় মেয়েদের জন্যে আর বাঙালী বাবুদের জন্যে। বাট্ নট ফর অ্যান এঞ্জিনীয়ার।'

শর্মিলা হাসতেন: 'আমার পিসে-মশাইও কিন্তু বিলেত ফেরৎ এঞ্জিনীয়ার। তিনি তো ধুতি-পাঞ্জাবী পরতে ভালোবাসেন।'

'ওঁরা কম্প্রোমাইজ করতে চান। কিন্তু আমরা ইয়ঙ্গার জেনারেশন, ও-সবের মধ্যে নেই।'

কোথায় অমিতাভ, কোথায় সে বিলিতী ধরণে ফার্নিসড্ কোয়ার্টার—কোথায় সেই সব দিন। যে স্মৃতিগুলোকে কৃপণের ধনের মতো বুকের মধ্যে লালন করতে চান শর্মিলা, সেখানে অমিতাভকে দেখা যায় শর্টস পরা, চোখে কালো গগ্‌লস, শর্মিলাকে পেছনের সীটে বসিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটিয়েছে মোটর সাইকেল; কিংবা ক্লাবের সেই গ্র্যাস-কোর্ট—টেনিস স্যুট পরে কামানের গোলার মতো বলটা ড্রাইভ করেছে নেটের ওপারে

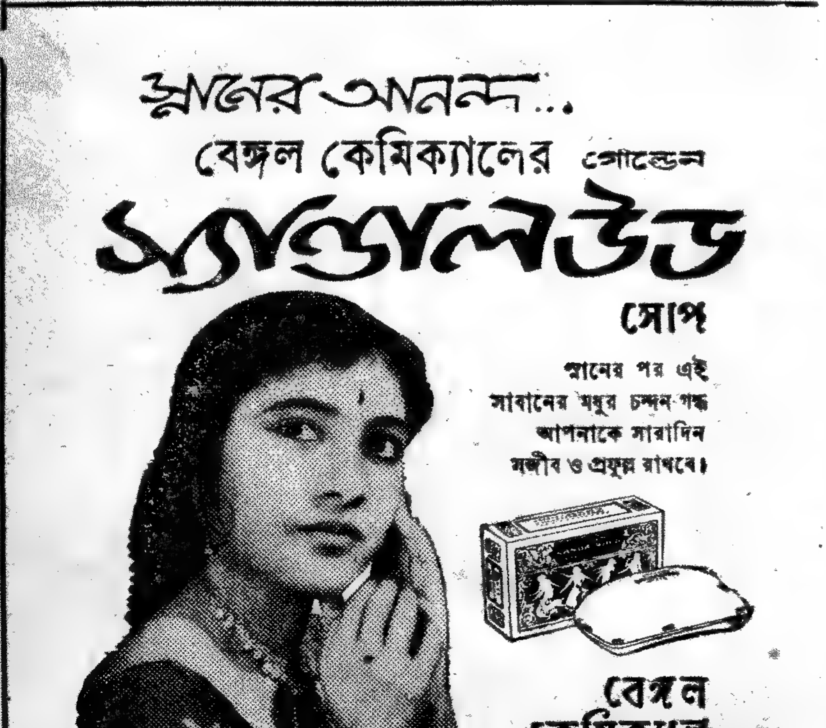

প্রতিবন্দী মিস্টার খোসলার দিকে। শর্মিলা চকিত হয়ে উঠলেন—এবার গুরুদেব নিজেই গান ধরেছেন, তালে তালে মাথা নড়ছে ভক্তদের। এর মধ্যে কোথায় তিনি আনবেন অমিতাভকে, কোনখানে তাকে জায়গা দেবেন!

পাশ থেকে গায়ত্রী বললেন, ভালো লাগছে?

লজ্জিত হয়ে শর্মিলা বললেন, ভালো লাগছে বই-কি, খুব ভালো লাগছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে আসর শেষ হল। গুরুদেব বললেন, যাও, এবার সবাই প্রসাদ নাও গে।

ঘর শুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়ালেন। একে একে গুরুদেবকে প্রণাম করে এগিয়ে চললেন বাঁ দিকের দরজা দিয়ে। গায়ত্রী আর শর্মিলার প্রণামের পালা এল। দুজনেরই মাথায় হাত রাখলেন তিনি, হাসলেন প্রসন্নভাবে।

গায়ত্রী বললেন, গুরুজী, আমার বন্ধু। আপনাকে দেখতে এসেছেন।

—প্রফেসার?

—জী মহারাজ।

—আনন্দ্ রহো বেটি, রাম কহো।

দাঁড়াবার সময় দিল না, পিছনে লাইন পড়ছে ভক্তদের। কিন্তু বাঁ পাশের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই থেমে দাঁড়ালেন শর্মিলা।

—মিসেস শর্মা?

—কী হল?

—আমাকে মাপ করতে হবে, এখন আমি কিছু খেতে পারব না।

—ওকথা বলতে নেই ভাই, পাপ হয়। খেতে না চাও, একটু কপালে ঠেকিয়ে যাও অন্তত।

বাঁধানো উঠোন জুড়ে উজ্জ্বল আলোর দীপাবলী। সারি সারি কলাপাতা পড়েছে। গায়ত্রীর পাশে শর্মিলাও বসে পড়লেন।

খিচুড়ি এল, তরকারী ভাজা-ভুজি এল, লুচি-মোহনভোগ-পায়েস এল, নানা রকমের মিষ্টি এল। শর্মিলার একবার মনে হল, শুধু এই আকর্ষণেই কি ভক্তদের টেনে আনবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কিন্তু এ-রকম একটা অন্যায় চিন্তা করে পরক্ষণেই তিনি লজ্জিত হলেন।

গায়ত্রী সামান্য কিছু খেলেন, শর্মিলা একটুখানি খিচুড়ি কপালে ঠেকিয়েই পাতা সরিয়ে রাখলেন। গৃহস্বামী এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—একি—আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না মিসেস রায়চৌধুরী।

—ক্ষমা করবেন, আমার শরীর ভালো নেই।

—গুরুদেবের প্রসাদ, স্বচ্ছন্দে খান আপনি, কোনো ক্ষতি করবে না।

—আর একদিন হবে।

—আচ্ছা—বলে অন্য ভক্তদের আপ্যায়নে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মুখ দেখে মনে হল, খুব খুশি হয়ে গেলেন না। শর্মিলার ভারী অপরাধী মনে হল নিজেকে, টের পেলেন এই আসরে তিনি সম্পূর্ণ বেমানান। কিন্তু প্রসাদ হোক আর যাই হোক, রাত্রে এ সমস্ত খাওয়া তাঁর অভ্যাস নেই, খেতেও পারবেন না।

প্রসাদ পর্ব শেষ হলে ফিরে যাওয়ার পালা। আবার প্রণাম।

ভাঙা বাংলায় গুরুদেব বললেন, আবার এসো মা।

—কী করে বুঝলেন আমি বাঙালী?

গুরুদেব সস্নেহে হাসলেন, কথাটার জবাব দিলেন না। তারপর বললেন, মন খুব চঞ্চল হয়েছে—না? ভগবান রামচন্দ্রজীর শরণ নাও মা—তিনিই শান্তি দেবেন তোমাকে।

অভিভূত হয়ে বেরিয়ে এলেন শর্মিলা।

পুরুলিয়া রোড ধরে দুজনে যখন ফিরতে লাগলেন সাইকেল-রিক্সাতে, বেশ রাত হয়েছে তখন। দু ধারে গাছের ঘন-গভীর ছায়া, পথ প্রায় নির্জন, পাহাড় থেকে অল্প অল্প হিমেল হাওয়া। শর্মিলা আঁচলটা ভালো করে জড়ালেন শরীরে।

গায়ত্রী তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন?

একবার দ্বিধা করলেন শর্মিলা, তারপর বললেন, ভালো।

—মন শান্ত হল?

—আমরা দুর্বল মানুষ। সময় লাগে।

—তা ঠিক, সময় লাগে।—গায়ত্রী বললেন, কিন্তু সময়ও তো বেশি দেওয়া যায় না। 'যাই জীবন আঁজুলিকে পানি।' যত দেরি হবে, ততই বেশি করে হারাব আমরা।

শর্মিলা চুপ করে রইলেন। গায়ত্রী বলে চললেন, সময় আমারও লেগেছিল। অত বড়ো শক্ সহজে ভোলা যায়? তবু ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল। দেখলুম, স্বামী-সংসারের চাইতেও

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

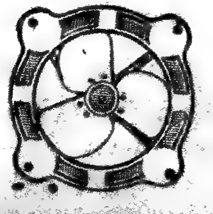

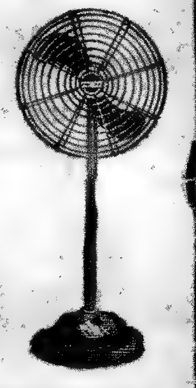

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

৮/৬৪ নং কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি

আপাতত অস্থায়ী, তবে যথাক্রমে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমোদিত স্কেলে বেতন ছাড়াও সব কয়টি পদেই প্রচলিত ভাতা, ফ্রি ডাক্তারী চিকিৎসা এবং রেলওয়ে পাশ/পি-টি-ও-র ব্যবস্থা এবং সময় সময় অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য কনসেসন আছে, তবে শিক্ষানবিশী/ট্রেনিং কালে কেবল মহার্ঘ ভাতা (অন্য কোন ভাতা নয়) তৎসহ অনুমোদিত স্কেলে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইবে।

২। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেশনগুলি হইতে ২৲ টাকা আদায় দিয়া (তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থী এবং শারীরিক অসুবিধাগ্রস্ত প্রার্থীদের জন্য ০.৫০ পয়সা) প্রাপ্তব্য এই রেলওয়ে বা যে কোন রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের অনুমোদিত ফরমের দরখাস্তগুলি ইংরাজীতে যথাযথভাবে পূরণ করিয়া বাহিরের খামের উপর পদের নাম ও শ্রেণী উল্লেখে পাঠাইবার ঠিকানা :

দি চীফ পার্সোনেল অফিসার ;
(রিক্রুটমেণ্ট)
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে
পোঃ মালিগাঁও রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার্স, জেলা কামরূপ (আসাম)।

৩১শে আগষ্ট ১৯৬৪ তারিখে ১৬-৩০ ঘটিকার পূর্বে পাঠাইতে হইবে।

৩। বর্তমানে সরকারীতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (রেলওয়ে সহ) নিকট হইতে যথাযথ প্রণালীতে প্রেরিত দরখাস্তগুলি এই অফিসে বন্ধের তারিখের পূর্বে (৩১-৮-৬৪) পৌছান চাই। তাঁহারা তাঁহাদের ডিপার্টমেণ্টের প্রধানদের মারফৎ প্রেরিত দরখাস্ত বিলম্বিত হইতে পারে আশঙ্কা করিলে তাঁহারা অনুমোদিত ফরমে দরখাস্ত (সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ) সরাসরি প্রেরণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে 'কোন আপত্তি নাই' সার্টিফিকেট পেশ করিলে তাঁহাদিগকে লিখিত পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

৪। সর্ববিষয়ে নির্ভুলভাবে পূরণ করা না হইলে এবং দরখাস্তে উল্লিখিত বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমর্থনে সার্টিফিকেটের প্রামাণ্য কপিগুলি (স্বাক্ষরদাতা কর্তার পদ ও অফিস ষ্টাম্প প্রদত্ত) এবং সকল পরীক্ষা পাশের মার্কসীট প্রভৃতি সহ না হইলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

৫। উর্ধ্বের বয়স সীমা (সমস্ত বয়স সীমা ১লা আগষ্ট, ১৯৬৪ তারিখ ধরিয়া হওয়া চাই) শিথিলযোগ্য :—

(ক) তপশীলভুক্ত জাতি, তপশীলভুক্ত উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য এবং ফরাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতের প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশের প্রার্থীদের জন্য ৫ বৎসর ;

(খ) সিংহল হইতে স্বদেশে প্রেরিত ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতের প্রাক্তন পর্তুগীজ অঞ্চল গোয়া, দমন ও দিউ-এর অধিবাসীদের জন্য ৩ বৎসর ;

(গ) যুদ্ধের চাকুরীয়া প্রার্থীদের জন্য যুদ্ধকালীন চাকুরী এবং পরবর্তী সময় বিভাগে চাকুরীর মেয়াদ পর্যন্ত ;

(ঘ) রিজার্ভিষ্টদের জন্য ৪০ বৎসর পর্যন্ত ; এবং

(ঙ) যথাক্রমে সর্বোচ্চ ৩ ও ১০ বৎসর তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণীতে চাকুরী করার সর্ত সাপেক্ষে নিয়মিত চাকুরীর মেয়াদ পর্যন্ত (সাময়িক শ্রমিক বাদে)।

দ্রষ্টব্য : **বাস্তুহারাদের জন্য কোন শিথিলতা নাই।**

৬। এই রেলওয়ের দরখাস্ত ফরমের দক্ষিণ দিকের নিম্ন কোণে (যেখানে খালি জায়গা রহিয়াছে) অথবা ২ এর পৃষ্ঠায় প্রার্থীর এক সাম্প্রতিককালের পাশপোর্ট ফটোগ্রাফ জুড়িয়া দেওয়া চাই। **ফটোগ্রাফ বিহীন দরখাস্ত কোনক্রমেই গ্রাহ্য করা হইবে না।**

৭। কোন প্রার্থী মনোনয়নের ফলাফল তাঁহাকে (পুরুষ/স্ত্রী) জানান হউক এরূপ ইচ্ছা করিলে দরখাস্তের সহিত তাঁহাকে নিজের নাম ঠিকানা লেখা ০.১৫ পয়সার খাম পাঠাইতে হইবে।

৮। **দরখাস্তের ফরম এই অফিসে পাওয়া যাইবে এবং এই অফিস কর্তৃক ফরমের জন্য কোনরূপ অনুরোধ গ্রাহ্য করা হইবে না।**

৯ (ক) তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পূঃ সীঃ রেলওয়ে রিক্রুটমেণ্ট কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী যোগ্যতার মান শিথিল করা চলিবে।

(খ) তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের মধ্য হইতে যোগ্য প্রার্থী না পাইলে সংরক্ষিত পদগুলি অসংরক্ষিত গণ্য করা হইবে।

১০। সাক্ষাৎকারের পর প্রার্থীগণকে এক লিখিত পরীক্ষা/প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় হাজিরা দিতে হইবে। পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারে উপস্থিতির জন্য এবং ফিরতি ভ্রমণের জন্য তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি প্রার্থীগণ এবং প্রাক্তন সমর বিভাগের চাকুরীয়াগণকে এবং ৫২ হইতে ৫৫ শ্রেণীর জন্য আবেদনকারী যোগ্য প্রার্থীগণকে পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ২৪ কিঃ মিঃ দূরত্বের ফ্রি রেলওয়ে পাশ ইস্যু করা হইবে।

১১। উপরোক্ত ৭ অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী ছাড়া রিক্রুটমেণ্ট সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই অফিস কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রালাপ করিবে না।

১২। **যে কোন আকারে তদ্বির তদারক সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীর অযোগ্যতা বিবেচিত হইবে।**

১৩। **শ্রেণী নং ৫২ :** ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের জন্য **ইলেকট্রিক্যাল চার্জম্যানের** পাঁচটি (৫) পদ। তপশীলভুক্ত জা[illegible] [illegible] [illegible]র্থীদের

জন্য সংরক্ষিত। **সর্বনিম্ন যোগ্যতা:** প্রার্থীর থাকা চাই (ক) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রী অথবা (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কোন অনুমোদিত ডিপ্লোমা/লাইসেন্সিয়েট তৎসহ কোন সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা লব্ধপ্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার হাউস, এইচ টি/এল টি ওভারহেড লাইন ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেমের নির্মাণ/সংরক্ষণ বিষয়ে সর্বনিম্ন তিন বৎসরের কার্যকরী অভিজ্ঞতা। **বয়স সীমা:** ২০ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে। **বেতনের স্কেল:** ২৫০-১০ ২৯০-১৫-৩৮০৲ টাকা।

শ্রেণী নং ৫৩: ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জন্য **এসিষ্ট্যান্ট ইলেকটি-ক্যাল ফোরম্যানের** চারটি (৪) পদ। একটি পদ তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। **সর্বনিম্ন যোগ্যতা:** প্রার্থীর থাকা চাই (ক) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রী তৎসহ দুই বৎসরের কার্যকরী অভিজ্ঞতা অথবা (খ) কোন সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা লব্ধপ্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটিং ষ্টেশন এইচ টি/এল টি ওভারহেড লাইন ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেমের নির্মাণ/সংরক্ষণ বিষয়ে সর্বনিম্ন ৫ বৎসরের কার্যকরী অভিজ্ঞতা সহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ (৩ বৎসরের কোর্স) কোন অনুমোদিত ডিপ্লোমা/লাইসেন্সিয়েট **বয়স সীমা:** ২০ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে। **বেতনের স্কেল:** ৩৩৫-১৫-৪২৫৲ টাকা। উচ্চতর যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণকে এই স্কেলে উপযুক্ত হারে অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হইবে।

শ্রেণী নং ৫৪: মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জন্য চার্জম্যান গ্রেড ৩ (ইলেকট্রিক্যাল)এর দুইটি (২) পদ। **সর্বনিম্ন যোগ্যতা:** কোন অনুমোদিত ইনষ্টিটিউট হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা এবং কোন ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কসপে অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা। **ট্রেনিং কাল:** প্রতি মাসে ২০৫৲ টাকা ষ্টাইপেণ্ড তৎসহ প্রচলিত মহার্ঘ ভাতায় ৬ হইতে ১২ মাস এবং ট্রেনিং সাফল্যজনকভাবে শেষ করিবার পর **[বে]তনের স্কেল** ২০৫—২৮০ টাকা। **বয়স সীমা:** ২০ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে।

শ্রেণী নং ৫৫: জুনিয়র মেকানিক্যাল ও মেটালার্জিক্যাল এসিষ্ট্যান্টের একটি (১) পদ। **সর্বনিম্ন যোগ্যতা:** প্রার্থীদের (১) পাশ করা চাই (ক) কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমিষ্ট্রি অন্যতম বিষয় সহ বি, এস, সি, পরীক্ষা অথবা (খ) মেটালার্জিতে বি এস সি এবং (২) বিশ্লেষণ কার্যে অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। **বয়স সীমা:** ১৮ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে। **বেতনের স্কেল:** ১৫০-৫-১৬০-৮-২৪০-১০-৩০০৲ টাকা।

শ্রেণী নং ৫৬: সাব ইন্সপেক্টর গ্রেড ২ (রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স) এর বারটি (১২) পদ। একটি করিয়া পদ তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি প্রার্থীদের প্রত্যেকের জন্য সংরক্ষিত। **ষ্টাইপেণ্ডের স্কেল:** ১৩০৲ টাকা তৎসহ আর পি এফ ট্রেনিং স্কুল, লক্ষ্ণৌ-এ ১২ মাসের ট্রেনিং কালে নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদিত মহার্ঘ ভাতা। সাফল্যজনকভাবে ট্রেনিং শেষ করিবার পর **সাব ইন্সপেক্টরের গ্রেড ২** হিসাবে এক বৎসরের জন্য প্রবেশনে ১৩০—২১২৲ টাকার **বেতনের স্কেলে** লওয়া হইবে। **বয়স সীমা:** ১৯ ও ২৪ বৎসরের মধ্যে। প্রাক্তন সমর বিভাগের লোকজনদের জন্য উর্ধ্বের বয়স সীমা ১২ বৎসর শিথিলযোগ্য। **সর্বোচ্চ যোগ্যতা:** প্রার্থীদের (ক) কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর্টস বা সায়েন্স বা কমার্সে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বা তৎসমতুল্য যে কোন পরীক্ষা পাশ করা চাই। (খ) সাইকেল চড়ার জ্ঞান থাকা চাই। খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ ও অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠান, এন সি সি, স্কাউটিং মিলিটারী সার্ভিস এবং অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অধিক গুণ বিবেচিত হইবে। **দৃষ্টিশক্তি:** (দূরের দৃষ্টিশক্তি)—৬।৯, ৬।১২ চশমা বা চশমা ছাড়া, তবে লেন্সের শক্তি ৮ ডি-এর উপর হইলে চলিবে না। (নিকটের দৃষ্টিশক্তি)—এস এন-০'৬, ০'৬ চশমা বা চশমা ছাড়া। **মাপ:**

ছাতি—৩২" (না ফুলাইয়া) সাধারণ প্রার্থীদের জন্য।
৩৪" (ফুলাইয়া):
৩০" (না ফুলাইয়া):
৩১" (ফুলাইয়া): তপশীলভুক্ত জাতি, তপশীলভুক্ত উপজাতি প্রার্থী এবং পার্বত্য লোকদের জন্য.

উচ্চতা: ৫'-৬" সাধারণ প্রার্থীদের জন্য।
৫'-৪" তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থীদের জন্য এবং
৫'-৩" তপশীলভুক্ত উপজাতি এবং পার্বত্য লোকদের জন্য।

দ্রষ্টব্য: যে প্রার্থীর বয়স ২০ বৎসরের কম এবং উচ্চতা ৫'-৫" ইঞ্চির কম নহে এবং ছাতি না ফুলাইয়া ৩০" ইঞ্চির নীচে নয় তিনি অন্যভাবে যোগ্য হইলে এবং মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে সার্টিফিকেট দিলে যে তাঁহার বয়স ২০ বৎসরের নীচে এবং উপরোক্ত মাপের মানে পৌঁছিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান, তিনি রিক্রুটমেন্টের যোগ্য হইতে পারিবেন

শ্রেণী নং ৫৭: সাব ফায়ার ষ্টেশন অফিসার-এর (রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স) পাঁচটি (৫) পদ। তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি প্রার্থীদের জন্য একটি পদ সংরক্ষিত। **সর্বনিম্ন যোগ্যতা:** প্রার্থীদের কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়/বোর্ড হইতে ইণ্টারমিডিয়েট বা তৎসমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হওয়া চাই। প্রার্থীগণ ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ, নাগপুর/রামপুর হইতে সাব অফিসারদের কোর্সের যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকিলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বা তৎসমতুল্য পরীক্ষা পাশ পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান শিথিল করা হইবে। মনোনীত প্রার্থীগণ বর্তমানে ঐরূপ যোগ্যতা অর্জন করিয়া না থাকিলে ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ নাগপুর হইতে সাব অফিসারের কোর্সের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। **ষ্টাইপেণ্ড *বেতনের স্কেল, বয়স সীমা এবং অন্যান্য যোগ্যতা—শ্রেণী নং ৫৬-এর ন্যায়।**

No. D/5/2
4. 8. 64

কত বড়ো সম্পদ আছে—দেখলুম কী ঐশ্বর্য অপেক্ষা করে আছে মানুষের জন্যে। 'বস্ত অমোলক দী মেরে সদ্‌গুরু কির্‌পা কর আপনায়ো।' তখন মনে মনে বললুম, 'জনম জনমকে পুঁজি পায়ী'—গায়ত্রী হাসলেন : আজ এসব ফেলে দিয়ে আমেরিকা রওনা হব স্বামীর ঘর করতে, অ্যাণ্ড বিকজ হিজ অ্যামেরিকান ওয়াইফ হ্যাজ ডিভোর্সড হিম?

শর্মিলা তেমনি নিঃশব্দেই বসে রইলেন। গায়ত্রী জন্ম-জন্মান্তরের সম্পদ পেয়ে গেছেন, তাঁর আর কিছুই চাইবার নেই ; মিস্টার শর্মা তাঁর কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন—নাম শুনছেন, একদিন সামান্য পরিচয়ও হয়তো ছিল, কিন্তু মনের ভেতর কোথাও এতটুকু ছায়া পর্যন্ত নেই। এই তো তাঁর পরম পাওয়া—তাঁর মুক্তি।

কিন্তু এই মুক্তির সম্ভাবনায় শর্মিলা তো এতটুকুও খুশি হতে পারছেন না। এ যেন এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, এক পরিণাম, এক পরিসমাপ্তি।

রিক্সা এসে হস্টেলের সামনে দাঁড়ালো। শর্মিলা ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিলেন, গায়ত্রীই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

নিজের ঘরে যাওয়ার আগে গায়ত্রী বললেন, আজ বড্ড ভিড় ছিল, ভালো করে কথা হল না গুরুদেবের সঙ্গে। যাবেন আর একদিন?

—যাব।

—তা হলে সেদিন সকালের দিকেই বেরুনো যাবে। তখন বেশি লোকজন থাকে না, গুরুদেবকে একটু একলা পাওয়া যায়।

—বেশ, তাই হবে।

সেই রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন শর্মিলা। চাঁদ উঠেছে, মোরাবাদী পাহাড়ের মাথাটা দেখা যায়, দেখা যায় না। কয়েকটা ঝাপসা তারা জ্যোৎস্নার বুকে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। শর্মিলা ভাবতে চেষ্টা করলেন, সত্যিই কি ওখানে মুক্তি আছে, শান্তি আছে তাঁর জন্যে? ভজনে, ধূপ-ফুল-চন্দনের গন্ধে, অনেক বেশি ঝলমলে আলোর তীক্ষ্ণ জোয়ারে, বহু মানুষের মুগ্ধ মনের ছোঁয়ায় আর দীর্ঘশ্বাসে একটা মোহাচ্ছন্নতার জগৎ তৈরি হয়েছিল ওখানে। সন্দেহ নেই, ওর মধ্যে শর্মিলাও তলিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরও চোখ দিয়ে জল আসছিল।

কিন্তু এক মোহের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে আর এক মোহ? এক কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্নজগৎ থেকে আর এক ভক্তির নেশার জগতে? কী হবে? কী হবে?

শর্মিলা অমিতাভকে ফিরে পেতে চান। কিন্তু গুরুদেব সব কেড়ে নেবেন। তখন অমিতাভ থাকবে না, কিরণ বসু থাকবে না, শুধু থাকবে এমন এক অমূল্য সম্পদ—যা সব চাওয়া-পাওয়ার পাট মিটিয়ে দেয় চিরকালের মতো। শর্মিলা কি তাই চান? জীবন তাঁকে বঞ্চনা করেছে বলেই জীবনের ওপর সব দাবি তিনি ছেড়ে দেন নি, অমিতাভর ধ্যানে মগ্ন-পবিত্র জীবন কাটাতে চান বলেই তিনি সন্ন্যাসিনী হতে চান না!

না—মিসেস শর্মার মতো হওয়া তাঁর সম্ভব নয়। অতখানি নিষ্ঠুর হওয়া তাঁর কল্পনারও বাইরে।

তবু একটা আশ্রয় চাই কোথাও। একটা কিছুকে শক্ত মুঠোয় তাঁর আঁকড়ে ধরতেই হবে। আজ ভজনের আসরে বসেও শর্মিলা বুঝতে পারছিলেন, তাঁর রক্তে কৃষ্ণচূড়ার বন্যা বইছে। সে স্রোতে ভেসে যাওয়া চলবে না—আত্মরক্ষা তাঁকে করতেই হবে।

হয়তো সে সমাধান করতে পারবেন গুরুদেবই।

কিন্তু পরের কথা পরে। আজ সমস্ত রাত ধরে কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন নামুক চোখ ভরে। সব শেষ করে দেবার আগে শেষবারের জন্যে আসুক সেই শ' তলানি—যা দুঃসহ, যা দুর্দম। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাষ।
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক.

মূল্য—তিন টাকা

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

"বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।"

আলীবর্দী যখন কানাতে বিশ্রামের জন্যে গেলেন, ঠিক সেই সময় আঁধারমাণিক গ্রামে আনন্দীরা। দুখোটির বাড়িতে মহাগোল বেধে গেল।

ওদিকে শ্মশানতলার মাঠে চড়কের ধুম লেগেছে। আর ক'দিন বাদে চড়ক তাই সন্ন্যেসীদের গান-বাজনা শিবকীর্তনে হৈ রৈ ব্যাপার। এই দুরন্ত গরমে কাঠের ধুনী জ্বেলে সন্ন্যেসীরা শিবচক্ষু হয়ে বসে আছেন। ভাঙের নেশায় স্বর্গে বিচরণ করছেন। ঠাকুর-বাবাদের প্রসাদ পাবার আশায় অনুগত ভক্তরা এখানে ওখানে হাত জোড় ক'রে বসে আছে। চৈত্র মাসে গ্রামের অন্ত্যজপাড়ায় দাম্পত্যকলহে কাক-চিল ওড়ে। পুরুষরা সকলেই সন্ন্যেসী হতে চায়, নিদেনপক্ষে গলায় একগাছা সুতো বেঁধে বাবার নাম গাইতে যায়। জোর ক'রে হাটে পাঠালে গেঁজের কড়ি আর ঘরে ফেরে না, আনাজপাতি চাল গামছাও আসে না। রাত হলেও সবাই ঘরে আসে না। গাঁজায় দম মেরে চোখ লাল ক'রে বলে, 'ধুর, ঘরে গেলে শুধু চেল্লানি শুনে প্রাণটা যায়, তার চে' এই ভাল।'

তবু তাদের মেয়েরা পরভরসায় বসে থাকে না। মাঠে মাঠে গোবর কুড়োয়, ঘাস কাটে, খালে বিলে মাছ ধরে, ঝুড়ি ঝুড়ি শুকনো কাঠ নিয়ে গেরস্তবাড়িতে ঢোকে পাছ-দুয়োর দিয়ে। বাগদিনীদের দেখলে সব বউ-ঝিরা আদর ক'রে ডেকে নেয়। ওদের কাঠের ঝুড়ির নীচে কাপড়ের পোঁটলায় বাঁধা অপার আশ্চর্যের ভাণ্ডার। সতীন এবং সতীনের ছেলে, এই দুই কাঁটার বিষে অনেকেরই জীবন জরজর। সতীনকে হীনবল করবার ওষুধ, স্বামীকে বশীকরণ করবার মন্ত্র, বন্ধ্যার সন্তান হবার ওষুধ, এমন কি পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী যে জিনিষ সবার আগে দাম হারায়, সেই চঞ্চল, পলাতক রূপযৌবনকে অক্ষয় রাখবার মন্ত্রপূত কবচ পর্যন্ত

গোয়ালের পেছনে, ঢেঁকশেলের আড়ালে, পুকুর পাড়ের ঝোপের আঁধারে ঘোমটা তুলে ফিসফিস ক'রে বউরা তাদের দরকারের পরিমাণ জানায়, আর কড়িপয়সা গুণে দিয়ে ওষুধ নিয়ে টপ ক'রে খোঁপায় গুঁজে ফেলে। কৃচিৎ শাশুড়িরা বলে, 'কি হচ্ছে কি?' বাগদিনীরা বলে, 'কিছু না মা ঠাকরুণ। বউঠান বলতে লেগেছেন যে ভিজে কাঠ আর দিও না, ধোঁয়ার জ্বালা সইতে পারি না।'

নিজেদের ভাতকাপড়টা হাটমাঠ বনবাদাড় থেকে উপার্জন করে নেয়, তার কারণ, এদের জাতের মেয়ে-পুরুষ বড় স্বাধীনতাপ্রিয়। খুব একটা আঁটসাঁট সইতে পারে না। তা ব'লে

স্বাধীনতার অপব্যবহারও এ জাতের পুরুষরা সয় না। প্রতি গ্রামে, প্রতি চকে, প্রতি পরগণায় খুনজখমটা যেন এদের মধ্যেই বেশি।

চড়কের সময় কাছে এলে এদের আর ঘরের শান্তি থাকে না। শ্মশানতলার মাঠে এখন দু'শো মজা। এমন সময়ে কোন্ পুরুষটা বাড়ি থাকতে চায়? বাগদী মেয়েরা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'রাত বিরেতে মড়া জাগিয়ে হাতের ওপর নাচায়, সাপ নিয়ে গায়ে জড়ায়। পিচাশ ব্রহ্মদত্যি সব সন্ন্যেসীদের দেশ-বিদেশের ফলমূল জোগায়। অমন দু'শো মজা ফেলে ঘরে আসবে কেন পান্তাভাত আর মাছ পোড়া খেতে?' পোড়া বা আধসেঁকা শোল ও ল্যাঠা মাছ এদের পক্ষে পান্তাভাতের উত্তম উপকরণ।

আজ সন্ধেবেলা রামাই বাগদীর ঘরে এই নিয়ে লেগেছিল। রামাই বাগদীসমাজে কুলীন। বাপের মত সে-ও গিয়ে মুর্শিদাবাদের নিজামতে চাকরী নিয়েছিল। রাঢ় দেশের লাঠিয়াল, তীরন্দাজ ও বর্শেলদের আলাদা খাতির সেখানে। সবাই মোটা মোটা পেতলের বালা, পেতলের মালা এবং লালজামা পায়। সে উর্দি জমা থাকে। বিশেষ বিশেষ দিনে পোশাক পরে তারা পথে বেরোয় ও শোভাযাত্রার সঙ্গে যায়। যুদ্ধের সময়ে যত না হোক, ছোটখাট বিদ্রোহ বা অন্য হাঙ্গামা থামাবার সময়ে লেঠেলদের দরকার।

দিব্যি ছিল রামাই। লোহার তৈরি সুগঠন শরীর। ধড়ের ওপর মাথাটা বিধাতা-পুরুষ একটু চেপে বসিয়ে-ছিলেন। গলাটি তাই বড়ই ছোট। এই খুঁৎটুকু রামাই যন বাবরী চুল দিয়ে সেরে নিয়েছে। সত্যি বলতে কি, এমন শোভার চুল সচরাচর দেখা যায় না। কাঁধ পর্যন্ত কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল। গলায় একগাছা রূপোর হার, কোমরে মালকোঁছা মারা কাপড় ও গলায় সদাই 'কার তরে মন পেতেছ এতই যাতনা' ইত্যাদি রসের গান। নেশাখের গোড়ায় দু'পাঁচ ছিলিম ধোঁয়া পড়লে 'কে রাজা কে উজীর, এ শর্মা কম কিসে' এই বলে আস্ফালন করা তার অভ্যেস।

বিয়ে দেবার সময়ে তার শ্বশুর বলেছিল, 'খুব ভাল কথা। পুরুষমানুষ হবে এই রকম।' কিন্তু মাসতিনেক আগে, বাগদীপাড়ার হাড়জ্বালানে মেয়ে সুন্দরী পারী ঘরে আসবার পর থেকে রামাই বাগদীর এই হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা ভাবটা চড়চড় করে বেড়ে যায়। ফলে একদিন কোতোয়ালীতে রাতচৌকি দেবার সময়ে দফাদারের সঙ্গে রীতিমত মতান্তর। তারপর রামাই-এর লাঠি আস্ফালন এবং দফাদারের পাল্টা শাসানি 'আমি যদি অমুক বেরার পুত্র হই'---ইত্যাদি। পরিণামে দু'পক্ষেই লাঠি চালাচালি এবং রামাই সাময়িকভাবে বরখাস্ত। দেশে ফেরবার সময়ে রামাই বাগদী বড় গলায় বলে এল 'পরিবার দিব্যি দিয়ে রেখেছে নইলে নির্ঘাৎ আজ অমুক বেরা'র ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিতাম।'

রামাই-এর মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে নি। মাইনে করা লেঠেল-স্বামীর বউ পারী আর এ পারী-তে অনেক তফাৎ। বউ-এর ভ্যানভ্যান ঘ্যানঘ্যান শুনতে শুনতে রামাই আবার জমিজমা দেখতে সুরু করে। অন্তত কিছু টাকা চাই, পান খাইয়ে মুহুরীকে খুশি করে তবে আবার দপ্তরে ঢুকতে হবে। কিন্তু টাকা পরের কথা, ক'টা কড়ি বা তামার পয়সা হাতে পেলেই দুঃখ ভোলবার জন্যে রামাই অন্য দাওয়াই কেনে। গাঁজা-ভাঙের কলকে নিয়ে সাধুদের সেবা করতে যায় চড়কের মাঠে। তারপর যেমন রাত বাড়ে তেমন তার দুঃখ উথলে ওঠে। মাঝে মাঝে সে দুঃখের প্রকাশ দেখে চমৎকৃত হতে হয়। এই সেদিনই সে নেশায় টলতে টলতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। গলদশ্রু লোচন, উর্দ্ধবাহু, একহাতে রাম-দা। 'কোথায় সেই মহাপাতকী উদ্ধব বাগদী, অ্যাঁ? আমার মত অমানুষের হাতে সোনার মেয়ে পারীকে বলিদান দিয়েছে, আজ আমিও তার ধড় একঠাঁই মুণ্ডু একঠাঁই করব।' ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা শব্দ করে সে রামদা নাচাতে থাকে, ভেতরে শ্বশুর কেঁপে মরে, শেষ অবধি পচাপুকুরে চুবিয়ে তবে মানুষ তার মাথা থেকে ভূত নামায়।

আজ সন্ধেবেলা যখন গাঁয়ের বাতাস ঝগড়ার চোটে বেজায় গরম হয়ে উঠল, তখন আচার্যবাড়ির পাতানী পিসী কবরেজবাড়ি থেকে এতটুকু বাতের তেল নিয়ে ধব্‌ধবে হেঁটো থানের আঁচল বাতাসে ওড়াতে ওড়াতে ডিঙি মেরে লাফাতে লাফাতে কায়েত-পাড়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কানখাড়া ক'রে কি শুনলেন। তারপর আপনমনে বললেন, 'নাঃ, কালই কায়েত কাকার কাছে কথাটা তুলতে হচ্ছে। বাগদীপাড়ায় ঝগড়া-কেজেটা যেন বড্ড বেশি হচ্ছে। আর তোকেও বলিহারী যাই রামাই, নিত্যি নিত্যি যদি এতই অশান্তি বউকে নিয়ে, ও কি, অ্যাঁ?'

দেখলেন পথের পাশে একটা কাটা গুঁড়ির ওপর বসে পারী তার ননদের সঙ্গে কথা কইছে।

'আমি পারী পিসী, এখানে বসে কথা কইছি।'

'তা ত' দেখতে পাচ্ছি। এ সন্ধেবেলা এখানে বসে কথা কইবি, ভাতজল দিবি না, তাইতে ত' রামাই চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছে।'

পারী পাতানী পিসীকে বিলক্ষণ চেনে। হাসি চেপে নিরীহ মুখে বললে, 'তিনি ত' এট্টু আগে ভিনগেরামে গেছে, ও চেল্লানি যা শুনতেছ তা আলতা মাসীদের ঘরে। ননদ ভাজে লেগেছে।'

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে পাতানী পিসী বললেন, 'তাই না কি, অ্যাঁ?' বলেই বিদ্যুৎ বেগে আবার রওনা হলেন। মুখখানি হাসিতে ভরে গেল। অন্য

বাড়িতে ঝগড়া বিবাদ, মারধোর বা রোগভোগ দেখলে পাতানী পিসীর বড় আনন্দ হয়। মুড়ানো মাথায় ছোট্ট খোঁপায় একটি তুলসীপাতা গোঁজা। আঁচলের একটা প্রান্ত পুঁটলী করে বগলে রেখেছেন, গলায় কণ্ঠি, মুখে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, পাতানী পিসী হাসতে হাসতে যেন সাঁঝের বাতাসে ভাসতে ভাসতে মুখোটি বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

বাতাসে কান পেতে পারী বললে, 'ওঃ, বামুনবাড়ির বুড়ি চেল্লায় বিস্তর।'

'সূঁচ বলে চালুনীকে, অ্যাঁ?'

'তা ঠাকুরঝি, আমাদের নিত্যি ঝগড়া কেজে, আর এদের ত' তা নয়। এতক্ষণে, দেখগে' যাও বুড়ি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে।'

'গতবার কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিল।'

'এই সেদিনই শুনলে না, কত কেচ্ছা হয়ে গেল?'

আনন্দীরাম মুখোটির বাড়িতে সত্যিই ঝগড়ায় কাক-চিল উড়ছে। বর্তমানে আনন্দীরামের গর্ভধারিণী রণে ভঙ্গ দিয়ে মুড়োচ্ছে বিলাপ করছেন 'এ ছার প্রাণ আর রাখব না, আমায় তোরা একগাছা দড়ি এনে দে।' অন্তঃপুর থেকে বিলাপ আসছে শুনে পাতানী পিসী 'আহা মরবে কেন? সোনার সংসার ফেলে কেউ কি মরে?' বলতে বলতে উৎসাহে বড় বড় পা ফেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আনন্দীরামের বাড়ি পূবমুখী, দক্ষিণদুয়োরী। নাকে নস্যি টিপে বাচস্পতি মশায় বলেন, 'এমন বাড়িতে যে বাস করবে তার মনে ত' সদাসুখ হে।' কিন্তু বাচস্পতি মশায়ের অনেক কথা অনেক সময়ে ফলে গেলেও এ কথাটি ফলে নি। অন্তত আনন্দীরাম তার কোন প্রমাণ পায় নি।

এখন বাইরের উঠোনে কাঠের চৌকিতে বাচস্পতি মশায়ও বসে আছেন ও চোখ কুঁচকে, ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটি দেখেন। অন্দরের মহল দোতলা। আট ইটের গাঁথুনি, পুরু দেওয়াল। অনেক উঁচুতে ছোট ছোট জানলা। ভারী ও পুরু শালকাঠের দরজায় মাঝে মাঝে লোহার গজাল। ছাতের পাঁচিল দেড়-মানুষ প্রমাণ উঁচু, মাঝে মাঝে ইট সরিয়ে ফুকর কাটা।

অন্দর ও বা'র মহলের মাঝে উঁচু পাঁচিল, ছোট দরজা। বাইরে কাছারীঘর, সে ঘরে চৌকি পেতে বসে আনন্দীরামের মামা বিষয়কর্ম দেখবার নামে তাস ভাঁজেন ও যাত্রার মহলা দেন। অতিথিসজ্জন, জ্ঞাতি আত্মীয়, গোমস্তা, মাহিন্দর, চাকর এদের থাকবার মত সার দেওয়া কয়েকটি খুপরী কোঠা, কোলে টানা দালান। বর্তমানে সে ঘরে ধান চাল, মুগ মসুরের কলাই, পাট ইত্যাদি রাখা হয়। ছোট একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে। এ বংশে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ, দোল, স্নানযাত্রা ও রাস-পূর্ণিমায় গৃহদেবতা কালাচাঁদকে আনন্দীরামের পিসীমার হেফাজত থেকে উদ্ধার ক'রে এখানে আনা হয়। এখন আনন্দীরামের গালে হাত, তাঁর মামা অন্দরের কলহে মাথা না গলিয়ে দাওয়ায় বসে পালকের কলম দিয়ে কান চুলকোচ্ছেন এবং নিবিষ্ট মনে 'কালীয়দমন' পালা-র গান গাইছেন।

বাচস্পতি মশায় কান খাড়া করলেন। 'জলে আছে কালীয়ের ছানা, যেমনি কানু নামবে জলে, পাক দিয়ে ন্যাজ, ন্যাজ দিয়ে পাক, জড়িয়ে নেবে উঠতে দেবে না' এই স্বরবিরহিত অপূর্ব ভাষাবিন্যাস শুনে তিনি অবজ্ঞার সুরে 'হুঁ' বললেন।

আনন্দীরাম অসন্তোষের সঙ্গে মামাকে দেখছিলেন। কিয়ৎক্ষণ দম পড়বার পর আবার দম নিয়ে পাতানী পিসী এবং মা নতুন উৎসাহে চেঁচামেচি সুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, 'ভেতরে যান মামা।'

মামা অন্নদাতা ভাগ্নের কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন, 'বাপু হে, তুমি ত' শহরে থাক, ভালমন্দ খাও, হাওয়ায় হাওয়ায় আছ। আমার এ জ্বালা বারোমেসে।'

'কিন্তু মা যে-রকম রোখ ধরেছেন—'

'কি, গলায় দড়ি দেবে বলে? আরে দিদিকে ত' আমি একরকমই দেখি, এই মরব, সেই মরব, ও সর্বক্ষণই সার।' তিনি উদার হেসে বললেন, 'ব্যাটাছেলের কি ওসব কথায় কান দিলে চলে?'

অগত্যা আনন্দীরাম ভেতরে গেলেন। পাতানী পিসী দু'দিকেই তাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ননদকে বলছিলেন, 'বললে বা, বড় তাড় বই ত' নয়। তুমি অমন তুচ্ছ কথা গায়ে মাখ কেন? হ্যাঁ বুঝি বটে রাগ হয়, রাগ হয় সেটা অন্যায্য নয়।'

এটুকু শুনে পিসীমা উৎসাহ পাচ্ছেন, এবং ওপর পানে মুখ তুলে বলছেন, 'দেখে যাও তোমরা, মাথার ওপর দেবতা আছেন, আমার মেয়ের স্বামীসুখ হয় তো সইবে কেন, কে না জানে কুলীন বর ঘরে আনতে গেলে নেষ্য পেন্নামী দিতে হয়।'

তৎক্ষণাৎ পাতানী পিসী রোরুদ্যমানা প্রৌঢ়াকে বুকে ধরে বলছেন, 'আহা শান্ত হও বউ, তোমার কি মরলে চলে, অ্যাঁ? ও আনন্দী, তোর

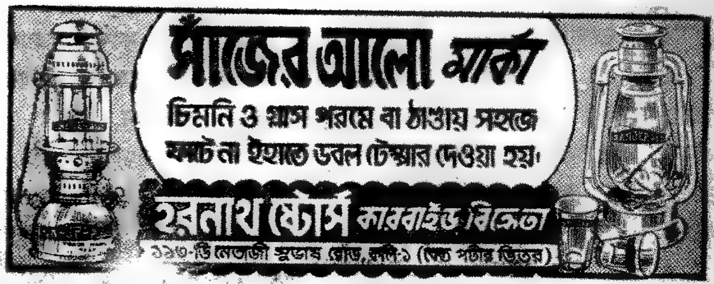

ছোটমা কই। মা-কে এসে শান্ত করুক না!'

আনন্দীরাম বিব্রতভাবে কি বলতে চেষ্টা করলেন। পাতানী পিসী উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তিনি বুঝি ছিকে বুনতে বসেছেন? অ্যাঁ? তা তোকেও বলি আনন্দী, বুড়ো হ'ল, মাকে একটু তীর্থিধম্ম করা, না চিরকাল এই সংসারের জোয়াল টানবে? সে বউকে বা আনিস না কেন?'

'ওগো, ছেলে যদি আমার বশ হত, তা'লে কি আমায় সবাই মিলে এমন অচ্ছেদ্দা করত, ছোট যে কাজ করে তাই যে ও দেখে গো, আর আমি যে এই একপণ সুপুরি কেটে শুকোই, খই ভাজি, তা কি ও দেখে গো! নিয়তে'র সে সর্বনাশী এসেই ত' সব্বনাশ হল গো---'

'ধুত্তোর!' ব'লে আনন্দীরাম দুম-দুম ক'রে পা ফেলে হেঁসেলের দিকে গেলেন। হেঁসেলে শেকল তোলা। উঠোনে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে এদিকে ওদিকে চাইছেন, এমন সময়ে জলের কলসী কাঁখ থেকে দাওয়ায় নামিয়ে বিশালাক্ষী ওরকে ছোট জিগ্যেস করলেন, 'আচাযি ঠাকুরঝি যে!'

ঠাণ্ডা গলা। যেন স্বাভাবিকতার বাইরে কিছু ঘটে নি। বিশালাক্ষীর পরণে সরু ভোমরা পেড়ে ধুতি, হাতে চুড়ি, ভিজে চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। পাতানী পিসী হঠাৎ যেন থমকে গেলেন একটু। তারপর গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, 'সাধ ক'রে কি কেউ এমন সময়ে আসে বাছা, ননদে ভাজে যে ঝগড়া---তা তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি?' বিশালাক্ষী ক্ষীণ হেসে বললেন, 'ধান ভানছিলাম।'

'ধান ভানছিলে?'

'ঢেঁকি যে। আমার বসে থাকলে চলে? ঘরদোর সারলাম, একপ্রস্থ রান্না সারলাম, জল আনলাম, এখন ছেলে-পিলে মুনিষ মাহিন্দর সুবাই খাবে, সংসারে কাজ কি কম?'

আনন্দীরাম আর রাগ চাপতে পারলেন না। বললেন, 'তবু নিজের মুখে বললে, এরা শুনল। সংসারের সব দায়িত্ব একজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তোমরা, ছিঃ!'

মা এবং পিসীমা চট ক'রে একপক্ষ হ'য়ে গেলেন, এবং ছোট না থাকলে কি সংসার চলে না, ইত্যাদি আস্ফালনের কথা বলতে সুরু করতেই ছোট বললেন, 'কেমন চালাও তা জানি। বউ আর মেয়ে দুটোর হাড় কালি কর। এখন আর কথা বাড়িও না দিদি, আমার কাজ আছে। ও মেয়েরা, এদিকে আয় না, গেলি কোথায়?'

আনন্দীরামের পিসতুত বোনরা এতক্ষণে স্বস্তিবোধ করে ছোট'র কাছে আসে ও পিদীম জেলে নিয়ে মুনিষদের ডাকতে যায়।

'তুমি এবার এস আচাযি ঠাকুরঝি' বলতে পাতানী পিসী 'তোমাদের ঘরে থাকব বলে আসি নি বউ' ব'লে ঠক্ ঠকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মুখ কালো ক'রে ননদ বললেন, 'তুমি আসন্তি যাওন্তি মানুষ ছোট, আমরা বারোমাস থাকি। অমন সম্মানী মানুষকে কি করে হট ক'রে বেরিয়ে যেতে বললে?'

বিশালাক্ষী বললেন, 'বেরিয়ে যেতে আমি বলি নি, তবে বললেই যেন ভাল ছিল। উনি কুচ্ছো করেছিলেন বলেই তোমার হাবিকে আর শ্বশুরঘরে নিলে না।' হাসিভরা মুখে চেয়ে রইলেন কথাটি বলে। তারপর গলার স্বরটা পালটে নিয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, সেই বিকেল থেকে যে চিল চিৎকার চেচাচ্ছ, তা ওষুধ খাবার কথা মনে আছে ত'? ঘরে যাও। কুলুঙ্গীতে ওষুধ, মুখশুদ্ধি সব রেখেছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শান্ত হয়ে গেল। আনন্দীরামের মা আবার সুপুরি কুচোতে বসলেন, পিসী গেলেন আনন্দীর মামার সন্ধানে, তাঁর সাহায্য ছাড়া জামাইকে চিঠি লেখা যাবে না। আহারাদির পাট মিটিয়ে আর সবাই বিশ্রামে গেল, আনন্দীরামের বাইরে থাকার ফলে অন্য অভ্যেস, রাত ক'রে খাবেন।

এতক্ষণে আনন্দীর মনে পড়ল বাইরে বাচস্পতি মশায় বসে আছেন। শশব্যস্তে গেলেন। যেমন কথা কইতে যাবেন, তেমনি বাচস্পতি মশায় হুঁ হুঁ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'বাবা, আমার বড় বিপদ।'

'কি হ'ল?'

বাচস্পতি মশায় ভাল করে দেখে নিলেন আশেপাশে কেউ আছে কিনা। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। কাশী ফরাসডাঙায় গিয়ে জাত দিয়ে এসেছে।'

'জাত দিয়ে এসেছে?'

বাচস্পতি মশায় ফিসফিস করে বললেন, 'সায়েবদের তৈরি বরফ---'

'কি খেয়েছে?'

বাচস্পতি মশায় জিভ কেটে বললেন, 'শুঁকে দেখেছে।'

আবার হুঁ হুঁ করে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদলে নাকের গর্ত সরল হয়, এখন ভিজে ভিজে নস্যির কৌটা নাক দিয়ে গড়াতে থাকল। আনন্দীরামের হাসি পেল। তিনি দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'বরফের কি গন্ধ আছে খুড়োমশায়?'

'জানিনে বাবা, আমি যজমানী ক'রে খাই, খবরটি রটলে আমি আর বাঁচব না।'

'আচ্ছা, আমি কাশীর সঙ্গে কথা কইব এখন, আপনি যান।'

'হ্যাঁ বাবা, তাই ক'রো, তাই ক'রো, আর অমনি কানদুটো ওর বেশ ক'রে,---তোমায় একটু মান্য করে।'

তিনি উঠে পড়েন ও আনন্দীরামের মুনিষ দুজন বাড়ি যাবার পথে বাচস্পতিকে এগিয়ে দিয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

খাঁটি মানুষ শশিভূষণ

রণজিৎকুমার সেন

সংসারে কত লোকই তো আসে, জীবন-নাট্যের অভিনয় শেষ ক'রে আবার একদিন চলেও যায়। কে তাদের খোঁজ রাখে? মহাকালের বিরাট ক্যানভাসে তাদের স্বাক্ষরটুকুও থাকে না।

কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আসেন, যাঁদের আসাকে বলতে হয় আবির্ভাব। জীবন-নাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁরা যে অভিনয় করে যান—তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। মহাকালের বুকে তাঁরা যে স্বাক্ষর রেখে যান—সহসাই তার দাগ মিলিয়ে যাবার নয়।

সৃষ্টি-জগতে সেই মানুষই সার্থক। লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো সরল রেখার জীবন নয় তাঁর। সে-জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাসের পাতায়-পাতায় যে অভিজ্ঞতার ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, কোনো কালে অগণিত জন-মানসের পক্ষে তাই হয় অভিধান।

এমনি একটি মানুষ শশিভূষণ। ফুল যেমন কুঁড়ি থেকে পুষ্পে বিকশিত হয়, ফল যেমন মঞ্জরী থেকে তার আপন পরিচয়ে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, শশিভূষণও তেমনি প্রজ্ঞায় বিকশিত হ'য়ে জীবন-চর্যায় পূর্ণতা লাভ ক'রেছিলেন।

তিনি কোন সালে কোথায় কোন বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন সেইটেই তাঁর জীবন-ইতিহাস নয়; বরং তিনি জীবনের কোন্ ক্ষুদ্র অংশ থেকে ক্রমে বৃহতের স্পর্শলাভ ক'রেছিলেন, সেইটেই তাঁর আসল জীবন-কাহিনী।

আমরা জানি—কি নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। ক'লকাতা থেকে বহুদূরে সুদূর মফস্বলের রিক্ত পরিবেশে সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তিনি সেদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি, বরং আঘাতের পীড়াকে আনন্দের মালা করে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন উজ্জ্বল এক সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের। সেই জীবনে এসে পৌছতে তাঁর সময় লাগে নি। মাটি থেকে ধাপে ধাপে উপরে উঠবার যে সিঁড়িগুলো সেদিন তাঁর দৃষ্টিতে এসে প'ড়েছিল, একে একে সেই শেষ সিঁড়িতে এসে পা রাখতে সময়ের পরিহাস ছিল না। কারণ, প্রথম জীবনেই সেই বিখ্যাত ইংরেজি প্রভার্বটা তাঁর মনে গাঁথা হ'য়ে গিয়েছিল—

'God helps them who helps themselves.'

আত্মোন্নতির জন্য নিজেকে সাহায্য ক'রেই তিনি ভাগ্য-বিধাতার সাহায্য পেয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেমন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের শেষ উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন, তেমনি গবেষণাকার্যে প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে তিনি অপরিসীম গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে শশিভূষণ রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ পান এবং ১৯৪০ সালে 'Some obscure religious cults as background of Bengali literature' বিষয়ে থিসিস রচনা ক'রে পি-এইচ-ডি লাভ করেন। এম-এ পাশের বছর-দুয়েক পরেই তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে শশিভূষণ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের নিষ্ঠা, মেধা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং গবেষণাকার্যে একাগ্রতা তাঁকে তাঁর কর্মজীবনে অতিক্রত এই সাফল্য এনে দিয়েছিল।

তাঁর 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য ১৯৬১ সালে ভারত সরকার তাঁকে একাডেমী পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি যে-সমস্ত গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন, তার মধ্যে উপরোক্ত দু'টি বিস্ময়কর গ্রন্থ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—উপমা কালিদাসস্য, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে, টলস্টয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ, ত্রয়ী, বাংলা-সাহিত্যে নবযুগ, বাংলাসাহিত্যের একদিক, উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ, শিল্পলিপি, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও আধুনিক কবিতার প্রথম পর্যায়, ঘরে বাইরের সাহিত্যচিন্তা, বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদনা, শিশুসাহিত্য, কাব্যনাট্য, কাব্য, গল্প ও উপন্যাস এবং রম্যরচনাতেও তিনি সমান দক্ষ ছিলেন।

যে মহৎ গুণাবলীর দ্বারা দীনেশচন্দ্র সেন একদা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বঙ্গসাহিত্যজগৎকে ফলবান ক'রে গেছেন, সেই গুণাবলীর সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন শশিভূষণ। প্রতিভার সঙ্গে কর্মস্পৃহা এবং হৃদয়বত্তার সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি—উভয়াঙ্গিক এই দ্বৈতসত্তার খাঁটি মানুষ ছিলেন শশিভূষণ। আজ যেখানে মানুষ ক্রমেই মেরুদণ্ডহীন ও ভেজালে পরিণত হচ্ছে, সেখানে তিনি ছিলেন—তার জলন্ত ব্যতিক্রম। তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল সাহিত্যগত। কিভাবে বাংলাসাহিত্যকে বিপুল গৌরবে গৌরবান্বিত ক'রে তোলা যায়, এই চিন্তাই ছিল তাঁর সকল কর্মের মূল চিন্তা।

শেষজীবনে হয়তো ভ্রমণকালে বিশিষ্ট ভারতীয় সঙ্গীতবিশারদ ডক্টর আর্নল্ড বাকের কাছ থেকে বাংলাসাহিত্যের চর্যাপদ প্রমুখ আদিযুগের কিছু মূল্যবান উপাদান ও টেপরেকর্ড সংগ্রহ ক'রে তিনি নিজের দেশে নিয়ে আসেন। এই উপাদানগুলো নিঃসন্দেহে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ হিসেবে এদেশের গবেষণাকারী ও তত্ত্বসন্ধানী ছাত্র ও পাঠকবৃন্দের যথেষ্ট উপকারে আসবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে কোনো প্রকার উগ্রতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনিই আবার সাহিত্যে এই উগ্রতাকে সসম্মানে স্থান দিয়ে গেছেন। এই উগ্রতার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মনীতির ভূমিকায়। ফলে, এই অগ্রজ ও কনিষ্ঠ উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসাহিত্যের মান এমন এক পর্দায় বেঁধে দিয়ে গেছেন—যে পর্দা থেকে ইচ্ছে ক'রলেই বঙ্গ ও সাহিত্যকে নীচে নামিয়ে বিকৃত করা যাবে না।

ব্যক্তিগতভাবে শশিভূষণের সঙ্গে গত বিশ বছরেরও অধিক আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। আমি অধুনালুপ্ত মাসিক বঙ্গশ্রী পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করি ১৯৪৩ সালে। সেই থেকে বঙ্গশ্রী বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারো বছর অধিকাংশ সংখ্যাতেই আমি শশিভূষণের রচনা প্রকাশের সুযোগ নিতাম। কোনো ক্ষেত্রেই কখনও তাঁর কুণ্ঠা বা কার্পণ্য লক্ষ্য করি নি। আগে যখন তিনি ৯।১৪, রসা রোডের ভাড়াবাড়িতে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় কতদিন যে কত ঘণ্টা কেটে গেছে, তার হিসেব নেই।

তিনি জীবনে একটি মাত্রই উপন্যাস লিখেছেন 'জংলা মাঠের ফসল', লিখে পাণ্ডুলিপি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, আমি ধারাবাহিক [illegible] বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ ক'রেছি। পল্লী—পরিবেশের পটভূমিকায় এ উপন্যাসের তুলনা নেই। কিন্তু উপন্যাসে আর তিনি কলম ধরেন নি।

একদিন গভীর অনুযোগ নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি স্বভাব-সুন্দর হাসি হেসে বললেন: 'রামতনুর চেয়ার নেবার পর মনে হচ্ছে গল্প-

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

উপন্যাস লিখলে লোকে আমাকে খেলো মনে ক'রবে, হয়তো তাতে পরোক্ষে এ-চেয়ারের অমর্যাদাই হবে।'

তর্ক তুলে বললাম: 'তা কেন? দীনেশ সেন বা খগেন মিত্র কি লেখেন নি? এ আপনার দুর্বলতা।'

তিনি তেমনি সহজ-সরল হেসে বললেন: 'দেখি আবার লেখা যায় কিনা।'

কিন্তু লেখা আর হয় নি।

এ ঘটনারও কিছুকাল আগে আমি যখন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলাম, শশিভূষণ ছিলেন হেড এগজামিনার। ছেলে-মেয়েদের পাশ করাবার ব্যাপারে এমন অনেকদিন অনেক খাতা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা এবং তর্ক ক'রেছি। তিনি হাসিমুখে অত্যন্ত সহজে বিচারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। দেখেছি—কত সহজ প্রাণবন্ত মানুষটি। মানুষকে বিশ্বাস ক'রে তিনি কত সময়ই তো ঠকেছেন। কিন্তু মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর চিরকাল অম্লান ছিল। বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে নিমগ্ন হ'য়ে বুদ্ধের আরব্ধ মৈত্রী-স্থাপনার পরিকল্পনাকে তিনি নিজের জীবনে চর্চা করার প্রয়াস পেতেন। এমন কি, নিজের ছেলে এবং মেয়ের নামও বৌদ্ধ আদর্শে অমিতাভ ও সংঘমিত্রা রেখেছিলেন। তাঁর সৌহার্দ্য যে কত মধুর ছিল, তা তাঁর অগণিত বন্ধুদের অজানা নেই এবং তাঁর অধ্যাপনা-জীবনে তিনি যে ছাত্রসমাজের কতখানি কাছের মানুষ এবং কত বড় উদারচরিত অভিভাবক ছিলেন, তা তাঁর প্রতিটি ছাত্রই জানে। একথা বলবো না যে, তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, বিদেহী আত্মায় বিশ্বাস আমাদের চিরকালের; আমরা বিশ্বাস ক'রবো—তিনি এবারের জীর্ণবাস ত্যাগ ক'রে ওপারে গেছেন মাত্র, কিন্তু অগণিত মানুষের চিত্ত ভ'রে আছেন, যেমন ছিলেন। আমি তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ ক'রবো না, স্মরণ ক'রবো সেই পরিপূর্ণ মানুষটিকে—যিনি আমাদের নানাভাবে নানাদিকে অনেক দিয়েছেন এবং জীবননাট্যে আকস্মিক যবনিকাপাত না ঘটলে আরও অনেক দিতে পারতেন।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পনেরোই আগষ্ট

স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র দিনে মনে পড়ে একজনের কথা— যিনি স্বাধীনতার পর প্রতি বৎসর জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে লালকেল্লার প্রাকার থেকে অগণিত জনতার উদ্দেশে তাঁর মনের কথা বলতেন। ভারতবর্ষকে তিনি কি ভাবে গড়ে তুলতে চান, সেকথা প্রকাশ করতেন। আজ জওহরলাল নেহরু জীবিত নেই। তাই স্মরণ করছি, তাঁকে।

উনিশ শো সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট। জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হ'ল স্বাধীনতার বিজয়বার্তা নিয়ে।

গোটা পৃথিবী তখন সুষুপ্তির অন্তরালে ঢাকা। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর রাজপথে অগণিত মানুষ। গভীর তপস্যায় অর্জিত দীর্ঘদিনের কামনার ধন—'স্বাধীনতা' ঘোষিত হ'ল রাত বারোটায়। দিন-পঞ্জীতে আর একটা দিন সুরু হ'ল। পনেরোই আগষ্ট উনিশ শো সাতচল্লিশ। প্রভাতী আলোয় সারা দিল্লী তথা গোটা দেশ ঝলমলিয়ে উঠেছে। পরাধীন জাতির জীবনে স্বাধীনতার নতুন আলোয় ঐতিহাসিক লালকেল্লায় বিদেশী শাসকের প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক'-এর বদলে উত্তোলিত হ'ল গোটা জাতির হৃদয়-মন্থন-করা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। জনসমুদ্র উদ্বেলিত হ'ল। সংকল্পধ্বনি উচ্চারিত হ'ল—

'দি গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার অব বিল্ডিং দি নোবল ম্যানশন অফ ফ্রি ইণ্ডিয়া হোয়েয়ার অল হার চিলড্রেন মে ডোয়েল।'

সেই ঐতিহাসিক সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্টে তমসামুক্ত জাতির প্রথম প্রত্যূষে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। সুরু হ'ল ঐতিহাসিক লালকেল্লার আর এক অধ্যায়।

স্মরণাতীত কালের ইন্দ্রপ্রস্থ শাশ্বত সভ্যতার ঐতিহ্য বহন ক'রে ইতিহাসের পাতায় দিল্লী মহানগরী রূপে পরিচিত। পাঠান, মোগল, ইংরেজ এই দিল্লীর মসনদে বসে শাসন করেছে গোটা দেশকে, জাতিকে। মোগল সম্রাট সাজাহান দূর্ভেদ্য রাজপ্রাসাদ উর্দু-ই-মুলা তৈরি

করলেন। এই দুর্গের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির প্রতিটি ঘটনা এক একটি ইতিহাস।

বাহাদুর শাহ এর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখলেন কিলা-ই-মুল্লা। সেই কিলা-ই-মুল্লাই পরবর্তীকালে লালকিলায় পরিণত হয়। লালপাথরে মোগল স্থাপত্যের প্রতীক এই 'রেড ফোর্ট' ইংরেজের হাতে পড়ে দস্যুবৃত্তির চিহ্ন বহন করেছিল মাত্র। যেখানে মণিমাণিক্যের বিন্যাস সেখানে তারা রেখে গেছে রঙের পোঁচ মাত্র।

একদিন সেই গৌরবময় মোগল আমলে এই দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রবেশ-দ্বারের নহবতখানায় প্রহরে প্রহরে বেজে উঠতো মাঙ্গলিক বাদ্য। সানাই বাজতো ভৈরবী, পূরবী, ইমনকল্যাণ সুরে। আম দরবার বসতো দেওয়ান-ই-আম-এ। জন-সাধারণের বক্তব্য শোনা তৎকালীন রাষ্ট্র-পরিচালকদের করণীয় কর্তব্য ছিল। দেওয়ান-ই-খাসের কারুকার্যময় কক্ষের মধ্যস্থলে ইতিহাস-বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন রাখা থাকতো। সাজাহানের আদেশে এ সিংহাসন তৈরি করেছিলেন বেবাদল খাঁ সাত বছরের সাধনায়। ঘটনাস্রোতে দেওয়ান-ই-খাসের এই ময়ূর সিংহাসনে বসে বিজয়ী নাদিরশাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে তাঁর সাম্রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু মূল্যবান এই ময়ূর সিংহাসনটি তিনি পারস্যে নিয়ে যান।

স্রোত তখন উল্টোমুখী। লাল-কেল্লায় নেমে আসছে কালো তিমির-রাত্রি। বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি এসে পড়ছে। কলুষিত দস্যুর হাতে লালকেল্লার অঙ্গ দূষিত। চোরা-গোপ্তা পথে ক্রমে এগিয়ে আসছে অভিশপ্ত অধ্যায়। এই দেওয়ান-ই-খাসের অভ্যন্তরে শাহ আলম একদিন অভ্যর্থনা জানালেন বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ লর্ড লেককে। আর একটি অধ্যায় সূচনা হ'তে চলল।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে তখন গোটা ভারতবর্ষকে শাসন করে চলেছে। উনিশ শো এগারো সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে এই ঐতিহাসিক লালকেল্লার আভিজাত্যময় দেওয়ান-ই-খাসে খাসদরবার ডাকলেন। সেদিন লালকেল্লার গম্বুজে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছিল। নহবতখানায় কোন বাদ্যকর না থাকলেও সম্রাটের সম্মানে লালকেল্লার প্রবেশপথে বিদেশী পোষাকে আচ্ছাদিত গোরা পল্টনরা ইংরেজী বাদ্যে মুখরিত করে তুলেছিল দিল্লীর আকাশ-বাতাস। লালকেল্লার এমন আভিজাত্যময় পরিবেশে কিন্তু প্রথম হোঁচট খায় ইংরেজ রাজকুল উনিশ শো একুশ সালে। প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এসে দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসে বিগত গৌরবময় দরবারের কথা কল্পনা করে আহ্বান করলেন বিশেষ অধিবেশন। তখন আসমুদ্র হিমাচল পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির আন্দোলনে আন্দোলিত। ভারতের জনগণ, রাজন্যবর্গ, অধ্যাপক, গুণীজ্ঞানী এই উৎসব বয়কট করেন।

ঐতিহাসিক দিল্লী আর অভিজাত গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতীক লালকেল্লার উপর উড়ন্ত ইউনিয়ন জ্যাক তখন প্রতিটি দেশপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে আঘাত হানছে। তাই দেশ-মাতৃকার পূজাবেদীতলে জীবন আহুতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুদূর কোহিমা-ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে হাজার হাজার ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা প্রিয় নেতাজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সংকল্পবাণী ঘোষণা করেছেন—'চল চল, দিল্লী চল।' লালকেল্লায় ওই বিদেশী শাসকের পতাকা নামিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ছিল তাদের একান্ত বাসনা।

তারা, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীরা এই লালকেল্লায় এলো। কিন্তু কালের কি পরিহাস! তারা বন্দী। ইংরেজ সরকার তাদের বিচার করবে এই লালকেল্লায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। প্রহসন শেষ হ'ল। অপরাধ: এরা লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা তোলবার বাসনা পোষণ করেছিল। অপরাধ প্রমাণিত হ'ল।

এলো উনিশ শো সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট। ঐতিহাসিক লালকেল্লার উপরে শোভিত ইউনিয়ন জ্যাক নেমে এলো। ত্রিবর্ণ পতাকা—জাতির হৃদয়-মন্থন-করা ধন, উত্তোলন করলেন জহরলাল নেহরু। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লীর বিরাট বিরাট যে সব প্রাসাদে এতদিন বিদেশী সরকারের পতাকা উত্তোলিত থাকতো, সেই ঐতিহাসিক পনেরোই আগষ্টে তার যে কয়েকটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল তার মধ্যে দিল্লীর আভিজাত্যময় প্রাসাদ ঐতিহাসিক 'মেটকাফ হাউস' অন্যতম।

এর পর ষোল বছর ধরে প্রতিটি পনেরোই আগষ্টে আনুষ্ঠানিকভাবে জহরলাল নেহরু লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। দিল্লীর বিশেষ বিশেষ প্রাসাদে আড়ম্বরের সঙ্গে উত্তোলিত হয়েছে জাতীয় পতাকা। আগামী পনেরোই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে দিল্লী সজাগ হয়ে উঠবে। লালকেল্লায় আনুষ্ঠানিক তোপধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে। কিন্তু এইবারই প্রথম, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, এই ঐতিহাসিক দিনটিতে প্রিয় নেতা নেহরুহীন অনুষ্ঠান হ'তে চলেছে।

আজ সতেরো বছর পূর্তি স্বাধীনতা উৎসবে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল অনুপস্থিত থাকলেও, কালের গতি যেমন স্থিতিশীল নয়, তেমনি বিরাট কর্মকাণ্ড বন্ধ হতে পারে না। জহরলাল নেহরুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ ভারতের কাণ্ডারী। তাঁর উপর আজ তাই তেতাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। আজ স্বাধীনতা দিবসে

গণতান্ত্রিক সমাজ রচনার প্রথম পদক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ গ্রহণ রেছেন। বুদ্ধিজীবীমহলে এই আদর্শ হণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোড়ন দেখা লেও, দেশের ক্ষেত-খামারে ও ল-কারখানায় খেটে খাওয়া মানুষের পর এই ঘটনার কোন উল্লেখযোগ্য ভাব পড়ে নি। তার প্রধান কারণ টি।

এক, প্রস্তাব পাশ ও সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান এবং কার্যত ব্যর্থতা সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন। ইতিপূর্বে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের যে প্রস্তাব আবাদিতে গৃহীত হয়েছিল, সেইরূপ সমাজ গঠন কতদূর কার্যকরী হয়েছে, তার কোন সমীক্ষা গ্রহণ করলে হয়ত দেখা যাবে যে, আমরা সেই লক্ষ্যপথে আদৌ অগ্রসর হই নি, যদি কিছুটা অগ্রসর হয়েও থাকি, তবে তাও দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ জনসাধারণ মনে করেন যে, কংগ্রেস আর পাঁচটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মত, প্রস্তাব পাশের প্রতিষ্ঠান মাত্র।

দ্বিতীয় কারণ, স্বাধীনতার প্রায় ষোল বছর পরেও সাধারণ মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক উন্নতি

তেরো বছরের খতিয়ানের প্রশ্ন তোলা তুলতা নয়, এ ক'বছর পর আমাদের ধানমন্ত্রী নেহরুর অনাবির্ভাবকে সবার গে মনে পড়লেও তাঁর অনুসৃত রিকল্পনার কথা বিস্মৃত হওয়া দুষ্কর মাদের পক্ষে।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরু বনের শেষরাত্রিতে বসে তাঁর ্যাডের পাতায় যখন রবার্ট ফ্রস্টের ই অবিস্মরণীয় কবিতার ক'টি লাইন লখছিলেন—

রমনীয় বনভূমি গভীর, আঁধার
কত যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে আমার—
ঘুমিয়ে পড়ার আগে
দীর্ঘ পথ হতে হবে পার
দীর্ঘ পথ হতে হবে পার।

তখন হয়তো নতুন ভারতের অনাগত দগন্তের দিকে যাত্রার কথাই তাঁর ার বার মনে পড়ছিল। স্বাধীনতা ংগ্রামের দুঃসময়ে তিনি দেশবাসীকে সই নতুন ভারতের কথা শুনিয়েছিলেন। এই মহান প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষ্য সম্মুখে রেখেই সুরু হয়েছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই নবযাত্রার প্রথম পর্যায়ে গভীর বনভূমির ধ্য দিয়ে যাবার ফলে যাত্রা দুরূহ হয়ে উঠলেও মনে জেগে উঠেছে সৃষ্টির দুর্নিবার বাসনা। এগিয়ে যাবার অনন্ত পিপাসা। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্কল্পময় ঘোষণা।

এই ক'বছরে সৃষ্টির আকাঙক্ষায় ভারতের অরণ্য-পর্বতে জেগে উঠেছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। জনমানবহীন অঞ্চলে আকাশ ছুঁয়ে উঠেছে ইস্পাতের কারখানা। সমগ্র দেশের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন রাজপথ, রেলপথ ও যানবাহনের জটিল জাল, গড়ে উঠছে অসংখ্য বিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান শিক্ষা নিকেতন। আজ শিশু-মৃত্যুর হার অনেক কমে এসেছে। ভারতের অন্যতম প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া আজ নির্মূল বলা চলতে পারে।

কিন্তু জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু দারিদ্র্য, অভাব-অনটন। আজকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সতেরো বছর পর সারা ভারতব্যাপী খাদ্যাভাব। খাদ্যমূল্য আকাশ ছুঁয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। জাতির জীবনে এসেছে অবক্ষয়। নইলে খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃত্যুর চাইতে আজ গোটা দেশে দেখা দিয়েছে ভেজাল খাদ্যে প্রাণনাশের বিভীষিকাময় আশঙ্কা। কেন?

সতেরো বছর পর ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবসে গোটা দেশের এই বিষময় আবহাওয়ার দিকে নজর পড়ায় কেউই স্বস্তিবোধ করতে পারে না। সমাজ-চেতনায় আজ যেন চৈতন্যহীনতার জঘন্য কালোছায়া ছেয়ে। দেশব্যাপী খাদ্য মজুতদারদের বেপরোয়া মনোভাব দেশের আইন-শৃঙ্খলাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতে চায়। তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংবাদ আসছে খাদ্যান্বেষণে সাধারণ মানুষ মজুতদার, গোলাদার এবং দোকানদারদের বিরুদ্ধে ধিক্কার নিক্ষেপ করছে। আমেদাবাদে এক সপ্তাহব্যাপী দোকানপাটে হামলা, পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ খাদ্যসমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ না হলেও, এ-সব বিশৃঙ্খলতার মধ্যে একটি সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে—সমাজ আজ সচেতন। রাজস্থানের জয়পুরে কংগ্রেসী এম-এল-এ প্রতাপ সিং খাদ্য মজুতের অপরাধে ধৃত হয়েছে—রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া সবেগে একথা ঘোষণা করেছেন। মধ্যপ্রদেশেও খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে আন্দোলন সুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে নানাস্থানে খাদ্য গুদাম ও হাট-গঞ্জ লুঠের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গ চাল-তেল মাছের দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য জনিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতো ধুঁকছে।

গোটা দেশের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীতেও এই দূষিত সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। দেশের কর্ণধারগোষ্ঠী কর্মসূচী নির্ধারণে দৃঢ়সঙ্কল্প। আমরা জানি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীনন্দ, শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম সমেত প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী এই অশুভ মুহূর্তের বিনাশকল্পে বদ্ধপরিকর। আভ্যন্তরীণ এই দুর্যোগকালে আন্তর্জাতিক দরিয়ায় যুদ্ধের তুফান উঠেছে। ঘরে বাইরে এই তাণ্ডব মুহূর্তে আজকের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। নেতৃমণ্ডলীসহ গোটা দেশের আপামর জনতাকে আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অশুভের বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করতে হবে আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে, তবেই ঐতিহাসিক পনেরোই আগষ্ট স্মরণীয় হয়ে থাকবে জাতির জীবনে।

—তরুণ মৈত্র

ক'দী। এখনও গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ অভাবে বাঁচে, তাকে মানুষের মত বাঁচা না বলে মানবেতর কোন প্রাণীর মত বেঁচে থাকা বলা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই অপ্রিয় সত্যটুকুও লোকসভার গত অধিবেশন ছাড়া কোন নেতাই স্বীকার করেন নি। বরং তাঁদের কণ্ঠে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির আকাশচুম্বী প্রশংসা প্রতিদিনের সংবাদ-পত্রে আমাদের গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। অর্থাৎ দেশের নেতৃবৃন্দ, যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন এবং যাঁরা প্রস্তাবও পাশ করেন, তাঁদের চরিত্রের মধ্যে সততার অভাব দেখা দিয়েছে। একমাত্র শ্রী ইউ এন ঢেবর পার্লামেণ্টের গত অধিবেশনের আগে, তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি এই অপ্রিয় কথাটি বলেছিলেন যে, দেশ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে দরিদ্র মানুষকে বেঁচে থাকার মত স্তরে নিয়ে যেতে হলে, আরও অন্তত ৪০ বছর সময় লাগবে। তাঁর এই অপ্রিয় কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কাজেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ রচনার মত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রচনার প্রস্তাবটিও যদি কার্যকরী হওয়ার পরিবর্তে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে স্থান পায়, তবে দেশের লোক তাতে বিস্মিত হবে না।

আশু কার্যকরী করার জন্য কয়েক প্রস্তাব

সমাজবাদের মূল কথা যদি সকলের জন্য সমান সুযোগ, অধিকার ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পদ বণ্টন হয়ে থাকে, অর্থাৎ এক কথায় আমাদের এই গলিত সমাজটাকে ভেঙে-চুরে যদি নূতন করে গড়তে হয় তবে, তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি চাই এবং অবিলম্বে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যথা—

১। (ক) আমরা নূতন 'জেনারেশন' বা নূতন সমাজের জন্য প্রত্যাশা করছি। যেহেতু সমাজ মানুষকে নিয়েই। তাই প্রথম সুরু হ'ক, শিশুকল্যাণ থেকে। দরিদ্র সাধারণ মানুষের ঘরের শিশু জন্ম নেবার পর থেকেই বৈষম্যমূলক আচরণ পেতে থাকে। ক'জন লোক তাঁদের ছেলেমেয়েদের, পুষ্টি ও বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিবেশ দিতে পারেন? এই শিশুকল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

(খ) শিশু বড় হয়ে ওঠার পর, শিক্ষার প্রশ্ন আসে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করা হ'ক এবং দরিদ্র শিশুর জন্য বৃত্তি ও নানান ধরণের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হ'ক। এ ক্ষেত্রে, মেধাকে একমাত্র বিচার্য বিষয় বলে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রথম জীবনে মেধাবী নয় এমন বহু ছেলে পরবর্তী জীবনে উন্নত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

গ্রামের সাধারণ মানুষের, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা থাকে না, বিশেষ করে যখন শিক্ষার মান না বাড়লেও ব্যয় চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। অনেক পরিবারে শিশুকে ছেলেবেলা থেকেই ক্ষেতের কাজে বা কারখানার কাজে লাগান হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষা হলে, সমস্ত ছেলেকেই বিদ্যালয়ে যেতে হবে।

শিশুকল্যাণ এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে নূতন সমাজ রচনার ক্ষেত্রে আমরা এক ধাপ অগ্রসর হতে পারব।

বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা

২। গ্রামাঞ্চলে এবং প্রয়োজনবোধে শহরাঞ্চলেও অবিলম্বে চিকিৎসা-ব্যবস্থা অবৈতনিক করা হ'ক। বিনামূল্যে চিকিৎসা-সাহায্য পাওয়া এবং অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্য পাওয়া সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বনিম্ন দাবী এবং অধিকার। স্বাধীনতার এত বছর পরেও গ্রামগুলি সেই অন্ধকারে আছে। যদি শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা করতে পারি, সাধারণ মানুষ সত্যই উপকৃত হবে এবং সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সুফল তাদের দ্বারে পৌঁছবে।

দুস্থ বৃদ্ধদের জন্য ভাতা

৩। অবিলম্বে দেশের দুস্থ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য ব্যাপকভাবে ভাতার ব্যবস্থা করা হ'ক এবং প্রয়োজন হলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা ও পরিচর্যার জন্য সরকার কর্তৃক আশ্রম খোলার ব্যবস্থা করা হ'ক। যাঁরা দেশের মাটি থেকে বিদায় নেবেন, তাঁরা অনাগতকালের সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখবার জন্য আর বেঁচে থাকবেন না, তাঁদের শেষের দিনগুলির শান্তি ও আরামের জন্য আমাদের নিশ্চয়ই কিছু কর্তব্য আছে। এঁদের মধ্যে হয়ত অনেকেই স্বাধীনতার জন্য দুঃখবরণ করেছেন। আর না করলেও স্বাধীন দেশের কর্তব্য, বিদায়ী মানুষগুলির জন্য কিছু আরামের আয়োজন করা। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে এ ব্যবস্থা আছে।

কোন্ অনাগত যুগে দেশের প্রচুর সম্পদ বাড়বে, সকলের মোটা-মুটি বেঁচে থাকার মত আর্থিক-ব্যবস্থা সঙ্কুলান হবে, কবে দেশের দুর্নীতি দূর হবে ততদিন সমাজকে স্থিতাবস্থার দেওয়ালে মাথা কুটে মরতে দেওয়া যায় না। দেশের মধ্যে অসন্তোষ, ব্যর্থতাবোধ এবং হতাশা আজ স্তুপীকৃত হয়ে উঠছে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জনগণের সরকার সমর্থনের একমাত্র মানদণ্ড নয়। কারণ আমাদের এই নিরক্ষর দেশের কাছে গণতন্ত্র বহুলাংশে প্রহসন মাত্র।

অতএব যদি কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় সত্যই আন্তরিক হন, তবে অবিলম্বে এই প্রস্তাবগুলিকে তাঁরা কার্যকরী করতে পারেন। এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা অপরিমেয় অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন নাই, প্রশ্ন আন্তরিকতার, সততার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর।

চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ

কল্পতরু সেনগুপ্ত

ত্যের মত চলচ্চিত্র সমাজের ষ। সমাজ, দেশ ও মানুষের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়। ছবিতে সমাজের সমস্যাগুলির ষ্টপাত ঘটানো স্বাভাবিক। দের চলচ্চিত্র এই স্বাভাবিক সর হচ্ছে কি? এখনো বলতে আমরা বুঝি দেশ ও কথাবর্জিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব।

সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। নশটি ছবির মধ্যে এগারটি (প্রেমোপাখ্যান), ছয়টি ক বা রহস্যকাহিনী, একটি ও একটি ভক্তিমূলক। জীবনীচিত্রে আমরা দেশপ্রেম উচ্চারিত হতে শুনেছ এবং র্মে প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা আর একটা ছবিতে বর্তমান সমাজের ভাঙনের চেহারা চেষ্টা হয়েছে। যে বাংলা ছবি ত হৈ-চৈ করা হয়, সেই বিতে কি সমাজ ও দেশ ব প্রতিফলিত?

ক দেশ ও জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। জাতির জন্য, ভবিষ্যতের সমাজ ন্য এই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লের পরিচয় থাকা দরকার। রা স্বাধীন দেশের মানুষ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের দিতে হয়েছে, সে ইতিহাস ান কালের তরুণ-তরুণীদের থাকে, তবে তাঁরা দেশকে ন বা দেশের জন্য গর্ববোধ ক করে?

দের চলচ্চিত্র প্রযোজকদের জক দায়িত্ববোধ থাকা দরকার, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই তাঁরা বিদেশী ছবির অনুকরণ এবং বটতলা পর্যায়ের গল্পের চিত্ররূপ দিতে যত উৎসাহী, জীবনের গভীরে যেতে এবং দেশ ও মানুষের কথাকে চিত্রে প্রতিফলিত করতে তত উৎসাহী নন। অথচ গতানুগতিক গল্পের বাইরে আমাদের দেশের এত কথা, এত কাহিনী, এত ঘটনা আছে যার ছবি হওয়া দরকার। দেশ স্বাধীন হবার পর, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিষয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটা মাত্র ছবি হয়েছে। এই কয়টি ছবি—'ভুলি নাই', 'বিপ্লবী ক্ষুদিরাম', 'বিয়াল্লিশ', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'বাঘাযতীন', 'আনন্দমঠ', 'নীল দর্পণ', 'বাঁশের কেল্লা', 'পথের দাবী', 'সিরাজদ্দৌল্লা'। সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' জীবনীচিত্রে আমরা দেখতে পাই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি; এছাড়া মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' সুধীর মুখার্জীর

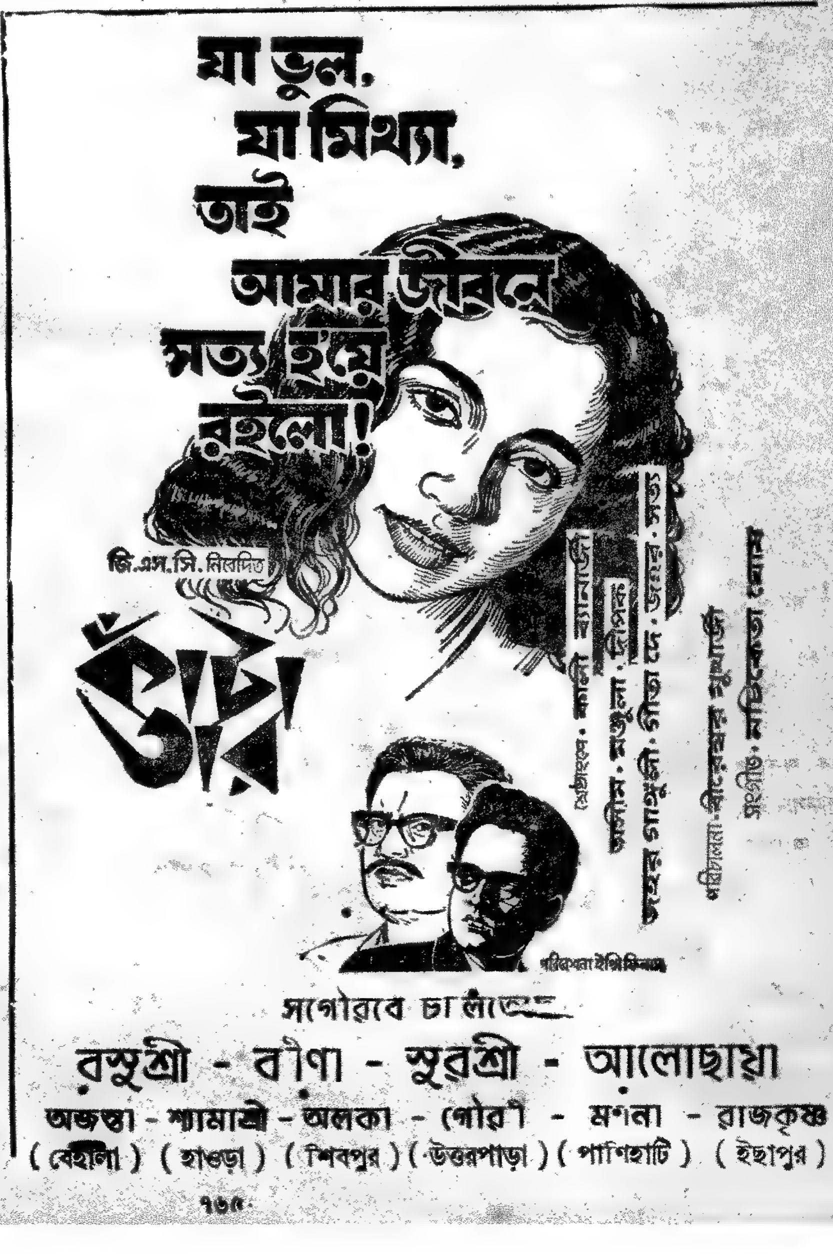

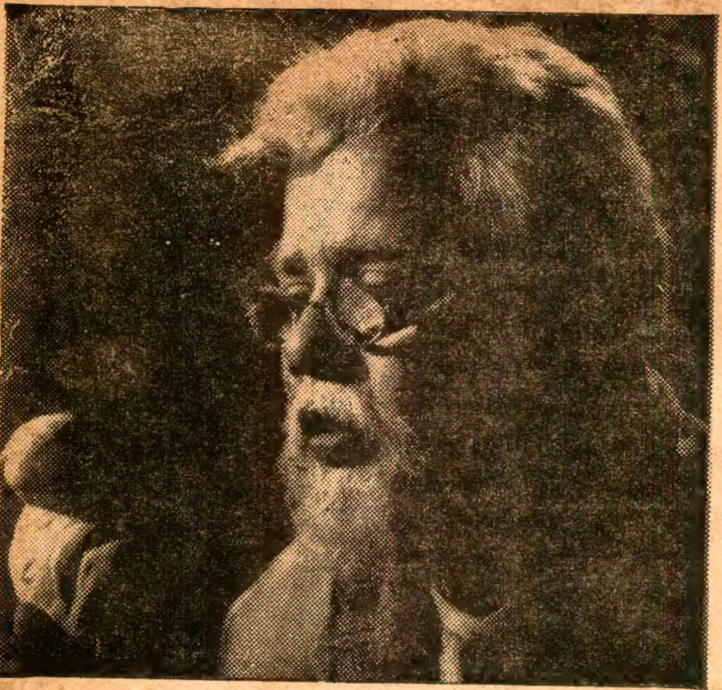

● 'দীপ নেভে নাই' চিত্রের একটি চরিত্রে তরুণকুমার

'দাদাঠাকুর' প্রভৃতি ছবিতে অসহযোগ আন্দোলনের এবং 'ভগিনী নিবেদিতা'য় মুক্তিকামী তরুণমনের আংশিক চিত্র দেখা যায়।

বর্তমানে রবীন্দ্র-গল্পের চিত্ররূপ দেবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি যে সব গল্পে রয়েছে, সে সব গল্প সম্পর্কে প্রযোজকরা তেমন উৎসাহী নন। অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের মত বিচক্ষণ পরিচালকের হাতে পড়লে 'নষ্ট নীড়' গল্পে রামমোহন প্রসঙ্গ এবং বাংলার তৎকালীন প্রগতিচিন্তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চিত্র উপস্থিত হয়। এবং বাঙালীর দেশপ্রেম যে উগ্র জাতীয়তাবাদের চোরাগলিতে আবদ্ধ নয়, সেকথা তিনি এক উপযুক্ত সময়ে বলেছেন।

সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের জীবনীচিত্র নির্মাণের জন্য পরিচালক হিরণ্ময় সেন উদ্যোগী হয়েছেন, এরূপ একটি জীবনীচিত্র দর্শনের জন্য দেশবাসীর আগ্রহ আছে। তবে এ ছবি যাতে প্রামাণ্য মূল্যসম্পন্ন হতে পারে, এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতি রাখতে পারে, তার জন্য পরিচালকদের সতর্ক থাকতে হবে। জার্মান ও জাপানের সাথে সম্পর্ক প্রসঙ্গে ফ্যাসিস্ট নায়করা কোনরকম প্রাধান্য লাভ করলে ছবির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য; বাঙালীরা এই ছবিকে গ্রহণ করবেন না। তাই হিরণ্ময় সেনের উচিত ছিল ছবির চিত্রনাট্য বিষয়ে একটা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা। এই বোর্ড কেবল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রাক্তন নেতাদের নিয়ে গঠিত না হয়ে, ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় গঠিত হওয়া উচিত। তাতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঠিক মূল্যায়নের বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারিতাম। আর একটি সংস্থা মুকুন্দ দাসের জীবন অবলম্বনে চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে মুকুন্দ দাসের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গ্রামে-শহরে তাঁর স্বদেশী যাত্রা মানুষকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছে, দেশাভিমান জাগিয়ে তুলেছে। আজকে সেই অতীতকে আবার জাগিয়ে তোলার দরকার রয়েছে। তাই আমরা এই চিত্র নির্মাণ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাই।

দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে—সে-সব তরুণ বিপ্লবীদের কথা, যাঁরা একদিন 'জীবনমৃত্যু পায়ের
ভৃত্য' করে সাগর পাড়ি দি[illegible]
বিপ্লব-প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ ক[illegible]
চীনে ডঃ সানইয়াৎ সেন[illegible]
লেনিন এবং ফরাসী, বৃটে[illegible]
আমেরিকা ও জাপানের প্রগ[illegible]
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতে[illegible]
সংগ্রামের পক্ষে জনমত [illegible]
সাংগঠনিক কাজ করেছিলেন। [illegible]
জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী [illegible]
বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস, তাঁদের
কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের
যেমন প্রচুর, তার প্রয়ো[illegible]
রয়েছে। স্বাধীনতা-সংগ্রা[illegible]
অধ্যায়কে ভারতের মুক্তি-
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্ত[illegible]
চেতনার কথা আমরা ভুলতে [illegible]
সাঁওতাল-বিদ্রোহ, মেদিনীপুর, [illegible]
বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক-বি[illegible]
কথাও চলচ্চিত্রে রূপলাভ করা [illegible]
আমাদের দেশের সাধারণ [illegible]
বীরত্ব ও মহত্ত্ব এই সব কাহিনী[illegible]
বিজড়িত রয়েছে।

বর্তমান ভারতে এক বির[illegible]
কার্য সুরু হয়েছে। বিরা[illegible]
কারখানার পাশাপাশি সমব[illegible]
গঠিত হবার পথে। শত-সহস্[illegible]
নিরলস কর্মে আজ নতুন ভা[illegible]
হতে চলেছে। প্রসঙ্গত ম[illegible]
একটি চিত্র। ডি-ভি-সি'র বাঁ[illegible]
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নেহ[illegible]
সাঁওতাল নারীমজুরকে দিয়ে[illegible]
টিপিয়ে ছিলেন। সেদিন কা[illegible]
ছবি বার হয়েছিল। কিন্তু ত[illegible]
প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতের [illegible]
মজুরের ভূমিকার গুরুত্ব [illegible]
করেছিলেন; কিন্তু আমাদের
নাটক ও চলচ্চিত্রে সেই গু[illegible]
ফলিত হতে পারে নি। আমাদে[illegible]
ডি-ভি-সি'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য[illegible]
করা হয়েছে, কিন্তু বীর শ্রমিক, [illegible]
কৃষকদের উপস্থিত করা হয় নি[illegible]
সমাজের এই দৃঢ়চেতা শ্রমিক-[illegible]
পরিবর্তে আমাদের ছবির [illegible]
নায়ক প্যানপেনে স্বভাবের, [illegible]
জীবী, অকর্মণ্য যুবক। যাদে[illegible]
'মস্তান'রা খুশি হয়, সাধা[illegible]
অনুপ্রাণিত হয় না।

আমাদের চলচ্চিত্রে জাতির [illegible]
ও ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়ে [illegible]
মানুষের শ্রম ও মহত্ত্বের জ[illegible]
সুশোভিত হয়ে কল্যাণময় রূপ[illegible]
করুক। ছবি হোক জীব[illegible]
আনন্দময় ও মহৎ-অনুপ্রেরণাসম্পন্ন[illegible]

খেলা ধুলা

॥ প্রাক্-স্বাধীনতার কাল থেকে একালের খেলাধুলা প্রসঙ্গে ॥

শ্রীঅমিতাভ

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে শ্বেতাঙ্গ ...ত্বের দাপট দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ...ড়িয়ে পড়েছিল। খেলাধুলার ব্যাপারেও ...র কোন ব্যতিক্রম হয় নি। বিংশ ...ার প্রথমভাগে একদিকে যেমন ... গোরা দল অন্যদিকে ...তমনি জাঁদরেল সিভিলিয়ান দল। ...টো করে গোরা দল একটা ফোর্ট ...ইলিয়ামে অন্যটি ব্যারাকপুরে সারা ...ছর ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকত। কাজের ...ধ্যে খাওয়া দাওয়া, কুচকাওয়াজ ...ার ফুটবল খেলা। সিভিলিয়ান দলের ...ধ্যে ক্যালকাটা, ডালহৌসি, রেঞ্জার্স ...-কলকাতা ময়দানে সগৌরবে প্রভুত্ব ...রত। এই দুঃসময়ে মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী ...াঙালী খেলাধুলার ব্যাপারে সাহেবদের ...কচেটিয়া প্রাধান্যকে বুক ঠুকে ...্যালেঞ্জ করল। সাহেব মহলে বাঙালী-...র এই গোঁয়ার্তুমির উপযুক্ত শাস্তি ...বার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ...ুতাঙ্গ ক্রীড়া-পরিচালকের দলও ...াতভাইদের মান বাঁচাবার জন্য ...ছবার বহু অন্যায় পন্থা অবলম্বন ...রতেন। কিন্তু ১৯১১ সালের এক ...ভলগে ফুটবলে শ্বেত প্রভুত্বের মূলে ...ঠারাঘাত করল মোহনবাগান দল। ...১১ সালের ২৯শে জুলাই একাদশ ...লী নওজোয়ানের দ্বারা গঠিত মোহনবাগান ইতিহাস সৃষ্টি করল শ্বেতাঙ্গ দল ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে আই-এফ-এ শীল্ড বিজয় করে।

খেলার শেষে মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের আশীর্বাদ করে এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করলেন উদাত্ত এক ভবিষ্যদ্বাণী—

"আজ তোমরা কেল্লার মাঠে দেশের—বাঙালীর জয়পতাকা উড্ডীন করেছ, কিন্তু কবে সেই শুভদিন আসবে যেদিন জাতীয় পতাকা উড়বে কেল্লার মাথায়।"

খেলার ছলে বাঙালী সেদিন প্রমাণ করেছিল—বিদেশী শক্তিকে পরাস্ত করা অসম্ভব নয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গদের এক সংবাদ-পত্র যে মন্তব্য করেছিল তা সত্যই স্মরণীয়। তারা লিখেছিল—

"কংগ্রেস বা স্বদেশীওয়ালারা আন্দোলন করে যা করতে পারে নি আজ অনুপ্রাণিত একাদশ বাঙালী যুবকের নগ্নপদে ঐতিহাসিক বিজয় তা সম্ভব করেছে।"

সাহেবদের হারিয়ে দিয়ে আই-এফ-এ শীল্ড জিতে মোহনবাগান দেশের মনোবল সৃষ্টি সম্ভব করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে মোহনবাগানের সেই ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয় নূতন আশার আলো দেখিয়েছিল। এরপর ফুটবলও এক অপূর্ব বিকাশ লাভ করল বাঙালীর সমগ্র জীবনে।

গোরা আর শ্বেতাঙ্গ দলগুলির গৌরব-সূর্য অস্ত গিয়েছে, তারাও

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

বিলীন হয়েছে পশ্চিম দিগন্তে, যারা আজ কলকাতা ময়দানে এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তারা আজ অতীতের ম্লান ছায়ামাত্র। সেই তিমির রাত্রি কেটে গিয়েছে। স্বাধীনতার সূর্যালোকে আজ জাতির পথ প্রশস্ত। স্বাধীন ভারতে খেলাধূলা ফুলে ফলে সুশোভিত হবার বহু সুযোগ পেয়েছে সরকারের অনুপ্রেরণা এবং অবারিত সাহায্য লাভ করে।

এত সুযোগ এবং সাহায্য লাভ করেও ভারতের খেলাধূলার মান যেন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। পরাধীন ভারতে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে বিশ্বজয়ী ভারতীয় হকির বিজয়রথ যে জয়যাত্রা সুরু করেছে ১৯২৮ সালে, স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ সালের পর সেই বিজয়-রথের চাকা ভেঙে দিয়েছে, প্রতিবেশী পাকিস্তানের নবগঠিত হকি দল। ভারতীয় হকির হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার অজস্র অর্থব্যয় করছে, কিন্তু ভারতীয় দলের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তার স্থান আরও নীচুতে হয়ত নেমে যাবে।

স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা নিয়েই ভারতের ফুটবল দলের প্রথম পদক্ষেপ অলিম্পিকের পবিত্র অঙ্গনে, ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে। স্বাধীন ভারতে ভারতীয় অলিম্পিক দলের কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে প্রতিবারে, কিন্তু যোগ্যতার বিচারে ভারত সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না।

স্বাধীন ভারতে খেলাধূলা যেমন প্রাধান্য লাভ করেছে, গুণী খেলোয়াড়েরাও আজকাল যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছেন। খেলাধূলার ক্ষেত্রে দেশের পক্ষে যে সমস্ত প্রবীণ খেলোয়াড়দের উল্লেখ-যোগ্য দান আছে, সরকার তাঁদের পদ্মশ্রী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করছেন। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন বিষয়ের সেরা খেলোয়াড়রা লাভ করছেন অর্জুন পুরস্কার। এত করেও কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে খেলাধূলার ক্ষেত্রে প্রতিভার সাধারণ উন্মেষ ঘটছে না।

বিভিন্ন ক্রীড়া পরিচালনার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে উচ্চ আসনে আসীন কর্তাদের সঙ্গে খেলাধূলার সত্যকারের কোন যোগই নেই। শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভেই তাঁরা খেলাধূলার ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার পথে হাসি-মুখে দ্বিধাহীনচিত্তে ঠেলে দিচ্ছেন। আমরা ভারতীয় ক্রীড়ার প্রাণকেন্দ্র ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার দিকে তাকালেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। স্বাধীন ভারতে খেলা-ধূলার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি ক্রীড়াকেন্দ্রেই গড়ে উঠেছে একটি করে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, কলকাতার বুকে আজ পর্যন্ত গড়ে উঠল না কোন স্টেডিয়াম!

স্টেডিয়াম কলকাতার ক্রীড়ামোদী-দের কাছে স্বপ্নেরই সামিল। অথচ আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগেই কলকাতা ময়দানে ফুটবলের যাত্রা সুরু হয়েছে। সন্তোষের মহারাজা শ্রীমন্মথ রায়চৌধুরী স্টেডিয়াম গঠনের জন্য তোড়জোড় সুরু করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে স্টেডিয়াম পরিকল্পনার সলিল সমাধি ঘটে তখন। বিশিষ্ট শিল্পপতি [illegible] শ্রীশিব ব্যানার্জী কলক[illegible] স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য আ[illegible] চেষ্টা সুরু করলেন। [illegible] এসে তাঁকেও টেনে নি[illegible] স্টেডিয়াম যে তিমিরে [illegible] তিমিরেই রইল। মৃত্যুর কিছু[illegible] থেকেই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী[illegible] চন্দ্র রায় স্টেডিয়াম [illegible] পরিকল্পনাকে কার্যে র[illegible] জন্য ব্রতী হন। [illegible] স্বার্থান্বেষী ক্রীড়াপরিচালক [illegible] এই শুভ পরিকল্পনাকে [illegible] করার জন্য আপ্রাণ চে[illegible] ব্যর্থ হলেন। স্থান [illegible] হল, ইতালীয় স্থপতি [illegible] পরিদর্শন করে নক্সা দাখিল [illegible] কিন্তু এই পরিকল্পনাই যেন [illegible] সেই সময় বিধান রায় [illegible] পরলোকে।

এর পর আবার জাতী[illegible] এসে স্টেডিয়ামকে আর[illegible] সরিয়ে দিল। তবে সকলের [illegible] আন্তরিক সাহায্য পে[illegible] পূর্বেই কলকাতা পেত [illegible] পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম। এ[illegible] আছে খেলাধূলাকে ঠিক [illegible] পরিচালিত করার। স্বার্থান্বেষীর [illegible] দূরে সরে যাক খেলা[illegible] ক্ষেত্র থেকে, সত্যকারের [illegible] দরদীরা নিক খেলাধূলাকে [illegible] দেবার গুরুদায়িত্ব। তাঁমার [illegible] হয় এই পরিবর্তন সম্ভব [illegible] ভারত তার বিজয়পতাকা উড্ডী[illegible] রাখতে সক্ষম হবে দেশ-বিদেশে[illegible] ক্রীড়াঙ্গনে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশি[illegible]

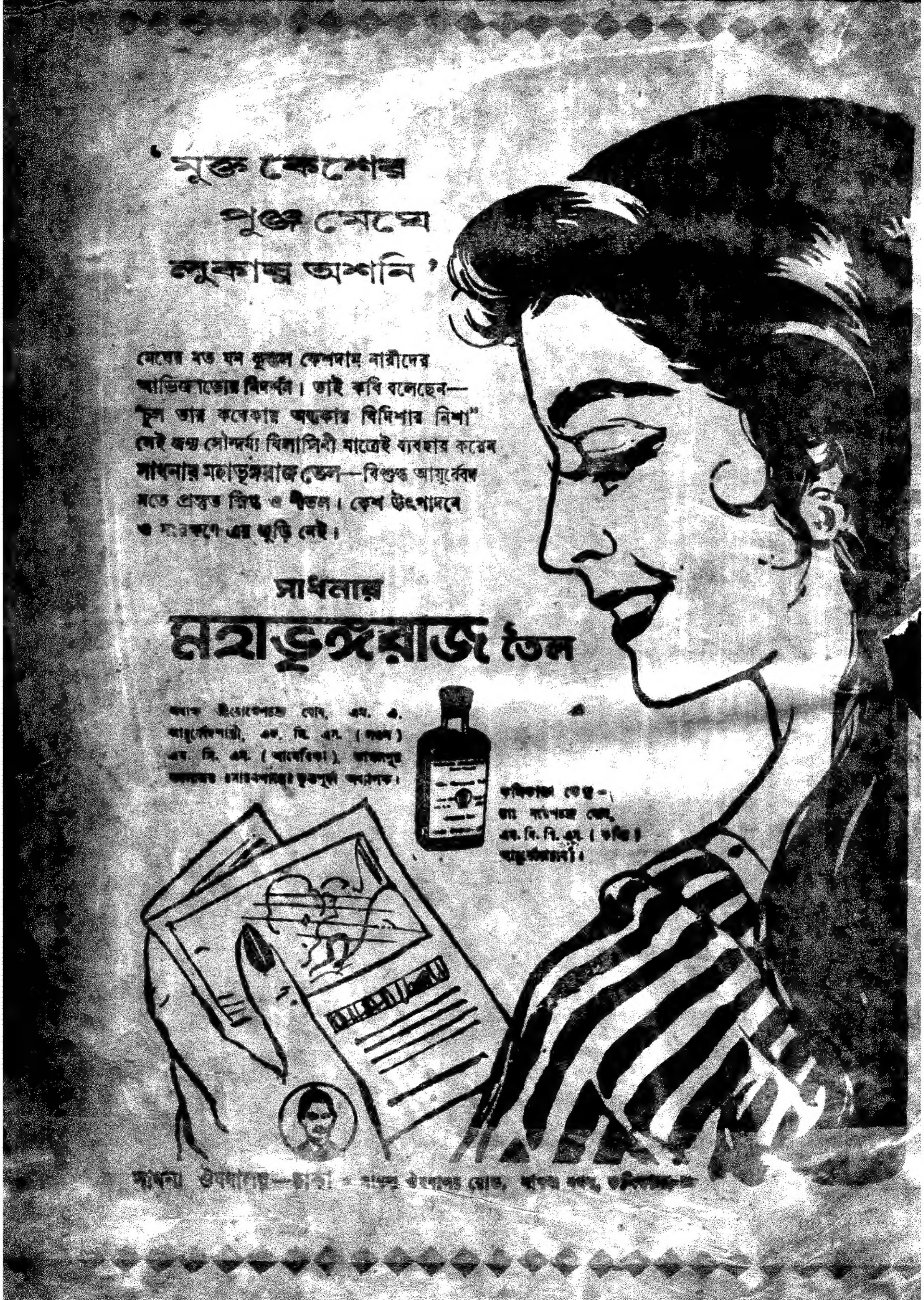
'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের
আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে
ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা